সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

লোটাকম্বল



লোটাকম্বল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



প্রথম সংস্করণ: জুন ২০০৯
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7756-837-0 (print)
ISBN 978-93-90286-57-7 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: দেবাশিস সাহা

প্রকাশকের নিবেদন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘লোটাকম্বল’ গ্রন্থাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫-তে। দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৯২-তে। বর্তমানে ওই দু’খণ্ড একত্র করে ‘লোটাকম্বল’ উপন্যাসের অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

My good blade carves the casques of men.

মারকাটারি বগল চাপ কারবারে গুনচট

যেমন কর্ম তেমন ফল

তিন বাতসে লট্পাট হেয়:

যে হও সে হও প্রভু

গোদা রোটি খাও

তুমি নাহি দিলে দেখা কে তোমারে দেখিতে পায়

লেতা হুঁ মকতব-এ গম-এ দিল-মেঁ সবক হনূজ্

Death dances like a fire-fly, Life coughs

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না

তুই নেই বলে ওরে উন্মাদ

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি

বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা

জানি না কে বা, এসেছি কোথায়,

ওই দেখা যায় বাড়ি আমার

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি

আরে সত্যঘাতী মন! কেন হও বিচঞ্চল?

ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে।

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে

লাখোঁ সুন্দার সপ্নোভিতে লাখোঁ সাঁঝ সবেরা

মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু

রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল

এই মানুষে সেই মানুষ আছে

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে

পার করো দয়াল, আমায় কেশে ধরে

নিরাসক্ত ভালবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী

Lead us not into temptation

The hour has come:

তিনটে কাছি কাছাকাছি যুক্ত

I may load and unload

সামনে যখন যাবি ওরে থাক-না পিছন পিছে পড়ে

The road of excess leads to the Palace of Wisdom.

বিশাল ধরার চতুঃসীমায় যা কিছু পাও, স্বপ্ন শুধু

পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।

দিয়েছিলে জ্যোৎস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার

About, about, in reel and rout

হেসে নাও এ দু'দিন বই তো নয়;

সুখের কথা বোলো না আর

আব ইয়ে সমঝ্মে জফরকি আয়া

In the great crisis of life when existence itself is

মনে করি এইখানে শেষ

There is no path in the sky and a monk must

One life, one death, one heaven

I shall go to her, but She shall not return to me

I could give all to time, except what I

ফলপাকা বেলী ততী ছিটকায়া সুখ যাহিঁ।

সামনে যখন যাবি ওরে থাক-না পিছন পিছে পড়ে

হে অন্তরযামী ত্রাহি!

যে সুরে বাজাই বেসুর লাগে

সমুখ দিয়ে স্বপনসম

Tell me in what part of the wood

I am no prophet

যে কথা ফোটে না গানে

দুয়ার খুলে থাকি বসে

দ্বিতীয় খণ্ড

Does the road wind up-hill all the way?

Good night? ah! no, the hour is ill

Love means never having to say you are sorry

What if the Universe wears a mask?

Happiness is beneficial for the body

একদিন কুম্ভকার-গৃহ-পার্শ্ব দিয়া

প্রেমের হাতে ধরা দেব

রক্ষা করো হে।

কি সুন্দর— কি মহান উদ্বেগে দাপটে!

I do none of the things I promised I would

As certain as stars at night.

মা গো অত আদর, অত স্নেহ সব করিলি মাটি।

ট্যাঁ করে জন্মে আমি কী পেলাম

The man that runs away

There are only three things to be done with a woman.

We're always too much out or too much in

As face reflects face in water

If one calls you a donkey, ignore him

Come let us ask life

One learns to know oneself best behind one's back.

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমি তখন জাগে, সেই আমিটা কে?

ভীষণ তৃষ্ণার্ত আমি। এই নদী, এই ছায়াবট

If your only tool is a hammer, then all your problems look like nails.

Who can go out without using the door?

Life is like an Onion. You peel

অন্তরে লভেছি সত্য, ভ্রমণের ফলে,

The man that runs away

Like a sword that cuts but cannot cut itself,

Still nursing the unconquerable hope

What a great happiness not to be me!

Nothing at all but three things,

You stand upon the threshold of your Century.

যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা

The people that walked in darkness have seen a great light.

জীব আজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।

জন্ম-জরার ঝরাধানে ফোটে নয়ন-চারা

Is man one of God's blunders

God, like a gardener, sows people as they are

He that looks not before, finds himself behind

When a man is wrapped up in

If you ever need a helping hand

To see a world in a grain of sand

Every man is a volume, if you know how to read him.

There is an Eye that never sleeps

কোথায় পালাবে তুমি তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়

Keep your fears to yourself, share your courage with others.

An animal with some instincts of a God,

Every man is the architect of his own fortune,

The time, which steals our years away

The flowers fall for all our yearning;

Thirty spokes will converge

প্রথম খণ্ড

অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ

মাতাজী

পরমারাধ্যা

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণার

শ্রীচরণকমলে

যাত্রা শুরু

এ আমার আত্মজীবনী নয় তবে আত্মজীবনীর মতো করে লেখা অসংলগ্ন প্রলাপ। বস্তু আছে কি না জানি না তবে বাস্তব কিছু থাকতে পারে। পৃথিবীতে অনেকেই অনেক কিছু করতে আসে। আমার স্কুলের প্রধানশিক্ষক মশাই ক্লাসে এসে প্রায়ই বলতেন, ওরে এসেছিস যখন তখন দেয়ালে একটা আঁচড় রেখে যা। স্বামী বিবেকানন্দ, যুগাবতার রামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, হুড়হুড় করে একগাদা নাম উচ্চারণ করতে করতে রবীন্দ্রনাথে এসে স্তব্ধ হয়ে যেতেন। চোখ ছলছলে হয়ে উঠত। তারপর চটাক করে সেই চটকা ভেঙে শেষ বেঞ্চের কোণের দিকে বসে থাকা শম্ভু সাঁতরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলতেন, অ্যায়, উঠে দাঁড়া। শম্ভু কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াত। ইংরিজি কর, রামেরা দুই ভাই। শম্ভু বারকতক রাম নাম করে চেত্তা-খাওয়া ঘুড়ির মতো একপাশে কেতরে পড়ত। সেই বয়েসেই বুঝেছিলুম, ত্রেতায় রাম নামের যথেষ্ট পাওয়ার থাকলেও কলির শেষপাদে একেবারেই শক্তিহীন; কারণ এর পরেই হেডমাস্টারমশাই শম্ভুর পিঠে লিকলিকে বেত দিয়ে সপাসপ আঁচড় কাটতে শুরু করেছেন। এরপর ওই রাম তার যোগ্য ভ্রাতাকে নিয়ে ইংরিজি হবার জন্যে ঘুরে ঘুরে আমাদের সকলের কাছেই আসছে আর আমরা যথারীতি বেত্রাহত হয়ে আঁচড়-কাটা মহাপুরুষ না হয়ে আঁচড়-খাওয়া মানবসন্তান হয়ে নেতিয়ে নেতিয়ে পড়ছি। একটি প্রশ্ন এবং পর্যায়ক্রমে ক্লাসের বড়, ছোট, দামড়া ষাটজন মনুষ্যশাবককে পেটাতে পেটাতেই সময় কাবার হয়ে যেত। টেবলের ওপর বেত ফেলে দিয়ে হেডমাস্টারমশাই কোঁচার খোঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে দিনের শেষ কথাটি বলতেন, তুমি যখন এসেছিলে, তখন তুমি কেঁদেছিলে জগৎ হেসেছিল, তুমি যখন যাবে হাসতে হাসতে যাবে, আর সারা জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুটি বাতাসা বের করে তিনি মুখে ফেলতে-না-ফেলতেই স্কুলের দারোয়ান এসে বেত, ডাস্টার আর মোটা ডিকশনারিটা তুলে নিয়ে চলে যেত। কাঁধে চাদর ফেলে আমাদের প্রধানশিক্ষক উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে সাবধানে নেমে আসতেন, তারপর আপন মনে আঁচড় কেটে যা আঁচড় কেটে যা বলতে বলতে নিজের ঘরের দিকে চলে যেতেন। আমরা সদলে ডোরা-কাটা জেব্রার মতো বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবতুম দাগ রেখে যাওয়া ব্যাপারটা কত সহজ! কিছুই না, একটা বেত আর মনুষ্যরূপী গাধাদের কালো-সাদা পিঠ আর একটি প্রশ্ন। এই তিন মালকে মেলাতে পারলেই মহাপুরুষ। মার খেতে খেতে শম্ভু সত্যিই মহাপুরুষ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে তার পিঠের আর কোনও সাড় নেই। মারলেও লাগে না। কানমলার চোটে ডান কান বাঁ কানের চেয়ে দু'সুতো লম্বা হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে সাচ্চা সাধুর মতো সবসময় শালা বেরোচ্ছে।

পেটাই হতে হতে পেটাই হতে হতে, জলছাত তৈরি হয়। গোটা কুড়ি পাঠঠা মেয়েমানুষ জলের আরক ছিটোয়, পিচিক পিচিক করে খইনির থুতু ফেলে আর কাঠের মুগুর দিয়ে পেটাতে থাকে যদ্দিন না পেটাইয়ের কাঠ তড়াং তড়াং করে লাফিয়ে ওঠে। এইভাবে হিট প্রুফ, ওয়াটার প্রুফ ছাদ তৈরি হলেও অভিমানশূন্য মানুষ

তৈরি হয় কি? কেরিয়ারও কি তৈরি হয়? হলে আমি সত্যিই মহামানব হয়ে যেতুম। ওটা আলাদা ব্যাপার। আমার সম্পর্কে একদিন একটি মন্তব্য শুনে বড় মুষড়ে পড়লুম। হাজারবার ধুলেও কয়লা সাদা হয় না। পেতল মাজলেও সোনা হয় না। মানুষ নিয়ে আসে। অদৃশ্য একটি পুঁটলি নিয়ে কুঁজো হয়ে অন্ধকার রাতে মাতৃজঠরে মুক্তোর পেটে স্বাতী নক্ষত্রের জলের মতো ঢুকে, ঘাপটি মেরে বসে থাকে। তারপর একদিন অয়েলক্লথে ওঁয়া ওঁয়া করে গড়িয়ে পড়ে। গর্ভে মহাপুরুষ এলে মায়ের জ্যোতি বেড়ে যায়। শেষরাতে পিতা স্বপ্ন দেখেন, আষ্টেপৃষ্ঠে বটের ঝুরি জড়ানো ভগ্ন দেউল থেকে জ্যোতিষ্মান এক দেবশিশু বেরিয়ে এসে বলেন, আমি তোর কাছে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পিতার ঘুম ভেঙে যায়। স্বেদ, কম্প, পুলক প্রভৃতি দেখা দেয়। তিনি মাকে ঠেলা মারতে মারতে বলতে থাকেন, ওগো, শুনছ শুনছ, তিনি আসছেন, তিনি আসছেন। শেষের দিকে আনন্দে গলা ভেঙে আটরকম শব্দ বেরোতে থাকে। আগমন সংবাদ অকটেভে খেলে বেড়ায়। ঘুম-চোখে মা হয়তো জিজ্ঞেস করেন, কে আসছে গো? পিতা মশারির মধ্যে গ্যাঁট হয়ে বসে ভাবাশ্রু বর্ষণ করতে করতে বলেন, যেসাস হতে পারেন, কৃষ্ণের অবতার হতে পারেন, স্বয়ং মহাদেব হতে পারেন। কে বলতে পারে, সময়ের ঘূর্ণনে দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হচ্ছে কি না! ক্ষুদিরাম তো এইভাবেই গদাধরকে পেয়েছিলেন। জগন্নাথ পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যকে। মায়ের খাতির অমনি বেড়ে যায়। মহাপুরুষের ডিম্ব ধারণ করেছেন। অলৌকিক জ্যোতি দেখা দিয়েছে লৌকিক শরীরে। যৌথ পরিবারের ছাদে ভাদ্রের চাঁদি-ফাটা রোদে বসে বসে বড়ি কি কয়লার গুল আর দিতে হবে না। বাগানের পাঁচিলে থ্যাপাক থ্যাপাক করে ঘুঁটে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য তলব করা হল। তাঁরা প্রত্যেকেই একবাক্যে ঘোষণা করলেন, এ বস্তুটির আবির্ভাব-মুহূর্তে ছোটবউদির চেহারায় কোনও অলৌকিক পরিবর্তন আসেনি। স্বপ্ন একটা দেছেছিল মনে হয়, বাবা পঞ্চানন ষাঁড়ের পিঠে চেপে আসছেন। পঞ্চাননতলার পঞ্চানন? সে দেবালয় ভেঙে কালের গর্ভে চলে গেছে। তা ছাড়া বাবা পঞ্চাননের তেমন দেবমর্যাদা ছিল না। পূজারি বেচারা গাঁজায় দম মেরে মেরে অকালেই দমহারা হয়ে পরপারে। মনে পড়েছে, তিন বছর বয়েসে ওকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই পুঁয়ে পেয়ে ছেলে শুকোতে লাগল। সাত সমুদ্রের কডলিভার মালিশ করে করে মালিশ করে করে, রোদে ফেলে রাখা হত ধুতি চাপা দিয়ে। কী বরাত! যে বয়েসে শিশু কোলে কোলে, বুকে বুকে ত্যাত্যা, ব্যাব্যা করে বেড়াবে, গোলগাল মোটা মোটা হাতের কচি কচি আঙুল দিয়ে নাক খামচাবে, চশমা ধরে টানবে, সেই বয়েসেই অস্পৃশ্য মৎসগন্ধ হয়ে দাওয়ায় পড়ে রইল। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কাছে এগোতে হত, এই যে আমার বাবুটা, এই যে আমার ব্যাবাটা। মুখে শিশুর স্বর্গীয় হাসি ছিল না। নাড়গোপালের মতো হামা ছিল না। কোমরের লাল ঘুনসিতে তামার ফুটো পয়সা কাপ হয়ে বসে ছিল না। সংসারের চাতালে এক দুঃস্বপ্নের আবির্ভাব। তিমিরে কডলিভার-মর্দিত তিমিশিশু। হাতে তার গুনছুঁচ। তবিল ফুটো করে সব সঞ্চয় লিক করিয়ে দিলে। এ মহাপুরুষ হল চৌবাচ্চার সেই বিখ্যাত ছেঁদা। যাঁর আগমনে সংসারটাই ড্যামেজ হয়ে গেল।

পুত্রের জন্মে পিতার ভূমিকা কী আমার জানা হল না। তবে মা আর তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে-থাকা মাতুল বংশের অবদানে আমি যে একটি গেঁজে যাওয়া পদার্থ এ সত্যটি পাকেপ্রকারে নানাভাবে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছিল। ওই যে তোমার কাঠামো, ওটা তোমার মামার দিকেই গেছে। বাপু। এ বংশে কারুর বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি ছিল না। মিনিমাম ছত্রিশ, ম্যাক্সিমাম ছেচল্লিশ। হাতের কবজি কারুর অমন প্যাঁকাটির মতো

ছিল না। ঘড়ি পরবে কী? পরতে হলে বাজুবন্ধ করে পরতে হবে। অমন সখীমার্কা চুল ওই বংশেরই পেটেন্ট করা জিনিস। বকের মতো লম্বা ঘাড়। ঘোড়ার মতো মুখ। ও মুখে আর ও মাথায় বাস্তব বুদ্ধি থাকতে পারে না। ইমোশন, সেন্টিমেন্ট, ক্রোধ এইসবই ভ্যাট ভ্যাট করছে। অহংকার, আলস্য, ঈর্ষা যাবতীয় তমোগুণে শরীর পাকতেড়ে। এরপর একটি ইংরেজি বাক্যে আমার চরিত্র সম্পূর্ণ, হি ইজ গুড ফর নাথিং। ওকে একটা নরম বিছানা আর গোটাকতক তুলতুলে বালিশ দাও, ঘুমিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিক। অগ্নিতে ঘৃতসংযোগের লোকের অভাব সংসারে হয় না। তাঁরা কুটুস কুটুস করে বলতে লাগলেন, ওর মায়ের লিভারটা কমজুরি ছিল তাই গায়ে গত্তি লাগে না। ওর মায়ের সর্দিকাশির ধাত ছিল, টনসিল ছিল, তাই বারো মাসই হাঁচি কার্শি সর্দি লেগেই আছে। এই যার স্বাস্থ্য তার জন্যে সংসার নয়, স্যানাটোরিয়ামই উপযুক্ত স্থান। মা ঊর্ধ্বলোকে পালিয়ে বেঁচেছেন, আমি পালাতে পারিনি। ফ্যাস্তা কলে পড়ে ফেঁসে গেছি। মায়ের জন্যে মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়। রোজই একটা-না-একটা কারণে তাঁকে নামানো হয়, আর তাঁর অপদার্থ সন্তানকে উপলক্ষ করে বাক্যবাণে এফোঁড়-ওফোঁড় করে আবার ওপর দিকে তুলে দেওয়া হয়।

আমার মরুভূমিতে মরূদ্যান ছিল না, ছিল মরীচিকা। সকলের মুখই কঠিন কঠোর। নিজের মুখ যতই বিষন্ন করি না কেন অন্যের মুখে স্নেহের নরম ছায়া নামে না। একটু ভালবাসা কোথায় পাওয়া যায়? গোকুলে নিশ্চয় কেউ বাড়ছে যে এই অধমকে ভালবাসবে। কল্পনায় সেই মুখটিকে পোস্টারের মতো বুকে সেঁটে একদিন খুব আবেগের গলায় গাইছি, বাঁকা ভুরু মাঝে আঁকা টিপখানি; কীভাবে জানি না, আমার সেই আবেগ চর্চা পিতৃদেবের কানে গিয়ে পৌঁছোল। তিনি রায় দিলেন, ছোকরা সঙ্গী খুঁজছে। হরমোন সিক্রিশনের এই তো বয়েস। তা বাপু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটি বাঁকা ভুরু খুঁজে নিলেই হয়।

কে বোঝাবে ও গান হর্মোন গাওয়ায়নি। চৈত্রের খাঁ খাঁ দুপুরে কাঠঠোকরা যখন সশব্দে নারকেল গাছ ফুটো করে, ঘুঘু যখন নির্জন বাগানে দুপুরকে উদাস করে তোলে, ঘাস-জ্বলা মাঠে গাভী যখন কষ্টের হাম্বাস্বরে বোঝাতে চায় বড় কষ্ট, বড় কষ্ট, তখন মনে একটু বিরহের সুর আসতেই পারে। তাতে শরীরস্থ গ্ল্যান্ডের কোনও কারসাজি নেই। কথা শুনে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বিদ্যে যদ্দুর হয়েছে তদ্দুর ভাল। আর না। এবার ভাগ্যান্বেষণ। একটা কিছু হতে হবে। হয়ে দেখাতে হবে, আমিও হতে পারি।

আমি যা হতে পারি তার একটা ছবি বেশ ভালভাবেই আঁকা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার হতে পারব না, বড়ই দুর্বল। অঙ্কে মাথা নেই। যার সরল করো-র উত্তর বেরোয় ন'হাজার সাতশো সত্তর বাই আঠারোশো ছত্রিশ, তার দ্বারা ব্রিজ বানানো কি ড্যাম তৈরি অসম্ভব ব্যাপার। ও ওই চুল উলটে মিনমিনে গলায় সখী সংবাদ করুক। বড় ইচ্ছে ছিল ফ্যামিলিতে একজন ডাক্তার হোক। বিধানচন্দ্র কি নীলরতন না হোক আমাদের ভুজঙ্গভূষণের মতো হলেও চলত। রাতবিরেতে কারুর শরীর খারাপ কি আত্মীয়স্বজনের ডেলিভারি কেস। হায় ভগবান! সে গুড়েও বালি। যে-ছেলে রক্ত দেখলে অক্ত অক্ত করে লাফায়, রাস্তায় বলহরি শুনলে একলা ঘরে শুতে পারে না, ভূত দেখে, সে হবে ডাক্তার! ওর ওই চুল উলটে চোখ বড় বড় করে, রে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোরই ভাল। এর বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়। আইনের জগতে রাসবিহারী, সেও কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। মেটাল দেখলেই বোঝা যায় ধারালো কিছু হবে কি ভোঁতা কোদাল হবে। যে লোক দেখলে লাজুক হেসে তোতলাতে থাকে তার পক্ষে সেলসম্যান হওয়াই অসম্ভব, বাঘা ব্যারিস্টার তো বহু দূরের কথা। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ ফোড়ন কাটলেন, ধাতু দৌর্বল্য। অভিভাবক মেনে নিলেন, হতে পারে, নরানাং মাতুলক্রম। টাইপ

আর শর্টহ্যান্ড শিখতে বলো, মাস গেলে যা হোক তিন-চারশো হবে। ওইতেই বাঁকা ভুরু হবে, আঁকা টিপ হবে। আমাদের সব স্বপ্ন ওই ছোকরা ভেস্তে দিলে।

কী হতে পারব না যখন স্পষ্ট, কী হতে হবে তাও যখন নির্দিষ্ট, তখন একটা নতুন পথ বেছে নিতে হবে। দেখিয়ে দোব, কোন পথে কে চলে। পৃথিবীটা ভোঁদকা মানুষে ছেয়ে গেছে। চওড়া চওড়া বুক, মোটা মোটা কবজি, ভুঁড়ি, কলাগাছের মতো উরু, থামের মতো ঠ্যাং। এক একবারে পাহাড়প্রমাণ ভাত উড়ছে, পাঁঠার ঠ্যাং, ডবল ডিমের ওমলেট। ঢক ঢক করে জল খাওয়া, ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর তোলা, চ্যাকর চ্যাকর পান চিবোনো। সমস্ত ব্যাপারটাই লাউড, নয়েজি, অ্যান্ড ভালগার। আমার উক্তি নয়, আমার মাতুলের। কাঁধে লাল ভিজে গামছা, ঢাকের মতো পেটের তলায় লুঙ্গির কষি বাঁধা, বুকের পাটা দুটো থলথল করে ঝুলছে, মোটা মোটা চুলের সুঁড়ি পথ উঠে গেছে ওপর দিকে। ঘাম গড়াচ্ছে। নাকের ফুটো থেকে চুল ঝুলছে খান্ডার গোঁফের ওপর। থেকে থেকে থুথু ফেলছে হ্যাঁক থু। গামছায় ফোঁ ফোঁ করে নাক ঝাড়ছে। মেয়েকে ডাকছে পুঁটি পুঁটি। ছেলের নাম রেখেছে হুলো। একপাল ছেলেমেয়ে আর ধুমসি বউ নিয়ে বাঙালি কত্তার সংসার। চুলোচুলি, ঠ্যাঙাঠেঙি। এই হ্যাঁহ্যাঁ করে হাসছে, এই প্যানপ্যান করে কাঁদছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে গালগলা ফুলিয়ে হাঁকছে, হুলো, হুলো, নস্যির ডিবেটা দিয়ে যা, মা'র কাছ থেকে পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে আয়। জানলা খুলে প্রতিবেশীর প্রশ্ন, পুঁটির পেট ধরেছে? উত্তর, না না, আম পড়ছে। প্রশ্ন, বায়ু আছে, বায়ু? উত্তর, আরে বায়ুতেই তো মেয়েটাকে খেলে। সিদ্ধান্ত, গাঁদালের ঝোল খাওয়াও।

সকালে বেশ করে তেল মেখে চান। পাট করে আঁচড়ানো চকচকে চুল। পেটের কাছে পাট করা কোঁচা। গায়ে কামিজ। সাদা কাপড়ের ব্যাগে টিফিন কৌটো। ভেতরে আধডজন রুটি, একনাদা কুমড়োর ঘ্যাঁট। কত্তা চললেন অফিসে। দুগগা দুগগা। সবচেয়ে ছোটটা দোরগোড়া থেকে চেল্লাচ্ছে, বাবা, থিগিগর থিগিগর আছবে। এই কত্তাই বিয়ের ভোজে বসে চিৎকার ছাড়ছেন, মাছটা আর একবার ঘুরিয়ে দাও। দইয়ের মাথা, দইয়ের মাথা। লেডিগেনিটা আর একবার। মন্দিরে গিয়ে ঠ্যাং ঠ্যাং করে ঘণ্টা বাজিয়ে বিকট ডাক, মা, মা, জগদম্বে! বুউ উ উ বুম, ব্যোম, শিব শ্যাম্ভু। চোখ উলটে কয়েক সেকেন্ড দণ্ডায়মান। তারপর হনহন করে ছুটছেন পাঁচুর পেছনে বাঁশ দিতে।

মন ভেবে দেখ, তুই কি ওইরকম হতে চাস? মন বললে, না। তা হলে? মামার সঙ্গে নিজাম ফ্যামিলির এক আত্মীয়ের বাড়িতে গানের আসরে গিয়েছিলুম। মামার সে কী সুন্দর পোশাক! গলাবন্ধ সিল্কের ঝকঝকে কোট। পা-চাপা পাজামা। সোনার চেন ঝুলছে বুকপকেটের কাছে। চোখে রিমলেস চশমা, মিহি আতরের গন্ধ। চলার মধ্যেও একটা হালকা নাচের ছন্দ। নবাব পরিবারের বিরাট গাড়ি চেপে আসরে যেতে যেতে মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার দুটি মেরু, হয় রাজা না হয় মহারাজ। মহারাজ মানে সন্ন্যাসী। এর মাঝে যা কিছু সবই উঞ্ছবৃত্তি। ইয়া পুরু কার্পেট মোড়া বিশাল হলঘর। ঝাড়লণ্ঠনের ঝাড় দেখে মাথা ঘুরে যায়। বেনারসি কেটে জানলার পরদা হয়েছে। বাড়ি বললে ভুল হবে। প্যালেস। গৃহস্বামীর গায়ের রং চাঁপাফুলের মতো। পোশাক রূপকথার মতো। আর সেই বাড়ির মহিলারা! স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। একঝলক দু'ঝলকের দেখা। যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ডিমের মতো মুখ। খাড়া খাড়া নাক। পটলচেরা চোখ। দুধেআলতা রং। ধনুকের মতো বাঁকা বাঁকা ভুরু। এমন পরিবেশ, এমন আদবকায়দা—নড়তেচড়তে ভয় লাগে। আমার মাতুলের এসব রপ্ত

ছিল। গান ধরলেন যমুনা কা তীর। কিছুক্ষণের মধ্যে মনে হল, চাঁদের আলোয় তাজমহল তৈরি হচ্ছে। স্বয়ং সাজাহান বসে আছেন আরাম চেয়ারে। ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে ধীরে ধীরে নাচাচ্ছেন। নাগরার জরি তারের আগুনের মতো চমকে চমকে রিরি করে উঠছে। কফিনের ডালা খুলে মমতাজ আসছেন চাঁদের আলোর পোশাক পরে। সেদিন যমুনার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে কেবলই মনে হয়েছিল, ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করলে মন্দ হয় না। এই শেরোয়ানি, এই আচকান, এই আতরদান, এই মলমল, মখমল, মেহেন্দির আলপনা আঁকা চাঁপার কলি আঙুল, সুরমা-টানা তীক্ষ্ণ চোখ, উর্দু শায়ের। মসজিদ উঠে গেছে আকাশের চাঁদোয়ায়, আজানের শব্দ। রোগনজুস থেকে ভেসে-আসা জাফরান আর আতরের গন্ধ। না, ধর্ম বদলালে কিছু হবে না। চালকলা বাঁধা বামুনের রক্তে রং ধরবে না। চ্যাটাই পেতে মেটে দাওয়ায় আড় হয়ে শুয়ে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ চ্যাটাস চ্যাটাস করে মশা মারতেন আর প্রপিতামহীকে গালাগাল দিতেন। সকালে ফতুয়া পরে বগলে রংচটা ছাতা নিয়ে পাঠশালে গিয়ে বাঁদরদের শুভঙ্করী শেখাতেন। সকালের নাস্তা বেগুনপোড়া দিয়ে একবাটি মুড়ি। বড়াখানা আলোচালের পিন্ডি, কাঁচকলা ভাতে, পপিতা সেদ্ধ, থানকুনি পাতার ঝোল, হিংচে শাক। তস্য পিতা উদুখলে চালভাজা গুঁড়ো করে ফোকলা মুখে ফকফক করে খেতেন। বুড়ি বুড়োকে গালাগাল দিয়ে বলতেন, মরবে এইবার পেছন পটকে। মাঝে মাঝেই পরিবারে চালু নানান চুটকির মধ্যে যেটি কানে আসে, খুব সূক্ষ্ম নয় স্থূল, যথা: পণ্ডিতং পণ্ডিতং মুখ কেন সিটকেতং? উত্তর, কোঁচায় পট্টতং। প্রশ্ন, যাও না কেন নদী? উত্তর, বাকি আছে দধি। সেই রক্তে কি আর পারস্যের বুলবুল গান গাইতে পারে? তৈমুর কি চেঙ্গিজের সন্তান হলে দেখা যেত। এ তো অসি ধরা মেজাজ নয়। মসি ধরে চলে আসছে জীবিকার ধারা। গাড়ু হাতে মাঠ ভেঙে প্রাতঃকৃত্য। কেঁতা বগলে শয়ন। দাঁতন মুখে প্রভাতে উত্থান।

রক্তে যদি গানের বীজ থাকত তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম। মামার মতো ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ নিয়ে রাজা মহারাজার বাড়িতে আসর মারতুম। সুরের পথ বেয়ে বেয়ে চলে যেতুম অতীতের ঐশ্বর্যে। মামার মতো ব্যাকব্রাশ করা চুল। ঘাড়ের কাছে বাবরি। আঙুলে হিরের আংটির ঝিলিক। চারপাশে সুন্দরী। দিনকতক মামার কাছে তালিম নিতে বসলুম। প্রথমেই গলা সাধা ভূপালি, এ তানা যোবানা পরমা নানা করিয়ে। কেঠো সুর। অর্ধেক পরদা লাগে না। এ তানা যোবানা পরমা, একটু থমকেই সপাট তান, সারে গাপা ধাসা, গাপা গারে সা, হাঁটুতে এক চাপড়, এ তানা যোবানা। সেই অঙ্কের ব্যাপার। ফাঁক, সম। তিন তালের তা ধিন ধিন তা, তা তিন তিন তা। লয় চলেছে টুকুস টুকুস। যে যেখান থেকে পেরেছে পৃথিবীটাকে জটিল করে রেখেছে। গলা শুনে গুরু বললেন, হচ্ছে, তবে নাকি সুর এসে যাচ্ছে দোক্তা বাঁড়ুজ্যের মতো। ভদ্রলোকের আসল নাম লোকে ভুলে গেছে। পানদোক্তা ঠেসে গান ধরেন, সোনে কা থালমে খা রাহি হ্যায়, এ কালী কমলি সুঘারা বানাও। চড়ার দিকেই যত গোলমাল। পাঁঠা-কাটা গলা। তালে লয়ে মাস্টার। স্টক অনেক। শুধু গলা নিয়েই গণ্ডগোল। গলা-কাটা গাইয়ে।

মামা বললেন, তোর ন্যাক আছে। থাকতেই হবে। আমাদের বংশের ব্লাড ঘুরছে শরীরে। তবে সাধতে হবে। বারো ঘন্টা, তেরো ঘন্টা। সারে, গাপা, ধাসা, ধাপা, গারে, গাসা। আর ওই নাকটাকে বাদ দিতে হবে। ওই তাঁনা পরমাঁ নাঁ নাঁ। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সামনে আধ হাত জিভ বের করে সিংহের মতো আ আ করবি। একগলা জলে দাঁড়িয়ে নাদ সাধনা করবি হুম, হুমমম। সংগীত মানে নাসিকাবাদ্য নয়, গলা বাজানো।

দাদু বললেন, দিনকতক আমার হাতে ছেড়ে দে। ধ্রুপদ দিয়ে গলার গার্দা বের করে দিই, তারপর মোচড় দিয়ে মুচড়ে খেয়াল, ঠুংরি, গীত, গজল। মামা বলে ফেললেন, গলা হয়তো হবে তবে জীবনে আর সুরে বলবে না। আপনার মতো বাজখাঁই হয়ে যাবে। বাস, লেগে গেল ঝটাপটি দু'জনে। জানিস আমি মণি মুকুজ্যের ছাত্র। আজ্ঞে হ্যাঁ অস্বীকার করছি না, তবে যেমন গুরু তেমন চেলা। গানের গ্রামার তিনি ভালই বুঝতেন, জানতেন, গাইতে পারতেন না। দাদু বললেন, অহংকার। অতি দর্পে হত লঙ্কা। আমার গলা আকাশের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করে। আর তোর মিনমিনে গলা দু'হাত এগিয়ে ঝরা ফুলের মতো নেতিয়ে পড়ে।

মামার সঙ্গে দাদুর তেমন বনিবনা নেই। তেহাই মেরে কথা চলে। দাদু হলেন পুরুষসিংহ। মুখের চেয়ে হাত চলে বেশি। পাঠানদের মতো দশাসই চেহারা। জাপানি আপেলের মতো গায়ের রং। বাড়ির বাইরে আউটহাউসে থাকেন। স্বপাকে খান। তন্ত্রসাধনা করেন। রোজ চণ্ডীপাঠ। প্রতি বছর কালীপূজা। কোথা থেকে এক কাপালিক এসে পুজোয় বসেন। সেদিন একটু কারণবারি চলে। মায়ের মূর্তিও অসাধারণ। শিবের বুকে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন আধহাত জিভ বের করে। পূজারি আর তন্ত্রধারক দু'জনেরই পরনে রক্তাম্বর। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল লাল টিপ। সব লাল। জবা লাল, মা লাল, চাঁদোয়া লাল। চোখ লাল। লালে লাল। সেই পুজো দেখতে গা ছমছম করে উঠত। বাইরের মিশকালো আকাশে বাজি উঠছে। দুমদাম শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপছে। মাতামহ পুজোর আসনে বসে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছেন যেন হাঁড়িকাঠে গলাটা ফিট করে দিয়ে ঘপাং করে একটা কোপ মারলেই হয়। কপালে হোমের টিপ পরাতে পরাতে হাত কাঁপত। আমার গা কেঁপে উঠত। গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, মা, মা। উহ্য থেকে যেত, মেয়ের ছেলে মা, তাই লোভ সামলাতে হল, নয়তো ধড় মুন্ডু আলাদা করে ফেলে দিতুম তোমার পায়ে। লাভের মধ্যে প্রসাদ লুচি মাংস। মাংস আসত কালীঘাটের মন্দির থেকে। এক ঝটকায় কাটা ছাগশিশু।

মাতামহের স্নেহের কমতি ছিল না। কথায় কথায় বলতেন, তুই আমার সুদের সুদ। আদর করে নাম রেখেছিলেন পান্তুরানি। কেন রেখেছিলেন কে জানে! ভীষণ পান্তুয়া খেতে ভালবাসতেন সেই কারণেই বোধহয় পান্তুরানি। ছোট্ট ঘরে বিশাল এক সিন্দুক। সেই সিন্দুকেই যত স্থাবর সম্পত্তি। মাঝে মাঝে খুলতেন আর বন্ধ করতেন। খোলার সময় সন্দেহের চোখে চারপাশে তাকাতেন। বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হতেন। কী যে রহস্য ছিল ওই বিশাল কাঠের বাক্সে! আর ছিল একটি তানপুরা।

মাতুলের তালিমে নানা ফ্যাচাং। এতই শাস্ত্রসম্মত ও আটকাঠ বাঁধা যে সুর থাকে তো তাল থাকে না, তাল থাকে তো লয় থাকে না। একঘর সুন্দর সুন্দরীর সামনে বিড়ম্বনার একশেষ। মাঝেমধ্যে কানমলা, গাঁট্টা, দাঁতখিঁচুনি। সুরের মধ্যে এত যে অসুর থাকে কে জানত! এমনিই তো বেশ গাওয়া যায়, জীবনে যদি দীপ জ্বালাতে নাহি পারো, সমাধি পরে মোর জ্বেলে দিয়ো। অভিমানে টসটসে মন, কান্নাকান্না গলা। কার জন্যে এই অভিমান বলা শক্ত। অবশ্যই অদৃশ্য কোনও রমণী। ইতিমধ্যে যে দু'-একজন রমণীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তারা কেউই যে আমার জীবনে দীপ জ্বালাবার জন্যে জন্মায়নি, এ সত্যটি আবিষ্কার করা গেছে। রমণীরা একটু ডাকাবুকো ফচকে ছোঁড়াদেরই পছন্দ করে। রসের কথাটথা বলবে। সাহস করে এমন কিছু করবে যা ভাবলেও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়। তেমন ছেলের তো অভাব নেই। এমন রমণী কোথায় আছে যার কাছে জ্যামিতির একস্ট্রা করে দেখালে, মাই লাভ বলে গলা ধরে ঝুলে পড়বে! তা ছাড়া আমার পথ তো আলাদা। আমি তো সংসার করতে আসিনি। ত্যাগ করতে এসেছি। মনে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলে দোষ আমার নয়। ট্রেনিংয়ের

অভাব। সাধনা তেমন হয়নি। কামার্ত সন্ন্যাসী গরম বালিতে গড়াগড়ি খেতে খেতে বলেন, পুড়ে যা পুড়ে যা, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যা।

আমার মাতামহই ভাল। আমি আসর মারতে চাই না। সুর দিয়ে চরণ ছুঁতে চাই। যাঁকে ছুঁতে চাই তাঁর কাছ থেকে সামান্য সিদ্ধাই টিদ্ধাই পেতে চাই। যৎসামান্য, যাতে মানুষকে একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া যায়। কারুর ক্ষতি করতে চাই না। একটু ভড়কে দিতে চাই। সেই ভাবটি চাই যাতে মনে হতে পারে, লোক না পোক। আগে শক্তি চাই। তারপর প্রেমিক হব। রমণীর নয়। জীবের। চোখদুটো হয়ে যাবে কাচের মতো। উদাস। উজ্জ্বল মুখ। বুকের মাঝখানটা সিঁদুরে লাল। যেমন ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের। সাধকের কী কী লক্ষণ হতে পারে সবই আমার জানা। বই পড়ে জেনেছি। আমেরিকার থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে স্বামী বিবেকানন্দ দাঁড়িয়ে আছেন। একমাথা চুল। চোখদুটো অদ্ভুত সুন্দর। যোগীর চোখ। দ্যুতি বেরোচ্ছে। বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স বলে শুরু করে সব স্তব্ধ করে দিয়েছেন। অ্যা মঙ্ক ফ্রম দি ইস্ট। আঃ স্বামীজির মতো যদি হতে পারা যেত! ওইরকম স্বাস্থ্য, সাহস, বাগ্মিতা, মেধা। ব্রিটানিকার পাতায় একবার চোখ বুলিয়েই পুরোটা মুখস্থ হয়ে গেল। আর আমি! হাজার চেষ্টা করেও গ্লুকোজের স্ট্রাকচার মনে রাখতে পারি না। ডক্টর ব্যানার্জির কাছে ধমক খেয়ে মরি। রহস্যটা কী? সবই নাকি রেতর খেলা। বীর্য ধারণ করে উর্ধ্বরেতা হতে হবে। মাতুলের আসরে মন বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্বামীজির বদলে জি বাদ দিয়ে যা থাকে সেইটি হবার সাধ জাগে প্রাণে। হাঁটুতে হাঁটু বেঁকিয়ে বসে থাকে উমা। তারও এ তানা যোবানা, আমারও এ তানা যোবানা। গলায় গলা মিলিয়ে কোরাসে, এ তানা, সারে গাপা ধাসা। গানের চেয়ে গায়িকার আকর্ষণ বড় বেশি। আমাকে সংসারে টেনে নামাবার জন্যেই যেন উমার এই মর্তে আগমন। ঠোঁট এত লাল হয়! গাল এত গোলাপি হয়! শরীরে এত বিদ্যুৎ থাকে! গায়ে গা ঠেকলেই সেই ব্যাং-নাচানো সাহেবের ব্যাঙের মতো কেঁপে কেঁপে উঠতে হয়। রাতের স্বপ্নে উমা রাজকাপুরের নার্গিসের মতো ধোঁয়ার স্রোত ঠেলে এগিয়ে আসতে থাকে। আতঙ্কের চিৎকার, আর না আর না। স্বপ্নের উমাকে থামায় কার পিতাব সাধ্য! প্রাতে বড়ই বিমর্ষ। স্বপ্নে স্বামীজি এলেন না পরিব্রাজক বেশে। রামকৃষ্ণ এলেন না সমাধিস্থ হয়ে। এসে গেল উমা। বাস্তবে এলেও না হয় বোঝা যেত। স্বামীজিকে উলটে রেখে ওমর খৈয়ামকে টেনে নামানো যেত। ও লাইনে লায়লা মজনু, হীর রনঝা কম্বিনেশন তো রয়েই গেছে। ইতিহাসের দিকে আর একটি জুটি ঠেলে দেওয়া যেত, উমা পিন্টু। এতক্ষণে আমার নাম প্রকাশ করা গেল। ভাল নামে দরকার নেই। পিন্টুই ভাল। বেশ পয়েন্টেড। ইন্টুর মতো।

পিতৃদেব নাস্তিক, মাতামহ আস্তিক। মায়ের বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা জানা নেই। নাস্তিকের আর আস্তিকের রক্তে আমি বোধহয় এক জগাখিচুড়ি। পিতাঠাকুর বললেন, যাচ্ছ কোথায়? বিশ্বরহস্য খানিক শুনে যাও। স্বর্গ নেই নরকও নেই মানিক। আছে কেবল কর্ম। এ জন্মে যদি ভাল করে তন-মন-ধন হয়ে জ্যামিতি করে তা হলে আসছে জন্মে ইউক্লিড। যদি পদার্থবিদ্যায় মন দাও, পরের জন্মে বাথটব থেকে লাফিয়ে উঠে রাজপথ ধরে রাজবাড়ির দিকে ছুটবে ইউরেকা ইউরেকা করে। মাতামহ বললেন, ওই দেখো দেয়ালে ঝুলছেন জগদম্বা। ও মাগি যা করাবে তাই করতে হবে।

এ সব খেপা মেয়ের খেলা
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা

সে যে আপনি খেপা, কর্তা খেপা, খেপা দুটো চেলা॥
কী রূপ কী গুণভঙ্গি, কী ভাব কিছুই না যায় বলা
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥

উতারো তানপুরা। লাগাও সুর। আহা, যেন ওঁকার ধ্বনি উঠছে চরাচর ব্যাপ্ত করে। উঁহু, ওভাবে বসলে চলবে না। বসতে হবে হাঁটু গেড়ে বজ্রাসনে। এখন সকাল। ধরো ভাঁয়রো, মা মা রবে মনসুখে মন ত্রিতন্ত্রী একবার বাজা রে। মা মা বলবে অনেকটা ঢেঁকুর তোলার মতো করে। তলপেট থেকে ঠেলে উঠবে হৃদয়ের দিকে। কুলকুণ্ডলিনী চমকে চমকে উঠবে। একবার যদি জেগে যায়, আর পায় কে? নাও ধরো, মা মা রবে মনসুখে। মামা ঠিকই বলেছিলেন। আবেগে, বীরভাবে, রাগে দাদুর গলা ছেড়ে যে-জিনিস মুক্তি পেল, তাতে সুর নেই, ভাঁয়রো, ভৈরবী, ধানেশ্রী, পুরিয়া, বেহাগ সব মিলে মিশে একাকার। দরদর করে জল ঝরছে দু'চোখ বেয়ে। এত অশ্রু কেন? ও গলার সঙ্গে আমি পারব কেন? মাঝে মাঝে চিঁহি চিঁহি করে মা রব ছাড়ছি। মূলাধার চমকে চমকে উঠছে কই! দাদু পাছে হার্টফেল করেন এই ভেবে নিজের হার্টই ধড়ফড় করছে। খালি হাত আকাশে বাতাসে কিছু একটা খামচে ধরার চেষ্টা করছে। উত্তাল সমুদ্রে জাহাজের মাস্তুলের মতো তানপুরা দুলছে সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। রাস্তার দিকের জানলায় সারি সারি কুচোকাচার মুখ। পথে চ্যাংড়া ছেলেরা ঘেউ ঘেউ করছে। দাদু মন ত্রিতন্ত্রীকে বাজাবার চেষ্টা করছেন। মহরমের হাসান হোসেনের মতো বুকে চাপড় মারছেন। তানপুরার পঞ্চমের তারটা পটাস করে ছিঁড়তেই দাদুর ভাবসমাধি হল। সমাধি ভাঙতেই জানলার দিকে তাকিয়ে অশ্লীল খিস্তি করলেন। মুখের সারি ভেংচি কেটে সরে গেল। জগদম্বার ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটি আজ খুব দিয়েছে। আমায় মাতিয়ে দে মা। আমি এমন করে মেতে যাই যেন এক মাতা হাতি!

চিঁ চিঁ করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, বুঝেছ পান্তুরানি। সিংহের মতো ডাকতে হবে। নাদ ছাড়তে হবে। নাদ ব্রহ্ম। চিঁ চিঁ করে মেয়েছেলেকে ডাকা চলে, ওগো, শুনছ? দ্যাকো তো আমার পিটের এখানটায় যেন কী একটা কামড়েছে? এট্টু চুলকে দাও। ওই বেটিকে পেতে হলে পুরুষকার চাই। আয় মা রণে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে! এই বসলুম আসনে। দেহ শুকিয়ে ঝরে যাক, কুছ পরোয়া নেই, তুমি সামনে এসে না-দাঁড়ানো পর্যন্ত উঠছি না। সাধন করনা চাহি রে মনুয়া, ভজন করনা চাই। তোর শরীরটা বড় ন্যালবেলে। ওইটাকে একটু ফোলাতে হবে। ডঙ্কামারা বুক চাই। নে ওঠ। উঠেছিস? নে বোস। আবার ওঠ। ওঠ বোস, বোস ওঠ। উঠতে তারা বসতে তারা। এমন দিন কি হবে মা তারা, যবে তারা তারা মা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা। রোজ পঞ্চাশবার।

আর ওই দেখো। ঘরের কোণে বিশাল দুটো মুগুর দুই পালোয়ানের মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে। দুটোকে দু'হাতে ধরে দাদু অক্লেশে তুলে ফেলে বারকতক পটাপট ভেঁজে ফেললেন। ওপর বাহু আর কাঁধের গুলি ঠেলে ঠেলে উঠল। মুগুর মাথার ওপর যখন চক্রাকারে ঘুরছে তখন বেশ ভয় ভয় লাগছে। এত উঁচুতে উঠছে, সিলিং-এ না লেগে যায়। মুগুর দুটোকে পায়ের কাছে জো হুজুরের ভঙ্গিতে রেখে বড় বড় নিশ্বাস নিতে নিতে দাদু বললেন, নে তোল। এক হাতে একটাকে চেষ্টা করে দেখলুম। ইম্পসিবল। অসম্ভব ভারী। দু'হাতে কোনওরকমে জমি থেকে তুলে আবার নামিয়ে রাখলুম। হাত কাঁপছে, শরীর কাঁপছে, পা কাঁপছে। মাতামহ হা

হা করে হেসে উঠলেন আলাদিনের দৈত্যের মতো। ব্যাটা বংশের মুখ ডোবাবি। ডেলি পঁচিশটা ডন। পঞ্চাশটা বৈঠক। তারপর মুগুর, সঙ্গে কুস্তি। আর খানা। খেতে হবে। খোরাক চাই।

সকালে একমুঠো কলবেরোনো ছোলা, আখের গুড়, কয়েকদানা চিনেবাদাম। দুপুরে নুন দিয়ে একবাটি ফ্যান। পর্বত প্রমাণ ভাত আর ডাল। মাছ মাংস ডিম না হলেও চলবে। রাতে গোটা দশেক মোটা মোটা আটার রুটি, একবাটি ছোলার ডাল। প্রচুর ব্যায়াম। মাইল পাঁচেক হন্টন। মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে শয়ন। ল্যাঙট পরিধান, সূর্য নমস্কার, গায়ত্রীজপ। সংসার ছাড় আর না-ছাড়, সাধু তৈরি হবে ভেতরে ভেতরে। অমরনাথের বরফের শিবলিঙ্গের মতো। হঠাৎ একদিন গুহার পাথর সরিয়ে দেখা গেল ছ'ফুট উঁচু তুষারলিঙ্গ। অন্ধকারে ফটফট করছে। আহা, বড় আশার কথা! কিন্তু সাধন পথের তিন দিনেই মৃত্যুর মুখোমুখি।

‘তৃণ হয়ে ভাসি জলে’

প্রচণ্ড রক্ত আমাশা। তেমনি জ্বর। কোমরে অসহ্য ব্যথা। নাইকুণ্ডলের কাছটা খামচে খামচে উঠছে। বাথরুম বেডরুম, বেডরুম বাথরুম এই চলছে। পাশে মাতামহ নেই। বিনা অনুমতিতেই ল্যাঙট খুলে বিকচ্ছ হয়ে পড়ে আছি। যাক কাছা খুলিয়ে ছেড়েছে, এইটাই একটা ভাল লক্ষণ। কাছা না খুললে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। লর্ড ক্লাইভের আমলের পুরনো বাড়ি। নোনাধরা দেয়াল। এ বাড়ি ছেড়ে আমার পিতৃদেব কোথাও যাবেন না। রাজপ্রাসাদেও না। এটি হল স্মৃতিসৌধ। বাড়িটি নেবার সময় শুভানুধ্যায়ীরা অনেক সাবধান করেছিলেন। হানাবাড়ি নেবেন না মশাই। এই তো বাগচীরা! ওই বাড়িতে কিছুদিন ছিল। তার মধ্যে যা হবার সব হয়ে গেল। দুপুরে বড়বউয়ের শাড়ি ঝুলছিল দোতলার বারান্দা থেকে পাতকোতলার দিকে। হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। পুড়ে ছাই। সেই বড়বউ এখন ঘোর উন্মাদ। যান না একদিন গিয়ে দেখে আসুন। ওই তো মালাপাড়ার দিকে উঠে গেছে। সকাল সন্ধে যখন খুশি যেতে পারেন। সবাই যায়। ভূতে পাগলি করেছে। একমাথা শনের নুড়ি চুল। দাওয়ায় বসে বসে পটাস পটাস ছিঁড়ে বাতাসে ওড়াচ্ছে, আর বলছে, এই ছিল, এই নেই। সিনেমার পাগল নয়, রিয়েল পাগল।

যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না তিনি ভূতে বিশ্বাসী হবেন? অসম্ভব। পিতৃদেবের কড়া উত্তর, যদি বলি আপনার ওই বাগচী আর তার মা নির্যাতন করে করে বউটিকে শেষ করে ফেলেছে, কিছু বলার আছে? আপনাকে আমি যখন-তখন, যেখানে-সেখানে ভূত দেখাতে পারি। দেখবেন নাকি?— কী করে দেখাবেন? অতই সোজা? — ভূত আমি ম্যানুফ্যাকচার করি মশাই।

বাড়িটা যে ভূতের বাড়ি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। দোমহলা বাড়ি। অসংখ্য ঘর। ঘোরানো প্যাঁচানো বারান্দা। পেছন দিকে একটা ঝোপঝাপঅলা বাগান। নীচের তলা পড়ে আছে ফাঁকা। পাতালপুরী। সে যুগের বাড়ি। একতলার ঘরে কোনও জানলা নেই। ঘরের মধ্যে ঘর। ড্যাম্প, অন্ধকার। দিনেরবেলাই টর্চ হাতে ঢুকতে হয়। অন্ধকারে যদি ভূতের জন্ম হয় তা হলে ওই আঁধারে কত যে প্রেতাত্মা বসে আছে আমার অবিশ্বাসী পিতাঠাকুরকে শায়েস্তা করার জন্যে। বাগান নামক বস্তুটিতে সাপ আছে নানা জাতের, ছুঁচো, ইঁদুর, গিরগিটি, তেঁতুলে বিছে। মাঝরাতে নীচের ঘরে ছুঁচোর কীর্তন শুরু হয়। ইঁদারার মতো বিশাল এক কুয়ো মাঝখানে মুখব্যাদান করে আছে। বহু নীচে আলকাতরার মতো জল। মাঝামাঝি জায়গায় একটা খিলানের মতো ছিল। মুখটা বোজানো ছিল ইট দিয়ে। একদিন ঝপাস করে একটা ইট খুলে পড়ল জলে। ঝালাই মিস্ত্রিরা এসে রহস্য আবিষ্কার করল। একটি সুড়ঙ্গ। কতদূর গেছে কে জানে? গবেষণায় মেনে নেওয়া হল, সুড়ঙ্গপথ গঙ্গা পর্যন্ত গেছে। কোমরে দড়ি বেঁধে হাতে টর্চ নিয়ে পিতৃদেব ঝুলে পড়লেন। রহস্য অনুসন্ধানে তাঁর জুড়ি নেই। সন্তান যে কত অপদার্থ, কত ভিতু তা আর একবার প্রমাণ করার জন্যে পিতা লাট-খাওয়া বালতির মতো ঝুলতে লাগলেন সেই সুড়ঙ্গের মুখে, হাতে পাঁচ সেলের টর্চ। অসাধারণ কায়দায় ঢুকে পড়লেন সেই

গহ্বরে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য। দড়ির অগ্রগতি দেখে বোঝা গেল তিনি চলছেন। ঝালাইঅলারা বলতে লাগল, বাবু আমাদের পাওনাগন্ডাটা মিটিয়ে ঢুকলেই ভাল হত। ও তো মহাপ্রস্থানের পথ। কতকালের গ্যাস জমে আছে। একসময় দড়ি থেমে গেল। ঝুলতে লাগল ন্যাজের মতো। নট নড়নচড়ন। ব্যস, বাবু ফিনিশ। মৃত-স্ত্রী পিতারা বড় বেপরোয়া হন। শাসন করার কেউ থাকে না তো সংসারে! মা থাকলে সম্ভব হত কি ওই সুড়ঙ্গে ঢোকা! নাও এবার বোঝো ঠ্যালা! গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির প্রবীণ মানুষ আশুবাবু দৌড়ে এলেন, কী হয়েছে বাবা?

মিস্ত্রী: বাবু ঘুঁষা।

প্রবীণ মানুষদের যে-কোনও জিনিসই বুঝতে বেশ দেরি হয়, কিন্তু একবার বুঝলে আর রক্ষা নেই। কে ঢুকেছে বাবা? তোমার বাবা? — আজ্ঞে হ্যাঁ। পাতকোর পাড়ে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি মারলেন। দড়ি ঝুলছে, মানুষ নেই। কিছুতেই বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা কী? পাতকোর মাঝামাঝি জায়গায় সুড়ঙ্গ? কোথায় এমন আছে? ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান ব্যাবিলনেই ছিল। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষণ। পাতকো বসাতেই ভিটেমাটি চাটি, মাঝে আবার সুড়ঙ্গ। কোন পাঁঠার কাজ? এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যেন আমি এক রামছাগল! খুব বকাঝকা করে আশুবাবু সিদ্ধান্তে এলেন, তোমার বাবা প্রায়ই দুঃখ করেন, তুমি একটি অপদার্থ; এখন মনে হচ্ছে তোমার বাবা তোমার চেয়েও অপদার্থ। যাও, মা-টিকে তো খেয়েছ এখন বাবাটিও পাতাল প্রবেশ করলেন। নাও এবার গলায় কাছা নেবার ব্যবস্থা করো। আচ্ছা, দড়িটাকে একটু টেনে দেখলে হয় না?

কার সাহস হবে ওই দড়ি টেনে দেখার? আমার অত সাহস নেই। দড়ি ধরে টানলে যে-মানুষটি বেরোবেন তাঁকে আমি চিনি। আমি খ্যাঁকশেয়াল হলেও তিনি ব্যাঘ্র। সব জল্পনা-কল্পনা থেমে গেল। ঝোলা দড়ি আরও খানিকটা ঝুলে গেল। ঝুলেছে ঝুলেছে বলে আশুবাবু কিঞ্চিৎ উল্লাস প্রকাশ করলেন। তোমার বাবা ব্যাক করছেন পিন্টু। অবশেষে একটি মুখ দেখা গেল। চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে সম্ভবত পিচ্ছিল পথে হড়কে হড়কে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। হাত নেড়ে বললেন, খিঁচো। সুড়ঙ্গ-মুক্ত পুরুষ মাঝামাঝি জায়গায় ঝুলতে ঝুলতে বললেন, ওয়ান্ডারফুল। এ গ্রেট ওয়র্ক অফ কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং।

ওপরে উঠে এলেন। হাতে একটা কী যেন রয়েছে। আশুবাবু উদগ্রীব, হ্যাঁগো, গুপ্তধন টুপ্তধন কিছু আছে নাকি? সংক্ষিপ্ত উত্তর, থাকলে আশ্চর্য হব না। আবার প্রশ্ন, হাতে ওটা কী? কচ্ছপের খোলা। বলো কী? তা হলে তো এ জায়গাটা দেখছি পীঠস্থান। কূর্মপীঠ। তা কতদূর গিয়েছিলে? মাইলখানেক হবে?

হাত তিনেক গিয়েছিলুম। আহা! এলিসের ওয়ান্ডারল্যান্ড। সোঁ সোঁ করে ঠান্ডা বাতাস বয়ে আসছে। ছোট একটা ছেলে পেলে দেখে নিতুম, শেষ কোথায়?

এইরকম একটি বাড়িতে রক্ত আমাশার মতো অসুখ। কার্বাইডের ড্রামে ভরতি জল। প্রায় শেষ করে ফেলেছি। একতলার পাতকোর থেকে টেনে টেনে জল ভরতে হবে ভাবলেই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। খালি যখন করেছি ভরতে তো হবেই। আইন হল আইন। শুনেছি এই আইনের ঠ্যালায় আমার মা যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিনই আধমরা হয়ে ছিলেন। সারা ভারত জুড়ে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন চললেও, গঙ্গার তীরবর্তী এই ক্ষুদ্র জনপদের ভুতুড়ে বাড়িতে আইন অমান্যের সাহস কারুর ছিল না। দুঃখের দিনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে মনের দেয়ালে সারি সারি বীর, যোদ্ধা, মহাপুরুষদের ঝুলিয়ে রাখতে হয়। সামনে দাঁড়াও।

চোখ বুজিয়ে বলো, শক্তি দাও, একটু স্পিরিট ধার দাও। রোমেলকে স্মরণ করি। এই অবস্থায় রোমেল না হলে উদ্ধারের আশা খুবই অল্প। শুয়ে শুয়ে মার খেতে হবে। সেই অনুচ্ছেদটি একবার ঝালিয়ে নিই। রোমেলের জীবনীর তেত্রিশ পাতায় নীচের দিকে আছে। ১৯১৪ সাল। আমি তখন কোথায়? ২২ অগাস্ট! ভোর পাঁচটা। স্থান, ফরাসি দেশ। গ্রামের নাম ব্লিইড। ফরাসিদের আক্রমণ করতে চলেছেন যুবক রোমেল। ধরা যাক, এখন আমার যা বয়েস, তখন তাঁর সেই বয়েস। রোমেল যাবেন যুদ্ধে, আমি যাব ড্রামে জল ভরতে। দু'জনের শরীরের অবস্থাই সমান। গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে রোমেল ঘোড়ার পিঠে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার ওপর খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে পেট ছেড়েছে। শরীর ভেঙে আসছে। ঘোড়ার জিন থেকে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হচ্ছে। তবু পড়ছেন না, কারণ তিনি রোমেল। রোমেল অসুস্থ হতে পারেন, কিন্তু মুখ চুন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে পারেন না। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন ঘোড়ার পিঠে। জ্ঞান ফিরে এলেই বলছেন, নেভার মাইন্ড। জার্মান ভাষায় নেভার মাইন্ডের অনুবাদ জানা নেই। ইংরেজির মতো অতটা মোলায়েম হবে না। গাবদা গোবদা ভাষা। উচ্চারণে হাপরের মতো বাতাস বেরোবে। শব্দেই চাঙ্গা। ঠিক হোক-না-হোক আমারও একটা শব্দ চাই। রোমেল কুয়াশা ভেদ করে যুদ্ধের দিকে চলেছেন। আমি ধেড়ে বালতি হাতে ভাঙাভাঙা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামব। রোমেলের ফুডপয়জনিং, আমার পেটে মাতামহের খাদ্যতালিকার প্রলয় নাচন। ও নটরাজ, নটরাজ, প্রলয় নাচন নাচবে যখন। আলোচালের ফ্যানটাই মনে হয় প্রধান আসামি। নেভার মাইন্ড! গুটেনবার্গেন হ্যাফট হাফেভেন।

জল-ভরতি বালতির টানে উলটে ডিগবাজি খেয়ে পাতকোর মধ্যে পড়ে যাবার মতো হচ্ছে! হঠাৎ হোয়াইট নাইটের কথা মনে পড়ল। জলকে আমার দিকে আকর্ষণ না করে, জল যদি আমাকে জলের দিকে আকর্ষণ করত তা হলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হত। মাঝে মাঝে পৃথিবীটাকে ঘুরিয়ে নিতে পারলে বেশ হয়। আপসাইড ডাউন। আমি জল না তুলে জল যদি আমাকে তুলত! তেমন একটা শরীর পেলে দেখিয়ে দিতুম। এক বালতি তুলেই মনে হল, রোমেল যে-ধাতুতে তৈরি ছিলেন আমি সে ধাতুতে তৈরি হইনি। ব্যর্থ চেষ্টা। হেলে কখনও কেউটে হতে পারে না।

চৌবাচ্চার পাড়ে বসে একটু দম নিচ্ছি আর ভাবছি আর একটা ঘটনার কথা। বেশিদিন আগের নয়। দুপুরে পইতের মধ্যাহ্নভোজনে পঙ্‌ক্তিতে বসেছি। পাশেই পিতাঠাকুর। আমরা একটু বেশি খাতিরের নিমন্ত্রিত। তাই আহার চলেছে কলাপাতা মাটির গেলাসে নয়। কাঁসার থালা, ধুম্বো কাঁসার গেলাস। ভীষণ তেষ্টা। জলের গেলাস এত ভারী, যতবার চেষ্টা করি তুলতে আর পারি না। আঙুলে লেগে আছে তেল ঘি। মাটি থেকে সামান্য ওঠে আর ঠকাস করে পড়ে যায়। ভেবেছিলুম কেউ দেখছেন না। গৃহস্বামীর চোখ এড়াল না। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, দাঁড়াও, আমি তুলে ধরি, তুমি খাও। পিতাঠাকুরও দেখছিলেন আড়চোখে। তিনি বললেন, খবরদার, নো সাহায্য। নিজে তুলতে পারে খাবে, না হলে খাবে না। আচ্ছা, আমি তা হলে একটা হালকা গেলাসে জল এনে দিই। আজ্ঞে না। সমস্যাকে সহজ করে দেবার কোনও অধিকারই আপনার নেই। জীবন যখন যে-ভার কাঁধে চাপিয়ে দেবে সে ভার বইবার শক্তি অর্জন করতে হবে। এই বয়েসে ওই গেলাস তোলা উচিত। দিস ইজ এ ডিসগ্রেস। আহা! হাতে ঘি লেগে আছে যে! থাক না। সো হোয়াট! এই তো আমি তুলছি। আমার গেলাসটা তিনি বারকতক তুললেন আর নামালেন। এক, দুই, তিন। গৃহস্বামীকে বললেন, কিছু

বলার আছে? বলার আর কী থাকতে পারে? অত ঝামেলা জানলে কে আর সাধ করে এগিয়ে আসত! তিনি এমন একটা মুখ করে চলে গেলেন, যেন, আপনার পাঁঠা আপনি বুঝুন! আমার কী?

আমি সেই পাঁঠা, রোমেল হবার ব্যর্থ চেষ্টায় পেট খামচে বসে আছি। দোতলার বারান্দা থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন, কী হল কী তোমার? ওখানে লাট খাচ্ছ?

জীবনীকার লিখছেন, রোমেল মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তেন কিন্তু কখনও ঊধ্বর্তনের কাছে গিয়ে নাকে কাঁদতেন না, আমার মাথা ঘুরছে, পেট ব্যথা করছে। সুতরাং উত্তর, না কিছু হয়নি তো!

তবে কি জৈন ধর্ম অবলম্বন করেছ? মশাকে রক্ত খিলাচ্ছ?

তেড়েফুঁড়ে উঠতে গিয়ে লাট খেয়ে পড়ে গেলুম। চেতনায় ভাসতে ভাসতে মনে হল মচকাব তবু ভাঙব না। তারপর আর কিছু মনে রইল না। কঠোর মানুষ যখন কোমল হন তখন একেবারে কুসুমের মতো হয়ে যান। সে প্রমাণ এ সংসারে মাঝেমধ্যে পাওয়া যায়।

পরের দৃশ্যে নিজেকে দোতলার বিছানায় আবিষ্কার করলুম। ঘরে দুই বিশাল ছায়া। পিতাঠাকুর আর মাতামহ। দু'জনে একটু ঝগড়ার ভাবেই রয়েছেন মনে হল। দাদু বলছেন, তোমাদের নিয়মটা বাপু বুঝি না, হোমিওপ্যাথি দিয়ে শুরু, বিভূতিতে শেষ। ওই করে আমার মেয়েটাকে মারলে।

আমি মারলুম না আপনার কবরেজে মারল?

কবিরাজে মারে না হরিশঙ্কর, একেবারে শেষের সময় প্রদীপ যখন নিবুনিবু তখন ডাক্তার গুডিভ এলেও কিছু করতে পারতেন না।

আপনি মাননীয়, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। আপনি বসুন, আমি শ্যামবল্লভকে কল দিয়ে আসি।

আমার মনে হয় নগেন কবিরাজই ভাল হত। নাড়িতে একবার আঙুল রেখেই ধরে ফেলত বায়ু, পিত্ত কি কফ! কোন নাড়ি অতি প্রবলা। এ ব্যাপারে অবশ্য কথা বলা মানেই অনধিকার চর্চা। তোমার পাঁঠা, তুমি ন্যাজেই কাটো আর মুড়োতেই কাটো কিছু বলার নেই। তবে মেয়ের ছেলে তো, একটিমাত্র নাতি। মড়ার মতো পড়ে থেকে দু'জনের বাক্যালাপ শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, জামাই আর শ্বশুরমশাইয়ের সম্পর্ক কখনওই মধুর হয় না। এক ধরনের শত্রুতা থেকেই যায়। সুযোগ পেলেই ঠুসঠাস। এ পক্ষ ও পক্ষকে একটু আঘাত করতে পারলেই বড় খুশি। অপদস্থ মাতামহকে পাশে রেখে পিতৃদেব হোমিওপ্যাথকে কল দিতে ছুটলেন।

ঘর খালি হতেই দাদু বললেন নিজের মনেই, বড় একরোখা। কারুর কথাই শুনতে চায় না। অনেকটা আমার মতোই। তেঁটিয়া স্বভাবের। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে কপালে আঙুল রেখে ইড়িরবিড়ির করে নাড়াতে লাগলেন। চোখ পিটপিট করে দেখলুম ঠোঁট নড়ছে। বীজমন্ত্র চলেছে। কালীনামের গণ্ডি পড়ছে চারপাশে। জগদম্বা বলে ভীষণ এক হুংকার ছাড়লেন। চোখ খুলে গেল।

কী রে ব্যাটা?

পেট ছেড়েছে দাদু। তিন দিনে তিন জামবাটি আলোচালের ফ্যান খেয়েছি। আধসের ছোলা, একপো চিনেবাদাম। মাতামহ হাঁ হয়ে গেলেন। সর্বনাশ! ভাগলপুরী ধুম্বো গাইয়ের খোরাক যে রে বাপ! তা একেবারে আলোতে গেলি কেন? সেদ্ধ দিয়ে শুরু করলে কী হত!

গণেশের মায়ের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল। বিধবা মানুষ। একবেলা আলোচালের ভাত খান, আলু কাঁচকলা পেঁপে ভাতে দিয়ে। সেদ্ধর ফ্যান পাচ্ছি কোথায়!

দাঁড়া, ও ব্যামোর ওষুধ আমার কাছে আছে। শরীর গরম হয়ে গেছে। শীতল করতে হবে। ভাল গাওয়া আছে! রান্নাঘরে ঘিয়ের টিন ছিল। ঘি তেল মোটামুটি ভালই চলে এ বাড়িতে। ভোগী আর যোগী দু'তরফেরই ঘৃত বিধি। ভোগেও ঘি, যোগেও ঘি। এক চামচে কাঁচা গব্যঘৃতের সঙ্গে একটু কাশীর চিনি মেড়ে দাদু আমার মুখে ফেলে দিলেন। মাতামহের ওপর অপার আধ্যাত্মিক বিশ্বাসে সেই অপূর্ব দাওয়াই গিলে ফেললুম। সন্দেহ রইল, মরে না যাই। শুনেছি ব্যাসিলাই ডিসেন্ট্রি বড় সাংঘাতিক অসুখ। পাহাড়ে পর্বতে বহু বড় বড় সাধু ওইতে দেহত্যাগ করেছেন। খুবই অপমানজনক মৃত্যু। ব্রহ্মতালু ফেটে শ্রীশ্রী আটলক্ষ বাবার মহাসমাধি নয়।

প্রবীণ হোমিওপ্যাথ যখন এলেন তখন আমাদের ঘি-পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আমরা তখন হরিদ্বারে কালীকমলির ধর্মশালায় সবে গিয়ে পৌঁছেছি। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার হর হর শব্দে দু'জনেই বিভোর। স্টেশন থেকে বেরোলেই চৌমাথায় মহাদেবের মূর্তি। ঘটি ধরা একটি হাত মাথার ওপরে তোলা। অবিরাম জল পড়ছে হুড়মুড় করে। সেই পাথরের শিবই দাদুর চোখে আসল শিব। থাকেন আর আহা আহা করে ওঠেন। হ্যারা হ্যারা শব্দে জল পড়ছে।

ডাক্তারবাবু ছোটখাটো খুরখুরে মানুষ। ভারী উজ্জ্বল চেহারা। নিজের হাতেই হাজারখানেক ওষুধ, তাই বয়েস হার মেনেছে যেন। একযুগ আগে যে-চেহারা ছিল এখনও তাই বজায় আছে। একটুও টসকায়নি। কুচকুচে কালো চুল। ধবধবে শরীর। ধবধবে সাদা ধুতি, সিল্কটুইলের শার্ট। উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখ। হাতে ওষুধের বাক্স। গলায় বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র। ছেলেবেলায় খোকাবাবু বলতেন, এখনও তাই। খোকার এদিকে গোঁফ বেরিয়ে বসে আছে, বাবা হবার হাঁকডাক চলেছে রক্ত নদীর ধারায় ধারায়। শিরশিরিয়ে যৌবন এসেছে। চাহনি তেরছা হয়েছে।

কী হয়েছে খোকাবাবু?

সারা বছরের আমার অসুখবিসুখের একটি নির্ঘণ্ট পিতাঠাকুর করেই রেখেছেন। সিজন শুরু হয় অক্টোবরে। শিশির এল, শিউলি এল, টনসিল তেউড়ে উঠে ঘুংরি কাশি। নভেম্বরে সর্দি জমে শ্বাসকষ্ট, ঘুসঘুসে জ্বর। ডিসেম্বরে হাঁপানি। সারারাত গলায় অর্গান বাজছে, খণ্ডন ভব বন্ধন জগ। জানুয়ারি জকারান্ত শব্দ সুতরাং জ্বর হবেই। কেঁপে কেঁপে আসবে ঘাম দিয়ে ছাড়বে। এইভাবেই ঋতুর রথচক্রে ব্যাধিচক্র বাঁধা। আমাকে আর উত্তর দিতে হল না। উত্তর দিলেন অভিভাবক।

পাতকোতলায় দাঁত ছিরকুটে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, মনে হয় হিস্টিরিয়া।

ফ্যামিলিতে হিস্টিরিয়ার হিস্ট্রি আছে নাকি?

এ বংশে নেই, যদি থাকে মাতুল বংশে।

মাতামহ তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, কী বললে হরিশঙ্কর? গঙ্গানারায়ণ মুকুজ্যের বংশে হিস্টিরিয়া? নিজেদের দিকটা ভাল করে খুঁজে দেখো। মনে পড়ে তোমার মেজো ভাই কালাজ্বরে ফৌত হয়ে গেল।

আজ্ঞে, ওটা হিস্ট্রি নয় জিওগ্রাফি। আসামের জঙ্গল থেকে ধরিয়ে এসেছিল। আপনি গেলে আপনারও হত।

তা হলে, তোমার বড় ভাই কেন দোতলার বারান্দা থেকে লাফ মেরে অণ্ডকোষ ফেটে মারা গেল?

আজ্ঞে, ওটা হিস্ট্রি নয় সাইকোলজি। অত বড় ব্যাবসা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে আপনি মনুমেন্ট থেকে লাফ মারতেন।

তা হলে তোমার মাথার সামনের দিকের চুল উঠে গিয়ে টাক বেরিয়ে পড়ছে কেন? এই বয়েসেও আমার চুল দেখো।

আজ্ঞে, ওটা হিস্ট্রি নয় ব্যাড মেনটেনেন্স। ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার। যত্ন আর তদারকির অভাব।

সাধুদের জটা দেখেছ? তারা চুলের কি যত্ন করে হরিশঙ্কর?

আপনি অন্য লাইনে চলে যাচ্ছেন। তা হলে বলতে হয় আপনারা সকলে অকালপক্ক কেন?

অকালপক্ক? হাসালে। পঁয়ষট্টিতে চুল পাকবে না? চুলের বাবা পাকবে।

তা হলে ওই দেখুন, আমার পিতাঠাকুরের ছবি। কুচকুচ করছে একমাথা কালো চুল।

ওটা কলপ হরিশঙ্কর। গোঁফজোড়া দেখেছ? পেকে ফটফট করছে।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, আপনারা কী আরম্ভ করলেন দু'জনে। শুনুন শুনুন, হিস্টিরিয়া হল মেয়েদের অসুখ। কোথা থেকে কোথায় চলে গেলেন!

পিতৃদেব অম্লান মুখে বললেন, ওকে আমি পুরুষ বলে মনে করি না, মহিলা, এফিমিনেট স্বভাবের। চুল আঁচড়াচ্ছে তো আঁচড়াচ্ছেই, গালে রুমাল ঘষছে তো ঘষছেই। ভাল করে গোঁফ পর্যন্ত বেরোল না। মাতুল বংশের দিকে চলে গেছে। চুলের বাহার দেখেছেন। খোঁপা বাঁধলেই হয়।

দাদু বললেন, ওহে হরিশঙ্কর, একতরফা খুব তো বলে যাচ্ছ, ফাঁকা মাঠে হারোয়া লাঠি ঘুরিয়েই চলেছ। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখো। গোঁফজোড়া দেখেছ। দেউড়ির দরোয়ানকেও হার মানায়।

আপনার কথা আলাদা। আমি বলেছি মাতুল বংশ।

মাতামহ ছাড়া মাতুল আসে কোথা থেকে বৃন্দাবনচন্দ্র!

আমার নাম হরিশঙ্কর। নাম বিকৃত করা আপনার এক বদ স্বভাব। শাস্ত্র বলছে, নরানাং মাতুলক্রম, মাতামহক্রম নয়। ধর্মের পথে আছেন যখন একটু শাস্ত্রটাস্ত্র উলটে দেখলে লাভ বই লোকসান হবে না।

ডাক্তারবাবু এবার বেশ সশব্দে হাসলেন, স্ত্রীবিয়োগ হলে মানুষের মস্তিষ্ক যে বিকৃত হয়, আপনারাই তার প্রমাণ।

তার মানে? দু'জনেই প্রতিবাদ করে উঠলেন। আমরা পাগল?

পাগল বললে ভুল হবে, সামান্য ছিটগ্রস্ত। সামান্য বিষয় নিয়ে যেভাবে কচলাকচলি করছেন দু'জনে?

দাদু বললেন, প্রতিবাদ করো হরিশঙ্কর, প্রতিবাদ।

আই প্রোটেস্ট, কে বলেছে স্ত্রীবিয়োগ হলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। আপনার হ্যানিম্যান সায়েব? মুখুজ্যেমশাই, আপনি কত বছর উইডোয়ার?

তা হবে, বছর তিরিশ তো হবেই।

আমার হাফ, প্রায় পনেরো বছর। আমার কী ইনস্যানিটি আপনি দেখলেন?

দাদু ভালমানুষের মতো মুখ করে বললেন, কিছুই না, যা ছিল তাই আছে।

তার মানে? পিতাঠাকুর আবার তেড়ে উঠলেন।

ডাক্তারবাবু ওঁদের দু'জনকে অগ্রাহ্য করে এবার আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে বাপু?

সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, উনি এইভাবেই কথা বলেন। রোগীদের মনে হয় বয়স বাড়ে না। যতটা সম্ভব চাপা গলায় বললুম, রক্ত আমাশা।

রক্ত আমাশা? পিতৃদেবের কান এদিকেও ছিল, লাফিয়ে উঠলেন, হরিগিরির ডালবড়া। বাজার থেকে মারা কাঁচা পয়সা পকেটে গজগজ করছে, ডালবড়া চলছে, ফুলুরি চলছে, কচুরি ঘুগনি চলছে, পেটের আর দোষ কী! নাও এবার তিনমাস বিছানায় লটকে পড়ে থাকো। পিতার হোটেলে। দাদু সঙ্গে সঙ্গে যোগ করলেন, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ।

ডাক্তারবাবু শান্ত গলায় বললেন, আহা, আপনারা অত উতলা হচ্ছেন কেন? আমাকে যখন আনলেন, একটু দেখতে দিন। তা বাবা, কী খেয়েছিলে? কোনও গুরুপাক কিছু?

দাদু চোখ টিপলেন। অর্থাৎ ফ্যানের কথাটা গোপন রাখ।

আজ্ঞে না, তেমন তো কিছু খাইনি।

পিতৃদেব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, মিথ্যে কথা। কার্য না থাকলে কারণ থাকে না। কিছু না খেলে কিছু হয় না। একে লিভার নেই, তার ওপর গোটা চল্লিশ ডালবড়া, তার ওপর কনস্টিপেশন, যাবে কোথায়? বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এবার ঘুঘু তোর□—।

তুমি তখন থেকে অত ডালবড়ার দিকে ঝুঁকে আছ কেন বলো তো? মাতামহের প্রশ্ন। আমি যে ওর উইকনেস জানি। আপনার যেমন ছোলার ডাল আর লুচি ওর তেমনি ডালবড়া।

এটা তুমি ঠিক বলেছ হরিশঙ্কর। চাপ চাপ ছোলার ডাল, আর গোটা চল্লিশ ফুলকো ফুলকো লুচি আর শেষে তোমার হাতের ঘি-চপচপ হালুয়া। আহা, ওটা তুমি যা বানাও না! খেতে খেতে মনে হয় কে যেন পটাপট পটাপট কাথবার্টসন হার্পারের বাড়ির জুতো হাঁকড়াচ্ছে গালে। অনেকদিন হয়নি, একদিন হয়ে যাক।

আড়চোখে একবার দেখে নিলুম, পিতাঠাকুরের মুখ নিমেষে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। স্বভাব অনেকটা শিবঠাকুরের মতো। অল্পেই তুষ্ট। মাতামহ এই মুহূর্তে খুবই মনের মানুষ। মোহনভোগ বস্তুটিতে বাবা সিদ্ধিলাভ করেছেন। বড়ে গোলাম আলি যেমন মালকোষ রাগে। সুজি শুকনো কড়ায় কতক্ষণ নাড়তে হবে, কখন, কতটা ঘি দিতে হবে, প্লাস্টারের মশলার যেমন ভাগ আছে, এতটা বালিতে এতটা সিমেন্ট, সেইরকম চার কাপ সুজিতে এক কাপ চিনি, ফোর ইজ টু ওয়ান। জলের মাপ আরও সাংঘাতিক, একটু এদিক-ওদিক হলেই মোহনভোগ হয়ে যাবে লেই। মোগলাই ব্যাপার। ময়ূর সিংহাসনে বসে বাদশাহরা খেতেন সুর্মা-টানা চোখে।

পিতাঠাকুর মহোৎসাহে বললেন, হলেই হয়। আজই হতে পারে। রাতে আমার মনে হয় রোগীর পথ্য হবে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা চারখানা লুচি আর একটু নুন। কী বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু বললেন, হতে পারে, তবে রুগিকে তো এখনও ঠিকমতো দেখাই হল না।

আমি মনে মনে বলছি, হে ডাক্তারবাবু, বাগড়া দেবেন না। দাদু বললেন, এর আর অত দেখার কী আছে! ইয়ংম্যান পেটটা একটু ছেড়েছে। তা ছাড়ুক না। এক ডোজ অ্যাকোনাইট থ্রি এক্স দিলেই তো মিটে যায়।

অ্যাকোনাইট থ্রি এক্স দোব কেন? মার্কসলও তো দিতে পারি।

পিতাঠাকুর বললেন, হোয়াই নট মার্ককর!

মাতামহ বললেন, হোয়াই নট নাক্সভম!

ডাক্তারবাবু খুটুস করে ওষুধের ব্যাগ বন্ধ করে বললেন, আমি উঠি। রোগের চেয়েও আপনারা মারাত্মক। চিকিৎসা আপনারাই করুন।

কুছ পরোয়া নেহি। মাতামহ উল্লাসে ফেটে পড়লেন। বেশ শুঁট জলে ফুটিয়ে, তোকমারি দিয়ে মেড়ে, চিনি সহযোগে প্রাতে সেবন করিয়ে দোব। মধ্যাহ্নে পেট সিলমোহর-করা লেফাফা।

তোকমারি? সে তো ফোড়া ফাটায়! আপনি ভুল করছেন। পিতার সংশয়।

ভুল করব কেন, ওই তো সাদা সাদা হড়হড়ে, ভু ভু...। আটকে গেলেন। স্মৃতি কমছে। বয়েস হচ্ছে।

ইসবগুল, ইসবগুল। ডাক্তারবাবু ভীষণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আসল বস্তুটির নাম বলে দিলেন। তা দিতে পারেন, ভালই হবে। এমনিই লুজ আরও লুজ হয়ে যাবে।

তুমি ডাক্তারির কিস্যু জানো না।

হতে পারে। তবে আপনিও যে খুব বেশি জানেন, এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না।

দাদুর মুখে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি খেলে গেল। তিনি ডাক্তারি থেকে সরে আধ্যাত্মিক লাইনে চলে গেলেন। আচ্ছা ডাক্তার, তুমি তো সব তীর্থ ঘুরে এসেছ, কৈলাস, মানস, অমরনাথ, গঙ্গোত্রী। বেশ, বলো দেখি স্বয়ম্ভু পূষন কাকে বলে?

ডাক্তারবাবু বললেন, পারব না মুকুজ্যেমশাই! শাস্ত্রজ্ঞানে আপনার জুড়ি নেই। আমি জানি, নাক্স, ইপিকাক, অ্যালো, জেলসিমিয়াম। আমি ঘুরি দেশ দেখার ধান্দায়। আপনি খোঁজেন ভারতাত্মা, আমি খুঁজি মানবাত্মা।

হাঃ হাঃ তাই বলো। তা হলে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ কাকে বলে তাও নিশ্চয় জানো না!

আজ্ঞে না।

সেই শঙ্খ গভীর রাতে আপনি বাজতে থাকে। সাধকের ইড়া পিঙ্গলায় তখন ওঁকারধ্বনি ওঠে।

ডাক্তারবাবু ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে বসতে বসতে বললেন, তা হলে অ্যাকোনাইট থ্রি এক্সই দিয়ে যাই।

দাদু বললেন, দেবেই তো, দেবেই তো। ও ছাড়া আর কোনও ওষুধই নেই। দক্ষিণাবর্ত শঙ্খের মতো আমার মুখ দিয়ে বেটি ঠিক ওষুধের নামটি বের করে দিয়েছে। জানো তো সিদ্ধপুরুষের বাক্যে বজ্রপাত হয়। ত্রেতায় হত, দ্বাপরে হত। মহাকলিতে সব গেছে। এক ডোজ ওষুধ দাও না ডাক্তার যাতে কুলকুণ্ডলিনীটা খুলে যায়।

মাতামহ প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তারবাবু এক পুরিয়া ওষুধ বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে আমার জিভে উজাড় করে দিলেন। দাদু বললেন, এক একটা গুলি এক একটা বীজমন্ত্রের মতো পেটে পড়ে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিক। ডাক্তার, তোমাকে নয়, তোমার বিশ্বাসকে আমি ভক্তি করি। এবার যখন পাহাড়ে যাবে আমার জন্যে একটু শিলাযতু আর এক ডেলা মৃগনাভি আনবে।

আচ্ছা মনে থাকবে, বলে ডাক্তারবাবু চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের বাইরে প্রায় চলে গেছেন, দাদু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, ডাক্তার, ডাক্তার আহারের বিধানটা দিয়ে গেলে না?

সকালে উপবাস। মিছরির জল চলতে পারে। রাতে টাকা সাইজের চারখানা লুচি, নুন দিয়ে লুচি ভাজার আগে ঘিয়ে কয়েক কুচি আদা ভেজে নেবেন। অত ভজঘট করবে কে?

পিতাঠাকুর হাঁটুতে তাল ঠুকে বললেন, কেন আমি!

আপনার অফিস?

অফিস আগে না ছেলে আগে ডাক্তার!

শ্যামবল্লভ মৃদু হেসে চলে যেতেই মাতামহ বললেন, দাঁত থাকতে লোকে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। কী, এখন তোমার মনে হচ্ছে না হরিশঙ্কর, স্ত্রী বেঁচে থাকলে কত সুখে থাকতে পারতে?

আজ্ঞে না, সুখ আমার জীবনে নেই। আমি জন্মেছি বেঁচে থাকার মাশুল দিতে। ওর মা বছর তিনেক সুস্থ ছিল, তারপরই তো শয্যাশায়ী। সারাজীবন আপনি ঘি খেয়ে, দুধে কাঁঠালের ক্ষীর খেয়ে, তীর্থ আর মহাপুরুষ করেই কাটিয়ে গেলেন। ছেলেমেয়ের কথা যদি একটু ভাবতেন?

বলো কী হরিশঙ্কর?

হরিশঙ্কর ঠিকই বলে, কারুর পরোয়া করে না। আপনার মেয়ের মতো অত ক্ষীণ স্বাস্থ্যের মহিলার সংসারধর্ম করতে আসাটাই অন্যায় হয়েছিল। আমাকে অনাথ করে, স্মৃতিটুকু ফেলে রেখে চলে গেল ড্যাং ড্যাং করে। স্বার্থপর, সেলফিশ, এসকেপিস্ট। ওপরে গিয়ে একবার দেখা হলে আমি গায়ে গায়ে শোধ তুলব। নাঃ, ওপর বলে তো কিছু নেই! সবই এখানে। সবই এখানে। হিয়ার, হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার। চোখে জল। দু'জনের চোখেই জল।

কৌপীনবন্ত: খলু ভাগ্যবন্ত

কোমরের কাছ থেকে ছোট্ট একটুকরো কাপড় বের করে পিতৃদেব চোখ মুছলেন। আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিলেন। উঃ, পিতা হবার কী জ্বালা! আমার মতো সৌভাগ্যবান ক'জন আছে। জন্মেই মরুভূমি। ধরে বেঁধে রাখার মতো কেউ কোথাও নেই। পরিস্থিতি লম্বা আঙুল তুলে দিকনির্দেশ করছে, পিন্টু, লোটাকম্বল। কৌপীনবন্তং খলু ভাগ্যবন্তং। জয় শিবশম্ভু, উখার দে মকান, লাগা দে তম্বু। চিতপাত হয়ে শুয়ে আছে, আর এক গৌতমবুদ্ধ। মানুষের কী কষ্ট। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি। মানুষ জেরবার হয়ে গেল। এ থাকে তো ও যায়, ও থাকে তো এ যায়। কী যে কেলোর কীর্তি চারদিকে। প্রবীণরা এসে মাঝে মাঝেই শুনিয়ে যান, হরিশঙ্কর, তোমরা শুনলে না তখন, এই ভূতের বাড়িতে এসে ঢুকলে! অত বড় সংসার, একে একে সবাই চলে গেল। এখন বংশে বাতি দেবার মতো কেউ থাকে কি না দেখো! হরিশঙ্কর তখন বুক ফুলিয়ে বলেন, কেউ না থাকে আমি থাকব। সেই ছাত্রজীবনে বাংলার শিক্ষক আমাদের চাঁদসদাগর পড়াতেন, হাতে লাঠি নিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছেন সদাগর, সব গেছে তবু নতি স্বীকার করব না।

মাতামহ অনেকটা টর্পেডোর ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পড়ে জামাইয়ের দিকে এগিয়ে এলেন। ধরাধরা গলায় বললেন, হরিশঙ্কর, আমার এই জিভ, আমার এই নোলায় একটু ছেঁকা দিতে পারো! সামনে জিভ ঝুলছে লকলক করে।

পিতা বললেন, ওটাকে আপনি ভেতরে গুটিয়ে রাখুন। ছেঁকা দেবার ব্যবস্থা আমি করছি। তার আগে হিসেবটা লিখে নিই।

দাদু চেয়ারে বসে গান ধরলেন, এখনও কি ব্রহ্মময়ী, হয়নি মা তোর মনের মতো।

পিতা ক্যাশবাক্স খুলে সেই বিখ্যাত হিসেবের খাতাটি খুললেন। যার পাতায় পাতায় প্রতিদিনের হিসেব লেখা। পাইপয়সার এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। প্রতিদিনের হিসেব মেলাতে গিয়ে একটি কথা লিখতেই হবে, শর্ট, এত পয়সা। পাশে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্ন। বড়ই সন্দেহ। কেন শর্ট? কে মেরেছে? আমি নয় তো! মিথ্যে বলব না, দু'-এক দিন মেরেছি। বেশ নরম করে ভাজা বোকাদার দোকানের ডিমের ওমলেট বড়ই সুস্বাদু! মনের ওপর এখনও যে তেমন সংযম আসেনি। একটু-আধটু এদিকে-সেদিকে পা ফেলে। কিন্তু সে তো মাঝেমধ্যে। তা হলে রোজ শর্ট হয় কী করে! কে জানে? এদিকে শুনি হিসেবের কড়ি বাঘে খায় না।

ডাক্তারবাবুকে দু'টাকা ভিজিট দিয়েছেন। সকালে নর্দমা সাফ করার লোক এসেছিল, তাকে এক সিকি। ভিখিরি এসেছিল, দু'পয়সা। ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট। চুলচেরা ব্যাপার। আমি যদি সত্যি বুদ্ধদেব হতুম, তা হলে কবে বোধিবৃক্ষের তলায় গিয়ে বসতুম। রোজ এইসব ছোটখাটো অপমান। বাজার থেকে পয়সা মেরেছি। অসুখে পড়ে ডাক্তার খরচ করিয়েছি। অহংকারে লাগে। আবার মহাপুরুষরা বলছেন, অহংকার কী রে ব্যাটা!

পাঁড়ে ন করসী বাদ-বিবাদঁ। যা দেহী বিন সবদ না স্বাদঁ
অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড ভি মাটি। মাটি নবনিধি কায়া।

আরে পাঁড়েজি তর্কাতর্কি মাত করো। এই দেহে শব্দ নেই, স্বাদ নেই, স্রেফ মাটি রে ভাই। অণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড, খণ্ড সবই মাটি। ওই যে আমার পিতৃদেব টাকা টাকা করছেন, ওঁর কানের কাছে আমি যদি নাকি সুরে দু'কলি গেয়ে উঠি;

মন রে রতন কাগজ কা পুতলা।
লাগে বুঁদ বিনসি জাই ছিল মৈ গরব করৈ ক্যা ইতনা॥

মন রে, ধনরত্ন সব কাগজের খেলনা। বুদবুদ এই উঠছে এই মিলিয়ে যাচ্ছে। এত গর্ব কীসের! আর কিছু না পারি বেশ দু'-চারটে শ্লোক, দোঁহা টোঁহা মুখস্থ করে, পিপুল-পাকা অবস্থায় পৌঁছে গেছি। নাকে রসকলি করে সামনে পুঁথি খুলে কথকতায় বসলেই হয়। গলায় গাঁদাফুলের মালা, সামনে মরা, আধমরা, বড়ি খোঁপা, পানদোক্তা-খাওয়া হরেক মেজাজের একপাল বিধবা।

মাতামহ বেশ তারিফের গলায় বললেন, বড় ভাল অভ্যাস হরিশঙ্কর! মরো আর বাঁচো রোজ হিসেবটি লিখে যাবে। নিজেকে সংযত রাখার এর চেয়ে ভাল রাস্তা আর কিছুই নেই। ওড়ার আগেই ডানাটি কেটে ফেলল। খাতার দিকে তাকাও আর শামুকের মতো গুটিয়ে যাও। মহাত্মা গান্ধী শুনেছি রোজ হিসেব লিখতেন। সাধে স্বাধীনতা আনতে পেরেছিলেন! ইংরেজ বললে, বাবা, বড় সাংঘাতিক লোক। কাপড় হাঁটুর উপর তুলেছে। আরও ওপরে তোলার আগেই সরে পড়ো।

আপনার সব ভাল, মাঝেমধ্যে এই যে একটু গ্রাম্য হয়ে পড়েন, তখনই পিত্তি চটে যায়। হচ্ছে হিসেবের কথা, চলে গেলেন মহাত্মা গান্ধীতে। উত্তর পশ্চিম জ্ঞানের বড়ই অভাব।

তুমি ঠিক বলেছ হরিশঙ্কর। আমার মুখটা একটু আলগা। এক-একটা কথা ফস করে মুখ দিয়ে যেই বেরোয়, চমকে চমকে উঠি। রিভলভারের গুলির মতো বেরোবার সময় ধাক্কা দিয়ে যায়। তখন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করি, ওরে তোর মুখ না পেছন? অ্যাই, অ্যাই দেখো, যেই বললুম অমনি ধাক্কা খেলুম। উপমাটা তেমন সুবিধের হল না। মুখকে যার সঙ্গে তুলনা করলুম, সে জায়গাটা খুব সভ্য নয়।

কে আপনাকে ব্যাখ্যা করতে বলেছে?

কেউ বলেনি। তোমাকে দেখালুম আমি একেবারে গবেট নই। বোধবুদ্ধি আছে, কেবল অভ্যাসটা নেই। ঢলকো ছিপির মতো! কী, রাগ করছ নাকি? রেগে গেলে তোমার আবার জ্ঞান থাকে না। ভুলেই যাবে, আমি তোমার শ্বশুরমশাই। এখুনি বলবে, আপনি তা হলে আসুন। আমার লুচি-হালুয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বেটির সামনে আসনে মন আর কিছুতেই স্থির হবে না। হরু পাগলের মতো গাইতে হবে,

থেকে থেকে যেন মাগো লুচির গন্ধ পাই
কোথা তোর রাঙা চরণ, ভাসছে চোখে মণ্ডামেঠাই।
থেকে থেকে যেন মাগো লুচির গন্ধ পাই।

খাতা ক্যাশবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ল। চাবিটি লাগাতে ভুল হল না। দাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আহারাদি তা হলে আজ এখানেই হোক।

গান থেমে গেল। লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, স্বপাকে ভাতেভাত খাই, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। ওরে কাঙাল ভাত খাবি? না, হাত ধুয়ে বসে আছি। তা, কী কী পদ হবে হরিশঙ্কর?

ধরুন খুব সরু চালের ভাত। তার ওপর পরিমাণ মতো গব্য ঘৃত।

আহা, আহা!

পালং শাক পোস্ত দিয়ে ভাজা।

বড়ি আর মুলো পড়বে?

পড়বে।

তোফা তোফা।

সোনামুগের ডাল।

বলো কী?

পাকা রুইমাছের কালিয়া।

কেয়া বাত কেয়া বাত।

একটু চাটনি আর দই।

সর্বাঙ্গসুন্দর।

কিন্তু কে করবে?

কে করবে? হ্যাঁ তাও তো বটে, কে করবে? এ তো শ্মশানভূমি। চারদিক হাহা করছে, খাঁখাঁ। তা হলে বললে কেন?

স্বপ্ন দেখালুম মুকুজ্যেমশাই। দিবা স্বপ্ন।

তা হলে কী হবে?

জগাখিচুড়ি। চালে, ডালে, লাউ ডাঁটায়, আলুতে, পটলে এক মহা সম্মেলন। কী, দুঃখ হচ্ছে?

কিছুমাত্র না। দুঃখু কীসের? মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পানিদ্বয়ং ভোক্তুমামন্ত্রয়ন্ত কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ত। বুঝলে হরিশঙ্কর।

হ্যাঁ, বুঝলুম বই কী। হীনবল ভারতীয়ের ভাগ্যের সঙ্গে সহজ রফা। পুরুষকারের অভাব। ওর সঙ্গে যোগ করুন তৃণাদপি সুনীচেন, তরুরোহপি সহিষ্ণুনা, নেংটি পরে লটকে বেড়াই, মুখে কেবল কথার বড়াই। যা বলেছি তাই হবে। নো ট্রাকস্টার অ্যান্ড হাকস্টার উইথ ফেট।

তুমি কথায় কথায় বড় ইংরেজি বলো সায়েববাচ্চার মতো। ওই ভাষাটা আমি আবার তেমন বুঝি না।

এ হল তাদের ভাষা যারা কর্মযোগে বিশ্বাস করে। যারা লেংচে চলে না। মার্চ করে।

সবই বুঝলুম হরিশঙ্কর, তবে কিনা নাতিটার পেট ভাল নেই, এতগুলো পদ রাঁধবে, আর আমরা খেলিয়ে খেলিয়ে খাব, সেটা কি ঠিক হবে?

ওর জন্যে আমি বেলের মোরব্বা তৈরি করব।

আহা বড় ভাল জিনিস! আমাকেও দিয়ে কিঞ্চিৎ, না কোরো বঞ্চিত। তা হলে এখন একটু চা হোক। চিনির বদলে আমাকে গুড় দিলেও চলবে।

কেন, চিনির অভাব আছে নাকি? আপনার মেয়ে নেই, ঠিক আছে। নেই তো নেই, আমি তো আছি!

অ্যাঁ, তুমি এত বড় কথা বললে? আমার পুত্র-পুত্রবধূ যে কখনও এমন কথা বলতে পারলে না। পায়ের নীচে এখনও তা হলে জমি আছে! হরিশঙ্কর, জমি তা হলে আছে?

আলবাত আছে। আপনার মেয়েকে আমি শ্রদ্ধা করি। আজ নেই বলে বলছি না, থাকলেও বলতুম। সে ছিল দেবী। আপনি তার কিসুই জানেন না। আনইয়ুজুয়াল ডটার অফ নট সো ওয়ার্দি এ ফাদার।

একটু বাংলা করে বলো হরিশঙ্কর। শুনতে বড় ভাল লাগছে। চোখে জল এসে যাচ্ছে।

বাংলা করলে শুনতে আর তেমন ভাল লাগবে না।

তা হলে ইংরিজিই থাক।

হ্যাঁ, সেই ভাল, হোয়ার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস দেয়ার।

উঃ, সব ভাল ভাল কথাই তুমি ম্লেচ্ছ ভাষায় বলছ, আচ্ছা তোমার সংস্কৃত আসে না?

আসে, তবে ইংরিজির মতো নয়। ইংরিজিতে বেশ মোলায়েম করে গালাগাল দেওয়া যায়।

তুমি কি তা হলে এতক্ষণ গালাগাল দিচ্ছিলে?

কুচো নিমকি আর চা দিয়ে স্টার্ট করা যাক। কী বলেন?

ওঃ ফাসক্লাস! কালোজিরে দেওয়া?

হ্যাঁ পূর্ণাঙ্গ জিনিস।

নাতিটা ডালবড়া।

পিতৃদেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মতো হেসে বললেন, কী বুঝছ পান্তুরানি?

বেশ জমেছে।

এরকম জামাই তুমি ভূ-ভারতে পাবে না। আনন্দ, আনন্দ। আজ যেন আনন্দের হিল্লোল বইছে। বেটি কোন দিন যে কী করে দেয়! এই কাঁদাচ্ছে, এই হাসাচ্ছে! এই রাজবেশ, এই কৌপীন। এই মহাভোজ, এই উপবাস।

তবে সেই সে পরমানন্দ
যে জন পরমানন্দময়ীরে জানে
সে জন না যায় তীর্থ পর্যটনে।

খুব জোর গান ধরেছিলেন। বিভোর ভাব। গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবি। পইতেটি সামান্য বেরিয়ে আছে।

দরজায় পিতৃদেবের মুখ দেখা গেল, স্টপ স্টপ, পরমানন্দময়ী হরিমটর ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা রাখেন না, উঠে পড়ুন। এখন আর মিউজিক নয়, মাসল্‌সের খেলা চলবে। বাটনা বাটতে পারেন?

ভাবজগৎ থেকে দমাস করে বাস্তবজগতে আছাড় খেয়ে মাতামহ কেমন যেন হয়ে গেলেন। তবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, ওই শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে ঠুকে ঠুকে তারপর গড়াগড়ি করে মাখামাখির ব্যাপার তো! জীবজগতে অহরহ যা চলছে? আহা, জাঁতা ঘুরতে দেখে কবীর দাস একদিন কেঁদে ফেলেছিলেন। জাঁতার দুটো ফাটার মধ্যে পড়লে কেউ কি অক্ষত থাকবে রে ভাই,

চলতি চক্কি দেখিকে দিয়া কবীরা রোয়
দুই পট ভিতর আয়কে সবিত গয়ান কোয়।

এ আপনার জাঁতাকলে জীবজগত নয়। হলুদের কথা হচ্ছে। চলে আসুন। চা ছাঁকতে পারেন?

তা আর পারব না! কিন্তু তুমি যে বললে সেই কালোজিরে দেওয়া কুচো নিমকির কথা! ভুলে গেলে নাকি?

আপনার ওই পরমানন্দময়ীর জগৎ ছেড়ে বেরোতে পারলেই সর্বপ্রকার জীবানন্দ পাবেন।

তুমি বড় নাস্তিক হে হরিশঙ্কর, কিছুতেই তোমার বিশ্বাস আসে না!

আমি কালাপাহাড়; বলে পিতাঠাকুর অদৃশ্য হলেন। মাতামহ গেলেন চা ছাঁকতে।

সেই কুচো নিমকি আছে আলমারিতে। আংটায় ঝুলছে সাত লিভারের থান্ডার লক। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারিনি। পিতার অফিসের বন্ধুর স্ত্রী এক জার আমের মোরব্বা করে পাঠিয়েছিলেন। ফিনকি ফিনকি করে কাটা, কিসমিস টিসমিস দেওয়া বড় সুস্বাদু বস্তু। রাতে একটু চাখার পর স্বভাবটা কেমন যেন বেড়ালের মতো হয়ে গেল। ছোঁক ছোঁক করে মরি। কোনও কাজেই মন বসে না। ঘুরি ফিরি আমের মোরব্বা। সেই কথামৃতের কথা: ঘুরছে ফিরছে, রান্না করছে, চুল বাঁধছে, মন পড়ে আছে উপপতির দিকে। দুপুরের দিকে একবারই একটু নিয়েছিলুম। বেশি না, চামচে দু'-এক। ধরা পড়লুম রাতে। মোরব্বার ওপর তখন বিদিগিচ্ছিরি রুটি আর কুমড়োর ছক্কা চেপে বসেছে। মোরব্বার জারে কোথায় একটা কী চিহ্নফিহ্ন করা ছিল। খুলতেই তিনি স্থানচ্যুত হবেন। জাগতিক দিক থেকে ব্যাপারটা খুবই সামান্য; কিন্তু নৈতিক দিক থেকে অসামান্য।

তুমি নিয়েছ?

যথারীতি উত্তর, আজ্ঞে না তো।

আজ্ঞে না-তো-ও-ও!

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটুখানি। এই এতটুকু।

মুখ যতদূর সম্ভব কাঁচুমাচু। সামনে আয়না থাকলে ছিঁচকে চোরের মতোই দেখাত। মাথায় বাবরি, অথচ চোর। সেই পাড়ার প্রসন্নদার মতো। গগল্‌স পরে অফিসের টাইপরাইটার চুরি করেছিল। সুট আর ঝকঝকে জুতো, চোখে রঙিন চশমা, এদিকে কোমরে কাছি বাঁধা। শ্রীঘরে চলেছে বড় রাস্তা দিয়ে। সামনে পেছনে দুই সেপাই চলেছে হেলেদুলে, খইনি মলতে মলতে। একই তো ব্যাপার। বললে, কাপতেন চুরি করে মরেছে। পিতৃদেব বলবেন, ব্যাটার মাথায় চাঁচরঅ চিকুরঅ এদিকে মোরব্বা চুরি করে মরেছে। কদমছাঁট কি ন্যাড়া চোরে সহ্য হয়। ননিচোরা কৃষ্ণকে দেবতা বলে রেসপেক্ট করা চলে, বস্ত্রহরণ, বাঁশি বাজন, রাধাভিসার, ক্ষমণীয়

অপরাধ কারণ তিনি এক গীতাতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে চিতপাত করে দিয়েছেন। তুমি বাছা কী করেছ! কিন্তু কেমন করে ধরলেন?

কী করে ধরলুম! আমি শার্লক হোমসের বাবা। ঢাকনাটা শেষ প্যাঁচে এনেও আমি আরও একটু চাপ দিয়ে মোক্ষম বাঁধনে বেঁধেছিলুম। যাতে খোলার সময় বেশ একটু বেগ পেতে হয়। লক্ষ করেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বেশ কোস্তাকুস্তি করেই খুলতে হয়েছিল।

হোমস বলছেন, অপরাধী অপরাধের জায়গায় সূত্র রেখে যাবেই। তুমি কী করলে, ঢাকনাটা লাগালে তোমার ক্ষীণজীবী শরীরের দুর্বল হাতে। পার্ফেক্ট ক্রিমিন্যাল পৃথিবীতে আজও জন্মায়নি পিন্টু। পার্ফেক্ট সাধু কিন্তু জন্মেছেন; কারণ সতের পথ সোজা। ঈশ্বরের দিকে যেতে চাইলে তিনি হাত ধরে টেনে নেন। স্বর্গে জায়গা পাওয়া সহজ, নরক গুলজার, সেখানে লাইন দিতে হয়। তা হলে! সেই লোভ, যে-লোভ তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে, সেই লোভের কাছে এই আহুতি।

যজ্ঞে আহুতি দেবার ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে পিতৃদেব পুত্রের সামনে নতজানু। সময় মধ্যরাত। বাইরে বসন্তের উতলা বাতাস। সিংহমশাইয়ের চায়ের দোকানের সামনে কাঁচি দিয়ে ভুলোর ন্যাজ ছাঁটা হচ্ছে। আর্ত চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ। আর্য ঋষির মতো তিনি বলছেন, পিন্টুর লোভ প্রজ্জ্বলিত হও, মোরব্বাকে দহন করে চিরকালের জন্যে প্রশমিত হও।

সামনে থেকে সরে যাবার উপায় নেই। পায়ের গোছ চেপে ধরে আছেন। খেতে হবে, পুরোটাই তোমাকে খেতে হবে। খেয়ে অসুস্থ হলে আমি বিধান রায়কে ডেকে আনব। হেলা চরিত্র চাই না, চাই খাড়া, স্ট্রেট লাইক পাইন নিডল।

সে স্মৃতি কি ভোলা যায়! ওয়াটার্লুর যুদ্ধের মতো। মাতালের অত্যাচারে ভুলো শেষ। তবু এখনও কুকুর কাঁদলে মোরব্বার কথা মনে পড়ে। চরিত্রও পালটেছে। লোভ আছে, অভিমানে চাপা। খেতে হলে নিজের রোজগারে, নয়তো আকাশবৃত্তি। মাতামহ বলেন, অজগরবৃত্তি। হাঁ করে পড়ে থাকবি। মুখের সামনে এলে গিলে খাবি, আবার চোখ উলটে পড়ে থাকবি।

ঠ্যান করে কী একটা পড়ল ওপাশে। পিতাঠাকুরের কিঞ্চিৎ উত্তেজিত গলা শোনা গেল, যাঃ, সব ফেললেন তো। নিন সরুন। খুব হয়েছে। এত কম সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকা যায়! পৃথিবীর সব ধেড়ে ধেড়ে প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী লোপাট হয়ে গেল। ধূর্ত শৃগাল কিন্তু ঠিক আছে।

মাতামহের অসহায় গলা, কেটলির ঢাকনাটা যে ফট করে খুলে যাবে, বুঝতে পারিনি হরিশঙ্কর!

ধীরে ধীরে উঠে গেলুম। তখন থেকে বড়ই অপদস্থ হচ্ছেন। যে-মানুষটির পাল্লায় পড়েছেন তাঁকে চেনা অত সহজ নয়। চা-পাতা সমেত একগাদা লিকার মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কেটলি থেকে চা ছাঁকার অভ্যাস না থাকলে ঢাকনা এইভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

আমি একটু সাহায্য করতে পারি?

চায়ের কাপে চিনি গুলতে গুলতে পিতা বললেন, তুমি? তুমি যে উঠে এত দূর আসতে পেরেছ, এই তো যথেষ্ট। ব্র্যাভো ব্র্যাভো বলে হাততালি দেওয়া উচিত। তুমি তো সামান্যেই কাতর!

একটু আগের তিরস্কার ভুলে মাতামহ আমার পক্ষ নিলেন, পেটের অসুখে মানুষ বড় দুর্বল হয়ে পড়ে হরিশঙ্কর। তা ছাড়া ও তো এমনিই একটু কাহিল।

তবে শুনবেন? চায়ের কাপ ঠেলে দিয়ে পিতা চললেন অন্যের বীরত্বের কাহিনিতে। বীরের সংখ্যা তো কম নয়। কৃতি পুরুষেরও ছড়াছড়ি। সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচণ্ড ষড়যন্ত্র চলেছে আমাকে আরও আরও হেয় করার জন্যে। কেউ ট্রাইপস্ পাচ্ছে, কেউ ব্যাংলার হচ্ছে, কেউ ছ'টা লেটার পেয়ে আজীবন স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে, কেউ এফ আর সি এস হয়ে এসে ক্যাচক্যাচ মানুষ কাটছে, বড়দিদার মতো গুনছুঁচ দিয়ে পেট সেলাই করছে, কেউ এভারেস্টের মাথায় উঠে পতাকা জাপটে ধরে স্টাইলে ছবি তুলছে।

দাদু ফড়ড়্ করে চায়ে চুমুক দিতেই পিতৃদেবের ভুরু কুঁচকে গেল। পদার্থবিদ্যায় পড়েছিলুম, এভরি অ্যাকশন হ্যাজ ইকোয়াল, অ্যান্ড অপোসিট রিঅ্যাকশন। ফড়ড়্ মানেই এক ধরনের গ্রাম্যতা। চিনের চা, পরিবেশন করতে হবে জাপানি কায়দায়, খেতে হবে বিলিতি প্রথায়। এতটুকু শব্দ হবে না। চুক করে টেনে নিয়ে, সুড়ুত করে গিলে ফেলা। গলকম্বল উঠল আর নামল। ইতিমধ্যে মাতামহ আর একটি দুর্ধর্ষ চুমুক মেরেছেন, ফড়ফড় ফড়াক করে। ভুরুতে এবার একাধিক ভাঁজ। মাতামহের চোখে পড়েছে। ধরতে পারলেন না ব্যাপারটা কী! অতি সরল প্রশ্ন, কী, মাথা ধরছে হরিশঙ্কর?

আজ্ঞে না, মাথা আমার ধরে না, অম্বল আমার হয় না। আমি শুধু ভাবছি, মানুষ কীরকম খাল কেটে কুমির আনে, ঝাড় কেটে বাঁশ আনে।

তা যা বলেছ? খাল বেয়ে অবশ্য মাছও আসে, রুই, কাতলা, মৃগেল। তোমার কুমির কোন দিক দিয়ে এল হরিশঙ্কর?

এবার বেশ খেলানো চুমকি। একতলা, তিনতলা।

পিতৃদেব বললেন, সামনের দরজা দিয়েই এল।

সে কুমির এখন কোথায়? মাতামহ নিমকি চিবোতে চিবোতে প্রশ্ন করলেন।

আমার সামনে।

কী জানি বাবা, আমাকে বলছ না তো!

হ্যাঁ আপনাকেই বলছি। চা খাচ্ছেন বেনারসের বিধবাদের মতো। চা খেতে অত শব্দ করেন কেন?

মাতামহ হাঁ হয়ে গেলেন। হাতের নিমকি হাতে, চায়ের কাপ প্লেটে। ছেলেমানুষ বকুনি খেলে যেরকম মুখ হয় ঠিক সেই মুখে তাকিয়ে আছেন। ভয়ে কাপের দিকে আর হাত বাড়াচ্ছেন না। খেতে গেলে আবার যদি শব্দ হয়।

এই দেখুন আমার চুমুক। এক চুমুক চা টেনে নিলেন। কোনও শব্দ হল?

মাতামহ ঘাড় নাড়লেন নিঃশব্দে।

নিন, কাপ ওঠান, চেষ্টা করুন। এমন কিছু শক্ত নয়।

মাতামহ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। হাত আর কাপের দিকে এগোবার সাহস পাচ্ছে না।

কী হল? চেষ্টা করুন। যা দশে শেখেননি, তা যাটে শিখুন।

আমি আর চা খেতে চাই না হরিশঙ্কর।

চোখের কোণদুটো ছলছলে। আলগা মুঠো থেকে মেঝেতে নিমকি খসে পড়ল। এতক্ষণ নিমকি নিমকি করে লাফাচ্ছিলেন। সেই নিমকির ওপরও আর তেমন টান নেই। সব ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্লেটে নিমকি, আধ কাপ চা।

পিতা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চললেন?

যাই, কোথাও তো যেতে হবে। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

বসুন। বেশ আদেশের সুর।

কখন কী অসভ্যতা করে ফেলি হরিশঙ্কর! তোমার মতো লেখাপড়া শিখিনি, তেমন সহবতও জানি না। রেলের মাল গুদামের বড়বাবু ছিলুম এককালে, পয়সাও অনেক কামিয়েছি; কিন্তু তোমার সামনে বসার মতো সভ্যতা তো আমাকে কেউ শেখায়নি হরিশঙ্কর। ছেলে বলে, ওল্ড ফুল, তুমিও তো আমার আর এক ছেলে, তোমার মুখেও সেই এক কথা,

যাবদ্বিত্তোপার্জন শক্ত-স্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জরদেহে, বার্তাং পৃচ্ছতি কোছপি ন গেহে॥

যতদিন রোজগার ছিল, বোলবোলা ছিল, ততদিন রাজনারায়ণের খুব খাতির ছিল হে। এখন গতায়ু বৃদ্ধ, জরা এসে চেপে ধরেছে, এখন কে কার! ভুলেও কেউ একবার জিজ্ঞেস করে না, বুড়ো কেমন আছ?

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং

বৃদ্ধ না কুত্র যাতি। পিতা হাত ধরে চেপে বসালেন। বসুন। অত অভিমান কীসের? সংসারে আপনার অভিমানের কে তোয়াক্কা করে! শঙ্করাচার্য পড়ে ঠোঁট ফোলাচ্ছেন? সাধনমার্গের দুটো পথ, জানেন তো? নেতি নেতি। ইতি ইতি। চায়ে চুমুক দিলে শব্দ হয়, অতএব চায়ে চুমুক দেব না, নেতির পথ। এমনভাবে চুমুক দেব শব্দ হবে না, এ হল ইতির পথ। নিন, স্টার্ট চুমুক, ওয়ান, টু, থ্রি।

মাতামহ উবু হয়ে বসে ছোট্ট একটু চুমুক ছাড়লেন ভয়ে ভয়ে। কী হরিশঙ্কর, কী বুঝলে?

পারফেক্ট। যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

মাঝারি ধরনের আর একটি চুমুক মেরে বললেন, এইবার?

শাবাশ!

নিমকির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে টেনে নিলেন। মুখে নিমকি পড়লে যে একটু মুচমুচ শব্দ হবে।

মুচমুচ অ্যালাউ করা যায়, কারণ ওটা বস্তুর ধর্ম, কিন্তু তারপর যদি চ্যাকোর চ্যাকোর শব্দ হয় তখনই হবে অভ্যাস দোষ।

তা হলে থাক বাবা। দরকার নেই খেয়ে।

না না, ইতিবাচক সাধনা। খেয়ে প্রমাণ করতে হবে সিদ্ধপুরুষ।

মাতামহের ট্রেনিংপর্ব চলেছে। আমাকে উপলক্ষ করে সেই বীরত্বের কাহিনি ধামাচাপা রইল। সরে পড়াই ভাল। পিতার চোখ পড়ল এতক্ষণে, তুমি তা হলে কীভাবে সাহায্য করবে?

যেভাবে বলবেন!

যেভাবে বলব? বেশ, তা হলে একটা কর্মতালিকা তৈরি করা যাক। মুখুজ্যেমশাই হলুদ আর সরষে বাটার চেষ্টা করবেন আর যে-কোনও একটা পদ রাঁধবেন।

রান্না কি আমার আসবে হরিশঙ্কর?

রেঁধে প্রমাণ করতে হবে আপনি মহিলা নন, পুরুষ।

সে আবার কী কথা?

পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় রাঁধিয়েই হল পুরুষ, গঞ্জালেস, আবু বকর, স্টুয়ার্টলয়েড, আমাদের হালুইকর বিচিত্রবীর্য। সব পুরুষ। রান্নার জগতে মেয়েছেলের স্থান নেই। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাছবে চাল। তোমার ওই রমণীমোহন চাঁচর চিকুরে ওই মেয়েলি কর্মটিই ভাল মানাবে।

আহা, তুমি আবার ওকে নিয়ে পড়লে!

পড়ব না! চুল ছাড়া ওর আর আছে কী? ভেবেছে চুল দিয়ে নারীচিত্ত জয় করবে! কৃষ্ণের হাতে শুধু বাঁশি ছিল না, সুদর্শন চক্রও ছিল। বুকের পাটা চাই। হাতের গুলি চাই। এই দেখো, তোমার সামনে তোমার পিতা, তোমার মাতামহ। সব ছেচল্লিশ ইঞ্চি।

সব ভুলে পিতার পাশে দাঁড়িয়ে সিমুলিয়ার ব্যায়ামবীরের মতো মাতামহ হাতের গুলি দেখাতে লাগলেন।

ছায়া, মায়া, কায়া

রান্নাঘরে এক ডেকচি জলের মতো ঝোলের তলদেশে ছাল-ছাড়ানো আস্ত একটা মাগুর কাঁচকলার বালিশ মাথায় দিয়ে শেষ শয্যায় শুয়ে আছে। জমাট অশ্রুবিন্দুর মতো গুটি পাঁচেক মরিচ শোকে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর একটি পাত্রে শ্রাদ্ধের পিণ্ডের মতো অতি পুরনো চালের এক ড্যালা ভাত। পিতাঠাকুর পেটরোগা ছেলের আহার প্রস্তুত করে রেখে, চোগাচাপকান চাপিয়ে অফিসে চলে গেছেন। খাঁখাঁ বাড়ি। পৃথিবীর চাকা ঘুরছে। এখানে মুহূর্ত যেন স্থির। কিছুই করার নেই। মোটা মোটা ভারী ভারী বই আছে। দেয়ালে দেয়ালে জ্ঞানভাণ্ডার ঝুলছে ঝুলের আবরণে। পণ্ডিত হতে চাইলে হওয়া যায়। মগজে গোবর। দাঁতের জোর থাকলে ইঁদুরের মতো চিবোনো যেত। সেও তো পোকা খেয়ে ভাঙা, আধভাঙা হয়ে বসে আছে। প্রায়ই পিতার সামনে হাঁ করে দাঁড়াতে হয়। ভাগ্য ভাল, তাঁর দাঁতও তেমন সুবিধের নয়। আমার গেছে যত্ন না নিয়ে, তাঁর গেছে অতি যত্নে। যখনই সময় পান শক্ত বুরুশে ইঞ্চিখানেক পেস্ট নিয়ে খসর খসর করে ঘষতে থাকেন। ঘর্ষণে পাথর খয়ে যায়, দাঁতের এনামেল তো কা কথা।

বিজয়দা বলেছিলেন, সাইকেল শিখতে চাস? তা হলে সাইকেল হাঁটাতে শেখ।

বিজয়দা একটা মোটা খাতা নিয়ে বাড়ি বাড়ি ট্যাক্স আদায় করতেন, আর আমি তাঁর পেছন পেছন বিশাল ভারী এক র‍্যালে সাইকেল নিয়ে হেঁটে হেঁটে পায়ের খিল খুলে মরি। মাঝে মাঝে লগবগে হয়ে নর্দমায় পড়ে যাবার মতো হয়। প্যাডেলের খোঁচা খেয়ে পায়ের ছালচামড়া উঠে যায়। মাঝে মাঝে সংশয় জাগে, এতে আমার কী লাভ হচ্ছে! বিজয়দার মতে, এ হল জোড়ে হাঁটা। অনেকটা বিয়ের মতো। গাঁটছড়া বেঁধে সাত পা হাঁটলেই বোঝা যায়, যার সঙ্গে ঘর করতে চলেছ, তার ধাতটি কেমন! তিনি কোন দিকে টাল খান, চলন কেমন? জোড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় আরও কিছুটা বুঝে গেলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার ব্যালেন্স এসে গেল। বুঝে গেলে, কীভাবে চড়তে হবে, চালাতে হবে। দু'চাকার সাইকেল আর স্ত্রীজাতি একই জিনিস। নাড়াচাড়া না করলে, দূর থেকে ধাত কি স্বভাব বোঝা যায় না। চালাতে জানলে চলবে, নয়তো ফেলে দেবে নালায়।

পিতারও সেই এক কথা। এ জীবনটা বইয়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে নাও, নেড়েচেড়ে দেখে যাও, আসছেবার ভেতরে ঢুকতে পারবে। মানুষের মতো চেহারা হলেই মানুষ হয় না। জন্ম হল অঙ্কের ব্যাপার, ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপার। এককোষী প্রাণী থেকে বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে বহুকোষী প্রাণী, ভেড়া, ছাগল, গাধা, ঘোড়া, বাঁদর, প্রথম মানুষ জনম। দেহ আকৃতি মানুষের মতো, ভেতরটা গাধা-বাঁদর কম্বিনেশন। গাধা যুক্ত নর ইজ ইকোয়াল টু গানর। গাবানর। সেই গল্পের মতো, মনুষ্যচর্মাবৃত একটি গর্দভ, লাস্ট বেঞ্চে বসে পেনসিল চিবোচ্ছে। দিনের অর্ধেক কেটে গেল নিলডাউন হয়ে হাতে থান ইট নিয়ে। এইবার জন্মে যাও। জন্মাতে জন্মাতে জন্মাতে নিউটন কি রাসেল, র‍্যাফেল কি রোদেনস্টাইন। লাখোবার জন্মালে তবেই আকৃতি আর প্রকৃতি দুটোতেই মানুষ হবে। তার আগে নয়। দু'জন পাশাপাশি বসে আছে, ট্রেনে কি ট্রামে। দু'জনই মানুষের

মতো দেখতে। হলে হবে কী? একটু নাড়াচাড়া করে দেখলেই বেরিয়ে পড়বে, একজন মানুষ আর একজন কোটপ্যান্ট পরা বনমানুষ।

সোম থেকে শনি, বইয়ের ধুলো ঝাড়ার ক্যালেন্ডার তৈরিই আছে। রবিবার যেন লিপ ইয়ার। কাজের ওপর কাজ। সারা বাড়িতে গোটা চোদ্দো মোগলাই আলমারি। তার মাথা আছে, তলা আছে, দেয়ালের দিকে পিছন করা পৃষ্ঠদেশ আছে। চেয়ারের ওপর টুল ফিট করে মাথা সাফ করো। টুলের চারটে পায়াই স্ট্যান্ড-অ্যাট-ইজের ভঙ্গিতে ছেতরে থাকে। চেয়ারে তিনি কোনওক্রমে খাড়া হবেন। সবসময়েই ভয়, সীমানা ছেড়ে যে-কোনও একদিকে ঝুলে না পড়েন। জয় তারা বলে সেই মনুমেন্টে উঠে দাঁড়িয়ে বলো, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে! হাতে একটি ঝাড়ন। ঝাড়ো ধুলো। প্রথম ঝাপটাতেই নাকে কিছু ঢুকবে। সঙ্গে সঙ্গে গোটাতকত হাঁচি গেট-খোলা কুকুরের মতো তেড়ে বেরিয়ে আসবে। স্বর্গের কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই বিপুল হাঁচির বেগে টুলচ্যুত হয়ে দেবতার মর্তে পপাত হবার সম্ভাবনা ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা হবে। পিতা তখন হয়তো এমরি পেপার ঘষে পোর্টম্যানের মরচে তুলছেন। কমলালেবু রং পালটে এবার নীল রং হবে। নিত্যনতুন রূপে সংসারকে সাজাতে হবে। নয়তো জীবনরসে ভাঁটা পড়বে। মাই ডিয়ার স্যার, স্ট্যাগনেশন ইজ ডেথ। শূন্যে তাকিয়ে পিতা বললেন, নাক টিপে, নাক টিপে।

সময় সময় নাকে রুমাল বেঁধে রঘু ডাকাতের বাচ্চা হয়ে ধুলো ঝাড়া চলে। সে বড় অসুবিধের। ডাকাতি আর ডাস্টিং, ডকারান্ত হলেও আকাশ পাতাল প্রভেদ, এক নয়। মাথা সাফাইয়ের পর তলা সাফ। সারা সপ্তাহের মালমশলা তলদেশে তরিবাদি করে জমিয়ে রাখা হয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসে, ঘাড় হেঁট করে, খাটো ঝ্যাঁটা দিয়ে টেনে টেনে বের করো। ইঁদুরের ডাইনিংরুম। শালপাতার ঠোঙা, পাউরুটির খোল, ডাঁটার ছিবড়ে, মাছের কাঁটা, যখন যা পেরেছে, টেনে টেনে নিয়ে গেছে। ভোজের পর বিয়েবাড়ির বাইরের আঁস্তাকুড়ের অবস্থা। তকতকে পরিষ্কার চাই। মনে রাখবে, ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস। দেয়াল আর আলমারির মাঝখানের অংশ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাঘা বাঘা এক্সপ্লোরারদেরও অজানা, ডার্কেস্ট আফ্রিকা। মানচিত্রে স্থান নেই। ঝুল, মাকড়সা, আরশোলা। ড্রাকুলা, এমনকী ভ্যাম্পায়ার বেরোলেও অবাক হবার কিছু নেই।

সব শেষ, ভেতর। মাল নামাও, ঝাড়ো, আবার মাল তোলো। ওঠ বোস। বোস ওঠ। তখনই ভাবনা আসে, সংসার এক বিচিত্র পুতুলখেলা। কিছু বই, কিছু বাক্সপ্যাঁটরা, কৌটোকাওটা, ন্যাকড়াচোপড়া, গোটাকতক শাল, আলোয়ান, জাম্পার, মাফলার, পুলওভার। সব নিয়ে ন্যাজেগোবরে। একবার এদিকে রাখছে, ওদিকে রাখছে। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া, হুঁয়া কা মাল হিঁয়া। তালা, চাবি, হিসেবের খাতা, ক্যাশবাক্স। রাবিশের হিসেব সামলাতে চুল পড়ে মাথায় মসৃণ টাক।

ভব পান্থবাসে এসে
কেঁদে কেঁদে হেসে হেসে
ভুগে ভুগে কেশে কেশে
দেশে দেশে ভেসে ভেসে

জীবনটা যে এত হিসেবের, আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না। সবসময়েই যেন যুদ্ধ চলেছে। একটু তালে ভুল হলেই ছিটকে চলে গেলে। আর ফেরার পথ নেই। শুধু এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো।

কোথায়? আর কোনও জবাব নেই। থাকলেও, খুব হেঁয়ালির উত্তর। কেন? জীবনের লক্ষ্যে। কে যে কীসের লক্ষ্যে পৌঁছোচ্ছে! সবাই যেন সুকুমার রায়ের সেই লড়াই-খ্যাপা। কখনও যায় সামনে তেড়ে, কখনও যায় পাছে। উৎসাহেতে গরম হয়ে তিড়িং বিড়িং নাচে। মাতামহের কাছ থেকে পিতাঠাকুর একটি কথা শিখেছেন, ভোগ একপ্রকার রোগ বিশেষ। উঠতে বসতে এখন সেই নয়া বিধানের প্রয়োগ। ওই এক ব্রহ্মাস্ত্রে সব চাওয়া-পাওয়া ওঠা-বসা খারিজ।

কেউ এসে বললেন, আহা ছেলেটার শরীর বড় খারাপ, একটু মেটের ঝোল, সঙ্গে একটি গুর্দা দিতে পারলে গত্তি লাগত। সঙ্গে সঙ্গে খারিজ, ভোগ একপ্রকার রোগ বিশেষ। একটা করে নরম পাকের শাঁখ সন্দেশ? সঙ্গে সঙ্গে সেই এক খারিজ মন্ত্র। এর ওপর কোথা থেকে পাড়ায় এক মেনিদা নামক ভদ্রলোক এসেছেন! এসব মানুষের খবর পিতার বীর ভাণ্ডারে আসবেই। তিনি দশমাইল পথ হেঁটে অফিসে যান, হেঁটে ফিরে আসেন। অভাব নয়, স্বভাব। সব অসুখই তাঁর প্রাকৃতিক চিকিৎসায় সারে। সর্দি-জ্বর! নাসে, মাসে, বাসে। তিনি প্রথম দুটি রেখে মাঝের মাংস দাওয়াইটি বাতিল করে দিয়েছেন। এ বেলা একটু সরষের তেল দু'নাকে সাঁ করে টেনে নাও, মেরে দাও এক গেলাস জল। ও বেলাও তাই। নাস আর উপবাস। তারপর ছোট্ট একটি গালাগাল সহ উপসংহার, সর্দিজ্বরের বাবা সারবে শালা। পেটের গোলমাল? তলপেটে মৃত্তিকার প্রলেপ। প্রথমে উলঙ্গ। দ্বিতীয় ধাপে, মাটি ফাইন করে মেড়ে সেরটাক তলপেটে চাপিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকো। শুকোতে শুকোতে একসময় ঝরতে থাকবে। পেটে তিনবার চাঁটি মেরে উঠে পড়ো। এই সর্বনেশে মানুষটি আমার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছেন। চেহারা শুষ্কং কাষ্ঠং। মানুষের পক্ষে এর চেয়ে রোগা হওয়া সম্ভব নয়। এই বস্তুটির সঙ্গে একজন স্ত্রীজাতি আছেন। তাঁর তৈরি প্রায় আধ ডজনের মতো ভবিষ্যতের স্ত্রী-পুং মেনি আছে। আমার বন্ধু সুখেন একটু অকালে পেকেছে। নরনারীর যৌন জীবন নিয়ে তার নিত্যনতুন আলোকপাতে আমরা সময় সময় বেসামাল হয়ে পড়ি। সে বলে পুং মেনি আর স্ত্রী মেনির ঘর্ষণে রাতে ওঁদের উত্তরের ঘরে আগুন জ্বলে। কাঠে কাঠে ঘষা লাগলে কী হয় রে ব্যাটা? দুটোই তো চকমকি? ডজন কমপ্লিট করে রিটায়ার করবে। সে যাই হোক। কে কী করবে, তা নিয়ে সুখেনের মাথাব্যথা থাকলেও আমার নেই। সেদিন গভীর রাতে মেনিদা বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের জানলার গরাদে হাত আলুলায়িত করে মিসেস মেনিকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করছেন। গলা প্রেমরসে টসটসে। ঘুমচোখে স্বামীর মুখ দেখে স্ত্রী বুবু করে অজ্ঞান। মুখে গ্যাঁজলা। ছোট্ট পাড়া। তা ছাড়া যে-পাড়ায় সুখেনের মতো প্রতিভা, সে পাড়ায় এমন একটা ঘটনা, কাগজে ছাপা না হলেও, ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় না।

এই ক'দিন একটু বিশ্রাম পাওয়া গেল। শরীর ঢকঢকে হয়ে আছে। সবসময় ঘুম পাচ্ছে। মনের দেয়ালে আরাম হারাম হায় বাণীটি সবসময় ঝোলানো থাকলেও, শুলে উঠতে ইচ্ছে করে না, বসলে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। বেশ ঘুমঘুম চোখে, হাই তুলে তুলে দিন কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আকাশ, গাছের পাতা, পাখি, রাস্তায় মানুষের স্রোত দেখে দেখে ক্রমশই দার্শনিক হয়ে উঠছি। আমি চাই না মাগো রাজা হতে। উঠতে গেলে হাত পা কাঁপে। বেশ আছি মা এলিয়ে বসে!

দোতলার বারান্দা। জানলার কাছে বেঞ্চ পাতা। দেয়ালে পিঠ। ঠ্যাং দুটো সোজা ছড়ানো। পায়ের পাতার ওপর পাতা। বাঁ পাশে টেবিল। টেবিলের ওপর বাঁ হাত আলগোছা ঝুলছে। এক বিঘত দূরে একটি বই, রজেটস থেসারস। একটি ইংরেজি কাগজ। কর্মখালির বিজ্ঞাপনের পাতায় এখানে-ওখানে লাল পেনসিলের

ঢ্যাঁড়া মারা। কর্মস্থলে যাবার আগে দুটি নির্দেশ আমার জন্যে রেখে গেছেন। থেসারস মুখস্থ করে যাও। ওই বিদ্যেটি তো ভালই জানা আছে। অঙ্কের মগজ থাক আর না-থাক। ইংরেজিটা যদি ভাল করে রপ্ত করতে পারো, তা হলে কোনওমতে দু'বেলা দুটো অন্ন হয়তো জুটবে। পিতার হোটেল চিরকাল ভোলা থাকবে না রে দামড়া। দ্বিতীয় নির্দেশ, ঢ্যাঁড়া-মারা জায়গায় চিঠি ছেড়ে যাও। বলা যায় না লাগলেও লেগে যেতে পারে। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো ভাই, মিলিলেও মিলিতে পারে পরশপাথর। দুটো কাজই বেশি এগোয়নি। আকাশে মেঘের ফর্মেশনে হিমালয়। শরীরে তাগত এলেই, একদিন উড়বে সাধের ময়না। মাটির চেয়ে আকাশ কত উদার! এখানে কচু, ঘেঁচু, মুলো, ময়লা, আবর্জনা, গোঁফ, দাড়ি, ঘামের গন্ধ, তিরস্কার। ওপরে, ট্রপোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার, ইথার, ওজোন, মেঘ, পাখি, মহাওঙ্কারধ্বনি। নীচে ভাগাভাগি, মারামারি, পাঁচিল তোলাতুলি, পার্টিশন, ডিক্রি। অস্থির পঞ্চম অবস্থা।

রাস্তার দিকেই চোখ ছিল। একটা গাড়ি আসছে। আমাদের বাড়ির সামনেই থামল। এই ভূতমহলে, অসময়ে, বিনা নোটিশে কার আগমন রে বাবা! দরজা খুলে সামনের আসন থেকে যিনি নামলেন, তাঁর চেহারা ডবলডিমের ওমলেটের মতো। সাদা জিনের প্যান্ট, হাফহাতা সাদা জামা, মাথায় একটা শোলার টুপি। মুখ দেখা যাচ্ছে না। সামনে ভুঁড়ি ঠেলে আছে আধ হাত। জল-ভবা বেলুনের মতো থিরিথিরি নাচছে। বাড়ির ঠিকানা দেখে হুংকার ছাড়লেন, হ্যাঁ, এই তো সাতান্ন নম্বর। ঠিক এসেছি। নেমে আয়।

নেমে আয় বলামাত্রই আমি পা গুটিয়ে নিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। কে নামে, কে নামে! পেছনের আসন থেকে একটা পা ঝুলে পড়ল। সুন্দর মনোহর লেডিজ স্লিপার। ফুলফুল শাড়ির প্রান্ত। সর্বনাশ! মহিলা। একজন নয়, ওয়ান আফটার এনাদার, দু'জন। বুড়ি নয়, যুবতী। খেল খতম, পয়সা হজম। নির্জন বাড়িতে বেঞ্চে বসে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হবার বারোটা বেজে গেল। বুকের মধ্যে ভয় হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে। কী করে সামলাব এই অপ্সরাদের। জিভ উলটে টাগরায় গিয়ে ঠেকেছে। মেয়ে দেখলেই আমি অবশ হয়ে পড়ি। খাটের তলায় কি জালার কোণে ঢুকে লুকোতে ইচ্ছে করে। আমি তো সুখেন নই।

সদরের কড়া নড়ে উঠল। মাথায় টুপি থাকায় ভদ্রলোক আমাকে দেখতে পাননি। টুপির কার্নিসে দৃষ্টি ঠোক্কর খেয়েছে। মেয়েদুটি ওপরে চোখ ঘুরিয়েই আমাকে দেখে ফেলেছে। আমার ছাগলদাড়ি, শীর্ণ ঘোড়ার মতো মুখ, দুটো ড্যাবা ড্যাবা নির্বোধের মতো চোখ, বকের মতো গলা। এমন ভজুয়া-মার্কা চেহারা আর দুটি নেই।

সদর খুলে সামনে দাঁড়াতে হল। ভদ্রলোক টুপি খুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি? হরিবাবুর ছেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাবা কোথায়?

অফিসে।

জানতে আমরা আসব?

আজ্ঞে না।

একটা চিঠি পাওনি তোমরা?

না তো!

তা হলে জানো না আমরা কে?

আজ্ঞে না।

না জানাই স্বাভাবিক।

চৌকাঠের এপারে আমাকে সাসপেন্সে রেখে ভদ্রলোক ড্রাইভার আর মেয়েদের বললেন, এই সামান উতারো। মেয়ে দুটির নজর আর আমার ওপর নেই। একবারই চোখে চোখে ঠোকাঠুকি হয়েছিল। এমন কিছু দর্শনীয় বস্তু নয়। অনেকটা রামছাগলের মতো। চারটের বদলে দুটো কেঠো কেঠো লিকলিকে পা। বরং বাড়িটা দর্শনীয়। নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু-কে চোখ উলটে বললে, দেখেছিস মুকু, বাড়িটা কী ভীষণ পুরনো। ঘাড়ে ভেঙে পড়বে না তো!

যাক, একজনের নাম জানা গেল মুকু। পরক্ষণেই জানা গেল আর একজনের নাম, কনক। ভদ্রলোক ভেতরে থেকে একটা সুটকেস বের করে বললেন, দাঁড়িয়ে থেকো না কনক। সাহায্য করো, সাহায্য করো।

মুকু ছোট, কনক বড়। মুকু খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বললে, দিদি, এ যেন স্বর্গের সিঁড়ি রে। দু'জনেরই হাতে মালপত্র। আমার ভাগে পড়েছে সুন্দর একটি বেতের বাস্কেট। জীবনে এমন বস্তু দেখিনি, দেখবও না। সর্ব অঙ্গে কারুকাজ। পিতার ভাষায় বলতে হয়, আহা, একটা ওয়ার্ক অফ আর্ট। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে, মন খারাপ করে ঘণ্টাখানেক বসে থাকো। অনুশোচনায় অন্তর্শুদ্ধি হয়।

দোতলার বারান্দায় মালপত্তর এসে জমল। বেশি কিছু না, গোটা তিনেক সুটকেস, একটা বেডরোল, বিশাল একটা স্টিল ট্রাঙ্ক। ওপরে আনতে ভদ্রলোক আর গাড়ির ড্রাইভার হিমশিম খেয়ে গেলেন। রিয়েল মাল যদি কিছু থাকে তো ওর মধ্যেই আছে। আরও গোটা দুই বেতের বাস্কেট আর হাতব্যাগ। দুই বোন, একবার এদিকে ফিরছে, একবার ওদিকে ঝুঁকছে। একবার এটা তুলছে, ওটা নামাচ্ছে। চুলের বেণি চাবুকের মতো, গোরুর ন্যাজের মতো সপাসপ ডাইনে বাঁয়ে দোল খাচ্ছে। কথায় বলে, আহা, তিনি যেন ঘর আলো করে বসে আছেন! সত্যিই তাই। দুই বোন যেখানে যাচ্ছে, যেদিকে ছুটছে সেই দিকটাই আলো হয়ে যাচ্ছে। অমাবস্যা আর পূর্ণিমার একই সঙ্গে আবির্ভাব। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের হাত ধরে দুই ফুটফুটানন্দ। এখন বেশ গলা ছেড়েই গাওয়া যায়, আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো কে দেখবি আয়।

অস্পষ্ট একটা পরিচয় পাওয়া গেল। মেজ জ্যাঠাইমার বোনের স্বামী। বহুকাল আগে একবার এসেছিলেন। থাকতেন রেঙ্গুনে। আইনজীবী ছিলেন। তখন আমাদের সংসার জমজমাট। সুন্দরী সুন্দরী বউ। পিসিমাদের আসাযাওয়া। অতিথি অভ্যাগত। গানবাজনা। পায়ে পায়ে ঘুরছে সাদা সাদা কাবলি বেড়াল। হাজার টাকার ঝাড়বাতি জ্বলছে। বাড়িটাও তখন এত জরাজীর্ণ হয়ে যায়নি। তারপর অদৃশ্য মৃত্যু এল কালো ওড়না গায়ে দিয়ে। আমরা তখন গভীর ঘুমে। ফুঁ দিয়ে একটি একটি করে বাতি নিবিয়ে দিয়ে গেল। সব মৃত্যুই শেষ রাতে। অদ্ভুত অদৃষ্ট লিপি। অসুখ, মৃত্যু, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা বোঝার মতো বড় তখনও হইনি। খুব ছোট গাছ। ঝড় বইছে ওপরে। ডালপালা নড়ছে। শব্দ শুনছি। গায়ে লাগছে না। ভোরে উঠে দেখি দীপ নিবে গেছে। ফিকে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। যে ছিল সে আর নেই। শূন্য ঘর। শূন্য শয্যা। এ কেমন যাওয়া! কেউ তেমন সহজ করে বলতেই পারে না। কেন যাওয়া, কেনই বা তবে আসা। শিশুকে বোঝানো হত, তিনি গেছেন, দূরে,

আসবেন, তবে দেরি হবে। এই নাও, তোমার ছবির বই, খেলনা, এয়ারগান। ভুলে যাও, ভুলে থাকো। মেতে থাকো। সংসারে অনেক কাজ, অনেক আশা। খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে খোলা ছাদে। রাতে যার মাথার ওপর থমকে থাকে তারা-চমকানো আকাশ। সেই সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে সন্ধেবেলা রোজই গা ছমছম করে উঠত। মনে হত আজও সে আসবে নাকি! ভোরে উঠে দেখব আমাদের আর একজন কেউ নেই। সেই চলে যাওয়া আর ফিরে না-আসার অভিমান মনের সুরটাই চিরকালের জন্যে এমনভাবে বেঁধে দিয়ে গেছে, এখনও ঠোঁট ফোলে। মনে হয় তাঁরা আছেন যাঁরা নেই। নির্জন দুপুরে এ বয়েসের সংলাপ:

যারা ছিল একদিন; কথা দিয়ে, চলে গেছে যারা;
যাদের আগমবার্তা মিছে বলে বুঝেছি নিশ্চয়;
স্বয়ম্ভু সংগীতে আজ তাদের চপল পরিচয়
আকস্মিক দুরাশায় থেকে থেকে করিবে ইশারা॥

কিছুই তো মনে নেই সেদিনের কথা। শীতের সকালে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। অস্বচ্ছ পরদার আড়ালে পড়ে আছে জীবনের ফেলে আসা দিন। কে হাত ধরেছিল; কে কোলে নিয়েছিল, কে চুমু খেয়েছিল আদর করে! সবই অস্পষ্ট, ভাসা ভাসা। কল্পনা করা যায়, জোর করে কিছু বলা যায় না। আজ জ্যাঠাইমাও নেই, জ্যাঠামশাইও নেই। কিছু আগে পরে দু'জনেই চলে গেছেন।

টেবিলের ওপর টুপি নামিয়ে রেখেছেন। মাথার চুলে কমান্ডার কাট। চোখদুটো মাংসর চাপে ছোট ছোট। মুখ গোলাকার। দুটি চিবুক তৈরি হয়েছে। বেল্টের চাপে পেট ফাটোফাটো। মানুষের মন কত খারাপ দিকে ছোটে! হঠাৎ মনে হল, এইরকম ভদ্রলোকের কেমন করে এমন সুন্দর দুটি মেয়ে হল? অবাক কাণ্ড! জন্ম-রহস্যটা যদি জানা যেত! মনকে এক ধমক, ব্যাটা! পড়াশোনা চুলোয় গেল, যা জানলে কাজ হয় তা জানা হল না। জন্ম-রহস্য!

দু'পাশে দুটো পা ছড়িয়ে ভদ্রলোক বসেছেন। মাথার চুলে কুচুর কুচুর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আমি তা হলে গিয়ে তোমার মেসো হলুম।

যা হয় একটা কিছু হলেই হল। একটা ব্যাপার লক্ষ করে বেশ অবাক হচ্ছি। সেটা হল আমার শরীর। এতক্ষণের দুর্বলতা, কিছু না করার ইচ্ছে, আলস্য, সব হাওয়া। শরীরে যেন বেশ বল এসে গেছে। কামিনী আর কাঞ্চন, এর চেয়ে ভাল টনিক আর কী আছে! আমার কথা নয়, নির্মল পাগলার। খুব জ্ঞানী মানুষ। গোটাকতক বিষয়ে এম এ। সব ক'টাতেই ফার্স্টক্লাস। পড়ে পড়ে পাগল। জমিদারের ছেলে। নেই নেই করে এখনও বেশ আছে। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে থাকেন। মালকোঁচা মারা ধুতি। শার্টের ওপর গেঞ্জি। ধুতির ওপর আন্ডারওয়ার। লোকে যা করে তিনি তার উলটোটাই করবেন। নির্মলদার গল্প, বাহাত্তর বছরের বুড়ো, খাবিখাওয়া অবস্থা। উঠোনে কেত্তন-পার্টি রেডি। খোলের ওপর হাত নিসপিস করছে। বুড়ি ঘর থেকে কেঁদে উঠলেই কপাক কপাক করে খোল বেজে উঠবে। বুড়োর চোখ গেল দরজার দিকে। রকে বসে মানদা বাসন মাজছে কোমর দুলিয়ে। বেশ ডাঁশা যৌবন। বুড়ো থপাক করে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল। আরে করো কী করো কী?

বড় অশ্লীল!

নির্মলদা বলবেন, চপ শালা। সারা পৃথিবীতে মানুষের শরীরে মাদল বাজছে। কামের জন্যেই come. পুড়ে ছাই হলে তবেই calm, ওসব সাধুগিরি আমার কাছে ফলাতে আসিসনি। নির্মলদার রণহুংকার:

I storm and I roar, and I fall in a rage,
and, missing my whore, I bugger my page.

কী জানি বাবা, কীসে কী হয়। আমার এই ভাবনা পিতাঠাকুর কোনওক্রমে জানতে পারলে হতাশায় আত্মহত্যা করবেন। উঃ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে! কেন যে ছেলেরা পিতার হাতছাড়া হয়ে যায়! বড় ভাবনার কথা!

একটু গরম জল হলে...মেসোমশাই কিন্তু কিন্তু গলায় বললেন।

চা? আমার প্রশ্ন! একটু চা করে এঁদের সেবা করতে পারলে ভাবব, তবু একটা কাজের কাজ হল।

না, চা আমরা কেউই খাই না। তোমার নামটা কী বাবা? ভুলে গেছি, অনেকদিন আগে একবারই তো এসেছিলুম, তখন তুমি এতটুকু।

আমার নাম পিন্টু। গরম জল কী করবেন?

স্নান করতে হবে। নতুন জায়গা, ঠান্ডা জল গায়ে ঢালতে চাই না।

খুবই চিন্তার কথা। প্রাইমাস স্টোভে চায়ের জল গরম হতে পারে, তিনজনের স্নানের জল গরম করতে হলে উনুন ধরাতে হবে। সে এক ভয়ংকর ব্যাপার।

একটু বসুন তা হলে, উনুন ধরাই।

তুমি ধরাবে কেন? কনক! মেয়েকে ডাকলেন।

দু'বোন কিছু দূরে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। কীভাবে কী করবে বুঝতেই পারছিল না। শূন্য বাড়ি। কোনও মহিলা নেই। প্রায় ধর্মশালার মতোই।

আসি, বলে কনক জানলার ধার থেকে সরে এল।

তুমি সব দেখেশুনে নাও। তোমাদের দু'বোনকেই সব করতে হবে বাপু। আসার পথে বাজার দেখে এলুম, আমি কিছু কেনাকাটা করে নিয়ে আসি।

সবই বাড়িতে আছে। আপনাকে আর বাজারে যেতে হবে না। ডিম আছে, তরিতরকারি আছে, চাল, ডাল সব আছে।

তা হলেও!

তা হলে আবার কী?

বেশ, যা আছে তাইতেই হোক। তোমার বাবা আসুন, তারপর যা-হয় হবে। কনক, তুমি ওদিক সামলাও, মুকু, তুমি এদিকে সব খুলেটুলে ফেলো। আগে স্নান, তারপর কাপড়টাপড় ছেড়ে রান্না। সামান্য কিছু করলেই হবে। বেশি বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

আমাদের রান্নাঘর আর এক মহলে। দুটি মহল বারান্দা দিয়ে জোড়া। বারান্দার বাঁক ঘুরতে ঘুরতে কনক বললে, বাঃ, তোমাদের বাড়ির এদিকটা তো ভারী সুন্দর। ওদিকটা শহর, এদিকটা গ্রাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ, গাছপালা রয়েছে তো। একটু এগোলেই গঙ্গা।

আমাকে অত ভক্তি করে আজ্ঞে বলতে হবে না। আমি তোমার দিদি নই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবার সেই আজ্ঞে?

কী করি বলুন, কীরকম একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

আবার বলুন! আমার সঙ্গে খবরদার আপনি আজ্ঞে করবে না। নীচেটায় পাতকো বুঝি? বারান্দার ভাঙা রেলিং ধরে সামান্য ঝুঁকতেই আ-হা আ-হা করে হাতের ওপরদিকটা ধরে আমি টেনে নিলুম, ভাঙা, ভাঙা, পড়ে যেতে পারেন।

কোথায় ভাঙা?

এই যে রেলিং। সারা বাড়িটাই তো ভেঙেচুরে খলখলে।

একটু সারাওটারাও না কেন? এমন সুন্দর বাড়ি! কত বড় বলো তো।

টুকটাক সারাই বাবা নিজের হাতেই করেন। বিরাট ব্যাপার তো, একা ঠিক সামলাতে পারেন না। আর আমি তো একটা অপদার্থ।

তুমি কী করবে? মিস্ত্রি লাগালেই তো হয়!

বাবা বলেন, সেলফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ।

পিতাঠাকুর রান্নাঘরটিকে সকালেই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখে গেছেন। কথায় কথায় বলেন, এ হল পুরুষের কিচেন, মেয়েদের হেঁশেল নয়। আঁস্তাকুড় আর আঁতুড় এই হল বাঙালির দুই বৈশিষ্ট্য। রান্নাঘরের সামনে বারান্দা পুব দিকে কিছু প্রশস্ত। সেই অংশে গুছিয়ে রাখা কয়লা আর ঘুঁটে। ওই যে নীচের বাগানে পড়ে আছে কয়লার রঙে কালো একটি পাথর, পাশেই সদ্যোজাত সন্তানের মতো গড়াগড়ি যাচ্ছে একটি হামানদিস্তের হাতল। কয়লা আগে ওইখানে আসবে। ঘন্টাখানেকের পরিশ্রমে টুকরো টুকরো হয়ে, ভারে ভারে ওপরে উঠবে।

কনক বললে, বাঃ ভারী পরিষ্কার তো! কে এমন সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে? তুমি?

না, ফাদার।

বাব্বাঃ, মেয়েছেলেও হার মেনে যাবে!

মনে মনে ভাবলুম মেয়েছেলে? মেয়েছেলে সম্পর্কে পিতার ধারণার কথা জানলে মেয়েছেলে হয়ে জন্মাবার সাধ চিরকালের মতো ঘুচে যাবে।

আমি তা হলে লেগে পড়ি, কী বলো?

শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে কনক কয়লার গাদার সামনে উবু হয়ে বসল। শাড়িটা মনে হয় বেশ দামি। কয়লার গুঁড়োয় ময়লা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ কার্যটি তো রোজ সকালে আমাকেই করতে হয়। আমিই কেন

হাত লাগাই না! এর নামই বোধহয় দুর্বলতা! কোনও গুঁফো লোক যদি এই মুহূর্তে কয়লার গাদায় বসতেন আমার মন কি এমন আকুলি-বিকুলি করত!

সরুন, আমি উনুন সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিই।

কেন?

শাড়িতে কালি লেগে যাবে যে!

বাঃ, লজ্জা তো বেশ কেটে এসেছে! জিভ তো আর তেমন জড়িয়ে যাচ্ছে না। কেমন মিঠি মিঠি বাত বেরোচ্ছে! এর নামই কি অ্যাটাচমেন্ট! পিতা যেমন মাঝেমধ্যে জগৎ-সংসারের দিকে তাকিয়ে হুংকার ছাড়েন, ছায়া, মায়া, কায়া।

কয়লা তোলার, নিয়ে যাবার অনেক সাজসরঞ্জাম আছে। পিতার উদ্ভাবন। হাত না ঠেকালেও চলে। যেমন মিনি বেলচা। ছোট বালতি। কয়লার গাদায় বেলচা চালাতেই এঁকেবেঁকে কিলিবিলি করে লাল মতো যে প্রাণীটি বেরিয়ে এল, সেটি একটি মধ্যম মাপের দাঁড়াটাড়াঅলা তেঁতুলে বিছে। গেঁটে গেঁটে শরীর।

মা গো, বলে কনক স্প্রিং-এর ইঁদুরের মতো লাফিয়ে সরে গেল। আমার তো তেমন সাহস নেই। ভিতুই বলা চলে। কনকের শরীরের আড়াল থেকে সেই রসহীন শুষ্ক প্রাণীটিকে একবার দেখে নিলুম। চালচলন আমার মতোই উদ্দেশ্যহীন। নিতান্ত ভীরু ব্যক্তিও বাহবার লোভে বড় কাজ করে ফেলে। আমার উক্তি নয়, স্বামী বিবেকানন্দের। ভাগ্যিস পা দিয়ে থেঁতো করার চেষ্টা করিনি। বেলচা দিয়ে এক ঘা লাগাতেই তিনি কেতরে কেতরে আবার কয়লার গাদায় গিয়ে ঢুকলেন।

কনক বললে, এইবার কী হবে?

বীরের উক্তি, কী আবার হবে? পাশ থেকে কয়লা নিয়ে উনুন ধরাব।

যদি কামড়ায়?

ওষুধ আছে। কেরোসিন তেলে কয়লা ঘষে লাগিয়ে দোব। কিছুক্ষণ জ্বলবে, তারপর সব ঠান্ডা।

তোমাদের বাড়িতে আর কী কী আছে?

আর এক রকম বিছে আছে, তার নাম কাঁকড়া বিছে। নীচের বাগানে গোটাকতক পোষা সাপ আছে। বড় বড় পাঞ্জামাপের মাকড়সা আছে। টনখানেক আরশোলা আছে। ইঁদুর আর ছুঁচোর অভাব নেই। সন্ধেবেলা বেশ বড় সাইজের একটা চামচিকি বেড়াতে আসে। মাঝরাতে চিলেকোঠায় বসে ডাকে একজোড়া প্যাঁচা।

মহীশূরের টানাটানা চোখ, পাঞ্জাবের খাড়া নাক আর কুলু আপেলের রঙে রাঙানো গাল নিয়ে কনক অবাক হয়ে চেয়ে রইল। নাকের ডগায় ছাঁট-হিরে ঘাম।

Nothing begins and nothing ends

উনুনে আগুন পড়েছে। ধোঁয়া বের করার একটা কেরামতি আমার পিতাঠাকুরের উদ্‌ভাবনী মাথা থেকে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর, ডিসপোজালে এখানে-ওখানে নানারকমের জিনিস বিক্রি হত। সেই পড়তি মালের আড়ত থেকে হরেকরকমের জিনিস কেনার একটা নেশা চেপে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন। অনেক কিছুই এসেছিল, কাজেও লেগেছিল। সবচেয়ে কাজে লেগেছে জাহাজের একটা চিমনি। ঠ্যালাগাড়িতে লোড হয়ে সেই বস্তু যখন পাড়ায় ঢুকল, হাতি দেখার মতো ভিড় জমে গেল। কী তার বাহার! কালোর ওপর লালের ডোরা। ঠ্যালায় চেপে চিমনি চলেছে, পেছন পেছন চলেছে একপাল কুচোকাচা। হইহই ব্যাপার।

প্রতিবেশী রকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আজ দেখছি পেল্লায় জিনিস পেয়ে গেছ হরিশঙ্কর! ওটা কী?

দেখতেই পাচ্ছেন, জাহাজের চিমনি।

এবার তা হলে একটি মাস্তুল জোগাড় করে চাঁদ সদাগরের মতো ভেসে পড়ো জলে।

মিস্ত্রিকে হুকুম হল, ফিট করো রান্নাঘরের ছাদে। দেখেই তার চক্ষুস্থির। ছাদ এ লোড নিতে পারবে না বাবু। ঘর নেমে আসবে। তুমি লোডের কী বোঝো হে। যা বলছি তাই করো, রোজ বুঝে নিয়ে সরে পড়ো। মিস্ত্রি বললে, এর ফাঁদটা একবার দেখেছেন বাবু? ছাদের অতটা খাবলে তুলে নিলে, ছাদের আর থাকে কী? সবটাই তো চিমনি হয়ে গেল। বর্ষায় তো বান ডাকবে ঘরে। তা ঠিক, বলে ভাবতে বসলেন। চিমনি কিছুদিন পড়ে রইল আড় হয়ে। একজোড়া দোয়েল এসে সংসার পেতে বসল। বাচ্চাকাচ্চাও হল গুটিকয়েক। সকাল সন্ধেয় খুব গান শোনা গেল বছর খানেক। অবশেষে সেই চিমনি ছাঁটকাটে সরু হয়ে দেয়াল ফুঁড়ে সোজা উঠে গেল আকাশে। আস্ত একটা পাঁঠাকে কাবাব বানানো যায় এমন একটি কড়া উপুড় হল উনুনের মুখে। কড়া যেদিন এল সেদিনও প্রতিবেশী বললেন, যাক, এতদিনে তা হলে পেলে। এইবার চিমনি ফিট করে ভেসে পড়ো সাত সমুদ্রের জলে।

চিমনি দিয়ে যেদিন ভলকে ভলকে ধোঁয়া উঠল আকাশে, সেদিন কী আনন্দ! জমিদারবাবু যেন পায়রা ওড়াচ্ছেন! ব্র্যাভো, ব্র্যাভো, হোয়াট এ গ্র্যান্ড সাকসেস! প্রতিবেশীরা দেখতে এলেন জনে জনে। একটা কল বানিয়েছ বটে হরিশঙ্কর, তোমার মাথা আছে! ব্যান্ডেজ করা ডান হাত তুলে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর জানাচ্ছেন আহত হরিশঙ্কর হাসিমুখে। চিমনি ছাদে ওঠার আগে মোক্ষম একটি লাথি ঝেড়ে গেছে পিতার ডান হাতে।

সেই কড়া এখন আমাদের প্রায় কাত করে ফেলেছে। ভলভল করে ধোঁয়া উঠছে। কড়া বিদ্রোহ করে বসে আছে। টানা হ্যাঁচড়া চলেছে খুব। কনকের চুল ফুঁড়ে ধোঁয়া উঠছে। অবশেষে তিনি ঘাড়ে চাপলেন। চোখ লাল, জলে ভরা। কনক বলল, বাব্বাঃ, চোখে এখন সরষেফুল দেখছি।

কনকের চালচলন দেখে মনে হচ্ছে মনটা বেশ সাদা। খুব একটা অহংকার টহংকার আছে বলে মনে হয় না। সুখেনের থিয়োরিই ঠিক। যারা সুন্দর, তাদের সবকিছুই সুন্দর। বিপদ কটা-সুন্দরীদের নিয়ে। দেমাকে

মাটিতে পা পড়ে না। ঠোঁট সবসময় উলটেই আছে, আমার ভাই দুধটুধ ভাল লাগে না। মা যখন রাতে শোবার আগে দুধ নিয়ে সাধাসাধি করে আমার কান্না পায়। যাদের দুধ জোটে না, তারা বেশ আছে! সুখেন বলে, মেলামেশা করতেই যদি হয় তো সাতপুরুষে বড়লোকের সঙ্গে মিশতে পারিস, একপুরুষে দেখলেই সাত হাত দূরে ছিটকে পালাবি।

আঁচলে চোখ মুছে কনক বললে, এইবার তোমার কোথায় কী আছে দেখিয়ে দাও। বেশি ঝামেলার দরকার নেই। শরীর আর বইছে না গো! একটু শুতে পারলে ভাল হয়।

আমি একটু-আধটু রাঁধতে পারি। যদি আপত্তি না থাকে!

থাক আর রেঁধে দরকার নেই। তোমার কেরামতি পরে দেখা যাবে।

মাছ ছাড়া সবই আছে। সুব্যবস্থার শেষ নেই। ফর্দ করে বাজার হয়। তেল, নুন, মশলাপাতি সারা মাসের মতো মজুত। লেবেল-আঁটা ঝকঝকে টিনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাকে পাশাপাশি ক্যাটালগ মিলিয়ে অবস্থান করছে। লাইব্রেরির বইয়ের মতো। ঝালের দিকে ঝাল, মিষ্টির দিকে মিষ্টি। চিনি, মোটা, মাঝারি, মিহি দানার, ভেলি, কাশীর চিনি। লাইন দিয়ে চলেছে ডালের কৌটো। এমন মানুষকে দেখিয়েই লোকে বলে, বিয়ে হলে তোমার বউ বড় সুখে থাকবে হে। আর কী হবে! সবই তো শেষ হয়ে গেছে। মা তো আর ফিরে আসবে না। কনককে দেখে মনটা কেমন যেন করে উঠছে। স্বপ্নে পুরনো ঘটনা মানুষ দৃশ্য দেখা দিয়ে ভেসে চলে যায়। মায়ের চেহারা আমার মনে নেই। যাঁরা দেখেছেন তাঁদের বর্ণনা থেকে একটা সাদৃশ্য তৈরি হয়েছে কল্পনায়। আমার মা বোধহয় কনকের মতোই দেখতে ছিলেন। পাতলা পাতলা পায়ের চেটো, ছিপছিপে গড়ন, কোমর-ছাপানো চুল। আমি অবশ্য ভোলামামার মতো আমার মা এসেছেন, আমার মা এসেছেন বলে চিৎকার করব না। ভোলামামার এই পাড়াতেই বাস। মাছের ভেড়ি আছে। রোজ রাত বারোটার সময় মদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন। মামি রোজই ঝ্যাঁটাপেটা করেন। এক এক ঘা ঝ্যাঁটা পড়ছে পিঠে, মামা চিৎকার করছে, আমার মা এসেছে, মা। মায়েরা যেমন ছেলেকে মুখপোড়া বলে, মামিও তেমনি মামাকে মুখপোড়া বলেন, ঠিক ওই সময়টিতে। পাড়ার গিন্নিবান্নিরা সেই স্ত্রীলোকটিকে সোহাগ করে বলেন, আহা তোমার কী ভাগ্য মা, রোজই ঝেঁটিয়ে স্বামীকে ঘরে তুলতে হয়! তবে এই গ্রীষ্মের দুপুরে কোনও এক রমণীর চলনে বলনে অতীতের দিন ফিরে এসেছে মনে করে মন যদি সুখী হতে চায়, হোক না!

এই হল তোমার গিয়ে আলু। কনক হিসেব মেলাচ্ছে। পটল, কুমড়ো, ঢেঁড়স, ঝিঙে, করলা, বরবটি, পেঁপে, কাঁচকলা, মোচা, থোড়, কিছুই দেখছি বাকি নেই। ও বাবা, ডুমুরও রয়েছে দেখছি। তুমি কী খাবে?

আমার যে-খানা পাকানো আছে সে খানা দেখলে কনক ঘাবড়ে যাবে। যেমন তার বর্ণ, তেমনি তার গন্ধ।

আমার আছে রুগির ঝোল আর গলা ভাত। সবে পেটের অসুখ থেকে উঠেছি তো।

তা হলে আমিও ঝোল ভাত করে ছেড়ে দিই।

ডিম আছে।

না ডিম চলবে না গো। বাবার আবার অনেক বায়নাক্কা। ডিম খেলে মানুষের পেট গরম হয়। পেট গরম হলে মাথা গরম হয়। ডিম না খেয়ে বাবার মাথা যে কত ঠান্ডা হয়েছে দু’-এক দিনের মধ্যেই টের পাবে। যাক উনুন ধরতে ধরতে চানটা সেরে ফেলা যাক। তোমাদের চানের ঘর?

নীচে। চৌবাচ্চায় জল আছে। পাতকো থেকে টাটকা তুলেও নেওয়া যায়।

তা হলে আমিই আগে যাই।

মুকু বেড়াতে বেড়াতে এপাশে চলে এসেছে। এরই মধ্যে চুলটুল খুলে ফেলেছে। হাতে একটা চিরুনি। পেছনটা রুপো বাঁধানো। চুলের ডগা ধরে খেঁচাত খেঁচাত করে বারকতক আঁচড়ে বললে, বাড়িটা বেশ নির্জন, না রে দিদি?

জন্তুজানোয়ারও আছে। রাত আসুক দেখতে পাবি।

ওপাশ থেকে ডাক ভেসে এল, মুকু, মুকু, আমার সুটকেসের চাবি কোথায়, মুকু, আমার সুটকেসের চাবি কোথায়?

আসি, বলে মুকু চলে গেল। এরা দু'বোনই কেউ ডাকলে আসি বলে উত্তর দেয়। গলার স্বরও বেশ মিষ্টি।

আর কী কী ভাল ভাল জিনিস স্বভাবে লুকিয়ে আছে কে জানে? আমার পিতাঠাকুর প্রথমে মুগ্ধ হবেন, তারপর আমার স্বভাবের খুঁত বের করে, এই উৎকৃষ্ট উদাহরণের পাশে ফেলে আমাকে নীচে নামাতে নামাতে মনুষ্যাধম জন্তু বলে, তলায় একটি রেখা টেনে দেবেন।

পেছন মহল ছেড়ে বার মহলে এসে দেখা গেল এলাহি ব্যাপার। বিশাল ট্রাঙ্কের ডালা খোলা। তার মধ্যে শুধু বই আর বই। জামা, কাপড়, জুতো, ছাতা, লাঠি, চশমা, তোয়ালে, গামছা, ধরাশায়ী সৈনিকের মতো চারপাশে ছড়ানো। একটা সুটকেস মুখ ভার করে পড়ে আছে একপাশে। তার সামনে থেবড়ে বসে আছে মুকু।

মেসোমশাই হাঁটুতে চাপড় মারতে মারতে বললেন, তুমি আজকাল ভীষণ কেয়ারলেস হয়ে যাচ্ছ মুকু। আমার বেশ মনে আছে তোমাকে আমি চাবিটা দিয়েছি। দেবার সময় এ কথাও বলেছি, দেখো হারিয়ো না যেন।

মুকু খুব ধীর গলায় বললে, সব চাবিই ঠিক রইল, আর ওটাই হারিয়ে গেল?

এ কথার মানে? তার মানে তুমি বলতে চাইছ, আমি মিথ্যে কথা বলছি! তোমাকে না দিয়ে বলছি দিয়েছি। আমি তোমার চোখে এত হীন, এত নীচ! তা হলে তো আমার আর বেঁচে থাকা চলে না। আমার আত্মহত্যাই করা উচিত। তোমার মা ঠিকই বলে, মেয়েরা কখনও আপনার হয় না।

মুকুর মুখ চুন। কনক কিছু বলব বলব করেও বলার সাহস পাচ্ছে না। মেসোমশাই টেবিলের ওপর থেকে টুপিটা তুলে নিলেন। মনে হয় টুপি পরেই আত্মহত্যা করবেন। যেতে হলে সেজেগুজেই যাওয়া ভাল। আমাদের পাড়ার গবা গামছা পরে গলায় দড়ি দিয়েছিল। মহিলারা দেখতে ছুটলেন। ফিরে আসতে আসতে বললেন, মুখপোড়া ভারী অসভ্য। কুমুদবাবু ফুলশয্যার পোশাকে গলায় মালাটালা পরে কলকাতার ভাল হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে বিষ খেয়ে মারা গেলেন। নীল চিঠির কাগজে লিখে গেলেন, চিন্তামণি, আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো। ইতি, কুমুদের লাশ। কে এই রমণী! সবাই বললে, ফিল্মের হিরোইন।

টুপিটা তুলতেই কনক কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের গলায় বললে, ওই তো আপনার চাবি।

মেসোমশায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। রিঙে লাগানো ছোট দুটি চাবি। মুকু ফোঁস করল। কপাল ক্রমশ হাঁটুর দিকে ভাঙছে। পিঠ নুয়ে পড়ছে। ফুলে ফুলে উঠছে। মেসোমশাই বললেন, বয়েস বাড়ছে, বয়েস।

কিচ্ছু করার নেই। এজলাসে উঠে বাদী বিবাদী নাম ভুল হয়ে যায়। ছ'বার কোঁত পেড়ে আজকাল শিবস্তোত্র পড়তে হয়। বাতে ধরেছে। তবু কান্না! কনক, আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নাও। বলো, টু আর ইজ হিউম্যান, টু ফরগিভ ডিভাইন।

কনক মুকুর পিঠে হাত রেখে বললে, কী হচ্ছে কী? শুধু শুধু কাঁদছিস কেন?

দিদির কথায় ফল উলটো হল। মুকু হাপরের মতো ফুলতে লাগল আর সাপের মতো হিসহিস।

বাড়ি ভরে গেছে মেয়েলি জিনিসপত্রে। লম্বা লম্বা শাড়ি নেমে গেছে দোতলা থেকে একতলায়। তারে ঝুলছে সায়া, ব্লাউজ। বারান্দায় হিল-তোলা জুতো। চুল বাঁধার ফিতে, মাথার কাঁটা, সেফটিপিন, মাথায় মাখার তেল, সাবান। সারা বাড়িতে একটা মেয়েলি গন্ধ। জানি না বাবা, পিতাঠাকুর ফিরে এসে কী মূর্তি ধরবেন। একটা নয়, দু'-দুটো মেয়ে। ছোট হলে কথা ছিল না, বেশ বড়সড়। অতিথিরা খাওয়াদাওয়া সেরে দক্ষিণের ঘরে একটু কাত হয়েছেন। দীর্ঘ ট্রেনভ্রমণের ক্লান্তি কাবু করে ফেলেছে। মেসোমশাইয়ের নাক ডাকছে মিঠে সুরে। যতটুকু জানা গেল, এঁরা মাসখানেক থাকবেন। মুকু বি এ পরীক্ষা দেবে, কনকের হবে চিকিৎসা। টনসিলে বেচারা বড়ই ভুগছে। কনক বি এ পাশ করে বসে আছে। আরও পড়বে না বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে, এই নিয়ে দোটানা চলছে। পড়লে ফিলজফি নিয়ে এম এ করবে। অসম্ভব ভাল রাঁধে। এত সুন্দর ঝোল রেঁধেছিল, মুখে লেগে আছে এখনও। ওই সেই সংগীতের মতো। পিতা রান্নার থিয়োরি খুব ভালই জানেন, প্র্যাকটিক্যালে কনকের কাছে গোহারান হারবেন।

আমিও শুয়ে পড়েছি। আরাম হারাম হ্যায় নোটিশটি আপাতত উলটে রেখেছি মনের দেয়ালে। যেখানে শুয়ে আছি, সেখান থেকে কনক আর মুকুর পা দেখা যাচ্ছে। মেসোমশাইয়ের ভুঁড়িটি ওঠানামা করছে নিশ্বাসের তালে তালে। নির্জন দুপুরে আড় হয়ে শুয়ে শুয়ে যুবকের যুবতীর সুডৌল পদযুগল দর্শন সম্পর্কে শাস্ত্রের কী সাবধান বাণী আছে জানি না। চোখ যদি অনবরতই ওদিকে চলে যেতে চায় তা হলে আমি কী করতে পারি! বিল্বমঙ্গল হয়ে যাব? রে চক্ষু, এই কাঁটার খোঁচায় দিলুম তোর বারোটা বাজিয়ে। সে মনের জোর আমার নেই। বাঁ দিকের দেয়ালে ক্যালেন্ডারে কেষ্টঠাকুর বসে আছেন কদমতলায় নধর একটি গাভীর গলা জড়িয়ে। সেদিকে তাকাতে কী হয়! দ্বারকা মথুরা হয়ে সোজা কুরুক্ষেত্রে চলে যাও না কেন! সেখান থেকে ঠেলে ওঠো মহাপ্রস্থানের পথে। মন যার লোভী সে হবে সন্ন্যাসী! কুঁজোর চিত হয়ে শোবার শখ। একবার করে ক্যালেন্ডারের দিকে ঘাড় ঘোরাচ্ছি, ঘাড় অটোম্যাটিক ঘুরে যাচ্ছে উলটো দিকে। লাল মেঝের ওপর দিয়ে চিনি-লোভী পিঁপড়ের মতো দৃষ্টি গুটিগুটি গিয়ে ঠেকছে সঠিক স্থানে। পা। পা থেকেই কি পাপ শব্দ এসেছে। ভাষাতত্ত্ববিদরা বলতে পারেন। সায়ার সামান্য অংশ, শাড়ির পাড়। চিত্ত বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে। যে নিজেকেই নিজে সামলাতে পারে না, সে সামলাবে জগৎ! এই বড় বড় চোখে তাকিয়ে কামিনীকাঞ্চনাসক্ত তাবৎ মানবকুলকে স্তম্ভিত করে ফেলবে! দ্বিতীয় বিবেকানন্দ হয়ে পৃথিবী কাঁপাবে! কুলকুণ্ডলিনী জেগেছে ঠিকই তবে তিনি সহস্রারে না উঠে নীচের দিকে নেমে বসে আছেন। ভিমরুলের চাকে খোঁচা। এই তো গত পরশু দিনই পড়লুম, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন— কামিনীকাঞ্চন ভোগ। যে-ঘরে আচার, তেঁতুল আর জলের জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মুশকিল। আমি কি বিকারের রোগী! তিন দিন আগে আমাশার রোগী। আজ দেখছি বিকারের রোগী! মনের কোনও উন্নতি হয়নি। অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। আহা, ছি ছি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাজখাঁই গলায় সুখেন চিৎকার করছে, পিন্টু, পিন্টু। একটা গলা করেছে বটে। যেমন ষাঁড়ের মতো চেহারা, তেমনি গলা। স্কুলে পণ্ডিতমশাই সুখেনের নাম রেখেছিলেন, সুখেন ষণ্ড। দিবাস্বপ্ন চটকে গেল। মেসোমশাই ধড়ফড় করে উঠে বসে বললেন, কে, কে? উঠবেনই তো। গলা শুনে মরা মানুষও উঠে বসবে। জানলার ধারে গিয়ে বলছি, দাঁড়া দাঁড়া, মেসোমশাই আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মেঘগর্জনের সুরে বললেন, অসভ্যের মতো চেঁচাচ্ছ কেন, রাসকেল! মেরে মুখ ছিঁড়ে দোব। সুখেন কেমন যেন হয়ে গেল। এই ধরনের আকাশবাণীর জন্যে প্রস্তুত ছিল না! এ আবার কে রে বাবা! বোঝো ঠ্যালা! বাবারও যেমন বাবা থাকে, ষাঁড়ের ওপরেও ষাঁড় থাকে।

আমাকে প্রশ্ন করলেন, ছেলেটি কে? তোমার বন্ধু?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইডিয়েট।

কনক আর মুকু দু'জনেই উঠে এসেছে চোখ রগড়াতে রগড়াতে। পৃথিবীর সমস্ত পিতাই যেন ষড়যন্ত্র করে বসে আছেন। বজ্রের মতো কঠোর। দাদু না হওয়া পর্যন্ত কোমল হব না। স্রেফ চাবকে যাও। মেয়েদের এক ধমক লাগালেন, ওখানে কী, ওখানে। যাও ভেতরে যাও। জানোয়ার দেখোনি?

ধমক দিয়ে ভালই করেছেন। আমার সমর্থন আছে। সুখেনের সামনে সুন্দরীদের না বেরোনোই উচিত। যেমন করেই হোক সুখেন ভাব জমাবে। উভয়পক্ষ ক্রমশই জমাট হয়ে উঠবে। অন্য কেউ আর পাত্তা পাবে না।

সুখেন বলে, তোমরা যে যাই বলো, আমার জন্ম মেয়েদের জন্যেই। খেঁদিই হোক, বুঁচিই হোক, অপ্সরাই হোক, সব আমার। বেশ হয়েছে ব্যাটা। চেঁচা গাঁক গাঁক করে।

নীচে নেমে দরজা খুলতেই সুখেন বললে, লোকটা কে রে?

মেসোমশাই।

রাস্তায় দেখা হোক, একদিন পেছন থেকে কাছা খুলে দিয়ে পালাব।

খুলে দেখ না! জজসাহেব। ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন।

মেয়েদুটো কে রে? নিচু ফিসফিসে গলায় সুখেন জানতে চাইল।

মেসোমশাইয়ের মেয়ে।

সুখেন সামান্য দমে গেল। সুর পালটে বললে, জজসাহেবের মেজাজ এইরকম না হলে মানায় না। কত মারাত্মক মারাত্মক আসামিকে ফাঁসিতে লটকাতে হয় বল? চল, ওপরে চল, প্রণাম করে ক্ষমা চেয়ে নিই।

তুমি যাও ডালে ডালে। তোমাকে আমি চিনি না! মাতামহের গান, থেকে থেকে যেন মাগো লুচির গন্ধ পাই। আর একটু ভয় না দেখালে সুখেন ঠেলেঠুলে ওপরে উঠে পড়বে, তারপর ব্যাপার কোথায় গিয়ে ঠেকবে কে জানে? আকাশপ্রদীপ হয়ে বসে থাকবে। যেমন করেই হোক সুখেনকে ঠেকাতে হবে।

প্রণাম করার চেষ্টা আর কোরো না। ভীষণ রাগী মানুষ। আইনের কোন ধারায় ফেলে দেবেন জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। এই তো সকালে যখন এলেন, পেছন পেছন পুলিশের দুটো গাড়ি এল। এরই মধ্যে বড়

দারোগা তিন বার সেলাম বাজিয়ে গেলেন। এই রকে বোসো। এখন মাসখানেক তার এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষার চেষ্টা কোরো না।

সুখেন মন খারাপ করে রকে বসে পড়ল। বাইরে গ্রীষ্মের দাবদাহ। বেলা পড়ে এসেছে। পথে লম্বা লম্বা ছায়া। উত্তাপ কিন্তু এতটুকু কমেনি। ঢোকার গলিতে এই রকটি বেশ ঠান্ডা। ভেতর বাড়ি থেকে লম্বা একটা নর্দমা এই পথেই বাইরে চলে গেছে। একটু-আধটু গন্ধ নাকে এলেও গ্রীষ্মের দুপুর কাটাবার বড় ভাল জায়গা। বসে বসে প্রাণের কথা মনের কথা বলো নিশ্চিন্ত আরামে। সুখেন বললে, দেশলাইটা আন না একবার।

দেশলাই? তুই এখানে সিগারেট খাবি নাকি?

কেন, কী হয়েছে?

আমাকে বাড়িছাড়া করতে চাস? সিগারেটের গন্ধ ওপরে উঠবে, তারপর আমার কী হবে?

তুই দেখছি ভয়ে ভয়েই মরলি। মায়ের আঁচল-ধরা ছেলে দেখেছি, বাপের এমন কাছা-ধরা ছেলে দেখিনি! তোর ওই মেয়েলি মিনমিনে স্বভাবটা ছাড়। পৃথিবীটা অনেক অনেক বড়। পুরুষ হয়ে জন্মেছিস সবরকমের অভিজ্ঞতা না হলে পরে ওই বেচারার মতো পড়ে পড়ে মার খাবি সারাজীবন। তোর বাবাই তোর মাথাটি খেয়েছেন। মা-মরা ছেলে মা-মরা ছেলে বলে আগলে আগলে এমন একটি বস্তু তৈরি করেছেন, এরপর শাড়ি পরিয়ে কপালে টিপ এঁকে কারুর পুত্রবধূ করে সাত পাকে ঘুরিয়ে না দেন।

তোর মতো এঁচড়ে পেকে লাভ নেই।

তুমি আর এঁচড়টি নেই ভাই। মেঘে মেঘে মন্দ বেলা হয়নি। তুমি একটা খাজা কাঁঠাল। খবর পেয়েছি, বেশ সিঙ্কিং সিঙ্কিং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হচ্ছে।

তার মানে?

মানে? তুই আজকাল রেগুলার ওই পোড়ো মন্দিরটায় যাস কেন?

কোন পোড়ো মন্দির?

কিছুই যেন জানিস না, না? বিন্দুবালার শীতলাতলায়?

সাধন ভজন করতে।

এত দেবদেবী থাকতে মা শীতলা! কস্মিনকালে তুই কোনও শীতলাসিদ্ধ মহাপুরুষের নাম ইতিহাসে পেয়েছিস? কালী, তারা, শিব, দুর্গা, শোনা গেছে। তা, মা শীতলা তো সামনে বসে আছেন গাধার পিঠে, ঝাঁটা হাতে, তুমি ব্যাটা পেছন দিকে বিন্দুবালার দাওয়ায় গিয়ে ওঠো কেন? ওখানে তোমার কী মধু আছে?

কোনও মধুই নেই।

মারব ব্যাটা এক থাপ্পড়। ছায়া আর মায়ার নাম শুনেছিস?

বিন্দুবালার ভাইয়ের মেয়ে। কেন কী হয়েছে? কেউ কোথাও নেই তাই পিসির কাছে মানুষ হচ্ছে। তাতে খারাপ কী হয়েছে?

ওদের কিছুই খারাপ হয়নি, হয়েছে তোর। তুই এবার দয়ে পড়ে মজবি। মজবি কী, রিপোর্ট বলছে মজে গেছিস।

সেকী রে? ছায়া তো পিসির মতো গেরুয়া ধারণ করে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। আর মায়া? অতি সাদাসিধে ভাল মেয়ে।

ঘুঘু তুমি ভিটে দেখেছ, এইবার ফাঁদ দেখবে। সে ফাঁদে পড়লে তোমার পিতারও ক্ষমতা নেই টেনে বের করেন। ওই মা শীতলার গাধা হয়ে দাওয়ায় বাঁধা থাকবে।

আরে রাখ।

নাবালক ছেলে, বাড়ি বসে হেঁশেল ঠেলিস, মেয়েরা যে কী কল বুঝবে সেদিন, যেদিন ছায়া, মায়া আর বিন্দুবালা একসঙ্গে চেপে ধরবে।

জানিস, আমি মেয়েদের পায়ের দিকে ছাড়া আর কোনও দিকে তাকাই না?

পা বেয়েই সুড়সুড় করে পিঁপড়ে ওপর দিকে ওঠে। ব্যাধ কাঠির ডগায় আঠা মাখিয়ে পাখি ধরে, জানিস তো?

সুখেন খুব খানিকটা জ্ঞান দান করে উঠে পড়ল। নতুন নেশা ধরেছে, সিগারেট। এখানে বসে অন্যান্য দিন গোটা তিনেক কেঁকা হয়ে যেত। ছাদে উঠে উত্তর দিকের আলসেতে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়িতে টোপ ফেলার চেষ্টা হত। অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলছে। আমার জন্যেই বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। সুখেন ব্যায়াম করে ভাগবে, কান ধরে নিলডাউন হব আমি। মেয়েটিও কম যায় না। মা আরও সাংঘাতিক। সেই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর নকল করতুম। কড়ে রাঁড়ি বাপকে উত্তর দিচ্ছে 'যা-ই'। বারান্দায় মাগিরা ডাকছে, 'ও তোপ্‌সে মাছওলা'। নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সেজে সিঁথে কেটেছে আর খুব অনুরাগের সঙ্গে গায়ে তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা। আমিও আজকাল বুঝতে পারি ঠাকুর। ঈশ্বরকে চিনতে পারি না, হয়তো পারব একদিন, আর একটু ঝড়ঝাপটা খাই, মেয়েছেলের ব্যাপারস্যাপার বেশ ভালই বুঝি। উত্তরের ওই বাড়িটি বড় সুবিধের নয়। ওদিককার ছাতে পিতাঠাকুরের চন্দ্রমল্লিকার চাষ আবাদ। গোটা পঞ্চাশ টব বসানো আছে। তিনি ও তল্লাটে যান ছাতা মাথায় দিয়ে। তারস্বরে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে। কুহকিনীর হাত থেকে যেন শেক্সপিয়ারই রক্ষা করবেন, ক্যানস্ট দাও নট মিনস্টার টু এ মাইন্ড ডিজিজড। প্লাক ফ্রম দি মেমারি এ রুটেড সরো। একবার নিচু হয়ে বসতে পারলে শেক্সপিয়রের ছুটি। তখন গাছেদের সঙ্গে নানা সমস্যার আলোচনা। সবই তাদের জগতের। নাঃ তোমাকে আর বাড়তে দিলে না মানু। বুরুশ দিয়ে পাতার পিঠ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি কালো পোকা ঝাড়েন আর বলেন, ব্লাডি বাগারস।

Nothing begins, and nothing ends.
That is not paid with moan.
For we are born in other's pain
and perish in our own.

মাথায় মাথায় তিনটে ম্যাগনাম সাইজের বউ। গতর যেন ফেটে পড়ছে। তেমনই বেশবাস। সখি আমায় ধরো ধরো। মালা পরো পরো। পুরুষ একজন। কদাচিৎ তাঁকে দেখা যায়। ঘাড়ে শাঁস বের করা চুলের ছাঁট।

ঠোঁটদুটো পুরুপুরু। সিল্কের পাঞ্জাবি। দিশি ধুতি। তিনি যেন সবসময় এলিয়েই আছেন। মুখ সদাসর্বদাই হাসিতে তুবড়ে তাবড়ে আলুর পুতুল। সুখেন ঠিক জলেই চার করেছে। মাছের নাম জবা। বেশ খেলিয়ে মাছ। আমার তাতে কাঁচকলা। বেল পাকিলে কাকের কী? তবে এটাও ঠিক, এদিকে এত বড় একটা ছাত পড়ে থাকতে আমারই বা কী দরকার ঘেঁষটে ঘেঁষটে ওই উত্তরে যাবার? বিকেলে রোদ পড়ে এলে ঝারি নিয়ে ফুলগাছে জল দেওয়া আমার একটা ডিউটি। মাথা নিচু করে সেই কর্মটি সমাধা করে সরে পড়লেই হয়! তা হলে অত বারেবারে, আড়ে আড়ে তাকানো কেন? এ আবার কেমনতর ব্রহ্মচারী! ওই জবাসুন্দরীর জন্যে পিতাকে একদিন নির্ভেজাল মিথ্যে বলেছি। গাছে এসেছে ফুল। তার নাম স্নোবল। চুলে আয়েশ করে চিরুনি চালাতে চালাতে জবা নিজে থেকেই বললে, কী সুন্দর হয়েছে! ব্যস, আর যায় কোথায়? মনের সাঁকো নড়ে ঝপাত করে জলে। ফুলের ব্যাখ্যানা হল পনেরো মিনিট। জবা হেসে হেসে, চোখ বড় বড় করে, ছোট ছোট করে, মাথার ওপর হাত ঘুরিয়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে, খোঁপা করতে করতে শুনে গেল। যেন কতই মনোযোগী চন্দ্রমল্লিকার ছাত্রী! লাল ব্লাউজ আর হাত তোলাতুলির শোভা দেখতে দেখতে কুপোকাত। কোথায় ব্রহ্ম, কোথায় আদি অনন্ত! স্রোতের মুখে কুটো। সেয়ানা মন মাঝেমধ্যে খোঁচা মারছে, অ্যায়, কী হচ্ছে! আর একটা মন সঙ্গে সঙ্গে ধমকে উঠছে, চোপ। একে বলে সৌন্দর্যের শিল্পীসুলভ কদর। নারীর সৌন্দর্য। কালিদাস বড়, না লোমপাদ মুনি বড়? র‍্যাফেল, দাভিনচি, না স্বামী অঘোরানন্দ! ঈশ্বর তা হলে মহিলাদের সৃষ্টি করেছিলেন কেন?

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশ দক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহকিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ

কী বর্ণনা! আমার পিতাও তো এই রচনায় মুগ্ধ, বিমুগ্ধ, তড়িতাহত। কালিদাস, দি গ্রেট পোয়েট বলে আত্মহারা হয়ে যান। রূপ বর্ণনা মহৎ, রূপ দর্শন লাম্পট্য, এ যুক্তি কি জজে মানবে? তুই মনের আনন্দে তারিয়ে তারিয়ে জবাকে দেখ।

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষ্যামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং— খেয়োদাঁত, বৃষকাষ্ঠ অধরপণ্ডিতও এই অংশটি আবৃত্তি করতে করতে রসে হাবুডুবু রাজভোগের মতো হয়ে যেতেন। কই ফণিবাবুকে কি কেউ এমন করে দেখে কাব্য করবেন,

নধরকান্তি ঘটোৎকচং
তিন তিসি লোটাগর্দানং।
সগুমফ গোলাকারং
টাকান্বিত তিন্তিড়িবৃক্ষং॥

সেই জবাসুন্দরীকে সম্মোহিত হয়ে একটি স্নোবল উপহার দিয়ে ফেলেছিলুম। জীবনে প্রথম এবং আপাতত শেষ পাপকার্য। গভীর রাতে চোখ বুজলেই জবাসুন্দরীর রক্তরাঙা উন্নত ব্লাউজ। সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে চোখ বুজলেই জবাকুসুম সঙ্কাশং, ঠিক সেই অবস্থা। অনুশোচনায় মরি আর কী? এ কী

অধঃপতন। জবাকে কুসুম দেবার এত মালী ছিল যে আমার মতো কৃশকায় খেঁকুরে ছাদমালীকে আর মনেই রইল না। সেই ঘটনা থেকে বুঝেছিলুম, আমি একটি বোকাপাঁঠা। হয় বৃষকাষ্ঠ, না হয় কাঠিয়াবাবা হবার জন্যে জন্মেছি।

সুখেন একটা ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেল। অনেকদিন হয়ে গেল, মায়া এক শিশি কালি চেয়েছিল। মেয়েটি খুব সুন্দর ছবি আঁকে। হাতের লেখা যেন ছাপার অক্ষর। যখন কাজ করে পাশে বসে দেখতে বড় ভাল লাগে। কেমন করে আঁকছে, রং করছে, লিখছে। পরনে কনট্রোলের লালপাড় সাদা শাড়ি, গেরুয়া ব্লাউজ। পিঠে ছড়ানো রুক্ষ চুল। কেমন একটা শিল্পী শিল্পী চেহারা। সুখেনের সবেতেই পাপ। আমার কেউ কোথাও নেই। ছায়া মায়া তো আমার বোনের মতো। ছায়া আমার চেয়ে বয়েসে ঢের বড়। মুখে বড় বড় বসন্তের দাগ। গেরুয়া নিয়েছে। তার সঙ্গে কারুর কোনও প্রেম, ভালবাসা, বিয়ে হতে পারে? সুখেন শুধু একটা কথাই জানে, যন্তর। ওর বাবার উচিত ছেলের শ'খানেক বিয়ে দিয়ে একটা আড়তে এক বছর বন্ধ করে রাখা। আমার পিতা যেমন রাত বারোটার সময় গলায় ডান্ডা পুরে এক জার মোরব্বা খাইয়েছিলেন জোর করে।

মায়াকে আজ এক দোয়াত কালো কালি দিয়ে আসতেই হবে। দেবার মতো আমার আর কী আছে? পিতার ধনে পোদ্দারি। নানা জিনিস তৈরি তাঁর হবি। লেখার কালি তৈরি তার মধ্যে একটি। বড় কঠিন কাজ। সবচেয়ে দুরূহ কেরামতি হল কালো কালি তৈরি। এতটুকু তলানি পড়বে না, ঝরনা কলমের মুখ দিয়ে সূক্ষ্ম ধারায় বেরোতে থাকবে অবিরাম। বিলিতি কালির কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে, স্টিফেনস সক্রিপ, কুইঙ্ক, ওয়াটারম্যান, সোয়ান। সারি সারি বোতল, মুখে ফোঁদল আর বিভিন্ন ঘনত্বের ফিল্টার পেপার। সারাদিন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে পরিশ্রুত কালি। নির্জন নিঃস্তব্ধ ঘরে কান পাতলে শোনা যাবে বিন্দুপতনের শব্দ, টুপ টুপ। এমন সব উপমা মাঝে মাঝে মনে আসে যা কালিদাসের পিতাও ভাবতে পারবেন না। বিশাল পালঙ্কে সময় শুয়ে আছে। ডান হাত ঝুলে আছে পালঙ্কের পাশে। তলায় একটি পাত্র। ধমনী চিরে গেছে ধারালো অস্ত্রে। রক্তের বিন্দু পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। পাণ্ডুর হয়ে আসছে শরীর। দিন যায় দিন যায়। গ্রিক পদ্ধতিতে সময়ের আত্মহত্যা। এর নাম কালি-ঘর। মাটির গামলায় বেদানার খোলা আর হরীতকী পচছে। তাকে তাকে অসংখ্য শিশি। কোনও কোনও শিশি মৃত্যুর মতো নীল, খুনির মতো লাল। চিনির দানার মতো শুভ্র জরানো এক ধরনের পদার্থ, অকজ্যালিক অ্যাসিড। বাদামি ট্যানিক অ্যাসিড। ঝুলের আবরণে হরেক শিশি বসে আছে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। ঘরটা তেমন আলোকিত নয়। শীতের শেষ দ্বিপ্রহরে ঢুকলে মনে হবে প্রেতাত্মা নৃত্য করে চলেছে নূপুর পায়ে।

মায়ার জন্যে কালি আমাকে চুরি করতে হবে। এ শিশি থেকে একটু, ও শিশি থেকে একটু। এ চুরিতে নীতির প্রশ্ন নেই। অর্থ নয়, অলংকার নয়, সামান্য তরল পদার্থ। বিদ্যার্জনের প্রয়োজনে লাগবে। তা ছাড়া একটা গর্বও আছে। আমার পিতা কী না পারেন? আমি সামান্য হলেও তিনি অসামান্য। কত কী পারেন, যা কেউ পারে না।

শিশিতে কালি ঢালাঢলি চলছে, কনক এসে ঘরে ঢুকল। নীচে কী করছিলে এতক্ষণ? এঁদো স্যাঁতস্যাঁতে গলিতে?

ওই যে আমার এক বন্ধু এসেছিল, সুখেন।

বেশ দেখতে ছেলেটিকে। কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য। তোমার যদি ওইরকম হত। একটু চেপে খাওয়াদাওয়া করো না! দুধ, ঘি, মাখন। সকালে তোমার খাওয়া দেখলুম তো! পাখির আহার!

হুম!

স্বাস্থ্য তুলে কথা বললে উত্তর এক অক্ষরেই হওয়া উচিত। শরীর ছাড়া পৃথিবীতে আর যেন কিছুই নেই। এ যেন গো-হাটায় গোরু বিক্রি। নধর গাভীটির দিকে সবাই দৌড়োবে। দাম উঠবে চড়চড় করে। শাস্ত্র বলছেন, দেহটা কিছুই নয়। আসল হল আত্মা। সে বাবা এমন জিনিস, আগুনে পোড়ে না, জলে গলে না, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না। নাও, কী করবে করো। মেয়েদের কথাবার্তাই যেন কেমন কেমন। চুল-ওলটানো ফচকে ছোঁড়া দেখে চোখ ট্যারা হয়ে গেল। কী? না, শরীর! সাতটা বাঘে রুল অফ থ্রি-র হিসেবে রোজ এক ঘণ্টা করে খেলে তিন দিনে সুখেন ফুরোবে। আর আমাকে? বাঘ দেখেও দেখবে না। এক যদি কোনও এয়োস্ত্রী বাঘ কাটোয়ার ডাঁটা ভেবে একটু চিবিয়ে দেখে। তাতে হয়েছেটা কী! সুখেনের ভেতর দেখো, আর আমার ভেতর দেখো! শ্রীচৈতন্যদেবের চেহারা কি গোয়াবাগানের ব্যায়ামবীরের মতো ছিল! শ্রীরামকৃষ্ণ পেটরোগা ছিলেন। সারদা মা কাঁচকলার ঝোল ভাত রেঁধে খাওয়াতেন। বুদ্ধদেব কি রোজ গুপেগুন্ডার মতো মুগুর ভাঁজতেন। পুণ্যের শরীর একরকম, পাপের শরীর আর একরকম। মেয়েরা বোঝে না কেন?

কনক উবু হয়ে আমার গা ঘেঁষে বসল। বসল তো ভারী বয়েই গেল। আমি তো আর সুখেন নই যে ভেতরটা জল থেকে তোলা মাছের মতো ছটফট করবে। আমি তো আগমার্কা ঘি। কোনও ভেজাল নেই। খুব বেসামাল হয়ে পড়লে, একবার শুধু বলব, মা বিপত্তারিণী, রক্ষা করো। গেল, গেল বুঝি সব রসাতলে। কনক ফিসফিস করে বললে, কী হচ্ছে কী এসব? সারি সারি বোতল।!

কালি ফিল্টার হচ্ছে।

কী হবে এত বোতল বোতল কালি?

লেখা হবে।

বাব্বা, মহাভারত লেখা হয়ে যাবে যে! আমার কলমে একটু ভরে দেবে? দেখি কেমন কালি!

এ জিনিস বাজারে মিলবে না। ঝুল কালো। নিবে আটকায় না। যে-কাগজে লিখবে সে কাগজে ভাগ্যের লিখনের মতো চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

বাঃ, পাক্কা সেলসম্যান ভাস্করবাবুর মতো কথা বলতে পারছি। একটুও আটকাচ্ছে না। পিতার ইচ্ছে কালি যদি কালীর মতো দাঁড়িয়ে যায় মহাদেবের বুকে, মহাদেব মানে বাঘমার্কা সাদা কাগজ, আর লজ্জায় যদি জিভটি না বেরোয়, তা হলে নেমে পড়বেন ব্যবসায়। নামও ঠিক, ইলিসিয়াম ইঙ্ক। আমি হব সেলসম্যান। দোকানে দোকানে অফিসে অফিসে ঘুরব। লেখার কালি দিয়ে শুরু করে, স্ট্যাম্প প্যাড ইঙ্ক, মার্কিং ইঙ্ক, শেষ হবে ছাপার কালিতে।

কনকের সোনার কলমে কালি ভরা হল। এমন কলম আমি জীবনে দেখিনি। নাম লেখা আছে পার্কার। এঁরা বেশ বড়লোক। চালচলন, সঙ্গের জিনিসপত্র, চেহারা, দেখলেই বোঝা যায় মেসোমশাই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই দেবীরই কৃপা লাভ করেছেন।

মাটির যে-গামলাটায় বেদানার খোলা আর হরীতকী পচছিল সেটা হঠাৎ নড়ে উঠল। কনক বললে, ওই দেখো জ্যান্ত কালি। ভুড়ভুড় করছে।

ও অমন হয়, ফার্মেন্টেশন হচ্ছে তো। নিজের জ্ঞান জাহির করতে পেরে বেশ গর্ব হল। গামলা থেকে কী একটা লাফিয়ে উঠে আবার গবাত করে গামলাতেই পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। কনক বললে, ওই দেখো কালির ন্যাজ বেরিয়েছে।

দু'জনেই গামলার দিকে ঝুঁকে পড়লুম। কালির আবার ন্যাজ কী রে বাবা! পিতা চেয়েছিলেন বিলিতি কোয়ালিটি। তিনি তো ন্যাজ চাননি। ফিল্টার করলে লাঙ্গুল বাদ যাবে কি! বাঁদরকে ফিল্টার করলে মানুষ হবে? ডারউইন সায়েব বেঁচে থাকলে একটা বেয়ারিং চিঠি লিখতুম।

আমিও তো আর এক পণ্ডিত। অনেক ভেবেচিন্তে বললুম, এটা হল সেই ব্যাপার বুঝলে কনক, জলে বিচিলি ভিজিয়ে রাখলে দিনকতক পরে ছোট ছোট সাদা সাদা ন্যালবেলে পোকা হয়, মাছের খাদ্য। কেমন হয় তো?

কী জানি, হয়তো হয়।

কী জানি মানে? আমি নিজে করে দেখেছি। আমার একটা গোল্ডফিশ ছিল। বেড়ালে খেয়ে না ফেললে আজ কত বড় হত। বেদানা কাবুলে জন্মায়, হরীতকী সাধুদের আহার। কাবুলিদের চেহারা দেখেছ? সাত ফুট বাই পাঁচ ফুট। সেই বেদানার খোলা পচে যে পোকা হবে তার আকার আকৃতি একটু বড়সড়ই হবে। এ তো কমন সেনস্।

আমার থিসিসও শেষ হল আর সেই কাবুলিপোকা তিড়িং করে এক লাফ মেরে, পড়বি তো পড় কনকের কোলে।

ওরে বাব্বা, খেজুর, বলে কনক উলটে পড়ল। সেই পা! পা থেকেই পাপ। পরিপূর্ণ তিনটি বোতল সুন্দরীর পদাঘাতে তিন গুন্ডার মতো তিন দিকে ছিটকে গেল। একেই বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পিতৃদেবকে রাতে কী কৈফিয়ত দোব?

মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল

পণ্ডিতের ঘরেই মূর্খ জন্মায়। আবার মূর্খরাই পণ্ডিত হয়। সেই তিন পণ্ডিতের গবেষণার গল্প। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চাষার কোদালে একটি তালের আঁটি উঠেছে। জটাজূটধারী। কী বস্তু কে জানে? কোনও দেবতাটেবতা নয় তো! তিন পণ্ডিত এলেন। টিকি নেড়ে, নস্যি নিয়ে, একজন বললেন, এ বস্তুটি হল শকুনের বাস্‌সা। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত দু'জন পণ্ডিত কখনও একমত হতে পারেননি। দ্বিতীয় পণ্ডিত বললেন, তুমি কসু জানো, এটা বাদুড়ের বাস্‌সা। তৃতীয় পণ্ডিত বললেন, প্রণাম করো, ইনি হলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মাথা। চাষা ব্যাটা কোদালের কোপে ধড় থেকে নামিয়ে এনেছে। কুষ্মাণ্ডকে নিয়ে চলো কোতোয়ালের কাছে, বিচার হবে। কারুর সর্বনাশের রাস্তা খোলা হলে পণ্ডিতরা সঙ্গে সঙ্গে একমত। আহা ব্যাটা শূলে চড়বে। হাকিম শূলে প্রায় চড়িয়েই ফেলেছিলেন। হাকিমের স্ত্রী বললেন, আরে ওটা তো তালের আঁটি। আমাকে দাও, ভেঙে ফোঁপলটা খেয়ে ফেলি।

গামলার প্রাণীটি যে একটি নেংটি ইঁদুর দুই পণ্ডিতে বুঝে উঠতে পারিনি। কনকের কোল থেকে মেঝের ওপর তার পলায়নের রেখা টেনে জলচৌকির নীচে গিয়ে ঢুকেছে। আর তাকে পায় কে? এদিকে তিন বোতল কালির স্রোত মেঝের ঢাল বেয়ে নর্দমার দিকে গড়িয়ে চলে গেছে। নীল, কালো, নীলকালো, সব মিলেমিশে সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতো একাকার। মাঝখানে আমি এক শ্রীরামকৃষ্ণ হাত ঊর্ধ্বাকাশে তুলে সমাধিস্থ। কনক এক মহামায়া, ভূমিশয্যায় আড়কাত হয়ে হেসে কুটোপুটি। দরজায় উঁকি মারছে আর এক মহাশক্তি মুকু। কে যেন বলেছিলেন, নারী নরকের দ্বার। আমার মাতামহ। মাতামহী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হয়তো বলেছেন, স্বর্গদ্বার। শৃগাল অনেক লম্ফঝম্ফর পর নাগাল না পেয়ে বলেছিল, দ্রাক্ষাফল টক। মাতামহী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরে পড়ার পর সেই স্বর্গদ্বার হয়ে গেল নরকের দ্বার। আমার তেমন কোনও বন্ধন নেই, প্রায় নাঙ্গাবাবা, আমি ভেবেচিন্তেই বলছি, বাক্যটির মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য আছে। আমি যদি সরাইকেল্লার মহারাজা হতুম, তা হলে মায়ার কাছে যেতুম গজমোতির হার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে। এক শিশি কালি তো সেই গজমোতির হার। কনট্রোলের শাড়ি পরা রাজকুমারীর মনে সামান্য আঁচড় কাটার চেষ্টা। মানুষের অভাব বেড়েছে, স্বভাব কিছুই পালটায়নি। তপস্যা করলেও বেড়াল বেড়ালই থেকে যাবে। উপনিষদ কত আগেই বলে রেখেছেন, নান্যঃপন্থা। আদি রিপুকে মালসায় ফেলে গন্ধকের আগুনে পোড়ালেও কিছু হবে না।

ছেঁড়া কাপড় দিয়ে নিংড়ে নিংড়ে ওই কালিকে যতটা সম্ভব বোতলে ফিরিয়ে আনতে হবে। তা না হলে রাতে এই সুন্দরীদের সামনে আমার নাজেহাল অবস্থা হবে। বারেবারে শুনতে হবে তিন চরণ কবিতা,

Sons dangle their fathers with a rope, creation kills the creator,

even the Almighty Lord.

কার লেখা কে জানে, বারেবারে শুনে শুনে কান পচে গেছে। ঘরের নর্দমার ছোট্ট মুখে একটি গোল কাঠ গোঁজা। সেখানে তৈরি হয়েছে কালির আরব সাগর। এমন এক পাপ ছড়িয়েছে যাকে আর সহজে চাপা দেওয়া যাবে না। নর্দমা চুঁইয়ে ওপাশে সিঁড়ির দেয়াল দাগরাজি করবেই। এতক্ষণে করেও ফেলেছে। কতরকমের রসিকতা আছে! মুকু বললে, আহা আমার বড় ইচ্ছে করছে ওই কালি পুকুরে একটা কাগজের নৌকা ভাসাই। কনক বললে, থাক, বুড়ি বয়েসে আর ছেলেখেলার দরকার নেই। বাবা কোথায় রে?

বাথরুমে?

কনক বললে, এসো, দু'জনে মিলে যতটা পারি তুলি।

তুমি আবার হাতে কালি মুখে কালি করবে কেন?

আমার অপকর্ম আমাকেই সামলাতে হবে।

এতক্ষণ আমরা কেউই লক্ষ করিনি, কেমন সহজে তুমি-তে নেমে এসেছি! পাশাপাশি বসে কালি তোলা হচ্ছে। বোতলের পাপ বোতলেই ফিরে যাচ্ছে একাকার হয়ে। ঘরে একটি মাত্র ছোট জানলা। তেমন আলো বাতাস আসে না। বেশ গরম হচ্ছে। এই প্রথম টের পেলুম, বেদান্তেও যা লেখা নেই, নারীদের শরীর থেকে অদ্ভুত একটা গরম হলকা বেরোয়। দীর্ঘ রৌদ্রদগ্ধ মাটিতে প্রথম বৃষ্টি পড়লে যেমন একটা সুবাস ছড়ায়, তেমনি একটা গন্ধও আছে। ওদিকে আমার মন যাবার কথা নয় তবু যাচ্ছে। এমনও মনে হচ্ছে, হে প্রভু, রোজই যেন একবার করে বোতল ওলটায় এইভাবে। আমার মনটা যেন কেমন কেমন করছে। গলায় চিকচিক করছে ছিলে-কাটা সোনার হার। হাতের চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ। নাকছাবির পাথর এক একবার চমকে উঠছে। খেঁকুরে মনের পোড়া শ্মশানে বসে, বিসমিল্লা খাঁ সানাইয়ে ধরেছেন পুরিয়া ধানেশ্রী। বৈশাখী সন্ধ্যায় ফুলওয়ালি হেঁকে চলেছে বেলফুল। তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে। সুখেন ঠিকই বলে গেল, পৃথিবী বিশাল। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। পুরানা কাগজ বলে থলে কাঁধে হেঁকে বেড়ালে সের সের কাগজ মিলবে, লোহালক্কড়, শিশিবোতল, ভাঙা কাচ মিলবে। মন মিলবে না, স্নেহ ভালবাসা মিলবে না। যে পায়, সে পায়। এসব ভেসে ভেসে কোথায় চলে যাবে! ঘর থাকবে, বৈশাখ থাকবে, সন্ধ্যার নম্র অন্ধকার থাকবে, মানুষ থাকবে না। মেয়াদ এক মাস। তারে ঝোলা শাড়ি সরে যাবে, ফিতে, কাঁটা, চিরুনি, সাবান, তেলের সুবাস, চুড়ির শব্দ, সব, সব মিলিয়ে যাবে। আবার সেই শূন্য বাড়ি, শেষ বেলার ছায়া, দূরে বহু দূরে কোনও মায়ের চিৎকার— পিন্টু ঘরে আয়।

এই ঠোঁট-ফোলানো ন্যাকামির জন্যেই ছেলেটার কিছু হবে না। কাব্য করেই কেবল মোলো। কেউ বলেনি, নিজেকেই নিজের তিরস্কার। একটা দিনও পার হল না, মনেই মথুরা তৈরি করে নটঘট অবস্থা। একে কয়লার গোলায় চাকরি করে দাও। বোঝা মাথায় বাড়ি বাড়ি ঘুরলেই রস মরে পুরুষ হবে। আর্মিতে পাঠাও। প্যারেড করে জীবন যন্ত্রণা জুড়োবে। কালি বোতলে তোলো, মেঝে থেকে তুলে মেঝেতে নিংড়োচ্ছ কেন? স্বপ্ন দেখছ নাকি?

তাই তো! কনকের কথায় চমক ভাঙল। কোন কল্পনাজগতে ভাসছিল মন!

সন্ধে হয়ে আসছে। মায়াকে কালির শিশিটা দিয়ে আসতেই হবে। প্রায় সাত দিন হয়ে গেল, দেখা সাক্ষাৎ নেই। সুখেন যাই বলুক বিন্দুবালার গাধা হয়েও সুখ আছে। যে-সংসারে পুরুষ নেই সে সংসারে মেয়েদের

স্বাধীনতার চেহারাই আলাদা। ভাল সারযুক্ত মাটিতে উপযুক্ত আবহাওয়ার ফুল যদি ফুটতে পায় সে ফুলের চেহারাই আলাদা। চেনাকেও অচেনা মনে হয়। মনে আছে কালিম্পঙে গিয়ে গন্ধরাজ দেখে অবাক। কী ফুল? কী ফুল? মহা বিরক্ত হয়ে একজন বললেন, গর্দভ গন্ধরাজ চেনো না। এদিকে গন্ধরাজ পুরোটা ফোটেই না।

যেন কন্বমুনির আশ্রম। হরিণ ছাড়া সবই আছে। ছিটে বেড়া। গাব ভ্যারেন্ডার ঝোপ। সারি সারি কলকে, টগর, করবী। উঠোনের মাঝখানে তেলচুকচুকে পাতা, কাঁঠাল গাছ। তলায় বাঁধা হাবলা-গোবলা একটি ছাগশিশু, লোটা লোটা কান। পেছন দিকে একটা ডোবামতো আছে। বর্ষায় ভেসে উঠোন পর্যন্ত চলে আসে। মাটির উঠোনে একটা চৌকি পাতা আছে। মেঘশূন্য চাঁদিনি রাতে ব্যাপারটা ভীষণ জমে ওঠে। কাঁঠাল গাছের মাথার ওপর চাঁদ ওঠে। তারাদের জলসা। দক্ষিণের হৃদয় বিদারক বাতাস। ধূপ-ধুনোর গন্ধ। ঘণ্টাধ্বনি। রাতচরা পাখির কটাস কটাস বন্ধন খোলা ডাক। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত মায়ার পোড়-খাওয়া মুখ। বিন্দুবালার সাধনজগতের কথাবার্তা। ভিজে কাপড়ে ছায়ার চলে যাওয়া। কেমন করে বৈরাগ্য আসে প্রভু! জলে জাল ফেলে জেলে বসে আছে জলে।

সারাদিন রোদে পড়ে থেকে ডোবার জল এখন বাষ্প ছাড়ছে। গাছপালার পেছনটা নীল-নীল ধোঁয়া-ধোঁয়া। মায়াবিনীর আঁচল উড়ছে। ছাগলটা চোখ বুজিয়ে কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছে। বেতার গায়ে একটি নীল শাড়ি শুকোচ্ছে। মায়া ঘরের সামনের দাওয়ায় বসে, ঊরুতে ফেলে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছে। গোটা কুড়ি হয়ে গেছে। আর ক'টা হবে কে জানে! দৃশ্যটি দর্শনীয় হলেও উটকো পুরুষের দেখা উচিত হবে কি না বুঝতে পারা যাচ্ছে না। শাস্ত্র এ সম্পর্কে নীরব। অথচ প্রদীপের জন্যেই সলতে। সলতের জন্মস্থান মহিলাদেরই কদলিকাণ্ড সদৃশ জঙঘার তৈলাক্ত মসৃণ দেহভাগে। প্রদীপ না জ্বললে ধর্ম হয় না। সলতে না হলে প্রদীপ জ্বলে না। যুবতীর ঊরু না হলে সলতে হয় না। আমাদের মেনিদা যদি ঠ্যাং বের করে সলতে পাকাতে বসেন, তা হলে এক পাকেই তো চিৎকার উঠবে। কাঁচি আন, ব্লেড আন। লোম রোল হয়ে সলতে সেঁটে আছে জোঁকের মতো। পরিণত পরিণতি লোমফোড়া।

তা হলেও, মায়া একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। অতটা অনাবৃত করার প্রয়োজন ছিল না। বাড়িতে কোনও পুরুষ না থাকলে মেয়েদের সাহস বড় বেড়ে যায়! এ যেন মশা মারতে কামান দাগা। দলমাদল সামনে পড়ে আছে। কোথাও এতটুকু মরচে নেই। যাহা অন্তঃপুরে থাকে তাহা কি এত বিস্ময়কর ভাবে শুভ্র হইয়া থাকে! বালক, প্রশ্নের উত্তর তোমার চক্ষুর সম্মুখেই প্রসারিত। লুকাইয়া, লম্পট জমিদারপুত্রের ন্যায় দেখিয়ো না। মহাবীরের মতো হুপ করিয়া লাফাইয়া সামনে গিয়া পড়ো। পাপ পুণ্য হইয়া যাইবে। শৃগাল সিংহের বলপ্রাপ্ত হইবে। বলদা, মোক্ষদা, মায়া, অষ্টপাশ ছিন্ন করিয়া দেবকার্য করিতেছে। তুমি বহুবার পাঠ করিয়াছ, দেবকার্য লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকিতে নয়।

বয়স্ক পুরুষদের দেখেছি অন্তঃপুরে ঢোকার সময় গলায় এক ধরনের শব্দ করেন, যা কাশিও নয়, চাপা হাঁচিও নয়। ছোট মাছের কাঁটা গলায় বিঁধে গেলে আমরা ওইরকম শব্দ করি। সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা সচেতন হয়ে বক্ষদেশে আঁচল তুলে দেন। কাপড় গুছিয়ে নেন। ব্যতিক্রম স্থূলাঙ্গী মহিলারা। মেদ বিপরীত লিঙ্গিদের কেমন যেন উদম, উদাস করে রাখে।

গলার শব্দে মায়া সচেতন হল না। চেনা মানুষ আর ছাগলে তেমন উনিশ-বিশ নেই বলেই মনে হয়। সলতে পাক খেয়ে উর্ধ্বপদখণ্ডের ছায়ায়, সুন্দরী এ কী করলে বলে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। মুখ হয়ে উঠেছে মেঘৈর্মেদুরম্বরং-এর মতো। একেই কি বলে, কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা!

আমি এলুম।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

রামগড়ুরের ছানার মতো, রামলীলার প্যান্ট পরা, খড়ের সোঁটা ন্যাজ ওঁচানো হনুমানের মতো, অশোককাননে নির্বাসিতা সীতার সামনে শিশি হাতে দণ্ডবৎ। বসতে বলছে না। অভিমান হয়েছে। হাম্বীর রাগে মাতুলের শেখানো সেই সংগীতের দু'চরণ গাইব নাকি, জানি না মানিনী, তড়াক, সম-এ এসে পড়লুম, কেন এ অভিমান, ফাঁক। তেটে ধিন ধিন তা, কৎ ধাগেনাগে, ধাগেনাগে, ধেরে কেটে, মেরে ধরে। জানি না মানিনী।

বসতে পারো।

বসতে তো পারি। বসার লোভে প্রাণ মৎস্যাশী হুলোর মতো ছোঁক ছোঁক করছে। উচিত হবে কি। মায়া যে বিধাতার উদ্যানের প্রথম আপেলে এখনও কামড় লাগায়নি। যে-ভঙ্গিতে ছিল সেই ভঙ্গিতেই বসে আছে। তা ছাড়া এমন একটি কর্ম করে বসল যাতে হৃদয় হোঁচট খায়। এক ফোঁটা তেল দিয়ে মসৃণ ত্বককে মেজে ঘষে পলতে-বিলাসী করে ফেলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভয়ে ভয়ে যতটা সম্ভব দূরে বসলুম। বসতে-না-বসতেই কাঁঠালতলার ছাগলটা ব্যাঅ্যা করে ডেকে জানিয়ে দিলে, তুমিও এক বলির পাঁটা। ব্যাটা জ্ঞানপাপী হাজার বার পড়েছিস, পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কাঁদে। পৃথিবীটা যদি আমাদের দু'জনের হত, তা হলে কথা ছিল না। হঠাৎ যদি সন্ন্যাসিনী পিসি ডোবার ধার থেকে চ্যালা কাঠ হাতে তেড়ে আসেন। মানুষের মুখে পাপের ছায়া ইংরেজি সিক্সও ক্লক শেডের মতো ঘনিয়ে আসে। বোঝা যায় সুবোধ বালক মনে মনে পাঁয়তাড়া কষছে।

এই যে তোমার কালি।

ফেলে দাও।

শুধু শুধু রাগ করছ। জানো আমার কী হয়েছিল! অসুখে কাত হয়ে বিছানায় পড়েছিলুম তিন দিন। একবার খবর নিয়েছিলে?

তোমার খবর নেবার উপায় আমার আছে? তুমি না এলে জানব কী করে?

তা অবশ্য ঠিক। মা কোথায়?

ছেলে কম সেয়ানা নয়। মা শব্দটি এমন মিঠে করে উচ্চারণ করলুম, যেন আমার মা। দেখতে না পেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে! ওঁয়া ওঁয়া করে উঠল বলে! আসলে ভয়ে মরছি। এ বাড়ির শাসন, অনুশাসন কোনওটাই তেমন জানা নেই। মায়া বললে, পিসিমা আর দিদি হালিশহর গেছে, ফিরতে রাত হবে।

ভেতরে ব্যাং লাফাল। একা। আমরা দু'জন। মনের কোণে কে যেন হালুম করে উঠল। আমি নই। আমি যে পবিত্র গঙ্গার জল। পাপ ধোয়া তুলসী পাতা। মায়ার সলতে পাকানো শেষ হয়ে গেল। পা ঢেকে বললে, তোমার মুখটা খুব শুকিয়ে গেছে। আমার কাছে দিন কতক থাকলে দুধ খাইয়ে মোটা করে দিতুম।

কীসের দুধ?

ফস করে বেরিয়ে গেছে। জিভ কাটলুম। মায়া কিছুই মনে করেনি। এ হল চরিত্রের ওপর সুখেনের প্রভাব! পিতা ঠিকই বলেন, সঙ্গদোষেই ভুজঙ্গ! প্রশ্নটা তেমন নিরীহ নয়।

[ওহে বর্ণচোরা আম! বেশি অশ্লীলতা করলে কান ধরে উপন্যাস থেকে বার করে দোব। বেশ পেকেছ। মনটাকে মানুষ করো। অবাক হবার কিছু নেই। এ কণ্ঠস্বর আমার। রাশ আলগা হয়েছে ভেবে কাটা ঘুড়ির মতো চেত্তা খেয়ো না, টানতে কতক্ষণ। জীবন একটা আধার। ধরলে অমৃত ধরা যায়, আবার বিষপাত্র হয়ে মৃত্যুকেও ডেকে আনা যায়। তুমি অমৃতের পুত্র হবে, না পুতনার স্তন! মনে মনে তিনবার বীজমন্ত্র জপ করে নাও। জিহ্বা শুদ্ধ হোক।

Truth never come where lust
    and fame and greed
of gain reside. No man who
    thinks of woman
As his wife can ever perfect be
Nor he who owns however little
    nor he
Whom anger chains can ever pass
    through Maya's gates
so give these up, Sannyasm bold
    Say Om Sat Om.

সন্ন্যাসীর গীত তোমাকে শুনিয়ে দিলুম। এই মায়া, আর ওই মায়ায় বিশেষ তফাত নেই। তা হলে আরও শোনো, আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। কাহার? স্বামী বিবেকানন্দের। তুমি অবশ্য তাঁহার একগাছা কেশেরও যোগ্য নহ। একে জগদব্যাপী প্রতিষ্ঠা; তাহাতে সর্বদাই পরমাসুন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিত মহিলাগণ আসিয়া আলাপ ও সেবা করিতেন। তাঁহার এত মোহিনী শক্তি যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেন। একজন অতি ধনাঢ্যের কন্যা সত্য সত্য একদিন আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'স্বামী! আমার সর্বস্ব ও আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিলাম।' স্বামী তদুত্তরে বলিলেন, 'ভদ্রে! আমি সন্ন্যাসী। আমার বিবাহ করিতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা!' তুই হলে কী করতিস ব্যাটা! তেত্রিশটা বউ নিয়ে লোটাকম্বল ফেলে, ন্যাজেগোবরে হয়ে বসে থাকতিস স্বামী পিনখাড়ানন্দ।']

মায়ার লম্বা ডান হাত আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। সরু সরু আঙুল। ওপর হাতে লাল সুতো দিয়ে একটা তাবিজ বাঁধা। ওই সর্বনেশে হাত আমার আমসির মতো গাল টিপতে আসছে। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ! দু'আঙুল দিয়ে নীচে থেকে টিপে ধরেছে। আহা! আমার গালে যদি একটু মানুষের মতো মাংস থাকত! তত্ত্বজ্ঞান না, বৈরাগ্য নয়, পোয়াটাক মাংস দু'গালে।

তোমাকে আমি খাঁটি গোরুর দুধের সিন্নি খাইয়ে খাইয়ে ইয়া মোটা করে দিতুম। আহা রে! শাসনে শাসনে ছেলেটা আমার শুকিয়ে গেল।

চুলের ঝুঁটি ধরে কোলের দিকে টানছে। ওম তৎসৎ, ওম তৎসৎ। প্ল্যাটফর্ম এগিয়ে আসার মতো কোল এগিয়ে আসছে। মায়ার দরজা পার করে দাও প্রভু।

বাঘিনি বাঘ নিয়ে খেলে
সিংহ নতজানু বিশেষ সময়ে
শৃগালের হাহা হাসি
হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া, ক্যা হুয়া, কেয়া হুয়া॥

আমি জানি, এখন কী হবে! মায়ার আবেগ বড় সাংঘাতিক! বারকয়েক ওই আটচালায় তার প্রমাণ মিলে গেছে। অপত্যস্নেহে কোলে ফেলে তাল চটকান চটকাতে থাকবে। সারাশরীর কাঁপতে থাকবে। দেহের অনাবৃত অংশ ঘর্মাক্ত হবে। কেবল বলবে, দুষ্টু দুষ্টু, চটকে শেষ করে দোব। সুখেন, বাঁচা। দৈহিক নয়, বড় নৈতিক যন্ত্রণা। আমার ধর্ম গেল। সতীত্ব গেল। ধ্যার মূর্খ। শাক্ত থেকে বৈষ্ণব হয়ে যা, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বোল হরি বোল, বোল হরি বোল॥

রূপসির কালো ওড়নার মতো সন্ধ্যা ঘিরে আসছে। লোম উসকোখুসকো দুটো কুকুরের মতো মায়া আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। খুব একচোট হয়ে গেল। কী থেকে যে কী হয়ে যায়! মনের কাঁধে পা ঝুলিয়ে আর একটা কী বসে আছে! সে যে দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়, যায় না তারে ধরা।

মায়া ঘর থেকে একটা আধ-ভাঙা টিনের বাক্স নিয়ে এল। সাজের সাজসরঞ্জাম। দাড়া-ভাঙা চিরুনি। চুল বাঁধার ফিতে। সোনালি টিপ, কাচপোকার ডানা কাটা। চিরুনি হাতে নিয়ে মায়া আমার সামনে মাটিতে দু'হাঁটু ফেলে খাড়া হয়ে বসে, বুকের দিকে মাথাটা টেনে নিয়ে ঘাড়ের দিকের চুলে চিরুনি চালাতে লাগল।

চুল নয় তো, জটেবুড়ির জটা। কী করে রেখেছ মাথাটা। দেখি মাথা তোলো।

সামনে ঝুঁকিয়ে, পেছনে হেলিয়ে, পাশে ফিরিয়ে মায়া আমার চুল ঠিক করতে লাগল। গোল হাতে বাঁধা তাবিজের লাল সুতো সাপের মতো ঝুলছে। মাঝে মাঝে ছোবল মেরে যাচ্ছে। একটু বাসি তেলের গন্ধ, জলের গন্ধ, বুকের গন্ধ। সন্ধ্যা আসে ঘিরে। পাতায় বাতাস লেগেছে। পৃথিবীরও একটা মোহিনী আঁচল আছে। অদৃশ্য সব ফাঁকফোকর থেকে সুখ নেমে আসে। মহাকাশের মহা অন্ধকারে মাথা তুলে আছে নির্জন পর্বতশ্রেণি। ফাটল চুইঁয়ে বেরিয়ে আসছে জলবিন্দু, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুর মতো। জমে উঠছে টোপা টোপা মুক্তোর দানার মতো। সূর্যের আলোয় অশ্রু হয়ে উঠবে হীরকের হাসি। সবই অলক্ষে। কখন কোথায় কী হয়ে চলেছে এই বিরাট বিশ্বে কে আর নজর রাখছে।

মায়া কোল থেকে আঁচল তুলে নিয়ে তেলতেলে মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, তুমি অনেক দেরিতে বুড়ো হবে। আমি মরে যাবার অনেক পরে তুমি মরবে। এখনও একবারে কচি আছ। দেখি একটা কাচপোকার টিপ পরালে কেমন দেখায়?

ছোট্ট কৌটোয় ধুনোর আঠা। সেই আঠায় ঠেকিয়ে একটি টিপ ভুরুর মাঝখানে প্রথম আঙুলের চাপ দিয়ে পরাতে পরাতে বললে, তুমি আমার কে বলো তো!

এ বড় শক্ত প্রশ্ন! এই পৃথিবীতে কে যে কার। যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। এই তো হালফিল যে ঘটনা ঘটে গেল পাড়ায়! হারু আর হারুর মা হারুর বাবাকে ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দিলে। বুড়ো ভাল দেখে না, কানে ভাল শোনে না। ঘষা কাচের ডাঁটি-ভাঙা চশমা চোখে। নাকের কাছে তুলো জড়ানো। বুড়ো কয়লার দোকানের পেছনে পড়ে রইল এক মাস। উঠতে পারে না, চলতে পারে না। দু'হাতে সেবা করে গেল কে? মেয়ে স্কুলের কর্মচারী মেনকাদি। বিয়ে করলে যে-কোনও রাজপুত্তুরকে বিয়ে করতে পারতেন। জীবন কাটাচ্ছেন আতুরের সেবায়। এক মাস সকাল বিকেল মেনকাদি জল, দুধবার্লি, কাঁথাকম্বল জোগালেন। বুড়ো দ্বিতীয়পক্ষের বউ প্রথমপক্ষের ছেলেকে রেখে একদিন শেষরাতে চলে গেলেন মহাযাত্রায়। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলল না। মেনকাদি কেঁদে ভাসালেন। তবে? মায়া আমার কে? আমি মায়ার কে? কোথাও কোনও অদৃশ্য লিপিতে কি ভাগ্যবিধাতা লিখে রেখেছেন?

একটা ভাঙা আয়নায় পাকা বউয়ের মতো মুখ দেখতে দেখতে মায়া বললে, তোমার বাবার তৈরি ব্রনর কোনও ওষুধ আছে?

বোরোফ্যাক্স আছে।

কাল একটু এনো তো।

ভাবতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। কার ওষুধ কোন গালে এসে লাগবে? যদি একবার জানাজানি হয়ে যায়! ন্যাড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে উলটো করে বসিয়ে, ঢাক ঢোল ফেস্টুন সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করাবেন।

কই বললে না তো তুমি আমার কে?

তুমি আমার ভৈরবী।

সে আবার কী?

আমার একটা পরিকল্পনা আছে মায়া। একদিন শেষরাতে তুমি আর আমি গৃহত্যাগ করব। আমার এই বড় বড় চুল। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে রক্তাম্বর। এক হাতে চিমটে, আর এক হাতে ত্রিশূল। পাশে তুমি আমার ভৈরবী। রুক্ষ, এলো চুল। লাল শাড়ি। কপালে এতখানি গোল সিঁদুরের টিপ। যেতে যেতে যেতে যেতে, কোনও এক মহাশ্মশানের পাশে দু'জনে ধুনি জ্বালিয়ে বসব। একটু একটু করে মহামায়াকে জয় করে সিদ্ধ সাধক হয়ে বসব। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সব আমাদের পায়ের তলায়।

তার মানে বউ!

ঠিক বউ নয়। সে কীরকম এক ধরনের ব্যাপার, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি নিজে বুঝে, তোমাকে বুঝিয়ে দোব।

ওসব সাধুটাধু হতে পারব না বাপু। আমার ভীষণ মাছের লোভ। চুনোমাছ বেশ সরষেবাটা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে গরগরে ঝাল তৈরি করে একথালা গরমগরম ভাত। তারপর একখিলি পান। ডুরে শাড়ি। ও গেরুয়া মেরুয়া সব ভণ্ডামি। চটকলে অনেক লোক নেবে শুনলুম। চেষ্টা করে দেখো না। তা হলে বেশ পালানো যায়!

কী বলে রে? আমি কার ছেলে? কত বড় আমাদের বংশ। ইচ্ছে করলে আমি কী না হতে পারি! ওকালত, কালোয়াত। ইচ্ছে করি না তাই! নাবালিকা। লঘুগুরু-জ্ঞানশূন্য।

উঠে পড়ি বাবা! সন্ধেটন্ধে দিতে হবে।

টিনের বাক্স হাতে মায়া ঘরের দিকে চলেছে। আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে। শাড়ি একটু উঁচু করে পরা। কত পাপ যে করেছি! লুকিয়ে লুকিয়ে বিদ্যাসুন্দর পড়েছি। তাকাতে গিয়ে যে সেই লাইনটাই মনে আসছে,

নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব।
কাম-পারাবার-পার-সার-অবলম্ব॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়।
মনোভাব পরাভব লইয়া পলায়॥

বাড়ি ফিরতেই কনক বললে, তুমি তো আচ্ছা। কথা আটকে গেল। তোমার কপালে ওটা কী?

মরেছে। সেই কাচপোকার টিপ। বৈষ্ণব পদাবলির সেই দৃশ্য। অভিসার শেষে রাধা ফিরছেন কুঞ্জ হতে। অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে। ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি। কপাল থেকে চট করে টিপটা খুলে নিয়ে পাকা অভিনেতার মতো বললুম, কিছু লেগেছিল বোধহয়! ভাগ্যিস সময়টা সন্ধে। নয়তো ধরা পড়ে যেতুম।

মেসোমশাই ডাকছেন, কনক, কনক। সন্ধে হল।

আসি বাবা। কনক যেতে যেতে বললে, তাড়াতাড়ি হাত পা ধুয়ে এসো। প্রার্থনায় বসতে হবে।

সে আবার কী? সে তো বহুকাল আগের কথা! অস্পষ্ট স্মৃতি। সকালে হাত জোড় করিয়ে হাঁটু মুড়ে বসিয়ে এক নারীমূর্তি আমাকে প্রার্থনা করাচ্ছেন,

সকালে উঠিয়া আমি মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি॥

তিনি হয়তো আমার মা ছিলেন কিংবা জ্যাঠাইমা। এই ছাড়া-গোরুকে কে আবার গোয়ালে তুলতে চায়! সাঁঝাল দিতে চায়। সব তো চুকেবুকে গেছে। আমার মনে যে বড় বেদনা! আমার যে কেউ কোথাও নেই। আমি ঈশ্বরকেই চাই, তবে পুরুষের বেশে নয়। নারীর বেশে। যত মত তত পথ। তুমি আমার প্রেমিকা হয়ে এসো।

তোমার দিন কি এইভাবেই কাটে পিন্টু! মেসোমশাই সামনে দাঁড়িয়ে। তুমি কি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছ?

আজ্ঞে না! এই একটু লাইন চেঞ্জের সময় তো!

তার মানে? তুমি রেলগাড়ি, না কলকাতার ট্রামগাড়ি! দুপুরবেলা বন্ধুবান্ধব নিয়ে হইহল্লা করছ। সন্ধে উতরে যাবার পর বাড়ি ফিরছ! হরিদা সারাদিন অফিসে থাকেন। ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বিকেলে আমাকে একটু বেড়াতেই বলেছেন।

ফাজিল ছেলেদের মতো মুখে মুখে তর্ক কোরো না। যাও ঠাকুরঘরে যাও।

প্রদীপের শিখা স্থির। ডগার দিক মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। গরদের কাপড় পরে মেসোমশাই আসনে বসেছেন। ধূপের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে। পেছনে আমরা তিনজন। সামনে পেতলের ওঁ-এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন। পটে মা লক্ষ্মী। মায়ের হাতে লাগানো সিঁদুরের দাগ এখনও লেগে আছে। নিস্তব্ধ। দূরে, বহুদূরে কোনও মন্দিরে আরতির ঘন্টা বাজছে। প্রদীপের শিখা মাঝে মাঝে ফটফট করে উঠছে।

হঠাৎ আমরা সংগীতে ভেঙে পড়লুম, ভবসাগর তারণ কারণ হে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। সুর ঢেউয়ের মতো একবার করে উঠছে, একবার করে পড়ছে। মন বলছে, ঈশ্বর, মেসোটি যেন রাতে ভিমরুলের চাকে খোঁচা না মারেন!

বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে

আপনার প্রথম চিঠি আমি পেয়েছি। কিন্তু আপনার দ্বিতীয় চিঠি, যে-চিঠিতে আপনি দিন, তারিখ লিখে জানিয়েছেন বলছেন, সে চিঠি আমি পাইনি। দেখুন পোস্ট করেছেন কি না!

কী বলছেন আপনি হরিদা? আমি নিজে হাতে লাল ডাকবাক্সের ঠোঁটে টুক করে গলিয়ে দিলুম, কোর্টে যাবার পথে। আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। আইনের ব্যাবসা করি। মক্কেল চরিয়ে খাই।

আপনি তো গোড়াতেই গলদ করে বসে আছেন বিনয়দা। যেসব ডাকবাক্স পথের ধারে ষাঁড়ের মতো বসে আছে, তাদের স্বভাব আপনার জানা নেই। কিছু গলায় রাখে, কিছু পেটে। চিঠি ফেলতে হলে কাঁধ পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে। সে চিঠি এখনও আপনার আটকে আছে। লেটারবক্স ডাইজেস্ট করতে পারেনি।

হতে পারে। পৃথিবীকে আমি আর বিশ্বাস করি না। এর অনেক মুখ। জাস্ট লাইক এ কারবাঙ্কল। তবে ডাকবাক্সে আমি আর জীবনে হাত ঢোকাব না। সে চিঠি যাক আর না-যাক।

অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা। কারণটা কী?

সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ডাকবিভাগের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

কনক চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকছিল। তার গলা দিয়ে কুঁক করে একটা শব্দ বেরোল। যেন পাতিহাঁস একবার ডেকেই পেছন উলটে জলে গলা ডোবাল। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিতে পেরেছে। এই যা রক্ষে। দুই অভিভাবকই ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছেন। দু'জনেই মনে হয় সমান ধাতের মানুষ। একই ধাতুতে তৈরি। টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ। কনক আমার পিতাঠাকুরের সামনে খুব কায়দা করে চায়ের কাপ রেখে বললে, আপনার চা মেসোমশাই। দুধ কম, চিনিও কম।

দ্যাটস ফাইন। তুমি কী করে জানলে, আমি দুটোই কম পছন্দ করি?

আমি যে জেনে নিয়েছি আগেই।

তোমার সব দিকে এত নজর?

সবে আধঘণ্টাও পেরিয়েছে কি না সন্দেহ। পিতা অফিস থেকে ফিরেছেন। এর মধ্যেই কনকের নজরে অভিভূত। মেয়েদের এই একটা সুবিধে। সহজেই মন জয় করে নিতে পারে। পিতা এমনভাবে তাকিয়ে আছেন যেন সন্ধিপুজোর মুহূর্তে ধূপধুনোর ধোঁয়ার পাতলা আবরণের আড়ালে দেবী দুর্গাকে দেখছেন ভক্তের চাহনিতে। স্তোত্রটি পড়ে ফেললেই হয়, 'নমস্তে সিদ্ধসেনানী, আর্যে মন্দরবাসিনী, কুমারী, কালী, কপালী, খড়্গখেটকধারিণী।' উপায় থাকলে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পৃথিবীটাকে বাকি জীবনের জন্যে একবার দেখে নিতুম। ন্যাজে খেলানো কাকে বলে! মুকুর প্রশংসা তো আগেই এক পক্কড় হয়ে গেছে। গার্গী মৈত্রেয়ীর

সমপর্যায়ে উঠে পড়ার টেবিলে গ্যাঁট হয়ে বসে, গনর গনর করে কী একটা মুখস্থ করছে। এলো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর। সুখেন হলে নেচে নেচে গাইত, এলো চুলে গৌরী আমার শাঁখা সিঁদুর পরেছে।

বাবা, তোমার গরম জল কি এখন আনব?

গরম জল? আচ্ছা নিয়ে আয়।

আমার পিতার হঠাৎ খেয়াল হল কনকের পিতার এই অসময়ে গরম জল আবার কী হবে? প্রশ্ন করলেন, গরম জল কী হবে? চান করবেন?

না না। গরম জল খাব।

কেন চা?

চা আমার চলে না। যৌবনে বিশ কাপ, পঁচিশ কাপ ডেলি খেয়েছি। লিভার পাকতেড়ে মেরে গেছে। রোজ সন্ধের দিকে অম্বল। ডা. রায়ের প্রেসক্রিপশন— গরম জল।

চায়ে লিভার খারাপ করে এ থিয়োরি আপনি কোথায় পেলেন?

প্র্যাকটিক্যাল করে সিদ্ধান্তে এসেছি।

আপনার লিভার তো মশাই ডাক্তারের বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে। সাত-আট লেয়ার চর্বির তলায় যেভাবে চাপা পড়ে আছে! ওটাকে ওভাবে বাড়তে দিলেন কেন? উত্তরপ্রদেশ বড় করুন। কাজে লাগবে। মগজটাই তো সব। অবশ্য ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিতে মধ্যপ্রদেশই বড়।

এ কি আর ইচ্ছে করে করেছি দাদা! মেড বাই অম্বল। আপনি কিন্তু চেহারাটাকে বেশ ফিট রেখেছেন!

রাখার কৌশল আছে। জানতে হয়। সবকিছুই সাধনার ব্যাপার। আছেন তো এক মাস। আপনাকে একটা চেহারা দেখাব।

ওসব ব্যায়ামবীরদের কথা আমাকে বলবেন না। এনাফ অফ দেম। ফ্যাশানেবল স্ত্রী আর মাসলম্যান, দে আর গুড ফর নাথিং।

আরে না মশাই, ওসব দেহধর ফেহধরদের আমিও জানি। তেল মেখে আলোর সামনে দাঁড়িয়ে পেশি নাচানো ছাড়া তারা আর কিছু জানে না। আপনাকে একটা সিস্টেম দেখাব। আমাদের ন্যাশন্যাল ফ্রুটের মতো ঝনঝনে।

ন্যাশন্যাল ফ্রুট কী জিনিস? কাঁঠাল? যা আমরা এতকাল ধরে পরস্পর পরস্পরের মাথায় ভেঙে আসছি। যা চিরকাল গাছেই থেকে গেল আর আমরা গোঁফে তেল দিয়ে দিয়ে তেল ফুরিয়ে ফেললুম।

মন্দ বলেননি। কাঁঠালের জাতীয় ফল হবার সব গুণই আছে। তবে আমি জাতীয় ফল করে রেখেছি আমড়াকে। আদর্শ বাঙালি চরিত্র। আঁটি চর্মসার। দাঁতে ঠেকান, বাপ বলে লাফিয়ে উঠতে হবে। ওই যে বসে আছে। তাকিয়ে দেখুন। নিশ্চিন্ত আরামে। হাত পা এলিয়ে। চোখের দৃষ্টি দেখুন। উদাস, নিরালম্ব। যেন এন্ড অফ দি ওয়ার্লডে পৌঁছে গেছে। গান ধরলেই হয়, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল। ওই হল দিশি আমড়া।

ওর সিস্টেম কি খুব ভাল?

কনক কাচের গেলাসে গরম জল এনে সামনের টেবিলে রেখে চলে যেতে যেতে আমার দিকে তাকাল। এক ফুটের গরম জল দেখলেই বোঝা যায়। বুজকুড়ি ভাসছে। অনেকটা মায়ার গালের যুবতী ব্রণের মতো। মেয়েদের গালে ব্রণ এলেই বুঝতে হবে আম গাছে মুকুল এসেছে। মউ মউ সুবাস। ভ্রমরের ভ্যানর ভ্যানর। তোমার মুখে জুতো। কেন? কে তুমি? আমি তোমার সাত্ত্বিক মন। এত তুলোধোনা হয়েও তোর শিক্ষা হয় না রে! মন ছুটছে মায়াপুর।

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল
চঞ্চল চীত্র পইঠো কাল॥

তোর দেহ থেকে পাঁচটা ডাল পাঁচ পাশে হাত বাড়িয়ে উদম নৃত্য করছে, মনের অঙ্গনে ঢুকে বসে আছে মহাকাল। মন তুই কৃষ্ণ কথা বল, কৃষ্ণ কথা বল।

ওর সিস্টেম? পিতা চায়ে চুমুক দিয়ে এমন একটা মুখ করলেন যেন পৃথিবীর বাইরে অন্ধকার মহাশূন্যে ভেলায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দু'হাতে কাপডিশ। কাপ ডিশ থেকে ইঞ্চিখানেক ওপরে ঝুলছে। আবার বললেন, অনেকটা ঘুমঘোরে, ওর সিস্টেম? আহারে অনাহার, শ্রমে বিশ্রাম, চিন্তায় নিশ্চিন্তা, দর্শনে অদর্শন, ভাবে বিভাব, উনি এক শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ। দয়া করে পাটকাঠি সদৃশ এক দেহাধারে ধরা পড়েছেন। একদিন মট করে ভাঙবেন আর উড়ে চলে যাবেন। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি এ পাড়ায় থাকেন, নাম মেনিবাবু। জীবনে একবারও অসুস্থ হননি। শরীর কঞ্চির মতো। মন ধারালো তলোয়ারের মতো। বায়ুর বেগে চলেন। তড়িৎ বেগে কথা বলেন। খাদ্য? চা আর জর্দাপান। কী আপনি লিভার লিভার করছেন? জেনে রাখুন শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়।

মেসোমশাই গরম জল খেতে লাগলেন। পিতা উঠে পড়লেন চেয়ার ঠেলে। বসবার সময় কোথায়? কথায় কথায় বলেন, আই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড অ্যান্ড স্টেয়ার। রান্নামহল থেকে হাঁক এল, চলে এসো। অন্যদিন হলে এই ডাকে আমার ময়দা মাখা শুরু হবার কথা। দু'কৌটো ময়দা, মাঝে গাব্বু তৈরি করে দু'চামচে ভাদুয়া, একটু নুন। নাও ঠেসে যাও। ঠাসতে ঠাসতে হাতের কবজি, কাঁধ টনটন করতে থাকবে। ততক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না হুকুম হয়, স্টপ।

ভেতরের দরজার পাশে কনক চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, এখন কী হবে?

একের পর এক নাটকের অঙ্ক হয়ে চলেছে সেই উত্তীর্ণ সন্ধ্যা থেকে। পরদা পড়ছে আর উঠছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছড়ানো-ছেটানো জিনিস দেখে বললেন, একী, এয়াররেড হয়ে গেছে নাকি? কনক, মুকু আর মেসোমশাইকে সামনে দেখে বললেন, আপনারা আবার কে? চেনাচিনি হয়ে যাবার পর হাওয়া মোটামুটি ধীরেই বইছিল। আবার ঝড় বইতে শুরু করেছে।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বেশ উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, দুপুরে অতিথিদের কী ব্যবস্থা করেছিলে? কিছু জুটেছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সবই তো ছিল। ওঁরাই সব তৈরিটৈরি করে নিলেন।

তা হলে রাতের ব্যবস্থা করা যাক। ওঁরা কী আহারাদি করবেন জানতে পারলে ভাল হত।

অন্ধকার থেকে কনক সাহস করে এগিয়ে এল। পিতা যেন আশার আলো দেখতে পেলেন, এই যে কাঞ্চন, তোমরা রাতে কী খাবে?

উত্তর দেবার আগে কনক নামটা সংশোধন করাবার জন্যে বললে, আজ্ঞে আমি কনক।

ও হ্যাঁ, তুমি কনক। কনক কাঞ্চন।

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কাঞ্চন সাধারণত ছেলেদেরই নাম হয়।

দ্যাট আই নো। কনক মানে কী?

সোনা।

কাঞ্চন মানে কী?

সোনা।

তা হলে? আমার ভুলটা দেখলে কোথায়? আমি ওকে স্বর্ণ বলে ডাকতে পারি, সোনা বলে ডাকতে পারি। একই মানে। রোজ সকালে কয়েক পাতা করে অমরকোষটা মুখস্থ করো। তাতে তোমার ওই বোকা-বোকা ভাবটা কিঞ্চিৎ কেটে যাবে।

উঃ, কী থেকে কী হয়ে গেল! দু'জনেই অপ্রস্তুত। গাধার মতো দাঁড়িয়ে ঘা চাটছি। কনকের কিন্তু সাহস কম নয়! পরিস্থিতি একটু থিতোতেই প্রশ্ন করল, আপনারা রাতে কী খান জানতে পারলেই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সব তৈরি হয়ে যাবে। আমরা যে ক'দিন আছি, আপনাকে আর রান্নাবান্না নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

খুব ভাল কথা। আমি কিন্তু তা হতে দোব না। আমার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে। তোমরা চলে যাবার পর বিপদে পড়ে যাব।

আপনি কী বলছেন মেসোমশাই। জ্ঞানী মানুষের কখনও অভ্যাসের দাস হওয়া উচিত নয়।

উঃ, শাবাশ। ভয়ে চোখ আর দম দুটোই বন্ধ। বোমের পলতেয় আগুন পড়েছে। দেখতে পাচ্ছি ফিচির ফিচির ফুলকি ছাড়তে ছাড়তে এগোচ্ছে। ফাটল বলে। মৃদু হাসির শব্দে চোখ খুলে গেল। বোমা ফাটল না। কনকের মেসোমশাই হাসছেন। মেয়েদের কী মহিমা রে! আগুনে আগুন নেই। তাপে তাপ নেই। জলে জল নেই। আমার মায়া! বিকেলে যখন চটকাচটকি করছিল, শরীরে উত্তাপ দেখে মনে হয়েছিল, ম্যালেরিয়া। তুমি কাঁপছ। তোমার জ্বর। কুইনিন খাও।

আজ্ঞে না গর্দভ। মেয়েদের আর বেড়ালের তাপ একটু বেশিই হয়। বুড়ি হয়ে বৃন্দাবনে গেলে তবেই এ জ্বর ছাড়বে।

আবার সেই মায়া? মায়ায় মজেছে মন। ভালই গাও, মজল আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে। শ্যামামাকে আর কষ্ট দিয়ো না। মন টোল খেয়েছে, টাল খেয়েছে। শ্যামা কেটে মায়া বসাও।

পিতা বললেন, হেরে গেলুম তোমার কাছে।

এ যেন নিমাইয়ের কাছে রঘুনাথ শিরোমণির হার। হারতেই হবে। অতবড় একটা কাবুলিকে ছোট্ট মেয়ে মিনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছিল। মুঠো মুঠো কিসমিস, আখরোট, মনাক্কা, খুবানি। ঝুলি থেকে বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। কনক হাসতে হাসতে বললে, এতে হারজিতের কিছু নেই মেসোমশাই, মেয়েদের কাজ মেয়েরাই করবে।

তা ঠিক, তা ঠিক। পিতা মাথা নাড়লেন।

কনক কথাটা এমন করুণ-করুণ মুখে বললে, যেন কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়ে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কেই যদি এই কুকুর আর প্রভুর ভাবটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে আর কোনও সমস্যা থাকে না। ন্যাজ নেড়ে নেড়ে ঘুরে যাও।

রাতে তা হলে লুচিই হোক।

তাই হোক, মেসোমশাই। এক হাতে কাচের গেলাস, আর এক হাতে তাসের মতো ধরা দুটো বড় নোট।

আপনার তো আবার অম্বল হয়েছে?

আই ডোন্ট কেয়ার। সোডিবাইকার্ব ইজ দেয়ার।

তা হলে লুচি হোক, রাতটা নিরামিষেই চলুক, চিনে ঘাস দিয়ে দুধের পায়েস, একটু গোলাপের আতর। মারভ্যালাস!

গেলাসটা মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে, মেসোমশাই দু'বার গলা ঝেড়ে বললেন, হরিদা, সবার আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া যাক, এই দুটো আপাতত আপনার কাছে রাখুন।

মেসোমশাই হাসি-হাসি মুখে গুটিগুটি এগোচ্ছেন। পিতার মুখ ক্রমশই কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এইবার বোমা ফাটবে।

হোয়াট!

বাতাসের ধাক্কায় মেসোমশাই দুলে উঠলেন। এত জোরে হোয়াট বেরোবে কে আর ভেবেছিল?

আপনি আমাকে টাকা দেখাতে এসেছেন? এত অহংকার! অহংকারং বিমূঢ়াত্মা।

ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন হরিদা! এতে আপনি অহংকারের কী দেখলেন?

সেই বোধটুকু থাকলে আপনি ওভাবে টাকার পেখম মেলে বাইজি বাড়ির বাবুর মতো এগিয়ে আসতেন না। আপনি আমার অভিমানে ধাক্কা মেরেছেন। ভাবতেই পারলেন না যে আপনি আমার আত্মীয়। আপনি ক্ষুদ্র, আপনি বীভৎস। আপনার সভ্যতার ঝুলি থেকে হুলো বেরিয়ে পড়েছে।

পিতা ধাপে ধাপে চড়ছেন, মেসোমশাইয়ের কপালের কোঁচ একটি একটি করে বাড়ছে। প্রতিবাদের জন্যে ঠোঁট নড়ছে, শব্দ বেরোবার ফাক মিলছে না। সিনেমা হলের দরজা দিয়ে যখন গলগল করে লোক বেরোতে থাকে তখন ঢোকার লোকেরা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে গা বাঁচিয়ে। যত জোরে হোয়াট দিয়ে শুরু করেছিলেন ততোধিক জোরে একটি হাঁচি দিয়ে মেসোমশাই-নিধন পর্ব শেষ হল।

মেসোমশাই বললেন, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমি টাকা দেখাবার জন্যে টাকা দেখাইনি। এই বাজারে তিনজন এক মাস এবেলা ওবেলা খাবে তার একটা খরচ আছে তো! আমি সেই ভেবেই শেয়ার করতে চেয়েছিলুম। আপনি আমার পয়েন্টটা না বুঝেই বেশ কিছু কটু কথা হুড়হুড় করে বলে গেলেন, আপনার যেমন সেন্টিমেন্টে লাগল, আমার তেমনি লাগল প্রেস্টিজে। এ এক ধরনের অপমান।

দুই যোদ্ধার মাঝে কনক এসে দাঁড়াল। এ মেয়ে অ্যানি বেসান্ত কি হেলেন কেলারের দ্বিতীয় সংস্করণ। লেডি উইথ দি ল্যাম্প। কনক বললে, ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। মেসোমশাই, আপনি শান্ত হন। বাবা, আপনি একটু কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন।

সমর্থন পেয়ে পিতা আবার লাফিয়ে উঠলেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি জিনিসটার কুৎসিত দিকটা ঠিক ধরতে পেরেছ। এটা তো হোটেল নয়, সরাইখানা নয়, পাঞ্জাবির পকেট থেকে কড়কড়ে নোট বের করে নাকের ডগায় ছুড়ে দেবেন, এই নিন। এক মাস কেন? আপনারা এখানে এক বছর থাকুন অতিথি হয়ে। আমার কে আছে বিনয়দা। রাজ্যপাট ভেঙে গেছে, সভাসদরা বিদায় নিয়েছে। আপনারা এসেছেন এই তো আমার সৌভাগ্য। বহুদিন পরে গাছের ডালে পাখি এসে বসেছে। কতকগুলো নোংরা কাগজ নেড়ে সুর কেটে দেবেন না। আমার অনুরোধ।

গলা যেন একটু ধরাধরা। এই যে সব থাকা আর না-থাকা, আমি আছি, তোমরা নেই, এইসব বিচ্ছেদের ব্যাপারট্যাপার সংসারী মানুষকে বড় বিচলিত করে। একটু বেদান্তের দিকে সরতে পারলেই বগল বাজিয়ে ঘোরা যায়, 'এই সংসার ধোঁকার টাটি, খাই দাই আর মজা লুটি।' জগৎ সব ভুল, স্বপ্নবৎ। আমিতেই মেরেছে। আমির বোধেই, তোমার বোধ। নীচে আগুন জ্বলছে, হাঁড়িতে ডাল, ভাত, আলু, পটল সব টগবগ করছে। লাফাচ্ছে, আর বলছে, 'আমি আছি', আমি ধিনতা ধিনা লাফাচ্ছি। শরীর সেই হাঁড়ি, মনবুদ্ধি জল, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি ডাল, ভাত, আলু, পটল, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার। অহং যেন তাদের অভিমান, আমি ফুটছি, ফাটছি। সচ্চিদানন্দ, তুমিই সেই অগ্নি। আহা, জগৎজোড়া কাবাবের কারখানা। থুড়ে থুড়ে কিমা। প্রশ্ন, কিমাং কিম করোতি। আসল জ্ঞান কি ব্যাকরণে আছে? আসল জ্ঞান কি গণিতে আছে? পাঁজিতে অনেক জলের কথা লেখা আছে। নিংড়োলে এক ফোঁটাও বেরোবে না। আসল জ্ঞান ফুটে ওঠে। প্রথমে একটু জ্বরজ্বর, কোমর ব্যথা, তারপর কপালে একটি গুটি, গলায় দুটি, পিঠে তিনটি! ব্যাপার কী? পক্স। ফক্সের সংসারে পক্সের মতো এইভাবেই গুটিকয়েক মানুষের মনে ব্রহ্মজ্ঞানের গুটি বেরোয়। বাকি সব অহংয়ের কচকচি। বয়েসফয়েস কিছুই নয়। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, সব কাঁচা বয়সেই যোগী।

পিতার শেষ কথায় পরিস্থিতি শীতল হয়ে এল। মৃত্যু, বিচ্ছেদ, শূন্যতা প্রৌঢ় মানুষদের সহজেই কাবু করে ফেলে। যুবকদের সমস্যা অনেক কম। এই যেমন আমি। কনকরা চলে যাবার পর দিন তিনেক মন হুহু করবে বাউল আর ভাটিয়ালি গানের মতো। বাথরুমে জল পড়ার ঝরঝর শব্দের সঙ্গে, মন মাঝি তোর বইঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না মিলিয়ে, ছলছলে চোখে নাঙ্গা হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা। তাতে কনকেরও কিছু এসে যাবে না, আমারও কাঁচকলা। দশ বছর পরে দেখা যাবে কনক মা হয়ে মেয়ে কোলে কোনও এক্স ওয়াই জেডের ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব দুঃখ হবে মায়ার কিছু হলে। না, মায়ার কথা যখন-তখন ভাবা উচিত নয়। মায়া আমার মাঝরাতের মালকোষ, ভোররাতের যোগিয়া।

মেসোমশাই এগিয়ে এসে পিতার হাত ধরে বললেন, ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট। যা হয়ে গেল, তা হচ্ছে প্রিন্সিপিল-এর লড়াই।

হাত-ধরা অবস্থাতেই পিতা বললেন, আজ্ঞে না, একে বলে অহংয়ের ঠোকাঠুকি। কেউ কারুর কাছে ছোট হব না। অহংয়ের বাষ্পে দৃষ্টি আচ্ছন্ন, বিচারবুদ্ধি ঘোলাটে। মোটরবাইক কীভাবে স্টার্ট নেয় দেখেছেন?

দেখলেও খেয়াল করিনি।

পিতা হাত মুক্ত করে নিলেন। দু'হাতে মোটরসাইকেলের হাতল। সামনে শরীর একটু ঝুঁকে আছে। বাঁ পা স্টার্টারে। ফার্স্ট ফিক, সেকেন্ড, থার্ড কিক। ভটভট, ভটভট। একেই বলে অহংয়ের লাথি।

মেসোমশাই, কনক দু'জনেই হেসে উঠলেন। যাক বাবা, আবহাওয়া ময়ান দেওয়া ময়দার মতো মোলায়েম হয়ে গেল। দুই ব্যাঘ্র চলে গেলেন বারমহলে। ছায়াছায়া বারান্দায় কনককে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! বুলবুল গান গায় নার্গিস বনে। বিচিলি রঙের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। ধারালো চেহারা। চকচকে কালো চুল। চোখে আলো পড়লে নীল সাগরে ভেসে থাকা কালো মণি ঝলসে ঝলসে উঠছে।

কনক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, তোমার একজন বোন থাকলে বেশ হত।

তুমি তো আছ।

আমি আর ক'দিন বলো?

তা ঠিক। যদিন আছ তদিনই বাড়ি জমজমাট। তারপর সংসার চলবে শেষবেলার জলের চাকার মতো। চাষার ক্লান্ত হাতে চাকা জলে নামছে, ঘুরে ঘুরে, ধীরে ধীরে উঠছে। সরষে-খেতে জল পড়ছে ছিড়িক ছিড়িক করে।

থাক আর কাব্য করতে হবে না। এখন লুচি, ছোলার ডাল, আলুর দম। ঘড়ির কাঁটা কোথায় গেছে দেখেছ!

ডাক উঠল, পিন্টু, পিন্টু। এক মিনিট দেরি করার উপায় নেই। আজ্ঞে বলে ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিনের মতো দৌড়োতে হবে। দুই পিতাই আবার চেয়ারস্থ। বেশ ভাব হয়ে গেছে দু'জনের। প্রসঙ্গটা কী জানি না। মেসোমশাই খুব কাকুতিমিনতি করছেন, ওসব হাঙ্গামার দরকার নেই হরিদা। খাদ্যতালিকা যা তৈরি করেছেন যথেষ্ট।

এ ব্যাপারে আপনার কথা বলার কোনও অধিকার নেই বিনয়দা। আপনি আমার সম্মানিত অতিথি। আমাদের বংশের একটা ধারা আছে।

বংশই নেই তো বংশের ধারা! শেষ বাতিটি কে জ্বালাবে! আমি তো আজ আছি কাল নেই। গুরু পেলেই বৃন্দাবন। তখন তো অনেক কথাই ফিরিয়ে নিতে হবে, যেমন দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভাল। পিতা বললেন, একটা কাজ করতে পারবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কেন পারব না!

পরেশের দোকানে গরম রসগোল্লা ক'টার সময়ে নামে?

রাত বারোটা নাগাদ।

তুমি ঘোড়ার ডিম জানো।

আমি সেইরকমই শুনেছি।

কার কাছে?

কে যেন বলছিল। ওই পেটের গোলমাল হয়েছিল। রাত বারোটায় গিয়ে পরপর তিন দিন ছ'টা করে রসগোল্লা খেয়ে সেরে উঠেছে।

সে তোমার কোনও গেঁজেল বন্ধু। আমি জানতুম, তোমার দ্বারা চুলের কেয়ারি ছাড়া অন্য আর কিছু হবার উপায় নেই। আমিই যাচ্ছি। কতক্ষণ লাগবে? যেতে তিন মিনিট, আসতে তিন মিনিট।

আমি তো যাব না বলিনি!

তবে যাও। বলে এসো রাত দশটার সময় এক সের গরম রসগোল্লা চাই। সবচেয়ে বড় সাইজের যেটা সেইটা।

মেসোমশাই আর একবার মৃদু গলায় বললেন, কেন হাঙ্গামা করছেন হরিদা?

এটা আমাদের ব্যাপার বিনয়দা। যাও, তুমি আবার তানানানা করছ কেন?

গরম হাওয়া পেলে বেলুন ফুস করে ঠেলে আকাশে ওঠে। রাস্তায় পা রেখে মনে হল আমারও সেই অবস্থা। বাড়ির দিকে তাকিয়ে ফিরে ফিরে দেখছি। খোলা জানলায় আলো ফটফট করছে। মানুষের ছায়া নড়ছে দেয়ালে। বাইরে থেকে দেখলে মনেই হবে না, গরাদহীন উন্মাদ আশ্রম! পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে যেন বললেন, কী দেখছ হে ঘুরে ঘুরে? আমাদের পাড়ার বিধুজ্যাঠা। পাটের দালাল। বেশ ভোগীর চেহারা। বগলে একটা ব্যাগ। চোখে সোনালি চশমা।

বাড়ি দেখছি জ্যাঠামশাই।

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশ্বরূপ শেষরাতে গৃহত্যাগ করছেন, জানলায় দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া। হরি ফিরেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

একবার মনে করিয়ে দিয়ে তো! আমি যা বলেছিলুম সেটার কী হল? রবিবার আমি অবশ্য একবার দেখা করার চেষ্টা করব।

পরেশদা ছানায় জাঁক দিচ্ছেন। পরনে সেই গামছা, গোলগলা আধময়লা গেঞ্জি। রসে-ডোবা চমচমের মতো চেহারা। নীচের দিকটা তাকিয়ার মতো, ওপরদিকটা মাথার বালিশের মতো। তার ওপর একটা তিন নম্বর ফুটবল। দুটো বারকোশের মাঝখানে কাপড় জড়ানো ছানার নাদা। ছাদে উঠে পরেশদার লেফটরাইট চলছে। এক একবার চাপ পড়ছে আর সাদা সাদা জল বেরিয়ে আসছে। পরেশদা দিন দিন কী হচ্ছে! সত্যিই এর নাম 'টনিক ময়রা'। মিষ্টির দোকানে কাজ করতে পারলে, মাসখানেকের মধ্যেই মুটিয়ে যেতুম। নধরকান্তি একটি বটব্যাল।

পরেশদা, গরম রসগোল্লা কখন নামবে?

ছানার ওপর নাচতে নাচতে বললেন, ওই তো রস জ্বাল হচ্ছে। এইবার পড়বে।

দশটা নাগাদ?

এসো, দেখা যাবে।

এক সের বুক করে গেলুম। সবচেয়ে বড়টা।

বুক পেট জানি না। নামলেই নিয়ে যেয়ো।

রাত ক্রমশই রসগোল্লার মতো রসস্থ হয়ে উঠছে। সাত নম্বর বাড়িতে গানের আসর বসেছে। তবলায় চাঁটি পড়ছে। পানবিড়ির দোকানে রেডিয়ো বাজছে। ফটফট করে আলো। বোকাদা ডিম ভেঙে সকালকে সুপ্রভাত করেছিলেন। এখনও ভেঙে চলেছেন। বিদায়রজনী হবে রাত বারোটায়। ইংরেজি মতে তখন নতুন দিন শুরু হয়ে গেছে। জবাদের বাড়ির সেই সদাহাস্যমুখ বাবুটি হাতে একগাদা প্যাকেট ঝুলিয়ে নেচে নেচে চলেছেন, রাত হল, রাত হল, দ্বার খোলো প্রমদা।

গরম রসগোল্লা রেডি হচ্ছে। রাত দশটা নাগাদ পাওয়া যেতে পারে।

দেখেছ, তোমার ইনফর্মেশন কত ভুল! এই ভুল ইনফর্মেশনের জন্যে অতবড় হিটলারের পতন হল। ইংরেজের রাজত্বে সূর্য ডুবে গেল। সত্য শ্রবণে নেই সত্য দর্শনে।

হুড়মাড় দুদ্দাড় করে কনক উত্তরমহল থেকে দক্ষিণমহলে ছিটকে এল। হাতে একটা খুন্তি। সমস্বরে প্রশ্ন, কী হল, কী হল?

কোনওরকমে দম ফেলে কনক বললে, আরশোলা, অসংখ্য আরশোলা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে।

পিতা মেসোমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, নাপচিয়াল ফাইট, বুঝলেন বিনয়দা!

এখন দরকার ঝ্যাঁটা ট্রিটমেন্ট। এ রোগের দাওয়াই হল ঝ্যাঁটা পেটা। চলো পিন্টু।

কনকের চেয়ে আমার কিছু বেশি সাহস নেই। মাতুলক্রমঃ। সেই ঘটনাটি মনে পড়লে এখনও আমার হাসি গুমরে গুমরে ওঠে। কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে বসেছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসর। সময় সকাল। মাতুল ধরেছেন গুর্জরী টোড়ি। আলাপ জমে উঠেছে। দুটো তানপুরা দু'পাশ থেকে মিঞাও মিঞাও করছে। তবলচির হাত উসখুস করছে তবলায়। গানের মুখ এলেই তেরে কেটে করে লাফিয়ে পড়বেন। ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে ফিরর করে কী একটা উড়ে গেল। সুর বোধহয় পক্ষ বিস্তার করেছে। সুর নয় আরশোলা। পেছনের সাদা পরদায় বসে তাল খুঁজছে। কে জানত, মাতুলের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করছে। আরশোলা যাঁহাতক উড়েছে দ্বিতীয় চক্করে, তবলা, তবলচি, মাইক্রোফোন, হারমোনিয়ম, গাইয়ে সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে স্টেজ থেকে সামনের সারির দর্শকদের ঘাড়ে। গানের মুখ সবে ধরেছিলেন অব মেরে নইয়া। নইয়া পাড়ে ভেড়ার আগেই ডুবে গেল। হইহই ব্যাপার। বেনারসের ওস্তাদ চিৎকার করছেন, কেয়া হুয়া ওস্তাদজি? ওস্তাদজি, তবলচি তখন হামা দিচ্ছেন সামনের প্যাসেজে।

রান্নাঘরের আকাশে লাল বিমানবহর। সপাসপ ঝ্যাঁটা চলছে। ডাইনে বাঁয়ে। মাঝেমধ্যে দু'-এক ঘা পরস্পরের পিঠেও পড়ছে। পিতা বলছেন, নেভার মাইন্ড, নেভার মাইন্ড। এক একবার চাপস মারছেন। কখনও বলছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে কিছু বড় সাইজের টিকটিকি ইমপোর্ট করতে হবে। কখনও বলছেন, ছাতাওয়ালা গলির পিংলিংকে খবর দেবেন। এ জিনিস মেরে শেষ করা যাবে না, খেয়ে শেষ করতে হবে।

প্রেমোন্মাদ শেষ আরশোলাটিকে ঝ্যাঁটায় চেপে ধরে পিতা হাঁকলেন, কনক, অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট।

সারমন অন দি মাউন্ট

আমাদের নোনা-ধরা দেয়ালের যে-জায়গাটায় দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র তৈরি হয়েছে সেখানে একটা আদ্যিকালের বদমেজাজি ঘড়ি ঝুলছে। পেন্ডুলামের চেহারাটা হেডমাস্টারের মতো। গুরুগম্ভীর মুখে দুলছে তো দুলছেই। ছন্দটা এইরকম: নো, নো, আই ওন্ট টলারেট। বাজনার সুর রসকষহীন। দুপুর রোদে হাঁকছে যেন, শিল কাটাও। বাজা-র এক মিনিট আগে জানান দেয়, খ্যাঁড়াড়াক।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পিতাঠাকুর চুলে টাকপড়া বুরুশ চালাতে চালাতে বললেন, ক্লক স্ট্রাইকস টেন। যাও, রসগোল্লা।

ক্লক স্ট্রাইকস বললে কেমন একটা রহস্যের দরজা খুলে যায়। মধ্যরাতে ঘড়ি বাজে, কবর খুলে বাদুড় ওড়ে। চশমার খাপ থেকে দশটা টাকা বের করে আমার হাতে দিলেন। স্নান সেরেছেন। বেশ তাজা দেখাচ্ছে। ছাদের ঘরে ব্যায়াম হয়েছে। ঠাকুরঘরে বসা হয়েছে। ধর্মের জন্যে নয়, একাগ্রতার জন্য। সব কাজ সারা। এইবার রাত বাড়বে, পড়া চলবে, পাতার পর পাতা। টেবিলের একধারে বইয়ের পাহাড়। কী নেই। উপন্যাস, দর্শন, গণিত, ভূবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান। স্বল্পং স্তথা আয়ু বহবশ্চ বিঘ্না। শিশির ভাদুড়ীর মতো হাত পা নেড়ে বলেন, জ্ঞান অর্জন করে যাও, জ্ঞান অর্জন করে যাও। এক জীবনে সব হবে না। যতটা পারা যায়, যতটা পারা যায়।

টাকাটি হাতে তুলে দিয়ে বললেন, কড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। একটি একটি করে হাঁড়িতে তুলবে যখন, দেখবে। চোখ বুজিয়ে থেকো না। চোখ বুজিয়ে ঈশ্বরদর্শন হয়, জগৎদর্শন হয় না। টাটকা আর বাসি মিশিয়ে ছেড়ে দেবে। এ বড় শক্ত ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

বিশাল উনুনে ঢাউস কড়ায় রস ফুটছে। রসে টাবুরটুবুর করছে রাশি রাশি রসগোল্লা। শর্করার গন্ধমাখা ফিনফিনে ধোঁয়া উঠছে বাঁশের বাতার দিকে। কড়ার সামনে নৌকোর হালের মতো কাঠের হাতা নিয়ে টুলে বসে আছেন পরেশদা। চোখের চেহারা দেখেই মালুম হচ্ছে দু'-চার ছিলিম চেপে গেছে। যমরাজ বসে আছেন গ্যাঁট হয়ে। তপ্ত কটাহে জীবজগৎ হাবুডুবু। ভিয়েন দেখলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। রসে তাডু ডুবিয়ে তুলে দেখে ময়রা। এক সুতো। দু'সুতো। পাঁচ সুতায় পাকা পাক। পঞ্চেন্দ্রিয় চুর হলে জীব মুক্তি পায়। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

পরেশদা, এক সের বড় রসগোল্লা।

অপেক্ষা করো, হয়ে এসেছে।

বাঁশের খোঁটায় হুক লাগানো। সেই হুকে সোনপাপড়ির সুতো লাগিয়ে আর এক ভীমভবানী টানাটানি চালিয়েছে। এও আর এক খেলা। যত টানবে তত খাস্তা হবে। ততই মজবে ভাল। মাঞ্জামারা সোনপাপড়ি। রসের চাঁচর দাঁতে কাটবে নাগর। নাগর শব্দটা তেমন ভাল নয়। এসব কথা কেন মনে আসছে! বালযোগী সাবধান। ক্ষুরস্যধারা।

পরেশদা হাঁক মারলেন, নিতাই, নিতাই।

ইজের-পরা নিতাই দোকানের গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এল। একসেরি হাঁড়ি আন একটা।

ভিজে হাঁড়ি জল শুষছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ফিসফিস শব্দ ছেড়ে গেল, বড় তৃষ্ণা, বড় তৃষ্ণা। ওজন টোজনের প্রয়োজন হল না। বড় রসগোল্লা ক'টায় এক সের হয় পরেশদার জানা।

ছোট্ট বিড়ের ওপর হাঁড়ি। মুখে শালপাতার আবরণ। পাটের দড়ি দিয়ে কায়দা করে বাঁধা। হাঁড়ি ঝুলছে ডান হাতে। ফাউ চাইলে একটা মুগের নাড়ু মিলত। লোভ জয় করে ফেলেছি। চরিত্রের কী শক্তি! ওদিকে সারি সারি পাঁচপো মাপের হাঁড়ি লাইন দিয়ে বসেছে। দুধে টইটম্বুর, সাঁজা দিয়ে ফেলে রেখেছে। কাল সকালে জমে দই হবে।

রাতের রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। মধুবাবুর সাইকেল মেরামতের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। রকে একটা কালো কুকুর শুয়ে শুয়ে গা চাটছে। বেশ গ্যাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। কুকুরটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, একটা ডন মেরে রাস্তায় নেমে এল। ভয়ের কিছু নেই। কে চোর, কে সাধু, চেনার ক্ষমতা কুকুরের মতো আর কোনও প্রাণীর নেই। সাধে কুকুর পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথের সঙ্গী হয়েছিল?

আমি চলেছি। পেছন পেছন কুকুর চলেছে ফোঁস ফোঁস করতে করতে। চলতেই হবে, আমি যে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। মহাপ্রস্থান করার সময় তোকে নিয়ে যাব রে ভুলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে একটু সন্দেহ হল। ভুলো আমার সাত্ত্বিক চরিত্রকে অনুসরণ করে আসছে বলে মনে হচ্ছে না তো! ডান হাতে ঝোলানো হাঁড়িটা শুঁকতে শুঁকতে আসছে।

এতে রসগোল্লা আছে মানু। মাংস নেই। গরম রসগোল্লা।

ভুলো রাসকেলের এই মতলব ছিল কে জানত! সামনের দু'পা তুলে মারল টান। হাত ছেড়ে হাড়ি পড়ল রাস্তায়। ভটাস করে একটা শব্দ। ঘটাকাশ আর চিদাকাশ এক হয়ে বন্ধনমুক্ত জীবের মতো সাদা সাদা রসগোল্লা। আমরা চললুম পিন্টু, ভুলোর মুখ দিয়েই স্বর্গদ্বারে পৌঁছোব, তোমার পিতৃদেবকে বলে দিয়ো। উপবাসী শয়তান কাবাব জ্ঞানেই রসগোল্লা খেতে লাগল। ন্যাজটি কিন্তু নাড়তে ভোলেনি। শয়তান হলেও কুকুর তো! অন্ধকার রাস্তা। দোকানপাট সব বন্ধ। নর্দমার ধার থেকে আর একটি ছায়ামূর্তি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল। এইবার প্রেতের হাসি। খিলখিলে শব্দ। এ সেই মণিপাগলি। কুকুরটা একটা চাপা গর্জন ছাড়ল। আনন্দমঠের দুর্ভিক্ষের দৃশ্য। পাগলি উবু হয়ে বসে রসগোল্লা খাচ্ছে। প্রায় উলঙ্গ।

মণি কত বড় বাড়ির মেয়ে। দেখতে দেখতে চোখের সামনে কীভাবে পাগল হয়ে গেল! একসময় কী সুন্দর চেহারা ছিল। ভাল ফুল তো ফোটার উপায় নেই। মানুষ এসে ছিঁড়বেই। মণিকে যারা শেষ করে গেল, তারা এখন কোন ফুলে গিয়ে বসেছে কে জানে। ডাঁসা ডাঁসা ভোমরা উড়ছে। যৌবনের পরাগ ঝরে ঝরে পড়ছে। ভাগ্যিস মেয়েছেলে হইনি। ভাদ্র মাসে ভুলোরা শেষ করে দিত। হে ভারত ভুলিয়ো না তোমার নারীজাতির আদর্শ।

মণিপাগলিকে দেখে মনের জোর বেড়ে গেল। রসগোল্লার বদলে বকুনি খাবার জন্যে আমি এখন প্রস্তুত। প্রমাণ সহ পিতার সামনে উপস্থিত হতে হবে। প্রমাণ ছাড়া তিনি কিছু বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বরকে প্রমাণ করা

যায় না, সুতরাং তিনি নাস্তি। মাটির হাঁড়ির একটা টুকরো রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিলুম। ভুলোর একটা টুকরো নিতে পারলে ভাল হত।

মণি গান ধরেছে, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, পেটের ছেলের বড় দাম।

শূন্য হাতে ফিরতে দেখে পিতা বললেন, কী এখনও নামেনি নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ নেমেছে। আনতে আনতে কুকুরে ছিনিয়ে নিলে। এই যে ভাঙা হাঁড়ির টুকরো। ভুলো আর মণিপাগলি ভাগাভাগি করে খেয়েছে। নির্ভীক স্বীকারোক্তি। বুক ফুলিয়ে সত্যভাষণ। জর্জ ওয়াশিংটন তো তাই করেছিলেন। পিতার শখের গাছ তলোয়ারের এক কোপে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পিতা, এই অপকর্ম আমি করিয়াছি।

মেসোমশাই মেয়েকে পড়াচ্ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, ভগবানের ইচ্ছে নেই হরিদা। আপনি চেষ্টা করলে হবে কী?

ভগবান ফগবান আমি মানি না বিনয়দা। যখন যেমন, মানুষের ইচ্ছে ভগবানের ইচ্ছে বলে চালানো হয়। আমি পুরুষকারে বিশ্বাস করি। ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই! গরম রসগোল্লা আমি খাওয়াবই আর ওকে দিয়েই আনাব।

আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না? কী আশ্চর্য! তাঁর ইচ্ছেতেই তো জগৎ চলছে। জীব আসছে যাচ্ছে। গাছের পাতা নড়ছে। ফুল ফুটছে। পাখি ডাকছে। যেখানে যা দরকার তাই দিয়ে পৃথিবী সাজিয়েছেন। এ এক অনন্ত লীলা! আপনার আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়! ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণি-গণা ইব।

মেয়ের বই দেখে আমাকে আর স্যাংস্কৃট আওড়াবেন না। আমি সার বুঝেছি, ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ। ঈশ্বর আমার সামনে এসে দাঁড়ালেও আমি আগে আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাইব। যাচাই করে নেব ইমপোস্টার কি না? আমি মনুর সন্তান মানুষ। আমার সেই পিতার পিতা তস্য পিতা, প্রি-ইনফাইনাইট পিতা বলে গেছেন, যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতোহস্য স্যাৎ পরিতোষোহন্তরাত্মনঃ। তৎ প্রযত্নেন কুর্ব্বিত বিপরীতন্তু বর্জ্জয়েৎ। যে-কাজ করলে অন্তরাত্মার তৃপ্তি হয় আমি সেই কাজই করব। ওসব গডস্ উইশ ফুইশ আমি বুঝি না।

আগে তো আপনি এইরকম ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন না। কী কবে এরকম হয়ে গেলেন?

ঈশ্বর হলেন ধনীর বিলাসিতা, দরিদ্রদের দুর্বলতা। এই সংসারে একের পর এক যখন মৃত্যু নামছে, একটা করে প্রাণ ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখন মাঝরাতে, নির্জন ছাতে, তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে, জলভরা চোখে দিনের পর দিন বলেছি, প্রভু, আর না, আর না, এনাফ অফ ইট, এবার ক্ষান্ত হও। একেবারে শ্মশান করে দিয়ো না। আপনার ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব ঈশ্বর উল্কায় জ্বলেছেন, তারায় মিটমিট করেছেন, অ্যান্ড নাথিং মোর। ভীরুর কল্পনায় তাঁর মন্দির। ওয়ান্ট, ডেস্ট্রাকশন, ডেস্টিটিউশন, মিউটিলেশন, রেপ, র‍্যামপেজ, ডিভাস্টেশন, আপনার ঈশ্বরের পৃথিবীর নিত্য ঘটনা। হার্ড লিকার। চিনি দিলেও মিষ্টি হবে না। এই নাও দশটা টাকা। এইবার মাথায় করে আনবে। দেখি এইবার ঈশ্বরের কেমন ক্ষমতা! দ্যাট নন-এগজিস্ট্যান্ট অলমাইটি লর্ড, আই চ্যালেঞ্জ ইয়োর অথরিটি।

পরেশদার ভিয়েন নেমে গেছে। দোকানের বেঞ্চিতে বসে আছেন। বাচ্চা ছেলেটা ঘ্যাসর ঘ্যাসর করে পিঠের ঘামাচি চুলকে দিচ্ছে। ছেলেটাকে দেখে বড় কষ্ট হয়। কে যে কী করার জন্যে জন্মায়! কীভাবে বিকিয়ে

যায়! এই ভবের হাটে অনবরত চলছে বেচা-কেনা। কে কোন রাতে নিজের তাগিদে জন্ম দিয়ে সরে পড়েছে। এখন তুমি ভুগে মরো। নির্মলদা ঠিকই বলেন, তোমার আনন্দ আর একজনের দুঃখ। 'প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত। জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত। ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট, বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত।'

আয়েশে পরেশদার চোখ বুজে এসেছে। ছেলেটি তার গ্রাম্য ভাষায় বললে, খদ্দের এসেছে গো।

আসুক গে তুই শালা চুলকো।

আমার গলা না শুনলে আয়েশ কাটবে না। পরেশদা, এক সের গরম রসগোল্লা।

পরেশদা ঘাড় তুলে চিনলেন, আরে সেই ছোঁড়াটা আবার এসেছে। কী হল? এই তো নিয়ে গেলে।

ছোঁড়া শব্দটা শুনে পা থেকে মাথা অবদি জ্বলে গেল। ব্যাটার পয়সা হয়েছে। পয়সা হলে কী হবে কালচার নেই। না, রাগলে চলবে না। গীতা বলছেন, বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। গীতাকে তো আবার ব্যঙ্গ করেছেন ডি এল রায়। 'গীতার জোরে সচ্ছে ঘুঁষি, সচ্ছে কানুটিটে, গীতার জোরে পেটে না খাই, সয়ে যাচ্ছে পিঠে।' নানা ভাবের ধাক্কায় পৃথিবীর পথ খুঁজে পাওয়া বড় কঠিন হয়ে পড়ছে।

বেশ ঝরঝরে গলায় বলতে হল, দেরি হবে নাকি!

বাবা, তুমি যে দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছ?

হ্যাঁ, তাড়া আছে। আমার কাজ আছে।

ব্যাজার মুখে পরেশদা দোকানে ঢুকলেন। বিচিত্র স্বভাবের মানুষ। আগেও দেখেছি দোকানে কোনও নিম্নশ্রেণির মহিলা এলে, অন্য খদ্দের ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রসালাপ করবেন। স্বামীজি কেমন করে বললেন, মানুষই ঈশ্বর। বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। কী দৃষ্টি লাভ করলে পরেশকে ঈশ্বর ভাবা যায়! পরেশ ঈশ্বর, মণিপাগলি ঈশ্বর। আমিও ঈশ্বর। ঈশ্বরে ঈশ্বরে ছয়লাপ। পৃথিবী গিজগিজ করছে রে বাবা!

এবার আর কোনও ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। মাথায় না চাপালেও, প্রায় বুকের কাছে গরম হাঁড়ি চেপে ধরে গুটিগুটি এগোতে থাকি। কৃষ্ণকোলে নন্দলালা যমুনা পার হচ্ছেন। আর কোনওদিন রাস্তার কুকুরকে সোহাগ করে বলতে যাব না, মানু আমার, মাংস নয়, রসগোল্লা। অন্ধকারে ভোঁস করে একটা শব্দ হল। ইনি আবার কে? আমাদের পাড়ার সেই বিখ্যাত ষাঁড়টি। যার আতঙ্কে যুবতী গোরুরা রাস্তা হাঁটে ভয়ে ভয়ে। যে থানার বড় দারোগাকে শিঙে ঝুলিয়ে রেখে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে। খ্যাতিমান পুরুষ এখন প্রাণায়াম করছেন। কুলকুণ্ডলিনী ধ্যানস্থ। ইড়া পিঙ্গলায় মহেশ্বরের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার মতো গাভী সুন্দরীরা এখন গোয়ালে জাবর কাটছে। প্রকৃতিতে বড় কামপ্রভাব। পজেটিভ আর নেগেটিভ এক হবার জন্যে সদাই ছটরফটর করছে। তাতে তোর কী রে শালা। এ যে রামকৃষ্ণের গলা। তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম।

আমাদের বাড়িতে মধ্যরাতে সন্ধ্যা নামে। সব নিদ্রাজয়ী মহাযোগী। কোন বাড়িতে রাত বারোটার সময় কর্তা হাঁকেন, চা চাপাও তো! পিতৃদেব গর্ব করে বলেন, আমি হলুম নকটারন্যাল বার্ড। কালপ্যাঁচা। কেন এমন হয়েছে জানেন, একের পর এক রুগির পাশে বসে রাতের পর রাত জেগে জেগে আমার বায়োলজিক্যাল ক্লক ঘুরে গেছে। পৃথিবী যখন ঘুমোয় আমি তখন জাগি। সেন্টিন্যাল অফ দি নাইট। নাইটজার। পিতার স্টকে কত

যে ভাল ভাল শব্দ আছে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে সারাজীবন এমন পিতার পাশে থেকে সেবা করে যেতুম।

হাতে হাঁড়ি দেখে পিতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন, এসেছে এসেছে। পেরেছে পেরেছে। আপনার ঈশ্বর পরাজিত হয়েছেন বিনয়দা। মেসোমশাই মুখ তুলে তাকালেন। সহজে হারতে চান না। মৃদু হেসে বললেন, বিচার হবে শেষের সে দিনে, যেদিন আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি হব।

মৃত্যু একটা ন্যাচারাল প্রসেস। ওখানে ঈশ্বর নেই। আছে কাল। ইজ থেকে ওয়াজ।

Under the wide and starry sky,
Dig the grave and let me lie.
Glad did I live and gladly die,
And I laid me down with a will.

জলের বিম্ব জলেতে মিলায়— অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত মরতে মরতে একেবারে মরণটারে মারত॥

ব্যস! মেসোমশাই কুপোকাত। ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত সব একেবারে পাঞ্চ করে ছেড়েছেন। ভোলাময়রা আর হরুঠাকুরের ধুন্ধুমার লড়াই। ভুরভুরে ঘিয়ের গন্ধ নাকে আসছে। মুকু চেয়ারে নেই। রান্নাঘরে গেছে দিদিকে সাহায্য করতে। হঠাৎ মাতামহকে মনে পড়ল। এই মুহূর্তে কী করছেন কে জানে? বাগানের একপাশে নারকেল গাছের তলায় ছোট্ট একানে ঘর। বিশাল এক সিন্দুক। একটু পরেই আমরা লুচি খাব। তিনি কী খেলেন? মাতুলের সংসারের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। অভিমানে দূরে সরে আছেন। কিছু প্রশ্ন করলেই হা হা হাসি, গৃহীভূত্বা বনী ভবেৎ, বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাম।

মুকু গোটাকতক আসন হাতে বড়ঘরে ঢুকল। হলঘরই বলা চলে। শুনেছি একসময় এই ঘরে বড় বড় আসর বসত। রাত ভোর হয়ে যেত গানে গানে। বড় বড় সব ওস্তাদ আসতেন। মাতুল তখন কিশোর। সেই কিশোর বয়সেই তাক লাগিয়ে দিতেন। মুকু হাতের ইশারায় ডাকল।

সেই সন্ধে থেকে এক নাগাড়ে পড়ে পড়ে চোখদুটো ফুলে উঠেছে। কোন দিকে মুখ করে খেতে বসতে হয় জানো?

দক্ষিণ ছাড়া, যে-কোনও দিকেই মুখ করে বসা যায়। দাও আমি পেতে দিচ্ছি। মুকু তিনটে আসন এনেছে। দুটো আসন পেতে দিলুম।

তোমারটা পাতলে না?

আমি পরে তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসব।

খেতে বসে পিতৃদেব নানা ফ্যাচাং বের করেন। কনক সামলাতে পারবে না। তা ছাড়া অপরিচিত মেসোমশাইয়ের সামনে বসে তাঁরই মেয়ের ভেজে ভেজে দেওয়া ফুলকো লুচি খেতে লজ্জায় মরে যাব। রান্নাঘরে উনুনের আগুনের আভায় কনককে একেবারে বউমার মতো দেখাচ্ছে। ওবেলা একটু আড়ষ্ট ছিল। এবেলা সব পুরোমাত্রায় দখলে এসে গেছে। মাঝে মাঝে ডিক্টেটারের মতো মুকুকে হুকুম চালাচ্ছে।

একটা নকল কাশি দূর থেকে এগিয়ে আসছে। পিতা আসছেন। কনকের একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে সিঁথি দেখছিলুম। কেন দেখছিলুম তা বলতে পারব না। ভাল লাগছিল। সম্মানজনক দূরত্বে সরে গেলুম। যতই শিশুর মতো নিষ্পাপ মুখ করি না কেন, পিতার চক্ষুবীক্ষণে মনের ফেঁসো ধরা পড়বেই। মন রে তুই শোঁয়াপোকা।

তালতলার চটি পটাস পটাস শব্দ করছে। কনকের কিছু দূরে এসে শব্দ থেমে গেল। পিঁড়েতে পেছন ঠেকিয়ে কনক বসে আছে উবু হয়ে। ইয়া এক খোঁপা ঘাড়ের কাছে লটকে আছে। সামনে অ্যালুমিনিয়ামের কড়ায় আধা-ঘিয়ে লুচি ফুলছে ফোঁস করে।

পিতা তারিফ করলেন, বাঃ বেশ ফুলছে। একেবারে নিখুঁত, নিটোল হয়ে। আচ্ছা এবার তুমি ওঠো। তোমার কাজ শেষ। এবার আমাদের শুরু।

কনক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, তার মানে?

তার মানে, তোমরা এইবার খেতে বসবে, আমরা পিতাপুত্রে পরিবেশন করব।

এ আবার কোন দেশি নিয়ম!

তোমরা অতিথি। অতিথিসেবার পর গৃহস্থ আহারে বসবে, এই হল নিয়ম।

নিয়ম শাস্ত্রেই থাক। আপনারা খেতে বসুন। মেয়েলি শাস্ত্র আলাদা।

কনক কথা বলছে আর লুচি ভেজে চলেছে। মেসোমশাইকে বেশ কায়দায় ফেলে দিয়েছে। মেয়েরা কেমন সহজেই শাসক হতে পারে! ভয়ডর কিছুই নেই। সাধে পরের বাড়ি গিয়ে সহজে জাঁকিয়ে বসে? ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়।

পিতা বললেন, কথা তা হলে শুনবে না!

না, মেসোমশাইয়ের বাড়িতে এসেছি। অতিথিফতিতি আবার কী? যদ্দিন আছি, এ মহলে আপনার প্রবেশ নিষেধ।

ঠ্যাং করে কড়াতে ঝাঁজরিতে একটা শব্দ হল। পিতার চোখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি। বহু দূর থেকে যেন তাকিয়ে আছেন। দীর্ঘ জলযাত্রার পর নাবিক যে-দৃষ্টিতে তমাল তটরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থির অচঞ্চল। চটির শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল। এ কি জয়? এ কি পরাজয়? পরাজয় মাঝে মাঝে ভাল।

কনক এবার আমার দিকে তাকাল। একটা চোখ আধ-বোজা। কড়ার ভাপ এসে লাগছে। এ এক মারাত্মক চাহুনি। একে আমার একটু কবিকবি ভাব। থেকে থেকে আকাশে কালিদাসকে দেখি। ছাদে উঠে ডানা মেলে উড়ে যেতে চাই। বিরহী যক্ষের মতো জানলা দিয়ে উত্তরের শ্যামবৃক্ষরাজির দিকে তাকিয়ে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তার দিকে এমন ধারালো মুখ যদি আধ-বোজা চোখে তাকায়, তা হলে কী হয়? নাও ভেসে যায় নদীর জলে।

কনক বললে, তুমি বসছ না কেন?

আমার কি লুচি চলবে?

ওমা সেকী কথা!

দেখলে না, সকালের খাদ্য।

তোমার তো পেট সেরে গেছে।

অত্যাচারে যদি বেড়ে যায়?

ঘোড়ার ডিম হবে। গরম লুচিতে পেট ভাল হয়।

তা হলে, তোমাদের সঙ্গে বসব।

রাত হয়েছে বেশ। তোমার খিদে পায়নি?

না না, খিদে পাবে কেন?

খিদে পেয়ে পেয়ে মরে মরে এখন আর খিদে কাকে বলে ভুলেই গেছি। কনক তো আর জীবনের সব ঘটনা জানে না। মরা গাছে ফল শুকিয়ে পাকে। রং থাকে স্বাদ থাকে না।

মুকু পরিবেশন করছে। শাড়ির আঁচল ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। মেসোমশাই বললেন, কতদিন বলেছি, আঁচল কোমরে জড়াবে।

মুকু বাঁ হাতে কোনওরকমে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল। মুকুর চুল বেশ কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো। দু'জনের আহার বেশ জোরকদমে চলেছে। অম্বুলের রুগি হলে কী হবে, মেসোমশাই বেশ ভালই টানছেন। এক এক গ্রাসে, এক একখানা লুচি উড়ে যাচ্ছে।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে আছি। দু'বোন আমাকে কোনও কাজই করতে দেবে না। পিতা পাত থেকে মুখ তুলে বললেন, কী বুঝলে তা হলে?

বোকার মতো তাকিয়ে রইলুম ঘুমঘুম চোখে। কোন বোঝার কথা বলছেন?

একটি নধর পটল আঙুল দিয়ে ফুটো করতে করতে বললেন, সেই ছাগলের ঘটনা মনে আছে নিশ্চয়ই।

ওরে বাবা, খুব মনে আছে। অনেকটা এই ভুলোর মতোই ব্যাপার। পিতাপুত্রে বাজার সেরে ফেরা হচ্ছে। আমার হাতে বিশাল দুটো কপি। চারপাশে লতাপাতা ঝুলছে। পথের পাশে একটা ছাগল শুয়ে ছিল। হঠাৎ মনে হল কপির পাতা তো কাজে লাগবে না। আহা কৃষ্ণের জীব খাইয়ে যাই। কপিসমেত পাতা মুখের সামনে ধরলুম। নে, খা, পাতা খা। ছাগলটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আচমকা এক টান মেরে কপিদুটো হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মার দৌড়। দু'জনেই ছুটছি ছাগলের পেছনে। হইহই রইরই ব্যাপার। ছাগল এক খানা টপকাবার জন্যে মারলে লাফ। কপি ছিঁড়ে পড়ল নর্দমায়। পাতা-মুখে ছাগল পালাল ওপারে। রাস্তার লোকের সে কী আনন্দ! মানুষ বোকা বনে গেলে তার চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! পিতার চোখমুখ রাগে লাল। বাড়ি ফিরে বললেন, ছাগলটাকে চিনতে পারলে? ভালমানুষের মতো বললুম, আজ্ঞে না।

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াও। দেখতে পাবে।

সামান্য দুটি কথা; কিন্তু কী অসম্ভব জ্বালা। শুনেছি, শয়তানের মুখ নাকি ছাগলের মতোই।

মুগের ডালের তারিফ করতে করতে পিতা বললেন, তোমার জন্যে আমি এক সেট 'সারমন অন দি মাউন্ট' তৈরি করে দিয়ে যাব। প্রথম সারমন হল, সবসময় ভাববে আমি মানুষ নই, একটা গাধা। পৃথিবীর অন্য সমস্ত জীবজন্তুর বুদ্ধি আমার চেয়ে ঢের বেশি।

মেসোমশাই ভরাট মুখে বললেন, সেই লেটারবক্সের ঘটনার পর আমিও নিজেকে তাই মনে করি।

পিতা কুচুরমুচুর করে লুচি খেতে খেতে বললেন, গ্রেট গাধাজ থিঙ্ক অ্যালাইক। হ্যাঁ, আপনার কী হয়েছিল?

সেই লেটারবক্স। তখন তো বলা হল না। কোর্টে যাবার পথে একদিন একটা চিঠি পোস্ট করার ছিল। এই অবদি শুনেই কনক কুঁক কুঁক করে হেসে উঠল। মেসোমশাই মেয়েকে সমর্থন করলেন, হাসিরই কথা। ভাবলে আমার নিজেরই এখনও হাসি পায়। চিরকাল শুনে আসছি চিঠি ঠিকভাবে না ফেললে লেটারবক্সের টাগরায় আটকে থাকে। তাই হাঁটু ভেঙে ডান পাশে কাত হয়ে হাতটাকে যতদূর পারা যায় ততদূর ঠেলে দিলাম ভেতরে। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত ঢুকে গেল। চিঠিটা টুক করে ছেড়ে দিলুম। এইবার যত হাত টানি, হাত আর বেরোয় না। লেটারবক্সের জিভ আছে। আপনি কি তা জানেন হরিদা?

খুব জানি। লেটারবক্সও প্রাণী। সে থিয়োরি আমি আপনাকে পরে বলব।

যতবার হাত টানি মুখের সেই ফ্যালফ্যালে ফ্ল্যাপে কোটের ওপর হাতটা আটকে যায়। হাত আর বেরোয় না। তেমন জোরে টানতেও সাহস হচ্ছে না। কোট তো ছিঁড়বেই। সেই সঙ্গে একখানা মাংসও যাবে। ইতিমধ্যে দু'-একজন এসে গেছেন চিঠি ফেলতে। তাঁরা কেবলই জিজ্ঞেস করেন, কী হল আপনার? আপনি কি নিজেকে পোস্ট করতে চাইছেন? তা হলে চিঠির বাক্সে নয়, পার্সেলের বাক্সে গিয়ে পড়ুন, হয়তো ধরে যাবে। লজ্জায় বলতেও পারছি না, আটকে গেছি। শেষে বলতেই হল, দাদা হাত টেনে ধরেছে। হইহই ব্যাপার। ঠিক্কুর রোদে বেলা বারোটা পর্যন্ত সেইভাবে ঝুলে রইলুম। মজা দেখার জন্যে শহরের ছেলেবুড়ো সব ভেঙে পড়ল। এজলাসে মামলা মুলতুবি রইল। জায়গাটার নামই হয়ে গেল, উকিলমারি। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, ডাকবাক্সে আর কখনও হাত ঢোকাব না।

চিঠিটা নিশ্চয়ই একটু ক্ষতিকারক ছিল!

তা একটু ছিল। উকিলের চিঠি তো! কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস।

সেই কারণেই লেটারবক্স হাত কামড়ে ধরেছিল। মরামাছ প্রতিশোধ নেয় জানেন কি?

কীরকম?

এই তো কয়েকদিন আগে দাঁত আর মাড়ির ফাঁকে আড়াআড়ি ঢুকে গেল কাঁটা। কিছুতেই বেরোয় না। আঙুলে ধরা যায় না। কাঠি দিয়ে খোঁচানো যায় না। জিভ দিয়ে ঠেলা যায় না। মাড়িতে পুঁতে গেল। ধারালো একটি খোঁচা বেরিয়ে রইল। সারাদিন কসরত। শেষে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে ফেঁড়ে বার করতে হল। মানুষ অপঘাতে মরলে ভূত হয়। মাছও তাই। মরে মেরে গেল।

ওটা জাস্ট একটা দুর্ঘটনা।

তা হলে শুনুন, দেয়াল কীভাবে প্রতিশোধ নেয়। পেরেক পুঁতছেন। ইয়া গজাল। হাতুড়ি পড়ছে ঢাঁই ঢাঁই। কে বলেছে দেয়ালের প্রাণ নেই! যার কান আছে, তার প্রাণও আছে। হাতুড়ির সঙ্গে ইশারায় কথা হয়ে গেল। ব্যস, পরের ঘায়ে বুড়ো আঙুলের মাথাটা ছেতরে গেল। পৃথিবী কি সহজ জায়গা মশাই! এখানে কী আছে আর কী নেই! কী হয় আর কী হয় না, বলা ভারী শক্ত।

একটি রসগোল্লা মুখে পুরলেন। এ হেঃ প্রায় ঠান্ডা হয়ে এসেছে। গরম রসগোল্লা দোকানের সামনে উবু হয়ে বসে খেতে হয়। নিন নিন, টপাটপ মুখে পুরুন। তা হলে তোমার দর্দ বাড়বে। হিন্দিতে দর্দ মানে যন্ত্রণা।

ঘড়ি খ্যাঁড়াড়াক করে উঠল। সাড়ে এগারোটা বাজবে। তিনমাথার মোড়ে কুকুর মড়াকান্না শুরু করেছে। মাঝরাত এগিয়ে আসছে। এইবার ভূত বেরোবে। আমাদের চিলের ছাতে প্যাঁচা ডাকবে চ্যাঁ চ্যাঁ করে।

রান্নাঘরে তিনজন পাশাপাশি খেতে বসেছি। মেয়েদের খেতে বসার ধরনটাই আলাদা। একটা হাঁটু খাড়া থাকবে, আর একটা পাতা থাকবে জমিতে। তার ওপর থাকবে একটা হাত। ঠোঁটদুটো অল্প ফাঁক। খাবার ঢুকবে একটু একটু করে। খাচ্ছে কি খাচ্ছে না বোঝার উপায় থাকবে না। যে-গতিতে খাওয়া চলেছে, শেষ হতে রাত দুটো বাজবে। কনক নিজের পাত থেকে একটা পটল আমার পাতে তুলে দিল। তুলে দিয়েই খেয়াল হল, এ মা তোমার পাতটা এঁটো করে দিলুম যে।

আনন্দে সারাশরীর শিরশির করে উঠল। কত কাছাকাছি চলে এসেছি। দুটো মহাদেশ যেন এক হচ্ছে। আমার একটা সেই মাছি-মার্কা হাসি আছে। দাঁত বের করা, গালে টোল ধরানো। সেই সাপের হাসি যে বেদেয় চেনে। মুখটাকে গাটাপার্চারের মতো করে বললুম, তাতে কী হয়েছে! তুমি খেলে না কেন?

নতুন পটল। সুন্দর খেতে। তুমি একটা বেশি খাও। রান্না কেমন হয়েছে?

উঃ। ওয়ান্ডারফুল। কার কাছে শিখলে এমন রান্না।

মায়ের কাছে।

সব শেষ হতে বারোটা বেজে গেল। উত্তর মহলের আলো নিবে গেল। কনক বললে, মুকু, তুই কি এখন আবার পড়তে বসবি?

আর শরীর বইছে না।

আজ তা হলে শুয়ে পড়।

ছাতে ধুপধাপ আওয়াজ হচ্ছে। পিতৃদেব পদচারণা করছেন। হজমের জন্যে যা অবশ্য করণীয়। বৃষ্টি পড়লে ছাতা মাথায় দিয়েও করতে হবে। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলেও সূর্য পূর্ব দিকে ঠিকই ওঠে। কোনও নড়চড় নেই।

যামিনী জাগহি যোগী

পিতৃদেব অনেকক্ষণ কান খাড়া করে বসে আছেন। সামনে একটা মোটা বই আধাআধি জায়গায় খোলা। চাপা আলো সামনে ছড়িয়ে পড়েছে। মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে দেখছি। ঘুম চটে গেছে। সহজে কি আর আসবে। হঠাৎ মশারির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী ডাকছে বলো তো? মনে হচ্ছে দুটো কোলা ব্যাং মুখোমুখি বসে গলা সাধছে! এখন তো বর্ষাকাল নয়। ব্যাং আসবে কোথা থেকে?

আজ্ঞে ব্যাং নয়। মেসোমশাইয়ের নাক। দুটো ফুটো দু'রকম শব্দ ছাড়ছে। আর মাঝে মাঝে গলাটা আমতা আমতা করে উঠছে।

রাত বারোটার পর পিতৃদেব একটু নরম হয়ে যান। তখন একটু রসিকতা টসিকতা চলে। রোদ উঠলেই স্বভাবের জলাশয় উত্তপ্ত হতে থাকে। সূর্য যখন মধ্যগগনে মেজাজও তখন সপ্তমে। মেজাজেরও উদয় অস্ত আছে। আসলে এই ঘরে এই সময় তো মায়ের শোবার কথা। নীল শাড়ি, চুড়ির শব্দ। চুলে চিরুনি চালাবার গাঢ় ঘন শব্দ। যেন বটের পাতায় হাওয়া লেগেছে। আমার মা হলেও পিতার স্ত্রী তো! দু'জনের সঙ্গে দু'রকম সম্পর্ক। রিভারসিবল সোয়েটারের মতো। দু'জনের কাছে দু'রকম রং! সেই জায়গায় কে শুয়ে আছে! তাঁরই গর্ভজাত এক অষ্টাবক্র মুনি। দেহেও মর্কট, মনেও মর্কট। সন্ন্যাস নিলে, নিজেই নিজের নাম রাখব স্বামী মর্কটানন্দ।

এ নাক কি শুলেই ডাকবে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরেও সমানে ডেকে গেছে।

তার মানে মিউজিক্যাল নোজ। আমাদের ফ্যামিলিতে কারুর কখনও নাক ডাকেনি। ডাকের বহর দেখে মনে হচ্ছে অ্যাফ্রিকান নোজ। মেয়েদুটো ঘুমোচ্ছে কী করে! এ যে ঘরের পাশে ঘোড়ার আস্তাবল।

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। সমস্যায় সলিলোকি। শেক্সপিয়ার চালু করে দিয়ে গেছেন। ঘরের এপাশ থেকে ওপাশে পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন, রিভলভারে যদি সাইলেন্সার ফিট করা যায়, নাকে কেন যাবে না! নিশ্চয়ই যাবে। ওটা যদি গোল হয়, এটা হবে তিনকোনা।

রাতে চারপাশ শান্ত বলেই ডাকের জোর দুপুরের চেয়ে অন্তত একশো গুণ বেশি মনে হচ্ছে। একেবারে ষাঁড়ের ডাক। ঘোরতর আক্রোশ। দাঁতে দাঁত চেপে নাক শব্দ করছে গাঁ গাঁ। বিরাট লরির ইঞ্জিন খাড়াই বেয়ে ওঠার সময় এইরকম পরিত্রাহী শব্দ ছাড়ে। আর একটি উপসর্গ যোগ হয়েছে যা দুপুরে ছিল না। নিজের ডাকে নিজেই চমকে উঠে সাড়া দিচ্ছেন, কে কে? চারবার কে বলে আবার নিচু পরদা থেকে নাক ধাপে ধাপে ওপরে উঠছে। সত্যিই আতঙ্কের বিষয়।

পিতার সলিলোকি, নাক কেন ডাকে? নাক ডাকে, না গলা ডাকে? বর্ষাকালে ব্যাং ডাকে। সে হল পুরুষের ডাক। পুরুষ ডাকছে প্রকৃতিকে। সে তো নাক নয়, গলার খেলা। দেখি বুক অব নলেজ কী বলছে।

রাত দুটো। মানুষের ঘুম চলে গেলে মাথা কত দিকে খেলতে চায়। বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে বুক অব নলেজ খুঁজছেন। হঠাৎ মাথাটা বাঁ পাশে হেলে গেল। যেন কোনও কিছুর ঝাপটা লাগল। চট করে বসে পড়লেন। গুড়িগুড়ি এগিয়ে গেলেন টেবিলের দিকে। হাত বাড়িয়ে আলো নেবালেন। বই বন্ধ করলেন ধপাস করে। একই কায়দায় ফিরে এলেন বিছানায়, মশারির ভেতরে। ফিসফিস করে বললেন, এসে গেছে।

ঘরে সুইশ সুইশ করে ডানার শব্দ হচ্ছে। সেই বিশাল চামচিকিটা। চক্কর দিয়ে উড়তেই থাকবে, উড়তেই থাকবে। পিতার মহামান্য অতিথি। আজ আমাদের বাড়ি-ভরতি অতিথি, মেঘের মতো নাসিকা গর্জন, তাই তেমন গা ছমছম করছে না। নয়তো এই মধ্যরাতে, অন্যান্য দিন, দুটি প্রাণীর চোখের সামনে ডানা-মেলা অন্ধকার যখন লাট খেতে থাকে তখন কেমন যেন মনে হয়। That horrible black scaffold dressed. That stapled block God sink the rest!

রঙ্গমঞ্চে লাট-খাওয়া চামচিকির প্রবেশ, পিতার গুড়িগুড়ি বিছানায় এসে ঢোকা, কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস বলা, এসেছে, এসেছে। ঘাড়ের কাছে গরম নিশ্বাস। অন্ধকারে অন্ধকারের তরঙ্গ তুলে পক্ষযুক্ত অন্ধকারের অন্ধকার রেখা টেনে চলা, জগতের গর্ভমোচন করে অতিজাগতিকের রহস্যমুক্তির মতো বিমূর্ত কোনও অনুভূতি। শরীর কেমন শিথিল হয়ে আসে। পিতা বলতে থাকেন, এ সোল, এ সোল। মহৎ কোনও আত্মা। আমাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। কার আত্মা! আমাদের যত মৃত পূর্বপুরুষ! আত্মার তলে ঈশ্বরের চাকিতে তিনকোনা পরোটার আকৃতি ধারণ করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে! শিক্ষিত মানুষের এমন বিশ্বাস আসে কী করে? পরপর তিন দিন না এলেই বুঝবে বিপদ আসছে। একটা হাত মাথার বালিশে রেখে কাত হয়ে পিতা ঘরের অন্ধকারের দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বোধিবৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট বুদ্ধকে শিষ্য পোত্থপদ জিজ্ঞেস করলেন, প্রভু, এই জগৎ কি অনন্তকালের নয়? কোনও উত্তর নেই? প্রভু, জগৎ কি সসীম? বুদ্ধ নিরুত্তর। জগৎ কি তবে অসীম? এ প্রশ্নেরও কোনও জবাব নেই। প্রভু, আত্মা আর দেহ কি এক? এরও কোনও উত্তর নেই। তা হলে কি পৃথক? বুদ্ধ বললেন, এসব প্রশ্ন অর্থহীন। ধর্মের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। এর উত্তর জানা-না-জানায় প্রশ্নকারীর কোনও লাভ নেই। মূল কথা হল, দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ আর মার্গ। আত্মা চামচিকি, না চামচিকি আত্মা এ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন করে ঘুমিয়ে পড়ো। মেসোমশাই আচমকা কে কে করে উঠলেন।

পিতা বললেন, কানের পাশে এই তূর্যনাদ চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাদের নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। ঠেলে তুলতে হবে।

সেটা খুব অভদ্রতা হবে।

এই, এই হল বাঙালি মেন্টালিটি। নোলক-নাড়া বউদের স্বভাব। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করব আর পুকুরঘাটে গিয়ে চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করব। ইয়োরোপের রীতিটা কী জানো? সোজা মুখের ওপর বলা, ইউ আর এ নুইসেন্স। আমার একটা হাই উঠল। খুবই অনুচিত কাজ। তবে আবেগ তো! বেগ চাপা যায় না।

পিতা বললেন, ইউ আর এ নুইসেন্স বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইটা হল ইয়োরোপিয়ান অ্যাপ্রোচ।

হাইটা চাপতে পারলাম না। চেষ্টা করেছিলুম। ছপ্পর ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

তোমাকে বলিনি। হাইয়ের পাংচুয়েশানে আগের কথার জের টানলুম। তোমাকে ডিরোজিওর জীবনের একটা গল্প বলি। জানো তো তিনি কে ছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিন্দু কলেজে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। ডিরোজিও দেখছেন। হঠাৎ একটা ছেলে এসে সামনে আড়াল করে দাঁড়াল। যেমন তোমরা করো আর কী? ডিরোজিও বললেন, মাই বয়, ইউ আর নট ট্রানসপেরেন্ট। একেই বলে ইংলিশ অ্যাপ্রোচ। অভদ্র না হয়েও কাজের কথাটি বলে ফেলা।

কিন্তু যিনি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন তাঁকে আপনি কী বলবেন? না ট্রানসপেরেন্ট, না ওপেক, ডেড।

দেখবে তা হলে! ব্যাপারটাকে কতদূর ফানি করে তোলা যায়! দেখো তা হলে।

বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লেন। চামচিকি উড়ে চলে গেছে শেষ চক্কর মেরে। আলো জ্বলে উঠল। মেঝেতে শতরঞ্জি পড়ল। কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘটনা কোন দিকে যাবে। কী করতে চলেছেন। নিচু হয়ে খাটের তলা থেকে বাঁয়া তবলা টেনে বের করলেন।

হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মারলেন বারকতক। তাল বোঝার চেষ্টা করছেন। নাকের ডাকেরও তাল আছে! দেখি কোন তালে ভেড়ে! তবলায় চাঁটি পড়ল। নেহাত বাগানঘেরা ভুতুড়ে বাড়ি! তা না হলে প্রতিবেশীরা ডান্ডা নিয়ে তেড়ে আসত। তবলা বোল ভাঙছে। বাঃ নাক দেখছি ঝাঁপতালে চলেছে।

মিনিট দশেক হয়ে গেল, তবলা উদ্দাম বেজে চলেছে, ধা ধা, ধা, ধিনতা তা। ধাগে নাগে বাগে পেলে, ধিক্কার দিয়ে যা। ভুরুকুটি, মুকুটি, ভিরকুটি, ফেঁসে যা, ধসে যা, ধা, ধা, ধিনতা, কৎ। যে-নাক ডাকে, সে কানে শুনতে পায় না। আর মেয়েরা একবার ঘুমোলে মৃত। বেহুলার কথা মনে নেই! লক্ষ্মীন্দর ঠ্যালা মারছে আর বলছে, উঠ উঠ বেহুলা/সায়াবেনের ঝি/ তোরে খাইল কালনিদ্রা/ মোরে খাইল কী! আমাদের মেনিদা তো প্রায়ই সদর দরজার একটা পাল্লা কাঁধে করে রাতে গৃহপ্রবেশ করেন। শ্রীমতী মেনির এমনই ঘুম। দেয়ালে পাল্লা ঠেসিয়ে রেখে একটু দম নিয়ে স্ত্রীর নাক টিপে ধরেন। একটু হাঁসফঁস করে চোখ মেলে তাকিয়ে শ্রীমতী বলেন, ভেঙেছ! একেই বলে, ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়। সবই মিস বড় মেনির কাছে শোনা। মাঝে মাঝে দুপুরে আসে পড়তে। এমন নিঃক্ষত্রীয় বঙ্গললনা সচরাচর চোখে পড়ে না। শব্দটা সুখেনের আবিষ্কার। যে-শরীরে যৌবন ফেঁড়ে ফেলার মতো ধার নেই সুখেনের ভাষায় তেমন শরীর হল নিঃক্ষত্রীয়। থিয়েটারে ছেলেরা মেয়ে সাজে। মেয়েরা যদি ছেলে সাজতে চায় সবার আগে মিস মেনির ডাক পড়বে। সব সমতল। ও তলে অতল নেই। সুখেনের কৃপায় জ্ঞানভাণ্ডার যেরকম সমৃদ্ধ হয়েছে, পরিচয় পেলে পিতা হতভম্ব হয়ে যাবেন। এ যে পিতার পিতা, বৃদ্ধ পিতা।

তবলা থেমে গেল। সাবেক কালের লম্বা লম্বা গরাদ লাগাননা খোলা খাড়া জানলায় রাতের আকাশ লেগে আছে। অন্ধকার যেন পাতলা চাদরের মতো থিরথির কাঁপছে। ফ্যাকাসে চাঁদ অভিসার শেষ করে ওই পথেই যেতে যেতে উঁকি মেরে দেখছে। ঘরের মেঝেতে লম্বা হয়ে তারাদের ছায়া পড়েছে, চার পাশ কেমন যেন

ঝিমঝিম করছে। মোহনিশা সব সো অনিহারা। দেখছি স্বপ্ন অনেক প্রকারা॥ এহি জগ যামিনী জাগহি যোগী। পরমারথ পরপঞ্চ বিয়োগী। এই মোহরাত্রি। ভোগী জীব স্বপ্নে নিদ্রিত। কনক, মুকু, মেসোমশাই। আর এই যে আমরা পরমার্থনুসন্ধায়ী বিবেকী যোগী দু'জন সংসার নিশায় জেগে বসে আছি। রাতের রেলগাড়ি চলেছে, চাঁদের পাহাড়ের পাশ দিয়ে তারাদের যাত্রী নিয়ে। থ্যাঙ্কস ফাদার। আপনার জন্যেই এই নিশিযাপন। অসীমের রহস্য সন্ধান।

হাঁটুর ওপর হাত রেখে পিতা তাকিয়ে আছেন উন্মনা হয়ে। সারাশরীরে চাঁদের আলো। ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। না ফিরেই বললেন, ঘুমোলে নাকি?

আজ্ঞে না।

কী হবে ঘুমিয়ে! নেমে এসো। দেখি তুমি কেমন গান শিখেছ?

মিলিটারি ডিসপোজালে কেনা খাকি মশারির ঘেরাটোপ ছেড়ে নেমে এলুম। মেঝেতে রুপোর স্রোত বইছে। ভাণ্ডারে তালে গাইবার মতো দুটো গানই আছে। তাই হোক। তুলসীদাসকে মনে পড়ছে। অযোধ্যার পাহাড়। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। ধরে ফেলি তা হলে, রামনাম সুখদায়ী, সাঁচ্চা মনসে ভজ রাঘব তো, একদিন মুক্তি পাই। গান বেশ জমে উঠল। সুরের মায়াজাল তৈরি করবার অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে। মাতুলের মতো কাজ অলংকার বসাতে না পারলেও চোখের সামনে রামচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছি। কাঁধে ধনুর্বাণ, নন্দলাল বসুর আঁকা টানাটানা চোখ। অযোধ্যার বিশাল প্রাসাদ। সিংহাসনে বৃদ্ধ দশরথ। চামর হাতে দু'পাশে দুই সুন্দরী। অযোধ্যার রাতের বাজার। মশালের আলো। দোকানে দোকানে ঝিলিক মারছে হিরে, চুনি, পান্নার হার। কী শান্তি! কী আনন্দ! রামনাম সুখদায়ী। রাম নাম হ্যায় অমৃতধারা। রাম বিনা কোই নেহি হামারা। ভাবের ঘোরে হড়কে গিয়ে মাঝে মাঝে তাল কাটছে। উত্তেজনায় লয় বেড়ে যাচ্ছে। প্রবল বেগে তবলা বাজাতে বাজাতে পিতা থেকে থেকে হুঁ হুঁ করে উঠছেন। ফাঁক চলে গেছে সমে। সম চলে এসেছে ফাঁকে। মরিয়া, তেরিয়া, খেপে গেছি। সবে সাইকেল চালাতে শিখে রাস্তায় নামার মতো। বেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। লয় বাড়ছে, মাথা দুলছে। লাঠালাঠি ব্যাপার।

খুটুস করে কনকদের ঘরের দরজা খুলে গেল। রাম ভুলে চোখ চলে গেল ঘরের দিকে। কায়দা করে তিন তেহাই মেরে কালোয়াতের কালোয়াতি শেষ হল। কনক অবাক হয়ে গেছে। রাতের এখন কোন প্রহর! চাঁদের আলো আরও ম্লান হয়ে এসেছে। বৃষ্টি-ভেজা প্রেয়সীর ওষ্ঠের মতো। পিতাপুত্র সেই আলোতে বসে আছি বিবর্ণ ছবির মতো।

কনক এগিয়ে এসে বললে, মেসোমশাই, কখন উঠলেন?

তিড়িং করে তবলায় চাঁটি মেরে বললেন, শুতেই যাইনি, তো ওঠা! নাও ধরো ধরো। মন্দ হচ্ছে না। ঘষামাজা করলে হতে পারে।

আমারও তর সইছে না। গলায় সুর এসেছে। সামনে কনক এসেছে। চার পাশে দুধ-গোলা অন্ধকার। মলিন উত্তরীয় জড়িয়ে পৃথিবী চেয়ে আছে পুবের দিকে। আর তো কিছু জানা নেই। ভাঁয়রোই চলুক। জাগিয়ে রঘুনাথ কুঁবর। পঞ্ছি বন বোলে। আহা সুর যা লাগছে! আকাশের গায়ে সিঁদুরে রং ধরার মতো।

কনক পা মুড়ে বসে পড়েছে। মেসোমশাইয়ের নাসিকা গর্জন থেমে গেছে। এরকম ভীষণ উৎপাতে কে ঘুমোবে! পুরো পরিবার জেগে উঠেছে। ঝাপসা পাখি উড়ছে। কুমার রঘুনাথকে জাগাবার জন্যে গাইয়ের কী ব্যাকুলতা! রহস্যময়ী রাত চলে গেল। অচেনা পৃথিবী আবার চেনা হয়ে উঠছে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ।

চোখদুটো জ্বালাজ্বালা করছে। কনক কাপড়জামা ছেড়ে প্রাইমাস স্টোভে চায়ের জল চাপিয়েছে। মেসোমশাই ঠাকুরঘরে ধ্যানস্থ। পিতা দাঁতে কড়া বুরুশ ঘষছেন। স্টোভের শব্দের সঙ্গে বুরুশের শব্দ মিশে বেশ একটা ঐকতান তৈরি হয়েছে। সকালের গায়ে যেন শিরিষ কাগজ ঘষা হচ্ছে।

মেসোমশাই ঘরের বাইরে এসে ধ্যান-ভাঙা চোখে জগৎসংসারের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে তাকিয়ে থেকে বললেন, হরিদা, আপনাদের এখানে কোথাও খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না। খাঁটি দুধ!

পিতা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, এ বাজারে খাঁটি কিছু আছে কি? খাটাল আছে, গোরু আছে, বাঁট থেকে সাদা জলও বেরোবে: তবে সে দুধে সরও পড়বে না, গোঁপে ঘিয়ের স্বাদও পাবেন না।

সেই ছেলেবেলা থেকেই সকালে দুধ খাওয়া অভ্যাস, যদি অনুমতি করেন একবার চেষ্টা করে দেখি।

ক'টার সময় খাওয়া অভ্যাস?

এই আটটা নাগাদ।

তার আগেই পাবেন। বালতি হাতে রামখেলোয়ান এল বলে।

তা হলে এই এক মাসের জন্যে দুধ একটু বাড়িয়ে দেবার আজ্ঞা করুন।

করলুম। তবে চাঁদির চাকতি ছোড়া চলবে না।

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। সুটকেসে নোট গজগজ করছে, খরচ করার সুযোগ মিলছে না। কনক চায়ের কাপ হাতে পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললে, বাব্বাঃ, কখন দাঁত মাজতে বসেছেন মেসোমশাই! এবার উঠুন। চা এসে গেছে।

ব্রাশ হাতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে পিতা বললেন, সকালের চা আমি যে গেলাসে খাই মা। ওইটুকু মধুপক্কির কাপে কি সানাবে?

খালি পেটে এক গেলাস চা?

ও বাপকো বেটি! লিভারাতঙ্কে ভুগছ! চা আমার লিভারকে কাবু করতে পারবে না। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। মেসোমশাই এবার দ্বিতীয় ফ্যাঁকড়া বের করলেন, আপনাদের সকালের বাজারটা একবার দেখে এলে হত না। গামছায় হাত মুছতে মুছতে পিতা বললেন, আপনি মশাই মহা ছটফটে লোক। শান্ত হয়ে একটু বসুন তো! বাজারে গিয়ে গোঁত্তা খেয়ে কী হবে? এ কি আপনি মধুপুরে চেঞ্জে এসেছেন? ড্যাঞ্চিবাবু হয়ে বাজারে ঘুরবেন? তিন দিনের বাজার বাড়িতে ঠাসা। আগে খেয়ে শেষ করুন।

আমি যে মাছ কিনতে বড় ভালবাসি।

সে সুযোগ রোববারে পাবেন।

পড়ার টেবিল থেকে মুকু ডাকল, বাবা।

পিতৃদেবের ভুরু ক্রমশই কুঁচকে উঠছে।

মেসোমশাই চলে গেলেন। পিতা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, তুমি বাজার থেকে দেখেশুনে একটু মাছ আনতে পারবে?

কেন পারব না?

তা হলে নেমে পড়ো। তোমার মেকআপ টেকআপ নিয়ে নাও।

কথায় একটু হুল থাকবেই। বসরাই গোলাপেও কাঁটা থাকে। মাতুল একটি মুখে ঘষার ক্রিম উপহার দিয়েছিলেন। সেই বস্তুটি একদিন মাখতে দেখে, কী অট্টহাসি! ওহে লালিমা পাল পুং, বঙ্গের বীর সন্তান, চুলে পমেটম, গালে রংচং, পকেট ঢনঢন, মুখে মিহিমিহি বুলি, চায়ের কাপে তুফান তুলি, বেড়াবি আর কতকাল। সেই দর্শনের দর্শনী আজও দিতে হচ্ছে।

হরি আছ? হরিশঙ্কর?

বেশ ভারী গলা। সিঁড়ি ভেঙে উঠছেন আর হাঁক মারছেন। এত সকালে কার আগমন? বিধুজ্যাঠা। গায়ে আসাম সিল্কের পাঞ্জাবি। চওড়াপাড় দিশি ধুতি। কপালে লাল চন্দনের টিপ। তার মাঝে একটি চাল আটকে আছে। চুলে অ্যায়সা তেল ঢেলেছেন কপালের দু'পাশে গড়াচ্ছে। মাতুল দেখলেই বলতেন, কলুর বলদ। সাতসকালে কারুর শুভাগমন কোনওকালেই তিনি ভাল চোখে দেখেন না।

বিধুজ্যাঠা আর একবার হাঁক পাড়লেন, হরি আছ? হরিশঙ্কর? আমাকে সামনে দেখে বললেন, ও তুমি! বাবা উঠেছেন?

কথায় আছে, তিন তিসি, লোটা গর্দান, দোনো হায় শয়তানকা নিশান। এই মানুষটি সেই লক্ষণাক্রান্ত। চোখে আবার ফ্যান্সি চশমা! আমার পেছনে দাঁড়িয়ে পিতা বললেন, আসুন। হঠাৎ এই সকালে!

এক সার বাঁধানো দাঁত মেলে বিধুজ্যাঠা বললেন, বাধ্য হলুম আসতে। তুমি যেরকম ন্যাজে খেলছ!

তার মানে?

তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে হে!

হ্যাঁ, আকাশ থেকেই পড়লুম। আপনার ন্যাজ আছে সে স্বীকারোক্তি এক ধরনের আত্মপ্রকাশ। মেনে নিতে রাজি আছি। তবে সে সোঁটা ন্যাজ নিয়ে আমি কোন দুঃখে খেলতে যাব।

রেগো না, রেগো না। ভেতরে চলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা চলে না! ব্যাপারটা যখন দেনাপাওনার।

বিধুজ্যাঠা প্রায় ঠেলেঠুলেই ঘরে ঢুকে এলেন। একটা জ্বলন্ত উনুন যেন পাশ দিয়ে চলে গেল, এত উত্তাপ! চেয়ারে যেন নিজেকে ছুড়ে দিলেন। নিজের ডান পা-টাকেই বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর এমনভাবে রাখলেন যেন বন্দুক ঘোরাচ্ছেন! পিতাও প্রায় সেইভাবেই চেয়ারে বসলেন। এঁদের শরীরে এখন খোঁচা মারলে রক্ত বেরোবে বলে মনে হয় না। রেলগাড়ির স্টিম বেরোবে ফ্যাঁস করে।

পিতা বললেন, কীসের দেনাপাওনা! কীসের দেনাপাওনা! আমার কাছে কেউ এক কপর্দকও পায় না।

পায় পায়, হরিশঙ্কর। নেবার সময় লোকে খুব কাঁদুনি গায়, দেবার সময় তিড়িং তিড়িং লাফায়।

শুনুন, শুনুন, আমি আপনাকে হাড়েহাড়ে চিনি। জীবনে আপনার ত্রিসীমানা মাড়াইনি, মাড়াবার ইচ্ছেও নেই। না খেয়ে মরব সেও ভি আচ্ছা, তবু আপনার মতো এক দালালের কাছে কখনও টাকা ধার করতে যাব

না, বুঝলেন? আর তা ছাড়া বাপমায়ের আশীর্বাদে আমি ভিখিরি নই। নিজের ম্যাও নিজেই সামলাতে পারি। তার জন্যে দালালের দরজায় যেতে হবে না।

হরিশঙ্কর, অহংকার ভাল, তবে কী জানো, তোমার মেজদা, যার মেরে তোমার এই বোলচাল, তার শেষের দিনে এই বিধুশর্মাই তো ম্যাও ধরেছিল। তোমার মেজবউদি যখন মরোমরো, তুমি তো তখন উড়ছ। বাড়িতে আসর বসাচ্ছ, রাজ এস্টেট থেকে ওস্তাদ আনাচ্ছ, বাড়িতে রেখে বিরিয়ানি ওড়াচ্ছ, আর ওদিকে তোমার মেজদা দু'বেলা আমার কাছে এসে হাত পাতছে।

গেট আউট, ইমিজিয়েটলি গেট আউট। লায়ার, শয়তান, রোগ।

পিতা ঘুষি পাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে সবেগে উঠতে গেলেন। গেঞ্জি গলে মোটা পইতে ঝুলে ছিল। উত্তেজনার অবসরে পইতে যথাস্থলে চেয়ারের কোনায় জড়িয়ে বসেছিল। পিতা উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার উঠল, পইতে ছিড়ে দু'টুকরো হল, চেয়ার টাল খেয়ে সশব্দে উলটে পড়ল বইয়ের র‍্যাকের ওপর, র‍্যাক থেকে দুদ্দাড় করে বই পড়ল, বইয়ের ধাক্কায় চায়ের গেলাস ছিটকে গেল কোনার দিকে। সব ঘটে গেল পরপর, অনেকটা জন্ম বিবাহ মৃত্যুর অর্ডারে।

মেসোমশাই, মুকু, কনক তিনজনেই ছুটে এসেছেন। পিতা পইতে ছিঁড়ে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। প্রতিপক্ষ চেয়ারেই বসে আছেন পায়ের ওপর পা তুলে। মৃদু মৃদু হাসছেন। আমার সেই শয়তানের গল্পটি মনে পড়ল। ঈশ্বর বললেন, শয়তান, লোকে বলে তুমি খারাপ ছাড়া ভাল কিছু কখনও করো না। কেন বলো তো? শয়তান বললে, প্রভু আমার ভাগ্য। দু'জনে ছদ্মবেশে এক মুদির দোকানে বসে কথা বলছিলেন। শয়তান গুড়ের নাগরি থেকে আঙুলে এক ফোঁটা গুড় নিয়ে দোকানের বাঁশের খোঁটায় একটি টিপ পরিয়ে দিয়ে বললে, প্রভু, এটা কি কোনও অপকর্ম? ভগবান বললেন, না, এ আর কী এমন অপকর্ম। তবে দেখুন! দু'জনেই স্থানত্যাগ করলেন। এদিকে সেই গুড়ের টানে সারি সারি পিঁপড়ে খোঁটা বেয়ে উঠতে লাগল। পিঁপড়ের লোভে তেড়ে এল গোদা টিকটিকি। টিকটিকি ধরতে এল বেড়াল। বেড়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে এল রাস্তার কুকুর। নিমেষে লন্ডভন্ড, লঙ্কাকাণ্ড।

মেসোমশাই মেয়েদের এক এক টানে দরজার সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে দুম করে ডান পা ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ড্রয়ারের ওপর পাশাপাশি রাখা কাচের ফুলদানি চিন করে বেজে উঠল। চাপা হুংকারে বললেন, কী হয়েছে হরিদা?

নানা জিনিসের যুগপৎ পতনের শব্দে বিভ্রান্তিতে পিতা তূষ্ণীভূত হয়েছিলেন। মেসোমশাইয়ের প্রশ্নে ঘোর কেটে গেল। বাজারের পাশে একটা লোক বসে বসে ভেলকি দেখাচ্ছিল, লাগ ভেলকি, লাগ ভেলকি। হঠাৎ টাগরায় জিভ জড়িয়ে লোকটির সমাধি হয়ে গেল। সবাই ধন্য ধন্য করছে। কিছুক্ষণ পরে সেই ভাবটি যেই কেটে গেল, লোকটি অমনি লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি বলে চিৎকার শুরু করে দিল। পিতা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠলেন, গেট আউট গেট আউট, ইউ স্কাউন্ড্রেল।

মেসোমশাই অগ্রপশ্চাৎ কিছুই শোনেননি: কিন্তু বীরভাবের একটা স্পর্শদোষ আছে। মালকোঁচা মারা ধুতিপরিহিত মেসোমশাই বিধুজ্যাঠার চোখের সামনে তিড়বিড় করে নাচতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, গেট আউট, গেট আউট, ইউ স্কাউন্ড্রেল।

আমাদের তিনজনের এতক্ষণ কোনও ভূমিকা ছিল না। লম্ফঝম্প শুরু হওয়ায় আমরা তিনজনে সমস্বরে চিৎকার করতে লাগলুম, বাবা কাচ, মেসোমশাই কাচ। বাবাতে, মেসোমশাইতে এমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে, কে কার বাবা, কে কার মেসোমশাই! সাবধানবাণী কেউই গ্রাহ্য করছেন না। এদিকে মেঝেতে লেবুর কোয়ার মতো ফালাফালা কাচ পড়ে আছে। একবার পায়ে ফুটলে হয়! আমাদের সুখেন একবার বৃন্দাবনকে খুব ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল। বৃন্দাবনের বাবা বৃন্দাবনের মাসিকে দ্বিতীয় পক্ষ করে আনলেন। সুখেন বোকাসোকা বৃন্দাবনকে বুঝিয়ে দিলে, তোর বাবাকে আর ভুলেও বাবা বলে ডাকিসনি। ভীষণ রেগে যাবেন। অপমান করা হবে। তিনবার ফেল করেছিস, এইবার তা হলে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন। মেসোমশাই বলবি। মাসির বর মেসো হয় জানিস তো! পরের দিন সকালে দেখা গেল, বৃন্দাবন উদম হয়ে বাইরের রকে বসে আছে। কী হল রে বৃন্দাবন? কী বলব মাইরি, রাতে খাবারটাবার সব বাড়া হয়েছে, যেই ডাকলুম, মেসোমশাই, খাবেন আসুন, এতদিনের বাবা মাইরি জুতো হাতে তেড়ে এলেন। শরীরের অবস্থা দেখ, মেসোতে আর মাসিতে মিলে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিয়েছে রে! সব কেড়ে নিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। বাবা মাইরি সত্যিই মেসো হয়ে গেছে।

বিধুজ্যাঠা এমনভাবে বসে আছেন, যেন কুচিপুড়ি নৃত্য দেখছেন। প্রোগ্রাম শেষ হলে হাততালি দেবেন। কাচ পরিষ্কার করে নাচের নিরাপদ জমি তৈরি করার জন্যে কনক ঝ্যাঁটা আনছিল। খেয়াল করেনি। সেই রাতের আরশোলা-পেটানো ঝ্যাঁটা। একটা আধমরা প্যাস্তাখ্যাঁচা মাল কাঠির মধ্যে ঘাপটি মেরে ছিল। মেঝেতে নিচু হয়ে বোল-কাটা জোড়া জোড়া পা বাঁচিয়ে যেই এক টান মেরেছে, আরশোলা ক্যাতরাতে কাতরাতে হাত বেয়ে একেবারে সেই মোক্ষম আশ্রয়ে ঢুকে পড়ল যেখানে বিবাহের আগে কোনও পুরুষের হাতের প্রবেশ নিষেধ। কনক ঝ্যাঁটা ফেলে মেঝেতে কুমড়ো গড়াগড়ি। ওদিকে কুচিপুড়ি, এদিকে হিন্দি সিনেমার ভুঁই নাচ। শেম শেম বলতে ইচ্ছে করছে। বিধুজ্যাঠা ছাড়া সকলেরই অবস্থা মত্ত মৃদঙ্গের মতো। খ্যাচাখাঁই খ্যাচাখাঁই করে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বেজেই চলেছে। গেট আউট বললেও কেউ যদি গেড়ে বসে থাকে, তা হলে তাকে চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসতে হয়।

মেসোমশাইয়ের হঠাৎ বোধহয় আদালতের কথা মনে পড়ল, বাজখাঁই গলায় চেঁচাতে লাগলেন, পুলিশ পুলিশ। ওদিকে সাহসী মুকু বক্ষলগ্ন আরশোলা সমেত কনককে বাইরে টেনে নিয়ে গেছে, সেদিক থেকে নানা রকমের কাতর চিৎকার ভেসে আসছে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমার ভীষণ সাহস। আরশোলা ফারশোলায় আর কোনও ভয় নেই। হাত ঢুকিয়ে খপাত করে ধরেই ছুড়ে বাইরে ফেলে দোব। অসাধারণ বীরত্ব। সেভিয়ার অফ ম্যানকাইন্ড, উওম্যানকাইন্ড। আহা, মানিক আমার। একটা উটকো লোক এসে পিতাকে অপমান করছে, সন্তান হয়ে গায়ে লাগছে না, রুখে দাঁড়াবার সাহস হচ্ছে না, মজা দেখছ, এরই মধ্যে আবার আরশোলা উদ্ধারের শখ। এই শোন, রোজই তো কথামৃত পড়িস, তা হলে মন অত চুলবুল করছে কেন রে! ‘সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক, থুথু ফেলে থুথু খাওয়া। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে সন্ন্যাসী বসে বসে কথা কবে না — হাজার ভক্ত হলেও জিতেন্দ্রিয় হলেও আলাপ করবে না।’ আরে সে তো পড়েছি। আরশোলা ঢুকেছে যে!

বিধুজ্যাঠা পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে বললেন, সামান্য ক’টা টাকার জন্যে এত নাচানাচি, ভাঙাভাঙি!

ষোলোকলা পূর্ণ হল। দরজার সামনে মাতামহ। কয়েকদিন অদর্শনের পর আজ উপস্থিত। বুকের কাছে দু'হাতে ধরা একটি বিশাল ঠোঙা। কাগজ ফুঁড়ে তেল ফুটে উঠেছে। তার মানে রসদ সহ অভিযানে বেরিয়ে পড়েছেন। মুড়ি আর তেলেভাজা। পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ চালাবার ইচ্ছে ছিল। ঘরের লন্ডভন্ড কাণ্ড অবস্থা দেখে বললেন, কী ব্যাপার! বেড়াল ঢুকেছে নাকি? বেড়ালও চোর, তবে তার জন্যে আবার পুলিশ কেন?

আজ্ঞে বেড়াল নয়, বিধুজ্যাঠা।

মাতামহ টর্পেডোর মতো সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, তারপর দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আরে আরে, এটা যে দেখছি সেই সিন্ধুঘোটক জুট মার্চেন্টটা। আঁটকুড়োর ব্যাটা? তুই এখানে সাতসকালে কী করছিস! ফুটবল খেলছিস। ব্যাটার মুখ দেখলেও অযাত্রা।

ক্রোধে শরীর কেঁপে কেঁপে উঠলেও পিতার শালীনতা জ্ঞান নষ্ট হয়নি। মাতামহকে বললেন, এ আপনি কী বলছেন? আঁটকুড়োর ব্যাটা? আরও অনেক ভাল ভাল গালাগাল আছে, যেমন পিগ, রাসকেল, সান অফ এ বিচ, হতচ্ছাড়া, জানোয়ার। সেসব ছেড়ে আপনি চলে গেলেন বস্তির ল্যাঙ্গোয়েজে। ওই আপনার দোষ। মুখের ফিল্টার নষ্ট হয়ে গেছে।

মাতামহ একগুঁয়ে ছাত্রর মতো বললেন, যা বলেছি, বেশ বলেছি। তুমি ওকে কতটা চেনো হরিশঙ্কর? ও একটা চিট। দ্যাটস রাইট। হি ইজ এ চিট। শুধু তাই নয়, ওই আগেরটাও। তুমি ওর জন্মবৃত্তান্ত জানো? ওর মা ছিল নন্দলালের রক্ষিতা। সমাজের যে শাসন নেই, তাই আজ সিল্ক চড়িয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরছে। চুলে আবার পমেটম। তুই কোন সাহসে আমাদের সামনে চেয়ারে পা তুলে বসে আছিস? ওঠ। উঠে দাঁড়া। কান ধরে উঠে দাঁড়া।

মাতামহকে দেখে বিধুবাবু একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এখন যেন জোঁকের মুখে নুনের ছিটে পড়ল। বাধ্য ছেলের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তা হলে কোর্ট কাছারিই করতে হচ্ছে!

আবার টাকা! কীসের টাকা? কার টাকা?

পিতা তেড়ে আসতে চাইছেন। হাতের মুঠো আবার পাকিয়ে উঠেছে। আমরা আবার কোরাস ধরেছি, বাবা কাচ, মেসোমশাই কাচ।

টাকার কথা আসছে কেন হরিশঙ্কর? তুমি কি এই দালালটার কাছে টাকা ধার করেছিলে?

মাতামহ ব্যাপারটা বুঝতে চাইলেন। রঙ্গমঞ্চে আপাতত চরিত্ররা স্থির। চেয়ার পা উলটে পড়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত অশ্বের মতো। থানইটের মতো কিছু কেতাব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। উত্তেজনায় মেসোমশাইয়ের ভুঁড়ি ইঞ্চিখানেক চুপসে যাওয়ায় কাপড়ের কষি আলগা হয়ে গেছে। টাইট করে বাঁধার চেষ্টা করছেন। কনক আর একটা ঝাড়ু এনে উবু হয়ে বসে কাচের কোয়া ঠেলে ঠেলে এক জায়গায় জড়ো করছে। পিঠের দিকে খোলা অংশে শাড়ির আঁচল লাগলে আরশোলা ভেবে চমকে চমকে উঠছে। মুকু চেষ্টা করছে বইয়ের র‍্যাকটাকে সোজা করার। বিধুজ্যাঠা শাসিয়েটাসিয়ে, কোর্টকাছারির ভয় দেখিয়ে পালিয়েছেন। মাতামহ বুকের কাছে ঠোঙাটি তখনও ধরে আছেন। অনেকক্ষণ লোভ সামলেছেন। আর পারলেন না। বেশ বড় সাইজের একটি বেগুনি বের করে সযত্নে দাঁতে কাটলেন। মুচুড় করে শব্দ হল।

মুকু ভূপাতিত চেয়ারটিকে খাড়া করেছে। পিতা সাবধানে পেছনে সরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। এতক্ষণ সব বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। আবার হিসেবজ্ঞান ফিরে আসছে। মাতামহ বিধুবাবুর বসে যাওয়া চেয়ারে বসলেন না। অপবিত্র হয়ে গেছে। পাশের আর একটা চেয়ারে বসলেন। মুখে বেগুনি, মাকালীর লাল জিভের মতো সামনে লকলক করছে।

মেসোমশাই কোমরের কষি কোনওমতে বাগে আনতে পেরেছেন। আর একটা চেয়ারে বসে তাঁরও ওই একই প্রশ্ন, কী টাকা টাকা করছিল ওই স্কাউন্ড্রেলটা!

মাতামহ বেশ সন্দেহের চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকালেন। চোখ ঘুরে গেল কনক আর মুকুর ওপর দিয়েও। এরা আবার কারা? সংসারটা বেশ শ্মশানের মতো হয়ে ছিল! হঠাৎ শ্মশান জাগাতে এ কাদের আগমন? প্রশ্ন করলেন, আপনাকে তো ঠিক চিনলুম না? সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিচয় দিলেন, আমি হরিশঙ্করের শ্বশুরমশাই।

কী ট্রেনিং! মুকু আর কনক সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে গড়াগ্‌গড় তিনজনকে প্রণাম করে ঘরের মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নৃত্যের একটা ছন্দ চলে গেল চোখের সামনে দিয়ে। মেসোমশাই বললেন, আমার মেয়ে।

মাতামহ একটা হাত বুকের কাছে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে সাপের ফণার মতো তুলে ধরে বললেন, সে তো বুঝলুম, কিন্তু আমিটা কে?

পিতা বললেন, এঁকে আপনি আগে হয়তো দেখেননি, মেজদার ভায়রাভাই। পণ্ডিত মানুষ। ডাকসাইটে উকিল।

মাতামহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কী, চলবে? বেগুনি, আলুর চপ, আলুর বড়া বা ফুলুরি?

আজ্ঞে, সবই তো সুস্বাদু, মুখরোচক। তবে আমি যে আবার অম্বলের রুগি!

মাতামহ হা হা করে হেসে বললেন, পুরুষমানুষের অম্বল? হরিশঙ্কর, শুনেছ? পুরুষমানুষের অম্বল! ও তো মেয়েদের অসুখ গো! অম্বল, মাথাধরা, গেঁটে বাত, বাধক। গরম তেলেভাজা না খেলে তোমার ও ব্যামো সারবে না বাপু! সুখদা মোক্ষদা মা, আমার দিকে এসো তো!

কনক আর মুকু এগিয়ে গেল। যাক, দু'জনের আর একজোড়া নতুন নাম হল। মাতামহ ঠোঙাটি কনকের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, বাঃ, বেশ মেয়েটি তো? একেবারে দুর্গাপ্রতিমা! আমার নাতিটার বিয়ে দিয়ে দিলে হয়। এই ভস্মলোচনের সংসারে একটি অন্নপূর্ণার বড় প্রয়োজন। মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ। বান্ধবা শিবভক্তাচ স্বদেশোভুবনত্রয়ম।

ঠোঙাটা বুকের কাছে ধরে, মাথাটাকে তার ওপর গুঁজে, মুকুর পা মাড়িয়ে আমাকে ধাক্কা মেরে মাতা অন্নপূর্ণা ঘর ছেড়ে পালালেন। এই লাজুক লাজুক প্রস্তাবে বাচ্চা মহাদেবটিকেও কামরাঙার মতো মুখ করে, দেয়ালে পিঠ ঘষে ঘষে গুটিগুটি সরে পড়তে হল।

রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই কনক বললে, যাও! তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

আমার তো আবার সবেতেই পাকামো! এই আহ্লাদে আটখানা, এই আবার বিষাদে ফুটিফাটা। এখন ভেতরটা নেত্য করছে।

কনক বসে বসে ঠোঙা থেকে তেলেভাজা বের করছে। চট করে আঁচলটা মাথায় তুলে দিলুম। মন ধমকে উঠেছিল, কী গ্রাম্য রসিকতা! হৃদয় শোনেনি, হাত বশে থাকেনি।

আর মা অন্নপূর্ণা! তিনি কপাত করে আমার হাত চেপে ধরে কটাস করে আঙুল কামড়ে দিলেন। মোস্ট আন-অন্নপূর্ণাসুলভ কর্ম। দৃশ্যটি মুকু দেখে ফেললেন এবং মৃদু হেসে বুঝিয়ে দিলেন, বেশ হচ্ছে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে, কোনও মেয়ে যদি কটাস করে আঙুলের মাথা কামড়ে দেয় তা হলে তার কী অর্থ! সুখেন? না সুখেন নয়। আরও পবিত্র কেউ। যে এর ভেতরের রোমান্সটা চটকে বের করে দিয়ে বিশ্রী একটা দেহের স্বাদ ঢুকিয়ে দেবে না। মায়া? না, মায়াও নয়। তা হলে মাতামহকেই জিজ্ঞেস করব। প্রাণের কথা বলার মতো এমন প্রাণ আর কোথায় পাব!

মাছ আনা মাথায় উঠেছে। বসার ঘরে তিন সংসারী আলোচনায় বসেছেন। ব্যাপারটা যেমন আকস্মিক তেমনই কদর্য। পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা। একদিকে যেমন ভাল, আর একদিকে তেমনই খারাপ।

কী বলছে ব্যাটা? তোমার মেজদা টাকা ধার নিয়েছিল? মাতামহ আলুর চপ খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন।

কোনও ডকুমেন্ট আছে? মেসোমশাইয়ের প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন।

ওর আস্তিনে কী আছে ওই জানে। মাঝে মাঝে কেবল তড়পে যাচ্ছে। আমার পরামর্শ ছাড়া মেজদা জীবনে কোনও কাজ করেনি। সে এই লোফারটার কাছে টাকা ধার করতে যাবে, আমি বিশ্বাস করি না। অসম্ভব। ইমপসিবল। আর টাকা তাকে ধার করতে হবে কেন? তার কোনও অভাব ছিল? সে তো ধার দিয়েই ফতুর। ওই রাসকেল আমাকে বলে গেল, মেজদার মেরে আমি বড়লোক! ছি ছি কানে যেন গরম সিসে ঢেলে দিয়ে

গেল। মেজদা যা রেখে গেছে, আমি কাকে দোব? দোবটা কাকে? কেউ তো নেই। মেজদার বংশই তো লোপাট হয়ে গেছে। আমি কি পার্সেল তার ওপরে পাঠাব!

মাতামহ বললেন, মেজকত্তা একটু খরচে ছিল। দানধ্যানও ছিল প্রচুর। তুমি সে তুলনায় বেশ হিসেবি।

এই রে, মরেছে রে! আমার মাতামহের এই এক যা দোষ! মনে যা এল, দুম করে বলে ফেললেন। মা ব্রুয়াত সত্যমপ্রিয়ম। কে কার কথা শোনে! এইজন্যে যে অপ্রিয় হতে হয়, তা বোঝেন না। পিতা কঠিন মুখে তাকালেন, সংসারী মানুষকে একটু হিসেবিই হতে হয়। দিয়তাম, ভুজ্যতাম করলে আপনার ছেলেটির মতো অবস্থা হবে। আয় একশো, ব্যয় হাজার, পাঁচজনের কাছে হাত পেতে বেড়াও। বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। ব্যাটা যেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। রোজ মোগলাই খানা চাই। কানে আতর চাই। একপা হাঁটার ক্ষমতা নেই, গাড়ি চাই, সেবাদাসী চাই। বউয়ের কী তোয়াজ। ব্যাটা যেন বিল্বমঙ্গল! পরশুদিন একটা শাড়ি এল, দাম শুনলে চক্ষু চড়কগাছ, দুশো টাকা!

বেহিসেবি হওয়া যেমন ভাল নয়, আবার আপনার মতো ওয়ানপাইস ফাদারমাদার হওয়াটাও ঠিক নয়।

আরে দুর, আমার পাইসই নেই তো ফাদারমাদার। তোমার যেমন কথা!

মেসোমশাই উসখুস করছিলেন। আলোচনা লাইন চেঞ্জ করে অজ্ঞাত দিকে চলেছে। পারিবারিক গোপনীয়তা বেরিয়ে আসছে। খক করে একবার কেশে চূড়ান্ত রায় দিলেন, হোয়েন দেয়ার ইজ নো ডকুমেন্ট, দেয়ার ইজ নো ক্লেম। যিনি ধার নিয়েছেন তিনি আর জীবিত নেই। একটা মানহানির মামলা ঠুকে দিন।

মাতামহ মহাউল্লাসে বললেন, এই তো আইন আমাদের পাশে, আমাদের কাত করে যাবে এক ব্যাটা দালাল! ঠুকে দাও, ঠুকে দাও। আমার জামাইকে আমি রিপ্রেজেন্ট করব।

কত টাকা দাবি করছে? মেসোমশাই আর একটু গভীরে যেতে চাইলেন।

পাঁচ হাজার। বলছে খেপে খেপে দিয়েছে। মেজদা মুদিখানায় কিছু ধার রেখে গিয়েছিল, হাজারখানেকের মতো। ভয়ে আমাকে বলেনি। সাধুখাঁ খাতা দেখাতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি, অফকোর্স উইথ এ প্রেয়ার, মেজদা, এবার তুমি যেখানেই জন্মাও, লম্বা হাত খাটো করার মতো এমন ভাই তোমার পাশে থাকবে না। তুমি সেই স্বভাব নিয়ে এসো, যে স্বভাব বলে, কাট ইয়োর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর ক্লথ।

মাতামহ বললেন, মুদিখানার হাজার তুমি না দিলেও পারতে। ওরা তিন টাকাকে তিরিশ টাকা করে রাখে। ওসব হল বানানো খাতা।

তা বললে কি চলে? ও আপনি পারেন, আমি পারি না, আমার শাস্ত্র আলাদা। আর একটা ধার ছিল, অতি সামান্য। জানতেও পারতুম না, যদি না মেজদা স্বপ্নে এসে বলে যেতেন।

কীরকম? কীরকম? মাতামহ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পরকালের গন্ধ পেয়েছেন।

ভোররাতে মেজদা এলেন।

নিশ্চয়ই ট্রেন লেট ছিল। আমি এতকাল রেলকোম্পানির মালবাবু ছিলুম। লেট না থাকলে কোনও ট্রেন শেষরাতে হাওড়ায় ইন করে না।

আপনি ছিলেন মালবাবু, কথা বলছেন জলপাইবাবুর মতো।

অর্থ?

সুকুমার রায়। জল পাই আর জলপাই এক করে পাগল করে মেরেছিল। হচ্ছে স্বপ্নের কথা চলে গেলেন অন্য লাইনে, রেললাইনে।

বয়েস হরিশঙ্কর। বয়েস। বয়েসে বাতুল। তুমি বলো, বলো। লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি। ব্লটিং পেপারে একটু চিটেগুড় পেলে জিভে সেঁটে ধরতুম।

কাশীর চিনি মিলতে পারে। চিটেগুড় পাবেন গুলিখোরদের আখড়ায়।

কনক চা নিয়ে এল না, এল মুকু। লজ্জা হয়েছে। বিয়ের কথায় মেয়েরা কেমন যেন মেদুর হয়ে যায়। আরে বোকা, ও তো মাতামহর ঠাট্টা। বৃদ্ধদের ওই তো রীতি। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই একেবারে ফুলশয্যার ছবি আঁকা। লাল মেঝে। বাঘথাবা খাট। নীল কামুক মশারি। ফলাও সাদা চাদর। বিলাসী বালিশ। রজনীগন্ধার ছড়ি। যুঁইয়ের মালা বাজু বেয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে মাতোয়ালা। ইন্দ্রিয়ে সুবাসের সুড়সুড়ি। ফরাসডাঙার ধুতি আর গরদের পাঞ্জাবি পরে প্যাঙা বসে আছে গ্যাঁট হয়ে। বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি বেড়ে ছেচল্লিশ ইঞ্চি একটি প্রেমের তাকিয়াকে ধরবে বলে। আর পাকা মেয়েরা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কাঁচা অর্ঘ্যটিকে ভেতর দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যাও না যাও, ওই যে বসে আছেন ঠুঁটো জগন্নাথ, জগন্নাথ স্বামী রসানন্দো রাধাসরসবপু-রালিঙ্গনসুখো। বৃদ্ধের চোখে হারিয়ে যাওয়া সেই অতীত রাতের ছবি। পাকা পেয়ারার মতো দিদিমার বদলে ঘরে একটা কাঠের সিন্দুক। কতদিন দেখেছি, মাতামহ সিন্দুকের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন, হ্যাঁগা, শেষপারানির কড়িটি তুমি রেখেছ তো!

যাক, চা এসে গেছে, বলে মাতামহ চায়ে একটা চওড়া চুমুক চালিয়ে বাপস বলে কাপ নামিয়ে রাখলেন। ঝালের জিভে গরম চা উত্তপ্ত শাবলের মতো ঢুকেছে। ভয়াবহ মুখে ফেলে আসা আলোচনার টুকরো তুলে নিলেন, শেষরাতে মেজকত্তা এলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ! তিনি এলেন উত্তরের দরজা দিয়ে।

হ্যাঁ, ওই দিকেই যে হিমালয়!

নো কমেন্টস। এটা জিওগ্রাফির ক্লাস নয়। দিস ইজ প্যারাসাইকোলজি।

বাবা, কতরকমের প্যারা আছে গো! প্যারাটাইফয়েড, প্যারাচুট, প্যারালিসিস, প্যারাগ্রাফ, প্যারামর্শ।

প্যারামর্শটা কী?

পরামর্শকে একটু বাঁকা পথে চালালেই প্যারামর্শ। উকিলরা যা দেয় তা হল প্যারামর্শ। ওই প্যারামর্শর ঠেলাতেই সারাজীবন কোর্টের খোঁটায় কলুর বলদের মতো ঘুরেই চলেছি, মামলার তেলে আমার উকিল বঙ্কুবিহারী দিন দিন চকচকে হচ্ছে। মাগের গতর দেখলে সুন্দরবনের কেঁদোর জিভে জল আসবে।

মাগ ছাড়া অন্য শব্দ মাথায় এল না?

আহা, ওই যার চেহারা তাকে আমি কেমন করে রমণী বলি? একটা মানানসই শব্দ বলতে হবে তো? তুমি সবেতেই যদি চটে যাও তা হলে তো বোবা হয়েই থাকতে হয়। তা হলে তুমি রামকৃষ্ণের ওপর রাগো, রামপ্রসাদের ওপর রাগো। আমি তো তাও মাগি বলিনি! রামপ্রসাদ বলে আমার কোষ্ঠী, শুদ্ধ সেই তারাবেশে। মাগি জানে না যে মন কপাটে খিল দিয়েছি কত কষে।

আপনি অফুল।

নিশ্চয়ই কোনও বিলিতি ফুল। কুন্দ, কমল, বকুল, বেল, যুঁই, জবা, ঘেঁটুর দলে নয়। বুঝেছি খুব বিরক্ত হচ্ছ। কী করি বলো, সারাদিন কথা বলার লোক পাই না। ছেলে ওল্ডফুল বলে মুখ বেঁকিয়ে সরে পড়ে। দেখেশুনে পুত্রবধূ নিয়ে এলুম। ছেলে সরে পড়ল ফুসলে নিয়ে। বড়লোকের মেয়ে, ছেলে শ্বশুরের সেরেস্তায় বন্ধক পড়ে গেল। বউ বললে, ওঠো তো ওঠো বোসো তো বোসো। সঙ্গী আমার কেউ নেই হরিশঙ্কর। দেয়াল, বেটির ছবি, দোরগোড়ার নারকোল গাছ, গোটাকতক কাক, আর আমার এই সুদের সুদ নাতি। মেরে তাড়াবে তাড়াও। তোমারই রকে গিয়ে বসব। লোকে বলবে জামাই শ্বশুরকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। জানো, গত তিনদিন আমার পেটে দানাপানি পড়েনি। কেউ একবার জিজ্ঞেস করেনি, বুড়ো, তুমি কিছু খেয়েছ? দোতলায় মোগলাই, একতলায় হরিমটর। মাতামহ চোখ রগড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে উঁহু করে হাত সরালেন, বাপস জ্বলে গেল, আঙুলে আলুর চপের লঙ্কা লেগে ছিল।

পিতার প্রশ্ন, দানাপানি জোটেনি কেন?

আর বলো কেন? সে আর এক দুঃখের কথা। এখন সই করতে গেলে হাত কাঁপে। যতবার টাকা তোলার ফর্মে সই করি, পোস্টমাস্টার বলে সই মিলছে না। সাক্ষী ধরে আনুন। শেষে জিজ্ঞেস করলুম, মশাই আমি তা হলে কোন শালা? সইয়ের আমি, না আমার সই!

আজ থেকে আপনি আমার এখানে খাবেন। যদ্দিন আমি বেঁচে থাকব। তবে একটা অনুরোধ, যতদূর সম্ভব হুগলি জেলার ওই গ্রাম্য শব্দগুলো ব্যবহার না করার চেষ্টা করবেন। শুনলেই আমার পিত্তি চটে যায়। মনে থাকবে?

মাতামহ বাধ্য ছেলের মতো মাথা নাড়লেন। গালে জলের রেখা। দুঃখ আর লঙ্কা নিংড়ে বের করেছে।

মেসোমশাই বললেন, আমারও একটা প্রতিবাদ আছে। উনি একটু আগে উকিলদেরও একহাত নিয়েছেন। বলেছেন আমরা মক্কেলকে যা দিই তা হল প্যারামর্শ। মক্কেল মেরে, তেল বের করে আমাদের চেকনাই। হাইলি অবজেকশনেবল।

মাতামহ জল-ভরা চোখে হেসে উঠলেন। কানন দেবীও এমনটি পারবেন না। অনেকটা রোদ আর বৃষ্টির মতো। হাসতে হাসতে বললেন, তোমাকে বলিনি গো। তুমি তো আমাদের ঘরের উকিল। ঘরকা মুরগি ডাল বরাব্বর। অনেকদিন আগে বিভক্তির শ্লোক মুখস্থ করেছিলুম, প্র, পরা, অপ, সম, নি, অভি, দুর, বি। হরিশঙ্করের প্যারার সঙ্গে মেলাতে গিয়েই কথায় কথা বাড়ে, টাকায় বাড়ে সুদ। ও কিছু না। তোমাকে আমি কিছু বলিনি।

মুরগি বলাটা মনে হয় উপযুক্ত হল না, যতই হোক হিন্দুর ছেলে!

পিতার মুখ দেখে মনে হল ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। কথার জালে ক্রমশই এমন জড়িয়ে পড়ছেন কীভাবে যে কেটে বেরিয়ে আসবেন ভগবানই জানেন। আঙুল তুলে মাতামহকে বললেন, আপনি অনেকটা গেঞ্জির মতো। কোনা ধরে টান দিলেই হল, ফড়ফড়, ফড়ফড় খুলেই চলেছেন। ওর জন্যে আমি যেমন এক 'নব-সারমন-অন-দি-মাউন্ট' তৈরি করছি, আপনার জন্যও সেইরকম একটা তৈরি করতে হবে।

ওই একটাতেই হবে হরিশঙ্কর। আবার নতুন করে খাটবে কেন?

খাটতেই হবে। দু'জনের দু'রকম নেচার। আপনার জন্যে পয়লা উপদেশ হবে, কম কথা বেশি আহার। খাবার না দেখলে ঠোঁট ফাঁক হবে না।

আঃ, চমৎকার চমৎকার! তুমি আমাদের হিন্দু যিশু, তোমাকে শিশুর মতো কোলে তুলে আমার ধেই ধেই করে নাচতে ইচ্ছে করছে। প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌরহরি, হরিবোল। হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ। মাতামহ মাথা নেড়ে নেড়ে সুর করে গাইতে লাগলেন। পিতা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাবসলিউটলি ব্যাড টেস্ট। নাম নিয়ে ব্যঙ্গ।

গান থেমে গেল। সরল মুখে মাতামহ বললেন, কেন, শাক্ত কি মাঝে মাঝে বৈষ্ণব হতে পারে না?

কেন পারবে না? সব ধর্মেরই শেষে মৃত্যু। তা বলে আপনি আমার নাম নিয়ে সুর করে হরি হরায় নমঃ, হরি হরয়ে নমঃ করবেন? অত্যন্ত কুরুচির পরিচয়।

আরে এ হরি সে হরি নয়। ইনি সেই লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিম্‌। তুমি তো শুধু হরি নও, হরি আর শঙ্কর একসঙ্গে পাটিসাপটা হয়ে বসে আছ। রেগে আছ তো, তাই বুদ্ধিবৈকল্য হয়েছে। না বাবা, তোমার সামনে আর বসব না। কী বলতে কী বলে ফেলব!

মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। কোলের ওপর থেকে গোটাকতক মুড়ি মেঝেতে ছিটকে পড়ল। ভয়ে ভয়ে মুড়ির দানা ক'টা মেঝে থেকে নিচু হয়ে তুলতে তুলতে বললেন, তোমার কোনও কথাই শোনা হল না।

আপনিই তো সব ভণ্ডুল করে দিলেন।

আচ্ছা বেশ, আমি যদি এখন একটাও কথা না বলে চুপ করে লক্ষ্মীছেলের মতো বসি!

চেষ্টা করে দেখুন।

মাতামহ চেয়ারে বসে মেঝে থেকে কুড়োনো মুড়ির একটা দানা মুখে পুরলেন। কার সামনে কী কাজ! পিতার নজর সর্বত্র, আরে ছিঃ ছিঃ। আপনি ওই মেঝের মুড়ি দাঁতে কাটছেন, ছি ছি ছিঃ। দেশে এত বড় দুর্ভিক্ষ চলেছে জানতুম না তো! ক'দিন না খেয়ে আছেন?

মেঝেটা তো বেশ পরিষ্কার হরিশঙ্কর।

আরে একটু আগেই ওখানে বিধু নেচে গেছে। যান, মুখ ধুয়ে আসুন। আপনাকে দেখছি এবার কোমরে ঘুনসি বেঁধে, দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে, দামড়া গোপালের মতো। দ্বিতীয় শৈশব শুরু হয়ে গেছে।

একদিন তোমারও হবে। না, না, হবে না, হবে না। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

স্তম্ভিত ঘরে মাতামহ মুখ ধুয়ে ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন ধীরে ধীরে, যেন শব্দ না হয়। শুভ্র ব্যাকব্রাশ করা চুলে জল হাত বুলিয়েছেন। ধবধবে সাদা ভুরু জলে ভিজে ভিজে। তপঃক্লিষ্ট মুখ অদ্ভুত প্রসন্ন। কোঁচার খোঁটে মুখ মুছতে মুছতে বহু দূর থেকে বললেন, নাও শুরু করো।

কথা বলার ধরনে বেশ বোঝা যায়, দেহ ঘরে, মন উড়ে চলে গেছে বহু দূরে। আমাদের ছাতে বহুকাল ধরে এক খণ্ড কাঠ পড়ে আছে। জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতে শুকোয়, হিম খায়, বসন্তের বাতাস পায়। এর নাম নাকি সিজনিং। কাঠ ধীরে ধীরে লোহা হয়ে উঠছে। মাতামহকে দেখলে, আমার সেই কাঠের টুকরোটার

কথা মনে পড়ে। Seasoned Sailor returns from the Seven Seas/ His eyes speak of Cyclones/ Hairs bleached white.

পিতা শুরু করলেন, রাত প্রায় ফিকে হয়ে এসেছে। ভোরের মেটে আলোয় মেজদা উত্তরের দরজা খুলে এলেন। গায়ে সাদা উত্তরীয়। আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়ালেন। মেজদা তুমি? মুখে অপূর্ব হাসি। মানুষের মুখে অমন হাসি দেখা যায় না। স্বর্গীয় হাসি। তুমি কেমন আছ মেজদা? বললেন, সে তোমাকে বোঝাতে পারব না হরি। না থেকেও থাকার আনন্দ। এলে বুঝতে পারবে। সে এক মহাসম্মেলন। তুমি কি আবার আসবে? মেজদা বললেন, আপাতত নয়। তোমাকে একটা কথা বলার জন্যে আজ এলুম। ওই যে কেবল মুচি, যাবার দু'-তিন দিন আগে ওকে দিয়ে আমার চটির স্ট্র্যাপটা সেলাই করিয়েছিলুম। পয়সা দিয়ে যেতে পারিনি। বড় ভাল মানুষ। কোনওদিন চাইবে না। তুমি সকালেই গিয়ে দেনাটা শোধ করে এসো। আলমারিতে আমার চশমার খাপে স্যাময় লেদারের তলায় টাকা আছে। পুরোটাই দিয়ে দিয়ো।

আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মেজদা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঘুম ভেঙে গেল। ফুটো দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়লে যেমন হয়, সেইরকম একটা রুপোলি রেখা ক্রমশ গুটোতে গুটোতে বহু দূরে চলে গেল। সারাঘরে সুন্দর গন্ধ। আমি একজন কেমিস্ট। অমন গন্ধ পৃথিবীর কোনও আতরে খুঁজে পাইনি। জানি না ব্রহ্মকমলের কেমন গন্ধ!

মাতামহের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। মেসোমশাই বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার। মুখ দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। সামনে ঝুঁকে পড়ে মাতামহ বললেন, তারপর কী হল!

আলমারি খুললুম। চশমার খাপ। সত্যিই টাকা রয়েছে। একটা দশটাকার নোট। সকাল হল। কেবলকে জিজ্ঞেস করলুম। সাধুসন্ত মানুষ। কিছুতেই স্বীকার করবে না। শেষে বললে, হ্যাঁ, মেজবাবু জুতো সারিয়েছিলেন। তবে সে পয়সা আমি আর কিছুতেই নিতে পারব না। স্বপ্নের কথা বলতেই কেঁদে আকুল। একজোড়া সোয়েডের নিউকাট দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন, মেজকত্তার জুতো। তৈরি হল, পরা আর হল না। এই তো মানুষের জীবন! টাকা কী হবে? সেই টাকা দশটা ফ্রেমে বাঁধাই করে দোকানে ঝুলিয়ে রেখেছে। সেই মেজদা বিধুর কাছে টাকা ধার করেছেন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

মেসোমশাই বললেন, একটা মানহানির মামলা ঠুকে দিই। আর দেরি নয়। ফার্স্ট, থানায় একটা ডায়েরি করে আসতে হবে।

না। মামলা-মকর্দমা নয়। আমি টাকাটা ওর নাকের ডগায় ছুড়ে ফেলে দোব।

সেকী? মাতামহ আর মেসোমশাই দু'জনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন।

পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে আমার কাছে আমার ইজ্জত অনেক মূল্যবান। ওর জন্যে, ওর জন্যেই আমি ওই জোচ্চোরটা যা চায় তাই দোব।

পিতা দূর থেকে আমাকে বারকতক আঙুলের খোঁচা মারলেন।

মেসোমশাই বললেন, এর মধ্যে ও আসছে কী করে?

ভবিষ্যতে কেউ যেন না বলতে পারে, তোমার বাবা চোর ছিল, জোচ্চর ছিল, চরিত্রহীন ছিল। দেয়ালে যখন ঝুলব, তখন দেবতার মতো ঝুলব। পৃথিবীর আদর্শ পিতাদের তিল তিল নিয়ে আমি হব তিলোত্তম।

কোনওদিন ওর মনে যেন এই ক্ষোভ দেখা না দেয়, আমার পিতা যা বলতেন তা করতেন না। হি ওয়াজ এ বান্ডল অফ প্যারাডক্স। দেবদেবীতে আমার বিশ্বাস নেই, দেবচরিত্রে আমার বিশ্বাস আছে। আমার চরিত্রই আমার গর্ব। সেই গর্বের ছোঁয়া লাগবে আমার পুত্রের চরিত্রে। All over the land they will be telling of Dugald Stewart. Mothers will teach their children to be men by him. High will his name be with the teller of few teles. There are things greater than death. Dugald Stewart-এর জায়গায় হরিশঙ্কর। পাঁচ হাজার টাকা নাথিং বাট স্ক্র্যাপ অফ পেপারস।

শুনুন, শুনুন হরিদা, সেন্টিমেন্ট ভাল, সেন্টিমেন্টাল হওয়া ভাল নয়। রামকৃষ্ণ বলেছেন, ফোঁস করবে। ফোঁসটি ছেড়েছ কী মরেছ। চরিত্র এক জিনিস, দুর্বলতা আর এক জিনিস। ভীরুতা কি ভাল? মেসোমশাই বেশ গম্ভীর মুখে বললেন।

ভয়? যে ঈশ্বরকে ভয় করে না, যে শয়তানকে ভয় পায় না, জীবনের সিংহদুয়ারে যে একা প্রহরীর মতো সারাজীবন খাড়া তার অভিধানে ভয় শব্দের স্থান নেই বিনয়দা।

আছে আছে, 'সাবকনসাসে' লুকিয়ে আছে বদনামের ভয়, চরিত্রহননের ভয়। It is the dark idolatry of Self/Which, when our thoughts and actions once are done/ Demands that man should weep, and bleed, and groan/Seek not glories that are in heaven.

বেশ, এরও উত্তর আছে, We have no wings, we cannot soar. But we have feet to scale and climb. দেখতে দোষ কী, কতটা ওঠা যায়, হায়ার, স্টিল হায়ার।

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে মাতামহ বললেন, বেশ জমেছে হে? তবে বাংলায় হলে খুলত ভাল।

মাতামহের তারিফে বিশেষ কেউ কান দিলেন না। এজলাসে দুই বাঘা উকিল যেন সমানে সমানে লড়ছেন। আসামি হল মানুষের চরিত্র। পিতা বললেন, তা হলে একটা ঘটনা শুনুন।

আবার ঘটনা? মাতামহ টানটান হয়ে বসলেন।

দেরাদুন থেকে ট্রেনে ফিরছি। আমি ওপরের বাঙ্কে। ওপরের বিপরীত বাঙ্কে আমার এক বন্ধু। তার নীচে একটি ছেলে। একেবারে নীচের বাঙ্কে একজন বাঙালি মহিলা। মহিলার বিপরীতে হ্যাটকোট পরা এক প্রৌঢ় মানুষ। আমার নীচের বাঙ্ক খালি।

মাতামহ বললেন, সব গুলিয়ে গেল। তোমরা কে যে কোথায়?

আপনার আর বুঝে কাজ নেই। মডেল তৈরি করে না দেখালে আপনি বুঝতে পারবেন না। সে ইনটেলিজেন্স আপনার নেই। আমারও সে সময় নেই।

কে কোথায় আছ বুঝতে পারলে ভাল হত।

থাক। যা বুঝলেন তাইতেই সন্তুষ্ট থাকুন। ট্রেন চলছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক হলেন কিশোরটির পিতা।

কেমন করে জানলে? মাতামহের বাগড়া।

পিতার ধমক, আবার আপনি কিন্তু শর্ত ভেঙে পূর্বের অবস্থায় ফিরে চলেছেন।

মাতামহ অপরাধীর মুখে বললেন, স্বভাব যায় না মলে।

ট্রেন চলেছে। বিপরীত বাঙ্কে শুয়ে থাকা আমার বন্ধু কেমন যেন উসখুস করছে।

প্রথমে কারণটা বুঝতে পারিনি। আমার বাঙ্ক থেকে আমি ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছি, আর সেই মহিলাকে দেখতে পাচ্ছি। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। মহিলা বসে আছেন জড়োসড়ো হয়ে। আমার বন্ধু হঠাৎ তড়াক করে বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। নেমেই সেই সায়েবি পোশাক পরা লোকটির কলার চেপে ধরল, রাসকেল। খুবই অশ্লীল ব্যাপার। আমার নজরে পড়ার কথা নয়, বন্ধুর নজরে পড়েছে, লোকটা হল একজিবিশনিস্ট।

সে আবার কী? মাতামহ জানতে চাইলেন।

সে একটা অসুখ, এর বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।

ছোঁয়াচে?

মানসিক ব্যাধি। মহিলা বাঙালি। আমাদের বললেন, আপনারা দয়া করে আমার পাশে বসুন। কলকাতা পর্যন্ত যাব। একা ভীষণ ভয় করছে।

তোমরা চেন টেনে লোকটাকে নামিয়ে দিলে না কেন? আইন আছে, পাগল, ছাগল, ছোঁয়াচে রোগী, কেরোসিন, বারুদ, মাতাল, ট্রেনে ট্র্যাভেল করতে পারবে না। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দাও।

মাতামহ এমনভাবে বললেন, যেন ট্রেন চলছে, ঘটনা ঘটছে।

পিতা আবার শুরু করলেন, আমরা ওপর থেকে নীচে নেমে এসে সেই মহিলার দু'পাশে বসলুম। কথায় কথায় জানা গেল, মহিলার স্বামী দেরাদুনে সম্প্রতি মারা গেছেন। ফিরে চলেছেন কলকাতায় নতুন জীবন শুরু করতে। বিবাহিত জীবন মোমবাতির মতো গলে গলে নিবে গেছে। চার বছরেই সব শেষ। মানুষ কী জীব দেখুন। লালসার জিভ লকলক করে বেরিয়ে এলেই হল। চেক-ভালভ বলে কিছু নেই। এরাই আবার গর্ব করে বলে, অমৃতস্য পুত্রা।

মাতামহর প্রতিবাদ, একটা মানুষ দেখে সব মানুষকে গালাগাল দিয়ো না। গরলের পুত্র একটা-দুটো, অমৃতের পুত্রই বেশি। তা ছাড়া তুমি তো বললে, লোকটা অসুস্থ! কী যেন অসুখ বললে? ও রোগের নাম বাপের জন্মে শুনিনি।

না শোনাই ভাল? কিছু অসুখ আছে যার ওষুধ হল লাঠি। লাঠৌষধি। ব্রায়োনিয়া নয়, অ্যাকোনাইট নয়, পটপটি নয়। লালসার দাওয়াই হল শাশুড়ি-ছ্যাঁকা। জিভটি টেনে বের করো, আর খুন্তিকে লাল করে পুড়িয়ে ছ্যাঁকা।

তুমি আমাকে বলছ না তো হরিশঙ্কর? পান্তুয়া দেখলে যে আমার নোলা সকসক করে ওঠে।

এ নোলা সে নোলা নয়। এ হল নোলকের নোলা। প্রস্টেট থেকে বেরিয়ে এসে কুলকুণ্ডলিনীতে সুড়সুড়ি দেয়। মানুষ তখন সারমেয়ের মতো জিভ বার করে হ্যা হ্যা করতে থাকে। অমৃতের পুত্র উদম হয়ে হেঁচকি তোলে। সময় নেই, অসময় নেই, স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নেই। আমার পাখিই ভাল, আমার পাখিই ভাল। সূক্ষ্ম আহার, সূক্ষ্ম বিয়োগ, দুটি ডিম। একটু তা। লাল-ঠোঁট বাচ্চা। পালকের বাহার। অনন্ত আকাশ। গান, শুধু গান। দ্বিপদ প্রাণী যখন চতুষ্পদ হয়ে যায় তখন ব্যাপারটা এত ভালগার হয়ে দাঁড়ায়? আমাদের ভোলা ষাঁড় অনেক অনেক ডিগনিফায়েড।

মেসোমশাই সামান্য অধৈর্য হয়ে বললেন, এখনও কিন্তু উপসংহারে এলেন না।

ও হ্যাঁ। ঠিকই তো। মানুষের ব্যবহারে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। যা বোঝাবার জন্যে এই গল্পের অবতারণা, তা হল, সেই হ্যাটকোটধারী পশুমানবটি কুপেতে আর বসতে পারলেন না, বাইরের প্যাসেজে দাঁড়িয়ে রইলেন। অনেক রাতে বাথরুমে যাবার পথে প্যাসেজের শেষ প্রান্তে পিতা-পুত্রকে মুখোমুখি দেখলুম। ছেলে বাপকে জিজ্ঞেস করছে, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান ফাদার?

গলায় অভিমান, অভিযোগ। ফাদার ফাম্বল করছে। ইউ হ্যাভ ডান সাম রং। হোয়াই, হোয়াই? হোয়াই? হোয়াই? গলা ভেঙে এসেছে কান্নায়। আমি চাই না, আমি চাই না আমার পুত্র, জীবিত আমি মৃত আমির সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগের আঙুল তুলে বলে, কেন, কেন তুমি এমন কাজ করতে গেলে? আমার চরিত্রের অর্কিড হাউসে ও ঝুলতে থাকবে হিমালয়ের সৌন্দর্য নিয়ে। সেই কারণেই আমি বিধুকে পাঁচ হাজার টাকা দোব।

সেকী? মেসোমশাই, মাতামহ, দু'জনেই আবার চিৎকার করে উঠলেন। এ যেন সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতা কার বাবা বলে চিৎকার করে ওঠা।

সেকী টেকি নয়, ডিসিশন ইজ ডিসিশন।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, তোমারও ওই লাঠ্যৌষধি। বিধুকে তুমি টাকা দিয়ে দেখো!

মেসোমশাই বললেন, এ হল আইনের অবমাননা। লোকটাকে আমি জালিয়াতি কেসে ফেলে যাবজ্জীবন করে ছাড়ব ভেবেছিলুম। আপনি বাদ সাধলেন। কিল খেয়ে কিল হজম করে পুত্রবধূর। কয়েকদিন পরেই আপনি শ্বশুর হবেন, আপনার এ কী ভীরুতা।

মাতামহ বললেন, ও হবে শ্বশুর? শ্বশুর হলুম আমি। এ জিনিস দ্বিতীয় আর পাবে না। মেয়ে নেই আমার জামাই আছে। আর তার ঘাড়ে বসে লুচি চলছে, মালপো চলছে। দু'বার তীর্থভ্রমণও হয়ে গেছে।

মেসোমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, বাথরুমে বসে ঠান্ডা মাথায় আর একবার চিন্তা করুন হরিদা।

চিন্তা? পিতা হাসলেন। পাঁচ হাজার টাকা আমাকে বেঁধে ফেলার আগেই লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ি মারব। মন বড় দুর্বল। আমি ক্যাশবাক্স খুলব, এখুনি টাকা বের করব, এখুনি দিয়ে আসব। কে জানে? মন বড় দুর্বল। মন বড় অপলকা। পিতা ক্যাশবাক্সর দিকে এগোতে লাগলেন। তা না হলে রক্ষক ভক্ষক হয়ে যায়?

তার মানে? পইতের চাবিটি হাতে ধরে পিতা ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বললেন, ওই যে আমার ট্রেনের বন্ধু!

নীলাঞ্জন-সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম

দিন যেন ঝলসে যাচ্ছে। চনমনে রোদ। চারপাশ ঝনঝন করছে। সামনে গঙ্গা। জোয়ারে ভারভরন্ত। সারাশরীরে ঢেউয়ের কুচুরমুচুর। একটু আগে একটা স্টিমার চলে গেছে। তলপেটে চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে। বড় ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে ঘাট পর্যন্ত চলে এসেছে। পইঠেতে জলের ধাক্কা লেগে লপাত লপাত শব্দ হচ্ছে। শ্মশানের কাঠকয়লা তালে তালে নাচছে — এই ছিল এই নেই সুরে। নৌকো ভেড়ার বাঁশের সাঁকো তলিয়ে গেছে জলের তলায়। নৌকো বাঁধার খোঁটাটি শুধু জেগে আছে দূরে। একপাশে পতিত মাঝির বৃদ্ধ নৌকো দুলে দুলে উঠছে। ঝুলনের মেলায় সেই প্রৌঢ়া নর্তকীর কোমর দুলিয়ে নাচার মতো। যে-নাচ দেখতে গিয়ে তাঁবুর ভেতরেই শশাঙ্ককাকার কানমলা খেয়েছিলুম। বাইরের পোস্টারে মাকড়সা-কন্যার জাল বোনার কথা সাড়ম্বরে লেখা ছিল। ভেতরে যে ঘাঘরা নাচের আয়োজন কেমন করে জানব। সুখেন হয়তো জানত! তা না হলে ঢুকবে কেন? কন্যাটন্যার মর্ম সেই বয়েসে সুখেনের চেয়ে ভাল কে আর জানত। প্রথমে প্যান্ট পরা চোয়াড়ে মার্কা একটা লোক কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে খুব খানিক অসভ্যতা করে, সিক সিক দু'বার সিটি মারতেই ততোধিক অসভ্য সেই মহিলা পেছনের ছেঁড়া চটের পরদা ঠেলে বেরিয়ে এল। মুখে খড়ি, ঠোঁট লাল। বুকদুটো ঠেলে বেরিয়ে আছে। সুখেনের মতো অ্যানাটমিই বা কে জানে? ফিসফিস করে বললে, ফল্‌স। শুরু হল অশালীন ক্রিয়াকলাপ। ভদ্ররুচির কোনও মানুষের সেসব দেখা উচিত নয়। উঠে পালাবার উপায় নেই। সুখেন চেপে ধরে রেখেছে। আমাদের পাশে লুঙ্গি পরা সব লোক বসেছে। মদের গন্ধ, রসুনের গন্ধ, তেলের গন্ধ, বিড়ির গন্ধ। মঞ্চের লোকটা মাঝে মাঝে সেই মহিলার বিশাল পাছায় পটাস পটাস চাপড় মারছে, আর সকলে হায় হায় করে উঠছে। বুকফাটা আর্তনাদ। মানুষের কখন কী যে কেমনভাবে ফেটে যায়! চিতায় বেলের মতো ফটাস করে মাথা ফাটে। দুঃখে বুক ফাটে। এ আবার কী ফাটা! আমার পাশের লোকটা কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলল, মাগির রস আছে। রসগোল্লার রস হয়। এ আবার কী রস বাবা! কিন্তু শশাঙ্ককাকার মতো প্রবীণ মানুষ কী জন্যে ওই রসমঞ্জরীর কাছে গিয়েছিলেন? জবাব নেই।

এমন মজা, সেই থেকে কিছু দুললেই কান সুড়সুড় করে ওঠে, আর সেই মেয়েমানুষটির কথা মনে পড়ে। আহা, এ যেন ভক্ত প্রহ্লাদ, ক বললেই কৃষ্ণের কথা ভেবে হাপুস। কিন্তু দূরে ঘাট-মাঝি চট পেতে ক্যাশব্যাক্স নিয়ে বসে আছেন। গঙ্গার ধারে সারাদিন বসে থেকে থেকে, নৌকোর পারাপার দেখে দেখে কেমন যেন দার্শনিকের মতো মুখ। বসে আছেন তো বসেই আছেন। ইনি যেন সিদ্ধার্থের সেই ঘাট-মাঝি। হেরম্যান হেসের ওই বইটা কতবার যে পড়েছি। যতই পড়ো বাবা! জীবন অনেকটা চুনো মাছের মতো। আঁশটে গন্ধ কি সহজে যেতে চায়। ছাঁকা তেলে কড়কড়ে করে ভাজা না হলে!

পশ্চিমে রোদ ঝুলছে। জল থেকে মাঝে মাঝে হিরের আঙুল বেরিয়ে এসে চোখে খোঁচা মেরে যাচ্ছে। বাঁ পাশে বিশাল একটা বাগানবাড়ির জলটুঙি অতীত গৌরব হারিয়ে, আধ-ভাঙা হয়ে জলের ওপর ঝুঁকে আছে।

ছেলেবেলায় ওখানে সুন্দরীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। চুল উড়ছে, শাড়ির আঁচল উড়ছে। সময় উড়ছে, টাকা উড়ছে, পাখি উড়ছে। যাহা যায়, তাহা যায়। ডাকলেও আর আসে না। ফাটা রেকর্ড বাজতেই থাকে, শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয় ফিরে আয়, ফিরে আয়।

মাতামহ পাশে বসে আছেন গুম হয়ে। কনকের হাতের রান্না খেয়ে সেই দুপুর থেকে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন বুঝি? খাবার সময় ছাড়া ঠোঁট ফাঁক করবেন না। জল থেকে রোদের ঝিলিক উঠে মুখে লেগেছে। তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ হয়েছে। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি, যদি কিছু কথা বলেন!

ভস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কী দেখছিস? কতদিন হয়ে গেল এই পৃথিবীতে এসেছি। জীবন যেন আর ফুরোতেই চায় না। যে শেষে যায় সে বড় কষ্ট পায়। একে একে হাত ধরে নৌকোয় তুলে দিয়ে, চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকো। দিন যায়, দিন যায়, সে আর আসে না।

কে দাদু?

মৃত্যু রে বোকা, মৃত্যু।

মৃত্যুর কথা আসছে কেন? সব বুড়োরই এক রোগ।

ওই জলটুঙিটার দিকে তাকিয়ে দেখ।

সেই তখন থেকেই তো দেখছি।

ওইটার মতোই আমি জীর্ণ আর প্রাচীন। হুহু করে জল বয়ে চলেছে। পোস্তা ভাঙছে আর ভাঙছে। একদিন ধস করে ধসে পড়ে যাবে। ওর আর কী কদর আছে বল? আমার মতোই। ভেঙে এসেছে। ভাঙল বলে।

এ তুলনার কোনও মানে হয় না। জড় পদার্থের সঙ্গে সজীব পদার্থ। বিজ্ঞান মানবে না।

রাখ তোর বিজ্ঞান। জড়ে আর বৃদ্ধের জীবনে বিশেষ তফাত নেই রে! দেহে সে শক্তি নেই, মনে সে জোর নেই, উপার্জনের ক্ষমতা নেই। বেঁচে থাকার অধিকার কোথায়? এ পৃথিবী হয় ভোগীর না হয় যোগীর। আমি যে কোনওটাই নই।

বাবা আপনাকে বকেন বলে মনে দুঃখু হয়েছে?

তোমার বাবা? ও তো মানুষ নয় দেবতা। তুই চিনতে পারিস না?

না।

তা পারবি কেন। পিতা সূর্যসমং জ্যোতিঃ মাতা সমুদ্রসমং সরঃ। পিতা পৃথিব্যৈঃ বর্ষীয়ান্ মাতুর্মাত্রা ন বিদ্যতে॥ বুঝলে কিছু? ও আমার পাগলা ছেলে। এই কড়া কথা, এই নরম কথা, এই দূর দূর করছে, এই আবার কোলে তুলে নিচ্ছে। ওর নখের যোগ্য হতে পারলে তোমার জীবন তরে যাবে।

একটু একগুঁয়ে।

গোঁ না থাকলে পুরুষকে মানায় না। গন্ডারের মতো গোঁ চাই। একেবারে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে বেরিয়ে যেতে হবে। পৃথিবী কি তোমার সহজ জায়গা ভেবেছ? ওর তেজ তো তোমরা কিছুই দেখোনি। সে আমরা দেখেছি। সবাই বলত আপনার জামাই নয় তো আগ্নেয়গিরি। ওর সেই বিয়ের রাতের ঘটনাটা! একেবারে প্রথম রাতে বেড়াল কাটার মতো। এখনও মনে পড়লে একা একা কুঁই কুঁই করে হাসি।

কী দাদু?

হ্যাঁ রে শালা, বাপের বিয়ের ঘটনা শোনার খুব শখ। আচ্ছা শুনে রাখ, তোরই হয়তো কাজে লাগবে। বাপকো বেটা হতে হবে তো। তোর বিয়েও তো লাগল বলে!

হ্যাঁ, তাই তো? ও পথে বাড়াস নে তুই পা।

তুই বাড়াবি কেন রে শালা, আমরাই বাড়িয়ে দোব।

আমি সারাজীবন ব্রহ্মচারী থাকব ভীষ্মের মতো।

আমরা বেঁচে থাকতে তুমি ধর্মের ষাঁড় হয়ে ঘুরবে ভেবেছ? ষণ্ড আর ভণ্ড এক জিনিস। পাত্রী উজিয়ে এসে ঘরে বসে আছে। একেবারে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। চোখদুটো দেখেছিস, যেন মা দুর্গা! হাতের রান্না দেখেছিস? আমি খাব কী, আমাকেই খেয়ে ফেললে। কাপড়ের কষি কোথায় নেমেছে দেখেছিস? মেয়েটিকে বড় পছন্দ হয়েছে আমার। মায়ায় বেঁধে ফেলেছে। ছোটটা তেমন নয়। একটু গুমোরে।

এতই যখন পছন্দ তখন করে ফেলুন।

হ্যাঁ রে শালা, তোর মতো বয়েসে আমাদের কালে দশ-বিশটা বিয়ে করে ফেলত তেমন-তেমন পুরুষ। কী সব দাপট ছিল তাদের। বিয়ের নামে তোর মতো এমন কোঁচার খোঁট মুখে পুরে ছাগলের মতো চিবোত না। বংশবৃদ্ধি করার সময় কারুর মুখের দিকে তাকাত না। পাশের ঘরে মা তালপাতার চ্যাটাইয়ে পড়ে খাবি খাচ্ছে। মাথার কাছে এনামেলের চটা-ওঠা বাটিতে সর-পড়া বার্লি। ডেওপিঁপড়ে বিড়বিড় করছে। পাশের ঘরে পতিতপাবন মাগ জাপটে পড়ে আছে। মৃত্যু এসে দু'জানলাতেই উঁকি মারলে। ওরে ব্যাটাচ্ছেলে, গর্ভধারিণীকে নিয়ে চললুম। তখন তোর বীজ যিনি গর্ভে ধারণ করছেন, খাতায় তাঁর নামও লেখা আছে। গর্ভধারিণী হয়ে ওই খাট থেকে চ্যাটাইয়ে একদিন নামতেই হবে, তখন দেখা যাবে। দৃকপাত নেই। সব শালা চার্বাকের ব্যাটা। বললে, অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখম এব পরুষার্থঃ। যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। কী ভয় দেখাও মৃত্যু! বড় বউ, মেজ বউ, সেজ বউ। বড় ছেলে, মেজ ছেলে, ছেলের পর ছেলে। রোলকল করে রাতে ঘরে তুলতে হয়। মুথো ঘাসের বংশ। শিকড়ে-বাকড়ে জড়িয়ে মুকুজ্যে বংশ কুঁড়োজালি তৈরি করে বসে আছি। টান মারলে মাটিসুদ্ধ উপড়ে চলে আসবে। কী ভয় মরণে। ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। এক বাপ মরলে আরও একশো বাপ রয়ে গেল। যমরাজ তুমি কত নেবে? ধিনতাকের ব্যাটা তিনতাক, আমি দিতে থাকি তুই নিতে থাক।

পালের ভারে কাত হয়ে তীব্র বেগে নৌকো ঘাটে এসে ভিড়ল। দু'জন মাঝি লগির ঠেকনা দিয়ে সানবাঁধানো সিঁড়িতে নৌকোর মাথা ঠোকা অদ্ভুত কায়দায় বাঁচিয়ে দিল। নিত্য করে করে এমন অভ্যস্ত হয়েছে, টাল খায় না, ফসকায় না, পেটে খোঁচা লেগে ভুঁড়ি ফঁসে না। নৌকোর মাঝখানে সাইকেল নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে ছিলেন, বাহনের ওপর বাহন। বেশ মজা। তিনি ঠেলেঠুলে আগে নামতে চাইছিলেন। পারলেন না। ছইয়ের ভেতর থেকে ডুরে শাড়ি পরা বেশ পাঠ্‌ঠা চেহারার এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। পানের রসে পুরুপুরু ঠোঁটদুটি বেশ লাল। শরীরের উর্ধ্বভাগে অদ্ভুত এক ঝাঁকুনি দিয়ে কোমরে শাড়ির আঁচল জড়াতে জড়াতে কাচ-ভাঙা গলায় বললেন, যাচ্ছেন কোথায়? মাছের ঝুড়ি না নামলে নামবেন কী করে? যাঁরা শেষে নামবেন বলে উদাস উদাস মুখে বসেছিলেন, মহিলা তাঁদের মাথার ওপর দিয়ে টপকাতে টপকাতে গলুইয়ের পাশ দিয়ে

টাল খেতে খেতে, মাঝিদের কোমর জাপটাতে জাপটাতে সামনে চলে এলেন। কে একজন বলে উঠলেন, গন্ধ। মহিলা ঘাড় ঘুরিয়ে ফোঁস করে উঠল, তোমার বউয়ের গায়ে কীসের গন্ধ? গোলাপের?

রসিক ছোকরা উত্তর দিল, বউ নেই গো আমার।

ঝুড়িটা মাথায় চাপিয়ে কোমর দুলিয়ে মেয়ে উত্তর দিলে, তা হলে রাতের বেলা লণ্ঠন জ্বেলে পাড়ায় এসো, চাঁদা মাছ পাবে।

এনকোর, এনকোর! গরবিনি মাছ নিয়ে, হেলে দুলে, সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠে এল। ওপারের যাত্রীরা এপারে পারানির কড়ি ফেলে। এপারের যাত্রীরা ওপারে। মহিলাকে কিছুই দিতে হল না। তিরছি নজরিয়াকি বাণ মেরে, ঘাটমাঝিকে কাত করে দিয়ে সরে পড়ল। পৃথিবীতে আদিরসের বড় ছড়াছড়ি। মৎসগন্ধা হলেও যৌবনে ডগমগে। আর যায় কোথায়? পৃথিবী ছেড়ে কথা কইবে? ঝুলনের মেলায় আধবুড়ি ঘাঘরা পরে মুখে রং মেখে নাচছে। সমঝদার খোঁচা মেরে বলছে, রস অছি। পরেশ মাঝরাতে খেঁটে গামছা পরে ছানার তালের ওপর নাচছে। জবা মাথার ওপর হাত তুলে চুল আঁচড়াচ্ছে। ফুলগাছের টবের আড়ালে বসে শিকারের চোখ অজগরের নিশ্বাসের টানে গুটিগুটি এগিয়ে চলেছে। আগুনে পতঙ্গের আত্মাহুতি। ও থাক। ও যেখানে লেখা আছে সেইখানেই থাক, দুঃখং সর্বং অনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্তয়েৎ, অজং সর্বং অনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি। পাগলা জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখের পৃথিবীতে সকাম হয়ে মরিসনি। সবই অজ। কিছুই নেই। তবে তুই ব্যাটা দামড়া ছাগল আঠাঅলা বটপাতা দেখে ব্যা ব্যা করে ছুটিস কেন? ডুরে শাড়ির ফাঁদ দেখলি। আর খোঁপা মাথায় মাছের ঝুড়িটা দেখতে পেলি না। চিদানন্দ সাগরে মাছ খেলছিল, টোপ ফেলে, বঁড়শি গেঁথে, আঁশ চুবড়িতে লাদাই করেছে। দশ টাকা সের, দশ টাকা সের।

শেষ যাত্রী নেমে গেল। পাটাতনে লগি রাখার শব্দ হল। শিকলে বাঁধা নোঙর ঝপাং করে জলে পড়ল। মাতামহ বললেন, নে উঠে পড়। কখন ছাড়বে কে জানে?

ঢেউয়ের তালে তালে নৌকো দোল খাচ্ছে। আই অ্যাম হেলপলেস, আই অ্যাম হেলপলেস। পাপীর মাথা নড়ছে। পুণ্যাত্মার মাথা নড়ছে। জজসাহেবের মাথা নড়ছে, আসামির মাথা নড়ছে। আমার কাঁধে হাতের ভর রেখে মাতামহ উইকেটকিপারের ভঙ্গিতে টাল খেতে খেতে নৌকোয় উঠলেন।

ঘটের মাথায় কাঁঠালি কলার মতো নাতি আর মাতামহ নৌকোর মাঝখানে পাল টাঙাবার বাঁশের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসেছি। এ সময় এপার থেকে ওপারে কে আর যাবে! এখন সব ফেরার সময়। কলকারখানায় ছুটির সময়। মাতামহ জোরে জোরে দু'বার নিশ্বাস নিয়ে বললেন, জলের কেমন মিষ্টি গন্ধ দেখেছিস? ভেতরটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আসছে বার জন্মে মাঝি হব। মাঝিরা খুব তাড়াতাড়ি ঈশ্বরকে পায়। মরে স্বর্গে যায়। তুই কী হবি?

আমি গভীর জলের মাছ হব।

খুব ভাল ইচ্ছে। কারুর বাপের ক্ষমতা নেই ধরে। মাঝে মাঝে শুধু ঘাই মেরে যাবি। তবে এ জন্মের সংস্কারে আসছে বার তুই লেংটি আর চিমটে নিয়ে জন্মাবি। এই পথের মাঝখানে বসে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না রে, চল গলুইয়ের ওপর গিয়ে বসি।

যদি টাল খেয়ে পড়ে যাই!

ঠিক মামার ধাতটি পেয়েছিস। ভয়েই আধমরা। পুরুষমানুষকে একটু ডাকাবুকো হতে হয়। আমার শরীরে কত জায়গায় কাটার দাগ আছে জানিস? এই দেখ।

সামনে একটা ঠ্যাং ছড়িয়ে দিলেন। গুলি থেকে ঊরু পর্যন্ত বড় ছোট নানা ধরনের দাগ।

দাদু, আপনি কি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?

দুর ব্যাটা। যুদ্ধ কি থেমেছে নাকি? এখনও চলছে। এই দাগটা কীসের জানিস?

ঊরুর মাঝখানে বেশ বড় মাপের গভীর এক ক্ষতচিহ্ন।

এই দাগটা বেনারসের স্মৃতিচিহ্ন। বিশ্বনাথের গলিতে ষাঁড়ের লড়াই। ষাঁড়ে ষাঁড়ে নয়। ষাঁড়েতে আর আমাতে। সেই চাঁদবদনিকে বাঁচাতে গিয়ে এই অবস্থা। তুই হলে?

কোন চাঁদবদনি দাদু? আপনার প্রেমিকা?

জিভের ডগাটা সামনে একটু বের করে বললেন, তুই চাঁদবদনি বলিসনি। তোর গুরুজন, দিদিমা। সবে বিয়ে হয়েছে। মনের যমুনায় তখন প্রেমের ঢেউ। রেল কোম্পানির 'পাসে' ভারত-ভ্রমণ হচ্ছে। তখনও তো পুরনো হয়নি বউ। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনি গোছের অবস্থা। আর তোর কানে কানে বলি, প্রথম যৌবনে সেই মেয়েমানুষটিকে দেখলে তুইও ভিরমি যেতিস। টকটক করছে গায়ের রং। তেমনি চেহারা। যেন উড়িষ্যার মন্দিরের খোদাই করা পাথরের মূর্তি।

ছবি দেখেছি দাদু।

ধুস, ও ছবিতে সে চেহারাই নেই। ঘি আর মালাই খাইয়ে খাইয়ে কুমড়োপটাশ করে দিয়েছি। তোকে আর একটা কথা বলে রাখি, সোহাগ ভাল অতি সোহাগ ভাল নয়। আদরের জিনিস তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

তারপর সেই ষাঁড়ের লড়াই?

হ্যাঁ, ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই। বিশ্বনাথের গলি, একটা গাভী, দুটো ষাঁড়।

নিজেকে ষাঁড় বলুন ক্ষতি নেই, দিদিমাকে গাভী বলাটা উচিত হচ্ছে?

তুই তো তার ভুঁড়ি দেখিসনি। দেখলে তুইও তাই বলতিস। আমি আদর করে নাম রেখেছিলুম ভগবতী। ঘর অন্ধকার করে যখন ঘুমোত, দূর থেকে নিশ্বাসের শব্দ শুনলে মনে হত, মাঝরাতে গোয়ালে এসেছি। যা যা শালা, নিজের বউকে আমি যা খুশি বলতে পারি। তোর বউকে তো বলিনি!

সকালে বাবা আপনাকে যে সারমন দিলেন ভুলে গেলেন। এই এত কথা বলছেন? অভ্যাসটা থেকে যাবে, রাতে বকুনি খাবেন।

রাতে তোর বাপের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনতে যাচ্ছে কে? নিজের মসনদে গিয়ে একগুলি আফিং খেয়ে বেটির পায়ের তলায় পেছন উলটে পড়ব।

কনক যখন জিজ্ঞেস করল, রাতে কী খাবেন? তখন লম্বা এক ফিরিস্তি ছাড়লেন কেন?

তুই বুঝিস না কেন? এক বেলা খেতেই আমার লজ্জা করে। জামাই আমার বলেছে বলে দু'বেলাই খেতে হবে! আমি কি তোর তেমন হ্যাংলা দাদু?

কনক রাগ করবে।

রাগ করবে কেন?

বাঃ, রান্না নষ্ট হবে না?

তাও তো ঠিক। নাতবউকে তো রাগানো চলবে না।

কেন বউ বউ করছেন? ব্যারিস্টারের মেয়ে। সকালে ফট করে যখন বললেন মেসোমশাইয়ের মুখটা কীরকম গামলার মতো হয়েছিল, দেখেছিলেন?

রাখ তোর ব্যারিস্টার। এমন সোনারচাঁদ ছেলে পাবে কোথায়?

দু'আঙুলে আমার গাল টিপে দিলেন। নৌকো দুলে উঠল। টকটকে লাল পাড় শাড়ি পড়া এক বর্ষীয়ান মহিলা নৌকোয় ডান পা রেখে সঙ্গের ছেলেটিকে বলছেন, বিষ্ণু, আমাকে ঠেলে তোল। দেখিস যেন দেবে যাসনি।

বিষ্ণু বললে, মা জননী, তুমিও একটু চেষ্টা করো।

আমি কি আর চেষ্টা করছি না বাবা, এ তো আর সানবাঁধানো পইঠে নয়, নৌকো যে ভর সইতে পারছে না। বিষ্ণু ঠেলছে আর বলছে, হেঁইও মারি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।

মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। পালের খোঁটা ধরে টাল সামলে, সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আসুন মা, আমার হাত ধরে উঠুন।

শাঁখা পরা, গোল, টকটকে একটা হাত দাদুর হাতে ধরাতে ধরাতে সেই মা বললেন, বিষ্ণু, আর ভাবনা নেই, আমার বড়ছেলে এসে গেছে।

কপালে এতখানি গোল সিঁদুরের টিপ পড়ন্ত বেলার সূর্যের মতো টকটক করছে। গলায় গোটা গোটা রুদ্রাক্ষের মালা। এক এক আঙুলে ঝিলিক মারছে এক এক রকম পাথরের আংটি। দিদিমা বেঁচে থাকলে মনে হয় এইরকমই দেখতে হতেন। চোখদুটো ভারী অদ্ভুত। নীলার মতো। যার দিকেই তাকাচ্ছেন দৃষ্টি যেন তাকে ফুঁড়ে চলে যাচ্ছে। সামলেসুমলে বসতে হয়। অস্বস্তি হয়। মনে হয় উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছি।

মহিলা পালের খোঁটা ধরে দাঁড়াতেই মাতামহ হাঁসের মতো পেছন উলটে পায়ের কাছে প্রণামে নামলেন। গাঙের জল ছলকে উঠল, মা, মা, জগদম্বে, সর্বমঙ্গলা, মঙ্গল্যে, মা, মা।

ওরে পা ছাড়, ওঠ পাগল ওঠ, নৌকো দুলছে, পড়ে যাব বাবা। এইখানটাতেই বসি। ছইয়ের ভিতরে গিয়ে কাজ নেই। বিষ্ণু বললে, পড়ন্ত বেলার রোদ লাগবে গো।

ওরে মুখপোড়া, বেলা যার পড়ে এসেছে তাকে একটু দিনের আলোয় থাকতে দে। ঘরে ঘরে আলো দেখে লাগে ভাল, মোর হৃদি গেহ অন্ধকারে কালো। হ্যাঁগো বড়ছেলে, তোমার গান আসে?

কথা বলতে বলতে মহিলা আসনপিঁড়ি করে নৌকোর মাঝখানে বসলেন। আহা! একেই বলে মায়ের কোল। তেমন মানুষ হলে বলত, মা জননী আমার এক কাঠা জায়গা নিয়ে চারপাশ আলো করে বসেছেন। টুক করে আমিও একটি প্রণাম সেরে নিলুম। দু'হাতে আমার মাথাটি ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, ছেলেবেলায় মাতৃহারা হলে বড় কষ্ট রে! এটি বুঝি তোমার নাতি? মেয়ের মেয়ে?

মাতামহ বসে পড়েছেন। তুমি কী করে বুঝলে মা?

ও আমি বুঝতে পারি। কী করে পারি তা বলতে পারব না। সবই গুরুর কৃপা। এই ছেলেটি পৃথিবীতে স্নেহ ছাড়া সবই পাবে। মরুভূমিতে হাঁটতে হবে, কাঁটাগাছ চিবোতে হবে উটের মতো। তোমার জীবন বাবা খুব সুখের হবে না। তবে ঘাবড়ে যেয়ো না। শত দুঃখ শত জ্বালা আসিবে আসুক। জীবন হল কাচের ফানুস। আলো যদি জ্বালাতে পারো অন্ধকারে চাঁদের মতো দেখাবে। ধারা নৈবপতন্তি চাতকমুখে মেঘস্য কিং দূষণম/ যৎ পূর্বং বিধিনা ললাট লিখিতন্ তন্ মার্জিতুং কঃ ক্ষমঃ? চাতকের মুখে যদি জল না পড়ে তাতে মেঘের কী দোষ বলো? বিধি তোমার ললাটে যা লিখেছেন, কার ক্ষমতা আছে তা মুছে দেয়? তবু পথ আছে। বিপদি মহতাং ধৈর্য।

নৌকোর নোঙর উঠল। বাতাস লেগে পাল ফুলে উঠেছে। একপাশে কাত হয়ে জলে ফেনা কেটে কেটে নৌকো সবেগে ছুটেছে। বড় বড় ঢেউ উঠছে হিসহিস করে। নৌকোর ধাক্কা লেগে ঢেউ ভেঙে পড়ছে টুকরো টুকরো কাচের মতো। গায়ে জলের কণা এসে লাগছে। ভয়ে বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাতামহ উন্মুখ হয়ে বসে আছেন। চোখদুটো জ্বলছে। মনের মতো সঙ্গ পেয়ে গেছেন। এ আর এক চাতক। না চাইতেই জল পেয়ে গেছেন।

মহিলা আমার মাথার পেছনে একটা হাত রাখলেন। কী ভারী হাত! এ হাতে জগৎকে দাবিয়ে রাখা যায়। বললেন, কী রে ভয় করছে? পরান মাঝি হাল ধরেছে, ভয় কীসের বোকা! তুই না পুরুষমানুষ! তুই বলবি, হরিফে জোশিশে দরিয়া নহি খুদাদারি-এ সাহিল। উদ্বেল সমুদ্রের শত্রু আমি নই, আমি তটের দম্ভ। আমি পুরুষ। কীরকম পুরুষ? জানতুম পর নিসার করতা হুঁ। মৈ নহি জানতা দুআ ক্যা হৈ। তোমার পায়ে নিজেকে ফেলে দিয়েছি, প্রার্থনা ফ্রার্থনা জানি না।

মাতামহ বললেন, একী? এ তো দেখছি উর্দু! তুমি উর্দু শিখলে কোথা থেকে?

হঠাৎ নৌকো চরকিপাক খেয়ে গেল, মোচার খোলার মতো। মাঝিদের হইহই, পালের দড়ি ছিঁড়ে গেছে, সামাল সামাল। সামনের দিকে যাঁরা বসে ছিলেন তাঁরা চিৎকার জুড়লেন, গেল গেল। নৌকোর দুলুনি দেখে প্রথম থেকেই আমার আত্মা খাঁচাছাড়া হচ্ছিল। সাধিকা মাথায় হাত রেখে চেপে ধরেছিলেন। এখন মনে হল জলে ডুবে মরার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হয়। খোলসা হয়ে মরার আর এক আনন্দ। মাতামহ তারা তারা বলে চিৎকার শুরু করলেন। দড়ি-ছেঁড়া পাল ছিটকে বেরিয়ে গেছে। নাগালের বাইরে পতপত করে উড়ছে। মাঝে মাঝে হ্যাঁচকা টান মেরে যাত্রীসমেত নৌকো উলটে দেবার চেষ্টা করছে। হালমাঝি যেন লড়াই করছে। হাত আর পা দুটোই চলছে। এত ভয়েও সে দৃশ্য দেখে মনে হল, একেই বলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জার লড়াই। মাতামহ এরই মাঝে ফিসফিস করে বললেন, পইতে থেকে সিন্দুকের চাবিটা খুলে নে। নামতে নামতে একেবারে নীচে নামবি, দেখবি একটা ছোট্ট বালিশ। বালিশটা তোর। বাকি সব ফেলে দিবি।

ডুবলে, আমরা দু'জনেই তো ডুবব। চাবি নিয়ে করবটা কী?

তুই তো সাঁতার জানিস।

সে সাঁতারে এ নদী সাঁতরানো যাবে না।

সাধিকার কিন্তু কোনও ভাবান্তর নেই। মুখ দেখলে মনে হবে বেশ মজা পাচ্ছেন। বিষ্ণুও বসে আছে গ্যাঁট হয়ে। নিমীলিত চোখে আমার দিকে তাকালেন। ঠিক মনে হল পেতলের চোখ। সে দৃষ্টি একমাত্র স্বপ্নেই

হয়তো দেখা যায়। আমাকে বললেন, তোকে দুটো জিনিস শিখিয়ে দিই।

এখন শেখাবেন? সে শিক্ষা কি আর কাজে লাগানো যাবে? একমাত্র সাঁতার ছাড়া আর কোনও শিক্ষাই এখন কাজে লাগবে না।

কথার ফাঁকেই নৌকো আর একবার বাঁই করে ঘুরে গেল। যাঁরা আরও বেশিদিন বাঁচতে চান তাঁরা সেই ঘূর্ণায়মান পদ্মপত্রে বসে পতনোম্মুখ জলবিন্দুর মতো হায় হায় করে উঠলেন। মাঝিরা পালের দড়িটাকে ধরবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ভূত না হলে অত বড় হাত পাবে কোথায়? সাধিকা ছেলেমানুষের মতো বলে উঠলেন, বাঃ, বেশ মজা তো! নাগরদোলায় চেপেছি রে বিষ্ণু।

দেরিতে হলেও বিষ্ণু এবার ভয় পেয়েছে। সে বলল, মা, তুমি একটা কিছু করো।

আমি কী করব? আমি কি ভগবান? তোরা বড় চিৎকার করছিস। মরবি তো মানুষের মতো মর। এমন করছিস যেন ঘোড়ার আস্তাবলে আগুন লেগেছে। বড়ছেলে?

মাতামহ ফ্যাকাসে মুখে শুকনো গলায় বললেন, বলো মা।

দড়িটাকে চেপে ধরো না বাবা।

আমি কি পারব মা? আমার যে বয়েস হয়েছে।

তা হলে হাওয়া কমুক। এমন ঝোড়ো বাতাস এল কোথা থেকে! তোমরা একটু স্থির হও, মনে স্থির, দেহে স্থির। সেই পেতলের চোখদুটি অর্ধনিমীলিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ। হালের মাঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর পারছে না যেন সামাল দিতে। হঠাৎ বাতাস পড়ে গেল। নদীর জল সম্পূর্ণ স্থির। বহু টাকা উড়িয়ে বড়বাবুর দাপট যেমন কমে আসে, পালের ফটফটানিও সহসা থেমে গিয়ে নেতিয়ে পড়ল। ঘরের ছেলে ঘরে এসো বাবা। মাঝিরা দড়িটা আবার যথাস্থানে বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার সতীমাইকি জয়।

নৌকোর মুখ কিন্তু ঘুরে গেছে। যে-পার থেকে ছেড়েছে সেই পারের দিকেই মুখ। সতীমা চোখ খুললেন। হাসিহাসি মুখে তাকিয়েছিলুম। তিনি উদাস কণ্ঠে বললেন, বিষ্ণু, ছেলেটা মারা গেল বাবা।

সেকী মা? এই তো দেখে এলে, হাসছে, দুধ খাচ্ছে।

নাঃ, বাতাস বড় জোরে বইছিল। প্রদীপ নিবে গেল। মাঝি, তোরা বাবা নৌকোর মুখ আর ঘোরাসনি। আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চল।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, কে মারা গেল মা?

আমার এক ভক্তের ছেলে। এই নিয়ে তিনটি গেল। সবাই কি আর মা হতে পারে? হয় ছেলে মরে, নয়তো মা মরে। আমি কী করব? তোমরা সব পাপ করবে, পাপের বোঝা নিয়ে আসবে। ফল ভুগতে হবে না!

তোমার কে মা বুঝবে লীলে। তুমি কী নিলে কী ফিরিয়ে দিলে॥

নৌকো কোনাকুনি পাড়ি মেরে যে-ঘাটে ভিড়ল, সেটা পারঘাটা নয়। চৈতন্যঘাট। ইতিহাসের কোনও এক কালে এই ঘাটে শ্রীচৈতন্য নৌকো থেকে নেমেছিলেন। সময় সময়ের নদী দিয়ে বয়ে চলেছে। ঘাট পড়ে আছে আধভাঙা হয়ে জলধারার পাশে। ক্ষয়া ক্ষয়া পাথরে কালচে সবুজ শ্যাওলার পুরু আস্তরণ।

বিষ্ণু আগে নামল। বিষ্ণুর কাঁধে ভর রেখে তিনি সাবধানে নামলেন। ঘাট বেশ পিছল। মাতামহও নেশাগ্রস্তের মতো পেছন পেছন চলেছেন। মন পড়ে আছে সাধিকার দিকে। নৌকোর দুলুনিতে তাই বোধহয়

টালমাটাল হচ্ছেন না। আমাকেও নামতে হল। কী যে হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। কোথায় চলেছি, কেন চলেছি জানি না। পিছলে পা হড়কাচ্ছে। পড়ে না যাই।

প্রভু যেমন পেছনে ন্যাজ নাড়তে নাড়তে আসা কুকুরের দিকে 'কী রে কেন আসছিস' দৃষ্টিতে তাকান, সেইভাবে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। হাতে বিস্কুট নেই, তবু সেই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বললেন, কী রে কোথায় চললি তোরা?

মা, একটু কৃপা। একটু কৃপা দিয়ে যাও মা। মাতামহ জমিদারের পেছনে হাতকচলানো নায়েবের মতো সামনে কুঁজো হয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। মাঝে মাঝে পিছলে যাবার মতো হচ্ছেন। কৃপাটৃপার কথা আমার কিছু মনে হচ্ছে না। আমি কেবল ভাবছি বাতাস উঠল কেন? বাতাস পড়ল কেন? এ কি শক্তি? না কোনও স্বাভাবিক ঘটনা। কে মরল! সে খবরও কি বাতাসে ভেসে এল! নৌকো তীর ছেড়ে চলে গেল।

মা মহাদেবের বুকে দাঁড়ানো জগদম্বার মতো দৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, কৃপা কি ভিক্ষে করে পাওয়া যায় বাবা? এ কি ছেলের হাতে মোয়া যে তুমি খাবে ভোগা দিয়ে! আধার প্রস্তুত কর। যন্ত্রটাকে বেঁধে নে তবে তো সুরে বাজবে।

সিঁড়ির দু'ধাপ নীচে আমি উদোবস্কা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। প্যাঁচালো মন। সহজে যেন বিশ্বাস আসতে চায় না। নাস্তিকের রক্ত শরীরে বইছে। আমার ঘোড়ার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি ডাকলেন, এদিকে উঠে আয়। তোকে কানে কানে দুটো কথা বলে যাই।

নিশ্বাসে গোলাপের গন্ধ। কানে ফোঁদল ফিট করে তপ্ত সিসের মতো গুটিকতক কথা তিনি ঢেলে দিলেন, তুই কখনও কাউকে ভালবাসার চেষ্টা করবি না, তা হলে তার মৃত্যু হবে। কিছু আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবি না, সে পালিয়ে যাবে। সুখে থাকার চেষ্টা করলে অসুখে পড়বি। নিজেকে খুব কষ্টে রাখবি তা হলেই তোর সুখ হবে। তুই হলি শনি। নীলাঞ্জন-সমাভাসং রবিপুত্রং যমাগ্রজম। ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং তং নমামি শনৈশ্চরম॥ ওই তোর পথ, ওই দেখ। ধুধু প্রান্তর। ধুলো উড়ছে। সাদা উত্তরীয় উড়িয়ে তুই চলেছিস, চলেছিস, ছায়া নেই, মায়া নেই, কায়া নেই, মমতা নেই, কনককান্তি নেই।

কী হল কে জানে? চোখের সামনে যেন মরীচিকা দেখছি। নদী অদৃশ্য। জনপদ লুপ্ত। সব যেন ভোজবাজি হয়ে গেল। সত্যিই ধুলো-ওড়া, রোদ-জ্বলা প্রান্তর। দূরে বহু দূরে আমি আমাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে আছি। ভীষণ ভয়ে আমার চিৎকার, এ তুমি কী করে দিলে? উত্তর এল দূর থেকে, ভয় পাসনি খোকা, আবার দেখা হবে, আবার, আবার।

কেয়া হুয়া, গোদ হুয়া

হিস্টিরিয়া, হিস্টিরিয়া, নাকের সামনে জুতোটা ধরুন। হ্যাঁ হ্যাঁ জুতোর গন্ধেই জ্ঞান আসবে। আমার মাসিমার মূর্ছা রোগ আছে। যেই ভিরমি যায় মেসো অমনি নাকের কাছে কাঁচা চামড়ার জুতো ধরেন। ব্লটিং পেপারে শুকনো লঙ্কা গোল করে পাকিয়ে আগুন ধরিয়ে সিগারেটের মতো ধরতে পারলে আরও তাড়াতাড়ি কাজ হত।

আচ্ছন্ন ভাব কেটে আসছে। যে-কল্পজগতে সহসা চলে গিয়েছিলুম সেই জগৎ থেকে ধীরে ধীরে ফিরে আসছি। সেই ঘাট, সেই নদী, সেই ঢেউ, সেই শব্দ। আকাশের রংটাই যা কেবল পালটে গেছে। অন্ধকারের আয়োজন চলেছে। একটি-দুটি তারা ইতিউতি চোখ খুলব কি খুলব না করছে। কে একজন গলাজলে দাঁড়িয়ে অস্ত-আকাশের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে।

মাতামহ বলছেন, কেন হিস্টিরিয়া হিস্টিরিয়া করছেন। এ অন্য ব্যাপার।

আমার কানের কাছে মুখ এনে বলতে শুরু করলেন, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ।

এতক্ষণে নিজের অবস্থা টের পেলুম। শ্যাওলা-ধরা ঘাটের পইঠেতে থেবড়ে বসে আছি। পাশে মাতামহ। তাঁর বুকের ওপর আমার মাথা। তিনি দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। পিটপিট করে তাকালে সামনে ঝুঁকে থাকা এক ভদ্রলোককে দেখতে পাচ্ছি। হাঁটুর ওপর দুটো হাত। পেছন দিকটা তোলা উনুনের মতো ঠেলে আছে। দু'ভাগ করে আঁচড়ানো চুল। চোখে রিমলেস চশমা। গায়ে গিলে-করা পাঞ্জাবি। এতক্ষণ তিনিই জুতো শোঁকাবার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, অন্য ব্যাপার মানে? গাঁজা নাকি?

আরে না মশাই। গাঁজা হবে কেন?

তা হলে? অন্য ব্যাপার মানেটা কী?

মাতামহ রেগে গিয়ে বললেন, আচ্ছা নেইআঁকুড়ে দাদা তো? অন্য ব্যাপার, মানে অন্য ব্যাপার।

ও, ভাল করতে গেলে মন্দ হয়। বিপদে পড়েছেন দেখে ওপর থেকে নীচে নেমে এলুম, এখন মেজাজ দেখানো হচ্ছে? এক্ষুনি ভাবছিলুম একটা চামচে এনে দাঁতি লাগা ছাড়াবার ব্যবস্থা করব। এক গেলাস খাঁটি গোরুর দুধ খাওয়াব, এইমাত্র দোয়া হল। ঠিক আছে, আমার কী? নিজের ম্যাও নিজেই সামলান।

দুধের নামে মাতামহ নরম হয়ে গেলেন। বললেন, ও আপনি বুঝি এই বাড়িতেই থাকেন?

হ্যাঁ, এই ঘাটও আমাদের। পশ্চিমে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছিলুম, দেখলুম ছেলেটা মাথা ঘুরে পড়ে গেল। থাকতে পারলুম না নেমে এলুম। পরোপকারে আমার পিতৃদেব দেউলে হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। তস্যতস্য পিতা উমেদারের জ্বালায় খুন করে জেলে যাবজ্জীবন কাটিয়েছিলেন। সেই রক্তের ধারাই তো আমার শরীরে বইছে।

মাতামহ ঘাটের ওপর ঠেলে ওঠা তিনতলা বাড়ির দিকে ঘাড় তুলে তাকালেন। আমিও পিটপিট করে একপলক তাকিয়ে নিলুম। ভাঙাভাঙা হলেও বিশাল বাড়ি। একটা পাশ প্রায় ধসে পড়েছে। বটের ঝুরি নেমেছে। একসময় সাদা রং ছিল। এখানে-ওখানে ছাপকা ছাপকা সেই স্মৃতিচিহ্ন মরা হাতি লাখটাকার কথা ঘোষণা করছে। মাতামহ বললেন, মনে কিছু করবেন না, বয়েসে মেজাজ তিরিক্ষি। কী হয়েছে তা হলে বলি, এ হল ঈশ্বরাবেশ।

আমি ফিসফিস করে বললুম, দাদু।

কানে মোচড় দিয়ে তানপুরার তার নামানোর মতো আমার কণ্ঠ নামিয়ে দিলেন। বোঝাতে চাইলেন, চুপ, লোকটাকে একটু খেলাই।

ভদ্রলোক বললেন, ঈশ্বরাবেশ মানে?

আমার এই নাতিটি ক্ষণজন্মা পুরুষ। মাঝে মাঝেই সমাধিস্থ হয়ে যায়। ঈশ্বরানুভূতিতে শরীর স্থির। দেহ এ জগতে চেতনা অন্য জগতে। তখন দর্শনটর্শন হয়। একথা তো সকলকে বলা যায় না!

অ্যাঁ, তাই নাকি? বলেন কী? সমাধি তো মশাই ঠাকুর রামকৃষ্ণের হত! তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি? গীতা অবশ্য বলেছেন, যদা, যদা হি ধর্মস্য; কিন্তু এঁর চেহারায় তো তেমন চেকনাই নেই। গেঁজেল দুধ না পেলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম। কী জানি বাবা!

অ্যায়? ওই জন্যেই অবিশ্বাসীদের কিছু বলতে নেই। কাঠিয়াবাবার নাম শুনেছেন?

আজ্ঞে না। গাঠিয়ার নাম শুনেছি। গুজরাটিরা আদাকুচি দিয়ে খায়।

তিনি ছিলেন যোগী, তান্ত্রিক। ছ'ফুট লম্বা। কাঠির মতো চেহারা। আসনে বসে হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে নেবু পেড়ে আনতেন।

এই উদীয়মান মহাপুরুষেরও কি সেইরকম কোনও শক্তি আছে?

থাকলেও দেখায় না। হরি ওম তৎসৎ।

আমি আর আড় হয়ে শ্যাওলা গঙ্গামাটি মাখামাখি ঘাটে শুয়ে থাকতে পারছিলুম না। মশায় সর্ব শরীর ছিঁড়ে দিচ্ছে। ঘোর কেটে গেছে। পুরো ব্যাপারটাকেই এখন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। ওম তৎসৎ বলামাত্রই তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়লুম। ভদ্রলোক ওরে ব্বাবারে বলে তিরবেগে দৌড়োলেন। মহাপুরুষের ভয়ে মানুষ এমন তিরবেগে দৌড়োতে পারেন, জানা ছিল না। যেন বাঘ দেখেছেন।

মাতামহ বললেন, যাঃ সব মাটি করে দিলি। দু'গেলাস খাঁটি গোরুর দুধ হাতছাড়া হয়ে গেল। সবে দোয়া হয়েছে। এখনও গরম। ফ্যানা উঠছে।

এইভাবে ধাপ্পা মেরে দুধ খাবেন! এক গেলাস দুধ তো আপনি বাড়িতেই পেতে পারেন। চলুন খাইয়ে দোব।

আরে ধুস, সে দুধ আর এ দুধ! পকেটে আফিমের গুলি। টুক করে মুখে ফেলে, এক গেলাস ফ্যানাফ্যানা দুধ চোঁচোঁ মেরে দাও। যত রাত বাড়ছে তত মৌতাত বাড়ছে। অন্যায়টা কী হত! সত্যিই তো তোর সমাধি হয়েছিল। আমি লক্ষণ মিলিয়েই বলছি। সমাধির তুই কী বুঝিস?

সমাধি না হাতি। ভবিষ্যতের ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। সতীমা যা বলে গেলেন, তাই যদি সত্যি হয়?

ধর্মের লাইনে অনেক বুজরুকি আছে। সহজে ওসব বিশ্বাস করিসনি। তোকে বিভূতি দেখিয়ে গেলেন। যাঁরা কথায় কথায় বিভূতি দেখান, তাঁরা হলেন প্রথম স্তরের সাধু।

কীসে কী, সে পরে ভাবা যাবে, বাড়ি গিয়ে কী বলবেন তাই ভাবুন। কাল সকালেই তো ধুনুরি আসবে।

মাতামহ দুর্ভাবনায় আবার উবু হয়ে বসে পড়লেন। ঘুসুরি থেকে আমাদের তুলে আনার কথা। কাল সকালেই পিতার প্রিয় ধুনুরি গফুর মিঞা আসবে। তোশক তৈরি হবে। তিন অতিথির শুতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। তুলো এল না। মিঞা সায়েবকে ফিরে যেতে হবে। যেদিন যা হবার কথা, সেদিন তা না হলে পিতৃদেব তুলোধোনা করে ছেড়ে দেবেন। নদী তরতর করে বেশ চলছে, বাধা পেলেই উদ্দাম, ক্ষিপ্ত।

মাতামহ বললেন, কী আছে, সত্যি কথাই বলব। এমন ঘটনা তো সহজে ঘটে না।

উনি বিশ্বাস করবেন না।

ওর বাপ করবে।

হ্যাঁ, তখন বুঝবেন ঠ্যালা। ঈশ্বর সিদ্ধে প্রমাণাভাবাৎ বলে যখন ঠেসে ধরবেন তখন আমার পিতামহ অয়েল পেন্টিংয়ে যেমন বসে আছেন তেমনি বসে থাকবেন। বাঁচাতে আসবেন না।

তা হলে আমি পালাই। তোমার বাবাকে তুমিই সামলাও। আমার তো জামাই।

তা তো বটেই। একে বলে সুবিধেবাদী। আমাকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে গিয়ে বসবেন বেটির কাছে।

তা যা বলেছিস! মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। ওই সাধিকার মতো শক্তি থাকলে আকাশে হাত বাড়িয়ে মেঘ থেকে পাঁজা তুলো ধরে আনতুম। বৃথাই সাধনা। রাতটা ভাগাভাগি করে বকুনি খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণ বারকতক চমকে উঠল। এক চাকলা মেঘ জমেছে। লক্ষণ ভাল না। বেশি রাতে বৃষ্টি নামতে পারে। মাইলখানেক হাঁটতে হবে। একটা দোকানে গরম শিঙাড়া ভাজছে। সেদিকে তাকিয়ে মাতামহ বললেন, তুলোর পয়সার কিছু সদ্ব্যবহার করে গেলে হয়! কীরকম হাবুডুবু খাচ্ছে দেখেছিস। একেবারে গরম গরম। এক এক কামড়ে হা হা করতে হবে। তোর বেশ দুর্বল দুর্বল লাগছে না? একটু চা না খেলে এতটা হাঁটতে পারবি?

বৃদ্ধর খুব লোভ হয়েছে। তুলোর পয়সা এদিক-ওদিক করা আর ব্যাঙ্কের ক্যাশ ভাঙা একই অপরাধ। বুকপকেটে নিজস্ব একটি টাকা মজুত আছে। মায়া সিনেমা দেখতে চেয়েছিল। অন্ধকার ঘরে দু'জনে পাশাপাশি বসে চিনেবাদাম চিবোতে চিবোতে নদের নিমাই দেখব। কতদিনের পরিকল্পনা আমাদের। সেই টাকাতেই এখন শিঙাড়া হোক।

শিঙাড়া আর চা খেতে খেতেই আকাশ বেশ ঘোর হয়ে এল। যে কটা তারা চোখ মেলেছিল তাদের চোখ বুজে এল। পা চালা পা চালা বলে মাতামহ দৈত্যের মতো হাঁটতে শুরু করলেন। বৃদ্ধ হলেও তিনি আমার চেয়ে যুবক। পেছন পেছন আমি চলেছি নেচে নেচে।

বাড়ির সদরে পা রাখতেই দমকা হাওয়া শুরু হল। ভৈরব আসছে তেড়ে। দোর ভাঙার শব্দ হচ্ছে। দুই বোনে মনে হয় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জানলা দরজা একটা-আধটা নয় তো! উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরে

আসতে আসতেই একটা-না-একটা দিক ভেসে যাবেই। সদর খোলা ছিল। গলিতে কাদের একটা ছাড়া-গোরু ঢুকে বসে আছে। ভোঁস ভোঁস করে জাবর কাটছে।

প্রথমেই কনকের সঙ্গে দেখা হল। একগাদা শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ বুকের কাছে ধরে ঘরে ঢুকছে। আমি আগেই উঠে এসেছি ওপরে। মাতামহ এখনও নীচে। গোরুর বাঁট পরীক্ষা করছেন। যে-দুধ ছেড়ে এসেছেন ওঁর ধারণা সেই দুধ বাড়ি বয়ে এসেছে। সাধিকার সঙ্গ বিফলে যাবার নয়। এখন থেকে অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার ঘটতেই থাকবে।

কনক হাসিমুখে বললে, যাক বাবা, এসে গেছ। আকাশ যা হয়েছে। ভেঙে পড়ল বলে।

হুস করে প্রবল একটা হাওয়া এল। রান্নাঘরের সামনের বারান্দা থেকে কয়লা তোলার খালি গামলাটা গড়াতে গড়াতে উনুনের দিকে চলে গেল।

ধরো ধরো, বলে কনক কাপড়জামার বোঝা ধরিয়ে দিয়ে দুদ্দাড় করে রান্নাঘরের দিকে দৌড়োল। গেল গেল সব গেল। কী গেল কে জানে? হয়তো কিছু নামিয়ে এসেছিল। রান্নার এখন খুব তরিবাদি চলছে তো! মরাগাঙে বান এসেছে। আমি এদিকে লক্ষ্মণ ফল ধরে হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। প্রকৃতিতে প্রলয় নাচন, মনেও তাই। এ তুমি কী ধরালে প্রভু! বড় গরম লাগছে। গরম কী রে গাধা! ধুর, বৃষ্টির শীতল বাতাস ভলকে ভলকে বয়ে আসছে। এক এক ঝাপটায় পেয়ারাগাছের ডাল ঝড়াস ঝড়াস করে বারান্দার টিনের চালে আছড়ে পড়ছে।

এ যে শাড়ি! সকালে কনকের শরীরে পেঁচিয়ে ছিল। এ যে ব্লাউজ! এখনও শরীরের ঘ্রাণ লেগে আছে। এ যে সেই, যা আরও তলায় থাকে। হে জগদম্বে! ভেতরে ভিসুভিয়াস ভসর ভসর করছে।

মাতামহ ওপরে উঠে এসেছেন। পেছন থেকে বললেন, কী হে, আবার সেই সমাধি নাকি?

আজ্ঞে না।

তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন? ওই তো পায়রার মতো বুক! নীলমণি হলে কে দেখবে!

পাপীর মন। কী যেন একটা চাপা দিতে চাইছে। আলিঙ্গনাবস্থায় গুরুজনের কাছে ধরা পড়ে গেছি নাকি? চোরের মন, সবসময় বোঁচকার দিকে। ঝড়ের ঝাপটা চলছে রান্নাঘরের দিকে তেড়ে। একহাতে মাথা আর মুখ আড়াল করে দেয়ালে কাঁধ ঘেঁষে ঘেঁষে কনক এদিকে এসে বললে, দাও। তুমি ঘরে ঢুকে গেলে না কেন?

মাতামহ সাধক মানুষ। মনে সবসময় সুবাতাস বইছে। আমার মতো কুবাতাসে পাড়ি দিয়ে হাবুডুবু খেয়ে মরেন না। গ্রাহ্যই করলেন না কী ঘটে গেল অন্তঃপুরে। একগাল হেসে বললেন, কিস্যু নেই। ব্যাটা শুকনো হয়ে শুয়ে আছে।

ঢুকে পড়ুন ঢুকে পড়ুন, বলতে বলতে ঝড়ের ঝাপটার সঙ্গে কনক আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। বারান্দায় চটাপট চটাপট বৃষ্টি পড়ছে। টিনের চালে টুং-টাং শব্দ হচ্ছে। মনে হয় শিল পড়ছে। মাতামহ বললেন, অকৃতজ্ঞ দুনিয়া, শোবে এক জায়গায় দুধ দেবে আর এক জায়গায়।

কাপড় কোঁচাতে কোঁচাতে কনক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, সে আবার কী?

ওই যে গোরুটা। নীচে শুয়ে আছে। দুধটুকু দিয়ে এসেছে মালিককে।

থাকলে কী করতেন?

একবার চেষ্টা করে দেখতুম।

পটাং পটাং করে শিল পড়ছে। ন্যাপথলিনের বলের মতো বারান্দার মেঝেতে লাফালাফি করছে। শিল পড়ছে শিল। আধ-কোঁচানো কাপড় মেঝেতে ফেলে রেখে কনক ছুটল। দু'জনে নিচু হয়ে হয়ে শিল কুড়োচ্ছি আর মুখে পুরছি। বৃষ্টির ছাট এসে গায়ে লাগছে। এক-একটা শিল পড়ে পিংপং বলের মতো লাফিয়ে উঠছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই যে এই একটা। এই আর একটা। এটা কত বড়! তুমি নাও, তুমি নাও।

বয়েস, পরিবেশ ভুলে, দু'জনে ভীষণ ব্যস্ত। পেছনে পেছন ঠেকে যাচ্ছে। মাথায় মাথা ঠুকে যাচ্ছে। বাতাসের আর্দ্রতায় কনকের সুন্দর মুখ আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। টাটকা-ফোটা ভিজে গন্ধরাজের মতো। এবার কিন্তু সত্যিই আমি ভালবেসে ফেলব। তারপর যা থাকে বরাতে। কিন্তু ওই সাধিকা যে বলে গেলেন, কখনও কাউকে ভালবাসার চেষ্টা কোরো না, কাউকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা কোরো না। সে চেষ্টা তো আমি একবারও করিনি মা। আমার মতো বোকচৈতন পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীকেই তো ভালবেসে বেকুব হতে পারে। তাতে কার কী যায় আসে! মূর্খরা ভালবেসে মরে। চালাকে কাজ গুছোয়।

মেসোমশাই এতক্ষণ ভেতরের ঘরে মুকুকে নিয়ে বোধহয় ব্যস্ত ছিলেন। কখন পেছনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন আমরা কেউই লক্ষ করিনি। বেশ রাগরাগ গলায় বললেন, কনক, তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছ। একেই তোমার সেপটিক টনসিল, হঠাৎ ঠান্ডা লেগে গেলে তোমার আর কী বলো, বিপদে পড়ব আমি।

কনক উঠে দাঁড়াল। বারান্দার আলোটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। ঝোড়ো বাতাসে তার দুলে উঠলে আলো কাঁপে। নিবেও যেতে পারে। কনকের ধারালো চোখে কেমন যেন একটা ছায়া নেমে এল। আমি জানি অভিমান কাকে বলে। মন কীভাবে টসটসে হয়ে ওঠে। দরজা খুলে মানুষ কীভাবে জগতের বাইরে ছিটকে চলে যায়। আমার পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে কনক ভেতরে চলে গেল। পেছনের দিকে গোড়ালির কাছে লেসের কাজ করা সায়ার অংশ ভিজে গেছে। সে যুগের ঋষিরা কত সাধারণ কথা কেমন অসাধারণ করে যুগের এপারে ওভার বাউন্ডারি করে দিয়ে চলে গেছেন। প্রথম বয়সে মেয়েরা পিতার সম্পত্তি, তারপরই স্বামীর। মেসোমশাই মানুষটি তেমন সহজ সরল নন। অহংকারের পুরিয়া।

মাতামহ চেয়ারে চুপ করে বসে আছেন। ইচ্ছে থাকলেও নিজের ডেরায় ফিরে যাবার উপায় নেই। বেশ ঝেঁপে বৃষ্টি এসেছে। মেসোমশাই আবার ভেতরের ঘরে চলে গেছেন। মুকুকে পড়াতে বসেছেন। মেয়েকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ করে ছাড়বেন। কনক বকুনির ধাক্কা সামলে উঠেছে। আমার মতো ওর ঠোঁট বেশিক্ষণ ফুলে থাকে না। সহজেই সামলে নিতে পারে। মেয়েদের তা না হলে তো চলবে না। প্রথম জীবনে পিতাকে সামলাও, শেষ আর মধ্যজীবনে স্বামীকে খেলাও। মাছ ধরার মতো। সুতো ছাড়ো আর সুতো টানো। আমার আর কতটুকু জ্ঞান। চার পাশে যা দেখছি আর কী! মেয়েছেলে যদি খেলোয়াড় না হয় তার অশেষ দুর্গতি। ওই জবা, জবার মা, মা কি না সঠিক বলতে পারব না, জবার মাসি, মাসিই হবে, দু'জনকে প্রায় একই রকম দেখতে, ওদের মতো হলে সুখের শেষ নেই। সুখেন সব জানে। নিজেও মাঝে মাঝে দেখি তো। এই তো সেদিন! দুপুরবেলা বাড়িতে বোধহয় দুই মাতব্বরের কেউই ছিল না, যে ছেলেটাকে ওরা পিসতুতো ভাই বলে

এতকাল চালিয়ে আসছে, সেই ষণ্ডামার্কাটা জবাকে পাঁজাকোলা করে বারান্দায় গোল হয়ে ঘুরছিল। কী খেলা কে জানে? সে জিনিস সিনেমা ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। দুপুরবেলা সব কাজ ফেলে এক মদ্দা সোমত্ত মেয়েকে কোলে নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে মরছে। নাও বোঝো ঠ্যালা। কে বাবা সেই উপদেশ মনে রাখছে, ওরে দাগ রেখে যা, দাগ রেখে যা। উলটো বুঝলি রাম! তাবৎ মানুষ চরিত্র দাগবাজ করে পস্তে মরছে। মেসোমশাই কি আর সাধে গোঁফ পাকিয়ে তেড়ে এসেছিলেন! কনক হয়তো আমাকে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু আমার চালচলন তো দেখতে হবে। ফোঁস করে ছোবল মেরে দিলে কে সামলাবে। মানুষ তো আর ঢোঁড়া সাপ নয়। খড়ম মার্কা কেউটে। মেয়ে আমার নীলবর্ণ হয়ে যাবে। ভালবাসার ছোবল আর বাঘের কামড় কোনওটাই কম যায় না। আঠারো ঘা।

জানলা ফাঁক করে কনক এতক্ষণ বৃষ্টি দেখছিল। গাছপালা সব জবুথবু হয়ে ভিজছে। একদল দৌড়বীরের মতো বৃষ্টি রাস্তার ওপর দিয়ে ধর ধর করে দৌড়েই চলেছে। ছোটার যেন শেষ নেই। পাল্লা বন্ধ করে কনক মাতামহর কাছে সরে এসে বললে, কী, চা খেতে ইচ্ছে করছে?

মাতামহ সুবোধ বালকের মতো মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ।

পাঁপড়ভাজা।

মেসোমশাই যে-ঘরে বসে মুকুর সঙ্গে তর্কশাস্ত্র নিয়ে ধস্তাধস্তি করছেন সেই ঘরের দিকে উঁকি মেরে ভয়ে ভয়ে বললেন, বুড়োর খাইখাই দেখে তোমার বাবা যদি রেগে যান!

কনক হেসে বললে, বা রে, রেগে যাবেন কেন?

আমতা আমতা করে মাতামহ বললেন, তা ছাড়া জামাইটা বাইরে এই দুর্যোগে কোথায় এখন ভিজছে কে জানে? আমরা বেকারের দল মজা করে চা-পাঁপড় খাব, আর সে বেচারা ভিজে জাব হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি আসবে। সেটা কি ভাল দেখাবে নাতনি!

নীচে একটা হ্যাঁটহুট শব্দ শোনা গেল। যাক পিতৃদেব বেশি না ভাবিয়েই ফিরে এসেছেন। প্রকৃতির কাছে হেরে যাবার মানুষ তিনি নন। মাঝে মাঝে গর্ব করে বলেন, আমি একটা ট্যাঙ্ক। এমন কোনও শক্তি নেই আমাকে থামিয়ে রাখতে পারে।

পিতার গলা আবার শোনা গেল, দুধ খাবে একজন, আর গোবরে মাখামাখি হবে আর একজন। ব্যাটা, এটা তোমার মামার বাড়ি?

মাতামহ আনন্দে আটখানা, ঠিক বলেছে, ঠিক বলেছে। চলো চলো আমরা যাই। গোবরকুণ্ড থেকে উদ্ধার করে আনি।

সামান্য গোলমাল, তাইতেই মেসোমশাই বিরক্ত। তুমি পড়ো তুমি পড়ো, বলতে বলতে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। একটা মানুষ বটে! যাই বলো বাবা, বেশ স্বার্থপর! কনক কিন্তু একেবারে অন্যরকম। দু'জনের তফাত একেবারে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। কনক নীচে নেমে গেল। আমরা দু'জনে সিঁড়ির মাথায় বৃষ্টিধৌত বীরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে স্থির দণ্ডায়মান।

মারাত্মক কিছু একটা সিড়ির দু'পাশের দেয়ালে ঠকাস ঠকাস করে ধাক্কা খেতে খেতে ওপরে উঠছে। পিতা কি শেষে বর্ম শিরস্ত্রাণ পরে ফিরে এলেন! কিছুই বিশ্বাস নেই। সব পারেন। ধনুকের মতো কী একটা ঘাড়ে

করে উঠছেন। পেছনে কনক। একেবারে বাধ্য মেয়ে। মেসোমশাইয়ের চেয়ে আমার পিতার সঙ্গে যেন বেশি মানিয়েছে।

মাতামহ বললেন, বাঃ বাঃ, বেশ মানিয়েছে হে। মহাভারতের পাতা থেকে যেন গাণ্ডীব ধারণ করে উঠে এলে! বস্তুটা কী গো! কোথাও হরধনু ভঙ্গের কমপিটিশন হচ্ছিল নাকি আজ?

একটা দিক কনকের কাঁধে। জিনিসটাকে ধীরে ধীরে দেয়ালে ঠেসিয়ে রেখে পিতা কনকের পিঠে দু'বার তারিফের চাপড় মেরে বললেন, তুমিই হলে রিয়েল কর্মী। আর এঁরা হলেন মহামান্য দর্শক। ন্যাজ নাড়েন শিকার ধরেন না। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেন? হরধনু ভঙ্গ! তা হলে তো একটি সীতাও আসত বুড়ো রামচন্দ্রের পেছন পেছন।

মাতামহ গ্রাহ্যই করলেন না। গীতার মহাপুরুষ। আক্রমণ অনাক্রমণে স্থির, অচঞ্চল। তিনি সেই যন্ত্রের ছিলেতে আঙুলের টুসকি মারলেন। ব্যাঙাও ব্যাঙাও করে শব্দ হল। বাঃ যন্ত্রটি বেশ তো! দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে জমবে ভাল। ইল্লেহেহে কুড়ুহুহু।

আপনার সংগীতের সঙ্গেও মানাবে ভাল। তবে বাজাতে পারবেন না। এ চালাতে হলে ষাঁড়ের ডালনা খেতে হবে বছর দুই।

মাতামহ বললেন, তোব তোবা, তা হলে আনলে কেন?

কনক বললে, মেসোমশাই, এটা তুলোধোনা যন্ত্র না?

আঃ ঠিক ধরেছ। ভেরি ইনটেলিজেন্ট, ভেরি ইনটেলিজেন্ট। তোমার মতো একজন কেউ আমার পাশে থাকলে সংসারে ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিতুম।

পিতা ঘরে ঢুকলেন। হাতে একটা হাফ মুগুর। ওইটা দিয়ে তাঁতে আঘাত করলে ব্যাঙাও ব্যাঙাও করে শব্দ হয়। ছটফট ছটফট করে চার পাশে তুলো লাফাতে থাকে। শৈশবে বাড়ির বিশাল ছাতে ধুনুরি এসে বসলে আমাদের উত্তেজনা বেড়ে যেত। মুগুরটাকে অনেকটা মিনারের মাথার মতো দেখতে। কনক হাত থেকে নিয়ে ঘরের এক পাশে সাবধানে রেখে দিল। এই প্রথম চিন্তাটা মনে উঁকি দিয়ে গেল, কনক যদি আমার মা হয়ে এই সংসারে বেশ জাঁকিয়ে বসে, তা হলে কেমন হয়? মন্দ কী? বয়েসে একটু ছোট হবে। তা হলেও, মা ছোট হলেও মা। ছেলে হিসেবে আমি একটু বেমানান হয়ে যাব। এই যা সমস্যা! ট্রেনের টিকিট চেকার সেই সুখেনকে ধরেছিল। হাফ টিকিটে ওপরের বাঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে বোম্বাই যাচ্ছিল। চাদরের বাইরে পা বেরিয়ে পড়েছে। চেকারের হাতে টিকিট, নজর পায়ের দিকে, এতনা মোটা গোড়, এতনা লম্বা বাল, হাফ টিকিট? সুখেনের দাদা বলছেন, মোটা হুয়া তো কেয়া হুয়া, গোদ হুয়া সাহাব। লোকে হয়তো বলবে, আহা মেয়েটার কী ভাগ্য, একেবারে রাজহাঁসের মতো ছেলে নিয়ে চলেছে। ধেড়ে গলায় যখন ম্যা ম্যা করে ডাকে তখন প্রাণ একেবারে জুড়িয়ে যায়? কেন যে এসব চিন্তা আসছে। বড় পাপ ঢুকেছে মনে। হিংসে, অভিমান, লোভ, কামনা, সব মিলেমিশে মন নয় তো, জগাখিচুড়ি।

মাতামহ বললেন, হঠাৎ তুমি এই যন্ত্রটা কিনতে গেলে কেন হরিশঙ্কর! ভাল দেখে একটা তানপুরা কিনলেই পারতে!

ভিজে জামা খুলতে খুলতে পিতা বললেন, তাতে তো আর তুলো ধোনা যেত না!

তুমি তুলো ধুনবে? সব ছেড়ে তোমার এমন অদ্ভুত ইচ্ছে কেন?

সংসারে সবকিছু শেখা দরকার। সেলফ হেলপ। পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকব কেন? নিজের কাজ নিজে করে নোব। সংসারের সাশ্রয়।

এটাও কি তুমি ডিসপোজাল থেকে কিনলে?

আজ্ঞে না। দেখি কী তুলে আনলেন? ভিজে যায়নি তো!

মাতামহ মাথা নিচু করলেন। এইবার সেই মুহূর্ত এসেছে। জীবন-মরণ সমস্যা। আমতা আমতা করে বললেন, তুলে আনা হয়নি হরিশঙ্কর।

কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? দিবানিদ্রা?

না না, সে এক অলৌকিক ব্যাপার।

তার মানে? তুলো উড়ে গেছে?

না না, সে এক মহা অলৌকিক ব্যাপার।

আপনাদের সবেতেই দেখছি অলৌকিক ব্যাপার! থাকেন লৌকিক জগতে, কাজকারবার সব অলৌকিক জগতে! মজা তো মন্দ নয়। আপনারা আমার সব প্ল্যান বানচাল করে দিলেন। বললেই পারতেন, পারব না।

কনক বললে, মেসোমশাই, এখন আর মেজাজ খারাপ করবেন না। পাঁপড়ভাজা আর চা খান, তুলোর চিন্তা পরে করা যাবে।

তুমি বলছ বটে, তবে আমার সমস্ত পরিকল্পনা একেবারে ভেস্তে গেল।

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। এই ঝড়ের রাতে কার আবার অভিসার! দরজা খোলা আর বন্ধের শব্দ। এই বাড়িতেই কেউ এলেন। গাড়ি চেপে কার আগমন? সুরেলা গলা উচ্চগ্রামে খেলে গেল, পিন্টু, পিন্টু।

মাতুল এসেছেন। আরে বাপ রে! মহামান্য অতিথি। তটস্থ হয়ে থাকতে হবে। পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। আসুন আসুন। অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে কাছা কোঁচা খুলে যাবার মতো অবস্থা। সেই পরিচিত সুবাস সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। সেই ফিনফিনে শৌখিন মানুষটি এবার দৃশ্যমান। আর একটু ফরসা হলে মনে হত ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সাহেব। আলো পড়ে বুকের একসার হিরে বসানো বোতাম জলতরঙ্গের মতো হাসছে। কখনও এটা কখনও ওটা। মাতুলের পেছনে আর এক ভদ্রলোক। যে-কোনও বিয়েবাড়িতে এমন কাঠামোর মানুষ প্রায়ই দেখা যায়। হৃষ্টপুষ্ট। লাগাম ছাড়লেই ফচকেমিতে ভেসে যাবেন। সমস্ত মহিলাই এঁর বউদি। চিরন্তন ঠাকুরপো। ঝুলনতলার নাচের তাঁবুতে লোকটি কনুইয়ের খোঁচা মেরে বলেছিল, মাগির রস আছে। মহিলারা এই মানুষটিকে অবশ্যই বলবেন, মিনসের রস আছে। গা থেকে সেই পরিচিত গন্ধ বেরোচ্ছে। পুরুষালি ঘাম, সিগারেট আর সেন্ট। ব্যাকব্রাশ চুল। যৌবনের ব্রণ মুখে দু'-চারটে ক্ষত রেখে চলে গেছে। এমন মানবের সঙ্গে মেশার আগে মহিলাদের খতিয়ে দেখা উচিত, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! অকারণে মুখে যে-হাসি লেগে আছে, সে হাসি দেখলেই পিতা বলতেন, উজবুকের মতো হাসছ কেন বলো তো? পৃথিবীটা কি এতই আনন্দের জায়গা!

মাতুল আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন, সব ঠিক আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবহাওয়া অনুকূল না প্রতিকূল?

আলেকজান্ডার সেই পুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন না! তুমি কীরকম ব্যবহার প্রত্যাশা করো? মাতুলের প্রশ্নের উত্তর আমাকে আর দিতে হল না। পিতা পেছন থেকে আলেকজান্ডারের কণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করলেন, তুমি কীরকম আবহাওয়া চাও?

মাতুল পুরুর মতোই বীর দর্পে বললেন, মৃদু এবং মোলায়েম। ময়েন দেওয়া লুচির মতো।

তৈরি করে নাও।

এসে যখন পড়েছি, অনুমতি পেলেই হাত লাগাব। বেতলব দেঁ তো মজা উস-মেঁ সিবা মিলতা। হৈ। বোহ্‌গদা জিস-কো নহ্ হো খু-এ সবাল, আচ্ছা হৈ। না চাইতেই যদি দেন তো তার স্বাদই আলাদা; সেই তো শ্রেষ্ঠ ভিখারি, হাতপাতার অভ্যেস হয়নি যার।

আহা গালিব দিয়ে শুরু করলে! সব মাটি করে দিলে। বেশ একটা রাগ-রাগ ভাব আসছিল। তোমাকেও ফায়ার করার ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমাকে? আমার অপরাধ?

তোমার অপরাধ? তোমার উপেক্ষা। এই ঝড়ের রাতে পারিবারিক হাঁড়ি খুলে পচাই বের করতে চাই না। আজ হল শ্যাম্পেন নাইট। তুমি স্রেফ তরে গেলে গালিবের জন্যে, তরে গেলে এই ভদ্রলোকের জন্যে।

ও হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই। প্রতাপ রায়। আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। অসাধারণ ভাল তবলা বাজায়।

প্রতাপ রায়ের কাণ্ডজ্ঞান আছে। প্রণামটি চট করে সেরে নিল। মাতুল সাধারণত কারুর কাছে মাথা নিচু করেন না। তবে ভগিনীপতির কাছে অহংকার খাটো করার অভ্যাস বজায় রেখেছেন।

পিতা জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হঠাৎ এলে কেন? তুমি তো সহজে আসো না। তোমার জগৎ তো আলাদা। এ কি তোমার মতিভ্রম!

মাতুল বললেন, ধরেছেন ঠিক। পৃথিবীকে আপনি যতটা চেনেন, আর কেউ ততটা চেনে না। আপনারই কথা, ধোঁয়া দেখলেই বুঝবে আগুন। আমরা এসেছি আপনাদের দু'জনকে ধরতে।

হঠাৎ। নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে।

অবশ্যই।

টাকাপয়সার ব্যাপার?

অবশ্যই।

তা হলে পরিবেশ বিষিয়ে ওঠার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

প্রতাপ রায় ঠিক তালে ছিলেন। কনককে দেখেই বললেন, এক গেলাস জল খাওয়াবে ভাই।

সুন্দরীরা বড় তৃষ্ণার্ত করে তোলে বুঝি!

রতনে রতন চেনে।
ভালুক চেনে শাঁকালু॥

পাঁপড়ভাজা আমি খাই না। ও আপনি নিয়ে যান। চিরকালের নাক-তোলা মাতুল, হাত নেড়ে, মাথা নেড়ে ভয়ংকর এক ভঙ্গি করলেন। ষোড়শীর বদলে বৃদ্ধা তেড়ে এলে মানুষ এমন ছিটকে যেতে পারে। বর্ষার রাতে মুচমুচে পাঁপড়ে এমন বিতৃষ্ণা বড়ই বেমানান। কনক হকচকিয়ে গেছে। মাতুল আবার আপনি বলে বয়েস আর ব্যবধান দুটোই বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পিতা বললেন, ও হ্যাঁ, তুমি তো আবার চপকাটলেট ছাড়া অন্য কোনও মধ্যবিত্ত খানা পছন্দ করো না। পোস্ত, বড়ি, মুড়ি, পাঁপড়।

আজ্ঞে না, তা কেন? পোস্ত দিয়ে পরোটা আমি ভীষণ ভালবাসি। পাঁপড় কেমন যেন বুড়োটে খাবার।

তাই নাকি? তা হলে তুমি বিস্কুট খাও, কটেজ ক্রিম।

বিস্কুট তো রুগিরা খায়।

ও, রুগিরা খায়!

পিতা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন। শ্যালক একের পর এক ফ্যাঁকড়া বের করছেন। সামান্য খাওয়া নিয়েও মানুষের সংসারে কত ফ্যাচাং। এ ব্যাপারে মাতামহ আমার সোনারচাঁদ ছেলে। কোনও বায়নাক্কা নেই। একেবারে কোণের দিকে একটা বেতের চেয়ারে বসে আপন মনে একা একা পাঁপড় চিবোচ্ছেন। যেন এ জগতের মানুষই নন। মা ছোট্ট ছেলেকে ধামিতে মুড়িমুড়কি দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেছেন যেন! শিশু ভোলানাথ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে, পাখি দেখছে, হাত নাড়ছে। চোখে কেবল মোটা করে কাজল আঁকা নেই, কপালে ধেবড়ানো টিপ নেই। কনকও ভীষণ বিপদে পড়েছে। এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে?

পিতা বললেন, তা হলে তুমি কেক খাও।

না না, কেক দাঁতে বড় জড়িয়ে যায়, জিবে বিচ্ছিরি একটা কোটিং পড়ে যায়।

তাই নাকি? তুমি টুথব্রাশ দিয়ে খাও। আমি তোমাকে নতুন টুথব্রাশ দিচ্ছি। এক কামড় করে খাও আর ব্রাশ দিয়ে ঘষে দাও।

সেটা একটা পাগলামো হবে।

পাগল তো পাগলামি করবেই। সেইটাই তো তার স্বভাব! বেশ, তুমি তা হলে ওমলেট খাও। কনক, তুমি ওমলেট করে নিয়ে এসো তো!

মাতুল বললেন, হ্যাঁ ওমলেট চলতে পারে, তবে পেঁয়াজ ছাড়া। আর মাখন দিয়ে নরম করে ভাজা।

কনক পাঁপড় নিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, প্রতাপ রায় বললেন, আমাকে দিয়ে যাও। আমার খোলটা অনেক বড়।

কনক পাঁপড়ের ডিশটা প্রতাপ রায়ের সামনে কোনওরকমে নামিয়ে রেখে পালিয়ে বাঁচল। মেয়েরা মানুষ পড়তে পারে। চোখের ভাষা, মুখের মুচকি হাসি। বহু যুগের অ্যানিম্যাল ইন্সটিংক্ট। প্রতাপ রায় যেন রেডিয়ো ট্রান্সমিটার। যখন যেখানেই থাকুন না কেন, লাগাতার বিপ বিপ করার জন্যেই জন্মেছেন। আমাদের ভোমলা পাগল। ডাকলেই বলবে, কী করতে হবে? ওই মেয়েটাকে চুমু খেতে হবে। সন্ধ্যা শিশি হাতে কেরোসিন তেল আনতে যাচ্ছে, ভোমলা দৌড়োল পেছন পেছন। ভোমলার পেছন পেছন দৌড়োলুম আমরা, ওরে, না-রে, না-রে, তোকে রুটি খাবার জন্যে ডেকেছিলুম। তিন দিন উপোস করে আছিস।

পিতা বললেন, তোমার স্বভাবের সাত খুন মাপ হয়ে যায়, তোমার একটি মাত্র গুণের জন্যে। সে হল তোমার সংগীত। তোমার বড়লোকি চালের জন্যে যখনই ঘৃণা করতে ইচ্ছে করে তখনই কানে ভেসে আসে তোমার সুর, কৈসে গুজার গই হায় জওয়ানি। সেই ছেলে, সেই এতটুকু ছেলে, স্কুলে আমার কোলে বসে গান গেয়েছিলে বাগেশ্রীতে, কোলে তুলে নে মা কালী। তাবড় তাবড় গুণী সেদিন কাত হয়ে গিয়েছিল। সময়, সময়! সময় কীভাবে চলে যায়। ব্রিজের ওপর দিয়ে যেন মেল ট্রেন ছুটছে!

মেসোমশাই ওঘরে বাঘের মতো চিৎকার করে উঠলেন, মূর্খ। সেই সকাল থেকে চেষ্টা করছি, কিছুতেই তোমার মাথায় ঢুকছে না, শি অ্যাস, শি গোট। কোঁতের পজিটিভিজমের সারকথা কী? চিন্তাধারা পরপর তিনটি ক্রম পার হয়ে এগিয়েছে। কী কী? আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক। বলো, বারবার বলো। মুকু ঘুম-জড়ানো গলায় বলতে লাগল, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক।

মাতুল এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলেন, এঁরা কারা?

এঁরা হলেন মেজদার ভায়রাভাই আর তার দুই মেয়ে।

ও, এঁরাই তো সেই রেঙ্গুনে ছিলেন। ইভ্যাকুয়েশানের সময় আরাকানের জঙ্গলে স্ত্রী মারা গেলেন? আচ্ছা সব বড় বড় হয়ে গেছে। উনি আর বিবাহ করেননি?

কোনও সেন্‌সিবল মানুষ দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করে? তোমার বাবা, আমি, ওই ভদ্রলোক। ইচ্ছে করলে আমরা আবার সংসারে ঢুকতে পারতুম। স্রেফ তোমাদের মুখ চেয়ে আমাদের এই স্যাক্রিফাইস। তোমরা এর দাম দিতে পারবে?

কেন পারব না?

ওই তো তার প্রমাণ। তোমার বৃদ্ধ পিতা গত তিন দিন অনাহারে ছিলেন। তুমি জানতে? তোমার স্ত্রী জানত?

অনাহারে থাকাটা ওনার একটা বিলাসিতা। কৃচ্ছ্রসাধন।

হোয়্যার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ। মনে রেখো, তোমাদেরও দিন আসবে। সব, সব শোধ করে দিয়ে যেতে হবে।

কনক ওমলেট নিয়ে এল। বেশ একটা খিদেখিদে গন্ধ বেরোচ্ছে। প্রতাপ রায় হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিতে নিতে বললেন, উমার ভূমিকায় সুন্দর মানাবে। পরদায় একেবারে নিউ ফেস। ফেটে যাবে বুঝলে? একেবারে

ফাটাফাটি হয়ে যাবে।

কনক অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে আবার কী রে বাবা! প্রতাপ রায়। নতুন এক চাল ছেড়েছেন। ভেতরে বেগ এসেছে। মনের চাতালে শৃগালের হাহাকার। কনক, কনক। কোন মানুষ যে কখন কীভাবে পাগল হয়ে যাবে, কেউ জানে না। নিজেরও জানা নেই। ঘোড়ার মতো নাক ছেঁদা করে লাগাম পরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয়। চার পা তুলে কখন যে চিঁ-হিঁ-হিঁ করে উঠবে!

মাতুল বললেন, তোর চোখ আছে প্রতাপ। বাংলা স্ক্রিনে নতুন নায়িকার বড় অভাব। এইসময় বাজারে ছাড়তে পারলে একেবারে ক্যান্টার হয়ে যাবে।

পিতা বললেন, তোমাদের আলোচনা কোন পথে চলেছে? পরদাফরদা কী বলছ? সিনেমা নাকি? ধরেছেন ঠিক।

মাতামহ অন্ধকার কোণে স্প্রিংয়ের মানুষের মতো মোড়া থেকে ছিটকে উঠলেন, তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করব। তোমার বায়োস্কপ করা আমি ঘুচিয়ে দোব। এই কাপ্তেনটি কে? হাতি-ছাড়া বিশ্বকর্মা! মুখ দেখলে মনে হয় রামবাগানের আড়কাঠি।

মাতামহ বাঘের মতো এগিয়ে এসেছেন। পাঁপড়ের তেলহাত মাথার চুলে বুলিয়েছেন। আলো পড়ে পাকা চুল জরির মতো চিকচিক করছে। মেসোমশাই মুকুকে চড়া গলায় দর্শন বোঝাচ্ছেন, 'যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে একজনের হিতসাধন ধর্ম আবার একজনের হিতসাধন অপেক্ষা দশজনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম। গুড অফ দি গ্রেটেস্ট নাম্বার। বাপস, বাংলা বটে। মুকু পরীক্ষার আগেই শুকিয়ে মরে যাবে। এরই মধ্যে কেমন যেন বাসি ফুলের মতো চেহারা হয়ে গেছে। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরে 'মিল', 'মিল', 'বেনথাম', 'বেনথাম' বলে কোঁত পাড়ে।

মাতামহের আক্রমণে প্রতাপ রায়ের মুখের সেই অদ্ভুত হাসি মিলিয়ে গেল না। ওমলেট চিবোতে চিবোতে নির্বিকার মুখে বললেন, জ্যাঠামশাই, কেন যে আপনি আমাকে দেখতে পারেন না! সেদিন আপনি আমাকে খড়ম তুলে তাড়া করলেন। আপনার রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে।

ওহে ছোকরা, ভুল আমার হচ্ছে না। তুমি সর্পই, মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। ঘাটের মড়া।

মাতুল বেশ চড়া গলায় বললেন, বাবা! বয়েসের চেয়ে আপনি বেশি বাতুল হয়ে পড়েছেন। আনকালচার্ড ফুল।

ঘরে যেন গ্রেনেড ফাটল। অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। ধোঁয়ায় চারপাশ আচ্ছন্ন। চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ। দেয়ালে ঘড়ি চলছে ঠকাস ঠকাস শব্দে। মুকুদের পরীক্ষার পড়াও থেমে গেছে। হাত স্থির। হাঁটু স্থির। মুহূর্ত প্রস্তরীভূত। বসাকদের বাগানবাড়িতে দেখেছিলুম, পেছন দিকের বাগানে জঙ্গলের মধ্যে একগাদা স্ট্যাচু। নগ্ন রমণী, স্নানরতা রমণী। দাড়িঅলা নগ্ন এক বৃদ্ধ ডিসকাস ছোড়ার ভঙ্গীতে স্থির। বছরের পর বছর রোদে আর জলে পড়ে থেকে মৃতের মতো বিবর্ণ। ভূতের মতো ভীতিপ্রদ। ঘরটাকেও এই মুহূর্তে বসাকদের পেছনের বাগানের মতো মনে হচ্ছে।

পিতৃদেব ধীরে ধীরে চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। এত ধীরে যে সামান্যতম শব্দও হল না। নৈঃশব্দ্যের মহড়া চলেছে। মাথা পিঠের দিকে সামান্য হেলে আছে। ফলে চিবুক সামনের দিকে সমকোণের

চেয়ে একটু উঁচু। দীর্ঘশ্বাসের শব্দ হল। ঝাউয়ের শাখায় একঝলক সমুদ্রের বাতাসের মতো। এতটুকু শব্দ না করে চেয়ারটাকে দু'হাতে পেছনে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাতুলের থেকে বেশ সম্মানজনক দূরত্বে সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ঘরে যেন চিতাবাঘ ঘুরছে।

চালচলনে এইবার সামান্য গতি লক্ষ করা গেল। বুকের কাছে হাত জোড় করে বললেন, আচ্ছা, তোমরা তা হলে এবার এসো।

মাতুল সাহস করে বললেন, তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

অফকোর্স। আমাদের সামনে বসার তোমার কোনও অধিকার নেই। তুমি হলে বড়লোকের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে। এ বাড়িতে তুমি আর কখনও না এলে আমি যারপরনাই সুখী হব।

হঠাৎ আপনার এই ভাবান্তর?

আমার আচরণের জবাবদিহি আপনার কাছে করতে আমি বাধ্য নই। আপনারা আসতে পারেন।

আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন?

হঠাৎ! সেই বেদের যুগ হলে তোমার মতো ইয়ার এতক্ষণে ভস্ম হয়ে যেত। গুরুজনদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় তাই তো তুমি শেখোনি। উনি আলকালচার্ড ফুল, তুমি কী? তুমি হলে কালচারড মাঙ্কি। ক্লিয়ার আউট। ইমিজিয়েটলি ক্লিয়ার আউট।

উনি কেমন মানুষ আপনি কিছুই জানেন না। না জেনে নিজের অপরাধের বোঝা বাড়াচ্ছেন। হি ইজ ওয়ান পাইস ফাদার মাদার। কঞ্জুষ দি গ্রেট, মাছির পিছন টিপে গুড় বের করেন।

শোনো শোনো, সক্রেটিস দি গ্রেট, উনি কেমন মানুষ আমাকে চেনাতে এসো না।

মাতামহ একচাকলা হাসি ছাড়লেন। সরতে সরতে কখন পিতার পাশে সরে এসেছেন। মুখ দেখলে মনে হবে ফোর্টের র‍্যামপার্টে বুক ঠুকে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশেই বীর গোলন্দাজ।

মেসোমশাই এতক্ষণে পাঠশালা থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করেছেন। বোধহয় মনে হয়েছে 'হোয়েন রোম বার্নস, নিরো ফিডলস' গোছের ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। মানুষটি একটু একবজ্ঞা হলেও গোষ্ঠীপতি হবার গুণ আছে। সেই বিধুজ্যাঠাকে কেমন তেড়ে গেলেন। আইনের রাজা। কিছুই তো তেমন জানা ছিল না। এইমাত্র পিতার কাছে আরও কিছু অতিরিক্ত পরিচয় পাওয়া গেল। জীবন একেবারে বেড অফ রোজেস ছিল না। রেঙ্গুন থেকে ভারতের হাঁটাপথে আরাকানের জঙ্গলে স্ত্রীকে হারিয়েছেন। এতক্ষণে বুঝেছি কেন একটু একবজ্ঞা। কাপড় দুভাঁজ করে লুঙ্গির মতো পরেছেন। ভুঁড়ি বেড়েছে, সেই মাপে গেঞ্জি ছোট হয়েছে। কষির ওপর পেটের অংশ টুকি করছে। মাঝখানে সিঁথি করে কুচিকুচি চুল পেতে আঁচড়ানো। দুপুরে ছোটমেয়ে পিতাকে আদর করে সাজিয়ে দিয়েছে। অকৃতজ্ঞ পিতারা সেসব কথা লেখাপড়ার সময় বেমালুম ভুলে যান। মুকু বেচারার সেই সন্ধে থেকে আড়ং ধোলাই হচ্ছে।

মেসোমশাই রঙ্গমঞ্চে এবার নতুন ধরনের খেলা দেখালেন। কোনও কথা নেই। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে, ফোলাফোলা মুখে, থপথপ করতে করতে সেই রণাঙ্গন ভেদ করে উত্তরে বারান্দার দিকে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বেশ তেড়ে গলা ঝাড়লেন। টিনের চাল ঝনঝন করে উঠল। এবার রিটার্ন জার্নি। উলটো রথ। সেইভাবেই তাকাতে তাকাতে ফিরে চললেন। ঘরের মাঝখান থেকেই উচ্চকণ্ঠে মেয়েকে বললেন,

যতক্ষণ তোমার আয়ত্ত না হচ্ছে আজ ততক্ষণ চালাতে হবে। সে রাত একটা হোক, দুটো হোক, ভোর হোক। লাল মেঝের কালো বর্ডার বরাবর এসে বললেন, বেদান্ত বলছেন, স্বন্মায়ে যথা দৃষ্টে, স্বপ্নে যেমন দেখা যায়, গন্ধর্ব নগরং যথা, মায়ায় দেখা দেয় গন্ধর্ব নগর। চৌকাঠে পা রেখে টাল খেতে খেতে বললেন, তথা বিশ্ব ইদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণেঃ। বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে বিশ্বও তদ্রূপ। তদ্রূপ শব্দটা ইচ্ছে করেই মনে হয় অত জোরে বললেন। অনেকটা বিদ্রুপের মতো শোনাল।

মেসোমশাইয়ের আসা আর যাওয়াটা এত সুন্দর হল, লেডি ম্যাকবেথের ঘুমের ঘোরে হাঁটার মতো। আমাদের অধ্যাপক প্ল্যাটফর্মে চোখ বুজিয়ে সুল্লাড, সুল্লাড করে হাঁটতে হাঁটতে একদিন হিসাবের ভুলে দমাস করে পড়ে গিয়েছিলেন। স্কটল্যান্ডের মানুষ। পড়ে গিয়ে ব্লাডি বলেছিলেন দাঁত কিড়মিড় করে। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে মেসোমশাই বললেন, প্রয়োজন হলে ডাকবেন হরিদা।

প্রতাপ রায় বললেন, যাঃ বাবা।

মাতুল উঠে দাঁড়ালেন, কোলের ওপর থেকে কোঁচা পাটে পাটে, ধাপে ধাপে মেঝেতে নেমে এল। ভীষণ অপমানিত হয়েছেন। দুর্দান্ত রাগী মানুষ। এমন বেকায়দায় পড়েছেন রাগতেও পারছেন। ফরসা মুখ জবাফুলের মতো টকটকে লাল। কোঁচা ঝেড়ে হাতে ধরে বললেন, বেশ আমি চলে যাচ্ছি। আপনার নির্দেশ মনে থাকবে।

প্রতাপ রায় বললেন, বাড়ি মর্টগেজের ব্যাপারটা তা হলে কী হবে? মিনিমাম দু'লাখ নিয়ে ফ্লোরে নামতে হবে।

সে হবে। এখন জামাইয়ের তোয়াজে আছেন। বাড়িতে তো ফিরতেই হবে। মর্টগেজ ডিড তৈরিই আছে, ধরে সই করিয়ে নোব। বাড়ি বাঁধা রেখে তো আর দু'লাখ হবে না। সীমার গয়না বেচে কয়েকদিন কাজ চালাই।

মাতামহ আর্তনাদ করে উঠলেন, ওকে তোমরা ধরো। ওকে বাঁচাও। ফতুর হয়ে যাবে। সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

পিতা বললেন, উতলা হবেন না। ভাগ্যকে ধরে রাখা যায় না। It is all a chequer-board of nights and days/where destiny with men for pieces plays. উতলা হবেন না। শুধু দেখে যান।

মাতুল রাগ-রাগ গলায় বললেন, ফিল্মের কিছুই যখন বোঝেন না, তখন মন্তব্য না করাই ভাল। আমি পুডোভকিন হব, আমি গদার হব, আমি আইজেনস্টাইন হব। হয়ে দেখাব।

মাতামহ বললেন, এসব কী বলছে গো? আমরা ছেলেদের তো বলতুম, বিদ্যাসাগর হও, বিবেকানন্দ হও, রবীন্দ্রনাথ হও। এরা আবার কারা?

পিতা বললেন, জানো যখন কিছুই বুঝি না, তখন দয়া করে বোঝাতে এলে কেন? তুমি হয়তো আবদুল করিম হতে পারতে, গোলাম আলি হতে পারতে। একেবারে দ্বিতীয় হতে না পারলেও কাছাকাছি যেতে পারতে। তোমার ভাগ্য। ভাগ্যের ঘোড়া ছুটল বেরাস্তায়। বয়েস হয়েছে, যা ভাল বোঝো তাই করো।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব। শুধু নাম নয় অর্থও। সাত দিন হাউসফুল হলে সব টাকা উঠে আসবে। চোদ্দো দিনে টাকা ডবল, আটাশ দিনে চার ডবল।

ব্যস ব্যস, তাই করো। সেই চটে শুয়ে মুটে রাজার গল্প। সেই ফেরিঅলার গল্প। মনে নেই দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে সব ভেঙে চুরমার করেছিল। আমি তোমার কথা নয়, কাচ ভাঙার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

ওল্ড জেনারেশন আর নিউ জেনারেশনে এই হল তফাত। টাকা সিন্দুকে রাখলে বাড়ে না। ছাতা পড়ে যায়। টাকা বাড়ে ব্যবসায়ে খাটালে। কোনও নন-বেঙ্গলি ব্যাবসার নামে এমন আঁতকে ওঠে না।

বাঙালির ব্যাবসা আমার জানা আছে। তোমার এটা ব্যাবসা নয়, ফাটকা।

রাজকাপুরের নাম শুনেছেন? জেমিনি গণেশনের নাম শুনেছেন?

প্রতাপ রায় বললেন, উত্তেজনায় তুই নাম গোলমাল করে ফেলেছিস। শিবাজি গণেশন। জেমিনি স্টুডিয়োর নাম। চন্দ্রলেখা করে কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছিল।

চন্দ্রলেখা? তুমি চন্দ্রলেখা করবে? চন্দ্রলেখা?

কথায় কথায় পিতা কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করছিলেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ফেটে পড়লেন বলে। ভিসুভিয়াসের মুখ দিয়ে লাভা বেরোয়। পিতার মুখ দিয়ে লাভার বদলে চন্দ্রলেখা বেরোচ্ছে ছিটকে ছিটকে। কেউ না জানুক, আমি জানি কারণটা। এক ঢিলে দু'পাখি মারা হচ্ছে। চারদিকে তখন চন্দ্রলেখার খুব প্রচার। সাংঘাতিক, ফ্যাবুলাস, সার্কাস, সোর্ডফাইট। কে জানত ওর মধ্যে আরও সব উঁচু উঁচু ব্যাপার আছে। আমার কথাতেই পিতা সপুত্র সেই ছবি দেখতে গেলেন। সবচেয়ে দামি আসনে দু'জনে পাশাপাশি বসে আছি। অন্ধকার ঘরে পিতা কখনও হরীতকীর টুকরো, কখনও যোয়ান, কখনও পাতলা কাগজে মোড়া লজেন্স এগিয়ে দিচ্ছেন। জিভ নানা রসে একেবারে চুর হয়ে আছে আরকের মতো। কষা থেকে মিষ্টি, মিষ্টি থেকে ঝাল, ঝাল থেকে মিষ্টি। পিতার ওপাশে একসার যুবতী। আমার পাশে মধ্যবয়সি একসার গোঁত্তামারা ভদ্রলোক। অবশেষে বই শুরু হল হাতির তোলা শুড়ের জল ছিটোনো দিয়ে। প্রথমটায় অত বোঝা যায়নি। বেশ চলছিল রাজারাজড়ার ব্যাপার। হঠাৎ শুরু হল ঢাকের ওপর যুবতীর নৃত্য। দক্ষিণী শরীর। যেমন নিতম্ব, তেমনি বক্ষ। চোখ ঠিকরে কোটর ছেড়ে পরদায় গিয়ে ঠোক্কর মারছে। নীচে সামনের সারির দর্শকরা নেচে নেচে উঠছে। দু'-একজন চেয়ার ভেঙে পড়েও গেল। পিতা বললেন, হরিব্ল। পেছনের দর্শকরা বললেন, চপ্। নর্তকীরা হঠাৎ পেছন দিকে চেত্তা খেয়ে পড়তে লাগলেন। জীবনে অমন 'কুচ যুগ' দেখিনি। কাঁচুলি ফেটে ফ্যাটাস করে বেরিয়ে না পড়ে। পিতা বললেন, হরেন্ডাস। পেছনের দর্শক বললেন, চোপ্। এরপর মেয়েদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ছেলেরা, ছেলেদের ঘাড়ের ওপর দিয়ে মেয়েরা চলে যেতে লাগল। মত্তপ্রমত্ত অবস্থা। এরপর গোদের ওপর বিষফোড়া। চন্দ্রলেখার কেরামতি দেখে রাজা কামার্ত হয়ে, হাউমাউ করে তেড়ে এলেন। পিতা বললেন, গেট আপ। হাত ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে প্যাসেজ পার করে হলের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেললেন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে স্রেফ দুটি কথা, আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ, তোমার এই টেস্ট হয়েছে। মাই গড! ঠিক সেইসময় পাশ দিয়ে বোকাবোকা চেহারার এক ভদ্রলোক কাছাকোঁচা সামলাতে সামলাতে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কী করেচে, নাক খুঁটেছে? শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গে ঝাকুনি মেরে পিতা বললেন, বাক আপ। ধড়ফড় করে সামনে এগোতে এগোতে ভদ্রলোক বললেন, বাবা রে। পিতা হেসে উঠলেন। শেষ লজেন্সটি হাতে দিয়ে বললেন, তোমার দোষ নেই। যেমন শুনেছ তেমনি করেছ। এসব ছবি কক্ষনও দেখবে না। এসব হল নেগেটিভ পিকচার্স। ব্রেনওয়াশের জন্যে তৈরি। ক্যাপিটালিস্টদের চাল। নৈতিক ব্যাকবোন ভেঙে দিয়ে কল্পজগতের সরীসৃপ করে

রাখার ষড়যন্ত্র। আর ইউ এ হিউম্যান ফডার ফর দেয়ার ক্যানন্‌স? পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। নাকে চাপা নাকে চাপা বলে পিতা পকেটে রুমাল খুঁজতে লাগলেন। আঁধি উঠেছে আঁধি। সেই চন্দ্রলেখার নাম শুনে পিতা তো লাফাবেনই।

প্রতাপ রায় বললেন, চন্দ্রলেখা ভেরি সাকসেসফুল ছবি। বক্স অফিস স্ম্যাশ করে দিয়েছে। ভেরি সিম্পল ফর্মুলা। একটু বীররস, একটু রোমান্স, আর একটু সেক্স। (শেষ কথাদুটি বলার সময় ঠোঁটদুটো ছুঁচোর মতো সামনে উলটে এল, বাঁ চোখ ছোট হয়ে শর্টসার্কিট বাতির মতো তিড়িক করে লাফিয়ে উঠল।) সব একসঙ্গে তাল করে চিটেগুড় দিয়ে মেখে ফুরফুরে অম্বরী তামাক।

পিতা বললেন, তোমার ভূমিকাটা কী? তখন থেকে ফড়ফড় করছ! তোমার মুখ দেখলে এলিস ইন দি ওয়ান্ডারল্যান্ডের সেই চেশায়ার ক্যাটের কথা মনে পড়ছে, এ গ্রিন উইদাউট এ ফেস। কোনও কোনও প্রাণী শাঁকালু দেখলে ওইভাবে হাসে। তোমার এই বোকা সেন্টিমেন্টাল বন্ধুর টাকাকে শাঁকালু ভেবে হাসিটা মুখে পার্মানেন্ট হয়ে গেল নাকি?

পিতার কাঁধের পাশ থেকে মাতামহ বললেন, ওটা হল ফেউয়ের হাসি।

প্রতাপ রায়ের অসম্ভব সহ্যশক্তি। এতটুকু না রেগে বললেন, বড় বড় গাইয়েদের সঙ্গে তাল মেরে ফিরি তাই হাসিটা মুখে লেগেই থাকে। এই ছবি করার ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনও ভূমিকাই নেই। পিতৃদেব কিছু টাকা, একটা বাড়ি, বিলিতি একটা গাড়ি রেখে গেছেন, বিয়েথা করিনি, ওস্তাদ মেরে বেড়াই, সেই টাকারই কিছু শ্রাদ্ধ হবে। শাঁকালু আমি দেখিনি, শাঁকালু দেখেছে আপনার শ্যালক।

পিতা এবং মাতামহ দু'জনেই একেবারে থ হয়ে গেলেন। এও সম্ভব। জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে। মাতুল বললেন, প্রতাপ, তুই শেষে আমাকে ভাল্লুক ভাবলি?

ওঁরা যে আমাকে ভাল্লুক ভেবেছিলেন?

পিতা বললেন, এমন একটা প্রতিভা ভুলপথে চলে নষ্ট হয়ে যাবে, তুমি বারণ করতে পারছ না?

করেছিলুম। শুনবে না। ব্যাপারটা জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে। হতে চেয়েছিল মিউজিক ডিরেক্টর। ল্যাং মেরে দিয়েছে। সেই থেকে গোঁ চেপেছে, নিজে ছবি করবে, সেই ছবির মিউজিক ডিরেক্টর হবে। নৌশাদ ফৌশাদ সব তলিয়ে যাবে।

পিতা হা হা করে প্রাণখোলা হাসি হেসে চেয়ারে বসলেন। আরে, বোসো বোসো। আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে হে।

মাতুল ইতস্তত করছেন। উঠে যখন পড়েছেন তখন বসা কি আর উচিত হবে। হাসি শুনে দর্শন ছেড়ে মেসোমশাই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে?

আপাতত। বিনয়দা আসুন। অনেকক্ষণ কচলাকচলি করেছেন। মেয়েটাকে এবার একটু রেস্ট দিন। মাতুলের দিকে তাকিয়ে সামান্য বিরক্তির গলায় বললেন, কী হল তোমার? বসতে বললুম না?

বসার সাহস পাচ্ছি না।

সেকী? তুমি চন্দ্রলেখা করে ঢাকের ওপর মেয়েছেলে নাচাবে, তোমার সাহস নেই?

মেসোমশাই চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, ঢাকের ওপর কেন? লাল মেঝেতে কিংবা কার্পেটের ওপর নাচালে ক্ষতি কী? ঢাকের ওপর থেকে দুম করে পড়ে গেলে কী হবে?

আরে মশাই, এ ঢাক সে ঢাক নয়, জয়ঢাক। শ্রাদ্ধের সঙ্গে তিলকাঞ্চন।

মাতুল বসে পড়লেন। আমতা আমতা করে বললেন, কই আমি তো চন্দ্রলেখার কথা বলিনি। আমি এমন একটা ছবি করব, যে-ছবি মানুষের চোখের জল টেনে বের করে আনবে। শিল্পীর বঞ্চিত জীবন। প্রতিভা আছে সুযোগ নেই। গোটা আঠারো গান থাকবে। সব রাগরাগিণীর ওপর। দরবারি, বাগেশ্রী, মালকোষ, দেশ। সব কম্পোজ করা হয়ে গেছে।

শেষ দৃশ্যে নায়কের টিবি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক। দরবারির ওপর বেস করে গান। তেমনি বাণী।

হৃদয়বিদারক?

আজ্ঞে হ্যাঁ। 'এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই।' এক এক লাইন গাইছে, আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাশছে, এক ঝলক রক্ত উঠছে, আর দরবারিতে এ জীবন, এ জীবন করছে। তাই তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে অবিকল।

মাথায় আর কিছু এল না?

কেন?

দুঃখ, মৃত্যু, প্রেম, এ ছাড়া কিছু ভাবা যায় না? কেন, টকি অফ টকিজ কি মানময়ী গার্লস স্কুলের মতো একটা বই করা যায় না।

ওসব এখন চলবে না। মানুষের মনের ভেতর ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোতে হবে। মানুষ এখন কাঁদতে চায়। বেদনায় জন্ম নেবে যন্ত্রণার শতদল, জীবনের ইতিহাস লেখা হবে রক্তের অক্ষরে, জীবনের মূল্য শুধু অশ্রুজল, তৃণশীর্ষে শিশিরের ক্ষণস্থায়ী বিন্দু।

ও, তোমার তো আর্টস ছিল। সবেতেই তাই এলিয়ে পড়ো। জীবনে চোখের জল তো আর ফেলতে হল না। তাই চোখের জল নিয়ে কাব্য করতে পারছ। তবে হ্যাঁ, যে-লাইনে নাক গলাতে চলেছ তার শেষটা অবশ্য অশ্রুজলেরই কাব্য। তুমি তো সাহিত্যের ছাত্র ছিলে, পড়েছ কি না জানি না, ভার্জিল থেকে দুটো লাইন বলি, Human deeds have their tears and morality touches the heart.

আমি তা হলে কী করব?

প্রথমে তুমি তোমার পিতার কাছে ক্ষমা চাইবে। তারপর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, আমাকে শুভবুদ্ধি দাও।

আমার অপরাধ?

সেকী? তোমার অপরাধ, তুমি জানো না? প্রথম অপরাধ, পিতাকে অপমান।

মাতুল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আপনারা দেখছি এজলাস বসিয়ে ফেলেছেন।

তা বলতে পারো। পাশে জজসাহেবও বসে আছেন, বিনয়দা। তোমার দ্বিতীয় অপরাধের বিচার এখন হবে না, হবে পরে। সেটা হল বুদ্ধিবৈকল্য।

মাতামহ বললেন, ক্ষমা চাইতে হবে না। ও তো ছেলেবেলা থেকেই এইভাবে কথা বলে। মা-মরা ছেলে।

পিতা বললেন, জানি জানি, ও তো আমার কাছেই মানুষ। আজই না হয় আতর-মাখা ওস্তাদ হয়েছে। অতীত সহজে ভুলতে পারে বলেই বর্তমানে মানুষের তুড়িলাফ। অতীতের সব ছবি আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। হয়তো বয়েস বাড়ছে বলেই। বর্ষার রাত। ওর দিদি ডিম দিয়ে খিচুড়ি বেঁধেছে। অনেক রাত হয়ে গেছে। ওই টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। চাদর মুড়ি দিয়ে এই বাবু তখন ঘুমে কাদা। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি। বিছানা থেকে পাঁজাকোলা করে তুলে আসনে বসিয়েছি। মাথা ঢুলে পড়ছে। আমি ধরে আছি, ওর দিদি একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছে। এক এক চামচে তুলছে, ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করে পাখির ঠোঁটে পুরে দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি। এমনকী ওর দিদির নাকের নাকছাবির হিরের ঝিলিকটি পর্যন্ত চোখের সামনে খেলে যাচ্ছে। কী অদ্ভুত মিল দু'জনের মুখের। আমি ওকে দেখছি, ওর দিদির মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমরা তিনজন একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছি। ভোরে আমার এসরাজের সঙ্গে গলা সেধেছে। সে মিলন আর সে বিচ্ছেদ কোথায়? সেই রাত, সেই দিন, মাস, বৎসর কোথায়?

বোহ্ ফিরাক অওর বোহ্ বিসাল কহাঁ॥
বোহ্ শব ও রোজ ও মাহ্ ও সাল কহাঁ॥

মাতুল চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, আমি ক্ষমা চাইছি।

মাথা নিচু করে প্রণাম করতেই পিতা পিঠে হাত রেখে বললেন, বড় রোগা হয়ে গেছ। সে যত্ন আর কোথায় পাবে? আমিও একটু কাব্য করে বলি, যারা ছিল তারা আর নেই, যারা পড়ে আছে, তারাও তো থাকবে না চিরদিন, কিছুটা পথ এগিয়ে দিতে পারি, তারপর তুমি একা। তোমার শাস্তি, আমাদের গান শোনাও। আজ হল গজলের রাত। কী বিনয়দা, অসুবিধে হবে না তো?

কিছুমাত্র না। সেই সকাল থেকে পড়িয়ে পড়িয়ে নিজেকে আর মানুষ মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে টিয়াপাখি।

হ্যাঁ, ওই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক কিছুক্ষণ জিরেন পাক।

প্রতাপ রায় বললেন, কিন্তু সেই গল্পটা?

ও, সেই গল্প! তুমি ঠিক মনে রেখেছ দেখছি! সেই ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের গল্প।

পিতা হাসতে লাগলেন। আমি ফরাস বিছোতে শুরু করলুম। আসর বসবে।

প্রেমের তিন পর্ব

পারস্যের গালিচা। কে কিনেছিলেন জানি না। তবে রবিবার রবিবার এই বস্তু জীবন বের করে ছেড়ে দেয়। মানুষের চেয়েও যত্নে থাকে। নরম বুরুশ দিয়ে বুনোন বরাবর ঝাড়ো আর গোল করে গুটিয়ে রাখো। ব্রাশ অ্যান্ড রোল, রোল অ্যান্ড ব্রাশ। আবার খোলা মুখ দিয়ে ইঁদুর না ঢোকে। দুটো মাথায় কাপড় জড়াও।

ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ সেই গালচে পড়েছে। বুকে লতাপাতার কারুকার্য। পাড় বসানো। নরম দুব্বো ঘাসের মতো জমি। কনক খুব সাহায্য করেছে। টানা হ্যাঁচড়ায় খোঁপা ভেঙে গেছে। পিঠের ওপর দুলছে সাপের কুণ্ডলীর মতো। আমার ওসব দেখা উচিত নয়। তবু নজর চলে যাচ্ছে। বয়েসের দোষ। বগলের কাছে ব্লাউজ টাকার মতো গোল হয়ে ঘামে ভিজে উঠেছে। হালকা নীল ওই জায়গাটা গাঢ় নীল হয়েছে। আবহাওয়া যত শীতলই হোক ওই জায়গাটা ঘামবেই। কাঁধ আর ওপর বাহুর সন্ধিস্থল পায়রার বুকের মতো গরম। তোমার তাতে কী? কার্পেট পাতছ পাতো, অন্যদিকে নজর যাচ্ছে কেন? মিটমিটে শয়তান।

হামা দিয়ে বসেছিলুম। কনক সামনে ঝুঁকে কার্পেট সমান করতে করতে পিছু হটছিল, ঘাড়ে এসে উলটে পড়ল। রেগে গেছে। আচমকা এমন ঘটনা ঘটলে সবাই রাগবে। আমিও রেগে যেতুম। আমার পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পেছনে চিতপাত। পা জোড়া এখনও আমার পিঠে। মোমের মতো মসৃণ গোড়ালি দু'চোখের কোণে ঝিলিক মারছে। নিতম্বের ঘর্ষণে পিঠ গরম হয়ে উঠেছে। চোখে শাড়ির নিম্নাংশের ঝাপটায় জল এসে গেছে। ব্যাপারটা বিশ্রী হলেও মধুর। মানুষের মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ে, যুবতী ভেঙে পড়ার ঘটনা খুব কম কোষ্ঠীতেই লেখা থাকে। কনক যদি মাতুলের ছবিতে নায়িকা হয় আমি নির্ঘাত আত্মহত্যা করব।

পিঠ থেকে পা তুলে নিয়ে কনক বললে, কী যে তখন থেকে বেড়ালের মতো পায়ে পায়ে ঘুরছ। পইতেতে পা লেগেছে?

কী জানি? খেয়াল করিনি।

ইস পাপ হয়ে গেল। দাঁড়াও একটা প্রণাম করি।

প্রণাম? পাগল নাকি?

ওপাশের ঘরে চেয়ার সরাবার শব্দ হল। চট করে উঠে দাঁড়ালুম। দু'জনকে কার্পেটে এইভাবে গড়াতে দেখলে, এ বাড়িতে আমার দানাপানি বন্ধ হয়ে যাবে। এলোমেলো শাড়ি গুছিয়ে নিয়ে কনকও উঠে দাঁড়াল। কনকের পাপ হবে কেন? পাপে আমি নিজেই মজে গেছি। ক'দিন থেকেই নিজেকে লক্ষ করছি, পুণ্যের চেয়ে পাপের আকর্ষণ হাজার গুণ বেশি। দেবতা হবার বাসনা তলিয়ে গেছে। অসুর হতে চাই। আমায় দাও মা অসুর করে, কাজ নেই আমার দেবতা হয়ে। স্বর্গপুরীর হর্ম্যে নাকি দেদার হুরি বসত করে/সেথায় নাকি অঢেল সুরার ঊর্মিমুখর ঝরনা ঝরে/পুণ্যবানের কাম্যভূমির মর্ম যদি এমনতর/দোষ কী তবে বরণ করার আগেই এদের মর্ত পরে? এসো খৈয়াম এসো। তোমাকে নিয়ে কোনও মরূদ্যানে পালাই। মধ্যবিত্ত বাঙালির সংসার বড়

একঘেয়ে। Those who have gone before us, O Cupbearer, are sleeping in the dust of Self-pride, অহংকারের অট্টালিকায় নির্বাসিতের হাহাকার। বেশ বলেছিস ব্যাটা।

দেয়ালে আমার মাতৃদেবীর ছবি সন্ধের ঝোড়ো বাতাসে একটু হেলে গিয়েছিল। পায়ের আঙুলের ওপর ভর রেখে শরীর উঁচু করে কনক ছবিটাকে সোজা করছিল, এমন সময় মাতুলের প্রবেশ। আমার চেয়ে অন্তত হাতখানেক বেশি লম্বা। পদক্ষেপের আগে আগে কোঁচা চলেছে লাথি খেতে খেতে। কনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার নাম কনক?

কনকের গোড়ালি মাটি স্পর্শ করল। ছবি নিয়ে বেচারা তন্ময় ছিল। আমি সাহায্য করলে ব্যাপারটা নিমেষে হয়ে যেত। ইচ্ছে করেই করিনি। স্বার্থ ছিল। বেশ লাগছিল দেখতে। কেমন ডিঙি মেরে মেরে হুকের নাগাল পেতে চাইছিল। দীর্ঘকাল এ বাড়িতে শুধু পুরুষেরই রাজত্ব ছিল। সকাল সন্ধে মিলিটারি মার্চ করছে। আদেশ ছিটকোচ্ছে ছিটেগুলির মতো। অ্যাটেনশন। অ্যাবাউট টার্ন। ফরোয়ার্ড মার্চ। সেই কঠোরে কোমলের স্পর্শ লেগেছে। ফুটিফাটা জমিতে বৃষ্টি নেমেছে।

কনক হাসিহাসি মুখে ফিরে তাকাল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নাম কনক।

তুমি গান জানো? মাতুল কার্পেটে প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো পায়চারি করতে করতে প্রশ্ন করলেন। গুনগুন করে গানের সুরও ভাঁজছেন। মেজাজ আসছে। আসতেই হবে। এ ঘরে কম গান হয়েছে? বড় বড় আসর বসেছে, রাতের পর রাত। এ ঘরের দেয়ালও গান গাইতে পারে।

কনক হাসিহাসি মুখেই বললে, অল্পস্বল্প।

সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মাতুলের প্রশ্ন, নাচ আসে?

আজ্ঞে না।

আসা উচিত ছিল। তোমার বিউটিফুল নাচের ফিগার।

আমার দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বললেন, কী রে! তোর রেওয়াজ টেওয়াজ কেমন হচ্ছে?

একেবারেই না।

তুই আমার নাম ডোবাবি ব্যাটা। আজ আমার সঙ্গে বোস। গানে গলা দিবি।

কোঁচায় লাথি মারতে মারতে, কার্পেটের ওপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে মায়ের ছবির সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। চিত্রার্পিত পুত্তলিবৎ। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে কাচ মুছলেন। মৃতের সঙ্গে জীবিতের ভাষাহীন আলাপন চলেছে। কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, আজ তোমাকে গান শোনাব।

আমাদের দিকে যখন ফিরে তাকালেন, তখন অন্যভাব। মুখে বিষণ্ণতার প্রলেপ। রিমলেস চশমার আড়ালে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। একটু যেন জল চিকচিক করছে।

যন্ত্র বের করো যন্ত্র বের করো বলে পিতা সদলে কুচকাওয়াজ করে ঘরে ঢুকলেন। হাতে দু'ফালি কাপড়। নিশানের মতো পতপত উড়ছে। একই সঙ্গে চামেলি আর বকুলের সুবাস। আতর ঢেলেছেন। বাতাস এখনও ভিজেভিজে। পাতা নড়লে এখনও জলের ফোঁটা ঝরছে। সেই বাতাস ফুলের গন্ধে কতদূর যে পৌঁছিয়ে গেল। কালিদাসের কালে। ওয়াজেদ আলির লক্ষ্ণৌতে। সাজাহানের দিল্লিতে। ওমর খৈয়ামের পারস্যে। কাল কোথা

থেকে কোথায় চলে গিয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল। চরিত্রদের চেহারাও যেন পালটে গেছে। মাতামহকে মনে হচ্ছে পুত্রের হাতে বন্দি সাজাহান। পেছন পেছন মুকু আসছে জাহানারার মতো। মাতামহর মুখ দেখে মনে হচ্ছে সব ভুলে গেছেন। সিনেমা, বাড়ি বন্ধক, গয়না বিক্রি, উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও আর মনে লেগে নেই। এখনই হয়তো অহীন্দ্র চৌধুরীর মতো কাঁপতে কাঁপতে বলতে থাকবেন, না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে চাই না। আমার সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এ সাম্রাজ্য তুমি ভোগ করো পুত্র। এ মণিমুক্তো মুকুট তোমার! আর মার্জনা? ঔরংজীব, ঔরংজীব। না সেসব মনে করব না। ঔরংজীব! তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

জাহানারার সকাল থেকেই সর্দি হয়েছে। ফুঁচুত করে হাঁচি হল। মুকু ঘাড় হেঁট করে হাঁচে। হাঁচার পর আরও কিছুক্ষণ নিচু হয়ে থেকে মুখ তুলে অপাঙ্গে তাকিয়ে মুচকি হাসে। বড় লজ্জার কাজ করে ফেলেছে। হেঁচে ফেলেছে। নবাব ওয়াজেদ আলির মতো পিতা মধ্যমণি হয়ে বসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, অ্যাকোনাইট থার্টি। মাতামহ বললেন, মাঝরাতে এক ডোজ ডালকামেরা। প্রতাপ রায় কোঁচা সামলে বসতে বসতে বললেন, কিস্যু না, স্রেফ গরম জলে একটা পাতিলেবু কষকষে করে নিংড়ে একটু নুন দিয়ে খেয়ে নাও। মাতুল বললেন, কষা মাংস আর ফুলকো লুচি। মাতামহ বললেন, আদা দিয়ে গরম চা। মেসোমশাই বললেন, ভোর বেলা ঠান্ডা জলে স্নান। মুকু ধীরে ধীরে দরজার দিকে সরতে আরম্ভ করেছিল। টুক করে চৌকাঠ টপকে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে ফুঁচুত করে আর একটি হাঁচির শব্দ ভেসে এল।

কনক আর আমি যন্ত্রপাতি বের করছিলুম। হারমোনিয়ম, বাঁয়াতবলা। পিতা বললেন, এসরাজটাও নামাও। অনেকদিন বাজানো হয়নি। ছড়টড় কী অবস্থায় আছে, কে জানে?

হারমোনিয়মটা বেজায় ভারী। দু'জনে ধরাধরি করে এনে কার্পেটের মাঝখানে ধপাস করে ফেললুম। প্রতাপ রায় উঠব উঠব করছিলেন। কোঁচায় কাছায় জড়াজড়ি হয়ে গেছে বলে রক্ষা পেয়ে গেল কনক। নয়তো তেড়ে এসে সরো সরো বলে আমাকে একপাশে চিতপাত করে দিয়ে কনকের সঙ্গে একটু দহরম-মহরম করার চেষ্টা করতেন।

পিতা খোল থেকে এসরাজ বের করে নরম একটুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন। আমাকে বললেন, ওহে রজনটা বের করো।

মাতুল হারমোনিয়মের রিডের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে এপাশ থেকে ওপাশে বারকতক আঙুল চালালেন। অনামিকায় আংটির পাথর ঝিলিক মেরে গেল। সুরের গমকে ঘরের বাতাস চমকে চমকে উঠল। এসরাজে ছড় টেনে অষ্টকুটি একটা শব্দ বের করে পিতা বললেন, বহত্ আচ্ছা। তোমার মেজাজ এসে গেছে।

প্রতাপ রায় তবলায় তড়াং করে একটা চাঁটি মারলেন। মেরেই বললেন, অ্যাঃ, ঢ্যা ঢ্যা করছে। কতদিন হাত পড়েনি? হাতুড়ি কই, হাতুড়ি?

এই রে, তবলা ঠোকার সেই ছোট্ট হাতুড়ি যে প্রায়ই হারিয়ে যায়। খুঁজে পাওয়াই যে মুশকিল। পিতা অধৈর্য হয়ে বললেন, কী হল, পেলে না? পাবে না জানি। এ বাড়িতে কোনও একটা সিস্টেম নেই। না পাও কয়লা-ভাঙা হাতুড়িটাই আনো।

যন্ত্রপাতির বাক্স থেকে সেই সুদৃশ্য হাতুড়ি অবশেষে বেরোল। এসরাজের ছড়ে রজন ঘষতে ঘষতে পিতা বললেন, কোথায় ছিল?

আজ্ঞে, আপনারই যন্ত্রপাতির বাক্সে।

প্রতাপ রায় তবলা ঠুকতে ঠুকতে বললেন, পাউডার আছে?

এ বাড়িতে পাউডারের পাট নেই। তবে ফ্রেঞ্চচক আছে। সে বস্তু যে-জায়গায় আছে তার নাগাল পেতে হলে চেয়ার চাই। কনক বললে, পাউডার? আমি এনে দিচ্ছি। খুব বাঁচিয়েছে। টঙে চড়ে আলমারির মাথা থেকে চক নামাতে হলে আসর মাথায় উঠত।

প্রচুর ঠোকাঠুকি করে তবলা সুরে বাঁধা হল। মাতুল বলতে লাগলেন, গাঁট্টায় মারো, গাঁট্টায় মারো। উঁহুঁ ডান দিকটা এক পরদা নেমে আছে।

মাতুলের সাংঘাতিক কান। তার চেয়েও সাংঘাতিক কান পিতার। হাতে পাউডার ঢেলে তবলার গাবে প্রতাপ রায় ভাল করে মাখালেন। ওপর দিকে দু'হাত তুলে জয় নিতাইয়ের ভঙ্গিতে নিজের তালুতে বেশ করে ঘষলেন। মাতুল হারমোনিয়মে একটা সাপটা তাল বাজিয়ে সুরের মুখটি সবে ধরতে যাচ্ছেন, পিতা উঁহুঁ উঁহুঁ করে উঠলেন। মাতুলের ভুরু কোঁচকাল।

সুরটা দাও, সুর, যন্ত্রটা বেঁধে নিই।

তিন সপ্তক এসরাজ বাঁধার কাণ্ডকারখানা আমার দেখা আছে। এর চেয়ে ভীতিপ্রদ ব্যাপার আর কিছু নেই। শ্রোতাদের ধৈর্যের পরীক্ষা। তারে টুসকি মেরে মেরে, কানে মোচড় দিয়ে দিয়ে প্রতিটি পরদাকে সুরে ভেড়াতে হবে। মাতুল উসখুস করছেন। আঙুল মাঝে মাঝে টেপা সুরের বাইরে গিয়ে খেলে আসছে। গানের মুখ লিক করে বেরিয়ে পড়ছে। পিতা অমনি উঁহু করে ছটফটে মাতুলকে বশে আনছেন।

এইভাবে চললে রাত দুটোর আগে গানে আসা যাবে না। তরফের কান সহজে ঘুরতে চাইছে না। মটমট শব্দ করে সুরে পা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। পিতা ঘোরাচ্ছেন আর বলছেন, গেল গেল।

মাতুল শেষকালে সাহস করে বললেন, আমার ভীষণ গান পেয়েছে। আর চেপে রাখতে পারছি না।

পিতা বললেন, আর একটু ধৈর্য ধরো, আর একটু, প্লিজ। এক মেটে বেঁধে ছেড়ে দিচ্ছি।

এসরাজ কাঁধে উঠল। মাতুল ইমনে আলাপ ধরলেন। নিখাদ থেকে কোমল ঋষভ হয়ে যখন সুরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন মনে হচ্ছে যেন অচেনা রাস্তা খুলে যাচ্ছে। কড়ি মধ্যম ছুঁয়ে যখন ওপরে উঠছেন সুর যেন আকাশের ব্রহ্মতালু স্পর্শ করছে। রাগিণীর বিরহী রূপ সুরের দু'-চার চলনেই স্পষ্ট। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নীল শাড়ি পরা কনক। বাকি সব অবলুপ্ত। রাজকাপুরের ছবির ধোঁয়া ভেদ করে নার্গিস যেন বেরিয়ে আসছে। মেঘৈর্মেদুরম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্নক্তং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহংপ্রাপয়।

মাতুলকে পিতার এসরাজ জবরদস্ত অনুসরণ করেছে। দু'জনেই দু'জনকে বাহবা দিচ্ছেন। প্রতাপ রায়ের আঙুল তবলার ওপর ছটফট করছে। এখনও গানের মুখ আসেনি। বোল ফোটাতে পারছেন না। ঝট করে গানের মুখ এসে গেল। একেবারে সাঁচ্চা গজল,

সব কহাঁ কুছ লালা বগুল মেঁ নুমায়াঁ হো গয়ী।
খাক মেঁ ক্যা সুরতেঁ হোগি কি পিনহাঁ হো গয়ী।

সব তো পাওয়া হল না। কিছু ফুল, কিছু পুষ্পবল্লরী, এতে আর কতটুকু প্রকাশ। মাটির যে আসল সৌন্দর্য সে তো সব লুকিয়েই রইল। সব কহাঁ কুছ লালা বগুল মে।

মাতুল-গর্বে বুক দশহাত হয়ে উঠছে। কী গাওয়াই গাইছেন। দুমড়ে মুচড়ে নিংড়ে হৃদয়ের আবেগ উজাড় করে দিচ্ছেন। এসব মানুষের কী দরকার কাউকে পরোয়া করে চলার? দুই বোন পাশাপাশি বসেছে। কনকের রাতের রান্না মাথায় উঠেছে। মেসোমশাই মাঝে মাঝে আহা আহা করে উঠছেন। মেসোর আহা শুনে মাতামহ হুঁহুঁ করে এক ধরনের হাসি হাসছেন, যার অর্থ দেখো, ছেলে আমার কোন কোটির মানুষ! ঈশ্বরকোটির জীব।

হো গয়ী বলে মাতুল দুরূহ একটা কাজ সবে শেষ করেছেন এমন সময় সিঁড়িতে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে গলা শোনা গেল, সিলিপ করে পড়ে গেলুম যে রে বাপ। গাইয়ে, বাজিয়ে, তবলচি কেউ না শুনতে পান, আমার কানে এসেছে। অচেনা গলা। আসর ছেড়ে ওঠার আগেই তিনি দরজার সামনে চলে এসেছেন। জবা এসেছে? জবা?

আরে, এ যে সেই জবাদের বাড়ির ধেড়ে বাবুটি। মনে হয় জবার স্টেপ ফাদার। আমাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ, যার হেড সুখেন, এখনও পরিচয় বের করতে পারেনি। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জবা এসেছে? জবা?

মাতুল গান বন্ধ করলেন, হারমোনিয়মে সুরের শেষ টানটি মেলায়নি। তবলার শেষ চাটি মাঝ-বাতাসে পাখির মতো উড়ছে। এসরাজ নিখাদে এসে ন্যাজ গুটিয়েছে। পিতা এসরাজটিকে কোলের ছেলের মতো সাবধানে কার্পেটে শুইয়ে রেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, কে এই অসুর? কী চাইছেন?

মুখে সেই কদাকার কাঁঠাল-কোয়া হাসি। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, জবা আছে? জবা?

মাতামহ পালটা প্রশ্ন করলেন, কেন? রক্ষেকালী পুজো আছে নাকি আজ? এই রাতে জবাফুল পাবেন কোথায়? পিতা এসরাজ তুলে নিতে নিতে বললেন, চোখের জলে পুজো করুন, চোখের জলে পুজো বেস্ট পুজো। ভদ্রলোক কিছুই বুঝতে না পেরে আর একটু পরিষ্কার করে বললেন, সেই দুপুর থেকে জবাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এত রাত হল, সে কি এখানে এসেছে?

পিতার এসরাজ আবার স্কন্ধচ্যুত হল। শূন্যে ছড়ি ঘুরিয়ে অর্কেস্ট্রার কনডাক্টরের মতো ভঙ্গি করে প্রশ্ন করলেন, ইনি কী চাইছেন বলো তো?

প্রতাপ রায় বাঁয়ায় গফা গফা আওয়াজ করে প্রশ্ন করলেন, কে জবা?

ভদ্রলোক বললেন, সেই জবা যাকে ওই ছেলেটি মাঝে মাঝে হাত থেকে ফুল ছুড়ে দেয়।

অ্যায় মরেছে। ব্যাটা হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলে। এইবার কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখো। কপালে আজ এই লেখা ছিল ঈশ্বর। পিতার হাত থেকে ছড়ি খসে পড়ল, কী বললেন? আমার ছেলে জবাকে চন্দ্রমল্লিকা ছুড়ে মারে? আপনি এতদিন আমাকে বলেননি কেন? ঘুমোচ্ছিলেন, থানায় ডায়েরি করেননি কেন?

মেসোমশাই বললেন, উঁহু, ডায়েরির স্টেজে এখনও আসেনি। যতক্ষণ না শ্লীলতাহানি হচ্ছে, ইনডিসেন্ট জেসচার হচ্ছে ততক্ষণ পানিশেবল অফেন্স হচ্ছে না। এ কেস ফেল করবে। যত বড় বাঘা ব্যারিস্টারই হোক না কেন আসামি খালাস পেয়ে যাবে। তারপর দেখতে হবে যাকে ফুল ছুড়ে মেরেছে সে সাবালিকা না নাবালিকা? সাবালিকা হলে তার কনসেন্ট ছিল কি না? যদি প্রতিবাদ করে থাকে তা হলে সে প্রতিবাদের সাক্ষী

কে? তা ছাড়া ফুল যে ছুড়ে মেরেছে বলছেন তার কোনও সাক্ষী আছে? প্রমাণ কী ফুল ছুড়ে মেরেছে? কেস ডিসমিস্‌ড। আসামি বেকসুর খালাস। আসামি এখন অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করতে পারে। হাজার দশেক টাকা অবশ্যই পেয়ে যাবে।

মাতুল বললেন, মামলা যখন খারিজ হয়ে গেছে তখন আবার গান ধরা যেতে পারে?

পিতা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফলস অ্যালিগেশন। নাও ধরো।

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে, আমি মামলা করতে আসিনি। আপনার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগও নেই। তবে আজকাল ভাবভালবাসার যুগ পড়েছে তো, তাই ভাবলুম জবা যদি এখানে এসে থাকে। এত বড় বাড়ি, শুনেছিলুম একটিও মেয়েমানুষ নেই, উঠতি বয়েসের মেয়ে, উঠতি বয়েসের ছেলে, ঝড়বাদল হচ্ছে। বলা তো যায় না, কী থেকে কী হয়ে যায়। যদি একবার হয়ে যায়।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়ে যায়?

আঞ্জে এই জোড়কলম আর কী।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, অশ্লীল কথা বলছে, অনুমতি দাও। জুতোজোড়া এখনও প্রায় নতুন আছে। পিতা বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, অ্যাকশন তো আমিও নিতে পারি; তার আগে অভিযোক্তাকে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, শপথ করো, সত্য ছাড়া মিথ্যা বুলিব না, যাহা সত্য তাহাই বলিব।

প্রশ্ন: জবা কে?

একটি মেয়ে।

কোথায় থাকে?

যেদিকে চন্দ্রমল্লিকার টব, সেই ছাদের দিকের লাগোয়া বাড়িতে।

আই সি, যে-বাড়ির মেয়েরা অন্তর্বাস পরে পুরুষদের সামনে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, আপনি সেই বাড়ির নিন-কম-পুপ। আজ্ঞে, আপনি আসতে পারেন। ফুল ছুড়েছে? সে তো নরম জিনিস। ইট ছোড়া উচিত ছিল। থান ইট, আধলা ইট।

ভদ্রলোক বললেন, শুনেছি আপনি রাগী মানুষ। রাগী হলেও পরোপকারী, দয়ালু, শিক্ষিত, আদর্শবান। বিপদে পড়ে এসেছিলুম আপনার কাছে। আমার দাদা পাঞ্জাবে বড় চাকরি করতেন, বউদিরা সেখানেই ছিলেন, তাই বাঙালির হালচালের সঙ্গে মেলে না।

প্রতাপ রায় প্রশ্ন করলেন, বউদিরা মানে?

আজ্ঞে দুই বিবাহ।

অ্যাঁ বলেন কী, দু’-দুটো বউ।

বলেন কেন, আর সামলাতে পারছি না।

প্রতাপ রায় কাবাবের গন্ধ পেয়েছেন। সাগ্রহে বললেন, বসুন, বসুন।

ভদ্রলোক এতক্ষণ কদমতলায় কেষ্টঠাকুরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। কার্পেটের একপাশে বসলেন। সাবান আর পাউডারের বোদা গন্ধ বেরোচ্ছে গা থেকে। মাথার চুলে ফুলেল তেল। প্রতাপ রায়

জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে সামলাতে হচ্ছে কেন?

আজ বছর পাঁচেক হল, দাদা নিরুদ্দেশ। মনে হয় বেঁচে নেই। আত্মহত্যা করেছেন।

মেসোমশাই টাস টাস করে টুসকি মেরে কনক আর মুকুকে দরজার সামনে থেকে ওপাশে সরে যেতে বললেন। খারাপ খারাপ কথা হচ্ছে, মেয়ে বখে যাবে। মাতামহ বলে উঠলেন, বলেন কী, এক ঢিলে দু'পাখি। দু'-দুটো বউ বিধবা!

বউদিরা অবশ্য বিধবার সাজপোশাক পরেন না। মাছ, মাংস, ডিম সবই চলে। দাদা মারা গেছেন সে প্রমাণ তো নেই। যা হবে সেই বারো বছর পরে।

পিতা প্রশ্ন করলেন, আপনার কী করা হয়?

পোস্তার বাজারে মশলার পাইকার।

মাতামহ অমনি বলে উঠলেন, ও, ব্যাটা গন্ধবেনে।

মাতুল ক্ষমা চাইলেন, কিছু মনে করবেন না, ব্যাটা বলাটা ওনার মুদ্রাদোষ।

প্রতাপ রায় বললেন, আপনার কি মনে হচ্ছে জবা পালিয়েছে?

মাতামহ বললেন, অমন বাপের মেয়ে পালাবেই। দ্রৌপদীর মতো পঞ্চস্বামী গ্রহণ না করে থামবে না। তারপর বস্ত্রহরণ। পিতা বললেন, বড় অসংলগ্ন কথা হচ্ছে। জবা পালাক ক্ষতি নেই। প্রেমের তিন পর্ব। প্রথম পর্বে বুদ্ধিবৈকল্য। কাচে কাঞ্চন ভ্রম। দ্বিতীয় পর্বে দ্বিত্ব। তৃতীয় পর্বে যথাস্থানে দ্বিরাগমন ও খেল খতম। সবই হল অপসৃষ্টির উত্তাপ। যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ততই ভাল। আপনি তার খোঁজে এখানে এলেন কেন?

আপনার ছেলের সঙ্গে ছাতে-ছাতে একটু কথা চালাচালি হত তো। তা ছাড়া এই চিঠিটা হঠাৎ হাতে এসে গেল।

চিঠি? সভাসদরা সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ চিঠি। মনে হয় আপনার ছেলের লেখা।

মেসোমশাই বললেন, মনে থাকে যেন হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট কল করা হবে।

আমি তো মামলা করতে আসিনি। জবার সন্ধানে এসেছি।

পিতা বললেন, ঠিক আছে, আগে হস্তাক্ষর মেলানো হোক, তারপর কী লিখেছে দেখা যাবে। কনক!

পিতার ডাকে কনক দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

এর যে-কোনও একটা হাতের লেখা নিয়ে এসো তো।

কনক একটু ইতস্তত করে সরে গেল। আমি যেন বন্দি আসামি। সাক্ষ্য, প্রমাণ সব একে একে হাজির করা হবে। আমার তাতে কোনও হাত থাকবে না। একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জবাকে এক-আধটা ফুল এ ছাত থেকে ও ছাতে পাচার করেছি ঠিকই কিন্তু চিঠি তো আমি লিখিনি। চিঠি লিখব কেন? আমি তো জানি যত দানাই ছড়াই জবা তো তেমন পায়রা নয় যে উড়ে আসবে। ওর দানা আলাদা। মটরদানা, কাঁকনিদানা, কোনও দানাতেই ও পাখি বশ মানবে না। মাতুল কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, কী কাণ্ড বাধিয়েছিস। ব্যাটা ওমর খৈয়ামের চেলা।

বেশ লজ্জা লজ্জা করছে। ভয় তেমন লাগছে না। কী আর হবে? পিতা যদি বাড়ি থেকে লাথি মেরে বের করে দেন, লোটাকম্বল নিয়ে সরে পড়ব। কোথায় সরব জানি না। তবে এত বড় পৃথিবী, কোথাও কি একটা ডেরা জুটবে না।

কনক খুঁজে খুঁজে আমার ডায়েরিটা নিয়ে এসেছে। মরেছে। এতে যেসব মনের কথা লেখা আছে, সেসব পড়লে সশ্রম কারাদণ্ডের পরিবর্তে জজসাহেব ফাঁসির হুকুম দেবেন। অনেক আধ্যাত্মিক চিন্তাও আছে। বরাতে কোন পাতাটা বেরিয়ে পড়বে কে জানে! জয় ঠাকুর।

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে পিতা মাঝামাঝি একটা জায়গা খুলে আলোর সামনে মেলে ধরলেন। নীরব, নিথর, নিস্পন্দ প্রদীপ শিখা। কোন পাতাটা খুলেছেন। হে ভগবান, যে-পাতায় মায়া আছে, যে-পাতায় কনক আছে, সেইসব পাতা যেন দুম করে বের করে দিয়ো না। কী কুক্ষণেই যে ডায়েরি লেখার ইচ্ছে হয়েছিল। ভেবেছিলুম মহাপুরুষেরা ডায়েরি লেখেন, তা হলে ডায়েরি লিখলে মহাপুরুষ হয়। লজিক।

পিতা মুখ তুলে বললেন, বাপস, কী সব লিখেছে?

প্রতাপ রায় বললেন, খারাপ কথা?

না না, অতি উচ্চমার্গের কথা। লিখছে, জীবনে পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়াটাই বড়। পেলে হারাবার ভয় থাকে, যা পাইনি তা তো কোনওদিন হারাবে না। সোজা চলে যাও, কিছু ধরার চেষ্টা কোরো না, কিছু তুলে নেবার চেষ্টা কোরো না। রিক্ত হবার সাধনা ক'জন করে। সকলেই তো দেহি দেহি করছে। সত্য একটাই, সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে।

জবার কাকা উসখুস করে বললেন, হাতের লেখা কি মিলছে?

চিঠিটাই পেলুম না, তো হাতের লেখা মেলানো!

এই যে স্যার।

এতক্ষণে কাগজটা নজরে এল। এ সেই চিঠি। সুখেন ব্যাটা সেদিন দুপুরে আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল। দেখেছ কাণ্ড! একটু বেশ জমিয়ে লেখ তো পিন্টু। বেশ একটু আবেগ দিয়ে মারাত্মক করে লেখ তো। বড় ফসকে ফসকে পালাচ্ছে। প্রথম লাইনেই মেরে দে, লেখ, আর কতকাল থাকব বসে, পরান খুলে বঁধু আমার! রাসকেল একবারও আমাকে বললে না মেয়েটা কে? বন্ধুকৃত্য করতে গিয়ে আজ অবস্থা দেখো। অপরাধ স্বীকার করে নিলে সাজা কমে যায়। সেই পথেই এগিয়ে দেখি।

মেলাতে হবে না, ওটা আমারই হাতের লেখা। তবে অন্যের হয়ে লেখা। হাতের লেখা আমার হলেও লেখক অন্য।

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে, হাইকোর্ট দেখাতে চাইছে? একটু চাপ দিলেই বেরিয়ে পড়বে জবা কোথায়।

মেসোমশাই ধমকের গলায় বললেন, চুপ করুন, চিঠির শেষে কার নাম আছে দেখুন তো হরিদা?

পিতা পাতা উলটে বললেন, ইতি তোমার সুখাদ্য।

প্রতাপ রায় বললেন, বাবা, একেবারে খাদ্যখাদক সম্পর্ক।

মেসোমশাই বললেন, কাকে সম্বোধন করা হয়েছে?

পিতা ভাল করে দেখে বললেন, আমার শ্যামা মায়ের চরণতল।

প্রতাপ রায় বললেন, একেবারে ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম। বহত আচ্ছা।

মেসোমশাই বললেন, এ চিঠি কিছু প্রমাণ করে না। ইট মে বি এনিথিং। কয়েক লাইন পড়ুন তো হরিদা। পিতা চিঠিটা মাতুলের হাতে দিয়ে বললেন, আমি পারব না, তুমি পড়ো।

ভদ্রলোক বললেন, বেশ পাকা পাকা কথা লেখা আছে। ইচ্ছে করলে আমি চেপে ধরে জবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে পারি। দুঃখু নেই। পাত্র হিসেবে ছেলেটি তো খারাপ নয়।

কথা শুনে সকলেই নির্বাক। বলে কী রে! পোস্তার কারবারি। সেই ছড়া নাকি, শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে তোমার নাকি ছেলের বিয়ে। মাতুল চিঠিটা শুরু করার আগেই প্রতাপ রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পকেট থেকে সিগারেট লাইটার বের করে দপ করে আগুন ধরিয়ে দিলেন। চিঠি পুড়ছে, মাতুল চিৎকার করছেন, আগুন লেগে যাবে, ওরে আগুন লেগে যাবে।

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, আমার চিঠি, আমার চিঠি।

প্রতাপ রায় জ্বলন্ত চিঠিটা কার্পেটের পাশের মেঝেতে ফেলে দিয়ে খুব সহজ গলায় বললেন, এবার আপনি আসতে পারেন। জবা এখানে নেই। ভোর বেলা গাছে খোঁজ করবেন।

মাতামহ বললেন, আর একটা কথা বলেছ কী চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলে দিয়ে আসব।

মাতুল বললেন, উনি যা বলেন তাই করেন। তন্ত্রসাধক।

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। মাতামহের দিকে ভক্তি গদগদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, বাবা, একটু আশীর্বাদ করুন। মাতামহ হাত তুলে বললেন, করলুম।

আশীর্বাদ করুন যেন এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারি।

অ্যাঁ সেকী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের ছেলে ছাত টপকে ফুল ফেলবে, চিঠি ফেলবে, আইবুড়ো মেয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে, দেশে আইন বলে তো একটা কিছু আছে। মেয়ে যদি না ফেরে আমি থানায় যাব। তখন যা হয় টানা হ্যাঁচড়া হবে। মেসোমশাই বললেন, আমি আছি।

পিতা খুব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনারা একে ডিফেন্ড করবেন না। আমার ছেলে অপরাধী। শুধু অপরাধী নয়। চরিত্রহীন, লম্পট। হি ইজ এ সাফারার। বয়েসের অসুখে ভুগছে। শেম! শেম।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়

সব স্থির। সমস্ত মুখ গম্ভীর। এমনকী প্রতাপ রায়ের মুখ থেকেও সেই বিচিত্র হাসি অদৃশ্য হয়েছে। মাতামহ মাথা নিচু করে হাতের আঙুল নিয়ে পুর-মুঠ খেলছেন। এসরাজ একপাশে অভিমানী স্ত্রীর মতো পাশ ফিরে শুয়ে আছে। হারমোনিয়ম বেলো খোলা, সুরহারা। বাঁয়া আর তবলা মাথা ঠোকাঠুকি করে ফাটকের দুই রাতজাগা আসামির মতো নিজেদের ভাগ্য নিয়ে যেন বড়ই বিব্রত। দুই উরুতে হাত রেখে পিতা এত সোজা হয়ে বসেছেন, মনে হচ্ছে অমরনাথের তুষারলিঙ্গ। মাতুল ওপর-ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে বসে আছেন। বোঝাই যায় সুর বেরিয়ে আসতে চাইছে, কোনওরকমে চেপে রেখেছেন। নিজেকে মনে হচ্ছে ইঁদুরকলে পড়ে গেছি। কেউ-না-কেউ এইবার তুলে নিয়ে বাইরে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। এক ঝাঁক কালো কালো কাক, ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তেড়ে আসবে। প্রাণভয়ে ন্যাজ তুলে শুরু হবে আমার দৌড়োদৌড়ি।

প্যাঁচ ঘুরিয়ে এসরাজের ছড়ির ছড় আলগা করতে করতে পিতা বললেন, আর কী রইল? কিছুই রইল না।

মাতামহ মাথা তুলে প্রশ্ন করলেন, তার মানে?

মানে অতি সহজ। চরিত্র গেল তো আর কী রইল? কিছুই রইল না।

ছড়িটা শূন্যে তুলে দেখাতে লাগলেন, এই হল মাথা, লম্বা লম্বা চুল, দুটো লিকলিকে হাত, কঞ্চির মতো বাঁকা বাঁকা দুটো পা, এই ধনুকের মতো পিঠ। এই দুর্বল শরীর কীসের জোরে জগতের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত?

ছাত্রের মতো সমস্বরে সকলের জবাব, চরিত্র, চরিত্র।

উত্তেজনায় পিতা উঠে দাঁড়ালেন, রাইট ইউ আর। সেই চরিত্রটাই যার থ্রেডবেয়ার হয়ে গেল, তার আর রইল কী! প্রবৃত্তির ড্যাঙোস মাথায় পড়বে। ঘা খেতে খেতে, ঘা খেতে খেতে ও তো কেঁচো হয়ে যাবে। হি ইজ মাই লস্ট সন। আমি এখন পৃথিবীর শেষ সীমায় এসে অন্ধকারে পথ খুঁজছি। ইস, ইস, এই ছেলে যখন পিতার নাম বলবে লেট হরিশঙ্কর, আমি তো তখন কবরেও ঘৃণায় যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠব।

মাতামহ উদাস গলায় প্রশ্ন করলেন, লেট বলছ কেন? তুমি তো প্রেজেন্ট।

আমি সিদ্ধান্ত করেছি, আই উইল কমিট সুসাইড।

সভাসদরা সমস্বরে বললেন, সেকী? আত্মহত্যা।

ইয়েস আত্মহত্যা! দুষ্ট গোরুর চেয়ে, শূন্য গোয়াল ভাল।

মাতামহ বললেন, দুষ্ট গোরু তো ও, তুমি কেন গোয়াল শূন্য করে চলে যাবে? এ আবার কেমন বিচার? অঙ্ক আর ইংরেজিতে তুমি মাস্টার, আইনে তুমি একেবারে গবেট।

প্রতাপ রায় বললেন, একে বলে ট্র্যানসফারড এপিথেট।

পিতা চড়াক করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক বলেছ। যে-চড় ওর গালে মারা উচিত ছিল, সেই চড় আমি নিজের গালে মারব। সেলফ ইম্‌মলেশন। ওই উঠোনে কাঠের পিঁড়েতে বসব। গায়ে ঢালব একটিন কেরোসিন, তারপর একটি দেশলাই কাঠি। যতক্ষণ গলা দিয়ে স্বর বেরোবে, ততক্ষণ বলতে থাকব, তোমার লেলিহান কামনায় আমি পুড়ছি, তোমার লেলিহান কামনায় তোমার পিতা পুড়ছে।

মাতামহ বললেন, আমরা তখন কোথায় থাকব?

কাছাকাছিই থাকবেন।

তুমি পুড়বে আমরা দেখব! কী তোমার বুদ্ধি হরিশঙ্কর। হিন্দুস্থানিরা তোমাকে বুদ্ধু বলবে। এ কি সতীদাহ নাকি! আমরা চট, কম্বল, বালি এনে তার ওপর, তার ওপর চাপাব। দমকল ডেকে আনব। তারপর হরিশঙ্কর, পুলিশ এসে তোমাকে ধরবে। কোমরে কাছি বেঁধে টানতে টানতে হাজতে। তোমার হাইপার অ্যাটিচিউড বেরিয়ে যাবে।

প্রতাপ রায় বললেন, হাইপার অ্যাটিচিউড নয়, ট্রানসফারড এপিথেট।

পিতা বললেন, আপনারা কি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন? অ্যাম আই এ লাফিং স্টক? ভুলে যাবেন না সেই প্রবাদ, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। তমসা এগিয়ে আসছে, তামাশা বেরিয়ে যাবে।

যতবারই আমি কিছু বলতে চাইছি মাতুল আমাকে চেপে চেপে ধরছেন। ফিসফিস করে বলছেন, একটাও কথা নয়, উত্তাপ বেরিয়ে যাক। গ্রহ আগে শান্ত হোক।

মেসোমশাই বললেন, পেশেন্স হরিদা, পেশেন্স। অপরাধীকে ডিফেন্ড করার সুযোগ দিন। এটা একটা ফাঁদ হতে পারে।

প্রতাপ রায় বললেন, ভাগনে, চিঠির রহস্যটা কী!

মাতামহ বললেন, তোমার পিতৃদেবকে সত্যি কথা বলে শান্ত করো। আমি জানি, তুমি আমাদের সে ছেলে নও।

আমার বন্ধু সুখেন।

মেসোমশাই বললেন, সে তোমার বন্ধু নয়, শত্রু।

মাতুল বললেন, নো ইন্টারাপশন। হি ইজ কামিং আউট।

মাতামহ বললেন, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোচ্ছে।

আমার বন্ধু সুখেন আমাকে বলেছিল একটা চিঠি লিখে দে। তোর বাংলাটা ভাল আসে। লেখাটা আমি চিঠি হিসেবে লিখিনি, লিখেছিলুম সাহিত্য হিসেবে।

মাতুল বললেন, বেলেলেটারস আর কী।

মাতামহ বললেন, তার মানে এলেবেলে।

সুখেন বলেছিল একটা মেয়েকে লেখার কথা। আমি লিখেছি প্রকৃতিকে। সত্তাকে ভেঙে দু'খণ্ড করেছি, পুরুষ আর প্রকৃতি। বৈষ্ণবের মধুরভাব আর কী? প্রকৃতিভাবে উপাসনা। আমিই কৃষ্ণ, আমিই রাধা। নিজেকে

দেখে নিজেই মুগ্ধ। রূপ দেখি আপনার/কৃষ্ণের হয় চমৎকার/আস্বাদিতে মনে উঠে কাম॥ এ চিঠিতে যে নায়ক সেই নায়িকা। সেই বেদনা, যার লাগি কান্দে প্রাণ তারে পাব কীসে।

পিতা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

আজ্ঞে না, দুরাত্মা নই, আসল আত্মা। আত্মাকে দু'টুকরো করেছি ভেঙে। একটা পুরুষ আর একটা প্রকৃতি। দু'জানলা দিয়ে দু'জনে উঁকি মারছে। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি...

মাতুল বললেন, অ্যাঁ, বলিস কী? খাঁচার ভিতর অচিন পাখি। প্রতাপ, ধরো ধরো।

পাখি নয়, প্রতাপ রায় তবলা ধরলেন। মাতুল ধরলেন,

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
ক্যামনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনো বেড়ি...

নে ধর, ধর। গলা দে না ব্যাটা,

ধরতে পারলে মনো বেড়ি
দিতাম তাহার পায়।

মাতামহ উঠে দাঁড়িয়ে বাউলের মতো নাচতে আরম্ভ করেছেন। বারেবারে বলছেন, আহা, খাঁচার ভিতর অচিন পাখি। পিতা বসে পড়েছেন। ছড়ির ছড় টান করতে করতে বলছেন, থেমো না, থেমো না, চালিয়ে যাও। এসরাজ সুরে ককিয়ে উঠল,

ধরতে পারলে মনো বেড়ি
দিতাম তাহার পায়ে।
আট কুঠারি নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝালকা কাটা
উপরে আছে সদর কোঠা।
আয়না মহল তায়।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি, বলে মাতুল যখন সুরে উঠছেন, ভেতর কেঁপে যাচ্ছে। মাতামহ নৃত্য করছেন, হাসি পাচ্ছে না। চোখে তাঁর ভাবাশ্রু। গানের ফাঁকে ফাঁকে মন বলে উঠছে, বেরিয়ে পড় পিন্টু। চার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়। অচিন পাখি ধরতে। কামিনী কাঞ্চনের দাসত্ব, অস্থিমজ্জার দাবি, সব পাশ কাটিয়ে, সেই অনন্তের মুখোমুখি দাঁড়া।

গান থামল, মেসোমশাই বললেন, ছেলে আপনার ব্যারিস্টার হবে। পরিস্থিতি কেমন বদলে দিলে দেখলেন? ভেতরটা কেমন তুলতুলে হয়ে গেল দেখছ হরিদা? কেমন যেন আনচান করছে।

মাতুল বললেন, কার ভাগনে দেখতে হবে তো।

পিতা বললেন, সেইজন্যেই তো ভয় পাই। জালালুদ্দিন রুমির নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?

হ্যাঁ শুনেছি।

তা হলে তার একটা গল্প শোনো। গল্প নয়, রূপক। রাজার বাজপাখি একদিন এক ভাঙা আস্তানায় উড়ে এসে বসল। সেখানে গোটাকতক প্যাঁচা বাস করত। বাজ বললে, তোমরা কি এই জায়গাটাকে খুব উন্নত বলে মনে করো? আমার স্থান কোথায় জানো কি? রাজার হাতের কবজির ওপরে। বুদ্ধিমান প্যাঁচারা চিৎকার করে অন্য প্যাঁচাদের সতর্ক করে দিলে, সাবধান। ওকে বিশ্বাস কোরো না। ওর ছলে ভুলো না। আমাদের আস্তানা দখলের তালে এসেছে। তুমি হলে সেই রাজকীয় বাজ। আমার এই প্যাঁচাটিকে কোটর-ছাড়া কোরো না।

মাতুল বললেন, আমার নাকটা সামনের দিকে সামান্য বাঁকা বলে বাজ বলছেন? তা বলুন। কিন্তু ওকে প্যাঁচা বলছেন?

আপত্তি কীসের? রুমি কী বলছেন শোনো, only Sweet-voiced birds are imprisoned/Owls are not kept in cages. যারা মেয়েছেলের সোনার খাঁচায় ঝোঁটন পাখি হয়ে বারান্দায় দোল খায়, তাদের গায়ে মুতো কাঁথার গন্ধ। তাদের মন শ্যাওলা-ধরা উঠোনের মতো। মানুষ যদি পুঁটলির মতো সংসারের চাতালে পড়ে থাকে তা হলে তার কী হবে? নৌকোর পাটাতনে নিদ্রিত মানুষের মতো অবস্থা হবে। এক দুলুনিতেই ছিটকে পড়বে অগাধ জলে। Seek a Pearl/brother/within a shell/And seek skill from among the men of words.

মাতুল বললেন, আমি কি তা হলে কিছুই না?

তুমি তোমার ক্ষেত্রে বিরাট। তবে কী জানো, তোমার লাইনে কিছু পাপ সহজাত। সুর, সুরা আর সুন্দরী। তুমি ধরবে। তোমার লিভার শুকোবে। তোমার কণ্ঠ হারাবে। শেষে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরবে। তোমার ভাগনের হাতে গার্ডল অফ ভেনাস আছে। জানো কি?

প্রতাপ রায় বললেন, গার্ডল অফ ভেনাস? ভাগনে আমাদের শিল্পী হবে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে অভিনয়ের লাইনে যাবে। দুর্গাদাস, নির্মলেন্দু, প্রমথেশ, দানিবাবু কি গিরিশ ঘোষ বলছি না, তাঁদের কাঠামোই আলাদা ছিল। এর একটা কীরকম প্রেমিক-প্রেমিক, গার্ডল অফ ভেনাস-ভেনাস চেহারা। ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকায় ফাটিয়ে ছেড়ে দেবে। মেকআপ পর্যন্ত লাগবে না। আমাদের ছবিতে একজোড়া নতুন হিরো-হিরোইন লাগালে মন্দ হয় না। বই তো এমনিতেই ফ্লপ করবে, তবু লাখখানেক টাকা বাঁচবে।

অক্ষয় ওর হাত দেখে আমার কানে কানে বলেছিল, হরিদা, খুব সাবধান, শুক্রবন্ধনী ছিঁড়ে ঝলঝলে হয়ে ঝুলছে, সরু সরু, লম্বা লম্বা, গাইনোকোলজিস্টদের মতো হাতের আঙুল, শুক্রের ক্ষেত্র ঢিবির মতো উঁচু, তাতে আবার জাল চিহ্ন, এ ছেলে ডন জোয়ান হবে। প্রমোদ আর প্রমদা, এই হবে ওর জীবনের পারস্যুট। চুলের কেয়ারি, সাজপোশাকের বাহার আর চাঁদনি রাতের বেড়ালের স্বভাব।

মাতামহ বললেন, সে আবার কী?

ফাল্গুন আসুক বুঝতে পারবেন। মাঝরাতে চাঁদের আলোয় পাঁচিলে বসে হুলো ডাকছে বুকফাটা গলায় মিঞাও, মিঞাও।

কাকে ডাকবে হরিশঙ্কর? সুখে ডালে বসি, ডাকিছ পাখিরে, ডাকিছ কি সেই পরমপিতারে?

আজ্ঞে না, হুলোর জীবনে পিতা নেই, মাতা নেই, পরমপিতা নেই, আছে শুধু প্রমদা। বালস্তাবৎক্রীড়াসক্ত-স্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।

মাতামহ বললেন, কী যে বলো তুমি? এ হুলো সে হুলো নয়। আজ এর সমাধি হয়েছিল, সে খবর রাখো কি?

পিতা বললেন, সমাধি আর লো প্রেশারের একই লক্ষণ। ওকে নিয়ে আমি চেঞ্জে যাব।

যাক, তা হলে তোমার রাগ পড়েছে।

হ্যাঁ, একে বলে সেকেন্ড থট। কোনও কিছু করার আগে দু'বার চিন্তা করা উচিত। আমি সরে গেলে ও আরও চিঠি লিখবে। প্রেমের বন্যা বইয়ে দেবে। প্রেমের ডিসেন্ট্রি ডায়েরিয়ায় জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

তা যা বলেছ। ব্যাটা যেন ডিসপেপটিক শ্রীকৃষ্ণ। ফুঁয়ে তেমন জোর নেই তাই বাঁশি ছেড়ে কলম ধরেছে। তুমি হবে ওর বেলপোড়া।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বেলপোড়াই হব। বাঁশি তবু বাজে, হুলোরা ডাকে, কলম বড় সাংঘাতিক জিনিস। নিঃশব্দ প্রাণঘাতিকা। বাঁশি শুনে গোপীরা বলত, কেষ্ট মুখপোড়া ছটফট করছে, কলমের খোঁচায় তেড়ে আসে মশলার কারবারিরা। চিঠিটা পুড়ে গেল, তা না হলে ভাষাটা ভাল করে অ্যানালিসিস করা যেত। বোঝা যেত কতদূর এগিয়েছে আর কতদূর এগোবে।

প্রতাপ রায় বললেন, কী লিখেছিলে ভাগনে?

মেসোমশাই বললেন, সে কি আর মনে আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে আছে। ও তো চোরাই মাল।

মাতুল বললেন, সে কী? প্রেমেও প্লেজিয়ারিজম। কোথা থেকে ঝেড়েছ?

আজ্ঞে খালিল জিব্রান থেকে। আমার সুখে তুমিই অসুখ। কেন? সে প্রশ্নের জবাব শুনে তোমার হৃদয় কি টলবে? যাকে ভালবাসি, যাকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই, যার জন্যে আমার দিবসের শ্রম, হৃদয়ের রক্তক্ষরণ, রাতের অনিদ্রা, সে যদি হৃদয়টি অন্যকে দান করে দিয়ে বসে থাকে তা হলে সুখের আর কিছু থাকে কি? আমি ধীরে ধীরে বাতির মতো গলে যাচ্ছি। বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছি আতরের সুবাসের মত। কী আর অবশিষ্ট রইল আমার? এ দিন কবে শেষ হবে! এ রাত কখন ভোর হবে!

মাতুল বললেন, দারুণ লিখেছিস তো। আমার আবার একটু গাইতে ইচ্ছে করছে।

হারমোনিয়মে ভাঙা কাচের মতো সুরে চুরমার চুরমার বেজে উঠল। একেবারে চড়া পরদায় গান ধরলেন।

থি বো ইক শখসকে তসব্বুর সে।
অব বো রানাই এ খয়াল কহাঁ।।

দু-চার পাক খেয়ে বাংলা করলেন, একজনের রূপের কল্পনায় আমি মশগুল ছিলাম। মনে এখন আর সে নেশা খুঁজে পাই না কেন?

তেরি ফুরসত কে মুকাবিল ওই উমর।

বর্ককো পাব হিনা বাঁধতে হেঁ॥

হায় রে জীবন, বিদ্যুতের পায়ে মেহেদি আঁকার মোকাবেলাতেই তো ফুরিয়ে যাবি!

বাইরে আবার উতলা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মনে হয় আবার বৃষ্টি হবে। প্রতাপ রায় বললেন, এবার ওঠো। অনেক দূর যেতে হবে।

হারমোনিয়মের বেলো আঁটতে আঁটতে মাতুল বললেন, কতদূরে আর যাবে, মৃত্যুর চেয়ে দূরে তো আর যেতে পারবে না ভাই। নজর মেঁ হেঁ হমারি জাদএ রাহে ফনা গালিব। কি য়ে শিরোজা হৈ, আলমকে অজজাএ পরিশাঁকা। আমার দৃষ্টিতে মৃত্যুর পথই ধরা পড়ে, গালিব। নিয়মহারা সংসারে মৃত্যুই তো একমাত্র শৃঙ্খলা, প্রতাপ।

এসরাজে শেমিজ পরিয়ে পিতা নিজেই হুকে ঝোলাতে গেলেন। আমাকে আর কোনও আদেশ হল না। খুব রেগে আছেন। মেসোমশাই বেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে আরামে বসে আছেন। প্রতাপ রায় হাতে ঘড়ি বাঁধতে বাঁধতে বললেন, আপনি আইনজ্ঞ?

মাতামহ উত্তর দিলেন, আরে বাপ রে বিরাট ব্যারিস্টার। ইনি উঠে দাঁড়ালে জজসাহেবরা ভয়ে কাঁপেন। মেসোমশাই ওজন বাড়াবার জন্যে মুখটাকে আরও গম্ভীর করলেন। মাতুল কানে কানে বললেন, তুই একটা কবজ ধারণ কর। সময়টা খুব খারাপ যাচ্ছে।

প্রতাপ রায় বললেন, ওঃ ভগবান আপনাকে পাইয়ে দিলেন। এখানে ক'দিন আছেন?

মেসোমশাই অকারণে কেশে, ব্যক্তিত্বের কুচকাওয়াজ তুলে বললেন, কিছুদিন আছি। ছোট মেয়ের পরীক্ষা, বড় মেয়েটাকে একবার বড় ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাব।

কী হয়েছে?

মনে হয় সেপটিক টনসিল। প্রায়ই ভোগে।

তাই নাকি? কাকে দেখাবেন ঠিক করেছেন?

নাঃ।

আমার এক বন্ধু বড় ডাক্তার, এফ আর সি এস। বলেন তো ঠিক করে দিতে পারি। এক পয়সা লাগবে না। আমার বাড়ির নীচেই চেম্বার।

মেসোমশাই সোজা হয়ে বসে বললেন, তা হলে তো খুবই ভাল হয়। আপনাকে ঈশ্বরই মনে হয় পাইয়ে দিলেন।

দু'জনে কোরাসে বললেন, ভগবানের অসীম কৃপা!

মাতামহ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ভগবান কখন কী যে করেন!

এসরাজকে ফাঁসিতে লটকাতে লটকাতে পিতা বললেন, হি ইজ দি রিয়েল কালপ্রিট।

প্রতাপ রায় বললেন, আমি আপনার কাছে কিছু আইনের পরামর্শ নিতে চাই।

অবশ্য, অবশ্য।

কলকাতায় আপনি কেস করতে পারবেন না?

কেন পারব না। তেমন জটিল কিছু হলে অবশ্যই করব। সহজ হলে জুনিয়ার দিয়ে করানোই ভাল, খরচ কম হয়।

প্রতাপ রায় বললেন, ফি ইজ নো প্রবলেম।

দ্যাট আই নো, দ্যাট আই নো!

কাল দুপুরের দিকে একবার আসব? আপনাদের দু'জনকেই একবার নিয়ে যাব। লিগ্যাল এগজামিনেশন, মেডিক্যাল চেক আপ একসঙ্গে হয়ে যাবে।

পিতা এসরাজ ঝুলিয়ে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন, মেসোমশাই ডাকলেন, হরিদা, আপনি কী বলেন?

অতি উত্তম প্রস্তাব। তা ছাড়া গাড়ি আছে, যাওয়া-আসার অসুবিধে হবে না।।

মেসোমশাই প্রতাপ রায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেন সেটল্ড?

মাতুল উঠে দাঁড়িয়ে কাছাকোঁচা ঝেড়েঝুড়ে পাট পাট করে নিলেন। সিনেমা টিনেমার কথা মনে হয় ভুলেই গেছেন। মুখে একটা অদ্ভুত প্রেমিক ভাব। কোথায়, কই রে তোরা, বলে ভেতর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

কাদের খুঁজছেন? সময় তো সব নিয়ে চলে গেছে! কাল ভুল হয়ে গেছে? দিদিকে খুঁজছেন নাকি? তিনি তো মৃত্যুপারের জগতে? একটি ছবি কেবল দেয়ালে ঝুলছে। মুকু ফোলাফোলা মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে বেশ আয়েশ করে একটি হাই তুলছিল। ছোট্ট, এতটুকু এতটুকু এক সার দাঁত। লাল একটি জিভ হাইয়ের আকর্ষণে ভেতর দিকে এলিয়ে পড়ছে। মাতুল টুস টুস করে দু'বার টুসকি বাজিয়ে নিজেই একটি বিশাল আকারের হাই তুললেন ইমন কল্যাণে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কত রকম রাগিণীতে হাই তুলতে পারিস?

চেষ্টা করে দেখিনি তো?

কনক আলু ভাজছিল। থালায় গোল গোল আলুভাজা। তেল মরছে পিটির পিটির শব্দে। টুক করে দু'খণ্ড মুখে ফেলেই হা হা করতে লাগলেন। ভীষণ গরম। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, এটা রাগিণী নয়, রাগ, রাগভৈরব।

কনক তাড়াতাড়ি বললে, ডিশে করে দোব? খাবেন আলুভাজা?

কনকের নাকটা ধরে নেড়ে দিয়ে বললেন, তোমার গান আজ আর শোনা হল না। আর একদিন হবে। এর সঙ্গে একদিন আমাদের বাড়িতে এসো না?

পাঞ্জাবির পকেটে হাত পুরে এতটুকু একটা সেন্টের শিশি বের করে কনকের হাতে দিয়ে বললেন, বিলিতি। জুনো। তোমার সৌরভ বাড়ুক।

কনক ভ্যাবাচ্যাকা। লাল একটা লঙ্কা হাতে তুলে নিয়ে, গোলাপ ফুলের মতো নাকের কাছে ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে মাতুল ফিরে চললেন। সাজাহান যেন তাজমহল দেখে গোলাপ ফুল শুঁকতে শুঁকতে খাসমহলে ফিরে চলেছেন। বারমহলে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, বুড়ো দেখেছিস?

কীরকম বুড়ো?

একেবারে থুত্থুরে বুড়ো। বিছানায় কাপড়েচোপড়ে হয়ে পড়ে আছে।

আজ্ঞে না।

জীবনের কোনও কিছু তেমন করে গায়ে মাখবি না। মাখামাখি করে, কাপড়চোপড়ে, ন্যাজেগোবরে হয়ে পড়ে থাকবি না। লাইফ ইজ এ গেম। হারজিত দুই-ই আছে। দুঃখ আছে। সুখ আছে। আমাদের দুটো পা, একটা সুখের, একটা দুঃখের। দুটো চোখ, এক চোখে হাসি, এক চোখে জল। গলা কিন্তু একটাই, কখনও ফুলের মালা, কখনও জুতোর মালা। কাঁটা আর ফুল, ফুল আর কাঁটা। গো অন মেরিলি ভাগনে। ইউ গো ইয়োর ওয়ে, আই গো মাই ওন। শিমুলের বীজ ফাটা দেখেছিস?

আজ্ঞে না।

কী দেখেছিস? কুনো ব্যাং? সরু সরু তুলোর পাখায় ভর করে ছোট ছোট বীজ উড়ে আসছে। আমাদের কর্মফল। ফুঁ দিয়ে দিয়ে উড়িয়ে দে, উড়িয়ে দে। ব্রাশ অ্যাসাইড, লাভ অ্যান্ড হেট/মি বিসাইড মি/লাফটার আফটার/হলটার, ফলটার/রাইজ টু দি অলটার/ নান টু লুক আফটার দিই॥

ভরাট গলায় ইংরেজি গান শুনিয়ে মাথায় গোটাকতক টুসকি মেরে মাতুল নেমে গেলেন নীচে। গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ হল। শব্দ মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরে। বেশ রাত হয়েছে। চারপাশ কেমন যেন সিমসিম করছে। অশরীরীরা নেমে আসছে রাতের জলসায়। মানুষের নাচঘর ঝিমিয়ে এল?

বিরাট কার্পেটে মাতামহ মাথা নিচু করে মাঝখানে একা বসে আছেন। মাথা মৃদু মৃদু দুলছে। ঠোঁটে সেই বাঁকা হাসি। যে-হাসির অর্থ দেখেছি অনেক, দেখছি অনেক, দেখব অনেক। পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।

খুব মৃদু স্বরে বললেন, তোমার সেই সারমনের খাতায় লিখে নাও, নাচালে নাচব না। হুঁশ নিয়ে মানহুঁশ হব। আরও লিখে নাও, প্রেমের ডিসেন্ট্রিতে পিতার বেলপোড়া। কিন্তু আমি এখন যাই কোথা?

মাতামহকে আর তেমন সাহস করে বলতে পারছি না, কেন? এখানেই থাকবেন? আমার নিজের আসনই টলে গেছে। কনক এসে হাঁটু গেড়ে বসল। মাতামহের মুখের দিকে নিচু হয়ে তাকিয়ে বলল, কী, খাওয়াদাওয়া হবে? রাত তো অনেক হল?

মাতামহ সেইভাবেই দুলতে দুলতে বললেন, কে কী অবস্থায় আছে?

কনককে আর উত্তর দিতে হল না। মেসোমশাই মেঘ গর্জনের গলায় ডাকলেন, কনক, তুমি এদিকে চলে এসো। কনক করুণ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে উঠে গেল। মেসোমশাইয়ের এই ডাকের অর্থ আমি বুঝি। ঘৃণা-মেশানো ডাক। মেয়েকে বলছেন চলে এসো। সন্দেহজনক চরিত্রের ছেলের কাছাকাছি থেকো না। দাগ লেগে যাবে। যৌবন বড় ছোঁয়াচে। বসন্তের টিকে হয়, যৌবন ব্যাধির যে কোনও প্রতিষেধক নেই।

মাতামহ মুখ তুলে তাকালেন। সর্ববোদ্ধার সেই হাসিটি আরও জোরদার হয়েছে। মাথা নড়ছে। কী বুঝলে, কী বুঝলে না? পাথরের মতো মুখ করে খাওয়া শেষ হল। রাত জানে না, কী হবে, কী হবে না। দিনের আলোয় বোঝা যাবে, আমি প্যাঁচা না অন্য কোনও পাখি। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ছাড়াছাড়া, টুপটাপ। গাছপালার গন্ধ ভেসে আসছে। অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, দূর কোণে আমি দাঁড়িয়ে আছি, নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছি। মাটি তোলার শব্দ হচ্ছে ঝুপঝাপ। সতীমার চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। চোখদুটো যেন পেতলের।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কনক পাশে এসে দাঁড়াল ভয়ে ভয়ে। এত দুঃখেও হাসি পেল। এ যেন শ্রীরাধার অভিসার। চরিত্রহীন কেষ্ট বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে। হাতে বাঁশির বদলে ব্রাশ। তার ওপর আধ ইঞ্চি টুথপেস্ট।

বুকের কাছে ব্লাউজের ভেতর থেকে খানচারেক ডায়েরির পাতা বের করে কনক আমার বাঁ হাতে গুঁজে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। একটাও কথা বললে না। বোঝাই গেল পিতার নিষেধ। ছেলে বখে গেছে। পাশের বাড়ির আইবুড়ো মেয়েকে প্রেমপত্র লিখেছে। খলিফাদের দেশ হলে ব্যাটাকে শূলে চাপানো হত। শুধু শূল নয়, গরম শূল।

উত্তর মহল অন্ধকারে ডুবে গেছে। সংসার নিস্তব্ধ। যে-ঘরে আসর বসেছিল, সেই ঘরেই মাতামহর বিছানা পড়েছে। পদ্মাসনে খাড়া বসে আছেন। রাত বাড়ছে। এইবার বেটির সঙ্গে যত মনের কথা প্রাণের কথা হবে। মশারিতে ঢোকার সময় আমার মাথায় হাত রেখে মন্ত্র জপ করে দিয়ে বলেছেন, কোনও ভয় নেই। মেঘ আসে মেঘ কেটে যায়। সূর্য চাপা পড়ে গেছে দেখে ভেবো না যেন সূর্য আর উঠবে না। রাত আসে দিন হবে বলে।

পিতা ঘরের দরজা বন্ধ করে দ্রুত পায়চারি শুরু করলেন। মশারির ভেতর মটকা মেরে পড়ে আছি। ডায়েরির যে-পাতায় মায়া আর কনক সম্পর্কে আমার জ্ঞানগর্ভ কথা লেখা ছিল কনক বুদ্ধি করে সেই ক'খানির পাতা ছিঁড়ে রেখেছিল। নইলে কী যে হত! সেসব যা কথা, যে-কোনও পিতা পড়লেই পুত্রকে দ্বিতীয় কোনও কথা না বলে পা থেকে জুতো খুলে প্রহার। ব্যাটার ডস্টয়েভস্কি হবার শখ হয়েছে। ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট।

সবচেয়ে অপমানের মেসোমশাইয়ের ব্যবহার। আমার যেন লেপ্রসি হয়েছে। মেয়ের ছোঁয়াচ লাগলে গলে গলে অঙ্গ খসে যাবে। প্রেম কি লেপ্রসি! বয়স্ক মানুষরা বিবাহ বোঝেন, প্রেম বোঝেন না কেন? এই মাঝরাতে একবার গলা ছেড়ে ধরব নাকি? বেশ একটু খেপু-খেপু ভাব আসছে; ভাঙ ভাঙ কারার মতো।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং রতিং
বিতনুতে তণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়বিমনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্য স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিম
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতিবর্ণদ্বয়ী॥

মশারির ভিতর গ্যাঁট হয়ে বসে কীর্তনীয়া প্রেমদাস বাবাজির মতো ধরব নাকি, তুণ্ডে তাণ্ডবিনীং।

পিতা মশারির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মশারির পাশ তুলে প্রথমে টেনে নিলেন পাশবালিশ। মাথার বালিশ ধরে টানছেন, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী হল, শোবেন না?

এক্সকিউজ মি। তোমার পাশে শুতে আমার গা রি রি করছে, ভেতরটা ছি ছি করছে। দেহের খবর জানি না, তোমার মন অপবিত্র হয়ে গেছে। তুমি শুধু অপবিত্র নও, তুমি ভণ্ড। তোমার পঞ্চেন্দ্রিয় নৃত্য করছে থই

থই, তাতা থই থই।

বালিশ ধরে এক টান মারলেন। তলায় ছিল দু'সেলের ছোট্ট একটা টর্চলাইট। ঠিকরে পড়ল মেঝেতে। পিতা বললেন, যাঃ ফিনিশ।

Inside my brain a dull tom-tom begins

কোয়ারেনটাইন চলেছে। পুত্র ইনফেকশাস ডিজিজে আক্রান্ত। আমগাছে মুকুল ধরেছে। প্রেমের মুকুল। গন্ধে চারপাশ ম ম করছে। ভ্রমর উড়ছে ভ্যানভ্যান করে। কোণের ঘরে আশ্রয় মিলেছে। বড় ঘরের, পিতার বাঘথাবা পালঙ্ক থেকে বিতাড়িত। এ ঘরটা মন্দ নয়, তবে একটু একপেশে। মাঝরাতে ভয়ভয় করে। এ বাড়িতে শরীরীর চেয়ে অশরীরী বেশি। রাতবিরেতে তাদের আনাগোনার প্রমাণ মেলে নানাভাবে। ছাতে পদশব্দে, জনপ্রাণীহীন একতলার অন্ধকার সাম্রাজ্যে ফিসফিস শলাপরামর্শে। মাঝরাতে বাড়িটা আমাদের হাতের বাইরে চলে যায়। আর তখনই মনে হয় পৃথিবীতে আমি বড় একা। তখনই মনে হয় পৃথিবীর কী-ই বা জানি। পৃথিবীর বাইরেটা তো সম্পূর্ণ অজানা! ভাবতে বেশ ভাল লাগে! জ্ঞানীরা বলেন, ভেবে কী হবে, কাজ করে যাও। কীরকম কাজ! যে কাজে কর্মফল নেই। He, to whom the eternal world speaketh, is relieved of much questioning.

অনেকক্ষণ সকাল হয়েছে। আকাশ আমার মনের মতোই ঘোলাটে। ঘরের বাইরে একবার বেরিয়েছিলুম। হাওয়া তেমন সুবিধের মনে হল না। কনক আড়চোখে তাকিয়ে সরে গেল। মুকু তো তেমন কথাই বলে না। মুখ খুললে বিদ্যে লিক করে বেরিয়ে যেতে পারে। মেসোমশাই ব্রাশ ছেড়ে নিম দাঁতন ধরেছেন। বারান্দায় মুখ ঝুলিয়ে চিবোচ্ছিলেন, আর থুথু করে নীচের বাগানে ছিটোচ্ছিলেন। পিতা অসম্ভব রকমের গম্ভীর মুখে হাতে একটা হাতুড়ি নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিলেন। বেশ কঠিন কোনও কাজ শুরু করার মতলব। আমি জানি, আগেও দেখেছি, মন তখন তোলপাড় করে তখন বিচিত্র কোনও কাজ নিয়ে ভীষণ মেতে ওঠেন। একে বলে, কাজের বাঁধন দিয়ে মন-তুরঙ্গকে বশে রাখা।

এক কাপ চা জুটেছে। অন্য কোনও কাজের ফরমাশ এদিকে আসছে না। অন্যদিন এতক্ষণে হরেক রকম কর্তব্যকর্ম ঘাড়ে চেপে বসত। আজ একেবারে স্বামী মুক্তানন্দ হয়ে চৌকিতে পা তুলে বসে থাকার সুযোগ মিলে গেছে। জানি না, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে। মন বলছে, খেলা বেশ ভালই জমবে। কেমন উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে এসে গেল। নাও এখন ম্যাও সামলাও। সুখেনের সঙ্গে একবার দেখা হোক, ব্যাটার পিন্ডি চটকাব।

মাতামহ ভোর না-হতেই চলে গেছেন। যাবার সময় বলে গেছেন, তেমন ঝামেলা দেখলে চলে আসিস। আমার খুপরিতে দু'জনে মজা করে থাকব। একটা খাবার যা আবিষ্কার করেছি! একেবারে পাহাড়িবাবার ফর্মুলা। একদিন খেলে তিনদিন আর হাঁ করতে হবে না। লাউ সেদ্ধ করে, গুড় আর একটু গাওয়া ঘি দিয়ে চটকে, এক ড্যালা মেরে দাও। কে কার পরোয়া করে না-বলে বললেন, কে কার পরোটা ভাজে! পেট নিয়েই তো মানুষ নাকাল। পেটটাকে ম্যাকাডামাইজ করতে পারলে কার দাসত্ব! হু কেয়ারস হুম। তোমার চোখ তুমি

রাঙিয়েই রাখো, আমি শিস দিয়ে যাই ডালে বসে। পাখি হয়ে ডাক দিতে থাকি পরমপিতাকে। মনে হচ্ছে একেবারে একা লড়তে হবে না। পক্ষে মাতামহ আর মাতুলকে পাব।

হাতুড়ির শব্দ হচ্ছে। কিছু একটা ভাঙা হচ্ছে। তুলো ধোনার যন্ত্র পড়ে রইল তুলোর অভাবে, তাই কি পিতা দেয়াল ভাঙার দিকে চলে গেলেন সব ছেড়ে। ভাঙার মতো দেয়াল এ বাড়িতে অনেক। আমার ওপর রেগে গিয়ে বাড়িটাকে অংশে অংশে ভেঙে মাঠময়দান করে তাঁবুর ব্যবস্থা হবে নাকি? বলা যায় না, কোন পরিকল্পনায় কী কাজ শুরু হল! কার ক্রোধ কখন কীভাবে কীসের ওপর যে গিয়ে পড়বে! আমাদের বিখ্যাত মেনিদা একবার মেয়ের ওপর রেগে হাঁটাপথে হরিদ্বার চলে গিয়েছিলেন। মাসখানেক বেপাত্তা। ফিরে এলেন ন্যাড়া হয়ে। গয়ায় নিজের নামে নিজেই পিণ্ড উৎসর্গ করে। বললেন, আমি আর বেঁচে নেই, আমাকে কারুর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। যার যা খুশি করে যাও। পাড়ায় পেছনে লাগার মানুষের তো অভাব নেই। তাঁরা সস্ত্রীক মেনিদাকে রাস্তায় দেখলেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, দাদা ইনি কি আপনার বিধবা স্ত্রী! বিয়েটা কি বিদ্যাসাগর মশাই দিয়ে গিয়েছিলেন?

মেসোমশাইয়ের গলা ভেসে এল, হরিদা, আজ বেরোবেন না? ছুটি নাকি?

না, ছুটি হবে কেন?

তা হলে সাতসকালে বাথরুমের দেয়াল ভাঙতে বসলেন?

কাজটা অনেকদিন পড়ে আছে। করব করব করে করা হচ্ছে না। খানিকটা এগিয়ে রাখি। রবিবার এসে গেল।

কী করতে চাইছেন?

পুরনো প্লাস্টার ঝরিয়ে ফেলব। শিলে গুঁড়ো করে অ্যাগ্রিগেট বের করব।

সে আবার কী?

আপনারা যাকে বালি বলেন, কনস্ট্রাকশনের ভাষায় তার নাম অ্যাগ্রিগেট।

সেকী মশাই! পুরনো প্লাস্টার গুঁড়ো করে আবার প্লাস্টার করবেন? ধরবে? ঝরে পড়ে যাবে। আমার লাইফে শুনিনি। পণ্ডশ্রম হবে।

ওর বাপ ধরবে। ধরাতে জানলেই ধরবে।

কিছু বালি কিনলেই তো হয়।

সে তো সবাই করে। তাতে আর নতুনত্ব কী আছে! সবসময় নতুন কিছুর অন্বেষণ করুন। সামথিং নিউ। সামথিং নিউ।

ঠাঁই, ঠাস, ধাঁই, ধাস। হাতুড়ির শব্দ উঠল। ঝড়াস ঝড়াস প্লাস্টার খসছে। বাথরুমের বারোটা বেজে গেল। আর তো একপাশে বসে থাকা যায় না। এসব অদ্ভুত কাজের একমাত্র দোসর আমি। এগোতেই হয়। এগিয়ে গিয়ে বলতে হয়, কী করতে হবে বলুন?

দরজার কাছে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে বললুম, কোনও সাহায্যে লাগতে পারি?

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, ও, নো নো। গো, অ্যান্ড রাইট ইয়োর লেটার্স। লাভ লেটার্স। সংসারে যুবতীর অভাব নেই। যুবকের কর্তব্য করে যাও। বোতল বোতল কালি আছে। দিস্তে দিস্তে কাগজ আছে। কোকিলের

ডাকে সাড়া দাও। কাননে বসন্ত এসেছে, বসন্ত।

ধাঁই ধাস, ঠাঁই ঠাস। হাতুড়ির শব্দ শুরু হল। আবার কোণের ঘরে প্রত্যাবর্তন। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেলে, নিকট দূর হয়ে গেলে বড় দুঃখ হয়। বেশ জোরে মনের মতো কয়েক চরণ কবিতা আবৃত্তি করলে কী হয়। বেশ জুতসই কয়েক লাইন:

Among the windings
        of the violins
And the ariettes
of cracked comets
Inside my brain a
        dull tom-tom begins
Absurdly hammering
        a prelude of its own
Capricious monotone
That is at least one
        definite false note.

রাস্তায় হইহই উঠেছে। ভাল্লুক টাল্লুক বেরোলে এরকম হতে পারে। সাতসকালে ভাল্লুক আসবে কোথা থেকে। চিৎকার, চেঁচামেচি। বারান্দার দিকে কনক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে সরে গেল। বয়েই গেল। তুমি আজ আছ কাল নেই। তোমার ভালবাসা, ঘৃণা কোনও কিছুরই পরোয়া করি না।

রাস্তায় প্রবল উত্তেজনা। সবাই একমুখো দৌড়োচ্ছে আর বলছে, ধরেচে, ধরেছে। কী ধরেছে রে বাবা! চোর না ডাকাত! বারান্দায় আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীনু ডাকলে, শিগগির নেমে আয়।

নীচে নামতেই ষাঁড়ের গলায় চিৎকার করে উঠল, শালা চিকের আড়াল থেকে বেনারসি বাইজিদের মতো মুখ বের করে রাস্তা দেখছিস, এদিকে কী হয়েছে জানিস?

আস্তে বল, আস্তে। কী হয়েছে?

আস্তে! শালা, সুখেনকে ধরে ধোলাই দিচ্ছে।

কী করেছিল?

জবাকে নিয়ে মাসির বাড়ি লুকিয়ে বসে ছিল। সকালে দুর্গাপুর পালাবে বলে যেই বেরিয়েছে, ক্যাচ, কট, কট।

তা আমরা কী করব? আমাদের কী করার আছে?

তার মানে? প্রেমের যূপকাষ্ঠে একটা ছেলেকে বলি দেওয়া হচ্ছে, একজন রিয়েল প্রেমিক, আমাদের কিছু করার নেই! দুনিয়ার প্রেমিক এক হও। আমরা শুধু প্রেমের কথা বলি। ও করে দেখিয়ে দিলে। আমরা থিয়োরিটিক্যাল, ও প্র্যাকটিক্যাল। কাল কালীঘাটে গিয়ে জবাকে বিয়ে করে এসেছে। কপালে পাঁঠার রক্তের

মতো এখনও এতটা সিঁদুর লেগে আছে। সেই প্রেমিককে পাঁঠাবলি দেবে, আর আমরা প্রেমের সাপোর্টার হয়ে চুপ করে বসে থাকব! চলবে না, চলবে না।

ভাগ্য ভাল, ওপরে হাতুড়ি চলছে, নয়তো দীনুর এই গলা ওপরের কানে গিয়ে আর এক নতুন ঝামেলা তৈরি করত। দীনু তো জানে না সুখেনের কলকাঠি কে নেড়েছিল। সুখেনের আগেই তো আমি বলি হয়ে গেছি। দীনুপাঁঠা সে খবর রাখে! সারাজীবন চেঁচিয়েই মোলো।

আমি গেলে আর এক কাণ্ড হবে।

তুই ভীষণ স্বার্থপর। তোদের ফ্যামিলিটাই স্বার্থপরের ফ্যামিলি।

হ্যাঁ রে, তাই তো বলবি। জানিস আমার কী হয়েছে?

দীনুকে অল্প কথায় ঘটনার আভাস দিতেই দীনু লাফিয়ে উঠল, শালা, কামাল করে দিয়েছিস। সাধে বলে, পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোর্ড। এক কলমের খোঁচায় টসকে দিয়েছিস। কী লিখেছিলিস মাইরি। জবা তো তা হলে তোরই বউ রে। মেয়েটা মাইরি...।

দীনু একটা চোখ অ্যায়সা বোজাল, মনে হল সারাজীবনের মতো দেড়চোখো হয়ে গেছে। দীনু চোখ খুলে বললে, এ অপমান, আমাদের সকলের অপমান। কেমন করে পকেটে পুরি, একটা কিছু তো করতেই হয়।

কী করতে চায় ওরা সুখেনকে নিয়ে?

আরে জবার সেই কাকাটা, জানিস তো কী জিনিস! সেই মাল, আর সুখেনের দাদা, দুটো পয়মালে মিলে প্রথমে সুখেনের মাথার অর্ধেকটা কামাবে, তারপর এক গালে চুন আর এক গালে কালি মাখাবে, মাখিয়ে ইজের পরিয়ে পেছনে ক্যানেস্তারা পেটাতে পেটাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাবে। আর হ্যাঁ, একগাদা ছেঁড়া জুতো জোগাড় করেছে। মালা করে গলায় ঝোলাবে। দেশে ব্যর্থ প্রেমিকের তো অভাব নেই। প্রেমে সাকসেস দেখলে জ্বলে পুড়ে মরে। সেই মালেরা জুটেছে। তারাই মদত দিচ্ছে।

কী করা যায় বল তো? রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।

আর একটা সিক্রেট খবর আছে। সুখেনের দাদা। মালকে চিনিস?

দেখেছি, তবে তুই কোন চেনার কথা বলছিস কে জানে!

দীনু আবার দেড়চোখো হয়ে বললে, মেয়েছেলে আছে।

তার মানে? মেয়েছেলে তো থাকবেই। বিয়ে তো লোকে মেয়েছেলেকেই করে।

তোর মাথা। এ মেয়েছেলে সে মেয়েছেলে নয়। যে-মেয়েছেলে বাজারে থাকে। বুঝলে চাদু। যারা নিজেরা পাপ করে তারাই সবচেয়ে বড় মর‍্যাল গার্জেন হবার চেষ্টা করে। সব গেল সব গেল বলে তারাই সবচেয়ে বেশি চেল্লামিল্লি করে। আমার কী মনে হয় জানিস, ব্যাটা জবাকে হাতাবার তালে আছে।

কী করে?

খুব সোজা। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে বসবে। ইতিহাস পড়ে দেখ, প্রেমিকরা চিরকাল ফ্যা ফ্যা করে বেড়ায়। কিন্তু লম্পটদের কখনও মেয়ের অভাব হয় না। মেয়েরা মাইরি লম্পটদেরই ভালবাসে।

তুই বড় শালা আর মাইরি বলিস। ভদ্রসমাজে মিশবি কী করে?

রাখ তোর ভদ্রসমাজ! ওই তো ভদ্রসমাজের ব্যাপার। সুখেনের চে খারাপ ছেলের সঙ্গে জবার বিয়ে দেবে সেও ভি আচ্ছা, তবু একটা ছেলে যেচে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে গাধার পিঠে চড়াবে। এই তোর ভদ্রসমাজ। এর চেয়ে বিলাসপুরের আদিবাসীরা ঢের ভাল। সুখেনটাকে কী করে তা হলে বাঁচানো যায়?

ব্যাটা পালাল যখন আরও দূরে পালাতে পারল না?

মনে হয় ঝড়বৃষ্টির জন্যে আটকে গিয়েছিল।

আমাদের দলে কাকে কাকে পাবি?

বুঝতে পারছি না। সুখেনেরও তো রাইভ্যাল ছিল অনেক। জবার পেছনে ক'টা ঘুরছিল কে জানে? তবে শিবুদাকে আমাদের দলে পাবই।

কী করে বুঝলি?

এ পাড়ায় শিবুদাই একমাত্র সাকসেসফুল প্রেমিক। থিয়েটারের মেয়েকে বিয়ে করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এলেবেলে বিয়ে নয়, একটা ফলও হয়েছে। তা ছাড়া লড়িয়ে মানুষ। একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই সব শালা ঠান্ডা।

আবার শালা?

শালাদের শালা বলব না তো কি ভগিনীপতি বলব! তুই শালা আচ্ছা এক নীতিবাগীশ হয়েছিস। এরপর বলবি, গোরু গলিতে বাথরুম করে গেছে।

ওপরে হুড়মুড় করে একটা শব্দ হল। মেসোমশাই আর কনক দু'জনেরই গলা একসঙ্গে পাওয়া গেল, কী হল, কী হল?

দীনু বললে, তোদের কিছু একটা ড্যামেজ হয়ে গেল। ভূত ছেড়ে যাবার সময় এইরকম শব্দ হয়।

মেসোমশাই বলছেন, লেগেছে আপনার? খুব লেগেছে! কেন যে সাতসকালে ওটার পেছনে লাগতে গেলেন। বেশ তো ছিল।

দীনু বললে, তোদের বোধহয় ছাদ ভেঙে পড়ল।

দাঁড়া আমি দেখে আসি।

হাতুড়িহীন পিতা কুঠারহীন পরশুরামের মতো উত্তরের বারান্দায় ছোট একটা মাড়ায় ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। চুন আর বালির প্রলেপ ভেদ করে কুঁচফলের মতো অনবরতই নতুন নতুন রক্তের দানা ফুটে ফুটে বেরোচ্ছে। মুখে যন্ত্রণার কোনও রেখা নেই। টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয় দেখার মতো পায়ে রক্ত ফুটে ওঠার শোভা দেখছেন।

মেসোমশাই উদ্বেগ-মাখানো গলায় বলছেন, কিছু তো একটা করতে হয় হরিদা। বালিতে চুনেতে রক্তে মাখামাখি।

হ্যাঁ, কিছু তো একটা করবই। তবে যতটা বেরোবার, আগে বেরিয়ে যাক। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। এরকম দুর্ঘটনা আমার প্রায়ই হয়। একে বলে প্রোফেশনাল হ্যাজার্ড।

দীনু আমার পেছন পেছন ওপরে উঠে এসেছে। একমাথা কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুল। ফরসা টকটকে রং। বুক-খোলা টি শার্ট। এতখানি চওড়া বুক। এ পাড়ার সবচেয়ে শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। কিছুকাল পিতার কাছে অঙ্ক বুঝে নিতে আসত। লেটারফেটার নিয়ে পাশ করেছে। এখন সি এ পড়ছে। পাশ করেই নিজেদের ফার্মে বসে পড়বে।

দীনু পায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, পিন্টু, শিগগির গরম জল আর বোরিক তুলে নিয়ে আয়।

পিতা হাসিহাসি মুখে বললেন, আরে, দীনু যে, কেমন আছ?

আমি তো ভাল আছি কাকাবাবু, আপনি এ কী কাণ্ড করেছেন?

তোমার বাবা কেমন আছেন?

চিঠি দিয়েছেন। ভালই আছেন।

তিনি এখন কোথায়?

লন্ডনে।

আই সি।

আমি ডক্টর সেনকে ডেকে আনি।

প্রয়োজন হবে না। মাইনর ব্যাপার। লেট মি ব্লিড। সবকিছুরই একটা শেষ আছে। অত বড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও একসময় শেষ হয়েছিল।

তা হয়েছিল, কিন্তু আহতদের এখনও ফেলে রাখা হয়নি। পিন্টু, তুই ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি ড্রেসিংটা করে রাখি।

তুই পারবি?

পারব না মানে? রেডক্রসের ট্রেনিং নিয়ে রেখেছি কী জন্যে! তুই ডাক্তারবাবুকে একেবারে ধরে নিয়ে আয়। বলবি এ টি এস নিয়ে আসতে।

পিতা বললেন, ডাক্তার, এ টি এস কিছুই লাগবে না। এমন একটা মারাত্মক কিছু হয়নি। সামান্য একটু বর্‌ইজ, একটু ব্লিডিং।

এখন আপনি আমাদের হাতে। আমাদের মতে চলতে হবে। পিন্টু তুই চলে যা।

সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে শুনলাম দীনু কনককে বলছে, দিদি, গরম জল বসিয়েছেন?

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, পাড়া আজ বিশেষভাবে জেগে উঠেছে। পাড়ায় সাড়া পড়ে গেছে। মোহনদার সেলুনের সামনে বিশাল ভিড়। সুখেনের মাথা কামানো হচ্ছে। সমাজের চোখ লাল হয়েছে, পেট গরম হয়েছে। কোথা থেকে একদল দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ নীতির হাতিয়ার নিয়ে নিরস্ত্র একটি ছেলেকে চেপে ধরেছে। বাধা দেবার কেউ নেই। সুখেন কী এমন অন্যায় করেছে! এমনি সব নাকে কেঁদে অস্থির, মেয়ে বড় হয়েছে, পাত্র জুটছে না, জুটলেও কাঁড়ি টাকা চাইছে, আর পাত্র যখন নিজে যেচে এসে মাথা মুড়োতে চাইছে, তখন সব বেঁকে বসছেন। মানুষ এক আজব চিজ।

দু’-চারজন রুগি বসে আছেন চেম্বারে। ডাক্তারবাবু এক অল্পবয়সি মহিলার বুকে স্টেথিস্কোপ চেপে ধরে বলছেন, জোরে জোরে নিশ্বাস নাও, আরও জোরে, হাঁ করে। হাঁ করে নিয়ে ভস করে ছাড়ো। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে এক তিরিক্ষি চেহারার ভদ্রলোক ক্রমাগত বলে চলেছেন, ছ’টা ক্যাপসুল পড়ে গেল ডাক্তারবাবু, এখনও ভসভসে ভাবটা যে গেল না।

ডাক্তারবাবু নির্বিকার। বুক থেকে পিঠে চলে গেছেন। মহিলা হাপরের মতো ভসভস করে চলেছেন। পিঠ পরীক্ষা করতে করতেই চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। মুচকি হাসি খেলে গেল মুখে। স্টেথিস্কোপ তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, কী সংবাদ বিদুর?

তিরিক্ষি ভদ্রলোক মরিয়া হয়ে বললেন, ভসভসে ডাক্তারবাবু।

আরে দুর মশাই। আপনার ভসভসের নিকুচি করেছে। রোজ মাংসর স্টু খাওয়াচ্ছেন?

আপনি তো বলেই খালাস। অত পয়সা কোথায়?

তা হলে ভসভসেই হবে। কারও বাবার ক্ষমতা নেই জিয়ার্ডিয়ার রুগিকে হাই প্রোটিন ছাড়া ভাল করে।

ভদ্রলোক বললেন, ডাক্তারবাবুদের এই এক দোষ, বড়লোক, গরিবকে আলাদা করতে পারেন না। সব যেন সমান। মুড়িমিছরির এক দর।

বড়লোকের অসুখ বাধিয়ে গরিব গরিব করে চেল্লালে আমি কী করব? ভগবানের দরবারে নালিশ পেশ করুন। ওই হলদে ট্যাবলেট তিরিশটা খাওয়ান। শাকপাতা একদম চলবে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কী খবর?

একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবু। বাবার পায়ে প্লাস্টার ভেঙে পড়েছে।

প্লাস্টার করতে হবে?

আজ্ঞে না, কেটেকুটে গেছে। এ টি এস দিতে হবে।

তোমার বাবার চিকিৎসা করতে সাহস হয় না। আমার জ্ঞান বেরিয়ে পড়বে। উনি হলেন ডাক্তারের ডাক্তার। চলো, দেখি কী করা যায়!

কোঁত পেড়ে চেয়ার থেকে নিজেকে ঠেলে তুললেন। বয়েসের ভার, মেদের ভার। মেয়েরা মিউমিউ করে বললেন, বেরিয়ে যাচ্ছেন! আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি।

আরও একটু বসুন। সবুরে ম্যাওয়া ফলে। ওযুধের গন্ধে অসুখ অর্ধেক ভাল হয়ে যাবে।

রিকশার তিনের চার ভাগে ডাক্তারবাবু। একের চার ভাগে আমি। ঈশ্বরের কী সুন্দর ব্যালেন্স। মানুষের শরীরেও জোয়ার-ভাঁটা। এদিক ফোলে তো ওদিক চোপসায়। রিকশাঅলা টানতে পারছে না। লোড তো কম নয়। ডাক্তারবাবু নস্যি নিতে নিতে বললেন, তোমার বাবার একটা বিয়ে দাও। বেশ রণচণ্ডী-মার্কা একটা মেয়ের সঙ্গে। মা ছাড়া এ মানুষকে সামলাবে কে? এই নিয়ে ক’বার হল? এই হাত উড়ে যাচ্ছে, এই পা উড়ে যাচ্ছে। সেই বেলকাঁটাটা বেরিয়েছে?

আজ্ঞে না মনে হয়।

বুঝবে ঠ্যালা পরে। ওই কাঁটা এখন ব্লাডস্ট্রিমে ঘুরছে। সোজা যেদিন হার্টে গিয়ে ঢুকবে সেদিন ফিনিশ।

উনি বলেন, সে হজম হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, হজমা হজম। তবে বলা যায় না, ওঁর রক্ত তো সবসময় ফুটছে। কাঁটা হয়তো ভেপার হয়ে নাক দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ওদিকে মনে হয় সুখেনকে নিয়ে প্রসেশন বেরিয়ে পড়েছে। মোহনদার সেলুনের সামনে ক্যানেস্তারা বাজছে মহরমের বোলে। এসব কাজে লোকের অভাব হয় না। কারও সর্বনাশ করার চেয়ে উৎসাহের কাজ আর কী আছে!

ওদিককার জটলার দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী হচ্ছে বলো তো? আজ কি কোনও পুজোপার্বণ আছে? ছট পুজোটুজো!

আজ্ঞে না। সুখেনের মাথা ন্যাড়া করা হচ্ছে।

ও, মানসিক ছিল!

মানসিক নয়। কাল রাতে জবা বলে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে।

ও, ট্রাইব্যাল ম্যারেজ।

না, রাক্ষস বিবাহ।

খেয়ে ফেলেছে।

খাবে কেন? সুখেন আমাদের চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে। জবাকে হরণ করে নিয়ে কাল রাতে কালীঘাটে গিয়ে বিয়ে করেছিল, আজ সকালে ধরা পড়েছে। এখন মেয়ের কাকা আর ছেলের দাদা দু'জনে মিলে ধরে ন্যাড়া করে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাবে।

জবা কোন বাড়ির মেয়ে বলো তো?

ওই তো যার বাবার দু'বার বিয়ে, অনেকদিন হল নিরুদ্দেশ।

ও, বিশুবাবুর মেয়ে। আরে সে মেয়েটার তো খুব খারাপ একটা অসুখ আছে গো! ছেলেটা রামছাগল।

পায়ের ধপাস ধপাস শব্দ করে ডাক্তারবাবু সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগলেন। দীনু পাকা ডাক্তারের মতো কাজ করেছে। ওই কড়কড়ে বালি আর চুন একটু একটু করে ক্ষতস্থান থেকে ছাড়িয়েছে। পায়ের অবস্থা দেখে গা শিরশির করে ওঠে। নুনছাল গুটিয়ে পাকিয়ে গেছে। সাদা দগদগে। ঘামের মতো বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরোচ্ছে। কনক পাকা নার্সের মতো দীনু ডাক্তারের হুকুম তামিল করছে। আমি কোথায় প্রভু! এই এক্সপার্টদের জগতে আমি এক কুষ্মাণ্ড। কিছুই পারি না, কিছুই জানি না। তফাত যাও তফাত যাও বলে সবাই হড়হড় করে এগিয়ে চলেছে। দীনুতে কনকেতে যেরকম মাখামাখি, 'ব্রেড অ্যান্ড বাটার' অবস্থা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে শুভযোগে মেসোমশাইয়ের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে। কনকের বাবাও বিলেত-ফেরত, দীনুর বাবাও বিলেত-মারা মানুষ। দুই বেয়াইয়ে জমবে ভাল। মিথ্যে বলে লাভ নেই। দু'জনকে পাশাপাশি দারুণ মানিয়েছে। দীনু একটা জামাইয়ের মতো জামাই। কনক একটা বউয়ের মতো বউ। গন্ধর্ব আর কিন্নরী। চোখের সামনে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। না, আমার মনে কোনও ক্ষোভ নেই। আমি নিজে ঈশ্বরের দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি, কনকের যেন দীনুর সঙ্গেই বিয়ে হয়। আজ হোক, কাল হোক, ছ'মাস পরে হোক, যেন হয়। মেসোমশাই কাঁচা ছেলে নন। দু'মেয়ের বাপ। জামাই চেনেন।

ডাক্তারবাবু দীনুকে ভালই চেনেন। বললেন, বাঃ তুমি তো আমার কাজ অনেকটা এগিয়েই রেখেছ। সি এ না হয়ে ডাক্তার হলেই তো পারতে।

মেসোমশাই বললেন, তুমি বুঝি সি এ পড়ছ? খুব ভাল লাইন। যেমন রেসপেক্টবল তেমনই রিওয়ার্ডিং।

এই তো, এই তো মাছে টোপ গিলেছে। ঈশ্বর আমার কথা শুনেছেন। ডাক্তারবাবু পিতার পায়ের সামনে মোড়ায় বসলেন। বসে বললেন, বাঃ, এই তো বেশ জট পাকিয়েছেন। বালিতে, চুনেতে, চামড়াতে, রক্ততে একেবারে ক্যাডাভারাস কাণ্ড।

ডাক্তারি ব্যাগটা বেশ প্রাচীন হয়েছে। চামড়ায় কোঁচ ধরেছে। যৌবনের বাঁধুনি নেই। মেঝের ওপর পড়ে আছে থেসকে। নিচু হয়ে একটা সার্জিক্যাল কাঁচি বের করতে করতে ডাক্তারবাবু বললেন, হরিবাবু, আপনি হলেন আমাদের পরীক্ষা। অঙ্কে যেমন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, রুগিদের মধ্যে সেইরকম আপনি। একেবারে জটিল জলতরঙ্গ। কী কায়দায় এমন করলেন? পা দিয়ে পিলার ভাঙছিলেন, নৃসিংহ অবতারের খোঁজে?

পিতা মৃদু মৃদু হাসছেন। মুখে একটু গর্বের ভাব। হেঁ হেঁ ব্বাবা করেছি একটা কাণ্ড। আমার কী! আমি তো পা ছড়িয়ে বসে আছি। ম্যাও সামলান আপনি। কঁচি দিয়ে কুট কুট করে চামড়া কাটছেন। গা শিরশির করছে। দীনুর কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। পাশেই হেলেন কেলার। তিনিও নির্বিকার।

ক্যানেস্তারা-বাদ্য বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। ইস, সুখেন চলেছে। একগালে চুন, একগালে কালি। ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কলির কেষ্ট চলেছে হে। শ্রীরাধিকা কি সঙ্গেই আছেন?

পিতা মুখ তুলে তাকালেন। নীরব প্রশ্নে জানতে চান, কী হচ্ছে রাস্তায়। রাধা-কৃষ্ণ আবার কোথা থেকে এলেন। দীনু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আমি এক্ষুনি আসছি, বলে, তিরবেগে দৌড়ল সিড়ির দিকে।

ইঞ্জেকশনের অ্যাম্পুলে ছোট্ট করাত ঘষতে ঘষতে ডাক্তারবাবু বললেন, আজকালকার ছেলেপুলে যা হয়েছে, শান্তিতে আর সংসার করা যাবে না হরিবাবু। ছেলে থাকলেও মুশকিল, মেয়ে থাকলেও মুশকিল।

উত্তরে পিতা একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। রাস্তায় ঘুসোঘুসির শব্দ হচ্ছে। কে কাকে ধরে প্রচণ্ড পেটাচ্ছে।

সিরিঞ্জের নিডলটি হাতে ঢোকাতে ঢোকাতে ডাক্তারবাবু বললেন, দীনুকে বিশ্বাস নেই। গিয়েই মনে হয় মারামারি শুরু করেছে।

পিতা লাফিয়ে উঠলেন, অ্যাঁ, বলেন কী! দীনু মারামারি করছে।

ডাক্তারবাবু বলছেন, করেন কী, করেন কী! নিডল ভেঙে যাবে।

দীনু ধরাধ্ধড় ঘুসি চালাচ্ছে। যে-ব্যাটা নেচে নেচে টিন পেটাচ্ছিল সে টিন ফেলে দৌড় মেরেছে। সুখেনের দাদাটা একপাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জবার কাকা, সেই পালের গোদাটা হাতের আস্তিন গুটিয়ে দূর থেকে একবার করে ঘুসি তুলছে আর বলছে, হু আর ইউ? হু আর ইউ?

দীনুর শুধু হাত নয়, পা-ও চলছে সমানে। পিতার ওপর-বাহুতে এ টি এস সামান্যই ঢুকেছে। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি নিডলটা বের করে নিয়েছেন। নইলে ভেঙে ঢুকে যেত। রক্তের স্রোতে বেলকাঁটা ঘুরছে, সঙ্গে দোসর জুটত ভাঙা ছুঁচ। রাস্তার দিকে জানলায় দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় পিতা পা ঠুকছেন, আর একসময়ের কৃতী

ছাত্র দীনুকে উৎসাহ দিচ্ছেন, শাবাশ! শাবাশ! চালিয়ে যাও। মেরে ফ্ল্যাট করে দাও। সব বাড়ির জানলাতেই সারি সারি মুখ।

পিতৃদেবের একপাশে মেসোমশাই আর একপাশে ডাক্তারবাবু, হাতে ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। দুই বোন আর এক জানলায় পাশাপাশি। আমি ফাঁকেফোকরে চোখ রেখেছি। দীনুর বীরত্ব যত বাড়ছে আমার ভেতরটা তত হুহু করে জ্বলছে। শামুকের মতো বীরত্বের ডান্ডা বেয়ে দীনু ওপরে উঠছে। হিরো, সুপার হিরো, সুপ্রিম হিরো, ক্রমশই ঝান্ডা উঁচু হচ্ছে আর আমি ক্রমশই ঠান্ডা হয়ে আসছি। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছি কনকের মুখের দিকে। চোখ ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কনকের মনের দেয়ালে দীনুর বীরত্বের গজাল পেরেক এক এক ঘুসিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ঢুকছে। সাধে বলে বীরভোগ্যা বসুন্ধরা!

বৃত্তাকার একটা জায়গায় চুনকালি মাখা, আধ-মাথা কামানো, ছেঁড়া প্যান্ট পরা সুখেন আমাদের ‘ফক্স সাহেবে’র মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমধ্যে ফক্স সাহেব এখনও এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। বেঁটেখাটো মানুষ। মাথায় শোলার টুপি। পরনে ঢোলা কোটপ্যান্ট। প্যান্টের তলা ছিঁড়েখুঁড়ে ঝুলঝুলে। পায়ে গোড়ালি খয়ে যাওয়া তালিমারা বুট জুতো। মুখে চুন আর কালি। প্রেমের নয়, জীবিকার। পেছনে এক হাফপ্যান্ট পরা কিশোরের মাথায় বিশাল কাঠের সিন্দুক। সাহেব চলেছে হুপ হাপ শব্দ করতে করতে। ম্যাজিক ফ্যাজিক দেখায়। কোনওদিন দেখা হয়নি।

দীনু তাল ঠুকে বললে, আর কে আছিস চলে আয়।

পিতৃদেব বললেন, আমারও ইচ্ছে করছে গোটাকতক ঘুসি হাঁকড়ে আসি।

ডাক্তারবাবু বললেন, ব্যাপারটা কী তা জানা আছে?

অনুমান করতে পারি, এ ফর্ম অফ সোশ্যাল র‍্যাগিং।

কেন, সে খবর রাখেন? পুলিশ কেসে পড়ে যাবেন যে!

কেন?

ওই ছেলেটা কাল একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছিল। আজ ধরা পড়েছে। সেই অপরাধের উচিত শাস্তি চলেছে। এর মধ্যে দীনুর নাক গলাবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আই সি! আমাদের পাশের বাড়ির সেই মেয়েটি। বেশ, ছেলেটাকে ধরে পুলিশে দিক। দেশে আইন আছে, আদালত আছে। কতকগুলো অর্বাচীন ইডিয়েটস হাতে আইন তুলে নেবে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মতো দেখব! সে তো হতে পারে না। সভ্য মানুষ সভ্য উপায়ে বিচার করবে। আমরা জঙ্গলে বাস করছি না। আমরা একদল হনুমান নই? কিল হিম। কিল দ্যাট বাস্টার্ড।

জবার কাকা আধলা একটা ইট তুলে দীনুর দিকে এগিয়ে আসছিল। আহত পা নিয়ে পিতা দুদ্দাড় করে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছিলেন। মেসোমশাই চেপে ধরলেন, করছেন কী? আপনার সে বয়েস আছে?

পিতা রুখে দাঁড়ালেন, অন্যায়ের প্রতিবাদে বয়েস আবার কীসের বাধা?

অন্যায় বলছেন কেন? ওরা যা করছে ঠিকই করছে, এগজাম্পল ইজ বেটার দ্যান প্রিসেপ্ট।

একে এগজাম্পল বলে না। এ হল চরম অসভ্যতা। মনুষ্যত্বের অবমাননা। আই মাস্ট রেজিস্টার মাই প্রোটেস্ট উইথ এ ব্লো।

ডাক্তারবাবু বললেন, আপনার পায়ের অবস্থা খুব ভাল নয় হরিবাবু। তা ছাড়া এই উটকো ঝামেলায় আপনার মতো মানুষের জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়।

এসকেপিস্ট। ইউ আর অল এসকেপিস্ট। মধ্যবিত্তের মিন মেন্টালিটিতে ভুগছেন।

দীনু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, পালাচ্ছিস কেন শালারা? পালাচ্ছিস কেন?

পিতা বললেন, ইস, ইস, শালাটা না বললেই পারত।

উত্তেজনার ছোঁয়া কনকের মনেও লেগেছে। জানলার ধার থেকে রিলে করলে, সব ব্যাটা পালাচ্ছে। মেসোমশাই বললেন, দিজ জানলাজ, অফুল উইনডোজ, ভদ্রবাড়িতে জানলা থাকা উচিত নয়। ভেতরে যাও। তোমরা ভেতরে যাও।

ডাক্তারবাবু বললেন, চেম্বারে রুগি বসিয়ে এসেছি। বি সেনসিবল্। আমাকে আমার কাজটা সেরে নিতে দিন।

পিতা হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন ফুঁড়ে নিন।

বসুন। মাথা ঘুরে যেতে পারে।

আমার সে মাথা নয় ডাক্তার। অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই আমার তিন-তিনটে দাঁত তুলিয়েছি।

নীচে থেকে দীনু বীরের মতো হাঁক ছাড়ল, পিন্টু, নেমে আয়।

সুখেন আমাদের গলিতে এসে বসেছে। সারাশরীর থিরথির করে কাঁপছে। দু'চোখে দু'রঙের জল গড়াচ্ছে। চুন- মাখানো গালে মুক্তোর দানা, আলকাতরা- মাখানো গালে কয়লার রস। দীনু এক ধমক লাগিয়ে বললে, তুই আমাদের একবারও বললি না কেন ইডিয়েট? আমরা দলবল নিয়ে রেডি থাকতুম। এবার তুই পাড়ায় মুখ দেখাবি কী করে?

পিতৃদেব নীচে নেমে এলেন। প্রথমে ডাক্তারবাবু, সবশেষে মেসোমশাই। ডাক্তারবাবু যেন পালিয়ে বাঁচলেন। পিতা সুখেনকে ভাল করে দেখে বললেন, তুমি তো চক্রবর্তী বাড়ির ছেলে?

উত্তর দিল দীনু, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমিই তো ট্র্যাপিজের খেলা দেখাও ব্যায়াম সমিতিতে?

দীনু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার এই দুর্মতি হল কেন? দেশে কি মেয়ের অভাব!

সুখেন ধরাধরা গলায় বললে, কাকাবাবু, আমার একলার দোষ নয়। জবা বললে, কলিতেও আর একবার অহল্যা উদ্ধার হোক। দুটো মা আর একটা কাকাতে মিলে আমার জীবন শেষ করে দিলে।

এই বাজারে একটি বাঙালি মেয়েকে উদ্ধার করার চেষ্টা অহল্যা উদ্ধারের চেয়েও মহৎ কাজ। জজেও মানবে। কী বলেন বিনয়দা?

মেসোমশাই হিসেবির হাসি হাসলেন। স্বাভাবিক। মাথায় মাথায় যাঁর দুই মেয়ে তাকে এই ব্যাপারে রায় দিতে হলে অবশ্যই অনেক ভাবতে হবে। বলা যায় না, আবার কোনও রামচন্দ্র যদি এদিকে হঠাৎ পা বাড়ান, তা হলে জয় রাম না বলে ছিছি রামই বলতে হবে।

পিতা সুখেনকে বললেন, তোমার দাদা হঠাৎ ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে তো মাকে নিয়ে বাঁদর নাচ করল কেন?

সে কাকাবাবু এক নোংরা ব্যাপার। দাদাকে তো আপনি চেনেন না। অতি নোংরা মানুষ। বউদিকে তো প্রায় ত্যাগই করেছে। নিত্য কিল, চড়, ঘুসি, লাথি। বাইরে আসা যাওয়া আছে। রেস আছে। নেশা আছে। আর আছে, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়সম্পত্তি একা গ্রাস করার ইচ্ছে। জবার কাকার হাতে কালোবাজারির পয়সা। বাড়িটা তাকে বেচতে পারলে, দু'তরফেরই লাভ। এর ফুর্তি, ওর সম্পত্তি। রতনে রতন চিনেছে।

আই সি। জবার বয়েস কত? সাবালিকা?

কুড়ি-একুশ তো হবেই।

বহত আচ্ছা! তবে তো কোনও ভয়ই নেই। কী বলেন বিনয়দা?

হ্যাঁ, আইন বলে, সাবালিকা স্বেচ্ছায় তার পছন্দমতো ছেলেকে বিয়ে করতে পারে।

তা হলে, আমরা লড়ে যাই। গেট রেডি ফর এ লিগ্যাল ফাইট। দীনুর অ্যাগেনস্টে ওরা ফৌজদারি করবেই। পয়সা আছে, ছেড়ে কথা বলবে না। সুখেনকেও ফাঁসাবার চেষ্টা করবে।

মেসোমশাই হুঁ হুঁ করে হেসে বললেন, আপনি একটা লিগ্যাল এড সোসাইটি খুলুন হরিদা। যেভাবে হুড়হুড় করে কেস আসছে, আমি এখানেই পার্মানেন্টলি থেকে যাই।

কথার মধ্যে ব্যঙ্গের ছোঁয়াটুকু পিতা ধরতে পারলেন না। উত্তেজনায় মেতে আছেন। আমাকে বললেন, টারপেন্টাইনের বোতল আর একফালি ন্যাকড়া নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ, আমার বাটলারের ক্ষুরটাও নিয়ে এসো। মাথাটা পুরো চেঁচে দিই।

মেসোমশাই ওপরে উঠতে উঠতে বললেন, কখন কী নিয়ে যে মেতে ওঠেন আপনি! নিজের পা-টা আগে সামলান। নিজের ছেলেটাকে আগে মানুষ করুন।

তার মানে? পিতা ফোঁস করে উঠলেন, ও কি অমানুষ হয়ে আছে?

মানুষ বলতে যা বোঝায় তা কি হয়েছে? যদি মনে করেন হয়েছে, আমার কিছু বলার নেই।

মানুষ বলতে আপনি কী বোঝেন?

এডুকেশন। এম এ করুক। পি আর এস, পি এইচ ডি করুক। বড় ডাক্তার, কি ইঞ্জিনিয়ার হোক।। সারাদিন বাড়ি বসে আছে, ফস্টিনষ্টি করছে। বড় বড় কথা বলছে। এটা কি মানুষ হবার লক্ষণ!

বিনয়দা, মানুষ বলতে আপনি বোঝেন তোতাপাখি, আমি বুঝি মানুষ। চরিত্রে, আচারে, আচরণে, সংস্কৃতিতে, সহবতে একটা পরিপূর্ণ মানুষ ইউনিভার্সিটির দরজা গলে বেরোয় না, বেরোয় পরিবারের ফার্নেস থেকে। একদিন ইংরিজি নিয়ে ওর মুখোমুখি বসবেন নাকি? বসবেন সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়ে? ধর্ম নিয়ে একদিন একটু আলোচনা হোক না। পরীক্ষা করুন না ওর ধৈর্য, সংযম, লোভ, সহিষ্ণুতা।

ওতে জাগতিক কিছু হয় না হরিদা। ছাপ চাই, ছাপ। নামের পেছনে এত বড় একটা ন্যাজ চাই, ন্যাজ। আপনার ছেলে আপনার কাছে হিরের টুকরো হতে পারে, জগতের বিচারে কয়লা।

মেসোমশাই দুমদুম করে ওপরে উঠে গেলেন, সিনেমার ব্যারিস্টারের ভঙ্গিতে। হঠাৎ আমার বয়েস যেন বিশ বছর বেড়ে গেল। এতসব গুণের কোনও ঘনঘটাই আমার নেই। আমি মহাপুরুষ? কাপুরুষ বললে শোভা

পায়। ধৈর্য? ছুঁচে সুতো পরাবার সময়েই ধৈর্য বোঝা যায়। সহিষ্ণুতা? একটার বেশি দুটো কাজের কথায় যার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে, সে হল সহিষ্ণু? সকালে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় যে বেতো ঘোড়ার মতো আর্তনাদ করে সে হল সহিষ্ণু? আমার লজ্জা বাড়াবার জন্যে কেন এসব বললেন? মেসোমশাই ঠিকই বলেছেন আমার দ্বিভুজে এমন কোনও হাতিয়ার নেই যা দিয়ে জগতের সঙ্গে লড়তে পারি। ময়লা পইতেতে চাবি বেঁধে, হাতে শালগ্রাম নিয়ে বাড়ি বাড়ি পুরুতগিরি করে যাকে দূর ভবিষ্যতে পেট চালাতে হবে, তার জন্যে পিতার এত গর্ব মানায়। লোকে বলবে, লাভ ইজ ব্লাইন্ড। অহংকারী মানুষটি বড় অপমান করে গেলেন। ন্যাজ নেই বলে এত অসম্মান?

তারপিন দিয়ে সুখেনের মুখের আলকাতরা তোলা হল ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে। মাথা তেল চুকচুকে করে কামানো। বেশ সাধু সাধু দেখাচ্ছে। ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে। দীনু এক সেট প্যান্ট, জামা আর টুপি এনে দিয়েছে। বাথরুমে ঢুকে সুখেন চান করে নিয়েছে। রাস্তায় বেরোতে লজ্জা পাচ্ছে। মানুষের ভুলতে সময় তো লাগবেই। রাত ছাড়া এ প্যাঁচার আর রাস্তায় বেরোবার উপায় নেই। কাকে ঠোকরাবে।

সুখেন বললে, আমি আজই দুর্গাপুর চলে যাব।

দীনু বললে, মামার বাড়ি। তোর বউয়ের কী হবে?

এক রাতের বউ ভাই। তাকে আর পাব কোথায়? চিরাগ কাঁহা, রোশনি কাঁহা। তাকে বোধহয় উলঙ্গ করে ঘরে চাবি দিয়ে রেখেছে।

সেকী রে!

আরে ওটা একটা পাপের বাড়ি।

সুযোগ পেলেই তাল বুঝে পাখি দেখবি উড়ে আসবে তোর খাঁচায়। সবুরে ম্যাওয়া ফলে রাজা।

কোনও পরিখাই খুব প্রশস্ত নয় এবং কোনও দেয়ালই খুব উঁচু নয়। ভালবাসা যদি থাকে, দু'জনে এসে মিলবেই। কোনও ঝড়ই খুব ভয়ংকর নয় এবং কোনও রাত্রিই খুব অন্ধকার নয়। ভালবাসা যদি থাকে, দু'জনে পরস্পরকে দেখবেই। যেমন ভাবেই হোক জ্যোৎস্না আসবে, তারার আলো ঝরবে, যেমন ভাবেই হোক মোমবাতি, আলো বা একটি লণ্ঠন জ্বলবেই।

কার কবিতা রে? পরে আমাকে লিখে দিস তো। বাঁধিয়ে রেখে দোব। আমার জন্যেই লেখা মনে হয়।

যে-গাড্ডায় পড়েছিস, সেই গাড্ডা থেকে আগে ঠেলে ওঠ। মাথায় সেই কোঁকড়ানো চুল আবার ফিরে আসুক, তারপর আবার প্রেমের গর্তে পা দিবি। ব্যাটা ন্যাজ-কাটা শেয়াল।

প্রেম হল ফলন্ত গাছের ফুলের মতো। গাছ যতদিন না মরছে ততদিন ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফুটবেই।

এখনও তোর কাব্য আসছে রে দামড়া! নাঃ তুই রিয়েল প্রেমের ধাতুতে তৈরি। বোস, মোটরবাইকটা বের করে আনি। তোকে এ পাড়া থেকে পগার-পার করে দিয়ে আসি।

দীনু বীরদর্পে বেরিয়ে গেল। সুখেন প্রেমের ধাতুতে তৈরি হলে, দীনু বীরের ধাতুতে। সুখেন ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ইস, কী করে দিয়েছে মাইরি। সুযোগ পেলে এর বদলা একদিন আমি নেবই।

একা ভাল কাজ করা যায় সুখেন, অন্যায় কাজে দল চাই। একা তুই মঠ, মন্দির, মিশন করতে পারিস, পরনের কাপড় খুলে দান করে দিতে পারিস, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারবি না। রোজ কত অন্যায়ই

তো মানুষ করছে, কোথায় তার প্রতিকার! সৎ কাজের চেয়ে পৃথিবী জুড়ে অসৎ কাজের পরিমাণ হাজার গুণ বেশি।

যা যা, বুড়ো দের মতো ভিজেভিজে কথা আর বলিসনি তো! তুই ব্যাটা একেবারে বুড়ো হয়ে গেছিস। কাকাবাবু এখনও তোর চেয়ে ইয়ং আছেন।

দীনুর মোটরসাইকেল বাড়ির সামনে এসে থামল। এরই মধ্যে পোশাক পালটে এসেছে। ছোকরার শরীরে রাজপুত্তুরের রক্ত বইছে। তা না হলে এমন 'লেডি-কিলারের' মতো চেহারা হয়? পুলিশ কি পাড়ার লোক দীনুর টিকিও ছুঁতে পারবে না। দীনুর বাবার যা ইনফ্লুয়েন্স। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ওঠাবসা করেন। আমাদের অনেক ক্ষতি অনেকে করতে পারে। বাঁচাবার কেউ নেই।

সুখেনকে পেছনে বসিয়ে দীনু সশব্দে পাড়া কাঁপিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, ন্যাড়াকে বেলতলায় ছেড়ে দিয়ে আসি।

সুখেনের ছেঁড়া ঝুলঝুলে প্যান্ট, কালিঝুলি মাখা জামা, ফেলে যাওয়া উৎকণ্ঠার মতো গলিতে পড়ে রইল। ওই সাজ এবার তোমাকে না পরিয়ে ছাড়ে। প্রেমের কাঁঠাল কোথায় পাকছে মানিক। শীতলাতলার আটচালায়। মায়ার সঙ্গে আর বেশি মাখামাখি করতে যেয়ো না। ওখানে ভোঁদার নজর পড়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী বড় প্রবল হে।

সিঁড়ির মাথায় পিতৃদেব। প্রশ্ন করলেন, ওরা কোথায় গেল?

কিছু বলে গেল না তো।

একবার জিজ্ঞেস করলে না! তোমার কি মনে হয় চ্যাপ্টার ক্লোজড হয়ে গেল?

আজ্ঞে না। এই তো সবে শুরু।

দ্যাটস রাইট। এই তো বুদ্ধি পাকছে। কে বলে, তুমি আমার পুঁয়ে পাওয়া ছেলে? আশঙ্কা নিয়ে বাঁচতে শেখো। বিপদের ঢেউ কেটে কেটে চালাও তোমার জীবনের জাহাজ। ছেঁড়াখোড়া এগুলো কী?

সুখেনের জামাপ্যান্ট।

ফেলো না, ছাতে নিয়ে চলো।

কী করবেন?

কাকতাড়ুয়া তৈরি করব। প্রেমের কাকতাড়ুয়া। ও পাশের ছাতে, যে-পাশে গাছের টব, হতচ্ছাড়াদের বাড়ি, সেই ছাতে থাকবে কাকতাড়ুয়া। একে কী বলে জানো?

আজ্ঞে স্কেয়ার ক্রো।

তোমার মাথা। একে বলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। ওরা ঘুরবে ফিরবে আর দেখবে। ক্রমশই মেন্টালি সিক হয়ে পড়বে। ম্যাকবেথের ভোজসভায় ব্যাঙ্কোর ভূত। রাজার আসন দখল করে বসে আছে। কেউ দেখতে পাচ্ছে না, পাচ্ছে খুনি ম্যাকবেথ। চিৎকার করে বলছে, তুমি মাথা নাড়তে পারো না, তুমি কথা বলতে পারো না, তোমাকে আবার ভয় কীসের! পরমুহূর্তেই আর্তনাদ, ঈশ্বর, মর্গ থেকে যদি মৃতদেহ বেরিয়ে আসে, যাদের কবরে রেখে এসেছি তারা যদি কফিনের ডালা খুলে একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে, old mouments, shall be the maws of kites. তোমার কেমন লেগেছিল কাল?

কী লাগার কথা বলছেন?

যখন বালিশটালিশ বের করতে করতে বললুম, তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে আমার ঘেন্না করছে।

খুব খারাপ।

মনটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যায়নি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দেহ ঠিক রইল, মনটা কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল। কী ভীষণ যন্ত্রণা, তাই না? একে বলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। মানুষকে সংযত রাখার জন্যে মনের মধ্যে ভূত ঢোকাতে হয়। তা না হলে শয়তান বাড়তে বাড়তে দেবতাকে গ্রাস করে ফেলে। রান্না মনে আছে, না ক'দিনের সুখে ভুলে বসে আছ!

না, মনে আছে।

তা হলে চলে এসো ওপরে। পুরনো অভ্যাস আজ আবার ঝালাই হবে।

উত্তরের বারান্দার একপাশে কনক উদাস মুখে বাগানের গাছপালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কীসের যেন প্রত্যাশা! গ্রহান্তরের কোনও জীব এসে নামবে বাগানের কোণে। বড়ঘরে মেসোমশাই পায়চারি করছেন। পিতৃদেবের হাঁটাচলা করতে অসুবিধা হচ্ছে। সামান্য খোঁড়াতে হচ্ছে।

মেসোমশাই বললেন, হরিদা, আপনার হঠাৎ এই সিদ্ধান্তের কোনও কারণ খুঁজে পেলুম না।

কারণ দেখিয়ে কোনও কাজ করার অভ্যাস আমার কোনওকালে ছিল না, আজও নেই। আমাদের রান্না আমরাই করে নোব, যেমন করে আসছি এতকাল।

কেন, বলবেন তো!

আবার কেন? কোনও কেন নেই। সিদ্ধান্ত ইজ সিদ্ধান্ত।

তার মানে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে বলছেন।

তা তো বলিনি।

কনক কথা কাটাকাটি শুনে ঘরে এসেছে। ছলছলে চোখে বললে, আপনি কেন এত রেগে গেলেন মেসোমশাই। এই তো কালই বললেন, তোমার মতো মেয়ে পাশে থাকলে সংসারে ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিতুম।

হ্যাঁ বলেছিলুম। যে-আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা সূর্যের প্রত্যাশা করি, সে আকাশেও হঠাৎ মেঘ আসে, সূর্য ঢাকা পড়ে যায়, দিনে ছ্যাতলা ধরে। আশা আর প্রত্যাশার মাঝখানে অনিশ্চয়তার বিশাল ব্যবধান। অনেক বাধা দিতে চাইলেও দেওয়া যায় না, নিতে চাইলেও নেওয়া যায় না। সাইকোলজিক্যাল ম্যানের এই হল ট্র্যাজেডি। মনের বিশুদ্ধ নীল আকাশে অহংকারের মিশকালো মেঘ।

মেসোমশাই বললেন, আপনি ভয়ংকর ইমোশানাল। সামান্যকে অসামান্য করে তুলে নাটক করতে চান।

কী বললেন, ইমোশান! এই চেয়ারের ইমোশান নেই, ওই টেবিলের নেই, দেয়ালের নেই। ইমোশান আছে বলেই আমরা মানুষ। ইমোশানই আমাদের মোশান। আবেগই আমাদের প্রাণ। বিশাল এই রঙ্গমঞ্চে সারাজীবন আমি নাটক করে যাব।

তা হলে তাই করুন। আপনার ছেলে সম্পর্কে এমন কিছু অন্যায় বলিনি। যা দেখছি হিতৈষী হিসেবে তাই বলেছি। পুত্রস্নেহে আপনি অন্ধ হয়ে আছেন। আপনি ওর মঙ্গল চান, না অমঙ্গল চান?

আপনি যেভাবে চান, আমি সেভাবে চাই না। আমি ক্রীতদাস তৈরি করতে চাই না। আমি চাই মানুষ। পরিপূর্ণ একটি মানুষ। তর্ক করে লাভ নেই। তর্কে বিবেকানন্দ আসবেন, রবীন্দ্রনাথ আসবেন। আপনাদের শিক্ষার মূল নড়ে যাবে। চুপ করে থাকাই ভাল। কাল পর্যন্ত আপনি আমার আত্মীয় ছিলেন, আজ আপনি একজন শিক্ষাগর্বী মদগর্বী ব্যারিস্টার। অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা, অনেক উচ্চাশা। আমরা রিক্ত ফকির। আদর্শ নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টাই আমার যৎসামান্য বিলাসিতা।

কী আপনার আদর্শ? গাছ তৈরিটা আদর্শ না আগাছা গজিয়ে তোলা আদর্শ?

কনক এগিয়ে এসে বললে, আপনাদের এই কথা কাটাকাটি আমার একদম ভাল লাগছে না। বাবা, আপনি চুপ করুন না। মুকুকে পড়াতে বসুন। বই খুলে বসে আছে অনেকক্ষণ।

মেয়ের কথায় মেসোমশাই সরে গেলেন। কনক শান্ত নরম গলায় জিজ্ঞেস করলে, একটু চা খাবেন মেসোমশাই?

চা? হ্যাঁ, তা খেলে হয়। না থাক।

কনক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। চোখ ছলছল করে উঠছে। একটু ধরাধরা গলায় বললে, আপনারা বড় নিষ্ঠুর।

নিষ্ঠুর কেন? নিষ্ঠুরতার কী দেখলে?

আমরা কী সুন্দর ছিলুম, কী বিচ্ছিরি হয়ে গেলুম। বাইরে কী একটা ঝামেলা হল, আমাদের ভেতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেল।

পিতা শব্দ করে হাসলেন, জীবন মানেই ঝোড়ো হাওয়া কনক, জীবন মানেই ঝড়। করার কিছু নেই।

সকাল থেকেই সংসারের চাতালে চড়া নাটক চলেছে। হাত নড়ছে, মাথা দুলছে, চোখ ছলছল হচ্ছে। দেয়ালের দিকে মুখ করে, অদৃশ্য কোনও শ্রোতাকে পিতা বললেন,

When the wind works, against us in the dark
come out, come out
It costs no inward struggle not to go.

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শব্দ শুনে পিতা বললেন, পুলিশ এল। গেট রেডি। শোনো তোমাকে বলে যাই, জেলখানার খাবার আমার গলা দিয়ে গলবে না, তুমি আমাকে রোজ একটু দুধ আর পাউরুটি দিয়ে আসবে। পারবে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন পারব না? কিন্তু আপনাকে ছাড়িয়ে আনার কী হবে?

তোমার মাতামহের সাহায্য নিয়ো। তিনিই আমার রিয়েল ফ্রেন্ড। দু'জনেই আমরা ঘরপোড়া গোরু।

গাড়ির দরজা বন্ধ হল। এইবার জোড়া জোড়া বুটের শব্দ তুলে সিঁড়ি বেয়ে পুলিশের দল উঠে আসবে। আমাদের অপরাধটা কী? পুলিশ আসবে কেন?

সিঁড়িতে খুড়ুস খুড়ুস করে জুতোর শব্দ হচ্ছে। পুলিশ তো এমন ভদ্রভাবে আসে না। এ যেন পাঁচির ছাগল ছাড়া পেয়ে ওপরে উঠে আসছে। খোলা দরজার সামনে প্রতাপ রায়। আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে

ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, নাটকের মহড়া চলছে নাকি?

পিতা বললেন, কী ব্যাপার, তুমি?

চলে এলুম। ওই কিছু লিগ্যাল পরামর্শ, তা ছাড়া মেডিকেল চেকআপ। বিষয় বিষ! বিষয় বিষ! প্রতাপ রায়ের গলা শুনে মেসোমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। হাল-ভাঙা নাবিক যেন তীর দেখতে পেয়েছেন। কোস্ট অ্যাহয় কোস্ট অ্যাহয় বলে চিৎকার করে উঠলেন।

প্রতাপ রায় উদ্ভাসিত মুখে বললেন, কিছু আগেই এসে পড়লুম দুটো কারণে। কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ কোনটা কী লাগে জানা নেই, আমার ওখানে বসেই যদি দেখেন বড় বাধিত হই। তা ছাড়া কোনও কাজের দায়িত্ব নিলে, যতক্ষণ সেটা করতে না পারছি, ততক্ষণ ভেতরটা এত ছটফট করে, খেয়ে নেয়ে শুয়ে স্বস্তি পাই না। ওই মেডিকেল চেকআপ! আমার বন্ধু বললে, বেলাবেলি পেশেন্টকে নিয়ে আয়।

মেসোমশাই একমুখ হেসে বললেন, কর্তব্যপরায়ণ মানুষের লক্ষণ। এ এক দুর্লভ লক্ষণ। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

আপনি আমাকে তুমিই বলবেন। আমি আপনার ছেলের বয়সি। চেহারাটাই যা একটু মোটাসোটা হয়ে গেছে।

মোটাসোটাই তো ভাল। বেশ ম্যানলি। পুরুষের চেহারা ফিনফিনে হলে মানায় না। মানুষ হবে হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড ওয়াইজ।

ঘুঁঘুক ঘুঁঘুক করে হেসে প্রতাপ রায় বললেন, তা হলে চলুন।

কিন্তু বাবা খাওয়াদাওয়া যে হয়নি এখনও!

খাওয়াদাওয়া! ওটা একটা কথা হল! আপনারা যাচ্ছেন কলকাতার বিখ্যাত রায়বাড়িতে। যে-পরিবার অতিথি সৎকারে ইতিহাস তৈরি করে রেখে গেছে। যার পিতাকে জনৈক নিমন্ত্রিত, তবে রে শালা বলে, পঙ্‌ক্তি থেকে উঠে খড়ম নিয়ে তাড়া করেছিলেন।

কেন গো!

এত খাইয়েছেন যে আর হ্যাঁ করতে পারছেন না, সেই অবস্থায় জোর করে পাতে গোটাকতক একেবারে গাছপাকা ল্যাংড়া আম ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আপনি মেসোমশাই সেই বাড়িতে যাচ্ছেন।

পিতৃদেব এতক্ষণ একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি লেখাপড়া কতদূর করেছ প্রতাপ?

প্রতাপ রায় আমতা আমতা করে বললেন, স্কটিশে পড়তুম। ফোর্থ ইয়ারে বাবা মারা গেলেন। বিষয়সম্পত্তির চাপ এসে গেল। তাই ছেড়ে দিতে হল।

এমনভাবে, ‘ছেড়ে দিতে হল’, বললেন যেন খাঁচা খুলে পাখি ছাড়লেন।

পিতা বললেন, এটা তুমি আজ কী পরে এসেছ?

কেন? চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি।

মেয়েদের অন্তর্বাসে এই ধরনের কাজ দেখা যায় বটে।

তা যা বলেন।

এতে কিন্তু তো মাকে তেমন ম্যানলি ম্যানলি দেখাচ্ছে না। কীরকম যেন লোফার লোফার দেখাচ্ছে।

মেসোমশাই বললেন, রহিস আদমিরা এইরকম পাঞ্জাবিই পরেন। চমৎকার মানিয়েছে।

ওঃ, তা হবে।

পিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। মেসোমশাই বললেন, হরিদা, আমি তা হলে মেয়েদের নিয়ে একবার ঘুরে আসি। রথ দেখা, কলা বেচা দুই-ই হবে।

অ্যাজ ইউ লাইক।

কনক চাপা সুরে বললে, এঁদের খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা না করেই চলে যাব?

আমরা যখন আসিনি তখন এঁরা কী করতেন? এঁদের রেঁধে খাওয়াবার জন্যে তো আমরা আসিনি।

পিতার কথায় কনক কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। বড়দের জগৎ স্বার্থের চাকায় ঘোরে। রাধে, তুমি কি তা জানতে না!

সেজেগুজে তৈরি হয়ে, কনক পিতৃদেবের সামনে ছলছলে চোখে এসে দাঁড়াল, মেসোমশাই, কী করব বলুন, আমি তা হলে আসছি।

পিতা মাথায় হাত রেখে বললেন, হ্যাঁ মা, সেরে এসো।

মুকুকে নিয়ে মেসোমশাই এসে দাঁড়ালেন, হরিদা, ঘুরে আসছি।

হ্যাঁ, আসুন।

প্রতাপ রায় দূর থেকে হেঁকে বললেন, আমরা আসছি।

অতি ক্ষীণ গলায় পিতা বললেন, এসো।

শুনতে পেল কি পেল না, কেউ বিশেষ গ্রাহ্য করল না। গাড়ির দরজা বন্ধ হল। ইঞ্জিনের শব্দ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। বারান্দার রেলিংয়ে ভর রেখে, রোদ ঝলমলে গাছপালার দিকে তাকিয়ে পিতা বললেন, কী বুঝলে?

আজ্ঞে?

কী বুঝলে? আপনার জন সতত আপন/পর কি কখনও আপন হয়।

আপনার সেই গান!

ইয়েস। আমার সেই ইটারন্যাল মিউজিক। একলা চলো রে!

দখিনা বাতাস হু হু করে বয়ে এল। এলোপাতা খসে পড়ল গাছ থেকে। তারে কনকের নীল শাড়ি আমার অভিমানে ফুলে উঠল।

সিন্নি দেখেই এগোই
কোঁতকা দেখে পেছোই

খাঁখাঁ দুপুর। খাঁখাঁ বাড়ি। বাগানের গাছে আবার ঘুঘু ডাকছে। নির্জন দুপুরের কারিগর। মনে হয় যেন স্যাকরার হাতুড়ি পিটছে! কনক চাল, ডাল, তরিতরকারি সবই বের করেছিল। রান্নার সময় পায়নি। প্রতাপ রায় তুলে নিয়ে গেছে। বড়লোকের সাতমহলা বাড়ি। জলসাঘর, ঝাড়লণ্ঠন, দাসদাসী। আস্তাবল, ওয়েলার ঘোড়া। তেলরঙে আঁকা পূর্বপুরুষদের ছবি। কার্পেটের ওপর আলতো পায়ে কনক ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। ভেতরটা কেমন যেন করছে। একেই বলে হিংসে।

পিতৃদেবের বেশ জ্বর এসে গেছে পায়ের তাড়সে। ইজিচেয়ারে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। কোলের ওপর গণিতের বই। পাশের টেবিলে খাতা আর পেনসিল। গল্পের বই পড়তে চান না। তাতে মন নাকি এলিয়ে পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তি উপন্যাসের খোঁটা বেয়ে লতিয়ে উঠতে থাকে। মন হবে বটবৃক্ষের মতো। শিকড় নেমে যাবে বিজ্ঞানে, দর্শনে, তর্কশাস্ত্রে, চিকিৎসাবিদ্যায়। শাখাপ্রশাখায় বিশাল মহীরুহ। আসুক বাতাস, আসুক ঝড়, অচল অটল, ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ। তলায় শীতল ছায়া। পারো তো একটুখানি উদারতার বেদি বাঁধিয়ে দাও। বার্ট্রান্ড রাসেলের খুব আত্মহত্যার ইচ্ছে হত। গণিতে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছিলেন। যখনই মনে হত এইবার ঝুলে পড়ি তখনই বসে যেতেন অঙ্ক নিয়ে। গণিত থেকে চলে গেলেন দর্শনে। পিতৃদেব গণিত নিয়ে পড়েছেন, মাঝে মাঝে দর্শনের দিকে ঝুঁকেছেন, মৃত্যু সম্পর্কে অসীম কৌতুকের ভাব। কারুর মৃত্যুতে কখনও আহা আহা করতে শুনিনি। আহার নিদ্রার মতোই একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। পেয়াদা এসে খাজনা নিয়ে গেল। মেনিদার মা মারা গেলেন। বুড়ির জন্যে ছেলে ফ্যাঁসোর ফোঁসর করে অস্থির। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে এসে কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। পিতা বললেন, সদ্য-বিধবার মতো অমন হাপুস হুপুস করছেন কেন? বয়েসে মানুষ তো মরবেই! আপনার ইনটেলেক্ট তো তেমন খোলেনি। তেরাত্তির কাঁদবেন, চতুর্থ রাতেই তো হেসে হেসে জর্দাপান খাবেন! পৃথিবীতে সে মৃত্যু কোথায়, যার শোকে মানুষ সারাজীবন মুহ্যমান থাকবে! Death borders upon our birth, and our cradle stands in the grave.

জ্বর মনে হয় বেশ তেড়েই আসছে। মাঝে মাঝে আড়মোড়া ভাঙছেন। চোখ বেশ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠছে। মুখের চেহারা শুকনো শুকনো। ফর্টিফাইভ। এ পরিবারের অ্যাভারেজ পরমায়ু নাকি পঁয়তাল্লিশ। সেই বয়েস যেই পেরোবে জল ঝেড়ে বইঠা তুলে পাটাতনে তুলে রাখো। মনকে বলো, যা আছে সব চটপট তাড়াতাড়ি সেরে নাও। এখন আমার সময় হল, যাবার দুয়ার খোলো। সেপটিক ফিভার। সেরকম কিছু হবে না তো! আমার মনের অত জোর নেই। মচকাব না, একেবারে মট করে ভেঙে যাব।

শোনো!

ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

জ্বর বেশ জাঁকিয়ে আসছে। বুঝলে!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পা-টাও বেশ টাটিয়ে উঠেছে। সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।

কোনও প্রয়োজন নেই। ডোন্ট বি নার্ভাস। বোসো না, দাঁড়িয়ে কেন? হ্যাঁ, যা বলছিলুম। বয়েস বাড়ছে, বুঝেছ?

আজ্ঞে না।

অ্যাঁ সেকী, বয়েস বাড়ছে, তুমি বুঝতে পারছ না! তুমি কি ভাবো, সময় স্ট্যাটিক। তোমার মা কত বছর হল মারা গেছেন জানো? চোদ্দো বছর হয়ে গেল। লং ফোর্টিন ইয়ার্স। তখন আমার বয়েস ধরো পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে। নাউ আই অ্যাম ফিফটি। পঞ্চাশ বছর! হাফ এ সেঞ্চুরি মাই সন। পঞ্চাশটা বছর দুঃখে সুখে পার করে দিলুম। কী বলছ তুমি! অ্যান্ড লাস্ট ফোর্টিন ইয়ার্স আই অ্যাম অ্যালোন। এ লোন ফাইটার। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়নি। আই কেয়ার এ ফিগ ফর দেম। পৃথিবীকেও আমি থোড়াই কেয়ার করি। জন্মের দরজা দিয়ে স্টেজে ঢুকেছি মৃত্যুর দরজা দিয়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যাব। যতদিন শক্তি আছে ততদিন অভিনয়।

Wavering between the
    profit and the loss
In this brief transit
    Where the dreams
    cross
The dream crossed
    twilight between birth
    and dying.

না হে, বয়েস বাড়লেও স্মৃতিটা এখনও আছে। তোমার মনে পড়ে?

আজ্ঞে কী মনে পড়ে? পড়া?

না না পড়া নয়, তোমার মায়ের কথা?

খুব অল্প। অস্পষ্ট। একটা-দুটো ঘটনা।

তুমি ‘লাকি’। ভেরি, ভেরি ‘লাকি’।

আজ্ঞে মায়ের মৃত্যু তো ছেলের পক্ষে দুর্ভাগ্যের ঘটনা। আপনি আমাকে ‘লাকি’ বলছেন?

অফকোর্স। যে-বয়েসে তোমার মা মারা গেছেন, সে বয়েসে তোমার স্মৃতি তৈরি হয়নি, অজ্ঞান শিশু। কিন্তু আমি! আমার কথাটা একবার ভাবো। হাজার হাজার টুকরো টুকরো স্মৃতি বহুবর্ণ পাথরের মতো মজা নদীর বুকে বিছিয়ে পড়ে আছে। দিন নেই, রাত নেই, আমি একবার এটা তুলি তো ওটা ফেলি, ওটা ফেলি

তো এটা তুলি। নো, আই শুড নট বি উইক, আই শুড নট বি এ সেন্টিমেন্টাল ফুল The dream crossed twilight between birth and dying.

আপনার জ্বর খুব বেড়েছে। বিছানা করে দিই শুয়ে পড়ুন একটু।

ছেলেমানুষ! আমি একশো তিন জ্বরে অফিস করেছি। জ্বর একটা বার্নিং প্রসেস। ভেতরের সমস্ত বিষ পুড়িয়ে দিচ্ছে। অত সহজে শুয়ে পড়লে চলে।

The hurt is not enough:
I long for weight
    and strength
To feel the earth
    as rough
To all my length.

তুমি ভাবছ আমি জ্বরের ঘোরে ভুল বকছি! তা হলে এসো, চেয়ারটা আমার কাছে নিয়ে এসো, বসে বসে দেখো আমি স্টেপ বাই স্টেপ কী কঠিন একটা অঙ্ক করছি।

না না, আমি ভুল বকার কথা বলিনি।

দেন ইট ইজ অলরাইট। তা হলে জেনে রাখো, শরীরকে কখনও বেশি প্রশ্রয় দেবে না। শরীর হল কুকুর। নাই দিয়েছ কী মাথায় উঠে বসবে। সবসময় পায়ের তলায় রাখবে। বেচাল দেখলেই লাথি। এ টাইমলি কিক। একটু চা করতে পারবে?

কেন পারব না?

ক'টা বাজল?

তিনটে-সাড়ে তিনটে হবে।

তা হলে চারটে নাগাদ বসিয়ো। কেন জানি না, আজ সব পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। জানবে, অতীত যখন মনে এসে ভিড় করে, তখন বুঝতে হবে বয়েস বাড়ছে। দেয়ালে ওই বড় আয়নাটা দেখেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব সুন্দর। বেলজিয়ান গ্লাস।

শুধু সুন্দর নয়। ওটা তোমার মায়ের। ওই কাচে তোমার মায়ের মুখ লেগে আছে। আমরা দুজনেই প্রায় মাথায় মাথায় ছিলুম। সেম হাইট। আচ্ছা, তুমি তোমার মায়ের মুখটা পেলে, স্বভাবও পেলে, রংটা কেন পেলে না বলো তো!

আজ্ঞে, তা তো জানি না।

আমি জানি। আমি তোমার রং কালচে করে দিয়েছি। শুধু মা সুন্দরী হলে হয় না, পিতাকেও সুন্দর হতে হবে। আগেকার দিনের জমিদারদের সন্তান কন্দর্পকান্তি কেন হত জানো? অনেক খুঁজে খুঁজে, দেখে দেখে সেরা সুন্দরীদের সঙ্গে ছেলেদের বিয়ে দিতেন। বংশ দেখতেন। ফুটফুটে ছেলে, ফুটফুটে মেয়ে হত। নিষ্ঠা চাই।

বুঝলে? হিউম্যান ব্রিডিংও একটা আর্ট। গ্রিক আর রোমানদের দিকে তাকিয়ে দেখো। ইজিপশিয়ানদের কথা ভাবো। ক্লিওপেট্রার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে? তবে কেন অত ছটফট করো!

আজ্ঞে করি না তো।

না কখনও করবে না। কোনও টিয়া কি কাককে বিয়ে করে! বউ কথা কও কি হাঁড়িচাচার জন্যে পাগল হয়? ময়ূর কি বকের পেছনে দৌড়োয়? ঘুঘু কি গোলাপায়রাকে লাভ লেটার্স লেখে?

আজ্ঞে না।

মেনটেন ইয়োর ব্রিড। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া উচিত হয়নি। শি ওয়াজ এ প্যারাগন অফ বিউটি। আর আমি! এ লিটল বিট অফ এ সিমপ্যাঞ্জি। আমার সবকিছু কোর্স। স্কিন, হেয়ার, কমপ্লেকশন।

আজ্ঞে না, ইউ আর সো ম্যাসকুলাইন।

ও, ডোন্ট ফ্ল্যাটার মি। ম্যাসকুলাইন! দ্যাট ইজ মাই সাধনা। যৌবনে পিটে পিটে শরীরটাকে তৈরি করেছিলুম। তোমার মায়ের সঙ্গে কোনও সুন্দর পুরুষের বিয়ে হলে, তুমি কত সুন্দর হতে পারতে! তুমি আমার দিকে অ্যাকিউজিং ফিঙ্গার তুলে বলতে পারো, কেন আপনি আমার সর্বনাশ করলেন, কেন আপনি আমাকে পৃথিবীতে আনলেন, আমি কন্দর্প হয়ে আসতে পারতুম!

আজ্ঞে, আমি তা কখনও বলব না।

তোমার বলা উচিত। তুমি বলতে পারো। আই ওন্ট মাইন্ড। আই হ্যাভ ডেস্ট্রয়েড এ পসিবিলিটি। একটা ভাল পুট কাঁচা হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। তোমার জীবনী অন্যভাবে লেখা হতে পারত!

আমি ভাগ্যকে বিশ্বাস করি।

হ্যাঁ করবেই তো! তুমি যে দুর্বল। তাইমুর কি চেঙ্গিজ ভাগ্যকে বিশ্বাস করতেন না। নেলসন কি নেপোলিয়ান ভাগ্যকে বিশ্বাস করতেন না। তোমার রক্তে হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল রেড ব্লাড সেলের চেয়ে অনেক বেশি। তুমি অ্যানিমিক। ভাল করে খাওয়াদাওয়া করো, ভাগ্য পালাবে। জীবন সম্পর্কে একটা পজিটিভ অ্যাটিচিউড আসবে। নির্জীব থেকে সজীব হয়ে উঠবে। ক্লীব থেকে জীব। তোমার রক্তে কিছু লোহার প্রয়োজন। ইউ নিড সাম মিনারেলস।

যাই, এইবার চা করে আনি।

হ্যাঁ, যাও, নাও ইট ইজ টাইম ফর টি।

উত্তর মহল আজ অসম্ভব ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। নির্জন দেয়ালে মাঝে মাঝে টিকটিকি টকাস টকাস শব্দ করে দরজা খোলাতে চাইছে। লম্বা লম্বা শাড়ি ঝুলছে। শুকিয়ে গেছে। হাওয়া দিলেই প্রাণ পেয়ে নড়াচড়া করছে। ছাতে ওঠার সিঁড়ির একপাশে কনকের, মুকুর ছাড়া জামাকাপড় তালগোল পাকানো পড়ে আছে। দু'জোড়া হাইহিল জুতো সিঁড়ি ভাঙার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে আছে। ওয়ান, টু, থ্রি বললেই টকাস টকাস করে এগোতে থাকবে। রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে এক টুকরো কাগজ রোল করা। কীসের ক্যাশমেমো? কনকের হাতের

লেখা, 'পিন্টু, তুমি কিছু মনে কোরো না। বাবার ভয়ে দূরে দূরে থাকছি। মেয়েদের একটু অভিনয় করে চলতে হয়, নইলে তলিয়ে যেতে হয়। মেয়ে হলে বুঝতে।' কখন লিখল! মনে আবার ভাঙন ধরাতে চাইছে।

চা নিয়ে এসে দেখলুম, পিতা জ্বরে হাঁসফাস করছেন। দেয়াল আয়নার দিকে দৃষ্টি স্থির। দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। হাত বাড়িয়ে চা নিলেন।

কী, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার?

শরীরে নয়, মনে। জীবনে ছোটখাটো দু'-একটা ভুল করে ফেলেছি। My thoughtless youth was winged with vain desirers/My manhood, long misled by wandering fires. আর তো শৈশবে ফিরে যাওয়া যাবে না, আর তো যৌবনে ফিরে আসবে না। Where is the Life we have lost in living?/where is the wisdom we have lost in Knowledge!/where is the knowledge we have lost in information?

চায়ে চুমুক দিলেন। যা কোনওদিন হয় না, আজ হাত কাঁপছে। চোখ আরও রক্তবর্ণ। উচ্চ চাপ মনে হয় বেড়েছে। এত আবেগই বা কোথায় ছিল? বাঁধভাঙা নদীর প্রবল স্রোতধারায় বেরিয়ে আসছে।

ওই যে আয়নাটা দেখছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওই আয়নায় আমার যৌবন ধরা আছে, তোমার কৈশোর আছে, তোমার মায়ের ছায়া আছে। তা হলে শোনো একদিনের কথা বলি। তাড়া আছে?

আজ্ঞে না।

তা হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মতো পা ঠুকছ কেন? বোসো। তোমার বয়েস তখন তিন কি চার। ভীষণ জ্বর। তিন কি চার। উঠছে নামছে। সকালে এক পুরিয়া ওষুধ দিয়ে ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে অফিসে গেলুম। কাজে মন বসছে না। ছটফট করছি। ল্যাবরেটরিতে অ্যানালিসিসে একটা স্যাম্পল চড়িয়েছি। অন্যমনস্ক, ইথারের বোতলে আগুন ধরে গেল। পুড়তে পুড়তে বেঁচে গেলুম। আমার অ্যাসিস্টেন্ট অন্নদা বললে, আজ আপনার কী হয়েছে বলুন তো? আমি বললুম, তুমি কিছুক্ষন সামলাও, আমি একবার চট করে বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। ছেলেটার খুব জ্বর দেখে এসেছি। ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। সাড়াশব্দ নেই। নিস্তব্ধ বাড়ি। ঘরে ঢুকে দেখি, তোমার মা ওই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সবে চান সেরেছে। ভিজে চুল কোমর ছাপিয়ে পায়ের কাছে চামরের মতো দুলছে। চাঁপাফুল রঙের শাড়ি পরেছে। গালে গোলাপি আভা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে সিঁদুরের টিপ পরছে। আর তুমি খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আয়নায় আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল, আঙুল কপালের টিপে, তুমি? হ্যাঁ আমি। খোকা কেমন আছে? হেসে বললে, জ্বর ছেড়ে গেছে। Time, you old gipsy man/Will you not stay/Put up your caravan/Just for one day/Just for one day?

আপনার চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল। টাটকা আর এক কাপ করে দিই।

নাঃ, মুখে আর ভাল লাগছে না কিছু। বিস্বাদ হয়ে গেছে। ওই কোটের পকেট থেকে আমাকে বড় রুমালটা দাও। মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধি। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে।

শুয়ে পড়ুন। একটু টিপে দিই।

দুর পাগল। সেবা নিলে মানুষ দুর্বল হয়ে যায়। He who was living is now dead/We who were living are now dying/With a little patience, তুমি বরং ওই রেকর্ডটা একবার চাপাও তো।

কোনটা বলুন?

ওই যে, তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই বারে বারে।

কোণের দিকে ছোট্ট একটা টেবিলে আদ্যিকালের চোঙা-লাগানো গ্রামোফোন। হাতল ঘুরিয়ে দম দিয়ে রেকর্ড চাপাতে হয়। ঘুঘু আর ডাকছে না। বাইরের কার্নিসে গোটাকতক বুড়ো পায়রা বাতের ব্যথায় অনবরত কোঁত পেড়ে চলেছে। গান বেজে উঠল। পিনটা পালটানো উচিত ছিল। পিতা চোখ বুজে গান শুনছেন। গান একসময় থেমে গেল। তবু চোখ খুলছেন না। মাথার কাছে এগিয়ে গেলুম। জ্বরে বেহুঁশ মতো হয়ে গেছেন। এখান থেকে হলঘরে মায়ের ছবিটা স্পষ্ট দেখা যায়। পশ্চিমের একচিলতে রোদে পড়েছে। জ্বলজ্বল করছে। আয়নাটাও কেমন যেন গভীর আকাশের চেহারা নিয়েছে। মেসোমশাইদের ঘরের খাটের চাদরের একটা অংশ আয়নায় ভেসে আছে। আয়নার জগৎ একেবারে নির্জন নয়। বাতাসে চাদর নড়লে ছায়াও নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে বহু দূর থেকে কেউ যেন আঁচল উড়িয়ে আসছে। ভারী অদ্ভুত লাগছে। বিরাট বড় একটা দায়িত্ব পেয়ে গেছি। বিশাল শক্তিশালী এই মানুষটি আজ কত অসহায়! অদৃশ্য বন্ধনের কত আকর্ষণ। ফেলে যাব কোথায়! সন্ন্যাস কি মুখের কথা! সব ছাড়োয়ে বললেই কি সব ছাড়া যায়!

মাথার নীচে ছোট একটা বালিশ লাগাতে গেলুম। চমকে উঠলেন। ক'টা বাজল?

প্রায় সাড়ে চারটে।

রোদে পড়ে এসেছে। ছাতের গাছে একটু করে জল দিতে হবে।

রোদের ঝাঁঝ কমুক, এখন দিলে শুকিয়ে যাবে।

হ্যাঁ, সন্ধের মুখে দিয়ে। আমার পা-টা বেশ টাটিয়েছে। ওঁরা ফিরেছেন?

আজ্ঞে না।

সকালে আমি একটু বেশি ইমোশানাল হয়ে পড়েছিলুম। তোমাকে কেউ আক্রমণ করলে তামার অ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট প্রখর হয়ে ওঠে।

The world turns and the world changes
But one thing does not change
In all of my years, one thing does not change
However you disguise it, this thing does not change
The perpetual struggle of good and evil.

দেবতা আর অসুরের মাঝখানে পাতলা কাগজের ডায়াফ্রাম। একটু এদিক-ওদিক হলেই ফরদাফঁই। নাঃ, সংযত হতে হবে। কী করব? তুমি যে আমার সন্তান। তোমার মধ্যে যে আমার বিশালের ছায়া আছে। আমাকে শেক্সপিয়ারের কমপ্লিট ওয়ার্কসটা একবার দাও তো।

বই না পড়ে, একটু শুয়ে পড়ুন না। শরীর খারাপ হলে রেস্ট নিতে হয়।

তুমি আমাকে শুইয়ে দিতে চাইছ কেন? তাতে তোমার কী লাভ?

বাপ রে? সিন্নি দেখে এগিয়েছিলুম, কোঁতকা দেখে আবার পেছিয়ে এলুম। দুর্গ জয় করা কি অত সহজ কাজ। মনোদুর্গে বসবাস, আলোছায়া খেলে অধরাকে ধরা কি সহজ? পিতার সঙ্গে আমার একদিন কবির লড়াই হলে বেশ হয়। দেখি কার স্টকে কত কবিতা আছে?

রোদে মিলিয়ে গেল রাতের ছায়ায়। বেগুনি রঙের আলো য় পৃথিবী বড় বিষণ্ণ। ফুলগাছের টবে জল দিচ্ছি। দু'-এক ফোঁটা ছাদে পড়লেই সোঁ সোঁ করে টেনে নিচ্ছে। মিট্টিকা আতরের মতো গন্ধ বেরোচ্ছে। কাকের দল যেদিকে উড়ে গেল বাসায়, সেদিক থেকে বাদুড় উড়ে আসছে। পেছনে ধপ করে কিছু একটা পড়ার আওয়াজ হল। বেশ ভারী। পেছন ফিরে তাকাতেই চমকে উঠতে হল। খুনি আততায়ীর মতো এ কে?

জটেবুড়ির মতো চেহারা। জট-পাকানো লাল লাল চুল চারপাশে উড়ছে। মুখ লাল টকটকে। চোখদুটো ছাদের আবছা বেগুনি আলোয় পাথরের মতো জ্বলছে। পোশাকও অদ্ভুত। লাল একটা ঘাগরা। ঘাগরা নয় সায়া। তার ওপর হলদে রঙের একটা ব্লাউজ। কোথা থেকে এল? আকাশ থেকে পড়ল নাকি? সতীমার ক্ষুদ্র সংস্করণ? সামনের দিকে দৌড়ে পালাবার উপায় নেই। ছাদের বাইরে চলে যেতে হবে। মূর্তির গলায় শব্দ বেরোল,

পিন্টুদা?

কে, জবা?

হ্যাঁ, চিনতে পারছ না?

তুমি কোথা থেকে এলে? কীভাবে এলে?

তোমাদের ছাদের আলসে টপকে।

আমাদের ছাত অবদি এলে কী করে?

আমাদের বাড়ির কার্নিসে নেমে তোমাদের বাড়ির কার্নিসে পা রাখলুম।

ভয়ে আমার চোখ বুজে এল। গা শিরশির করে উঠল। যদি একবার পড়ে যেত, নির্ঘাত মৃত্যু। তুমি এভাবে আসতে গেলে কেন?

আমার শাড়ি খুলে নিয়ে ঘরে শেকল বন্ধ করে রেখেছিল। এ সব হল আমার মাসিটার কাজ।

মাসি মানে?

ওই হল, ছোট মা। তুমি আর কথা বাড়িও না। তোমার সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার লজ্জা করছে। চট করে একটা শাড়ি এনে দাও।

শাড়ি পাব কোথায়?

তোমাদের বাড়িতে দু'-দুটো মেয়ে, শাড়ি পাব কোথায়? যাও শিগগির নিয়ে এসো। এখুনি খোঁজপাত শুরু হবে।

নীচের তারে কনকের শাড়ি ঝুলছিল। যা হয় তবে, এখন দিয়ে তো দিই। কনককে বোঝালে নিশ্চয়ই বুঝবে। জবার হাতে শাড়িটা দিতেই বলল, এত দামি কাপড় না আনলেই পারতে।

শাড়িটা পরতে পরতে বললে, তোমাদের পেছন দিকের দরজা দিয়ে আমি বেরিয়ে যাব।

কোথায় যাবে?

আমার জায়গায়।

সেটা আবার কোথায়?

বিয়ের পর মেয়েদের জায়গা কোথায় জানো না!

জবা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে চলল। জোরে চেঁচাতেও পারছি না। পেছন পেছন নামতে নামতে ফিসফিস করে বললুম, সুখেন নেই। দীনু তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেছে।

যাক, আমি ঠিক খুঁজে বের করব।

তোমার চেহারাটা একটু ঠিক করে নিলে হত না।

সময় নেই, উপায়ও নেই। আমি চুপিচুপি নেমে বেরিয়ে যাচ্ছি, তো মাকে আর আসতে হবে না। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবে আমি কিছু জানি না।

তোমাকে আবার ধরে ফেলবে।

কারুর বাপের ক্ষমতা নেই।

জবা পায়ে পায়ে নীচে নেমে গেল। ভাগ্য ভাল, পিতৃদেব জ্বরে ইজিচেয়ারশায়ী। উঃ, সুখেনের বরাতটা তো খুব ভাল! এত প্রেম! দু'জনে এক সুরে বাঁধা! এমন তো বড় একটা দেখা যায় না। জলের ঝারিটা আনতে গিয়ে কানে এল, জবাদের বাড়িতে এক মহিলা খ্যানখ্যানে গলায় চিৎকার করছে, 'জবা, জবা'। পালাও জবা, পালাও।

কোলের ওপর শেক্সপিয়ার, চেয়ারে পিতা আচ্ছন্ন। মাথায় ফেট্টি, চোখ বন্ধ। বাড়িতে বয়স্ক কেউ থাকলে একটু সাহস পাওয়া যেত। ঘরে ঘুটুর ঘুটুর করছি, চোখ না খুলেই পিতা বললেন, রাতে আমার উপবাস। তুমি যা হয় একটা কিছু নিজের মতো করে নাও। ওঁরা তো এখনও ফিরলেন না!

না, বেশ দেরি হচ্ছে।

মুখ থেকে কথা সরতে-না-সরতেই বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। প্রতাপ রায় এলেন। দু'জনে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠছেন। মেসোমশাইকে বেশ খুশিখুশি দেখাচ্ছে। ভোজনতৃপ্ত চেহারা। ঘরে ঢুকে কিছু একটা বলতে গিয়ে পিতার অবস্থা দেখে থেমে গেলেন। কী হল? শরীর খুব খারাপ হয়েছে?

চোখ না খুলে পিতা বললেন, আপনার কাজ হল?

প্রশ্ন প্রশ্নে চাপা পড়ে গেল। এ বেশ ভাল কৌশল। যে-প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই না পালটা প্রশ্ন করে পাশ কাটিয়ে যাই। কনক আর মুকু কোথায় গেল? তাদের দেখছি না তো!

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। প্রতাপের মতো ছেলে হয় না। হরিদা, আপনার অনুমতি চাইছি।

অনুমতির প্রয়োজন নেই। ম্যাটার অফ কনভিনিয়েন্স। আপনি যেতে পারেন।

যাবার কথাই জিজ্ঞেস করছি কী করে বুঝলেন।

কমন সেন্স বিনয়দা, কমন সেন্স।

প্রতাপের বাড়িটা বিশাল, জনপ্রাণী নেই।

লেখাপড়ার সুবিধে হবে।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া...

নীচের তলাতেই ডাক্তারের চেম্বার।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া...

প্রতাপের বিষয় সম্পত্তির মামলা এমন জড়ভট্টি হয়ে আছে, জট ছাড়াতে হলে কাছেই থাকা দরকার।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া...

কলকাতায় থাকলে পরীক্ষা দেবার সুবিধে অনেক।

ঠিক বলেছেন, তা ছাড়া প্রতাপের এক কাকা দর্শনের অধ্যাপক। কাছাকাছি থাকলে আমার চেয়ে ভাল কোচিং পাবে।

এই মুহূর্তে আপনি চলে যান। আর একটুও দেরি করবেন না।

আপনি চোখ খুলছেন না কেন?

কোনও কোনও সময় চোখ বুজিয়ে থাকলে পৃথিবীকে কম কর্কশ মনে হয়।

প্রতাপ রায় বললেন, আপনাকে বেশ অসুস্থ মনে হচ্ছে। চলুন না একবার স্পেশালিস্ট দেখিয়ে দিই।

তেমন স্পেশাল কিছু হয়নি প্রতাপ। ধন্যবাদ।

মেসোমশাইয়ের চেয়ে প্রতাপ রায়ের উৎসাহ যেন বেশি। মেসোমশাই বিক্ষিপ্ত সমস্ত জিনিস গোছগাছ করে সুটকেসে ভরতে লাগলেন। মেয়েদের শাড়ির হিসেব রাখেন না, তাই জানতেও পারলেন না একখানা শাড়ি নেই। আশ্চর্য, মেয়ে দুটোকে কেন রেখে এলেন?

মেসোমশাইয়ের সেই প্রথম দিনের বেশ। হাতে শোলার টুপি।

হরিদা, আমি তা হলে আসছি। মেয়েদুটো থিয়েটার দেখতে গেছে। অনেকদিনের শখ কলকাতার থিয়েটার দেখবে। যাবার আগে দেখা করে যাব। দিনকতক আপনার অসুবিধে করে গেলুম।

অসুবিধে হলে যাবার আগেও আসতে পারেন।

নাঃ অসুবিধে আর কী? প্রাসাদতুল্য বাড়ি। দাসদাসী। আচ্ছা আসি।

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন, আগে পরে। প্রতাপ রায়ের এত উৎসাহ কীসের! পিতা এতক্ষণে চোখ খুললেন।

কী বুঝলে?

আমাকে আর বুঝতে হল না। মাতামহ আসছেন গাইতে গাইতে, রিপুর বশে চললেম আগে, ভাবলেম না কী হবে পাছে।

আপনার চেয়ে পর ভাল
পরের চেয়ে বন ভাল

গান গাইতেন, আপনার জন সতত আপন, পর কি কখনও হয় রে আপন। কনকের বাবা যেভাবে চলে গেছেন, নিতান্ত স্বার্থপর না হলে এভাবে কেউ যেতে পারে না। কুইক মার্চ অ্যান্ড এগজিট। জীবনে বড়সড় হতে গেলে নিজের কথাই ভাবতে হয়, অন্যের কথা ভাবতে গেলে চলে না। ভেবেছ কী মরেছ। কে কার?

মাতামহ দরজার আড়াল থেকে ঘরে উঁকি মেরে বললেন, একী, এমন রাখাল রাজার বেশ কেন? মাথায় ফেট্টি। তুমি কি রাখালভাবে সাধনা করছ নাকি?

পিতা চোখ আধ-খোলা করে বললেন, ব্রেকডাউন। একশো তিনটিন হবে। ডান পা-টা ড্যামেজ করে ফেলেছি।

মাতামহ পিতার সামনে চেয়ার টেনে এনে সোজা হয়ে বসে বললেন, তোমার মঙ্গল কিঞ্চিৎ কুপিত। প্রায়ই রক্তপাত হচ্ছে। ফ্রন্টিয়ারে যুদ্ধ করতে গেলেও ঘনঘন এতবার আহত হতে হয় না। তোমার এই কাটা সৈনিকের অবস্থা দেখতে ভাল লাগে না। তুমি হলে আমাদের পুরুষসিংহ। সিংহ যদি গর্জন না করে বেড়ালের মতো মিউ মিউ করে, বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

সংসারে চিরকালই আমি এক কাটা-সৈনিক। মাঝেমধ্যে তেড়েফুঁড়ে উঠি, সঙ্গে সঙ্গে ড্যাঙোস খেয়ে চিতপাত হয়ে পড়ি।

তোমাকে ড্যাঙোস মারে এমন পুরুষ মাতৃগর্ভে জন্মায়নি।

আমি তো আছি। নিজেই নিজেকে মেরে ফ্ল্যাট করে দিচ্ছি।

হরিদা আছেন? হরিদা?

অপরিচিত কণ্ঠস্বর। মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি। খদ্দরের খাটো ধুতি। একমাথা আধ-পাকা চুল। চারপাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলছে। ধুলোমাখা দুটো খালি পা। অন্তত ফুট ছয়েক লম্বা। তেমনি বিশাল চেহারা। বুকের সবক'টা বোতাম খোলা। ভেতরে আবার গেঞ্জি নেই। বুকে একটাও লোম নেই। মসৃণ, তেলা। কোমলে কঠোরে মেশানো অদ্ভুত এক চেহারা।

হ্যাঁ, আছেন। আপনি আসুন।

কে, অক্ষয় নাকি? পিতা ক্ষীণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন।

হ্যাঁ, আমি অক্ষয়। কী ব্যাপার আজ অফিসে গেলেন না?

এই যে পা খোঁড়া করে বসে আছি।

আমার মন বলছিল একটা কিছু হয়েছে। অকারণে বসে থাকার মানুষ আপনি নন।

তুমি ওই চেয়ারটায় বসে পড়ো। আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

না, আপনার মুখে ওঁর কথা আমি শুনেছি। আজ দর্শন হল। একটু পায়ের ধুলো নিই। শুনেছি আপনি অনেক দূর এগিয়েছেন।

মাতামহ পদযুগল কাপড়ের আড়ালে লুকোতে লুকোতে বললেন, না, না, প্রণাম কেন? আবার প্রণাম কেন?

তা বললে হয়, প্রণম্যকে প্রণাম করতেই হবে। অক্ষয়বাবু সামনে ঝুঁকে পড়ে চিকের আড়াল থেকে পা খুঁজে বের করার কসরত দেখাতে লাগলেন। মাতামহ ইজ্জত-যেতে-বসা রমণীর মতো মুখভঙ্গি করে বসেই রইলেন।

পিতা বললেন, ধুলো নেবার মতো পা হল তোমার অক্ষয়। যেখান দিয়ে চলেছ সেইখানেই টন টন পদরেণু ঝরে ঝরে পড়ছে।

অক্ষয়বাবু খাড়া হয়ে বললেন, আমি ঝেড়ে দিচ্ছি হরিদা। একটা ঝাড়ুটাড়ু দিন।

আরে বোসো বোসো। আমি ধুলোর কথা বলেছি। ধুলো ঝাড়ার কথা বলিনি।

আপনার বাড়িতে লোকজন নেই, সারা শহরের ধুলো টেনে এনেছি, দিন না পরিষ্কার করে দিই।

মাতামহ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বাড়িতে এখন অনেক লোক। আমাদের সংসার ভরে উঠেছে।

পিতা বললেন, ভরে উঠেছিল, আবার খালি হয়ে গেছে।

সেকী? সব হাওয়া!

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁরা চলে গেছেন। আরও ভাল বাড়ি, আরও ভাল ব্যবস্থা। আরও সুখসুবিধে।

যাক বাবা, বাঁচা গেছে। আর তা হলে জড়োসড়ো হয়ে থাকতে হবে না। আরে আমাদের পুরুষের সংসারে ওসব মানায় নাকি? আমরা নিজেদের মতো খাবদাব আর সানকি বাজাব। এ ক'দিন যেন আমাদের আক্কেল দাঁত উঠেছিল। তা হলে ঝেড়েই দাও।

না না, কোনও প্রয়োজন নেই, তুমি বোসো, আরাম করো। নিশ্চয় হেঁটে হেঁটে এসেছ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার আছে চরণবাবুর জুড়িগাড়ি। তা হলে বাইরে গিয়ে একটু নেচে আসি। যা ঝরার ঝরে যাক।

কোনও দরকার নেই, তুমি শান্ত হয়ে বোসো।

অক্ষয়বাবু বসলেন। বসে বললেন, আমি আরও এলুম, একটা সুখবর আছে। আপনার প্রোমোশনের সেই অর্ডারটা আজ এসে গেছে।

বলো কী? ল্যাং তা হলে মারতে পারল না।

নাঃ ফেল করল। আপনাকে আমি বলেছিলুম, অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি আপনার এই প্রোমোশন কারুর আটকাবার ক্ষমতা নেই। আপনার ব্যাড ডেজ চলে গেল। এইবার ভাগ্যের রথ গড়গড়িয়ে চলবে।

মাতামহের ঘুমঘুম ভাব কেটে গেল। বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, ও, তুমি এনার কথাই বলেছিলে। বিরাট জ্যোতিষী। মর্গে গিয়ে মৃতদেহের হাত দেখে দেখে জ্যোতিষের সত্য অসত্য মেলান।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস নেই, তবে অক্ষয়ের অধ্যবসায়ে আমার গভীর বিশ্বাস। দেখা যাক ও এই বুজরুকিকে বিজ্ঞানের স্তরে নিয়ে যেতে পারে কি না। মর্গে তোমার সেই ভূত দর্শনের ঘটনাটা ভাবো অক্ষয়?

মাতামহ আরও সোজা হয়ে বসে বললেন, অ্যাঁ, ভূতের হাত? ইনি ভূতের হাত দেখেছেন?

ভূতের হাত নয়, ভূতের হাতে পড়েছিলেন।

আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করছে।

এসেছে যখন শুনবেন, তার আগে একটু জলযোগ করে নিক। খাইয়ে মানুষ। সারা মাসই তো ওকে নেমন্তন্ন খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হয়। ও হল কলকাতার এক নম্বর প্রোফেশনাল খাইয়ে। বড় বড় বাড়ির রেজিস্টারে ওর নাম আছে।

উঃ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমরা সারাবছর হাপিত্যেশ করে বসে থাকি, আর ইনি রোজ ভোজ মেরে বেড়ান। ভোজরাজ। কিন্তু ভূতের ব্যাপারটা সন্ধের মুখে সেরে নেওয়াই ভাল। বেশি রাতে ওসব আলোচনা না করাই উচিত। ছোটরা ভয় পেতে পারে।

আমরা তো সবাই বুড়ো দামড়া, ভয় পাবার মতো তো কেউ নেই। এক আপনি যদি ভয় পান। তা হলে আলাদা কথা।

আমি একটু ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করি। তোমার মতো অবিশ্বাসী নই। বাগানের একপাশে পড়ে থাকি। বুঝলে কিনা?

আপনি তো তন্ত্রসাধক! আপনার আবার ভয় কীসের?

তা-আ ঠিক। মাতামহ আবার মাথা নিচু করলেন।

পিতা বললেন, নাও, এঁদের একটু জলযোগের ব্যবস্থা করো। আমি তো বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েছি। তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না।

থাক না হরিদা। জলযোগের জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? পরে আর একদিন হবে। অক্ষয়বাবু খুঁতখুঁত করে উঠলেন।

আমার ডিকশনরিতে পরে বলে কোনও কথা নেই। আমি জানি, নাও অর নেভার। ওর ট্রেনিংও সেইভাবেই হয়েছে। তুমি কিন্তু কিন্তু কোরো না।

মাতামহ বললেন, আমি সাহায্য করছি। আমরা সব অন্য জাতের মানুষ, কী বলো হরিশঙ্কর! আমরা হলুম গিয়ে অর্ধনারীশ্বর। বাড়িতে মেয়েরা নেই তো কী হয়েছে। আমরা হলুম গিয়ে মেয়েদের বাবা। গর্ভধারণ ছাড়া সবই পারি।

উঃ, আবার আপনার মুখ আলগা হয়েছে। সেদিন কী সারমন দিলুম?

গর্ভধারণ তো খারাপ কথা নয়। একেবারে শুদ্ধ সংস্কৃত।

শব্দটা খারাপ নয়, ভাবটা ভালগার।

তা হলে ওটা তুমি কেটে দাও।

বলা কথা আর ছোড়া পাথর আর ওলটানো দুধ হাতের বাইরে চলে যায়।

পিতার মনে হয় জ্বরের দাপট একটু কমেছে। সেই ঝিমুনি ভাবটা আর নেই। অনর্গল কথা বলছেন।

মাতামহ উঠে এলেন। মুখে সেই অনাবিল হাসিটি লেগে আছে। শুভ্র একটি রাজহংস। জীবনের কোনও কিছুই গায়ে মাখলেন না। একবার করে পালক ঝাড়েন আর সব ছিটকে পড়ে যায়। ফিসফিস করে বললেন, আসার সময় দেখে এলুম ওই মোড়ের দোকানে গরম গরম হিঙের কচুরি ভাজছে। এই ফুলোফুলো, লাল লাল।

আপনি যা ভাবছেন আমিও তাই ভাবছি। কচুরি, ঘুগনি, আর চা।

উঃ, তুই আমার নাতির মতো নাতি। তুলসী তোকে রেখে গেছে আমার জন্যে আর ওই দুর্দান্ত ছেলেটার জন্যে। পা-টাকে অমন ক্ষতবিক্ষত করল কী করে?

বাথরুমের দেয়াল ঝরাচ্ছিলেন, পায়ে প্লাসটারের চাঙড় ভেঙে পড়েছে।

নাঃ তুলসী ওকে ভুলতে পারেনি।

তার মানে?

সে তুই বুঝতে পারবি না। এই পৃথিবীর চারপাশে আর একটা জগৎ ঘুরপাক খাচ্ছে। ডাক্তারখানায় যেমন রুগিরা মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে থাকে সেইরকম মৃত আত্মারা সেইখানে বসে আছে। ওখানের আলোটা কেমন জানিস?

না।

বিদ্যুৎ চমকালে যেমন নীল আলো হয় সবসময় সেইরকম নীল আলো স্থির হয়ে আছে।

কী করে জানলেন?

আমার মনে হয়। তা হলে কচুরি আর ঘুগনি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোড়ের মাথায় দিনুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কী রে, সুখেন কোথায়?

খুব নিরাপদ জায়গায়। আচ্ছা, চুল বেরোতে ক'মাস সময় লাগে রে?

রাখ তোর চুল। জবা ছাত টপকে আমাদের বাড়ির খিড়কি দিয়ে সেই ন্যাড়ার সন্ধানে ছুটছে।

অ্যাঁ, বলিস কী? পৃথিবীটা হঠাৎ পালটে গেল নাকি! যাই জবাকে খুঁজে বের করি। কেউ জানে?

না, কাউকে বলিনি।

দিনু আবার দৌড়োল। আমাদের গ্রেট দিনু।

কচুরি আর ঘুগনি খেয়ে অক্ষয়বাবু একটু ধাতস্থ হলেন। এতটা পথ হেঁটে এসেছেন, বেশ খিদে পেয়েছিল মনে হয়। চায়ের কাপটা সামনে রাখতেই পকেট থেকে খানিকটা তুলো বের করে চায়ে ভেজাতে লাগলেন।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, চায়ে তো বিস্কুট ভিজিয়ে খায়, তুলোও খাওয়া যায় নাকি?

আজ্ঞে না, আসার পথে হোঁচট খেয়ে ডানপায়ের বুড়ো আঙুলের নখটা কৌটোর ঢাকা খোলার মতো হয়ে গেছে। চায়ে তুলো ভিজিয়ে একটু বেঁধে রাখি।

এটা কী ধরনের চিকিৎসা?

আজ্ঞে আসুরিক। মানুষ যখন জঙ্গলে থাকত, পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করত, তখন তাদের অনেক দাওয়াই জানা ছিল।

তখন কি চা ছিল?

না, চা-চিকিৎসা আমার আবিষ্কার। চা খেলে পেট মরে যায়, লিভার শুকিয়ে যায়, তা হলে ঘা কেন শুকোবে না, জীবাণু কেন মরবে না? কাটাছেঁড়ায় চা আমার দাওয়াই।

চা-টা যে নোংরা হয়ে গেল।

না, না, নোংরা আবার কী? নোংরা, পরিষ্কার সবই আমাদের মনের বিকার।

ওঃ কত বড় সাধক আপনি! ভূত দেখেছেন, ভৌতিক চিকিৎসায় উপকার পেয়েছেন, ভগবান দেখেছেন?

আজ্ঞে না।

দেখবেন দেখবেন। কেউ আটকাতে পারবে না। ঠাকুর বলেছিলেন, যখন গঙ্গার জল আর নর্দমার জল এক মনে হবে তখন বুঝবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। আপনার তো তাই হয়েছে। আপনি প্রকৃত ভাগ্যবান।

আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন?

হ্যাঁ, তাও তো বটে। আমি তো বড় একটা কাউকে আপনি বলি না। আপনিটা তুমি নিজের গুণেই আদায় করে নিলে।

পিতা চায়ের কাপ রাখতে রাখতে বললেন, অক্ষয়ের সাহস কত জানেন? তোমার সেই ঘটনাটা বলো না।

কোনটা হরিদা?

সেই বালির ব্রিজে মুণ্ডু-কাটা মানুষ।

উঃ, সে ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

কীরকম, কীরকম? মাতামহ উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

অক্ষয়বাবু বেশ আয়েশ করে বসে গল্প শুরু করলেন। আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকি। বউদির ভীষণ অসুখ। ডাক্তারবাবু এমন এক ওষুধ দিলেন যা কলকাতা ছাড়া পাওয়া যাবে না। রাত হয়ে গেছে। ওষুধ না পড়লে রুগির রাত কাটবে কি না সন্দেহ। বেরিয়ে পড়লুম সাইকেল নিয়ে। কোথাও না পাই শ্যামবাজারের রাইমারে পাবই। শীত পড়েছে জাঁকিয়ে। অমাবস্যা তিথি। যাবার সময় দেখে গেলুম গঙ্গা থেকে হিলহিল করে কুয়াশা উঠছে। ওষুধ পেয়ে গেলুম। ফেরার পথে টালার কাছে টায়ার পাংচার হয়ে গেল। সারাতে সারাতে বেজে গেল রাত দশটা। ফের যখন ব্রিজে উঠলুম তখন মাঝরাত। গঙ্গা অদৃশ্য। ব্রিজ পড়ে আছে নরকে যাবার একফালি রাস্তার মতন। কুয়াশায় ভেসে আছে। মনে হচ্ছে কুরে কুরে রাস্তা বের করতে হবে। সে দৃশ্য ভাবা যায় না। দু'হাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। ব্রিজের মাঝামাঝি এসেছি। বাঁ পাশে তাকিয়ে দেখি লোহার গার্ডারে ঠেসান দিয়ে কে যেন বসে আছে। কে রে বাবা! এই শীতের রাত। থিকথিকে কুয়াশা। আত্মহত্যা করতে চায় নাকি! ব্রিজ হল আত্মহত্যার জায়গা। সাইকেল থেকে নেমে পড়লুম। ফুটপাথে ঠেসিয়ে রেখে কাছে গিয়ে ডাকছি, ও মশাই শুনছেন, ও মশাই শুনছেন? কোনও উত্তর নেই? কাঁধে হাত দিয়ে বললুম, ও মশাই! যেই না নাড়া দিয়েছি, কাঁধ থেকে মুন্ডুটা খুলে ঠকাস করে গড়িয়ে পড়ল। কী সর্বনাশ! আমার তো খালি পা। এতক্ষণ

পায়ে নরম নরম রবারের মতো কী লাগছিল। ভাল করে তাকিয়ে দেখি আলকাতরার মতো জমাট রক্ত। আর ঠিক সেই সময় একটা স্টিমার গম্ভীর সুরে ভোঁ দিয়ে উঠল। কুয়াশার সাদা চাদর কেঁপে গেল। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে চট করে রাস্তা থেকে মুন্ডুটা তুলে নিয়ে আবার কাঁধে ফিট করে দিলুম। চেহারা দেখে মনে হল বেশ মানিড ম্যান। সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মনে হল পিঠে কে যেন হাত রাখল। চমকে উঠেছি। পুলিশ নাকি! কেউ কোথাও নেই। অথচ পিঠে হাত রেখেছিল কেউ! ফিসফিস করে কানের কাছে কে বললে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। ঝড়ের বেগে সাইকেল চালালুম। পড়ি কি মরি। বাড়ি ঢুকছি, ভাইপো ভাইঝিরা কেঁদে উঠল। বউদি মারা গেলেন।

পিতা মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন শুনলেন? আপনি হলে কী করতেন?

মাতামহ ভয়ে জমে পাথর হয়ে গেছেন। নীচের ঠোঁট থিরথির করে কাঁপছে। চোখদুটো প্রায় উলটে গেছে।

পিতা বললেন, একটা ঠোঙা ফুলিয়ে কানের কাছে ফট করে ফাটাও। শক ট্রিটমেন্ট।

অক্ষয়বাবু বললেন, শকে শাক্যং সমাচরেৎ। ভীষণ ভিতু মানুষ।

না না, অন্য ব্যাপারে তেমন ভয় নেই। আগে খুব বাঘের ভয় ছিল। আমাদের সঙ্গে একবার জামতাড়া বেড়াতে গিয়ে রাতে বাঘের স্বপ্ন দেখে মশারিফশারি ছিঁড়ে এমন কাণ্ড করেছিলেন। সে আর এক কাহিনি। পরে তারাপীঠে শ্মশান জাগাতে গিয়ে ভূতের ভয় ধরিয়ে এসেছেন। ভ্রষ্ট তান্ত্রিক। মাঝরাতে ভূতে নাকি আঁচড়ে দিয়েছিল। আঁচড় দেখেই বুঝেছিলাম, খ্যাঁকশেয়ালের কাজ। সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুরে নিয়ে গিয়ে তলপেটে চব্বিশটা।

ফ্যাট করে ঠোঙা ফাটার শব্দ হতেই মাতামহ সংবিৎ ফিরে পেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, তা হলে মর্গের গল্পটা না বলাই ভাল। কী বলেন হরিদা!

হ্যাঁ, না বলাই ভাল। সে তো আরও সাংঘাতিক।

মাতামহ বললেন, আমি কিন্তু ভয় পাইনি হরিশঙ্কর। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না। আমি একটা অন্য জগতে চলে গিয়েছিলুম। তুমি যার কাঁধে মুন্ডু ফিট করেছিলে, সে আমার শ্যালক প্রতীপ।

অ্যাঁ, বলেন কী! একই সঙ্গে দু'জনের বিস্ময় প্রকাশ।

হ্যাঁ গো, তোমাদের মনে নেই, সেই পদ্মিনী মামলার কথা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পদ্মিনী মামলা! মনে পড়েছে। বছরের পর বছর চলেছিল। এতদিন আপনি চেপে ছিলেন কেন?

সে যে বড় লজ্জার কথা ছিল।

হ্যাঁ, তা ছিল, লাস্ট, গ্রিড।

হ্যাঁ, একেবারে চটকাচটকি ব্যাপার। অক্ষয়বাবু ফোড়ন কাটলেন।

মাতামহ বললেন, প্রতীপ আজ বেঁচে থাকলে কত বড় গাইয়ে হত জানো? ওর মতন অমন ঠুংরি খুব কম গাইয়েই গাইতে পারত। একেবারে আবদুল করিম কেটে বসানো। আমি তোমার ভয়ে বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলুম।

আমার ভয়ে? অক্ষয়বাবু ভুরু কোঁচকালেন।

হ্যাঁ, খুব বাঁচা বেঁচে গেছ। মনে আছে, মৃতের পাশে একটা ইঞ্জেকশনের অ্যামপুলস্ পড়ে ছিল। সেটা তো তা হলে তোমার পকেট থেকেই পড়েছিল।

পিতা বললেন, যদ্দুর মনে পড়ছে, সেটা তো ছিল মরফিয়া। তুমি কি রাইমার থেকে মরফিয়া কিনেছিলে?

কতদিন আগের কথা, আর কি মনে আছে! হতে পারে মরফিয়া। বউদির মাথায় হেমারেজ হচ্ছিল, এইটুকু মনে আছে।

মাতামহ বললেন, সেইসময় আমি পরপর চোদ্দোদিন টানা সাক্ষী দিয়েছিলুম। আসামিরা সব ওই অ্যামপুলসের জোরে একে একে খালাস পেয়ে গেল। প্রতীপ মরফিয়া নিত না। আসামিরাও নয়। তা হলে মরফিয়া এল কোথা থেকে? খুনির পকেট থেকে। আর তুমিই সেই খুনি। তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ পাওয়া গেল।

অক্ষয়বাবু শুকনো মুখে বললেন, আপনি কি আমাকে এতদিন পরে সেই খুনি ভাবলেন নাকি?

মাতামহ হেসে বললেন, কী, ভয় পেয়েছ তো!

তা একটু পেয়েছি।

দেখলে তো, ভূতের ভয় ছাড়াও, অন্য ভয় আছে। প্রতীপও নেই, পদ্মিনীও নেই। যে খুন করেছিল, সে এখনও বেঁচে আছে চন্দননগরে। সারাগায়ে শ্বেতী। প্রতীপের প্রেতাত্মা গায়ে হাত বুলিয়ে সাদা করে দিয়েছে। পদ্মিনী পুড়ে মারা গেছে।

পরের খবর কাগজে আর বেরোয়নি। পৃথিবীর আদালত থেকে মামলা গিয়ে উঠেছিল ভগবানের আদালতে। একেই বলে, ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট।

মাতামহ বললেন, জীবনে আমি বহু পাপী দেখেছি। মানুষের আদালতে পার পেয়ে গেলেও ঈশ্বরের আদালতে অন্যভাবে সাজা পেয়েছে। আশু রেল কোম্পানির ক্যাশ ভেঙেছিল। অনেক টাকা। জেলে গেল তার অ্যাসিসটেন্ট প্রভাত। বউটা গলায় দড়ি দিলে। দিন যায়। আশুর একমাত্র ছেলে। খুব বড় ঘরে বিয়ে দিলে। ছ'মাসের মাথায় বাস অ্যাকসিডেন্টে ছেলেটা মারা গেল। দিন যায়। আশুর চোখদুটো গেল। চুরি-টাকার বাড়ি নিলাম হয়ে গেল। তাই বলি, পাপ করার আগে ঈশ্বরের কথা একবার ভেবো। সে চোখকে তো ফাঁকি দিতে পারবে না।

পিতা ব্যান্ডেজ- বাঁধা পা-টা সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই দেখুন আমার ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট।

অক্ষয়বাবু বললেন, কী ক্রাইম করেছিলেন?

সামান্য অহংকার, একছিটে প্রত্যাশাভঙ্গের ক্রোধ, একটু ঘোলাটে বুদ্ধি, সব মিলে ঘণ্টা কয়েকের পশু। খুব লপচপানি, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পানিশমেন্ট। হাতে হাতে গীতার ফল প্রাপ্তি।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

মাতামহ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, হে হেঃ ব্বাবা, পথে এসো ম্যান। খুব তো পুরুষকার পুরুষকার করতে, আমি কতদিন বলেছি, কারুর কাছে কিছু আশা কোরো না। না পেলেই মন খারাপ, মন খারাপ থেকে

অভিমান, অভিমান থেকে রাগ। রাগ হল লাল লোহা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পশুকে জাগিয়ে তোলে। অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।

থাক থাক আর গীতা নয়। ও অনেক শুনেছি। মুখে আওড়ে কাঁচকলা হয়। মনকে বশে আনতে হবে।

এই তো, এই তো। তুমি ঘুরে গেছ। এইবার সাধনা। রত্নাকর থেকে বাল্মীকি।

রত্নাকর বাল্মীকি হয়। মিটমিটে মধ্যবিত্ত বাঙালি বাঙালিই থেকে যায়।

অক্ষয়বাবু বললেন, সবই হল গ্রহের প্রভাব। যে যা হবে, সে তা হবে। আগে থেকেই ঠিক করা আছে। সাধু সাধু হবে। চোর চোর হবে।

ওটা আবার তোমার লাইন। আমি বিশ্বাস করি না। ম্যান ইজ এ ক্রিচার অফ সারকামস্ট্যানসেস। তবে কালকের একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি।

কীরকম, কীরকম? মাতামহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কাল আমি একটা স্বপ্ন দেখলুম। আমি যেন মাঝরাতে খোলা ছাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশটা খুব কাছে নেমে এসেছে।

আহা, কী ভাল স্বপ্ন। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

দাঁড়ান দাঁড়ান। সবটা আগে শুনুন। আকাশটা খুব কাছে নেমে এসেছে। ধকধক করে তারা জ্বলছে। আমি বলছি, আরে ওই তো কালপুরুষ। যেই বলেছি কালপুরুষ, অমনি কালপুরুষ ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অবাক হয়ে ভাবছি, এ আবার কী! কালপুরুষ অমনি হুহু করে নীচের দিকে নামতে লাগল। আলো, আলো। চারপাশ যেন ঝলসে যাচ্ছে। নেমে এল ছাতে। সঙ্গে সেই কুকুরটাও আছে। লোমে হিলহিল করছে আগুন। আমি ভয়ে বলছি, একী একী, আকাশ ছেড়ো না। কালপুরুষ ধনুকে তির জুড়ল। মারবে নাকি! বলতে না-বলতেই তির ছেড়ে দিল। এত আলো, মনে হল সারা পৃথিবী জ্বলে উঠেছে। পেট্রলে আগুন লাগার মতো আমি দপ করে জ্বলে উঠে এক খণ্ড পোড়া কাঠের মতো হয়ে গেলুম। সব দেখতে পাচ্ছি, সব বুঝতে পারছি। নিজেই নিজের সৎকার দেখছি। কালপুরুষ রকেটের মতো আকাশে উঠে গেল। আকাশ সরে গেল। চারপাশে থকথকে অন্ধকার। ছাদে সেই পোড়া কাঠ। হাওয়া লেগে ছাই হচ্ছে, আর পিটপিট শব্দ করছে।

মাতামহ পিতার পিঠে হাত রেখে বললেন, তোমার হয়ে গেছে। তুমি পেয়ে গেছ। তোমার আর দেরি নেই। দীক্ষাটা নিয়ে ফেলো। এখন গেরুয়া পরার দরকার নেই। সবসময় সঙ্গে একটা গেরুয়া রুমাল রাখো। সন্ন্যাসাশ্রমে তোমার নাম হোক, স্বামী হরিহরানন্দ। এই বাড়িটাকে আমরা আশ্রম বানাব। পাঁজিতে তোমার নাম তুলে দোব।

আহা উত্তেজিত হবেন না। কী স্বপ্নের কী ব্যাখ্যা! কাল রাতে ওই স্বপ্ন, আজ সকালে আহত, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। দুটোর মধ্যে কেমন যেন যোগসাজস খুঁজে পাচ্ছি। অক্ষয়, তুমি এর কী মানে করবে?

আজ্ঞে, আমি তো তেমন স্বপ্নতত্ত্ব জানি না। তবে, মনে হয়, আপনার এই প্রমোশনের সঙ্গে ওর কোনও যোগ আছে।

মাতামহ মানতে পারলেন না। আরে, না হে না, একেবারে আধ্যাত্মিক স্বপ্ন। নক্ষত্র জ্যোতিতে পুড়ে ছাই হয়ে হরিশঙ্কর নবীন জন্ম লাভ করে ঊর্ধ্বে আরোহণ করছে। এসব স্বপ্নের অর্থ তোমরা কী বুঝবে! আচ্ছা,

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? হয়তো বলতে পারবে, জ্যোতিষ ট্যোতিষ করো তো।

অক্ষয়বাবু বললেন, বলুন, জ্ঞান থাকলে বলব।

এই বাড়িটা, বুঝলে অক্ষয়, এই বাড়িটায় একটা কিছু আছে। সংসারটা একেবারে ছারখার হয়ে গেল। এই দুটো সলতে কেবল টিমটিম করে জ্বলছে। নাতিটা তো একটা বদ্ধ পাগল। এই বয়েসের ছেলে, একটা সিগারেট খায় না, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেশে না, যাত্রা থিয়েটার দেখে না, আবার বেদবেদান্ত পড়ে। ব্যাটা মহাপুরুষ না কাপুরুষ বোঝা দায়। আমার কী মনে হয় জানো?

কী মনে হয়?

মাতামহ পিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, কুলকুচো করে এসো। কতদিন বলেছি, চা খাবার পর মুখ ধোবে। দাঁত ভাল থাকবে। শেষ বয়েসেও দোলের দিন মঠ আর ফুটকড়াই খেতে পারবে।

আপনিও তো চা খেলেন?

আমি? এই দেখো! মাতামহ পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে আস্ত দু'পাটি দাঁত বের করে দেখালেন। মাতামহ যেন নিজের হাতের তালুতেই পড়ে পড়ে খিলখিল করে হাসছেন।

এই যদি আপনার অবস্থা হয় তা হলে আমার আর নিয়ম মানার প্রয়োজন নেই। পা নিয়ে নড়তে পারছি না। আতুরে নিয়ম নাস্তি।

মাতামহ আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, আমার কী মনে হয় জানো, এই বাড়ির উত্তরের ওই বাগানে কোথাও একটা হাড় পোঁতা আছে।

শ্রোতারা সমস্বরে বললেন, হাড়?

হ্যাঁ, হাড়। সেই হাড়টা মাটি খুঁড়ে তুললে দেখা যাবে, সরু সরু কালো কালো লোম বেরিয়েছে।

শ্রোতারা বললেন, সে আবার কী?

মাতামহ বড় বড় চোখ করে বললেন, তোমরা এসবের কতটুকু জাননা। দু'কলম ইংরেজি পড়ে সব পণ্ডিত হয়ে গেছ। নিশির ডাক শুনেছ?

ডাক শুনিনি, তবে আছে শুনেছি।

আমাদের শশাঙ্ক সাড়া দিয়ে চোখের সামনে মারা গেল। আড়াই প্রহর রাতে গুণিন এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল, হাতে একটা মুখ-খোলা ডাব। শশাঙ্ক, শশাঙ্ক, তিনবার ডাকল, শশাঙ্ক আছ! শশাঙ্ক ঘুমের ঘোরে উত্তর দিল, কে, যাই। ব্যস কপ করে ডাবের মুখে চাপা পড়ে গেল। শশাঙ্কর প্রাণবায়ু চলে এল ডাবের জলে। সেই জল খেয়ে বেঁচে উঠল মণি চাটুজ্জে। আজও বুড়ো বেঁচে আছে। তেজপক্ষের বউটা সংসার ছারখার করে দিলে। প্রথম পক্ষের বড় ছেলেটার সঙ্গে, সে আমি বলতে পারব না, তুমি আবার বকাবকি করবে।

বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। সবসময় সবকথা বলার দরকার করে না। কবিদের মতো ব্যঞ্জনায় মেরে দিতে হয়।

তা হলে দেখো, তোমার ট্রেনিংয়ে কীরকম তৈরি হয়েছি। রেলের মালবাবু থেকে কবি কালিদাস। যাক যে কথা বলছিলুম, তুমিই তো শিখিয়েছ, বেশি লাইন চেঞ্জ করা খুব খারাপ। মেন লাইন ধরে থাকতে হয়। মাঝরাতে পৃথিবীর চেহারা কীরকম দাঁড়ায় জানো? তোমার স্বপ্নের মতো। মাপার উপায় নেই, তা হলে সত্যি

সত্যিই দেখতে পেতে, আকাশ অনেকটা নীচে নেমে আসে। তারাদের চোখ ড্যাবড্যাবা হয়ে ওঠে। গাছ চুল এলো করে দেয়। গর্তে আগুন জ্বলে, নদীর জল রক্তগোলা হয়ে যায়, কবরে কবরে মৃতদেহ উঠে বসে। এ সব আমার দেখা। তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসে দেখেছি।

আপনি দেখছি, আর এক মিলটন।

ও, সেই অন্ধ মহাকবি। অন্ধ না হলে মনের চোখ খোলে না। আচ্ছা, তোমার সেই হ্যামিলটন সায়েবকে মনে আছে! রোজ কলকাতা থেকে প্লেনে চেপে দিঘার সমুদ্রে চান করতে যেতেন।

আবার লাইন চেঞ্জ করছেন।

মিলটনের নাম শুনে হঠাৎ মনে পড়ল, তাই জিজ্ঞেস করলুম। এই যে তুলসী, তুলসী আমার মেয়ে, তুলসী কেন মারা গেল?

পিতা বললেন, ওসব অসুখের এখনও কোনও চিকিৎসা বেরোয়নি।

ও তোমাদের কথা। আমি জানি, তুলসী কেন মারা গেল। মনে আছে, ওর তারে-মেলা শাড়ির আঁচলের খানিকটা কেটে নিয়ে গেল। তোমরা সন্দেহ করলে হাবুর মাকে। তুলসী আর ভাল হল না। হাবুর বউ কিন্তু এখনও বেঁচে আছে। দশ-দশটা ছেলেমেয়ে, এই গতর। মাছের ভেড়ি করে হাবু এখন ধনকুবের। লোকে বলে বেড়াচ্ছে, বিধান রায় মন্ত্রী হবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। হাবুকে ডেকে পাঠাবেন। বাংলাদেশে যেন মানুষের অভাব।

লৌকিক জগৎটাকে আগে ভাল করে জানি, তারপর সময় থাকলে অলৌকিক নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।

পিতার কথায় মাতামহ কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। অক্ষয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার নাতির হাতটা একবার দেখো না। বেশ বড়টড় একটা কিছু হতে পারবে কি না?

ওর হাত আমি দেখেছি। হরিদা অ্যালাউ করবেন না, তা না হলে ও খুব ভাল নাচিয়ে হতে পারত। ড্যান্সার।

মাতামহ বড় আনন্দ পেলেন, অ্যাঁ, বলো কী? উদয়শঙ্কর! কালই তা হলে নিয়ে যাই।

পিতা বললেন, কোথায়?

কেন? উদয়শঙ্করের আখড়ায়।

থাক, নাচিয়ে করে আর কাজ নেই। ছেলেরা হিলহিল করে মেয়েদের মতো পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচবে ভাবলেও কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে।

এ তুমি কী বলছ? উদয়শঙ্করের নটরাজ নৃত্য দেখেছ!

উদয়শঙ্কর একটাই হয়, একশোটা হয় না। প্রতিভার ডুপ্লিকেট নেই।

অক্ষয়বাবু বললেন, আমাদের অফিসে একটা পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি একবার বললেই ওর একটা চাকরি হয়ে যায়। ভাল ফিউচার।

একই অফিসে বাপ-ছেলে। মাপ করো রাজা। ওকে আমি সম্বলপুর পাঠাব।

সম্বলপুর? সেখানে কী করবে? হাতিখেদা? মাতামহ অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

সেখানে আমার বন্ধু অমল আছে। বিড়ির পাতার ব্যাবসা করবে। একেবারে নিউ লাইন। অমলের মেয়েটি পরমাসুন্দরী।

মাতামহ বললেন, আঃ তা হলে তো কোনও কথাই নেই। আহার ঔষধ দুই-ই হয়ে গেল।

অক্ষয়বাবু বললেন, ব্যাবসা ওর হবে না হরিদা। ভাবুক টাইপের চরিত্র। ব্যাবসার দিকে যদি পাঠাতেই চান তা হলে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট কিংবা গন্ধ দ্রব্যের লাইনে দিন।

বাদ্যযন্ত্র। সেতার, তানপুরা, হারমোনিয়াম, ফ্লুট বাঁশি। বলেছ ভাল। আবার আতর। কানে তুলো, হাতে কাঠি, চামড়ার বাক্সে ছোট ছোট শিশি। আতরওয়ালা। বলেছ ভাল।

আমি বলছি না, বলছি ওর হাত যা বলছে।

মাতামহ বললেন, আমার মতে ওকে ইনশিয়োরেন্সের লাইনে দাও। বেশ পাকা পাকা কথা বলতে পারে। ঝপঝপ ক্লায়েন্ট ধরবে আর ফেঁপে ফুলে উঠবে।

বলেছেন ভাল, মৎস্য ধরিবে, খাইবে সুখে। ইনশিয়োরেন্স একটা লাইন হল?

কেন? আমাদের ভবেশকে দেখো। কী থেকে কী হয়েছে!

অক্ষয়বাবু বললেন, আমার অ্যাস্ট্রোলজি যদি ঠিক হয়, তা হলে এ ছেলে ফাইন আর্টসের লাইনে যাবেই। কেউ ঠেকাতে পারবে না। অভাব হবে না, তবে চোট খাবে।

চোট খাবে মানে?

সে আমি পরে আপনাকে বলব। সাদা কাগজে একফোঁটা কালি।

আই সি, আই সি, তুমি কী মিন করছ বুঝতে পেরেছি।

আমি আজ উঠি হরিদা। অক্ষয়বাবু উঠে পড়লেন।

কবে পা সামলে অফিসে বেরোতে পারব জানি না। পারলে একবার এসো।

অক্ষয়বাবু সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করলেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, হরিদা, গোটাকয়েক টাকা দিতে পারবেন! পকেট একেবারে খালি।

একেবারে খালি! মাতামহ যেন বেশ আনন্দ পেলেন।

পিতা চশমার খাপ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমাকে বললেন, এই নাও দিয়ে দাও। এতে হবে তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব হবে। আমি আপনাকে মাস কাবারে শোধ করে দেব।

সে দেখা যাবে। তুমি আপাতত কাজ চালাও।

অক্ষয়বাবু সিঁড়ির কাছাকাছি গেছেন, হঠাৎ বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কে একজন জড়ানো জড়ানো গলায় চিৎকার করে উঠল, শালা হরিশঙ্কর, তুমি বড় বাড় বেড়েছ। তোমার বাপের নাম আমি ভুলিয়ে দোব।

পিতা তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, টাল সামলাতে না পেরে আবার চেয়ারেই বসে পড়ে বললেন, এ ব্লাডিবাগারটা আবার কে?

আমরা তিনজনে জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। অক্ষয়বাবু বললেন, লোকটা কে? চেনা?

হ্যাঁ, জবার কাকা। জবা বলে একটা মেয়ে, তারই কাকা।

মাতামহ বললেন, ব্যাটা মদ খেয়েছে।

অক্ষয়বাবু বললেন, হরিদাকে গালাগাল দিচ্ছে।

জানলায় তিনটে মুখ দেখে বীরত্ব খুব বেড়ে গেল। পা টলছে, হাত ছুড়ে বললে, নেমে আয় শালা।

মাতামহ হুংকার ছেড়ে বললেন, ব্যাটাচ্ছেলে, নামলে যে তোর পুঁটকি প্যাঁক হয়ে যাবে।

জবার কাকা বেসামাল পায়ে নাচতে নাচতে বললে, নেমে আয় শালা পেঁড়িদারের দল।

মাতামহ অসহায় মুখে পিতার দিকে তাকালেন, কী করব হরিশঙ্কর? ঝেড়ে আসব এক লাথি?

অক্ষয়বাবু বললেন, আপনাকেই তো বলছে মনে হয়, একটা ধোপার আছাড় মেরে আসব?

তথাগতের মতো হাত তুলে পিতা বললেন, ভায়োলেন্স বিগেটস ভায়োলেন্স, খিস্তি বিগেটস খিস্তি। তুমি শুধু যাবার সময় একটা টুসকি মেরে খানায় শুইয়ে দাও। মাতালস্য কর্দম গতি।

My good blade carves the casques of men.

সারারাত জ্বরের ঘোরে পিতা বলতে লাগলেন, তুমি এসেছ? তুমি এসেছ?

আমি তো পাশেই বসে আছি। কী করব কিছুই জানি না। ডাক্তারবাবুকেও ডাকা হল না। গল্পে গল্পে রাত বেড়ে বসে রইল। রাত অনেকটা সরীসৃপের মতো। ক্রমশ বড় হতে হতে বড় হতে হতে, ভোরের দিকে অন্ধকারের ন্যাজটি টেনে নেয়।

তুমি এসেছ বলায় প্রথমে ভেবেছিলুম, আমাকেই বলছেন বোধহয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এসেছি। পিতা বললেন, একটু দাঁড়াও, আমিও আসছি।

তখনই বুঝলুম, এ তুমি আমি নই, অন্য কেউ। জ্বর বাড়লে জলপট্টি লাগায়। সে চেষ্টাও করে দেখলুম। এমন হাতের ঝাপটা মারলেন, জলের বাটি উলটে বিছানার চাদর ভিজে গেল। চাদরের তলায় পাট পাট খবরের কাগজ ঢুকিয়েছি।

শব্দহীন মধ্যরাত। ঘড়ির পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সময়ের সান্ত্রি যেন কয়েদের বাইরে পায়চারি করছে। ফাঁসির আসামি শেষ রাত জাগছে। পরমায়ু থেকে একটি দিন না নিয়ে সে যাবে না। ভোরের শমীবৃক্ষে দিনের প্রাণদণ্ড। সায়েব হলে ইংরেজিতে কবিতা লিখতুম, এভরি মর্নিং এ ডে ইজ হ্যাঙ্গড। মিনিট গলে যাচ্ছে ঘণ্টায়, ঘণ্টা চুঁইয়ে পড়ছে দিনে। দিন যায়, আর আসে না।

ভোরের আকাশ কতদিন দেখিনি! কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। রুগি এখন শান্ত। পৃথিবীর যত কিছু বাড়াবাড়ি সবই যেন মধ্যরাতে। খুনির খুন, চোরের চুরি, সাধকের ঈশ্বর দর্শন, রুগির রোগ, সবই যেন তুঙ্গে আরোহণ করে বসে থাকে। শুনেছি আত্মহত্যার ইচ্ছেও প্রবল হয়ে ওঠে। পাগলের পাগলামিও বেড়ে যায়। রাতের কী মহিমা!

মানসবাবু খুরখুরে একটা কুকুরের বুকে চামড়ার ক্রস বেল্ট বেঁধে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছি। চোখ জ্বালা করছে। রাতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। মুখেচোখে ভোরের ঠান্ডা বাতাস বেশ লাগছিল। মানসবাবু হঠাৎ গোঁত করে আমাদের সদরে ঢুকে পড়ে কড়া নাড়তে শুরু করলেন। নাও বোঝো ঠ্যালা। সাতসকালেও শান্তি নেই। কুকুরটা মেয়েলি গলায় খেঁউ খেঁউ করছে।

দরজার খিল খুলতেই মানসবাবু লম্বা পা ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন, হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর। বাবার খুব জ্বর, শেষরাতে সবে একটু ঘুমিয়েছেন।

ধমকের সুরে মানসবাবু বললেন, ঘুমিয়েছেন বলে আমি একটু খোঁজখবর করব না! তোমার আচ্ছা আবদার তো! তুমি আগে জন্মেছ, না আমি আগে জন্মেছি হে ছোকরা!

মানসবাবু আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। উঠছেন আর বলছেন, ব্বাবাঃ সিঁড়ি করেছ বটে! কাশীর সিঁড়িকেও হার মানায়!

আমাকে পেছন পেছন উঠতে দেখে কুকুরটা খুব অসন্তুষ্ট হচ্ছে। ফিরে ফিরে তাকায় আর ফিনফিনে গলায় খেঁউ খেঁউ করে ওঠে। এইসময় মাতামহ থাকলে বুঝিয়ে দিতেন ঠ্যালা। বাড়িতে ডাকাত পড়ার অবস্থা। পিতা মশারির ভেতর উঠে বসেছেন। না বসে উপায় কী!

মানসবাবু দরজার সামনে। কুকুর চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতরে। এই যে হরিশঙ্কর, উঠেছ?

কুকুর সেই এক প্রশ্ন নিজের ভাষায় রিপিট করল। মশারিটা আঁচড়াবার খুব ইচ্ছে। বকলশে টান পড়ছে বলে তেমন সুবিধে করতে পারছে না।

পিতা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি কীরকম গুড স্যামারিটান দেখো, ভোর না-হতেই তোমার খবর নিতে এসেছি। দু'দিন মেয়ের বাড়িতে ছিলুম। জামাই নতুন গাড়ি কিনেছে। বুড়োকে খুব ক'দিন ঘোরালে। কাল রাতে তুমি গাড়ির শব্দ শোনোনি?

অতটা খেয়াল করিনি।

রাত ন'টার সময় জামাইয়ের গাড়িতেই তো ফিরলুম। আজ সকালের প্লেনে দিল্লি যাবে। ওই করে বেড়াচ্ছে বুঝলে? ক'দিন আর কলকাতায় থাকে? হিল্লিদিল্লি করেই জীবন কাটালে। আর উপায় কী বলো? অত বড় ইঞ্জিনিয়ার ভারতে ক'জন আর আছে। হাতে গোনা যায়। অ্যাঁ, কী বললে!

কুকুরের ডাকের পাংচুয়েশনে কথা চলেছে। কমা ফুলস্টপের গোলমালে শ্রোতারা তেমন মর্মোদ্ধার করতে পারছেন না। পিতা ছোট্ট একটি হাই তুলেছিলেন।

কই না, কিছু বলিনি তো?

মানসবাবু আদুরে গলায় কুকুরকে ধমক লাগালেন, যেন বক্তার স্ত্রীকে থামাতে চাইছেন, আঃ, বিউটি, চুপ করো না। ও তো আমাদের হরিশঙ্কর। ওকে অত ঘেউ ঘেউ করার কী আছে। ও, মাথায় মুড়ি দিয়ে বসে আছে বলে তোমার অপছন্দ হচ্ছে। কী কুকুরই হয়েছ তুমি? একেবারে সায়েব বাস্‌সা! অ্যাঁ, কী বললে?

আজ্ঞে, না, কিছু বলিনি তো?

শুনলুম, তুমি নাকি নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সে-এ-এ, কীই-ই? আমরা যে বলতুম, চরিত্র দেখতে চাও তো হরিশঙ্করের চরিত্র? সেই চরিত্রে তা হলে স্পট পড়ে গেল?

আজ্ঞে হ্যাঁ। স্পটেড ডিয়ার।

অ্যাঁ, কী বললে?

ছিলুম বাঘ, এখন হয়েছি গুলবাঘ।

হ্যাঁ, চরিত্র ঠিক রাখা বড় কঠিন ব্যাপার! মুনি ঋষিদের জীবনটাই দেখো না। বিন্ধ্যাচল থেকে হিমালয় থেকে সাধন ভজন করে ঊর্ধ্বরেতা হয়ে সমতলে নেমে এলেন। জেলেনি জাল ফেলছে জলে। ব্যস হয়ে গেল। খেল খতম, পয়সা হজম। বউমা মারা যাবার পর তোমাকে আমি বলেছিলুম, বারবার বলেছিলুম, আমার একটি বয়স্কা শালি আছে। গুণে তার তুলনা নেই। রূপেই যা একটু গড়বড়ে। মুখে একটু পক্সের দাগ। তুমি কিছুতেই দার পরিগ্রহে রাজি হলে না। বয়েস তোমার এখনও যায়নি হরিশঙ্কর। বলো তো রাস্তা ওপেন আছে।

উচ্ছিষ্টে আমার রুচি নেই।

অ্যাঁ, কী বললে?

আজ্ঞে, উচ্ছিষ্টে অরুচি।

তার মানে?

আপনার স্ত্রীর আত্মহত্যা।

আত্মহত্যা! সে তো স্টোভ ফেটে মারা গেল।

আপনি তাই বলেন, আপনার গুড স্যামারিটানরা তা বলে না। তারা একটু অন্যরকম গন্ধ পায়। ডিফ্যামেসান কেস করব।

সময় পেরিয়ে গেছে।

তুমি ছোটলোক, ইতর।

মানুষ সম্পর্কে মানুষের ধারণা মেলে না। ওপিনিয়ান ডিফারস।

আমি কিন্তু তোমার শত্রু হয়ে রইলুম। সুযোগ পেলেই এর শোধ নোব।

এই যে একটু আগে বললেন, আপনি আমার গুড স্যামারিটান।

আমি উইথড্র করছি।

দেন ইউ ক্যান সেফলি ক্লিয়ার আউট। ডোন্ট পোক ইয়োর আগলি নোজ ইন মাই অ্যাফেয়ারস। তোমার বাঁশ তৈরি হচ্ছে, হরি।

বাঁশ আমি খুলতে জানি। বাঁশঝাড়ের দেশের মানুষ আমি। বাঁশ দিতেও জানি, বাঁশ খুলতেও জানি। দেখা যাক আপনার বংশ কোন জাতের।

মানসবাবু কুকরটাকে কোলে তুলে নিলেন। ঘেউ ঘেউ কিছুতেই থামেনি। বাচ্চা-কোলে সিনেমা দেখতে এসেছিলেন কোনও মা। কান্না যেন আর থামে না। আঁচল সরিয়ে অন্ধকারে স্তন্যপান করাও। তবে যদি শান্ত হয়। মানসবাবুর তো স্তন নেই। গোঁফ আছে বিরাট।

সিঁড়ির একটা ধাপ নেমে বললেন, মনে থাকে যেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ, থাকবে।

শুভানুধ্যায়ীকে শত্রু করলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্যামোফ্লেজ আর রইল না। যুদ্ধ সহজ হবে। আপনার সেই ভাইয়ের কী হল? মকর্দমা মিটেছে?

দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস।

আমারও ওই একই উত্তর, তবে ইংরেজিতে নয়, বাংলায়— নিজের চরকায় তেল দিন।

মানসবাবু সরে পড়লেন। পিতা মশারি ঠেলে বেরিয়ে এলেন। গতকাল দাড়ি কামানো হয়নি। কদমফুল ক্ষীরে পড়ে গেলে যেরকম চেহারা হয়, মুখের চেহারা সেইরকম। আমাকে বললেন, কী বুঝলে?

খুব খারাপ।

খারাপ? খারাপ কেন?

ক্রমশই শত্রু বাড়ছে।

তুমি কি এতকাল সব বন্ধু ভাবতে? ইও আর এ ফুল। মানুষ কখনও বন্ধু হয়? বিশেষত প্রতিবেশী। ভাল হল, ভাল। খোঁচা মারলেই সরীসৃপের জাত বেরিয়ে পড়ে। জাত চেনা হয়ে গেলে নাড়াচাড়া করতে আর অসুবিধে হয় না। জেনে রাখো, তুমি এবং তুমিই। বুঝলে কিছু?

আজ্ঞে না।

এক দিকে তুমি, আর এক দিকে তোমার জগৎ। চালিয়ে যাও লড়াই। শক্তি থাকে জিতবে, নয়তো হেরে ভূত হয়ে যাবে।

মানুষকে শুধু শুধু চটিয়ে লাভ কী?

মানুষ? মানুষ নামক জন্তুকে তুমি কতটুকু চেনো? প্রায় হাফ এ সেঞ্চুরি ধরে আমি মানুষকে দেখছি। মানুষের মতো নিষ্ঠুর, পরশ্রীকাতর, নীচ, স্কিমিং, ক্যালকুলেটিং প্রাণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় পাবে না। তুমি তো এখন যুবক?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার সব গ্ল্যান্ডসই এখন ফুল সিক্রিশনে। হরমোন, থাইরয়েড, পিটুইটারি। তোমার জানা উচিত সাবকনশাস কীভাবে কনশাসে উঠে আসে। মানুষ কোন উৎস থেকে তার আচার আচরণের নির্দেশ পায়, মন কাকে বলে, তার কতটা সাব-মার্জড কতটা ফ্লোটিং, এ বিষয়ে তোমার কোনও পড়াশোনা আছে?

আজ্ঞে না।

ব্রাহ্মণের ছেলে। পইতে হয়েছে! ত্রিসন্ধ্যা করো। ভূতশুদ্ধি কাকে বলে জানো?

আজ্ঞে না।

সবেতেই তোমার না। কী জানো হে তুমি? পাপ পুরুষের ছবি দেখেছ? দেখোনি? তান্ত্রিক সন্ধ্যোপাসনায় আছে। শিরে ব্রহ্মহত্যার চিন্তা, বাহুতে চৌর্যবৃত্তি, হাত নিসপিস করছে, কী করে মেরে নোব। আর কটিদ্বয়। সবচেয়ে মারাত্মক স্থান। ব্যভিচারের উৎস। হোয়াট ইজ লিবিডো?

আজ্ঞে, আমি যে ওসব কিছুই জানি না।

তোমার মুখ দেখলে আমার মায়া হয়। দিস ওয়ার্লড ইজ নট ইয়োর প্লেস, মাই ডিয়ার সান। তোমার জন্যে চাই কিং আর্থারের আইল্যান্ড ভ্যালি অফ অ্যাভালন। মৃত্যুর পর যে-দ্বীপে গিয়ে তিনি আর ফেরেননি।

Where falls not hail/or rain/or any snow/
nor ever blows wind loudly/but it lies.
Deep meadowed/fair with orchard lawns.

কোথায় পাবে তুমি সেই সুখের দ্বীপ। পৃথিবী বড় কঠিন জায়গা। তাই তো জন্মের মুহূর্তে আমরা ককিয়ে কেঁদে উঠি। মাই প্যারাডাইস ইজ লস্ট। যদি মেয়ে হও পুরুষের লালসার জেলিতে আযৌবন বগবগ করবে। যেই বার্ধক্য হল, চলে গেলে আঁস্তাকুড়ে। যদি ছেলে হও, তোমাকে ক্রীতদাস বানাবার জন্যে জগৎ চাবুক হাতে তেড়ে আসবে। ক্ষমতাশালী বলবে, নে ব্যাটা আমার পদলেহন কর। দুর্বলও তোমাকে ছাড়বে না। মাছির মতো ভনভন করবে চারপাশে। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, উপহাসের ছিটে মেরে উত্যক্ত করবে। সো, হাউ টু লিভ? তেড়ে ওঠো। বৈষ্ণব নয়, শাক্তের শক্ত হুংকার,

My good blade carves the casques of men/
My tough lance thrusteth sure/
My strength is the strength of ten/
Because my heart is pure.

আপনি এইসব বলছেন? প্রেম বলে কি কিছু নেই? আমাদের বন্ধু বলে কি কিছু নেই? এমন সাংঘাতিক নিষ্করুণ পৃথিবী আমার কল্পনায় আসে না।

পৃথিবীতে তুমি করুণা খুঁজতে এসেছ? মাই ডিয়ার ফুল। ওই বইটা নিয়ে এসো। থার্ড ফ্রম দি লেফট। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা। গিরীন্দ্রশেখর বসুর স্বপ্ন। দাও। হিয়ার ইট ইজ। নাও পড়ে দেখো। গল্পের বই কবিতার বই না পড়ে মাঝে মাঝে এইসব বই পড়ে দেখতে পারো। নিজেকে জানতে পারবে। মানুষকে জানতে পারবে।

বইটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। ভোর হতে-না-হতেই কী অশান্তি! পেনসিলে সূক্ষ্ম দাগ দেওয়া অংশটা পড়ে দেখতেই হচ্ছে। এরপরেই যে প্রশ্ন হবে, উত্তর না দিতে পারলেই তো মাই ডিয়ার ইডিয়েট। 'পরকে মারিব, এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছা, নিজে মার খাওয়া।' পাশে মুক্তাক্ষরে নোট, পাতা ৮৩, চিহ্নিত অংশ। 'কামবৃত্তির বিকাশ কোনও একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমও সেই আদি কামভাবেরই রূপান্তর নহে। সেইরূপ, সখিত্ব বন্ধুত্ব ইত্যাদির মূলেও কামগন্ধ রহিয়াছে।' পরের চিহ্নিত অংশ, 'দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে একটি রুদ্ধ ইচ্ছারূপে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছা, স্ত্রীলোকের নিপীড়নের ইচ্ছা, পুরুষের রূপ দেখাইবার ইচ্ছা ও স্ত্রীলোকের রূপ দেখিবার ইচ্ছা অজ্ঞাতভাবে মনের মধ্যে থাকে। পরের অধীনে চাকরি করিবার ইচ্ছা পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র।' পাশে খুদে অক্ষরে সংস্কৃত দু'ছত্র, কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি। মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ॥ বিশ্বজগৎ কামনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বাথরুমে স্নানের শব্দ। সর্বনাশ, জ্বরের রুগি স্নান করছেন।

চান করছেন নাকি?

ঝরনা যেন উত্তর দিল, কেন, আপত্তি আছে?

আপনার জ্বর, পা ক্ষতবিক্ষত, চান করছেন কী?

একে বলে হাইড্রোথেরাপি। শরীরের গরম বার করে দিচ্ছি। ভয় পাবার কিছুই নেই। মোটরগাড়ি দেখেছ?

দেখিছি।

র‍্যাডিয়েটার কাকে বলে জানো?

জানি।

জল ঢেলে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখতে হয়। প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব।

তোড়ে জল পড়তে শুরু করল। কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির সামনের রাস্তায় হুড়মুড় করে একগাদা টিনের কৌটো পড়ার শব্দ হল। তিরিক্ষি গলায় কে যেন বললেন, যাঃ শালা।

পরমুহূর্তেই হুড়মুড় করে আর একটা শব্দ হল। শব্দের পরেই নারীকণ্ঠ, লাথি মারছ কেন?

পুরুষকণ্ঠ, না লাথি মারবে না, নাতজামাইকে আদর করবে!

কথা শেষ হতে না-হতেই আবার শব্দ। একটা ঢোল গড়িয়ে পড়লে যেরকম শব্দ হতে পারে সেইরকম। পুরুষকণ্ঠ গর্জন করে উঠল, মারেগা শালা এক ঝাপ্পড়।

হামারা কেয়া কসুর?

একটা চড় মারার শব্দ। নারীকণ্ঠ, শুধু শুধু লোকটাকে মারছ কেন?

না মারবে না, দাড়ি ধরে চুমু খাবে!

কী হচ্ছে কী? জানলার ধারে গিয়ে দেখতে হচ্ছে। বাড়ির সামনে একটা টানা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। চুল-ওলটানো খেঁকুরে চেহারার এক ভদ্রলোক। গায়ে লেসের কাজ করা পাঞ্জাবি। হাতায় মিহি গিলে। ভদ্রলোক খুব হম্বিতম্বি করছেন। বুড়োটে রিকশাঅলা গামছা নেড়ে নেড়ে বলছে, কাহে হাত উঠায়া, কাহে হাত উঠায়া?

ভদ্রলোক তিড়বিড় তিড়বিড় করতে করতে বলছেন, তুম হামারা সর্বনাশ কর দিয়া। রিকশায় এক ভদ্রমহিলা কোনওরকমে বসে আছেন। বেশ স্বাস্থ্যবতী। তাজা টেপারির মতো দেখতে। কোলের ওপর একগাদা জিনিসপত্র। রাস্তায় গোটাকতক টিনের কৌটো গুরুর সামনে ভক্তের মতো গড়াগড়ি যাচ্ছে। একটা বড় কৌটো ভেতরের মাল ছেড়েছে। একগাদা বড়ি ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। একটা তবলা একপাশে ডিগবাজি খেয়েছে।

ভদ্রমহিলা বলছেন, আর বসতে পারছি না। কতক্ষণ পায়ের ভরে বসে থাকা যায়।

ভদ্রলোক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, নেমে এসো না সুন্দরী। কেউ তো তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে টঙে উঠে বসে থাকতে বলেনি।

মহিলাও একই রকম খিঁচিয়ে উত্তর দিলেন, কোলের জিনিসগুলি না ধরলে নামা যায়?

এঁরা কারা? কোথায় চলেছেন? হঠাৎ এখানে থামলেন কেন?

ভদ্রলোক হঠাৎ ওপর দিকে তাকাতেই আমার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তোবড়ানো গালে একমুখ হাসি। নিমেষে এমন ভাবান্তর ভাবা যায় না। চেঁচিয়ে বললেন, এই যে মাস্টার, ফাদার কোথায়?

ভদ্রমহিলা সেই মুহূর্তে নামার চেষ্টা করায় কোল থেকে আবার একটা কৌটো সশব্দে গড়িয়ে পড়ল। রত্নগর্ভা শুনেছি, এমন কৌটোগর্ভা কদাচিৎ দেখা যায়।

ভদ্রলোকের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মহিলাকে দাবড়ে উঠলেন, তেরি নোলে খেলি। এ আবার কী ভাষা! আবার ওপর দিকে তাকালেন। সেই গাল-ভাঙা হাসি। মেঘ-ভাঙা রোদের মতো। ফাদার, মাস্টার কোথায়!

যাঃ উত্তেজনায় সব গুলিয়ে ফেলেছেন! ডেকে দোব?

ইয়েস, ইয়েস। ডেকে দাও। উই কাম।

ভদ্রলোকের চালচলন যেন দু'মুখো ছুরির মতো। একবার এদিকে কাটছেন, একবার ওদিকে কাটছেন। মহিলার দিকে ফিরে বললেন, নামতে পারছ না? তখনই বলেছিলুম ভীম ভবানীর মতো গতর কোরো না।

পিতা সবে বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন। গায়ে তোয়ালে জড়াননা। পায়ের ব্যান্ডেজ জায়গায় জায়গায় সামান্য ভিজেছে।

সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক আপনাকে ডাকছেন।

আকৃতি?

চেহারার বর্ণনা শুনে বললেন, ও, প্রফুল্ল এসেছে। কোনও নোটিশ না দিয়েই চলে এল! বিপদে ফেললে।

তোয়ালে জড়ানো অবস্থায় জানলার সামনে গিয়ে বললেন, কী খবর প্রফুল্ল?

আমার আসার ঠিক ছিল না। হঠাৎ চলে আসতে হল।

বেশ করেছ, চলে এসো ওপরে।

আর এক খেপ মাল আসবে। নিয়ে আসি তা হলে।

যাও নিয়ে এসো।

এই স্ত্রীলোকটি রইল।

ওপরে পাঠিয়ে দাও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি একটু তদারকি করো। নীচে অনেক ঘর পড়ে আছে, সেইখানেই থাকবে। অনেক আগে একবার বলেছিল। কথার কথা। আজ দেখছি এসেই পড়েছে। নীচেটা ভূতের বাসা হয়ে আছে, এতদিনে মানুষের হাত পড়বে।

মাহেশে রথ দেখতে গিয়ে মাতামহ এক মহিলাকে দেখে বলেছিলেন, আহা! মা যেন রাবণলক্ষ্মী।

রাবণলক্ষ্মী কী জিনিস দাদু!

মালক্ষ্মী একটু স্থূলাঙ্গী হলেই যক্ষপুরীর লক্ষ্মী হয়ে যান।

প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীকে দেখে আমার সেইরকমই মনে হল। বেশ একটা জমজমাট অস্তিত্ব। এত চওড়া পাড় শাড়ি আমি আগে দেখিনি। ঠোঁটদুটো লাল টুকটুকে। স্যানাটোরিয়াম থেকে বেরিয়ে এলে মানুষের এইরকম

দুধেআলতা চেহারা হয়। কী মানুষের কী স্ত্রী। প্রবীণা মহিলা হলে বলতেন বাঁদরের গলায় চাঁদমালা।

একগাদা জিনিসপত্রের মাঝে মহিলা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন।

আপনি ওপরে চলুন।

বড় বড় চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আমাকে যে এখানেই দাঁড়াতে বলে গেল।

তাতে কী হয়েছে।

এসে দেখতে না পেলে কুরুক্ষেত্র করবে। আমি বরং এই রকটায় বসি।

একটা ছাগল এসে বড়ি খাচ্ছিল বেশ তারিয়ে তারিয়ে, চোখ বুজিয়ে। হুঁ হুঁ করে মাঝেমধ্যে শব্দ ছাড়ছিল। হঠাৎ তিড়বিড় করে লাফাতে শুরু করল।

মহিলা বললেন, ঝাল লেগেছে। এর নাম পাঞ্জাবি বড়ি। কত কষ্ট করে দিয়েছিলুম। সব রাস্তায় পড়ে গেল। সব ব্যাপারে এত হাঁকপাঁক করে।

রকে বসে পড়লেন। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। আমাদের নীচেটা যেন যক্ষপুরী। এখানে বসবাস করবেন কী করে! অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে।

মহিলা বললেন, সারাটা দিন চলে যাবে এইসব পোস্কারঝোস্কার করতে। কী হয়ে আছে! মেয়েদের হাত না পড়লে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী ফেরে না।

ছাগলটা আবার বড়ি খেতে শুরু করেছে। ঘাসপাতা খাওয়া মুখে নতুন ধরনের স্বাদ। ছাগলের কখনও পেট খারাপ হয় না। এমন লিভার, যাই খাক না কেন, সেই ছাগলনাদি।

বাকি মালপত্র নিয়ে প্রফুল্লবাবু এসে পড়লেন। তিন ভাগ পাকা, এক ভাগ কাঁচা চুল, টান টান করে পেছনে ওলটানো মুখে একটা সিগারেট। কথা বললেই পিড়িক পিড়িক করে নাচছে।

পিতা চাবির গোছা নিয়ে নীচে নেমে এলেন, খুব সাবধানে, ধীরে ধরে ধরে। প্রফুল্লবাবু বললেন, জুতো মেরে চলে এলুম।

সেকী, মামাকে কেউ জুতো মারে?

জুতো মারার কাজ করলে জুতোই মারতে হবে। ফুল গেঁদুয়া নয়। নাও নাও, প্রণাম করো। ব্রাহ্মণ মানুষ। একী তোমার পায়ে আবার কী হল?

চোট লেগেছে।

তা হলে নেমে এলে কেন? ব্যাটাচ্ছেলে আমার তবলাটা দুম করে রাস্তায় ফেলে দিলে। দেখি একবার, ঘাটফাট সব ঠিক আছে কি না!

রকে বিড়ে সমেত তবলা বসিয়ে টাঁই করে একটা চাঁটি মেরে কিছু কুচো বোল ছাড়লেন। যেন চকমকি খেলে গেল। দেখতে যেমনই হোক গুণী মানুষ।

পিতা বললেন, আহা আহা, একটা হাত করেছ বটে প্রফুল্ল। ঘুরিয়ে এনে তেহাইয়ে ফেলল।

প্রফুল্লবাবু তিনটে তেহাই মেরে ডান হাতটা আকাশের দিকে তুলে দিলেন। শ্রীমতী প্রফুল্ল মাথায় ঘোমটা টেনে কলাবউয়ের মতো একপাশে দাঁড়িয়ে।

মুখোমুখি দুটো ঘর খোলা হল। একটা বেশ বড়, আর একটা একটু ছোট। ছোট ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনের বেলাতেই চোখ চলে না। প্রফুল্লবাবু ঘর দেখে বললেন, বাঃ বাঃ বেশ হবে, একটা শোবার, একটা রাঁধার। নাও হে লেগে পড়ো। পারবে তো সব গোছগাছ করতে!

পিতা বললেন, আমার পা-টা ঠিক থাকলে তোমাদের সঙ্গে লেগে যেতুম।

না না, ও একাই পারবে। আমাকে আবার এখুনি বেরোতে হবে। মুরগিহাটায় কাজ আছে।

সেকী, একা সব সামলাবে কী করে, যেখানে এক রেজিমেন্ট লোকের প্রয়োজন।

ওঃ, তুমি ওকে চেনো না। একাই একশো।

ভদ্রমহিলা দেয়ালের দিকে মুখ করে বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, শরীর যখন খারাপ, আমি কি বেঁধে দোব? আমার ছোঁয়া খেতে ওনার যদি আপত্তি না থাকে!

ঠিক বলেছ। ঠিক বলেছ। সত্যিই তো। শরীর যখন খারাপ তোমারই সেবা করা উচিত। হরি, তোমার কি জাতের বিচার আছে?

জাত! তা হলে তো আমাকে বড় বিপদে ফেললে। যদি বলি আছে, তা হলে দুঃখ পাবে, যদি বলি নেই, তা হলে রাঁধতে বসবে। আমি আমার জন্যে কাউকে খাটাতে চাই না।

শ্রীমতী প্রফুল্ল নিচু হয়ে প্রণাম করে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। প্রফুল্লবাবু বললেন, মারো গোলি।

মারকাটারি বগল চাপ কারবারে গুনচট

ডাকে একটা চিঠি এল। খামের বুকে পাতলা কাগজের জানলা বসানো। সেখান থেকে উঁকি মারছে আমার নাম। ভেতরে টাইপ করা চিঠি। বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান ইন্টারভিউতে ডেকেছেন। যাবতীয় কাগজপত্র নিয়ে সাত দিন পরে সকাল দশটার সময় উপস্থিত হবার সংক্ষিপ্ত আদেশ। যাক এতদিনে তবু একটা ডাক এল। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ। খুবই আতঙ্কজনক ব্যাপার। কনে দেখার মতো। একটু হাঁচো তো মা। একটু কাশো তো মা। দু'লাইন কবিতা বলো তো মা। সামনে দিয়ে দু'পা হেঁটে যাও তো মা। সাধারণ চাকরি। কী আর এমন জিজ্ঞেস করবে। বি সি এস কি আই সি এস হলে চিন্তার ছিল। চাকরিটা যদি হয়ে যায়, তা হলে বেশ মজা হয়। গোঁফ বেরোলেই কি সাবালক হয়! বেড়াল তো গোঁফ নিয়েই জন্মায়। সাকার না হলে আকার আসে না।

টেবিলের ওপর গোল একটা আয়না বসিয়ে পিতা চিবুক উলটে দাড়ি কামাচ্ছেন। হাতে কায়দা করে ধরা সেই বাটলার ক্ষুর। বেঁটে ঝকঝকে ফলা। বাঁটটা ভারী সুন্দর। ওটা নাকি হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি। সোনালি পিন দিয়ে আঁটা। রূপসির নাকছাবির মতো ঝিলিক মারছে। সড়াক করে টান মারছেন। সাবানের ওপর দিয়ে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি হচ্ছে। দাড়ি কামাতে বেশ সময় লাগে। সোজা টান, উলটো টান। মাঝে মাঝে হাত বুলোনো। কড়কড় করলেই উলটো টান।

প্রশ্ন করলেন, কার চিঠি? ইনশিয়োরেন্সের?

আজ্ঞে না, ইন্টারভিউ।

তাই নাকি? তা হলে জীবিকার জগতে ঢুকলে? কোন প্রতিষ্ঠান?

সি এইচ লরেন্স।

প্রাইভেট ফার্ম। একজন ডিরেক্টারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সত্যিই যদি চাকরিটা চাও তা হলে একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।

নিজের জোরে কী হয় দেখি না।

বাঃ, এই তো চাই। পুরুষকার তৈরি হচ্ছে।

উত্তর দিক থেকে একঝলক ধোঁয়া এসে ঘরে ঢুকল। নীচে প্রফুল্লকাকার স্ত্রী তোলা উনুনে আগুন দিয়েছেন। পিতা বিরক্ত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমি যেন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়েছি, সরাসরি তাঁর মুখে। আমতা আমতা করে বললুম, আজ্ঞে, ধোঁয়া।

হ্যাঁ, ধোঁয়া। স্মোক নুইসেন্স। সহ্য করা শক্ত।

রাঁধতে গেলে আগুন তো দিতেই হবে।

তুমি কি ও-তরফের অ্যাডভোকেট?

যা বাব্বা! নীচের তলায় থাকার জন্যে আমি ওঁদের ডেকে এনেছি নাকি! পিতা সুর পালটে বললেন, মহিলা রাঁধেন ভাল। সেদিন ধোঁকা কেমন খেলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অসম্ভব ভাল বেঁধেছিলেন।

প্রায় বছর দশেক পরে আমি ধোঁকা খেলুম। তোমার মা রাঁধতেন ভাল। তবে জীবনটা তো বড় সংক্ষিপ্ত ছিল। খেলা না ফুরাতে, খেলাঘর ভেঙে সরে পড়ল। চলবে না।

আসা-যাওয়ায় তো মানুষের হাত নেই।

আরে দুর, উনুন না-ধরালেই ধোঁয়া আসবে না। এর চেয়ে সহজ সমাধান আর কী আছে।

না, আমি ভেবেছিলুম, আপনি মানুষের আসা-যাওয়ার কথা বলছেন।

আরে না না, মানুষ তো আসবে-যাবে। ইন্টারন্যাল প্রসেস।

একফালি চামড়ায় সটাসট বারকতক ক্ষুর শানিয়ে নিলেন। গালে আবার একবার সাবান চাপছে। হাত থামিয়ে বললেন, ডেকে আনো।

কাকে? কাকিমাকে?

গবেট। কোনও পুরুষ পরস্ত্রীকে ডাকতে পারে? প্রফুল্লকে ডেকে আনো।

প্রফুল্লকাকার স্ত্রীর নামে সাবেক কালের একটা গন্ধ আছে, আঙুরবালা। ভদ্রলোক আদুরে গলায় ডাকেন, আঙুর। ও আঙুর। মহিলার বরাতে স্বামীর আদরের চেয়ে অনাদরই বেশি জোটে। যে-ক'দিন এসেছেন, তার মধ্যেই দু'-এক পক্কড় চড়চাপড়ও হয়ে গেছে। মহিলা সত্যিই অসম্ভব কাজের। নীচেটাকে কেমন তকতকে ঝকঝকে করে ফেলেছেন। পাতকোতলা থেকে যে নর্দমাটা সোজা সদর রাস্তার নর্দমার দিকে পড়েছে, সেটা এতকাল খোলাই থাকত। আঙুর কাকিমা লম্বা কাঠ পেতে নগ্নতা ঢেকেছেন। বিচিত্র বোদা গন্ধটা আর নেই।

হুট করে নীচে নেমে বড় অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। সকালের দিকেই যে প্রফুল্লকাকার এমন সোহাগ পেয়ে বসে আছে, কী করে জানব। কিছু একটা করছিলেন, আমার ডাক শুনে চমকে ফিরে তাকালেন। একটু অপ্রস্তুত ভাব।

এই যে মাস্টার পিন্টু?

আঙুর কাকিমা তাড়াতাড়ি ঘরের অন্ধকার অংশে সরে গেলেন।

আপনাকে বাবা একবার ডাকছেন।

অ্যাঁ, ডাকছে! এ পোশাকে যাই কী করে। হ্যাঁগা, এই ফুলফুল শাড়ি পরে যাওয়া যাবে।

স্ত্রী সমর্থন করলেন না। উনি রাগী মানুষ। শাড়ি পরে যাবে কী করে? ধুতি পরে যাও।

ভাঁজ করা শাড়ি ছেড়ে ধুতি পরতে হলেও যে বিড়ি ধরাতে হয় এই প্রথম দেখলুম। উনুন থেকে কাগজে করে আগুন তুলে নিলেন। মুখে এখনও দাঁত পরেননি। বিড়ির টানে চোপসানো গাল আরও চুপসে গেল। বাজপাখির ঠোঁটের মতো নাক আর ছিটেগুলির মতো দুটো চোখ ছাড়া মুখে আর কিছু আছে বলে মনে হল না। ঠোঁটের ফাঁকে বিড়ি, চামচের মতো দুটো চোখের রসগোল্লা তুলছে আর নামাচ্ছে। গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি।

সারাগায়ে গুলির বাহার। ঠেলে ঠেলে আছে। যাঁরা উপযুক্ত আহার ছাড়া রিঙে ব্যায়াম করেন তাঁদের চেহারাই এইরকম পাকতেড়ে হয়।

কী বলছ হরি, কী বলছ হরি, করতে করতে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন। হাতকাটা গেঞ্জিটা ছাড়লে পারতেন। স্যান্ডো গেঞ্জি পরলে পিতা বড় অসন্তুষ্ট হন। হাত তুললেই বাহুকেশ উঁকি মারে।

দাড়ি কামানো শেষ করে পিতা ক্ষুরের পরিচর্যায় ব্যস্ত। সামান্য ধোঁয়া তখনও ঘরে ইলিবিলি করছে। শোনো প্রফুল্ল, এ চলবে না।

প্রফুল্লকাকা কিছু না বুঝেই বললেন, ঠিক বলেছ এ আর চলে না।

তা হলে ব্যবস্থা করো।

দিয়ে দাও, আজই শান দিয়ে নিয়ে আসি।

শান? পিতা অবাক হলেন। কীসের শান?

ক্ষুর। ক্ষুরে ধার কমবেই। মাঝে মাঝে ধার দিতে হয়।

আমি ধোঁয়ার কথা বলছি। তোমার নীচের সমস্ত ধোঁয়া ওপরে আসছে। তার কী হবে?

আমাদের তো দুটি খেতে হবে, হরি।

তোমাকে আমি ধোঁয়ার কথা প্রথমেই বলেছি। তুমি বলেছিলে, আপনি আর কপনি, প্রাইমাস স্টোভেই মেরে দেবে। সে কথা তুমি রাখলে না।

বড্ড খরচ হরি। কয়লাতে একটু সাশ্রয় হবে। জানোই তো আমি কী কাজ করি। সামান্য মাইনে।

উটের নাক গলাবার গল্পটা তোমার মনে আছে? গিভ দেম অ্যান ইঞ্চ, দে উইল আস্ক ফর অ্যান এল। এমনি থাকো আমার আপত্তি নেই, ধূমায়িত অবস্থায় আমার আপত্তি আছে।

বেশ তাই হবে। প্রফুল্লকাকা করুণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাচ্ছিলেন। পিতা গম্ভীর গলায় বললেন, যাও জিজ্ঞেস করে এসো।

কী জিজ্ঞেস করব হরি? কাকে করব?

তোমার স্ত্রীকে। আমাদের রান্নাঘরে রাঁধায় তাঁর আপত্তি হবে কি না? ধোঁয়া বেরোবার চিমনি আছে। এক জাপটে সব হয়ে যাবে।

অ্যাঁ, বলো কী? তুমি তা হলে আমাদের রান্না খাবে?

না।

তা হলে?

তা হলে, ভেরি সিম্পল। পালা করে রান্না হবে। সকাল ন'টার মধ্যে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে। তোমাদের শুরু হবে। ইচ্ছে করলে বিকেল পর্যন্ত চালাও। রাত আটটায় আবার আমাদের পালা।

এখন আমরা কোন পালায় পড়ব? এখন তো প্রায় এগারোটা বাজে।

আজ তো তোমরা আগুন দিয়েই ফেলেছ! সকালটা সেরে নাও। বিকেলে যে-পালা বেঁধে দিলুম, সেই পালা অনুসারেই চলবে।

ভেরি গুড, ভেরি গুড। প্রফুল্লকাকা নীচের দিকে পা বাড়ালেন।

হ্যাঁ শোনো। আবার বাধা। পিতা আপাদমস্তক তবলচি বন্ধুকে দেখে নিলেন একবার।

এই ধরনের অঙ্গসজ্জা আমি অপছন্দ করি। ভবিষ্যতে আমার সামনে যখন আসবে, হয় আদুড় গায়ে, না হয় পুরোহাতা গেঞ্জি পরে। এই ধরনের গ্রহণ-লাগা গেঞ্জি চলবে না।

ও ইয়েস, ও ইয়েস। আই চেঞ্জ ক্লথ, নট চেঞ্জ গেঞ্জি। রিমেমবার। রিমেমবার।

এ কী ইংরিজি রে বাবা। পিতার বন্ধু, অথচ শীলন, পরিশীলন, শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই তেমন নেই। এমন মানুষকে সহ্য করবেন কেমন করে! উনি আবার ফুসুর ফুসুর করে বিড়ি খান। গোদের ওপর বিষফোড়া।

ঊর্ধ্বশ্বাসে একটি গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। আমাদেরই বাড়ির সামনে সশব্দে ব্রেক কষে থেমে গেল। দরজা বন্ধের শব্দ হল। মনে হয় প্রতাপ রায়। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মাতুল এলেন। পিতা খাপে ক্ষুর ভরতে ভরতে বললেন, কী ব্যাপার হে, অমাবস্যায় চাঁদের উদয়।

অঙ্গে চাঁপাফুল রঙের পাঞ্জাবি। ফিনফিনে দিশি ধুতি। উঃ যা মানিয়েছে। একেবারে প্রিন্স অব ওয়েলস্। মাতুলের হাসিটি ভারী চমৎকার। সোনার চশমার আড়ালে জ্বলজ্বলে টানা চোখ। চোখ হাসছে, মুখ হাসছে। সর্ব অঙ্গে হাসির হিল্লোল।

দুটো জিনিস চাইতে এলুম।

একটা নয়, একেবারে দুটো। বলো, কী বস্তু?

আপনার সেই মুগুর দুটো। আর আমার এই ভাগনেটিকে।

ফর গুড, না ফেরত দেবে।

না না, ফেরত দোব। ফার্স্ট আইটেম, রিটার্নেবল হোয়েনেবল, সেকেন্ড আইটেম সন্ধের মুখেই ফিরিয়ে দোব।

হঠাৎ মুগুর নিয়ে কী করবে? ভাঁজবে?

চেয়ারে গুছিয়ে বসে মাতুল বললেন, আমার ছবি ফ্লোরে নেমে পড়েছে। তিন দিন কাজ হয়ে গেল। আজ চতুর্থ দিন। আজ যে-শটটা নেওয়া হবে, সেই শটে একটু মুগুরটুগুর ভাঁজার ব্যাপার আছে।

স্টোরি কার?

স্টোরি আমরা সবাই মিলে তৈরি করেছি।

সে আবার কী? বারোয়ারি দুর্গাপুজো!

ফিল্মে ওইটাই চলে। একটু অ্যাকটিং, একটু গান, পারলে এক রাউন্ড নাচ, আবার একটু অ্যাকটিং। ফুটবলের মতো, পাস দিতে দিতে পাস দিতে দিতে এগিয়ে চলা।

তা তোমার এ কাহিনি কি লাভস্টোরি?

না, না, প্রেমফ্রেম খুব জোলো ব্যাপার। আমার হল দেশাত্মবোধ। ভারত জাগিল তবু কই? দেশ বিভাগ, দাঙ্গা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি, চক্রান্ত, কালোবাজারি...

সব মিলিয়ে একটা ক্যাডাভ্যারাস কাণ্ড।

ক্যাডাভ্যারাস বলছেন কেন?

দেশাত্মবোধে আবার নাচ আসে কোথা থেকে। তা ছাড়া এ দেশে দেশাত্মবোধ ছিল স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত। আদর্শ ছিল, আত্মত্যাগ ছিল, স্বাদেশিকতা ছিল। এখন তো আবার সেই নীচের দিকে স্রোত বইছে। মেরি করেলির ভারত, চিকেনারি, পারজারি, ফোরজারি, বাফুনারি।

অ্যা, ঠিক ধরেছেন। আমাদের গণেশ উদ্বাস্তুদের নামে করোগেটেড শিট বের করে ব্ল্যাকে ঝেড়ে ঝেড়ে আটচালা থেকে তিনতলা বাড়ি হাঁকালে। আমাদের মেধো হল ভারী নেতা। আগে বাড়ি বাড়ি মাঝরাতে সিঁদ দিয়ে বেড়াত, এখন ওয়াগন ভাঙে। নেতা আবার ডাক্তারদের মতো চেম্বার খুলে বসেছে। সকাল, বিকেল দরবার বসে। A film not only entertains but it also educates. এইসব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা। কোরাসে একটা গান রেখেছি, মুখোশ খোলো, মুখোশ খুলে মানুষ চেনো, মুখোশ খোলো। মুখের কথায় ভুল বুঝো না, চিনতে শেখো, কোন কথাটা কথার, কোন কথাটা মনের। মুখোশ খোলো। বাউলের সুরে নেচে নেচে ধরেছি একেবারে তেড়ে চড়া পরদায়। ফাটাফাটি ব্যাপার। মারকাটারি বগল চাপ।

এ আবার কী ল্যাঙ্গুয়েজ!

ভুল হয়ে গেছে। ককনি। দেশবিভাগের পর এইসব ল্যাঙ্গোয়েজ খুব চলছে। যেমন কারবারে গুনচট।

মাপ করো রাজা। মানে মানে এখন কেটে পড়তে পারলেই ভাল হয়। একে বলে বাস্টার্ড কালচার।

আপনিও ওই ফাঁদে পড়ে গেছেন। না জেনেই। এইমাত্র দুটো শব্দ ব্যবহার করে ফেললেন, মাপ করো রাজা, আর, কেটে পড়ো। আপনার পিতাঠাকুর এসব ভাষা ব্যবহার করতেন না।

করতেন না?

কখনওই না।

তা হলে আমি কোথা থেকে শিখলুম। আমি তো কারুর সঙ্গে তেমন মিশি না।

ওই যে জানলা। ওই জানলা দিয়ে আলো আসে, বাতাস আসে, শব্দ আসে, ধুলো আসে, ধোঁয়া আসে।

ঠিক বলেছ। গবাক্ষ পথেই স্ল্যাংয়ের আনাগোনা। The dogs did bark, the children screamed/up flew the windows all/And every soul bowled out. কত দিন আগে পড়েছি। কীরকম মনে আছে দেখেছ?

আপনার মেমারি একেবারে ফোটোগ্রাফিক মেমারি।

তা, তোমার নায়ক না হয় মুগুর ভাঁজবে, তোমার ভাগনে কী করবে?

কোরাসে গান গাইবে। আজ গানের টেক আছে।

টেক মানে?

শট ফর টেকিং।

ও গানের কী জানে?

যা জানে তাইতেই মারকাটারি। একবার শুধু রিহার্স করিয়ে নোব।

কী লাভ?

আহা, ওকে একটু মিশতে দিন, একেবারে ঘরকুনো করে রাখবেন না। এখন ডাকাবুকোর যুগ পড়েছে। যা-তা গান নয়, ডি এল রায়। একবার গালভরা মা ডাকে/মা বলে ডাক, মা বলে ডাক, মা বলে ডাক মাকে।

মাতুলের গলায় সুর এসে গেল। ভাবে বিভোর হয়ে গাইতে লাগলেন—

ডাক এমনি করে, আকাশ, ভুবন সেই ডাকে যাক ভরে,
আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে থাক যেখানে যে থাকে।

প্রফুল্লকাকা গুটিগুটি ওপরে উঠে এসেছেন। এবারে একেবারে আদুড় গা। ফরসা বুকে গুটিকতক লাজুক নোম। পিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বললেন, খুলে এসেছি। পুরোহাতা গেঞ্জি নেই। জামা কেচে দিয়েছে। মাতুল এদিকে উদাত্ত সুরে গাইছেন—

দুটি বাহু তুলে নৃত্য করে
ডাক রে মা মা বলে,
আর নেচে নেচে আয় রে মায়ের
ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে

প্রফুল্লকাকা বললেন, আমাদের জয় এসেছে। একেবারে জমিয়ে দিয়েছে। তবলাটা নিয়ে আসি তা হলে, বউনি হয়ে যাক।

গান থেমে গেল। চোখ মুদে ছিলেন। চোখ খুলে বললেন, কে, প্রফুল্লদা। এখনও হাত ঠিক আছে?

তা, তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে হাত এখনও ভালই চলে।

আপনি এখন আছেন কোথায়?

হরি দয়া করে এই বাড়িতেই আশ্রয় দিয়েছে। খাবদাব আর দু'জনে বাজনা বাজাব।

না, আজ আমি উঠি। ওরে নে নে, চল মুগুর দুটো বের কর।

মাতুল উঠে পড়লেন। আমি এখন যাই কী করে? রান্না খাওয়ার কী হবে? আমার দ্বিধা দেখে পিতা বললেন, ভাবনা নেই। তুমি ঘুরে এসো। এক বেলা আমি চালিয়ে নিতে পারব।

মাতুল বললেন, যাচ্ছিস সিনেমাপাড়ায়, আমি তোকে সাজিয়ে নিয়ে যাব। দেখি তোর জামাকাপড় কী আছে। পাঞ্জাবি আছে?

আজ্ঞে না।

গোটা দু'য়েক পাঞ্জাবি করা না! দাঁড়া, আমি তোকে করিয়ে দেব।

পিতা বললেন, উঁহু ভাইস ঢুকিয়ো না। অ্যাভারিস বিগেটস সিন, সিন বিগেটস ডেথ।

পাঞ্জাবিতে ভাইস?

না, তা নয়, তবে ফপিস টেনডেন্সি এসে গেলে ও আর কিছু করতে পারবে না। তুমি তো সব পেয়ে গেছ। তোমার যা সাজে, ওর তা সাজে না। ওকে যে এখনও অনেক দূর যেতে হবে, go thou forth weeping bearing precious seed, until the time comes.

কোন যাওয়ার কথা তিনি বললেন জানি না, তবে মাতুলের গাড়িতে প্রায় কেঁদে ফেলার মতোই পরিস্থিতি তৈরি হল। পেছনের আসনে বসে আছি। হাঁটুর দু'পাশে দারোয়ানের মতো খাড়া দুটো মুগুর। মাতুল বসেছেন, সামনে, চালকের পাশে।

গাড়িটা কিনে ফেললুম, বুঝলি? যদিও সেকেন্ড হ্যান্ড, তবু বাঘের বাচ্চা। খায় কম।

কী খায়?

তেল রে, তেল। কম তেলে বেশি রাস্তা খায়।

সিটটা এমন কেন? পেছনে খোঁচা মারছে।

গদিটা একটু তেবড়ে গেছে রে। ওসব পালটাতে হবে। দাঁড়া, ডিস্ট্রিবিউটরের টাকাটা হাতে এসে যাক, খোলনলচে সব বদলে রোলস রয়েস করে ফেলব। গাড়ি ছাড়া ফিল্‌ম হয়? কীরকম যাচ্ছি বল? রাজার মতো!

তা যাচ্ছি। তবে আপনার গাড়ি বড় শব্দ করে। এটা বোধহয় মিলিটারিতে ছিল।

না রে, গাড়িরও পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ আছে। এ হল পুরুষ গাড়ি। ক্ল্যাসিক্যাল আর্টিস্ট। গলা দিয়ে ধ্রুপদ বেরোচ্ছে, সঙ্গে পাখোয়াজের সংগত।

আপনার সেই বন্ধু প্রতাপবাবুর কী হল?

ও প্রতাপ! আর বলিসনি, প্রতাপ ফেঁসে গেছে।

ঘুড়ি ফেঁসে যায় শুনেছি, মানুষও ফেঁসে যায়!

ফাঁসে না। প্রতাপ প্রেমে ফেঁসেছে।

প্রেম?

হ্যাঁ রে ব্যাটা! সেই তোদের বাড়ির মেয়েটা, কী যেন নাম বড়টার।

কনক।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই কনক। কনকের সঙ্গে ওর বিয়ে লাগল বলে। তোর ওই মেলোমশাই। উঃ একটা ঘোড়েল মাল।

আমি জানতুম।

জানবিই তো। ধোঁয়া দেখলেই বুঝবি আগুন আছে। প্রতাপ ছেলে ভাল, তবে কী জানিস, অঢেল পয়সা। পয়সাওলাদের চরিত্র বড় চঞ্চল হয়। আকাশে ভেসে থাকে, মাটিতে পা থাকে না।

আপনারও তো পয়সা আছে।

আমার পয়সা! গান ছাড়া আমার কিছু নেই। জানিস তো, ভাল একটা চাকরি করতুম, ইয়েস স্যার নো স্যারের ভয়ে ছেড়ে চলে এলুম। আমার দুটো গ আছে, গান আর গোঁ। দুটো র আছে, রাগ আর রসনা। আমি খেতে বড় ভালবাসি রে। বেশি না, অল্পঅল্প। কিন্তু বেশ তরিবাদি করে। দুটো ল আছে, লোভ আর লোকভয়। দুটো ভ আছে, ভালবাসা আর ভাবনা। নিজেকে চিনতে শেখ ব্যাটা, জীবনে চলার রাস্তা খুঁজে পাবি। বাঁয়ে, বাঁয়ে।

মাতুল হাউমাউ করে পথনির্দেশ দিলেন। চালক বেচারা রাস্তা ছেড়ে যাবার ভয়ে বাঁ দিক হেলে অ্যায়সা স্টিয়ারিং ঘোরালেন দু'হাতে, কনুইয়ের কানকি লেগে মাতুলের সোনার চশমা নাক থেকে খুলে কোলে পড়ে গেল। এদিকে সাইকেলের পেছনে দুধের ক্যান চাপিয়ে এক হিন্দুস্থানি রাস্তায় বাঁক নিচ্ছিল, গাড়ির মাডগার্ডের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে ছিটকে পড়ল। মোহনবাগানের গোলকিপার যেন বল বাঁচাতে বডি থ্রো করেছে। দুধের ক্যান রাস্তায় আপন মনে গড়গড়িয়ে চলেছে, ভলকে ভলকে দুধ বেরোচ্ছে, মায়ের করুণাধারার মতো। সাইকেল ঘাড়মুখ গুঁজড়ে একপাশে পড়ে আছে শ্যামল মিত্রের সংগীতের মতো, আজ হৃদয়ের কামনা শান্ত, থাকে শুধু ব্যথাভার।।

এইসব শৃঙ্খলিত ঘটনাপ্রবাহের দিকে মাতুলের চোখ ছিল। স্বভাববিরুদ্ধ গম্ভীর গলায় বললেন, স্টপ। গাড়ি থামব কি থামব না করছিল, থেমেই পড়ল। দরজা খুলে মাতুল ডান পা বাড়ালেন। চুনোট করা দিশি ধুতির কোঁচা, আসুন বাবু আসুনের ঢঙে ধবধবে সাদা, শৌখিন একটি পা-কে রাস্তায় পদপাতে আহ্বান জানাল।

দেশপ্রেমীর মতো চেহারার এক ভদ্রলোক ভূপাতিত মানুষটির ওকালতনামা নিয়ে তেরিয়া হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। মাতুলের চেহারা আর সাজপোশাক দেখে ঘাবড়ে গেলেন। চারপাশে জ্বলজ্বলে রোদ। সামনে ছ'ফুট লম্বা এক মানুষ। সারাগায়ে গোলাপি আভা। যেন কোনও কাশ্মীরি ললনা লিঙ্গ পরিবর্তন করে জাফরানের মাঠ থেকে উঠে এলেন। ঘাড়ের কাছে উদয়শঙ্করের মতো কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলোবার জন্যে একবার আঙুল তুলেছিলেন, অনামিকার হিরের আংটি চড়াক করে ঝিলিক মেরে উঠল। দুধঅলা গোল-খাওয়া গোলরক্ষকের মতো মুখ করে সামনে এসে দাঁড়াল, গরিব আদমি বড়াবাবু।

মাতুল বললেন, সমঝ গিয়া।

বুকপকেটে হাত দিয়ে চওড়া একটা একশো টাকার নোট বের করে হিন্দুস্থানির হাতে দিতে যাচ্ছেন□— দেশপ্রেমী বাধা দিলেন, কে রে, তুই, আমাদের জয় না? দাঁড়া।

মাতুল ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রবীর! তুই আমাদের প্রবীর না!

ব্যস, দুই বন্ধুর মিলন। প্রবীর বলছেন, কী চেহারা করেছিস? একেবারে লেডিকিলার!

মাতুল বলছেন, কী চেহারা করেছিস, কুস্তির পালোয়ান!

হিন্দুস্থানি বলছে, বাবুজি গরিব আমি।

মুগুর দুটো শুয়ে পড়েছিল। সিটের মাঝখানে তাড়াতাড়ি আটকে গেছে। কিছুতেই সোজা করতে পারছি না।

যেমন কর্ম তেমন ফল
মশা মারতে গালে চড়

একশো নয়, শেষপর্যন্ত কুড়ি টাকায় হিন্দুস্থানি গোয়ালা সন্তুষ্ট হয়ে দুধের ক্যান আর সাইকেল তুলে নিয়ে সরে পড়ল। আহা কী দৃশ্য! যেন হরিহর ছত্রের মেলা। কুকুরে দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে। একটা হোঁতকা ষাঁড়ও এসে জুটেছে। সেই কবে কোন শৈশবে, যখন এতবড় পেল্লায় ষাঁড় হয়নি, তখন কোনও এক গোমাতার দুধ খেয়েছিল। এখন আর কোন গাভী এই ভয়ংকর দামড়াকে দুধ খাওয়াবে। ষণ্ড তো আর চণ্ডী পাঠ করেনি যে গোরুতে মাতৃদর্শন হবে। বলবে স্ত্রীয়া সমস্তা সকলা জগৎসু। সে এক দৃশ্য! ষাঁড়ে দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে। মাতুলের কুড়ি টাকার সদগতি হচ্ছে।

এদিকে মুগুর অ্যায়সা আড়াই প্যাঁচ মেরে বসে আছে। কুমিরের গলায় বঁড়শি আটকেছে। বেশি টানাটানি করতে ভয় লাগছে। যদি হাতল ভেঙে যায় আমিও আর আস্ত থাকব না। এদিকে মাতুল প্রবীরবাবুকে পেছনের আসনে তুলতে চান। কথায় কথায় জানা গেছে, তিনি চিত্রকর, আবার গান লেখেন। আর রক্ষে আছে! সিনেমায় হরেকরকমের প্রচারের কাজ আছে। বাল্যবন্ধুকে হাতের কাছে পাওয়া গেছে। আর কি সহজে ছাড়া যায়।

প্রবীরবাবু উঠবেন কী করে? পায়ের কাছে মুগুরদ্বয়ের ষড়যন্ত্র। মুগুর মনে হয় স্ত্রীলিঙ্গ প্রাণী! দু'জনে পাশাপাশি সদ্ভাব বজায় রেখে শান্তিতে অবস্থান করতে পারে না। চুলোচুলি করে বসে আছে। অনেক অঙ্ক কষে প্রবীরবাবু মুগুরকে স্বস্থ করে আমার পাশে উঠে বসলেন। বেশ ভালই জায়গা নিলেন। গাড়ি চলতে শুরু করল।

মাতুল সামনের আসনেই বসে আছেন। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে, সাবধানে চশমার কাচ মুছতে মুছতে চালককে বললেন, হিসেব রেখো।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনশো কুড়ি হল।

তা হলে দু'মাসের জন্য নিশ্চিন্ত।

আমার সংসার কী করে চলবে স্যার?

যেভাবে গাড়ি চলছে, সেইভাবেই চলবে। তুমি একের পর এক অ্যাকসিডেন্ট করে যাবে, আর আমি টাকা গুনে যাব?

আপনি যে হঠাৎ হঠাৎ ডাইনে, বামে, পেছনে যেতে বলেন?

কাল তুমি রিকশাওয়ালাকে মারলে কেন?

আপনি এত সুন্দর সুর ভাঁজছিলেন, আমার খেয়ালই ছিল না যে আমি এক গরিব ড্রাইভার। মনে হচ্ছিল হায়দ্রাবাদের নিজাম।

মনে তো হবেই। কী সুর জানো?

আজ্ঞে না, তবে ভারী সুন্দর।

আহির ভৈঁরো। প্রবীর, আহির ভৈঁরোর ওপর কথা বসা তো। সুরের চলনটা এইরকম হবে, হুঁ হুঁ, হুঁহুঁ, না না, তুম, হুঁ, হুঁউঁ।

প্রবীরবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, দাঁড়া দাঁড়া, বড় ব্যথার সুর, বেদনার বাণী বসাতে হবে।

ধরেছিস ঠিক। প্রেমিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শীতের ভোর। ফিনফিনে আঁচলের মতো কুয়াশার কেশর উড়ছে। তেরছা হয়ে নেমে আসছে প্রথম সূর্যের কিরণ। ওদিকে বাঁধের ওপর দিয়ে রেলগাড়ি চলেছে। প্রেমিক গাইছে আর কাশছে।

আবার কাশি ঢোকাচ্ছিস কেন?

আহা অসুস্থ যে। এই রোককে রোককে।

চালক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্রেক কষল। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থামতেই বললে, এইজন্যেই অ্যাকসিডেন্ট হয়। মাতুল গ্রাহ্যই করলেন না। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা বোস, আমার এক ছাত্রীকে তুলে আনি।

সামনেই সাবেক কালের এক বাড়ি। বেশ বড়। গাড়িবারান্দা, থাম, লতানে গাছ, জানলায় লাল নীল কাচ। সব মিলিয়ে বেশ একটা বনেদি চেহারা।

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, প্রবীরবাবুর পকেট থেকে একটা নোট খাতা বেরিয়েছে। পাতা ওলটাচ্ছেন আর আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তুমি কে?

আমার মামা।

দেখেই বুঝেছি। মুখটা একেবারে কেটে বসানো। মামার গুণ কিছু কিছু পেয়েছ?

কী করে বলব?

গান জানো?

ইচ্ছে করে।

ওইতেই হবে। দেখো তো এই গানটা। আচ্ছা এক দায়িত্ব দিয়ে গেল!

খাতাটা আমার হাতে দিলেন। তিন ছত্রের একটি গান,

> এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই।
> ব্যাকুল বাতাস হৃদয়ে আমার
> মরিয়া মরিয়া কাঁদে।

প্রবীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগছে তোমার আস্থায়ীটা?

দারুণ।

সুরটা শুনবে?

হুঁ হুঁ করে দু'বার সুর ভেঁজে প্রথম দুটো লাইন গেয়ে ফেললেন। ভীষণ আতঙ্কে ছিলুম। গলা দিয়ে কী বেরোয়, কে জানে। না, খুব একটা খারাপ কিছু বেরোল না। ভালই বলা চলে। গাড়ির চালকও বললে, বাঃ বাঃ বেশ হচ্ছে।

প্রশংসায় প্রবীরবাবুর কাতর হয়ে পড়লেন, আমার গলায় ভাই একটা সপ্তকই খেলে। তোমার মামার মতো তিন সপ্তকে গলা খেলে না। চড়ায় উঠলেই ক্র্যাক করে। অন্তরাটা গাইব দেখবে?

করুন না।

প্রবীরবাবু প্রথম লাইন দুটো আর এক পক্কড় গেয়ে তারসপ্তকে ঠেলে উঠলেন,

তুমি যাবে চলে রজনী পোহালে
ঝরাপাতা ঝরে উতলা বাতাসে।

সাংঘাতিক শব্দ। মনে হল কে যেন গলা টিপে ধরেছে আর প্রাণবায়ু ঝারির জলের মতো বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছে। প্রবীরবাবু নিজেকে সংযত করে নিলেন। সময়টা সকাল। রাস্তায় লোক চলাচল করছে। করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কী বুঝলে? খুব খারাপ? আমি জানি চড়ার দিকে গলাটা আমার সেইরকম হয়ে যায়। না বাবা, বলব না। ভাগ্য একটু খুলব খুলব করছে। নাম করলেই সব কেঁচে যাবে।

বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি।

পারবেই তো, পারবেই তো। কার ভাগনে দেখতে হবে তো! স্কুলের ফার্স্ট বয়, কলেজের সেরা ছাত্র, গানে ভারত বিখ্যাত। নুনজলের গার্গল করে করে ঘামাচির ধাত হয়ে গেল, গরমকালে কী কষ্টই পাই, নুনের পাহাড় শেষ করে ফেললুম, গলার কিছুই উন্নতি হল না।

গার্গল করলে ঘামাচি হয়?

আরে আমার কথা আর বলো কেন। নুনজল মুখে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে যেই ঘড়ড় করতে যাই, ব্যস, ঢাকাস করে আদ্দেক চলে গেল পেটে, আদ্দেক বেরিয়ে এল নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে। যার খারাপ হয়, তার সবই খারাপ। গলার দু'পাশে প্রহরীর মতো দুটো টনসিল থাকা উচিত, আমার মনে হয় সে মাল দুটো নেই। আলজিভটাও আছে কি না কে জানে? হাঁ করেছ কী সুয়েজ ক্যানেল খুলে গেল। অত নুন শরীরে সয়! চামড়া যেন ডায়মন্ডহারবারের নোনা মাটি। গ্রীষ্মের ফসল চাবড়া চাবড়া ঘামাচি।

আপনি আর একটা টোটকা করে দেখতে পারেন।

কী বলো তো? কী বলো তো?

গোটাদুয়েক গোলমরিচ দিয়ে এক চামচে গাওয়া ঘি। গলাটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।

আর ভাগনে সে উপায় কি রেখেছি! লিভারের বারোটা বেজে গেছে। মুখ দিয়ে ঢুকবে পশ্চাদ্দেশ দিয়ে...না বাবা বলব না, তুমি আমাকে অসভ্য ভাববে।

আপনি কী বলতে চান বুঝে গেছি।

বুঝতেই হবে। কার ভাগনে দেখতে হবে তো?

ওরও একটা দাওয়াই আছে।

শুনি শুনি।

আগে একটা পিপুল খেয়ে নেবেন, তা হলে ঘি-মরিচ সহজেই সহ্য হবে।

পিপুল? সে আবার কী বস্তু। লোকের পিপুল পাকে শুনেছি।

ওটা অসভ্য পিপুল। আমি বলছি সভ্য পিপুলের কথা। গাছে হয়। কবিরাজরা ব্যবহার করেন।

মনে থাকবে না ভাগনে, দাঁড়াও লিখে নিই।

নোট খাতায় লিখতে লাগলেন। ওদিকে মাতুল আসছেন। সঙ্গে কে রে বাবা! রোদের কী চমক। ওঁর সাজসজ্জার রঙের চমকে প্রকৃতিরও পা পিছলে যাচ্ছে। সঙ্গে আবার এক বৃদ্ধ। তাঁর সব সাদা, যেন শরতের মেঘ। মাথার দিকটা রুপোলি। সামনে সিঁথি। হাফ পাঞ্জাবি, হাতায় গিলে। দিশি ধুতি, একটু উঁচু করে পরা, পায়ে বার্নিশ করা চটি, হাতে আবার একটি ছড়ি, চোখে রিমলেস চশমা। পুরো নম্বর দেবার মতো মিহিবাবু। মহিলার দিকে তাকানো যাচ্ছে না, মেজাজ খারাপ করে দেবার মতো ধরনধারণ। শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো, শাস্ত্রীয় পরীক্ষা। দেখবে তবু টলবে না, হেলবে তবু টসকাবে না। হরি ওম্ তৎসৎ। বাগিচার বুলবুলি। গণ্ডদ্বয় এত গোলাপি হল কী করে? ওষ্ঠদ্বয় এমন করমচার মতো লাল হল কী করে। চক্ষুদ্বয় কোণ ছেড়ে কর্ণ অবধি বিস্তৃত হল কোন মায়াবলে! ঘোর বেগুনি বর্ণের ফিনফিনে শাড়ি, ব্লাউজ বেগুনি। গাত্রবর্ণ এর চেয়ে ফরসা হলে আয়ারল্যান্ডে পাঠাতে হত।

আমার বিস্ময় প্রবীরবাবুর কণ্ঠে শব্দরূপ পেল। তিনি বললেন, বাপস, কী সেজেছে রে ভাই।

মাতুল এগিয়ে এসে পেছনের দরজা খুলে ধরে আমাদের বললেন, তোমরা একটু সরে বোসো। এঁদের বসতে দাও।

আমাদের প্রাণ আছে। আমরা না হয় সরে বসলুম। দুটো মুগুরের তো প্রাণ নেই। দুটোকে নিয়ে মহা জ্বালাতনে পড়া গেছে। নীচের দিকটা ভারী, মাথার দিকটা হালকা। সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। একটু এদিক-ওদিক হলেই, সখি গো! বলে টাল খেয়ে উলটে পড়ছে। তেমনি ভারী। কোনওক্রমে কোলে তুলে নিয়ে সরে বসতে গেলুম। একটা ডান পাশে হেলে ছোট্ট একটু হাত ছুড়ল। তাইতেই প্রবীরবাবু কাত। সেই বাল্যে, ছাত্রজীবনে গাঁট্টা খেয়েছিলেন, আজ এইমাত্র আর একবার খেলেন। স্মৃতি, তুমি বেদনা। পাপের বেতন পেলেন। মাতুলের চড়া পরদায় বাঁধা রূপসি ছাত্রীকে দেখে মনে মনে বড় ছটফট করছিলেন। রগে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, তখন থেকে এই বেয়াড়া জিনিস দুটোকে নিয়ে কী যে তুমি করতে চাইছ। দাও দাও, একটা আমাকে দাও।

একটাকে তাঁর কোলে তুলে দিলুম। যমজ নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়েছিলুম। নিন, মোহ-মুদগর কোলে নিয়ে অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করুন।

রূপসি আমার পাশে ঘট স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে ধনুক-ভাঙা ভুরুতে আড়ে আড়ে দেখতে লাগলেন। মাতুল বললেন, আমার ভাগনে, তুমি আরাম করে বসতে পারো। ওর পাশে আমার বন্ধু প্রবীরকুমার, গীতিকার, নাট্যকার, চিত্রকার।

সাহস পেয়ে তিনি এত আরামে বসলেন, পুচুত করে ক্ষীণ একটি আর্তনাদ কানে এল। বাঁপাশে জামার পকেটটা গেল। সিকি-আধুলির ভারে অভ্যস্ত পকেট, এমত রূপসির দেহভারের ভগ্নাংশ বহনের ক্ষমতা রাখবে কী করে। দু'বছরের পুরনো জামা। জায়গায় জায়গায় পিঁজে এসেছে।

রূপসি একটু আর্তনাদ করে উঠলেন। আমার জন্যে নয়। আসনের স্প্রিং খোঁচা মেরেছে। সাবধান করার সুযোগ পেলুম কই। সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ দেহভার ছেড়ে দিলেন। গাছ থেকে তাল পড়ে, গাইয়ে তালে ঝাঁপিয়ে পড়েন, জামার আধখানা নিয়ে রূপসি পড়েন বরাতে। দিন কয়েক আগে কনক ঘাড়ে পড়েছিল। কনকের কথা আর চিন্তায় আনব না। সেই মহীয়সী ভাল বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে চলেছেন। অক্ষয়বাবু ঠিকই বলেছিলেন, হরিদা, এর রাশিফল বলছে, সারাজীবন শুধু চোট খেয়ে যাবে, এমনকী ঘোড়াতেও চাঁট মারতে পারে।

সেকী হে, ঘোড়া আসবে কোথা থেকে! অশ্বযুগ শেষ হয়ে, অশ্বশক্তির যুগ এসেছে।

বরাত হরিদা, বরাত। কোথা থেকে এসে, কাকে যে চাঁট মেরে যায়।

বৃদ্ধকে গাড়িতে তোলার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাদু আসুন, দাদু উঠুন, দাদু উঠুন। প্রথমে ভেতরে এল ছড়ি। আর একটু হলেই চোখটা যেত। মুগুর কোলে বসে আছি বলে রক্ষে পেয়ে গেল। তারপর ঢুকল বার্নিশ করা চটি সমেত একটা পা। নাতনি হাঁ হাঁ করে উঠল, আমার শাড়িটা গেল, শাড়িটা গেল।

হ্যাঁ, তোর অমনি শাড়িটা গেল। এইটুকু গাড়িতে এত বড় শরীরটা ঢোকে! কাস্টাম বিল্ট রোলস রয়েসে চেপে যৌবন কাটালুম, তোদের কালে এসে, এই বুড়ো বয়েসে ক্যানেস্তারা চাপতে হচ্ছে।

চুপ করে বোসো তো।

নাতনির ধমক খেয়ে দাদু কাছাকোঁচা, ছড়ি, সামলে বসলেন। কানের পাতায় খাড়া খাড়া লম্বা লম্বা চুল। কানে চুল থাকলে মানুষ পয়মন্ত হয়। পয়মন্ত না হলে রোলস রয়েস চাপতেন! গাড়ি চলতে শুরু করল। মাতুল সোনার ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, চিত্রা, তুমি সাজতে গুজতে অনেক সময় নিয়েছ। দেরি হয়ে গেল।

নাতনির দাদু বললেন, কেন যে এত রং মাখিস! তোর নিজের রূপ নকলে চাপা পড়ে যায়। তোর মতো মেমের বাচ্চা...

আঃ চুপ করো তো।

রূপসি কটাক্ষ হানলেন। আমার কোলের মুগুরে আর প্রবীরবাবুর মুগুরে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। চকমকি হলে আগুন ছুটত। কার গর্ভে যেন মুষল জন্মেছিল! সেই মুষলে কৃষ্ণ মরেছিলেন। পাশাপাশি আমাদের দু'জনের গর্ভে প্রমাণ মাপের দুটি মুগুর এসেছে যেন। সদ্যোজাত শাবকের মতো জাপটে বসে আছি। প্রবীরবাবু ফিসফিস করে বললেন, মায়ের কথা স্মরণ করো।

গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে নির্দেশটা ঠিকমতো বুঝতে পারলুম কি না সন্দেহ হওয়ায় প্রশ্ন করলুম, কী বললেন?

ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, কিছু না।

একই কথা দু'বার বলতে হলে অনেকেই ভীষণ রেগে যান। আমিও যাই। আমারই ভুল হয়েছে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করা। ভীষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি! পাশেই মাতুলের ছাত্রী। স্বাস্থ্যবতী। পরনে আবার পিচ্ছিল সিল্কের

শাড়ি। তার ওপর ছটফটে। মাঝপুকুরের মাছের মতো মাঝে মাঝে ঘাই মারছেন। আমি ভাবছি, বলে না বসেন তোমার হাঁটু আমার হাঁটুতে ঠেকছে। তোমার ওপর-বাহু আমার ওপর-বাহুতে ঘষে যাচ্ছে।

মহিলা হঠাৎ আমার হাত মুঠোয় চেপে ধরে বললেন, আমার ভীষণ ভয় করছে।

কীসের ভয়। এদিকে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। মহিলায় ধরলে ভূতে ধরার মতোই অবস্থা হয়। মাঝরাতে ঘরে চোর ঢুকলে গলা দিয়ে শব্দ বেরোয় না। গেরস্থ ক্ষীণ কণ্ঠে চোও চোও করতে থাকেন।

আমি কোনওক্রমে প্রশ্ন করলুম, ভয় করছে কেন?

মহিলা ডাইনে বাঁয়ে শরীর মুচড়ে বললেন, কী জানি বাবা! কী হয়! ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছে।

ভীষণ সাহসে জিজ্ঞেস করলুম, কীসের ভয়?

অত হ্যান্ডস ফ্যান্ডস নিয়ে কোনওদিন তো গান রেকর্ড করিনি। তা ছাড়া গুরুজির গান গাওয়া খুব শক্ত। একটু এদিক-ওদিক হলেই সুর ফসকে যায়, তাল হড়কে যায়। আর তখন উনি যে দৃষ্টিতে তাকান। বাবা। না বাবা, আমি পারব না।

গরম জলে হাত লেগে গেলে মানুষ যেভাবে হাত ঝাড়ে, তিনি সেইভাবে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে চোখে চাপা দিলেন। তারপর দু'আঙুলের ফাঁক দিয়ে এক চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। মরেছে। মাথার গোলমাল নেই তো!

চোখ থেকে হাত সরিয়ে ফিক করে হাসলেন। হেসে বললেন, তোমাদের কোলে ও দুটো কী যন্ত্র? একেই কি বলে গুপী যন্ত্র?

মাতুল সামনের আসন থেকে বললেন, না রে বাবা, ও দুটো হল মুগুর। আমাদের শুটিংয়ে লাগবে। যারা সিনেমার মাল সাপ্লাই করে, তারা একগাদা টাকা ভাড়া চাইত, তাই আমার ভাগনের বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি। কিছু টাকা বাঁচবে।

দাদু বললেন, সিনেমায় রিয়েল জিনিস চলবে? ওখানে তো সবই নকল মাল চলে।

প্রবীরবাবু বললেন, আসলে নকলে মিলিয়ে একটা কিছু দাঁড়ায়।

দাদু খুব আর্টের ঢঙে প্রশ্ন করলেন, হু আর ইউ?

প্রবীরবাবু থতমত খেয়ে গেলেন। মাতুল বললেন, আমার বাল্যবন্ধু, আর্টিস্ট, গীতিকার। আমার ছবির কিছু কিছু গান ও লিখছে।

প্রবীরবাবুর উৎসাহ ফিরে এল। আমি অলরেডি তোমার আহির ভৈঁরোতে বাণী বসিয়ে ফেলেছি জয়।

তাই নাকি? চিত্রাকে দেখাও।

প্রবীরবাবু আমার বুক ফুঁড়ে এপাশ থেকে ওপাশে হাত বাড়িয়ে সেই নোট বইটা মহিলাকে দিলেন।

মাতুল বললেন, চিত্রা, প্রথম লাইনটা সুরে ভেড়াও তো।

প্রবীরবাবু তাকিয়ে আছেন যেন গাছ থেকে পাকা ফল পড়বে। নীচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে। চিত্রাদেবী সহসা শুরু করলেন, এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই। শাবাশ, একেবারে সাধা গলা। মিছরির দানার মতো খেলছে। বরফে জমানো মধুর মতো মিঠে গলা। ঝাউয়ের পাতায় বয়ে যাওয়া বাতাসের মতো শনশনে।

এঁর নাকি গান গাইতে ভয় করছিল।

মাতুল বললেন, আমি আর একটু চড়া পরদা থেকে ধরতে চাই। চড়ায় করুণ রস জমে ভাল। মাতুল ধরলেন,

এ জীবনে আর কোনও প্রয়োজন নাই
ব্যাকুল বাতাস হৃদয়ে আমার
মরিয়া মরিয়া কাঁদে।

চিত্রাদেবী আমার হাতে প্রচণ্ড একটা চিমটি কেটে, একটা চোখ ছোট করে, বললেন, আহা, এইরকম যেদিন গাইতে পারব, আমি সেইদিন হব শান্ত। বলেই, মাতুলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিলেন।

মাতুলের চোখ ছিল রাস্তার দিকে। ব্যাকুল বাতাসে মীড়ের কাজ করতে গিয়ে হইহই করে উঠলেন, বাঁয়ে বাঁয়ে।

চালক আবার দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাঁয়ে হেলে পড়ল। ভাগ্য ভাল কোনও দুর্ঘটনা হল না। গাড়ি গোঁত করে এক রাস্তা ছেড়ে আর এক রাস্তায় ঢুকে পড়ল। চিত্রাদেবীর দাদুর মাথা ঠুকে গেল। সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, রোলসে এই ঝাঁকুনিটা একদম লাগে না। এমন কায়দায় তৈরি, যেন হাওয়ায় ভেসে চলেছি।

রোককে।

গাড়ি থামাতে হলে বাঙালিরা হিন্দি বলবেনই। বাংলায় গাড়ি থামিয়ে তেমন সুখ হয় না। হিন্দির মতো ব্রেক নেই। গাড়ি থেমে পড়ল। মাতুল নামতে নামতে বললেন, আপনারা একটু বসুন। আরও কয়েকজন হ্যান্ডস উঠবে। অন্ধকার-অন্ধকার একটা গলিতে ঢুকে পড়লেন।

মাতুল চলে যেতেই প্রবীরবাবু বললেন, তুমি আমার জায়গাটায় একটু সরে বসবে। আমি তা হলে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করে বাণীটানিগুলো একটু ঠিকঠাক করে নিতে পারি।

উত্তর দিলেন দাদু, ন্যাঅ্যা। যে যেখানে আছ, সেইখানেই থাকো। নাতনি আমার বড় হয়েছে। লাইনটা তেমন ভাল নয়। চোখেচোখে রাখার হুকুম নিয়ে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

চিত্রাদেবী খিলখিল করে হেসে উঠলেন, তোমরা সব পাগল। তুমি পাগল, মা পাগল, বাবা পাগল।

তুই-ই আমাদের পাগল করে ছেড়েছিস। জানিস না, শিল্পীদের একটু লুজ ক্যারেক্টার হয়।

প্রবীরবাবু করুণ মুখে, উদাস দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম তেমন ফল, মশা মারতে গালে চড়। মাতুল আসছেন। সঙ্গে কুঁজোমতো এক ভদ্রলোক। চলার ধরনটা বকের মতো। প্রতি পদক্ষেপে মাথাটা সামনে এগিয়ে গিয়ে বাতাসে হোঁচট খেয়ে ফিরে আসছে। ছন্দটা অনেকটা এইরকম, কত ধানে কত চাল, কত ধানে কত চাল। সাজপোশাক দেখলেই মনে হয় মুসলমান। মাথায় লেস-তোলা সাদা টুপি, চোগা, গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতেও লেসের কাজ। পায়ে নাগরা জুতো। সঙ্গে আসছে একজন কিশোর। তার হাতে একটা বাদ্যযন্ত্র। মনে হয় সারেঙ্গি।

মাতুল আর ক'জনকে তুলবেন! এটা তো রবারের গাড়ি নয়, যে চারপাশ ফুলে উঠে সকলকে জায়গা করে দেবে। মানদার মুখে পান জর্দার খিলির মতো। যখনই দেখো ডান গালটা ফুলে আছে।

মাতুল গাড়ির ভেতরটা একবার দেখে নিলেন। কীভাবে বসাবেন ভাবছেন। ঠিক হল, ছেলেটি চলে আসবে পেছনে। পেছনে এখনও একটু জায়গা আছে। ওস্তাদজি বসবেন সামনে। তাই হল। চিত্রাদেবী আমার দিকে আরও কিছুটা সরে এলেন। আমি প্রবীরবাবুকে দরজার দিকে আরও কিছুটা চেপে দিলুম। দাদু বললেন, তোমাদের কোলের ওই দুটোকে গাড়ির পেছনে রেখে দাও না। আরাম করে বসতে পারবে।

গাড়িতে উঠতে উঠতে মাতুল বললেন, পেছনে, ন স্থানং তিল ধারণং। যেমন আছে, বেশ আছে, আর তো মাত্র একজন উঠবে।

দাদু বললেন, অ্যাঁ বলো কী। এখনও আর একজন উঠবে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলের গাড়ির মতো অবস্থা হয়ে যাবে যে রে বাবা।

তা একটু হবে। কী আর করা যাবে বলুন।

ওস্তাদজি জানলার ধারে বসেছেন। সাজপোশাকে যত বাহার, চেহারায় তত বাহার নেই। দারুশিল্পের মতো আকৃতি। পকেট থেকে একটা রুপোর কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাচ্ছেন, আর বাঁ দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফুতুস ফুতুস করে জানলার বাইরে ভুক্তাবশেষ ছুড়ছেন।

যতবারই তিনি ফুতুস করেন ততবারই আমাদের দাদু আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুলে ডাঁয়ে হেলে পড়ে বলেন, মুশকিল করলে রে বাপু।

সামনে ফুতুস, পেছনে মুশকিল করলে রে বাপু। পর্যায়ক্রমে এই চলতে লাগল আর গাড়ি এগোতে লাগল টালিগঞ্জ স্টুডিয়োপাড়ার দিকে।

চিত্রাদেবী আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, বাপস।

কী বাপস?

ছেলেটা মাথায় হেকিমি তেল মেখেছে। কী বিশ্রী গন্ধ।

আমার চোখের সামনে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের কপালে চাঁদ। চাঁদের নাকে হাকিমি তেলের গন্ধ। আমার নাকে গুলবাগিচার খুশবু।

চিত্রাদেবী ভেলভেটের হাতব্যাগ থেকে একটা রুপোর আয়না বের করে মুখ দেখতে লাগলেন। গরম, ধুলো উড়ছে। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি বসা। গালের গুলাল গলে গলে পড়ছে। মহিলারা সুন্দরী হলে বড় জ্বালা। সামাল সামাল রব ওঠে। তরী করে টলমল পাশরাতে ওঠে জল। মাতুল হইহই করে উঠলেন, ডাঁয়ে, ডাঁয়ে।

তিন বাতসে লট্‌পাট হেয়:
দাম্‌ড়ি, চাম্‌ড়ি, পেট

মাতুলের গাড়ির অবস্থা গ্রামের ট্যাক্সির মতো। এমন ঠাসা ঠেসেছেন সেই জজসাহেবেও হেরে যাবেন। গ্রামের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে চৌকিদার ধরে এনেছে কোর্টে। গাড়িতে বাইশ জন লোক পুরেছিল হুজুর। ড্রাইভার অমায়িক হেসে বলেছিল, ওই তো আমার ধধ্‌ধড়ে গাড়ি কোর্টের বটতলায় পড়ে আছে, আপনি হুজুর বাইশ জন লোক পুরে দেখিয়ে দিন, কেমন করে তা সম্ভব!

টালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে গাড়ি ঢুকল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। চিত্রাদেবীর চাপে নিম্নাঙ্গে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পা দুটো ঝিনঝিন করছে! নারীশরীর কোমল হলেও তার একটা চাপ আছে। ভার আছে। অবশ্যই মধুর এবং সুখকর। এত দীর্ঘ সময় সুন্দরী কোনও মহিলার গাত্রলগ্ন হয়ে বসে থাকার অভিজ্ঞতা, এই আমার প্রথম। মন বিড়বিড় করে তখন থেকেই বলছে, সাহস করে বাড়ির বাইরে বেরোতে পেরেছিস, তাই না তোর এই অভিজ্ঞতা। আর্টের জগতে কত রোমান্স আছে দেখেছিস? গার্ডল অফ ভেনাসের খেলা।

একে একে আমরা খালাস পেলুম। চিত্রাদেবী নেমেই টলবল বলবল হয়ে গেলেন। পায়ে ঝিনঝিনি ধরেছে। দাদু বলতে থাকলেন, অমন করে নাচিসনি, আমার ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়া। বেশি নাচানাচি করলে গলার মুড়কি খারাপ হয়ে যাবে।

মুড়কি আবার কী বস্তু, কে জানে বাবা! ফুটকড়াই মুড়কি দোলের দিন খাওয়া হয়। গলার আবার মুড়কি কী! গানের লাইনে কত কী যে আছে! আমি আর প্রবীরবাবু মহাভারতের চরিত্রের মতো মুগুর হাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

বিশাল চেহারার এক ভদ্রলোক, জয়দা জয়দা বলতে বলতে এগিয়ে এলেন। পাঞ্জাবির খোলা বুকে বিশাল এক পদক ঝুলছে। ইনি যদি অভিনয়ের জগতের কেউ হন, তা হলে এঁর একমাত্র উপযুক্ত ভূমিকা হওয়া উচিত আবগারি দারোগার।

জয়দা জয়দা করছেন বটে, চোখদুটো খেলছে চিত্রাদেবীর শরীরে। মানুষের এই একটা বড় বদ অভ্যাস, মহিলারা যেন ময়রার দোকানের লাল ল্যাংচা। খাব খাব দৃষ্টিতে ওভাবে তাকানোটা কি ঠিক হচ্ছে! লোকে যে লোভী বলবে! দৃষ্টির ছ্যাঁকায় মহিলাদের অস্বস্তি হয় না!

প্রবীরবাবুও চোরা চাহুনি মারছেন, তবে বেশ কায়দা করে রেখেঢেকে। চারপাশে সবুজ গাছপালা, রোদ ঝলমল করছে, কড়া ছায়া লুটোপুটি করছে, তার মাঝে বেগুনি পোশাকে সুন্দরী এক মহিলা, পাশেই রুপোলি চুলের এক বৃদ্ধ, যৌবনের ব্যঙ্গ, পাঞ্জাবি পরা দারুশিল্প, সারেঙ্গি বাদক। একটা দার্শনিক দল।

লোলুপ দৈত্যকে কেন জানি না আমার কেবলই বলতে ইচ্ছে করছিল, মা যেমন শিশুকে বলে, ওই দেখ পাখি! শিশু পাখি উচ্চারণ করতে পারে না, বলে পাপী। আদো আদো বুলি, এত্তা পাপী।

ভাবতে ভাবতে মুখ ফসকে ওই শব্দটিই বেরিয়ে পড়ল। এত্তা পাপী।

প্রবীরবাবু বললেন, কী বলছ? কিছু বললে?

একটা পাখি।

হ্যাঁ, এখানে অনেক পাখি। গাছপালা বেশি তো! গাছ থাকলেই বেশি পাখি আসবে।

দৈত্য চিত্রাদেবীর সামনে গিয়ে সালাম আলেকুমের ভঙ্গিতে বললেন, চলুন ম্যাডাম। আমাদের অফিসে চলুন।

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হু আর ইউ। অফিসে যাবে কেন?

দৈত্য একটু ঘাবড়ে গেলেন। বেশ হয়েছে ব্যাটা। মহিলা দেখলেই হল! যেন নাকের চুল! সুড়সুড় করলেই ফ্যাঁচাত হাঁচি।

মাতুল খুব কড়া সুরে বললেন, দামু, তোমার কাজ কী?

কেন দাদা! ম্যানেজমেন্ট আর প্রোকিউরমেন্ট।

গাড়ির পেছনে যেসব মালপত্তর আছে, সাবধানে নামিয়ে নিয়ে যাও। তোমার অন্য আর কোনও কাজ নেই। ওদের হাত থেকে মুগুর দুটো নিয়ে যাও।

কোথায় সুন্দরী, আর কোথায় দুটো কেঠো মুগুর! আমাদের হাতের মুগুর দৈত্যের হাতে যেন ছাত পেটার দুটো কাঠ। সটাক সটাক করে দু'বার ভেঁজে নিয়ে বললেন, কোনও ওয়েট নেই। মুগুর দুটো পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে জিভের তলায় দুটো আঙুল পুরে, সিক করে একটা সিটি বাজালেন।

বোঝাই গেছে, পুরনো কলকাতার পায়রা-ওড়ানো বাবুদের শেষ বংশধর। মাতুলের স্কন্ধে ভর করেছেন। মাতামহ যদি একবার জানতে পারেন পুত্র সিনেমা করতে এসে এই সঙ্গে মিশছেন, তারা তারা বলে, দু'নয়নে পড়বে ধারা। আর মাতুলানী যদি জানতে পারেন, ডানাকাটা পরিরা গুরুজি গুরুজি বলে চারপাশে লাট খেয়ে বেড়াচ্ছেন, রেগে হাফবয়েল হয়ে বসে থাকবেন।

সিটি শুনে, দূরের একটা ঘর থেকে খাকি হাফপ্যান্ট আর সাদা জামা পরা লোক, যাই ওস্তাদ, বলে এগিয়ে আসতে থাকলেন। পা দুটো ধনুকের মতো। বড় বড় লোম। কামিয়ে কম্বল করা চলে। মাতুল সিনেমা করছেন, না সার্কাস করছেন? মাতুলই জানেন।

দৈত্য দামুবাবু হাত চোখ মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে বললেন, ওস্তাদ এ দুটোকে লিয়ে যাও। তুরন্ত লে যাও, তুরন্ত লৌটকে আ যাও শাগরেদ।

ওস্তাদের ওস্তাদ মুগুর দুটো দু'কাঁধে ফেলে শিম্পাঞ্জির মতো এগিয়ে চললেন। প্রবীরবাবু চাপা গলায় বললেন, দেখেছ?

কী বলুন তো?

ওই যে পুকুরপাড়ে, শানবাঁধানো ঘাটে কারা বসে আছেন?

গেরুয়া রঙের কাপড় আর পাঞ্জাবি পরে সুঠাম চেহারার দু'জন ভদ্রলোক বসে আছেন। সুন্দরী এক মহিলা এলোচুলে হাত পা নেড়ে কী যেন বলছেন। গাজন তো হয়ে গেছে, বাবা তারকনাথের এইসব সন্ন্যাসীরা কোথা থেকে এলেন, কে জানে? প্রবীরবাবু হয়তো জানেন।

ওঁরা কি সন্ন্যাসী?

তোমার মাথা।

তা হলে?

ওঁরা হলেন এক নম্বর ফিল্‌ম স্টার। দেখে চক্ষু সার্থক করো। ডান দিকে অহীন্দ্র চৌধুরী, পাশে পাহাড়ী সান্যাল। হাঁটুর ওপর একটা পা তুলে কেমন বসে আছেন দেখেছ?

আর ওই এলোকেশী?

আরে বাপ রে, ওঁকে চেনো না? কী চেনো হে ছোকরা! উনি হলেন তোমার গিয়ে, তোমার গিয়ে, আহা, নামটা মনে আসছে না, পরে বলছি। তুমি দেখে রাখো, ও হ্যাঁ সুনন্দা দেবী।

ওঁরা সব গেরুয়া পরেছেন কেন?

মনে হয় আনন্দমঠ হচ্ছে।

দামুবাবু গাড়ির পেছন থেকে মালপত্র বের করছিলেন, শুনতে পেয়েছেন আমাদের কথা। বললেন, আরে না মশাই, সিনেমায় গেরুয়া সাদা হয়ে যায়। এ লাইনে গেরুয়া বলে কিছু নেই, অল হোয়াইট। ক্যামেরার ব্যাপার মশাই। ওস্তাদ!

হাঁক মারলেন। পাহাড়ী সান্যাল চমকে উঠলেন।

দামুবাবু লক্ষ করে বললেন, পাহাড়ীদা, একটু জোরে হয়ে গেছে দাদা, মার্জনা করবেন।

পাহাড়ীদা গ্রাহ্যই করলেন না। আর একটা গাড়ি ঢুকল। দু'-চারজন হইহই করে এগিয়ে গেলেন। লম্বা চওড়া, ভীষণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ সামনের আসন থেকে নেমে এলেন। দু'-চারজন কাটা কলাগাছের মতো তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লেন। প্রবীরদা চাপা গলায় বললেন, দেখে রাখো, ইনি হলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নট, ছবি বিশ্বাস। দেখেছ এঁর অভিনয়?

মনে পড়ছে না।

অ্যাঃ তোমার জীবনটাই অসম্পূর্ণ। ছায়াছবির কিছুই জানো না।

পুকুরপাড়ে আর একজন অভিনেত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন। সাজগোজ দেখলে মনে হবে এইমাত্র বাসর ছেড়ে উঠে এসেছেন। কী সব চেহারা! প্রবীরবাবু চাপা গলায় বললেন, কী দেখছ? অনুভাদেবী। অভিনয় দেখলে তিন রাত্তির ঘুমোতে পারবে না।

মাতুল এতক্ষণ গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন, সেইখান থেকেই হেঁকে বললেন, তোমরা চলে এসো।

নীল জামা পরা এক ভদ্রলোককে মাতুল বেশ রাগরাগ গলায় বলছেন, যতক্ষণ না আমি স্লিপে সই করে দিচ্ছি ততক্ষণ কাউকে এক কাপ চা-ও দেবেন না। ক্যান ইউ ইমাজিন, একজন সারাদিনে চল্লিশটা হাফবয়েল

ডিম খেয়েছে!

আজ্ঞে, হাফবয়েল নয়, অমলেট।

ওই হল।

আজ্ঞে বৃহৎযজ্ঞে ওরকম তো হবেই। ফিল্ম লাইনে আপনি নতুন, তাই অবাক হচ্ছেন, এ লাইনে সবকিছু ওড়ে, পাখির মতো ওড়ে, টাকা ওড়ে, যৌবন ওড়ে, ডিম ওড়ে, চপ ওড়ে, লাল জল ওড়ে। এর নাম স্যার ছায়াবাজি, ভোজবাজি। কত কন্ট্রোল করবেন! এ কি র‍্যাশনের চাল!

আমার টাকা তো ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, সবাই খেয়ে যাবে ভোগা দিয়ে।

আজ্ঞে তা নয়, তবে দুশো এক টাকা আপনি এখন আমাকে দেবেন, কালকের পাওনা।

মাতুল হাঁকলেন, দামু।

ইয়েস গুরুজি।

টাকা উড়ছে।

সে তো কথাতেই আছে, কলকাতায় টাকা ওড়ে, ধরতে পারলেই হয়। মাড়োয়ারিরা ধরছে।

তা হলে ধরে এনে, ক্যান্টিন ম্যানেজারকে দাও। দুশো এক টাকা।

দামুবাবু একগাল হেসে বললেন, আপনি ওড়ান, আমি ধরি।

পকেট থেকে গোটাকতক একশো টাকার নোট বের করে দামুবাবুর হাতে দিলেন। দিয়ে বললেন, কাজের নামে অষ্টরম্ভা, রোজ দুশো টাকার খানা উড়ছে। চলে এসো।

শেষ নির্দেশ আমাদের জন্যে। আমরা গুটিগুটি এগিয়ে চললুম। প্যান্টশার্ট পরা খড়খড়ে এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে পড়লেন। তীক্ষ্ণ নজরে চিত্রাদেবীকে দেখলেন। ভদ্রলোকের গলায় সুতোয় বাঁধা কী একটা গোলমতো ঝুলছে। রেফারির গলার বাঁশির মতো। হঠাৎ থেমে পড়ে মাতুলকে ডাকলেন, জয়!

মাতুল ফিরে তাকালেন। মনে হয় এ জগতের বেশ সম্মানিত মানুষ। তা না হলে এত সম্ভ্রমে মাতুল উত্তর দিতেন না, বলুন রাখালদা!

তোমার আর্টিস্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাইড রোল, না হিরোইন।

আজ্ঞে না, মিউজিক্যাল।

ভেরি ফোটোজেনিক ফেস। আমি একটা চান্স দিতে পারি। একেবারে লিডিং রোলে। আমি হিরোইন খুঁজছি।

আপনি তো ফ্লোরে নেমে গেছেন। কাস্টিং তো ঠিক হয়ে গেছে।

না, আমার নেকস্ট বইটার জন্যে। আগুনের ফুলকি। বাজারে আমি নতুন একটা জুটি ছাড়তে চাই। স্ক্রিপ্টটা বড় ভাল হে।

মিউজিক কে করছে?

ঠিক করিনি। তুমি করবে?

প্রবীরবাবু দুম করে বললেন, গান আমি লিখব।

রাখালবাবু বললেন, কেন?

প্রবীরবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, জয়ের বইয়ে আমি লিখছি তো!

আগুনের ফুলকি রোমান্টিক বই, বিরহের গান আপনি লিখতে পারবেন?

খুব পারব, আমি নিজে একজন ব্যর্থপ্রেমিক। আমার হিস্ট্রি জয় জানে।

হিস্ট্রি জিয়োগ্রাফির প্রয়োজন নেই, পরে দেখা করবেন।

রাখালবাবু সরাসরি চিত্রাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, কী, অভিনয় করবেন?

চিত্রাদেবী ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, পারব? না বাবা, লজ্জা করে।

দাদু বললেন, অভিনয় করবে? কী বলছেন আপনি? ভদ্রঘরের মেয়ে অভিনয় করবে কী? নায়করা মদ খেয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরবে, আপনি লাইনের মেয়ে খোঁজ করুন।

আপনি বুঝি খুব কনজারভেটিভ! ফিল্ম লাইনে কত ভদ্রঘরের লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে এসেছে জানেন?

জেনে কাজ নেই, জেনে কাজ নেই। দাদু সুর করে টেনে টেনে বললেন। আমাদের ভোলার মেয়ে আজ পাঁচ বছর হল নিরুদ্দেশ। নায়িকা হবে বলে গয়নাগাটি নিয়ে বোম্বে পালিয়েছিল। ব্যস, একেবারে বেপাত্তা। ভোলার বউ রোজ রাতে মেয়েকে স্বপ্নে দেখে, কেঁদে কেঁদে বলছে, মা, মাগো, ওরা আমাকে সেলুলয়েডে ধরে রেখেছে, এই দেখো আমার ছায়া পড়ছে, কায়া নেই।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। চিত্রাদেবীর কান ঘেঁষে, কাঁধ বেয়ে একঝলক পক্ষীকৃত্য নেমে গেল। তিনি ধেইধেই করে নেচে বললেন, অ্যাম্মা, যাঁঃতেঁরিকা, ভাল্লাগে না বাবা, কী হবে!

একসঙ্গে দু'জনে বললেন, যদি অনুমতি করেন!

দু'জনের একজন প্রবীরবাবু, অন্যজন দামুবাবু। যদি অনুমতি করেন!

দাদু বললেন, না, অনুমতি করবে না, আমি আছি কী করতে! অ্যায় এদিকে মাথা নিচু কর।

রাখালবাবু বললেন, খুব শুভ লক্ষণ। তুমি অভিনয়ে এলে, অনেক দূরে যাবে। টপ, টু দি টপ। তাড়া নেই। ভেবেচিন্তে জবাব দিয়ে। তোমার এই এক্সপ্রেশন এত ন্যাচারাল! দেখো, যদি বেরিয়ে আসতে পারো! কনজারভেটিভ ফ্যামিলি এইভাবে কত ট্যালেন্ট যে নষ্ট করছে! আই পিটি দেম, আই পিটি।

রাখালদা!

গাছের আড়াল থেকে বেশ লম্বা চওড়া এক মহিলা ডাকলেন। রাখালবাবু বললেন, যাই অনুভা। প্রবীরবাবু খপ করে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, দেখেছ, অনুভা, আরে ব্বাপ। আজ রাতে আর ঘুমোতে পারব না। অনুভা আমার এত কাছে! ফ্যানটাস্টিক!

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেভাবে হেঁটে যায়, চিত্রাদেবী রাখালবাবুর পথে সেইভাবে দু'কদম হেঁটে গেলেন। দাদু খপ করে হাত চেপে ধরে বললেন, অ্যায়, যাচ্ছিস কোথা! একে একেবারে হিপনোটাইজ করে ফেলেছে। ওরে,

তুই গান গাইতে এসেছিস, নায়িকা হতে আসিসনি।

মাতুলের মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। দু'পাশে দু'সার গাছের মধ্যে তিনি এগোতে লাগলেন। দলবল চলল পেছন পেছন। সারেঙ্গি মিঞা বাতাসে মাথা কুটে কুটে চলেছেন, কী হয়, কী হয়! চিত্রাদেবী এখন মাতুলের পাশাপাশি হাঁটছেন। প্রবীরবাবু আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটছেন। ধীরে ধীরে আমাদের দু'জনের বেশ একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠছে। মানুষটি বেশ সহজ সরল। আমার কানে কানে আবার ফিসফিস করে বললেন, নায়িকা কীভাবে তৈরি হয় জানো?

আজ্ঞে না।

আমাকে এত আজ্ঞে আজ্ঞে কোরো না। ও তোমার না জানাই ভাল।

কেন?

সে অনেক ব্যাপার। অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়। সেসব কথা তোমাকে আমি বলতে পারব না। তাকিয়ে দেখো, জয় আর চিত্রাকে কেমন মানিয়েছে! ওদের দু'জনকে নায়কনায়িকা করে দিলে হয়।

হ্যাঁ।

তোমার মামা বিয়ে করেছে?

হ্যাঁ।

কাকে?

মামিমাকে।

উঃ, তোমার মাথায় কি গোবর ভরা আছে! মামার বউ তো মামি হবেই। মামির নাম কী?

সীমা।

জয়া নয়, ঠিক জানো?

উনি তো সীমাই বলেন।

ইস! কাজটা খুব খারাপ করেছে।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। আমার খুব খারাপ লাগছে। কেমন যেন কান্নাকান্না পাচ্ছে।

কেন?

সে তুমি বুঝবে না। একজনের জন্যে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি। কী বলো তো?

এমন কিছু, যা দেখলে মানুষের কান্না পায়।

ঠিক বলেছ। আমি একটা নদী দেখতে পাচ্ছি। মনে করো ঘাটশিলার সুবর্ণরেখা। সেই নদীর ধারে চাঁদিনি রাতে, একটা কালো পাথরের ওপর পাশাপাশি বসে আছে একটি ছেলে আর মেয়ে। সামনে ধোঁয়াধোঁয়া আকাশ। মেয়েটি ছেলেটির কাঁধে মাথা রেখেছে।

ছেলেটি হঠাৎ উঠে চলে গেল। মেয়েটি এখন একা বসে আছে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকছে বিধবার কান্নার মতো।

স্টার্ট সাউন্ড। স্টার্ট সাউন্ড। টেক ওয়ান।

আমরা দু'জনেই চমকে উঠেছি। একটা বিশাল গাড়ির ভেতর থেকে শব্দটা ভেসে এল। একগাদা যন্ত্রপাতির সামনে কানে হেডফোন লাগিয়ে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। মাতুল চিত্রাদেবীকে হাতপা নেড়ে কী যেন বলছেন। সব কথা শোনা যাচ্ছে না। কেবল তুমি তুমি শুনছি। দু'জনেই বেশ উত্তেজিত।

প্রবীরবাবু বললেন, মনে হচ্ছে, জয় খুব রেগে গেছে। স্বাভাবিক। নায়িকা হবার জন্যে একেবারে খেপে উঠেছে। তুমি এলে জয়ের সঙ্গে, চললে রাখালবাবুর সঙ্গে। কোনও মানে হয়!

আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছি। বুঝতে পারছি না গুরু শিষ্যায় কী হচ্ছে। তবে গুরুতর একটা কিছু হচ্ছে। চিত্রাদেবী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মাতুল এগিয়ে চললেন হনহন করে। পেছনে ফিরেও তাকালেন না। আমরা চিত্রাদেবীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। জিজ্ঞেস করতে যাব, হল কী?

হঠাৎ তিনি সামনে দু'হাত বাড়িয়ে হেরে রে রে করে মাতুলের দিকে ছুটে চললেন। সেই নদের নিমাইয়ে দেখেছিলুম, শচীদেবী এইভাবে ছুটছিলেন নিমাই নিমাই করে।

প্রবীরবাবু বললেন, যাঃ শালা, সিনেমা দেখছি এইখানেই শুরু হয়ে গেল। মেয়েছেলের কারবার!

এই অবসরে আমরা খুব কাছাকাছি এসে গেছি। মাতুল বললেন, যাও না যাও, আমার কাছে কেন? নায়িকা হও গে যাও।

দাদু সঙ্গে দোহার দিয়ে চলেছেন, সমানে এক সুরে, আত্মসংযম চাই, ভেসে যাবে, ভেসে যাবে।

সারেঙ্গি মিঞা মাথা নাড়ছেন আর বলছেন, শোভানাল্লা, শোভানাল্লা।

ব্যাপারটা কতদূর গড়াত কে জানে! চিত্রাদেবীকে বাঁচিয়ে দিলেন লাটু ওস্তাদ। দামুবাবু ঘোষণা করলেন, ওস্তাদ এসে গেছে উইথ ফুল টিম।

প্রকৃতই ওস্তাদের মতো ওস্তাদ। কাপড় পরেছেন ঠিক লাটুবাবুর মতো, মালকোঁচা মেরে, দু'পাশে পেখম উড়ছে। প্রবীরবাবুর সবেতেই একটা কিছু বলা চাই। নিজের মনেই বলছেন, বাবা, কী ডাঁসা, ডাঁসা চেহারার নাচনেওয়ালি।

সত্যিই তাই, নাচিয়ে মেয়েদের চলার ধরনই আলাদা। ডান হাত শরীরের ডান পাশে ছেতরে আছে। নড়ছে যেন নৌকোর বইঠা বাওয়া হচ্ছে। আর কোমর থেকে শরীরের নিম্নাঙ্গে এমন কায়দায় দুলছে, তওবা তওবা। সে কী ছন্দ! যাব কি যাব না। লটাকে চলানা। মুকুতা ঝুলানা। এতদিনে বুঝলুম, মা দেখেছি, মাইমা দেখেছি, মাসিমা দেখেছি, দিদি দেখেছি, রমণী দেখিনি। আজ দেখলুম। রমণীয় রম্যতাং। মাতামহ একদিন সন্ধ্যাকালে নারকেল গাছের তলায় উবু হয়ে বসে বলেছিলেন, পান্তুরানি, যখনই দেখবে মন বড় চঞ্চল হয়েছে, রিরংসার ইচ্ছে হচ্ছে, তখনই ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতকের সেই শ্লোকটি আবৃত্তি করবে,

স্তনৌ মাংসগ্রন্থী কনককলসাবিত্যুপমিতৌ
মুখং শ্লেষমাগারং তদপি চ শশাঙ্কেন তুলিতং।
স্রবন্মূত্রক্লিন্নং করিবরকরস্পর্ধি জঘনং
মুহুনিন্দং রূপং কবিবরবিশেষৈর্গুরুকৃতম্।

ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি, আর আবৃত্তি করছি। করলে কী হবে! খোস একবার চুলকে উঠলে আর রক্ষে আছে। স্থানকালের বিচার থাকে না। খ্যাঁসোর খ্যাঁমোর চুলকোতে থাকে। তিন বাতসে লট্‌পাট হেয়, দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি, পেট। একেই আমি সহজে কেতরে পড়ি, চোখের সামনে এই ডুবে যৌবনের র‍্যালায় মনের মাচা মচমচ করছে। অক্ষয় কাকাবাবু বলেছিলেন, এ ছেলে আপনার নাচিয়ে হতে পারত! মা আমি নাচিয়ে হব। কলসি গেল ছলকে ছলকে। ভোলে বোম্বা উঠল দুলে।

লাটুবাবুকে দেখে মাতুল নেচে উঠলেন। এতক্ষণ চিত্রাদেবী চারপাশ আলো করে রেখেছিলেন, এখন একেবারে চাঁদের হাটবাজার। কনক কলসের কলকাকলিতে টলমল। সারেঙ্গি মিঞার ডাক পড়ল। প্রবীরবাবু বললেন, বাবা, জয় দেখছি পুরো বাইজি পাড়াটাকে উঠিয়ে এনেছে। সামলাবে কী করে! গাদা গাদা টাকার ব্যাপার!

এদের বাইজি বলে প্রবীরমামা?

হ্যাঁ গো! কত বড়লোকের বাড়িতে এখন ঘুঘু চরছে। জানো কি?

বিশাল একটা ঘরে আমরা ঢুকে পড়লুম। মাঝখানে আলো, চারপাশে অন্ধকার। শয়ে শয়ে ইলেকট্রিক তার এপাশ থেকে ওপাশে, ওপাশ থেকে এপাশে ছুটোছুটি করছে। উটমুখো হয়ে চললেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে। লাটুবাবু, মাতুল, দলবল, আলোর বৃত্তে চলে গেছেন। বেশ ভারী চেহারার এক ভদ্রলোক হাত নেড়ে নেড়ে নানা কথা বলছেন। প্রবীরবাবু বললেন, মনে হচ্ছে ইনিই জয়ের ছবির ডিরেক্টর।

একপাশে মেকআপ নিয়ে এক ভদ্রলোক, ভুল বলা হল, অভিনেতা বসে আছেন। বসে আছেন রাজার মতো। প্রবীরবাবু বললেন, চিনতে পারছ?

এ দেখি ভাল পরীক্ষায় পড়া গেছে। চিনতে পারছ? চিনতে পারছ?

জহর গাঙ্গুলী। প্রবীরবাবু হাত তুলে নমস্কার করলেন। সাংঘাতিক তারকাভক্ত মানুষ।

অন্ধকার থেকে চাপা গলায় কে যেন ডাকল, পিন্টু। খুব পরিচিত নারীকণ্ঠ। চেয়ারে বসে আছে। অন্ধকারে আবছা।

যে হও সে হও প্রভু
তুমি তো সোয়ামি
যত কাল দেহ তোমার
তত কাল আমি ॥

বুকে ছলাত করে একটা শব্দ হল। বুকের শব্দ কানে আসে না। ধরা পড়ে ডাক্তারের বুক-দেখা যন্ত্রে। বলতে হয় তাই বললুম। উপন্যাসে পড়েছি, এইরকম পরিস্থিতিতে বুক ছলাত করে ওঠে। কনক বসে আছে আবছা অন্ধকারে গালে হাত দিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে। সে এক দৃশ্য। কেন জানি না, রঘুবংশের সেই স্বয়ংবর সভার কথা মনে পড়ে গেল। কোথা থেকে একচিলতে আলো এসে কনকের আঙুলে পড়েছে। আমি মাথা ঘোরালেই আঙুলের পাথর ঝিলিক মেরে উঠেছে। এ আংটি তো কনকের আঙুলে আগে দেখিনি। নিশ্চয় প্রতাপ রায় কোনও এক রাতে সোহাগ করে পরিয়ে দিয়েছে। পরাবেই। পরাবার মুরোদ রাখে রায়মহাশয়। আমার মতো ফেকলু নয়। আবার আমার কথা আসছে কেন? আমি কনকের আঙুলে আংটি পরাতে যাব কোন আনন্দে। আমার আবার অত মাতন কীসের! পাগলা দাশু। তবে কনককে অসাধারণ দেখাচ্ছে। রঘুবংশ ছাড়া অন্য কোথাও এর তুলনা নেই,

বজ্রাংশু-গর্ভাঙ্গুলি রন্ধ্রমেকং ব্যাপারয়মাস করং কিরীটে ॥

কালিদাস লিখেছেন, কোন রাজা আবার, যথাস্থানে স্থাপিত থাকা সত্ত্বেও যেন কিঞ্চিৎ স্থানচ্যুত হইয়াছে,—এমনই ভাব দেখাইয়া স্বহস্তে মস্তকের রত্নময় কিরীটটি তুলিয়া ঠিক করিয়া বসাইতে লাগিলেন। কিরীটখচিত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডর প্রভায় তাঁহার অঙ্গুলির রন্ধ্রসমূহ পরিপূর্ণ হইল।

প্রবীরবাবু বললেন, তোমাকে ডাকছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাব্বা বলো কী! ভদ্রমহিলা কে?

আমার মেসোমশাইয়ের মেয়ে।

উঃ। তোমাদের কত কী যে আছে। আমার শালা, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। যাও যাও, শুনে এসো।

কনকের পাশে একটা চেয়ার খালি পড়ে আছে। বসা উচিত হবে কি না ভাবছি, কনক চাপাস্বরে বললে, বোসো না।

তুমি কি সিনেমা করতে এসেছ, কনক?

আমার একটা হাত মুঠোয় ধরে কনক বললে, আমায় ভুলে গেছ?

ভুলে যাব কেন? ভোলা কি অত সহজ। মানুষ কোনও কিছুই ভুলতে পারে না। মনের অতলে স্মৃতি হয়ে তলিয়ে থাকে। সুযোগ পেলেই ঠেলেঠুলে ওঠে।

আমার হাতে কনকের মুঠোর চাপ কখনও জোর হচ্ছে, কখনও আলগা হচ্ছে। মেয়েছেলের ভালবাসায় আমার আর বিশ্বাস নেই, ঘেন্না ধরে গেছে। এবার আমি ঈশ্বরকে ভালবাসব। একতরফা ভালবাসা। দেনাপাওনার ব্যাপার নেই। প্রীত্ প্রীত্ সব্ কোই কহত, কঠিন তাসু কি রীত। আদি অন্ত নিব নাহি, বাল্কি সি ভীত॥ প্রেম, প্রেম! প্রেম তো বালির বাঁধ। আজ আছ, কাল নেই। সাচ্চা প্রেম ঈশ্বরে। আমি ঈশ্বরকেই ভালবাসব। আমার হাত খামচালে কী হবে কনক। আমি যে জেগে উঠেছি। মোহনিদ্রা ভেঙে গেছে। দুনিয়ার হালচাল এই বোকাটা বুঝে ফেলেছে।

হম যাকো চিন্তন করে মোহি মানত নহি।
সো চাহভ জন অন্যকো সো নহি মানত তাহি॥
হমকো চিন্তত হয় অরু নারী।
ধিক্ হৈ কাম ধিকধিক নর-নারী॥

আমি যার জন্য অধীর, তার মনে বাসা বেঁধে বসে আছে অন্য পাখি। সে পাখি আবার এ ডালে বসে, উড়ে যায় অন্য বাগিচায়। পরস্ত্রী আর পরপুরুষ, এ ওকে, ও তাকে, বিশ্বাসঘাতকের দল। ধিক কামনা, ধিক বাসনা, নারীকে ধিক, আমাকে ধিক।

কানের কাছে মুখ এনে কনক ফিসফিস করে বলল, কী, তোমার অভিমান হয়েছে?

কী জানি, কনকের কথা বলার ধরনে কী ছিল, গলা যেন বুজে এল আবেগে। উত্তর দেবার ক্ষমতাই নেই তো উত্তর দেব কী! আশেপাশে সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব লোক ঘোরাফেরা করছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলব নাকি, কেন, কেন তুমি চলে গেলে? হাতের তাস অত সহজে দেখাতে নেই।

কনক বললে, বুঝেছি, তোমার অভিমান হয়েছে।

আলোর বৃত্তে দাঁড়িয়ে বেঁটেমতো কে একজন হেঁকে বললেন, সাইলেন্স, সাইলেন্স। স্টার্ট ক্যামেরা, স্টার্ট সাউন্ড।

কনকের হাতের মুঠোয় আমার শির-বের-করা শীর্ণ আঙুল ধরাই রইল। কথা বন্ধ হয়ে গেল। আলোর বৃত্তে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসেছেন সেই বিখ্যাত অভিনেতা, ছবি বিশ্বাস। এরই মধ্যে কখন গেরুয়া পরে ফেলেছেন। মেকআপে চেহারা একেবারে বদলে গেছে। ঘাড়ে নেমেছে। কাঁচাপাকা চুলের বাবরি। ঠোঁটের ওপর পাকানো গোঁফ। এই জিনিসকেই ইংরেজিতে বলে, হ্যান্ডল বার মুশট্যাশ। জমিদারবাবু বসেছেন ফরাশে। সামনে বোতল আর গ্লাস। পাশেই উঁচিয়ে আছে আলবোলা। নলটা সামনে পড়ে আছে বাঘের ন্যাজের মতো। সেই বেঁটে মানুষটি ঘুড়ি ওড়াবার কায়দায় একপাশে দাঁড়িয়ে, দুটো হাত নীচে থেকে ওপর দিয়ে তুলে ছেড়ে দিলেন। সংকেত জানালেন, শুরু। ঝলঝলে প্যান্ট পরা এক ভদ্রলোক ছবিবাবুর মুখের সামনে দুটো কাঠের টুকরো ধরলেন। কালো রং করা। খড়ি দিয়ে কী সব লেখা। চিৎকার করে বললেন, শট থ্রি, টেক ওয়ান। কাঠদুটো দু'হাতে ফাক করে ঠাস করে ঠুকে দিয়ে, গুঁড়ি মেরে সরে এলেন।

শুরু হল ছবিবাবুর খেলা। নিমেষে তার চেহারা পালটে গেল। চোখমুখ দেখলেই মনে হবে, কতক্ষণ যেন বসে বসে মদ্যপান করে বেশ একটু নেশাগ্রস্ত হয়েছেন। একেই বলে বড় অভিনেতা। বাস্তব থেকে কল্পজগতে যেতে পারেন চোখের পলকে। শূন্য দৃষ্টিতে এধার-ওধার তাকালেন। বোতল থেকে গেলাসে লাল জল ঢাললেন। অদ্ভুত কায়দায় সুদৃশ্য গেলাসটি ঠোঁটের ফাঁকে তুলে ধরে ছোট্ট একটি চুমুক মারলেন। হাত সামান্য কাঁপছে। এইবার গেলাসটিকে চোখের সামনে তুলে ধরে বলতে লাগলেন,

জীবন, জীবন! মহাশূন্যে নক্ষত্রের হাহাকার! উল্কা, উল্কা! জ্বলে যাও, পুড়ে যাও। নীলাদ্রিশেখর, মৃত্যুর আর কত দেরি। সবাই তো চলে গেল, একী, আমি একা! এই জলসাঘরে আমি একা! ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কোই হ্যায়? বাঁ দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে হাঁকলেন, কোই হ্যায়?

মহা উল্লাসে পাশ থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠলেন, ওকে, ওকে, স্টপ। ছবিবাবু গেলাসটি সহজ হাতে সামনে নামিয়ে রেখে তাকিয়ায় কাত হয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। সেই বেঁটে ভদ্রলোক নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে বলতে লাগলেন, ছবিদা, ফাটিয়ে দিয়েছেন। লা জবাব। লা জবাব।

কনকের ওপাশের চেয়ারে অন্ধকারে কে যেন এসে বসলেন। কনকের মুঠো থেকে আমার আঙুল খুলে এল। বন্ধনের এই হল ধর্ম, কখন যে খুলে পড়ে! এই আকর্ষণ, এই বিকর্ষণ। কে এসে বসলেন, দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে চমকে উঠলুম। প্রতাপ রায়। একেবারে সাহেবি পোশাক। চোখে ছাইছাই রঙের গগল্‌স। ও, প্রতাপ রায় আসায় কনক আমার হাত ছেড়ে দিলে! বেশ ভাই বেশ, শাবাশ! লা জবাব। মেয়েরা বুঝি এইভাবেই ক্ষমতাশালী পুরুষের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। 'যে হও সে হও প্রভু তুমি তো সোয়ামি/যত কাল দেহ তোমার তত কাল আমি।'

প্রতাপ রায় কনকের কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বললেন। তেমন বোঝা গেল না, শুধু কানে এল, 'জয়টা হোপলেস, জয়টা হোপলেস।' কনক ফিসফিস করে বললে, পিন্টু, পিন্টু।

আড়চোখে দেখছি, প্রতাপ রায় কনকের পাশ থেকে আমাকে একবার উঁকি মেরে দেখে নিলেন। সোজা হয়ে বসে বললেন, কী ভাগনে, কেমন আছ?

ভাল আছি। আপনি? (দেখতেই পাচ্ছি বেশ মজায় আছেন, তবু আমড়াগাছি।)

চলছে একরকম, বড় ঝামেলায় আছি। (তাই নাকি? রসে হাবুডুবু রসগোল্লার একটাই ঝামেলা, রসিকে খেয়ে ফেলে।)

কী ঝামেলা?

সে তুমি বুঝবে না। তোমার বোঝার বয়স হয়নি। বিষয়সম্পত্তি। মামলা মোকর্দমা। তোমার বাবা কেমন আছেন?

ভাল।

ভাল থাকলেই ভাল।

কনকের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, জয়ের সঙ্গে আজ আমার একচোট হয়ে যাবে।

কনক বললে, শুধু শুধু মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। আপনার সব ভাল, একটাই খারাপ। বড় তাড়াতাড়ি রেগে যান। ওটা ঠিক নয়।

কী বলছ তুমি? পুরুষমানুষের রাগই হল ভূষণ। জড়োয়ার গয়না।

সাইলেন্স, সাইলেন্স।

আবার সেই নির্দেশ ভেসে এল। আড়চোখে দেখছি, কনকের হাতের মুঠোয় এখন প্রতাপ রায়ের হীরকভূষিত আঙুল। ধ্যাততেরিকা, মেয়েছেলের নিকুচি করেছে। আমার অবশ্য রাগ বা অভিমান করার কোনও মানে হয় না। কনক আমার কে। সম্পর্কে বোন। দূর সম্পর্কের বোন। এমন কিছু প্রেমের সম্পর্ক নয়। বাতাসে নিজেই অট্টালিকা তৈরি করছি, নিজেই ভেঙে ফেলছি। ওঃ মন কী জিনিস! চেয়ার ঠেলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে গেলুম, পেছন থেকে কে একজন মাথায় গাঁট্টা মেরে বসিয়ে দিলে। ও মনে ছিল না, সামনে ছায়াছবি তৈরি হচ্ছে। কায়াকে ছায়া করে সেলুলয়েডে চ্যাপটা করে ধরা হচ্ছে। শব্দ করা চলবে না। গাঁট্টা খেয়ে গোটাকতক কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল, চলে মুসাফির গাহি/এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু, ব্যথার দোসর নাহি!/নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল কেহ নাই মুছাবার,/হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলি, কেহ নাই শুনিবার।

শট ফোর, টেক ওয়ান। খটাস করে কাঠের শব্দ।

ছবিবাবু আবার অন্যরকম হয়ে গেছেন। সেই মাতাল জমিদার। কোই হ্যায়? কে আছে? শশী, শশী। ফতুয়া পরা একটা লোক, খাটো ধুতি পরে, কাঁপতে কাঁপতে সামনে এসে দাঁড়াল, হুজুর।

কাট, কাট। পরিচালক নৃত্য করতে করতে এগিয়ে এলেন।

এই আমার সুযোগ। চেয়ার ঠেলে উঠে, প্রবীরবাবু যেখানে ছিলেন সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। ধনী ব্যক্তিদের পাশাপাশি বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়। বড় উত্তাপ, বড় অস্বস্তি। আমার প্রবীরবাবুই ভাল। মাতুলও কেমন যেন অস্বস্তিকর। বেশ একটু ধনগর্ব আছে।

আবছা অন্ধকারে প্রবীরবাবুকে প্রথমে খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। মাতুল দলবল সহ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছেন। কার ভেতর ঢুকে বসে আছেন, কে জানে? প্রবীরবাবুই ফিসফিস করে ডেকে জানান দিলেন। ছোট একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর চুপ করে বসে আছেন। এত নিচু, মাটির প্রায় কাছাকাছি, তাই চোখে পড়েননি।

প্রবীরবাবু বললেন, চলো, বাইরে যাবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, এখানে হাঁপিয়ে উঠেছি।

দু'জনে সেই কল্পজগৎ থেকে বাইরের জগতে মুক্তি পেয়ে যেন প্রাণে বাঁচলুম। রোদের আলোয় চোখ ঝাঁঝিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, মামা কোথায় বলুন তো?

প্রবীরবাবু বললেন, অদ্ভুত ছেলে, আমাদের ফেলে কোথায় যে চলে গেল। ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে। চলো না, বাইরে গিয়ে দেখি, কোনও দোকানটোকান পাওয়া যায় নাকি!

উনি যদি হঠাৎ আবার খোঁজ করেন?

তাও তো বটে। তা হলে তুমি থাকো, আমি যাই।

আমি যাই মানে?

আমি চলে যাই। এ জগৎটা আর আমার ভাল লাগছে না। এ যেন সব দাঁড়ে-বসা টিয়া। রাধেকৃষ্ণ বলো পাখি, কৃষ্ণ কথা বলো। এখানে আমার কিছু করার নেই। বুঝলে ভাগনে। এ হল গিলটি সোনার জগৎ। আর জয়! জয়কে আমি চিনি। কল্পলোকের মানুষ। ওর কথায় যে নাচবে তার ভরাডুবি হবে। যখন যা নিয়ে মাতবে তখন একেবারে চূড়ান্ত করে ছেড়ে দেবে। তারপরে নেতিয়ে পড়বে। ভোরের ফুলের মতো। ফুটল যখন, বাগান মাত, তারপরেই ন্যাতা। তুমি এখানে ঘুরেফিরে বেড়াও। খেয়াল হলে ডেকে পাঠাবে। ঘুরে ঘুরে ভুঁইতারা দেখো।

আমারও আর ভাল লাগছে না। চলুন পালাই।

তা হলে তো কোনও কথাই নেই। তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। আমার বোন বড় সুন্দর গান গায়। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, আমরা বড়লোক নই। ভাঙাচোরা বাড়ি। অন্ধকার। তেমন বাতাস খেলে না।

প্রবীরমামা, আমরাও বড়লোক নই। যাবার আগে মামাকে কোনওভাবে জানিয়ে যেতে পারলে শান্তি পাওয়া যেত।

দাঁড়াও, ওই দেখো দামুবাবু আসছে।

দৈত্য দামু চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে, শিস দিতে দিতে আসছেন। প্রবীরবাবু বললেন, এই যে স্যার, শুনছেন?

দামুবাবু থেমে পড়ে, ভুরু কুঁচকে, টেরিয়ে তাকালেন। আর্টের চাহুনি। বলুন।

আজ্ঞে, জয়বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কেন? আর কোনও একস্ট্রা নেওয়া হবে না।

আমরা একস্ট্রা নই। আমি জয়ের বন্ধু, আর এ হল ভাগনে।

সিনেমা লাইনে অনেক ভাগনে-ভাগনি ঘোরে। ও কায়দায় সুবিধে হবে না।

আরে কী আশ্চর্য, আচ্ছা বেহেড মানুষ, আমরা তো একসঙ্গে জয়ের গাড়িতে এলুম, আপনি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন। ব্রাহ্মী শাক খান।

আরে খুব লম্বা চওড়া বাত বলছ ছোকরা। গলা টিপে তোমার দুধ বের করে দোব।

প্রবীরবাবু বললেন, তা তুমি পারো। তোমার যা চেহারা। আমি তো ছারপোকা।

তবে, শালা অত ফুটুনি কীসের?

তোমার শ্যালক হবার ইচ্ছে নেই গো ভীম ভবানী। আমার ভগিনী তো তোমার কোলের শিশু।

টেম্পার যা চড়েছে থামাতে না পারলে প্রবীরমামা ছাতু। কিছু না, দামুবাবু একবার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলেই রোড রোলারের কাজ হবে। আমি খুব আদুরে গলায় বললুম, দামুমামা, আমার মামা সত্যিই মামা। তাঁকে বলবেন, আমরা চলে গেছি।

কথাটায় বেশ কাজ হল। এতগুলো মামা একসঙ্গে ছেড়েছি। অনেকটা 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ'র মতো। সবেতেই মা। মা দিয়ে মাত।

দামুবাবু নরম হয়ে বললেন, তোমাকে প্রথম থেকেই আমার চেনাচেনা মনে হচ্ছে।

আজ্ঞে তা তো হবেই। আমার আর মামার মুখ প্রায় একই রকম।

আই সি, আই সি। তা গুরুজি তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

প্রবীরবাবু আঁতকে উঠলেন, অ্যাঁ, কোথায় বেরোলেন?

টাকার খোঁজে। সিক্স পাওনাদার ঘুরঘুর করে ঘুরছে, হ্যান্ডসরা সব বসে আছে, আগাম টাকা না দিলে কেউ প্যাঁ করবে না। যে-বন্ধুর টাকা দেবার কথা ছিল, সে বলছে, সিনেমা করবে না। এ সব ভেতরের কথা। বাইরে যেন লিক না করে। মালুম!

হ্যাঁ মালুম, কিন্তু গেল কোথায়?

এক মহারাজের বাড়ি। টাকা না পান, কিছু মার্বেল পাথর তো পাবেন। একটা মেঝেতে ছবি দশ হাত এগোবে। লাঃ লা ট্রালা, ট্রালা। দামুবাবু গুরুজির রেস্ত ফুরিয়ে যাবার আনন্দে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললেন।

প্রবীরবাবু বললেন, তোমায় বলেছিলুম না, জয় বড় বিচিত্র চরিত্রের ছেলে। শিল্পী, তাই লোকে বলে আত্মভোলা, তা না হলে বলত স্বার্থপর। সময়ে ও সবকিছু ভুলে যেতে পারে, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, এমনকী নিজের মঙ্গল অমঙ্গল।

প্রবীরমামা, আমরা তা হলে এখন কী করব?

এ জগৎ থেকে পালিয়ে চলো। এ আমাদের জায়গা নয়। নাম-পাগলদের আখড়া। চলো তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই। মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার খুব খিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে।

আমার পকেটে পয়সা থাকলে তোমাকে দোকানে খাওয়াতুম। না না খাওয়াতুম না। দোকানে খাওয়া খুব খারাপ। বাইরে খাওয়া উচিত নয়। শরীর খারাপ হয়। আমাদের বাড়িতে চলো।

উনি যদি ফিরে এসে আমাদের খোঁজ করেন!

তুমিও যেমন! তোমার মামাকে তোমার চেয়ে আমি ভাল চিনি। চলে এসো, চলে এসো।

ডান দিকে একটা খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে কোমরে গামছা বাঁধা একদল লোক আগুন আগুন বলে চিৎকার করছে। নকল দাড়িগোঁফ লাগানো এক ভদ্রলোক নাচতে নাচতে বলছেন, সব জ্বলে যাক, পুড়ে যাক, শ্মশান হয়ে যাক। আহা তোমার কী রূপ, আহা তোমার কী রূপ, লকলক করছে, লকলক করছে।

এ আবার কী ব্যাপার!

প্রবীরবাবু বললেন, শুটিং হচ্ছে শুটিং।

আগুন লাগলে এইভাবে কেউ নাচে।

বাস্তবে না নাচলেও সিনেমায় নাচতে হয়।

একটা ঠ্যালাগাড়ির ওপর ক্যামেরা। খড়খড় করে ফিল্ম ঘোরার আওয়াজ হচ্ছে। দু'জন মানুষ গাড়িটাকে ধীরে ধীরে ঠেলে নিয়ে চলেছেন। আগুনের হলকায় উত্যক্ত হয়ে একগাদা পাখি গাছের ডালে ডালে উড়ছে আর ডাকছে।

আমরা রাস্তায় এসে পড়লুম। চারপাশে বড় বড় গাছ। রাস্তাটা বেশ ছায়াছায়া, নির্জন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ট্রাম ডিপোর কাছে চলে এলুম। প্রবীরবাবু বীরের মতো হাঁটছেন। গুনগুন গাইছেন, মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হল বলিদান।

আবার আমরা সকালবেলার সেই দুধ পড়ে যাবার জায়গায় চলে এলুম। ইতিমধ্যে সময় সরে গেছে। দীর্ঘ ছায়া নেমেছে। চারপাশের জেল্লা অনেক কমে গেছে। বড় রাস্তা ছেড়ে আমরা একটা ছোট রাস্তায় পড়েছি। হঠাৎ মনে হল, আমি কী কারণে বোকার মতো প্রবীরবাবুর বাড়ি চলেছি! চেনা নেই, জানা নেই। ভদ্রলোক শিল্পী, দু'-একটা ছবি দেখা যাবে। একসময় আমার খুব শিল্পী হবার ইচ্ছে ছিল। আর্ট কলেজে ভরতি হবার জন্যে পাগল হয়েছিলুম। পিতা বলেছিলেন, তোমাকে বড়লোকি নেশায় পেয়েছে। গরিবের ঘোড়া রোগ। না খেয়ে মরার ফিকির।

প্রবীরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পেছন ফিরে তাকালেন, কী হে, পেছিয়ে পড়লে কেন?

পা চালিয়ে পাশাপাশি আসতেই আমার কাঁধে হাত রাখলেন পরম বন্ধুর মতো। রাস্তা ক্রমশই দু'পাশে চেপে আসছে। ক্রমশই যেন কলকাতার জঠরে প্রবেশ করছি। আলো-বাতাস কমে আসছে। এই শহরে মানুষ কীভাবেই না বাস করে। প্রবীরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী, খুব কষ্ট হচ্ছে?

আজ্ঞে না, আমার হাঁটা অভ্যাস আছে।

হ্যাঁ, পুরুষমানুষ, সবরকম অভ্যাস রাখবে। জীবন তা হলে দেখবে, তোমার কাছে হেরে গেছে। যত ব্যথা পাই, তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা, ওগো সুন্দর নয়নে তোমার নীল কাজলের মায়া। শরীরটাকে একেবারে পাথরের মতো লোহার মতো করে ফেলবে। কোনও কিছুর প্রত্যাশা রাখবে না। দুঃখ পেলে হেসে উঠবে, সুখ দেখলে সরে আসবে। শূন্য সংখ্যাটার কিছু নেই, একেবারেই শূন্য, অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। শূন্য না হলে দশক হবে না, শতক হবে না, সহস্র হবে , অযুত, নিযুত কিছুই হবে না। আমি সেই শূন্য রে ভাই। মহাশূন্যে ভাসছে জগৎ, ঘুরছে তারা, ঘুরছে চন্দ্র, শূন্য আছে সৃষ্টি আছে, গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নে।

এই গলির মধ্যেও ছোট্ট একটা মুদিখানা মতো রয়েছে। প্রবীরবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, দাঁড়াও দু'পাতা চা কিনে নিই। বাড়িতে আছে কি না কে জানে? চা না খেলে আড্ডা ঠিক জমবে না।

প্রবীরবাবু যে-চা কিনলেন, আমি জানি সে চা খাওয়া ভীষণ শক্ত। কেমন একটা বুনো বুনো গন্ধ বেরোয়। আবার আমার কাঁধে হাত রেখে হাঁটা শুরু হল। রাস্তা বর্শার ফলার মতো ক্রমশই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। অবশেষে আমরা একটা ভাঙাভাঙা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালুম। আমালাগা ইটের দোতলা হুমড়ি খেয়ে রাস্তায় নেমে আসতে চাইছে। বাড়িটা এমনই বসে গেছে। ওপর দিকে তাকালেই দোতলার জানলা। খয়া খয়া কাঠের পিঞ্জর। সারা বাড়িটার যেন যক্ষ্মা হয়েছে। সারা দিন রাত নীরবে কেশে চলেছে।

দরজায় বিরাট বড় একটা কড়া। নিজের ভারে হেলে পড়েছে। কোনদিন উপড়ে চলে আসবে। প্রায় অসংলগ্ন সেই কড়া ধরে প্রবীরবাবু ঠকাস ঠকাস করে তিনবার শব্দ করলেন। এ কড়া তেমন মুখরা স্ত্রীর মতো বাজে না, উদাসী বৃদ্ধার মতো 'হরি দিন তো গেল'র সুরে জরাজীর্ণ বিদায়ী ব্যথায় বাজে থেমে থেমে।

প্রবীরবাবু ডাকলেন, ঊষা, উষা।

সেই ডাক চারপাশের নোনা-লাগা বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে ধ্বনিতে, প্রতিধ্বনিতে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। বহু ওপরে এক টুকরো আকাশে আলোর পাখনা উড়ছে। হড়াস, একটা শব্দ হল। দরজার হুড়কো সরল। ইনিই কি ঊষা! প্রথমে নজরেই প্রেমে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। কদর্য প্রেম নয়, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক প্রেম। ঊষা না হয়ে, আমার মায়ের তুলসী নামটা যদি এঁকে দেওয়া যেত! অবশ্যই আমার পিতৃদেবের অনুমতি নিয়ে।

প্রবীরবাবু একগাল হেসে বললেন, দেখ ঊষা, কাকে এনেছি!

প্রবীরবাবু এখনও আমার কাধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যেন দুই মানিকজোড় মাঝরাতে মাল খেয়ে বাড়ি ফিরছি। কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার আমাদের পরিদর্শন করছেন। প্রবীরবাবুকে আমার আর মামা বলতে ইচ্ছে করছে না, দাদা বলতে ইচ্ছে করছে।

ঊষাদেবীর ঘাড়ের কাছে এলো খোঁপা। আয়তন দেখলেই বোঝা যায়, খুলে দিলেই পাহাড়ি নদীর মতো কোমর ছাপিয়ে লাফিয়ে পড়বে। সাদা শাড়ি, চওড়া নীল পাড়। হালকা নীল ব্লাউজ। দেহ আর মুখের গড়ন দেখার মতো। এ যেন নালন্দা আবিষ্কার। কোনারকের মন্দির থেকে অপরাহ্ন বেলায় নেমে এসেছেন অপরূপা। কলকাতা টুঁড়লে এমনি সব বিস্ময় কত যে পাওয়া যেতে পারে, কেউ জানে না।

প্রবীরবাবু কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে বললেন, আমার একমাত্র বোন ঊষা। পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। আমি আর ঊষা। ঊষী, এ হল আমার বাল্যবন্ধু জয়নারায়ণের ভাগনে। ছেলেটা বড় ভাল, ঠিক তোর মতো।

আগে তোমরা ভেতরে এসো তো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী করছ?

প্রবীরবাবু ঢুকতে ঢুকতে বললেন, ঊষী, আমাদের খুব খিদে পেয়েছে, জল-তেষ্টা, চা-তেষ্টা সব একসঙ্গে পেয়েছে। এই নে চা।

এঃ দাদা, তুমি এই চা নিয়ে এলে। এ চা খেতে পারবে না তোমার—কী নাম? নামটা তো জানা হল না।

প্রবীরবাবু বললেন, তোমার নাম?

পিন্টু।

বাঃ, ফাসক্লাস নাম। খুব পারবে, খুব পারবে, ও তো আর বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতে আসেনি। আমরা যখন খেতে পারি, ও-ও পারবে।

বাড়ির নীচের তলাটা একেবারেই জখম হয়ে গেছে। আহত অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত সৈনিকের মতো তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে। ভাঙা উঠোন থেকে একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। বারান্দায় ঝলঝল করছে কাঠের রেলিং। কিঁচ কিঁচ করে কোথায় একগাদা পাখি ডাকছে।

দোতলায় উঠতেই প্রাণটা ভরে গেল। দেবালয়ের মতো পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ নাকে এল। ধূপ হতে পারে। বারান্দার শেষকোণে মাঝারি আকারের একটা তারের খাঁচা। খাঁচায় গোটা দশেক ছোট ছোট রঙিন পাখি, উড়ছে, দোল খাচ্ছে। এদেরই বোধহয় ক্যানারি বলে। একটা ফুটফুটে সাদা খরগোশ, থেবড়ে বসে আছে আপন মনে। মাঝে মাঝে মুখ তুলে পাখি দেখছে।

ঊষা বললেন, তুমি জুতোটা এইখানে খুলে রাখো। দাদা, তোমরা ঘরে গিয়ে বোসো।

ঘরে খাটফাট কিছুই নেই। অনাবশ্যক কোনও ফার্নিচার নেই। একপাশে সুন্দর একটা মাদুর সমান করে পাতা। তার ওপর ঝকঝকে একটা জলচৌকি। পাশেই নকশা-করা ফুলদানিতে ছোট-বড় অসংখ্য তুলি। গোটাকতক পরিষ্কার প্যালেট। দেয়ালে সারি সারি ছবি ঝুলছে, জল রং, তেল রং। আর একপাশে, আর একটা ছোট মাদুর। তার ওপর একটা হারমোনিয়ম, পাশেই একটা তানপুরা ঝুলছে। ঘরের আর এক কোণে বেশ বড় আকারের ফুলদানিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ গোঁজা। ফুলের গন্ধ সারাঘরে প্রজাপতির মতো ভাসছে।

প্রবীরবাবু প্রথমেই পাঞ্জাবিটা খুলে ফেললেন। একটা দেখার মতো স্বাস্থ্য। দু'-চারবার হাতের গুলি ভেঁজে নিয়ে আমাকে বললেন, তুমি ব্যায়াম করো?

আজ্ঞে না, আমার বাবা করেন।

হা হা করে ঘর-ফাটানো হাসি হেসে বললেন, এ যে দেখি সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। ওসব চালাকি চলবে না, রোজ ব্যায়াম করবে।

আমার বাবার ব্যায়ামে খুব বিশ্বাস। উনি বলেন, যখনই দেখবে শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, মন ঝিমিয়ে পড়ছে, তখনই মারবে পঁচিশটা ডন, পঞ্চাশটা বৈঠক।

ঠিক বলেন, ঠিক বলেন। আমি ওঁকেই আমার গুরু করব। জীবনে গুরু চাই পিন্টু, গুরু চাই। সাধন করনা চাহি রে মনুয়া, ভজন করনা চাই। উষী-ই, কোথায় গেলি রে!

প্রবীরবাবু নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখনও গান চলছে, সাধন করনা চাহি রে মনুয়া। জলরঙে আঁকা একটা নিসর্গ দৃশ্য তখন থেকেই বড় টানছে। অমন একটা জায়গায় এখুনি যদি দৌড়ে চলে যাওয়া যেত।

প্রবীরবাবু ওপাশ থেকে ডাকলেন, পিন্টু, চলে আয়।

ডাকটা বড় ভাল লাগল। হঠাৎ যেন খুব কাছাকাছি করে নিলেন। উঁচু ডালে ফল ঝুলছে। কোনওরকমে সেই ফলের নাগাল পেয়ে গেলে যেমন আনন্দ হয়, সেইরকম একটা আনন্দের অনুভূতি হল।

গোদা রোটি খাও
হরিকে গুণ গাও ॥

পাখির খাঁচার সামনে প্রবীরবাবু থেবড়ে বসে পড়েছেন। আদুড় গা। কোলে একটা খরগোশ, দুটো লেংচে বেড়াচ্ছে পাশে। পাখিরা প্রভুকে দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে খুব নাচানাচি করছে। কিছু দূরেই একটা ঘুপচি মতো জায়গায় রান্নাঘর। সেখানে স্টোভ জ্বেলে ঊষাদেবী লাল লাল করে আলু ভাজছেন। কনুই দিয়ে কপালের ওপর ঝরে পড়া চুল সরাতে সরাতে বললেন, পিন্টু, হাত মুখ ধুয়ে নাও। দাদা, তুই ওকে বাথরুমে নিয়ে যা। তুই হাত পা ধুয়েছিস!

দাঁড়া না ধুচ্ছি। তাড়া কীসের?

এই বললি নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে রে, ঊষী।

আজকে পাখিরা খুব লাট খাচ্ছে রে!

প্রবীরমামা, ওগুলো কী পাখি?

তুমি আমাকে মামা না বলে, দাদা বললে কেমন হয়?

দারুণ হয়।

তাই বলিস। মামা-ভাগনে সম্পর্কটা তেমন ভাল নয়। ঊষা তোর দিদি। দিদিটা কেমন বল?

একেবারে দিদির মতো।

ওঃ টেরিফিক বলেছিস। আমার যদি ওইরকম একটা দিদি থাকত রে!

দিদি নেই বলে তোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে রে দাদা?

একটাই অসুবিধে, দিদি রে বলে ডাকতে পারছি না।

আমি দিদি হলে, তোর মতো দাদা পেতুম কোথায়!

প্রবীরদা, কী পাখি?

এ হল মনপাখি রে ভাই, ছটফটানি দেখে বুঝতে পারছিস না। সব যেন ফিল্মস্টার হবার জন্যে লাফালাফি করছে।

ঊষাদি বললেন, ওগুলো হল বদরি পাখি। দুটো থেকে অতগুলো হয়েছে। আরও হবে, তুমি নেবে?

ইচ্ছে থাকলেও নেওয়া যাবে না। বাবা রাগ করবেন।

কেন?

বনের পাখি বনে থাকবে। খাঁচায় থাকবে কেন? একবার না জিজ্ঞেস করে একটা টিয়া পাখি কিনেছিলুম। আমাকে বললেন, এখুনি উড়িয়ে দাও। আমি একটু বায়নামতো করেছিলুম, না ছাড়ব না। আমাকে একটা ঘরে ছ'ঘণ্টা বন্ধ করে রেখেছিলেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান আর জিজ্ঞেস করেন, কী, কেমন লাগছে? প্রথম ঘণ্টা দুয়েক জেদের বসে বলেছিলুম, বাঃ, বেশ লাগছে! তোফা লাগছে। তা হলে সারাজীবন থেকে যাও। এই নাও খানদুয়েক বিস্কুট। কিছু পরে জানলা দিয়ে ছুড়ে দিলেন কাগজে মোড়া দুটো লজেন্স। হঠাৎ ছোটবাইরে পেয়ে গেল। চিৎকার করে জানান দিলুম। বললেন, ঘরের কোণে নর্দমা আছে করে ফেলো, কিংবা যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখানেই করো। বন্দি-পাখির আবার বাথরুম কীসের! খাঁচার দেড়হাত জায়গাতেই তার ওঠা-বসা, আহার-নিদ্রা, প্রকৃতির কর্ম। তোমাকে তো তোমার মাপ অনুযায়ী বেশি জায়গাই দেওয়া হয়েছে। বড়বাইরে, ছোটবাইরে সব ওইখানেই সারো। সকালে একবার পরিষ্কার করা হবে।

শেষে কী হল? তোমার মা এসে মুক্তি দিলেন!

মা কোথায়? মা তো তার অনেক আগেই স্বর্গে চলে গেছেন।

তা হলে?

তা হলে আর কী, বেলা তিনটের সময় কুঁইকুঁই করে জানালুম, আমি আর পারছি না। বেলা তিনটে পনেরো মিনিটের সময় মুক্ত পাখি উড়ে চলে গেল উদার আকাশে।

শাবাশ, তোর বাবা তো একটা সাংঘাতিক ক্যারেক্টার। নমস্য মানুষ! কবে যাই বল তো, একবার প্রণাম করে আসি। ঊষী, যাবি তুই?

আমি গেলে রাগ করবেন। এসব মানুষ মেয়েদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

হ্যাঃ, তুই একেবারে সবজান্তা বাবা। চ না একদিন যাই।

আচ্ছা, সে দেখা যাবে। তুই বোধহয় ভুলে গেছিস দাদা, আজ সাড়ে ছ'টার সময় আশ্রমে গান আছে।

হ্যাঁ রে, তাই তো! সেধেছিস! নে নে তাড়াতাড়ি হাত চালা।

প্রবীরদা উঠতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন, এতক্ষণ পেছন দিকে গা ঘেঁষে যে-খরগোশটি বসে ছিল, সেটি বিনা কাজে বসে ছিল না। চিবিয়ে চিবিয়ে কাপড়ের কাছাটি শেষ করে দিয়েছে।

এই দেখ ঊষী, তোর বিক্রম কী করেছে! কী বলতে ইচ্ছে করে বল! বাড়ির একটা জিনিসও আর আস্ত থাকবে না।

তোকে সকাল থেকে বলছি, ওদের ঘাস ফুরিয়েছে।

তা বলে, ও ব্যাটা আমার কাছাটা ঘাস ভেবে চিবোবে!

ওর সে বিচার থাকলে খরগোশ হবে কেন বল! রেখে দে, আমি কেটে বাদ দিয়ে সেলাই করে দেব।

হ্যাঁ, ওই তো তুই শিখেছিস। কেটে বাদ দোব। আমার সমস্ত ধুতি এইভাবে দশ থেকে আট, আট থেকে সাত, শেষে কৌপিন হয়ে যাবে।

ভালই তো, তুই না বলিস সন্ন্যাসী হয়ে যাবি! লুচিগুলো বেশ গোল করে বেলে দে তো।

ঊষাদি, আমি দোব?

প্রবীরদা বললেন, তুই পারবি না পিন্টু। বড় শক্ত কাজ। জ্যামিতির জ্ঞান থাকা চাই।

চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জ।

তা হলে হয়ে যাক।

বেশ মজা। যেন চড়ুইভাতি হচ্ছে, নদীর ধারের পোড়ো বাড়িতে! লুচি বেশ গোলাকারই হতে লাগল।

প্রবীরদা বললেন, শিখলি কোথা থেকে?

এই তো আমার কাজ।

কেন, তোর বাড়িতে কেউ নেই?

আমি আর আমার পিতা, আর সাবেক কালের বিশাল এক বাড়ি!

বলিস কী? তুই তো মহাভাগ্যবান রে! যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। আর সংসার ফংসারে ঢুকে ন্যাজেগোবরে হয়ো না। সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়ো। শালা, সংসারের নিকুচি করেছে।

সন্ন্যাসী হবার আগে তোরা দু'জনে হালুহকর হয়ে যা। দু'পয়সা রোজগার হবে, হরিদ্বার যাবার গাড়িভাড়াটা উঠে যাবে।

সন্ন্যাসীর আবার গাড়িভাড়া কী রে! সবই তো ফ্রি।

লুচি, লাল লাল আলুভাজা, চা। পেটটা ঠান্ডা হল। প্রবীরদা বললেন, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। খুব ভাল লাগবে। দেখবে ঊষী কেমন গান গায়!

ফিরতে দেরি হলে বাবা বকবেন।

আঃ এক ছেলে হওয়ার এই বিপদ। আমি তোমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব। যদি বকেন, আমাকে বকবেন।

যেতে তো খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু ভয় লাগছে।

আরে দুর, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তিন থাকতে নয়। আজ একজন সাধিকা দেখবে। তোমার মাথায় একবার শুধু হাত রাখবেন, সারাশরীর জুড়িয়ে যাবে। কী সংসারে পড়ে আছ? গোদা রোটি খাও, হরি কা গুণ গাও। দুটো কাঠ খত্তাল হাতে তুলে নিয়ে প্রবীরদা বাজাতে লাগলেন, আর সারা ঘরময় নেচে নেচে গাইতে লাগলেন, গোদা রোটি খাও, হরিকে গুণ গাও। আমাকে বললেন ধর, ধর। নেচে নেচে গা। দেখবি তোর ভেতর থেকে কী যেন একটা বেরিয়ে আসছে।

আমি যে নাচতে পারি না প্রবীরদা। লজ্জা করে।

আরে ধ্যার ব্যাটা, ছাগলেও নাচতে পারে। তুই মানুষ হয়ে নাচতে পারবি না?

ঊষাদি এসে পড়ায় বেঁচে গেলুম। ঘরের বাইরে আমরা দু'জনেই নির্বাসিত। ঊষাদি একটু সাজগোজ করবেন।

দাদা, ধেই ধেই করে না নেচে, জামাকাপড় পরে নে। দুটো রিকশা ডাক।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলেন। প্রবীরদার দু'জোড়া খরগোশ। সবক'টাকে কান ধরে ধরে বাক্সে পুরে দিলেন। চারজন চারটে ফুটো দিয়ে মুখ বের করে সংসারের বিচিত্র হালচাল দেখছে। প্রবীরদা গায়ে সেই সকালের জামাটা চাপিয়ে, চুলে দু'বার আঙুল চালিয়ে বললেন, পিন্টু, তুই বোস, আমি মোড়ের মাথা থেকে দুটো রিকশা ধরে আনি।

রান্নাঘরের সামনে ছোট্ট একফালি ছাদ। ছাদে একটি নিখুঁত তুলসীমঞ্চ। নিকোনো তকতকে। এঁরা মনে হয় বৈষ্ণব। আমরা শাক্ত। চারপাশেই খাড়া খাড়া প্রাচীন বাড়ি। ভাঙাভাঙা বারান্দা। হেলে-পড়া জানলা। একেবারে লাগোয়া একটি বাড়ি বেশ নতুন। হালে রং পড়েছে। ভেতরে কোথাও রেডিয়ো বাজছে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য গাইছেন, বাঁকা ভুরু মাঝে আঁকা টিপখানি। জানলায় জানলায় পরদা ঝুলছে।

হঠাৎ পায়ের কাছে ছোট্ট একটা ইটের টুকরো পড়ল। চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। আবার একটা ইটের টুকরো এসে কপালে লাগল। বেশ চমকে দেবার মতো লাগা। এবার ওপর দিকে তাকালুম। তিনতলার ছাদের আলসেতে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়েস মনে হল ষোলো-সতেরো হবে। একমাথা চুল হাওয়ায় উড়ছে। তাকাতেই মেয়েটি হেসে বললে, প্রিয়তম।

সামান্য একটা শব্দ মানুষকে কীরকম গতিবেগ দিতে পারে। দৌড়ে একেবারে ভেতরে চলে এলুম। আর ঠিক তখনই ঊষাদি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

কী হয়েছে পিন্টু! তোমার কপালটা কাটল কী করে!

তিনতলার ছাদে মেয়েটি হা হা করে হাসছে প্রেতিনীর মতো।

সেই হাসি শুনে ঊষাদি বললেন, তুমি বুঝি ওই ছোট ছাদটায় গিয়েছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

মেয়েটি পাগলি। কখনও ভাল থাকে, কখনও উন্মাদ হয়ে যায়। এখন উন্মাদ অবস্থা। এসো দেখি। ইট মেরেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমাকে আমার বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল। দোষটা আমারই। এসো ওষুধ লাগিয়ে দিই। অত বড়লোক, মেয়েটাকে কেন যে উন্মাদ আশ্রমে পাঠাচ্ছে না!

সামান্য একটু কেটে গেছে, ও আর ওষুধ লাগাতে হবে না।

দেখো পিন্টু, আমার অবাধ্য হবে না। অবাধ্য ছেলেদের আমি পছন্দ করি না।

ঊষাদির দৃপ্ত শাসনের ভঙ্গিতে বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। ছিপছিপে বেতের মতো লম্বা চেহারা। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ধারালো মুখ, চোখ, নাক। জোড়া ভুরু। সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। হাতদুটো কী লম্বা, যেন শালুক ফুলের ডাঁটা। হাত তুলে খপ করে যখন আমার একটা হাত ধরলেন, মনে হল সাপে ছোবল মারতে আসছে।

এদিকে আয়, আমার হাত ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা কারুর নেই। বৃথা চেষ্টা করিসনি।

সত্যিই তাই। মেয়েদের আঙুলে এত জোর হয় আমার জানা ছিল না। যেন লোহার বেড়িতে হাত বাঁধা পড়েছে। আমি অবাক হয়ে ঊষাদির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। ধনুকের মতো বাঁকা

ভুরু। কপালে ছোট্ট একটা সাদা টিপ। শুদ্ধ আত্মার জ্যোতির মতো দুই ভুরুর মাঝখানে ভাসছে। চূর্ণ চুল কপালের প্রান্তরেখায় সামান্য অবাধ্য। পৃথিবী এত সুন্দর? ঈশ্বর তোমার আয়োজন এত পূর্ণ? আবেগে আমার চোখে জল এসে গেল। একই নারীর কত বিচিত্র, বিভিন্ন রূপ। ওদিকে একজন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢিল ছুড়ে কপাল ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। এদিকে একজন পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে শাসন করছে।

বকেছি বলে তুই কাঁদছিস! পাগল ছেলে। ঠিক ধরেছি, তুই এখনও শিশু। চিরকালই তুই শিশু থেকে যাবি। তোকে না চালালে চলতে পারবি না।

ঊষাদি আমার মুখটা বুকে চেপে ধরলেন। আবেগ এমন একটা জিনিস, যখন হঠাৎ আসে তখন মত্ত হাতির মতো ভেতরটা একেবারে তছনছ করে দিয়ে যায়। রোখা যায় না। আমার ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগলুম, তোর হলটা কী! কেন এমন করছিস! মানুষ কেন যে কী করে মানুষ যদি জানত। বুকের ওপর ঊষাদি মুখটা চেপে ধরে আছেন। আমার মনে হচ্ছে:

সে বহুদিন আগের এক অভিজ্ঞতা। সাত দিন নাগাড়ে বৃষ্টি হবার পর খুব রোদ উঠেছে। খাল বিল সব ভেসে মাঠ ময়দান একাকার। আমাদের বাড়ির পাশের ঘাসে-ঢাকা একটা মাঠ ভেসে গেছে। চারপাশে পায়ের পাতা ডোবা জল। মাগুর আর শিঙি ভেসে ভেসে চলেছে। সেই জলে পা ডুবিয়ে খপাত খপাত করে চলেছি। জলের ওপরটা গরম, নরম ঘাসে পা পড়লেই ঠান্ডা জল কী এক নাতিশীতোষ্ণ স্নেহে পা জড়িয়ে ধরছে।

এখন এই অবস্থায় আমার মনে হচ্ছে আমি সেই নরম সিক্ত ঘাসে মুখ থুবড়ে পড়ে আছি। ঊষাদির ভরাট বুক থেকে একটা শীতল স্পর্শ উঠে আসছে, একটা পূর্ণতার অনুভূতি। সমস্ত শরীর শিথিল হয়ে আসছে। এই মহিলার নিশ্চয়ই কোনও ঐশী শক্তি আছে।

ঊষাদি আমার মুখটা উঁচু করে তুলে ধরে ঠোঁটে একটা চুমু খেয়ে বললেন, তোর মুখটা কী মিষ্টি রে! এই বয়সের ছেলেদের মুখ কেমন যেন চোয়াড়ে হয়।

কপালের কাটা জায়গাটা মুছিয়ে দিয়ে এক ফোঁটা আইডিন লাগিয়ে দিলেন। হাতে একটা চিরুনি দিয়ে বললেন, নে, চুলটা আঁচড়ে নে।

হঠাৎ আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল একটা প্রশ্ন, আপনি কে?

আমি? আমি ঊষা। পৃথিবীর প্রথম আলো।

হেঁট হয়ে ঝপ করে একটা প্রণাম করে নিলুম।

করিস কী, করিস কী?

আর করিস কী! আমার মন বলছে, তুই এঁকে ধরে থাক। কী পেতে কী পেয়ে যাস, তার ঠিক নেই। পরশপাথর ছুঁইয়ে নে সোনা হয়ে যাবি।

প্রবীরদা নীচে থেকে হাঁক মারলেন, ওরে নেমে আয়।

রিকশা চলেছে ঠুনঠুন করে। একটায় আমি আর ঊষাদি। আর একটায় প্রবীরদা আর হারমোনিয়ম। আজ কী বাতাস ছেড়েছে! সন্ধের কলকাতা যেন পাগল হয়ে গেছে। চারপাশ ভিজেভিজে। কোথা থেকে নীলচে আলো নেমে এসেছে। দোকানের হলদে বাতি সব সবুজ বর্ণ। লোকজন, পথঘাট সব যেন স্বপ্নের ভেতর দিয়ে চলেছে।

ঊষাদির মুখ অসম্ভব গম্ভীর। একটাও কথা বলছেন না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, গান জানিস?

আমরা কোথায় যে চলেছি, কিছুই জানি না। শুধু চলেছি। ছায়াছায়া পৃথিবীর পথ দিয়ে তরতর করে বয়ে চলেছি। সামনে একটা বলিষ্ঠ পিঠ, ডাইনে-বাঁয়ে ছন্দে দুলছে। দুটো পা একই লয়ে নেচে চলেছে। মাঝে মাঝে ঠুং ঠুং শব্দে বাতাস যেন ঝিমিয়ে পড়ছে।

গোটা তিনেক বাঁক নিয়ে রিকশা একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তায় ঢুকে পড়ল। দু'পাশের বাড়িতে বেশ একটা শ্রী আছে। নিয়মমতো রং পড়ে। তেমন ভাঙাচোরা নয়। একটা গেরুয়া রঙের বাড়ির সামনে আমরা নেমে পড়লুম। বিশাল গেট। গেটের মাথায় কেয়ারি করা বাগান বিলাস উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে। ভেতরে সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগান। বাড়িটা ভেতর দিকে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। কোনও আড়ম্বর নেই। পরিচ্ছন্নতায় মন ভরে যায়।

ভেতরের হলঘরে বেশ বড় রকমের আয়োজন। একেবারে শেষ মাথায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি বেদি। তার ওপর বিশাল একটা চিত্রপট। কোনও সাধিকার। আসন করে বসে আছেন। একটি পায়ের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা আর একটি পা। একেই বলে সিদ্ধাসন। বজ্রের মতো চেহারা। মাথায় নটরাজের মতো চুল একপাশে চুড়ো করে বাঁধা। গেরুয়া রঙের শাড়ি। বসে আছেন বাঘছালে। চারপাশে মোমবাতির মতো উঁচু উঁচু চারটে বিজলি বাতি জ্বলছে। বড় বড় পদ্মফুল পায়ের কাছে ছড়ানো। ধূপের ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ঘরে আলোর ব্যবস্থা এমনভাবে করা, যেন সবে ভোর হল। বড় বড় কার্পেট টানটান করে পাতা। এরই মধ্যে বেশ ভাল জমায়েত হয়েছে। বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার সংখ্যাই বেশি। তরুণ, তরুণী এমনকী বালক বালিকাও রয়েছে। কেউ এতটুকু শব্দ করছেন না, একেবারে ধ্যানস্থ। কে যেন বলছেন চুপ, সব নীরব হয়ে গেছেন। সমুদ্রে ঢেউ উঠেছিল, জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে সেই মুহূর্তে স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

কে সেই জাদুকর!

সেই চিত্রপটের একপাশে বসে আছেন এক সন্ন্যাসিনী। এঁকেই বলা যায় যৌবনে যোগিনী। সিল্কের গেরুয়া। রুক্ষ, এলোচুল। কপালে এত বড় একটা লাল টিপ, ঘষা লেগে ছড়িয়ে পড়েছে। নিমীলিত চোখ। কোথায় কোন জগতে আছেন? দেহ যেখানে রয়েছে, মন সেখানে নেই। দেখলেই বোঝা যায়।

ঊষাদি ফিসফিস করে বললেন, পা টিপে টিপে এক পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে চলো। পায়ের গাঁট ভাঙার শব্দ যেন না হয়।

প্রবীরদার হাতে ধরা হারমোনিয়মের আংটায় খটাস করে বিশ্রী শব্দ হল। নিস্তব্ধতায় যেন ঢিল পড়ল।

ঊষাদি হাঁটু মুড়ে প্রণাম করলেন।

তিনি নিমীলিত দৃষ্টি মেলে দেখলেন। খুব রোদের দিনে জানলার পাখি একটু ফাঁক করলে যেমন একঝলক রোদ আসে, চোখের ফাঁক দিয়ে সেইরকম একঝলক তেজ বেরিয়ে এল। সাধন-ভজন করলে মানুষের কী যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন হয়!

প্রবীরদার প্রণাম শেষ হতেই আমি নিচু হলুম। আমার মনে হল অনন্তের সামনে মাথা নিচু করছি। নাকে দেবালয়ের গন্ধ। গায়ে কেমন যেন কাঁটা দিচ্ছে। শক্তিশালী চুম্বকের সামনে লোহার টুকরো পড়লে যেমন কাঁপতে থাকে, আমার শরীর সেইরকম কাঁপতে থাকল। মনে হল, আমি যেন বরফের মতো গলতে শুরু

করেছি। তিনি একটি আঙুল তুললেন। আমার সমস্ত শরীর সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। কেন জানি না, তাঁর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎচমকের মতো একঝিলিক হাসিও খেলে গেল।

পিঠে আঙুলের স্পর্শ পড়ল। উষাদি ইশারায় বলছেন, উঠে এসো।

যে-কার্পেটটিতে এতক্ষণ কেউ বসেননি, আমরা সেই আসনে সাবধানে বসে পড়লুম। ডান পাশে চিত্রপট। কোনাকুনি বসে আছেন ধ্যানস্থ সাধিকা। সামনে ভক্তমণ্ডলী। করুণাধারার মতো আলো নেমে আসছে। বাইরে উতলা বাতাসে, জানলায় জানলায় ফুলন্ত যুঁই কেঁপে কেঁপে গন্ধ ছড়াচ্ছে। ধূপের ধোঁয়া মৃতের আত্মার মতো ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে।

সাধিকা একটি হাত তুলে ইশারায় জানালেন, শুরু করো। এ বেশ ভাল ব্যবস্থা! অনর্থক কোনও বাগাড়ম্বর নেই। ঈশ্বর এই, ঈশ্বর ওই। ধর্ম, ধর্ম। নীরব ধ্যানে তোমরা যে পারো তাঁকে খুঁজে নাও।

হারমোনিয়মে সুর খেলতে লাগল। তবলা নেই। তাই তেএঁটে তালের টক্করে সুর হোঁচট খাচ্ছে না। ঊষাদি ধরলেন,

ন তাতো, ন মাতা ন বন্ধুর্ণ নপ্তা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব,
গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী॥

শ্রোতারা শেষ লাইনটি কণ্ঠে তুলে নিলেন, গতিস্তং গতিস্তং ত্বমেকা ভবানী।

আশ্চর্য এই স্তোত্রটি আমি পুরো জানি, হে ভবানী! আমার পিতা নেই, মাতা নেই, বন্ধু, পৌত্র, পুত্র, কন্যা, ভৃত্য, ভর্তা, জায়া কেউ নেই, আমার বিদ্যা নেই, জীবিকা নেই, তুমি গতি, তুমিই আমার একমাত্র গতি।

ঊষাদির গলা এত সুন্দর! এত সুন্দর! এত স্পষ্ট উচ্চারণ। আমি নেহাতই একটা মেড়া। কিছুই নেই আমার। বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, স্বাস্থ্য নেই, পুরুষকার নেই। কে কোথায় কতদূর এগিয়ে বসে আছে, কিছুই জানি না।

ঊষাদি এবার গাইলেন:

ওহে রাজ রাজেশ্বর দেখা দাও,
করুণা-ভিখারি আমি করুণা কটাক্ষে চাও॥
চরণে উৎসর্গ দান করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥

বেহাগে এমন একটা গান ধরেছেন, কারুর আর নড়বার চড়বার উপায় নেই। বাইরেটা যত অন্ধকার হচ্ছে ভেতরটা তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চিত্রপটে দেবী হাসছেন। চোখের ভুল কি না জানি না, সাধিকাকে দেখাচ্ছে, আগুনের পুতুল যেন!

তুমি নাহি দিলে দেখা কে তোমারে দেখিতে পায়

চারপাশ কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। পুঁতির জালির মধ্যে দিয়ে তাকালে যেমন দেখায় সেইরকম দেখাচ্ছে। কিংবা তারের জালির ওপর বৃষ্টি পড়লে যেমন হয়। এপাশে আমি ওপাশে দৃশ্য। সুর ফোঁটাফোঁটা হয়ে জমে গেছে। ঝিলঝিল করে ঝুলছে, দুলছে বাতাসে।

গান থেমে গেছে। আর একটি গানের সুর খেলছে হারমোনিয়ামে।

স্থির সাধিকা ধীরে ধীরে একটা আঙুল তুললেন। নিমীলিত দৃষ্টি। সুর সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। তিনি খুব মৃদু অথচ ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠে বললেন, একেবারে শেষের সারিতে বসে যিনি পাপ চিন্তা করছেন, তিনি অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করুন।

আমি ছাড়া আর কেউ ফিরে তাকালেন না। আমার এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। অহেতুক কৌতূহল মনের মাঝে বসে আছে ফুলঝাড়ু হাতে নিয়ে। থেকে থেকেই খোঁচা মারে, দেখ কী হচ্ছে, আশেপাশে তুচ্ছ তুচ্ছ কী হচ্ছে গোল্লা গোল্লা চোখ বের করে তাকিয়ে দেখ। পড়েছিলুম, বৌদ্ধভিক্ষুরা পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে দৃষ্টি রেখে পথ হাঁটেন। দিনকতক সেই চেষ্টা করতে গিয়ে একদিন কেলেমতো ভুঁসকো একটা ষাঁড়ের পিঠে উঠে পড়েছিলুম। ষাঁড়টা পথের পাশে শুয়ে ছিল। বুদ্ধদেবের কৃপায় রক্ষে পেয়ে গিয়েছিলুম। সাধনার যুগ কীভাবে হারিয়ে যাচ্ছে!

শেষ সারি থেকে ধুতি পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক মাথা নিচু করে উঠে গেলেন। আশ্চর্য, এই আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর হল না। সাধিকাই বা কীভাবে তাঁর মনের কথা পড়ে ফেললেন। সাধনজগতের রহস্য সাধক ছাড়া বুঝবে কে!

পদ্মফুলে এতক্ষণ কোনও সুবাস ছিল না। সাধারণত থাকেও না। হঠাৎ প্রচণ্ড সুবাস ছড়াতে লাগল। সাধিকা আপনমনে মৃদু হাসলেন।

ঊষাদি হারমোনিয়ামে সুর তুলতেই, তিনি আবার আঙুল তুললেন। সুর বন্ধ হল। তিনি মৃদু সুরে বললেন, ওই ছেলেটিকে একটা গান গাইতে বলো।

আমি গান গাইব! গলা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে।

তিনি বললেন, কোনও ভয় নেই। হারমোনিয়াম টেনে নাও।

আমি বেশ বুঝতে পারছি, মনের ওপর আমার আর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মন্ত্রে না হোক অন্য কিছুতে বশীভূত। মাতামহের কাছে শেখা সেই গানটি চোখ কান বুজিয়ে ধরে ফেললুম,

বিফল জনম, বিফল জীবন
জীবনের জীবনে না হেরে।

আমি খুঁজি সব ঠাঁই
কোথা তারে পাই,
কে হরে নিল মম মনচোরে॥

একেবারে পুরো টপ্পা, ভৈরবীতে বসানো। কে বলেছে ভৈরবী সকাল ছাড়া গাওয়া যায় না। রাতেও তো দেখছি বেশ জমে। চোখ বুজিয়েই গাইছি। চাইলেই লজ্জা এসে যাবে। হারমোনিয়ামে হাত ফসকাবে আর বেসুরে গলা খেলবে। একবার ন্যাজেগোবরে হলে, সে ন্যাজ আর নাড়ানো যাবে না। মাঝে মাঝে চোখ পিটপিট করে শ্রোতাদের মুখ দেখে নিচ্ছি। না, কারুর মুখে ব্যঙ্গের রেখা পড়েনি। জয় ঠাকুর, উতরে দাও। বিশ্বাসে কী না হয়! মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।

গান শেষ করে ভয়ে ভয়ে চোখ মেলে তাকালুম। সাধিকা স্থির, অচঞ্চল। ধ্যানস্থ। সারাঘর নিস্তব্ধ। হঠাৎ তিনি তাকালেন। এমন চোখ আমি কখনও দেখিনি। এই দৃষ্টিতে হিংস্র বাঘকেও বশীভূত করে ফেলা যায়। এক লক্ষ মানুষকে স্থির করে রাখা যায়। আমি যদি অমন দৃষ্টি পেতুম।

সাধিকা আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কাছে ডাকলেন।

দূরত্ব বেশি না, কার্পেটের ওপর দিয়ে হামা টেনে বেড়ালের মতো সামনে গিয়ে থাবা গেড়ে বসলুম। গোলাপের গন্ধ বেরোচ্ছে। যে-আঙুল তুলে তিনি নির্দেশ দেন, সেই আঙুলটি দুই ভুরুর মাঝে কপালে রেখে বললেন, এইখানে, এইখানে, এইখানে।

আমার মনে হল, একটা বরফের ছুরি আমার কপাল ভেদ করে চলে গেল। একটা শীতল অনুভূতিতে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। স্থান, কাল, পাত্র সব হারিয়ে যাচ্ছে। চোখ বুজে আছি তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এতক্ষণ যা দেখছিলুম তা নয়, অন্য কিছু, অন্য এক জগৎ। জ্যোৎস্নার মতো নীল আলো, গাছের পাতা যেন রুপোর তবক। অগাধ জলাশয় যেন তরল কাচ।

তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, মা বল, মা বল, মা বল।

আমি মা বলছি, আর যতবার বলছি, চোখের সামনে একটি করে সোনার কদম ফুল ফুটে উঠছে।

জোরে নিশ্বাস নে, খুব জোরে। মনে কর, প্রাণবায়ু মেরুদণ্ড দিয়ে পিঠ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে মাথার দিকে। সেখানে একটি সোনার কমল ফুটে আছে। নিশ্বাস জোরে ফেল। মনে কর একঝলক কালো বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা বল, মা বল, মা বল।

সাধিকা নিজেই গাইতে লাগলেন। তেমন সুর, তেমন উচ্চারণ সহসা শোনা যায় না।

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥

প্রবীরদার হাতে কাঠ খত্তাল, ভক্তদের হাতে খঞ্জনি। প্রত্যেক চরণের শেষ লাইনটি সকলে সমস্বরে গেয়ে গেয়ে উঠছেন: চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।

সুরে আর ছন্দে আমাদের শরীর দুলে দুলে উঠছে। কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে বসছেন।

গীতং মধুরং পীতং মধুরং ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরম্

ক্রমে সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন, দক্ষিণে বামে দুলতে দুলতে গাইতে লাগলেন, সলিলং মধুরং কমলং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্॥

এক একটি চরণ ঘুরে ঘুরে আসছে, করণং মধুরং তরণং মধুরং হরণং মধুরং রমণং মধুরম্।

আমি কিন্তু থেবড়েই বসে আছি। ভক্তেরা যখন গাইছেন, সাধিকা তখন কানের কাছে মুখ এনে বলছেন, মা বল, মা বল। আমার ভুরুর মাঝখানে বৃত্তাকারে আলোর ঢেউ খেলছে। ছোট, ক্রমশ বড় হতে হতে অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এক একটি বৃত্তের এক এক রং। রামধনুর মতো পরপর সাজানো।

ঢং ঢং করে আটটা বাজল। চিত্রপটের দু'পাশে মোমবাতির মতো আলো দুটি ছাড়া ঘরের সব আলো একে একে নিবে গেল। সংগীত থেমে গেল। চারপাশে অখণ্ড নীরবতা। অগাধ জলে ডুবে বসে থাকার মতো অনুভূতি।

ঊষাদি ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলেন, চলো, এবার বাড়ি চলো।

সাধিকা বললেন, দাঁড়া। বুকের কাছে জামার বোতাম খোল।

নেশাচ্ছন্নের মতো বোতাম খুললাম। তিনি কড়ে আঙুল দিয়ে একটি ব এঁকে, তিনবার ফুঁ দিলেন।

যা, তোর হবে। ঊষা!

মা!

তুমি আজ এত চঞ্চল কেন?

কই না তো!

আমি যে দেখতে পাচ্ছি। যাও তোমরা প্রসাদ নাও।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, তোর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে ছ'বছর পরে, তার আগে নয়। একটা বীজ ফেলে রাখলুম, অঙ্কুর থেকে গাছ, গাছ থেকে মহীরুহ। তোর জীবনটা আমি নষ্ট করে দিলুম।

নষ্ট করে দিলেন?

হ্যাঁ বাবা। সংসারটংসার তোর দ্বারা হবে না। চেষ্টাও করিস না। বড় চাকরি, গোলদারি ব্যাবসা, ধন, ঐশ্বর্য, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই পড়ে থাকবে তোর এলাকার বাইরে। তবে আনন্দে থাকবি, বড় আনন্দে। ভরপুর আনন্দ। কেন এমন করলুম?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যে-মাটিতে যা হবে তাই তো করতে হবে। এখানে এলি কেন?

তা তো জানি না মা!

আসতে হবে বলে।

তা হলে ছ'বছর পরে কেন দেখা হবে? কেন তার আগে হবে না?

একটু ঘুরেফিরে আয়, জগৎটাকে একটু দেখেশুনে বাজিয়ে নে। ডাব ঝুনো না হলে তার আঁশ ছাড়ানো যায় না। দেয়ালে মাথা না ঠুকলে মাথা শক্ত হয় না, খালি পায়ে না হাঁটলে পায়ের তলা শক্ত হয় না। আঙুলে

কড়া না পড়লে সেতার বাজানো যায় না। আয়, আয়, জয়ী হয়ে ফিরে আয়।

আমি কি যুদ্ধে চলেছি মা?

তুই সাঁতরে একটা নদী পার হবি। জলে হাঙর আর কামট। ওপার থেকে এপারে আয় অক্ষত শরীরে। ছ'বছর সময়।

তখন আপনি থাকবেন?

তিনি জানেন।

তিনি কে?

যিনি নিজে ধরা না দিলে ধরা যায় না, যিনি নিজে দেখা না দিলে দেখা যায় না। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি গুহাবাসী। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি। যে জানে সে জানে, যে দেখে সে দেখে।

রিকশা করে আবার আমরা ফিরে এলুম প্রবীরদার বাড়িতে। এইবার বেশ ভয়ভয় করছে। রাত ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আজ বরাতে নির্ঘাত তিরস্কার।

প্রবীরদা, আর রাত করিয়ে দেবেন না।

ঊষাদি বললেন, আবার আসবি তো?

খুব ইচ্ছে করবে।

তা হলে আসবি। তোকে আমি গান শেখাব।

প্রবীরদা বললেন, আমরা একটা গানের দল করব।

ঊষাদি বললেন, দাঁড়া, তোকে এক শিশি আমের মোরব্বা দিই। দুপুরে খাবি।

ট্রাম চলেছে ঠ্যাং ঠ্যাং করে, ঘণ্টা বাজিয়ে। আমি জানলার ধারে, প্রবীরদা আমার পাশে। কলকাতার রাতের নেশা বেশ জমে উঠেছে। একটি মেয়ে বসে আছে, খোঁপায় গোড়ের মালা। বেলফুলের সুবাসে ট্রামের মন কেমন করছে।

সামনের সিটে দু'হাঁটুর ঠেকনা দিয়ে, শরীরটাকে পেছনে ঠেলে প্রবীরদা বেশ আরামে বসে ছিলেন। ট্রাম একবার থেমে যেই চলতে শুরু করেছে, হাঁটু খুলে প্রবীরদার পা দুটো ধপাস করে নীচে পড়ে গেল। চটিটা ড্যাংগুলির মতো ছিটকে লাফিয়ে উঠে ডিগবাজি খেয়ে উপুড় হয়ে গেল।

প্রবীরদা সামনে টাল খেয়ে ঝুঁকে পড়লেন। সামনের আসনে কপাল ঠুকে গেল। কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, বাপস, পৃথিবীর কোনও কিছুই কি সহজ নয়?

সামনের আসনের ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কী করছেন মশাই, কুস্তি নাকি?

ফুলেল মহিলা কুঁক কুঁক করে হেসে উঠলেন।

প্রবীরদা ফিসফিস করে বললেন, কান মলে দিতে ইচ্ছে করছে।

কার? ওই মহিলার?

না রে বাবা, আমার নিজের। নিজের দোষেই বেইজ্জত। কপালটা দেখ তো?

একটু লাল হয়েছে।

এ কপাল থেঁতো হবার জন্যেই জন্মেছে। যাক, তোর শরীর কেমন লাগছে? ঘোর কেটেছে?

তা কেটেছে, তবে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হচ্ছে। বড়কে ছোট দেখছি, ছোটকে বড়।

সে আবার কী? চোখ খারাপ হয়ে গেল নাকি?

না না, চোখের ব্যাপার নয়। এ হল ভেতরের ব্যাপার। যেমন ধরুন, একেবারে সামনের আসনে ওই যে ভদ্রলোক বসে আছেন, বিশাল চেহারা, আসলে উনি খুব ক্ষুদ্র। জোরে একটা ধমক দিলে ঘাবড়ে যাবেন।

পরীক্ষা করে আসব?

যাঃ, লোকে আপনাকে পাগল ভাববে। আবার ওই যে মেয়েটি, কুঁক কুঁক করল, ও একেবারে শিশু।

তোর এরকম কেন হচ্ছে বল তো?

তা জানি না। আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে।

সেটা আবার কী?

সকলের ভেতর দেখতে পাচ্ছি।

মানে সকলকে উলঙ্গ দেখছিস?

না গো, মন দেখতে পাচ্ছি। যেমন আমাদের সামনের আসনের ভদ্রলোক একটা অন্যায় কাজে চলেছেন।

কী হবে?

কিছুই হবে না। কাজটা করে আসবেন।

আমার মন দেখতে পাচ্ছিস?

হ্যাঁ, আপনি ওই মেয়েটির কথা ভাবছেন।

ওঃ ঠিক বলেছিস। তোর সামনে দাড়াঁতে ভয় করছে রে।

আর ওই মেয়েটিও আপনার কথা ভাবছে।

মরেছে, চল, তা হলে নেমে পড়ি।

দরকার নেই। হরেকরকম মনের মানুষ চারপাশে ঘুরছে, ঘুরবে।

হ্যাঁরে আমার ভেতর পাপ আছে?

না, হুজুগ আছে।

যাক বাবা খুব বাঁচান বাঁচিয়েছিস। তোর এই শক্তিটা কবে কাটবে?

ওই মা জানেন।

আমাদের পাড়ায় যখন ঢুকলুম, তখন ন'টা বেজে গেছে। চারপাশ কেমন যেন থমথমে। কিছু একটা হয়েছে। দোকানে দোকানে জটলা। দীনুর নামটা কানে আসছে। দীনু আবার কিছু করল নাকি?

পিতৃদেব গম্ভীর মুখে বারান্দায় বসে আছেন। পাশে একটি চেয়ারে প্রফুল্লকাকা। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে প্রবীরদা ফিসফিস করে বলছেন, তুমি আগে।

আমি বলছি, আপনি আগে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে কাকিমা ডালে লঙ্কা ফোড়ন দিলেন, ছ্যাঁ করে। সমস্ত ঝাঁঝ আমাদের নাকে। কোরাসে দুটি সশব্দ হাঁচি। প্রফুল্লকাকা লাফিয়ে উঠলেন, কে, কে? কে ওখানে?

লেতা হুঁ মকতব-এ গম-এ দিল-মেঁ সবক হনূজ্
লেকিন য়েহী কেহ্ 'রফৎ' গয়া অওর 'বুদ' থা॥

আত্মপ্রকাশ বলে একটা কথা আছে। হাঁচিতে আমাদের আত্মপ্রকাশ হল। দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললুম, আমরা।

আমার ভয় পাবার কারণ আছে। প্রবীরদা কেন যে ভয় পাচ্ছেন এত?

প্রবীরদা সোজা টর্পেডোর মতো পিতৃদেবের পায়ের ওপর পড়লেন। প্রফুল্লকাকা পিতার হয়ে বলতে লাগলেন, এসো বাবা, এসো, দীর্ঘজীবী হও, শতায়ু হও। চটাস করে নিজের পায়ে একটা চাঁটা মেরে বললেন, বড় মশা হয়েছে হে। ম্যালেরিয়া না হয়।

পিতৃদেব গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কে?

আজ্ঞে, আমি আপনার শিষ্য।

কবে থেকে এ অবস্থা হল?

প্রবীরদা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, আজ্ঞে কী অবস্থা!

এই মস্তিষ্ক বিকৃতি, এই উন্মাদ অবস্থা।

আজ্ঞে, আমি তো উন্মাদ নই। আমাদের পাশের বাড়িতে এক পাগলি আছে। ওই যে ওর কপালে ইট মেরেছে।

তার মানে?

পিতা গর্জন করে উঠলেন। প্রবীরদার কি কোনও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই? দুম করে এই কথাটা বলা কি উচিত হল!

তুমি তা হলে তোমার মামার সঙ্গে সিনেমাপাড়ায় যাওনি!

আজ্ঞে হ্যাঁ গিয়েছিলুম।

তা হলে?

মামা অদৃশ্য হলেন।

কেন? সে কি পি সি সরকারের মতো ম্যাজিশিয়ান হয়েছে নাকি? দৃশ্য থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল!

আজ্ঞে না, তিনি আমাদের ফেলে রেখে কোন এক বড়লোকের বাড়ি মার্বেল পাথর খুলতে চলে গেলেন।

সে আবার কী? সকালে ছিল মিউজিক ডিরেক্টর, বিকেলে রাজমিস্ত্রি।

প্রফুল্লকাকা ফোড়ন কাটলেন, কত রঙ্গ জানো যাদু, কত রঙ্গ জানো, সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়ো। প্রবীরদা আবার বেফাঁস বলে ফেললেন, আজ্ঞে না, তা নয়, ওই মার্বেল পাথর বেচে বাইজিদের পাওনা মেটাবে।

সেকী? এত অধঃপতন। বলে গেল সিনেমা করছি, চলে গেল বাইজি বাড়ি?

প্রফুল্লকাকা বললেন, বয়েসের দোষ।

প্রবীরদা বললেন, আমাদের বলাটা ঠিক হচ্ছে না, তাই আপনাদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।

তুমি কে বলো তো? তোমার পরিচয়টা আগে জানা দরকার।

আমি জয়ের ছাত্রজীবনের বন্ধু।

প্রফুল্লকাকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তার মানে তবলচি।

আজ্ঞে না, তবলচি নই। চিত্রশিল্পী। গান লিখি। তেমন গাইতে পারি না।

প্রফুল্লকাকা বললেন, রোজ সকালে ভাল করে গলা সাধো। গান কি মুখের কথা। বিখ্যাত গাইয়ে ওমপ্রকাশ শর্মা কী করতেন জানো? রোজ ভোরবেলা কৃষ্ণা নদীর একগলা জলে...

পিতা বললেন, ভূগোলে তুই বড় কাঁচা প্রফুল্ল, উত্তরভারতে কৃষ্ণা আসবে কী করে! গঙ্গা নদী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, গঙ্গানদীতে আর্লি মর্নিংয়ে, একগলা জলে দাঁড়িয়ে রেগুলার গলা সাধতেন, এ তানা যোবানা পরমাননা।

পিতা হাত তুলে বললেন, থামো, বড় বেলাইনে চলে যাচ্ছ। তুমি তা হলে জয়ের বন্ধু।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার ছেলেকে কোথায় পেলে?

ওই যে, বিডন স্ট্রিটের মুখে জয়ের গাড়ি একজনকে চাপা দেবার জোগাড় করেছিল।

বহত আচ্ছা।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন তোমাকে যেখানে-সেখানে যেতে দিই না দেখেছ?

প্রবীরদা বললেন, আজ্ঞে হুলো বেড়াল আর উঠতি বয়সের ছেলেকে ক'দিন ধরে রাখবেন?

থামো, তোমাকে আর মোড়লি করতে হবে না। তোমার ছেলে আছে?

আজ্ঞে না, আমিই তো ছেলে।

ছেলে কী করে মানুষ করতে হয় আমাকে নাই-বা শেখাতে এলে।

আজ্ঞে, অন্যায় হয়ে গেছে।

সেই চাপা-পড়া লোকটি আছে না গেছে?

আছে। চাপা পড়েনি। সাইকেল থেকে ছিটকে পড়েছিল। খুব গোলমাল হতে পারত। আমার পাড়া তো, সব ঠান্ডা করে দিলুম, তারপর আমিও গেলুম ওদের সঙ্গে স্টুডিয়ো পাড়াতে। আপনার ছেলের আজ দিব্যজ্ঞান হয়েছে।

কোথায়? বাইজি পাড়ায়?

প্রফুল্লকাকা বললেন, নাচ দেখলে? কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ? অখাদ্য ভক্ষণ করেছ? যদি করে থাকো, আগে স্নান করে নাও।

পিতা বললেন, প্রফুল্ল, আমার মনে হয়, তোমার এখন নীচে যাওয়াই ভাল।

কেন বলো তো, কেন বলো তো? আমি তো আজ আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে আসিনি। এই দেখো ফতুয়া পরে এসেছি।

এলে কী হবে? তোমার অতীত দুধের মতো উথলে উঠছে। তুমি না কোন বাইজির সঙ্গে তবলা বাজাতে?

বাজাতে মানে? এখনও বাজাই, বিখ্যাত কমলী বাই।

তা হলে তুমি অবশ্যই নীচে যাবে।

এখানে তো বেশ লক্ষ্মীছেলের মতো বসে আছি। কেমন ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে!

নাই-বা কথা বাড়ালে। জানোই তো আমার মেজাজ বিশেষ সুবিধার নয়।

প্রফুল্লকাকা উঠে পড়লেন। ফতুয়ার পকেটে দেশলাই আর বিড়ির কৌটো শব্দ করে উঠল।

প্রবীরদা বললেন, আজ্ঞে বাইজিজ্ঞান নয়, দিব্যজ্ঞান। আমরা আজ দু'জনে জয়ামাতার কাছে গিয়েছিলুম। আমার বোন ঊষাও গিয়েছিল। সে খুব ভাল গান গায় তো!

তিনি কার শিষ্যা?

আমার ঠিক জানা নেই। তবে সাংঘাতিক শক্তি। পিন্টুকে আজ চৈতন্য দিয়েছেন। একদিনেই অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছেন। বড় ভাগ্যবান ছেলে। সামান্য বিভূতিও পেয়েছে। মানুষের ভেতর দেখতে পাচ্ছে।

তাই নাকি? নিজের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে? কী হে, পাচ্ছ?

প্রবীরদার মতো বোকা মানুষ দেখা যায় না। কার কাছে কী কথা বলছেন! নিজের ভেতর যেদিন দেখতে পাব সেদিন কি আর সংসারে থাকব। ছার এ সংসার বলে বেরিয়ে পড়ব। আজ সেই অনন্তের সিংহদুয়ারের চৌকাঠ থেকে ফিরে এসেছি। একঝলক দেখেছি, এপারের ওপারে কী আছে। সতীমা আমাকে ভবিষ্যৎ দেখিয়েছিলেন, ইনি আমাকে অনন্ত দেখিয়ে দুয়ারটি বন্ধ করে দিলেন। চাবি আমার কাছে নেই।

পিতা প্রবীরদাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তুমি কী জন্যে এসেছ?

ঈশ্বরের সন্ধানে।

ঈশ্বর! তিনি কে? কোথায় তাঁকে পাওয়া যায়?

অসহায়ের মতো, পড়া-না-পারা ছাত্রের মতো প্রবীরদা বললেন, আমি তো জানি না।

কেউ কি জানেন?

অনেকে যে বলেন!

বিকারের রোগীও তো অনেক কিছু বলে! তোমার কি ভোগ শেষ হয়েছে?

কী ভোগ?

দুর্ভোগ।

আজ্ঞে সে তো সেই তিন বছর বয়েস থেকে ভুগেই চলেছি।

আসক্তি গেছে?

কীসের আসক্তি?

কামিনী কাঞ্চন।

আমার নেই।

মিথ্যেবাদী, তুমি মিথ্যেবাদী, ড্যাম ল্যায়ার। জগৎ যাতে লাট খাচ্ছে, তুমি তার বাইরে? তা হলে তুমি কেন বাপু ঈশ্বর খুঁজছ! তুমিই তো ঈশ্বর।

আমি জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। আমার ভেতরটা ভীষণ ছটফট করে।

সেটা তোমার কামনা। তোমার ভেতরটা পুড়ছে। অঙ্ক জানো?

সামান্য।

তা হলে আমার কাছে আসা-যাওয়া করো। ঈশ্বর হলেন গণিত, ঈশ্বর বিজ্ঞান। কীর্তন নয়, নাক টেপা নয়, উপবাস নয়, সন্ন্যাস নয়, সাধক নয়, সাধিকা নয়, ঈশ্বর হলেন কর্ম, ঈশ্বর হলেন পারফেকশন।

আমি আপনার বড় ছেলে।

কেন?

আপনি আদর্শ পিতা, তাই।

হা হা করে পিতৃদেব হেসেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমি হাসছি, একী আমি হাসছি! জানো আজ আমার কী হয়েছে, আমার পুত্রোপম ছাত্র মারা গেছে। তুমি জানো আজ কী সর্বনাশ হয়েছে?

কী হয়েছে?

পিতার গলা আবেগে রুদ্ধ, দীনু মারা গেছে।

সেকী?

হ্যাঁ, কে বলেছে ঈশ্বর আছে। ড্যাম লায়ার, চিট, এই কি ঈশ্বরের পৃথিবী, আই স্ট্যাম্প অন ইট, আই কিক দিস আর্থ, দিস ডাস্ট, ইটস লজ অ্যান্ড বাইলজ, এ ক্রুয়েল, আননোন ক্রিয়েটার, ফিয়ারড অ্যান্ড রেসপেক্টেড উইদাউট অ্যানি রিজন।

দীনু মারা গেছে। এই তো সেদিন দীনু বেঁচে ছিল। সুস্থ, সবল, প্রাণপ্রাচুর্যে টগবগে। বিশ্বাস করা যায় সে মারা গেছে! মৃত্যু এত সহজ!

কীভাবে মারা গেল?

নিয়তি। মানুষের নিয়তি। এর মাঝে কবে ও যেন মোটরসাইকেলে দুর্গাপুর গিয়েছিল। ওর সেই বন্ধু সুখেনের কাছে। ফেরার পথে বর্ধমানের কাছে জিটি রোডে দুর্ঘটনা। ছিটকে পথের পাশে মাঠে গিয়ে পড়েছিল। মাথাটা একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। বর্ধমান পুলিশ ফোন করে জানিয়েছে এই কিছুক্ষণ আগে। দীনুর বাবা এখন বিলেতে। বাড়িতে এখন কেউ নেই। কে নিয়ে আসবে মৃতদেহ! আমি একবার যাই।

আপনি এখনও ভাল করে হাঁটতে পারছেন না, আপনি কোথায় যাবেন? আমি যাচ্ছি।

তুমি! তুমি কি কিছু করতে পারবে? তুমি তো নিজেকেই সামলাতে পারো না।

চেষ্টা করে দেখি। হয়তো পারব।

প্রবীরদা বললেন, ছেলেটি কে?

আমার বন্ধু, বাবার সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র।

চলো চলো, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

দীনুদের বাড়িটাকে বাগানবাড়িই বলা চলে। সিংহ দরজার দু'পাশে থাবা গেড়ে বসে আছে দুটো সিংহ। সারাবাড়ি এই সেদিন রং করা হয়েছে। সাদা সিংহ আলো-অন্ধকারে অদ্ভুত নিষ্ঠুরতায় হাসছে। যেন এইমাত্র দীনুকে মেরে এসে বিশ্রামে বসেছে। দু'পাশে বাগান। দু'-একটা স্ট্যাচু আছে। সামনেই গাড়িবারান্দা। মৃদু আলোয় স্বপ্ন মায়া খেলছে।

বিশাল বৈঠকখানা। বার্মা কাঠের ঝকঝকে দরজার দুটো পাল্লা দু'পাশে হাট খোলা। কিছু নেই, বাধা দেবার কোনও ক্ষমতা কারুরই নেই। সবকিছু এ সংসারে বড়ই অবারিত। দরজা যত বড়ই হোক, যে যাবে, সে যাবে।

ঘরের সবক'টা ঝাড় জ্বলছে। বিশাল বিশাল সোফায় এ পাড়ার অনেক গণ্যমান্য মানুষ বসে আছেন। গাড়িবারান্দার একপাশে কালো রঙের একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। পেট্রলের মৃদু গন্ধ। গাড়িটা মনে হয় দীনুর মেসোর। কলকাতা পুলিশের দুটো গাড়ি আমি চিনি। একটা নীল আর একটার রং চকোলেট।

ভেতরে যাঁরা বসে আছেন, তাঁদের দেখলেই মনে হতে পারে এ বাড়ির কোনও উৎসবে নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছেন। একটা ব্যাচ বসেছে। উঠলেই এঁদের ডাক পড়বে। অনেকে আবার সিগারেট ধরিয়েছেন। মৃদু মৃদু টান মারছেন। অনেকের চোখ বেশ ঘুমঘুম। বহুক্ষণ বসে থাকার ক্লান্তি।

প্রবীরদা বললেন, এঁরা যে খুব বড়লোক গো। এখানে আমরা কী করব?

সত্যিই তাই। পিতৃদেব দূর থেকে বুঝতে পারেননি। তিনি এলে বড় অস্বস্তি পেতেন। দীনুর মাকে আমি দু'-একবার সামনাসামনি দেখেছি। বেশ অহংকারী। দুই দাদা বাইরে থাকেন। কাল তাঁরা নিশ্চয়ই এসে পড়বেন। আজও এসে পড়তে পারেন। দিল্লি আর বম্বে প্লেনে বর্ধমানের চেয়েও কাছে।

প্রবীরদা বললেন, চলো, সরে পড়ি।

হ্যাঁ, তাই চলুন। বড়লোককে বড়লোকরাই সাহায্য করতে পারেন। এখানে আমাদের বোকাবোকা লাগছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছি। ঝাউগাছের অন্ধকার থেকে ভারী গলায় কে যেন প্রশ্ন করলেন, কী চাই?

সিগারেটের আগুন বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে বললুম, কিছু চাই না।

মজা দেখতে এসেছ?

আজ্ঞে না, দীনু আমার বন্ধু ছিল।

অ, বন্ধু ছিল, যত র‍্যাজাটে বন্ধুর পাল্লায় পড়ে ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। যাও, সরে পড়ো।

গেটের কাছে এসে প্রবীরদা জিজ্ঞেস করলেন, লোকটি কে বল তো?

মনে হয় এ পরিবারের কোনও হিতৈষী।

বাব্বা, বিপদেও মানুষের অহংকার যায় না।

রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। মন ক্রমশই বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। দীনু আর দীনুর পিতা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। দীনুর মা বিরাট বড়লোকের মেয়ে। তাঁর কাছাকাছি একবার যেতে পারলে হত। কিন্তু কী করে যাই।

প্রবীরদা বললেন, আমি তা হলে যাই। আর একদিন আসব। তোমার বাবা আজ খুবই চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। পারো তো তুমি একবার কাল এসো না! অনেক কথা আছে। কাজের কথা।

চেষ্টা করব, যদি ছাড়া পাই।

ধুলো উড়িয়ে আমাদের সামনে দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। পেছনের আসনে কে বসে?

প্রবীরদা ঠিক দেখেছেন, বললেন, জয় না? মরেছে, আমাদের খুঁজতে এসেছে।

গাড়ির ন্যাজ তখনও দেখা যাচ্ছে। রাস্তার বাঁক ঘুরছে। প্রবীরদা, জয় জয় বলে ছুটতে আরম্ভ করলেন। রাস্তার পাশে একটা নেড়ি নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে ছিল। প্রবীরদার দৌড় দেখে তারও খুব ছুটতে ইচ্ছে করল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পেছন পেছন ছুটল, ঘেউ ঘেউ করে।

গাড়ির পেছনে কেউ ওভাবে ছুটে পারে! সামনের বাঁক ঘুরে গাড়ি তো সোজা চলে যাবে। পরিষ্কার ফাঁকা রাস্তা। মাঝখান থেকে কুকুরের কামড় না খান।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে। মাতুল ওপরে উঠেছেন। প্রবীরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন বিষণ্ণ বদনে। প্রফুল্লকাকা নীচের তলায় দড়ি পাকাচ্ছেন। কাকিমা একটা দিক ধরে আছেন। পাক যত পেকে উঠছে কাকা কেবলই সাবধান করছেন, দেখো ছেড়ে দিয়ো না যেন, ছেড়ে দিয়ো না সুন্দরী।

প্রবীরদা বললেন, ধরতে পারলুম না, ওপরে উঠে গেল।

গেছেন, যান না, তাতে আমাদের কী?

আরে বুঝছ না কেন? ধরতে পারলে তোমার বকুনিটা একটু কম হত।

আমি বকুনি-প্রুফ। আমার জন্যে ভাববেন না। চলুন ওপরে চলুন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পাকের টানে কাকিমা দড়ি ফসকেছেন। কাকা লাফাচ্ছেন, আরে মাগি, সবই কি তোর ফসকা গেরো! মারব মুখে জুতোর বাড়ি। খাচ্ছে দাচ্ছে গতর বাগাচ্ছে, কুচবিহারের মহারানি।

কাকিমা বলছেন, তুমি টানলে কেন, না বলে?

ওরে আমার কুইন ভিক্টোরিয়া রে; বলে টানতে হবে, বলে টানতে হবে। তখন থেকে আমি জপে যাচ্ছি, ওরে ছাড়িসনি, ওরে ছাড়িসনি।

স্বামী-স্ত্রীর সোহাগ দেখে প্রবীরদা হাঁ হয়ে গেছেন। দাম্পত্য জীবনের এক চাকলা দড়ির পাকে পাকে ক্রমশই রসস্থ হচ্ছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, এঁরা কারা?

পরে বলব, এখন ওপরে চলুন।

পিতার সামনে একটা চেয়ারে গম্ভীর মুখে মাতুল বসে আছেন। আমরা দু'জনে চোরের মতো, ন্যাজ গুটোনো দুটো কুকুরের মতো পায়ে পায়ে পাশে সরছি। জানলার পাশে দাঁড়াতে পারলে, রাস্তা দেখা যাবে। জীবনের মিছিল চলেছে যেখানে। বকুনি খেলেও তেমন দুঃসহ লাগবে না। বাইরে কিছু উড়িয়ে দেওয়া যাবে।

মাতুল কিন্তু বকলেন না, শান্তগলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখে এলে? ডেডবডি আনার ব্যবস্থা। হয়েছে?

ঠিক বোঝা গেল না।

কেন?

বহু বড় বড় লোক এসেছেন। দীনুর মেসোমশাই এসেছেন, যিনি লালবাজারে আছেন।

যাক, তা হলে আর কোনও চিন্তা নেই।

পিতা হাসলেন শব্দ করে। মুখে আলোর ছায়া পড়েছে। মাতুলের কথার উত্তরে বললেন, বেশ বলেছ, আর কোনও চিন্তা নেই। মৃত এবার ফিরে আসবে মায়ের কোলে।

মাতুল বললেন, তোমরা খুব অন্যায় করেছ। আমাকে না বলে চলে এলে কেন?

প্রবীরদা বললেন, তুমি ছিলে না, তাই ওকে নিয়ে চলে এলুম আমাদের বাড়িতে, সেখান থেকে আমরা গেলুম জয়ামাতার কাছে। এটা তুমি স্বীকার করবে জয়, তোমার ওই সিনেমা পাড়ার চেয়ে মহাগিরি আশ্রম ঢের ভাল। ওখানে গেলে মানুষের দিব্যজ্ঞান হয়।

হ্যাঁ, তা হয়। তবে তোমাদের না দেখে বড় দুশ্চিন্তায় ছিলুম, আমার একটা দায়িত্ব আছে তো।

তোমার আজকের কাজ সব ঠিকমতো হয়েছে তো!

প্রতাপ আমাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে।

কোন প্রতাপ?

ওই যে আমাদের হাটখোলার প্রতাপ।

আমাদের সেই গড়পারের প্রতাপের কী খবর জয়?

সে এখন চুটিয়ে ব্যাবসা করছে। বাড়িগাড়ি করে ফেলেছে। প্রতাপ আমাকে যা প্যাঁচে ফেলেছে!

পিতা বললেন, সে তো তোমার প্রাণের বন্ধু ছিল হে।

ওই যে, ওই ব্যারিস্টার ভদ্রলোক এখন কলকাঠি নাড়ছেন। বড়মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ফাইন্যালাইজড। এইসব বিষয়ী মানুষ যেখানে গিয়ে ঢুকবেন সেখানে একেবারে জ্বলেপুড়ে যাবে। টানতে টানতে কাছা কোঁচা খুলে ছেড়ে দেবে। প্রতাপ এমন বদলে গেছে, ভাবা যায় না। এক দিকে বাঘা শ্বশুর, আর এক দিকে সুন্দরী স্ত্রী। বেচারার মাথা ঘুরে গেছে। আমার নাম জয়নারায়ণ, আমি যা ধরি তা করে ছাড়ি। বড়লোক হবার জন্যে পৃথিবীতে আসিনি। আলুওয়ালাও বড়লোক হতে পারে। কয়লার গোলা করে আমাদের পাড়ার নন্তুবাবু তিনতলা বাড়ি করেছে। আমি কীটসের ভক্ত। আমার কাছে, আর্ট ফর আর্টস সেক।

নীচে খুব ধুমধাম শব্দ শুরু হয়ে গেছে। মাতুলের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ প্রশ্নবোধক। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নীচে কী হচ্ছে বল তো? মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্য?

একসঙ্গে গোটাকতক কাপডিশ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। প্রফুল্লকাকার গলা, বেশ কষকষে করে বলছেন, মারব মুখে জুতোর বাড়ি, মারব মুখে জুতোর বাড়ি। ওরে আমার কুচবিহারের মহারানি।

Death dances like a fire-fly, Life coughs
its last laugh in burning pyres.

দশটা বাজতে এখনও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাকি। পাছে দেরি হয়ে যায় সেই ভয়ে অনেক আগে এসে পড়েছি। বেশ ভয়ভয় করছে। জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ। প্রথম যেদিন দাড়ি গোঁফ কামিয়েছিলুম সেদিন একরকম মনের অবস্থা হয়েছিল, অদ্ভুত এক বিষণ্ণ অনুভূতি, যাঃ বড় হয়ে গেলুম, বিদায় শৈশব, বিদায় কৈশোর!

স্বপ্ন দেখার নিশ্চিন্ত দিন শেষ হয়ে গেল!

আর কেউ খোকা বলবে না। বাস বা ট্রামের নারী-আসন থেকে ঠেলে তুলে দেবে। কোনও মহিলা বলবেন না, খোকা তুমি আমার কোলে বোসো। মলিমাসি বলবেন, পিন্টু, তুমি একটু বাইরে গিয়ে বোসো, আমি একটু সাজগোজ করে নিই।

আর আজ মনে হচ্ছে, আমি আমার বহু মূল্যবান স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে এসেছি। আমার দিন গেল, রাত গেল। পিতার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে এই বিশাল বাড়ির কর্মদাতা প্রভুরা। প্রভু 'আমি' থেকে হয়ে যাব দাস 'আমি'। মাস গেলে পাঁচশো টাকা। পাঁচশো টাকাও কি এঁরা দেবেন! এখন মনে হচ্ছে, ইয়ারকি না করে, আর একটু ভাল করে লেখাপড়া করলে হত। যদি আই সি এস হতে পারতুম, তা হলে ওরই মধ্যে একটু বড় দাস হতে পারতুম। গ্রেজ ইন থেকে যদি ব্যারিস্টার হয়ে আসতে পারতুম, কিংবা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার। পিতা বহুবার বলেছিলেন। বললে কী হবে, মানুষ যে ভাগ্য নিয়ে আসে। কেউ রাজা হয়, কেউ খাজা।

সুটেড বুটেড, টাই পরা এক ভদ্রলোক বাড়িটার দিকে আমার মতোই সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছেন। পায়ের জুতো কালির বিজ্ঞাপনের মতোই জেল্লা ছাড়ছে। ইনি যদি চাকরির উমেদার হন, আমার আশাভরসা খুবই কম। এমন একটা স্মার্ট গাইকে ছেড়ে কে আর এই দিশি গাইকে বেছে নেবে। এ তো আর খাটাল নয়! বড় ঘাবড়ে গেলুম। ভদ্রলোক আমার প্রতিযোগী না-ও হতে পারেন। মশা মারার জন্য কেউ এমন কামান দাগতে আসবে না। ভদ্রলোক সিগারেট টানছিলেন। টুকরোটা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। সাংঘাতিক ডাঁট। চরিত্রে এমন একটা প্রভু-প্রভু ভাব কীভাবে আনা যায়! খুব মাংস খেলে মনে হয় হতে পারে। বাঘ যেমন বাঘ, ছাগল যেমন ছাগল।

দেউড়িতে চাপরাশ পরা প্রহরী। ভদ্রলোককে দেখে সট করে টুল ছেড়ে উঠে সেলাম বাজাল। যাক বাবা ইনি তা হলে আমার প্রতিযোগী নন। অন্য কেউ। বিগ বস গোছের কিছু একটা ব্যাপার! নীল জামা পরা আমার মতোই আর এক ন্যালাখ্যাবলা এসেছেন। এঁরা যা মাইনে দেবেন তাতে আমাদের মতো এইরকম ঝলঝলে খলখলে মালই জুটবে। নীলজামা কপালের দু'পাশে পাটিসাপটার মতো পেতে চুল আঁচড়েছেন। বেশ

গুড বয় গুড বয় চেহারা হয়েছে। চোখদুটো বড় বড়। চশমাটা বেশ ভারিক্কি মানুষের মতো। বেশ কাশি হয়েছে। শব্দটাও বিদঘুটে। শুনলে মনে হবে ভেতরে আর কেউ ঢুকে কাশছে।

কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করলেন, ইন্টারভিউ দিতে এসেছেন?

হ্যাঁ, আপনি?

আমিও খ্যাঁক। কীরকম তৈরি হল, খ্যাঁক।

কী তৈরি?

আরে, প্রেপারেশন, ঘ্যাঁক ঘ্যাঁ। ইন্টারভিউয়ের ভ্যাঁচ প্রেপারেশন। উঃ মরে গেলুম। দাঁড়ান একটু যষ্টিমধু খাই, ফ্যাঁচাত, খাবেন নাকি!

না, আমার কিছু হয়নি।

না হলেও খ্যাঁক ভাল।

উঃ সর্দি আর কাশিতে ভদ্রলোক নাস্তানাবুদ। ভালই হয়েছে, অনেক মাইনাস পয়েন্ট। প্রতি কথায় একটা করে হাঁচি বা কাশির পাংচুয়েশনে ইন্টারভিউয়ে খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না। যাঁরা নেবেন তাঁরা বলবেন, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

দেউড়ির সেই গোঁপদাদা বললে, সামনেই সিঁড়ি, দোতলায় চলে যান।

দোতলায় একটা ঘরের বাইরে লেখা রয়েছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টার। দরজাটা বেশ বাহারি। অর্ধেকটা কাঠ, অর্ধেকটা কাচ। কাচে মিছরির দানার মতো আলো আটকে আছে, যেন একটু আগে আলোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঘরের বাইরে টানা বারান্দা, এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে গেছে। গোটাকতক চকচকে বেঞ্চ পাতা। দু'-চারজন বসে আছেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখছেন। ক'টা পদ খালি জানা নেই, প্রার্থী অনেক। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে বিধাতাই জানেন।

কোম্পানির এক কর্মচারী এসে আমাদের হাত থেকে ছোঁ মেরে মেরে ইন্টারভিউয়ের চিঠিগুলো নিয়ে গেলেন। এইবার নম্বর মিলিয়ে একে একে ডাক আসবে। আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী? স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কী হবে?

প্রশ্ন করবেন না। যদি জানা থাকে বলুন।

আজ্ঞে জানা নেই। প্রধানমন্ত্রী জানা আছে। স্বাস্থ্য এমন কিছু ইমপর্ট্যান্ট পোর্টফোলিয়ো নয়।

বুঝবেন ঠ্যালা, যখন জিজ্ঞেস করবে। এঁরা ওষুধবিষুধ তৈরি করেন, স্বাস্থ্যটাই আগে ধরবেন।

ধরলে বলব জানি না।

আপনি জানেন, তবু বলবেন না। মুখ দেখেই বুঝেছি ভীষণ স্বার্থপর। কাল মাসির ছেলের অন্নপ্রাশন ছিল, তাই জেনারেল নলেজটা ভাল করে আর একবার দেখা হল না। চাকরিটা পেয়ে গেলে বড় ভাল হত। বাবা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে আজ দেড় বছর পড়ে আছেন।

আমার এ পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি ব্যাকিং আছে?

আজ্ঞে না।

আমি এত চেষ্টা করলুম একটাও শালা ব্যাকিং জোগাড় করতে পারলুম না। ব্যাকিং ছাড়া চাকরি হয়!

কোম্পানির কর্মচারী হাঁকলেন, শেখর সামন্ত।

সেই নীলজামা-পরা কেশো ছেলেটি বলির পাঁঠার মতো দরজা ঠেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকে গেলেন। এত ভয়ের কী আছে কে জানে। আমরা তো আর সত্যিই পাঁঠা নই যে কাবাব করে খেয়ে নেবে! এখানে না হয় অন্য কোথাও হবে।

সেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী আবার এক ফ্যাচাং বের করলেন, আচ্ছা কোন পাখি আকাশে ডিম পাড়ে?

আকাশে ডিম পাড়ে? লাইফে শুনিনি।

তা শুনবেন কেন? শুনলে যে আমার একটু সুবিধে হত। তিন-তিনটে বোন মাথায় মাথায়, বিয়ে দিতে হবে। আপনার বোন আছে?

না।

আপনার বাবাকে ধন্যবাদ। ভাই আছে?

না।

এমন মানুষের পায়ের ধুলো রোজ সকালে উঠে নিতে হয়। মা আছেন?

না।

তাই বলুন। আমাদের এ বেলা সাতটা পাত, ও বেলা সাতটা পাত। ছাত্র ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে লাইফ হেল হয়ে গেল। আপনার কে কে আছে?

আমি আর আমার পিতা।

আপনি কেন দাদা চাকরির খোঁজে এসেছেন?

এ পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ব্যাকিং আছে?

একটু আগেই যে বললুম, নেই।

ও, বলেছিলেন, যাক, তা হলে ফেয়ার কম্পিটিশন হবে।

নীলরতন হালদার, হাঁক পড়ল। শেষমাথা থেকে বেঁটে, গাঁটাগোট্টা এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। জিভ দিয়ে টুকটুক করে ওপর আর নীচের ঠোঁট চেটে নিলেন। নীলজামা-পরা ভদ্রলোক একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে আর ঘেঁষলেন না। সোজা চলে গেলেন সিঁড়ির দিকে। এদিকে এলে দু’-চার কথা জিজ্ঞেস করা যেত। যাক গে আমার অত দুশ্চিন্তা নেই। হলে হবে, না হলে হবে না।

হোমা পাখি! যিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি এমন আচমকা চিৎকার করে উঠলেন।

কী হোমা পাখি?

আরে মশাই যে-পাখি আকাশে ডিম পাড়ে। কিছুতেই মনে পড়ছিল না। তখন থেকে মনে মনে অ এ অজগর, আ এ আম করতে করতে হ-এ এসে হদিশ মিলল। হাতি হাতি করতে করতে, হোম হোম সুইট

হোম, হাতি, হোম, হোম, হোম, হাতি, পেয়ে গেলুম হোমা। স্মৃতি এমনই জিনিস, না চালালে চলে না।

এসব প্রশ্ন কি ওঁরা করবেন?

করলেই হল। ইন্টারভিউ মানে জামাই-ঠকানো প্রশ্ন। দাঁড়ান ওই কায়দায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীটা বের করে ফেলি। ভদ্রলোক চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ হলেন।

গৌর মল্লিক। আবার পেয়াদার হাঁক। ভদ্রলোকের ধ্যান ভঙ্গ হল। তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন।

কী মশাই পেলেন?

না, যা হয় হবে, ভগবানই ভরসা।

ভদ্রলোক বাঘের খাঁচার দিকে গুটিগুটি এগিয়ে গেলেন।

পরপর সাতজন চলে গেলেন। আমার ডাক আর আসেই না। বোঝাই গেছে সব শেষে যাকে ডাকা হয় তার সম্ভাবনা খুবই কম। বেঞ্চ প্রায় ফাঁকা। আমরা আর মাত্র তিনজন, চুপসে বসে আছি। পারের ডাক কখন আসে!

যিনি হাঁকডাক করছিলেন, তিনি জানালেন, এখন লাঞ্চের সময়। আবার এক ঘণ্টা পরে বুলফাইট শুরু হবে। ইচ্ছে করলে আমরাও ঘুরে আসতে পারি। যো হুকুম জাঁহাপনা।

বেপাড়ার অফিস। অফিস আর কারখানা একসঙ্গে। বেশ নামী প্রতিষ্ঠান। ওষুধ, সাবান, পেস্ট নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কারখানা পেছন দিকে। বিশাল একটা চিমনি আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে। চারপাশের বাতাসে রকম রকম গন্ধ ভাসছে। আশেপাশে তেমন দোকানপাট নেই। বসতবাড়িই বেশি। উচ্চমধ্যবিত্তের পাড়া। রাস্তায় বেরিয়ে এলে মনেই হবে না চাকরি করতে এসেছি। মনে হবে পাড়া বেড়াতে এসেছি। দোতলা তিনতলার বারান্দায় মেয়েরা দুপুরের মতো গা এলিয়ে দিয়ে গল্প করছেন। দুপুরের গান বাজছে রেডিয়োতে। এ পাড়ার ডাকসাইটে পুরুষরা এখন এসপ্ল্যানেডে, ড্যালহাউসিতে, বড়বাজারে। এখানে মেয়েদের আধিপত্য চলেছে। বারান্দায় বারান্দায় কথা ছোড়াছুড়ি চলছে। কোনও কোনও বারান্দায় শাড়ির বদলে চুল ঝুলছে। বৃদ্ধরা পুরুষের দলে পড়েন না। মানুষ বৃদ্ধ হইলেই বিড়াল হইয়া যান। এ পাড়ার বৃদ্ধদের সম্বল দেখছি তিনটি। একটি ইজিচেয়ার, একখানি খবরের কাগজ, আর হয় একটি পুতুল-পুতুল নাতি না হয় নাতনি। বাইরের ঘরেই তাঁদের আস্তানা।

মোড়ের মাথায় একটি ঘুমঘুম মিষ্টির দোকান। নীল কাপড় ঢাকা শো-কেসের আড়ালে সেই থোড়বড়িখাড়া মিষ্টি। চায়ের দোকান চোখেই পড়ল না। পড়লে এক কাপ চা খাওয়া যেত। ট্যাঁকে তেমন পয়সার জোর নেই যে গোটাকতক রসগোল্লা চালিয়ে দোব। হাঁটতে হাঁটতে একটা নির্জন পার্কে এসে পৌঁছোলুম। ভবঘুরে চেহারার দু'-একজন চেত্তা খেয়ে এখানে-ওখানে পড়ে আছেন। বেশ মজা, কোনও কাজকর্ম নেই। আকাঙক্ষা নেই। যা হল, হল। যা হল না, হল না। টকটকে গেরুয়া পরে এক সন্ন্যাসী চলেছেন রাজার মতো। মাথায় মহারাজদের মতো করে বাঁধা গেরুয়া পাগড়ি। দশাসই চেহারা, খাড়া নাক, টানা চোখ, গৌর বর্ণ। রাস্তা কাঁপিয়ে হেঁটে চলেছেন। পোশাকের ধরন দেখে মনে হচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সঙঘের। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে, মৃদু হেসে ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন।

কী দেখছ?

আপনাকে।

প্রণাম করার জন্যে নিচু হতেই হাত ধরে সোজা করে দিলেন, আমি কারুর প্রণাম গ্রহণ করি না।

কেন মহারাজ?

অনেক দেরি আছে রে ভাই। আগে বিশুদ্ধির শেষ ধাপে পৌঁছোই তারপর প্রণাম। তুমি কে?

আমি, আমি এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছি। শুরু হতে দেরি আছে দেখে একটু ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছি।

অমন অবাক হয়ে কী দেখছিলে?

আমার ভীষণ সন্ন্যাসী হতে ইচ্ছে করে। হিমালয়ের কোনও এক গুহায় নির্জনে একা একা।

হিমালয়ে গেছ?

আজ্ঞে না, হরিদ্বারে গেছি, আর একটু এগোতে পারলেই হিমালয়।

দেহে না মনে?

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলুম না!

মন না রাঙায়ে কাপড় রাঙালে যোগী, গানটা শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি এখন কোথায় ঘুরছি?

এইখানে।

কেন ঘুরছি? কর্ম, কর্ম! ধ্যানের স্বাধীনতা কোথায়! যতদিন শ্বাসপ্রশ্বাস ততদিন কর্ম। মনে বৈরাগ্যের বাতিটি জ্বালিয়ে রাখো, হিমালয়কে কলকাতায় নামিয়ে আনো। সাধুসঙ্গ করো?

তেমনভাবে নয়।

শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু পড়ো?

মাঝেমধ্যে।

তা হলে শোনো, দুর্লভং এয়মেবৈত দৈবানুগ্রহ হেতুকম। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষ সংশয়॥ কিছু বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয় প্রাপ্তি এই তিনটেই সংসারে দুর্লভ। ঈশ্বরের দয়া ছাড়া হয় না।

বাঃ, খুব সুন্দর। যে-কাজে এসেছ জয়ী হও। জীবন, সন্ন্যাস, কোনও কিছু সম্পর্কেই রোজি আইডিয়া রেখো না। পোড়াতে জানো?

একটু বুঝিয়ে বলুন।

রসায়নে একটা শব্দ আছে, দহন, কম্বাসন। ধিকিধিকি একটা আগুন জ্বালাও ভেতরে, বাইরে নয়, ভেতরে হোম। একদিন আশ্রমে এসো, তোমাকে একটু বাজিয়ে দেখব।

এইবার একবার প্রণাম করি।

না, প্রণাম নেবার অধিকার আমার জন্মায়নি। যদি কোনওদিন আসো, সন্ন্যাসাশ্রমে আমার নামটা মনে রাখো— ধীরানন্দ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

মহারাজ পথের বাঁকে হারিয়ে গেলেন। মনে বেশ একটা বল এসে গেল। ইন্টারভিউ! কীসের ইন্টারভিউ! আমার কে আছে যে চাকরির পরোয়া করব! ইন্টারভিউ না দিলেই বা কী হয়! না, দোব, একবার পরীক্ষা করে নোব 'আপ সাচ্চা তো জগৎ সাচ্চা' কত সত্য। সৎ, যাকে বলে মজ্জায় মজ্জায় সৎ, সাহসী। হাসি পাচ্ছে, নারকেলের ছোট্ট খোলে সমুদ্রের আলোড়ন। কী কী আছে আমার, কী কী নেই? যেতে যেতে হিসেব করি। হিংসে আছে? হয়তো আছে। ভাইবোন থাকলে বোঝা যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে? হয়তো আছে। ক্ষমতা নেই তাই 'দ্রাক্ষা ফল টক' বলে পালিয়ে আসি। ভোগের ইচ্ছে? কে না ভোগ করতে চায়? ভোগ না হলে ত্যাগের গর্ব থাকে! গর্ব? হয়তো আছে! নিজেকে বিশ্লেষণ করা কি অতই সহজ।

পলাশ চট্টোপাধ্যায়। নকিব ফুকারে।

যাক, দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমেই আমার নাম ডাকা হল। বুক সামান্য কাঁপল। স্বামী ধীরানন্দের মতো ধীর পায়ে আধা-কাচের দরজা ঠেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে ঢুকে পড়লুম। অর্ধচন্দ্রাকার টেবিলে চারজন বসে আছেন দরজার দিকে মুখ করে অর্ধচন্দ্র দেবার জন্যে। ঘরটি বেশ মনোরম। সব অনুষঙ্গই আছে। কার্পেট। ঝকঝকে ফার্নিচার। পেলমেট থেকে ঝোলা ভারী পরদা। ফুলও আছে। দুর্বল বুকে চেপে বসার মতো আবহাওয়া। ঘর বলছে, দাস হবি আয়, দাস হবি আয়। মাঝের আসনে সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ। মাঝখানে সিঁথি। সোনার ফ্রেমের চশমা। দুগ্ধশুভ্র ধুতি পাঞ্জাবি। কবজিতে সোনার ঘড়ি। সেই সুটেড বুটেড ভদ্রলোকও বসে আছেন। মুখ অসম্ভব গম্ভীর। মনে হয় বেশ ভয় পেয়েছেন। হয়তো আমাকে দেখে। ছাগলের যেমন ভয় থাকে, বাঘেরও তো সেইরকম ভয় থাকতে পারে। টেবিলের এদিক আর ওদিক। ওদিকের ভয়ে এদিক তটস্থ। কারণ ওঁরা দেবেন। ওঁরা না দিলে এদিক পাবে না। কিন্তু এদিক যদি কিছুই না চায়। ছাগল যদি বাঘ হয়ে যায়। বাঘে বাঘে লড়াই। দেখা যাক কী হয়।

ইয়োর নেম প্লিজ? সুটেড-এর প্রশ্ন।

তা প্রথম রাতেই বেড়াল কাটা যাক। দু'জনেই বাঙালি, তা হলে কেন এই ইংরিজিতে কেরাদানি। আমার পালটা প্রশ্ন, ইয়োর নেম প্লিজ?

চারজন ভদ্রলোকের মধ্যে তিনজনের মুখ যেন কেমন হয়ে গেল। সামনে ঈষৎ ঝুঁকে বসে থাকা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখেই কেবল একটু হাসি খেলে গেল। উপভোগের হাসি। টেবিলের কোণে আঙুলের ট্যাপ ট্যাপ শব্দ করলেন।

হরিদাস ব্যানার্জি। ভদ্রলোক কোনওরকমে বললেন।

থ্যাঙ্ক ইউ মি. ব্যানার্জি, মে আই টেক মাই সিট?

ইয়েস।

নাও, লেট আস গেট আওয়ারসেলভস ইন্ট্রোডিউসড। আই অ্যাম পলাশ চ্যাটার্জি, ইয়োর নেম প্লিজ, দি জেন্টলম্যান সিটিং বাই ইয়োর সাইড, চিউইং বিটল লিফ।

থলথলে কালো মোটা ভদ্রলোক থতমত খেয়ে গেলেন, আমার নাম, মাই নেম?

ইয়েস ইয়োর নেম?

মি? মাই নেম ইজ রমেশ সেন।

হোয়াট ইউ আর প্লিজ?

হোয়াট?

ইয়েস, হোয়াট ইউ আর প্লিজ?

আই অ্যাম এ জেন্টলম্যান।

এইবার আমার হাসার পালা। একটু বিলিতি কায়দায় ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো হাসি। তাড়িয়ে তো দেবে নিশ্চয়ই। পাগল ছাড়া এরকম বিদঘুটে সাহস কার হবে, ইয়েস, ইও আর এ জেন্টলম্যান, বাট, আই আসকড অ্যাবাউট ইয়োর প্রফেশন, ইয়োর পজিশন ইন দিস কোম্পানি। আমরা সবাই যখন বাঙালি তখন বাংলা বলতে আপত্তি কীসের? দেশ তো অনেকদিন হল স্বাধীন হয়েছে। আপনারা করবেটের 'মাই ইন্ডিয়া' পড়েছেন?

সেই সুটেড ভদ্রলোক বললেন, হি ইজ কোয়াইট হোসটাইল, প্রবেবলি ইনসেন, উই ক্যান টার্ন হিম আউট।

ইয়েস ইউ ক্যান, কিন্তু তার আগে করবেট সাহেবের মন্তব্যটা শুনে নিন, তা হলে আর সায়েব হতে ইচ্ছে করবে না, মাইকেলের মতো বাঙালি হয়ে যাবেন। করবেট লিখছেন, ভারতীয়দের ইংরেজি শুনে সায়েবরা ভয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে পালালেন। ভাবলেন, আর বেশিদিন থাকলে কুইনস ইংলিশের বারোটা বেজে যাবে। কুইট ইন্ডিয়া টু সেভ আওয়ার ল্যাঙ্গোয়েজ। আচ্ছা, আমি তা হলে আসি, নমস্কার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখে তাকালেন, বোসো বোসো। তোমাকে আমি তুমি বলতে পারি? পারি তো? আমার অনেক বয়স হয়েছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তুমি বলতে পারেন।

ইংরিজির ওপর তোমার এত ছেলেমানুষি রাগ কেন?

কই, না তো। ইংরিজির ওপর রাগ নয়, রাগ ইংরেজিয়ানার ওপর।

বাঃ, ছোকরা ভাল বলেছে, তোমরা শুনলে?

শুনেছি, ওর অ্যাটিচিউড বড় ইনসালটিং।

এবার আমার প্রতিবাদের পালা, বাংলায়, সর্বনামে একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ না করলে অভদ্রতা হয়। আমি তো এখনও চাকরিতে বহাল হইনি, এখনও অপরিচিত, খাস ইংরেজ হলে সেই শব্দই ব্যবহার করতেন, যাতে 'ওঁর' বোঝায়।

তুমি আমাদের চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট।

বয়সে ছোট হলেই সম্মানে ছোট হয়ে যায় না, অতএব তুমি নয় আপনি।

সুটেড ভদ্রলোক বললেন, এই ভেরি রেসপেক্টেবল পার্সনটিকে আমি শূন্য দিলুম।

বাকি দু'জন বললেন, আমরাও শূন্য দিলুম।

সৌম্য বৃদ্ধ বললেন, কীসের ভিত্তিতে দিলে? কোনও প্রশ্নই তো ওকে করা হল না।

প্রশ্নের প্রয়োজন নেই, ওই এঁড়ে স্বভাবের ছেলে কোথাও চাকরি করতে পারবে না। হি ইজ অ্যাবসোলিউটলি এ মিসফিট। এ রেবেলিয়াস স্পিরিট।

সৌম্য বৃদ্ধ বললেন, তা হলে ওকে আমি পুরো নম্বর দিলুম। মিনমিনে বাঙালি আমি চাই না।

সুটেড বললেন, হি ইজ ইনসেন, আনকালচার্ড।

আমি পাগলদের ভীষণ ভালবাসি, নিজে পাগল তো, আর কালচার? ঈশ্বর ওকে বাঁচিয়েছেন, তোমাদের কালচার ভাগ্যিস রপ্ত করে বসেনি! তা হলে এঁড়ের সঙ্গে ইংরিজি মিশিয়ে কেলেঙ্কারি করে বসে থাকত। তোমাদের কালচার হল সেরিকালচার। চকচকে রেশমের গুটি, ভেতরে কিলবিল পোকা। গরম জলে সেদ্ধ না হলে সিল্ক বেরোবে না।

হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক বললেন, বেশ, এই যদি আপনার সিদ্ধান্ত হয়, তা হলে আমাদের আর অপমান করবেন না। আপনিই বাজিয়ে নিন।

হ্যাঁ, আমিই একটু বাজাই, তবে তোমাদের অফিসের কেরানিগিরির জন্যে নয়, আমার ল্যাবরেটরির জন্যে। ছেলেটি যখন সায়েন্স গ্রাজুয়েট তখন একটু তালিম দিলেই কেমিস্ট হতে পারবে। প্রদ্যোতের হাতে ফেলে দিলেই মানুষ করে দেবে। তোমার অ্যানালিসিসের হাতটি কেমন বাবা?

আজ্ঞে, খুব একটা খারাপ নয়।

শোনো, পিপেট আর ব্যুরেট হল অ্যানালিস্টের দুই সহধর্মিণী, ওই দুটিকে যে কন্ট্রোল করতে পারে তার আর মার নেই, হ্যাঁ তার সঙ্গে চোখও থাকা চাই, সদা জাগ্রত দুটি আঁখি। এই অ্যাপ্লিকেশনটা কি তোমার হাতে লেখা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ, ভারী পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা হে তোমার। দু'পাশে সমান মার্জিন, সমান্তরাল অক্ষরের সারি। ওহে তোমরা দেখো, ছেলেটি কত অরগ্যানাইজড তার প্রমাণ এই দরখাস্ত। তোমরা অমন অভিমানী স্ত্রীলোকের মতো মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন?

আপনার ব্যাপার আপনি বুঝুন।

তা না হয় বুঝলুম, পরে আবার শত্রুতা করবে না তো? আমার সঙ্গে নয়। আমাকে তোমরা পারবে না। এর সঙ্গে?

সেই স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক বললেন, শত্রুতা করব কেন?

কেনর কি কোনও জবাব আছে হে। আমরা যে বাঙালি। আচ্ছা, তুমি এখন এসো। তোমার পরিচয় আমার এই ফাইলে আছে, সেইটাই যথেষ্ট। হরিশঙ্কর কেমন আছে?

চমকে উঠলুম। মরেছে, ইনিই বোধহয় সেই পিতৃবন্ধু। আজ্ঞে, ভাল আছেন।

বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে। তোমার রক্তে হরিশঙ্কর আছে। ওর কেমিস্ট্রি কেমন চলছে?

খুব জোর চলছে।

বড় ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে। বাপকো বেটা, সিপাহি কো ঘোড়া, কুছ নেহি হায় তো থোড়া থোড়া।

বিদায়ের সময় সায়েবরা বলেন, গুডবাই, সুটেড ভদ্রলোক ছোট্ট একটি চাঁট ছুড়লেন, এ আমাদের আর এক দাদাঠাকুর। ডেঁপো দি গ্রেট।

সাংঘাতিক কিছু একটা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, মেজাজ থিতিয়ে গেছে। এইটুকুই বলতে পারলুম, আশীর্বাদ করুন তাই যেন হতে পারি।

অফিসের বাইরে রাস্তায় পা রেখে মনে হল, বুদ্ধিসুদ্ধি এখনও তেমন পরিপক্ক হয়নি। অকারণে বাহাদুরি দেখাবার লোভ স্বভাবে প্রবল। কোনও প্রয়োজন ছিল না ছেলেমানুষের মতো পাকাপাকা কথা বলার। চাকরিটা যদি হয় নিজের কৃতিত্বে হবে না, হবে পিতার পরিচয়ে।

শরীরকে এবার একটু কষ্ট দেওয়া যাক। দক্ষিণ থেকে উত্তরে হেঁটে হেঁটে যত দূর যাওয়া যায় যাওয়া যাক। যখন আর পারব না তখন একটা কিছুতে উঠে পড়ব। বেলা বেশ পড়ে আসছে। লিন্ডসে স্ট্রিটের কাছে ট্রাফিক সিগন্যালে একটা গাড়ি থেমেছিল, কাছাকাছি আসার আগেই, সবুজ পেয়ে ঝাঁকি মেরে এগিয়ে গেল। মনে হল প্রতাপ রায় চালাচ্ছেন। পেছনে বসে আছেন দু'জন মহিলা একজন পুরুষ। ঠিকই দেখেছি। মেসোমশাই হবু জামাইকে নিয়ে মার্কেটিংয়ে বেরিয়েছিলেন।

ধুঁকতে ধুঁকতে পাড়ায় ঢুকলুম। শহর পড়ে আছে বহুদূরে। কালীবাড়িতে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে। শীতলাতলায় মায়ার পিসি ঠুংঠুং ঘণ্টা নাড়ছে। মায়ার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয়নি। কোথাও একটা কিছু হয়েছে। লোক চলেছে নেচে নেচে। কে বললে, দীনু এসেছে।

দীনু আসবে কী করে? দীনু তো আর আসবে না। দীনুর শরীর এসেছে। ধবধবে সাদা একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের দরজা খোলা। বরফের চাঙড়ার ওপর সাদা চাদর ঢাকা মৃতদেহ। ফিনফিনে নীল কুয়াশায় মৃত্যুর প্রেয়সী-আলিঙ্গন।

আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না

ভীষণ মেঘ করেছে। দুপুরে রাত নেমেছে। প্রকৃতি থমকে আছে। বৃষ্টি এল বলে। ঝাঁক ঝাঁক চিল উড়ছে মন্দিরের মাথায়। সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। দিগন্তের এক হাত ওপরে কালো মেঘের পুরু রুটি ভাসছে। বছরের প্রথম বড় ধরনের বৃষ্টি আসছে খুব তোড়জোড় করে। একটা চাতক করুণ সুরে ডাকছে— জল দাও, জল দাও।

এমন দিনে একটা কাজই করা চলে, বেশ আয়েশ করে শুয়ে শুয়ে বই পড়া। সুখেন নেই যে জ্বালাতে আসবে। দীনু চিরকালের জন্য চলে গেছে। দীনুর পিতা বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। দীনুর সেই খুনি মোটরসাইকেলটার কিচ্ছু হয়নি। আরোহীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে যন্ত্রদানব এখন বেশ বহাল তবিয়তে গ্যারেজের একপাশে দু'পা ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষ কত কী যে রটাতে পারে! আজকাল মাঝরাতে একটা মোটরসাইকেলের আওয়াজ পাওয়া যায়। হয়তো থানার অফিসার ইনচার্জ রোঁদে বেরোন। বেরোতেই পারেন। সেইটাই স্বাভাবিক। বিশেপাগলা মুদির দোকানের রকে শুয়ে থাকে। পাগলাদের কল্পনাশক্তি মনে হয় প্রবল। কেমন রটিয়ে দিয়েছে! লাল আগুনের মতো মোটরসাইকেল চেপে, জ্বলন্ত দীনু ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে নীল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। সোনার চামরের মতো মাথার চুল উড়ছে। টকটকে পেতলের মতো গায়ের রং। সে তোমরা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। আওয়াজ শুনে একদিন তাড়াতাড়ি উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখেছিলুম, তবে মোটরসাইকেল আরোহী দীনুকে নয়, একঝলক বাতাস চলে গেল ছেঁড়া কাগজ আর শালপাতা টানতে টানতে।

সকালে যা হয় একটা কিছু রাঁধলেই চলে। নীচে থেকে প্রফুল্ল কাকিমা একটা-না-একটা কিছু দিয়ে যান। পিতৃদেব স্পর্শ করেন না। বলেন স্বপাকই বেস্ট পাক। সবটা একলা আমাকেই সাবড়াতে হয়। রাঁধেন ভাল তবে ঝালের হাতটা একটু বেশি। আজ করেছিলেন নারকেল কোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট। ছোলাটোলা ছিল। বেশ তরিবাদি ব্যাপার। ঝালের চোটে পেট এখনও জ্বলছে।

মেঘলা আকাশের দিকে তাকিয়ে কত কথাই মনে আসছে। মাতামহ অনেকদিন আসেননি। আজ বিকেলের দিকে একবার খবর নিতে পারলে ভাল হত। আকাশের যা ঘনঘটা আয়োজন, বিকেলের দিকে মেঘমল্লার জলসা শুরু হবেই। মেঘের পাখোয়াজ শুরু হয়ে গেছে।

কনকটা আচ্ছা ছোটলোক। না, কনকের আর দোষ কী! মেসোমশাই যেমন চালাবেন, তেমনই তো চলবে। মেয়েরা হল গাড়ির মতো। চালক যেভাবে চালাবে, সেইভাবে, সেই দিকেই চলতে হবে। প্রতাপ রায় একজন মালদার লোক। ফকিরে কি আর সংসার করতে পারে! উপন্যাসেই প্রেমের জয়জয়কার। জীবনে শুধু লাভ-ক্ষতি, দেনা-পাওনা।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালতে পারলে ভাল হয়। পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে এবার দিবানিদ্রা। সামনের বাড়ির টিনের চালে বৃষ্টি নাচছে। দরজার বাইরে ক্ষীণ চুড়ির শব্দ হল। কনক এল নাকি! কাকিমা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

বাঃ বেশ মজা করে শুয়ে আছ! লেখাপড়া নেই?

থাকলেও করা যাবে না। বর্ষায় ঘুম।

কাকিমা ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিছানার একপাশে বসে বললেন, আমার সব গুল ভিজে গেল।

তুলে ফেলুন।

তোলার উপায় নেই, একেবারে ভিজে।

বেশ বড় করে একটা হাই তুললেন। একে দুপুর, তায় বর্ষা। আলসে লেগেছে। বর্ষায় আমাদের নীচেটা যক্ষপুরীর মতো হয়ে ওঠে। অন্ধকার, ড্যাম্প, নোনা-ধরা দেয়াল। ওপরে এসেছেন বেশ করেছেন, তবে খাটে না বসলেই পারতেন! বিছানায় বসা উচিত নয়। চেয়ার রয়েছে, সোফা রয়েছে। চক্ষুলজ্জায় কিছু বলতেও পারছি না।

পিন্টু, তোমার বাবার কাছে তো অনেক ওষুধ থাকে!

কী ওষুধ বলুন? হোমিওপ্যাথিক!

এই ধরো কেটেকুটে গেলে লাগাবার মতো কিছু।

হ্যাঁ আছে। দিচ্ছি দাঁড়ান। হাত কেটেছে বুঝি!

সেই উঠতে হল। শোবার উপায় কি ভগবান রেখেছেন! আয়োডিনের শিশিটা নিয়ে এলুম।

বলুন, কোথায় লাগাতে হবে?

কাকিমার ঠোঁটে লাজুক হাসি, তুমি একটু লাগিয়ে দেবে!

কেন দেব না।

কিছু মনে করবে না?

মনে করব কেন?

ধীরে ধীরে পিঠের আঁচল সরালেন। গায়ে যে জামা ছিল না, এতক্ষণ লক্ষ করিনি। মেয়েদের পিঠ, ফরসা ধবধবে। তেলা টানটান চামড়ার ওপর এপাশ থেকে ওপাশে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা লাল দাগ। দেখলেই গা শিউরে ওঠে। চামড়া ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গেছে।

ভয়ে, আতঙ্কে আর একটু হলেই হাত থেকে আয়োডিনের শিশি পড়ে যাচ্ছিল। কাকিমা সামনে ঝুঁকে বসে আছেন। এই ক্ষতের ওপর আয়োডিন পড়লে অসম্ভব জ্বলবে। সে জ্বালা আমি সহ্য করতে পারব না। কে এমন করলে! মানুষে না জানোয়ারে!

কাকিমা বললেন, কী হল, লাগিয়ে দাও।

এ আমি পারব না কাকিমা। অসম্ভব জ্বলবে।

এমনিই তো জ্বলছে, ওষুধে না হয় আর একটু জ্বলবে। তুমি নির্ভয়ে লাগিয়ে যাও।

কী করে এমন হল?

ও আমার মাঝে মাঝেই হয়। বরাতে হয়। কেন হয়, সে আর তোমাকে আমি বলতে পারব না।

সুখেনকে হেডমাস্টার মশাই একবার সপাসপ বেত মেরেছিলেন। সারাপিঠ এইভাবে ফেটে ফেটে, দাগড়া দাগড়া হয়ে গিয়েছিল। রেড়ির তেল লাগিয়ে সুখেন সেরেছিল। আয়োডিনের বদলে রেডির তেল লাগাতে পারলে, হয়তো আরাম পেতেন। পাব কোথায়!

যা থাকে বরাতে, আয়োডিনই লাগাই। কাঠিতে বেশ মোটা করে তুলো জড়িয়ে একটু একটু করে আয়োডিন লাগাচ্ছি। পিঠটা থিরথির করে কাঁপছে। চারপাশে শিশিরের দানার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে। কাকিমার কী হচ্ছে জানি না, আমার কিন্তু চোখ ফেটে জল আসছে। এ ওই গোঁয়ারগোবিন্দ তবলচি ব্যাটার কাজ। জানোয়ার। কেন ব্লাউজ পরেননি এখন বুঝতে পারছি।

পিঠের দিকটা খুলে রাখলে তুমি কিছু মনে করবে পিন্টু?

না না, মনে করব কেন?

খাটে বসেছিলেন বলে, একটু আগে আমার খারাপ লেগেছিল। এখন আর লাগছে না। একটু বাতাস করে দিলে, মনে হয় আরাম পাবেন। পাখাটা নিয়ে আসতেই খপ করে হাত চেপে ধরলেন। মুখ দেখলে বোঝা যায়, খুব জ্বালা করছে। অন্য কেউ হলে চিৎকার করতেন। এ মহিলার অসম্ভব সহ্যশক্তি।

ছাড়ুন, একটু বাতাস করে দিই। জ্বালা কমবে।

দুর পাগল। জ্বালা কি কমে? সহ্য করতে হয়। নাও, তুমি শুয়ে পড়ো। আমি একটু বসে চলে যাই। কাজ পড়ে আছে।

অসম্ভব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। এইরকম জোরে ঘণ্টাখানেক পড়লেই জল জমে যাবে। বিখ্যাত ঠনঠনেতে একবুক জল হবে। পিতৃদেবের বাড়ি ফিরে আসতে আজ জীবন বেরিয়ে যাবে। চাদর চাপা দিয়ে আবার জানলার ধারে গিয়ে বসলুম। গুঁড়িগুঁড়ি জলকণা উড়ে আসছে।

সারাআকাশ ফাটিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ভয়ে কানে আঙুল দিলুম বিকট শব্দ হল বলে। না, তেমন শব্দ হল না। বহু দূরে আকাশের হুমকি বাজল গুমগুম করে।

কাকিমা বললেন, আওয়াজকে বড় ভয় করে। বৃষ্টি হয় হোক। তুমি বাজ পড়া দেখেছ?

না, শুনেছি বাজ পড়লে গোবর চাপা দিতে হয়, তা হলে নাকি নীলমতো একটা বল পাওয়া যায়।

ধুস, ওসব গল্পকথা। আমি কত সাপ দেখেছি, একটারও মাথায় মণি দেখিনি। আমার ভীষণ হিরের নাকছাবি পরার শখ। একটা মণি পেলে কাটিয়ে আংটি আর নাকছাবি করিয়ে নিতুম। গল্পের সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল বলো তো, সেই পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাজপুত্র, সোনার কাঠি, রুপোর কাঠি।

দিন হারায়নি কাকিমা, গল্প হারিয়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে, পৃথিবী তত সেয়ানা হয়ে উঠছে।

নাঃ, কাকিমাকে এক ডোজ আর্নিকা খাইয়ে দিই, ব্যথা অনেক কমে যাবে। চাদর ফেলে আমাকে উঠতে দেখে কাকিমা বললেন, কী হল আবার?

কিছু না, আপনাকে এক পুরিয়া ওষুধ খাইয়ে দিই। ব্যথা কমে যাবে।

মনে হচ্ছে, জ্বর আসছে পিন্টু। শীতশীত করছে।

আর্নিকার শিশি হাতে কাকিমার সামনে এসে দাঁড়ালুম। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন।

নিন, জিভটা বের করুন, গোটাকতক গুলি ঢেলে দিই।

শিশির পেছনে টুস টুস করে গোটাকতক টুসকি মেরে সাত-আট দানা ওষুধ জিভের ওপর সবে ছেড়েছি, বিদ্যুতের আলোয় আকাশে ঢেউ খেলে গেল। কানে আঙুল দেবার সময় নেই। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল।

শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কাকিমা, ও মা, বলে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বসে, আমি দাঁড়িয়ে। টাল সামলানো গেল না। হুমড়ি খেয়ে সামনে, মহিলার ঘাড়ে। দু'জনেই বিছানায় চিতপাত। কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়েছে। খুব কাছে। বাতাস গরম। নাকে পোড়াপোড়া গন্ধ।

আকাশ আবার চমকাল। আবার বজ্রপাতের শব্দ। মহিলার ভীত আলিঙ্গন আরও দৃঢ়। এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছেন! এভাবে না জড়ালেই ভাল হত। শরীরেরও তো চৌম্বক শক্তি আছে। এই মুহূর্তে নিজেকে আর পিন্টু বলে ভাবা যায় না। সেই পুরুষ ও প্রকৃতি। ঘনঘোর আকাশে, ঝোড়ো বাতাসে, মেঘ ছিঁড়ছে, মেঘ জুড়ছে, গাছের মাথা দুলছে উন্মত্ত আনন্দে, বিদ্যুৎ শিউরে শিউরে উঠছে, আকাশ কখনও চাপা, কখনও মুক্ত গর্জনে প্রকৃতিকে শাসন করছে।

সারা চাদরে ভিজেভিজে আর্নিকার গুলি। শিশি ছিটকে চলে গেছে বালিশের পাশে। রাত না দুপুর! পিন্টুর পিন্টুত্ব লুপ্ত। শরীরে বড় কষ্ট। কষ্টে আনন্দ, আনন্দে কষ্ট, চোখে আকাশ অদৃশ্য। মাতাল বর্ষায় বড় রমণীয় স্থানে আশ্রয় পেয়েছি। ছেড়ে যেতে চাই, মুক্তি নেই। মনে সে জোর নেই। নিজেকে এবার চিনতে পেরেছি। ভণ্ড তপস্বীকে।

যেমন হঠাৎ জড়িয়ে ধরেছিলেন, তেমনি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে কাকিমা জানলার ধারে চলে গেলেন। বিছানায় পড়ে আছি চিতপাত। মনে একটু পাপের ফেঁসো এখনও লেগে আছে, তা না হলে এমন হতভম্ব হয়ে যাব কেন? মা কি সন্তানকে জড়িয়ে ধরতে পারেন না, খুব পারেন, একশোবার পারেন। ওই কথামৃত পড়ার ফলে, আমার এইরকম কলা খাইনি গোছের অবস্থা হয়েছে। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণ যে বলেছেন, মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশিক্ষণ আলাপ, সেও একপ্রকার রমণ। রমণ আট প্রকার,

স্মরণং কীর্তনম্ কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্য ভাষণং।
সংকল্পোহধ্যাবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং॥

মেয়েদের কথা শুনছি; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে, ও এক রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি [কীর্তনম্], ও এক রকম রমণ; মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে চুপিচুপি কথা কচ্ছি, ও এক রকম। মেয়েদের কোনও জিনিস কাছে রেখে দিয়েছি, আনন্দ হচ্ছে, ও এক রকম। স্পর্শ করা, আর এক রকম। তাই গুরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নেই।

অবশ্য, এ বিধিনিষেধ সবই হল সন্ন্যাসীদের জন্য। 'সংসারীদের আলাদা কথা; দু'-একটি ছেলে হলে ভাই-ভগ্নীর মতো থাকবে; তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নেই।' কিন্তু, আমি তো সংসারীও নই,

সন্ন্যাসীও নই। যখন সন্ন্যাসী হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাব, তখন আর মহিলাটহিলা কোথায়! বরফ ঢাকা হিমালয়। ছোট্ট একটা গুহা। যা হয়ে গেল, তাতে কি আমার আনন্দ হল! না, হয়নি। মনে হচ্ছে একটু হয়েছে। মরেছে। কাকিমা তো একটা পাতানো সম্পর্ক। আসলে তো রমণী। মধ্যবয়স্ক তরুণী ভার্যা।

জানলার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখি। দাঁড়িয়ে আছেন সেই একভাবে। উদাস চোখ। চোখের দু'কোলে জলের ধারা। কাঁদছেন কেন? আমি তো কিছু করিনি। চড়াক করে আবার একটা বাজ পড়ল। কাকিমা চমকে জানলার ধার থেকে সরে এলেন। আবার হালুম করে বুকে এসে পড়ার ভয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম।

কাকিমা খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালেন।

কাঁদছেন কেন আপনি?

এই একটি কথায় নীরব অশ্রু সরবে বইতে শুরু করল। মাথা নিচু করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কেউ কাঁদলে মন এমনিই দুর্বল হয়ে পড়ে, মহিলারা কাঁদলে তো কথাই নেই।

আমাদের দু'জনের দূরত্ব খুব বেশি নয়। ইঞ্চি দুয়েক কাঠের ব্যবধান। কান্নার আবেগে বুক ফুলে ফুলে উঠছে।

আপনি কঁদছেন কেন?

আমাকে একটু বিষ জোগাড় করে দিতে পারো?

বিষ?

হ্যাঁ বিষ।

আপনার কীসের দুঃখ!

দুঃখু? বলো, কীসের সুখ!

আপনি এদিকে এসে বসুন। জীবন মানেই দুঃখ। তা হলে সব মানুষকেই তো আত্মহত্যা করতে হয়! কাকিমার হাত ধরে টেনে এনে খাটের পাশে বসিয়ে দিলুম। বেশ আপনজনের মতো বসেছেন। কী জানি কেন, মনে এখন আর তেমন কোনও ব্যবধান নেই। একটু আগে লজ্জা করছিল, এখন মায়া এসেছে। মমতা-মাখানো সরল মুখ, অপরূপ একটি শরীর! মাতুলের স্টুডিয়োতে সেদিন যে বাইজির দল এসেছিল তাঁদের থেকে এঁর চেহারায় কীসের কমতি! গৃহবধূ হয়ে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছেন। বেঁচে থাকার ধরনটা সাহস করে পালটে ফেলতে পারলে, রানি মহেশ্বরী। সংস্কারে আটকে আছেন।

আপনার বাপের বাড়িতে কে কে আছেন?

কেউ নেই। সব খেয়ে বসে আছি। আর থাকলেই বা কী হত। বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ি থাকে না।

এইরকম একটা মানুষকে বিয়ে করলেন কেন?

আমি করব কেন? আমার মামা করিয়ে দিলে। আমার মামা আর এর মামায় খুব আলাপ ছিল।

আপনার মামা কোথায়?

ওপারে।

এখানে আসার আগে কোথায় ছিলেন?

এর মামার বাড়িতে। এর মামার অবস্থা বেশ ভাল। একলা মানুষ। ব্যাবসাট্যাবসা আছে। ব্যায়লা বাজায়, একটু মদটদ খায়। মানুষটা খুব উদার। বড় বাড়ি।

চলে এলেন কেন?

আমি আসব কেন? উনিই চলে এলেন। বুড়োকে মারধর করে।

মারধর করে কেন?

সে অনেক ব্যাপার। নোংরা ব্যাপার। তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করবে। এতদিন পরে ওনার মনে হল, বুড়োর চরিত্র খারাপ। আর প্রথম থেকে আমাকে বলে এল, মামাকে একটু তোয়াজ করো, বুড়োর কেউ নেই, মরলে সব আমাদের। তুমিই বলো, বুড়োমানুষের কী চরিত্র খারাপ হবে! বুড়োরা তো এমনিই বুড়ো।

সে আপনি বলতে পারবেন।

আমি তো বলছি, মামাশ্বশুর দেবতার মতো মানুষ। বয়েস হয়েছে তাই বাতের রোগে ভোগেন। গা হাত পা বেশ কিছুক্ষণ টিপে না দিলে রাতে ঘুম আসত না। অ্যায় শুরু হল অশান্তি। মুখের তো কোনও বাঁধন নেই। রাগলে নালা নর্দমা। কেবলই বলে, তুমি টেপো না তোমাকে টেপে।

থাক থাক, আর শুনতে চাই না।

না, শুনে কাজ নেই। আমিও বলতুম না, যখন মারধর করে, তখন মনে হয় সত্যিই খারাপ হয়ে যাই। ওই মামাশ্বশুর আমাকে সাত ভরি সোনার গয়না করিয়ে দিয়েছিলেন, বাবু সব উড়িয়েছেন। মামার ভালটা পায়নি, মামার কাপ্তেনিটা পেয়েছে। তার অনেক আছে, তোমার কী আছে?

যাক গে, ছেড়ে দিন ওসব কথা।

ছাড়ব কেন? ছাড়ব কেন? তুমি করতে পারো, আমি বলতে পারি না। পেটে একটা বাচ্চা এল। বলে কিনা, এ কার? কে এর বাবা! কীরকম নোংরা মানুষ। সেই বাচ্চাটাকে আমার নষ্ট করিয়ে দিলে। মানুষ না জানোয়ার!

আবার কান্না এসে গেল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, জানো, আমি আর মা হতে পারব না। কেউ আর আসবে না আমাকে মা বলতে। দোষ আমার না, দোষ তোমার! এদিকে উঠতে বসতে গালাগাল দেবে, আঁটকুড়ো। জানে তো, এর কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাই ধামসে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু আপনাদের ভালবাসাও দেখেছি। সোহাগ যে করে তার শাসন করাও সাজে।

তুমি দেখেছ, তুমি বোঝোনি। স্বার্থ ছাড়া ও এক পা-ও চলে না। তুমি জানবে, ভালবাসা হিরের চেয়েও দামি। যে ভালবাসে তার চাবুকও হজম করা যায়। আমাকে কেউ কোনওদিন ভাল বাসেনি, ভাল বাসবেও না, আমি এক ক্রীতদাসী।

পাতকোতলায় দুম করে একটা শব্দ হল। কাকিমার মুখটা ছাইয়ের মতো হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সর্বনাশ! সদর খোলা ছিল নাকি? আমি তো বন্ধ করে এসেছিলুম, তা হলে!

তা হলে কী?

কখন এসে বসে আছে! হয়তো সব দেখেছে, সব শুনেছে। আজ আমায় খুন করে ফেলবে।

খুন করলেই হল! আমরা আছি না!

আমি যাই।

পায়ে পায়ে ভয়ে ভয়ে কাকিমা চলে গেলেন। বৃষ্টি সামান্য কমেছে। আকাশ ঘুলিয়ে উঠেছে। এ সেই বৃষ্টি, যা চলবে সমানে তিন দিন। মহিলা মনটা বড় বিষণ্ণ করে দিয়ে গেলেন। পৃথিবীতে জানোয়ারের সংখ্যা এত বাড়ছে কেন! কিছু হান্টারওয়ালি জন্মালে বেশ হয়। চাবকে সব ঠান্ডা করে দেবে।

কাকিমার গলা শোনা গেল, পিন্টু, শিগগির এসো, শিগগির এসো।

কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে কাকিমা চিৎকার করছেন, আর জলে ভিজছেন। দোতলার বারান্দা থেকে মুখ বের করে বললুম, কী হয়েছে!

ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে। টিনের চালে অবিরাম বেজে চলেছে জলতরঙ্গ। নল বেয়ে জল বইছে দুধের ধারায়। প্রকৃতির অঝোর শব্দে মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি-ভেজা মুখ তুলে কাকিমা বললেন, নেমে এসো না। দেখে যাও আকাশ ভেঙে কী পড়েছে!

উঠোনে চিত হয়ে কী একটা পড়ে আছে। পাথর নয়। সরার মতো কী এক প্রাণী। মাছ বৃষ্টি হয়, আগুন বৃষ্টি হয়, এ আবার কী বস্তু রে বাবা! নড়েও না, চড়েও না অথচ ঠাসা মাল।

আমার পাশে হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকে পড়ে কাকিমা বললেন, কী বলো তো!

ঠাকুর, আমাকে রক্ষা করো। এ মহিলার লজ্জাশরম বড় কম। বেহুঁশ উদাসী। শরীর ভিজে জাব। চুল ভেঙে পড়েছে পিঠে। দেহভঙ্গি তেমন ভাল নয়। আমি বস্তু দেখব, না মানবী দেখব! তুমিই আমাকে বলে দাও। আমি এক যুবক। শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে। দেহে রক্তস্রোত বইছে। কোনওরকমে বললুম, কী বলুন তো! ঠিক বুঝতে পারছি না। অনেকটা কচ্ছপের মতো।

ঠিক ধরেছ। কচ্ছপই। উলটে পড়ে আছে। শরীরটা ভিতরে ঢুকে আছে। কোত্থেকে এল বলো তো!

আকাশ থেকে কচ্ছপ পড়বে কী করে?

তাই তো অবাক হচ্ছি।

আমার মনে হয় পাতকো থেকে এসেছে।

কুয়োয় কচ্ছপ আসবে কী করে?

আমাদের কুয়োর সঙ্গে গঙ্গার যোগ আছে।

হ্যাঃ!

হ্যাঃ নয়। সত্যিই আছে। দেখবেন চলুন।

সাঁওতাল রমণীদের মতো হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কাকিমা কুয়োর পাড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। আদুড় পিঠে ভিজে এলো চুল, এপাশে ওপাশে লাল সোঁটা দাগ। তবলচি কাকার সোহাগের তেহাই।

কই, কোথায় তোমার গঙ্গা?

ওই দেখুন, পাতকোর মাঝখানে সুড়ঙ্গের মুখ। হুহু করে জল আসছে।

বাঃ, কী মজা, কী মজা! এখুনি বড় বড় মাছ আসবে।

কাকিমা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। ভিজে নার্গিসের মতো দেখাচ্ছে।

তুমি আচ্ছা বোকা! জামাকাপড় পরে ভিজছ। সব খুলে ফেলো।

না, না, সব খুলব কী?

আরে দুর, আন্ডারওয়ার আর গামছা পরে এসো। বিকেলের গা ধোয়া বৃষ্টির জলেই হয়ে যাক। আমার গান গাইতে ইচ্ছে করছে। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না।

বাঃ বেশ সুরেলা গলা। বৃষ্টিতে সংসারের মলিনতা ধুয়ে গেছে। দুঃখ ভেসে গেছে। আসল মানুষটি ক্ষণিকের জন্যে বেরিয়ে পড়েছে বৃষ্টি-ভেজা উঠোনে। চারপাশে তোড়ে জল পড়ছে ছাদের নল থেকে। কলকল শব্দে জল খেলছে চারপাশে।

দাঁড়াও কচ্ছপটাকে বালতিতে তুলি।

তুলে কী করবেন?

পুষব।

যদি কামড়ায়, মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না।

মেঘ তো অনবরতই ডাকছে।

বালতি এসে গেল। মহিলার অসম্ভব সাহস। দু'পাশ থেকে দু'হাতে ধরে কচ্ছপটাকে ঝপাং করে বালতিতে ফেলে দিলেন। তোলামাত্রই কচ্ছপটার লম্বা গলা, আর চারটে পা বেরিয়ে পড়ল। ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। শব্দ শুনে আবার চোখ খুললুম।

কাকিমা খিলখিল করে হাসছেন আর বলছেন, তুমি কী ভিতু, তুমি কী ভিতু!

তুই নেই বলে ওরে উন্মাদ
পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ

কোনওকালে আমাদের বাড়িতে গোরু ছিল না; কিন্তু জাবনা দেবার একটা কাঠের পাত্র ছিল। আমাদের এইরকম অনেক কিছুই আছে। মাল আছে মালিক নেই। ভাব আছে ভাবী নেই? শাড়ি আছে, গহনা আছে, রমণী নেই। রান্নাঘর আছে রাঁধুনি নেই।

সেই কেঠোটি এখন শোবার ঘরে খাটের পাশে চলে এসেছে। ভেতরে গরম জল গোলাপি ধোঁয়া ছাড়ছে। পাশে একটা বালতিতে ঠান্ডা জল, মগ ভাসছে দুলে দুলে। আধ হাত ওপরে পিতার চরণদ্বয় ঝুলছে। ফুটবাথের প্রস্তুতি। মাথায় দু'পুরু ভিজে তোয়ালে। ঘড়ির শেষ শব্দ এইমাত্র বাতাসে মিলিয়েছে। এগারোটা বাজল। মেঘলা আকাশের তলায়, বৃষ্টি-ভেজা পথে রাত এগিয়ে চলেছে মধ্যযামের দিকে। বৃষ্টির বিরাম নেই। ঝোড়ো বাতাসে বন্ধ জানলা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

পায়ের পাতা গরম জল স্পর্শ করেই ছোঁ-মারা চিলের মতো ওপরে উঠে গেল। পিতা বললেন, মাই গড, ঢালো এক মগ ঠান্ডা জল।

আগেও কয়েক মগ ঢেলেছি। জল কিছুতেই সহনীয় উত্তাপে নামতে চাইছে না। পাদস্পর্শ সম্ভব হলেও পদকেলির সুযোগ মিলছে না। ছোবল-মারা উত্তাপ। চাদরের ঝোলা অংশটা হঠাৎ তুলে ধরে বললেন, একী, কোথা থেকে রক্ত এল? হাত কেটেছে বুঝি? বঁটিতে পেয়ারা কাটতে গিয়েছিলে?

পা দুটো ওপরে তোলা ছিল। কথা বলতে বলতে খেয়াল নেই। জলে পা পড়ে গেল। উহু উহু করে পা তুলে নিলেন। বললেন, জল একবার গরম হলে আর ঠান্ডা হতে চায় না। কতটা কেটেছে?

ওটা রক্তের দাগ নয়, আয়োডিন।

হাত কাটেনি তো আইডিন নিয়ে কী করছিলে? এমব্রয়ডারি! চাদরটা দাগরাজি করে দিলে।

পা আবার ধীরে ধীরে জলের দিকে নামছে। এখুনি ছ্যাঁকা লেগে যাবে। সাবধান সাবধান বলে একটু জোরে চিৎকার করে ফেলেছি।

ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছ কেন?

আজ্ঞে না।

আরও দু'মগ জল ঢালো। হট বাথের চেয়ে কোলড বাথই ভাল। ধৈর্য থাকে না।

আজ মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। জল ভেঙে হেঁটে বাড়ি ফিরেছেন। দু'মগ জল ঢাললুম। পা এবার ডুবেছে। কিছুক্ষণ পরেই খলবল খলবল করে শব্দ হবে। জলে এক তোলার মতো নুন পড়েছে। এবার একটু সুস্থ হয়ে বসতে পেরেছেন। দু'পাশে দুটি হাত। মাথায় ভিজে তোয়ালে। ব্যাং ডাকছে। বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের

শব্দ। প্রকৃতির জলসাঘরে বসে আছি। চাদরে আবার একটা কী খুঁজে পেয়েছেন। দু'আঙুলে ধরে ওপর দিকে টেনে তুলছেন। উঠছে উঠছে। কী রে বাবা! লম্বা চুল। আলো আর চোখের মাঝখানে চুলটাকে দু'আঙুলে ঝুলিয়ে বললেন, একী? চাদরে মেয়েদের চুল। আশ্চর্য? সামথিং ফানি।

এ যেন ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া হচ্ছে। ওইরকম গোটাকতক চুল পেলেও আশ্চর্য হব না। পিতা বললেন, আইডিন, এলোচুল, মানুষ খুন করেছ নাকি?

আজ্ঞে না! কাকাবাবু কাকিমাকে চাবুক মেরেছেন।

চাবুক মেরেছে? কেন, লটারি পেয়েছে নাকি?

আজ্ঞে?

লটারি পেয়ে জমিদার-বাচ্চা হয়েছে?

না, সেরকম তো কিছু দেখলুম না। তা ছাড়া লটারি পেলে মানুষ তো হাসতে হাসতে মরে যায় শুনেছি।

তা হলে চাবুক মারার জমিদারি শখ হল কেন?

তা তো জানি না। তবে কাকিমা এসেছিলেন, পিঠ দু'ফাঁক, ডায়াগোনালি মেরেছেন।

তুমি সেই পিঠে আইডিন লাগালে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ বেশ। তিনি এই বিছানায় বসলেন, তুমি লাগালে, তিনি শুয়ে পড়লেন, সারা চাদরে আইডিন আর লম্বা লম্বা চুল। জানো, এটা ব্যাচেলারদের বিছানা। বিছানা কত পবিত্র জানো? জানো বিছানা হল সাধনার পীঠস্থান! তান্ত্রিকের পঞ্চমুণ্ডী আসনের মতো।

আজ্ঞে হ্যাঁ জানি। তবে আপনি যদি দেখতেন, আপনিও কাতর হতেন। সে এক পাশবিক ব্যাপার।

পৃথিবীটাই তো পাশবিক। মানুষ এখানে আসে শাস্তি পেতে, সাফার করতে। নারী নির্যাতন এদেশে কোনও নতুন ঘটনা নয়।

আপনার কিছু বলা উচিত।

আমি বলব অন্যভাবে। আমার নীতি হল, টিট ফর ট্যাট। ওকে ঘুম থেকে টেনে তুলে স্কেল দিয়ে মেপে, সমান মাপের একটি ক্ষত তৈরি করে দোব।

সেটা কি ঠিক হবে?

তুমি কী করতে বলো?

আমার সেই ঘটনাটা মনে পড়ছে। সেই ভুজাওয়ালা!

ওঃ হোঃ আমাদের বাড়ির সামনের সেই উৎপাত!

আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত বারোটার সময় স্ত্রীকে ধরে পেটাচ্ছিল, আপনি যেই স্বামীটাকে তেড়ে গেলেন পেটবার জন্যে স্ত্রী অমনি ঝ্যাঁটা নিয়ে আপনাকে তেড়ে এল। মনে পড়ছে?

হুঁ, পড়ছে। মার যে সোহাগ বুঝতে পারিনি। তোমার কি মনে হয় এটাও সেম কেস।

তা বলতে পারব না, তবে কাকিমা কেঁদে কেঁদে বলছিলেন, একটু বিষ পেলে জীবনযন্ত্রণা জুড়োতেন।

হ্যাঃ, তুমিও যেমন, জীবনযন্ত্রণা জুড়োতেন। এদেশের মেয়েরা প্রতি মুহূর্তে আত্মহত্যার চিন্তা করে। সেই চিন্তা নিয়েই সুখে শেষ জীবন পর্যন্ত সংসারের জোয়াল ঠেলে। মৃত্যুর কথা ভাবা যায়, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া যায় না।

তা হলে এ নিয়ে আর রাগারাগি না করাই ভাল।

তুমি কিন্তু ডেঞ্জার জোনে চলে গেছ।

ডেঞ্জার জোন?

তোমার তো ষোলো হয়ে গেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বহুদিন আগে।

তা হলে খোলাখুলি বলা চলে, কী বলো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুত্র মিত্র, কী যেন বলে?

পা দুটো জলে খলবল করে উঠল। কোন দিকে মোড় নেবেন বুঝতে পারছি না। গভীর প্রদেশে চলে যাবেন নাকি? যেখানে জীব জগতের প্লাস আর মাইনাস ফ্যাক্টর অনবরত দাঁড়কাকের মতো শুকনো ডালে বসে খাখা করছে। নীরবতা ভঙ্গ হল। পদকেলি শান্ত।

বুঝলে, মানুষের একটা বয়েস আসে, যে-বয়েসটাকে বলে পিউবার্টি। তোমার গলার স্বর কত পালটে গেছে লক্ষ করেছ। তোমার ভেতরেই, তোমার অজান্তেই একজন পুরুষ বাসা বেঁধেছে। সেই পুরুষের অনেক চাহিদা আছে। বুঝতে পারো কিছু?

আজ্ঞে না, তেমন তো কিছু বুঝি না।

হয় তুমি অসুস্থ, না হয় তুমি মিথ্যেবাদী।

মিথ্যেবাদী শব্দটা সহ্য করতে পারি না। মাথায় আগুন জ্বলে যায়। আমি মিথ্যে কথা বলছি! পুরুষের ভেতর তো পুরুষই থাকবে। মেয়েছেলে থাকতে যাবে কোন আক্কেলে। মেয়েলি পুরুষকে তো লোকে গালাগালিই দেয়। বলে এফিমিনেট লৌন্ডা। তা হলে প্রতিবাদ করা উচিত।

মিথ্যেবাদী বলছেন কেন? আমি তো কোনও মিথ্যে বলিনি। আমার গলা যখন সরু থেকে মোটা হল, তখন আপনি বয়সা লেগেছে বয়সা লেগেছে বলে দিনকতক এমন কাণ্ড করলেন, মনে হল আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। মুখে একটা ব্রণ বেরিয়েছিল, সেই দেখে সাত দিন ভাল করে কথা বলেননি। প্রায় ত্যাজ্য পুত্র করে দেবার মতো অবস্থা। আজ বলছেন মিথ্যেবাদী। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

শোনো, শোনো মাই ডিয়ার সান, বাক্য দিয়ে, আবেগ দিয়ে সত্য চাপা যায় না। তোমার এই বয়েসটা আমিও পেরিয়ে এসেছি। কাম বলে একটা জিনিস আছে, জানো কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি।

শোনোনি, অনুভব করেছ। তুমি তো মানবপুত্র। যে-কোনও সুস্থ মানুষ জীবনের অসংখ্য মুহূর্তে ওই আবেগে বিচলিত হয়। দেবতারাও মুক্ত ছিলেন না। আমাদের শাস্ত্রকাররা বড় প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন। যৌবনেই তাঁরা বিবাহের বিধান দিয়েছিলেন। আমাদের অর্থনীতি পারমিট করে না বলেই, সাকার হয়ে সংসারী হতে হয়। অনেকে প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করে, যখন বিবাহের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। ইংরেজিতে একটা

কথা আছে— Early marriage late orphan, late marriage early orphan. আমি তোমাকে একটা স্বাভাবিক চ্যানেলে ফেলে দিতে চাই। পজেটিভ লাইফ।

তার মানে? এখন কি আমার নেগেটিভ লাইফ!

দেখো বাপু, আমার মুখটা বড় আলগা। অবশ্য ভালগার নই। জীবন আমার কাছে জীবন। কোদাল আমার কাছে কোদাল। চাঁদ আমার কাছে চাঁদ, পৃথিবীর মৃত উপগ্রহ, প্রেয়সীর মুখ নয়। কিছুদিন আগে, তোমার মনে আছে নিশ্চয়, এ পাড়ার মানুষ এক হুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। মাঝরাতে পাঁচিলে পাঁচিলে ওঁআউ ওঁআউ করে ডাকত। আমি চাই না, তুমি চাঁদনিরাতের কামতাড়িত হুলো হয়ে যাও।

নাঃ, আর বসে থাকা যায় না। অসহ্য আক্রমণ। একেই বলে হিটিং বিলো দি বেল্ট। সামনে থেকে সরে যাই। মুখে মুখে তর্ক করে লাভ নেই। ব্যাপারটা থিতিয়ে যাক।

চললে কোথায়? আমার সামনে থেকে পালালে, নিজের কাছ থেকে পালাতে পারবে? পারবে না। ধৈর্য ধরে বোসো। আমার চেয়ে ভাল বন্ধু পাবে না, আমার চেয়ে ভাল উপদেষ্টা পাবে না। তোমার শুরু আমার শেষ। যাবার আগে তোমার মা বলেছিলেন, খোকা রইল, তুমি দেখো। তোমাকে আমি তুলোয়-রাখা আঙুরের মতো মানুষ করেছি। অস্বীকার করতে পারো?

আজ্ঞে না।

তোমার চেয়ে জীবনকে আমি অনেক বেশি চিনি। অস্বীকার করতে পারো?

আজ্ঞে না।

আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি পোড়-খাওয়া মানুষ। কোনও সন্দেহ আছে?

আজ্ঞে না।

তা হলে শোনো, যুদ্ধ দুর্গে বসেই করা ভাল।

কীসের যুদ্ধ?

ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অনবরতই মানুষের যে যুদ্ধ চলেছে, হারছে, জিতছে, উঠছে, পড়ছে, সেই অদৃশ্য যুদ্ধ সংসার দুর্গে বসে করাটাই হল গৃহীর ধর্ম। শক্তির আঁচলে বেশ করে নিজেকে বাঁধো, বেঁধে তাল ঠুকে বলো, কে আসবি আয়।

আপনি ধ্যান, জপ, দীক্ষা, এইসবের কথা বলছেন?

মনে হয় না। আধার ঠিক না হলে, ও সব হল ফাঁকি। মুখে বলি হরি, কাজে অন্য করি। মন্দিরে যার মাধব আছে তারই শাঁক ফোঁকা চলে। তোমাকে আমি সংসারী করব।

তার মানে?

চাকরিটা তোমার হচ্ছে, জানো বোধহয়।

আজ্ঞে না, হচ্ছে? আপনি কীভাবে জানলেন?

যে ভাবেই জানি, তোমার হচ্ছে। দু'-একদিনের মধ্যেই চিঠি পাচ্ছ। সামনের ফাল্গুনেই তোমার আমি বিয়ে দেব। পাত্রী ঠিক করে ফেলেছি।

ইমপসিবল। হতেই পারে না।

ইমপসিবল কেন? তুমি নিজে কি কোথাও ঠিক করে বসে আছ?

নিজে ঠিক করব কেন? আমি কি বিয়ে-পাগলা!

বলা যায় না, এখন তো প্রেম আর আত্মহত্যার একটা হিড়িক পড়েছে। সেই বাতাসে তুমিও উতলা!

আজ্ঞে না। বিয়ে একটা থার্ড ক্লাস নোংরা ব্যাপার।

তাই নাকি! তা হলে আমরা খুব অন্যায় করে ফেলেছিলুম বলো! তোমার মায়ের সঙ্গে একটা থার্ড ক্লাস অ্যাফেয়ারে জড়িয়ে পড়ে, তোমার মতো একজন ফাস ক্লাস মহামানব লাভ করেছি!

আমি সে কথা বলিনি। আমার মত আলাদা, পথ আলাদা। সংসারে একজন সন্ন্যাসী হলে চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়। আমি সংসারের পাঁকে ডুবতে চাই না।

সন্ন্যাসী তুমি হতে পারবে না।

আলবাত পারব।

আমি লিখে দিচ্ছি তুমি পারবে না। সে গাছ আলাদা, সে ফল আলাদা, সে মাটি আলাদা। তুমি তো এই গাছের ফল। আমার ভেতরটা দেখো। সাংসারিক বুদ্ধিতে জবজবে, বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটাও নেই। এখনও ভাদুয়া ঘিয়ে ভাজা ফুলকো ফুলকো লুচির লোভ গেল না। শীতের প্রথম বেগুনভাজার জন্যে প্রাণ আঁকুপাঁকু করে। ঈশ্বরে ছিটেফোঁটাও বিশ্বাস নেই। আমি বুঝি কর্ম। কর্মেই মুক্তি, কর্মেই সিদ্ধি। তুমি তো খুব কথামৃত পড়ো, ঠাকুরের সেই কথাটা মনে পড়ে?

কোন কথা?

সেই যে সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে, কিন্তু যেমন তেতো, তেমনি তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে-গাছে লাগে, সব চন্দন হয়ে যায়। কিন্তু শিমুল, অশ্বত্থ, আমড়া এরা চন্দন হয় না। কেউ কেউ সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্যে। সাধুরা গাঁজা খায় কিনা তাই তাদের কাছে এসে বসে গাঁজা সেজে দেয় আর প্রসাদ পায়।

আপনি যাই বলুন, বিয়ে আমি করব না। নারী নরকস্য দ্বার।

বাঃ, তোতাপাখির মতো বেশ কপচাতে শিখেছ তো! নারী যে শক্তি তা কি জানো? তোমার অস্ত্রেই তোমাকে কাত করে দিই। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, বিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে, আবার অবিদ্যারূপিণী স্ত্রীও আছে। বিদ্যারূপিণী স্ত্রী ভগবানের দিকে নিয়ে যায়, আর অবিদ্যারূপিণী ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। আমি যাঁর হাতে তোমাকে তুলে দিচ্ছি, তিনি হলেন বিদ্যারূপিণী। তাঁর পাশে তুমি এক মর্কট।

তা হলে, জেনেশুনে আপনি বিদ্যার গলায় একটি মর্কট ঝোলাতে চাইছেন কেন?

যদি তুমি একটু মানুষ হও। তোমার এই উড়ুউড়ু, পাখি-পাখি ভাবটা কেটে গিয়ে, যদি একটু দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হতে পারো।

মানুষ হবার জন্যে মানুষ গুরুর কাছে যায়, সুন্দরী স্ত্রীর কাছে যায় না।

টেবিলের ওপর থেকে ওই খামটা নিয়ে এসো।

খাম থেকে সেই বর্ষণসিক্ত মধ্যরাতে অর্ধমাপের একটি ছবি বেরিয়ে পড়ল। ফুটবাথের জল শীতল হয়ে গেছে। তবু পা ডুবে আছে। এই মানুষটি দিনরাতের হিসেব তেমন গ্রাহ্য করেন না। কত রাত জেগে কাটিয়েছেন! কত রাতে এসরাজ বেজে গেছে দরবারির কোমল মোচড়ে।

এদিকে এগিয়ে এসো। অবাধ্য হোয়ো না। বসন্ত আসছে। এ সংসারে আমরা বড় রুক্ষ হয়ে আছি। আমাদের চিন্তাভাবনা বড় বাউন্ডুলে হয়ে গেছে। একটু সবুজ হতে হবে। জীবনের কথা কেউ বলতে পারে! আজ আমি আছি, কাল হয়তো থাকব না। কে বলতে পারে, ঘরের ওই কোণে মৃত্যু হয়তো এসে বসে আছে। ঘড়ি দেখছে, ক্যালেন্ডার দেখছে। তুমিও জানো না, আমিও জানি না। ছবিটা একবার দেখে যাও। আমার বন্ধুর মেয়ে। ঈশ্বর কত বড় স্রষ্টা একবার দেখে যাও! আমি অবশ্য ঈশ্বর মানি না।

পিতার ভাবাবেগ অঝোর বর্ষণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। পুত্রের সঙ্গে কোন পিতা এমন খোলাখুলি কথা বলতে পারেন! মিথ্যে বলব না, বন্ধুকন্যা অপরূপা। কুমোরটুলিতে অর্ডার দিয়ে তৈরি। রবিবর্মার পৌরাণিক ছবির নারীমূর্তির মতো। তেমনভাবে তাকাতে পারছি না। ফিচিক ফিচিক করে চোরাচাহুনিতে যতটুকু দেখা যায়।

পিতা বললেন, তুমি হেরে গেলে। তোমার বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

কেন?

তুমি সোজাসুজি তাকাতে পারছ না। তুমি সংকুচিত। তোমার মধ্যে প্রেমও নেই ভক্তিও নেই। ও দুটো না থাকলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। প্রেমার্পণ সম দরশন জগজন-দুঃখ যায়। শঙ্করের মাথা চৈতন্যের হৃদয় চাই। জানি এখুনি তুমি প্রতিবাদ করবে। তোমার মধ্যে শিশুর সরলতা থাকলে এদিকে তাকাতে অমন ইতস্তত করতে না। হৃদি বৃন্দাবনে বাস যদি করো কমলাপতি/ওহে ভক্তিপ্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধাসতী, মুক্তিকামনা আমারই হবে বৃন্দে গোপনারী/দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতী॥

প্রায় সংগীতের মতো করে পিতা চরণকটি উচ্চারণ করলেন। পা দুটো জল থেকে উঠে এসে আপাতত তোয়ালের আশ্রয়ে। ছবিটা বিছানায় চিত হয়ে পড়ে আছে। পিতার পাশে কন্যার মতো। চোখ পড়লেই মনে হচ্ছে সেই অন্তরালবর্তিনী হেসে উঠছে। নাকে মনে হয় ছোট্ট একটি হিরের ফুল। সাদাকালো ছবিতেও চিকিরমিকির করছে। বেশ স্নেহের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আগামী জীবনের সুন্দর একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছি, এখন তুমি যদি না বানচাল করে দাও। এই জরাজীর্ণ বাড়িটা আমি এবার বেচে দেব। এর দেয়ালে দেয়ালে জীবনের বিষণ্ণ স্মৃতি। আর একটু নিরিবিলি দিকে সরে গিয়ে বিঘেখানেক জমি কিনব। সেই জমিতে ছোট্ট একটা কটেজ টাইপ বাড়ি করব। চারপাশে বাগান করব নিজের হাতে। স্থলপদ্ম, টিকোমা জেসমিন, সবরকমের করবী, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, গুলমোহর, জবা, টগর, গোলাপের ফোয়ারা ছোটাব। চটিটা একটু এগিয়ে দাও তো, উঠে দাঁড়াই।

চটিজোড়া খাটের পাশে এগিয়ে দিতে গিয়ে মেঝে থেকে আর একটি মেয়েলি জিনিস আবিষ্কার করলুম, মুখখোলা সেফটিপিন। সর্বনাশ! পায়ে ফুটলে হয়েছিল আর কী! সাধে কি মেয়েরা কাছাখোলা।

ঘরে পায়চারি করতে করতে পিতা বলতে লাগলেন, বাথরুমটা করব বেশ বড়। দেয়াল, মেঝে সব মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধাব। বিরাট একটা বাথটব বসাব। শাওয়ার থাকবে। তোমার মা খুব চান করতে ভালবাসত। খুব

শখ ছিল এইরকম একটা বাথরুমের। এই বাথরুম আমি উৎসর্গ করব আমার পুত্রবধূকে। একে বলে হামাম। দুটো হলঘর হবে। একটায় বসবে জলসা, আর একটা হবে লাইব্রেরি। বাগানে থাকবে গার্ডেন লাইট আর ফোয়ারা। যুদ্ধে আমার জীবন হয়ে গেছে পোড়ামাটি। তোমার জীবন আমি ভরে দোব। ফুলের মতো একটি নাতি আর একটি নাতনি। নাতিকে আমি নিজে হাতে তৈরি করব। বিরাট ম্যাথেমেটিশিয়ান, এ গ্রেট র‍্যাংলার। নাতনিকে করব ডাক্তার, এ লেডি উইথ দি ল্যাম্প। তোমার মনে নেই, আমাদের একটা কুকুর ছিল। তার নাম ছিল জিম। নিউফাউন্ডল্যান্ড ডগ। মেজদা মারা গেল, সাত দিনের দিন মারা গেল জিম। ওইরকম একটা কুকুর পুষব। যারা চলে গেছে তাদের আর ফেরাতে পারব না। তা না পারি, নতুন হাট তো বসাতে পারি। এক কূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে আকুলে সাজায়। লেট আস হ্যাভ সাম মিউজিক।

ঘরের কোণে টেবিলের ওপর পরিপাটি করে রাখা দম দেওয়া গ্রামাফোন, এত বড় তার চোঙা। দম দেবার হাতলটা ভারী সুন্দর। কুকুর-মার্কা ছোট্ট কৌটো থেকে পিন বেরোল। ঘরঘর করে দম দিলেন বারকতক। বাইরে বৃষ্টি ভেতরে সংগীত। শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়।

পেছনে হাত জোড় করে ঘরে পায়চারি করছেন। ঘড়ির পেন্ডুলাম ঠকাস ঠকাস করছে। জ্ঞান গোস্বামীর গলায় গানের সুর তিরের ফলার মতো বিঁধছে□— তুই নেই বলে ওরে উন্মাদ, পাণ্ডুর হল আকাশের চাঁদ।

ঘরের মাঝখানে থেমে পড়ে পিতা বললেন, মেয়েটির নাম অপর্ণা। আমি তাকে এই এতটুকু দেখেছি। তোমার মায়ের চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। শুধু সুন্দরী নয়, সুশিক্ষিতা। লেটার নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট করেছে। সামনের বার ফিলসফিতে অনার্স নিয়ে বি এ দেবে। বি এ-র আগেই বিয়ে, তারপর এম এ করাব। তোমরা সুখী হও।

গানের শেষ চরণ বাজছে, শূন্য এ বুকে পাখি মোর, আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়। খটাস আওয়াজ করে রেকর্ডের ওপর থেকে হাতলটা সরে গেল একপাশে। এবার শুধু বৃষ্টির শব্দ, হাওয়ার ওঠাপড়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিতা দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। বুক কেঁপে উঠল। এ বাড়িতে অল্পবিস্তর অশরীরীদের আনাগোনা আছে। এই ঝড়ের রাতে কেউ অভিসারে এলেন নাকি! চৌকাট টপকে সরার মতো কী একটা বস্তু মেঝেতে ঠকাস করে উলটে পড়ল।

ইনি আবার কে এলেন, এই মাঝরাতে?

আজ্ঞে ওটা একটা কচ্ছপ।

কচ্ছপ? কচ্ছপ কোথা থেকে এল? দেখো দেখো, এরপর হয়তো একটা গজ এসে ঢুকবে।

আজ্ঞে না, গজ মনে হয় আসবে না। কচ্ছপ আজ দুপুরে পাতকো থেকে উঠেছে।

সেকী?

মনে হয় সুড়ঙ্গপথে গঙ্গা থেকে এসেছে। নীচে ছিল বালতিতে চোবানো, ওপরে উঠে এসেছে।

বলো কী? অত্যন্ত শুভলক্ষণ। ভবিষ্যতের চিন্তা করতে-না-করতেই প্রাপ্তিযোগ। ইনি পুরুষ না মহিলা?

তা তো জানি না।

এর একটা নাম রাখতে হয়। কী নাম রাখা যায়!

বলাই।

বলাই। নট ব্যাড। বলাইবাবু। ওটাকে আমি পুষব। আপাতত আজ রাতের মতো এই বালতিতে থাক। আপ মাই বয়, আপ।

দেখবেন, কামড়ে না দেয়!

কামড়াবে কেন?

দু'হাতে তুলে বালতিতে বলাইবাবুকে ফেলা হল। সলিলশয্যায় বলাই ভাসতে লাগল। পিতা একটি রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ড চাপালেন। পঙ্কজ মল্লিক। কেন বাজাও কাঁকন কনকন। বড় ডেকচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে বললেন, পাঁজিটা একবার দাও। ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পারো।

সিঁড়িতে এবার স্পষ্ট পায়ের শব্দ। পিতা শুনতে পাননি। পাঁজি নিয়ে ব্যস্ত। শব্দটা খুবই চেনা। দরজার মুখে প্রফুল্লকাকা, ভাই হরি!

পিতা মুখ না তুলে গম্ভীর গলায় বললেন, গেট আউট।

সেভ মি হরি। ওয়াইফ ফিভার। স্পিকিং ডিলিরিয়াম।

পিতা মুখ তুললেন, আর একটু ধরে পেটাও না রাসকেল।

রাগের মাথায় অন্যায় করে ফেলেছি ভাই। এই আমি কান ধরে ওঠবোস করছি।

কান ধরে সত্যিই ওঠবোস শুরু করলেন ভদ্রলোক। আর ঠিক সেইসময় বলাইবাবু মেঝেতে উলটে পড়লেন।

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি

বলাইবাবু খুব পোষ মেনে গেছে। পিতা তার পিঠ পালিশ করে দিয়েছেন। এমন পরিচ্ছন্ন কচ্ছপ জীবজগতে আর দুটি নেই। সারা বাড়িতে ইচ্ছেমতো পায়চারি করে বেড়ায়। খাদ্য পুঁইশাক, কুটনোর খোসা, আলু, কলা। চুকচুক করে দুধ খেতে শিখেছে। আগের মতো আর কথায় কথায় খোলে ঢুকে পড়ে না। গলা বের করে পৃথিবী দেখে। তবলার শব্দে চঞ্চল হয়।

রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় বলাই ঘুরছে। পিতা ডাকছেন, বলাই আয়, একটু চা খেয়ে যা। নীচে প্রফুল্লকাকা কাপড় থোবার তালে তালে গাইছেন, লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছে হায়।

সামনের রাস্তায় গাড়ি থামার শব্দ হল। মনে হয় মাতুল এলেন। এতদিনে সিনেমা নিশ্চয় অনেকটা এগিয়ে গেছে। গম্ভীর গলায় ডাক শোনা গেল, হরিদা আছেন, হরিদা।

দীর্ঘকাল পরে মেসোমশাই এলেন। নিশ্চয় মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এলেন! এমাসে কি বিয়ের দিন আছে! যে জানে সে জানে। আসুন আসুন, বলে পিতা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বলাইবাবু প্লেট থেকে চেটে চেটে চা খাচ্ছে।

মেসোমশাইকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছে। ভেবেছিলুম পেছন পেছন প্রতাপ রায় উঠে আসবেন। না, মেসোমশাই একা। গাড়িটা অবশ্য প্রতাপ রায়ের। ড্রাইভার চালিয়ে এনেছে। বসার ঘরের চেয়ারে বসে মেসোমশাই চারপাশ একবার ভাল করে দেখে নিয়ে, কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগেই বললেন, বড় দুঃসংবাদ।

পিতা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কেন, কী হয়েছে? মেয়েরা ভাল আছে তো!

মেয়েদের মধ্যে ছোট মেয়ে ভালই আছে, পরীক্ষাও ভাল দিয়েছে, তবে বড় মেয়েটা নেই।

নেই মানে? পিতা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন। আমার বুকের মধ্যে কেমন করছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কনক মারা গেছে! সে কী করে হয়?

হরিদা, কনক নিরুদ্দেশ, কনককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তা কী করে হয়! ছেলেরা হিরো হবার জন্যে বাপের পকেট কেটে বোম্বে পালায়। মেয়ে পালায়, আমি বিশ্বাস করি না। কনক সেরকম মেয়েই নয়। আপনারা ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?

কোথাও বাকি নেই। নো স্টোন লেফট আনটার্নড। সব জায়গা দেখেছি। হাসপাতালে, মর্গে, শ্মশানে। থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। কোনও খবর নেই। কনক এখানে আসেনি তো!

এখানে? এখানে এলে তো আপনাকে আগেই বলতুম।

সেইটাই তো উচিত! তবে মানুষ তো অনেক সময় অনেক কিছু চেপে যায়!

বাঃ বাঃ, বেশ বললেন যা হোক। চেপে রাখার পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকবে নিশ্চয়ই। এখানে আমার উদ্দেশ্যটা কী!

আপনাদের দিকে কনকের একটা টান দিনদিন বাড়ছিল। তার ওপর আমি প্রায় জোর করেই তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতাপের সঙ্গে ম্যারেজ ফাইন্যালাইজ করে ফেলেছি। এই অবস্থায় সে কোথায় যেতে পারে! লজিক বলে, এখানেই আসা উচিত।

আপনার লজিকের নিকুচি করেছে! এমন ফাদার আমি জীবনে দেখিনি। পুরো ঘটনাটা বলুন।

আপনার ছেলে এখানে আছে তো?

দরজা দিয়ে উঁকি মেরে একটু আগে কে দেখে গেল?

হ্যাঁ, মনে হল তাই; কিন্তু সাহস করে ঘরে আসছে না কেন? ও মহলে কেউ নেই তো!

পুলিশের কাছ থেকে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করে তা হলে বাড়ি সার্চ করান।

না, সেটা তো হয়ে গেল শেষ কথা, তার আগে দেখতে হবে, একটা অ্যামিকেব্‌ল সেটলমেন্টে আসা যায় কি না!

না আসা যায় না, আপনার মতো একটা ক্রুকেড লোকের সঙ্গে কোনও সেটলমেন্ট চলে না।

হ্যাঁ, তা তো বলবেন। মেয়ের বাপ হলে বুঝতেন কী জ্বালা!

মেসোমশাই হাঁক পাড়লেন, কনক, কনক, আমি এসেছি, কাল থেকে প্রতাপ তোর জন্যে না খেয়ে আছে মা।

আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যান সারাবাড়ি তন্নতন্ন করে দেখে আসুন।

মেসোমশাই লাফিয়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলেন, ওটা কী?

সামনেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। মেয়ে হারিয়ে গেল তবু জীবনের ভয় গেল না। অতবড় একটা মানুষ, সামান্য একটা কচ্ছপ দেখে আঁতকে উঠলেন। বললুম, চলে আসুন, ভয় নেই, ওটা একটা কচ্ছপ!

কচ্ছপ! ছি ছি, অযাত্রা। তোমরা কচ্ছপ খাও নাকি!

ওটা খাবার নয়, আমরা পুষেছি।

কচ্ছপ আবার কেউ পোষে নাকি? যাক তোমাদের ব্যাপার, আমার নাক গলিয়ে দরকার কী! তা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কনক কি সত্যিই এই বাড়িতে নেই!

আপনি নিজে দেখুন না। সব ঘুরে দেখে আসুন।

মেসোমশাই আবার লাফিয়ে উঠলেন, ওই তো কনকের গলা। নীচে লুকিয়ে আছে।

সিঁড়ির দিকে দৌড়োলেন। কাকিমার গলা। নিজের মেয়ের গলা চেনেন না! বাধা না পেলে এখুনি হুড়মুড় করে নীচে ছুটতেন। ও কনকের গলা নয়। বারান্দা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

ও বাবা, ইনি আবার কে?

বাবার বন্ধুর স্ত্রী।

হরিদার স্বভাবই হল যত উড়ো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। তা পড়ুন। আমার তাতে কী! কনক নীচে নেই তো!

আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। কনক এখানে আসেনি।

চুপ করো ডেঁপো ছেলে, আমার মেয়ের মাথাটি তুমিই খেয়েছ। প্রেম কাকে বলে সে জানত! প্রেম আবার কী? প্রেম! রাধাকেষ্ট পালা।

ঘর থেকে পিতা সাবধান করলেন, তুমি চলে এসো। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ। কোনও উত্তর দিয়ো না। চলে এসো।

মেসোমশাই হতাশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। তারপর ধীর পায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। চোখে জল। পিতা বললেন, শান্ত হয়ে বসুন, বিনয়দা। বিপদের সময় উতলা হতে নেই।

মেসোমশাই রুদ্ধ কান্নায় ফুলেফুলে উঠতে লাগলেন, হরিদা, আমি কোন মুখে বাড়ি ফিরব? বাড়ি গিয়ে আমি কী বলব? এই এত বড় শহর, কোথায় আমি খুঁজব!

আপনি কোনও চিঠি পেয়েছেন?

কী চিঠি? কনকের স্যুসাইড নোট!

না, র‍্যানসাম চেয়ে কোনও চিঠি। যেমন বিলেতে হয়। প্রথমে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, তারপর বিরাট টাকা চেয়ে চিঠি ছাড়ে। না দিলে খুন করে।

না, কোনওরকম চিঠিই আমি পাইনি।

ঘটনাটা খুলে বলুন তো আপনি।

কাল সকালে প্রতাপের বউদির সঙ্গে...

প্রতাপের তো কেউ নেই শুনেছিলাম।

না না, সবাই আছে, মিল নেই, আলাদা আলাদা থাকে। মামলা-মকর্দমা চলছে।

বেশ বলুন তারপর। বউদির সঙ্গে?

বউদির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যাবে বলে বেরোল। বেলা একটার সময় বউদি ফিরে এলেন। এসে জিজ্ঞেস করলেন, কনক ফিরেছে! আমরা অবাক। কনক একা ফিরবে কী করে! সে তো গেল আপনার সঙ্গে। খোঁজ খোঁজ, তোলপাড়, এখনও তার সন্ধান নেই।

জল-পুলিশে খবর নিয়েছেন?

জল-পুলিশে কেন?

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাটা মশাই তেমন সুবিধের নয়। এ সময়টা আবার বান আসার কাল। হয়তো জলে নেমেছিল, টেনে নিয়ে চলে গেছে।

সঙ্গে যিনি ছিলেন, তিনি বলছেন, গঙ্গার ঘাটে সে নামেনি। পঞ্চবটীর কাছে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

সেই মহিলার কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য! আপনি খুব ভুল করেছেন। শুনেছেন নিশ্চয়, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

কার লোভ, কীসের লোভ!

বড়লোক জামাইয়ের লোভ। অগাধ বিষয়সম্পত্তি। মামলার জট ছাড়াতে পারলেই, অভিভাবক হয়ে নিজে লাঠি ঘোরাবেন। এখন ম্যাও সামলান। ওরা কায়দা করে আপনার মেয়েকে মেরেও ফেলতে পারে।

মারবে কেন? মেরে ফেলে কার কী লাভ হবে!

খুব হবে। প্রতাপের উত্তরাধিকারী আসার পথ বন্ধ হবে। আপনি আইন বোঝেন, এই সামান্য জিনিস বোঝেন না? জমিদারি মানেই খুন, জখম, রাহাজানি, হত্যা, ব্লাডবাথ। অর্থকণিকা আর রক্তকণিকা এক জিনিস। আমাদের এখানে এক জমিদারকে বিষ খাইয়ে মেরেই দিলে। কে মারলে জানেন? ভাগনে। সমস্ত সম্পত্তি পড়ে রইল কোর্ট অফ ওয়ার্ডে। নাবালক ছেলে কবে সাবালক হবে, তারপর সব ছাড়ান পাবে! এর মধ্যে তাকে যদি সরিয়ে ফেলতে পারে তো হয়ে গেল! বেশ ছিলেন এখানে, লোভে লোভে পা দিলেন গিয়ে জতুগৃহে।

হরিদা, আমি তো এত সব ভাবিনি। আমি এখন নিমজ্জমান ব্যক্তি। আমাকে তিরস্কার না করে উদ্ধার করুন।

পিতা আপনমনে বলতে লাগলেন, কোথায় যেতে পারে? আচ্ছা, প্রতাপকে কি ওর পছন্দ হয়নি?

মেয়েদের আবার পছন্দ-অপছন্দ কী! আমরা যা পছন্দ করে দোব সেইটাই তো হবে তাদের পছন্দ।

তা বললে চলে! যুগ পালটাচ্ছে। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তার একটা পছন্দ অপছন্দ থাকবে না! প্রতাপকে স্বামী হিসেবে আমার খুব একটা রিলায়েবল মনে হয়নি।

ছেলেটার সব ভাল, তবে একটু খেয়ালি। জীবনটাকে হিসেব করে খরচ করতে শেখেনি। আর অসম্ভব স্ফূর্তিবাজ। অত ফুর্তি আবার ভাল নয়।

মানুষকে একটা দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, বিনয়দা। তা না হলে চরিত্র তৈরি হয় না। আপনারা ভাবেন টাকায় সুখ। একেবারে ভুল ধারণা। জীবনকে যত সিম্পল করবেন তত সুখ বাড়বে। সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে। স্বভাব একবার এলে গেলে বড় বিপদ। তাকে খাড়া করা খুব শক্ত!

গানের সুরে কথা চাপা পড়ে গেল। অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি। আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি। এ আমার মাতামহের গলা। দুলে দুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি। আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।

গানের শেষ চরণটি নিচু হয়ে ঘরে ছাড়লেন, যেন কোল থেকে বেড়াল নামালেন। আজ একেবারে রাজবেশ। ফরসা ধবধবে ধুতি। কোয়ার্টার হাতা সাদা পাঞ্জাবি। পায়ে বার্নিশ করা জুতো।

এলুম গো। কে কেমন আছ তোমরা! কেন বসে বিরস বদনে? কী হল কী তোমাদের?

পিতা বললেন, আপনার পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে যান।

উঃ, সে তোমাকে কী বলব হরিশঙ্কর। জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হল। সাধনার জোরে মানুষ যে কোথায় যেতে পারে! এক মহাপুরুষ দেখে এলুম হরিশঙ্কর।

চেয়ারে বসতে বসতে মাতামহ বলছেন, আর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হঠাৎ মেসোমশাইয়ের দিকে চোখ পড়ল। এতক্ষণ নিজের খেয়ালে ছিলেন।

কী খবর? আপনি আবার বৃন্দাবন থেকে মথুরায় ফিরে এলেন?

আমার বড় বিপদ।

চাবি হারিয়ে ফেলেছেন?

হারিয়েছি, তবে চাবি নয়, মেয়ে। আমার বড়মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছি না।

কোথায় রেখেছিলেন?

কোথায় আবার রাখব। ঘরে রেখেছিলুম।

ওইজন্যেই হারিয়েছে। রিং-এ না রাখলেই হারাবে।

পিতা বললেন, আপনি কোন জগতে আছেন! উনি চাবি হারাননি! মেয়ে হারিয়েছেন। বড়মেয়ে কনককে কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আঃ। বলো কী! কী সর্বনাশ! কনক সেই মেয়েটি! যার সঙ্গে মনে মনে আমার নাতির বিয়ের ঠিক করেছিলুম! চলো তা হলে।

কোথায় যাবেন?

খুঁজতে বেরোই। আমার মনে হয় সে জিটি রোড ধরে হাঁটছে। এতক্ষণে তারকেশ্বরে পৌঁছে গেছে।

মেসোমশাই উদগ্রীব হয়ে বললেন, কী করে বুঝলেন? আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

না, দেখা হয়নি। আমি নখদর্পণে যেন দেখতে পেলুম।

নখদর্পণ কী জিনিস!

সে আছে। অবিশ্বাসীদের জন্যে নয়। একটু অলৌকিক ধরনের ব্যাপার।

ওসবে আমার খুব বিশ্বাস। পারেন তো বলুন না আমার মেয়েটাকে কোথায় পেতে পারি?

আমার ক্ষমতায় হবে না, তবে আপনাকে একজায়গায় নিয়ে যেতে পারি। ঘুরঘুরে বাবার কাছে।

তিনি বলে দিতে পারবেন?

খুব পারবেন। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। মৃত্যুর পর কে কোন লোকে আছে একেবারে সঠিক বলে দেন।

কনকের মৃত্যু হয়েছে!

না না, মৃত্যুর কথা আমি ভাবছি না। মৃত্যু হবে কেন? আমি বলছি পরলোকের কথা যিনি বলতে পারেন, এ লোক তো তাঁর কাছে ছেলেখেলা।

ঘুরঘুরে বাবা দমদম বিমানবন্দরের কাছে কোনও এক গ্রামে থাকেন। মেসোমশাই গাড়ি এনেছেন। যেতে আধঘন্টাও লাগবে না। পিতার তেমন মত ছিল না, তবু আমরা বেরিয়ে পড়লুম। যেতে যেতে মেসোমশাই শুধু একটি কথাই বললেন, কনককে যদি খুঁজে না পাই, তা হলে আমি আত্মহত্যা করব। মাতামহ বললেন, আত্মহত্যার কোনও প্রয়োজন হবে না। বেনারসে আমার স্ত্রী একবার হারিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিচ্ছু করিনি। চুপচাপ বসে রইলুম আর বগলা স্তোত্র আওড়াতে লাগলুম। সন্ধের দিকে সুড়সুড় করে সৌদামিনী এসে

হাজির। তখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের মতো বললুম, এবার তোমাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। তিনি বললেন, ঝ্যাঁটার বাড়ি দোব। ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে শিবঠাকুর আমার বউ ফেলে পালালেন। তা দেখুন, সেই স্ত্রীর কল্যাণে স্বামী জগদানন্দের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। জ্বলন্ত মহাপুরুষ। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। দু'জনেরই দীক্ষা হয়ে গেল। বীজমন্ত্র যেন ডাঁসা ভোমরার মতো ভোঁ ভোঁ করছে। তবে একটা কথা, স্ত্রী ফিরে আসবেই। সে যে জন্মজন্মের বন্ধন। এই সামনের বার আবার আমার সৌদামিনীর সঙ্গে বিয়ে হবে। আপনার স্ত্রী হারিয়ে গেলে ভাবনার কিছু ছিল না। মেয়ে তো? কেউ যদি পেয়ে থাকে সে কি আর ফেরত দেবে! অমন সুন্দরী মেয়ে। একটা টাকা ফেরত দেয় না যে-দেশের মানুষ, সে দেশের মানুষের ওপর আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যাক যা করেন কালী সেই সে জানে।

বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশ দিয়ে গাড়ি চলেছে। রোদে দাঁড়িয়ে থাকা একটা প্লেন চকচক করছে। মাতামহ নানা কথা বলছেন, আমার মনটা কিন্তু তেমন সুবিধের নেই। মনে হচ্ছে আমিই হারিয়ে গেছি। এই বিশাল শহরে কনক সত্যিই হারিয়ে গেল। কার খপ্পরে গিয়ে পড়ল কে জানে। কনক তো কচি মেয়ে নয় যে গোলাপ ফুল শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে দেবে, কি লজেন্সের লোভ দেখিয়ে থলেতে ভরে ফেলবে! এই হোঁতকা বাপটার জন্যে মেয়েটার জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। যে ধরেছে সে নিশ্চয়ই আরবদের দেশে চালান করে দেবে।

মাতামহ বললেন, এই যে আমরা এসে গেছি। ঘুরঘুরে বাবার আশ্রম দেখা যাচ্ছে।

মেসোমশাই জিজ্ঞেস করলেন, ঘুরঘুরে বাবা নাম হল কেন? খুব ঘুরে ঘুরে বেড়ান?

গেলেই বুঝবেন, কেন ওঁর নাম ঘুরঘুরে বাবা।

ছিটে বেড়া দেওয়া বিশাল একটা জায়গা। মাঠে এক কণাও ঘাস নেই। পরিষ্কার তকতকে। কী করে এমন হল! মাথায় টাক পড়ে, মাঠে কেমন করে পড়ে কে জানে? চারপাশ সাদা খনখনে। দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে ধুলো উড়ছে। একপাশে একটা ছোট মাপের মন্দির। তার মাথায় লাল পতাকা উড়ছে। ভেতর দিকে আটচালা ধরনের কয়েকটা বাড়ি। উঁচু উঁচু দাওয়া। দেখলেই মনে হয় ভেতরটা বেশ শীতল হবে। লাল রঙের পাঞ্জাবি, ধুতি, কৌপিন ঝুলছে। দাওয়ার এক পাশে বিশাল একটা ত্রিশূল পোঁতা। ফলায় ঝুলছে জবার মালা। দিনের উত্তাপ শুকিয়ে এসেছে। তলায় একটি নির্বাপিত হোমকুণ্ড। কিছু কাঠে তখনও আগুনের স্পর্শ লেগে আছে। ফুরফুরে ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে বাতাসের গায়ে অদৃশ্য কোনও লোকের লিপি লিখে চলেছে।

ঘরের ভেতর থেকে বিরাট এক হুংকার ভেসে এল, মা, মা, একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠ মা।

মাতামহ ততোধিক জোরে হাঁক পাড়লেন, বাবা, বাবা, আমি আ গিয়া।

খটাস খটাস করে খড়মের আওয়াজ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। উঃ ঘুরঘুরে বাবার কী সাংঘাতিক চেহারা! দারা সিং, কিংকং, রানধোয়া, সব একসঙ্গে এক ছাঁচে ফেলে ভগবান বাবাকে তৈরি করেছেন। এরকম বিশাল ভুঁড়ি খুব কমই দেখেছি। ভয় হতে লাগল, এখুনি না ফটাস করে ফেটে যায়। বেলকুঁড়ির মতো নাইকুণ্ডল, ভোমরার মতো সেঁটে আছে, ভোঁ করে উড়ে এসে কামড়ে না দেয়। নিম্নাঙ্গে একটুকরো লাল কাপড় কোনওরকমে জড়ানো। টেনিস বলের মতো লাল দুটো চোখ। কপালে গোল এতবড় একটা লাল টিপ। মাথায় জটা। মহাপুরুষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা। যখন দূরে ছিলেন মুখ দেখতে পাচ্ছিলুম, যখন

কাছে এলেন, তখন জালার মতো ভুঁড়ি আর থামের মতো দুটো পা ছাড়া আর কিছুই দেখার উপায় নেই। তিনি ঈশ্বরের মত বিশাল, আমি কীটের মতো ক্ষুদ্র।

মাতামহ দমাস করে পায়ের ওপর পড়লেন।

বাবা বললেন, রাক্কুসি তোর মঙ্গল করুক।

আমরাও পালা করে প্রণাম সারলুম। মহাপুরুষ কর্কশ গলায় ডাকলেন, পঞ্চা, পঞ্চা।

গুড়গুড় করে বামনাকৃতির একটি মানুষ, যাই বাবা, বলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। সার্কাসের ক্লাউনের মতো ভাবভঙ্গি।

মহাপুরুষ হুকুম করলেন, মাদুর বিছাও। ছিলিম লে আও।

যো হুকুম, বলে চ্যালা নাচতে নাচতে চলে গেলেন। দাওয়ায় মাদুর পড়ল। আমরা একে একে বসে পড়লুম। মহাপুরুষ বসলেন পদ্মাসনে। যোগের শরীর। পায়ের ওই বিচিত্র মুদ্রায় আসতে এতটুকু কষ্ট হল না। ভুঁড়িটি সামনে লটকে পড়ল। ত্রৈলঙ্গস্বামী কীভাবে উলঙ্গ থাকতেন আজ বুঝতে পারলুম। ছোট একটি কলকে এসে গেল। দমভোর টানে ব্লপ করে আগুন জ্বলে উঠল। এর নাম গাঁজা। ব্যারিস্টার মেসোমশাইয়ের চোখমুখের অবস্থা তেমন ভাল নয়। মহাপুরুষকে পছন্দ হয়নি।

কলকেটি চ্যালার হাতে দিয়ে বাবা বললেন, শিক্ষিত লোকেদের বড় অবিশ্বাস, আর অবিশ্বাসী লোক দেখলে আমার খুব দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করে। তোমরা মজা দেখবে? তা হলে দেখো।

মহাপুরুষ মৃদু হাসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে মেসোমশাই আর্তনাদ করে উঠলেন, এ কী হল, আমি কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না। আমি অন্ধ হয়ে গেছি।

মহাপুরুষ বললেন, হবেই তো, হবেই তো। তুমি যে বাবা অহংকারে অন্ধ। পূর্বজন্মে তুমি ছিলে একজন রূপবান অভিনেতা, আগামী জন্মে তুমি হবে একজন শবর। এ জন্মে তুমি সব হারাবে। নদীর তীরে একলা বাস করবে। বেঁচে থাকবে এক নীচ জাতীয়া মহিলার অন্নে। মৃত্যু হবে অমাবস্যায়, শেষরাতে, শ্বাসকষ্টে। মৃতদেহ সৎকার করবে নীচ জাতির লোকেরা।

মেসোমশাই, বাবা, বলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

বাবা একটি তালি বাজালেন। স্পষ্ট দেখলুম হাত দিয়ে ধোঁয়া বেরোল। মেসোমশাই উল্লাসে চিৎকার করলেন, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আমি ক্ষমা করার কে রে ব্যাটা! নিজের কাছে ক্ষমা চা। নিজের আত্মপুরুষের কাছে। প্রতিদিন তুই যাকে খাটো করছিস। তোর দীনতা দেখে প্রতিদিন যে অশ্রু বিসর্জন করছে।

বাবা, আমি আমার বড়মেয়েকে কাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি দয়া করে তাকে পাইয়ে দিন। বলে দিন সে কোথায় আছে!

মহাপুরুষ আবার হাঁক পাড়লেন, পঞ্চা পঞ্চা। কৌটো লে আও।

সেই ক্ষুদ্র চ্যালা নাচতে নাচতে একটি রুপোর কৌটো নিয়ে এলেন। নদীর জলে চাঁদের আলোর মতো চকচক করছে।

কৌটোটাকে মাদুরের পাশে মেঝেতে রেখে গেলেন। মনে হয় কোনও মশলাটশলা আছে। মহাপুরুষের জীবনে ভোগ আর ত্যাগ দুটোই হাতধরা।

তোমার মেয়ে পালিয়েছে। পালিয়ে বেঁচেছে। তবু একবার দেখি, কোথায় সে আছে? পঞ্চা!

হাঁক শুনে সেই পঞ্চু মহারাজ আবার নেচে নেচে এলেন। বাবার এবারের হুকুম, স্লেট পেনসিল আর এক সানকি জল। স্লেট-পেনসিলটা মেসোমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তিনটে সংখ্যা লেখো।

মেসোমশাই লিখলেন, দুই সাত দুই। মহাপুরুষ সংখ্যা তিনটির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমার মেয়ের নাম ক দিয়ে, বোধহয় কনক। চন্দ্রের জাতক, সুন্দরী, কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, নাতিদীর্ঘাঙ্গী, মৃদুস্বভাব, ভাবপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী। পিতা এবং মাতার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মহাপুরুষ হোমকুণ্ড থেকে আঙুলের ডগায় ছাই নিয়ে মেঝেতে একটা চক্র আঁকলেন। চক্রের মাঝখানে একটা ব লিখলেন। ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে তিনটি বীজমন্ত্র ছুড়লেন, শব্দে বাতাস কেঁপে উঠল পাতলা ধাতব চাদরের মতো। সেই কম্পন যেন আর থামতেই চায় না। সানকির জলে তরঙ্গ খেলছে। এক ধরনের চিনচিন শব্দ হচ্ছে।

কী যে হচ্ছে ঈশ্বরই জানেন। পৃথিবীর প্রগতি অনেকটা লম্বা বেলুনের চেহারা নিয়েছে। এক প্রান্ত যেমন ছিল তেমনই আছে, অন্য প্রান্তে ঠেলে এগিয়ে চলেছে। মহাপুরুষ রুপোর কৌটোটি হাতে। তুলে নিয়ে ঢাকা খুলে সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে উপুড় করে দিলেন, যেন পাশার দান ফেললেন। চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে ঝপ করে কৌটোটা তুলে নিলেন। অদ্ভুত চেহারার একটা পোকা, কেন্দ্রে স্থির থেকে হঠাৎ সড়সড় করে দক্ষিণে চলতে শুরু করল।

দক্ষিণ দিকেই আমরা বসেছিলুম। মেসোমশাই ঘুরঘুরে ঘুরঘুরে বলে এক ডিগবাজি খেয়ে দাওয়া থেকে নীচে পড়ে গেলেন। মাতামহ পড়লেন না, তবে ভয়ে সিঁটিয়ে রইলেন। ঠোঁট বিড়বিড় করছে। মন্ত্র জপছেন। আর আমি, দ্বিতীয় কোনও কথা নয়। ঘুরঘুরে শুনেছি সাংঘাতিক প্রাণী। তিরবেগে দৌড়ে একেবারে চৌহদ্দির বাইরে।

বাবার চ্যালা পঞ্চা মেসোমশাইকে ঠেলেঠুলে আবার দাওয়ায় তুলে দিল। মাতামহর গলার স্বর ফিরে এসেছে। আমাকে ডাকছেন, চলে আয়। তার মানে ঘুরঘুরে আবার কৌটোয় ঢুকে পড়েছে। কী কায়দায় ঢোকালেন, কে জানে! মহাপুরুষরা সব পারেন।

মেসোমশাইয়ের মাথার পেছন দিকে এক তাপ্পি ধুলো। মহাপুরুষ বললেন, তোমাদের এত ভয়! বেঁচে আছ কী করে! মনটাকে বড় চঞ্চল করে দিলে। পঞ্চা, ছিলিম আন।

এক টানে কলকের মাথা ব্লপ করে জ্বলে উঠল। চোখে এসে গেল তুরীয় দৃষ্টি।

মেসোমশাই একটু সামলেছেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী বুঝলেন বাবা?

বাবা হুম করে একটি হুংকার ছেড়ে বললেন, মেয়ে তোমার দক্ষিণ দিকে গেছে।

দক্ষিণ মানে দক্ষিণ কলকাতা?

না রে বোকা, দক্ষিণ ভারতের দিকে গেছে।

সেকী, সেখানে কে আছে!

বাবা খুব চটে গিয়ে বললেন, কে আছে, তার আমি কী জানি, সে জানবে তুমি। আচ্ছা দাঁড়াও জলদর্পণে একবার দেখি।

বাবা একটি দেশলাই কাঠি জ্বেলে সেই জল-টলটলে সানকির ওপর ধরলেন। আগুনের শিখায় জলের রং সোনার বর্ণ হল। কী আশ্চর্য! রং ক্রমেই ফিকে থেকে গাঢ় হচ্ছে। জল যেন টলটলে কাঁচা সোনা। বাবা তাকিয়ে আছেন স্থির দৃষ্টিতে। উত্তেজনায় আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

বাবা হঠাৎ নড়ে উঠলেন, নাঃ এখনও সে কোথাও পৌঁছোয়নি। মনে হয় ট্রেনেই আছে।

মেসোমশাই বললেন, ট্রেনের ভেতরেই একবার দেখুন না।

তা তো হবে না রে। ট্রেন যে গতিশীল। সে স্থিত না হলে আমার দর্পণে তো আসবে না।

আমি তা হলে এখন কী করব বাবা?

কী আর করবে, অপেক্ষা করো। ধৈর্য ধরো। সংসারে এমন ঘটনা কত হচ্ছে!

বাবা, ওর সঙ্গে আর কেউ আছে কি?

অবশ্যই আছে।

কে সে? সে কে?

অত সহজে বলতে পারব না। অমাবস্যার দিন আসনে বসব। সেই দিন তোমার জন্যে আমি সারাভারত চষে আসব। প্রতিপদে বলতে পারব, মেয়ে তোমার কোথায় আছে, কেমন আছে!

মেসোমশাই একটি দশ টাকার নোট বাবার সামনে মাটিতে রাখলেন। প্রণাম করার জন্য সবে মাথাটি নিচু করতে যাবেন, বাবা অমনি থামের মতো পা বের করে নোটে মারলেন লাথি। রাগে লাল চোখ ঘোর রক্তবর্ণ, তুই আমাকে টাকা দিতে এসেছিস! দশ টাকায় আমার সাধনা কিনতে এসেছিস? এটা কি মুদির দোকান? বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।

মাতামহ বাবার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, শান্ত হন বাবা! শান্ত হন। না জেনে অন্যায় করে ফেলেছে। অবোধ সন্তানকে ক্ষমা করে দিন। শিব, শিব। শিব, শিব।

বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা

স্বপ্ন বেশিক্ষণ মনে থাকে না। অনেক সময় জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন মনে রাখতে হলে ঘুম ভেঙে গেলেও ধড়মড় করে উঠতে নেই। চুপ করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। তা হলে স্বপ্নের প্রতিটি দৃশ্য, কথা, শব্দ ছবির মতো মনে থাকে।

স্বপ্ন দেখছিলুম বিশাল এক বাগানে, চাঁদের আলোয় আমি আর ছবিতে দেখা সেই অপর্ণা নামক মেয়েটি বসে আছি পাশাপাশি, গাছতলায়। চাঁদমাখা রাত চার পাশে ঝিমঝিম করছে। মনে হচ্ছে মসলিনের মধ্যে দিয়ে, কিংবা মসলিনের মশারির ভেতর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। মাঝে মাঝে চুমকি জ্বলছে। পাশে ওই মেয়েটি বসে থাকায় বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। এরই মাঝে, কোন ঝোপে বসে পাখি ডাকছে। স্বপ্নে অবাস্তব একটা কিছু থাকবেই। তা না হলে, মাতুলের সেই ছাত্রী, সুন্দরী চিত্রাদেবী, ঘাড় ঢগঢগে সারেঙ্গিঅলাকে নিয়ে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবেন কেন। তিনি চলেছেন আগে আগে, নায়িকার মতো, বৃদ্ধ চলেছেন পেছন পেছন জিজ্ঞাসার চিহ্ন ধরে। চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নেই ভাবছি, আহা এ যেন স্বপ্ন! অপর্ণার দিকে তাকালেই সে মৃদু হেসে বলছে, কিছু বলো। হঠাৎ দূরে কোথাও গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। চাঁদিনি রাতে মেঘ গর্জন! এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করল। হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস। সিনেমা হলে যেভাবে ধীরে ধীরে আলো নিভে আসে, সেইভাবে চাঁদের আলো মৃদু হয়ে আসছে। ঢালু জায়গা দিয়ে যেভাবে জল গড়িয়ে পড়ে, সেইভাবে চারপাশ থেকে আঁধার গড়িয়ে আসছে। অপর্ণা ভয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলছে, এ কী হল পলাশ? আমার ভীষণ ভয় করছে। কোথা থেকে হঠাৎ একটা পাহাড় গজিয়ে উঠল চোখের সামনে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অন্ধকার নেমে আসছে কুলকুল করে জোয়ারের জলের মতো। স্বপ্নে কী যে সব হতে লাগল! ভয় ছাড়া যেন স্বপ্ন হয় না। যোড়শী সুন্দরী গাত্রলগ্না। শ্বাসপ্রশ্বাসে তার শরীর ওঠা-নামা করছে। দূরে একটা সাদা মূর্তি দেখা গেল। বাতাসে আঁচল উড়ছে। কে? কনক! সেই মূর্তি যেন মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। সারামুখে চন্দনের আলপনা। অপর্ণাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি ছুটতে লাগলুম। কনক যেন সাদা মেঘখণ্ডের মতো ভেসে চলেছে। আমি তার আঁচল ধরতে না পেরে ক্রমাগত চিৎকার করে চলেছি, কনক, কনক!

এর পরের দৃশ্য স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

বিছানায় বসে আছি হাঁদাগঙ্গারামের মতো। বালিশে চিত হয়ে শুয়ে আছেন পিতা। চোখদুটো খোলা। আকাশে ভোরের আলো ফুটেছে। পিতার মুখে এক ধরনের শান্ত হাসি, যেন আকাশে চিড় ধরছে। তিনি বললেন, কী হল হে! যেভাবে হাত তুলে কনক, কনক করছিলে, মনে হচ্ছিল ভুস করে আকাশে উড়ে না যাও। তোমার পেটগরম হয়েছে, জোড়া ডাব খেয়ো। আজ পয়সা দিয়ে যাব। উঠে পড়েছ যখন আর শুয়ে কাজ নেই। বাইরে গিয়ে ফাঁকা বাতাসে একটু পায়চারি করো।

আজ প্রায় সাত দিন হয়ে গেল কনকের কোনও খবর নেই। মেয়েটা একেবারে উবে গেল। পুলিশ নাকি বলেছেন, আমরা সারা ভারতবর্ষে ছবি ছড়িয়ে দিয়েছি। খোঁজপাত চলছে। না পেলে আমরা কী করতে পারি। যারা হারিয়ে যায়, তাদের সকলকেই কি আর পাওয়া যায়।

ভাগ্যিস বলেননি, মারা গেলে কী করতেন?

প্রতাপ রায়ের স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আর তেমন ভাল ব্যবহার করছেন না। মেয়ে নেই, তা ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে অত খাতির কীসের! মেসোমশাই এতদিনে বুঝেছেন, মানুষ কান ধরে টানে, মাথাটা কাছে আনার জন্যে। শুধু কানের কোনও কদর নেই। মেসোমশাই আজ আবার ফিরে আসছেন এ বাড়িতে। ব্যাক টু মেথুসেলা। এখন তাঁর মনে হয়েছে, হরিদার মতো মানুষ হয় না। যতই হোক একটা কুটুম্বিতার সম্পর্ক রয়েছে।

কোথা থেকে কনক এল, এসে একটা দাগা দিয়ে চলে গেল। যখনই মনে হচ্ছে কনক আর বেঁচে নেই, তখনই ভেতরটা হুহু করে উঠছে। কনকের মতো মেয়ে, একা পরিব্রাজিকা হয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। অসম্ভব। সে তো সিস্টার নিবেদিতা নয়, কিংবা সেই ভৈরবীও নয়, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সাধনা করাবার জন্য হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন।

কনকের খোঁজে তিন জন তিন ভাবে এগোচ্ছেন।

পিতা চলেছেন বিজ্ঞানের রাস্তায়। তিনি রাতের পর রাত অঙ্ক কষে চলছেন। একটি মেয়েকে যদি জোর করে বিয়ে দেবার চেষ্টা হয়, আর সে মেয়ে যদি স্বাধীনচেতা এবং শিক্ষিতা হয়, এবং যুগটা যদি আধুনিক, নারী স্বাধীনতার যুগ হয়, তা হলে মেয়েটি কী করবে! রুল অফ থ্রি লাগাও। নানারকম কেস হিস্ট্রি ঘেঁটে দেখো। অনুরূপ অবস্থায় কোন মেয়ে কী করেছে অনুসন্ধান করো, খোঁজ নাও। নিজের মনেই থেকে থেকে বলছেন, ইনভেস্টিগেশন, ইনভেস্টিগেশন। এখন তাঁর অবস্থা প্রায় শার্লক হোমসের মতো।

আমি একটা কেসই জানি, সেইটাই বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে ফিরে এসেছি। সে হল আমাদের পাশের বাড়ির জবা। যাকে নিয়ে সুখেন দুর্গাপুরে পালিয়েছিল। যার জন্যে দীনু আজ পরলোকে। পিতা বললেন, ওটা হল সিম্পল রুল অফ থ্রি। চেয়েছি পেয়েছি। ও হল, মিঞা বিবি রাজি তো কেয়া করে কাজি। ওটা কোনও কেস নয়, ও হল কেলেঙ্কারি। এক ফুটোঅলা চৌবাচ্চার অঙ্কে হবে না। চাই ডবল ফুটো। একটা খোলা, একটা বন্ধ। আমার তো তেমন কোনও কেস জানা নেই।

মাতামহ কখনও চলেছেন আধ্যাত্মিক রাস্তায়, কখনও চলেছেন ভৌতিক রাস্তায়। মেসোমশাই ভাবছেন আইনের কথা। প্রতাপ রায়ের নামে একটা কেস ঠুকে দেবেন। হয় মেয়েকে খুঁজে দাও, নয় জেলে যাও। এদিকে কনক কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে। আগামীকাল অমাবস্যা। সেই ঘুরঘুরে বাবা পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে ভূত নামাবেন।

সকালের চায়ে চুমুক দিতে দিতে পিতা বললেন, যদি একটা মেয়ে পেতুম!

কী করতেন?

শুধু মেয়ে পেলেই হবে না, তার স্বভাবটি হওয়া চাই কনকের মতো। তা হলে কেসটা আমি রি-কনস্ট্রাকট করতুম। প্রতাপের মতো একটা থার্ডক্লাসের সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়তুম, তারপর সবসময় চোখে চোখে রেখে

দেখতুম সে কী করে! এর মধ্যে আমি তিন ভল্যুম অপরাধ বিজ্ঞান পড়ে ফেলেছি। জানো কি, একটা খুনের কিনারা করতে আর একটা খুন করতে হয়!

আজকের কাগজে কনকের ছবি দিয়ে আবার একটা বিজ্ঞাপন করা হয়েছে। 'কনক, ফিরে এসো। তুমি যা চাও তাই হবে। বাবা।' ছবিটা দেখছি, আর রাতের স্বপ্ন মনে পড়ছে। জানি, স্বপ্নের কোনও অর্থ হয় না, তবু ভয় হচ্ছে, কনক হয়তো বেঁচে নেই।

আমার কেবলই মনে হচ্ছে নৌকোয় দেখা সেই সতীমার কাছে যদি একবার যাওয়া যেত, তা হলে হয়তো সঠিক খবর পাওয়া যেত। মাতামহ কেন যে হঠাৎ ঘুরঘুরে বাবাকে নিয়ে মেতে উঠলেন! আগামীকাল হয়তো আবার ঘুরঘুরে বাবার আশ্রমে যাওয়া হবে। এবার রাতের দিকে, থাকতে হবে সারারাত। যেতে হবে বাসে। মেসোমশাই আজই যদি এখানে চলে আসেন, তা হলে প্রতাপ রায়ের গাড়ি কি আর পাওয়া যাবে!

আজ আমার জীবনের সাংঘাতিক একটি দিন। আজ থেকে শুরু হবে দাসত্ব। চাকরিতে বহাল হবার চিঠি এসে গেছে। মাইনেটা খুব একটা খারাপ নয়। আপাতত শ'ছয়েক। ফ্রি লাঞ্চ। তিন মাস শিক্ষানবিশির পর চাকরি পাকা হবে। তখন শ'আটেক মিলবে। পিতা অবশ্য খুশি নন। তাঁর মতে চাকরি যদি করতেই হয়, চার অঙ্কের কমে করা উচিত নয়। সে যোগ্যতা আমার নেই। অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পরীক্ষায় বসলে গোল্লা পাব। যা হয়েছে, আমার মতো বুদ্ধুর পক্ষে ভালই হয়েছে।

ল্যাবরেটরি মানেই কারখানা। কারখানার নিয়মেই চলতে হবে। আট ঘণ্টা ডিউটি, শুরু সকাল সাড়ে আটটায়। তানানানা করার মতো সময় নেই বললেই চলে। নীচে প্রফুল্ল কাকারা এসে একদিকে ভালই হয়েছে। আমরা সবাই বেরিয়ে গেলে, নীচে বাড়ি আগলাবার জন্যে একটি প্রাণী অন্তত থাকবেন।

সংসারের কাজে আজ আমার ছুটি। প্রথম দিন, ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে হবে। যেতে, বাসটাস বদলে কতক্ষণ লাগবে জানা নেই। পিতা বললেন, দেখো, আমার নামটা যেন ডুবিয়ো না। বেরোবার আগে গুরুজনদের ছবিতে প্রণাম করবে। আশীর্বাদ চাইবে। আজ তোমার জীবনের একটি পরিবর্তনের দিন।

বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদরের দরজার কাছে এসেছি, দেখি কাকিমা দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। হাতে একটা লাল টকটকে জবা। ফুলটি কপালে ছুঁইয়ে দিয়ে বললেন, পকেটে রেখে দাও, মায়ের পায়ের ফুল। দুর্গা, দুর্গা। ছুটি হলেই চলে আসবে। এখানে-ওখানে আড্ডা মারবে না। মনে থাকে যেন, আমি একলা থাকব। এত বড় বাড়ি, সন্ধের দিকে ভীষণ ভয়ভয় করে।

মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। কোন সুদূরের এক মহিলা, মাতৃস্নেহে দাঁড়িয়ে আছেন দরজার পাশে, হাতে একটি ফুল নিয়ে। এ দেশের ছেলে সহজে কি সন্ন্যাসী হতে পারে! প্রতি পদে পিছুটান।

সেদিনের সেই ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘর। ঢুকতে আজ আর বুক কেঁপে গেল না। স্নিগ্ধ বৃদ্ধ, পরিচ্ছন্ন মটকার পাঞ্জাবি পরে বসে আছেন। সামনে একটি বিশাল টেবিল। পেছনে কাচ-ঢাকা বুককেসে মোটা মোটা কেমিস্ট্রির বই। পিতার মুখে এই মানুষটির পরিচয় সামান্য জেনেছি। একসময়কার সেরা ছাত্র, সেরা বিপ্লবী। নামে ইংরেজ সরকার সিংহাসনে বসে কাঁপত। বিদেশ থেকে বোমার ফর্মুলা এনে দেশে সন্ত্রাসবাদীদের হাত শক্ত করেছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দের প্রিয় শিষ্য। এখন গৃহী সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবন কাটাচ্ছেন। যদিও

অকৃতদার, প্রতিপাল্যের সংখ্যা নেহাত কম নয়। একটি অনাথ আশ্রম করেছেন। উপার্জনের অর্ধেক টাকা সেই আশ্রমেই ঢেলে দেন।

এত বড় একজন মানুষ অথচ শিশুর মতো সরল। ব্যক্তিত্বের কোথাও এতটুকু অহংকারের আঁশ নেই। চোখদুটি স্নিগ্ধ। স্নেহ মাখা। চশমার আড়ালে ঢুলঢুল করছে, যেন ঘোর লেগেছে। আমাকে দেখেই বললেন, বোসো, মনে মনে তোমার কথাই ভাবছিলুম। খুব সকালে বেরিয়েছ, নিশ্চয় খাওয়া হয়নি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি।

কী জলখাবার খেয়েছ?

আজ্ঞে পাউরুটি আর চা।

ডিম নয়, দুধ নয়, শুধু চা আর পাউরুটি!

ওইটাই যে বেশ সহজে হয়।

তা হয়, তবে তোমার বয়েসের ছেলের আর একটু পুষ্টির দরকার। একটা করে মুরগির ডিম খেলে কেমন হয়! কোনও বাধা আছে?

আজ্ঞে না, তা নেই।

তা হলে কাল থেকে তাই খাবে। এখানে তোমাকে খুব খাটতে হবে। লাঞ্চ পাবে তো সেই একটার সময়। দাঁড়াও, দেখি, তোমাকে কী খাওয়ানো যায়।

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার পেট বেশ জয়ঢাক হয়ে আছে।

ল্যাবরেটরিতে একবার গিয়ে ঢুকলে, তোমার ঢাক চুপসে যাবে। বুঝতে পেরেছি, তোমার লজ্জা হচ্ছে। সংকোচ হচ্ছে। হতেই পারে। যেহেতু আমি তোমার এমপ্লয়ার। ভুলে যাও, তফাতটা ভুলে যাও।

তিনি কথা বলতে বলতে ঘরের কোণের দিকে চলে গেলেন। সাদা রঙের একটি ফ্রিজ সেই কোণে গুনগুন করছে। দরজাটা টেনে খুলতেই হা করে একটা শব্দ বেরোল, যেন কোনও সাধক প্রাণায়ামে বসে 'রেচক' করলেন। যতক্ষণ দরজাটা খোলা রইল ততক্ষণ জলতরঙ্গ বাজতে লাগল মৃদু সুরে।

সাদা একটা প্লাস্টিকের বাটিতে জমাটমতো কী একটা বস্তু এনে আমার সামনে রেখে বললেন, নাও, খেয়ে নাও। এর নাম 'ইয়োগহার্ট'। যেমন উপকারী, তেমনি সুস্বাদু।

বাবা, এমন বস্তুর নাম জীবনে শুনিনি। হার্ট যুক্ত শব্দ, সঙ্গে আবার ইয়োগ। অর্থাৎ যোগ। বাংলা করলে দাঁড়াবে যোগহৃদয়। সঙ্গে একটি সুদৃশ্য কাঠের চামচ। লজ্জা করলে চলবে না। খেতেই হবে। ঠিক আইসক্রিম নয়, অনেকটা দইয়ের মতোই স্বাদ, তবে ভেতরে প্রচুর কিসমিস, খেজুর, কুমড়োর বরফি, আমসত্ত্ব ঠাসা। বেড়ে তরিবাদি ব্যাপার।

প্রবীণ ম্যানেজিং ডিরেক্টার সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি যত খাচ্ছি, তাঁর তত তৃপ্তি হচ্ছে। এমন স্নেহপ্রবণ মানুষ কীভাবে এত বড় প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন! বইয়ে পড়েছি, শোষণ আর শাসনই হল ধনতন্ত্রের মূল কথা। কই মিলছে না তো?

পাত্র যখন প্রায় সাফ করে ফেলেছি, তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, জিনিসটা কেমন?

আজ্ঞে অসাধারণ। একেবারে অমৃতোপম।

তোমার খুব খিদে পেয়েছিল। বুঝতে পারোনি?

খিদের সময় কমদিনই খেতে পেয়েছি, তাই খিদে কাকে বলে তেমন বুঝতে পারি না।

জানি, জানি, আমার ফ্রেন্ড হরিকে আমি চিনি। অতিমানব হবার সব গুণ নিয়ে মানব হয়ে বসে আছে। জানো, ওর স্বপ্ন ছিল, এই ধরনের এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। সে প্রতিভাও ছিল। আমার চেয়ে একশোগুণ ভাল ছাত্র। আর আমি চেয়েছিলুম দেশসেবক, মানবসেবক হতে। দু'জনেই আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট। পয়সা করেছি, কিন্তু মানুষ হতে পারিনি। যাও, হাত ধুয়ে এসো। ওই দরজাটা খোলো। ওটা বাথরুম। কাপটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দাও।

হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলুম। ম্যানেজিং ডিরেক্টার নিচু হয়ে বুককেসের তলা থেকে ঘড়ির মতো কী একটা বস্তু টেনে বের করলেন। কাঁটা বসানো।

এসো, এর ওপর দাঁড়াও, তোমার ওজনটা নিয়ে রাখি।

ওজন?

হ্যাঁ, ওজন। তুমি কতটা আন্ডারওয়েট, আমার দেখা দরকার। এক মাসের মধ্যে তোমাকে আমি মোটা করে দোব। শরীরম্, আদ্যম, খলু ধর্ম সাধনম্।

যন্ত্রে উঠে দাঁড়ালুম। ঝুঁকে পড়ে কাঁটাটা দেখে বললেন, অনেকটা বাড়াতে হবে। শুধু দইয়ে হবে না, মধু চাই, মুরগি চাই, চিজ চাই, ছোলা চাই, ভিটামিন চাই, মিনারেলস চাই। আমাদের লাঞ্চ খুব ভাল, ব্রেকফাস্ট আর ডিনারটাকে যদি সামলাতে পারো, একমাসে তোমার উন্নতি হতে বাধ্য। আচ্ছা, এবার তা হলে চলো।

দুটো বাড়ির মাঝখানে সেতুর মতো ঝুলবারান্দা। বারান্দা শেষ হয়েছে জাহাজের ডেকের মতো একটা জায়গায়। মোটা মোটা লোহার চাদর। নীচের দিকে তাকালেই দেখা যাচ্ছে বিশাল কারখানা। বিরাট একটা ভ্যাটে সাবান ফুটছে। ক্ষার ক্ষার ধোঁয়া উঠছে। এক দিকে একটা বয়লার। মাঝে মাঝে রেল ইঞ্জিনের মতো বাষ্প ছাড়ছে। নানারকম কেমিকেলসের গন্ধ ভেসে আসছে। সব গন্ধ ছাপিয়ে উঠছে ন্যাপথলিনের গন্ধ। ছোট ছোট ট্রলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা ছোট সিঁড়ি ভেঙে আমরা একটা নতুন ব্লকে চলে এলুম। এবার নাকে আসছে অন্য গন্ধ। এ গন্ধ আমার ভীষণ চেনা। কলেজ ল্যাবরেটরিতে শুঁকে এসেছি। অ্যাসিড ইথার। ল্যাবরেটরিটি বেশ আধুনিক। নেহাত ছোট নয়। জনা দশেক কেমিস্ট এরই মধ্যে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। খাড়া খাড়া ব্যুরেট। র‍্যাকে র‍্যাকে সাজানো রি-এজেন্টের বোতল। ত্রিপদে গলা উঁচিয়ে আছে ডিস্টিলেশন জার। বুনসেন বার্নার জ্বলছে। প্রতিটি টেবিলের শেষে বেসিন আর কল।

বই-ঠাসা কাচের ঘরে বসে আছেন ডিসপেপটিক চেহারার এক ভদ্রলোক। অ্যাপ্রন-পরা অবস্থায় তাঁকে ফাদারের মতো দেখাচ্ছে। ল্যাবরেটরিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। যিনি কিছুই করছিলেন না, তিনি হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে একটা খালি টেস্টটিউব চোখের সামনে তুলে ধরে গভীর মনোযোগে ভেতরের বাতাস দেখতে লাগলেন।

এম ডি ডাকলেন, প্রদ্যোত, উঠে এসো।

ইনিই সেই প্রদ্যোতবাবু, যাঁর হাতে আমাকে ফেলে দিলে একমাসেই মানুষ করে দেবেন। প্রদ্যোতবাবুর চোখে যে-চশমাটা ছিল, সেটা খুলে, দ্বিতীয় আর একটা চশমা পরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সামনের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। কোমরের পেছন দিকে দু'হাত রেখে শরীরটাকে সোজা করতেই ঢেউ করে একটা ঢেঁকুর উঠল। মুখে হাত চাপা দিয়ে বললেন, সরি। বুড়ো আঙুল ছাড়া সব আঙুলেই একটা করে আংটি। ভাগ্যকে পাথরের চেন দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছেন।

এম ডি বললেন, পেটে মনে হচ্ছে শুম্ভনিশুম্ভের লড়াই চলেছে!

আজ্ঞে হ্যাঁ, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হল পেট। এইবার একটু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাই। ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের টেবিলের এক ভদ্রলোককে বললেন, সুধীর, অ্যানালার এইচ সি এল কয়েক ফোঁটা জলে গুলে দাও তো!

সুধীরের চেহারাটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তিনি বার্নারের ওপর বিশাল একটি কেটলি বসিয়ে নল দিয়ে বাষ্প বেরোনো দেখছিলেন। তিনি বললেন, চা খাবেন না স্যার?

চা-ও খাব, অ্যাসিডও খাব। এবার থেকে আমি সব খাব।

এম ডি বললেন, এ ভেরি গুড ডিসিশন। না-খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরা ভাল। আচ্ছা, এই নাও, এই ছেলেটিকে তৈরি করো। পলাশ চট্টোপাধ্যায়। নাড়াচাড়া করলেই বুঝতে পারবে কী জিনিস! ভেতরে একটু আগুনটাগুন আছে! শোনো পলাশ।

বলুন।

প্রদ্যোত বেসিকেলি বড় ভাল ছেলে। তবে একটা দপ্তর চালায় তো, চিফ কেমিস্ট, তার ওপর পেটরোগা, তাই মেজাজটা তেমন সুবিধের নয়। মাঝে মাঝে আমাকেও দাঁতমুখ খিঁচোয়। তা নিয়মটা হল, ও খিঁচোলে তুমি খিঁচোবে না। চুপ করে থাকবে। মনে মনে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর, তুমি এঁর ক্রনিক ডিসপেপসিয়া ভাল করে দাও। আচ্ছা প্রদ্যোত?

আজ্ঞে বলুন!

আমি তোমাকে কী বলেছিলুম?

আজ্ঞে যোগাসন।

হচ্ছে?

মাঝে মাঝে।

কই দেখি, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসনটা করে দেখাও তো?

এখানে?

বেশ, আমার ঘরে চলো। কার্পেটের ওপর করবে।

ওটা বড় কঠিন। আমার পক্ষে শবাসনটাই বেস্ট।

সুধীরবাবু আধ গেলাস জল প্রদ্যোতবাবুর হাতে দিলেন। ঢকঢক করে খেয়ে গেলাসটা ফিরিয়ে দিলেন। এম ডি বললেন, বাঁচতে যদি চাও আসন করো প্রদ্যোত, আসন করো।

আসন করো, সাধন করো, বলতে বলতে এম ডি ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, পলাশ, মন খারাপ লাগলে আমার কাছে চলে এসো। আর হ্যাঁ, রোজ সকালে আমার সঙ্গে দেখা করে, তবে এখানে আসবে। জানো তো, সব পুজোর আগে গণেশ পুজো?

চিফ কেমিস্ট ভদ্রলোক বললেন, সুধীর, এক গেলাস চা বেশি হবে?

হ্যাঁ স্যার, জল ঢেলে দিয়েছি।

নতুন একটা অ্যাপ্রন বের করে দিয়ো, একটা তোয়ালে।

দিচ্ছি স্যার।

রবিবাবু?

বলুন।

দীর্ঘ চেহারার মিষ্টি একজন মানুষ এগিয়ে এলেন। পোশাক পরিচ্ছদে একেবারে টিপটপ। মুখে চোখে সুস্বাস্থ্যের ঝিলিক। হাসিহাসি মুখ।

পলাশকে আপনার হাতে তুলে দিলুম। তৈরি করে নিন।

রবিবাবু আমার কাঁধে একটি হাত রাখলেন। আমার দাদা নেই। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, দাদা যেন কাঁধে হাত রেখেছেন। সেই জয়ামাতা আমাকে একটি দৃষ্টি দান করেছিলেন, চোখের ভেতর দিয়ে মানুষের অন্দরমহল দেখার ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা এখনও হারায়নি। রবিবাবুর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছি। ঊষার আকাশের মতো বর্ণময়, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক। আমার ভেতরে যেন আনন্দের হিল্লোল বইছে। এত ভাল লোক এক জায়গায় এসে মিললেন কী করে?

বাতাসের মতো মৃদু স্বরে রবিবাবু বললেন, এসো। এসো বললুম বলে রাগ করলে না তো!

আজ্ঞে না।

আজকে আমি সারাদিন কাজ করব, তুমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে দেখবে। তুমি হবে তন্ত্রধারক। গোটাকতক জিনিস তোমাকে অবশ্য শিখতে হবে। তার মধ্যে প্রথম হল সেফটি। কোন জিনিস কার সঙ্গে কীভাবে মেশাবে! কীভাবে তাতাবে। কেউ স্বভাবে রাগী, কেউ ঠান্ডা। অ্যাসিড, অ্যালক্যালি আর নিউট্রাল, এই নিয়েই আমাদের কারবার। আচ্ছা, এসো, এখন আমাদের টি ব্রেক।

গেলাসে গেলাসে চা নিয়ে শুরু হল আমাদের চা-পর্ব। কেউ বসেছেন চেয়ারে, কেউ উঁচু টুলে। সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় জমে গেল। রবিবাবু হলেন কেমিস্ট-ইনচার্জ। আর একজন ইনচার্জের নাম সমীরবাবু। গোলগাল, বেঁটেখাটো মানুষ। আপেলের মতো গায়ের রং। কুচকুচে কালো চুল। ইনিও খুব আস্তে কথা বলেন। জমিদার ফ্যামিলির ছেলে। এই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কাজ করছেন।

চারদিকে বুনসেন বার্নার জ্বলছে। বাইরে গরম, ভেতরে আরও গরম। তার ওপর গরম চা? রবিবাবু বললেন, প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে। পরে সবই সহ্য হয়ে যাবে। মানুষ কী না পারে! নাও, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া কোডেক্সটা খোলো। আমরা এখন টেস্ট করব, সোডিয়াম স্যালিসিলেট। তুমি পড়ে পড়ে বলো, আমি তোমার সামনে স্টেপ বাই স্টেপ এগোতে থাকি।

বেলা এগারোটার সময় ল্যাবরেটরি কাঁপিয়ে এক ভদ্রলোক এলেন। দৈত্যের মতো বিশাল চেহারা। শালপ্রাংশু মহাভুজ। এই প্রথম একজনকে পেলুম, যিনি গলা ছেড়ে কথা বলেন, ঘর ফাটিয়ে হাসেন। এনার নাম জিমূতবাবু। ইনি মাল তৈরি করার কেমিস্ট। নীচের বিশাল কারখানায় এনার সাম্রাজ্য। সেখানে সারাদিন জলদস্যুর মতো হাঁকডাক করে ঘুরে বেড়ান।

জিমূতবাবু করমর্দনের জন্যে আমার সামনে হাত বাড়িয়ে দিলেন। বাঘের থাবায় আমার বেড়ালের থাবা তিনবার নেচে উঠতেই মনে হল কাঁধের কাছ থেকে আমার হাত খুলে বেরিয়ে যাবে। হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, আজ মাংস, আজ মাংস।

জিমূতবাবু আমাদের লাঞ্চ ইনচার্জ। যেদিন মাংস হয়, জিমূতবাবু সেদিন নিজে মাংস রাঁধেন। সে রান্না হয় নীচের কারখানায়, স্টিমে।

জিমূতবাবু বললেন, আজ তা হলে পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দিতে হবে। খেয়ে বলবেন, কেমন হয়েছে। সুবীর, তুমি তা হলে পৌনে একটার সময় নীচে যাবে।

জিমূতবাবু চলে গেলেন। ল্যাবরেটরি নিস্তব্ধ। বিকারে ফোঁটা ফোঁটা রি-এজেন্ট পড়ার শব্দ। ফ্লাস্কে জল ফোটার শব্দ। ফিল্টার পেপার লাগানো ফানেল থেকে টিপটিপ করে নেমে চলেছে তরল পদার্থ। সার সার বোতলে টলটল করছে নানা রঙের রি-এজেন্ট। বাতাসে উত্তাপ কাঁপছে, ইথার আর ক্লোরোফর্মের গন্ধ ভাসছে।

রবিবাবু বললেন, চলো, সেনসিটিভ ব্যালান্সে কীভাবে ওজন করতে হয় তোমাকে শেখাই।

ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল, ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে বসার উপায় নেই। পা দুটো ইতিমধ্যেই বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। ফুলোফুলো লাগছে। আলাদা একটা ঘরে, কাচের আধারে সারি সারি ওজন যন্ত্র। এর মধ্যে একটা-দুটো এত সূক্ষ্ম যে হাওয়া ওজন করা যায়। এই একটি মাত্র জায়গা যেখানে একটু বসা চলে।

সাড়ে চারটের সময় রাস্তায় নেমে মনে হল, আর এক পা-ও হাঁটতে পারব না। পা দুটো থামের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। জুতো দু'পাটি কাপ হয়ে বসে গেছে। মাথা টলছে। একটা জিনিসই মুখে লেগে আছে, জিমূতবাবুর রান্না করা বাষ্পপক্ক মাংস। বেশ বড় মাপের মাটির ভাঁড়ে সেই মাংস যখন ঘরে এসে ঢুকল, গন্ধেই আমি কুপোকাত। যেমন তার বর্ণ, তেমনি তার স্বাদ। পাঁঠার মতো একটা জিনিস যে এইভাবে রূপান্তরিত হতে পারে আমার জানা ছিল না। আজ এই খেয়ে বুঝলুম। নাঃ, প্রতিষ্ঠানটি সত্যিই সর্বাঙ্গসুন্দর। জয় বাঙালি। ভাগ্য এতদিনে মুচকি হেসেছে। শেষরক্ষে হলে হয়।

সামনেই সেদিনের সেই পার্কটা। একটু বসে যাই। অনেকটা গেলে, তবে বাস কি ট্রাম মিলবে। আয়ারা প্যারাম্বুলেটরে চাপিয়ে ফুটফুটে সব বাচ্চা নিয়ে এসেছে। আগামী পৃথিবী মনে হয় খুব সুন্দর হবে। আজকের মতো সূর্য বিদায় নিচ্ছে। বাতাসে রাতের শীতল ওড়না উড়ছে। সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে কনকের কথা মনে পড়ে গেল। কনক এখন কোথায়?

জানি না কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়।

একে অমাবস্যা। তায় শনিবার। তার ওপর রটন্তি কালীপূজা। রাত একেবারে গমগম করছে। পিচকালো আকাশে তারার খই ফুটছে। শুকনো বাতাস বইছে। ঘুরঘুরে বাবার আশ্রম কেমন যেন থমথম করছে। দূরে কোথাও শেয়াল ডাকছে। রাত যে এত রহস্যময়ী এখানে না এলে বোঝা যেত না।

মেসোমশাই রেগে মেয়েকে নিয়ে প্রতাপ রায়ের বাড়ি থেকে চলে এসেছেন। ভদ্রলোকের সে দাপট আর নেই। বেশ ভেঙে পড়েছেন। এত ভেঙেছেন যে আজ আর আমাদের সঙ্গে আসেননি। মাতামহ যা ধরেন, তার শেষ দেখে ছাড়েন। আমরা দু'জন বারকতক বাস পালটে, সন্ধের মুখে এখানে এসে হাজির হয়েছি। একে একে আমাদের মতো আরও সব বিশ্বাসী মানুষ এসে পড়েছেন। মহিলারাও আছেন। এক এক জনের এক এক সমস্যা। কারুর ছেলের অসুখ। কারুর স্বামী মরণাপন্ন। কারুর চাকরি নেই। সমস্যার ভারে সবাই নেতিয়ে পড়ে, এখানে ওখানে বসে আছেন চুপচাপ। অন্ধকারে বসে বসে কবিতার সেই লাইন ক'টা মনে পড়ছে: মুখ দিল যে, ভুখ দিল সে, মৃত্যু দিল লেলিয়ে পাছে পাছে।

মাতামহ মাঝে মাঝে চটাস করে মশা মারছেন। সামান্য শব্দ, তাই কত জোর মনে হচ্ছে! নির্জনতা এমন জিনিস! মাতামহ গুনগুন করে গান ধরলেন, শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি/শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি! ক্রমশই ভাব আসছে। হঠাৎ গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে না ওঠেন! গান থেকে মনটাকে ঘুরিয়ে আনা দরকার।

দাদু!

বল।

ঘুরঘুরে বাবা কখন আসনে বসবেন?

আর একবার শেয়াল ডাকুক।

কখন আবার ডাকবে?

সে ওদের ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ির নিয়মে ওরা ডাকে। তুই কি ভাবিস মানুষই একমাত্র জীব। পৃথিবীতে কত আধ্যাত্মিক প্রাণী আছে জানিস? এই যে কচ্ছপ, কচ্ছপ কত বড় যোগী! শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর কী কন্ট্রোল! কুম্ভক করে বসে রইল সারাদিন। এক-একটা কচ্ছপ তিনশো-চারশো বছর বাঁচতে পারে। ঐরাবতের স্বভাব হল ঋষিদের মতো। নিরামিষাশি। শরীরটা দেখেছিস! একেবারে পর্বতের মতো। ধীর, স্থির। রেগে গেলে দুর্বাসা।

কিন্তু দাদু, শেয়াল তো শুনেছি ভীষণ ধূর্ত। চোর। শেয়ালের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার কী আছে?

শেয়াল হল তান্ত্রিক। শৃগাল ছাড়া তন্ত্রসাধনা হয় না। শেয়ালের ডাক শুনেছিস? এমন উদাত্ত গলায় আর কোনও প্রাণীকে ডাকতে শুনেছিস? শেয়ালের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ভীষণ জোরদার। শুভ, অশুভ দুটোই আগেভাগে জানতে পারে। যেসব প্রাণী রাতে জাগে তারা সবাই হল সাধক।

পাখি তা হলে সাধক নয়?

হ্যাঁ, পাখিও সাধক। শেষরাত্রে সে ঈশ্বরকে ডাকে। একটি ডালে দুটি পাখির অর্থ বুঝিস?

না।

জীবাত্মা আর পরমাত্মা। পাশাপাশি, দুটোই এক। কথামৃতে ছবি দেখেছিস তো? পাখি ডিমে তা দিচ্ছে। চোখদুটো ফ্যালফেলে। ঠাকুর বলছেন, যোগীর চোখ ওইরকম ফ্যালফ্যাল করে। তখন থেকে তুই ছটফট করছিস কেন? শান্ত হয়ে বোস না।

ভীষণ মশা কামড়াচ্ছে যে!

সহ্য করতে শেখ। সাধনজগতে শরীরকে তৈরি করতে হবে লোহার মতো করে। টললে চলবে না, টসকালে চলবে না। আমি লৌহভীম বলে শুরু করতে হবে। চাকরিটা কেমন লাগছে?

বেশ ভালই। তবে চাকরি তো। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, আট ঘণ্টা আটকে থাকা।

খাঁচার পাখি, তাই না! বড় দুঃখু রে! ভেবেছিলাম তোকে সংসারী করে দিয়ে কংখলে চলে যাব। যাঃ শালা, মেয়েটাই হারিয়ে গেল। তুই আমাকে একটা জিনিস কিনে দিবি?

কেন দোব না! বলুন কী চাই?

কলুটোলা থেকে আমাকে একটা আলবোলা কিনে এনে দিবি! বেশ লম্বা নলঅলা। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে, বেশ ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে, জমিদারদের মতো ফরসিতে অম্বুরি তামাক খাই। শোন, সংসারে যদ্দিন বাঁচবি, রাজার মতো বাঁচবি।

অন্ধকারে ফোঁসফোঁস করে মেয়েলি গলার কান্না শোনা গেল। কাঁদে কে? মাতামহ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। অন্ধকার কোণ থেকে প্রবীণা কোনও মহিলার উত্তর ভেসে এল, আমার মেয়ে বাবা।

মাতামহ বললেন, কেন, খিদে পেয়েছে?

আমার মাতামহের এই এক দোষ। কখন কী যে বলে বসেন! আঃ, দাদু, খিদে পাবে কেন? যিনি কাঁদছেন তিনি বয়েসে বড়, শিশু নয়।

ও, তাই নাকি! তা হলে, মনে খুব দুঃখ হয়েছে। দেখো, কী আবার হল!

প্রবীণা মহিলা বললেন, এক শয়তান ছেলে মেয়েটার জীবন নষ্ট করে দিয়ে পালিয়েছে। বাবা কথা দিয়েছেন, এর জীবনের একটা বিলিব্যবস্থা করে দেবেন।

মাতামহ গর্জন করে উঠলেন, ওর আর বিলিব্যবস্থা কী? কোথায় সেই ছেলেটা আছে বলো, জুতিয়ে লাশ করে দিই।

সে আর এ দেশে নেই বাবা, জার্মানিতে গিয়ে বসে আছে। সেখানে এক মেমসায়েব জুটিয়েছে।

বসে আছে বসে থাক। মেয়ের আবার বিয়ে দাও।

এ পোড়া দেশে বাবা মেয়েদের একবারই বিয়ে হয় না, দ্বিতীয়বার কে বিয়ে করবে? তেমন ছেলে কি আছে? ঠোকরানো ফল কি দেবতার পুজোয় লাগে!

তা হলে মেয়েকে বিন্ধ্যাচলের কোনও আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। আসল দেবতার সেবা করুক।

সকলে কি তা পারে বাবা! সংসারের মায়ায় সব লাটুর মতো ঘুরছে।

মাতামহ উঠে পড়লেন, চল, একটু ঘুরেফিরে দেখি। দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। কেন যে মানুষ জন্মায়!

অন্ধকারে অন্ধকারে অনেকেই এসেছেন। এক ভদ্রলোক মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। অন্ধকারে কে যেন জিজ্ঞেস করলেন, প্রবোধ, খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা!

মাতামহ থমকে দাঁড়ালেন। গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে?

উত্তর এল, আর কী হবে দাদা! রাজরোগ। পেটে ক্যান্সার।

আরও দু'ধাপ এগোতেই দেখা গেল সামান্য একটু শ্বাস নেবার জন্যে এক মহিলা ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছেন। এই বয়েসেই হাঁপানি! এই অমাবস্যার রাতে, ঘুরঘুরে বাবার আশ্রমে নামহীন মানুষের দল এমন কিছুর আশায় এসেছেন, যা অলৌকিক। বিজ্ঞান যা দিতে পারে না, বাবা তাই দেবেন।

বাবার গলা পেয়ে আমরা ফিরে তাকালুম।

বাবার বিশাল শরীর দাওয়ায় পিলারের মতো খাড়া। ঘরের দরজা খোলা। ঘরে মিটমিট আলো জ্বলছে। সেই আলোর সামনে বাবাকে মনে হচ্ছে অন্ধকারের দেবতা। বাবা অদ্ভুত গলায় ডাকছেন, আয়, আয়, আয়। অতি সাধারণ একটি শব্দ, কিন্তু ডাকার ধরনে এই ছায়াময় পরিবেশ কেমন যেন ভৌতিক হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে সমস্ত অশুভ শক্তি চারপাশ থেকে হিলহিল করে ছুটে আসছে। চতুর্দিকে যেন বিচিত্র সব আকার আকৃতি প্রাণময় হয়ে উঠছে। বাবা ভৌতিক গলায় প্রেতাত্মাদের ডাকছেন, আয়, আয়। প্রদীপের মিটিমিটি আলোয় ছায়া কাঁপছে। চোখের ভুল কি না জানি না, বাবা ক্রমশই একটি লাল আগুনের মতো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছেন। সারাশরীর যেন জ্বলজ্বলে আগুনের রেখা। প্রতিবার আয় বলছেন, আর মুখ দিয়ে যেন ভলকে ভলকে নীল আগুন ছুটছে, বেশ মোটা বিদ্যুতের রেখার মতো। ভয়ে মাতামহের গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। তিনি ফিসফিস করে বললেন, তোরা বিশ্বাস করিস না, শক্তিটা একবার দেখ। আরে বোকা! ভয়ে কাঁপছিস কেন?

যা দেখছি, তা কি সত্যিই দেখছি?

অন্ধকারে কারা যেন ছুটে আসছে। আকৃতি বিশিষ্ট তাল তাল অন্ধকার এপাশ থেকে ওপাশ থেকে তেড়ে আসছে। মাতামহ ফিসফিস করে বললেন, কী আসছে বুঝতে পারছিস?

না দাদু, মনে হচ্ছে কুকুর।

কুকুর নয় রে বোকা। শেয়াল। কত শেয়াল দেখছিস!

বাবা বললেন, নে সেবা কর।

কী যেন সব ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন। একটা-দুটো নয়, অনেক শেয়াল, গোটা বারো তো হবেই, নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে, শান্ত হয়ে খেতে লাগল। কড়মড় শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, হাড় চিবোচ্ছে। এতক্ষণ যেখানে যত আর্তনাদ আর চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, সব থেমে গেছে। শুধু কানে আসছে

শেয়ালদের নড়াচড়া, নিশ্বাস, আর হাড় ভাঙার শব্দ। মিটিমিটি প্রদীপের আলোয় বাবার বিশাল ছায়া কাঁপছে। নারকেল গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের শ্বাস ভাঙার শব্দ উঠছে।

বাবা হুংকার ছাড়লেন, নে, এবার তোরা পাগলির জয়ধ্বনি কর। ডাক ডাক, গলা ছেড়ে ডাক। একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠ মা। একবার তেড়েফুঁড়ে ওঠ।

শেয়ালগুলো অমনি আকাশের দিকে মুখ তুলে সমস্বরে ডেকে উঠল, হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া। আর বাবার সেই চ্যালা, বামন পঞ্চানন, কোণে দাঁড়িয়ে রামশিঙায় ফুঁ দিল। শেয়ালের ডাক আর ভোঁ ভোঁ শব্দে তলতলে অন্ধকার থলথল করে কাঁপতে লাগল। সারাগায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। কী অদ্ভুত সাধনপদ্ধতি। এমনটি আমি কোথাও দেখিনি। আমি ধ্যান দেখেছি, জপ দেখেছি, ভাবে বিভোর হয়ে মানুষকে নাচতে দেখেছি, সাধনসংগীতে অশ্রু বিসর্জন দেখেছি, হোম দেখেছি। এ জিনিস দেখিনি।

বাবা পা ফাঁক করে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ খলখল করে হেসে উঠলেন। মনে হল বিশাল এক জলপ্রপাত উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নীচে নেমে আসছে। মনে হচ্ছে কোনও গুহার মধ্যে দিয়ে নদী ছুটে চলেছে। হাসি থামিয়ে, দু'হাত ওপর দিকে ধুলো ছোড়ার মতো করে ছুড়তে ছুড়তে বাবা বলতে লাগলেন, যাঃ ব্যাটারা, যাঃ চলে যা, যাঃ যাঃ।

নিমেষে সমস্ত শেয়াল অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা হঠাৎ ভীষণ রেগে গেলেন। অদৃশ্য সেই মহাশক্তিকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, আর কত খাবি, আর কত খাবি! এখনও তোর খিদে মিটল না! দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-লম্বমান-কচোচ্চয়াং। এই নে, তোরা সব নে। লুটে নে, লুটেপুটে নে।

বাবা দু'হাতে মহাশূন্য থেকে কী সব ধরে ধরে আমাদের দিকে ছুড়তে লাগলেন। মাতামহ মহা ব্যস্ত হয়ে বললেন, তুলে নে, তুলে নে।

আমাদের এপাশে ওপাশে কী সব পড়তে লাগল। হুটোপাটি শুরু হয়ে গেল। কে জানে কী পরমপদার্থ জিনিস! নিচু হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা সংগ্রহ করলুম। নরম তুলতুলে, অনেকটা লিচুর মতো। মাতামহও একটা পেয়েছেন। আমাকে বললেন, শিগগির মুখে পুরে দে।

কী এটা? মুখে পুরে মরব নাকি? ধুলোবালি লেগে আছে।

খবরদার, মনে কোনও অবিশ্বাস আনবি না। বিপদ হবে। ভক্তিভরে খেয়ে নে। অমর হয়ে যাবি। আমার ভেতর থেকেও কে যেন বলে উঠল, মূর্খ, যা পেয়েছিস খেয়ে নে। ভয়ে ভয়ে মুখে পুরে দিলুম। অদ্ভুত স্বাদ। পৃথিবীর কোনও বস্তুর স্বাদের সঙ্গে মেলে না। ফল, তবে কোনও বিচি নেই। জিভে পড়ামাত্রই বরফের টুকরোর মতো গলতে শুরু করল। সুন্দর গন্ধ। সারাশরীর স্নিগ্ধ হয়ে গেল। ফিনফিনে বৃষ্টিধারার মতো মনে চিনচিন করে উঠল সুখ। সব দরজা যেন একে একে খুলে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, আমার ভেতর দিয়ে একটা রাজপথ চলে গেছে, আর সেই পথে চলেছে অসংখ্য তীর্থযাত্রী। কেউ বলছেন, হরি ওম তৎসৎ, কেউ বলছেন, জয় শিবশম্ভু, কেউ বলছেন রাম নাম সত্য, কেউ বলছেন, আল্লাহ আকবর। মনে হতে লাগল, ধীরে ধীরে আমি মহাশূন্যের দিকে ভেসে উঠছি। কানে আসছে বাবার হাসির শব্দ। খলখল করে হাসছেন, আর বলছেন, জাগ শালারা, জাগ গুয়ের পোকা, কামিনীকাঞ্চনের দাস। জাগ শালারা শয়তানের ক্রীতদাস।

বাবার চ্যালা আবার শিঙা ধরেছে। শব্দে আকাশের চাঁদোয়া কাঁপছে। তারারা মিটিমিটি করছে। দূরে মড়মড় করে একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ল। বাবা চিৎকার করে বললেন, পালালি কেন শালা! পালালি কেন? এরা আমার কাছে এসেছে। এরা আমার আশ্রিত। ব্রহ্মশম্ভুজলৌঘে চ শবমধ্য-প্রসংস্থিতে। প্রেতকোটি-সমোযুক্তে কালিকায়ৈ নমোহস্তুতে॥ কৃপাময়ি হরে মাতঃ সর্বাশাপরিপূরিতে। বরদে ভোগদে মোক্ষে কালিকায়ৈ নমোহস্তুতে॥

বাবা ত্রিশূল হাতে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। আর হুংকার ছাড়তে লাগলেন, হুংহুংকারে শবারূঢ়ে নীলনীরজলোচনে। বাবার নৃত্য দেখে ভক্তরাও নাচতে লাগলেন, আর চিৎকার করতে লাগলেন, বাবা, বাবা। মাতামহ বললেন, আহা, যেন সাক্ষাৎ শিব। উঃ, কত ভাগ্যে মানুষের এইসব দর্শন হয়? শালা, সংসারের নিকুচি করেছে। ডেকে নিয়ে আয় তোর প্রাইম মিনিস্টার, তোর চিফ মিনিস্টারকে। সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ। ডাক তোর টাটা বিড়লা ডালমিয়াকে। সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ।

বেশ বুঝতে পারছি, মাতামহের পা দুটো নেচে ওঠার জন্যে ছটফট করছে। চেপে ধরে না থাকলে ধেই ধেই করে নৃত্য শুরু করে দেবেন।

বাবা নাচতে নাচতে হাতের ত্রিশূলটি মাটিতে পুঁতে দিলেন। বুকে দু'হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁকলেন, তোদের যার যা অসুখ আছে, এই ত্রিশূল ছুঁলেই সেরে যাবে। একে একে এগিয়ে আয় শালারা। সেই ক্যান্সারের রুগি কোঁত পাড়তে পাড়তে এগিয়ে গিয়ে ত্রিশূল স্পর্শ করলেন। কী হল, তা বলতে পারব না। ভদ্রলোক ছিটকে হাত দুয়েক দূরে উলটে পড়লেন। বাবা অট্টহাসি হেসে বললেন, যাঃ শালা, মরেই গেল বুঝি।

সঙ্গে যে-ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি আর্ত চিৎকারে ডাকতে লাগলেন, বাবা প্রবোধ, ওরে আমার প্রবোধ।

প্রবোধবাবু হাতপা চিতিয়ে পড়ে আছেন ঘাড় কাত করে। বাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডান পায়ের আঙুলটা গায়ে ঠেকাতেই প্রবোধবাবু ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সঙ্গী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কেমন বুঝছ বাবা প্রবোধ?

তড়াক করে খাড়া লাফিয়ে উঠে প্রবোধ বললেন, পারফেক্টলি কিওরড মেসোমশাই।

মাতামহ ঝুঁকে পড়ে বললেন, একেবারে সেরে গেলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবার দয়া।

ভদ্রলোক বাবা বলে চিৎকার করে মহাপুরুষের পায়ে পড়লেন।

বাবা স্নেহের সুরে বললেন, ওঠ, ওঠ, ষোলো আনা কি একদিনেই সারে! কর্কট ব্যাধি। অনেক নিয়ম মেনে চলতে হবে বাবা। স্ত্রীসঙ্গ চলবে না, পান বিড়ি সিগারেট খাবে না। ভোরে উঠে আসনে বসবে। জোরে জোরে শ্বাস নেবে। অনুভব করবে, শীতল বাতাস মেরুদণ্ডের দু'পাশ বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে তোমার মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে। শ্বাস যখন ছাড়বে, তখন মনে করবে গরম কালো বাতাস মেরুদণ্ড বেয়ে নীচের দিকে নেমে চলেছে। যা, পালা শালা।

মাতামহ একপাশে সরে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ওভাবে ছিটকে পড়লেন কেন?

প্রবোধবাবু বললেন, উঃ, কী বলব মশাই, যেই না ত্রিশূলে হাত দিয়েছি, মনে হল হাজার ভোলটের ইলেকট্রিসিটি খেলে গেল সারাশরীরে। অলৌকিক ব্যাপার মশাই। বাবা সাক্ষাৎ দেবতা। এসব জিনিস বিশ্বাস

না করলে সন্দেহই থেকে যায়।

প্রবোধের মেসোমশাই বললেন, আমিও তা হলে ছুঁয়ে আসি একবার। গত তিন বছর লামবেগোয় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি।

কিন্তু ত্রিশূলের চারপাশে এখন তাণ্ডব চলছে। রোগের শেষ নেই, রুগিরও শেষ নেই। হাঁপানি, যক্ষ্মা, বাত, মৃগী, আলসার, প্যারালিসিস সব লাইন দিয়ে চলেছে, আর ছিটকে ছিটকে পড়ছে। রোগ যেন ফুটবল। বাবার ত্রিশূলের লাথি খেয়ে ঠিকরে যাচ্ছে।

মাতামহ বললেন, যা না তুই একবার স্পর্শ করে আয়। তোর তো পেটের ব্যামো, দেখবি সেরে যাবে।

না দাদু, আমার সাহস নেই।

তোর মতো ভিতু আমি জীবনে দুটো দেখিনি।

বাবাকে এইবার মহিলারা ঘিরে ধরেছেন। কারুর মেয়ে স্বামী পরিত্যক্তা, কেউ অত্যাচারিতা, কারুর মেয়ের মাথায় গোলমাল। সারাপৃথিবী যেন শিকড় সমেত উঠে এসেছে। বাবা বললেন, অপেক্ষা কর, এবার আমি আসনে বসব।

মাতামহকে জিজ্ঞেস করলুম, আমাদেরটা কখন হবে? রাত তো অনেক হল।

আজ আর রাতের হিসেব করিসনি। বাবা আমাদের অন্তর্যামী, সময় হলেই ডেকে পাঠাবেন। আয়, আবার আমরা একপাশে চুপ করে বসি।

একটা জারুল গাছের তলায় দু'জনে চুপ করে বসলুম। কালো আকাশে আর গাছের পাতায় মাখামাখি। তারাদের ড্যাব ড্যাবা চোখ জ্বলছে। জ্বোরো রুগির উত্তপ্ত নিশ্বাসের মতো বাতাস বইছে। হঠাৎ চ্যাঁ চ্যাঁ করে একসঙ্গে অনেক প্যাঁচা দিগ্বিদিকে ডেকে উঠল। সত্যিই কী অদ্ভুত, গা ছমছম করানো পরিবেশ। পৃথিবীর চেনা মুখ দিয়ে অচেনা সব বস্তু আর ঘটনা বেরিয়ে আসছে।

আশ্রম প্রায় খালি। কিছু মহিলা কেবল বসে আছেন। বাবা কখন ডাকবেন কে জানে! দূরে বেলতলায় পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বাবা খাড়া বসে আছেন। গাছের কোটরে নিবুনিবু প্রদীপ জ্বলছে। পিঙ্গল জটার মতো ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে। চারপাশ নিস্তব্ধ। প্যাঁচারা একবার না দু'বার ডেকেই চুপ মেরে গেছে।

কোনও কথা না বলে, কতক্ষণ বসে থাকা যায়। বাবার মতোই সিদ্ধাসনে মাতামহ ক্রমশ ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছেন। দু'জনেই একপথের পথিক। আমি এক দল ছাড়া আসামি।

মৃদু স্বরে ডাকলুম, দাদু।

বেশ ভাবগম্ভীর উত্তর এল, বলে ফেল।

আপনার কি মনে হয় কনক খারাপ পথে চলে গেছে!

দুর পাগল, তুই মেয়ে চিনিস না। যেসব মেয়ে খারাপ হয়, তাদের চেহারাই আলাদা। শাস্ত্রে তাদের পরিষ্কার বর্ণনা আছে। খনার বচনে আছে। তোকে দোব পড়ে দেখিস। জানবি মেয়েদের মধ্যেই স্বর্গ আছে নরক আছে। কনক আলাদা জাতের মেয়ে। কিছু পাখি আছে যারা ডাকতে ডাকতে ক্রমশই আকাশের ওপর দিকে উঠে যায়। কনক হল সেই জাতের পাখি, যার আরোহণ আছে অবরোহণ নেই। সে গেছে, সে ভাল দিকেই গেছে।

মেয়েছেলের এত সাহস হয় কী করে! একা একা বেরিয়ে চলে গেল।

সাহস! বলিস কী রে ব্যাটা! সাহস তো মেয়েদেরই হবে। তারা যে শক্তি। জানিস সন্তানধারণ কত বড় সাহসের কাজ! সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে কত মায়ের মৃত্যু হয় জানিস! ব্যাপারটা যদি উলটে যায়, তা হলে কী হবে? কোনও পুরুষের অত সাহস হবে, পারবে অত কষ্ট সহ্য করতে! আমার মেয়ে যদি তোকে ধারণ না করত, তা হলে তুই আসতে পারতিস এই পৃথিবীতে!

তাতে আমার কী লাভ হল? মা তো আমাকে ফেলে পালালেন।

হ্যাঁ, তা ঠিক, ও কাজটা সে খুব ভাল করেনি। থাকলে আমাকেও একটু দেখতে পারত। কিন্তু শালা, তার জন্যে তো তুমিই দায়ী। তুমি এলে, আর অমনি আমার মেয়েটিকেও নিয়ে গেল! না রে, এ আমি এমনি বললুম! পৃথিবীতে কে কীসের জন্যে দায়ী হতে পারে! কোনও কিছুর ওপর মানুষের হাত নেই। মানুষ আসে, মানুষ যায়, মানুষের সুদিন আসে দুর্দিন আসে। জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।

খুব চাপা গলায় মাতামহ গাইতে লাগলেন, ফিরে ফিরে আসি কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।

আজ কিন্তু বেশ ভালই গাইছেন। বেশ মিঠে লাগছে। হয়তো পরিবেশের গুণে। মাতামহ অন্তরায় উঠলেন, কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন! এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর, অধীরে অধীরে যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই!

বৃদ্ধ মানুষ, কত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এতটা পথ এসেছেন, হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। চাপা আবেগে বিশাল বুক ফুলেফুলে উঠছে। মাতামহের কান্না দেখে, মন বড় বিমর্ষ হয়ে গেল। মানুষকে কীভাবে যে একটু আনন্দে রাখা যায়।

পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে বাবা হঠাৎ সাংঘাতিক এক শব্দ ছাড়লেন। বুম বুম করে সেই ডাক যেন অনন্তের টাগরায় গিয়ে ঠেকল। আমার তলপেট গুড়গুড় করে উঠল। মাতামহের চাপা কান্না বন্ধ হয়ে গেল। বাবা ওঁ স্বাহা ওঁ স্বাহা বলে আগুনে কী যেন আহুতি দিচ্ছেন, লেলিহান শিখা নটরাজের মতো নেচে নেচে উঠছে। রাত্রি এখন নিদ্রামগ্ন, জেগে আছেন শুধু সাধক, জেগে আছেন রোগী, আর পুড়ে যাওয়া কিছু সংসারী মানুষ।

বাবা হাঁকলেন, আয় তোরা আয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা এগিয়ে গেলুম। বাবা বসেছেন ঠিক যেন মহাদেবের মতো। ডান হাতে ধরে আছেন একটি চিমটে। কে একজন তাঁর সমস্যার কথা বলতে গেলেন, বাবা সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিলেন, চুপ, চুপ করে বোস। তোরা বলবি কেন? আমি তো সব দেখতে পাচ্ছি রে শালা।

চিমটেটা মাটিতে ঠুকে বললেন, এই রুখে দিলুম। যেখানে আছিস সেইখানেই থাক।

হোমের শিখায় এক সার লাল লাল, উদ্বিগ্ন মুখ। কেউই কিছু বুঝলেন না, বাবা কী রুখে দিলেন, কাকে রুখে দিলেন!

মাতামহ সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে রুখলেন বাবা!

সর্বাণীর স্বামীকে। তোর স্বামীকে মা বেঁধে দিলুম। দিনকতক হাজতবাস করুক। নির্জনে থাকতে থাকতে তোর কথা মনে পড়বে। সামনের বছর পুজোর আগেই সে ফিরে আসবে। রোজ মাঝরাতে হাড়ের চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াবি।

মহিলা বাবা বলে পা ছুঁতে গেলেন, মহাপুরুষ চিমটে ঠুকে বললেন, খবরদার, আমাকে ছুঁবি না। ওপাশে গিয়ে বোস। ভোর হলে চলে যাবি। শ্যামা! শ্যামা কোথায়?

শ্যামা মৃদু গলায় বললেন, এই যে বাবা।

প্রস্তুত হ, প্রস্তুত। তোর বৈধব্যযোগ এসে গেছে।

শ্যামা ফুঁপিয়ে উঠলেন, বাবা, বাঁচিয়ে দাও। বাবা, আমার যে আর কেউ নেই গো!

ভাগ্যের চাকা ঘুরছে মা, তাকে আমি থামাই কী করে? তোর প্রারব্ধ।

মেয়েটি এবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। বাবা এক দাবড়ানি দিলেন, চুপ। গত জন্মে যা করে এসেছিস এ জন্মে তার ফল ভুগতে হবে না! তখন মনে ছিল না! এই দেখ।

বাবা একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিলেন। কী সাংঘাতিক ব্যাপার! এমনভাবে ধরে আছেন যেন আগুন নয়, আইসক্রিমের কাঠি। বাবা আগুন নাচাতে নাচাতে বললেন, এর নাম জীবন। সহ্য করতে শেখ। আগুন নিয়ে খেলতে শেখ। পুড়ে পুড়ে পোড়াকাঠ হয়ে যা। এই দেখ।

বাবা সেই আগুন মুখে পুরে দিলেন। একেবারে রোমহর্ষক ব্যাপার। একবার করে হাঁ করছেন, মুখ দিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। অবাক কাণ্ড! কাঠের টুকরো হোমের আগুনে ফেলে দিয়ে বাবা বললেন, পৃথিবীতে বাঁচতে এসেছিস ফুলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার জন্যে? মামার বাড়ি! সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। আগুন যা জলও তাই, দুঃখও যা সুখও তাই। সবই সেই অনন্ত শক্তির লীলা। ভগবানকে জব্দ কর।

সব শেষে বাবা মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাছে সরে আয়। তোর মনের দরজা খুলে গেছে। সামনের বার তোর কিছু হবে। এবারটা চোখকান বুজিয়ে কাটিয়ে যা।

মাতামহ এক হাতে আমার হাত চেপে ধরে আছেন। তাঁর সারাশরীর কাঁপছে। বাবা এইবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখতে চাস?

থতমত খেয়ে বললুম, কী মহারাজ?

তোর সেই মেয়েটিকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পেতে চাই।

পেতে চাস? না পেলে? শালা মানুষ, কী পেতে চায়, ঠিক কী পেতে যে তার মন চায় মানুষ জানে? আমার দিকে তাকা। বড় বড় চোখে তাকা।

বাবা ফটাস করে একটা তালি বাজালেন।

আমার সারাশরীর কেমন যেন এলিয়ে পড়ল। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল। আমি মারা যাচ্ছি। আমার শরীর স্থির। চিন্তাশূন্য অবস্থা। বিস্মৃতি নেমে আসছে, আঁধার নেমে আসছে। অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, বাবা বলছেন, বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়, পাখির মতো উড়ে যা, খুঁজে দেখ, খুঁজে দেখ।

সারাশরীরে কেমন যেন একটা হ্যাঁচকা টান লাগল। আমার আর কিছু মনে রইল না। শুধু মনে হল আমার অন্দরমহল থেকে কে যেন বেরিয়ে চলে গেল।

একসময় আমার চেতনা ফিরে এল। আমি মরিনি। তবে আমার আমি আমাতে ছিল না। সবে ভোর হচ্ছে। পুব আকাশ জবাফুলের মতো লাল। আমি হাতপা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছি। শরীর যেন পাথরের মতো ভারী। হাত নড়ছে না, পা নড়ছে না। দাঁতে দাঁত লেগে আছে। মাথাটা মনে হচ্ছে আমার নয়, অন্য কারুর।

অনন্ত আকাশের পটভূমিতে ভাসছে আমার স্নেহময় মাতামহের মুখ।

বাবার গম্ভীর গলা কানে এল, ফিরে এসেছে।

মাতামহ বললেন, হ্যাঁ বাবা। কিন্তু দাঁতে দাঁত লেগে আছে।

বাবা ফট করে একটা তালি বাজাতেই খট করে আমার দাঁত খুলে গেল।

ওই দেখা যায় বাড়ি আমার
চারি দিকে মালঞ্চের বেড়া

অবিশ্বাসী পিতা আমার সহজে কিছু বিশ্বাস করতে চান না। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে হাসতে হাসতে বললেন, যাক, বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখে এলেন। আধ্যাত্মিক ম্যাজিক।

বিশ্বাসী মাতামহের মনে বড় লাগল। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি না হয় বোকা বুড়ো। গাধাতে আর আমাতে কোনও তফাত নেই; কিন্তু আমার এই বুদ্ধিমান নাতিটিকে তুমি জিজ্ঞেস করো। এক তুড়িতে সে প্রায় ঘণ্টা আড়াই মৃতের মতো পড়ে রইল। দেহ রইল আশ্রমে, মন ছুটল ভুবন ভ্রমণে।

আরে মশাই, ওকে বলে সম্মোহন। ও বিদ্যে আমাদের পি সি সরকারও জানেন। তা হলে তো হুডিনিকে এনে গেরুয়া পরিয়ে আশ্রমে বসাতে হয়।

মাতামহ তর্কের হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি যখন বিশ্বাস করবে না তখন কার ক্ষমতা তোমাকে বিশ্বাস করায়! তুমি ভূত মানলেও ভগবানকে একেবারেই মানতে চাও না। ভগবানের কী যে খেলা!

বিশ্বাস অবিশ্বাস জানি না, আসলে আমার অত অবসর নেই। জীবন ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে, এখনও অনেক কাজ বাকি। যতটা পারা যায় ততটা সেরে যেতে হবে তো। কে জানে আর আসা হবে কি না! আমি দুটো ঘটনা বিশ্বাস করি, জন্ম আর মৃত্যু, আর বিশ্বাস করি সময়ের গতি। সময়ের নদীতে, বিভিন্ন দূরত্বে বাঁশের খোঁটার মতো আমরা পোঁতা রয়েছি। হুহু করে জল ছুটছে উলটো দিকে। স্রোত কখনও প্রবল, কখনও মৃদু। টাইম টেকস অল।

তুমি প্রারব্ধ বিশ্বাস করো না? তুমি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করো না?

আমি যা দেখি তাই বিশ্বাস করি। অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে চাই না। জন্ম দেখি, বিশ্বাস করি। সেটা পুনর্জন্ম কি না, অনর্থক সেই বিচারে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। মৃত্যু দেখি, বিশ্বাস করি। প্রকৃতিতে শক্তির খেলা দেখি, বিশ্বাস করি। ন্যাচারাল ফোর্সেস। বিশ্বাস করি নিজের শক্তিকে, মেধাকে। হু ইজ গড? ভগবান আবার কে?

মাতামহ ভীষণ আহত হয়ে বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই।

কী করে বলবেন? ভগবানকে তো আপনি আর হাত ধরে আমার সামনে হাজির করতে পারবেন না। আমার মতোই একজন মানুষকে ভগবান বলে চালাতে চাইবেন।

তুমি আগুন খেতে পারবে?

চেষ্টা করলেই পারব। এত কিছু খেতে পারছি, অভ্যাস করলে আগুনও খেতে পারব।

অত সহজ নয়, হরিশঙ্কর।

বেশ, আপনি নাপ্পি খেতে পারবেন?

সে আবার কী?

বার্মিজদের প্রিয় খাদ্য। মাটির তলায় পুঁতে-রাখা পোকা-ধরা পচা মাংস।

অসম্ভব, ভাবলেই গা গুলিয়ে উঠছে।

ওরা কিন্তু সবচেয়ে বড় উৎসবের দিনে সম্মানিত অতিথিকে নাপ্পি পরিবেশন করে থাকে। সবচেয়ে বড়া খানা, আমাদের বিরিয়ানির মতো। সবই হল অভ্যাসযোগ। উট কাঁটাগাছ খায়। আপনি পারবেন। আমাদের ফকস সাহেবও আগুন খেয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে। গণপতি ম্যাজিশিয়ান, কাঁটা পেরেক, কাচ, অ্যাসিড মুড়িমুড়কি আর শরবতের মতো খেতে পারেন। এর মধ্যে ধর্ম নেই, ঈশ্বরও নেই। কৌশল।

তোমার কোনও কথাই আমি ঠিকমতো ধরতে পারি না। আজ এক রকম বলো, কাল এক রকম বলো। এই সেদিন বললে, ভূত আছে। ভূত থাকলে ভগবানও আছে। আজ বলছ কিছুই নেই। ঘুরঘুরে বাবা জাদুকর হলেও, তোমার ছেলে তো ম্যাজিশিয়ান নয়। ও তা হলে কীভাবে দেহমুক্ত হয়ে সারাভারত ঘুরে এল। শেষে সেই হৃষীকেশের এক আশ্রমে কনককে খুঁজে পেল।

এই ঘরে বসে আমিও সারাভারত এখুনি ঘুরে আসতে পারি। দেখবেন? আমি এক্ষুনি কন্যাকুমারী চলে যাব! কল্পনাপ্রবণ মানুষ অনেকরকম ধাপ্পা দিতে পারে। কাঞ্চীপুর বর্ধমান ছয় দিনের পথ, একদিনে উত্তরিল অশ্বমনোরথ।

কী তুমি বলছ হরিশঙ্কর! তোমার মতো কালাপাহাড় কেউ দেখেছে! আমার নাতি ধাপ্পা দেবে?

ধাপ্পা দেবে কেন? স্বভাবে দুর্বল শরীরে দুর্বল। সে পড়েছে বলিষ্ঠ মনের খপ্পরে। ওর কল্পনাটাকেই তিনি সত্যির মতো করে দেখিয়েছেন। একে বলে সাজেশন। যেমন মায়ায় জগৎভ্রম। কোথাও কিছু নেই, অথচ আমরা ঘরবাড়ি দেখছি, পাহাড়পর্বত দেখছি, গাছ দেখছি, ফুল দেখছি। স্বপ্নই কেমন সত্য হয়ে উঠছে। আজ থেকে ছ'বছর আগে ও আমার সঙ্গে হৃষীকেশে গিয়েছিল। বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লি, কানপুর কোথাও গেল না ও গেল হৃষীকেশে। সেখানে সারদা ভবনের প্রেয়ার হলে কনককে দেখে এল। এর চেয়ে সহজ রচনা আর কী আছে!

রচনা?

হ্যাঁ রচনা। পরীক্ষায় দেয় না? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা, ভ্রমণ, একটি দিন, ওই জাতীয় একটা কিছু। মেসোমশাই সর্দিতে ফোঁসর ফোঁসর করতে করতে ঘরে এলেন। ভদ্রলোকের মন আর শরীর দুটোই ভেঙে পড়েছে। মুকু এমনিই একটু অমিশুক ধরনের ছিল। দিদির অন্তর্ধানে আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। বেশির ভাগ সময়েই বারান্দায় বসে বসে উদাস চোখে আকাশ দেখে। কাছে গেলে সরে যায়।

মেসোমশাই চেয়ারে বসে বললেন, তা হলে আমরা কবে যাচ্ছি?

পিতা বললেন, কোথায় যাবেন?

কেন হৃষিকেশে? কনক যে-আশ্রমে আছে।

কী করে বুঝলেন কনক হৃষীকেশেই আছে?

এই যে ওঁরা বললেন।

ওঁরা কি দেখে এসেছেন?

না তা নয়, তবে দৈবপ্রভাবে দেখেছেন।

পিতা বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই। তিনি উঠে চলে গেলেন। একেবারে ঘরের বাইরে। মাতামহ বললেন, এই একটা মানুষ! কখন যে কীরকম! বাঘকে বাগ মানানো যায়। আমার এই জামাইটিকে যায় না। আমিও চলি। হাওয়া বড় এলোমেলো বইছে।

মেসোমশাই অসহায়ের মতো বললেন, একটা সিদ্ধান্তে তো আসতে হবে!

তা হবে, তবে সিদ্ধান্তে আসার মালিক তো উঠে চলে গেল। সে দলে না ভিড়লে কিছুই তো করা যাবে না।

মেসোমশাই হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, উঃ কী ফাঁপরেই যে পড়া গেল!

মাতামহ সত্যিই চলে গেলেন। মেসোমশাই আমার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলেন না।

অপরাধীদের তালিকায় আমি বোধহয় পয়লা নম্বরে আছি। আসামি নাম্বার ওয়ান।

কেউ কিছু না করুক, আমি করবই। প্রয়োজন হলে গৃহত্যাগেও প্রস্তুত। আমি কনককে স্বচক্ষে দেখেছি। চোখ কি চোখের! চোখ তো মনের। পিতা যাই বলুন, ঘুরঘুরে বাবার অসীম শক্তি। আমি আমার থেকে বেরিয়েছি, আবার আমাতে এসে ঢুকেছি। এমন অভিজ্ঞতা ক'জনের হয়! ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে! জ্ঞান দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে কি সবকিছুর সমাধান হয়! তাই যদি হবে তা হলে মাঝরাতে ঘরে সেই জোড়া চামচিকি ঢুকলে, পিতা কেন রহস্যময় গলায় বলেন, চুপ, চুপ, এসেছে। সে তা হলে কীসের ইঙ্গিত!

দুপুরে সবে চান করে উঠেছি, কাকিমা ফিসফিস করে বললেন, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম, তবু বললুম, কী উপকার?

কাপড় ছেড়ে এসে তুমি আমার পুজোটা করে দেবে?

কী পুজো?

এমন কিছু না, ঠাকুরকে একটু ফুল, বাতাসা আর জল দিয়ে দেবে, আর একটা ধূপ জ্বেলে দেবে।

রোজ তো আপনি দেন, আজ আমি কেন?

মেয়েদের মাসে পাঁচ দিন ঠাকুর ছোঁবার উপায় থাকে না।

কেন?

উঃ আচ্ছা বোকার পাল্লায় পড়েছি! সব কেনর উত্তর দেওয়া যায় না। বুঝে নিতে হয়। পাঁচ দিন মেয়েদের শরীর খারাপ থাকে। এত বড় ছেলে হলে, কত কী যে জানো না!

কাপড় ছেড়ে আবার নীচে নামতে হল। সেদিন অফিস থেকে একটা ফ্রিপ্যাকেট পেয়েছি। তাতে ছিল, গোটাকতক গায়েমাখা সাবান, দুটো কাপড় কাচার বড় বার সাবান, মাথায় মাখার দু'শিশি তেল, স্নো, সেন্ট, পাউডার। ঠিক করেছিলুম হাফ কাকিমাকে দোব, আর হাফ দেব মায়াকে। যতই হোক মায়া আমার প্রেমিকা। একটু পাগলি আছে। সেদিন একটা চিঠি লিখেছে। কী তার ভাষা! মনে হয় কোনও বই থেকে টুকে দিয়েছে। প্রিয়তম, জীবন বড় ছোট। একদিন ফুরিয়ে গেলে টের পাবে, তখন চোখের জল ফেললেও আমাকে আর

পাবে না। তুমি বলেছিলে সাধু হবে, আমি হব তোমার ভৈরবী। তোমার একটা কথারও যদি ঠিক থাকত। শুনলুম চাকরি পেয়েছ? চলো এবার তা হলে পালাই। চিঠিটা গোল করে ঢোলের মতো একটা মাদুলির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। পিতৃদেবের হাতে পড়লেই হয়েছে আর কী!

তেল সাবান স্নো পেয়ে কাকিমা কী খুশি। একবার এর ছিপি খোলেন, ওর ঢাকনা খোলেন, গন্ধ শোঁকেন আর বারেবারে বলেন, এই সব তুমি আমাকে দিলে? তুমি আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে? কখন মাখি বলো তো! একদিন এইসব মেখেটেখে, বেশ সেজেগুজে কোথাও গেলে হয়! যাবে একদিন?

কাকাবাবু রাগ করবেন।

তাও তো বটে! আমি এক ক্রীতদাসী, হেঁশেল ঠেলার জন্যেই জন্মেছি। জন্ম আঁতুড়ঘরে, মৃত্যু রান্নাঘরে। যাই বলো, তোমাকে আজ বেশ ঠাকুর ঠাকুর দেখাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি বলুন, কী করতে হবে। এখুনি ওপরে হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যাবে।

তুমি ওই কুলুঙ্গির পরদাটা সরাও। ধূপ জ্বালো, বাসি ফুল ফেলে নতুন ফুল দাও, কৌটোয় বাতাসা আছে, পুজোর থালায় গোটাকতক সাজিয়ে দাও, ছোট এক গেলাস গঙ্গাজল ধরে দাও। পরদা টেনে চোখ বুজিয়ে আসনে বসে বলো, মা খাও, মা খাও।

কাকিমা বড় গোছানে। এই এঁদো ঘরেই কী সুন্দর আয়োজন! পরদাটি একপাশে সরাতেই তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতার বেশ কয়েকজনের দর্শন মিলে গেল। পরিচ্ছন্ন পটে হাসিহাসি মুখ মা কালী, দশভুজা দুর্গা, গণেশ, মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী, সুদর্শন চক্রধারী নারায়ণ, মাটির মহাদেব, পেতলের রাধাকৃষ্ণ।

চেয়ারের ওপর গোল করা ছিল কম্বলের আসন। মেঝেতে পেতে চোখ বুজিয়ে বসলুম। সবই মায়ের খেলা। কেমন ফাঁদে ফেলে দিলেন। কাকিমা না বললে, এমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মতো আসনে বসতুম কি! কার পুজো কে করে! চোখ বুজোতেই, প্রথমে ভেসে উঠল কাকিমার মুখ। সেদিনের সেই ছবি, হাতে জবাফুল নিয়ে বেরোবার সময় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সে মুখ চোখের সামনে থেকে সরতেই চায় না। অতি কষ্টে যদিও বা সরানো গেল, সামনে এসে দাঁড়ালেন ঘুরঘুরে বাবা। আমি বললুম, বাবা খাও। কী আর করব, দেবী যখন দর্শনে দুর্লভ, দেবতার প্রতিনিধিকেই নৈবেদ্য নিবেদন করি।

বাবা হাসলেন। বলতে চাইলেন, সামান্য ফুল বাতাসা কী খাব রে শালা! আমার ভোগ আলাদা। বাবা দুই চোখের মাঝখানের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন। এসে দাঁড়ালেন ঊষাদি। বাঃ বেশ মজা! জয়ামাতার আসতে কী হয়েছিল! ঊষাদির হাতদুটো আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। এখুনি উঁচু করে তুলে ধরে ঠোঁটে ভিজেভিজে চুমু এঁকে দেবেন। শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। মনে মনে বললুম, না না, আর না।

ঊষাদি সরলেন বটে, এসে গেলেন চিত্রাদেবী। ঘনঘন রুমাল নাড়ছেন আর বলছেন, বাব্বা, কী গরম! ব্যর্থ চেষ্টা। কোনও দেবীই এই পোড়া চোখে আসবে না। দৃষ্টি দূষিত হয়ে গেছে। আসন গুটিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। কাকিমা বললেন, 'উঃ তোমার কী ভক্তি গো। খাড়া বসে আছ তো বসেই আছ। তোমার মতো ভক্তি পেলে আমি নির্ঘাত স্বর্গে যেতুম। নাও, প্রসাদ তুলে নাও। একটা বাতাসা মুখে ফেলো, আমি জল এনে দিচ্ছি।

ঝকঝকে মাজা গেলাসে জল খাচ্ছি, কাকিমা বললেন, আহা রে গরমে পিঠটা ঘেমে গেছে। মুক্তোর দানার মতো ঘাম ফুটেছে, এসো মুছিয়ে দিই।

শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার পিঠের ঘাম মোছাতে লাগলেন। এবার গায়ে কাঁটা দিল ভয়ে। পিতৃদেব একবার যদি দেখতে পান, বলবেন, যাও, চান করে এসো। আঁচলে অশুদ্ধ হয়েছে।

আমি তা হলে এবার আসি কাকিমা!

না, আর তোমাকে আটকাব না। কাল সকালে তুমি আমার পুজোটা করে দেবে!

সময় পাব! কাল তো আমার অফিস!

ওই তো চান করে ওপরে ওঠার আগে।

ঠিক আছে। কাকাবাবু কোথায় গেছেন?

কাকিমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তবলা বাজাতে।

কোথায়? দূরে?

মহিষাদল রাজবাড়িতে।

কবে ফিরবেন?

যবে সেই মেয়েমানুষটা ফিরবে।

মেয়েমানুষ?

সে তুমি বুঝবে না। তুমি এখনও বড় সরল। মানুষের বয়েস বাড়লে তার সব চলে যায়। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব, একটু দাঁড়াও।

কাকিমা নিচু হয়ে চৌকির তলা থেকে একটা টিনের বাক্স বের করলেন। ডালা খোলার সময় কোঁচ করে একটা শব্দ হল। নাকে এসে লাগল অতি পরিচিত, সুখ-সুখ সঞ্চয়-সঞ্চয় সংসার-সংসার একটা গন্ধ। এ গন্ধে ত্যাগ নেই, সন্ন্যাস নেই, অনেকটা মেয়েদের অঙ্গের গোপন গন্ধের মতো। বহু দূর থেকে ভেসে আসা, বহু দূরে চলে যাওয়া। কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যা আমার কাছে ভারী অদ্ভুত। গোলাপি রং, বাক্সের ডালা খোলার শব্দ, ভেতরের ন্যাপথলিন আর সেন্ট মেশানো গন্ধ, ঝুলনের পুতুল, কালীয়দমন, বকাসুর বধ, উত্তরা অভিমন্যু, রথের চাকা বসে-যাওয়া বীর কর্ণ, সুভদ্রা হরণ, বর্ষাকাল, রথ, একই সঙ্গে পেঁয়াজি আর কাঁঠালের গন্ধ। মনের ভেতর মঞ্জিল তৈরি হয়।

কী গো তোমার ঘোর লেগে গেল নাকি? কোন জগতে চলে গেছ? তখন থেকে তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি!

আপনার বাক্স খোলার শব্দে ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিলুম?

ইস, তুমি একেবারে ঠিক বলেছ। বাক্সটা খুললে আমারও তোমার মতোই মনে হয়। কোথায় যে চলে যাই। আর একবার মরে জন্মাতে ইচ্ছে করে।

আপনি এর মধ্যে কতবার মরেছেন কাকিমা?

ওই হল রে বাবা। বলতে গিয়ে গুলিয়ে গেছে। মরে আর একবার জন্মাতে ইচ্ছে করে। নাও দেখো। সিল্কের সুতো দিয়ে বোনা গেঞ্জির মতো কী একটা জিনিস কাকিমা আমার হাতে তুলে দিলেন।

কী এটা? গেঞ্জি?

হ্যাঁ গো? কার বলো তো?

কার? কাকাবাবুর?

আজ্ঞে না মশাই। তোমার। কাউকে বলবে না। আর দু'-এক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

এই সুতো পেলেন কোথায়?

সে খবরে তোমার দরকার কী? বড়াভাজা খাবে?

বড়া আমার বড় প্রিয়, না বলি কী করে?

তা হলে এসো, পিঁড়ে পেতে দিই, বোসো, গরম গরম ভাজি। বড়া ভাজতে ভাজতে কাকিমা বললেন, আমার বড় শখ ছিল।

কী শখ?

ওই সেই মাথা-খোলা ঘোড়ার গাড়ি চড়ে সারা কলকাতাটা একবার ঘুরব।

ঠিক আছে, ঘোরাব।

আরও একটা আছে।

কী, বলে ফেলুন?

লাজুক-লাজুক মুখ করে বললেন, কাপের আইসক্রিম খাব।

ঠিক আছে খাওয়াব।

আর একটা ভীষণ ইচ্ছে ছিল।

বলুন?

নাঃ, সেটা আর তোমাকে বলব না। সে ভগবানকে বলার জিনিস।

বুঝেছি।

হাসতে হাসতে বললেন, বুঝেছ তো? বড় একা লাগে। আমার তো কেউ নেই।

ঘুরঘুরে বাবার কাছে যাবেন? তিনি সব পারেন।

একদিন নিয়ে চলো না গো!

ঠিক আছে, পরের অমাবস্যায় নিয়ে যাব। সারারাত কিন্তু থাকতে হবে!

ও বাব্বা, তা হলেই তো বিপদ!

খানকতক বড়াভাজা খেয়ে ওপরে উঠে এলুম। শুনলুম কাকিমা গান গাইছেন, ওই দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চের বেড়া। গলাটি বেশ সুন্দর। কোথা থেকে এই গানটি শিখলেন কে জানে! মুকু এসে গম্ভীর মুখে বললে, বাবা একবার ডাকছেন।

মেসোমশাই মেঝেতে মাদুরের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন, হাল-ভাঙা তলা-ছ্যাঁদা নৌকোর মতো। ঘরে ঢুকতেই নরম গলায় বললেন, বোসো।

ভদ্রলোকের ব্যারিস্টারি সুর পালটে গেছে। আহা, মাটিতে কেন, মাদুরে উঠে বোসো।

মেসোমশাই শয়ান থেকে অর্ধশয়ান হলেন। আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, একটা কথা বলব?

হ্যাঁ বলুন না?

আমার আপত্তি নেই। বুঝলে, আমার আর কোনও আপত্তি নেই। তা ছাড়া তুমি চাকরিবাকরি করছ।

আপনি কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

খুব পারছ বাবা। তুমি কি কম ছেলে, ওই যে মিটমিট করে, কলসা নাড়ায়, সে বড় সাংঘাতিক।

দেখুন, আমাদের এখন বিপদের দিন, দাগা মারা কথা নাই বা বললেন।

আমার মাথার ঠিক নেই বাবা, তুমি বাপ হলে বুঝতে। কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কীসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে! তুমি কনককে খুঁজে বের করো, আমি তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে দোব।

আমার সঙ্গে? বোনের সঙ্গে ভাইয়ের বিয়ে?

আহা, তুমি তো সেরকম ভাই নও। রক্তের সম্পর্কে ভাই হলে কথা ছিল। তুমি তো ছেলে খারাপ নও। তা ছাড়া হরিদা, অমন মানুষ তুমি আর দুটি পাবে না। একজন মানুষের মতো মানুষ। অনেস্ট, সেনসিব্‌ল, এ ম্যান অফ ক্যারেক্টার। যা শুনছি, তা ঠিক?

কী শুনছেন?

হরিদা একেবারে গঙ্গার ধারে একটা জায়গা কিনেছেন?

বোধহয়। আমি ঠিক জানি না।

চেপে যাচ্ছ?

সত্যিই জানি না। আমার সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা একেবারে হয় না।

আরে, তুমি বাপের এক ছেলে। সব খবর রাখবে। একটু একটু করে সব বুঝেসুঝে নেবে। মানুষের জীবন। কিছু বলা যায়? আজ আছে কাল নেই।

আর কিছু বলবেন?

কাছে সরে এসো, চুপিচুপি, বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। কনককে কোথায় রেখেছ? ওয়ার্ড অফ অনার কাউকে বলব না।

আশ্চর্য মানুষ আপনি! আমাকে কী করে আপনি কিডন্যাপার ভাবলেন?

না, তোমার সঙ্গে বেশ একটু ইন্টিমেসি গড়ে উঠেছিল। আর আমি একটু অন্য রাস্তায় চলতে চাইলুম। যদি জানো, বলে ফেলো বাপু।

আমি জানি না। তবে জানার চেষ্টা করছি। আমি কনককে দেখেছি। সে আছে আশ্রমে। মনে হয় সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে। এখনও অবশ্য গেরুয়া পরেনি।

মাথা ন্যাড়া করেছে?

না, এখনও করেনি।

কতরকমের গল্প যে তোমরা বানাতে পারো!

আপনাকে তো আমি বিশ্বাস করতে বলিনি। আমার বিশ্বাস আমারই থাক।

তোমার স্বভাবটি বড় উদ্ধত। আর হবে না কেন? বাবার এক ছেলে। আদরে আদরে খাস্তা হয়ে গেছ!

তা হবে।

পিতা সকাল থেকেই এক যান্ত্রিক উদ্ভাবন নিয়ে বড় ব্যস্ত। কয়েক টিন রং এসেছে। যত বাক্সপ্যাঁটরা আছে, সব নতুন অঙ্গসজ্জায় ভোল পালটাবে। হলদে নীল হবে, নীল কমলা হবে, সবুজ লাল হবে। যে রং এসেছে, সে রং বুরুশে লাগানো যাবে না। রং বড় তাড়াতাড়ি উড়ে যায়। টানা যায় না। স্প্রে-গান চাই। সেই স্প্রে-গানের উদ্ভাবনে সকাল গড়িয়ে গেছে। মনে হয় দুপুরও পার করে দেবেন। খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠল। কাপ কাপ চা চলছে। গোটা ছয়েক কাপ পড়েছে। সব একবারে ধোয়া হবে।

রান্নাঘরের দিক থেকে তাঁর কণ্ঠ ভেসে এল, যাঃ, হয়ে গেল। খেল খতম।

পেটমোটা গোলগলা একটা শিশির মুখে রবারের ছিপি। ছিপিতে দুটো গর্ত। একটা গর্তে সোজা একটি কাচের নল, অন্য গর্তে একটি বাঁকা নল। এই পর্যন্ত থিয়োরিতে কোনও গোলমাল ছিল না। সোজা নলে ফুঁ মারলেই বাঁকা নলে তরল পদার্থ তোড়ে বেরোবে। আধ শিশি রং ভরে পিতা যেই ফুঁ মেরেছেন, বাতাস ও তরল রঙের ঊর্ধ্বচাপে ফটাস করে ছিপি ছিটকে চলে গেছে। চতুর্দিকে রঙের স্রোত বইছে। মাতামহ দেখলেই গান গেয়ে উঠতেন, হোরি খেলত নন্দকুমার। সুপক্ক সিঙ্গাপুরি কলার ভুরভুরে গন্ধ বাতাসে। এই রঙে এমন একটা কিছু আছে, যার গন্ধটাই পাকা কলার মতো।

রঙের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে, পিতা নেপোলিয়ানের মতো মুখ করে বসে আছেন। নাকের ডগা লাল টুকটুকে। দাড়িতেও রং লেগেছে। ছিপিটা পড়ে আছে চিতপাত হয়ে। কলার গন্ধ পেয়ে বলাইবাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। কাকে সামলাই! রঙে ভাসমান পিতাকে না কচ্ছপটাকে! ওদিকে এই অবেলায় সিঁড়ি বেয়ে একটি কণ্ঠস্বর উঠে আসছে, হরি আছিস, হরি! পিতা বললেন, রিসিভ দেম, রিসিভ দেম।

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি

সিঁড়ি ভেঙে যিনি উঠে আসছেন, তাঁকে আগে আমি কখনও দেখিনি। গোলগাল, আদুরে আদুরে চেহারা। টকটকে গায়ের রং। ডান গালে বেশ বড় লাল একটি আঁচিল। কোঁকড়া চুল, একমাথা, বাতাসে এলোমেলো। গিলে-করা মিহি পাঞ্জাবি। এত মিহি নয় যে গেঞ্জি দেখা যায়। দুধের মতো ধবধবে সাদা। কালোপাড় ধুতি। পায়ে কালো ভেলভেটের চটি। গৌরবর্ণ পায়ে কালো চটি বড় আচ্ছা মানিয়েছে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মুখের লাল আভার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

আর পেছনে যিনি উঠছেন? দেখেই বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠল। ইনিই সেই বর্ষারাতের ছবি। জীবন্ত হয়ে উঠে আসছেন? সিল্কের শাড়িতে বসন্তের পুষ্পিত উদ্যান। পাখি নেই তবু পাখি ডাকছে। ঈশ্বর কী যে একটা জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন। নাকে আবার হিরের নাকছাবি। কানে ঝাড়লণ্ঠন। ননির হাতে মিছরির ছিলে-কাটা কয়েক সার চুড়ি। গলায় সোনার ইদুর-দাঁত, সৃষ্টিকর্তার তৃপ্তির হাসির মতো হারে মূৰ্ছিত। সেই হারের গতি উপত্যকা বেয়ে পর্বতচূড়ার দিকে চলে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন যেন মোলায়েম একটি ছন্দ! প্রতি পদক্ষেপে সিঁড়ির ধাপ রোমাঞ্চিত হচ্ছে। দু'পাশের দেয়াল যেন বলছে দেখো, দেখো। মানুষের পা কেমন করে এমন নিটোল হয়! নিতম্ব কেমন করে এমন দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। মানুষের মুখে দেবতা কীভাবে এমন করে হাসেন, শরীর কেমন করে এমন কবিতা হয়, হাত কেমন করে এমন মৃণালকাণ্ডের মতো মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমাকে আর রিসিভ করতে হল না। আমি হাঁ-করা গঙ্গারামের মতো সিঁড়ির মাথায় বাক্যহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মন বলতে লাগল, পালা ব্যাটা, বড় সুন্দরী, মনে গেঁথে গেলে, বঁড়শি-বেঁধা মাছের মতো অবস্থা হবে। পায়ে পক্ষাঘাত। পালাব কী, পা জমে গেছে। দুটো পাথরের স্তম্ভ।

হাঁ-করা আমার সামনে দাঁড়িয়ে, সেই সুগৌর গিরিগোপাল বালামচালের মতো মিহি গলায়, মুখ থেকে বিরিয়ানির আতরের সুবাস ছড়াতে ছড়াতে বললেন, বাবা কোথায়?

প্রশ্ন শুনে, শরীরের সাময়িক পঙ্গুভাব কেটে গেল। হঠাৎ মনে হল অতিশয় চাঙ্গা হয়ে উঠেছি। বললুম, বাবার এক্সপেরিমেন্ট ফেল করেছে। রং মেখে হতাশ হয়ে বসে আছেন।

অ্যাঁ বলো কী? হরি, ঘাবড়াসনি, ফেলিয়োর ইজ দি পিলার অফ সাকসেস!

গলা যতটা তুলেছিলেন ঠিক ততটা নামিয়ে বললেন, রং নিয়ে কী করছে?

এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে আর দিতে হল না। পিতৃদেব এসে গেছেন। দেবতার মতোই দেখাচ্ছে। একেবারে লালবাবা। হাতে সেইসব ভজঘট। ছিপি, কাচের টিউব, রবারের নল। বিশ্বকর্মা শেকড় সমভিব্যাহারে উঠে এলেন।

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, একেবারে ফ্রেশ ফ্রম গার্ডেন, কাশ্মীরি আপেলের মতো চেহারা। অ্যাঁ, তোকে ঠিক ড্যানি কে, বাস্টার কিটনের মতো দেখাচ্ছে যে রে!

মেয়েটি টুক করে পিতার চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন। এসো মা এসো মা বলে চিবুক ছুঁতেই ব্যাপারটি বেশ মনোরম হল। অধরের তাম্বুল যেন শ্রীরাধিকার বয়ানে লেগেছে। পিতার হাতের লাল রঙে চিবুক লাল, গালের একাংশ লাল।

ভদ্রলোক বললেন, গিয়েছিলুম দক্ষিণেশ্বরে মেয়েকে নিয়ে। আঃ, দর্শন করে মন ভরে গেল। আহা মায়ের কী রূপ। নে মা, প্রসাদটা কোথাও রাখ। তা বুঝলি হরি, হঠাৎ তুই যেন টানলি। মনে হল, যাই একবার বিজ্ঞানীকে দেখে যাই। তা ভাই, তোমার হাতে এই জলকলমি, শাপলা, শালুকের মতো বস্তুগুলি কী?

আর বলিস কেন পঙ্কজ, কমপ্লিট ফেলিয়োর, টোটাল ডেস্ট্রাকশন, লস অফ মানি, মেটিরিয়েল, ম্যান পাওয়ার। খাওয়াদাওয়া?

মন যা বলছে বলব?

ইয়েস।

ভয়ে না নির্ভয়ে!

নির্ভয়ে।

এইখানেই হয়ে যাক।

হয়ে যাক।

একটা প্রস্তাব। আমি রাঁধব। এবং মাংস রাঁধব।

পাবে কোথায়?

এই যে আমার হাতে। হ্যা হ্যা, তুই কি আমায় এতই মূর্খ ভাবিস?

ত্যাদোটা নয়।

নিজেদের রসিকতায় নিজেরাই হইহই করে হেসে উঠলেন। মরা ডালে যেন ফুল ফুটছে। কড়িকাঠের ঘুলঘুলিতে চড়াইছানা চমকে জেগে চিঁচি করছে।

তা হলে, পঙ্কজবাবু টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, লেগে পড়া যাক। বুড়ি?

মেয়ে প্রসাদের ঠোঙা হাতে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে এসে বললে, বলো বাবা?

নাও মা, লেগে পড়ো। তোমার এই রাজবেশটি ছাড়ো। প্রসাদটা রাখো না, মা।

রাখার জায়গাটা যে কেউ দেখিয়ে দিচ্ছেন না আমাকে।

আহা, তুমি নিজে দেখে নাও।

অলরাইট।

অপর্ণা আপনজনের মতো সহজ ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল। পিতা বললেন, যাও যাও, তুমি সাহায্য করো। কোথায় কী আছে দেখিয়ে দাও।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোর ছেলেটিকে বেশ দেখতে হয়েছে, হরি। মায়ের মুখটি একেবারে কেটে বসানো। খালি গায়ে সের দশেক মাংস লাগাতে পারলে একেবারে মাউন্টব্যাটেনের মতো দেখতে হত।

কী আশ্চর্য মিল, পঙ্কজ। একবার ভেবে দেখেছিস?

ওই মুখের মিলের কথা বলছিস!

তোর মেয়ের মুখের সঙ্গে পিন্টুর মায়ের মুখ।

উঃ, একেবারে সেন্টপারসেন্ট। সেন্টপারসেন্ট মিল। পৃথিবী জুড়ে কী যে সব হতে থাকে। কোথা থেকে কী যে হয়ে যায়। আমার তো মাঝে মাঝে রাতে ঘুম হয় না। ভাবতে ভাবতেই রাত কেটে যায়। দেখ হরি, সব মানুষই দার্শনিক। যার যার নিজের মতো। একটু চা হবে না!

চা হবে না মানে! চা-ই তো আমাদের জীবন। একশো ফোঁটা রক্তে পঞ্চাশ ফোঁটা চা।

পঙ্কজবাবু অট্টহাসি হেসে বললেন, রাক্ষসের প্রাণ যেমন ভোমরায়, তোর আর আমার জীবন তেমনি চায়ের পাতায়। বুঝলি হরি, বড় দুঃখ হয় রে!

কীসের দুঃখ বল! তোর কীসের দুঃখ।

দেখ, তোর বউ মারা গেল, মানে বউঠান মারা গেলেন, তুই সংসারে বড় একা, আমার কিন্তু সবাই আছে, একেবারে পরিপূর্ণ সংসার। আমার সব থাকবে, তোর কিছু থাকবে না, এরকম কেন হবে? খোদার এ কী বিচার! তোর কথা ভাবলেই আমার ভীষণ লজ্জা করে। তুই যোগী, আমি ভোগী। আমি কত ক্ষুদ্র, তুই কত বিশাল।

দেখ পঙ্কজ, আমিও তোর কথা ভীষণ চিন্তা করি। আর যখনই চিন্তা করি, মনে ভীষণ বল পেয়ে যাই, ভাবি পঙ্কজ আমার পাশে আছে। সত্যি কথা বলতে কী, তুই আমার ভায়ের মতো।

শুধু ভাই নয়, বল যমজ ভাই। একটু চা হলে মন্দ হয় না, কী বল?

অফ কোর্স। চা ছাড়া জীবন অচল।

বাট ওয়ান থিং, চা কে করবে?

কেন আমি।

না, তুই নয়, করবে বুড়ি।

তোর মেয়ের ক'টা নাম?

আমি বাপু বুড়ি বলেই ডাকি। তোর মেয়ে নেই বুঝবি না। মেয়েই হল বুড়ো বাপের একমাত্র ভরসা। কী শাসন! সবসময় আগলে আগলে রাখে।

ভেতরের বারান্দায় অদ্ভুত এক দৃশ্য। দুটি মেয়ে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মুকু আর অপর্ণা। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। বেড়াল যেন বেড়াল দেখেছে। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে দু'জনকে মুক্তি দেবার জন্যে পরিচয়টা আমাকেই করাতে হল, ইনি আমার মেসোমশাইয়ের মেয়ে, নাম মুকুলিকা, আমরা ছোট্ট করে ডাকি মুকু। মুকু, এঁর নাম অপর্ণা, আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে।

দু'জনেরই খুব সহবত। হাত তুলে নমস্কার বিনিময় হল।

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে কাকিমা গুটিগুটি উঠে এসেছেন। পানের মতো মুখ ঘামতেলে চকচক করছে। আমার পাশে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, কে গো?

ফিসফিস উত্তর, বাবার বন্ধুর মেয়ে।

কী নাম?

অপর্ণা।

একটা চোখ ছোট করে কাকিমা বললেন, খুব সাবধান, তোমার উপযুক্ত ফাঁদ।

অপর্ণা কাকিমার দিকে তাকাতেই, কাকিমা বললেন, বেশ মেয়েটি।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গিয়ে কাকিমা চুলের বিনুনি নাড়তে নাড়তে বললেন, বাঃ, কী সুন্দর চুল! নাকটা নেড়ে দিয়ে বললেন, টিকোলো নাক। চোখদুটো দেখে বললেন, প্রতিমার মতো চোখ, ভুরু দেখে বললেন, ধনুকের মতো ভুরু, সবশেষে বললেন, গড়নটি কী সুন্দর! ভগবান তোমাকে। একেবারে ঢেলে দিয়েছেন।

কাকিমা যত প্রশংসা করছেন, অপর্ণা ততই কুঁচকে যাচ্ছে। কাকিমা বললেন, তুমি যার হাতে পড়বে তার রাজার ভাগ্য।

অপর্ণা অতি কষ্টে বললে, আপনি?

আমি পিন্টুর কাকিমা।

অপর্ণা প্রণাম করতে গেল। কাকিমা দু'হাত ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, আমি ব্রাহ্মণ নই, মা।

পিতা আর পঙ্কজবাবুর গলা পাওয়া গেল। কাকিমা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নীচের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

পিতা বললেন, একী অপর্ণা, তুমি এখনও ডাঙা পাওনি, জলেই পড়ে আছ? কই হে অবতার?

আজ্ঞে বলুন।

যাও দেরাজ খুলে দাও। পছন্দ করে একটা শাড়ি বেছে নাও। একেবারে নতুন শাড়িও আছে। এর মা পরার সময় পায়নি। জীবনটা তো খুব ছোট ছিল। লজ্জা কোরো না, লজ্জা কোরো না। এ তোমার নিজের বাড়ি।

পঙ্কজবাবু বললেন, তুই জানিস না বুড়ি, আমরা দু'জনে হরিহর আত্মা। কত রাত এ বাড়িতে কাটিয়ে গেছি। হরি, তোর মনে আছে, সেই মহিষাদল রাজস্টেটের গাইয়ে অগস্তিমশাইকে। আঃ, কী গানই গাইতেন! এ বাড়িতে বহুকাল কোনও আসর বসেনি। জীবনটা কী হয়ে গেল!

আর জীবন? এই তো জীবন। যেতে যেতে সবই চলে যায়। যে শেষে যায় তার বড় জ্বালা। সব দোরতাড়া দিয়ে চাবি বন্ধ করে, বারেবারে পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে যাওয়া।

অগস্তিমশাই এখন কোথায়?

জানি না রে। আছেন না গেছেন তাও জানি না। শিল্পীরা বেশিদিন বাঁচেন না।

না না বেঁচে আছেন। বয়েস খুব বেশি নয়।

পঙ্কজবাবু হঠাৎ মুকুকে দেখলেন, মেয়েটি কে?

মেজদার ভায়েরাভাইয়ের মেয়ে, এখানে এসেছিল পরীক্ষা দিতে। ভেরি স্যাড, ভেরি স্যাড।

স্যাড কেন?

এর বড় বোনটি নিরুদ্দিষ্টা হয়েছে।

সেকী? তল্লাশ চলছে?

কিছু বাকি নেই, তোলপাড় চলছে।

আঃ, এইজন্যই সংসার করতে নেই। একটা-না-একটা অশান্তি পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকবেই। একটু চা হলে মন্দ হত না, কী বল হরি?

অফকোর্স!

কাকিমা সিঁড়ির বাঁকে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললেন, আমি করে দোব বটঠাকুর? আমার উনুনে আঁচ গনগন করছে।

পিতা চমকে ফিরে তাকালেন, অ্যাঁ, তুমি, আচ্ছা করবে করো। সেই ভাল চা-টা নিয়ে যাও।

পঙ্কজবাবু বললেন, ইনি?

আমার বাল্যবন্ধুর স্ত্রী। নীচেটা নো-ম্যানস ল্যান্ড হয়ে ছিল, তাই থাকতে দিয়েছি। স্বামীটি গুণী, সুন্দর তবলার হাত, তবে স্বভাবটি তেমন সুবিধের নয়। উড়োপাখি।

সংসার কী জিনিস, হরি! দুটো পাখি কখনও এক ডালে বসতে পারে না। তোর বাগানের গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে। বয়েস কীভাবে বাড়ছে, হরি?

শশিকলার মতো।

পঙ্কজবাবু আবার হইহই করে হেসে উঠলেন, দারুণ বলেছিস। তার মানে অমাবস্যা আসছে। ওটা কী গাছ রে? ওই যে কোণের দিকে। বিউটিফুল হলদে হলদে পাতা।

ও, ওটা হল রিঠে গাছ। কী হল তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে? যাও দেরাজটা খুলে দাও।

আজ্ঞে, ইনি গেলে তবেই তো খুলব?

পঙ্কজবাবু আবার হোহো করে হাসলেন, বুড়ি, তোর কী রেসপেক্ট! ইনি। দুর, বোকা ছেলে। ইনি কী? ইনি? শাড়ি পরেছে বলে এত সম্মান! তুমি বলো, তুমি।

দেরাজে থরে থরে সাজানো মায়ের স্মৃতি। বেনারসি, সিল্ক, ব্লাউজ, সোয়েটার, সোনা-বাঁধানো পাশচিরুনি। ব্রহ্মদেশের বাঁশের তৈরি কারুকাজ করা গোল চৌকো বাক্স। সবই ছিল মায়ের। আর এক মা, আমার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে। ঘরে একটা আলোআঁধারের খেলা চলেছে। দেরাজ থেকে কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। স্মৃতির একটা সুন্দর মন-কেমন-করানো গন্ধ আছে।

অপর্ণা দেখার জন্যে মাথা সামনে নোয়াল। ওর শরীর থেকে কেমন একটা উত্তাপ বেরোচ্ছে, ফুলের গন্ধ। দেরাজের ভেতরটা ঠান্ডা। একগুচ্ছ চুল কপালের ওপর দুলছে। দু'কানে ঝুলে থাকা দুটো দুল, আর পারি না, আর পারি না, ছন্দে দুলছে। নাকের নাকছাবি মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে। পরনের সিল্কের শাড়ি নানা ষড়যন্ত্রে খিসখিস শব্দ করছে। আমার মন বলছে, চেয়ে দেখ, তোর জীবনসঙ্গিনী হতেও পারে, শুধু তুমি ঘাড়টি একটু কাত করবে, মুখে একটু লাজুক লাজুক হাসি টেনে আনবে। ব্যবধান মাত্র এক হাত।

বুকের ভেতর এমন ঢেঁকিপড়ার শব্দ হচ্ছে কেন? কণ্ঠতালু কেন শুকিয়ে আসছে?

তোর ঘোর লেগেছে। পৃথিবীতে এইরকমই হয়। এটা টপকাতে পারলেই মুক্তি। বড় শক্ত কাজ হে। এ যে বিশালাক্ষীর দ।

কাকিমা তখন সৌন্দর্য দেখাচ্ছিলেন, নাক চোখ মুখ গড়ন রং। আমি গড়ন দেখছি। মাথায় আমার মতোই লম্বা। কিন্তু কী সুন্দর! মেয়েটির খুব জীবন আছে। সেই বলে না, এ অনেক দূর যাবে, এই মেয়েটিও আরও অনেক বাড়বে। সবে তো মুকুলিকা! ফুল হয়ে ফুটবে যেদিন! সিল্কের শাড়ি শরীর বেয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে গেছে। কোথাও ক্ষীণ হয়েছে, কোথাও গুরু। নদীর মতো। স্থানে স্থানে শীর্ণ, স্ফীত। মানুষ মারার কল তৈরি করেছেন ঈশ্বর। ফাঁদ পেতেছেন বিশ্বজুড়ে।

এক একটা শাড়িতে আলতো আঙুল বুলোতে বুলোতে অপর্ণা বলছে, কী সুন্দর! কী সুন্দর! এসব আর দেখাই যায় না। সব আপনার মায়ের!

মেয়েটির গলাও কী সুন্দর। মৃদু বাতাসে যেন ঝাড়লণ্ঠনের কাচ দুলছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই ছিল আমার মায়ের।

আমাকে আপনি বলছেন কেন?

বোকার মতো হাসলুম। চিরকালই আমি একটু বোকাবোকা। আমার পেটে খিদে, মুখে লাজ। বোকা বদমাশ।

আমাকে তুমিই বলবেন। ওমা! এটা কী?

ছোট ছোট ঘণ্টা লাগানো ভেলভেটের সেই হাতপাখাটা অপর্ণা খুঁজে পেয়েছে। কোন দেশে তৈরি তা জানি না। তবে বড় সুন্দর জিনিস। নাড়লে বহু দূর থেকে ভেসে আসা প্যাগোডার ঘণ্টার শব্দ ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়।

পাখা রেখে অপর্ণা বললে, উনি বললেন বটে, এসব শাড়ি আমি পরতে পারব না। সে যুগের দামি দামি শাড়ি। পরলে নষ্ট হয়ে যাবে। আমার পরার অধিকার জন্মায়নি।

দাঁড়ান, আমি তলার ড্রয়ারটা খুলি। অনেক আটপৌরে আছে। একটু সরুন।

অপর্ণা একপাশে সরে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে নীচের ড্রয়ারটা টেনে খুললুম। আমার ডান পাশ দিয়ে রমণীয় বৃক্ষের মতো উঠে গেছে রমণী-শরীর। যেন বসে আছি গাছের ছায়ায়। মাথার কাছে ঝুলে আছে পাতার মতো আঁচল। ব্রহ্মতালু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ফিকে গোলাপি রঙের একটা শাড়ি তুলে নিয়ে অপর্ণার হাতে দিয়ে বললুম, এইটা আপনি পরুন। একেবারে নতুন।

শাড়িটা হাতে নিয়ে অপর্ণা বললে, আশ্চর্য সুতো। কত বছরের পুরনো, এখনও ঠিক আছে। তবে পরে বসতে গেলে ফেঁসে না যায়।

ফেঁসে যাবার কথায় ঘাড় তুলে, আড়চোখে অপর্ণাকে একবার দেখে নিলুম। সেদিন ঘর মোছার সময় বসতে গিয়ে আমার অন্তর্বাস ফেঁসেছিল। বসার সময় কোথায় চাপ পড়ে আমি জানি। একযুগ আগের শাড়ি, ফাঁসতেও পারে। অপর্ণার আয়তন আর ওজন দুটোই আমার চেয়ে বেশি।

দরজার ওপাশ থেকে মুকু বললে, আমার একটা শাড়ি পরবে ভাই? কাচা পরিষ্কার।

হ্যাঁ, সেই ভাল।

মায়ের গোলাপি শাড়ি আবার স্মৃতির ভাণ্ডারে ফিরে এল। আমারও মন চাইছিল না। যাক, মেয়েতে মেয়েতে এবার বোঝাপড়া হোক।

পুবের বারান্দায় বসে, দুই বন্ধুর চা চলছে। রকমসকম দেখে মনে হচ্ছে, এঁরা দু'জনেই ঘড়িটড়ির ধার ধারেন না। চা শেষ হবে। মাংস বাছা হবে, ধোয়া হবে। মশলা পেষা হবে। তারপর কষা হবে, সেদ্ধ হবে। ভাত চাপবে। আজ বরাতে লাঞ্চ নেই। একেবারে সেই ডিনার?

ওপাশের ঘরে অপর্ণার চিৎকার শোনা গেল, ও মা গো, এটা কী রে বাবা? পিতা বললেন, দেখো দেখো, কী হল?

মুকু মৃদু গলায় বলছে, কী হল ভাই, দরজাটা খোলো না!

অপর্ণা তিড়বিড় করে বললে, মেঝেতে মালসার মতো কী একটা চলে বেড়াচ্ছে!

উত্তরের ঘরে দরজা দিয়ে অপর্ণা শাড়ি ছাড়ছিল। বুঝেছি, ভয়ের বস্তুটি কী। বলাইবাবু। বড় রসিক মানুষ। সাহস দেবার জন্যে বললুম, ভয় নেই আপনার, ওটা একটা কচ্ছপ। আমাদের পোষা।

ও মা, কচ্ছপ? কচ্ছপ আবার কেউ পোষে? কামড়াবে না?

ও কামড়ায় না, ভারী ভাল ছেলে।

ঘরের ভেতর দুদ্দাড় করে একটা শব্দ হল। বলাইবাবু অপর্ণা দেবীকে নাচ শেখাচ্ছেন। খটাস করে খিল খুলে উত্তরের ঘর থেকে অপর্ণা প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল। মুকুর দেওয়া শাড়িটা কোনওরকমে গায়ে জড়িয়েছে। ছাড়া সিল্কের শাড়ি মেঝেতে ফুলে ফেঁপে পড়ে আছে। বলাইবাবু বেশ আরাম করে তার ওপরে চেপে বসেছেন। বলা যায় না, হঠাৎ যদি টেস্ট করে দেখার ইচ্ছে হয়। মুন্ডুটি মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে।

শাড়িটাকে উদ্ধার করে এনে অপর্ণার হাতে দিলুম। এইসব মন-চঞ্চল-করা কাজই তো আমাকে করতে হবে। এর নাম পরীক্ষা।

শাড়িটা হাতে করে নিয়ে অপর্ণা বললে, ইস, ছি ছি, আপনাকে তুলে আনতে হল? কী লজ্জা? কচ্ছপ পুষেছেন কেন? কচ্ছপ কেউ পোষে! কামড়ালে, মেঘ না ডাকলে ছাড়বে না।

বাজে কথা। কচ্ছপ নিরীহ প্রাণী। কখনও কামড়ায় না।

শাড়ি পরার ধরনে অপর্ণাকে আশ্রমবালিকার মতো দেখতে হয়েছে। বড় বড় চোখে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। না, আর এখানে থাকা উচিত নয়। মুকু যেভাবে তাকাচ্ছে! অপর্ণা একটু এলোমেলো হয়ে আছে। ঠিক ততটাই এলোমেলো, যতটায় যুবকের মতিভ্রম হতে পারে। আমাকে চরিত্রহীন ভাবছে। চরিত্র আবার কাচের গেলাসের মতো। কখন যে ঠুন করে ভেঙে যায়, কোন আঘাতে!

মেসোমশাই গম্ভীর গলায় মেয়েকে ডাকলেন, মুকু।

আসি বাবা, বলে মুকু প্রায় দৌড়ে চলে গেল। অপর্ণা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কে, কে?

মেসোমশাই। মুকুর বাবা।

মেসোমশাইয়ের গলা শোনা গেল। মেয়েকে বলছেন, বড় গোলমাল হচ্ছে। কীসের এই উৎসব! তুমি দরজাটা ভেজিয়ে দাও। আমার জ্বর আসছে। একটু শুয়ে পড়ি।

মেয়ে বললে, চলো বাবা, আমরা ফিরে যাই। এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না। যা করার ওখানে বসেই করা যাবে।

হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছি। শুধু শুধু এঁদের কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

মুকু দরজাটা ভেজিয়ে দিল। অপর্ণা অপরাধীর মতো মুখ করে বললে, আমি কি খুব জোরে চিৎকার করে ফেলেছি?

না না। খুব আস্তে কথাও ওঁর এখন অসহ্য লাগে। বুঝতেই পারছেন, মনের অবস্থা খুব খারাপ।

আমরা খুব বাজে দিনে এসে পড়েছি। বাবা যখন কোনও কিছু নিয়ে মেতে ওঠেন, তখন যেন সামলানোই দায়। যাই বলে আসি, অত হইচই করছ কেন?

না না। অপর্ণার হাতটা প্রায় চেপেই ধরেছিলুম, খুব জোর সামলে নিয়েছি। একেই বলে সংযম!

অপর্ণা বললে, মেসোমশাইয়ের জ্বর আসছে বলছেন, ওঁকে কিছু খাইয়ে দিলে হত না? এঁদের রান্না হতে তো সেই বিকেল পাঁচটা। যেমন আমার বাবা, তেমনি কাকাবাবু!

আমার বাবার জীবনে তো কোনও আনন্দ নেই। শুধুই কর্তব্য। আজ আপনার বাবাকে পেয়ে তবু একটু মেতে উঠেছেন। এ মাতন তো বেশিক্ষণ থাকবে না। ম্যালেরিয়ার মতো, এই ছাড়ে, এই আসে। কী হবে বলে! সব আয়োজন এখুনি থেমে যাবে!

মুকুকে তা হলে ডাকুন না। মেসোমশাইকে যা হোক কিছু খাইয়ে দিক।

মুকুকে আমি ডাকতে পারব না, আপনি ডাকুন। আমার সঙ্গে কথা বলে না।

কেন, ঝগড়া হয়েছে?

না, ঝগড়া নয়। বড়লোকের মেয়ে। বেশ একটু গরব আছে।

কই, আমি তো তেমন কিছু বুঝলুম না। আচ্ছা, দাঁড়ান দেখছি।

অপর্ণা ভেজানো দরজা ঠেলে খুলতে খুলতে ডাকল, মুকু, মুকু। ঘরে একটা পা রেখেছে। মেসোমশাই চিৎকার করে উঠলেন, কে, কনক এলি, কনক? কনক?

বড় হৃদয়বিদারক দৃশ্য। মুখ দেখলেই বোঝা যায়, মেসোমশাইয়ের বেশ জ্বর এসেছে। চোখদুটো ঘোর লাল। কনক, কনক করে, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন। অপর্ণা এক পা এক পা করে পিছু হটছে।

আরে সত্যঘাতী মন! কেন হও বিচঞ্চল?

অপর্ণা পায়ে পায়ে পিছু হটছে। মেসোমশাই পায়ে পায়ে এগোচ্ছেন। মুকু বলছে, বাবা, বাবা, ও দিদি নয়, এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

মেসোমশাই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অপর্ণা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। ফিসফিস করে বললে, এমন জানলে, আমি সামনে যেতুম না। কনককে কি আমার মতো দেখতে ছিল?

অনেকটা। তবে আপনি আরও সুন্দর।

মেয়েদের মুখের ওপর সুন্দর বললে, বড় লজ্জা পেয়ে যায়। খুব পরিচিত হলে, ধ্যাত বলে চড় মারতে আসে। ধরতে পারলে খামচে দেয়। অপর্ণা মুখ নিচু করল।

আমাদের দুই পিতাই ছুটে এসেছেন। আমার পিতা বলছেন, কী হল বিনয়দার! বিনয়দার কী হল!

পঙ্কজবাবু বললেন, ভদ্রলোককে ভীষণ অসুস্থ মনে হচ্ছে।

মুকু মেসোমশাইকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, কী, হয়েছিল কী?

উনি অপর্ণাকে কনক ভেবে ছুটে এসেছিলেন। তা ছাড়া খুব জ্বর এসেছে।

পঙ্কজবাবু বললেন, জ্বর এসেছে? তা হলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়!

পিতা বললেন, উনি বড় বেশি ভেঙে পড়েছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, তুমি কী বুঝবে বলো ভাই! তোমার মেয়ে থাকলে বুঝতে! কী যে করা যায়, আমার মাথায় আসছে না। এত বড় একটা দেশে মেয়ে হারানো মানে, খড়ের গাদায় ছুঁচ হারানো। কীভাবে হারাল হরি?

সে একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার। পুরো ঘটনা তোকে দুপুরে বলব।

অপর্ণা বললে, বাবা, এঁদের মন, মেজাজ, শরীর, কোনওটাই যখন ভাল নেই, তখন তোমার ওই রান্নাটান্না আজ থাক। পরে আর একদিন হবেখন।

ঠিক বলেছিস মা। চল, আজ আমরা চলে যাই।

কাকিমা দরজার ওপাশ থেকে নিচু গলায় বললেন, আমি একটা কথা বলব?

পঙ্কজবাবু ঘুরে গিয়ে বললেন, নিশ্চয় বলবেন।

মাংসটা আমিই বেঁধে দিই। সহজে হয়ে যাবে। আপনারা ততক্ষণ চানটান করে নিন। আমি খুব একটা খারাপ রাঁধি না।

পিতা সার্টিফিকেট দিলেন, না না, তুমি ভালই রাঁধো। বরং পঙ্কজ রাঁধলে কী হত, বলা শক্ত।

অপর্ণা বললে, না না, বাবা খুব ভালই রাঁধে। মা বলেন, আগের জন্মে তুমি ছিলে বাবুর্চি। আর মা ছিলেন মুরগি।

পঙ্কজবাবু বললেন, এঃ, বেটি আমার সব সিক্রেট আউট করে দিলে।

কাকিমা বললেন, আমি তা হলে লেগে যাই?

পিতা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, লেগে যাও। আমরা ততক্ষণ রুগির সেবার ব্যবস্থা করি। দূর থেকেই মনে হচ্ছে, জ্বরটা বেশ ফুটেছে। মুখ দেখে বোঝা যায়—এ হল ব্রেনফিভার। ভগবান করুন, খারাপ দিকে না চলে যায়!

পঙ্কজবাবু বললেন, ভূতের মুখে রাম নাম? তুমি তো বাবা নাস্তিক!

ও আমার কথার কথা। ভগবান কি আর কিছু করবেন! করবে মানুষ। ভাল ডাক্তার চাই। তেমন বুঝলে, টেলিগ্রাম করে স্ত্রীকে এখানে আনাতে হবে। সেবা চাই।

মেসোমশাই ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, ওই উপকারটি আর করবেন না, হরিদা। তাকে আমি কিছুই জানাইনি। এই অবস্থায় জানাতেও চাই না। তার শরীর খুবই খারাপ। আপনাদের আমি খুব বেশি ভোগাব না। আজ বড় কাবু। কাল সোজা হয়ে যাব। সোজা হতে পারলেই আমি চলে যাব।

পিতা বললেন, আপনি বড় অভিমানী। আমি তো সে ভেবে বলিনি। তুমি একবার থার্মোমিটারটা নিয়ে এসো তো! আঃ মনটা বড় ছটফট করছে।

পঙ্কজবাবু বললেন, কেন, ছটফট করছে কেন?

ওর দাদুকে একবার খবর দিতে পারলে বড় শান্তি পেতুম। শাক্ত মানুষ, মাংস হচ্ছে।

তা দিলেই হয়!

যাবে কে? আমরা সবাই তো ব্যস্ত!

সিঁড়িতে ভরাট গলায় কে যেন তিনবার বললেন, জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম। সঙ্গে সঙ্গে মাতামহের গলা পাওয়া গেল, শঙ্কর, দেখো দেখো, কে এসেছেন! কাকে এনেছি একবার দেখো।

মাতামহ পাখির আনন্দে উড়ে এসেছেন। সন্ধেবেলা ডালে বসে পাখি বাসায় ফেরার এমনই আনন্দে কিচির মিচির করতে থাকে। মাতামহের আগে আগে উঠে আসছেন এক সন্ন্যাসী। মুখে মৃদু ধ্বনি, জয় রাম, জয় রাম। বড় সুন্দর, সাত্ত্বিক চেহারা। নাতিদীর্ঘ শরীর। গৌরকান্তি। মুখে একটা জ্যোতি খেলছে। চোখে অদ্ভুত এক প্রেমিকের দৃষ্টি। তাকিয়ে আছেন, অথচ দৃষ্টি কাউকে স্পর্শ করছে না। খেলে যাচ্ছে সুদূরে। যেন দিগন্তের পারে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। বিষয়ীভূত নয়।

আমরা তিনজনেই ছুটে গেলুম। অপর্ণা সবার পেছনে। মুখ-গোমড়া মুকু ধারে-কাছে নেই। না থাকুক। ও এক আলাদা স্বভাবের মেয়ে। পিতার দিকে গেছে। সন্ন্যাসী দেখলে বড় আনন্দ হয়। কেন হয় তা জানি না। মন বলতে থাকে, ওরে, সংসারেই মুক্তি আছে। কায়দাটা ওঁদের কাছে শিখে নে।

পিতা বললেন, আসুন আসুন, আপনার কথাই হচ্ছিল, ভাবছিলুম, একে পাঠাব ডাকতে।

সত্যি! মাতামহের গলায় কীরকম এক ধরনের আবেগ এসে গেল, আমাকে ভাবার মানুষ, আমাকে ডাকার মানুষ এখনও আছে! রাজা, আরও কয়েক বছর বাঁচা চাই। রাজা, এখনও সব ডাল শুকোয়নি।

উচ্ছ্বাসের মধ্যেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল, বইঠিয়ে গুরুজি, ও হ্যাঁ, একটা আসন চাই, কম্বলের আসন।

আসন এল। সেই আসন পেতে, গুরুজি চেয়ারে বসলেন। বসার ধরনটি বড় সুন্দর। একেবারে খাড়া। আমার নজর তাঁর বুকের দিকে। ধীরে ধীরে সমান তালে বুক উঠছে আর নামছে। শ্বাস যতটা দীর্ঘ, প্রশ্বাসও ততটা দীর্ঘ। আমার দৃষ্টি তাঁর চোখের দিকে। সকলের মাঝে থেকেও, কী অদ্ভুত নিঃসঙ্গ। কীসের আনন্দে যেন মশগুল। যে-আনন্দ এখানে নেই, অন্য কোথাও আছে, অন্যভাবে।

মাতামহ বললেন, শঙ্কর, ইনি আমার গুরুদেব, হৃষীকেশে থাকেন।

হঠাৎ পঙ্কজবাবুর দিকে দৃষ্টি পড়ায়, এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

পিতা বললেন, আমার একমাত্র বন্ধু, সহকর্মী পঙ্কজ।

মাতামহ পরিবেশ-সচেতন হয়েছেন। চোখ বেড়াতে বেড়াতে অপর্ণাকে ধরে ফেলেছে। দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, বুঝেছি, বুঝেছি, আন্ডারস্ট্যান্ড, আন্ডারস্ট্যান্ড, ওই যে বঁড়শি বেটি দাঁড়িয়ে আছে। এক যায়, এক আসে, পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, হরি নামের মাস্তুলে। ব্যাটার আমার কপাল ভাল।

বয়েস বাড়লে, মানুষের রসের ভাণ্ডার যেন উপচে পড়ে। এমন করলেন অপর্ণা সরে পড়ল।

মাতামহ এইবার অপূর্ব হিন্দিতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমাদের পরিচয়পর্ব শুরু করলেন, বাবা, এ মেরা জামাই, হরিশঙ্কর, বহুত চরিত্রবান, যৌবনমে দোনো এক সাথ ব্যায়াম কিয়া। ও দিন তো চলা গিয়া। আভি, আঁধার আ রাহা হই, সুরয অস্ত হো যায়ে গা। আশীর্বাদ কিজিয়ে, কী, সামনা জনমমে, ফির দোনো এক সাথ মিলে। লীলা এইসি চলে, জনম জনম মে।

বাবার ঠোঁট কাপছে। তার মানে জপ চলছে।

পিতা কখনও কারওকে প্রণাম করেন না। আজ করলেন। করলেন বড় ভক্তিভরে।

সন্ন্যাসী পিতার মাথায় হাত রেখে শুধু বললেন, জয় রাম, হো যায়ে গা।

সামান্য ব্যাপার, সামান্য কথা, কী জানি কী হয়ে গেল, আমার কঠোর পিতা ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন। আর আমার মাতামহ উল্লাসে বলতে লাগলেন, ভাঙছে, ভাঙছে, নামছে নামছে। বলতে বলতে তিনিও কেঁদে ফেললেন। কঁদছেন আর বলছেন, আবার আমাদের দেখা হবে, লীলা লীলা।

সন্ন্যাসী আবার বললেন, জয় রাম, জয় রাম। দৃষ্টি সুদূরে। পিতার মাথায় আবার স্নেহের হাত রেখে বললেন, দীক্ষা মিলা বেটা?

মাতামহ বললেন, নেহি হুয়া। উ সব মানতাই নেহি, আতাই নেহি, বিজ্ঞানী হো।

সন্ন্যাসীর ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল। তিনি বললেন, জয় রাম, সব কুছ আ যায়েগা।

পিতা প্রণামের জন্যে অবনত হয়েছিলেন, এতক্ষণ সেইভাবেই ছিলেন। সোজা উঠে দাঁড়ালেন। মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, এখনও ফিরে আসেননি। চরিত্রে চরিত্র আসেনি। আমার অভিজ্ঞতায় জানি, মানুষ কীভাবে মানুষের ভেতর থেকে বেরিয়ে চলে যায়। কেমন করে অনন্তের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ায়। যখন আবার ফিরে

আসে তখন অন্য মানুষ। নাম যা ছিল তা রইল, কর্মও একই রইল, মানুষ কিছু জানল না, বুঝল না। আমি বদলে গেলুম। আমার বিষয়, ধ্যান-ধারণা সব বদলে গেল।

পিতা বললেন, আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন?

জয় রাম। হোগা, হো যায়েগা।

মাতামহ বললেন, কব হোগা গুরুজি?

একদিন হোগা।

কোন দিন গুরুজি?

বেটা, তুমহারা বোখার হোগা। বহত ভারী, ঘাবড়াও মাত। আরোগ্য মিল যায়েগা। তুম তো বেটা বিজ্ঞানী হো। দেহ শুধ হো যায়েগা। কভি ঘুমতে ঘুমতে হাম আ সেকতা, তুম ভি হামারা পাশ আ সেকতা। রামজিকা মর্জি।

মাতামহ আকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, বোখার কাহে হোগা?

হোগা, ওইসাই হোগা।

সন্ন্যাসীকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেল। অসম্ভব শান্ত। বড় কম কথা বলেন। কম কথা বলেন বলেই, সব কথার অসম্ভব ওজন। সুযোগ পেয়ে প্রণাম করলুম। মাতামহ পরিচয় করালেন, হামারা নাতি, কন্যাকা লেড়কা।

সাধুজি প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু বললেন, জয় রাম।

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, আমাকে দীক্ষা দেবেন?

মাতামহ সার্টিফিকেট দিলেন, বহুৎ শুদ্ধ আত্মা।

সাধুজি মৃদু হেসে বললেন, হো সেকতা। জয় রাম।

মাতামহ বললেন, দীক্ষা হোগা গুরুজি?

হোগা বেটা, লেকিন হিঁয়াসে নেহি।

নিজের শরীর আঙুল দিয়ে দেখালেন।

তব হোগা ক্যায়সে, হোগা ক্যায়সে? মাতামহ ভীষণ উতলা হলেন।

হ্যায়, হ্যায়, ইসকা গুরু হ্যায়, সময় হোনেসে আ যায়গা, মিল যায়গা। জয় রাম, জয় রাম।

মুকু উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এল, একজন ডাক্তার পাওয়া যাবে, ডাক্তার? জ্বরটা ভীষণ বেড়েছে। ভুল বকছেন।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, কার জ্বর? কার আবার জ্বর হল, শঙ্কর!

আজ মাতামহ পিতাকে সেই তখন থেকে শঙ্কর শঙ্কর বলে ডাকছেন। আদরের ডাক ছোটই হয়।

পিতা বললেন, বিনয়দার ভীষণ জ্বর। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে— ব্রেনফিভার।

মেয়ের কোনও খবর নেই, শঙ্কর?

নাঃ, কোথায় খবর?

আশ্চর্য, পুলিশ কি ঘুমিয়ে পড়েছে? গুরুজি, আপনি একবার দেখবেন? বহত আফসোস কি বাত, লেড়কি খো গিয়া। বেমার হো চুকা।

কাঁহা হায় বেটা! চলিয়ে।

সাধুজিকে নিয়ে সদলে আমরা মেসোমশাইয়ের ঘরে গেলুম। তিনি তখন জ্বরের ঘোরে অনেকটা গানের মতো করে বলছেন, জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো। পুরো লাইনটা একবারে বলা সম্ভব হচ্ছে না, ভেঙে ভেঙে, থেমে থেমে বলছেন।

সাধুজি মেসোমশাইয়ের মাথার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহাপুরুষদের শরীর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। ওঁরা নিশ্চয়ই সেন্ট মাখেন না। হোমের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লে যেরকম গন্ধ বেরোয় ঠিক সেইরকম। ঠাকুরঘরে ঢুকলে যেরকম গন্ধ বেরোয় অনেকটা সেইরকম।

মেসোমশাই জ্বরের ঘোরে দুবার, মি. লর্ড, মি. লর্ড করলেন।

মেসোমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। সংসার মানুষকে কীভাবে দগ্ধ করে দেয়! চেহারা কেমন যেন ঝামার মতো কালো হয়ে গেছে। এক একবার চোখ খুলছেন, রং দেখলে চমকে যেতে হয়। ঘোর রক্তবর্ণ। বড় ব্যারিস্টার, যথেষ্ট পসার, প্রচুর অর্থ, কিন্তু কেমন যেন হাতপা-বাঁধা কয়েদির মতো জীবন। অথচ মাথার কাছে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন? সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, কোনও ঐশ্বর্যই নেই, আপনি আর কপনি, তিনি যেন রাজা! অসীম আকাশ যাঁর প্রজা। মুক্ত পুরুষ আর বদ্ধ পুরুষে এই হল তফাত?

ঘরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা সব থমকে থমকে দাঁড়িয়ে আছি। সাধুজি চোখ বুজিয়ে, হাত জোড় করে মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেবদূতের মতো। ঠোঁটদুটো অনবরতই কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থির থেকে তিনি মেসোমশাইয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। জয় রাম, জয় রাম বললেন বার তিনেক। শেষে বললেন, সব কুছ ঠিক হো যায়েগা।

আমরা সদলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। সাধূজি কম্বল-পাতা চেয়ারে আসন নিলেন। মাতামহ প্রশ্ন করলেন, বাবা, ডাক্তারের কি আর প্রয়োজন হবে?

জরুর। বোলাইয়ে।

মাতামহ বললেন, মেয়ে কি ফিরে আসবে বাবা?

মুছে মালুম নেহি, বেটা। কেইসে বোলেগা?

না, আপনি সাধক মানুষ, সাধকরা অনেক কিছু জানতে পারেন, দেখতে পান, বলতে পারেন!

বিভূতি? সাধুজি অনন্তের দিকে তাকালেন। বিভূতি? মেরা কুছ নেহি হ্যায় বেটা। মেরা সিরিফ রামজি হায়। চলতি চক্কি সব কোই দেখে, কীল না দেখে কোই। যো কীলকো পাকড়কে রহে, সাবেৎ রহা হেয় ওই॥ হামারা বিভূতি নেহি বেটে। হামারা কুছ নেহি।

সাধুজির মুখচোখ কেমন যেন করুণ হয়ে এল। উদাস চোখদুটি যেন জলে ভরে আসছে। হায় রাম বলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কী সুন্দর ভাব! কোথায় যেন নিয়ে চলেছেন আমাদের!

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন আবার, বোখার সারবে তো বাবা?

সাধুজি বললেন, রামকৃপা নাশহি সব রোগা।

আমার কানের কাছে অপর্ণা ফিসফিস করে বললে, আপনাকে আপনার কাকিমা ডাকছেন।

কোথা থেকে কোথায় ফিরে এলুম! এই পতন এড়াবার জন্যেই মানুষ সংসার ছেড়ে পালায়। চলতি চক্কি ছেড়ে, কীলকে জাপটে ধরে। কাকিমা গরমমশলা খুঁজে পাচ্ছেন না। গরমমশলা না দিলে মাংস বেতার হয়ে যাবে।

কাকিমা বললেন, তোমরা এখনও কী করছ বলো তো? বেলা কত হল জানো? তোমাদের সবই অদ্ভুত! মেয়েটার মুখটা শুকিয়ে গেছে।

অপর্ণা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ন্যাসী দেখে কেমন যেন হয়ে গেছে। বসার ঘরে ভাবের বন্যা বইছে।

আমি বললুম, আজ আবার খাওয়াদাওয়া কীসের? জানেন কত বড় সাধু এসেছেন!

কাকিমা লাফিয়ে উঠলেন, অ্যাঁ, সেই ঘুরঘুরে বাবা?

না না, ইনি আমার দাদুর গুরুদেব। হিমালয়ে থাকেন।

আমি একবার যাই। বটঠাকুর রাগ করবেন?

রাগ করবেন কেন?

তা হলে আমি একবার যাই। আমি কেবল একটা জিনিস চাইব। পয়সাকড়ি নয়, সুখটুখ নয়, শুধু একটা জিনিস। বুঝতে পেরেছ?

কাকিমা ফোঁসফোঁস করে চোখ মুছতে লাগলেন। আজ যেন দিকে দিকে কান্নার মহোৎসব পড়ে গেছে।

আপনি যেতে পারেন, তবে একঘর লোকের সামনে কেমন করে আপনি সেই জিনিস চাইবেন! তবে হ্যাঁ, মহাপুরুষরা সব বুঝতে পারেন। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই মনের কথা পড়ে ফেলবেন।

তুমি বলো আমি তা হলে কী করব! একবার বলছ এগোতে, একবার বলছ পেছোতে। ঠিক করে বলো, কী করব?

যান, ঘুরে আসুন। সাধু দর্শনের পুণ্যটা তো হবে!

কিন্তু শুধু-হাতে যাই কী করে! তুমি আমাকে একটু মিষ্টি কিনে এনে দাও।

আপনি তা হলে নীচে যান, আমি আসছি। হয়তো আমাদেরও কিছু আনতে হবে।

অপর্ণা বললে, আমি যাব আপনার সঙ্গে নীচে? একটা যা হয় কিছু আমাকেও করতে দিন।

চলো না মা, তবে নীচেটা বড় অন্ধকার। তোমাকে এতক্ষণ ভয়ে বলিনি।

অপর্ণা বললে, অন্ধকার! তাতে কী হয়েছে? সব জায়গায় কি আলো থাকে?

দুই মহিলা নীচে নামতে লাগলেন। অপর্ণা না ভেবেই বড় ভাল কথা বলে ফেলেছে। বসার ঘরে পঙ্কজবাবু আর এক মহাপুরুষের মতো বসে পড়েছেন। খালি গা, চাঁপাফুলের মতো রং। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে মোটা পইতে। সবাই চুপচাপ, কেউ কোনও কথা বলছেন না। প্রকৃত সন্ন্যাসীর এই ঠিক লক্ষণ। মুখে বাক্য সরে না, ভাবেই বিভোর।

পঙ্কজবাবু হাতের ইশারায় আমাকে কাছে ডেকে, ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, ধূমপান করা যায়?

দাঁড়ান, দাদুকে জিজ্ঞেস করে আসি।

ভাবস্থ অবস্থায় মাতামহ এক শুনতে আর এক শোনেন, না না, সন্ন্যাসীরা ধূমপান করেন না। তবে বাবার কিছু সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি সাধুজির ধূমপানের কথা জিজ্ঞেস করিনি। পঙ্কজবাবু ধূমপান করতে পারেন কি না জিজ্ঞেস করছেন।

অ, উনি, না করলেই ভাল হয়। তুই একচামচে ভাল দই আর এক চামচে মধুর ব্যবস্থা কর। এই হল বাবার সারাদিনের আহার।

দই আমি দোকানে পাব, মধু কোথায় পাই? নীচে বেশ জাঁকিয়ে মহিলামহল বসেছে। দু'জনকে দেখে মনে হচ্ছে কতকালের পরিচয়। অপর্ণা শিলে কী একটা বাটছে। কাকিমা বসেছেন পেঁয়াজ নিয়ে। দু'চোখে হাপুস হুপুস জল। মাঝে মাঝে হয় এ হাতের ওপর বাহু, না হয় ও হাতের ওপর বাহু দিয়ে চোখের জল মোছার চেষ্টা করছেন। বেশ অন্তরঙ্গ কোনও আলোচনা চলেছে নিচু গলায়। মানুষ ইচ্ছে করলে সংসারকে কত সুখে রাখতে পারে, কিন্তু করবে না। এই কাকাবাবু এসে হাজির হবেন দু'-একদিনের মধ্যে। কাকিমার মুখের হাসি শুষে নেবেন ব্লটিং পেপারের মতো। উট যেমন কাঁটাগাছ খায়। মুখ রক্তারক্তি তবু খেয়ে চলেছে। কোনও কোনও মানুষের অশান্তিই পরম প্রিয় খাদ্য হয়ে ওঠে। তাইতেই ধৃতি, তাইতেই পুষ্টি।

কাকিমা বললেন, দেখে নাও, অপর্ণা বউ হলে কীরকম দেখাবে! এমনি করে শিলে ফেলে নোড়া দিয়ে থেঁতো করবে। বুঝেছ ছোকরা!

কাকিমার কথা শুনে অপর্ণা লজ্জায় মুখ নিচু করে রইল। মেয়েদের জগতে বিয়ের চেয়ে বড় ঘটনা যেন আর কিছু নেই।

আপনার কাছে একটু মধু হবে কাকিমা?

মধু! বাবা, তুমি যে একেবারে ভবিষ্যতে চলে গেলে। আগে হোক, তারপর তো মধু লাগবে। এখনই তোমার মধু কী হবে!

অপর্ণা নোড়াটাকে শিলের ওপর ঠকাস করে নামিয়ে রেখে, দ্রুত পায়ে আমার পাশ দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল। যেতে যেতে বললে, ধ্যাত, আপনি বড় অসভ্য।

কীসের যে কী অর্থ, কিছুই বোঝা গেল না। মধুর সঙ্গে ভবিষ্যতের কী সম্পর্ক! অপর্ণাই বা অমন করে চলে গেল কেন? কাকিমা খিলখিল করে হাসছেন আর বলছেন, ভারী সুন্দর মেয়ে, বড় সুন্দর মেয়ে।

ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে।
তখনই তা মোছে ঠোঁটেরই হাসির ঘায়ে॥

এক চামচে দই, এক চামচে মধু, এই হল হরিদ্বারের সন্ন্যাসীর সারাদিনের আহার! কী করে শরীর থাকে! আমরা এত খেয়েও বলছি, খাওয়া ঠিক হচ্ছে না, শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। প্রোটিন চাই, ভিটামিন চাই। পিতৃদেবের প্রশ্নে মাতামহ মৃদু হাসলেন।

বুঝলে শঙ্কর, এই হল সাধনা। ক্ষয় নিবারণের জন্যেই আহার। যাঁর ক্ষয় নেই তাঁর আর আহারের কী প্রয়োজন বলো?

বড় হলঘরে কাকিমা ভেলভেটের আসন পেতে দিয়েছেন। চকচকে ঝকঝকে গেলাসে গেলাসে জল। পঙ্কজবাবু স্নান করে আরও যেন ঝকঝকে হয়েছেন। গুরুজি চলে যাওয়ায় মাতামহ একটু শোকার্ত। আবার কবে দেখা হবে, কে জানে। ছোড়ো এ সংসার। ঝুটি মায়া, ঝুটা কায়া। মাংসের গন্ধে বাড়ি মম করছে। কাকিমার রান্নার হাত সাংঘাতিক। কেবল একটাই যা দুঃখ, অতি বড় ঘরনি ঘর না পায়, অতি বড় যোগী দর্শন না পায়।

পিতা বললেন, বসার ঘরে এমন সুন্দর এক অতিপ্রাকৃত গন্ধ বেরুচ্ছে! জীবনে বহু সেন্ট নাড়াচাড়া করেছি, এমন গন্ধ কখনও নাকে আসেনি।

মাতামহ বললেন, কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে এমনই গন্ধ বেরোয়। মৃগের যেমন কস্তুরী, সাধকের তেমনি কুণ্ডলিনী।

পিতা বললেন, আমি আর মাংস খাব না। আজ থেকে মাংস খাওয়া ছাড়লুম।

পঙ্কজবাবু বললেন, সেকী! খাওয়ার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, হরি। ধর্ম হল মনের জিনিস। ঠাকুর বলেছেন মনে, বনে আর কোণে।

দেখ পঙ্কজ, জীবনে যত পাঁঠা আর মাছ খেয়েছি, সব যদি লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, সেই ফোর্ট পর্যন্ত চলে যাবে।

তুই দেখছি বার্নার্ড শ'র মতো কথা বলছিস। আর বাবা, বছর পাঁচেক অপেক্ষা কর, অটোমেটিক মাংস ছাড়তে হবে। দাঁতই বলবে, ছোড়ো মুসাফির, মায়া নগরকো। যদ্দিন আছ তদ্দিন খেয়ে নাও। আপনি কী বলেন?

প্রশ্নটা মাতামহকে।

মাতামহ কী এক ধরনের ভাবে বুঁদ হয়ে বসে আছেন। এত সুন্দর দেখাচ্ছে! সারা ঘরটাকেই বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ। সব অমাত্যদের মতো চেহারা। কাকিমা সবে একটি পাটভাঙা সাদা শাড়ি পরেছেন। কপালে

সিঁদুরের টিপ আঁচলের আর হাতের ঘষায় এপাশ ওপাশ হয়ে, এই মায়ার সংসারকে যেন আরও মায়াময় করে তুলেছে। আজ থেকে আমি কাকিমাকে মনে মনে মা বলব। কাকিটা খুব আস্তে, মা-টা খুব জোরে। অপর্ণাও খুব খাটছে, নুন, লেবু, জল আসছে যাচ্ছে। শাড়ির শব্দ হচ্ছে। চুড়ি বেজে উঠছে। অবেলায় যে-হাট ভেঙেছিল, অবেলাতেই সে হাট যেন জমে উঠেছে। সবই নিখুঁত। কেবল মুকু যদি যোগ দিত। মেসোমশাই যদি সুস্থ থাকতেন।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মুকু বললে, বাবা ভীষণ ঘামছেন।

পিতা লাফিয়ে উঠলেন, জ্বর ছাড়ছে। জয় রাম! চলো দেখি।

কাকিমা হাতায় করে গরম ভাত তুলছিলেন। পিতাকে উঠতে দেখে বললেন, আপনি বসুন, আমরা দেখছি। ভাতটা দিয়ে নিই।

না না, আগে দেখাই ভাল। ওনার জন্যে মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে আছে। যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে, জয় রাম, জয় রাম!

পিতার কী সুন্দর ভক্তি এসে গেছে। অপর্ণার হাতে হাতা ধরিয়ে দিয়ে কাকিমা উঠে গেলেন। মেয়েটিও কম কাজের নয়! পঙ্কজবাবু বলতে লাগলেন, বুড়ি, গাদা গাদা দিসনি। বেলা হয়ে গেছে। কম কম দে।

মাতামহ বললেন, আমাকে মা যা দেবার তাই দিয়ো। খাওয়ার ব্যাপারে আমার বেলা-অবেলা নেই। পারলে একদিনেই দু'দিনেরটা মজুত করে নোব। কাল কী জুটবে কালই জানে।

অপর্ণা বললে, আপনি বাবার কথায় লজ্জা করে কম খাবেন কেন? বাবা তো পাশেই রয়েছেন, শেষে দু'জনে না কমপিটিশন লেগে যায়!

কাকিমা দরজার কাছে এসে বললেন, বটঠাকুর, একবার আসবেন?

পিতা উঠে গেলেন উদ্বিগ্ন মুখে। আমার পক্ষেও আর বসে থাকা সম্ভব হল না। মেসোমশাই মানে কনক। কনক সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছে। মেয়েটা গেল কোথায়? কনক সত্যিই কি আর পৃথিবীতে নেই? হঠাৎ একেবারে উবে না গিয়ে, সে তো স্পষ্ট বললেই পারত, না বাবা, প্রতাপকে আমি বিয়ে করব না। মেসোমশাই কি জোর করে, নিজের কথায় মেয়ের বিয়ে দিতে পারতেন! এর পেছনে গভীর কোনও রহস্য, গভীর কোনও পাপ আছে। আমি গোয়েন্দা হলে নিজেই লেগে পড়তুম।

মানুষ যে এমন করে ঘামতে পারে আমার দেখা ছিল না। জ্বর তো আমাদেরও হয়, ঘাম দিয়েই ছেড়ে যায়। এ যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার! মেসোমশাইকে কে যেন বিছানায় ফেলে চান করিয়ে দিয়েছে। কাকিমা একটা পাখা নিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়েছেন। মুকু একেবারেই ছেলেমানুষ। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

পিতা বললেন, এখন একেবারেই হাওয়া করা চলবে না। কপালে একবার হাত দিয়ে দেখো তো!

কাকিমা বললেন, বরফ।

পায়ের চেটো?

বরফ।

তোয়ালে আনো, তোয়ালে আনো। শিগগির একটা হ্যারিকেন জ্বালার ব্যবস্থা করো।

তোয়ালে এনে পিতার হাতে দিতেই কাকিমা বললেন, আমার হাতে দিন, আমি জানি, কী করতে হবে। আপনি চট করে যা হয় দুটি খেয়ে আসুন। ওঁরা সব বসে আছেন।

তুমি পারবে সব? গা মোছাতে হবে, পায়ে সেঁক দিতে হবে।

সব পারব। আমাতে, মুকুতে সব করতে পারব। অপর্ণাকে বলবেন, ও যেন পরিবেশন করে। আমি তো এদিকে আটকে গেলুম।

পিতা যেতে যেতে বললেন, সেই অতিপ্রাকৃত গন্ধে ঘর ভরে আছে। সেই স্বর্গীয় গন্ধ।

সত্যই তাই। সেই সন্ন্যাসী যে যে ঘরে ছিলেন, সেই সেই ঘরে, সেই সেই জিনিস যা তিনি স্পর্শ করেছিলেন, সবেতেই এমনি এক ঈশ্বরীয় গন্ধ। কেমন করে এসব হয়! বিজ্ঞান কী বলে? অবিশ্বাসী কী বলেন!

অপর্ণা পাকা গৃহিণী। ওদিকে অসুস্থ মানুষ, তবু ভেবে হাসি পাচ্ছে, বিয়ের আগে অনেক মেয়েই অনেক ভাবে দেখা দেয়, এমন হাতেনাতে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে আসরে নামে ক'জন! প্রতিটি ব্যাপারেই ফুলমার্ক পাচ্ছে। হাত একটুও কাঁপছে না। যেখানকার জিনিস ঠিক সেইখানেই পড়ছে। জাপানি বিমান যেন পার্লহার্বারে বোমা ফেলছে! বুঝেছি, এ মেয়ে এ বাড়ির জন্যেই তৈরি।

মাতামহ বললেন, দেখো তো মা, একটুকরো মেটে পাও কি না! নীচের বউমা যা রেঁধেছে না, একেবারে মাতোয়ারা করে দিয়েছে। এমন হাতে পড়ার ভাগ্য হলে, পাঁঠা হয়ে জন্মেও সুখ!

পঙ্কজবাবু বললেন, আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। সবাই আমার মাংসের তারিফ করে, এ রান্না খেলে তারা আমার রান্না ছোঁবে না। হরি!

বল?

ভদ্রলোক সুস্থ সবল হয়ে উঠুন, তারপর আবার একদিন সাংঘাতিক ভাবে হবে। কী বলিস?

বেশ, তাই হবে। একেবারে ষোলোকলা পূর্ণ করে হবে।

সেদিন কালীঘাট থেকে মাংস আনব।

মাতামহ আহার করেন চোখ বুজিয়ে। মাঝে মাঝেই একটি গান করেন, সেই গানের একটি লাইন হল, আহার করো মনে করো আহুতি দিই শ্যামা মাকে। চোখ বুজিয়ে বললেন, সে ভার আমার। আমি এনে দোব।

চাটনি মুখে দিয়ে পঙ্কজবাবু আহা, আহা করে উঠলেন। এমন চৌকস হাত খুব কম দেখা যায়। একেবারে আলাউদ্দিন খাঁ সায়েব, যেমন সেতারে, তেমনি সরোদে, তেমনি বেহালায়। এনার ট্রেনিং-এ বুড়িকে কিছুদিন রাখতেই হবে। মেয়েছেলে যদি রাঁধতে না জানে, তা হলে শি ইজ অ্যান ইনকমপ্লিট ওম্যান।

ওদিকে কাকিমা একেবারে পাকা নার্সের মতো কাজ করে বসে আছেন। মেসোমশাইয়ের গা মুছিয়ে দিয়েছেন। গেঞ্জি বদলে দিয়েছেন। বিছানার চাদর পালটে দিয়েছেন। তিন থাক বালিশে পিঠ দিয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত মেসোমশাই বসে আছেন সামনে পা ছড়িয়ে। হ্যারিকেন জ্বলছে। সেঁক চলছে। তার আগে পাউডার দিয়ে পা ঘষা হয়েছে।

পিতা স্নেহমাখানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, বিনয়দা, কেমন বুঝছেন এখন?

ক্ষীণ গলায় মেসোমশাই বললেন, এত ঝরঝরে মনে হচ্ছে, জীবনে কখনও এত সুস্থ বোধ করিনি। আর তেমনি খিদে। জ্বরের ঘোরে, বুঝলেন হরিদা, কত কী যে দেখলুম! দেখলুম মহাদেব এসে মাথার সামনে

দাঁড়িয়েছেন। হাতে ইয়া বড় এক ত্রিশূল। ত্রিশূলটা কপালে ঠেকিয়ে কী যেন সব বললেন। কিছুই আর মনে নেই। সারাশরীর যেন চড়চড় করে পুড়ে যেতে লাগল। মনে হল আমি যেন আগুনে শুয়ে আছি। এখন নিজেকে মনে হচ্ছে, যেন হোমের পোড়া কাঠ। হরিদা, সে আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। মনে হল শরীরে হাই ভোলটেজ ইলেকট্রিসিটি খেলে যাচ্ছে।

পিতা বললেন, জয় রাম, জয় রাম।

মাতামহ শব্দ করে হাসলেন, যার অর্থ, জানতুম, জানতুম এইরকমই হবে।

মেসোমশাই কাকিমাকে দেখিয়ে বললেন, আর করলেন বটে ইনি! মাকেও হার মানিয়েছেন। আর কি সেঁকের দরকার হবে?

চেটো গরম হয়েছে?

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ হয়েছে।

ব্যস, তা হলে ছেড়ে দাও। তোমরা খাওয়া সেরে নাও। বিনয়দাকে এখন একটু গরম দুধ খাওয়াতে হবে।

আমার কিন্তু বেশ ঝাল ঝাল একটা কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।

না, আজ না, আজ আর অত্যাচারী কিছু চলবে না। আজ সব হালকা। সন্ধে হয়ে আসছে, তা না হলে ফলের রস দেওয়া যেত। আপনি খাবেন পরেশের বিখ্যাত নরমপাক, থিন অ্যারারুট আর গরম দুধ। রাতে জ্বর না এলে, কাল সকালে মাছের ঝোল আর ভাত।

মাতামহ বললেন, জীবনে আর জ্বর হবে না। শেষ জ্বর হয়ে গেল।

মুকু আর অপর্ণাকে খেতে বসিয়ে কাকিমা এক অদ্ভুত কথা বললেন, তোমরা বসে বসে খাও ভাই, ওদিকে আমার ভাত আর পুঁইডাঁটা কড়কড়িয়ে গেল।

অপর্ণা বললে, তার মানে? আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না? তা হলে আমরাও উঠে পড়লুম।

কাকিমা বিব্রত মুখে বললেন, আমি যে ভাই আগেই আমার মতো বেঁধে ফেলেছি। না খেলে যে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

পিতার প্রবেশ হল। জিজ্ঞেস করলেন, কী তোমাদের সমস্যা! সব হাত গুটিয়ে বসে আছে এখনও?

অপর্ণা বললে, ইনি খেতে চাইছেন না।

কেন? কেন বউঠান, তুমি খাবে না! আমি তোমাকে বলিনি বলে! যাও, বসে পড়ো। তুমি আমাকে দুঃখ দিতে চাও? তুমি আমাকে বিব্রত করতে চাও? আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। উৎসবের দিন। বিনয়দা তিনঘণ্টায় সেরে উঠলেন। কত বড় একজন মহাপুরুষ পায়ের ধুলো দিয়ে গেলেন। তুমি জানো না বউঠান, আজকের দিনটার কী অর্থ। এ এক দিন-ছাড়া দিন। আনন্দ করো আনন্দ করো। জীবন বড় ছোট, বড় দুঃখে ভরা। ওই যে মেয়েটি, ওর দিকে আমি তাকিয়ে আছি। জয় রাম, জয় রাম।

কাকিমার চোখে জল গড়াচ্ছে।

একী, তুমি কাঁদছ? দুঃখে, না আনন্দে!

কাকিমা ফিসফিস করে বললেন, আনন্দে। আমাকে কেউ কখনও এতটুকু স্নেহ করেনি। আপনি করলেন। আপনার কাছে কাছে সারাজীবন যদি থাকতে পারতুম!

পিতা চমকে উঠলেন, না না, খবরদার ও কামনা কোরো না। আমাকে যে চায় তাকে চলে যেতে হয়। এই আমার ভাগ্য, এই আমার গ্রহ।

কাকিমা এবার বেশ জোরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। মেয়েদুটি হাত গুটিয়ে আসনে বসে আছে হাঁ করে। বড়দের আবেগ বোঝার বয়স ওদের হয়নি। দু'জনেই সম্পন্ন ঘরের মেয়ে। দুঃখ কাকে বলে জানা হয়নি। পিতা ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। আমার মনে পড়ছে নৌকোয় দেখা সেই সতীমার কথা। বলেছিলেন, কিছু মানুষ আসে যারা কিছু পায় না। আগুনের গোলার মতো। তারা যে জায়গা দিয়ে যায়, সবকিছু পোড়াতে পোড়াতে যায়। তারা হল মানুষ-উট। মরুভূমিতেই যার চলাফেরা। এতটুকু ছায়া নেই। দগ্ধ, তাম্রবর্ণ, ধুধু বালির বিস্তার। যত দূরে তাকাও, মৃত্তিকা নেই, জল নেই, বৃক্ষরাজি নেই।

মাতামহ একটি সোফায় বুকের কাছে মাথা ঝুলিয়ে ঝিম মেরে বসে আছেন। পঙ্কজবাবু আর একটিতে বেশ আয়েশ করে বসে, সেদিনের খবরের কাগজটি পড়ার চেষ্টা করছেন। পিতা বসেছেন হোমিওপ্যাথি গৃহচিকিৎসার বই খুলে। মেসোমশাই উষ্ণ দুগ্ধপান করে অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। কাকিমা উত্তরের বারান্দায় মুকুকে নিয়ে বসেছেন চুল বেঁধে দিতে। অপর্ণা বারান্দার রেলিং-এ কনুইয়ের ভর রেখে আকাশ, বাতাস, গাছ, পাখি দেখছে। যত বেলা বাড়ছে, রূপ যেন ততই খুলছে। মুখটা সিঁদুরপানা হয়ে উঠেছে।

আর আমি? দেয়ালে হিমালয়ের একটা ছবি ঝুলছে। সেই দিকে তাকিয়ে ভাবছি, কাল আবার বেরোতে হবে। ঢুকতে-না-ঢুকতেই চাকরিতে অরুচি ধরে গেল। সামনে পড়ে আছে সারাটা জীবন! যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে বারান্দার একান্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। মুকু দু'হাত দিয়ে চেপে চেপে ঢাউস খোঁপা সঠিক স্থানে ঝোলাবার চেষ্টা করছে। কাকিমা চিরুনি থেকে চুল ছাড়াচ্ছেন। অপর্ণা একইভাবে স্বপ্ন দেখছে। মেয়েটি সুন্দরী, তবে স্বভাবটি কেমন বোঝা গেল না।

কাকিমা দরজার সামনে এসে ইশারায় আমাকে ডাকলেন। অবেলায় খেয়ে শরীরটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। বারান্দায় যেতেই কাকিমা বললেন, বুড়োদের দলে বসে বসে কী করছ! তোমার ভীষণ বুড়োটে স্বভাব হয়ে যাচ্ছে। মাদুরটা নিয়ে চলো ছাতে যাই। একটু পরেই তো চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি মাদুর পাতো গে যাও, আমি নীচে থেকে লুডোটা নিয়ে আসি। চারজন আছি, এক চাল খেলা যাক।

সেরেছে! তিনজন মেয়ে, একজন ছেলে। ভাবতেও আতঙ্ক হচ্ছে। এদিকে বলাইবাবু বিকেলের বারান্দায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। কাকিমা তো লুডো খেলবেন বললেন, মুকু কি রাজি হবে!

অপর্ণা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আপনাদের ছাদে অনেক ফুলগাছ আছে তাই না?

হ্যাঁ, অনেক গাছ। বাবা একেবারে নার্সারি বানিয়ে ফেলেছেন।

চলুন যাই, বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

ভেতরটা কেমন যেন ছলাক করে উঠল। অপর্ণা এইভাবে যেচে ছাদে উঠতে চাইবে, ভাবাই যায় না। এ যেন সেই মেঘ না চাইতেই জল, নাকি, জল না চাইতেই মেঘ। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরীদের সাধারণত বড় তোষামোদ করতে হয়।

যা ভেবেছিলুম তাই হল, অপর্ণা আগে আগে উঠতে লাগল। পেছনে মাদুর বগলে আমি এক মাধাই। এইরকম পরিস্থিতিতে অল্পবয়সি মানুষদের বড় কষ্ট হয়। ভেতরটা হাঁকপাঁক করতে থাকে। সিঁড়ি থেকে সিঁড়িতে পা তোলার সময় শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। পায়ের গোছ প্রকাশিত হয়। মাথা খারাপ হয়ে যায়। ধর্ম, দেবতা, বেদ বেদান্ত সব ভেসে যায়। হাত পা ছুড়ে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে, বীরেনদার সেই গানের মতো, ভেসে যায় ভাসিয়ে নে যায়।

সিঁড়ির বাঁকের বড় ধাপে, পিতৃদেবের সেই তুলোধোনা যন্ত্র প্রহরীর মতো খাড়া। এটাকে দেখলেই আমার কনকের কথা মনে পড়ে যায়। যে-রাতে এটা এল সে রাতে শিল পড়েছিল। কনক পাঁপড় ভেজে মাতামহকে খাইয়েছিল। সেই রাতেই প্রথম আমার বুকে এসেছিল নারী নয়, নারীর পরিধেয় বস্ত্র। সেই রাতেই উচ্ছ্বসিত পিতা বলেছিলেন, তোমার মতো একটা মেয়ে পেলে এই সংসারে আবার আমি ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিতুম। সুখের দিন যেন স্রোতের ভাসমান ফুলের মতো। এক ঘাট থেকে আর এক ঘাট হয়ে, ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যায়।

অপর্ণা সেই তুলোধোনা যন্ত্র দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, এটা কী? বাজনা? বাজিয়ে দেখব!

তাঁতে টুসকি মারতেই, বুং করে খুব বোকাবোকা, বোঁদা একটা শব্দ হল। তাঁতটা মনে হয় বোকাপাঁঠার ছিল।

অপর্ণার খুব আনন্দ হয়েছে, আর একবার বাজাব?

বাজাও! অ্যায় তুমি বলে ফেলেছি। খেয়াল করেনি। যন্ত্রে বিভোর। করলেও কিছু করার নেই। এত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, আপনি বলতে পারছি না। সবকিছুর একটা সীমা আছে। আমি তেমন বকাটে ছেলে হলে, যা-তা কিছু একটা করে ফেলতে পারতুম। যা ভাবা যায়, তা করা যায় না বলেই আমরা মানুষ। একে বলে চরিত্র। একে বলে সংযম।

আবার একবার বুং করে শব্দ হল। অপর্ণার খুব মজা। খিলখিল করে হেসে বললে, কেমন একটা শিং শিং আওয়াজ। এ যন্ত্র মনে হয়, সিঙ্গিমামার আসরে বাজে।

ধরেছ ঠিক। নাও চলো।

দাঁড়াও না।।

বলেই অপর্ণা জিভ কাটল। আমার চোখে তার স্থির চোখ। মোটেই বিব্রত নয়। আদৌ লজ্জা পায়নি। শুধু মনে মনে একটু কাছাকাছি সরে আসার দুষ্টুমি। জিভ ঢুকিয়ে নিয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো বললে, কী বলে ফেললুম?

বেশ করেছ। এখন ওপরে চলো। ওরা আসছে।

এটা কী বলো না? চেনাচেনা মনে হচ্ছে।

এ হল তুলোধোনা যন্ত্র। লেপ তোশক তৈরির সময় লাগে। ধুনুরির কাঁধে কাঁধে ঘোরে। কাকিমা মুকুকে নিয়ে পেছনে এসে পড়েছেন।

বাবা, কতক্ষণ ধরে তোমরা এই ক'ধাপ মাত্র উঠেছ? শাবাশ, নওজোয়ান!

এই গানটা এখন খুব শোনা যায়। আমরা নওজোয়ান। কাকিমাও শুনে থাকবেন। অপর্ণা বুং করে একটা শব্দ তুলে, উদ্ভাসিত মুখে বললে, কী সুন্দর!

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ, তোমার বিয়েতে নবতের সঙ্গে বটঠাকুরকে এসরাজ ছেড়ে বাজাতে বলব। দুটিতে তো বেশ জোড়ে দাঁড়িয়েছ। কত্তাকে একবার ডেকে দেখাব?

অপর্ণা দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বলতে লাগল, না না লক্ষীটি না।

কাকিমা বলতে লাগলেন, ওরে পাগলি, কাপড় জড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবি। কী ডাকাত মেয়ে রে বাবা! ছাতে উঠে অপর্ণা হাঁপাচ্ছে। ভারী বুক উঠছে আর নামছে। মেয়েটার তো খুব প্রাণ আছে। কনকের মধ্যে একটা বড়দি-বড়দি ভাব ছিল। এ একেবারে ভিন্ন জাতের টগবগে মেয়ে।

ন্যাড়া ছাদের আলসেতে শাড়ি গুটিয়ে বসে অপর্ণা বললে, উঃ হাঁপিয়ে গেছি। এক গেলাস জল খেয়ে আসি।

কাকিমা বললেন, দয়া করে তুমি ওই আলসে থেকে নেমে বোসো। মাথা ঘুরে টাল খেয়ে ওপাশে পড়ে গেলে সর্বনাশ হবে, মা।

হ্যাঁ পড়লেই হল। আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি? আঃ কী সুন্দর ছাদ!

হ্যাঁ, সুন্দর ছাদ। তুমি নেমে মাদুরে বোসো।

অপর্ণা আলসে থেকে নেমে মাদুরে পা ছড়িয়ে বসল রানির মতো। কাকিমা বললেন, এমন টুকটুকে পা, একটু আলতা পরো না কেন?

অপর্ণা নিজের পা দুটো ভাল করে দেখতে দেখতে বললে, বড় ছটফটে, বড় অবাধ্য।

আপনারা বসুন, আমি এক গেলাস জল নিয়ে আসি।

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে এসো, সেবা করতে শেখো।

অপর্ণা বললে, না না, আমি নীচে গিয়ে খেয়ে আসছি।

তুমি চুপ করে বোসো তো। একদম ছটফট করবে না।

তা হলে আমি একটু শুয়েই পড়ি।

অপর্ণা মাদুরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। চারপাশে কড়ার মতো উপুড় হয়ে পড়েছে ঘন নীল আকাশ। কসমস গাছে অজস্র ফুল এসেছে, সাদা, বেগুনি। অপর্ণার হলদে শাড়ির জমিতে খয়েরি ডুরে। ওপর-বাহুর তলার দিক, কোমরের কিছু অংশ, আর দুটো পা, নতুন আবিষ্কারের মতো মাদুরে সাজানো রয়েছে। মেয়েরা জানে না, মেয়েদের কোন কোন জিনিস কতটা মারাত্মক! বহু উঁচুতে আকাশের চাঁদোয়ায় চিল ঘুরপাক খাচ্ছে। রায়সায়েবদের বাড়ির এরিয়েলের তারে বসে দুটো দোয়েল খুব শিস দিচ্ছে, আর ন্যাজ নাচাচ্ছে। মুকু গোবদা মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কাকিমা বললেন, এসো, একপাশে বোসো। মহারানি তিন কাঠা জায়গা নিয়ে শুয়েছেন। অবেলায় আলসে লেগেছে। ভাব এসে গেছে।

মুকুর মনে হয় হিংসে হয়েছে। মেয়েদের হিংসে কি ছেলেদের চেয়ে বেশি?

জল আনতেই অপর্ণা উঠে বসল। আলগোছে কলকল করে জল খাচ্ছে। মুখের হাঁ ছোট্ট এতটুকু। ভেতরটা লাল টকটকে। ইঁদুরের মতো ছোট্ট ছোট্ট সাজানো দাঁত। জিভটা যেন সাপের মতো হিলহিল করছে। এ সাপ অন্য সাপ, বড় অমৃত, বড় অমৃত।

খুব ভাল করে ভেবে দেখো তুমি, এখনও রয়েছে
ফিরিবার অবসর,
শুধু নিমিষের ভুলের লাগিয়া কঁদিবে যে তুমি,
সারাটি জনম ভর।

কাকিমা বললেন, রানি এইবার এক-এক খিলি পান। ঠোঁটদুটো লাল টুকটুকে হবে। টুকটুকে লাল ঠোঁট চুষে চুষে খাই।

যাঃ অসভ্য, বলে অপর্ণা কাকিমাকে ঠেলা মারল। আমি ভালমানুষের মতো মুখ করে, আকাশের চিল দেখতে লাগলুম, যেন আমি চিল-বিশারদ। মনে ভাবছি একটি লাইন, ছাঁচিপান দিয়ে ঠোঁটেরে রাঙালে, তখনই তা মোছে ঠোঁটেরই হাসির ঘায়ে।

লুডোর ছক পড়েছে। চারটে মাথা চারদিক থেকে সামনে ঝুঁকে আছে। ঘাড়ের কাছে খোঁপা লদলদ করছে। ছক নাড়ার খুড়খুড় শব্দ হচ্ছে। অপর্ণার এন্তার ছয় পড়ছে। সব ঘুঁটি বেরিয়ে ছকের চারপাশে ছড়িয়ে আছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে এগিয়ে চলেছে। অপর্ণার লাল। কাকিমার নীল। আমার সবুজ। মুকুর হলদে। কাকিমার কেবল এক পড়ছে নয়তো তিন। আমার যেমন বরাত, বলে ক্রমশই হতাশ হয়ে পড়ছেন। আমার তিনটে বেরিয়েছিল। দুটোকে অপর্ণা পত্রপাঠ ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। মুকুর দুটো বেরিয়েছে। বেরোলে কী হবে? অপর্ণার নাগালের মধ্যে। ও তো বলে বলে কাটছে। ছক্কা যেন ওর হাত ধরা! পড় পাঁচ তো পাঁচই পড়ল। আর কচাত করে মুকু_উড়ে গেল। অপর্ণার গলায় গান গুনগুন করছে, মায়াবন বিহারিণী হরিণী, গহন স্বপন সঞ্চারিণী।

কানের পাশ দিয়ে বাতাস ঢালছে ফুরফুরিয়ে। লম্বা লম্বা চুল উড়ছে দিশাহারা হয়ে। আমার একপাশে অপর্ণা, আর একপাশে কাকিমা। অপর্ণার দিক থেকেই বাতাস বইছে। মাঝে মাঝে চুল উড়ে এসে আমার গালগলা ছুঁয়ে যাচ্ছে।

পড় তো তিন। ব্যস, আমার একটা ঘুঁটিই বাইরে ছিল, ঘরে ফিরে গেল। অপর্ণা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কী, মন খারাপ হয়ে গেল!

বলতে পারতুম, তোমার কাছে পরাজয়, সে তো আমার জয়। বড় বেশি নাটকীয় হয়ে যাবে। বীরের উক্তি, আবার আমি শুরু করছি, তোমায় নতুন করে পাব বলে, হারাই বারেবারে।

অপর্ণা বললে, সে কি লুডোর ঘুঁটি? সে তো ভালবাসার ধন!

কাকিমা বললেন, হ্যাঁ রে বুড়ি, সে তো ভালবাসারই ধন।

মুকু দান ফেলছে, চাল দিচ্ছে, কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্ক! পশ্চিম আকাশে সূর্যদেব পাটে নেমেছেন। আকাশ একেবারে কুমকুম-লাল। তালচটকা পাখি উড়ছে নেচে নেচে। কাকিমা বললেন, চায়ের সময় হল। যাই

ব্যবস্থা করি। বটঠাকুর আবার চা-খোর মানুষ।

অপর্ণা বললে, আমার বাবাও তাই। মাঝে মাঝেই মায়ের সঙ্গে লেগে যায়। চা নিয়ে দক্ষযজ্ঞ। ছক গুটিয়ে কাকিমা নীচে চললেন। মুকু আর অপর্ণা বসে রইল মুখোমুখি। মুকুর মনে হয় অপর্ণাকে খুব ভাল লেগে গেছে। দু'জনেই ছাত্রী।

নীচের ঘরে বিশেষ একটা কিছু নিয়ে তিনজনেই ভীষণ ব্যস্ত। টেবিলে ল্যাম্প জ্বলে উঠেছে। তার আলোয়, ছড়ানো খবরের কাগজের পাতা। তিনটে মাথা তিন দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। যা কথা হচ্ছে, সবই ফিসফিস করে। তিন মেজর জেনারেল যেন, রাতের আক্রমণের পরিকল্পনায় মশগুল।

পায়ের শব্দে তিনজনেই চমকে ফিরে তাকালেন। আমাকে দেখে বললেন, অ, তুমি? তাও ফিসফিস করে।

পিতা ফিসফিস করে ডাকলেন, এদিকে এসো।

আলোর বৃত্তে কাগজের যে-অংশ, সেই অংশে একটি ছবি।

দেখো তো। ভাল করে দেখো।

পুলিশের বিজ্ঞাপন, অশনাক্ত মৃতদেহ। ধেবড়ে কালো হয়ে আছে। একটি মেয়ে।

পিতা খুব চাপা স্বরে বললেন, সেই নাক, সেই কপাল, অনেকটা সেইরকমেরই মুখ। কী, তাই? না?

খরবায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো॥

পুলিশের ছাপা ছবি থেকে কাউকে শনাক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। তবু কোথাও সামান্য মিল খুঁজে পেলে বুকটা কেমন যেন ছাঁত করে ওঠে। হাতপা অবশ হয়ে আসে। পিতা কাগজটা সরিয়ে ফেলতে ফেলতে বললেন, খুব সাবধান, বিনয়দা বা মুকু কারুর কানে যেন না যায়।

খুব চাপাস্বরে কথা হচ্ছে। পিতা মাঝে মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, পুলিশের একজন ওপরঅলার সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। বলিস তো আজই যা হয় একটা কিছু করা যায়।

ডাক ভেসে এল, হরিদা আছেন, হরিদা!

সব আলোচনা থেমে গেল। গলাটা খুবই চেনাচেনা। আর একবার ডাক আসতেই পিতা বললেন, হ্যাঁ, আছি। এসো, এসো অক্ষয়, এসো অক্ষয়।

পিতার সেই সহকর্মী বন্ধু, অক্ষয়কাকা, যিনি ভীষণ ভাল হাত দেখেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, আরে, কী আশ্চর্য! অক্ষয়, তুমি এইসময়?

ভদ্রলোকের সেই এক পোশাক। খালি পা, বুক খোলা হাফহাতা মোটা পাঞ্জাবি, মোটা ধুতি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বড় বড় লাল চোখ।

পা দুটো পাপোশে ঝেড়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, কাছাকাছি একজনের হাত দেখতে এসেছিলুম, ভাবলুম একবার ঘুরে যাই।

পিতা বললেন, বোসো বোসো, তোমাকে ভগবান পাঠিয়েছেন।

কাকিমা আর অপর্ণা চা নিয়ে এসেছেন। পিতা বললেন, আর এক কাপ চাই। কিছু খাবার আছে?

অক্ষয়বাবু বললেন, এখন শুধু চা-তেই হবে। আছি তো, যাবার সময় হবে।

পঙ্কজবাবু বললেন, এই আমার মেয়ে, অক্ষয়। অপর্ণা।

অপর্ণা হাত তুলে নমস্কার করল।

বাঃ একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা। চন্দ্র তুঙ্গী। বুধ প্রবল। আপনি অতি ভাগ্যবান। মনে আছে, এই মেয়ে হবার পরই আপনার চড়চড় করে উন্নতি হতে লাগল। বউদিও অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, আপনিও সুন্দর। তবে ইদানীং একটু মোটা হয়েছেন।

সে অক্ষয়, তোমার বউদির যত্নে। তা ছাড়া বয়েসও তো বাড়ছে।

সে তো হরিদারও বাড়ছে। দেখুন তো কেমন পাথর-কোঁদা শরীর। একছটাক মেদ নেই।

আহা, ও হল সাধক। ওর সঙ্গে তুলনা চলে না।

চা আসার পর, পিতা নিজে উঠে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ভেতরের কথা যেন বাইরে না যায়।

শোনো অক্ষয়, ঈশ্বরই আজ তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

কেন বলুন তো? বেশ সশব্দে চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে, অক্ষয়বাবু সামলে নিলেন। মৃদু চুমুক মেরে বললেন, আজ আপনার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখছি। থেকে থেকেই ঈশ্বরের নাম করছেন। যা আগে কখনও করতেন না।

মাতামহ নীরবে মাথা নাড়তে লাগলেন, মাদ্রাজি কায়দায়।

পিতা বললেন, আমার মনোজগতে একটা বিপ্লব হয়ে গেছে, অক্ষয়। মানুষের মন! কখন যে কীভাবে ভেঙেচুরে যায়। মৃত্যু আমাকে নাস্তিক করেছিল, জীবন আমাকে আবার আস্তিক করে তুলেছে। যাক সেসব কথা এখন চাপা থাক। কাজের কথায় আসা যাক। তোমার তো মর্গে খুব আসা-যাওয়া আছে।

মর্গ?

হ্যাঁ মর্গ, যেখানে অশনাক্ত মৃতদেহ থাকে।

হ্যাঁ তা আছে। প্রায়ই যাই। টেনে টেনে হাত দেখি, কেস হিস্ট্রি তৈরি করি, তারপর মেলাই।

তা হলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। খুব সাবধানে, চুপিচুপি। তুমি এই কাগজটা দেখো।

অক্ষয় কাকাবাবু সামনে ঝুঁকে পড়লেন।

এই যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, এটা মনে হচ্ছে, আমাদের সন্দেহ বলতে পারো।

কী সন্দেহ? এর সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক?

আছে আছে। আমাদের বিনয়দার বড় মেয়ে, কনক, দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে গিয়েছিল। সে আর ফিরে আসেনি। তার কোনও ট্রেস নেই। আজ এই ছবিটা বেরিয়েছে।

মিলছে?

ছবিটা তো তেমন স্পষ্ট নয়। কালি ধ্যাবড়ানো। তবু মনে হচ্ছে কেমন যেন মিল আছে।

পঙ্কজবাবু বললেন, পুলিশে আমার এক মাসতুতো ভাই বড় অফিসার, ভাবছিলুম আজই একবার তাকে গিয়ে ধরি। সামনাসামনি দেখলে সন্দেহটা আর থাকবে না।

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, এই অসময়ে কি আর দেখাতে চাইবে? ওদের অনেক বায়নাক্কা। ঘুষঘাষের ব্যাপার আছে। সব ব্যবস্থা সারতেই তো রাত কাবার হয়ে যাবে। আজকে দেখতে হলে আমাদের অন্য রাস্তায় যেতে হবে।

কীরকম?

চিফ মিনিস্টারের পলিটিক্যাল ডানহাত আমার খাতিরের লোক। হাতটাত দেখি। মাঝেমধ্যে ওষুধবিষুধও দিই। কলকাতা তার নামে কাঁপে। তাকে একবার ধরতে পারলে এখুনি কাজ হয়ে যাবে।

কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে?

সে ঘাঁটি আছে।

তা হলে চলো, এখুনি একবার বেরিয়ে পড়া যাক।

আপনাকে যেতে হবে না। আপনার ছেলেকে নিয়ে যাই। দেখলেই চিনতে পারবে।

অক্ষয় কাকাবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কী, তোমার ভয় করবে?

না, ভয় করবে কেন?

সত্যিই তো, ভয়ের কী আছে! দিনুর ডেডবডি দেখেছি। বরফের স্ল্যাবে শোয়ানো। মাথাটা চুরমার।

তা হলে তুমি আমার সঙ্গে চলো।

পঙ্কজবাবু বললেন, অক্ষয়, এক কাজ করা যাক। প্রথমে আমার বাড়িতে চলো। হুডখোলা আমার সেই ছ্যাকড়া গাড়িটা বের করি। যেমনই হোক চারটে চাকা তো আছে। ঘোরাঘুরির সুবিধে হবে।

হ্যাঁ, গাড়ি থাকলে তো খুব সুবিধেই হবে। চলুন তা হলে।

জাস্ট এ মিনিট। একটু তৈরি হয়ে নিই।

পিতা বললেন, তোমরা যাবে, আর আমি আরাম করে বাড়ি বসে থাকব!

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, আমরা তো রয়েছি। এ বড় ঝামেলার কাজ। আপনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। বাড়ি সামলান, আমরা ঘুরে আসি।

মাতামহ বললেন, আমি তা হলে থেকেই যাই। কী হল জানতে না পারলে, সারারাত বড় উদ্বেগে কাটবে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা সদলে রাস্তায় নেমে এলুম।

পঙ্কজবাবু বললেন, একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। বাস ঠেঙাতে আর ভাল লাগছে না।

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, ওই মোড়ে গেলেই পেট্রলপাম্পের কাছে অনেক গাড়ি পাওয়া যাবে।

একটু দূরত্ব রেখে পেছন পেছন হাঁটছি। পঙ্কজবাবুরা মনে হয় ভীষণ বড়লোক। নিজেদের গাড়ি। আত্মীয়স্বজনরা বড় বড় চাকরে। চেহারায় সাংঘাতিক চেকনাই। অপর্ণা পঙ্কজবাবুর পাশাপাশি হাঁটছে। যুবকরা যুবতী দেখলেই তাকাবে। চায়ের দোকানের সামনে থেকে হারু এগিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, কে রে পিন্টু?

আমাদের আত্মীয়।

আগে তো কোনওদিন দেখিনি।

বিদেশে ছিলেন।

প্রশ্নের জবাব পেয়েও হারু আমার পাশে পাশে বোকার মতো হাঁটতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, যাবি কোথায়?

তুই কোথায় চললি?

আমি কলকাতায় যাব।

চল তোকে স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিই। একলা একলা যাবি!

একলা কী রে? আমার সঙ্গে এতজন রয়েছেন।

কতদিন তোর সঙ্গে দেখাটেখা হয় না। চাকরিবাকরি করছিস! আড্ডা মারার আর সময়ই নেই। মেসোমশাই কেমন আছেন?

ভাল আছেন।

তুই কোথায় বেরোচ্ছিস?

একটা মার্চেন্ট অফিসে।

মেসোমশাইয়ের অফিসে ঢুকতে পারলি না! সরকারি অফিসে একবার ঢুকতে পারলে, জীবনে আর কোনও দুশ্চিন্তা থাকে না। বিয়েথা করে একেবারে জাঁকিয়ে বোসো।

হারু কথা বলছে আমার সঙ্গে, তাকিয়ে আছে অপর্ণার দিকে। আচ্ছা বিপদ তো! হে ঈশ্বর, পাঁঠাটার হাত থেকে মুক্তি দাও। ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রার্থনার উত্তর দিলেন। হারু মোক্ষম একটা হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছিল। সামলে নিল। চলতে গিয়ে বললে, যাঃ শালা, চটি ছিঁড়ে গেল।

তুই পারবি তো একা যেতে?

মনে হয় পারব।

হারু চটি টানতে টানতে ফিরে চলল। ট্যাক্সি তৈরিই ছিল। অক্ষয় কাকাবাবু ড্রাইভারের পাশে বসলেন। আমরা তিনজন পেছনে। আমি আর অপর্ণা দু'ধারে, মাঝখানে পঙ্কজবাবু। সারাদিন আমার সঙ্গে তেমন কথা হয়নি। এইবার আমাকে পাশে পেয়েছেন।

চাকরি কেমন লাগছে?

বেশ ভালই।

আমার একটা কথা শুনে ভীষণ ভাল লাগল। ভেরি ভেরি প্রেজওয়ার্দি। তুমি নাকি বলেছিলে, বাবার অফিসে ঢুকবে না, নিজের জোরে চাকরি জোগাড় করবে, এবং করেছ! ব্র্যাভো মাই সান। শেষ পর্যন্ত তোমার এই স্পিরিট যেন থাকে। বাঙালি প্রতিষ্ঠান হলেও, ভেরি গুড কনসার্ন। চুপ করে আছ কেন? কথা বলো। তুমি ভীষণ শাই।

আজ্ঞে না, কী আর কথা বলব? আপনিই তো সব বলছেন।

তুমি কিছু বলছ না বলেই, আমাকে বকবক করতে হচ্ছে। তোমার বাবা বলছিলেন, তোমার নাকি উড়ুউড়ু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী ভাব।

অক্ষয়বাবু সামনের আসন থেকে বললেন, ওর হাত আমি দেখেছি পঙ্কজদা, সন্ন্যাসযোগ আছে। সংসার ছাড়লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অপর্ণা বললে, সন্ন্যাসী হতে হলে কী করতে হয় বাবা?

উত্তর দিলেন অক্ষয় কাকাবাবু, সব ছেড়ে চলে যেতে হয় মা।

কোথায়?

কোনও আশ্রমে, পাহাড়ের গুহায়।

পঙ্কজবাবু বললেন, গৃহী সন্ন্যাসীও হওয়া যায়। আমাদের গুরুদেব গৃহী সন্ন্যাসী।

হ্যাঁ, তাঁরা হলেন অবধূত।

অপর্ণা বললে, গৃহী সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল।

অক্ষয় কাকাবাবু শব্দ করে হাসলেন।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সোজা গিয়ে, গাড়ি বাঁয়ে বাঁক নিয়ে যে রাস্তায় ঢুকল, সেটা হল বিডন স্ট্রিট। সাবেক আমলের বড় বড় থাম-অলা বিশাল বাড়ি। গেট আছে। গেটের বাইরে একটি প্রস্তর ফলক। সেই ফলকে ডক্টর বি. ডি পর্যন্ত পড়া যায়, বাকি সব ধুয়েমুছে গেছে।

বিশাল বাড়ি মানেই ভাঙা বাড়ি হওয়া উচিত। এ বাড়ি কিন্তু সেরকম নয়। বেশ ভালই আছে। দেখলে মনে হয় লক্ষ্মীছাড়া হয়নি। বাগান, গাড়িবারান্দা, বাগানঘর, সাবুগাছ, ঝিলমিল লাগানো গভীর বারান্দা, ঝাড়লণ্ঠন। অতীত এখনও জাঁকিয়ে বসে আছে, হিসেবি বৃদ্ধের মতো।

গেটে চাকা লাগানো আছে। ঠেলতেই ঘড়ঘড় করে খুলে গেল। গম্ভীর গলায় কুকুরের ডাক। পুরুষকণ্ঠের ধমক, অ্যাস্টার, অ্যাস্টার। মেয়েদের দমকা হাসি। রেডিয়ো থেকে উপচে-পড়া বেহাগে খেয়াল। সাবুগাছের পাতায় রাতের বাতাসের পাখা-নাড়া-শব্দ। সব যেন কেমন স্বপ্নের মতো! এই বুঝি নিয়ম। এই বুঝি তাঁর খেলা। কোথাও স্বপ্ন, কোথাও বাস্তব।

বসার ঘরে গোল একটা শ্বেতপাথরের টেবিল। কোণে কোণে ছোট ছোট টেবিল। কোনওটায় পাথরের মূর্তি, কোনওটায় পোর্সিলেন ভাস। এলাহি ব্যাপার। দেয়ালে বিশাল বিশাল ছবি। মনটা কেমন যেন করে ওঠে। ফিনফিনে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, সুন্দর চেহারার এক ভদ্রলোক জুতো মসমসিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, দাদা এলে? তোমার দেরি দেখে বউদি ছটফট করছে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। বাতাসে একটা সুবাস ঘুরপাক খেতে লাগল।

ঘরে এইবার যে-মহিলা এসে ঢুকলেন, তাঁর কাছে ঘরের বাতিও ম্লান হয়ে গেল। জীবনে অতবড় খোঁপা আমি দেখিনি। মহিলা ভীষণ আবেগে কিছু বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের দেখে রাশ টানলেন। মাথায় এক চিলতে ঘোমটা টেনে দিয়ে বললেন, এত দেরি হল?

পঙ্কজবাবু বললেন, কী এমন দেরি গো, এই তো সবে সন্ধে হল। ছোটবাবু ইভনিং ওয়াকে গেলেন। ছোটবাবুকে দেখে ঘড়ি মেলাতে যেয়ো না।

অক্ষয় কাকাবাবু আগেও মনে হয় এ বাড়িতে এসেছেন। মহিলা বললেন, কী অক্ষয় ঠাকুরপো, পথ ভুলে!

অক্ষয়বাবু উত্তরে শুধু হাসলেন। হেসে বিশাল একটা সোফায় শরীরের ভার ফেলে দিলেন। স্প্রিং তাকে দোলাতে লাগল। যেন ঢেউয়ে ভাসছেন।

আমি পড়েছি মহা বিপদে। এত বড় ঘর, সুন্দর সুন্দর চেহারা। নিজেকে মনে হচ্ছে লেড়ি কুকুর। হঠাৎ তাড়া খেয়ে ঢুকে পড়েছি।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই সেই বালক, মায়ের মৃত্যুর পর যাকে তুমি দত্তক নিতে চেয়েছিলে।

আঁ, এই সেই পিন্টু। ও মা কত বড় হয়ে গেছিস রে তুই?

মহিলা আবেগে উচ্ছ্বাসে, আমাকে বুকে টেনে নিলেন। মাথাটা বুকের ওপর। যে-চোখটা খোলা, সেই চোখের সামনে হারের লকেটে লাগানো লাল একটা পাথর, আলো পড়ে ধকধক করছে।

মহিলার একটা হাত আমার মাথার চুলে খেলা করছে।

তুই আমার কাছে থাকলে এতদিনে আরও সুন্দর করে দিতুম।

পঙ্কজবাবু বললেন, সুধা, ওকে ছাড়ো। এখন আমাদের অনেক কাজ। তুমি চট করে গাড়ির চাবিটা এনে দাও।

এখন আবার বেরোবে?

হ্যাঁ, আমাদের ভীষণ একটা কাজ পড়েছে। ফিরতে রাত হলে ভেবো না।

পিন্টুও যাবে?

হ্যাঁ, ওকে তো যেতেই হবে।

ওমা। ছেলেটাকে একটুও বসতে দেবে না?

ফিরে এসে বসবে। আগে কাজ।

টুক করে একটা প্রণাম সেরে নিলুম ফাঁক পেয়ে। ভাবাই যায় না, ইনি আমাকে মায়ের স্নেহে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। মরুভূমি আর নদী একই পৃথিবীর দুটি দিক।

অপর্ণা কেমন টুক করে ভেতরে চলে গেছে। কী জানি কেমন মেয়ে। চালিয়াত বলে তো মনে হল না। তবে এঁরা বেশ বড়লোক। বড়লোকি চাল থাকলে কিছু বলার নেই।

পঙ্কজবাবুর গাড়িটা বেশ মজার। মাথাটা খোলা যায় আবার বন্ধ করা যায়। কী যেন একটা নাম বললেন, সান বিম। মাথার ওপর শহর ছুটে চলেছে হুহু করে। বাড়ি, ছাদ, বারান্দা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। আকাশও ছুটছে। পঙ্কজবাবুই গাড়ি চালাচ্ছেন। অক্ষয়বাবু পাশে বসে আছেন দৈত্যের মতো। আমি এক লিলিপুট পেছনের আসনে।

পঙ্কজবাবুর কবজিতে সোনার চেনে বাঁধা সোনার হাতঘড়ি চিকচিক করছে।

আমরা প্রথমে তা হলে কোথায় যাব! লালবাজারে?

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, অসময়ে লালবাজারে গিয়ে শুধু শুধু সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

তা হলে ভবানীপুরে আমার সেই আত্মীয়ের বাড়ি যাব?

আগে মলঙ্গা লেনে আমার সেই বন্ধুর ডেরায় যাওয়াই ভাল। এখন তাকে পাবই।

সরু গলি। গাড়ি ঢুকবে না। একটা তিনকোনা পার্কের পাশে গাড়ি রেখে, আমাদের পদযাত্রা শুরু হল। ভাঙাভাঙা একটা বাড়ির দোতলা থেকে আর্ত চিৎকার উঠল, খুন খুন।

পঙ্কজবাবু আর আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। এরকম অন্ধকার-অন্ধকার গলিতে যে-কোনও সময়েই খুন হতে পারে। রক্তনদীর ধারার খোকাগুন্ডার গলি।

অক্ষয়বাবু হেসে বললেন, ভয় নেই, চলে আসুন। নাটকের মহলা হচ্ছে।

গলির মধ্যে সবচেয়ে যেটা চটকদার বাড়ি, সেই বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অক্ষয়বাবু ডাকতে লাগলেন, সরোজ, সরোজ। দু'ডাকে সাড়া না পেয়ে নাম বদলে ডাকতে লাগলেন, পটোল, পটোল।

মানুষের কী দুর্গতি! যার ভাল নাম সরোজ, তার ডাক নাম পটোল।

দোতলার জানলায় একটা বিরাট মুখ ঘরের আলোয় কালো হয়ে দেখা দিল। হেঁড়ে গলায় উত্তর এল, কে?

আমি অক্ষয়।

কে অক্ষয়?

আরে আবলুস।

ও হোঃ, অক্ষয়দা? দরজা ঠেলে ওপরে চলে আসুন।

ভেতরে মার্বেল পাথর বাঁধানো একটা উঠোন। সামনেই ঠাকুরদালান। দালানে মা কালীর বিশাল মূর্তি। একটু আগেই পুজো হয়েছে। ধুনোর ধোঁয়ায় আলো এখনও ঝাপসা। সেই ঝাপসা পরদায় মা কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়।

বাঁ পাশ দিয়ে বেশ একটা চওড়া সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে। পালিশ করা কাঠের হাতল ঝকঝক করছে। সিঁড়ির ওপরের মাথায় অসম্ভব সাজগোজ করা এক মহিলা হাসিহাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখে বললেন, আসুন দাদা, আসুন।

মহিলার একটু স-এর দোষ আছে। বাঙালি বলে মনে হল না। ইরানি হতে পারেন, ভূপালি হতে পারেন।

লম্বা ঝকঝকে একটা দালান সোজা উত্তরে চলে গেছে। ডান পাশে একটা কাঠের স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে স্টাফ-করা বাঘ। জীবন্ত। মাঝরাতে ঘুমচোখে দেখলে, বাপ বলে দৌড় মারতে হবে। চোরেদের কী খোয়র।

একপাশে জুতো খুলে, পালিশ করা মেঝের ওপর দিয়ে প্রায় হড়কাতে হড়কাতে, আমরা যে-ঘরে এলুম সেটাকে হলঘর বলা চলে। বিশেষ কোনও ফার্নিচার নেই। মাঝখানে একটা লাল কার্পেট। সেই কার্পেটে লাল লুঙ্গি, আর সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে সরোজবাবু বসে আছেন। দেয়ালে খাপ সমেত একটা রিভলভার ঝুলছে। আর এক দিকে ঝুলছে একটা রাইফেল।

আসুন দাদা আসুন দাদা বলে আমাদের অভ্যর্থনা হল।

অক্ষয়বাবু বললেন, নাও, আসন ছেড়ে উঠে পড়ো। পরোপকার করতে হবে। এঁরা আমার আত্মীয়ের মতো। বড় বিপদে পড়েছেন।

কী হয়েছে? কারুর অসুখ? ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না? না, পকেট মারা গেছে?

ওসব তো তোমার কাছে সামান্য জিনিস।

আমরা তিনজনেই বসে পড়েছি।

একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা কী দাদা! কলকাতায় কত মেয়ে যে বেপাত্তা, আপনাদের কোনও ধারণাই নেই। মিসিং পার্সনস ডিপার্টমেন্টে মেয়ের বাপেদের দু'বেলা হাহাকার। সব দেখবেন, বোম্বাই গিয়ে বসে আছে। সব ফিল্‌মস্টার হবে। আপনার মেয়ে?

প্রশ্নটা পঙ্কজবাবুকে। অক্ষয়বাবু বললেন, না না, ওনার মেয়ে নয়। আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের মেয়ে। আজকের কাগজে একটা আন-আইডেন্টিফায়েড ডেডবডির ছবি বেরিয়েছে। ভাল বোঝা যাচ্ছে না। সেইটাই আমরা একবার দেখতে চাই।

সারা সকাল কী করছিলেন অক্ষয়দা? এই শেষরাতে এসব ঝামেলা?

একটু উপকার করো ভাই। তোমার তো সবে সন্ধে। তুমি একবার গিয়ে দাঁড়ালে, কারুর বাপের ক্ষমতা নেই না বলে।

বসুন তা হলে, তৈরি হয়ে আসি। কিছু খাবেন?

না না, আমরা খেয়েই এসেছি।

কাগজটা সঙ্গে এনেছেন?

উত্তর আমিই দিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, এনেছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সরোজবাবু বললেন, দেশে প্রেমের বন্যা বইছে রে বাবা!

ভেতর থেকে অর্গানের সুর ভেসে এল। রবীন্দ্রসংগীত বাজছে। পঙ্কজবাবু বললেন, কে বাজাচ্ছে অক্ষয়? বড় মার্ভেলাস হাত।

সরোজের স্ত্রী। মারাঠি মেয়ে। ভীষণ ভাল নাচে। লোকে টিকিট কেটে দেখতে যায়।

মারাঠি মেয়ে বাঙালিকে বিয়ে করেছে? স্ট্রেঞ্জ!

স্বাধীনতার পর সবেতেই স্বাধীনতা এসেছে, পঙ্কজদা।

দু'জনের বয়েসের অনেক ডিফারেন্স!

ওসব কিছু না। মনের মিল হলে বয়েসফয়েস কিছু না।

সরোজবাবু বেশ পালটে ঘরে এলেন। ব্যাকব্রাশ করে আঁচড়ানো চুল। সাদা প্যান্ট, সাদা জামা। প্রায় ফুট ছয়েক লম্বা। ক্রিকেট ক্যাপ্টেনের মতো দেখাচ্ছে। দেয়াল থেকে রিভলভারটা নিয়ে কোমরের বেল্টে গুঁজছেন, অক্ষয়বাবু বললেন, তুমি কি যুদ্ধে যাচ্ছ? রিভলভার কী হবে?

সরোজবাবু হাসলেন, অক্ষয়দা, কয়েক হাজার শত্রু এই শহরে ঘুরছে। মরার আগে একটু বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

অর্গানে বাজতে লাগল, খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে, ওগো নেয়ে নাওখানি বাইয়ো।

লাখোঁ সুন্‌দার সপ্‌নোভিতে লাখোঁ সাঁঝ সবেরা

সরোজবাবু কাগজের বিজ্ঞপ্তিটা দেখে বললেন, ইউনিভার্সিটির পেছনের সেই মর্গেই আমাদের যেতে হবে। দেখি যদি সাধুকে পেয়ে যাই, কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পঙ্কজবাবুর গাড়ি এখন বেশ ভারী হয়েছে। তাই যেন গুড়গুড় করে চলেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দারুণ দেখাবে। জনতার মাথার ওপর দিয়ে হুড়হুড় করে উড়ে চলেছে কিংকং-এর মতো এক দৈত্য। সঙ্গে তার ছানাপোনা। গাড়ি কলুটোলায় এসে ডান দিকে বাঁক নিল। বাঁ পাশে রাস্তা ঘেঁষে গাড়ি দাঁড়াল। সরোজবাবু নামতেই গাড়ি আধ হাতটাক ওপরে উঠে গেল।

ফুটপাথের ধারে ভলভল গঙ্গার জল বেরোচ্ছে ফোয়ারার মতো। মেয়ে-পুরুষের ভিড়। মনেই হয় না, এর উলটো দিকের বিমর্ষ চেহারার লম্বাটে ঘরে সারি সারি শুয়ে আছে প্রাণহীন দেহ। সরোজবাবু সাধুর খোঁজে গেছেন।

অক্ষয়বাবু বললেন, অনেক পাপ করলে, মানুষকে মর্গে আসতে হয় মৃতদেহের খোঁজে।

পঙ্কজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, দুর্গন্ধ আছে?

একটু পরেই দেখতে পাবেন। নাকে বেশ করে রুমাল জড়িয়ে নেবেন। এখানে যে আমার কত অভিজ্ঞতা আছে, শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে।

কীরকম?

একদিন একটি মেয়ের হাত দেখব বলে হাতটা টেনেছি। আত্মহত্যার কেস। পোকামারার ওষুধ খেয়ে স্যুসাইড করেছে। তখনও কাটাই ছেঁড়াই হয়নি। হাতটা আমার হাতের তালুতে ফেলে, খাতায় সবে আঁকতে আরম্ভ করেছি। আঙুলগুলো অল্প অল্প নড়ে উঠল। মরার পর মানুষের শরীরে টান ধরে, আমি ভাবলুম সেইরকম কিছু। চাঁপার কলির মতো আঙুল। একেবারে দুর্গা প্রতিমার মতো চেহারা। হাতে আত্মহত্যার যোগ যেমন স্পষ্ট, তেমনই আবার দীর্ঘ জীবন, প্রচুর ঐশ্বর্যের যোগ আছে।

পঙ্কজবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তা কী করে হয় অক্ষয়?

কেন হবে না? খুব হয়। একটা ট্রেন ধরুন, বেনারসের কাছে অ্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে গেল, তারপর সোজা চলে গেল হরিদ্বার। জীবনও সেইরকম, একটা ধাক্কা কাটাতে পারলেই, রয়ে গেল সত্তর কি আশি বছর। এ তো আপনার আর আমার জীবনের দেখা ঘটনা। মনে আছে! আমাদের সেই প্রিভেনটিভ অফিসার ঘোষের কথা। মোটরসাইকেলে রেড রোডে অ্যাকসিডেন্ট করল। শরীর চুরমার। গেল গেল অবস্থা। সেই ঘোষ এখন ডেপুটি কালেক্টর।

উলটো দিকের ফুটপাথ থেকে সরোজবাবু ডাকলেন, চলে আসুন।

অক্ষয় কাকাবাবুর গল্পের শেষটা আর শোনা হল না। উলটো দিকের ফুটপাথে সরোজবাবুর পাশে, সরোজবাবুর হাফ সাইজের একটি মানুষ খাকি জামা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে বিড়ি।

সরোজবাবু বললেন, অ্যায় সাধু?

সাধু যেন স্বপ্নের ঘোরে দাঁড়িয়ে আছে। ফুকফুক বিড়ি টানছে, আর ফুসফুস ধোঁয়া ছাড়ছে। কোনও হুঁশ আছে বলে মনে হচ্ছে না। এ আবার মানুষের কী ব্যামো!

অ্যায় সাধু, বলে সরোজবাবু ঘাড় ধরে এক ঝাঁকুনি মারলেন।

সাধু বললে, বলুন। শুনতে পাচ্ছি।

ক' ছিলিম টেনেছিস?

কার বাপের কী?

সরোজবাবু সঙ্গে সঙ্গে সপাটে এক চড় কষালেন।

পঙ্কজবাবু আর অক্ষয়বাবু দু'জনেই হাহা করে উঠলেন, আহা, করো কী? করো কী?

সরোজবাবু হুংকার ছাড়লেন, তোমার নেশা আমি ঘুচিয়ে দোব। কার সঙ্গে কথা বলছিস জানিস?

সাধু সঙ্গে সঙ্গে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, মারুন মারুন। গরিবলোক তো বড়লোকের তবলা। তেহাই সাধার জায়গা। এক চড় কেন? তিন চড় মারুন। এই তো গাল পেতে দিচ্ছি। মহাত্মাজির চেলা।

সাধুবাবু যা করছেন সবই ঘুমের ঘোরে। অক্ষয়কাকাবাবু বললেন, সরোজ, একে দিয়ে হবে না মনে হচ্ছে।

খুব হবে, দু'-চার ঘা পড়লেই হবে।

না, না, মারধরে দরকার নেই।

সাধুবাবু অমনি মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, না না মারধরে হবে না। প্রেম বিলাও, দিল দিলাও।

সরোজবাবু এবার সাধুর দু'কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলেন। রোগা মানুষটার হাড় ক'খানা খুলে না পড়ে যায়। চুকচুকে মাথা কামানো, ঘাড়ে গর্দানে একটি লোক এগিয়ে এসে বললেন, আরে এ সাধু, দেখা হামারা হাতমে কেয়া হ্যায়।

লোকটির হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। সাধুর চোখদুটো চকচক করে উঠল। চোখ বড় বড় করে সরোজবাবুকে বললেন, বলুন স্যার, কী করতে হবে?

এতক্ষণ আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছিল, রাসকেল? চল ঘর খুলবি চল।

মর্গের সামনে গোটা দুই ছোট লরি দাঁড়িয়ে। একদল লোক। সবাই ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছেন। সাধুর একজন ওপরওয়ালা সাধুকে দেখেই ফায়ার হয়ে গেলেন, ব্যাটা তোর চাকরি এবার আমি খাব।

সাধু অম্লানবদনে বললে, সেই ঢোকার প্রথম দিন থেকেই শুনে আসছি। ছাড়ালে, নতুন লোক আর পাবে না। এ হল ভূতের চাকরি।

যাঁরা ভিড় করে আছেন তাঁরা লাশ নিতে এসেছেন। একজন পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে আছেন। ঠান্ডাঘর থেকে হুকুম মিলিয়ে দেহ বের করে দেবেন। লরির ওপর থেকে দুটো খাটিয়া, ফুল, ফুলের মালা নেমে এল। গোছা গোছা ধূপে আগুন পড়ল। দড়ি নামল। প্রিয়জনকে বাঁধা হবে।

খাকি জামা পরা আরও দু'-চারজন কর্মচারী এপাশ ওপাশ থেকে এসে গেলেন। অন্ধকারে ফিসফাস কথাবার্তা, টাকার লেনদেন চলতে লাগল। পুলিশের সেই লোকটি এক ফাঁকে এসে সরোজবাবুকে বলে গেল, কিছু মনে করবেন না স্যার! যেখানকার যা নিয়ম!

সরোজবাবু যেন দেখেও দেখছেন না। গম্ভীর গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি ঝামেলা হাটান, আমি এসেছি একজনকে আইডেন্টিফাই করতে।

এই তো স্যার, এক্ষুনি হয়ে যাবে।

একধরনের ধাতব শব্দ হতে লাগল। লোহার ট্রে নামছে বাঙ্ক থেকে। মৃত্যু চলেছে ঝনঝনিয়ে, মল বাজিয়ে। আমি আর পঙ্কজবাবু তাকিয়ে আছি উলটো দিকে। এ দৃশ্য যত কম দেখা যায় ততই ভাল। জীবনের আতঙ্ক!

একবার আড়চোখে তাকিয়েই ভয়ে আতঙ্কে চমকে উঠলুম। একটি মহিলার মৃতদেহ ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছেন। বেশ সম্পন্ন চেহারার কয়েকজন ভদ্রলোক রয়েছেন সঙ্গে। মহিলা পুড়ে একেবারে কাঠকয়লার মতো হয়ে গেছেন। কয়লার হাত, কয়লার পা, কয়লার মুখ। মাথার চুল পুড়ে গিয়ে, গুঁড়িগুঁড়ি হয়ে আটকে আছে।

আতঙ্কে পঙ্কজবাবুকে জড়িয়ে ধরেছিলুম। তিনি বললেন, ওদিকে তাকিয়ো না। অক্ষয় কাকাবাবুর কোনও কিছুতেই দৃকপাত নেই। সরোজবাবুরও তাই। দু'জনেই গল্পে মশগুল। ডোমজুড়ে বাগানবাড়ি বিক্রি হবে। সরোজবাবু দরদস্তুর করছেন। দু'হাত দূরে মৃত্যু স্তূপাকার, এঁরা জীবনের আয়োজনে ব্যস্ত।

মৃতদেহ নাড়াচাড়া করে সাধুবাবুর নেশা ছুটে গেছে। তিনি প্রসন্ন মহাদেবের মতো এসে বললেন, কই আসুন। আপনাদের মাল দেখে যান।

চলুন চলুন, বলে সরোজবাবু আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে, মৃত্যুর মতো শীতল সেই ঘরে ঢুকলেন। মৃত্যু যে এত দুর্গন্ধময় কে জানত। কোথায় মানুষের গৌরব! জীবনের সুগন্ধ ছড়ায় কই! মৃত্যু এসে দুর্গন্ধ মাখিয়ে দিয়ে যায়। সাধুবাবু একটা ট্রে টানলেন। একজন কিশোর। ভুল নম্বর টেনেছেন। ছিলিম এখনও ছাড়েনি। দ্বিতীয় ট্রে। একজন বৃদ্ধ। দাঁত খিচিয়ে আছেন। সাধু বললেন, অ্যাঃ, শালা সেই বুড়ো। কেউ নিতেই আসে না। থাক শালা, এখানে আজন্ম শুয়ে।

সরোজবাবু ধমক লাগালেন, আবার মার খাবি সাধু, মুখ সামলে।

মুখ আর কী সামলাব হুজুর, এখানে কিছু মাল আছে, যারা চিরকাল থাকবে, কোনওদিন নড়বে না। এই বুড়োকে গলা টিপে মেরেছে। মেরেছে মেরেছে...

সাধু এটা গল্প করার জায়গা নয়। মাল টানো।

টানি হুজুর, আমি আদার বেপারি।

তৃতীয় ট্রে-টা টেনেই সাধু বললে, অ্যায় যাঃ আবার ভুল হয়ে গেল।

ট্রে-টা ভেতরে ঠেলতে যাচ্ছে, আমি চিৎকার করে উঠলুম। না করে পারলুম না, এ যে প্রফুল্লকাকা!

সাধু বললেন, কী হল? আপনারা তো বললেন, মেয়েছেলে, পুরুষ দেখে চিল্লে উঠলেন?

আরে এ যে আমাদের প্রফুল্লকাকা!

কে তোমার প্রফুল্লকাকা? তিনজনেরই এক প্রশ্ন।

ওই যে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, কাকিমার স্বামী।

অ্যাঁ, সেকী? পঙ্কজবাবু চিনেছেন, ওই যে মহিলা, যিনি আজ রাঁধলেন, পরিবেশন করে খাওয়ালেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার বুকের ভেতর কাঁপতে শুরু করেছে। হাতপা অবশ হয়ে আসছে। আমি ঠিক দেখলুম তো?

সরোজবাবু বললেন, তুমি ভাল করে একবার দেখো। সাধু বের কর।

ট্রে টানার শব্দ হল। চিত হয়ে শুয়ে আছেন। সেই পরিচিত মুখ। ছুঁচোলো গোঁফ। আমাদের প্রফুল্লকাকা। আর দাঁড়াতে পারছি না। সারাশরীর কাঁপছে। এ কী হল! বেশ বুঝতে পারলুম, আমি ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছি।

সময়ই জানে সময়ের উজানে আমাকে কোথায় এনে ফেলেছে। তিনটি উদ্বিগ্ন মুখ তিন দিক থেকে ঝুঁকে আছে। মাথার ওপর বাড়ি-ঘেরা কলকাতার আকাশ। পঙ্কজবাবুর হুডখোলা গাড়ির পেছনের আসনে পা দুমড়ে চিত হয়ে আছি। মাথাটা ভিজেভিজে। সরোজবাবুর হাতে একটা তালপাতার পাখা। অল্প দূরেই একজন দেহাতি মহিলা। ফুটপাথের বাসিন্দা, আমাকে সুস্থ করার জন্যে পাখা এগিয়ে দিয়েছেন।

তিনজনেরই এক প্রশ্ন, কেমন বুঝছ বাবা!

দুঃস্বপ্ন দেখে যেন জেগে উঠলুম, যা দেখলুম, তা কি সত্যি!

পঙ্কজবাবু বললেন, সে তো তুমিই জানো বাবা।

সরোজবাবু বললেন, একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোনো।

অন্ধকারে সাধুবাবুর গলা, মেয়েটাকে একবার দেখবেন না?

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, দেখতে তো হবেই, সেইজন্যেই তো আসা।

সরোজবাবু সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ওই লোকটিকে কোথায় পেলে?

কে জানে? কোথায় যেন মরে পড়ে ছিল। ওসব আমি জানি না। খাতায় আছে।

সরোজবাবু আমার কপালে একটা হাত রেখে বললেন, কী বুঝছ? একটু শক্ত হও। বেঁচে থাকলে কত মৃত্যু দেখবে! অত সহজে টাল খেলে চলে?

দেহাতি মহিলা বললেন, পানি?

তুমি জল খাবে?

আজ্ঞে না। চলুন আমি ঠিক হয়ে গেছি।

ধীরে ধীরে আবার আমরা সেই লাশঘরে এলুম। সাধুবাবু এক টানে সেই ট্রে-টা বের করে ফেললেন। যা দেখার জন্যে আমাদের ছুটে আসা। অক্ষয় কাকাবাবু কাঁধে হাত রেখে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, পাছে পড়ে যাই বা মরে যাই। ধরে রাখলেই যদি ধরে রাখা যেত!

এতক্ষণ চোখ বুজিয়ে ছিলুম। শ্বাসপ্রশ্বাস প্রায় বন্ধ। চোখ খুললেই তো কনককে দেখতে পাব। প্রথমে পিটপিট করে তাকালুম। না দেখলেই যেন ঘটনা অঘটনা হয়ে যাবে, সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে। সরোজবাবু বললেন, ভাল করে তাকাও।

ভাল করেই তাকালুম। আনন্দে বুক ছলাত করে উঠল। কনক নয়। অন্য কেউ। যৎসামান্য মিল। সে মিল মুখে। ইনি অনেক ময়লা। বয়েসেও বেশি। মাথার চুল কনকের মতো নয়। শুধু এই ভেবে অবাক হচ্ছি, একটু আগে শোকে, আতঙ্কে, জ্ঞানশূন্য হয়েছিলুম, এখন আনন্দে একেবারে ভোরের পাখি।

এ নয় এ নয় বলে, প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলুম। পাখির মতো ডানা ঝটপটিয়ে গলা নামিয়ে নিলুম। মৃতের মঞ্জিলে উল্লাস অশোভন।

পঙ্কজবাবু বললেন, এ নয়? আ গড সেভ দি কিং।

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, এ নয়, আঃ, বাঁচালে।

সরোজবাবু বললেন, যার গেল, তার গেল। নাও সাধু তুলে রাখো।

এতক্ষণ যেন শাড়ির দোকানে কাপড় পছন্দ করা হচ্ছিল। পঙ্কজবাবু বললেন, কিন্তু!

আর কিছু বললেন না। আমাদের সকলের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল। ছায়া নামল মনে।

সরোজবাবু বললেন, তুমি আর একবার ভাল করে দেখো তো। তোমার চিনতে ভুল হচ্ছে না তো!

আজ্ঞে না, ভুল হয়নি। খুব ভাল করেই দেখেছি।

কিন্তু কী করে তা হয়! ভদ্রলোক ছিলেন কোথায়? আছেন কোথায়? এখানে কী করে এলেন?

সাধু বললেন, মরে গিয়ে এসেছেন স্যার! এঁরা সবাই যমরাজের অতিথি।

সরোজবাবু থেমে থেমে, কেটে কেটে বললেন, তুউমি চুউপ কঅরো!

পকেট থেকে পাঁচটাকার একটা নোট বের করে সাধুর হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুই আছিস কতক্ষণ?

সারারাত হুজুর।

আমরা হয়তো আবার আসব, বুঝেছিস শয়তান? এসে যদি দেখি তুই সুঁই নিয়ে পড়ে আছিস, কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না।

বেঁচে থাকলে তো বাঁচার কথা আসে হুজুর, আমরা তো মরেই আছি। মড়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভূত হয়ে গেছি। মর্গের বাইরে এসে, চুপ করে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম মুক্ত আকাশের তলায়। সরোজবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এখন তা হলে কী করা যায়|

প্রশ্ন আছে উত্তর নেই। কী করব আমি। জীবনেও ভাবিনি, এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে। একটা বাতি জ্বলছে, আমি গিয়ে ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দোব। এই তো সেদিন, দু'জনে হইহই করতে করতে এলেন। সংসার সাজিয়ে বসলেন। কত আশা, আকাঙ্ক্ষা। একটি সন্তানের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা। দুপুরে হেসে খেলে রান্না। পাত পেতে খাওয়া। ছাদে লুডো খেলা। চোখের জল, হাসি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে জীবন ধুয়ে সাদা। সিঁদুর মুছে ফেলো, শাঁখা ভেঙে ফেলো। শাড়ি ছেড়ে, থান পরো।

না, এ আমি পারব না।

সরোজবাবু উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন, ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, কী পারবে না|

আমি গিয়ে বলতে পারব না, কাকাবাবু মারা গেছেন।

এ কী বোকার মতো কথা, বলতে তো হবেই। ঘটনা ঘটিয়ে সময় চলে গেছে। সময়কে তো ফিরিয়ে আনা যাবে না ভাই। ঘড়ির কাঁটাকে ঘোরাবে কী করে? তা হলে শোনো।

পঙ্কজবাবু বললেন, এখানে না দাঁড়িয়ে, কোথাও গেলে হয়।

হ্যাঁ, তা হয়। চলুন তা হলে, গাড়িতে চলুন।

ওঁদের মনে কী হচ্ছে আমার বোঝার ক্ষমতা নেই। নিজের মনের কথা বলতে পারি। অন্ধকার সমুদ্রে ঢেউ উঠছে, পড়ছে, ভাঙছে, চুরছে। শ্যাম আকাশের তলায়, ফসফরাসের খলখল হাসি। ভয়ংকর সুন্দর। ওই সাধু গাঁজা চড়িয়ে অসাড়, ঘটনার অ্যানেসথেসিয়ায় আমার চেতনা বিকল হয়ে আসছে।

পৃথিবীতে দুঃখ মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। জল যখন গড়ায় তখন একজনের চোখেই বয়। তা না হলে এই বিভ্রান্তির মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে কেন? একটা কেলে ভুঁসো কুকুর, পেছনের আসনের তলায় ঠ্যাং ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছিল। আরাম করার আর জায়গা জুটল না। অক্ষয় কাকাবাবু যেই পা রেখেছেন কুকুরটা কেঁউ করে লাফিয়ে উঠে কাকাবাবুর কাছাকোঁচার সঙ্গে জড়িয়ে, ওই অল্প পরিসরে এমন এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল। সরোজবাবু আর পঙ্কজবাবু হেই হেই করছেন, আর বলছেন, খুব সামলে, খুব সামলে। কামড়ালেই জলাতঙ্ক। কে শুনবে? কাকাবাবু সাংঘাতিক বেকায়দায় পড়ে গেছেন। পা দুটো যথেষ্ট ফাঁক করতে পারলে কুকুরটা বেরিয়ে যেতে পারত।

যাই হোক সবকিছুরই একটা শেষ আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও শেষ হয়েছিল। রাস্তার কূটকচালে ট্রাফিক জটও একসময় খুলে যায়। শেষমেষ একটা রফা হল। কাকাবাবুর কোঁচা গলায় জড়িয়ে, খামচাখামচি করতে করতে কুকুর ফুটপাথে লাফিয়ে পড়ল। অর্ধেক বস্ত্র দান করে ভদ্রলোক রেহাই পেলেন। কামড়ায়নি। কামড়াতে পারেনি, কারণ নিজের মুখ নিজেই খুঁজে পায়নি। কাপড়ে জড়িয়েছিল। যা করে গেছে, সবই পায়ের কাজ।

অক্ষয় কাকাবাবু রাস্তায় নেমে এলেন, কাছা গলায় দিয়ে কুকুর বসেছে গিয়ে যেখানে ভলভল করে গঙ্গার জল বেরোচ্ছে। কাপড়ের যতটুকু কুকুর দান করে গেছে, সেই অংশটুকু লুঙ্গির মতো করে পরে নিলেন। সংসারে কীভাবে যে মানুষের কাছা খুলে যায়|

সরোজবাবু বললেন, হুডখোলা গাড়ি কলকাতায় চলে না। এ এক ভাগাড়ে শহর। অক্ষয়দা, কামড়ায়নি তো|

কামড়ায়নি, তবে আঁচড়েছে।

চলুন তা হলে, ডাক্তার ভবরঞ্জনের কাছে যাই।

আরে দুর, এ অতি সামান্য ব্যাপার। এর চেয়ে কত বড় বড় চোট হয়ে গেছে তাই যাইনি|

গাড়ি চলতে শুরু করল। কুকুর-কুকুর গন্ধ বেরোচ্ছে। সরোজবাবু আবার একটা সিগারেট ধরালেন। ভদ্রলোক মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এবার তা হলে কী হবে|

এবার?

দু'জনে একই কথা বললেন, বলেই চুপ করে গেলেন। পৃথিবীতে এইরকম বহু এবার আছে, যে-বারের পরে আর কিছু থাকে না। থাকে এক ধরনের ঘোলাটে শূন্যতা।

সরোজবাবু বললেন, কেসটা জানা দরকার। হঠাৎ একটা লোক মারা গেল, নিরীহ লোক।

পঙ্কজবাবু বললেন, এখন, এ সময় জানব বললেই কি আর জানা যাবে?

যেতে পারে, যদি বিশুকে ধরা যায়।

এতক্ষণ আমরা কথায় কথায় কেউই লক্ষ করিনি। গোয়ালের গোরুর মতো গাড়ি ঘুরঘুর করে বিডন স্ট্রিটের দিকেই চলেছে। কোথাও তো একটা যেতে হবে। যে যার ঘরের দিকেই চলে।

পঙ্কজবাবুর বাগানে ভুরভুর করে ফুলের গন্ধ ছাড়ছে। রাত-রানিরা ফুটে বসে আছে। ঢোকার মুখের উঁচু রকে এক সার সুন্দরী বসে আছেন। একটা ফুটফুটে বাচ্চা, চোখে ঘুম নেই, সবে হাঁটতে শিখেছে। টলে টলে বেড়াচ্ছে। দু'পা যায়, ধুপ করে বসে, আধো আধো গলায় বলে, এই দাঃ। আমাদের ঢুকতে দেখে, সকলেই একটু সংযত হলেন। অপর্ণা বাচ্চাটাকে কোলে টেনে নিতেই, মুক্তি পাবার জন্য ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে চিল চিৎকার ছাড়তে লাগল।

অপর্ণার মা বললেন, ওরে ওকে ছেড়ে দে না বাপু, কানের পোকা বের করে দিলে।

বাচ্চাটা ছাড়া পেয়েই অপর্ণাকে চড়, চাপড়, ঘুসি সব একসঙ্গে চালাতে লাগল। শেষে কচি কচি মুঠোয় চুল ধরে টান। সামনের দিকে মাথা নিচু করে অপর্ণা বলছে, উ, উ, ছাড় ছাড় দস্যি ছেলে।

অপর্ণার মা উঠে এলেন। নতুন মানুষ দেখে অভ্যর্থনা জানালেন নতুনভাবে, আসুন আসুন। পঙ্কজবাবুকে হাসিহাসি মুখে বললেন, কী, তোমাদের কাজ হল? কী করে এলে, ডাকাতি?

আমাদের মনের অবস্থা জানবেন কী করে। পঙ্কজবাবু যেন একটু বিরক্তই হলেন। সেইভাবেই বললেন, বড় বিপদ, বড় বিপদ।

কী বিপদ? মহিলা যেন কেমন হয়ে গেলেন। বিপদের চেয়ে বিপদের ছায়া অনেক বেশি ভয়াবহ।

চলো চলো, ভেতরে চলো, সব শুনতে পাবে।

শিশুটির দস্যিপনা থামাবার জন্য এইবার কেউ একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, ওকে ঘুমপাড়া না বাপু। রাত তো অনেক হল।

সরোজবাবু বসতে বসতে বললেন, বাঃ বড় চমৎকার বসার ঘর।

পঙ্কজবাবু প্রশংসাটা স্ত্রীর দিকে ঠেলে দিলেন, সব এরাই করে। আমাকে বিশেষ ভাবতে হয় না।

সৌভাগ্যবান আপনি। বউদি, জল খাব, ভাল করে এক কাপ চা খাব, কিছু মনে করবেন না, আবদার করছি।

ওমা, সেকী! মনে করব কেন? আমাদের বাড়ি অষ্টপ্রহরই চা হচ্ছে।

আমাদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, হ্যাঁগা, সত্যি করে বলো তো, তোমরা কি শ্মশান থেকে এলে|

শ্মশান? পঙ্কজবাবু ঢোঁক গিললেন, ঠিক শ্মশান নয়, বলতে পারো মহাশ্মশান।

মরণ মরিতে চায়, মরিছে না তবু
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।

এই বাড়ির কোথাও একটা গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ি আছে। সময় চলে যাবার সময় বড় সুন্দর শব্দ করে যায়। রাত ন'টা বাজল। গ্রীষ্মকাল। শীতকাল হলে চারপাশ নিশুতি হয়ে যেত। সরোজবাবু বললেন, এ নিয়ে খুব একটা পরামর্শের দরকার আছে কি। ভদ্রলোক আপনাদের কীরকম আত্মীয়|

আমি বললুম, আমার বাবার বন্ধু। খুব ভাল, মনে হয় নামকরা তবলচি। বাড়ির নীচেটা খালি পড়ে ছিল বলে, উনি যেখানে থাকতেন সেখান থেকে উঠে এসেছিলেন।

আত্মীয়স্বজন কে কে আছেন?

মনে হয় কেউ নেই। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। একজন মামা বোধহয় আছেন।

ব্যস, তা হলে তো কোনও সমস্যাই নেই। মামাকে খবর দিলেই হয়ে যাবে। তিনি এসে লাশ নিয়ে যান। আমি পুলিশকে বলে দিচ্ছি, যেন হ্যারাস না করে।

অক্ষয়বাবু বললেন, খুব ভাল বলেছ। এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবা যায় না।

পঙ্কজবাবু বললেন, দি ওয়ে।

অপর্ণা এসে বাবার কানে কানে কী যেন বলল। পঙ্কজবাবু বললেন, ও হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়। উঠে দাঁড়ালেন। অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, কোথায় চললেন?

একবার অন্দরমহল থেকে ঘুরে আসি, ডাক পড়েছে। তোমার জন্যে একটা ধুতি নিয়ে আসি।

না না, পঙ্কজদা, ধুতির দরকার হবে না। এই বেশ আছি। আপনি তো আমাকে চেনেন। বউদি চা আনলে কুকুরের আঁচড় মাচড় একটু ওয়াশ করে দোব।

চা দিয়ে কেন? আমি অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ড্রেস করিয়ে দিচ্ছি। আমার ছোটভাই রাখাল এইসব ব্যাপারে ভীষণ এক্সপার্ট।

কথা বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলো, ভেতর থেকে ঘুরে আসি। ভেতরে যেতে হবে শুনেই, নিজের আকার আকৃতি সাজপোশাক সম্পর্কে মনে মনে ভীষণ সচেতন হয়ে পড়লুম। মনের অদৃশ্য আয়নায় বারেবারে ভেসে উঠতে লাগল আমার অবিন্যস্ত চেহারা|

ঢাকা একটা বারান্দা এপাশ থেকে ওপাশ চলে গেছে। সুন্দর করে বাঁধানো একটা উঠোন। পাশে পাশে পাতাবাহার গাছের অপূর্ব শোভা। একপাশ দিয়ে একটা নারকেল গাছ সোজা আকাশের দিকে উঠে গেছে। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। পরিবেশটা এতই সুন্দর, দেখলেই মন ভাল হয়ে যায়। দুরে বাঁ পাশ দিয়ে চওড়া একটা সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে কোনও স্বপ্নলোকের দিকে। পঙ্কজবাবু আমাকে বলতে লাগলেন, এসো

বাবা এসো। চলে এসো, লজ্জা কীসের? এ তো তোমারই বাড়ি। উঠোনের শেষ প্রান্তে রান্নাঘর। রান্নার 'ছ্যাঁকছোঁক, টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। দোতলার ছাদে কুকুর ডাকছে গম্ভীর গলায়।

পঙ্কজবাবু হাঁকলেন, কই গো, কোথায় গেলে তোমরা |

স্বাস্থ্যবান একটি ছেলে, হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে, পাশের একটা ঘর থেকে হাতের গুলি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে এল। পঙ্কজবাবু বললেন, এই যে, জনি উইসমুলার, তোমার বডি বিলডিং ওয়ার্কশপ এত রাতেও খোলা?

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে, জেঠু, কাল আমরা রাঁচি যাচ্ছি।

হঠাৎ এইসময় রাঁচি?

কলেজ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সাত দিনের ক্যাম্প। তোমার জন্যে কিছু আনতে হবে?

রাঁচির পেঁপে খুব ভাল। পারিস তো কিছু বীজ নিয়ে আসিস।

তোমার কিটব্যাগটা কিন্তু নিয়ে যাব। জ্যাঠাইমাকে বলেছি।

ওটাতে বোধহয় একটা তাপ্পি লাগাতে হবে।

সে আমি ঠিকঠাক করে নোব।

দু'জনের কথার ফাঁকে ঘরটা দেখে নিলুম। মেঝেতে বারবেল, ডাম্বেল গড়াগড়ি যাচ্ছে। দেয়ালে ব্যায়ামবীরদের বিভিন্ন ভঙ্গির ছবি।

পঙ্কজবাবু বললেন, আমার বন্ধু অক্ষয়কে কুকুরে আঁচড়েছে, তুই একটু ড্রেস করে দিয়ে আসতে পারবি?

খুব পারব।

পঙ্কজবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসো, সব ওপরে আছে মনে হচ্ছে।

দোতলাটা একতলার চেয়ে আরও সুন্দর। জাফরি-বসানো ঢাকা বারান্দা। ঝকঝকে মেঝেতে আলো ঠিকরোচ্ছে। জায়গায় জায়গায় জোড়া জোড়া সোফা পাতা। যুঁই ঝাড় জানলার বাইরে ফুলে ফুলে সাদা, বাতাসে দুলছে। মোড়ায় সৌম্যচেহারার এক বৃদ্ধা বসে আছেন। যাঁর সবকিছুই শুভ্র। কেশ, অঙ্গবাস, দেহত্বক, এমনকী পায়ের চটি। পায়ের কাছে থেবড়ে বসে আছে সাদা একটা বেড়াল। পশমের গোলার মতো।

বৃদ্ধার হাতে একটি জপের মালা আপন মনে ঘুরছে। পঙ্কজবাবু বললেন, আমার মা। বয়েস অনেক। এমনি খুবই শক্তসমর্থ। কেবল কানে একটু কম শোনেন।

পঙ্কজবাবু গলা দু'ধাপ তুলে বললেন, মা, এই আমার সেই বন্ধুপুত্র, পলাশ।

জপের মন্ত্রে ঠোঁটদুটি নড়ছে। মুখ ভেসে গেল উদ্ভাসিত হাসিতে। পবিত্র মুখে হাসি খেলে কোজাগরী রাতের চাঁদের আলোর মতো চরাচর ব্যাপ্ত করে।

অদ্ভুত স্নেহজড়ানো সুরে বললেন, আয় আয়, কাছে আয়। তোকে একবার ভাল করে প্রাণভরে দেখি।

কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই, দু'হাতে মাথার চুল ধরে বেশ করে নেড়ে দিলেন। নাড়তে নাড়তে বললেন, চান করেছিস, ভাল করে মাথা মুছিসনি? সর্দি হবে যে রে ভাই। এত বড় বড় চুল করেছিস। ও খোকা, এর মাথাটা যে ভিজে সপসপ করছে। একটা কিছু দে আগে, ভাল করে মুছুক।

পঙ্কজবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, দিচ্ছি মা। কই গো কোথায় সব গেলে৷

বারান্দা ধরে তিনি এগোতে লাগলেন। হঠাৎ বাড়িটা যেন জনশূন্য হয়ে গেছে। এই বারান্দা ওপাশে পাক মেরে কোথায় যে চলে গেছে। কোন স্বপ্নলোকে।

দূরে অপর্ণা আসছে। কী হল বাবা?

আরে তোরা কোথায় যে চলে যাস। এই আছিস এই নেই যেন মরীচিকা৷

অপর্ণা বললে, ওদিকে যে এক কাণ্ড হয়েছে। বাবলু নাকে ন্যাপথালিনের গুলি ঢুকিয়েছে, আর বেরোচ্ছে না। মা কাকিমারা সবাই সেই নিয়ে ব্যস্ত।

অ্যাঁ, সেকী রে?

দু'জনেই বারান্দার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সার সার, সাদাসাদা আলোর ডোম বাতাসে দুলতে লাগল। যুঁই ফুলের ভিজেভিজে গন্ধ।

বৃদ্ধা মোড়া থেকে মেঝেতে নেমে বসলেন, আয়, আমার পাশে বোস। সারাদিন ওরা কী যে এত হইহই করে। বড় সংসার তো? কত লোক দেখ না? বাড়ি একেবারে গিজগিজ করছে।

ভেতরের হট্টগোলে ঢোকার চেয়ে এইখানে বসতে পেয়ে যেন প্রাণে বাঁচলুম। অনেক মহিলার মধ্যে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়।

বৃদ্ধা বললেন, কী করিস তুই?

এই তো সবে একটা চাকরি পেয়েছি।

চাকরিতে গেলি ভাই। ডাক্তার কি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলি না?

আমার যে তেমন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। বাবা বলেন, মানুষের খোলসে একটা গাধা পোরা।

বৃদ্ধা হাসলেন। বড় মাপা হাসি। অভিজাত মহিলারা এইভাবেই হাসেন। অপর্ণা একটা পাটভাঙা তোয়ালে এনেছে।

ওমা, একী! আপনি মাটিতে বসে পড়েছেন?

নাক থেকে সেই জিনিসটা বেরিয়েছে?

চেষ্টা চলছে। কাকা বলছেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ও ধীরে ধীরে উড়ে যাবে। নিন মাথাটা মুছে ফেলুন। ভেজালেন কী করে?

ভিজে গেল।

কী করে ভিজল?

উত্তরে বোকার মতো হাসলুম।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন, বুড়ি কী বলছে?

অপর্ণা চিৎকার করে বললে, মাথা কী করে ভিজল?

চান করলে মাথা ভিজবে না? চান করে এসেছে। মাথা মোছার সময় পায়নি।

অনেক দূরে সমবেত উল্লাসধ্বনি উঠল। অপর্ণা বললে, যাক বেরিয়ে গেছে মনে হয়। চলুন, চলুন, এখানে দিদার কাছে বসে থাকলেই হবে?

মেঝে থেকে আমাকে ওঠাবার জন্যে অপর্ণা হাত ধরে টানতে লাগল। এই কাজটা মনে হয় সে ঠিক করছে না। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বৃদ্ধা দেখছেন দেখুন, অন্য কেউ দেখলে ভাববেন, বাবা, এখনই এত|

বৃদ্ধা বললেন, যাও ভাই ঘুরে এসো। যাবার সময় একবার আমার কাছে হয়ে যেয়ো। আমার ঠাকুরঘর দেখাব, একটু প্রসাদ খেয়ে যাবে।

অপর্ণার পেছন পেছন চলেছি। হাতে তোয়ালে। হঠাৎ মনে হল, ব্যাপারটা নিয়ে অপর্ণার সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। কী করা উচিত, কী করা উচিত নয়। বারান্দার নির্জন অংশে এসে মৃদু গলায় ডাকলুম, অপর্ণা! বেশ লাগল ডাকতে।

অপর্ণা প্রশ্নের মুখ নিয়ে ঘুরে তাকাল, কী বলুন?

শোনো, একটা খুব বিপদ হয়েছে।

কী বিপদ? দেয়ালে পিঠ রেখে থেমে পড়ল। মুখে আলো পড়েছে। নাকছাবি কানের দুল চিকচিক করছে। মনে হচ্ছে আমার ভীষণ কাছের মানুষ। আমার এই উতলা উৎকণ্ঠিত মন সামনে মেলে ধরতে পারলে একটু শান্তি পাব।

আমরা এইমাত্র মর্গ থেকে আসছি।

মর্গ?

আর কিছু বলার সুযোগ হল না। পঙ্কজবাবু আর অপর্ণার মা মার্চ করে আসছেন।

অপর্ণার মা এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, কী বিপদ বাবা! ছিছি, তোমাকে একলা এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। চলো চলো, ঘরে চলো।

পঙ্কজবাবু বললেন, আজ কিন্তু বেশিক্ষণ আটকানো চলবে না। বেশ ঝামেলার একটা কাজ এখনও সারা হয়নি।

তোমাদের হঠাৎ এত কাজ কোথা থেকে এল। কাজের যেন বন্যা বইছে। তুমি একবার দেখো, ওঁরা চা পেলেন কি না?

সেকী, নীচে চা যায়নি!

পটাস পটাস চটির শব্দ তুলে তিনি চলে গেলেন। অপর্ণার মা বললেন, পিন্টুকে ঘরে বসা। আমি আসছি এখুনি। তিনিও নীচের দিকে চললেন। অপর্ণা বললে, আসুন।

আমার কথাটা!

ঘরে হবে। বসে বসে বলবেন।

বারান্দা ডান দিকে বাঁক নিয়ে আর এক মহলে ঢুকে পড়েছে। একজায়গায় তিনধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা একটা উঁচু চাতালে চলে এলুম। অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। অদ্ভুত রহস্যময় বাড়ি। চাতালের তিন পাশ ঘেরা। মৃদু একটা আলো জ্বলছে মাথার ওপর, ঘেরাটোপের মধ্যে। সামনে একটা

সুন্দর পালিশ করা দরজা। কোথা থেকে হুহু করে হাওয়া আসছে। এই বাড়িতে সারাজীবন আমি বন্দি হয়ে কাটাতে পারি।

অপর্ণা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। একটু আগেও ধূপের গন্ধ পাচ্ছিলুম, এখন গন্ধ আরও বেশি পাওয়া গেল। হলঘরের মতো বিরাট একটা ঘর। ঐশ্বর্য দেখলে চোখ ঠিকরে যায়। মহিলাদের স্পর্শে এইভাবেই মনে হয় ইন্দ্রলোক তৈরি হয়। একেই বলে, ম্যাজিকটাচ। তা না হলে, সবই ছন্নছাড়া। সব থেকেও কিছু নেই।

ঘরের শেষ মাথায় একটি পালঙ্ক, যেন স্বপ্নে ভেসে আছে। ডান পাশে একটা অর্গান। সামনেই বাঁ পাশে জানলা ঘেঁষে একটি চৌকো কার্পেট। ধারে ধারে সোফা। ছিমছাম বইয়ের আলমারি। দাঁড়িয়ে লেখার ডেস্ক। বসে লেখাপড়া করার কাচ-পাতা ঝকঝকে টেবিল। বুকস্ট্যান্ড। শেড-লাগানো টেবিল ল্যাম্প। এ যেন রাজার ঘর।

দু'জনে মুখোমুখি বসলুম।

অপর্ণা বললে, মর্গে গিয়েছিলেন বলে চান করেছেন? হঠাৎ মর্গে গেলেন?

ওই যে কনক। একটা ছবি দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তবে সে কনক নয়, কিন্তু আর একটা সাংঘাতিক জিনিস দেখে এলুম। কাকিমার স্বামীর মৃতদেহ।

যাঃ, তা কী করে হয়। তিনি ওখানে কী করতে যাবেন? তিনি তো কোথায় যেন বাজাতে গেছেন।

আমি স্বচক্ষে দেখলুম, তিনি ওখানে শুয়ে আছেন।

বলতে বলতে কাকিমার মতো একজন সুন্দর মহিলার অসহায় অবস্থার কথা ভেবে গলা ধরে এল। অপর্ণার দু'চোখে জল টলটল করছে।

ধরাধরা গলায় বললুম, কী হবে অপর্ণা!

অপর্ণার চোখের জল গালে নেমে এসেছে। অতি কষ্টে বললে, আপনি দেখলেন কেন?

ইচ্ছে করে দেখিনি, হঠাৎ বেরিয়ে এল।

ইস! ছিছি। এই তো একটু আগে রাঁধলেন, খাওয়ালেন। আমরা লুডো খেললুম বসে বসে। কী হবে তা হলে?

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, অপর্ণা। আমার কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। আচ্ছা, আমি কি ভুল দেখলুম, অপর্ণা?

হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অনেক সময় একই রকম দেখতে দু'জন লোক থাকে। হয়তো যমজ নয়; কিন্তু চেহারায় অদ্ভুত মিল।

অপর্ণার মা এলেন। দু'জনকে পাশাপাশি দেখলে মনে হয়, ছোট অপর্ণা, বড় অপর্ণা। তাঁর পেছনে আর একজন মহিলা, হাতে ট্রে, একটা শরবতের গেলাস বসানো তার ওপর। যেন কুয়াশা তরল টলটল করছে গেলাসে। অপর্ণার মা অবাক হয়ে আমাদের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, কী হয়েছে রে? দু'জনে কাঁদোকঁদো মুখে বসে আছিস?

অপর্ণা আঁচলে চোখ মুছে বললে, কিছু হয়নি, মা।

তোরা আমার চোখকে ফাঁকি দিবি? নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। প্রভা, ওটা আমার হাতে দিয়ে তুমি যাও।

প্রভা ট্রে-টা সাইড টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে চলে গেল। আমার স্বভাবটা আবার মেয়েদের মতো। পেটে কথা রাখতে পারি না। বেরোবার জন্যে দরজার কাছে মুখিয়ে বসে থাকে।

অপর্ণার মা আমার ডান পাশের সোফায় বসে বললেন, কী হয়েছে বাবা! তোমার চেহারা দেখে প্রথম থেকেই কেমন যেন মনে হচ্ছে। গেলে একরকম, ফিরে এলে আর একরকম। চুল উসকোখুসকো, জামা ভিজেভিজে। কী হয়েছে বলো, আমাকে লুকিয়ো না। বুড়ি, তুই ট্রে-টা এনে সামনে ধর।

এই প্রশ্নটার জন্যেই অপেক্ষা করেছিল আমার জমা-কথা। হুড়হুড় করে বেরোতে লাগল। সব শুনে মা বললেন, কী সর্বনাশ! তুমি ঠিক দেখেছ তো|

অপর্ণা বললে, আমিও সেই কথাই বলছি, অনেক সময় দেখার ভুল হয়। দু'জন লোককে একই রকম দেখতে হয়। আর একবার ভাল করে দেখে এলে হয়।

না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই। ও যদি হঠাৎ ওখানে না যেত, তা হলে কী হত?

কিছুই হত না।

ব্যস, সেইরকম কিছুই হবে না।

ওই কাকিমার কী হবে? তিনি তো কিছুই জানতে পারবেন না।

আর তুমি জানাবার পর যদি দেখা যায়, তোমার দেখার ভুল, তা হলে কী হবে? আজ রাতে আর হইচই করে দরকার নেই। ওঁদের ওপর ছেড়ে দাও। ধীরেসুস্থে সব খবর নিন।

অপর্ণা বললে, সেই ভাল। দুঃসংবাদ যত দেরিতে জানা যায়।

পঙ্কজবাবু ঘরে এলেন, বলতে বলতে আসছেন, রাত বাড়ছে, এখনও অনেক কাজ বাকি।

অপর্ণার মা বললেন, ছটফট কোরো না তো। এখানে স্থির হয়ে বোসো। আমি সব শুনেছি।

শুনেছ? পঙ্কজবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। হাতপা ছড়িয়ে বসে পড়লেন খালি সোফায়।

বললেন, নীচে ওঁরা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ব্যস্ত হলে তো চলবে না, ভেবেচিন্তে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। আজকের রাতটা চলে যেতে দাও। সরোজবাবু আর অক্ষয় ঠাকুরপোকে বলো সব খবর নিতে। পুলিশের খাতা দেখলেই বেরিয়ে পড়বে পরিচয়।

কিছুই বেরোবে না। আননোন ডেডবডিই মর্গে পড়ে থাকে। শেষে চলে যায় লাশকাটা ঘরে। কঙ্কালটা বিক্রি হয়ে যায়।

আঃ রাখো তো ওসব কথা। মনে করো তোমরা কিছু জানো না।

তোমার সেই ইংরিজি প্রোভার্ব, হোয়্যার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ।

ছেলেটার কী অবস্থা হয়েছে দেখেছ? গেল একরকম, ফিরে এল আর একরকম।

তুমি বলেছ ঠিক, আমরা না গেলে কী হত। কিছুই জানতে পারতুম না। আচ্ছা পিন্টু, তুমি কি সত্যিই তোমার প্রফুল্লকাকাকে দেখেছ?

একবার মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, আবার মনে হচ্ছে, না।

মনটাকে স্থির করে যে-কোনও একটা কিছু বলো, পজিটিভ নেগেটিভ একসঙ্গে দুটো কী করে হয়?

তা ঠিক। তবে, এ তো মনের ব্যাপার নয়, চোখের ব্যাপার।

তা হলে আজকের মতো চেপে যাও। বেশ রাত হয়েছে।

অপর্ণার মা বললেন, তুমি আজ থেকে যাও।

করুণ মুখে বললুম, উপায় নেই। বাবা কনকের খবরের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছেন।

তা হলে কথা দাও, তুমি শিগগির আর একদিন আসবে।

পঙ্কজবাবু বললেন, আরে, তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, সামনের রোববার আমি দু'জনকেই ধরে আনব।

অপর্ণা বললে, চলুন, দিদা ঠাকুরঘরে আপনার জন্যে বসে আছে। বাবা, তুমি নীচে নামো, আমরা এখুনি আসছি।

এবার আমরা বাড়িটার আরও রহস্যময় অংশে চলে এলুম। একেবারে বাগানের দিকে। ছাদ মন্দিরের চূড়ার মতো ওপর দিকে উঠে গেছে। মার্বেল পাথরের মেঝে সোজা চলে গেছে ঠাকুরের সিংহাসনে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে বৃদ্ধা আসনে বসে আছেন। শুভ্র কেশ মৃদু বাতাসে উড়ছে। সামনেই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

আমরা দু'পাশ থেকে দু'জনে হাঁটু গেড়ে প্রণামের জন্যে মাথা হেঁট করতেই, মাথার পেছন দিকে একটি স্নেহের হাতের স্পর্শ পেলুম। হাত যেন কত কথাই বলতে চাইছে। সময় যেমন কথা বলে ঘড়ির শব্দে। দু'জনে প্রায় একই সঙ্গে মাথা তুলেছি। বৃদ্ধার দুটি হাত আমাদের দু'জনের মাথায়। দুটি অনড় চোখে জলের ধারা। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে এতক্ষণ কী কথা হচ্ছিল ভক্তই জানেন। তিনি যার কাছে আছেন, তার কাছে ষোলো আনাই আছেন, যার কাছে নেই তার কাছেও আছেন, একজন দেখেন, আর একজন দেখেন না।

অপর্ণা বললে, দিদা, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও, অনেক রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরবেন।

বৃদ্ধা আসন ছেড়ে উঠলেন। প্রসাদের থালা থেকে ধবধবে সাদা সন্দেশ তুলে আমাদের হাতে দিলেন। মুখে কোনও কথা নেই। মৃদু হাসি লেগে আছে। দু'চোখে জলের ধারা সমানে বইছে। বেশ বোঝাই গেল আবেগে রুদ্ধকণ্ঠ।

ফিরে আসার পথে অপর্ণা বললে, আমাদের ঠাকুর বড় জাগ্রত। দিদার নানারকম দর্শন হয়। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমরা গভীর রাতে মাঝে মাঝে বাঁশির শব্দ শুনি। এই দেখুন, বলতে বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

অপর্ণা তার হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। কী করব, প্রথমে আমার মাথায় এল না। হ্যাঁ, তাই তো তাই তো বলে ছেড়ে দিলে, লঘু করা হয়। তাই কম্পাউন্ডার যেভাবে ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দেয়, সেই কায়দায় দু'হাতে সেই সুন্দর হাত ধরে, ত্বকে ভাবাবেগের কাটা দর্শন করলুম। একেই বলে ভাগ্য। কেউ ঈশ্বর দেখেন, কেউ অতীন্দ্রিয় ধ্বনি শোনেন। আর কেউ সুন্দরীর দেহত্বকে কাটা দর্শন করে, হায় হায় করে। ওপাশে মৃত্যু শুয়ে আছে মর্গে, এপাশে যুবতীর দেহবল্লরী।

অপর্ণার হাত সাবধানে ধীরে ধীরে তার দেহের পাশে নামিয়ে রাখলুম। ধপাস করে ছেড়ে দিতে সাহস হল না। এসব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম। পুতুলে মানুষে তফাত বুঝি না। শুনেছি বিখ্যাত এক বিদেশি

শিল্পী সারাজীবন শুধু এঁকে গেছেন নানা ভঙ্গিমায়।

অপর্ণা বললে, এই দেখুন আমার গালেও কীরকম কাঁটা দিয়েছে।

একটা গাল আমার চোখের কাছাকাছি নিয়ে এল। মনে হল আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে দেখি, সাহস হল না। নিজের ভেতরে ডামাডোলের শব্দ পেলুম। বুকে যেন ঢাক বাজছে।

নীচের ঘরে তিনজনে ঝিমিয়ে পড়েছেন। আরও পড়তেন, যদি না অপর্ণার মা কথায় কথায় বেশ মশগুল করে রাখতেন।

সরোজবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কী করবে তা হলে?

কিছুই ভেবে না পেয়ে বললুম, আজ থাক।

সেটা কি ঠিক হবে? তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? ওনার স্ত্রীকে একবার নিয়ে এলেই তো হয়।

না, না।

না, না আবার কী? স্বামী মারা যেতে পারে জেনেই তো মেয়েরা বিয়ে করে। প্লেন ভেঙে পড়তে পারে জেনেই তো মানুষ বিমানে চড়ে। স্টোভ ফাটতে পারে জেনেই তো মানুষ পাম্প করে।

তা হলেও যতটা দেরিতে জানা যায়।

যা ভাল বোঝো করো।

সরোজবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেইভাবেই উঠে দাঁড়ালেন, আমি তা হলে চলি।

পঙ্কজবাবু বিনীতভাবে বললেন, প্রয়োজন হলে যেন সাহায্য পাই।

সেই ঘড়ি, কোথায় আছে জানি না, গম্ভীর সুরে বাজতে লাগল। রাত এগারোটা।

পঙ্কজবাবু বললেন, সর্বনাশ! অনেক রাত হয়ে গেল। ইস, হরি ভীষণ ছটফট করছে। এই তোমার জন্যেই দেরি হল।

অপর্ণার মা বললেন, কী এমন রাত! গ্রীষ্মকাল, এই তো সবে সন্ধে।

পঙ্কজবাবু বললেন, চলো চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি বললুম, না, না, আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আবার এতটা পথ একা একা ফিরতে হবে।

অক্ষয়বাবু বললেন, কোনও প্রয়োজন নেই। ভাববেন না। ছেলেদের একটু সাহসী করুন। আমি ওই পথেই ফিরব, পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

বাগানের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছি। রাতকা রানি গন্ধে একেবারে পাগল করে দিচ্ছে। কোথাও কেউ ঠুমরি গাইছে।

রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস

শেষ বাস চলে গেছে। অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, হাঁটতে পারবে পিন্টু?

খুব পারব, কাকাবাবু।

সবে সাবালক হয়েছি, ধরা তো আমার কাছে এখন সরা বিশেষ। পারলে বিশ্বটাকে অ্যাটলাসের মতো বুকে চেপে ধরে, তার ঘোরাটাও বন্ধ করে দিতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে পা চালাও। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। হরিদা ভীষণ ছটফট করছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, তিনি একবার করে ঘরে ঢুকছেন, একবার করে বারান্দায় বেরিয়ে আসছেন।

প্রায়-নির্জন রাস্তায় দু'জনে হনহন করে হাঁটতে লাগলুম। কাকা ভাইপোতে যেন ওয়াকিং কম্পিটিশন হচ্ছে। আমি হাঁটছি সামান্য সামনে ঝুঁকে, কাকাবাবু হাঁটছেন খাড়া সোজা হয়ে, অনেকটা নেচে নেচে। দম ফুরিয়ে যাবে বলে আমরা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলছি না। সামনে পড়ে আছে ট্রামলাইন। লকলক করে চলে গেছে দূর থেকে দূরে। অনেকটা মানুষের লোভের মতো, মানুষের আকাঙক্ষার মতো।

রাস্তা ক্রমশই পেছিয়ে পড়ছে। একটু আগে কারা বোধহয় শ্মশানের দিকে মৃতদেহ নিয়ে গেছে। কালো পিচের রাস্তায় সাদা সাদা খই ছড়িয়ে আছে। বাতাসে উড়ে উড়ে যাচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। চলে-যাওয়া মানুষের ফেলে-যাওয়া অসংখ্য দিনের মতো। ওড়া খই দেখে আবার সেই মর্গের কথা মনে পড়ল। সাধুবাবু এক একটা ট্রে টানছেন, এক একটি মৃতদেহ বেরিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন বয়েস, বিভিন্ন আকৃতি। মুখে লেগে থাকা বিভিন্ন প্রকারের মৃত্যুযন্ত্রণার চিহ্ন। কেউ মরেছেন আতঙ্ক নিয়ে, কেউ গেছেন বিষন্নতা নিয়ে, কেউ যেন হাসিমুখে মায়ের কোলে উঠে গেছেন। আমি ঠিকই দেখেছি। ও মৃতদেহ প্রফুল্লকাকা ছাড়া আর কারুর নয়। আর কারুর হলে কাকিমার দুঃখের ষোলোকলা পূর্ণ হবে কী করে। সেই মারনেওলা ভগবান বসে আছেন কোন ওপরে। অসংখ্য তারার চোখে সৃষ্টিকে দেখছেন, ঝুলিয়ে দিচ্ছেন ফরমান, একে মারো, ওকে আধমরা করে রাখো। একে হাসাও ওকে কাঁদাও।

চলতে চলতে কী করতে চাই, পরিকল্পনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। অভিশপ্ত বাড়ি। কোনও সন্দেহই নেই। যে আসে সেই ভোগে। একটা-না-একটা কিছু তাকে দিতেই হবে। হয় নিজেকে, না হয় নিজের কোনও আপনজনকে। অদৃশ্য মহাকাল সিংহাসনে বসে আছেন। রক্তের অক্ষরে অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস। হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে, হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে, অগাধ সাগরজলে, নির্মল আকাশে, হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে, হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে, চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে, উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে, ব্যাঘ্রের আক্রমণে, মৃগসম মুহূর্ত

দাঁড়াতে নাহি পারে। মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি, বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চির রক্তধারা, ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর। এই মহাকালকে ফাঁকি দিতে হবে। প্লটের যেমন কাউন্টার-প্লট। এসপিয়নেজের যেমন কাউন্টার-এসপিয়নেজ। কাকিমাকে কিছুই বলা চলবে না। ইচ্ছে করেই বলব না। একজন মানুষ যদি না ফেরেন, তা হলে তাঁর জন্যে চোদ্দো বছর অপেক্ষার বিধান আছে শাস্ত্রে। যা হবার হবে তার পর। চোদ্দো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়টুকু কাকিমা অপেক্ষায় অপেক্ষায় কাটিয়ে দিন। বৈধব্য স্পর্শ করবে না। একটা উদ্বেগ থাকবে, ক্রমশই শূন্যতা সহনীয় হয়ে উঠবে। শোক আর কাবু করতে পারবে না। ভরণপোষণ? একজন মানুষের দায়িত্ব আমরা নিতে পারব না। খুব পারব। পিতাপুত্রের রোজগারে হেসেখেলে চলে যাবে।

আমি লক্ষ করিনি। অক্ষয় কাকাবাবুর নজরে পড়েছে। ল্যাম্পপোস্টের আলো নেমে এসেছে নীচে। রাতের দিকে পৃথিবীটা কেমন যেন ধোঁয়াধোঁয়া হয়ে ওঠে। মিলটনের নরকের মতো। সেই আলোকিত ধোঁয়ার বৃত্তে, দু'পাশে দু'হাত ছড়িয়ে একজন মানুষ ভূমিকম্পের জমিতে গোল হয়ে ঘুরছেন। মাঝে মাঝে উলটে পড়ে যাবার মতো হচ্ছে।

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। দোসর আমি পেছনে। কাছে গিয়ে শুনতে পেলুম, লোকটি অস্পষ্ট জড়ানো গলায় বলছেন, শালা কোন দিকে, উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, পশ্চিমে? বল, শালা কোন দিকে?

কাকাবাবু লোকটিকে ধরে ফেললেন। চড়া গলায় বললেন, কী কোন দিকে?

এই যে বাওয়া বিবেক, আমার বাড়িটা কোন দিকে? আমার সেই সাতমহলা মার্বেল প্যালেস।

কাকাবাবু পশ্চিম দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, এই দিকে।

লোকটি মেয়েলি গলায় বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ব্যাটা হনুমান।

ডাইনে বাঁয়ে, ফাঁক ফাঁক পা ফেলতে ফেলতে লোকটি কাঁচি সিগারেটের মতো অন্ধকারে চলতে লাগলেন। অনিশ্চিত যাত্রা। জড়ানো গলায় টপ্পার সুরে গান ধরেছেন, বিধুমুখী, তোমায় সাজাব যতনে, মাইরি বলছি, সাজাব যতনে।

উনি কোথায় চললেন কাকাবাবু?

থানার দিকে। মুখটা সেইদিকেই ঘুরিয়ে দিলুম। তবু প্রাণে বাঁচুক। এরপর তো গুন্ডার হাতে পড়বে। নয়তো মাতাল ড্রাইভারের চাকার তলায়। লোকটার হাতে গোটা তিনেক আংটি রয়েছে। খুব টেনেছে, বুঝলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

রাত বড় মজার সময়, পিন্টু। দিনের বাঁধন আলগা হয়ে পড়ে। নাও নাও, পা চালাও! কুইক মার্চ। তোমার তো এসে গেল, আমাকে এখনও কত দূর যেতে হবে জানো। বালির ব্রিজটা কী হয়ে আছে একবার চিন্তা করো, রাতের আতঙ্ক। পারবে তুমি এখন ওই ব্রিজের ওপর দিয়ে একা একা যেতে?

আজ্ঞে না।

কী তুমি পুরুষমানুষ হয়েছ? ভয়কে জয় করো। তা না হলে জীবনের কাছ থেকে কিছুই পাবে না। সে কী দৃশ্য, ভাবতে পারো। বহু নীচে গঙ্গা বয়ে চলেছে। চারপাশ অন্ধকার। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। রেল কোয়ার্টারের

বাড়ি। একের পর এক ব্রিজের আর্চ চলে গেছে এপার থেকে ওপারে। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়ে আছে একজোড়া রেললাইন। পারবে না তুমি?

আজ্ঞে না। আমি ভীষণ ভিতু। এমনিই আমি রাতকে ভীষণ ভয় পাই, তার ওপর আছে ভূতের ভয়, বদমাইশ লোকের ভয়, এমনকী ভগবানকেও আমি ভয় পাই। জ্যোতির্ময় মূর্তি ধরে সামনে এসে তিনি যদি দাঁড়ান আমার দাঁতে দাঁত লেগে যাবে।

নাঃ, তোমার যে কী হবে!

আপনি তো আমার হাত দেখেছেন। অনেক কথাই বলেছেন, অনেক কথাই চেপে গেছেন।

চেপে গেছি, কী করে বুঝলে?

আমি জানি। এমন কিছু বলার আছে, যা বাবার সামনে বলা যায় না।

ধরেছ ঠিক। তোমার হাতটা বড় অদ্ভুত। এক দিকে প্রচণ্ড ভোগী, অন্য দিকে সাংঘাতিক ত্যাগী। একই সঙ্গে জ্ঞানী, আবার নির্বোধ। একই আধারে বসে আছে শিশু আর পণ্ডিত। কখনও জ্ঞানীর মতো কথা বলবে, কখনও নির্বোধের মতো। একই সঙ্গে লম্পট ও সন্ন্যাসী। অনেকটা চন্দ্রের মতো। পনেরো দিন অন্ধকারে, পনেরো দিন আলোয়!

বাবা, এ তো দেখছি সাংঘাতিক হাত। বিপজ্জনক চরিত্র।

তোমার জীবন সম্পর্কে আমার নিজেরই ভীষণ কৌতূহল। দূর থেকে তোমাকে দেখে যাব। আমি আছি। প্রায় পঁচানব্বই বছর থাকব। তুমিও থাকবে, তোমার আয়ু নেহাত কম নয়। জোর করে কিছু করতে যেয়ো না। দৈবশক্তির ওপর নিজেকে ছেড়ে দাও। দেখো না কী হয়।

সেটা কি ঠিক হবে?

আরে সেইটাই তো মজা! এই সন্ন্যাসী, এই প্রেমিক। কখনও গুহায়, কখনও প্রমোদকাননে। কখনও বৃদ্ধ, কখনও কৃষ্ণ। একটা কথা আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিতে পারি, মেয়েরা তোমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। সব বয়েসের মেয়েরা।

বাঁচার উপায়?

মৃত্যু।

রাত কাঁপিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে অক্ষয় কাকাবাবু হেসে উঠলেন। পথের ধারের একটা দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে এক বৃদ্ধা আকুল গলায় বললেন, কে যায়, জীবন নাকি?

অনেকটা ভেতর থেকে পুরুষালি গলায় ধমক ভেসে এল, আঃ, চুপ করে শুয়ে থাকো। ঘুমোতে পারছ না?

বৃদ্ধা টেনে টেনে বললেন, আঃ, মধুসুদন।

অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না। বারান্দায় সারি সারি অর্কিডের টব ঝুলছে। সাদামতো কী একটা রেলিং-এর পাশে জবুথবু হয়ে রয়েছে। অক্ষয় কাকাবাবু তাড়া লাগালেন, পা চালাও, পা চালাও।

মোড়ের মাথায় বেশ বড়সড় একটা পানবিড়ির দোকান রাতকে মাত করে রেখেছে। বিশাল আয়নায় আলো মুখ দেখছে। পেতলের পান-সিংহাসন ঝকঝক করছে। কোলে কুলো নিয়ে পাশাপাশি তিনটি লোক

দুলে দুলে বিড়ি বাঁধছে। একটা হাঙড়ায় রেডিয়োয় দূরের কোনও কেন্দ্র বাজছে। শব্দ মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে চোঁচাঁ, কোঁকাঁ আওয়াজ হচ্ছে। দোকানের সামনের বেঞ্চে গুন্ডা-গুন্ডা চেহারার দু'জন লোক বসে আছে। মনে হয়, সাদা পোশাকের পুলিশ। পাশেই অন্ধকারমতো একটা বাড়ির দোরগোড়ায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে।

আরও কিছু দূর এসে একজন বৃদ্ধ পথিককে পাওয়া গেল। সামনে শরীর ভেঙে লাঠি ঠুকঠুক করে টুকটুক করে চলেছেন। হাঁটার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, গন্তব্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত। রাত চলেছে, মানুষ চলেছে। আমাদের দেখে বৃদ্ধ বললেন, বাবুমশায়, একটা বিড়ি হবে?

কাকাবাবু বললেন, না।

নস্য?

না।

এক আনা পয়সা?

পকেট থেকে একটা আনি বের করে বৃদ্ধের, হাতে ধরিয়ে দিলুম। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, যাবে কোথায়?

বৃদ্ধ বললেন, দেখি, কোথায় যাওয়া যায়।

বৃদ্ধ যেন ছদ্মবেশী ভগবান। পৃথিবীর হালচাল দেখতে বেরিয়েছেন।

বাঁ পাশের অন্ধকার একটা গলিতে, গোটা তিনেক বিড়ির আগুন জ্বলছে আর নিবছে। অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, পা চালাও, পা চালাও।

উলঙ্গ এক পাগলি আঁস্তাকুড়ে ময়লা ঘাঁটছে। কিছু দূরে একটা কুকুর প্রতিবাদে গড়গড় করছে। উত্তর আকাশে পাঞ্জা মাপের একটা তারা ধকধক করছে।

আমাদের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হলেও, ভেতরে আলোর খেলা চলেছে। শুধু পিতা নয়, সকলেই মনে হয় আমাদের অপেক্ষায় জেগে বসে আছেন। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিলেন কাকিমা। মাথায় ঘোমটা ছিল না। সন্ধের দিকে তেল দিয়ে চুল বেঁধেছেন। আলো পড়ে খোঁপা চকচক করছে। কপালে সিঁদুরের টিপের অরুণোদয়। কাকাবাবুকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টানলেন। একপাশে সরে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, এত দেরি হল?

আমার প্রথম প্রশ্নই হল, কাকাবাবু আসেননি?

কাকিমা বললেন, দাঁড়াও, কোথাও গেলে, অত সহজে কি আসবেন? সব শেষ করে, অরুচি ধরিয়ে আসবেন।

সিঁড়ির মাথা থেকে পিতার গলা ভেসে এল, কী? ফিরেছ?

আমরা তিনজনে একসঙ্গে উত্তর দিলুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

অক্ষয় কাকাবাবু ওপরে উঠতে লাগলেন।

কাকিমা আমার হাত টেনে ধরে বললেন, তোমরা চলে যাবার পর খুব বিপদ হয়েছে।

বুকটা ধক করে উঠল, কী বিপদ?

মুকু পড়ে গেছে।

কোথায়?

নীচের সিঁড়িতে। কপাল থেঁতো হয়ে গেছে।

সেকী?

কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। যেন চাঁদের কপালে সূর্য উঠেছে।

ওপরে উঠে বোঝা গেল পিতৃদেব এতক্ষণ অশান্ত পায়ে পায়চারি করছিলেন। কেমন যেন উদভ্রান্তের মতো চেহারা। সারাঘরে একটা আয়োডিন-আয়োডিন, বেনজিন-বেনজিন গন্ধ বেরোচ্ছে। মুকু আমাদের বিছানাতেই চিত হয়ে শুয়ে আছে। কপালে একটা ব্যান্ডেজ।

পিতা ফিসফিস করে অক্ষয় কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী? দেখলে?

অক্ষয় কাকাবাবু চাপা গলায় বললেন, না।

থ্যাঙ্ক গড।

কী হল কী? এ তো দেখছি বিপদের ওপর বিপদ।

আর বোলো না। খুব বাঁচা বেঁচে গেছে। একে মেয়েছেলে। কপালটা না দাগরাজি হয়ে যায়। বিয়ে দিতে হবে তো!

অনেকটা গেছে!

ভাগ্য ভাল। স্টিচ পড়েনি। ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, তেমন কোনও ভয় নেই।

হরিদা, আমি তা হলে চলি।

পাগল নাকি! এই রাতে তুমি যাবে কোথায়। তুমি আজ এইখানে থাকবে। কাল সকালে আমার সঙ্গে অফিস যাবে।

আমি থেকে যেতে পারি, কিন্তু আপনাদের যদি কোনও অসুবিধে হয়।

আমাদের অসুবিধে। তুমি হাসালে অক্ষয়।

কাকিমা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, আমি আপনার জন্যে খাবার তৈরি করেছি।

পিতা বললেন, তুমি এত বড় একটা খবর আনলে, এইসব ছোটখাটো দুর্ঘটনা না থাকলে, আজ তো আনন্দের দিন।

কী যে আনন্দের দিন সে তো আমি জানি। যে-দুঃসংবাদ আমি চেপে রেখেছি, তা যদি কোনওরকমে একবার প্রকাশ পায়, এই বাড়ি কেঁপে যাবে। কী যে হবে আমার জানা নেই।

কাকিমা বললেন, আপনারা তৈরি হয়ে নিন, খাবার জোগাড় করি। এরপর খেলে শরীর খারাপ হবে।

পিতা বললেন, আমার জন্যে খুব সামান্য। অনেক বেলায় খেয়েছি। এবেলা না খেলেই ভাল হয়।

কাকিমা বললেন, মশারিটা ফেলে দিই। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে। ওকে আর না জাগানোই ভাল। এখানেই ঘুমোক। আপনাদের আমি আলাদা বিছানা করে দিই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল। বিনয়দাকে আজ আর নতুন কোনও চিন্তায় না ফেলাই ভাল। সন্ধের থেকে ভদ্রলোক আরামে ঘুমোচ্ছেন। ঘুমই ওনার ওষুধ।

কাকিমা আমার পিঠে টোকা মেরে আড়ালে ডাকলেন।

তোমার কী হয়েছে গো!

কই কিছুই তো হয়নি।

তা হলে তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

এতটা পথ হেঁটে এলুম না। বাসট্রাম সব বন্ধ হয়ে গেছে না!

তুমি হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নাও।

এই তো নিচ্ছি।

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, আমি চান করব।

এত রাতে তুমি চান করবে অক্ষয়!

আপনি তো জানেন, সারাদিন আমি বারেবারে চান করি। আমার গরম একটু বেশি।

যাও, তা হলে ঝট করে সেরে নাও।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারাবাড়ি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠল। গভীর রাতে এমন ভোজনের আয়োজন একমাত্র এই ভুতুড়ে বাড়িতেই সম্ভব। এ বাড়ির প্রতিটি ইট ইতিহাসের সাক্ষী। কত ঘটনাই দেখেছে। আরও কত ঘটনা দেখবে।

রান্নাঘরে মধুর এক নাটক চলেছে। কাকিমার বাধা শোনেননি পিতা। বসে গেছেন লুচি বেলতে। এক হাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, দু'হাত চাই। এসব কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। রাতের আকাশ দেখে মনে হচ্ছে, একটু পরেই পাখি ডেকে উঠবে।

হলঘরে পরপর তিনটে বিছানা পড়েছে। অক্ষয় কাকাবাবু চিত হয়ে বুকের ওপর হাত জড়ো করে শুয়েছেন। পিতাপুত্রে জেগে শুয়ে আছি। সহজে কি ঘুম আসে!

পিতা বললেন, একেই বলে সাধকের ঘুম। শুল আর ঘুমোল। তোমার কাকিমার আজ খুব ধকল গেল। ও ঘরে মুকুর মাথার কাছে হয়তো ঠায় জেগে বসে আছে। বিছানা বেশ বড় আছে, দু'জনের বিছানা। তুমি গিয়ে বলে এসো, পাশে শুয়ে পড়তে। না বললে হয়তো ওই মাটিতেই পড়ে থাকবে। শেষরাতে মশা বাড়ে। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। মায়ের জাত, ওদের কথাও একটু ভাববে। স্বার্থপর হলে চলে না।

মুকুর মাথার কাছে একটা চেয়ারে কাকিমা বসে আছেন। মাথাটা পাশে হেলে পড়েছে। হাতদুটো দু'পাশে এলিয়ে আছে। সারাঘরে বিনবিন করছে মশা। এত ক্লান্তি, মশকদংশনেও সাড় নেই। এত অসহায়! প্রাণটা কেমন যেন করে ওঠে। এ দেশের মহিলাদের জীবনের যেন কোনও ছিরিছাঁদ নেই। ভাগ্যনির্ভর। হাসালে হাসি, কাঁদালে কান্না।

কাকিমার গায়ে হাত রাখতেই চমকে উঠলেন। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলেন। চোখেমুখে ঘুম জড়িয়ে আছে।

তুমি ঘুমোওনি পিন্টু?

আর ঘুমিয়ে কী হবে? একটু পরেই ভোর। বাবা আপনাকে মুকুর পাশে শুতে বললেন।

ইস ছি ছি, উনি আমাকে এই অবস্থায় দেখে গেলেন!

উনি এ ঘরে আসেননি। আমাকে পাঠালেন। নিন শুয়ে পড়ুন। মশা ছেঁকে ধরেছে।

ছি ছি, গুরুজনদের বিছানায় শোয়া যায়!

খুব যায়। গুরুজন অনুমতি দিলে সব করা যায়।

আমি বেশ আছি গো। এসব আমার অভ্যাস আছে। কত রাতে তোমার কাকা ঘাড় ধরে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে, দরজা দিয়ে দিয়েছে। দরজায় পিঠ রেখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরবেলা দরজা খুলতেই উলটে পড়ে গেছি। কত দুঃখের রাত পার করেছি পিন্টু, এ তো সুখের রাত|

মুকু কেমন একটা শব্দ করল। কাকিমা মশারিতে মাথা ঠেকিয়ে দেখলেন। মুকু আর কোনও শব্দ করল না। স্থির হয়ে গেল।

আচ্ছা কাকিমা, কাকাবাবু যদি হঠাৎ আপনাকে ছেড়ে চলে যান, আপনার খুব দুঃখ হবে?

ছেড়ে যাবে কেন? বিয়ে করা বউকে কেউ ছাড়তে পারে। পুরুষমানুষ একটু এদিক-সেদিক করে, কিন্তু শেষে সেই বউ। বউ ছাড়া সেবা পাবে কোথায়? ভালবাসবে কে? ও চলে গেলে আমাকে তো গলায় দড়ি দিতে হবে। কোথায় গিয়ে দাঁড়াব আমি, কে দেখবে আমাকে। তোমার কাকার সব ভাল, কেবল একটু গোঁয়ার। পেটে দু'কলম থাকলে অমন স্বভাব হত কি। হত না। তা আমারই বা কী ছিল, যে শিক্ষিত ছেলে বিয়ে করবে। ও নিয়ে দুঃখু করলে চলে। ভাগ্যকে মেনে নিতে হয়।

নিন, আপনি শুয়ে পড়ুন। সারাদিন অনেক খেটেছেন। আপনাকে শোয়াতে না পারলে, বাবা আমাকে বকবেন।

আমার কেমন লাগছে পিন্টু!

ওসব লাগালাগি পরে হবে। আগে উঠুন তো।

হাত ধরে টেনে তুলে দিলুম। কাকিমা উঠে দাঁড়ালেন। শুধু শরীর নয়, বেশবাসেও ঘুম লেগেছে। কাকিমা বললেন, তোকে আমার এত ভাল লাগে কেন বল তো। আর জন্মে তুই আমার কেউ ছিলিস, এ জন্মে আবার ফিরে পেয়েছি।

হাত দিয়ে আমার মাথার চুল সরিয়ে দিলেন। মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, বউ হলে পর করে দিবি না তো!

আমি বিয়েই করব না।

যে-ফাঁদে পড়েছিস, বিয়ে না করে পারবি। মেয়েটা ভারী সুন্দর রে, তেমনি স্বভাব। হবে না, কত বড় ঘরের মেয়ে। বটঠাকুরকে বলব, সামনের মাঘেই লাগিয়ে দিন।

নিন তো, মশারিতে ঢুকুন।

আমার সোনা ছেলে।

কাকিমা গাল ধরে নেড়ে দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে মশারিতে ঢুকে গেলেন।

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।

কয়েকদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছে, আমি খুনি। লাশ চাপা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যে-কোনও মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারি। কাকিমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। কাজটা খুব সহজ নয়। কাকিমা আর দূরের মানুষ নন। আমাদের পরিবারেরই একজন। প্রফুল্লকাকার অবর্তমানে এই কাছাকাছি সরে আসা সহজ হয়েছে। পিতাও আর আগের মতো দেখলেই লাফিয়ে ওঠেন না। তফাত যাও ভাবটা সংযত করেছেন। কাকিমা এতদিনে বেশ উতলা হয়ে পড়েছেন। ঘুরতে ফিরতে প্রায়ই জিজ্ঞেস করছেন, কী হল বলো তো। কোনওবার এতদিন তো বাইরে থাকে না। আমার রাতে ভাল করে ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখি, আর জেগে জেগে উঠি। তুমি একটু খোঁজখবর করো না, পিন্টু। কাকিমাকে এখন আর আমি আপনি বলি না। তুমির সম্পর্কে নেমে এসেছি। কোথায় খোঁজখবর করব, তুমিই বলে দাও। কোথায় গেছেন তুমিই তো জানো না।

ওর যাবার একটা জায়গা আছে। ওই যে সব গাইয়ে মেয়েছেলে আছে না?

গাইয়ে মেয়েছেলে অনেক আছে, নাম ঠিকানা না বললে হয়?

তারা সব কলকাতার একটা জায়গায় থাকে। রাতের বেলা সেজেগুজে সব বাবুদের গান শোনায়।

তাও জানি। তুমি নাম বলতে পারবে?

না।

তা হলে হয়ে গেল। ওসব জায়গায় ঘরে ঘরে ঘোরার ক্ষমতা কারুর নেই।

কাকিমা উদাস হয়ে কখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে, কখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর আমার ভেতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। মনে হয় আমিই যেন জলজ্যান্ত একটা মানুষকে খুন করে চোরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সুবিধে একটাই, খুব সকালে অফিস, একবার বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়তে পারলে, আমায় আর পায় কে। মেসোমশাই মোটামুটি সুস্থ। তবে কনক যদি না ফেরে, ভদ্রলোকের হাসিখুশির দিন আর ফিরবে না। মুকুর কপালের ব্যান্ডেজ খোলা হয়েছে। সামান্য একটু সাদা দাগ আছে, পরে মিলিয়ে যাবে। মেসোমশাই ঠিক করেই ফেলেছেন, সামনের শনিবার, সকালের প্লেনে চলে যাবেন। আর এখানে পড়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

মানুষের জীবন নদীর মতো হঠাৎ হঠাৎ কীরকম বাঁক নিয়ে ঘুরে যায়। মুকু যেন হঠাৎ কীরকম বদলে গেছে। সেই গুমোরে ভাব আর নেই। সুযোগ পেলেই কথা বলে। সময় সময় জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়। এক

গেলাস জল। রুমাল। চিরুনি। মাঝে মাঝে নীচে নেমে গিয়ে কাকিমার সঙ্গে গল্প করে আসে। এই পরিবর্তনটা যদি আগেই আসত। মুকু একটু রোগা হয়ে গেছে। চেহারায় কনকের আদল আসছে।

সেদিন সকালে অফিস বেরোবার আগে মুকু বললে, আর তো আমরা মাত্র দু'দিন আছি, তুমি আমাকে দক্ষিণেশ্বরটা একবার দেখিয়ে আনবে? আর কি আসা হবে। হয়তো হবে না। দিদি যেখান থেকে চিরকালের মতো চলে গেল, সেই জায়গাটা শেষবারের মতো একবার দেখে যাই।

আমি নিয়ে যেতে পারি, তোমার বাবা যাবার অনুমতি দেবেন না।

অনুমতি আমি চেয়ে নেব।

মনে হয় পাবে না। যে-জায়গা থেকে একটি মেয়ে চলে গেছে, সেখানে আর একটি মেয়েকে যেতে দেন কখনও!

সে আমি বলে দেখব। কাকিমাকে দিয়ে বলাব। ওঁর কথা বাবা নিশ্চয়ই শুনবেন।

ওঁর কথা শুনবেন কেন?

কী জানি কেন?

তার মানে?

আমার মনে হয় কাকিমার কথা ঠেলতে পারবেন না। অসুখের সময় সেবা করতেন, শাসনও করতেন। সেই থেকে কাকিমার সঙ্গে ওঁর অনেক সুখদুঃখের কথা হয়।

তা হলে তো ভালই, তুমি কাকিমাকে দিয়ে বলাও। বলবে, কাকিমাও আমাদের সঙ্গে যাবেন।

অফিসটা আমার বেশ জমে উঠেছে। পরিবেশটা এখন অফিস বলে মনেই হয় না। তেমন কোনও শাসন নেই। কেবল চিফ কেমিস্ট ভদ্রলোক মাঝেমধ্যে একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সে ওই পেটের জন্যে। মুড়ির সঙ্গে ভুঁড়ির ভীষণ যোগ। দু'ফোঁটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড জলে গুলে সুধীর যেই খাইয়ে দেয়, অমনি মেজাজ শান্ত। তখন মুখে হাসি ফোটে। রবিবাবুর শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই অ্যানালিসিসের হাত বেশ পেকে উঠেছে। ফোড়ার মতো আরও কত কী যে পাকে। চুল পাকে, ছেলে পাকে, সম্পর্ক পাকে। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে সম্পর্কও বেশ পেকেছে। অনেকটা ছেলের মতো হয়ে গেছি। আসলে চাওয়া আর পাওয়ার তুচ্ছ জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ঠ হতে পারে। একেবারে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে চাকরিতে না এলে যেটা সম্ভব। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানেই দাস হয়ে ঘুরে বেড়ানো।

আজ আকাশ একটু মেঘলা মেঘলা। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে গাছপালা পাগলের মতো দুলে দুলে উঠছে। বিকেলের দিকে জোর নামবে মনে হয়। আজ ক্যালকাটা ভেসে যাবে। ময়দানে দুই বড় দলের খেলা আছে। বিকেলে আজ জমবে ভাল।

লেবরেটরিতে ঢুকতেই সুধীরবাবু বললেন, শিগগির যান, এম ডি খুঁজছেন। লেবরেটরিতে যখন কেউ থাকেন না, তখন বেশ দেখায়। রহস্য, রোমাঞ্চ, কল্পনা সব মিলেমিশে জগতের ভেতর একটা জগৎ তৈরি হয়ে যায়। মানুষ যেমন তিনটে। একই মানুষ নানা স্তরে বিভক্ত। এক হল তার হাড়ের খাঁচা, কঙ্কাল। মৃত একটা স্তর। তার ওপর, মেদ মাংসের একটি অবয়ব। ধুঁধুলের খোসার মতো শিরা উপশিরার জালি। বুকের

খাঁচায় দুটো যন্ত্র, হরতনের মতো হৃদয়, বেলুনের মতো ফুসফুস। গর্ভে লিভার, পিলে, অন্ত্র, বৃহদন্ত্র, প্রভৃতি পোঁটলাপুঁটলি। দু'পায়ের ফাঁকে মানুষের কদিচ্ছার কোষ। যার সামনে দাঁড়িয়ে আলিবাবা অষ্টপ্রহর হেঁকে চলেছে, চিচিং ফাঁক, ঝিঙে ফাঁক, ঢ্যাঁড়স ফাঁক, উচ্ছে ফাঁক। এই সজীব কম্পন ঘিরে তৈরি হয়ে আছে একটি চেতন আধার, অবয়বহীন একটা ব্যাপার, যেখানে প্রেম আছে, অনুভূতি আছে, কল্পনা আছে, হিংসা আছে। মাতামহ সেই গাইছিলেন একদিন নেচে নেচে,

এই মানুষে সেই মানুষ আছে
কত মুনি ঋষি চারযুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদায় আলোকে বসে॥

এম ডি ঘরে পায়চারি করছেন। টেবিলের ওপর একটা নকশা খোলা, পেপার ওয়েট চাপা। দূরে আর একটা টেবিলে রয়েছে একটি মডেল। মনে হয় কোনও কারখানার। আমি যখন ঘরে ঢুকলুম, এম ডি তখন আমার দিকে পেছন ফিরে, জানলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। জানলার বাইরে একটা কদমফুলের গাছ। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সাদা সাদা ফুল এসেছে। দুটো হাত পেছন দিকে। মুখ সামনের দিকে তোলা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, মেঘলা আকাশের চাপা আলো পড়ে চিকচিক করছে। একমাথা সাদা চুলে তাঁর বৈজ্ঞানিক চেহারাকে বড় স্পষ্ট করে তুলেছে। মাঝে মাঝে এই মানুষটিকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। সব থেকেও যেন কিছু নেই। সবেতে থেকেও যেন সবকিছু থেকে অনুপস্থিত।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াতেই আমাকে দেখতে পেলেন। এমন একটি হাসি খেলে গেল মুখে, যে-হাসির সঙ্গে একঝাঁক উড়ন্ত শঙ্খচিলের তুলনা চলে।

খুব কাজের লোক হয়েছ, না?

না, তা নয়।

তা নয় মানে? তিন দিন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করোনি।

ওই তিন দিনই অফিসে আসতে আমার একটু দেরি হয়েছিল। সোজা ল্যাবরেটরিতে উঠে গিয়েছিলুম।

এদিকে এসো, এই জানলার কাছে সরে এসো। প্রকৃতির খেলা দেখে যাও।

বিশাল জানলা পা থেকে মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে। কদমগাছের সবুজ পাতা সবুজ আলো ছড়াচ্ছে। এম ডি গাছটা দেখিয়ে বললেন, দেখেছ, সবুজের কী খেলা চলেছে। গাছের ধর্ম দেখো। আমাদের মতোই বয়েস বাড়ে; কিন্তু বৃদ্ধ হতে জানে না। প্রতি বছরই পাতা ঝরিয়ে, আবার নতুন পাতায় সেজে ওঠে। আমরা কেন পারি না পলাশ!

কী জানি? আমরা কেবল বুড়ো হতেই শিখেছি।

দেখেছ, প্রকৃতিতে বার্ধক্য নেই।

সেভাবে দেখলে, মানুষেরও বার্ধক্য নেই, মৃত্যু নেই। ওপর থেকে চলে যাচ্ছে, তলা থেকে ভরে উঠছে।

তা উঠছে। তবে একই মানুষ গাছের মতো বছরে বছরে নবীন হতে শেখেনি।

মানুষের তেমনই অভিজ্ঞতা বাড়ে, জ্ঞান বাড়ে। গাছের মতোই প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন পাতা গজায়।

জ্ঞানপত্র! বলেছ ঠিক, তবে সব মানুষের নয়। এই গাছটাকে আমি কত বছর ধরে দেখছি। এই কারখানার ফিউম্‌সে এতদিনে মরে যাওয়া উচিত ছিল। অসীম জীবনীশক্তি। প্রতি বছরই সবুজ পাতায় সেজে, ফুল ফুটিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গ করে, বৃদ্ধ, তুমি আরও বৃদ্ধ হও, আমি সবুজে সবুজ হয়ে তোমার মৃত্যুর পাশে দাঁড়িয়ে জীবনের কথা বলি।

মৃত্যু বলে কিছু আছে কি?

এম ডি গাছের দিক থেকে ঘুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

এ তোমার বইয়ের কথা, না বিশ্বাসের কথা?

বিশ্বাস বলতে পারেন, যে-বিশ্বাসের জন্ম অভিজ্ঞতা থেকে।

অভিজ্ঞতা থেকে?

এম ডি চেয়ারে বসলেন। সোনার চশমা খুলে রাখলেন নকশার ওপর। মুখে একটা রক্তাভ দ্যুতি খেলছে। হঠাৎ মনে পড়ল, মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। ইশারায় বললেন, বোসো।

অভিজ্ঞতা মানে? মৃত্যু নেই এমন অভিজ্ঞতা কী করে হতে পারে? না না, তুমি ঠিক বলছ না। এমন একটা বিশ্বাস কষ্টেসৃষ্টে গড়ে তোলা যায়। অভিজ্ঞতায় আসে কী করে?

অভিজ্ঞতা একটা নিজস্ব ব্যাপার। আপনার জানলার কাছে এই গাছটা আছে, আমাদের জানলার কাছে নেই। টেবিলের তলায় আপনার পায়ের কাছে একটা পাদানি রয়েছে, সকলের পায়ের কাছে নেই।

এর সঙ্গে মৃত্যু নেই, এই অভিজ্ঞতার কী সম্পর্ক?

আছে। আমি যদি বলি, আমাকে ছেড়ে যাঁরা চলে গেছেন, তারা প্রতি মুহূর্তেই আমার সঙ্গে আছেন, জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওই কদমগাছের মতো। আপনি বিশ্বাস করবেন না, কারণ আপনাকে দেখানো যাবে না। জাগতিক স্তর থেকে তাঁরা অনুভূতির স্তরে উঠে গেছেন। এ এমন একটা ব্যাপার, যা লেবরেটরিতে ডেমনস্ট্রেট করা যায় না। ঈশ্বরকে যেমন দেখানো যায় না। কোনওদিন বিজ্ঞান হয়তো পারবে।

কী জানি তুমি কী বলতে চাইছ!

তা হলে, আর একভাবে বলি। এই মুহুর্তে এই ঘরে বহু শব্দতরঙ্গ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান, বাজনা, বক্তৃতা। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন দেশ থেকে ভেসে আসছে। লন্ডন থেকে, রাশিয়া থেকে, চিন থেকে। কোনওটাই আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে একটা ভাল রেডিয়ো দিন। আমি সবকটা ধরে ধরে শুনিয়ে দোব। শব্দের মতো মানুষও এক তরঙ্গ থেকে আর এক তরঙ্গে চলে যেতে পারে। টেলিভিশন বিভিন্ন তরঙ্গের আলো ধরে এ তথ্য প্রমাণ করেছে।

তোমার অভিজ্ঞতা কী করে আমার অভিজ্ঞতা হতে পারে?

বিশ্বাস। বিশ্বাসে অনুভূতি তৈরি হয়, অনুভূতিতে অভিজ্ঞতা আসে। কেউ যদি বলেন, এই ঘরে এখন বেগম আখতার গান গাইছেন, তাতে আমার অনুভূতি তৈরি হবে বিশ্বাসে। হ্যাঁ হয়তো গাইছেন। অনুভূতি

তেমন প্রখর হলে শুনতেও পাব। তারপর কেউ হয়তো রেডিয়ো খুলে অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রমাণ মিলিয়ে দেবেন।

নাঃ ব্যাপারটা বড় জটিল হে। আমার জমি এখনও তৈরি হয়নি। এই নিয়ে তোমার সঙ্গে একদিন বসব। এপার তো দেখা হল, ওপারটা একবার দেখতে ইচ্ছে করে। অবশ্য এপার থেকে। ওপারে গেলে তো এপারে ফিরতে পারব না। মাথায় একটা লাইন এসে গেল:

যখন নিঃশব্দে শব্দেরে খাবে
তখন ভবের খেলা ভেঙে যাবে□—

কার লেখা?

ঠিক মনে পড়ছে না।

লালন কয়, দেখবি ফিরে কী গতি। লালন ফকিরের লেখা। তুমি এসব পড়ো? না হরিশঙ্কর কেবল অঙ্ক কষায়?

আজ্ঞে ওইটাই আমি ভাল পারি না বলে, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল। তা না হলে এতদিনে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে, কোথায় কোন দেশে চলে যেতুম!

তোমার কি মনে হয় জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে?

বাবার তাই ধারণা।

হরির কথা ছেড়ে দাও। ও একটা র‍্যাংলার। একটা পরীক্ষায় ও অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো এক পেয়েছিল।

সে কি সম্ভব?

সম্ভব হয়েছিল। একটা অঙ্ক ভুল ছিল। অঙ্কটাই ভুল। ও সেটা পয়েন্ট আউট করে, অঙ্কটা কী হওয়া উচিত, শুদ্ধ করে, একটা নোট সমেত খাতা জমা দিয়েছিল। হইহই ব্যাপার। পরীক্ষক যে-বই থেকে অঙ্কটা নিয়েছিলেন, সে বই বাতিল হয়ে গেল। হরিশঙ্করের মাথার দাম অন্য দেশ হলে কত হাজার টাকা হত জানো? এ দেশে মুড়ি মিছরির এক দর।

আমার মাথাটা ভগবান কেন যে এমন করে দিলেন। দুই আর দুইয়ে চার ছাড়া কিছুই সহ্য করতে পারে না।

তোমার মাথায় কেমিস্ট্রিটা ভালই খেলে। রবিবাবু বলছিলেন, এই অল্পদিনেই হাত বেশ পেকেছে।

আজ্ঞে, ওতে তো মাথা নেই।

মাথা ছাড়া হাত হয়। সবই মাথার খেলা। আচ্ছা শোনো, আমার একটা পরিকল্পনার কথা তোমাকে বলি। এই হল সেই পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট। এপাশে সরে এসো, আমার চেয়ারের পাশে। দেরাদুনে আমরা আর একটা কারখানা করছি। সেখানে তৈরি হবে শুধু ওষুধ। পাশেই হিমালয়, গাছগাছড়ার অভাব হবে না। ক্লাইমেটও খুব সুন্দর। কী, কেমন হবে?

আজ্ঞে, সাংঘাতিক হবে।

এই দেখো মুসৌরি-চক্রাতা রোড। এর পাশে দু'একর জমি। চমৎকার স্পট। ডান পাশে ঘাড় ঘোরালেই মুসৌরি হিলস। ওই হল কারখানার মডেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়েছে।

বুঝলে, একেবারে আধুনিক ডিজাইনের ব্যাপার। বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি এসে, ডকে পড়ে আছে। আমার একটা ভীষণ ইচ্ছে। বলব?

হ্যাঁ, বলুন।

তোমাকে আমি দেরাদুন পাঠাব। কেমন হবে?

আজ্ঞে ভীষণ হবে।

আমি বেছে বেছে এখানকার কয়েকজনকে ওখানে পাঠাব। তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান, তুমি। নাম্বার টু, রবিবাবু। নাম্বার থ্রি, জীমূতবাবু। কেমন হবে টিমটা!

খুব ভাল।

আমিও থাকব তোমাদের সঙ্গে। তবে আমাকে তো দুটো দিকই দেখতে হবে। আমি আসা যাওয়া করব। হ্যাঁ, এই কয়েকদিন আগে হরিশঙ্করকে ফোন করেছিলুম, মাই গুড ওলড ফ্রেন্ড। ওর খুব ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি তোমাকে সংসারী করার। পারলে এই ফাল্গুনে। ফাল্গুন ওর প্রিয় মাস। শিল্পী মানুষ তো! বসন্তের দূত। নিজেও বিয়ে করেছিল ফাল্গুনে। সেই স্মৃতিটাকেই আবার জাগিয়ে তুলতে চায়। জানো তো, নিজের জীবনের অপূর্ণ আশা আকাঙ্ক্ষা মানুষ সন্তানের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তুমি ওকে দুঃখ দিয়ো না। অমন নীতিবাদী আদর্শপরায়ণ মানুষ, তুমি আর দুটি পাবে না। একেবারে পারফেক্ট ম্যান। অমন কামনাশুন্য নির্লোভ মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। পঙ্কজকেও আমি চিনি। কলেজে আমরা সব সহপাঠী ছিলুম। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।

টেলিফোনটা দু'বার কিড়কিড় করে থেমে গেল। হাত বাড়াতে গিয়ে এম ডি হাত টেনে নিলেন। হাসিহাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। পঙ্কজ একটা জেনুইন বনেদি ঘরের ছেলে। ওরা তিনপুরুষে ডাক্তার। পঙ্কজের বাবা ছিলেন নামকরা সার্জেন।

এইবার কড়কড় করে ফোন বেজে উঠল। এম ডি রিসিভার তুললেন।

ও প্রান্তে কে আছেন বোঝা গেল না, তবে এইটুকু বোঝা গেল, তার-পথে উত্তেজক কিছু খবর আসছে। এম ডি বলছেন, না, চোরকে আমি কোনওমতে প্রশ্রয় দিতে পারব না। সে যত বড়লোকই হোক। থানাপুলিশের দরকার নেই। দেনাপাওনা মিটিয়ে বিদায় করে দাও। অমন পণ্ডিতে আমার কাজ নেই। তস্কর পণ্ডিতের চেয়ে মূর্খ সাধু ঢের ভাল। না না, নো মার্সি। নো মার্সি। নো মার্সি। বলো রেজিগনেশন সাবমিট করতে। তা না হলে আমরা পুলিসে কেস হ্যান্ডওভার করব।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। মুখের লাল আভা সামান্য বেড়েছিল। দেখতে দেখতে স্বাভাবিক হয়ে এল। নকশাটা কোলের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, তোমাকে দেরাদুন পাঠাব ইনচার্জ করে। তোমাকে আমি পারচেজ অফিসার করব। খুবই দায়িত্বপূর্ণ পদ। তোমার বয়েস আর অভিজ্ঞতার তুলনায় বেশি ভারী। কিন্তু আমি

বিশ্বাস করি পেডিগ্রি, বিশ্বাস করি সততায়, সাধনায়, আন্তরিকতায়। তুমি ওই পদের অমর্যাদা করবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু ওই পদে তো কেমিস্ট্রি নেই!

আছে আছে। পারচেজ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আলাদা একটা লেবরেটরি থাকবে। প্রতিটি জিনিস কেনার আগে অ্যানালিসিস করতে হবে। স্পেসিফিকেশন ঠিক থাকলে, তবেই তুমি কিনবে। পঙ্কজের মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে, তোমার পজিশন সেইভাবে বাড়িয়ে দিতে না পারলে, সমানে সমান হবে কী করে? ফাইভ ডেজ এ উইক। উইক-এন্ডে দু'জনে বেড়াতে চলে যাবে মুসৌরি। তোমাদের দু'জনের সুখের জীবন আমার চোখের সামনে ভাসছে। বিদায় নেবার সময় এসে গেছে বাবা। মানুষ কেন আসে জানো? যে আগে আসে, সে বন কেটে বসত বসায়, ফল ফুলের গাছ তৈরি করে। দিঘি কাটায়। রাস্তা তৈরি করে। সে জানে, পেছনে আসছে তার উত্তরপুরুষেরা। পূর্বপুরুষ যদি তার কর্তব্য পালন না করে, উত্তরপুরুষ কেন তাকে মনে রাখবে? তুমি বলছিলে না, মৃত্যু বলে কিছু নেই। সত্যিই নেই। আমি যখন নেই, তুমি তখন আছ। আমার মৃত্যু আছে। মানুষের মৃত্যু নেই। তোমাদের বিবাহে এই আমার যৌতুক। যাও, তোমার অনেকটা সময় আমি নিয়ে নিলুম। বুড়ো হচ্ছি, কথা বলতে বড় ভাল লাগে। একটা কথা, আমার এই পরিকল্পনার কথা তুমি কাউকে বলবে না।

দরজার কাছে চলে এসেছি, এম ডি ডাকলেন, হ্যাঁ শোনো। তুমি প্রবীর বলে কাউকে চেনো? আর্টিস্ট।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার মামার বন্ধু।

ওঁর বোন খুব ভাল গান করেন, ভক্তিমতী মহিলা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁকেও আমি চিনি।

হ্যাঁ, ওঁরা তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। প্রবীরবাবুকে আমি আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে চাকরি দিচ্ছি। আর ওঁর বোন ঊষাকে দিচ্ছি, আমাদের সেই অরফ্যানেজের। কেমন হবে?

উঃ সাংঘাতিক হবে। এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবা যায় না।

তুমি আজ যাবে আমার সঙ্গে, সেই অনাথ আশ্রমে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন যাব না!

তা হলে তোমাকে আমি ঠিক সময়ে ডেকে পাঠাব।

লেবরেটরিতে চা-পর্ব চলেছে। জীমূতবাবু শিকারের গল্প বলছেন। সবাই চোখ বড় বড় করে শুনছেন। জীবনের প্রথম শিকার। চিফ কেমিস্ট দূরের একটা টেবিলে বার্নারে কী একটা চাপিয়েছেন। বিকারে সেই নীলমতো পদার্থটির মেজাজ তেমন শান্ত নয়। কাচের রড দিয়ে চমকে দিলেই ফ্যাঁস ফোঁস করে উঠছে।

জীমূতবাবুর বাবা ছিলেন ফরেস্ট অফিসার। উত্তর ভারতের জঙ্গলে গিয়েছিলেন বাঘ শিকারে। মাচা বেঁধে পিতাপুত্রে বসেছেন। নীচে খোঁটায় বাঁধা কিল মাঝে মাঝে ব্লা ব্ল্যা করে ডাক ছাড়ছে। চাঁদের আলোর রাত। যথাসময়ে বাঘ এলেন।

এই পর্যন্ত বলে জীমূতবাবু গেলাসে বেশ লম্বা একটি চুমুক মারলেন। সবাই একসঙ্গে 'তারপর? তারপর?' করে উঠলেন।

তারপর বাঘ এসে, আমাদের দিকে মুখ করে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল, ছাগলটা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর আমারও আর মনে নেই।

আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, মনে নেই কেন? এমন একটা ঘটনা ভুলে গেলেন?

ভুলে যাব কেন? আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, তখন শেষরাত। চাঁদ ঢলে পড়েছে। পশ্চিমে গাছের আড়ালে। ছাগলটা অজ্ঞান অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

আর বাঘটা?

বাঘ ফিরে গেছে জঙ্গলে। বাঘ এসেছিল ভরাপেটে। ছাগল স্পর্শ করেনি। আর চাঁদের আলোয় বাঘের ওই সৌন্দর্য দেখে, বাবা আর গুলি করতে পারেননি। সামনাসামনি বাঘ দেখলে মনুষ্যজন্মে ঘেন্না ধরে যাবে। এই হল আমার প্রথম ব্যাঘ্র দর্শন।

জীমূতবাবু উঁচু টুল ছেড়ে উঠে পড়লেন। মনে হল, দেরাদুনে আমাদের জমবে ভাল। একটু এগোলেই জিম করবেটের কুমায়ুন। সঙ্গে থাকবেন রবিবাবু।

রবিবাবু ব্যাগ থেকে পাতলা একটা ম্যগাজিন বের করে আনলেন। পাতা উলটে আমার চোখের সামনে ধরে বললেন, তোমার লেখা?

আশ্চর্য! আমারই তো লেখা। অনেক দিন আগে পাঠিয়েছিলুম। একটা ছোট গল্প। আমার কাছে এখনও কপি আসেনি। আমারই নাম, বড় বড় হরফে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি।

আমার পিঠে হাত রেখে, কানের কাছে মুখ এনে রবিবাবু ফিসফিস করে বললেন, বেশ লিখেছ। ছেড়ো না, চালিয়ে যাও। ওপাশে বুম করে একটা শব্দ হল। চিফ কেমিস্ট ভয়ে পিছু হটতে শুরু করেছেন। বিকারের সেই নীল পদার্থ উষ্ণ পীতাভ রং ধারণ করে ফুটতে শুরু করেছে।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে
কাল হল তাঁতির হেলে গোরু কিনে

সন্ধে হয়েছে। মেঘ-থমকানো আকাশ। রাস্তার বাতি কেমন যেন মনমরা হয়ে জ্বলছে। দূর থেকে দেখছি বাড়ির সামনে বিদঘুটে চেহারার একটি লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ইনি আবার কিনি? গায়ে একটা আদ্দির পাঞ্জাবি। ফিনফিন করছে। এমন কাপড়ের পাঞ্জাবি বিশেষ এক শ্রেণির লোকেরাই পরেন। পাঞ্জাবিটার ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে, তা না হলে এত কুঁচকে যেত না। তোবড়ানো গালের দু'পাশে গালপাট্টা নেমেছে। চোখদুটো ভেতরে ঢুকে গেলেও, মণিদুটো সাপের মতো জ্বলছে। পাকানো চেহারার অদ্ভুত একটি লোক, হেলে-পড়া ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে। গা-টা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। কিছু কিছু মানুষের শরীর থেকে অদৃশ্য একটা তরঙ্গ বেরোতে থাকে, অনেকটা মৃত্যুরশ্মির মতো, ক্লোরোফর্মের মতো। শরীর অবশ করে দেয়।

লোকটিকে পাত্তা না দিয়ে সদরে এসে দাঁড়ালুম। কড়া নাড়তে যাচ্ছি, রাস্তার অপর পার থেকে লোকটি মিহি গলায় বললে, শুনছেন?

হাত যেন অবশ হয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ স্যার আপনাকে। এই বাড়িতে থাকেন?

এগিয়ে গিয়ে লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, কেন বলুন তো?

শরীর থেকে বাসি আতরের ঘিনঘিনে গন্ধ বেরোচ্ছে। মুখে অস্পষ্ট পেঁয়াজ আর রসুনের বাস।

প্রফুল্লবাবু এই বাড়িতে থাকেন?

হ্যাঁ থাকেন, এখন নেই।

তাঁর স্ত্রী আছেন?

কেন বলুন তো?

খুকখুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে, সেই সন্দেহজনক লোকটি বললে, আমার একটু দরকার ছিল।

আপনি কে?

আমি একজন লোক।

একজন অপরিচিত মানুষ, হঠাৎ এই ভরসন্ধেবেলা কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারে?

তেমন কোনও খবর থাকলে পারে বই কী স্যার!

আমি তাঁর ভাইপো, আমাকে বলতে পারেন।

তা স্যার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সেসব কথা হতে পারে না। অনেকক্ষণ এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে। দোতলার জানলায় একবার এক ভদ্রমহিলা এলেন, বেশ সুন্দরী, একবার চোখাচোখি হতেই সরে গেলেন। ভাবলেন কোনও খচ্চর লোক দাঁড়িয়ে আছে।

আঃ, কী যা-তা কথা বলছেন?

ভুল হয়ে গেছে স্যার। লাইনের লোক তো। ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন। তা স্যার, একটু বসা দরকার। এক গেলাস জল, এক কাপ চা।

চলুন, আমরা কোনও দোকানে গিয়ে বসি।

কোন দিকে? বলে, যেদিকে দোকান, লোকটি তার উলটো দিকে তড়বড় করে হাঁটতে লাগল। ডেকে বললুম, ও দিকে নয়, এই দিকে।

সন্ধে বলে এখনও পর্যন্ত বাড়ির কারুর নজরে পড়িনি। মেয়েরা মনে হয় গা ধুচ্ছে, নয়তো সন্ধে দেখাচ্ছে।

বিষ্টুদার চায়ের দোকানে এই সময়টায় তেমন খদ্দের থাকে না। দোকান জমবে রাত আটটার পর। দশটা বাজবে এগারোটা বাজবে, গুলতানি চলতেই থাকবে। শখের অভিনেতা বিশুদা এসে বসবেন এই এতখানি রাজপুত্রের মতো চেহারা নিয়ে। বড় মজার মানুষ।

লোকটি দোকানের বেঞ্চিতে বসেই অর্ডার দিলে, এক গেলাস জল দাও ভাই। জল শেষ করেই বললে, বাঃ, ভাল কেক রয়েছে। দেখি ভাই একটা কেকের মাথা দাও, একটা ডবল হাফ চা।

হঠাৎ আমার কথা মনে পড়ল বোধহয়, আপনি কিছু খাবেন না স্যার?

চা খাব। বিষ্টুদা, আমাকে শুধু চা।

বিষ্টুদা প্রথম থেকেই ভুরু কুঁচকে লোকটিকে দেখছে। কিছুতেই আমার সঙ্গে মেলাতে পারছে না। দোকানের একেবারে পেছন দিকে মুখোমুখি বসেছি। কী গেরো! লোকটির গায়ের গন্ধ অসহ্য লাগছে। এক মশারিতে এর সঙ্গে শোবে কে? কাকিমা সেদিন হঠাৎ একটা অসভ্য কথা বলে ফেলেছিলেন, সব হাঁড়িরই সরা জোটে পিন্টু? মহিলাদের মাঝে মাঝে মুখ বড় আলগা হয়ে যায়। আর এটা সাধারণত হয় হুহু দুপুরে। লাল মেঝেতে গা এলিয়ে দিয়ে, পান চিবোতে চিবোতে। মেঝে থেকে উঠে যাবার পর, পড়ে থাকে খোঁপার তেলের দাগ, শরীরের ঘামের ছাপ। সারাপৃথিবী জুড়ে মানুষের মন খারাপের কত আয়োজন। মন আকর্ষণের কতরকম ফাঁদ।

কেকের মুন্ডু থেকে একটা টুকরো ভেঙে নিয়ে মুখে পুরে ওস্তাদ বললে, কতদিন হল?

কী কতদিন হল?

প্রফুল্লবাবু কতদিন হল ফেরেননি?

বেশ কিছুদিন হল। দিন পনেরো-কুড়ি তো হবেই।

এতদিন একটা লোক বাইরে, আপনারা কোনও খোঁজপাত করলেন না!

উনি মাঝে মাঝেই তো এইরকম বাইরে চলে যান, বেশ কিছুদিন পরে আবার ফিরে আসেন।

অ।

ওস্তাদ এবার আধখানা কেক মুখে পুরে চিবোতে লাগল। আয়েশে চোখ বুজে এসেছে। বিষ্টুদা দু'কাপ চা দিয়ে গেলেন। দেবার সময় লোকটির দিকে সেই সন্দেহের দৃষ্টি। কাছ থেকে বেশ ভাল করে মুখটা একবার দেখে নিলেন। দেখার মতোই জিনিস, এ পাড়ায় এই প্রথম আবির্ভাব। অনেকটা লটরপটর খাঁয়ের মতো দেখতে। খয়ের খাঁ-ও হতে পারে।

চায়ের কাপে ফড়ড় করে একটা চুমুক মেরে ওস্তাদ বললে, এবারে কি আর ফিরবেন?

কেন?

ওস্তাদ আর এক চুমুক চা সেরে বললেন, এসব কথা ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে হলেই ভাল হত।

আপনি কে বলুন তো?

লোকটি ভালমানুষের মতো মুখ করে বললে, মনে করুন, আমি স্যার একজন দালাল।

দালাল? কীসের? জমিজায়গার, ওষুধের?

না-আ স্যার। ওসব বড় ব্যাপার। মেয়েমানুষের দালাল। যাত্রা, থিয়েটারে, বিয়েবাড়ির নাচেটাচে অ্যাকট্রেস সাপ্লাই করি স্যার!

নিজেকে শামুকের মতো খোলে ঢুকিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। মেয়েমানুষ শব্দটাই কেমন যেন, তার আবার দালাল। তার পাশে বসে চা খেতে হচ্ছে। কী বলবে, তারই অপেক্ষায় ধৈর্য ধরে থাকা।

বিষ্টুদাকে তাক করে বললে, চা-টা বেশ ভালই বানিয়েছ ওস্তাদ।

বিষ্টুদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। চায়ের কারবার করলেও খুব ভদ্র মানুষ। যথেষ্ট লেখাপড়া করেন। থিয়েটারের ভীষণ ভক্ত। শরৎচন্দ্র সবচেয়ে প্রিয় লেখক। দোকানের দেয়ালে সার সার ছবি ঝুলছে, শরৎচন্দ্র, দুর্গাদাস, শিশির ভাদুড়ী, প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস। একটা উটকো লোকের এই ধরনের আলটপকা কথা গায়ে ছুঁচের মতো বিঁধছে।

লোকটি আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ওস্তাদ আর নেই স্যার।

ওস্তাদ কে?

প্রফুল্লবাবুকে আমরা সবাই ওস্তাদ বলি স্যার! অমন হাত কোথায় পাবেন? তবলায় যেন খই ফুটিয়ে ছেড়ে দিতেন।

কী বলতে চান, একেবারে পরিষ্কার করে বলুন না।

আমি তো তাই বলতেই চাই। তবে দু'বার করে না বলে, একবারে বলতে পারলেই ভাল হয়। চলুন না, ওস্তাদের স্ত্রীর কাছে একবার যাই।

সে উপায় নেই, যা বলার আমাকেই বলুন।

হ্যাঁ, তা হলে বলেই ফেলি। একটা জায়গা থেকে আমরা বাসে করে ফিরছিলুম, আমাদের দলবল নিয়ে। দলে ছিল লক্ষ্মীবাই, উমাবাই, আমি, হীরাচাঁদ, আরও অনেকে। হীরাচাঁদের সঙ্গে ওস্তাদের একটা খটাখটি চলছিল। দুটো ওস্তাদের মধ্যে একটা মেয়েছেলে পড়লে যা হয়। আপনি স্যার ছেলেমানুষ, এসব যত কম শোনেন ততই ভাল। লক্ষ্মীবাই দু'জনকেই পুষছিল। দুটোরই যেন এঁড়ে লেগে গিয়েছিল। সেসব অনেক

ব্যাপার। আপনি স্যার নাবালক, ওসব না জানাই ভাল। চন্দ্রকোনার কাছে বাস যখন এল তখন মাঝরাত। হীরাচাঁদ বললে গাড়ি থামাও। উমাবাই তামাক খাবে। রাস্তার পাশে বাস দাঁড়াল। তামাকচি তামাক সাজতে বসল। ওস্তাদজি আর ফট্‌কে গেল জল ফেরাতে। গেল তো গেলই, তাদের আর আসার নাম নেই। বাস দাঁড়িয়ে রইল এক ঘণ্টা। হীরাচাঁদ আর আমি ঘুরে এলুম। দু'জনেই বেপাত্তা।

গল্পটা বেশ ভালই ফেঁদেছে অষ্টাবক্র। টেবিলে টকটক আওয়াজ করে বললে, আর এক কাপ চা ছাড়ো ওস্তাদ।

বিষ্টুদা মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হচ্ছেন। কী করব, সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। চা এসে গেল। চুমুক দিয়ে, জিভে আর দাঁতে এক ধরনের গ্রাম্য শব্দ করে, গল্পের খেই ধরলেন, হীরাচাঁদ বললে, দাও গাড়ি ছেড়ে দাও, ও নিমকহারাম দুটো এখানেই পড়ে থাক। হীরাচাঁদ স্যার বেনারসের গুন্ডা, ও যা বলবে শুনতেই হবে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

গল্পের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ঘটনা মেলাবার চেষ্টা করলুম। কোথায় চন্দ্রকোনা আর কোথায় কলকাতার মর্গ। আমি পুলিশ হলে, মারতুম ব্যাটার তলপেটে এক কোঁতকা, সত্যি কথা বেরিয়ে আসত হুড়হুড় করে।

সেই ফট্‌কেকে সেদিন আমি গার্ডেনরিচে দেখলুম, বললুম, বল ব্যাটা, তুই আর ওস্তাদ সে রাতে কোথায় বেপাত্তা হলি? ফট্‌কে আবোল তাবোল বকছে। কোনও কথার সঙ্গে কোনও কথার মিল নেই।

লোকটি চায়ে লম্বা এক চুমুক মেরে, কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। এই মুহূর্তে আমার সেই ভয়টা আবার চেপে এল। এ তো দেখছি পুলিশ কেস। খুনের মামলা। ব্যাপারটা এইভাবে চেপে রাখা যায় না। এরপর কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোতে পারে।

আপনি হঠাৎ এখানে এলেন কেন, এতদিন পরে?

বাঃ, খবরটা জানাতে হবে না? এই তো আপনারা কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। কিছুই জানেন না।

বেশ, যা জানার তা তো জানা হল, ব্যবস্থা যা করার তা আমরাই করব। আপনি এখন আসুন তা হলে। লোকটি চোখমুখ কুঁচকে বললে, স্যার, এর মধ্যে একটা ছোট্ট ব্যাপার ছিল। ওস্তাদের কাছে আমি হাজার দুয়েক টাকা পেতুম। টাকাটা আমার ভীষণ দরকার স্যার। স্ত্রীর কাছে কিছু সোনাদানা থাকবেই। একটা হার, কি একটা বালা। যা হয় একটা কিছু পেলে, আমি নাচতে নাচতে চলে যাই।

আপনি যে টাকা পেতেন, তার তো কোনও প্রমাণ নেই ভাই।

খুব আছে। বলেন তো ফুলেশ্বরীকে নিয়ে আসি। বেশিক্ষণ লাগবে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়ব। আপনার বাবার সঙ্গেও তখন দেখা হয়ে যাবে।

ফুলেশ্বরীটা কে?

আজ্ঞে, সে এক ডাগর মেয়েছেলে। লাইনে সবে এসেছে।

শুনে, আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এ যেন নরকের দূত! একের পর এক প্যাঁচ মেরে চলেছে। একে ছেড়ে দিলে, যা হবার তা তো হয়েইছে, এরপর ঘোলা জল আরও ঘোলা করে দিয়ে যাবে শয়তান। নিজের হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকালুম। এটা পেলে সন্তুষ্ট হবে কি?

শুনুন, এসব কথা ওঁর স্ত্রীকে এখন না বলাই ভাল। আপনি আমার এই ঘড়িটা বরং নিয়ে যান। এখনকার মতো কাজ চালান, পরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

লোকটি বেশ কায়দার গলায় বললে, কী ঘড়ি?

ওমেগা গোল্ড।

নামটা তো বেশ চেনাচেনা মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, দামি ঘড়ি। যা-তা নয়।

দিন তা হলে। গোল্ড মানে তো সোনা, আসল সোনা?

সামান্য একটু খাদ মেশানো আছে, তা না হলে ঘড়ির কেস হবে না যে।

ঘড়িটা হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখেই পাশ-পকেটে চালান করে দিলে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ঘড়িটা পইতের সময় মামা আমাকে দিয়েছিলেন। মাতুলের স্মৃতি আজ হাত থেকে খুলে চলে গেল। মানুষ কীভাবে উটকো ঝামেলায় জড়িয়ে যায়। কোথাকার কে প্রফুল্লকাকা, হঠাৎ এলেন। এমন এক চরিত্রের মানুষ, যাবার সময় জল ঘোলা করে দিয়ে সরে পড়লেন। কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে!

ওস্তাদ বললে, আমি তা হলে আবার কবে আসব স্যার?

আবার আসবেন কেন?

বাঃ এইতেই হয়ে যাবে নাকি! এটা বেচলে, ক'টা টাকাই বা আমার হবে। সাত দিন পরে আসি? আপনাকে আসতে হবে না, ঠিকানাটা রেখে যান।

ঠিকানা! লোকটি ইস্পাতের মতো হেসে উঠল। আমার ঠিকানায় স্যার আপনি পৌঁছোতে পারবেন না। সে জায়গায় যেতে হলে আলাদা চরিত্র চাই। আপনি অতি নাবালক। আমিই আসব। জায়গাটা তো চেনাই হয়ে গেল। আসতে কোনও অসুবিধে হবে না। আচ্ছা আজ আসি। রাত হয়ে গেল।

আমাকে কোনও কথা বলার অবসর না দিয়ে লোকটি দোকান থেকে নেমে পড়ে হনহন করে হাঁটতে লাগল। হাঁটার ধরনটা অনেকটা শিম্পাঞ্জির মতো। হাতদুটো সামনে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দুলছে।

লোকটি চলে যেতেই বিষ্টুদা বললে, আজকাল কী সব লোকের সঙ্গে মিশছ। চেহারা দেখলেই মনে হয় মাগির দালাল।

বিষ্টুদার মুখ ভীষণ গম্ভীর। মানুষটিকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। এ পাড়ার সেরা মানুষ। পরোপকারী। পরচর্চায় নেই। দোকানে বসে কেউ পরচর্চা করলে, সোজা হাত জোড় করে বলে দেয়, আপনি দয়া করে আসুন। এ পাড়ার সব ছেলে ভাল হোক, লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি পাক, সবসময় এই প্রার্থনা। দীনু যেবার লেটার পেয়ে পাশ করল, বিষ্টুদা সবার আগে এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে দেখা করতে ছুটল। ফিরে এল, চোখের দু'কোল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। যেন নিজের ছেলে লেটার নিয়ে পাশ করেছে। দোকানসুদ্ধ লোককে বিনা পয়সায় চা আর লেড়ো বিস্কুট খাইয়ে দিল। পরোপকারের শেষ নেই। মেনিদার মেয়ে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে উলটে পড়ে গেল। দুপুরবেলা পাড়ায় কেউ নেই। বিষ্টুদা কোলে নিয়ে হাসপাতালে ছুটল। রক্তে সারাশরীর ভাসছে। বিভূতি মাস্টারমশাই ব্যাচেলার মানুষ। জগাদের বাইরের ঘরে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। বিষ্টুদা ছুটছে, একবার ডাক্তার নিয়ে, একবার ওষুধ নিয়ে, একবার সাবু নিয়ে। বয়স্ক মাননীয় মানুষ

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, বিষ্টুদা ছুটে এসে পায়ের ধুলো নিচ্ছে। পিতা বলেন, এরা হল শাপভ্রষ্ট সাধক। বিষ্টুদা আর বিষ্টুদার স্ত্রীকে পাশাপাশি দেখলে আমার চোখে জল এসে যায়, যেন সাক্ষাৎ হর-পার্বতী। দোকানের দেয়ালে ঝুলছে হাসিহাসি মুখ একটি শিশুর ছবি। যার কথা বলতে বলতে বিষ্টুদার চোখ জলে ভেসে যায়। সাত বছরের ছেলে ম্যানেনজাইটিসে মারা গেল। হয়ে গেল প্রায় বছর বারো। কেন জানি না, সেই মুহূর্তে মনে হল, বিষ্টুদাকেই বলা যায় আমার চেপে রাখা গোপন কথা। হত্যাকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি দিনের পর দিন।

বিষ্টুদা বললেন, এইসব লোকের সঙ্গে মেশো কেন? তুমি কত বড় বংশের ছেলে জানো?

বিষ্টুদাকে হাত ধরে দোকানের পেছনে টেনে নিয়ে গেলুম। বুঝতে পারছেন না আমি কী করতে চাইছি। অবাক হয়ে গেছেন। দোকানে এখন একটিও খদ্দের নেই। এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

এইখানে বসুন। ভীষণ জরুরি কথা আছে।

বিষ্টুদা বেশ ভয় পেয়ে গেছেন, কী ব্যাপার বলো তো!

খুব একটা সমস্যায় পড়ে গেছি। নিজের তৈরি ফাঁদে নিজেই পড়ে গেছি।

পুরো ব্যাপারটা বিষ্টুদাকে বললুম। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। এমনকী এই লোকটির আসা, ঘড়ি খুলে দেওয়া সব বলতে পেরে মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল।

সব শুনে বিষ্টুদা অ্যা হ্যাঃ হ্যাঃ, চুক চুক করে একটা আক্ষেপের শব্দ করলেন। তোমার মতো বোকা ছেলে পৃথিবীতে আর দুটো নেই। ঝট করে ঘড়িটা খুলে দিয়ে দিলে। আমাকে বলবে তো। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

কী করব? লোকটাকে থামাতে হবে তো। কাকিমাকে আমি জানতে দিতে চাই না।

শোনো শোনো, খবরটা চেপে রাখা খুব অন্যায় হবে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে বিধবা হতে হয়। শ্রাদ্ধশান্তি করতে হয়।

অপঘাতে মারা গেলে শ্রাদ্ধ হয় না।

বিধবা তো হতে হয়!

যিনি মারা গেছেন তিনি কি মানুষ ছিলেন? তেমন মানুষ হলে একশোবার বিধবা হওয়া চলে।

বিষ্টুদা জিভ কেটে বললেন, ছি ছি, সব মানুষই ভাল। বিচার করার অধিকার তোমার নেই। স্ত্রীর কাছে যে-কোনও স্বামীই দেবতা। তা যদি না হত, তোমার বউদি আমাকে লাথি মেরে চলে যেত। কত বড় ঘরের মেয়ে! গান শুনলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। রূপও বড় কম ছিল না।

জহরবাবুর কথা মনে আছে, আজ বছর সাতেক বেপাত্তা। আপনার ধারণা সে বেঁচে আছে!

ধরলুম বেঁচে নেই, তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী!

জহরবাবুর বউ বিধবা হয়েছেন? শাস্ত্রে আছে, কত বছর যেন অপেক্ষা করে তারপর শাঁখা সিঁদুর ছাড়তে হয়।

তুমি যখন জানোই তখন শুধু শুধু পাপের ভাগী হবে কেন?

আপনি এই মহিলাকে দেখেননি। দেখলে আমার মতো আপনারও একই ইচ্ছে হত। যিনি প্রতি মুহূর্তে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখছেন, কী করে যমদূতের মতো তাঁর সব স্বপ্ন চুরমার করে দেওয়া যায়, আপনিই বলুন। খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে যায়। ষোলো-সতেরো বছর চলুক না এইভাবে।

তোমার বুদ্ধি এখনও বহুত কাঁচা। তোমার কাকার কথা ভেবে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। একটা মানুষ এইভাবে চলে যাবে, কেউ একটু চোখের জল ফেলবে না? কেউ তার জন্যে সাদা কাপড় পরবে না? পৃথিবী কি এতই অকৃতজ্ঞ? আমাকে ভার দাও, আমি মর্গ থেকে লাশ খালাস করে আনি।

সে কি আর আছে নাকি!

ছি ছি, এ তুমি কী করলে পিন্টু? শেষ দেখা দেখতে দিলে না, শেষ কাজ করতে দিলে না। কেন বলো তো!

আমি এতক্ষণ আপনাকে কী বললুম!

তুমি নিজেকে এখনও ধরতে পারোনি পিন্টু। তুমি বিশ্রী একটা ঝামেলার ভয়ে এতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে। থানা, পুলিশ, মর্গ, শ্মশান, সৎকার, কান্নাকাটি এইসব এড়াবার জন্যে নিজের মতো একটা যুক্তি খাড়া করে নিজেকে ধাপ্পা দিলে। সংসারের সবকিছুকে কি ওইভাবে এড়িয়ে যাওয়া যায়? তুমি আমাদের সত্যেনের মতো করলে। বাপের শ্রাদ্ধের পর ফিরে এল। এসে বললে, টেলিগ্রাম চিঠি কিছুই পায়নি। আর দুম করে তুমি হাত থেকে ঘড়িটা খুলে দিয়ে দিলে। কী লোক, কোন লোক, কোথাকার লোক কিছুই দেখলে না। আমাকে একবার বলতেও তো পারতে!

ওর সামনে বলি কী করে?

যাক যা গেল তা গেল। খুব সাবধান! ও আবার আসবে, তোমার কাছেই আসবে। ও বুঝে গেছে, কোথাও একটা গোলমাল আছে। একে চাপ দিলেই মাল বেরোবে। তুমি সোজা বাড়ি যাও। প্রথমে তোমার বাবাকে সব খুলে বলো। তোমার কাকিমাকে তিনিই বলবেন। প্রয়োজন হলে আমাকে ডেকো। জানো তো চাপা জিনিস ফেটে বেরোয়।

বিষ্টুদা, আমি এখন বলতে গেলে সবাই বলবেন, তুমি তখন বললে না কেন? একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে যাবে। তার চেয়ে সাত দিন পরে ওই ব্যাটাই আসুক, এসে বলুক।

অ্যাঃ তুমি একটা অসৎ লোকের খপ্পরে চলে গেলে!

গেলুম কই? সোজা এসে এবার কাকিমার সঙ্গে দেখা করুক!

খবরদার না। এসব লোককে বাড়ির অন্দরমহলে একেবারে ঢুকতে দেবে না। এরা সব পারে। এরা ঘরের মেয়েকে বাইরে বের করে পেট চালায়। আমি যদি একবার টের পেতুম তোমাদের এইসব হচ্ছে, সোজা থানায় গিয়ে পুলিশ ডেকে আনতুম।

নীল লুঙ্গি পরে অঘোরবাবু দোকানে ঢুকলেন। বিষ্টুদা ঠোঁটে আঙুল রেখে বুঝিয়ে দিলেন, চুপ, আর একটাও কথা নয়!

পার করো দয়াল, আমায় কেশে ধরে
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ হল। পরক্ষণেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মাতুল আসছেন। একটু যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মুখে সেই মনোরম হাসিটি লেগে নেই। সাজপোশাক অবশ্য রাজপুত্রের মতোই আছে। শরীর ঘিরে ফুরফুরে সুবাস।

চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কী খবর তোমাদের?

আজ্ঞে, মোটামুটি ভাল। আপনার খবর?

তোর লজ্জা করে না, এলেই যত খবর নেবার ঘটা। কেন, একবার যেতে পারিস না!

সেই সাতসকালে বেরিয়ে যাই। সারাদিন ল্যাবরেটরিতে বার্নারের সামনে, অ্যাসিড, অ্যালক্যালি ফিউম্‌স। ফিরি যখন শরীরে আর কিছু থাকে না।

বাবা, তুই যে দেখি বুড়োদের মতো কথা বলছি। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর চাকরি করবি কী করে? রবিবারেও তো আসতে পারিস।

আপনি থাকেন?

আমি না থাকলে, আর কেউ নেই? তোর দাদুর খবর জানিস?

কী খবর?

তিনি বানপ্রস্থে যাবার জন্যে প্রস্তুত। গেরুয়া ছাপানো হয়ে গেছে। রংটা মনে হয় ভাল ছিল না, তাই তেমন লাল হয়নি।

হঠাৎ বানপ্রস্থ! রাগারাগি হয়েছে বুঝি!

না, রাগারাগি হবে কেন, বৈরাগ্য এসেছে!

কোন বনে যাবেন? বন আর আছে, তেমন ফলমূলঅলা ভাল বন?

সারাভারতে ওঁর তো একটাই ফেভারিট জায়গা আছে রে, হরিদ্বার। কংখল, হর-কি-প্যারী, লছমনঝুলা, কালী-কম্‌লিকা ধরমশালা। বার তিরিশ হরিদ্বার গেছেন আর একবার না হয় যাবেন। পিতৃদেব কোথায়?

বাজারে গেছেন।

এত রাতে বাজারে!

আজ্ঞে রাত সম্পর্কে ওঁর ধারণা অন্য। ওঁর জীবনে রাত নেই। যত রাত বাড়ে, তত কাজ বাড়ে।

একটু চা-টা খাওয়াবি, না, সেসব পাট উঠে গেছে?

না উঠবে কেন? এ তো চায়েরই বাড়ি। টি হাউস।

তা হলে কড়া করে এক কাপ নামা দেখি। হৃদয়ে যেন লাথি মারে।

সে আবার কী?

ও ইংরিজি করে না বললে বোঝা যায় না বুঝি। চায়ে যেন বেশ কিক থাকে। কিকিং টি।

রান্নাঘরে গিয়ে খুটুর খুটুর করছি। মুকু পাশে এসে দাঁড়াল। আজকাল একটু ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি, মুকু কী যেন একটা বলতে চায়। গভীর গোপন কোনও কথা। মনে আতঙ্ক পুষে রেখেছি। সরলকেও জটিল মনে হচ্ছে। হয়তো কিছুই বলার নেই। যাবার দিন এগিয়ে আসছে, তাই হয়তো কাছাকাছি এসে, এতদিনের দুর্ব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে।

চুলে আজ তেল পড়েছে। টানটান খোঁপা। দু'চোখে কি একটু কাজল টেনেছে? মুকুর মেকআপে নিশ্চয়ই আজ কাকিমার হাত পড়েছে। কোথায় তিনি? কয়েকদিনের দুশ্চিন্তায় মুকুর মেদ এখন বেশ ঝরে গেছে। চেহারায় কনকের আদল এসেছে। কনক এতকাল মেদভারে মুকু হয়ে ছিল।

মুকু বললে, তুমি সরো, আমি চা করে দিচ্ছি। শুধু চা? আর কিছু খাবেন না?

তুমি জিজ্ঞেস করে এসো তো, তা হলে আচ্ছা করে ডবল ডিমের ওমলেট বানিয়ে দিই।

মুকুকে আর যেতে হল না। আমার মামা কি এক জায়গায় চুপ করে গোমড়া মুখে বসে থাকার ছেলে, চুপিচুপি মুকুর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। মুকু টের পায়নি। ইশারায় জানালেন, বোলো না। তারপর মুকুর কানের পেছন দিকে ফুস করে ফুঁ মারলেন।

মুকু চমকে উঠেছে। মাতুলের সে কী হাসি! হোহো, হাহা, হিহি।

লাফাতে গিয়ে মাতুলের পায়ে বোধহয় মুকুর পা ঠেকেছিল। তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে প্রণাম করল। কেউ প্রণাম করলে, কেউ ভক্তি শ্রদ্ধা দেখালে, মাতুল একেবারে মহাদেব। চিবুক ছুঁয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা। জীবনে সুখী হ।

শুকনো আশীর্বাদে মাতুল সন্তুষ্ট হবেন। তিনি কি আমার মায়ের তেমন ভাই। বুকপকেট থেকে খুলে নিলেন সোনার পার্কার কলম, এই নাও, পুয়োর ম্যানের পুয়োর প্রেজেন্টেশন। এমনি করেই স্মৃতি ছড়িয়ে যাই।

মুকু কলমটা হাতে নিয়ে ভাবছে, নেওয়া উচিত হবে কি না। কেমন যেন অবাক হয়ে গেছে।

মাতুল গান ধরেছেন,

এই কথাটি মনে রেখো,
তোমাদের এই হাসি খেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে আপন-মনে
অনাদরে অবহেলায়॥

মাতুলের গলা সামান্য ধরে এল। তবু গাইলেন, দিনের পথিক মনে রেখো, আমি চলেছিলেম রাতে/ সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।

পরের লাইন আর উচ্চারণ করতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে কান্না বেরিয়ে এল। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ ঢেকে মুখ নিচু করলেন। একটা হাত লম্বা টেবিলে, শরীর হেলে গেছে বাঁ পাশে।

এমন আবেগ আগে কখনও দেখিনি। আজ কী হল! কথা বলতেও সাহস হচ্ছে না। পিতৃদেব পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, হাতে বাজারের ব্যাগ। এত বড় ব্যাগ একমাত্র তিনিই তুলতে পারেন, বইতে পারেন।

ব্যাগটা কোনওমতে মাটিতে নামিয়ে, তিনি বললেন, কী হল জয়?

মাতুল চোখে রুমাল চাপা অবস্থায় মুখ তুলে বললেন, আই অ্যাম এ ব্রোক।

ব্রোক? তার মানে?

আই অ্যাম ফিনিশড্।

ফিনিশড্? তার মানে?

চোখ থেকে রুমাল সরিয়ে বললেন, চলুন, বলছি।

আমরা সেই শোকের মুহূর্তেও নিজেদের কর্তব্য ভুলিনি। সমস্বরে জিজ্ঞেস করলুম, আদা আর পেঁয়াজকুচি দিয়ে ডবল ডিমের ওমলেট চলবে তো মামা। ঘাড় নাড়লেন। তার মানে, হয়ে যাক। বাজার-ব্যাগ থেকে লকলকে সবুজ পেঁয়াজকলি বেরিয়ে আছে।

মুকু কলমটা আমার হাতে দিয়ে বললে, কী হবে?

কী আবার হবে! তুমি রেখে দেবে যত্ন করে, দামি জিনিস। মাঝে মাঝে লিখবে।

কোনও কিছু নিতে আমার ভীষণ লজ্জা করে। এটা তুমি নাও। ওনার মন ভাল হলে, পরে বরং ফেরত দিয়ো।

তা কখনও হয়? মামাকে তুমি চেনো না। রাগলে একেবারে অন্য মানুষ। মুকু, কাকিমা কোথায়?

ও, তোমাকে বলা হয়নি, আমাকে বলে গেলেন, মনটা বড় খারাপ, একবার মামাশ্বশুরের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

কখন গেছেন?

তা বেশ কিছুক্ষণ হল। পাঁচটা নাগাদ গেছেন।

একা একা চলে গেলেন?

হ্যাঁ, আমাকে বললেন, হাতে নাকি একটাও পয়সা নেই।

পয়সা নেই, তা আমাকে বলতে কী হয়!

তুমি আমার ওপর রাগ করছ কেন? আমি কী জানি বলো?

তোমার ওপর রাগ করিনি। মানুষের জন্যে যতই করো না, পর কখনও আপন হয় না, নেভার!

সে যদি বলো, কাকিমা যেমন তোমার পর, ওদিক থেকে তুমিও তো কাকিমার পর। সম্পর্ক হাওয়ায় ভেসে আসতে পারে না। সম্পর্ক রক্তের, সম্পর্ক দাবির। এক হয় জন্মসূত্রে, আর এক হয় আইনের বাঁধনে।

তুমি কি একবারও কাকিমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

না, তা অবশ্য করিনি। মানে আমার ভাবনায় আসেনি।

তবে! শুধু শুধু অভিমান!

আমাকে আপনার লোক ভাবতে পারলে, নিজেই চাইতেন।

তা হয় না। টাকাপয়সার ব্যাপারটা অত সহজ নয়। অনেকে পাওনা টাকাই মুখ ফুটে চাইতে পারে না। লোককে ধার দিয়ে নিজে উপোস করে মরে।

ঠিক আছে, আজ উনি আসুন। কত বড় কাকিমা হয়েছেন আমিও দেখছি!

মুকু পেঁয়াজ আর আদা কুচোতে বসে গেল। পেছন থেকে দেখলে অবিকল কনক। কোথায় যে গেল মেয়েটা? যদি কোনওদিন দেখা হয়, বাপের নাম ভুলিয়ে দোব। যদি মারা গিয়ে থাকে। কী হবে কনকের কথা ভেবে? চলতে চলতে হঠাৎ দেখা হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া। এ জগতে কে কার?

ওমলেট নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই শুনলাম, পিতা বলছেন, তোমাকে আমি বারবার বারণ করেছিলুম কি না?

মাতুল বললেন, আজ্ঞে হ্যা, করেছিলেন।

শুনেছিলে?

না।

তা হলে এখন ভোগো। তুমি তো জীবনে কারুর কথা শোনো না, জয়। তোমার তালে তাল না দিলে তুমি রেগে অগ্নিশর্মা হও। তুমি যখন কারুর কথা শোনো না, তোমার কথা আমরা শুনব কেন?

আমি এখন তা হলে কী করব?

যেখানে যা যেমন আছে পড়ে থাক, তুমি আবার তোমার জগতে ফিরে যাও। জীবন থেকে এই ক'টা পাতা ছিঁড়ে ফেলে দাও।

আমার এত টাকা ইনভেস্টমেন্ট সব যাবে?

যাবে, কী আর করা যাবে। আবার নতুন করে শুরু করো। Remember the faith that took men from home.

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওমলেট দেখিয়ে বললেন, নাও খেয়ে নাও, তোমাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। ইউ আর নট ইয়োর ফর্মার সেল্‌ফ।

মাতুল ডিমটা টেনে নিলেন। চামচেটা আর একটু হলেই মেঝেতে পড়ে যেত। পিতা পায়চারি করতে করতে আর একটি লাইন বললেন, At the call of a wandering preacher. ঘরের ও মাথা থেকে এ মাথায় আসতে আসতে বললেন, Our age is an age of moderate virtue/And of moderate vice/When men will not lay down the cross/Because they will never assume it/Yet nothing is impossible nothing. To men of faith and conviction/Let us therefore make perfect our will/O god, help us.

পিতা মাঝে মাঝে শিশির ভাদুড়ি হয়ে যান। থামতেই জিজ্ঞেস করলুম, চা খাবেন?

নিশ্চয় খাব।

চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, আবার নতুন করে শুরু করো। সংগীতই তোমার জীবন, নট দ্যাট সিনেমা। মাতুল কাঁচালঙ্কা চিবিয়েছেন। মুখ বিকৃত করে বললেন, শিগগির এক গেলাস জল।

চায়ে চুমুক দিয়েই মাতুল বাপ বলে উঠলেন। ঝালের মুখে চা, ব্রহ্মরন্ধ্র ছ্যাঁদা করে দেয়।

পিতা বললেন, তোমার খাবার কম্বিনেশনটা তেমন ভাল হল না। ডিমের পরে চা। অ্যান্টি প্রোটিন হয়ে গেল।

ও আমি প্রায়ই খাই। কিছু হবে না।

যখন হবে তখন আর সামলাতে পারবে না, এই সিনেমা করার মতো হবে। আচ্ছা, তোমার তো একটা বাজেট ছিল?

ছিল বই কী?

তা হলে এমন ভাঁড়ে মা ভবানী হয়ে গেলে কী করে?

এ লাইনে এত জোচ্চোর ঘোরে কে জানত। সেট সাজাবার জন্যে একটা শুকনো গাছের ডাল সাপ্লাই করে, দুশো টাকা বিল করে দিলে। একটা স্টেথিসকোপের ভাড়া তিনশো টাকা। নতুন কিনলে তিরিশ টাকা।

তুমি এসব জানতে না?

কী করে জানব, আমি তো এ লাইনে একেবারে নতুন!

তুমি ঈশপস্ ফেব্‌লটাও যদি একবার ভাল করে পড়তে, লুক বিফোর ইউ লিপ।

আমার এক লাখ টাকা ভুষ্টিনাশ হয়ে গেল। ছবি হয়েছে ওয়ান ফোর্থ।

এইভাবে ওড়াতে ওড়াতে চললে, কত লাখে গিয়ে শেষ হবে?

তিনের কমে নামবে না।

তুমি ফিরে এসো, জয়। এর চেয়ে তুমি আসামের জঙ্গল থেকে একটা হাতি কিনে পুষলে, অনেক বেশি রোজগার করতে। তোমাকে আমি সম্বলপুরে, আমার বন্ধুর ফরেস্টে পাঠিয়ে দিতুম, সেখানে কাঠ ক্যারি করে তোমার হাতি তোমাকে সারাজীবন খাওয়াত। বউমার গয়না সব গেছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইস, ইস। বাড়ি মর্টগেজ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বহত আচ্ছা। তুমি তো তা হলে অনেক দূর এগিয়ে গেছ হে!

কোন দিকে?

লোটাকম্বলের দিকে। একতারা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হয়। ভগবানদত্ত গলা, চেহারাটিও রাজপুত্তুরের মতো। নেচে নেচে গাও, নেচে নেচে গাও,

পার করো দয়াল,

আমায় কেশে ধরে।
পড়েছি এবার আমি ।
ঘোর সাগরে॥

ওমলেট আর চায়ের অ্যাকশন অন্যভাবে শুরু হল। মাতুল বলেন, রাইজ আই মাস্ট। বই আমি শেষ করবই।

তাই যদি করবে, তা হলে আমার কাছে ছুটে এলে কেন?

বড় আপন ভাবি বলে, পিতার চেয়েও আপনজন।

সাঁই করে তির ছেড়েছেন পিতার সেন্টিমেন্টে। পিতার কাছে কেউ সারেন্ডার করলে, তিনি পর্বতের মতো তাকে আগলে রাখবেন।

শেষ করতে গেলে, তোমার দু'লাখ চাই।

দেড়ে আমি ম্যানেজ করব।

দেড় পাবে কোথায়?

মধুপুরের বাগানবাড়িটা বেচে দোব।

অসম্ভব! মধুপুরের বাড়ি বেচবে কী হে। সে বাড়িতে কত স্মৃতি থইথই করছে। ইমপসিব্‌ল! বাঙালির এমনই নাম হয়েছে, বাড়ি-বেচা বাঙালি। সারা কলকাতাটা বেচে দিয়ে বসে আছে।

মধুপুরে আমরা বছরে ক'বার যাই। এরপর ওই মালির ফ্যামিলিই বাড়িটা দখল করে নেবে।

তুমি যখন বেচবে ভেবেছ, তখন তুমি থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান যুক্তি খাড়া করবে। আমার মত নেই। আমি কনস্ট্রাকটিভ, ডেস্ট্রাকটিভ নই।

আহা, আপনি একটা জিনিস ভুল করছেন, ছবিটা লেগে গেলে কত লাখ আসবে একবার ভেবে দেখুন। তখন ওই বাহান্ন বিঘের দিকে, আপনার সেই প্রিয় বাগানবাড়িটা এককথায় কেনা যাবে। অনেক বেশি জায়গা, অনেক ভাল এলাকা।

এ বার্ড ইন হ্যান্ড ইজ ওয়ার্থ টেন ইন দি বুশ। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলে আমি বিশ্বাসী নই।

এ ছাড়া টাকা তোলার আমার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই।

টাকা টাকা করছ, মধুপুরের বাগান বেচে তুমি কত পাবে বলে মনে করো। কে কিনবে?

আমার এক অ্যাটর্নি বন্ধু।

অফার কত?

বাড়িটা আগে দেখুক।

তোমার কী মনে হয়?

হাজার চল্লিশ।

অ্যাবসার্ড। ওখানে অত দাম পাবে না। এ কি তোমার কলকাতা!

জমিজায়গার দাম সব জায়গাতেই বাড়ছে।

যতই বাড়ুক, তোমাকে ছাড়তে হলে থ্রো-অ্যাওয়ে প্রাইসেই ছাড়তে হবে। একে বলে ডিস্ট্রেস সেল। ধরলুম তুমি চল্লিশই পেলে, বাকি এক লাখ ষাট? তোমার তো লাখ-লাখের ব্যাপার।

আমাদের বাড়িটাকে সেকেন্ড মর্টগেজ।

বহুত আচ্ছা। শুধু ডোবা নয়, একেবারে ভড়ভড় করে ডোবার ব্যবস্থা। বেশ বেশ তারপর?

তারপর আপনি।

আমি? আমার ঝুলিতে কী আছে জয়! সবই তো ডাক্তার আর পাওনাদারে শেষ করে দিয়েছে। পরপর মৃত্যুর মিছিল চলে গেল জীবনের ওপর দিয়ে।

ক্যাশ না থাক, গোল্ড আছে।

সোনা?

হ্যাঁ সোনা, দিদির কম-সে-কম বিশ-পঁচিশ ভরি সোনার গয়না ছিল।

তুমি বলছ কী জয়? ওসব অলংকার, এক একটা মাস্টার পিস। এ যুগে ও সোনাও পাবে না, অমন কারিগরও মিলবে না। সেই জিনিস তুমি ছায়াছবির পেছনে ওড়াবে?

ওড়াব কেন? সব আবার ফিরিয়ে আনব। ছবি রিলিজ হওয়া মানেই টাকা আসতে থাকা। পরপর সাত দিন হাউসফুল হলেই তো হয়ে গেল।

আমি তোমার মতো ওই কাচের ফেরিওলার স্বপ্ন দেখতে পারব না, যা এক লাথিতে চুরমার হয়ে যায়। ওসব গয়না আমি আমৃত্যু যক্ষের মতো আগলে রাখব। চাও তো এই বাড়িটা বেচে দিই।

মাতুল মাথা নিচু করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চারপাশ নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতায় দূর থেকে ভেসে আসছে একটা রিকশার ঘন্টার শব্দ। টুং টুং করে বাজতে বাজতে এগিয়ে আসছে। মনে হয় কাকিমা আসছেন।

মাতুল মাথা তুলে চারপাশে তাকালেন। বড় অসহায় মুখের ছবি। করুণ কণ্ঠে বললেন, বইটা হাফ কমপ্লিট করতে পারলে ডিস্ট্রিবিউটর ধরে বাকি টাকাটা আদায় করা যেত।

তোমার তো অনেক বড়লোক ছাত্রছাত্রী, তাদের ধরো না জয়।

আপনার লোকই আমাকে ফেলে দিচ্ছেন, তারা তো পর। আচ্ছা, আমি এখন যাই।

মাতুল উঠে দাঁড়ালেন। সেই কোঁচা-লোটানো রাজপুত্তুর। শরীরটাকে টানটান করে বললেন, আপনি কোনও ফাইনানসার জোগাড় করে দিতে পারেন? একজন বিজনেস পার্টনার!

আমার পরিচিতরা সবাই স্মলমিন্সের মধ্যবিত্ত। তারা হাজার হাজার টাকা পাবে কোথায়?

মাতুল বললেন, এই হল বাঙালি। মাড়োয়ারি কি গুজরাতি হলে আমার এসব সমস্যাই হত না। বাঙালি লটারির টাকা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সিকিউরিটি, সেফটি□—এর বাইরে বাঙালির কোনও শব্দ জানা নেই।

ধীরে ধীরে বিয়োগান্ত দৃশ্যের নায়কের মতো মাতুল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাত নামছে, রাত। চারপাশের দোরতাড়া বন্ধের আয়োজন চলেছে। দরজা জানলার সংখ্যা তো কম নয়। নীচের দায়িত্বে কাকিমা, ওপরের দায়িত্বে আমরা। ছাদের সিঁড়ির দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি, কাকিমা বসে

আছেন আলসের একপাশে চুপ করে।

মধ্যরাত। চারপাশে হুহু করছে শূন্যতা। দূরে, বহু দূরে কুকুরের পাল রাত কাঁপাচ্ছে। যারা জাগার তারা ঠিক জেগে আছে ঝকঝকে চোখ মেলে, অসীম কৌতুহলে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে। দেশলাইয়ের বাক্সে মানুষের নাচা-কাঁদা-ওঠা-বসা। অত ঊর্ধ্ব থেকে পৃথিবীর বিশাল বিটপীও আগাছার মতো।

কাকিমা খুব শান্তগলায় বললেন, কে, পিন্টু?

আমি যেই হই, আজ আর আমি সাড়া দোব না। আমারও তো অভিমান থাকতে পারে!

* * *

মেসোমশাই মুকুকে নিয়ে আজ রাতের ট্রেনে চলে যাবেন।

প্রথমে বলেছিলেন প্লেনে যাবেন। কী কারণে হঠাৎ মতের পরিবর্তন হয়েছে। আমার অগোচরে কোথাও একটা কিছু ঘটে গেছে। ঠিক ধরতে পারছি না, তবে অনুমানে নানা সম্ভাবনা ভেসে ভেসে আসছে। কাকিমা মেসোমশাইকে কেন জানি না এড়িয়ে এড়িয়ে চলছেন। কেমন যেন একটা ভয়ভয় ভাব। আর মুকু যেন প্রহরীর মতো বাবাকে চোখে চোখে রেখেছে। গুরুজন। সন্দেহ করা উচিত নয়, কিন্তু বিশ্রী একটা সন্দেহে মন কুঁকড়ে আছে। পৃথিবীর কিছুই দেখিনি, তবু যা দেখেছি, যা শুনেছি তাইতেই চোখ খুলে গেছে। এ বড় বিচিত্র স্থান। এখানে কী যে হয়, আর কী যে হয় না। এখানে জলেও ডিঙি চলে, ড্যাঙাতেও ডিঙি চলে।

এতদিন পরে আমার সেই পুরনো ডায়েরিটা বেরিয়ে পড়েছে। সেই ডায়েরি যেটা কনক লুকিয়ে রেখে আমাকে সেই জবা-পালানো রাতে ভীষণ বাঁচিয়েছিল। যে-ডায়েরির পাতায় মায়াকে নিয়ে ভট্টিকাব্য লিখে নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই তৈরি করেছিলুম। ডায়েরি ওলটাচ্ছি, কত কী পাগলামিই যে বেরোচ্ছে। একটা পাতায় কনকের হাতের লেখা স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল। আমাকে কেমন লাগে কনক লিখেছে। প্রধানশিক্ষকের ক্যারেক্টার-সার্টিফিকেট যেন! তোমার সবই ভাল, গোটাকতক বস্তু ছাড়া। তোমার ভেতরে একটা অহংকারের ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তুমি ধরতে পারো না। তুমি অনেকটা তোমার মামার মতো। নিজেকে কখনই অত শ্রেষ্ঠ ভাবা উচিত নয়। এ ছাড়া, তোমার অভিমান! অত অভিমানী হলে পৃথিবী থেকে সরতে সরতে ক্রমে একঘরে হয়ে যেতে হয়।

কনক প্রচণ্ড জ্ঞানীর মতো কত কীই যে লিখে রেখে গেছে। একটা পাতায় অদ্ভুত একটা গান লিখে রেখেছি। কোথা থেকে পেয়েছিলুম জানি না। মানুষের কাণ্ডকারখানার সঙ্গে বড় মিলে যায়। উপায় থাকলে মেসোমশাইকে পড়তে দিয়ে, মুকুর মতো তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতুম।

কোন দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই।
আমি দেখব, কোথায় পির হও তুমি রে,
তীর্থে যাবে সেখানে কি পাপী নাই রে॥
বিবাদী তোর দেহে সকল,
অহর্নিশি করছে রে গোল

যথা যাবি, তথায় পাগল করবে তোরে॥
নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না তথায়,
সাথের বাঘে সবারে খায়,
তখন আর কে ঠেকায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ছয় জন,
তারা সদাই করে জ্বালাতন
যথা যাবি তথায় জঞ্জাল ঘটাবে রে॥

মেসোমশাই মাঝেমধ্যেই বারান্দায় এসে গাছপালা দেখার ছলে নীচের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মুকু এসে বলত, এখানে কেন? এখানে কেন? বাবা, আপনি ভেতরে যান। মেসোমশাই বলতেন, দাঁড়া না, দাঁড়া না, একটু সবুজ দেখি। কাকিমা আড়াল থেকে বারেবারে ওপর দিকে তাকাতেন, আর সরে সরে যেতেন। কাজ থাকলেও কুয়োতলায় আসতেন না।

এসব আমি দূর থেকে দেখতুম। সবাই ভাবত, আমি কিছু বুঝছি না। সাথের বাঘে সবারে খায়, তখন আর কে ঠেকায় রে। মেসোমশাইকে সামনে রেখে মানুষ সম্পর্কে আমার এই খেয়ালখাতায় আরও দু'-চার কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। আমার কথা নয়। আমার একজন প্রিয় দার্শনিকের কথা। জীবনের মধ্যভাগে যিনি ঘোর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। Man is a rope, tied between beast and overman. পশু আর অতিমানব যে-দড়িতে বাঁধা, সেই দড়িটি হল মানুষ। সেই দড়ি চলে গেছে অতি গভীর এক খাদের ওপর দিয়ে। A dangerous across, অতি বিপজ্জনক এক পারাপার। সাংঘাতিক এক চলার পথ। ফিরে তাকালেই বিপদ। দোদুল্যমান এক রজ্জু। দাঁড়াবারও উপায় নেই। Man is something that shall be overcome. মানুষ এমন এক জীব যাকে পেরিয়ে যেতে হবে। মানুষকে অতিক্রম করতে না পারলে মানুষ হওয়া যাবে না। এ দেশের এক সাঁই লণ্ঠন হাতে মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। মানুষ হয়ে মানুষের কী জ্বালা!

মুকুরা চলে যাবে। আর মনে হয় কোনওদিনই দেখাসাক্ষাৎ হবে না। কী করে হবে? বড় দূর সম্পর্কের আত্মীয়। থাকেও বহু দূরে। মুকু খুবই ব্যস্ত। বাঁধাছাঁদা চলছে। আমার সেইদিনটির কথা মনে পড়ছে, যেদিন তিনজনে হইহই করে এলেন। এসেছিলেন এক মেসোমশাই ফিরে যাচ্ছেন আর এক মেসোমশাই। দিনকতক বাড়িটা বেশ ভরে ছিল। কত কীই যে ঘটে গেল। কাল থেকে আবার সেই শূন্যতা, সেই নির্জনতা। দ্বিপ্রহরের ছায়াঘেরা বাগানে উদাস সুরে ঘুঘু ডাকবে। ফাঁকা রান্নাঘরে বেড়াল চেষ্টা করবে দুধের ডেকচির ঢাকা খুলতে। ফোকরে শুরু হবে চড়ুই পাখিদের পারিবারিক কলহ। ঘরের মাঝখানে মুকুদের বাঁধাছাঁদা জিনিস এখন থেকেই, যাই যাই, বিদায় বিদায় করছে। মুকুই সব করছে। মেসোমশাই গম্ভীর মুখে ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন, মনোযোগী পরীক্ষার্থীর মতো।

আজ আর বেরোনো হল না। শনিবার অর্ধদিবস অফিস মানে বেলা তিনটের সময় ছুটি। পুরো ছুটিই করে নিলুম। চিরবিদায়ের আগে এই পরিবারের সঙ্গে শেষ সঙ্গ করে নিই। মুকু মাঝে মাঝে আসছে। এটা ওটা জিজ্ঞেস করে চলে যাচ্ছে। নিচু হয়ে সুটকেস গুছোচ্ছে। বেডিং-এর দড়ি ধরে টানছে। মেসোমশাইয়ের দুটি

মেয়েই বেশ কাজের। ভদ্রলোক বড় রহস্যময়। দুটি মেয়ে যে আছে, নিজের চোখেই দেখলুম। আর কে আছেন তেমন পরিষ্কার হল না এতদিনেও। কাউকে তো একটা চিঠিও লিখতে দেখলুম না। আর কয়েকদিন থেকে গেলেই পারতেন। মুকুর রেজাল্ট বেরোবার সময় হয়েছে। বলার কিছু নেই। রহস্যময় পুরুষের রহস্যময় আচরণ।

রবিবাবু সেদিন আমার মনে অন্য এক ধরনের অ্যামবিশন জাগিয়ে দিয়েছেন। সেই লিটল ম্যাগাজিনের গল্পটা পড়ে বলেছিলেন, চালিয়ে যাও, তোমার হতে পারে। রবিবাবুকে ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। এত ধীরে, এত আস্তে কথা বলেন, কানের কাছে মুখ না নিয়ে গেলে শোনাই যায় না। সবসময় হাসিহাসি মুখ। দীর্ঘ, একহারা চেহারা। সাদা ট্রাউজার, জামা ভেতরে গুঁজে পরা। বেশ একটা ইংলিশম্যান ইংলিশম্যান ভাব। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা একই তরঙ্গে ভাইব্রেট করেন। সেইসব মানুষের নিজেদের মধ্যে বেশ একটা মিল থাকে। তাঁদের একই সঙ্গে মন ভাল হয়, মন খারাপ হয়, সর্দি হয়, কাশি হয়, জ্বর হয়, পেট খারাপ হয়। এঁদের বায়োলজিক্যাল ক্লক একই সময় দেয়। রবিবাবু আর আমি মনে হয় একই ভাইব্রেশনের মানুষ। স্বভাবের মিলও যথেষ্ট।

মানুষকে মানুষই এগিয়ে দেয়। মানুষই পেছিয়ে দেয়। কেউ উৎসাহিত করেন, কেউ হতাশা আনেন। কেউ মিইয়ে দেন, কেউ তাজা করে দেন। কেউ বলেন তোমার হবে, কেউ বলেন ব্যর্থ চেষ্টা, তোমার দ্বারা কিছু হবে না বাপু।

রবিবাবুর উৎসাহে একটা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফেঁদে ফেলেছি। জীবনে দেখা তো কম হল না। কতরকমের মানুষ! কতরকমের অসুখ! কতরকমের বিচিত্র পরিস্থিতি! জীবনে আনন্দের ভাগের চেয়ে, দুঃখের ভাগই বেশি। এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল। কে যেন বলেছিলেন, আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধের বড় অভাব হে। গল্প পাবে, টন টন কবিতা পাবে, প্রবন্ধের দিকে কেউ বড় একটা যেতে চায় না। কোথায় রামেন্দ্রসুন্দর! কোথায় জগদীশচন্দ্র, কোথায় জগদিন্দ্র! প্রবন্ধভূমি তৃণহীন। খাঁখাঁ করছে।

পাতা দুয়েক লিখে ফেলেছি। বিষয়বস্তু মানুষ। মানুষের হাতে কম দিন হল মার খেয়ে মরছি। খাবলে খুবলে শেষ করে দিলে। প্রবন্ধটা মনে হয় ভালই জমছে। মানুষের পিন্ডি চটকে ছেড়ে দাও। একবার জন্মে গেলে, মানুষ নিজেকে আর মানুষ বলেই মনে করে না। মানুষ বলে ভাবতেই ভুলে যায়। নিজেকে মনে করে এক সেট অভ্যাস, আহার, নিদ্রা, মৈথুন, জীবিকা, শত্রুতা, পরশ্রীকাতরতা। ইন্দ্রিয়ের টংকারের এমন ঝংকার, অন্য সুর শোনার উপায় নেই।

কমলনেত্র রাম, শিক্ষা শেষ করে কিছুকাল রাজগৃহে অলস সময় কাটাতে কাটাতে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। শেষে মনস্থ করলেন, তীর্থ দর্শনে যাবেন। রাজা দশরথ বললেন, অতি উত্তম প্রস্তাব। পড়ে গেল, সাজো সাজো রব। রাজকুমার রাম যাবেন তীর্থপর্যটনে। সঙ্গে চললেন লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। পর্যটন শেষ করে রাম যথাসময়ে ফিরে এলেন।

রাম গেলেন এক মানুষ, ফিরে এলেন আর এক মানুষ। মুখে হাসি নেই। আহার বিহার সব ত্যাগ। পদ্মাসনে বসে আছেন সারাদিন। গালে হাত। শরীর কৃশকায়। ক্রমশই রোগা হয়ে যাচ্ছেন। রাজকুমারের এ কী হল? রাজা দশরথ বড়ই চিন্তিত। ডেকে পাঠালেন বশিষ্ঠদেবকে। হে মুনি! আমার পুত্র কেন এমন খেদান্বিত।

দিনদিন কৃশ থেকে কৃশতর হয়ে চলেছে। বশিষ্ঠ বললেন, রাজন! চিন্তিত হবেন না। এ অতি শুভলক্ষণ। রাজকুমারের বৈরাগ্যোদয় হয়েছে।

রামচন্দ্রের যখন এই অবস্থা, তখন রাজসভায় এলেন বিশ্বামিত্র। রাজা দশরথ, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমার প্রয়োজন। রাক্ষসের উৎপাতে আশ্রমে টিকতে পারছি না। রাক্ষস-নিধনের প্রয়োজন। রাজা বললেন, রামের অবস্থা অতি শোচনীয়। বিষন্ন রামচন্দ্র মুনির সামনে এসে বিরসমুখে দাঁড়ালেন।

রাম বললেন, মুনিশ্রেষ্ঠ, অবয়ববিশিষ্ট এই স্থূল শরীরেই মানুষের আত্মবোধের জন্ম। সংসাররূপ মেঘমালার ক্ষণবিধ্বংসী বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর জীবনে আমার শান্তিলাভের আশা নেই। এ জীবন শরতের মেঘ, নিঃশেষিত তৈল প্রদীপ, জলতরঙ্গের মতো চঞ্চল। পত্রের অগ্রভাগে অবস্থিত জলবিন্দুর মতো এই ক্ষণ শরীর যত তাড়াতাড়ি চলে যায় ততই ভাল। দীর্ঘায়ুব্যক্তি বৃদ্ধ গর্দভ। আয়ুতেই আপদ, অশান্তি, আর বৃথা শ্রমের পুঞ্জীভূত জঞ্জাল। কালরূপ মূষিক আয়ু কর্তন করে চলেছে। বায়ুভক্ষক সর্পের মতো কালসর্প আয়ু হরণ করে চলেছে। ব্যাধিঘুণ কুরে কুরে ক্ষয় সাধন করছে। মূষিক-আয়ুর সামনে। বসে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মৃত্যু-বিড়াল।

আহা! শ্রীরামচন্দ্রের কী সুন্দর কথা । গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রবন্ধ লেখার এই মজা, র‍্যানডাম কোটেশন মেরে যাও। এ যেন পড়তে পড়তে লেখা, লিখতে লিখতে পড়া। শ্রীরামচন্দ্রের কী হয়েছিল জানি না, আমি হাতে হাতে ফল পাচ্ছি। উদাসীর একতারা বাজছে মনের কোণে কোণে। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের এক একটা হিটলারের মতো সায়ানাইড ক্যাপসুল চিবিয়ে, চোখ উলটে উলটে পড়ে যাচ্ছে। যশ-খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা কোন রিপুর এক্তিয়ারে পড়ে জানা নেই। সেইটা এই মুহূর্তে বেশ প্রবল হয়েছে।

দেখি, রামচন্দ্র কী বলছেন? বালক যেমন বল নিয়ে খেলা করে, কালও সেইরকম নভোমণ্ডলে চন্দ্র ও সূর্যকে নিয়ে উদয় অস্তের খেলা খেলছে। কলপান্তে এই প্রাণীমণ্ডলকে সংহার করে, তাদের ভূতপঞ্চকময় অস্থিমাল্য গলায় ধারণ করে, কালপুরুষ মহানন্দে নৃত্য করতে থাকবেন। প্রলয়ের সময় নৃত্যপর এই কালপুরুষের নিশ্বাসে ভূর্জপত্রের মতো সুমেরু পর্বতও উড়ে যাবে। এই কালই ইন্দ্র, কালই রুদ্র, কালই কুবের, অথচ কালের কোনও রূপ নেই।

হে ঋষি! অগণিত ব্রহ্মাণ্ডমালা যেন পতনশীল ডুমুর ফল, অনন্ত প্রাণীমণ্ডল যেন মশা, আর কাল সেই ডুমুরফল-প্রসবকারী বৃক্ষ।

ত্রেতা ছেড়ে কলিতে চলে আসি। আমিই রাম, আমিই বিশ্বামিত্র। নিজেকেই প্রশ্ন করি, নিজেকে নিজে চিনিস? আলোকিত কাচের আধারে সাজিয়ে রাখা জিনিসের মতো নিজের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাস, ইডিয়েট! প্রকৃতি তোকে নির্বোধ করে রেখেছে। চুষিকাঠি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে। অহংয়ের খোলে পুরে ভ্রান্ত জ্ঞানের ছলনায় ভুলিয়ে রেখেছে। নিজের শরীরটাকেই ভাল করে চিনিস না, রাসকেল। অন্ত্রের জটিল মারপ্যাঁচ শিরায় শিরায় রক্তের কুলুকুলু প্রবাহ, টের পাস। স্নায়ু কখন কীভাবে, কেন কেঁপে কেঁপে ওঠে, জানিস কি? এই নে চাবি, জ্ঞান-প্রকোষ্ঠের দরজার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখ নীচের দিকে। আহা, চমকে উঠিস না। কার ওপর দাঁড়িয়ে আছিস। The merciless, the greedy, the insatiable, the murderous। অজ্ঞান

উদাসীনতায় ভাসমান স্বপ্নখণ্ড। Hanging in dreams, as it were, upon the back of a tiger. বাঘের পিঠে চেপে স্বপ্ন দেখেছিস!

You that have seen man
As god and sheep.
Tearing to pieces the God in man
No less than the sheep in man
And laughing while tearing
This, this is your bliss
A poet's and fool's bliss.

পথে যে কন্টক আছে কী ভাবিলি তার?/কত শুষ্ক জলাশয়, কত মাঠ মরুময়/পর্বত শিখর-শায়ী বিস্তৃত তুষার/কত শত বক্রগতি নদী খরস্রোত অতি/ঘুরিছে দারুণ বেগে আবর্তের জল/হা দুর্বল তুই তার কী ভাবিলি বল।

চমকে উঠেছি। মুকু পেছন থেকে এসে পিঠে হাত রেখেছে।

কী হল? অমন চমকে উঠলে?

না, অন্য একটা জগতে ছিলুম তো!

কী লিখেছ অত, পাতার পর পাতা?

মানুষ।

তুমি লেখো নাকি?

সম্প্রতি চেষ্টা করছি।

চেপে গেলুম। গর্ব খর্ব করার প্রবন্ধ লিখছি, তা না হলে বলতে পারতুম, আমার একটা গল্প বেরিয়েছে। রবিবাবু বলেছেন, বেশ লিখেছ।

মুকু কাঁধের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়েছে। মেয়েটি হঠাৎ কেন এমন সহজ হয়ে গেল। এই শেষ মুহূর্তে। যাবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে। মুকুর চিবুক আমার ডান কাঁধের ওপর। ঘাড়ের কাছে দেহের উত্তাপ। শাড়ির আঁচলের হালকা স্পর্শ। আমি যেন মুকুর ভেতরে চলে গেছি!

মুকু বললে, তুমি যে লেখো, আগে জানলে শুনে যেতুম। নিশ্চয়ই ছাপা হবে। কাগজের নামটা জানালে যেখানেই থাকি জোগাড় করে পড়ে নিতুম।

লেখা সহজ, লেখা ছাপানো খুবই কঠিন কাজ। ফিরে আসতে আসতে হঠাৎ একদিন ছাপা হয়। কারুর কারুর ভাগ্যে সারাজীবন শুধুই ফিরে আসা। কেউ কেউ আবার এমন অপয়া, না মরলে লেখা ছাপা হয় না। নিজেই নিজের ব্যাডস্টার। যেই সরল, অমনি হুড়হুড় করে লেখা ছাপা হতে লাগল। যশ, খ্যাতি, এমনকী পসথুমাস অ্যাওয়ার্ড। ফ্রানজ কাফ্‌কার কী হয়েছিল ভাবো? মেটামরফসিস পড়েছ?

না।

পেলে পড়ে দেখো।

একবার উঠবে?

কেন?

একটু নীচে চলো, কাকিমা ডাকছেন।

ইমপসিব্‌ল! আমি যাব না।

যেতে আমার ইচ্ছে করে। এটা একটা ছুতো। কাকিমার সামনে যেতে ভীষণ ভয় করে। একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ে গিয়ে কণ্ঠতালু শুকিয়ে আসে। সামনে আয়না না থাকলেও বেশ বুঝতে পারি, চোখেমুখে কেমন যেন একটা অপরাধীর ভাব ফুটে ওঠে। চোখের সামনে ফিনফিনে পাঞ্জাবি পরা অদ্ভুত চেহারার সেই লোকটিকে দেখতে পাই। বিষ্টুদার কথামতো কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কোনওদিন সম্ভব হবে বলে মনেও হয় না।

মুকু বললে, ছিঃ অভিমান করতে নেই। ভদ্রমহিলা কাল তোমার কথা বলতে বলতে চোখের জল ফেলেছেন। প্লিজ অভিমান কোরো না। আজ আমি চলে যাচ্ছি না? বেশ ভালই জানো, তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

এককথায় মুকু আমাকে স্তব্ধ করে দিলে। এই যে কিছুকাল মানুষের পাশাপাশি থাকা, আবার চলে যাওয়া, পৃথিবী জুড়ে এই যে বিচ্ছেদের খেলা চলেছে, এই খেলা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায় নেই। মুকুর সঙ্গে নীচে নামতেই হল। যাবার বেলায় তার একটা অনুরোধ রাখতেই হয়।

কাকিমা দরজার পাশে ডাকপিয়নের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেন রেজিস্ট্রি চিঠি এনেছেন, সই করিয়ে ডেলিভারি দিয়ে যাবেন।

কাকিমা বললেন, আমি কী করেছি গো, তুমি আমার সঙ্গে হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিয়েছ?

মুকু বললে, বাবুর অভিমান হয়েছে। আপনি বাবুকে না বলে মামাশ্বশুরের বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন! বাবুর রাগ হয়েছে।

তুমি তো বাড়ি ছিলে না পিন্টু। তোমার কাকাবাবুর কোনও খবর নেই। আমাকে কোথাও তো একটা যেতেই হবে। তোমাদের আর কত কষ্ট দোব বলো। আমার ওপর রাগ কোরো না। এমনিই তো আমি আধমরা হয়ে আছি।

আপনার টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেছে, আমাকে বলতে কী হয়েছিল?

আমি তো টাকাপয়সার জন্যে যাইনি, আমি তোমার কাকাবাবুর কথা বলতে গিয়েছিলুম। এতদিন হয়ে গেল, মানুষটা আসছে না কেন। মনে অনবরতই খারাপ চিন্তা আসছে।

মুকু বললে, আমি ডবল দুশ্চিন্তা নিয়ে চলেছি। এক আমার দিদির চিন্তা, দুই আপনার চিন্তা। মনে থাকলে একটা চিঠি দিয়ে জানাবেন।

কাকিমা বললেন, হ্যাঁরে, মেয়েটা আজ চলে যাবে, কিছু ভালমন্দ একটা খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

মাংস?

মাছই ভাল, ট্রেনে রাত জাগবে। নিয়ে যাবার জন্যে কিছু জলখাবার করে দিই। লুচি, আলুর ঘি-মরিচ। তুই কিছু ভাল মিষ্টি এনে দে। বটঠাকুর আজ বেরোলেন কেন?

আজ শনিবার, দুটো কি তিনটের মধ্যেই ফিরে আসবেন। বলে গেছেন আসার সময় সন্দেশ আনবেন।

কাকিমা বললেন, আয় ঘরে আয়।

চৌকির ওপর ভাঁজ করা একটা শাড়ি। আকাশের মতো জমিতে, ছোট ছোট সাদা ফুল ছড়িয়ে আছে। কোনও শিশু যেন প্রকৃতির পায়ে অঞ্জলি দিয়ে গেছে। কাকিমা শাড়িটা মুকুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন, বড় গরিব ভাই। তেমন দামি নয়। ফেলে দিয়ো না, পোরো। মনে রেখো, অনেক দূরে এমন কেউ আছে, যে তোমার কথা ভাবে। কত ইচ্ছে মানুষের। কোনটাই বা পূর্ণ করা যায়। বলো পরবে? দামি নয় বলে টান মেরে ফেলে দেবে না!

কাকিমা মুকুর হাতদুটো চেপে ধরলেন। চোখদুটো ছলছলে হয়ে গেছে। ধরাধরা গলায় মুকু বললে, ভালবাসায় এ কাপড় সোনার চেয়েও দামি, কাকিমা। আপনাকে আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। এই বাড়ির কাউকেই আমি ভুলতে পারব না। আপনারা হয়তো আমাকে ভুলে যাবেন!

আমরা তিনটি প্রাণী পোড়ো বাড়ির সেই অন্ধকার ঘরে, চোখে টলটল জল নিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম।

নিরাসক্ত ভালবাসা আপন দাক্ষিণ্য হতে
শেষ মূল্য পায় যেন তার

বেশি বেলা হয়নি। বারোটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। শনিবার অর্ধদিবস হলেও, দুটোর আগে দোকানপাট বন্ধ হবে না। মুকুকে একটা কিছু দেবার ইচ্ছে আমারও ছিল। কাকিমাকে দেখে সেই ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। একটা ভাবনা ছিল, যদি না নেয়। অহংকার কমেছে, তবে কতটা কমেছে। কাকিমার দেওয়া শাড়িটা যখন নিয়েছে, তখন আমি একটা শাড়ি দিলে নেবে না কেন!

ঝট করে স্নান সেরে একবার বেরিয়ে যাই। কতক্ষণ আর লাগবে। শ্যামবাজারের মোড়ে অনেক বড় বড় দোকান আছে। একটাই সমস্যা জীবনে কখনও শাড়ি কিনিনি। কাকিমাকে নিয়ে গেলে কেমন হয়। এখন তো বাড়িতে করার মতো তেমন কাজ নেই। ট্রেনের জলখাবার করার অনেক সময় আছে।

কাকিমাকে বলতেই এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। বাড়ির বাইরে যেতে যে-কোনও বয়েসের মেয়েই খুব আনন্দ পায়। একঘেয়ে জীবনে তবু একটু বৈচিত্র্য।

কাকিমা বললেন, খেয়ে যাবে, না এসে খাবে?

খাওয়ার পর বড় আলস্য আসে। চাপা থাক, এসে খাওয়া যাবে।

চান করে কিছু না খেলে তোমার যে পিত্তি পড়বে।

ধুর, অনিয়মে এত বড় হলুম, গোঁফদাড়ি গজিয়ে গেল, আপনি এখন আমাকে নিয়মে ফেলতে চাইছেন! স্নান করতে করতে ভাবলুম, কাকিমাকে যত তাড়াতাড়ি আমাদের জীবনবৃত্তে টেনে নেওয়া যায় ততই ভাল। হঠাৎ মনে পড়ল, আমার সেই বেড়াল পোষার অভিজ্ঞতা। এতটুকু বয়েস থেকে খাইয়ে আদর করে যত্ন করে সুন্দরী রমণী করে তুললুম, তারপর সে দেখি আমাকে আর পাত্তাই দেয় না। ডাকলে আসে না। কোলে তুলে নিলে আঁচড়ে পালাবার চেষ্টা করে। তার একটা আলাদা স্বাধীন জগৎ। সব ছেড়ে বেড়াল রমণী তার প্রকৃতির জগতে ফিরে যেতে চায়। একদিন সে সত্যিই চলে গেল। পড়ে রইল তার ঘুমোবার বাক্স, দুধ খাবার বাটি, পাউডারের পাফ, খেলার গোল লাল বল। বিজাতীয় মানুষের মায়ায় তাকে বাঁধা গেল না। ফেরার অপেক্ষায় দিন থেকে সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর ঘুরে গেল। বেড়াল আর এল না।

কাকিমারও নিজস্ব একটা জগৎ আছে। যেই জানবেন এখানকার পাট শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে যেতে চাইবেন তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থায়। নিরালম্ব মানুষ বাঁচতে পারে না, বিশেষত মেয়েরা। মেয়েরা বাঁচতে চায় দাবি নিয়ে, যে-কোনও একটা সম্পর্ক নিয়ে। বলতে খারাপ লাগছে, কোনও কোনও মহিলা কারুর রক্ষিতা হয়েও বেশ দাপটে বেঁচে থাকেন। আমাদের পাড়ার ললিতবাবু। তাঁর একজন রক্ষিতা ছিলেন। বাবু মারা গেছেন। তাঁর সম্পত্তিতে মহিলা এখনও কেমন দাপটে বেঁচে আছেন। দান-ধ্যান, পূজাপার্বণ। রাধাগোবিন্দর

মন্দির সংস্কার করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ নাম জ্বলজ্বল করছে। বছরে একবার বাড়িতে বিশাল ভোজ হয়। সকলকেই তো পাতা পেড়ে খেতে দেখি। নিন্দনীয় সম্পর্ককে মেনে নেবার উদারতা সমাজের এসেছে। কাকিমা কী সম্পর্কের জোরে এখানে থাকবেন। যে-জমির ওপর মালিকানা নেই, সে জমির ওপর কেউ ইমারত বানায় না। ভালবাসার ভিত কোথায়! বাতাসের মতো। শ্বাসপ্রশ্বাস নিলেও মূল্য বোঝা যায় না। কারুর আশ্রিতা হয়ে, কারুর দয়ায় বেঁচে থাকার পাত্রী কাকিমা নন।

বেরোবার সময় মুকু জিজ্ঞেস করলে, দু'জনে সেজেগুজে চললে কোথায়?

ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যেই ফিরে আসছি। তুমি বাড়ি পাহারা দাও।

কোথায় চললে বলবে তো?

ফুল কিনতে।

ফুল? ফুল কী হবে?

তোমার গলায় পরাব মালা করে।

হঠাৎ মুখ ফসকে এমন একটা অশালীন কথা বেরিয়ে গেল। প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ভেবে ভীষণ ঘাবড়ে গেলুম। বোমার পলতেয় আগুন লাগিয়ে মানুষ যেমন সিঁটিয়ে থাকে আমি সেইভাবে বেশ কিছুক্ষণ রইলুম। দৃষ্টি মুকুর মুখের দিকে। ভাবের কোনও পরিবর্তন যদি ধরা পড়ে!

না, বিস্ফোরণ হল না। মুখে ক্রোধের কোনও প্রকাশ দেখা গেল না।

কিছু মনে করলে তুমি?

মুকু মুখ নিচু করল। যখন মুখ তুলল, চোখদুটো ছলছলে। মালা পরার ভাগ্য করে আমি জন্মাইনি। মুকু আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। প্রায় ছুটে চলে গেল। কাকিমা আমার মুখের দিকে তাকালেন, আমি কাকিমার মুখের দিকে। ব্যাপারটা কী হল কিছুই বোঝা গেল না। মুকুর কোথাও একটা তীব্র বেদনা, তীক্ষ্ণ হতাশা জমে আছে। কেন? কারণটা কী? বড়লোকের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙোতে চলেছে। তার আবার দুঃখ কীসের!

আজ আমি নবাবি করব। ট্যাক্সি চাপব। বাইরে কোথাও বসে প্রাণ যা চায় তাই খাব। পেট্রল পাম্পে শরৎদার গাড়ি তেল নিচ্ছে। চেনা গাড়িতে উঠব না। সারাটা পথ বকবক করবে। দু'পা এগোতেই আর একটা গাড়ি পেয়ে গেলুম। গাড়িটা কোথা থেকে এল কে জানে। শ্মশান থেকে নাকি। পেছনের আসনে সাদা ফুলের ছেঁড়া পাপড়ি পড়ে আছে। গাড়ি চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। মুকুর মুখ কিছুতেই কেন ভুলতে পারছি না। সব বেদনা আজ যেন দুধের মতো উথলে উঠেছে। মানুষ বুকের ভেতর কী যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওপর দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। বিজলী ছলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি ঝরি;/বসন্ত জ্বলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি/স্বপন চলিয়া যায়/তন্দ্রা করে হায় হায়!

পাশে বসে আছেন কাকিমা অনেকটা করুণ ভৈরবীর মতো। নারীর যতরকম রূপ আছে, সব মিলেমিশে এই বাইরে এসে কাকিমাকে এমন দেখাচ্ছে, যার তুলনা কাকিমা নিজেই। অন্য কারুর সঙ্গে তুলনা চলে না। কাকিমা মৃদু গলায় বললেন, কী ভাবছ তুমি?

আমি ভাবছি মুকুর কথা।

জানো আমিও ওই একই কথা ভাবছি। তোমার এই মেসোমশাই কেমন মানুষ পিন্টু?

সত্যি বলছি, আমি বিশেষ কিছু জানি না। কাউকে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টাও করিনি। মেসোমশাই মানে মেসোমশাই, এইটুকুই জানি। আর জানি, পেশায় আইনব্যবসায়ী, প্রচুর পয়সার মালিক।

মানুষটি তেমন সুবিধের নয় পিন্টু।

কীরকম!

কাকিমা উত্তর দিতে ইতস্তত করছেন। গাড়ি ছুটছে হুহু করে। দুপুরের রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। পথ ফুরোবার আগে উত্তর পাব কি?

বললেন না তো, কী কম সুবিধের নয়?

তুমি দেখো, ওঁর বড় বড় দুই মেয়ে, এক মেয়েকে আমি দেখিনি, মুকুকে দেখেছি। তার মানে ভদ্রলোকের বয়েস নেহাত কম নয়!

তা তো নয়ই, দেখলেই বোঝা যায়। মনে হয় পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে।

পঞ্চাশ তো হবেই, বেশিও হতে পারে। তা হলে দেখো!

কী দেখার কথা বলছেন?

তুমি আমার কাছে আর কিছু জানতে চেয়ো না। সংসারের অনেক নোংরা দিক আছে। তুমি আমার পবিত্র ছেলে, তোমাকে সেসব আমি জানতে দেব না। কাকও পাখি, চন্দনাও পাখি। একজন খোঁজে আঁস্তাকুড় আর একজন খোঁজে গাছের উঁচু ডাল। বিশ্বাস কর পিন্টু, আমার নিজের ছেলে থাকলে তাকেও আমি হয়তো এত ভালবাসতুম না। আমি রাতে তোকে স্বপ্নে দেখি। আমার কত কল্পনা! তুই বড় হতে হতে একেবারে আকাশের মতো হয়ে গেছিস। আমি কোথায় থাকব জানি না, যেখানেই থাকি, দূর থেকে শুনব তোর নামডাক। সবাই বলবে আমার পিন্টুর কথা। কত মানুষ তোর আশ্রয়ে থাকবে। তোর জীবনে রাতটাও হয়ে থাকবে দিনের মতো। কাগজে ছবি ছাপা হবে, নাম বেরোবে। সব মানুষের মুখে মুখে তোর নাম ফিরবে। ভাবতে ভাবতে আমি কীরকম পাগলের মতো হয়ে যাই, ছটফট করি মনে মনে, কেন হচ্ছে না। কেন এত দেরি হচ্ছে। সময় যে হুহু করে চলে যাচ্ছে। আমি কি দেখে যেতে পারব। কে কখন কোথায় কীভাবে থাকে। কাছ থেকে দূরে চলে যায়, দূর থেকে আসে কাছে। তোর ভাগ্য খুব ভাল পিন্টু। বটঠাকুরের মতো মানুষ হয় না। একেবারে সাধুর মতো। তোর সুখের জন্যে কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন!

কী ত্যাগ?

সে ত্যাগের কোনও তুলনা নেই। সাধারণ মানুষ যা পারে না। তোমার মেসোমশাই যা কোনওদিন পারবেন না। সেই ত্যাগ বোঝার বয়েস তোমার হয়নি। মানুষ যার জন্যে পাগলপাগল। দিন নেই, রাত নেই, ছটফট ছটফট করছে।

একটু একটু বুঝেছি।

কাকিমা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। হুহু করে বয়ে আসছে দুপুরের গরম বাতাস। কানের পাশের চুল উড়ছে। ফেরানো মুখের ওপর আলোর আভা খেলছে। বড় বড় চোখের পাতা স্থির, নিশ্চল। কপাল আর নাকের অংশ প্রোফাইলে ধরা পড়েছে। নাকছাবির পাথর ঝিলিক মেরে উঠছে মাঝে মাঝে।

এমন একজন মহিলাকে যেচে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ দিয়ে বৈধব্যের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়। রঙিন একটা জগৎ থেকে ম্লান বিমর্ষ এক জগতে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া!

কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে ফেলা ছবি
আবার নতুন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি।

জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে তা কি আর জোড়া লাগে। যা আছে, যদ্দিন আছে, যেমন আছে সেইরকমই থাক। দেখাই যাক না কী হয়। তারপর না হয় প্রশ্ন করা যাবে, কেন মরে গেল নদী/আমি বাঁধ বাঁধি তারে চাহি ধরিবারে পাইবারে নিরবধি/তাই মরে গেল নদী॥ গাড়ি হুহু করে ছুটছে। মাইলের পর মাইল পথ গিলে ফেলছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এই চলা কখনও যদি শেষ না হত।

অনেক দূরে কোথাও কোনও শিমুল গাছে তুলোর বীজ ফাটলে, একটা-দুটো পলাতক বীজ পাখা মেলে উড়তে উড়তে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে বাতাসে ভাসতে থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে অদ্ভুত একটা উড়ো চিন্তা মনের ঘরে ভেসে এল। বিলেতে একজন পুরুষ অথবা নারী বহুবার বিবাহ করতে পারে। সারাজীবন একই স্বামী বা একই স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে হবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। না পোষালেই বিবাহবিচ্ছেদ। বিপত্নীক কিংবা বিধবা হলেও আবার সংসার পাতারও কোনও বাধা নেই। তা হলে!

ছি ছি, এ আমি কী ভাবছি! মনের কোন স্তর থেকে আমার এই ভাবনার উদয়? কিছু বাজে বই পড়ে কি আমি অসম্ভব রকমের ডেঁপো হয়ে গেলুম। কেন পড়তে গেলুম লরেন্সের ‘ম্যানিফেস্টো’

...another hunger
Very deep, and revening...
redder than death, more clamorous,
The hunger for the woman...

চিন্তাটাকে যতই চেপে রাখতে চাইছি, ততই যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। যা ভাবছি, তা যদি ঘটে যায়, আমি মনে মনে ভীষণ সুখী হব। এমন একটা আলয় পেয়ে যাব, স্নেহের আলয়, যা দেহবোধে কলুষিত নয়। এ দেশের রক্ষণশীল মানুষের সে সাহসই হবে না। চরিত্র বড় আদরের বস্তু, সমমানের বস্তু। বস্তুটা আসলে কী তা জানা নেই। যদি এমন হত, আহারে চরিত্র নষ্ট হয়, তা হলে বহু মানুষ অনাহারে মারা পড়ে প্রমাণ করে যেতেন, তিনি চরিত্রবান। হিন্দু রমণীর আদর্শ সামনে রেখে কাকিমা বলবেন, ছি ছি, তা হয় না, তা হয় না। জীবন এক ধরনের লটারি। মারার সুযোগ একবারই পাবে। লেগে যায় ভাল, নয়তো দান আর বাজির টাকা দুটোই তামাদি হয়ে গেল। কাকিমাকে গ্রহণের কথা বললে তিনি আমাকে নির্ঘাত জুতোপেটা করবেন। অথচ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে পরিষ্কার বিধান দিয়ে গেছেন, স্বামী যদি নীচ চরিত্রের হন, যদি প্রবাসী হয়ে থাকেন, রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হন, খুনি হন, তিনি যদি কোনও কারণে পতিত হয়ে থাকেন, কিংবা ক্লীব, সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, তা হলে স্ত্রী অমন স্বামীকে ত্যাগ করতে পারেন। বিধবা বিবাহ চালু করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মতো রিফর্মার হিমশিম খেয়ে গিয়েছিলেন। তাও কি ঠিকমতো চালু হয়েছে। করা যায়। কিন্তু

ক'জন করেন? করলেও সমাজ আওয়াজ দেয়। কেমন একটা ব্যভিচারের ইঙ্গিতে সকলে আধ-বোজা চোখে তাকাতে থাকে।

থাক, ঘটক হয়ে আর দরকার নেই। ভাবনার রাশ টেনে রাখো। কেউ শুনলে বলবে, ছোকরার জ্ঞানের বদহজম হয়েছে। তবু মনে হয়, আমাদের বল্‌গাহীন সংসারে বল্‌গা ধরার ক্ষমতা, আমার পাশে কোলের ওপর আলতো পড়ে থাকা ওই দুটি হাতের ছিল। যে-হাতে অনধিকারীর মতো এখনও একজোড়া শাখা প্রাণদণ্ডের প্রহর গুনছে।

কাকিমা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

মেয়েছেলে হয়ে জন্মাসনি খুব বেঁচে গেছিস। আমাদের জীবন বর্ণপরিচয়ের প্রথম দুটো অক্ষরে পড়ে আছে।

তার মানে?

অ, আর আ। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আ-এ আমটি খাব পেড়ে।

কাকিমা হাসতে লাগলেন, আর আমি ভাবতে লাগলুম কথাটা অনেক অংশেই নির্ভুল। খুব ন্যায়ের কথা হচ্ছে, নীতির কথা হচ্ছে, সাহিত্য হচ্ছে, সংগীত হচ্ছে, হতে হতে শেষ কথা, চলো, তা হলে এবার একটু শোওয়া যাক। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকের গোটাকতক লাইন মনে পড়ছে, প্রমোদিনীরা সবসময় যুবকের সঙ্গী হবে। পথের পাশের লতানে গাছের মতো, সকলেরই তার ওপর সাধারণ অধিকার থাকবে। তোমার শরীর হল পণ্য, স্বর্ণের বিনিময়ে বিকিয়ে যাও। এখনকার কালে স্বর্ণ শব্দটি কেটে দাও, তার বদলে লেখো, অন্ন আর বস্ত্র।

আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। পাশাপাশি সার সার দোকান এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে গেছে। যোগমায়া বস্ত্রালয়, মহামায়া বস্ত্রালয়। সবই মায়ার খেলা। বাইরের আলোয় কাকিমাকে এর আগে এত ভাল করে দেখিনি। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি। সাদা ব্লাউজ। গায়ের রং ফরসা আর স্বাস্থ্য ভাল হলে মেয়েদের গালে অদ্ভুত একটা গোলাপি আভা খেলে। ঈশ্বর এক জীব সৃষ্টি করেছিলেন বটে, যার সবটাই নরম। মন নরম, দেহ নরম, পাউরুটির ভেতরের অংশটির মতো।

কাউন্টারে একের পর এক শাড়ি নামছে। কচি কলাপাতার রং, নীল, আরও নীল, কমলা, লাল। একটু দেখতে শুনতে ভাল কোনও মহিলা কাউন্টারে এসে শাড়ি দেখতে চাইলে দোকানদারের উৎসাহ বেড়ে যায়। পাশ থেকে শাড়ি বেরোয়, মাথার ওপর থেকে শাড়ি নামে। তিন-চারজন চার পাশ থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের মতো শাড়ি ছুড়তে থাকেন। কাকিমার নীলের ওপর একটা দুর্বলতা আছে। একটা নীল হাতে তুলে নিতেই বিক্রেতা বললেন, নীল তো পরেই আছেন, একখানা চাঁপাফুল নিন না, জমিটা খুব ভাল।

কাকিমা আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, আপনারও একটা হবে। বলেই মনটা কেমন বিষন্ন হয়ে গেল। ঠিক যেন সমুদ্রের বালিতে বাড়ি তৈরির চেষ্টা। গোটাকতক ঢেউয়ে সব চুরমার।

কাকিমা বললেন, আর দু'-একটা দোকান দেখা যাক। সেলসম্যান হতাশ হয়ে বললেন, এত দেখালুম, তাও পছন্দ হল না!

এইবার মহামায়া থেকে যোগমায়া। আরও বড় দোকান। অনেক বেশি আলো, অনেক বেশি খদ্দের।

কাকিমা দোকান দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, কিনতে হলে বড় দোকান থেকে কিনব, ভাল দোকান থেকে কিনব। জানো তো, আমার মামাশ্বশুরের বিশাল বড় কাপড়ের দোকান ছিল। বিয়ের পর থেকে কাপড়ের কথা শুনতে শুনতে, কাপড় চিনতেও শিখে গেছি।

কাকিমা আজ রাজরানির মতো হয়ে গেছেন। চেহারায়, চলনে বলনে। দুঃখের পরিবেশ ছেড়ে বেরোতে পারলেই মানুষ সুখী হয়ে ওঠে। সুখ কোথায় আছে কীসে আছে কারুর সঠিক জানা নেই। অনেকটা চোরকাটার মতো। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, হঠাৎ একসময় নীচের দিকে তাকাতেই অবাক। কাপড়ে ফিনকি ফিনকি রাশি রাশি আটকে আছে। আজ যেসব সুখের মুহূর্ত দিয়ে জীবন চলেছে, একটু পরেই চলে যাবে বহু দূরে। রেলগাড়ি যেমন ব্রিজ বা টানেল পেরিয়ে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। মাইলের পর মাইল সামনে পড়ে থাকে বৈচিত্র্যহীন দু'সার অনুভূতিহীন লৌহপথ। কেন জানি না, আজ বড় একঘেয়ে জীবন-ভাবনা আসছে মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের মতো। জীবন যদি ব্লটিং পেপারের মতো এক ফোঁটা সুখের মুহূর্তকে ধরে অনেকটা বড় করে দিতে পারত, তা হলে বেশ হত।

দুমদাম কাপড় নেমে এল কাউন্টারে। ঝলমলে রঙের বাহার। চোখে জীবনের নেশা লেগে যাচ্ছে। শাড়ির সঙ্গে সঙ্গে শরীর দেখতে পাচ্ছি। শরীরের ভেতর মন দেখতে পাচ্ছি। মায়ার বন্ধন দেখতে পাচ্ছি, যে-বাঁধনে জগৎসংসার ধুঁকছে, ফুঁসছে, ছিঁড়ছে, জোড়া লাগছে। শাড়ির রঙিন জমিতে স্বপ্ন হাঁটছে। আমি হাঁটছি, আমার পাশে মুকু হাঁটছে। সুখের হাত মেলানোয় কোনও তৃপ্তি নেই। দুঃখের সঙ্গে সুখ মিলে যখন দুঃখের চোখের জল মুছে গিয়ে মুখে হাসি ফোটে তখন মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। দেহ কিছু নয়, অভ্যাসে বাঁচাটা বাঁচা নয়। মনের সঙ্গে মন মিলে গেলে পৃথিবীটাই স্বর্গ হয়ে ওঠে!

কাকিমা শাড়ি পছন্দ করে ফেলেছেন। আমি বললুম, এবার আপনারটা। রং আমি পছন্দ করি, জমি পছন্দ করুন আপনি।

এই প্রস্তাবের পেছনে আমার একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। খুব চড়া নয়, হালকা কোনও একটা রং বেছে নেব। বলা যায় না, যদি রঙিন শাড়ি পরা বন্ধ হয়ে যায় তা হলেও যেন পরতে পারেন। সেলসম্যান বলছেন, দিদির আমার পছন্দ আছে। সেরা শাড়িটাই বেছেছেন।

কাকিমার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যেন হোমের আগুন লেগেছে মুখে।

আমি বললুম, এইবার দু'-একটা হালকা রং দেখাবেন?

দেখাতে বলে যেই পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়েছি, ভয়ে কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। এতক্ষণ সুখের যে-বুদবুদটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিল, একটি পিনের খোঁচায় যেন নিমেষে ফেটে গেল। সেই অদ্ভুত চেহারার অষ্টাবক্র লোকটি, যে আমাকে গল্প শুনিয়ে হাতঘড়িটা নিয়ে সরে পড়েছিল, কোণের কাউন্টারে পাজামা কিনছে ঝুল মেপে মেপে। পাশে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অশ্লীল একজন মহিলা। দেখলেই মনে হয়, মহিলা দেহে বেঁচে আছেন, মনে নয়।।

লোকটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছে। চোখ সরিয়ে নিলেও দেখতে পাচ্ছি, সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এখুনি আক্রমণ করবে। প্যাঁচ মারবে? এবার ধরে ফেলবে দু'জনকে একসঙ্গে। সেভাবে না তাকালেও

আমি দেখতে পাচ্ছি, লোকটি হাসছে। চোখদুটো হয়ে উঠেছে শিকারি বেড়ালের মতো। পাজামা ফেলে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

আমি কাকিমার ডান হাত মুঠোয় চেপে ধরলুম। কাকিমা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হল? কী হল তোমার!

আর সময় নেই। কাকিমার হাত ধরে টেনে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে এলুম দোকানের বাইরে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাবার মতো হচ্ছিল। কোনওক্রমে সামলে নিলুম। পেছন থেকে সেলসম্যান চিৎকার করছেন, কী হল দাদা, শাড়ি! শাড়ি নেবেন না!

লোকটি দোকানের মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখেছি আমি।

ভিড়ে গা মিলিয়ে মিশে গিয়ে কাকিমাকে হাত ধরে টানতে টানতে, ছোটাতে ছোটাতে, ট্রাম ডিপোর পাশ দিয়ে আর একটা রাস্তায় পড়লুম। লোক চলাচল কম। জনারণ্যে মিশে হারিয়ে যেতে হবে। বুঝতে না পেরে কাকিমা নানারকম প্রশ্ন করে চলেছেন। আমার জবাব দেবার অবসর নেই। এ রাস্তা ও রাস্তা করে একসময় মনে হল অনেক দূরে চলে এসেছি। আর ধরতে পারবে না, তবু সাবধানের মার নেই। সামনেই বিশ্রী চেহারার এক রেস্তোরাঁ। কলেজের ছেলেমেয়েদের প্রেম করার জন্যে পরদা-ফেলা ছোট ছোট খুপরি। একটু গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকা উচিত। বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাকিমা হাঁপাচ্ছেন।

রেস্তোরাঁর খুপরি ঘরে দু'জনে বসতেই, হাফপ্যান্ট পরা একটা ছেলে এসে ময়লা পরদাটা টেনে দিয়ে গেল। একবার ভাবলুম বলি, না, খোলা থাক, তারপর মনে হল একটু আবরু থাকা ভাল। তেলতেলে মোটা কাচের গেলাসে দু'গেলাস জল দিয়ে গেল। গেলাসটা দু'হাতে ধরে কাকিমা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল বলো তো?

কী বলি? কীভাবে বলি! একটু ইতস্তত ভাব। বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বানাতে হবে। বয় এসে ধমকের গলায় জিজ্ঞেস করলে, কী খাবেন?

কী আছে?

ছেলেটি চোখ বুজিয়ে পাখিপড়ার মতো বলতে লাগল, মোগলাই, ফিশ চপ, ফিশ ফ্রাই, কবিরাজি, মটন কারি, কষা, কোরমা, মটন কাটলেট, প্রন কাটলেট, ডেভিল..।

গড়গড়িয়ে আরও কতদূরে চলে যেত কে জানে? থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কেক আছে ভাই?

প্যাস্ট্রি আছে।

দুটো ওই আর দু'কাপ চা।

ছেলেটি ক্ষুন্ন হয়ে বললে, আর কিছু না!

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি

পশ্চিম আকাশ কাচের মতো লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য অস্ত গেল এই কিছুক্ষণ আগে। একঝাঁক পাখি মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল পশ্চিম আকাশের দিকে। যত দূরে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কে যেন একরাশ খুঁটি খেলার দানের মতো আকাশের দিকে চেলে দিয়েছে। পাখি কেন সবসময় আলোর দিকে উড়ে যায়। সূর্যকে কি অনুসরণ করা যায়। পশ্চিম আকাশের অদ্ভুত ওই সোনালি আলো একটু পরেই নিবে যাবে। এ আকাশে রাত নামল, ও আকাশে ভোর। না, অত দর্শন ভাল নয়!

নীচে থাকতে না পেরে ওপরে চলে এসেছি। মুকুরা প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। একটু পরেই গাড়ি নিয়ে আসব, ছুটবে স্টেশনের দিকে। সারাবাড়িতে এখানে-ওখানে যা কিছু ছড়ানো ছিল সব ভরে ফেলেছে বাক্সে। আমাদের যেসব জিনিস ছিল, যেগুলো লেগেছিল ওদের ব্যবহারে, সেসব জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কুলুঙ্গিতে আয়না ছিল, চিরুনি ছিল, একটা বুরুশ ছিল, চুলবাঁধা ফিতে ছিল, পাউডারের কৌটো, মেসোমশাইয়ের শেভিংসেট ছিল। সব অদৃশ্য হয়েছে, পড়ে আছে নিঃসঙ্গ ব্রাশ। কেমন যেন লাগে। কাঁদতে ইচ্ছে করে। একটু আগেও তারে সার সার কাপড় ঝুলছিল। সব যেন ভোজবাজি হয়ে গেছে, হাওয়ায় উড়ছে সাদা একটা গামছা।

মানুষের জীবন কিছুতেই পূর্ণ হতে চায় না, কেবলই শূন্য হয়ে যায়!

এই ছাতে কত কী ঘটে গেল। কত রাতে আমি আর কনক পাশাপাশি বসে থেকেছি। ক্ষয়া চাঁদ দেখেছি, পূর্ণ চাঁদ দেখেছি। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছে। কনকের শাড়ির আঁচলে দুজনে একসঙ্গে মাথা ঢেকেছি। তখন মনে হয়েছিল, এইসব মুহূর্ত বুঝি রাজার মাথার উষ্ণীষের হিরা, চুনি, পান্নার মতো, যতদিন বাঁচব ততদিনই মাথায় থেকে যাবে। কোথায় কী! মালা ছিঁড়ে মানিক পড়ে গেল কালের স্রোতে। ভাসতে ভাসতে চলে গেল। দূর থেকে দূরে! আর ফিরবে না। স্মৃতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে। নতুন স্মৃতির পলি পড়বে। কোনও একদিন যক্ষের মতো কোনও এক নির্জন ঘরে সিন্দুকের ডালা খুলব। ক্যাঁচ করে শব্দ হবে। ভেতরে দেখব থরে থরে সাজানো আমার জীবনের মৃতঝরা মুহূর্ত। মাকড়সার ঝুলে ঢাকা, ধূসর। তখন আমি বৃদ্ধ; হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে। চুল সাদা। চোখদুটো মৃত মাছের মতো। এই তো মানুষের জীবন, মানুষের নিয়তি। এই পথেই সকলকে চলতে হবে। বর্তমানের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে না পারলে, অতীত বড় কষ্ট দেয়। সোনার হরিণ সামনে ছেড়ে পেছন পেছন ছুটে চলো। রোজই দাও নতুন নেশা।

প্রতি পদক্ষেপে গন্তব্যের সুদূরতা আমার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, আমার চলাকে পেছনে ফেলে জনশূন্য বনভূমি এগিয়ে চলে আরও জোরে।

দুঃখের দিনে গালিবকে বড় ভাল লাগে, হর কদম দূরী-এ মনজিল হৈ নুমায়াঁ মুঝ-সে;/মেরি রফতার-সে ভাগে হৈ বয়াবাঁ মুঝ-সে॥

শেষের ক'টা দিন মুকুও এই ছাতে এসেছে। আলসেতে বসেছে। কত কথা হয়েছে। জীবনকথা। রাত বেড়ে গেছে। পেটা ঘড়ি বেজেছে। মাঝরাতে অদ্ভুত একটা ভৌতিক বাতাস ওঠে, প্রকৃতি ছমছম করতে থাকে। দু'হাত দূরে বসে-থাকা মুকুকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হতে থাকে। মধ্যরাতে মানুষ কেমন যেন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। এই ছাদে আমি কাল আসব, পরশু আসব, তার পরের দিন আসব, আসব একা, পাশে কেউ থাকবে না। যত দিন যাবে স্মৃতি ততই পুরনো হতে থাকবে। কালের হাত ধরে এরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সমুদ্রে জাহাজ যেমন হারিয়ে যেতে থাকে। সব শেষ মাস্তুলের ডগাটিও চলে যায় দৃষ্টিপথের বাইরে। সমুদ্র পড়ে থাকে ঢেউ নিয়ে, ফেনরাশি নিয়ে। মানুষের তিনটি অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী, আকাশ বাতাস আর শূন্যতা। এই তিনটিকে কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারবে না।

আকাশের সোনালি আগুন নিবে গেছে। গোলাপি পেখম মেলে রাত উড়ে আসছে। বন্ধু কাঁদতে দাও, শোনো, তিরস্কার কোরো না, হৃদয়ের দুঃখভার কখনও তো খালি করতে হবে। রোনে সে ওই নাদিম সলামত ন কর মুঝে। আখির কভি তো অকদএ দিল বা করে কোই॥

খসখস শব্দে পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখি মুকু দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল ছাত এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। পশ্চিমে গাছগাছালি ভরা বিশাল এক ভূখণ্ড ক্রমশ ঢালু হতে হতে নেমে গেছে গঙ্গার কূলে। দূরে অন্ধকার আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে মন্দিরের ত্রিশূল। গাছের মাথায় মাথায় অন্ধকার নেমে আসছে ডানা-মোড়া পাখির মতো। উনুনের ধোঁয়া কিছু দূর উঠেই বাতাসে থমকে গেছে।

মুকু আমার দিকে দু'পা এগিয়ে আসতেই চার পাশে সন্ধ্যার শাঁখ বেজে উঠল। দিন ঘুমিয়ে পড়ল রাতের কোলে। মুকু কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। শরতের একখণ্ড মেঘ থেকে চাপা একটা আলো এসে পড়েছে মুখে। চোখদুটো যেভাবে চকচক করছে, তাতে মনে হচ্ছে সামান্য জল এসেছে। মুকু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনও কথা নেই মুখে। অনেক সময় না-বলা কথা বলা-কথার চেয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের এমন অনেক ভাব আছে যা কথা দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। ভোরের মতো সন্ধ্যার অস্বচ্ছ আলোয় উন্মুক্ত এই ছাদে মুকুর শেষবারের মতো দাঁড়ানো। মুহূর্তের নদীতে একই জলে মানুষ দু'বার স্নান করতে পারে না। মুকু কী বলছে আমি জানি,

খেলার খেয়াল বশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাত বেলায়
তুলে নিয়ে তোমাদের প্রাণের খেলায়

মুকু ধরাধরা গলায় বললে, আমার একেবারেই যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বললুম, সময় হয়ে এল, একটু আগে বেরোনোই ভাল।

মুকু আরও ধরাগলায় বললে, কাল তোমরা থাকবে, আমি থাকব না।

আমি বললুম, সব গোছগাছ হয়ে গেছে? কিছু পড়ে নেই তো? একবার ভাল করে সব দেখে নিয়েছ?

মুকু বললে, কতদিন লাগবে তোমাদের ভুলতে!

আমি বললুম, তোমরা এসেছিলে দু'জন, ফিরে যাচ্ছ একজন।

মুকুর গলায় এবার কান্নার শব্দ, দিদি রইল, পারো তো খুঁজে বের কোরো। যদি দেখা হয় বোলো মুকুকে যেন ভুল না বোঝে।

মুকু সারা ছাতটা একবার ঘুরে এল। ছাতে এলেই কনকের একটা নিজস্ব বসার জায়গা ছিল। ফুলগাছের টবের পাশে সেই বসার জায়গায়, মুকু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে, কারুর সমাধির সামনে মানুষ যেভাবে দাঁড়ায়।

মুকুর পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললুম, এবার চলো।

মুকু সামনে ঝুঁকে ছিল। দুটো হাত ছিল সামনে জোড়া হয়ে। কথা শুনে মুকু সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিশ্বাস নেবার চেষ্টায় শরীর টানটান হল। খুব মৃদু গলায় বললে, তুমি যদি আমাকে রাখতে পারতে পিন্টু! চিরকালের জন্যে এখানে যদি আমাকে রাখতে পারতে!

মুকু আমার কাঁধের ওপর ভেঙে পড়ল। আমার খুব অবাক লাগছে, এতদিন পরে বাড়ি ফিরছে, কোথায় আনন্দে মন যাই যাই করবে। পরবাস থেকে নিজবাসে ফিরে চলার আনন্দ নেই। তা হলে এ বেদনা কীসের? মুকু আমার কাঁধে মাথা রেখে বারেবারে বলতে লাগল, তুমি পারলে না, পারলে না, পারবে না, পারবে না।

কেমন যেন নেশাচ্ছন্নের মতো লাগছে। কে যে কখন কত আপন হয়ে যায়। মুকু দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, তুমি তুমি তুমি তুমি!

আমি দাঁড়িয়ে আছি বেওকুফের মতো। যে-কোনও কথাই এই আবেগের কাছে বড় খেলো হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে মানুষের মনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশ কথায় সম্ভব হয় না, চোখের জলে হয়তো কিছুটা হয়, ঠোঁটের হাসিতে হয়তো হয়, চোখের দৃষ্টিতেও হতে পারে। শব্দ শব্দের সীমা ছাড়াতে পারে না। যে-আর্তনাদ মুখে ফোটে না, সে আর্তনাদ বুকে দাগ কেটে বসে। যে-জল সমুদ্রে পথ পায় না সে জল শুষে নেয় মাটি। সিনে কা দাগ হৈ বহ নালা কা লব তক নগয়া/খাক কা রিজক হৈ বহ কতরা জো দরিয়া ন হুআ॥

বিদায় ছাত বলে নীচে নামার মুখে সিঁড়িতে কাকিমার সঙ্গে দেখা হল, তোমাদের ডাকতে যাচ্ছিলুম। ওঁরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

কাকিমা অবাক হয়ে মুকুর দিকে তাকাচ্ছেন। আমাদের চেয়ে মুকু যেন বেশি বিচলিত হয়ে পড়েছে। চাপা স্বভাবের মানুষের এই এক সমস্যা। প্রথমে কেউ তাদের চিনতে পারে না, ধরতে পারে না, যখন পারে তখন সে চলে যায় ধরার বাইরে।

এতক্ষণ ছাতে ছিলুম। সোনার বরণ আকাশ থেকে আঁধার আকাশ হয়ে তারার আলো গায়ে মেখে নীচে নেমে এসে বিদ্যুতের আলো কেমন যেন অস্বাভাবিক হলুদ হলুদ লাগছে। মনে হচ্ছে সব ন্যাবা হয়েছে। বড়ঘরে কাকিমা দুটি আসন পেতেছেন। মুকু আর মেসোমশাই খেয়ে যাবেন। এ বাড়িতে তাদের শেষ আহার। কাকিমার যেন কোনও ক্লান্তি নেই। দুপুরে কম ছুটোছুটি হয়েছে!

সেই নোংরা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে চোরের মতো আমরা আবার সেই শাড়ির দোকানে ফিরে এসেছিলুম। দোকানের সেলসম্যান প্রশ্ন করেছিলেন, তখন কী হয়েছিল বলুন তো। অমন করে পালালেন কেন?

রেস্তোরাঁয় বসে বসে উত্তর একটা কাকিমার জন্যে তৈরিই করে ফেলেছিলুম, তারই একটা অংশ কাজে লেগে গেল। বললুম, একজন চেনা ভদ্রলোককে দেখে পালাতে হয়েছিল।

সেলসম্যানের চোখেমুখে কেমন যেন একটা সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এসেছিল। কাকিমার মুখের দিকে বারেবারে তাকাতে লাগলেন। জানি কী ভাবছিলেন। অবৈধ প্রণয়-ট্রনয়ের কথা নিশ্চয়ই। মন এমন জিনিস। সেই মুহূর্তে কেন জানি না নিজেকে বেশ ভাবুক ভাবুক লাগছিল। কাকিমাকে গল্পটা অবশ্য বেশ গুছিয়ে বলতে পেরেছিলুম। অফিসে শরীর খারাপ বলে ছুটি নিতে হবে তো, তাই অফিসের চেনা লোক দেখে অমন দুদ্দাড় করে পালিয়েছিলুম। গল্পে অবশ্য অনেক ফাঁক ছিল। কাকিমা যদি প্রশ্ন করতেন, উনিও কি ছুটিতে আছেন। তা হলে আবার আমাকে আর একটা কিছু ভাবতে হত।

কাকিমা বললেন, তুমি আর বটঠাকুরও কিছু খেয়ে নাও, আসতে রাত হবে তো!

আমরা কত বেলায় খেয়েছি, আপনার খিদে পেয়েছে?

আমার ক্রমশই পেট ফুলছে।

তা হলে? আপনি বরং বাবাকে কিছু খেতে দিন।

উনি খাবার কথা শুনলে বিরক্ত হন।

তা হলে থাক।

দু'জনে প্রথামতো আহারে বসলেন। মেসোমশাই যদিও দু'-একখানা খেলেন, মুকু স্রেফ খেলা করে গেল। কাকিমা অবশ্য করেছিলেন অনেকরকম। নানা ধরনের লোভনীয় পদ। এই অল্প সময়ে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় আর কাউকে না পারুন আমাকে চমকে দিয়েছেন।

পিতা ঘড়ি দেখলেন। আমাকে বললেন, যাও এবার বেরিয়ে পড়ো, একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুদূর গিয়েই দেখি উলটো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। রংটা বেশ চেনাচেনা। সামনে একটা ঠ্যালা পড়ায় গাড়িটা আস্তে আস্তে আসছে। পেছনের আসনে মাতুল বসে আছেন। সেই পরিচিত ভঙ্গি, গালের ওপর একটি আঙুল। দোকানের আলোয় অনামিকার আংটির পাথর জ্বলছে। শুনেছি পাথরটা হিরে।

মাতুল আমাকে দেখতে পাননি। ভাব কি ভাবনা জানি না, বিভোর হয়ে বসে ছিলেন। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মামা বলে ডাকতেই চমকে উঠলেন। মুহূর্তের বিস্ময় কেটে যেতেই মুখে খেলে গেল সেই ছেলেমানুষি হাসি। মাতুলের মধ্যে একটি শিশু লুকিয়ে আছে। মাঝে মাঝেই ছুটে ছুটে বেরিয়ে আসতে চায়।

জিজ্ঞেস করলেন, চললি কোথায়?

একটা গাড়ি ডাকতে।

কেন গাড়ি কী হবে?

মেসোমশাইরা স্টেশনে যাবেন, আজ চলে যাচ্ছেন।

মাতুল দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আয়, উঠে আয়। গাড়ি ডাকতে হবে না, আমি পৌঁছে দেব। আসনে বসতেই মাতুল বললেন, কীরকম সময়ে এসে পড়েছি বল? জাস্ট ইন টাইম।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই, জানলায় একটা মুখ উঁকি মেরে সরে গেল। মাতুল সিঁড়ি ভেঙে আগে আগে উঠছেন, আর হেঁকে হেঁকে বলছেন, গাড়ি আ গিয়া হুজুর।

গলা পেয়ে পিতা বেরিয়ে এসেছেন সিঁড়ির মুখে, আরে, জয় তুমি! আনএক্সপেক্টেড। এ যেন মেঘ না চাইতে জল।

মাতুল বললেন, তাই কি! আমার মনে হল, আপনি আমাকে ডাকছেন।

তুমি বুঝতে পেরেছিলে?

তা না হলে এলুম কেন?

বুঝলে, সেদিন তুমি চলে যাবার পর ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। আমি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি, মনে হয় তোমার খুব কাজে লাগবে।

আপনার আগেই কিন্তু আমি একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি।

তাই নাকি, তাই নাকি?

পিতা ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, ঠিক আছে পরে শোনা যাবে। আমি জানতুম, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। তা হলে চলো এঁদের আমরা পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার অসুবিধে হবে না তো!

কাল হলে অসুবিধে হত। আজ আর কী অসুবিধে!

মাতুলের এই কথার মধ্যে কীসের একটা ইঙ্গিত রয়েছে। পিতা তেমন খেয়াল করলেন না, আমার কানে কিন্তু লাগল।

সামান্যই জিনিসপত্র। হাতে হাতে উঠে গেল গাড়িতে। কাকিমা কোথা থেকে বিভিন্ন মাপের কৌটো জোগাড় করে গরম লুচি, আলুমরিচ, সন্দেশ, এমনকী একটা শিশিতে আচারও ভরেছেন।

মাতুল মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমার জন্যে যেন একটু থাকে বউদি, আমি ফিরে আসছি।

কাকিমার মুখটা মাঝে মাঝে কেমন যেন মেরী মাতার মতো হয়ে ওঠে। মুখচোখ সব কিছু চুঁইয়ে অদ্ভুত একটা স্নেহের ধারা নেমে আসে। এখন অত ভাবার সময় নেই, পরে ভাবা যাবে।

কাকিমা বললেন, আজ তো আমার রান্না দেবতার ভোগ হয়ে গেল, আপনি এলেন। সব রাখা আছে, ভালয় ভালয় ফিরে আসুন।

সব প্রস্তুত। সময় যেন হেঁকে বলছে, চলে এসো।

মুকু কোথায়! দেখো দেখো মেয়েটা আবার কোথায় গেল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

মুকু দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণের নির্জন ঘরে। যে-ঘরে এতদিন তারা থেকে ছিল। রাতের পর রাত মুকুর সেই অনন্ত লেখাপড়া। মেসোমশাইয়ের পড়ানো। জীবন যে-ঘরে ছড়িয়ে ছিল এখন তা আবার গুটিয়ে গেছে। শূন্য ঘরে কণ্ঠস্বর এক ধরনের প্রতিধ্বনি তোলে।

মুকু বলে ডেকে নিজেই চমকে উঠলুম। নিজের গলা নিজের বলা নিজের কাছে ফিরে এলে যা হয়। মুকু দাঁড়িয়ে ছিল আমার মায়ের ছবির সামনে। অবাক কাণ্ড! ডাক শুনে চমকে নয়, ধীরে ফিরে তাকাল।

মুকু, এবার চলো, ট্রেনের সময় হয়ে যাবে।

হ্যাঁ যাই।

মুকু আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার চোখের ওপর তার স্থির পরিষ্কার দৃষ্টি। ঠোঁট দু'বার কাঁপল, তিনবারের বার শব্দ বেরোল, আমি তা হলে যাই।

নিচু হয়ে প্রণাম করার চেষ্টা করছিল, হাতদুটো ধরে ফেললুম। প্রণাম নেবার একটা বয়েস আছে। যখন আর কিছু নেবার থাকে না মানুষ তখনই প্রণম্য হয়ে ওঠে। মুকুর হাত সেই যে ধরেছিলুম ছাড়লুম এসে সদরে। কাকিমা মুকুকে দু'হাতে বুকে চেপে ধরে চাটনি খাওয়ার শব্দ তুলে অমোচন করতে লাগলেন। পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দু'জনেই ফুলে ফুলে উঠছেন।

আর সময় নেই, এবার চলে এসো। কালের হুংকার।

দু'পা এগিয়ে এসে কাকিমা মুকুকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। একে একে সবাই গাড়িতে উঠছেন। মেসোমশাই উঠতে উঠতে বললেন, আপনাদের ওপর যথেষ্ট উৎপাত করে গেলুম, ক্ষমা করবেন। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বের করে কাকিমাকে বললেন, আসি তা হলে? বলার সময় মুখে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল। হাসির প্রলেপ মাখিয়ে মেসোমশাই বললেন, ভুলব না কোনওদিন।

কাকিমার মুখ দেখে মনে হল ভীষণ ভয় পেয়েছেন। কেউ কিছু ভুলতে চান, কেউ কিছু মনে করিয়ে দিতে চান, কারুর স্মৃতিতে আনন্দ, কারুর বিস্মৃতিতে আনন্দ। কী বিচিত্র এই পৃথিবী!

পেছনের আসনে পিতাকে বসাবার জন্যে মাতুল ঝুলোঝুলি করছেন।

পিতা বললেন, ভাবছি আমি আর যাব না, তোমরা তো রয়েইছ।

মাতুল বললেন, বাঃ, আপনাকে গাড়িতে একবার তুলব বলেই আমার আজ আসা।

তার মানে? সে আবার কী? হঠাৎ তোমার এমন উদ্ভট ইচ্ছে হল!

আজই যে শেষ দিন। অদ্যই শেষ রজনী।

কথা না বাড়িয়ে পিতৃদেব পেছনের আসনে বসলেন। মানুষের কথায় অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে, গুটোনো টেপের মতো, দেখতে ছোট্ট এতটুকু, খুলতে শুরু করলে ফুটের পর ফুট কাহিনি বেরোতে থাকবে। সামনের আসনে আমি আর মাতুল বসলুম। গাড়ি ছেড়ে দিল। চাপা স্বরে সকলে বললেন, দুর্গা দুর্গা।

এতক্ষণের ছড়ানো ছত্রাকার জিনিস বেশ যেন গুছিয়ে উঠেছে। গাড়ির এই স্বল্পপরিসরে সব কাহিনি বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে। যাওয়া আর থাকা দুটো দিকই গতিশীল, এর মাঝে মাতুল এক রহস্যের উপাদান। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালুম। আমাদের সদরে সাদা শাড়ি পরে কাকিমা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ মনে হল অত বড় একটা ভুতুড়ে বাড়িতে কাকিমাকে একা পাহারায় রেখে আসা কি ঠিক হল? যতক্ষণ আমরা না ফিরছি ততক্ষণ কী বিশ্রী লাগবে! একেবারে ফাঁকা। শুধু বিশাল এক গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ির পদচারণের শব্দ!

পিতা মেসোমশাইকে ছোটখাটো নানারকম পরামর্শ আর আশ্বাস দিতে লাগলেন। গিয়েই একটা পৌঁছোনো-সংবাদ পোস্ট করে দেবেন, ভুলবেন না। মেসোমশাই হ্যাঁ বলতে পারতেন, বললেন না। আইনের

লোক বললেন, চিঠি লেখার অভ্যাস আমার তেমন নেই, ওই মেয়েকে বলব, সেই একটা পোস্ট করে দেবে।

পিতা বললেন, ওদিক থেকে আপনি চেষ্টা চালান, এদিক থেকে আমরাও চালাই। কনককে যেমন করেই হোক ট্রেস-আউট করতে হবে।

মেসোমশাই বললেন, আপনাদের কী-ই বা করার আছে!

মেসোমশাইয়ের জবাবে গা জ্বলে জ্বলে উঠছে, আচ্ছা ঠোঁটকাটা লোক তো! পিতা প্রসঙ্গ পালটে মাতুলের সঙ্গে কথা শুরু করলেন, তোমার গাড়িটা বেশ কমফর্টেবল্ হে! চলো, একদিন দূরে কোথাও ঘুরে আসা যাক!

তা হলে আজই চলুন। কাল আর এ গাড়ি থাকবে না। আজই আমার গাড়ি চাপার শেষ দিন। আজই আমাদের লাস্ট রাইট টোগেদার।

হঙ্ক হঙ্ক, হর্নের শব্দে মাতুলের কথা চাপা পড়ে গেল। শিস দিয়ে ট্রাম চলেছে।

Lead us not into temptation
but deliver us from evil.

আটটা বেজে দু'মিনিটে ট্রেন ছাড়বে। এখনও সময় আছে। হুইলারের স্টলে দাঁড়িয়ে মাতুল ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছেন। চারপাশে লোকজন ছোটাছুটি করছে। ঝাঁকা ঝাঁকা ফজলি এসেছে মালদা থেকে। প্ল্যাটফর্মে পড়ে আছে। নীল পোশাক পরা রেলের একজন কর্মচারী লম্বা একটা কাগজে পেনসিলের টিক মেরে চলেছেন। মাথায় বিরাট বিরাট বোঝা নিয়ে পোর্টাররা ছুটছে। পেছন পেছন তাল রেখে চলার চেষ্টা করছেন এক একটি পরিবার। এইসব কালা আদমিদের মাঝখানে, প্ল্যাটফর্ম আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন এক সায়েব দম্পতি। সায়েবের বুকের কাছে ঝুলছে ছোট্ট একটি ক্যামেরা। মুকু, মেসোমশাই আর পিতৃদেব দাঁড়িয়ে আছেন কিছু দূরে ঘড়ির তলায়। এই বিপুল ব্যস্ততার মাঝে মানুষ কিছুই আর ভাবতে পারে না। গতির চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তাই আসে না। এখানে এলেই মনে হয় যেতে হবে, যেতে হবে। বেরিয়ে পড়েছি, একটা কোথাও যেতে হবে।

মাতুল বললেন, এই দেখ আমার ছবি বেরিয়েছে।

একটি সিনেমা পত্রিকার পাতায় মাতুলের ছবি। পাশে আরও দু'-তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সুন্দরী চিত্রা দেবী। আর একজন মানুষ দু'জনের কাঁধের ফাঁক দিয়ে মুন্ডুটা সামনে বের করে চোখ আর মুখের এমন একটা ভাব করেছেন, দেখলেই হাসি পায়। মাতুল বললেন, চিনিস না? এঁর নাম নবদ্বীপ হালদার।

চতুর্দিকে এঁর গলা শুনেছি। সময় সময় একটু ভালগার মনে হলেও, সেরা কমেডিয়ান। মাতুল আর একজনকে দেখিয়ে বললেন, এঁকে চিনিস?

আজ্ঞে না।

সেকী রে! ইনি হলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

মানুষটিকে ভাল করে একবার দেখার ইচ্ছে হল। গানে গানে পাগল করে রেখেছেন। আজ দুপুরেই শুনেছি—বাঁকা ভুরু মাঝে আঁকা টিপখানি, আঁখি হিল্লোলে মরিমরি, কী ছাঁদে বেঁধেছ কবরী। যেমন কণ্ঠ তেমনি আবেগ। আমাদের পাড়ায় বিশাল এক ফাংশনে এসেছিলেন। প্যান্ডেলে যাঁরা ঢুকতে পারেননি, এইরকম কয়েক হাজার শ্রোতা দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে বসেছিলেন। শিল্পীর এমনই জনপ্রিয়তা, মাইকে যেই বললেন, আমার অনুরোধ, গান শোনার জিনিস, দেখার নয়, আপনারা শান্ত হয়ে বাইরে থেকেই শুনুন, অমনি সব গোলমাল থেমে গেল।

মাতুল কাগজটা কিনলেন। মুকুর জন্যে কিনলেন শার্লক হোমসের হাউন্ডস অফ বাস্কারভিল। মাতুলকে হঠাৎ কেনায় পেয়ে বসল। লজেন্স, চকোলেট, মুসাম্বি, চোখে যা পড়ছে সবই কিনছেন, শেষে একটা ব্যাগ কিনে সব ভরে ফেললেন।

বোঝার আয়তন দেখে মুকু কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। বলা উচিত নয়, মেসোমশাই কৃপণ না হলেও বেশ হিসেবি। মেয়েকে কখনও কোনও উপহার কিনে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ মানুষ উপহার পেতে ভালবাসে। মেয়েরা আরও বেশি।

পিতা বললেন, বেশ করেছ। এসব ব্যাপারে তোমার কোনও তুলনা হয় না। তোমার মনটা হল রাজপথের মতো।

ভসভস শব্দ করতে করতে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে লাগল। শুরু হয়ে গেল প্রাথমিক খণ্ডযুদ্ধ। আমাদের চিন্তা নেই, রিজার্ভেশন আছে। অবস্থা মোটামুটি আয়ত্তে আসতেই মেসোমশাই বললেন, এবার তা হলে এগোনো যাক। মিনিট দশেক আর সময় আছে।

কম্পার্টমেন্টের বাইরে নামের লিস্ট আর টিকিট নম্বর ঝুলছে। সেই দেখে মেসোমশাইদের স্থান খুঁজে নিতে অসুবিধে হল না। সহযাত্রীদেরও বেশ ভাল বলেই মনে হল। উলটো দিকের বার্থে স্বামী-স্ত্রী। চাকরি নিয়ে বিদেশে চলেছেন। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীই বেশি চটপটে। তাঁদের মাথার ওপর একজন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। মেসোমশাইয়ের মাথার ওপর একজন যুবক। যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি সুরূপ। চা বাগানের মালিক। কলকাতায় এসেছিলেন বন্দুকের কার্তুজ কিনতে, আর নতুন একটা গাড়ি বুক করতে। সঙ্গে এক পাঁজা ঝকঝকে ভাল ভাল বই সংস্কৃতির পরিচয় দিচ্ছে। মাতুলের সঙ্গে পরিচয় বেরিয়ে গেল। ছেলেটির মা আর মাতুল একই গুরুর কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন। ছেলেটি ভদ্রতা জানেন। পরিচয় বেরিয়ে পড়তেই মাতুলকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

চাকরেবাবুর স্ত্রী আড়ে আড়ে মাতুলকে দেখছিলেন। না দেখে উপায় নেই। এমন খাপ-খোলা তরোয়ালের মতো চেহারা সহজে চোখে পড়ে না। হিংসে করার মতো অভিজাত চেহারা। আমার মাতামহেরই কৃতিত্ব। রক্তের ধারায় গন্ধর্ব আর কিন্নরের বীজ ঘুরছে।

যা ভেবেছিলুম তাই, মেসোমশাই যুবকটিকে লুফে নিলেন। সারাটা পথ কবজা করার চেষ্টা করবেন। স্বার্থ-সিদ্ধি করতে গিয়ে বড় মেয়েটিকে খুইয়েছেন। হয়তো পড়েছেন, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। লোভ জাগলে সে কথা আর মনে থাকে না। মানুষ নামক প্রাণীর এইটাই মনে হয় স্বধর্ম। ভুল, আবার ভুল, ভুলের ওপর ভুল, অবশেষে সেই স্তূপ চাপা পড়ে মৃত্যু।

গার্ডের বাঁশি বেজে উঠল। আচ্ছা আসি, সাবধানে যাবেন, মাকে আপনার কথা বলব, গিয়ে চিঠি ইত্যাদি মিলিত মিশ্রিত কথার স্রোত ঠেলে আমরা প্ল্যাটফর্মে নেমে এলুম। সেই মহিলা তখনও মাতুলের দিকে ‘সতৃষ্ণ নয়ন’ বলে যাকে, সেই চোখে তাকিয়ে আছেন। ওঁর স্বামীটির জন্যে বড় বেদনা হল। সংসারকে জ্ঞানীরা এমনিই বলছেন—ধোঁকার টাটি, মাতুলের মুখে কবীরের ভজন শুনেছি, কঙ্কর চুন চুন মহল বানায়া, লোভ কহে ঘর মেরা, না ঘর মেরা, না ঘর তেরা, তারপর ভুলে গেছি। সেই সংসারী মানুষ যদি এমন স্ত্রীর সঙ্গে ঘর

বাঁধেন, যাঁর আঁখিপাখি খাঁচা-ছাড়া, তাঁর অবস্থা কী হবে! বসে থাকতে হবে পথ চেয়ে। যৌবনের পালক ঝরে গিয়ে স্ত্রী যতদিন না রোঁয়া-ওঠা শালিক হচ্ছেন ততদিন বালুকাবেলায় বসবাস।

মুকু ইশারায় জানলার কাছে সরে আসতে বলল। ট্রেনের শেষ পতাকা গার্ডের কামরার কাছে দোল খাচ্ছে। পাশের কম্পার্টমেন্টের জানলার কাছে একটি শিশু মায়ের কোলে ঝিঁকি মেরে মেরে কাঁদছে আর চিৎকার করছে, বাবা বাবা। মেয়েটির বাবা জানলা দিয়ে হাত বের করে ক্রমান্বয়ে নাড়ছেন। ড্রাইভারে আর গার্ডসায়েবে পতাকায় পতাকায় কথা হচ্ছে, ভেঙে দে, ভেঙে দে, মিলনমেলা ভেঙে দে। আর সময় নেই। ইঞ্জিনে গতির টান লেগেছে। কী আশ্চর্য! মুকু কিছু বলছে না কেন?

বলো, কিছু বলো।

মুকু বললে, বাড়ি গিয়ে মায়ের ছবির পেছনটা একবার দেখো।

ট্রেন ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছে। মুকু চট করে আমার হাতের মুঠোয় একটা চিরকুট গুঁজে দিল। গতির টানে হাত থেকে হাত খুলে গেল। মুকু আমার হাতে কী গুঁজে দিল, দেখতে গিয়ে যেই মুঠো খুললুম, চলমান ট্রেনের নিশ্বাসে একটুকরো কাগজ উড়তে উড়তে ট্রেন আর প্ল্যাটফর্মের খাঁজে ঢুকে গেল।

পেছন থেকে পিতা আর মাতুল বলছেন, চলে এসো, চলে এসো।

কথা আমার কানে ঢুকছে না। লাইনে আর অপসৃয়মান সরীসৃপের চাকায় চাকায় ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে। দূরে ইঞ্জিনে তাল ধরেছে, ভেঙে যায় চুরে যায়, ভেঙে যায় চুরে যায়। হাত নেড়ে বললুম, যাচ্ছি।

ঠ্যাঙা গার্ডের কামরা, এক জোড়া নুলো হাতের মতো বাফার আর লাল আলো নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য প্ল্যাটফর্ম আর অনেক নীচে জোড়া জোড়া লাইন। রত্ন হারিয়ে মানুষ যে-চোখে তাকায় সেই চোখে পাতা লাইনের দিকে তাকালুম, যদি পাই লাফিয়ে পড়ব। কোথায় কী! এক টুকরো কাগজের বদলে অসংখ্য টুকরো পড়ে আছে। পড়ে আছে কলার খোসা, ডাবের খোলা, তেল কালি, কয়লা ছাই।

কাঁধে হাতের স্পর্শ। মাতুল বললেন, চলে আয়। স্মৃতি লাইনে কেউ ফেলে যায় না, রেখে যায় মনে। কত যাবে, কত আসবে, মন খারাপ করলে চলে! ভাবকে চেপে রাখবি মনে, তবে সে ঠেল মারবে সৃষ্টিতে!

মাতুল বীরের মতো বলছেন বটে, কিন্তু তাঁরও চোখদুটি ছলছল করছে। চশমার কাচে আলো পড়লেও দেখা যাচ্ছে। মাতুল শিল্পী মানুষ, তিনি সৃষ্টির কথা বলতে পারেন, আমার তো সবই অনাসৃষ্টি।

এসেছিলুম পাঁচ জন। ফিরে চলেছি তিন জন। ঘটনা প্রতি মুহূর্তেই জীবনের সার কথা বলে যেতে চায়। পাগল ছাড়া কেউ বোঝে না। আমাদের মণিপাগলি বেশ বলে, সুর করে গায়, আমার দিন থাকে না, আমার রাত থাকে না। আমার প্রাণ থাকে না, আমার মান থাকে না। তারপর মার্চিং সঙের মতো ধমকে ধমকে বলতে থাকে, দশ, নয়, আট, সাত, ছয়, পাঁচ, চার, তিন, দুই, এক, শূন্য, ফক্কা ফাঁক।

মাতুল পিতাকে বললেন, চলুন, আজ আপনাকে সারা কলকাতা ঘোরাব। এমন সুন্দর রাত! দখিনা বাতাস বইছে।

কলকাতায় কী ঘুরবে! শুধু শুধু সময় নষ্ট। চলো বাড়ি ফিরে যাই।

কাল তো রবিবার! ভয় পাচ্ছেন কেন? অদ্যই শেষ রজনী। কাল তো আর গাড়ি থাকবে না। কলকাতার শনিবারের রাত দেখে নিন। কতদিন পরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে! আপনি আমার পিতার মতো,

নেকস্ট টু মাই ফাদার!

তোমার কথায় আজ বড় বৈরাগ্যের সুর বাজছে। ব্যাপারটা কী বলো তো! তখন বললে পথের সন্ধান পেয়েছ, সমস্যার সমাধান করে ফেলেছ। খুলে বলো তো!

মাতুল চালককে বললেন, পার্ক স্ট্রিট চলো। তারপর পিতাকে বললেন, সহজ সমাধান। সিম্পল সলিউশন। ছবিটা যে-অবস্থায় আছে, সেই অবস্থাতেই পড়ে থাক। গাড়িটা বেচে দিয়েছি। সেই টাকায় ছোটখাটো দেনা শোধ। আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

সে কী? চাকরি! দাসত্ব তোমার মেজাজে ধরবে না। তুমি রজোগুণী মানুষ!

চাকরিটা একটু অন্যরকম, তাই সাহস করে নিতে পেরেছি। টিসকোর একটা মিউজিক কলেজ আছে। সেই কলেজে প্রিন্সিপ্যালের চাকরি। মনে হয় দশটা-পাঁচটার ব্যাপার নয়। মাইনেও ভাল। যদি কিছু টাকা জমাতে পারি, যদি একজন ফাইনান্সার পাই, ছবিটা শেষ করব। যদি হিট করে, এক সপ্তাহে টাকা উঠে আসবে, তখন বাড়িটার মর্টগেজ ছাড়াব। গয়না উদ্ধার করব। এক মাস যদি রমরম করে চলে, মধুপুরের বাড়িটার সংস্কার করব, নতুন আর একটা ছবি করব।

সবই ভাল, তবে কী জানো, বড় বেশি যদি রয়েছে। যদিগুলোকে যদি বাদ দিতে পারতে!

আজ্ঞে টাকার অভাব হলেই যদি আসবে। একমাত্র টাকাতেই যদির উৎপাটন সম্ভব! টাকাই হল সুপ্রিম ডেনটিস্ট!

তোমার বুঝি সেইরকম ধারণা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। টাকা হল জার্মান ট্যাঙ্কের মতো, গড়গড়িয়ে চলে।

খুব ভাল ধারণা হে! এই তো একজন মানিড ম্যানকে আমরা সি-অফ করে এলুম। তিনি কি সুখী! টাকা তাঁর জীবন-সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে? পারেনি। একটা মজার ইংরিজি উক্তি শোনো, মন দিয়ে শুনবে, অনেক 'পান' আছে: The only incurable troubles of the rich are the troubles that money cannot cure. /Which is a kind of trouble which is even more troublesome if you are poor. শুনলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে ও হল গরিবের দ্রাক্ষাফল টক জাতীয় কথা।

পিতা শব্দ করে হাসলেন, হেসে বললেন, তা হতে পারে, বড়লোক না হলে যাচাই করা যাবে না। টাকার দুটো পিঠই যে সমান, টাকা না হলে বুঝি কী করে!

প্রসঙ্গ পালটে পিতা বললেন, ও অমন ম্যাদামারা হয়ে বসে আছে কেন?

আমার কথা হচ্ছে। মাতুল বললেন, মন খারাপ হয়েছে। মা-মরা ছেলেরা সকলকে বড় আঁকড়ে ধরতে চায়। বড় ভাবপ্রবণ হয়। মনে একটা শূন্যতা নিয়ে ঘোরাফেরা করে।

তা বললে তো চলবে না। তোমার ইমোশনকে কে বসে বসে পাখার বাতাস করবে? মনকে শক্ত করতে হবে। যোদ্ধা হতে হবে।

মাতুল বললেন, বি চিয়ারফুল মাই বয়।

পেছনের কোনও কথাই আমার তেমন কানে যাচ্ছে না। আমি ভাবছি মুকু শেষ মুহূর্তে আমার হাতে যে চিরকুটটা গুঁজে দিয়েছিল, তাতে কী লেখা ছিল? কী এমন কথা যা মুখে বলা যায় না। অদৃষ্টলিপির মতো যা

ট্রেনের চাকায় চাকায়, ইঞ্জিনের নিশ্বাসের টানে উধাও হয়ে গেল! কী লেখা ছিল! মায়ের ছবির পেছনে কী আছে! কী রেখে গেছে মুকু! এই আলোকিত পার্ক স্ট্রিট, এই রাতের কলকাতায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবার প্রস্তাব, কোনওটাই আমার ভাল লাগছে না।

মাতুলের নির্দেশে গাড়ি রাস্তার বাঁ দিকে থেমে পড়ল। আমাদের নামতে বললেন। সামনেই খুব ভদ্র চেহারার সায়েবি রেস্তোরাঁ। সামনের দিকটা পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা। ভেতরে মোম-মোলায়েম আলোর বাহার। যাঁরা বসে আছেন, তাদের বাইরে থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাইতেই মনে হচ্ছে ফিল্টার করা ভদ্রলোক।

পিতা বললেন, এখানে তুমি কী করবে?

আপনাকে এক কাপ সর্বাঙ্গসুন্দর চা খাওয়াব, আর দু'-একটা সুইস প্যাস্ট্রি।

বড় ফ্যাশানেবল জায়গা যে! কৃত্রিম মানুষে ভরা। এখানে খাওয়ার চেয়ে খাওয়ার ভড়ংটাই বড় হয়ে উঠবে, জয়।

ও আপনি একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন। চায়ের তৃষ্ণাটা মিটিয়ে নিই। এই শহরে আজ আমার শেষ রাতের আগের রাত। আজ একটু বেহিসাবি হতে দিন।

বেহিসাবি? তোমার বেহিসেবটাই তো হিসেব, জয়! শিল্পীর জীবন, তোমাকে ক্ষমা করা যায়। তুমি যদি খেরোর খাতা খুলে বসো বড় বেমানান হবে! কবে যাচ্ছ তুমি?

কালকের দিনটা আছি।

মাতুলের সঙ্গে আমরা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লুম। এলাহি ব্যাপার। পিতা কিন্তু বেশ মানিয়ে নিলেন। একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এল। মনে হল রোজই তিনি সকাল-বিকেল এখানে চা খেতে আসেন। ওঁরা কথা বলতে লাগলেন, আমি তাকিয়ে রইলুম দেয়ালে সাঁদ করানো বিশাল অ্যাকোরিয়ামের দিকে। স্বপ্ন ভরা, কাচের চৌকো আধার। আলোর তরল ধারায় রঙিন ইচ্ছের মতো মাছ ঘুরপাক খাচ্ছে। ঠিক নীচেই বসেছেন একজন পুরুষ আর মহিলা পাশাপাশি। দু'জনেই সুন্দর। মহিলার মুখ চোখ ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সুখের সমুদ্রে পদ্মের মতো পাপড়ি মেলেছেন। বাতাসে নৌকা ভাসিয়েছেন। আমার ভীষণ মুকুর কথা মনে পড়ছে। আজ থেকে হয়তো সাত বছর পরে ওইরকম কোনও সুবেশ সুন্দর তরুণের সঙ্গে মুকু ঠিক ওই জায়গাটিতে এসে বসবে। ওইরকম সুখী চেহারা নিয়ে। পেছনে মাছ খেলবে। ঘাড় একপাশে কাত। বড় ঘনিষ্ঠ। কুচকুচে কালো চুলের চকমকে খোঁপা পিঠের কাছে, একমুঠো নরম কামনার মতো দলা পাকিয়ে থাকবে। কী আশ্চর্য মানুষের মন। পাশেই বসে আছেন দুই গুরুজন। আর আমি কী সব ভাবছি! মানুষের আগুন কীভাবে জ্বলে ওঠে! জলে ভাসমান এক টুকরো জ্বলন্ত কর্পূরের মতো।

বড় সুস্বাদু প্যাস্ট্রি। জিভে পড়ামাত্র মিলিয়ে যাচ্ছে চকোলেটের গন্ধ নিয়ে। চায়ের তেমন কোনও আহামরি বুঝছি না। পিতা কিন্তু খুব তারিফ করছেন। বলছেন, রিয়েল ইংলিশ টি।

পিতা বললেন, তুমি কি একলা যাচ্ছ?

না, সপরিবারে।

থাকার ব্যবস্থা?

ভাল কোয়ার্টার।

বেশ, তা তোমার পিতৃদেব?

নিয়ে যাওয়া যাবে না। তিনি একই দিনে রওনা হচ্ছেন হরিদ্বার। আটকানো গেল না।

কই আমাকে তো কিছু বললেন না?

নিশ্চয়ই বলবেন। আপনি ওঁর বড় ছেলে। আমার ওপর ভীষণ অভিমান হয়েছে। অভিমান হলেই ওঁর বৈরাগ্য আসে।

তুমি কী বুঝবে বলো! একে বলে, ওয়ান চাইল্ড সিন। ওঁর আর আমার একই অবস্থা!

বিল এসে গেল। পিতৃদেব আর মাতুল একসঙ্গে হাত বাড়ালেন। মাতুল বললেন, এটা আমার বিষয়।

পিতা বললেন, পাগল হয়েছ, জীবনে আমি কখনও অন্যের পয়সায় খাইনি, তুমি আমার সে রেকর্ড নষ্ট করে দিতে পারো না! তা হলে তোমার অপরাধ হবে। তা ছাড়া, আমার বয়েস। বয়েসটার কথা একবার ভাবো!

বয়েস আমি ভাবতে রাজি আছি। আপনি আমার চেয়ে বড়। বয়েসে, সম্মানে; কিন্তু পরের পয়সা! কথাটায় বড় আঘাত পেলুম। আমি তো কখনও আপনাকে পর ভাবিনি। আপনি আমি আর দিদি একই বিছানায় দিনের পর দিন শুয়েছি। অসুখে আপনি আমার সেবা করেছেন। সেসব ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব!

স্নেহের ঋণ অর্থে শোধ করা যায় না, জয়। সে চেষ্টা কোরো না। পৃথিবীটা তা হলে বিশাল এক গোলদারি দোকান হয়ে বসবে। কারেন্সি নোটে স্নেহ বিক্রি হবে। দশ টাকার ভালবাসা, বিশ টাকার ভালবাসা।

মাতুল করুণ মুখে বললেন, আপনার হিসেব থেকে একটা দিন আমাকে দিন, ওনলি ওয়ান ডে, তা না হলে মনে হবে, আপনি আমাকে পপার ভাবছেন!

যেদিন তুমি প্রকৃত নিঃস্ব হবে সেদিন তো তুমি আরও কাছে চলে আসবে। মনে আছে, তুমি আমার কোলে বসে প্রথম আসরে গান গেয়েছিলে, একটি ভজন, জয় রঘুপতি, শ্রীরামচন্দ্র, সীতাপতি রঘুরাই। শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিভা মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, আর তখনই সে হয় প্রকৃত ধনী।

মাতুল করুণ মুখে বললেন, তা হলে আমি কী করব। আমার যে বড় আশা ছিল।

ঠিক আছে, আজ তুমিই দাও। অনুমতি দিলুম।

সামান্য ব্যাপার কত অসামান্য হয়ে ওঠে। মাতুলের মুখ দেখে মনে হল হাতে স্বর্গ পেলেন। টাকাপয়সা মিটিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। রাত যেন আরও মদির হয়েছে।

মাতুল বললেন, এইবার আমরা আর এক জায়গায় যাব, যেখানে গেলে আপনি ভীষণ খুশি হবেন।

কোথায়?

আমার গুরু এসেছেন, অনেকদিন পরে এই কলকাতায়।

তোমার তো তিনজন গুরু।

শেষ তালিম যাঁর কাছে, সেই বিখ্যাত বিনায়ক রাও পটবর্ধন।

বলো কী! তিনি এসেছেন! কোথায় উঠেছেন?

প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের এক বাড়িতে।

চলো তা হলে?

নিউ মার্কেট থেকে তা হলে কিছু ফল আর ফুল কিনে নিই। বড় সাত্ত্বিক মানুষ। এক ভরি ভাল আতর কিনতে পারলে বেশ হত।

আতর তুমি এ পাড়ায় পাবে না, ছুটতে হবে কলুটোলা।

নিউ মার্কেটের দিকে গাড়ি ঘুরল। ফলের বাজার লাল করে রেখেছে আপেল। আঙুর এসেছে। আপেলের দাপটে ন্যাসপাতি কোণঠাসা। দেখতে দেখতে ঠোঙা ভরে উঠল। থরে থরে সাজানো শুকনো ফল। নিজেকে মনে হচ্ছে ওমর খৈয়াম। পারস্যের কোনও এক অতীত রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আধঘণ্টার মধ্যেই মাতুলের আশি টাকা শেষ। গাড়ি চলেছে প্রিটোরিয়া স্ট্রিটের দিকে। ফল আর মেওয়ার গন্ধ ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে নতুন এক সুগন্ধ তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে এখুনি বুলবুল শিস দিয়ে উঠবে।

দেবদারু গাছ দিয়ে ঘেরা সাবেক আমলের বিশাল এক বাড়ি। কলকাতার নির্জনতম এলাকা। যত না রাত, মনে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি রাত জমেছে এ তল্লাটে। আদ্যিকালের আলোকস্তম্ভ থেকে পাণ্ডুর আলো অন্ধকারের নিতম্বে সামান্য লজ্জাবস্ত্রের মতো দুলছে।

সামনেই বিশাল গেট। গেটের বাইরে আলোকিত কাচের ফলকে গৃহস্বামীর নাম ও নম্বর। মোরাম-বিছানো পথ বাঁ দিকে চলে গেছে ভদ্র মোচড় মেরে, অতি গভীর এক গাড়িবারান্দার দিকে। সেখানে সাদা একটা ডুম থেকে বৈধব্যের আঁচলের মতো আলো লুটিয়ে পড়েছে। গাড়ির চাকায় চাকায় মোরামের মুমূর্ষু আর্তনাদ।

প্রাসাদের মতো বিশাল বাড়িটি যেন সুরসাগরে ভাসছে। কোথাও কোনও এক জায়গায় একসঙ্গে গোটা তিনেক তানপুরা বাজছে। মাতামহ ঠিকই বলেন, সুরে বাঁধা তানপুরায় হরি ওঁ, হরি ওঁ শব্দ ওঠে। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হতেই, দেবদারুর পাতায় পাতায় বাতাসের শব্দের সঙ্গে সুর ভেসে এল। ভেতরে আলাপ চলেছে। ভরাট নিটোল কণ্ঠ।

গাড়ি থেকে নেমে আমরা তিনজন কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। সুরে অবগাহন। পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে গেছে পালিশ-করা বিশাল দরজার দিকে। সেখানে ঝকঝক করছে পেতলের হাতল। একটি মকরের মুখ।

মাতুল ফিসফিস করে বললেন, আহা মারু বেহাগ।

আমাদের অবস্থা ফণা-তোলা সাপের মতো। স্থির হয়ে গেছি। নড়তে চড়তে পারছি না। শরীর প্রতিটি কোষ দিয়ে আরকের মতো সুর শুষছে। ইতিমধ্যে আলাপ থেকে শিল্পী নেমে এসেছেন বাণীতে,

> ভবানী স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্নবদনৈঃ
> প্রজানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।

ধরতাই ভবানী শব্দটি খাদ থেকে একেবারে তারায় চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে কুণ্ডলিনী শক্তি সাধকের সহস্রার ভেদ করে জ্যোতির্লোকে চলে যাচ্ছে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধাপে ধাপে উঠছি। হাতে ফল। একগুচ্ছ সাদা গোলাপ।

The hour has come:
Let us wander into the night.

হলঘরে মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়ালুম। রাত বেশ গভীর। সারাবাড়ি আজ নিস্তব্ধ। অন্যদিন হলে ঠিক পাশের ঘরেই মেসোমশাইয়ের নাক ডাকার শব্দ শোনা যেত। শোনা যেত মুকু পাশ ফিরছে, ঘুমের ঘোরে হাত তুলেছে তাই চুড়ির মৃদু প্রতিবাদ, আঃ কী হচ্ছে!

এই চুড়ির শব্দের সঙ্গে আঃ, কী হচ্ছে শব্দটা এমনভাবে আমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, কিছুতেই যেন ভুলতে পারি না। মনের সঙ্গে শব্দটা ভাল কিছু জড়িয়ে দিতে পারেনি, যেমন ঘণ্টা আর শাঁখের শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেবালয়ে আরতির দৃশ্য, ধূপ আর ধুনোর গন্ধ, পুরোহিতের পইতা শোভিত, উদার-অনাবৃত গৌরবর্ণ পৃষ্ঠদেশ। উঃ আর আঃ-র সঙ্গে রোগশয্যা। ওই শব্দটি বড় দেহবাদী। মধ্যরাতে কাছাকাছি দুটি দেহের অবস্থান। উত্তাপ আবেগ, জীবলীলার যাবতীয় উষ্ণ প্রক্রিয়া। ইচ্ছা জড়ানো একটি প্রতিবাদ শব্দ। যৌবন উদ্‌গমে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে একটি ঘরে শুয়ে, সারারাত পাশের ঘরে এমনি শব্দ শুনেছিলুম। চুড়ির রিনরিন আর আঃ কী হচ্ছে! পরের দিন সকালে আমার সেই একান্ত বান্ধবের দাদার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারিনি। সকালে বউদি যখন চা দিতে এলেন আমি মুখ নিচু করে রইলুম। সব মানুষই অক্লেশে কেমন দুটো জীবন, বহন করে চলে। সবাই জানে পোশাকের তলায় থাকে নগ্ন শরীর। এ জানা আরও এক ধাপ বেশি জানা।

মন যে এক নিয়ন্ত্রণহীন বিশ্রী বস্তু, আর একবার জানা হল এই মুহূর্তে। রাত যখন নিস্তব্ধ গভীর, পৃথিবী যখন ঘন ঘোর, অশরীরীরা যখন বিচরণশীল, সাধকরা যখন ধ্যানের আসনে, সেইসময় সন্তান কেমন করে মায়ের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবতে পারে! মানুষ বড় ক্ষুধার্ত প্রাণী।

ছবিটা একপাশে সামান্য হেলে আছে। মধ্যরাতে পরলোকগত কোনও নিকটজনের প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়ালে যে গা ছমছম করে, শরীরে এক ধরনের শিহরন হয়, এই প্রথম অনুভব করলুম। ঘর থেকে ঘরে লাল মেঝে চলে গেছে। ওপাশের স্টোর রুমে, জানলার খাঁজে ফার্পো রুটির একগাদা খালি ঠোঙা, পিতৃদেবের, যাকে রাখো সেই রাখের নির্দেশে পর্বতপ্রমাণ হয়ে আছে। সেখানে ধেড়ে ইঁদুর নৃত্য করছে। বাইরে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।

দেয়ালে কোনও ছবি হেলে আছে দেখলে, পিতা বড় অসন্তুষ্ট হন। ঘটনা ঘটে গেছে বিকেলে, তারপর তিনি আর এঘরে আসার সুযোগ পাননি। যদি আসতেন, ছোটখাটো একটা কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত। মৃতের প্রতি এত বড় অসম্মান! পারলে অপরাধীকেই ছবি করে ঝুলিয়ে দাও।

দু'হাত বাড়িয়ে ছবিটাকে সোজা করতে গিয়ে আবার হাত সরিয়ে নিলুম। মা যেন ফিসফিস করে বললেন, খোকা! তুই কত বড় হয়ে গেছিস!

সাহস করে মায়ের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালুম। চোখদুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এখুনি হয়তো চোখের পাতা পড়বে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মৃদু শব্দ শোনা যাবে। ভয়ভয় ভাবটা কেটে গেল। মনে হল জিজ্ঞেস করি, তুমি এখন কোথায় আছ মা? শুনেছি পরলোকে অনেক স্তর আছে! কোন লোকে তোমার অবস্থান!

মা যেন বললেন, জীবন কেমন লাগছে?

এ প্রশ্নের উত্তর এখনই আমি কেমন করে দেব! যেমনই লাগুক, জীবন থেকে তো বেরিয়ে যেতে পারব না। পুরো মেয়াদ আমাকে খেটে যেতে হবে।

মনে আর চোখে যে ঘোর লেগেছিল, হঠাৎ সে ঘোর যেন কেটে গেল। ছবি সেই ছবিই। বহুকাল আগে বেঁচে থাকা কোনও এক স্নেহময়ী জননীর ধূসর হয়ে আসা একটি পট। যিনি ছিলেন এখন আর নেই। ঠোঁটের কোণে সুখের দিনের একচিলতে হাসি। যাঁকে ভুলতে ভুলতে প্রায় ভুলেই এসেছি। আজকাল ল্যাবরেটরিতে একটা জিনিসের দিকে প্রায়ই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। বোতলের মুখে ফানেল, ফানেলে ভাঁজ করা ফিল্টার পেপার, কাচের মতো স্বচ্ছ তরল পদার্থ টুপটুপ করে পড়ছে, ফিল্টার পেপারে জমে উঠছে তলানি। জীবনের নির্যাস কালের বোতলে টুপটুপ করে পড়েই চলেছে, আমরা সব রেসিডিউ।

রবিবাবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন, কী অমন দেখো বলো তো হাঁ করে?

অনুমতি নিয়ে ছবির পেছনে হাত দিলুম। দেয়াল আর ছবির মাঝখানে একটা খাম ছিল। দেয়াল বেয়ে খস করে মেঝেতে পড়ে গেল। চমকে উঠেছিলুম। ছবিটিকে জ্যামিতিক কোণ মেপে সোজা করে, টেবিল ল্যাম্পের তলায় এসে বসলুম।

এখন আমার একটা নিজস্ব ঘর হয়েছে। ব্যবস্থা হয়েছিল কয়েকদিন আগেই। দখল নিয়েছি আজ। পিতা যেদিন ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন হঠাৎ, সেইদিনই বললেন, রাতই হল মানুষের সাধনার সময়, অলৌকিক দর্শনের সময়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই সময়ে বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকরা বসেছেন আসনে, পৃথিবীর নাভিপদ্ম থেকে উঠছে অনাহত ওঁকারধ্বনি, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে ঝরনা কলস্বনে, উত্তাল হিমবাহ নামছে ভীমগর্জনে, সাইবেরিয়ার বরফ-সমুদ্রে সশব্দে ফাটল ধরছে, এই সময়ের সঙ্গে কেউ যদি নিজেকে একবার জুড়ে দিতে পারে, তার আরোহণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। জীবন বড় সংক্ষিপ্ত। যে যেখানে আছ শুরু করে দাও। শুরু করে দাও এখনই। সেই লালাবাবুর মতো। যেই শুনলেন মা ডাকছে মেয়েকে, ওরে আয়, বেলা যে পড়ে এল, অমনি তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সব ছেড়ে। জানি প্রথম প্রথম একা শুতে একটু ভয়ভয় করবে, পরে অভ্যস্ত হয়ে যাব। সন্দেহ হয়, এ ব্যবস্থা বোধহয় আমার পিতার পূর্ব-পরিকল্পনা। জীবনে একটি মেয়ে আসছে। ফল পেকে টুসটুসে হয়ে ঝুলছে।

সিল-করা খাম। ভেতরে শক্তমতো কিছু একটা আছে। আলোর সামনে তুলে ধরতেই বোঝা গেল, ভেতরে একটি আংটি, আর ভাঁজ-করা একটি কাগজ রয়েছে। খামটা সাবধানে ছিঁড়তে যাব, দরজায় টোকা পড়ল। তাড়াতাড়ি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলুম। গোপনে দেখতে হবে, কী রেখে গেছে মুকু।

দরজা খুলেই চমকে গেলুম। দাঁড়িয়ে আছেন কাকিমা। চোখমুখ ভয়ে কেমন যেন বিবর্ণ। আমার পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে এসে ফিসফিস করে বললেন, দরজা দাও, দরজা দাও।

দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েই মনে হল, কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। হঠাৎ পিতা যদি উঠে আসেন খোঁজখবর নেবার জন্যে, আর যদি দেখেন ইনি রয়েছেন, তা হলে এমন কিছু ভাববেন না তো, যা একটু অন্যরকম। ভাবা গেল কিছু করা গেল না। কাকিমা মেঝেতে বসে পড়েছেন।

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, কী হল? ফিসফিস করেই বললেন, কাছে আয়, বলছি।

পাশে বসতেই আমার একটা হাত চেপে ধরলেন। হাত কাঁপছে। পিন্টু, আমি নীচে শুতে পারলুম রে। এই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

কেন, শীত করছে?

না, না শীত নয়। ভয়ে।

কীসের ভয়!

কাকিমা এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। খোলা জানলায় অন্ধকার আকাশ, সেই দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার হাতে তাঁর হাতের মুঠো শক্ত হল। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ একপাশ কাত হয়ে পড়ে গেলেন।

সর্বনাশ, অজ্ঞান হয়ে গেলেন? না মৃত্যু! সন্ন্যাস রোগ আজকাল খুব হচ্ছে। বুকে কান পেতে দেখলুম। সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। বেঁচে আছেন। পরক্ষণেই মনে হল, মারা গেলে বেঁচে যেতেন। কোনওদিনই জানতে পারতেন না স্বামীর মৃত্যুর কথা। পরক্ষণেই মনে হল, মারা গেলেই থানাপুলিশ হত। শুধু তাই নয়, ফাঁকা জীবন আরও ফাঁকা হয়ে যেত। তবু তো একজনের স্নেহ পাচ্ছি।

বিশ্রী ভঙ্গিতে শুয়ে পড়েছেন। কোনওরকমে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিতে পারলে বেশ হত। আমার সে শক্তি নেই। মেঝেতেই নানা কায়দা করে চিত করে শুইয়ে দিলুম। পা দুটো ধরে সোজা করে দিলুম। একরকম হল। খোঁপা বালিশের কাজ করছে। শাড়িটা জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। এত দৈন্য কেন? স্বামী ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কেউ নেই?

কপালে ভিজে হাতের তালু, পাখার বাতাস, কাকিমা চোখ মেলে তাকালেন। পরিবেশে ফিরে আসতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগল।

চাপা স্বরে বললুম, আমার বিছানায় একটু শুয়ে নিন।

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসতে বসতে বললেন, এখানেই বেশ আছি।

কী হয়েছে আপনার?

আগে ওই জলের গেলাসটা আন।

আলগোছে ঢকঢক করে জল খেলেন। হাত এখনও সামান্য কাঁপছে। বুকের কাছে জল ছলকে পড়েছে। চিবুকে একবিন্দু জল আটকে আছে। টেবিলের আলো পড়ে হিরের মতো চিকচিক করছে। গেলাসটা পাশে রাখলেন। সরাতে গেলুম, বললেন, থাক।

এইবার তা হলে বলুন, কী হয়েছে?

কাকিমা জানলার বাইরের অন্ধকারের দিকে আবার একবার তাকালেন। মহাশূন্য থেকে কেউ কি ভেসে ভেসে আসবে? ওঁর ভাব দেখে আমার নিজেরই কেমন ভয়ভয় করছে। হঠাৎ একটা কথা ভেবে গা হিম হয়ে গেল। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাতে যে-কোনও মুহূর্তে কাকাবাবু আসতে পারেন। অপঘাতে মারা গেলে আত্মা সহজে মুক্তি পায় না। আপনজনের কাছে ফিরে ফিরে আসতে চায় পূর্বের দেহ ধরে।

কাকিমা আর আমার মাঝে যে ব্যবধান রয়েছে সেটুকু ঘুচিয়ে দিতে পারলে একটু সাহস পাই। বলা যায় না ওইটুকুর মধ্যে প্রফুল্লকাকার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না! আমার চোখে আবার সেই মর্গের দৃশ্য ফিরে আসছে। ঢালু বেয়ে এক একটি দেহ গড়িয়ে আসছে। কারুর মুদিত, কারুর নিমীলিত, কারুর বিস্ফারিত আতঙ্কিত চোখ। আততায়ীকে দেখে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে। কারুর ঠোঁটের কোণে খেলোয়াড়ি হাসি□—মৃত্যুর পরোয়া করি না।

মানুষ মনের কথা পড়তে পারে কি না জানি না, কাকিমা বললেন, আমার কাছে সরে আয়।

প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে বসলুম। মহিলার অনাবৃত ওপর-বাহু বরফের মতো শীতল। লাল সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটি মাদুলি। জানি ওটি কীসের। সন্তানের প্রার্থনা। তাগার সুতো ঝুলছে। সেই ঝোলা অংশ মাঝে মাঝে আমার হাত স্পর্শ করছে। প্রথমবার চমকে দিয়েছিল।

কাকিমা বললেন, কী ব্যাপার বল তো পিন্টু! এতদিন নীচে একা একা শুয়ে থাকি, কই কোনওদিন তো এমন হয়নি!

কী হল?

হাতপাখা টানতে টানতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছি। খেয়াল নেই। ইঁদুর, আরশোলা খুটুর খুটুর করছিল। ও অমন রোজ করে। অভ্যাস হয়ে গেছে। আলো নিবে গেলে ওদেরই রাজত্ব। কেন জানি না, হঠাৎ একসময় ঘুম ভেঙে গেল। সারাদিন খাটাখাটুনির পর বিছানায় শুলেই আমি মরে যাই। পড়লুম কি মরলুম। ঘুম ভাঙে সেই ভোরে। ঘুম ভাঙল, ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। উঠে পড়লুম বিছানা ছেড়ে। ভাবলুম বাইরে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গার একটু হাওয়া বাতাস লাগালে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। অন্ধকারে দরজা খুলে বাইরের গলিতে পা দিয়েই ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম। রান্নাঘরের সামনের রকে সাদামতো কে একজন উবু হয়ে বসে। মাথাটা যেন দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে। চোর নয় তো! বদমাইশ লোকও হতে পারে। খুব জোরে কে বলে চিৎকার করার চেষ্টা করলুম, গলা দিয়ে কোনও স্বর বেরোল না। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালার ইচ্ছে হল, চলতে পারলুম না। শরীর যেন পাথরের মতো হয়ে গেছে। সেই মূর্তি উঠে দাঁড়াল পিন্টু। তোমার কাকাবাবু। তখন আমার সাহস ফিরে এল। আমি বললুম, একী, তুমি কখন এলে? কে তোমাকে সদর খুলে দিলে? এখানে বসে আছ, আমাকে ডাকোনি কেন? মুখে কোনও কথা নেই। ভাবলুম, কোনও খবর না দিয়ে এতদিন পরে ফিরেছে, তাই বোধহয় লজ্জায় কোনও কথা বলছে না। আমাকে পাশ কাটিয়ে মুখ নিচু করে ঘরে ঢুকে পড়ল। আমি পেছন পেছন ঘরে ঢুকে, হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই বের করতে করতে রাগের গলায় বললুম, তোমার সেই ভাঙা লাইটারটা জ্বেলে ধরেও তো একটু উপকার করতে পারো। স্বার্থপর। আলো তো জ্বলল পিন্টু, তারপর যা হল, তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। ঘরে কেউ নেই। বিছানায় নেই, খাটে নেই, খাটের তলায় নেই, কোথাও নেই। আলো হাতে বাইরে

এলুম, জোরে জোরে বললুম, কী গো, আমার সঙ্গে চোরচোর খেলছ নাকি! চারপাশ বাক্সর মতো বন্ধ, মানুষটা এল কোথা দিয়ে! রান্নাঘরের দরজায় বাইরে থেকে শেকল তোলা। হঠাৎ ঘরের মধ্যে দুম করে একটা শব্দ হল। আলো হাতে ছুটে গেলুম। ঘরের মাঝখানে তবলা-ঠোকা হাতুড়িটা পড়ে আছে। তুমি বিশ্বাস করো পিন্টু, হাতুড়িটা ও যাবার সময় ঝুলিতে ভরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কোনওরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

কাকিমা হঠাৎ দু'হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলেন, ও আর বেঁচে নেই, কিছুতেই বেঁচে নেই।

আর একটু হলেই আমার মুখ ফসকে সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ছিল, মিথ্যে বলার নৈতিক সাহস পেলুম এই ভেবে, মর্গে আমিই যে ঠিক দেখেছি, তার কী প্রমাণ আছে।

আমি জোর গলায় বললুম, আপনার চোখের ভুল। বড় বেশি ভাবছেন, তাই স্বপ্ন দেখেছেন।

তুমি বলতে চাও আমি স্বপ্নে দরজা খুলেছি, স্বপ্নে আলো জ্বেলেছি? স্বপ্নে মানুষ এসব পারে!

কী বলছেন আপনি? মানুষ স্বপ্নের ঘোরে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে পারে। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তাস খেলে আসতে পারে। খুন করে আসতে পারে। দিনের পর দিন এইরকম হলে ওটা হয়ে দাঁড়ায় একটা অসুখ, ইংরেজিতে বলে স্লিপ ওয়ার্কিং। তখন ডাক্তার ডাকতে হয়। লেডি ম্যাকবেথ রাজাকে খুন করার পর, ওইভাবে মাঝরাতে প্রাসাদে বাতি হাতে হেঁটে বেড়াতেন।

অদ্ভুত নাম শুনে কাকিমার যেন একটু বিশ্বাস হল। জিজ্ঞেস করলেন, লেডি ম্যাকবেথ কে?

ম্যাকবেথের বউ। ওসব হল রাজরাজড়ার ব্যাপার। উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় মানুষের ওরকম হয়।

পিন্টু, তুমি আমার সঙ্গে একবার নীচে যাবে! একবার ভাল করে দেখা দরকার। তুমি যাই বলো, এ আমার চোখের ভুল নয়। আমি খুব একটা ভিতু মেয়েমানুষ নই। পাড়াগাঁয়ে মানুষ। কাল আমি একবার থানায় যাবই। শুনেছি মানুষ হারিয়ে গেলে থানায় খবর দিতে হয়।

থানা কিছু করে না। নাম ঠিকানা লিখে রেখে ছেড়ে দেয়। বড়জোর একটা ছবি চাইতে পারে। ছোট ছেলে হলে একটু যত্ন নেয়। ছেলেধরার উৎপাত আছে। উদ্ধার করতে না পারলে, বিকলাঙ্গ করে ভিক্ষে করাবে। বড়রা কোনওদিনই ছেলেধরার হাতে পড়বে না। হারিয়েও যাবে না। বড়দের রাস্তাঘাট সব চেনা। পুলিশ জানে, কেউ সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়। কেউ পরিবারকে জব্দ করার জন্যে গা-ঢাকা দিয়ে বসে থাকে অনেকদিন। কেউ কোনও অন্যায় করে ফেরার হয়ে যায়। সময় হলে সবাই আবার সুড়সুড় করে ফিরে আসে। পুলিশ সব জানে। জানে বলেই বাজে কাজে সময় নষ্ট করে না।

কিন্তু কনকের মতো কেউ যদি মারা গিয়ে থাকে?

কনক মারা গেছে কে বললে?

দেখো দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গা বড় সাংঘাতিক জায়গা। চান করতে করতে বান এসে গেলে সাঁতার-জানা লোকও সামলাতে পারে না। ডুবে না গেলে মেয়েটা যাবে কোথায়? মেয়েরা কি ছেলেদের মতো পালাতে পারে?

কেন পারবে না? পালানোর ব্যাপারে ছেলেতে মেয়েতে বিশেষ তফাত নেই। আমাদের পাড়ার ভারতী নায়িকা হবে বলে একা একা বম্বে পালিয়েছিল।

তারপর কী হল?

একমাস পরে ফিরে এল। ভারতীর মা রেগে তার সব চুল কামিয়ে ন্যাড়া করিয়ে দিলেন। পাড়ার লোক নায়িকা ভারতীর বদলে বলতে লাগল ন্যাড়া ভারতী।

নানা প্রসঙ্গ টেনে কাকিমাকে সহজ করে আনার চেষ্টা সফল হচ্ছে বলেই মনে হল। কাকিমার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছি আমি। কাকাবাবু একবার যখন এসেছেন, আবার আসবেন। ভৌতিক বইয়ে পড়েছি, মৃত আত্মা অনেক সময় খুনের কিনারা করে দিতে আসে। এইভাবে কত ক্রিমিন্যাল ধরা পড়েছে। পুলিশ পারছে না, বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা ঘোল খেয়ে যাচ্ছে, মৃতের আত্মা এসে আততায়ীকে ধরে দিয়েছে। কাকিমার সঙ্গে কথা বলছি, চোখদুটো পড়ে আছে দু'দিকে, একটা অন্ধকার জানলার দিকে আর একটা বন্ধ দরজার দিকে। কোনওরকম আওয়াজ পেলেই কান খাড়া হয়ে উঠছে। রাতের দিকে এ বাড়িটা এমনিই কেমন যেন হয়ে ওঠে! যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, আমার বিশ্বাস তাঁরা ফিরে আসেন। কখনও শুধুই অপ্রাকৃত শব্দ, কখনও সূক্ষ্ম শরীরে দর্শন। পিতৃদেবকে নিজের সন্দেহের কথা বলে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছি। তিনি বলেন, ভগবান না হলে ভূত দর্শন হয় না! বেশ, দর্শন না হোক শ্রবণ তো হয়। মাঝরাতে ছাদে গড়গড় করে কী একটা শব্দ প্রায়ই হয়। বিশাল ছাদের এ পাশ থেকে ও পাশে লোহার বলের মতো কী একটা গড়িয়ে চলেছে। পিতাকে প্রায়ই বলি। তাঁর বিশ্বাসও হয় না, তেমন পাত্তাও দেন না। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে বললেন, এবার হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাকবে।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। শুরু হল সেই শব্দ। ভারী লোহার বল গড়িয়ে চলেছে পুব থেকে পশ্চিমে। পিতাকে জাগালুম, উঠুন উঠুন, সেই শব্দ। এর আগে একবার হয়েছিল, যেই ডাক শুনে তিনি উঠে বসলেন, শব্দ থেমে গেল। বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে আমরা দু'জন, আবার হবার অপেক্ষায় রাতটা জেগেই কাটিয়ে দিলুম। পিতা বললেন, তুমি ভুল শুনেছ। খাওয়ার গোলমালে জ্যান্ত মানুষের পেট মাঝরাতে অমন গড়গড় করে জানান দেয়, অতি আহারে ভূত হবার সম্ভাবনা। মিতাহারী হও, মিতবাক হও।

সেদিন আমার ভাগ্য ভালই ছিল। শব্দ থামল না, হতেই লাগল। তিনি শুনলেন, তারপর বললেন, চলো, লেট আস সি। প্রস্তাব শুনে গলা শুকিয়ে গেল। তিনি ছাড়ার পাত্র নন, আজ আমি তোমাকে ভূতদর্শন করাবই। ভগবান আর ভূত একই বস্তু। ভাইব্রেশনের ইতরবিশেষ। যেমন কনডেনসেশনের ওপর নির্ভর করে, জল থেকে কুয়াশা, জল থেকে স্নো কিংবা আইস।

ছাদের দরজা বন্ধ। সিঁড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকার। বন্ধ দরজার ফাটলে সুতোর মতো চাঁদের আলোর রেখা। হাতড়ে হাতড়ে উঠছি। বেঁচে আছি না মরে গেছি বোঝার ক্ষমতা নেই। দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল। বন্যার জলের মতো চাঁদের আলোয় সিঁড়ির ধাপ ভেসে গেল। ধুধু ছাদ, চাঁদের আলোয় ফটফট করছে। গাছপালা, আকাশ বাতাস সব যেন চাঁদের আলোয় স্নান করে উঠেছে। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি প্রকৃতি তখন যেন জেগে ওঠে। বিশাল আরও বিশাল হয়ে যায়। উত্তর দিকে আলসে ঘেঁষে একটা নিম গাছ উঠে গেছে, ঝাঁকড়া হয়ে। তার পাতায় পাতায় চাঁদের আলো কুচিকুচি হয়ে ঝুলছে। মাঝে মাঝে বাতাস এসে প্রকৃতির

ঝাড়লণ্ঠন দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। বিশাল আকাশের তলায় গড়ের মাঠের মতো ছাতে আমরা দুটি প্রাণী। ক্ষুদ্র যে কত ক্ষুদ্র হতে পারে সেদিন বুঝেছিলুম।

পিতা বললেন, কী দেখছ? কোথায় তোমার ভূত? কোথায় লোহার বল! এই তো তোমার ছাত। দেখে নাও। আমি এখানে বসি। তুমি দেখো। যদি কিছু পাও, আমাকে জানিয়ো, গিয়ে চেপে ধরব। নকল ভূত, ইমিটেশন ভূত দেখেই জীবনটা কেটে গেল, একটা রিয়েল ভূত দেখার বাসনা বহুদিনের।

ভূতের দর্শন পাওয়া গেল না ঠিকই, তবে সে রাতে পিতার অদ্ভুত এক রোমান্টিক চেহারার সঙ্গে পরিচয় হল। জনপদের মাথার ওপর বিশাল এক নির্জন ছাতে আমরা দুটি ভূতার্থী প্রাণী জীবন্ত ভূতের মতো পাশাপাশি বসে রইলুম, দুই সমবয়স্ক বন্ধুর মতো।

পিতা বললেন, রোজই তো আমরা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোই, এসো আজ আমরা বসে বসে জাপানিদের মতো চাঁদের আলো দেখি। নীচে গিয়ে মাদুরটা নিয়ে এসো। কী, একা যেতে ভয় করবে?

কী করে বলি ভয় করবে! ভয় অবশ্যই করবে। রাত আমার কাছে ভীষণ রহস্যময়। যত রাত বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে, এই বনেদি ভগ্ন প্রাসাদের বিভিন্ন দিক একটু একটু করে আমার কাছে অচেনা হয়ে ওঠে। এমনকী খাটের তলাটাও আমার হাতছাড়া হয়ে যায়। খাট থেকে পা নামাতে হলে মনে হয়, এই বুঝি কেউ খপ করে চেপে ধরল।

মাদুর এল। বিছানো হল। দু'জনে বসে আছি মুখোমুখি। রাত দুটো। পেটা ঘড়ি জানান দিল গঙ্গার দিকের থানা থেকে। পাহারাদারের পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল। মালা পাড়ায় একপাল কুকুর চিৎকার করেই থেমে গেল। বহু দূরে ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের পাওয়ার হাউস সশব্দে খানিকটা স্টিম ছেড়ে রাত্রির প্রশান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল।

পিতা শুরু করলেন তাঁর যৌবনের কাহিনি। ছাত্রজীবনে কত ক্লেশ সহ্য করেছেন! জ্ঞাতিদের উৎপাতে পিতামহের বাস্তুত্যাগ। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তাঁর শিক্ষালাভ। তাঁর পাণ্ডিত্য। শিক্ষক হিসেবে অসামান্য খ্যাতি। ধমনীতে যে রক্তস্রোত বইছে, তার কণায় কণায় ত্যাগ, আদর্শ, সহিষ্ণুতা, উচ্চভাব, সন্ন্যাস। অর্থ নয়, জ্ঞান, ভোগ নয়, ত্যাগ, নীচতা নয়, উদারতা এ পরিবারের রক্তের সংকেত। মোর্স কোডে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে সেই কথাই জানাতে চাইছে। ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে।

শেষে এসে পড়ল মায়ের প্রসঙ্গ। জীবনে সিল্কের পাঞ্জাবি পরেননি। হাতে ঘড়ি বাঁধেননি। বুকে সোনার বোতাম ঝোলাননি। চুলে গন্ধতেল মাখেননি। ধুতি আর শার্ট পরে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। বাসর থেকে মাঝরাতে মায়ের হাত ধরে উঠে এসেছিলেন ক্রোধে, চটুল মহিলাদের চপল রসিকতা সহ্য করতে না পেরে। বাড়ি ফিরে এসে প্রথমে স্নান করেছিলেন, তারপর মুগুর আর বারবেল ভেঁজে মনকে শান্ত করেছিলেন। মা খুব কেঁদেছিলেন, আর বিবাহের অর্ধযাম উত্তীর্ণ হবার আগেই পিতার ধমক খেতে শুরু করলেন। রাত কাটার আগেই নববধূর রোমান্টিকতা কেটে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সংসার তাঁকে গ্রাস করে নিল। সামান্যতম সময় নষ্ট হল না বলে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠল খাগড়াই কাঁসার মতো।

পিতা বললেন, তোমার মায়ের মেটালটা অসম্ভব ভাল ছিল, তাই এত সুন্দর অ্যালয় হয়ে গেল, বোঝাই যেত না কে আমি, আর কে তুমি! সেম ভাইব্রেশন! তোমার দুভার্গ্য! জন্মালে মরুভূমিতে উটের মতো। তুমি

তখন ছোট, সবে হামা দিতে শিখেছ, আমরা সব শিমুলতলায় গেলুম বেড়াতে। এমনি চাঁদিনি রাত। গোলাপ বাগান। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়। তোমার মায়ের মুখে চাঁদের আলো পড়েছে। কোলে শুয়ে আছ তুমি। কপালে সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করছে। আমি চাঁদ দেখব না তোমার মায়ের মুখ দেখব! কে বেশি সুন্দর! দেখতে দেখতে চোদ্দোটা বছর কেটে গেল। মৃত্যুর আগে ছ'মাস যমে-মানুষে টানাটানি চলল। ছ'মাস আমি রাতে ঘুমোইনি। একবার রুগির শিয়রে, একবার এই ছাতে। কত রাত একা একা কাটিয়ে গেছি এই ন্যাড়া ছাতে। অমাবস্যা গেছে, পূর্ণিমা গেছে। উত্তরে তাকিয়ে প্রার্থনা করেছি, দক্ষিণে তাকিয়ে করেছি, দিক-দেবতার ক্ষমতা নেই মানুষের যাবার পথ আটকায়। দীর্ঘ রোগ ভোগ করার পরও মুখের চেহারার এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। রাত বারোটার সময় চিতায় শোয়ালুম। কোমর পর্যন্ত চুল চারপাশে ছড়ানো। পা দুটো আলতায় টুকটুক করছে, চাঁদের মতো মুখে গোল লাল টিপ, সিঁথির সিঁদুর চলে গেছে ঊষার পথের মতো। সেই চিতায় আগুন দিতে হল। হোমের শুকনো কাঠের মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, মৃত্যু আগুন আর সতী যেখানে আছে সেখানে পাপ থাকতে পারে না, ভূত থাকতে পারে না, ভয় থাকতে পারে না। সে এলাকা হল ভগবানের। গায়ে পুট করে এক বিন্দু জল পড়েছিল। মাথার ওপর নির্মল নির্মেঘ নীল আকাশ, জল এল কোথা থেকে। পিতা বলেছিলেন, হয়তো স্বাতী নক্ষত্রের জল। ঝিনুকে পড়লে মুক্ত হত। তোমার গায়ে পড়েছে, দেখো মনটা যদি মুক্তোর মতো হয়ে ওঠে। আমি যদি ঈশ্বর হতুম, সেই রাতে পিতার কাছে তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে, আমার মাকে ফিরিয়ে দিতুম। অন্তত এক রাতের জন্যে। তারপর পাশে বসে মজা করে শুনতুম তাঁদের দু'জনের দীর্ঘ চোদ্দো বছরের জমা কথা। অমন রাত এখনও পর্যন্ত আর আসেনি, আসবে কি না তাও জানি না। অতীত দুঃখ আর সুখের স্মৃতি নিয়ে দূরাগত পাখির মতো পাখা মুড়ে বসেছিল। একসময় বললেন, আমার এসরাজটা নিয়ে এসো।

চাঁদ ক্রমশ পার হয়ে আসছে দীপ-নেবা জীবনের মতো। রাতের ছড়ানো মায়াজাল ক্রমে ক্রমে গুটোতে শুরু করেছে, পুবের আকাশে সূর্যের নখরচিহ্ন দেখা দিয়েছে। এসরাজ কাঁধে তুলে নিতে নিতে পিতা বললেন, আমার সবচেয়ে সমঝদার শ্রোতা ছিল তোমার মা। জানলার ধারে পা মুড়ে বসত। কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ত চাঁদের আলো। বসে বসে বাজনা শুনত।

তারে ছড়ের টান পড়ল। শুরু হল জৌনপুরী রাগে আলাপ। হৃদয়ের মোচড় পড়ল সুরে। পাখি উড়ে গেল।

আলগোছে গেলাসের জলটুকু শেষ করে কাকিমা বললেন, চলো না গো একবার দু'জনে নীচে যাই। ব্যর্থ চেষ্টা। ভদ্রমহিলা ঘুরেফিরে সেই এক প্রসঙ্গে আসছেন। রাত বয়ে চলেছে। আর কতক্ষণই বা! একটু পরেই পাখি ডেকে উঠবে। শেষরাতে মহিলা যদি পিতার সামনে দিয়ে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যান, যতই কাকিমা বলি না কেন, বিশ্রী একটা সন্দেহ হতে পারে। এই কিছুদিন আগেই জবার ঘটনায় চরিত্রে দাগ পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। জ্যোতিষীরা একবাক্যে বলেছেন, খুব সাবধান ছোকরা, নারীঘটিত বদনামের তীব্র যোগ রয়েছে। আর বসে থাকা যায় না। রাত বড় ভয়ংকর সময়। অন্ধকারের শক্তি কখন গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয় কে জানে?

চলুন তা হলে যাই। বড় টর্চটা সঙ্গে নিই।

মেঝেতে হাতের ভর রেখে কাকিমা মেঝে থেকে শরীর তুললেন। রাত্রির জড়তা লেগেছে। মাথার ওপর দু'হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙলেন।

ধীরে ধীরে শব্দ না করে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিলুম। আলো আগেই নিবিয়ে দিয়েছি। অন্ধকারে পা টিপে টিপে দু'জনে নীচে নামছি। কাকিমার সেই ভয়ভয় ভাবটা আবার ফিরে এসেছে। একটা ব্যাপার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না, স্বামীকে যদি ভালবাসা যায়, তা হলে স্বামীর প্রেতাত্মাকে কেন ভালবাসা যাবে না! মানুষের সবকিছুই কি ফাঁকিতে ভরা!

সিঁড়ির বাঁক ঘুরে ভয়ে ভয়ে টর্চের বোতাম টিপলুম। কাকিমা বললেন বটে তিনি খুব সাহসী, সাহসের তেমন প্রমাণ পাচ্ছি না। আমার শরীরের সঙ্গে প্রায় লেপটে আছেন। নিজে কত সাহসী সে তো জানাই আছে। আলোর রেখা অন্ধকারের বুক চিরে সামনে এগিয়ে গেল। অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। আলোর সরণিতে পিনপিন করে এক ঝাঁক মশা উড়ছে।

আমরা দু'জনে জড়াজড়ি করে অদ্ভুত এক অনিশ্চয়তার দিকে ধাপে ধাপে নেমে চলেছি। একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব মুখে এসে লাগছে। এই রহস্যপুরীতে একটা কেন, একশোটা ভূত থাকতে পারে। কাকিমার শোবার ঘরের দরজা হাট খোলা। হ্যারিকেন নিবে গিয়ে এক পাশে ভূত হয়ে বসে আছে। বুকের ভেতরটা এবার সত্যিই কাঁপছে। চারপাশ খুব একটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। কারুর ছেড়ে-যাওয়া আসনে বসলে যেমন উত্তাপ থেকে মনে হয় কেউ ছিলেন একটু আগেই, সেইরকম মনে হচ্ছে।

রান্নাঘরের দরজায় আলো ফেলতেই কাকিমা বললেন, ওই দেখো শেকল খোলা।

ব্যস! ওই একটিই কথা। ভারী শরীর কাঁচা মাটির পুতুলের মতো ধীরে ধীরে আমার শরীরের ওপর ভেঙে পড়ল। টর্চটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে নিবে গেল। চারপাশে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার।

তিনটে কাছি কাছাকাছি যুক্ত
বাঁধা মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার সারথি তার
রথ চলে দেশ-দেশান্তরে॥

জীবনে এমন একটা-দুটো রাত আসে, যে-রাত ভোর হলে বাঁচা যায়। ভয়ে চৈতন্য হারালে ভয়ের হাত থেকে বাঁচা যায়। না হারালে অবস্থা হয় আমার মতো। টর্চ ছিটকে চলে গেছে রান্নাঘরের সামনের নর্দমায়। ড্যাম্প লেগে আলোর তার নষ্ট হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ লিক করছিল। দেয়ালে হাত ঠেকলেই শক মারছিল। কানেকশন কেটে দেওয়া হয়েছে। কবে মিস্ত্রি আসবেন কে জানে, তারপর আলো জ্বলবে। সে এখন বিশবাঁও জলে।

পরিস্থিতি মানুষকে কীভাবে সাহসী করে তোলে! কী জানি কাকিমার চোখের ভুল কি না! হয়তো রান্নাঘরে শেকল তোলেননি। নিজের ভুলে নিজেই অজ্ঞান। অন্ধকারে যেখানে যেভাবে পড়ে আছেন, সেখান থেকে এখুনি সরাতে না পারলে ভূতের হাত থেকে বাঁচলেও, বিছে কিংবা সাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে কি না সন্দেহ!

মৃত্যুর জড়তার চেয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে মানুষের কত প্রবল! শরীরে কোথা থেকে পালোয়ানের মতো শক্তি এসে গেল। বড় এক বালতি জল তুলতে যার হাত কাঁপে, দম বেরিয়ে আসে, সে অনায়াসে একজন মহিলাকে, একটা হাত দুটো পায়ের তলায়, আর একটা হাত পিঠের নীচে দিয়ে কেমন অক্লেশে তুলে ফেলল! ভীষণ ভয় করছে। পৃথিবীর সবই প্রায় অচেনা, নিজের বসতবাটিও যে কত অচেনা, ভয়ংকর, এই মুহূর্তেই বুঝছি।

বেড়াল যেভাবে মুখে বাচ্চা নিয়ে লটরপটর করে হাঁটে, আমিও সেইভাবে সিঁড়ির দিকে এগোতে শুরু করলুম। কাকিমার পিঠ ঘামে একেবারে ভিজে গেছে। সারাশরীর এলিয়ে আছে। দুটো হাত শরীরের দু'পাশে লটপট করছে। হাতের ওপর দিয়ে ঝুলে আছে ভাঁজ করা দুটো পা। হাঁটুর ভাজ ভিজেভিজে। এই অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে যে-দৃশ্য মনে পড়ল, মন তোমার খুরে খুরে নমস্কার। রোগাপটকা রাজকাপুর যেন আওয়ারা ছবিতে দিঘল নার্গিসকে নিয়ে ড্রিম-সিনে ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে।

পা দিয়ে কী একটা সুট করলুম। হৃৎপিণ্ডে ধড়াস করে একটা শব্দ হল। সেই টর্চ। এতক্ষণ পাশেই পড়ে ছিল। এইবার সত্যি সত্যিই নর্দমায় গিয়ে পড়ল। যাক, আপদ শান্তি, বিপদ শান্তি। কোনওরকমে সিঁড়ি অবদি পৌঁছোতে পারলে, ধাপের ওপর বসিয়ে একটু বাতাসটাতাস করলে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠবেন! এ দেশের মেয়েদের সাজপোশাকের কোনও মাথামুন্ডু নেই। লজ্জা রাখতে গিয়ে হার্টফেল করার অবস্থা! বুক বেঁধে মানুষ

বিপদে ঝাঁপ দেয়, মাঝরাতে বিছানায় শুতে যাওয়ার কী মানে? মেয়েদের অনেক কিছুরই মানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। চেষ্টা করাই বৃথা।

যে-দিকে চলেছি সেই দিকেই সদর। সিংহ দরজা বললেই ভাল হয়। মানসিংহ স্বচ্ছন্দে টাট্টু চেপে টগবগিয়ে ঢুকে পড়তে পারেন। দরজাটা আবার তিনপাট। বহুকালের পুরনো। বাঘের আঁচড়ের মতো কালের আঁচড় খেয়ে ফাটাফাটা, সরু সরু চিড় ধরেছে। এপাশ থেকে ওপাশের আলো নজরে পড়ে। যেন ঝিলমিল দরজা। এখন বাইরে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। আলো দেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বেশি না, আর সাত-আট পা এগোতে পারলেই সদর। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায় গোটা দুয়েক প্যাঁচ মেরে। সিঁড়ির তলায় ঘুপচিতে আগে আমাদের কুকুর থাকত। সেসব দিন চলে গেছে, এখন আমরা ঝাড়া হাতপা।

দরজার দিকে চোখ পড়তেই বুকটা আবার ছ্যাঁত করে উঠল। দরজার তলার দিকে ছোট্ট একটা আলোর টিপ স্থির হয়ে আছে। জোনাকি? জোনাকির আলো স্থির হয় না। জ্বলে আর নেভে। ভয়ে, কৌতূহলে পা থেমে পড়ল। বিন্দু সূক্ষ্ম সরলরেখার আকারে বিশেষ একটি ফাটা ধরে জ্বলন্ত সুতোর মতো এঁকেবেঁকে বিদ্যুৎগতিতে নীচের দিক থেকে ওপরে উঠছে। যেন আলোর পুঁয়ে সাপ। এরকম একটা নয়, দেখতে দেখতে চোখের সামনে অসংখ্য আলোর ঝিলমিল তৈরি হয়ে গেল। মনে হচ্ছে দেওয়ালির রাত। আলোর রং কেমন যেন হলদেটে।

মন এইবার যুক্তিতর্কের বাইরে চলে যাচ্ছে। এসবের মানে বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি কমে আসছে। এ লোকের চেয়ে পরলোকের ক্ষমতা অনেক বেশি। কোনওরকমে যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই ধীরে ধীরে বসে পড়লুম। অশরীরী! কোনও অন্যায় তো করিনি, তবে কেন এমন করে ভয় দেখাচ্ছ।

চিন্তা, দৃষ্টি ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পাতলা এক পরদা কুয়াশা নেমে আসছে। চিন্তায় কিংবা কাজে সত্যিই কি আমি কোনও অন্যায় করিনি, পাপ করিনি! জোর গলায় বলতে পারো? কীসের স্বার্থে তুমি একজন মহিলার কাছে তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ চেপে রেখেছ! তোমার অনুকম্পা! নিজের ভেতরটা একবার ভাল করে হাতড়ে দেখো তো?

দোতলা থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে গভীর ঘুমে শোনা স্বপ্নের শব্দের মতো, ওপার নদী থেকে ভেসে আসা পিতার ভারী কণ্ঠস্বর, একী, সব খুলেটুলে রেখে গেল কোথায়, বাথরুমে নাকি? কোথায় গেলে হে। বাতাসে যে বইয়ের পাতা উড়ছে! আঃ ছিঁড়ে যাবে এক্ষুনি।

প্রায়-সংজ্ঞাহীন সেই অবস্থায় অদ্ভুত এক পাপবোধের তাড়নায় প্রাণপণ চেষ্টা করলুম উঠে দাঁড়াবার। কাকিমার স্বার্থে এখুনি আমার ওপরে উঠে যাওয়া উচিত, এমন একটা নির্দেশ উঠছে মনে। পারছি না, কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। দেহ যেন তালশাঁসের মতো থ্যাসথ্যাস করছে।

দরজার দিকে চোখ চলে গেল। সেই আদ্যিকালের ফাটাফাটা দরজা, খিল দিয়ে জমপেশ করে আঁটা। আলোর ঝিলমিলি আর নেই। খেলা করে চলে গেছে। এতক্ষণ গলায় কোনও স্বর ছিল না। স্বর ফিরে এসেছে। ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন। কাকিমা ধীরে ধীরে আমার কোল থেকে মাথা তুললেন। ফিসফিস করে বললুম, কোনও

ভয় নেই, সট করে সিঁড়ির তলায় ঢুকে পড়ুন। বাবা উঠেছেন। একটু আগেই যাঁকে বিছে কামড়াতে পারে ভেবে অস্থির হয়েছিলুম, প্রাণে মরার ভয়ে তাঁকেই ঠেলে দিলুম অন্ধকার আবর্জনায়। তিনিও ভূত ভুলে অম্লানবদনে সেখানে চলে গেলেন। কেন গেলেন, না গেলে কী হত এসব ভাবার কোনও প্রয়োজন হল না। আমরা দু'জনেই মনে হয় এক নৌকোয় চেপে বসে আছি। উই আর অন দি সেম বোট, ফাদার।

মিথ্যে বলার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছি। গলা তুলে বললুম, আমি নীচে।

অন্ধকারে নীচে কী করছ?

সঙ্গে টর্চ আছে। কী একটা শব্দ হল, তাই দেখতে এসেছি।

অ্যাঁ, তাই নাকি? সাহস তা হলে বেড়েছে বলো! ভেরি গুড। সন্দেহজনক কিছু পেলে? আমি নামব?

আজ্ঞে না। তেমন কিছু দেখছি না।

সদরের খিলটা একবার ভাল করে চেক করো। ওটার দু'পাশই খোলা হ্যাঁচকলের মতো, ঠিকমতো লাগে না। বাইরে থেকে সরু পাত গলিয়ে ঠেললেই খুলে যায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ, চেক করেই উঠব।

আমি এবার তা হলে শুয়ে পড়ছি, তুমি উঠে এসো। শোবার আগে ফুল এক গেলাস জল খেয়ে শোবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমার ভুরুর কাছটা কুঁচকে উঠেছে। বেশি কথা না বলে উনি শুয়ে পড়ছেন না কেন? দরজা বন্ধ ও ছিটকিনি লাগানোর শব্দ হল। কী আশ্চর্য! ওঁর ঘরে ঢোকার জন্যে, ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে আমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছি কেন? আমার কি কিছু হয়েছে?

প্রায় শিস দেবার মতো করে বললুম, বেরিয়ে আসুন।

অন্ধকারে কাকিমা এগিয়ে আসছেন। সাদা শাড়ি, সামান্য চুড়ির শব্দ, জীবন্ত একটি মনুষ্য শরীরের উত্তাপ আর গন্ধ, রহস্যময় রাত্রি। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কাকিমা ঠিক আমার পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। চারপাশের দেয়াল কোথায় যেন সরে গেছে। মনে হচ্ছে গভীর এক অরণ্যে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই মহিলা, আমার আর পাশে নন, একেবারে শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। মাংসপিণ্ড গলে গলে পড়ছে।

তুমি অমন থরথর করে কাঁপছ কেন পিন্টু! একী, তোমার গা যে আগুনের মতো গরম! জ্বর আসছে নাকি! ঘরে এসো, ঘরে এসো। এই নীচে কিছুতেই আমি আর একা থাকতে পারব না। ভোর অবদি তুমি আমার কাছে থেকে যাও। উনি জানতে পারবেন না।

ওপরে আমার ঘরে আলো জ্বলছে।

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলুম। এ কার গলা! ধরাধরা, ভাঙাভাঙা। আমার ভেতর থেকে আর একজন কেউ বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি তাকে চিনি না। অনেকদিন ধরে দেখে আসছি, বাগানের একপাশে ছোট একটা গর্ত। সবাই বলে, ও কিছু নয়, ইঁদুরের গর্ত। মাঝে মাঝে দেখার চেষ্টা করি, কে আছে ভেতরে! একফালি অন্ধকার। সময় সময় কী একটা নড়েচড়ে, কোনওদিন দেখতে পাই না। হঠাৎ একদিন ফোঁস করে তেড়ে উঠল একটা সাপ। ফণা তুলে হেলছে, দুলছে। বিস্ময়ে আমি জড়বৎ। সত্যিই তা হলে ছিল! ইঁদুরের গর্তে সাপ থাকে একথা তা হলে মিথ্যে নয়!

কাকিমা বললেন, জ্বলুক আলো। দিন ফুটলে তেজ কমে ফ্যাকাসে হয়ে যাবে। তখন আর বোঝাই যাবে না, শুধু শুধু আলো জ্বলছে। তুমি কাঁপছ, তোমার জ্বর আসছে! তুমি আমার কাছে এসো। আমি তোমাকে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকি। আরাম পাবে। কে আছে তোমার? কেউ তো নেই!

যা আমি বলতে চাই, তা তো সাহস করে বলতে পারব না। আর একজন মুখ চেপে ধরছে। জ্বর নয়, এ হল আমার প্যাশন। এতকাল গর্তে শুয়ে ছিল ন্যাজ গুটিয়ে, শীতঘুমে। হঠাৎ জেগে উঠছে। গ্রীষ্ম এসেছে। সদর দরজার ফাটলে ফাটলে আগুনরেখার যে ঝিলিমিলি দেখেছিলুম, তা আমার জ্বলন্ত ধমনীরই প্রতিচ্ছবি। লাভার মতো রক্তস্রোত বইছে। আমি আমার ছোট্ট নির্জন ঘরে ফিরে যেতে চাই, যেখানে একটি দীপ জ্বলে আছে আমার অপেক্ষায়, আমার ফেলে আসা সাধনা, মুখ-আঁটা একটি খামে আছে, একটি মেয়ের কোনও গোপন কথা। আমি যে পারছি না ফিরে যেতে। কে প্রবল? আমি, না আমারই রক্তে পুষ্ট সেই অন্যজন। আমি তার কাছে পরাজিত হতে চলেছি স্ট্রেট সেটে। দুটো শরীর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে একটি আয়োজনের দিকে পায়ে পায়ে। একজন জানে না আর-একজন কীভাবে অন্য আর-একজন হয়ে গেছে। সে এখন পুরুষ। চৌকাঠ, মেঝে, নিবে-যাওয়া হ্যারিকেনের কেরোসিন গন্ধ, অন্ধকারে ভাসমান চৌকি, একটি অন্যের ব্যবহৃত বিছানা, শাড়ির ক্ষারক্ষার গন্ধ, দেহের কিছু আবৃত অনাবৃত অংশ, জমাট বাতাস, ফিকে অন্ধকার। এই সেই বিছানা, যার একজন অংশীদার কোনও এক রাতে, কোনও এক অরণ্যভূমির প্রান্তে, ভাগ্যের শিকার হয়ে নীল শীতল ঘরে একটি ধাতুর চাদরে পড়ে ছিলেন কারুর অনিশ্চিত অপেক্ষায়। কেউ আসেনি। সেখান থেকে লাশকাটা ঘরে, তারও পরে অবয়বহীন, নামহীন একটা হাড়ের খাঁচা। গভীর রাতে ভৌতিক চেরাই ঘরের দেয়ালে। ছাত্ররা আসবে, দেখবে চিনবে, ফেমার, পেলভিস, ইলিয়াম, স্কাপুলা, ম্যাকসিলা, ম্যানভিবল—সব মানুষেরই তখন এক নাম।

অন্ধকার আমাদের দু'জনকেই গ্রাস করে নিয়েছে। ফিসফিস করে মহিলা বললেন, তুমি অমন থরথর করে কাঁপছ কেন? ম্যালেরিয়া আসছে নাকি? একটু শান্ত হও, একটু স্থির হও।

আমি নিজেকেই বোঝাতে পারছি না, তা এই মহিলাকে বোঝাই কী করে, এ এক অন্য ধরনের ম্যালেরিয়া। শরীরে আমাদের সাপ আছে। সাধকরা জানেন। সারপেন্ট পাওয়ার। এক স্থান মূলাধারে আর স্থান সহস্রারে। ভুজঙ্গ রূপা লোহিতা, স্বয়ম্ভুতে সুনিদ্রিতা। চতুর্দলবিশিষ্ট হস্তীপৃষ্ঠে পৃথ্বীবীজ লং, স্বয়ম্ভুশিববেষ্টিতা কুণ্ডলিনী নিদ্রিতা, দেবতা ব্রহ্মা ও দেবী সাবিত্রী। সেই সর্প পিঠ বেয়ে ঘাড়ের পেছন দিয়ে সোজা উঠে পড়েছে মাথায়। মেরুদণ্ডে নিউরনের সংকেত থ্যালামাসে গিয়ে ধাক্কা মারছে। আজ্ঞাচক্রে এ কীসের আজ্ঞা ভেসে বেড়াচ্ছে! দ্বিদলবিশিষ্ট এই চক্রের একটি দলে হং অন্যদলে ক্ষং বীজ। মুক্ত ত্রিবেণীতে কোথায় আমার ওঁকারধ্বনি। পরশিব, দেবী সিদ্ধকালী, ষড়মুখ ও চার হস্তযুক্ত হাকিনী দেবীই বা কোথায়! শুধুই থ্যালামাস। সেরিব্রাল করটেক্স বলছে, বড় নরম, বড় গরম, বড়ই গভীর আর গোপনীয়। সহস্রারে, সহস্রদলের মাঝে মিথুনাত্মক পরমশিব আর আদ্যাশক্তি। আমি তিনবার বলেছি, বাঁচাও বাঁচাও। কেউ আসেননি আমাকে বাঁচাতে। আমার দ্বিতীয় 'আমি' শুধু খ্যা খ্যা করে হাসছে। তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখি। আমারই অন্তরে থেকে, আমারে দিতেছ ফাঁকি।

কাকের গলায় বললুম, আমি ওপরে যাই। টেবিলে আমার আলো জ্বলছে।

অন্য তরফে সাড়া নেই। বিস্ফোরণে প্রকোষ্ঠ আমার ভেঙে পড়েছে। ওই যে রাত্রে এসে ছয়টা চোরে মেটে দেয়াল ডিঙিয়ে পড়ে। অন্ধকার আমাদের আবৃত করে রেখেছে, তাই আর একধাপ নীচে নামলেই কাল দিনের আলোয় নিজের মুখের সামনে নিজেই আর দাঁড়াতে পারব না। দেহের ওপর দেহ ভাঙছে, তটের ওপর ঢেউ ভাঙছে, নিদ্রাশেষে স্বপ্ন ভাঙছে, মৃত্যু এসে ঘট ভাঙছে। সবই যখন ভাঙনের খেলা, আমার আমিও ভাঙবে, তবু শেষ চেষ্টা। এই বদ্ধঘরেও ভেসে এল দূর থেকে ভোরের প্রথম পাখির শিস।

এস্কিমোরা যেমন কুঁজো হয়ে ইগলু থেকে বেরিয়ে এসে অরোরা বোরিয়ালিস দেখে, আমি সেইভাবে আর একটি শরীরের তলা থেকে বের করে আনলুম আমার ঘৃণিত শরীর। তোমাকে আমার ধিক্কার জানাই। তুমি শঠ, তুমি প্রবঞ্চক, তোমার ভেতরে বসে আছে তক্ষক। তুমি তার শিকার।

সদর দরজার ফাটলে সার সার রুপোলি রেখা। সদরে দিন এসে দাঁড়িয়েছে। এ দীনের আর ভাবনা কী। দুরারোগ্য ব্যাধিতে মরমর হয়েছিল। আবার বেঁচে ফিরে এসেছে। ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, যেন বহুকাল পরে, কত অচেনা! দোতলার বারান্দায় ঊষার আঁচল উড়ছে, প্রতিদিনের মতো তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছি না। অপবিত্র হয়ে মানুষ যেমন বলে, একটু সরে দাঁড়াও, আমাকে যেতে দাও, আমাকেও সেইভাবে পাশ কাটিয়ে সরে আসতে হল। টেবিলের আলো আমার জন্যে জেগে জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্ঞান-ঠাসা কেতাব, সোনার জলের লেখায় ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। শূন্য ঘরে কেউ নেই, তবু মনে হচ্ছে অদৃশ্য একঘর মানুষ হইহই করে বলছে, এসো, এসো। মায়ের ছবির দিকে তাকাতে পারছি না। দুটি চোখে আগের রাতের স্নেহের দৃষ্টি যেন আর নেই। ঘৃণা ধিক্কার, ঠোঁটের অভ্র হাসি মিলিয়ে গেছে। রক্তের ঋণ শোধ করে এলুম মা।

হঠাৎ মনে হল গঙ্গার জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। সব পাপ ধুয়ে যাক। ভূতের ব্যাখ্যা আমি পেয়ে গেছি। ভূত হল মানুষের দ্বিতীয় আমি। কখনও সে ছায়া, কখনও সে কায়া। সেই সুললিত কণ্ঠের মানুষটি, যিনি রোজ প্রাতে নাম গান করতে করতে স্নানে চলেন, তিনি চলেছেন। ভৈরবীতে ধরেছেন, রাই জাগো, রাই জাগো বলে ডাকে শুকসারি।

কোমরে গামছা বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়লুম। পিচ এখনও ভিজেভিজে। রাত সারারাত শিশিরে কেঁদেছে।

একটি রাতের খতিয়ান বড় কম হবে না। কত লক্ষ প্রাণ এল, কত লক্ষ প্রাণ গেল, কত অপরাধ ঘটে গেল, কত পবিত্র অপবিত্র হল! ভোরের প্রসন্ন আলোয় পুরুষ আর মহিলারা স্নানে চলেছে। বিধবা মহিলাদের সাদা থান, হাতে ঝকঝকে কমণ্ডলু, কারুর কারুর হাতে পেতলের সাজিতে সাদা আর নীল অপরাজিতা। টকটকে চেহারার বিলাসী বধূরাও চলেছে। বুকের ওপর আড়াআড়ি পেতে দিয়েছেন লাল ডুরে গামছা। রাতের আলস্য পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। শরীরে শয্যার গন্ধ, সুবাসিত তেলের গন্ধ, শাড়ির বেড় তখনও ঢিলেঢালা, খোঁপা আলগা। যাবার আগে রাত যেন আর এক তোলা যৌবন দান করে গেছে। সখীতে সখীতে কী যে আলাপ, চুড়ির শব্দের মতো হাসি উঠছে রিনরিনিয়ে।

সেই বিশাল সন্ন্যাসী চলেছেন। গলায় রুদ্রাক্ষ। রক্তাম্বর পরনে। শুভ্র কেশ, শুভ্র শ্মশ্রু, ঊর্ধ্ব নেত্র, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা। গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বলে চলেছেন হরি ওঁ, হরি ওঁ। প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবী যেন সংকুচিত হচ্ছে। প্রতিবার মন্ত্র উচ্চারণে বাতাস যেন কেঁপে উঠছে। আমিও চলেছি তাঁর পেছন পেছন।

গৈরিক জলধারা তরতর করে বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। সামনেই পশ্চিম। আকাশে তখনও অন্ধকারের শেষ পটিটুকু লেগে আছে। মন্দিরের চূড়া ভোরের আলো ধরে, সম্রাটের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জলে ভোরের আলো চুমকি বসিয়ে দিয়েছে। আকণ্ঠ নিমজ্জিত নরনারী, নানা সুরে স্তোত্র পড়ে চলেছেন। কেউ কেউ ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সবিতা স্তোত্র পড়ছেন, কেউ আবৃত্তি করছেন গায়ত্রী, কেউ করছেন পিতৃপুরুষের তর্পণ, অঞ্জলিবদ্ধ হাতের ফাঁক বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। ঝরা জলে খেলছে সূর্যের সাতটি রং।

সেই রুদ্রাক্ষধারী সন্ন্যাসী সাঁতার দিয়ে প্রায় মাঝগঙ্গায় চলে গিয়ে শবের মতো চিত হয়ে ভাসতে ভাসতে ভাটার টানে শ্মশানঘাটের দিকে চলেছেন। দুটো হাত মাথার দু'পাশে টানটান, দুটো পা ছড়ানো, দেহ চিত, ঊর্ধ্বমুখী, কোনও স্পন্দন নেই, নিখুঁত শবাসনে ভাসমান। কাছাকাছি কোনও শকুন থাকলে শব ভেবে বুকের ওপর এসে বসে পড়ত। জলে আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন স্নান করছিলেন। তিনি খুব অবজ্ঞাভরে বললেন, ভেলকি দেখাচ্ছে, ভেলকি। কথা শেষ করে ভুস করে একটা ডুব মারলেন, পরক্ষণেই উহু উহু করে উঠে পড়লেন। যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ। পরিচিত একজন জিজ্ঞেস করলেন, কী হল মুকুজ্যে?

দেখো তো ভাই, পিঠে কী একটা মেরে গেল। মনে হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। ভীষণ জ্বলছে।

জল থেকে একটু ওপরে উঠতেই দেখা গেল, চওড়া পিঠের বাঁ পাশে মেরুদণ্ডের কাছে রক্ত বেরোচ্ছে। চোখের ভুল কি না জানি না, রক্তের অক্ষরে পরিষ্কার একটি শব্দ ফুটে উঠেছে, ওঁ। কে যেন দেগে দিয়ে গেছে গরম লোহা দিয়ে।

সবাই বলতে লাগলেন, ওহে, আড়ট্যাংরায় কাঁটা ঝেড়েছে। বেশ ভোগাবে কিছুদিন। আমার মনে হল ভদ্রলোক সন্ন্যাসী-নিন্দার ফল হাতে হাতে পেয়ে গেলেন। আমরা সবাই স্নান করছি, ট্যাংরা মেরে গেল বেছে বেছে ওই নিন্দুককেই।

পুব আকাশ লাল হয়ে উঠেছে জবাফুলের মতো। পাশের খেয়াঘাট থেকে একটি নৌকা ছেড়ে গেল ওপারের দিকে। তিনজন মঠবাসিনী বসে আছেন উদাস হয়ে। দুটো জেলেনৌকা তরতর করে দক্ষিণ দিকে চলে গেল। কে একজন হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী মাছ আছে গো কত্তা? তারা কোনও উত্তর দিল না।

মেয়েদের স্নানঘাটের দিকে দৃষ্টি চলে গেল। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে কে একজন পেতলের ঘড়া জলে ভাসিয়ে দোল খাইয়ে খাইয়ে জল ধরার চেষ্টা করছে। ছোট ছোট তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। চমকে উঠলুম, মায়া। আমার দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে ভিজে শাড়ি লেপটে গেছে সারাশরীরে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে একজন হাতের মুদ্রা করে, চোখের সামনে ধরে সূর্য নমস্কার করছেন, ওঁ নমঃ বিবস্বতে। চোখ তাঁর সূর্যের দিকেই নেই, জবাকুসুম-সঙ্কাশং যেন নেমে এসেছেন মায়ার টোল-খাওয়া বুকে। মনে হল একবার বলি, এই ব্যাটা, আকাশের দিকে তাকা। সকাল না-হতেই মানুষের খিদে। পেটের খিদে, মনের খিদে, দেহের খিদে।

শরীরের অদ্ভুত ভঙ্গি করে মায়া ঘড়াটা কাঁখে রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে ইশারা করলে, উঠে এসো। ভদ্রলোকের স্তোত্র ভুল হয়ে যাচ্ছে, জবা জবা করছেন। থাকতে না পেরে বলে ফেলেছি, কুসুম সঙ্কাশং। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কুসুম সঙ্কাশং।

ভিজে পাতা যেন সোনার পাত। জলের কিনারায় ফুল ভাসছে, ভাসছে চিতার কাঠকয়লা। ঘাটের বাইরে কাঁখে কলসি নিয়ে মায়া দাঁড়িয়ে আছে যক্ষিণী মূর্তির মতো। ভিজে কাপড় থেকে জল ঝরেছে পায়ের কাছে।

সামনে দাঁড়াতেই মায়া বললে, কী গো একেবারে ভুলে গেলে? বলেই সে ধীর পায়ে চলতে লাগল। দূরে আরও দূরে। বৈষ্ণব কবি হলে লিখতেন, আমার আঁখিভ্রমর জড়িয়ে গেল তার ভিজে কাপড়ে জড়ানো শরীরের ছন্দে।

I may load and unload
Again and again
Till I fill the whole shed,
And what have I then.

মুকুর খামটা আর খোলার অবসর পাচ্ছি না। একটু নির্জনতা চাই। সে তো মধ্যরাতের আগে আসবে না। দুপুরের দিকে একটু অবসর মিলতে পারে। মাতুলের বাড়িতে যে-নেপালি যুবকটি কাজ করে, সেই বাহাদুর এসেছে একটি চিঠি নিয়ে।

স্নেহভাজনেষু, অদ্যই এই শহরে আমার শেষ রজনী। কাল আমি লোটাকম্বল নিয়ে সরে পড়ছি। ভেবো না যেন আমি পরাজিত। একে তুমি বলতে পারো সাময়িক বাধা, এ টেম্পোরারি সেট ব্যাক। যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটু কাব্য করে যাই। রবার্ট ফ্রস্ট পড়ছিলুম, কাল রাতে। তোমার প্রিয় গায়ক ধনঞ্জয়বাবুর সেই গানের লাইন ভাসছিল মনে, কাল সারারাত চোখে ঘুম ছিল না। ছিল না চোখে। আমার ছবিতে উনি যে দুটি গান করেছেন অনবদ্য হয়েছে। রেকর্ড কোম্পানি মাসখানেকের মধ্যেই ডিস্ক বাজারে ছাড়বেন, পারলে শুনে নিয়ো। একটি গান আছে দরবারিতে। আমার বিশ্বাস, ওই গান বহুকাল বাংলার আকাশে বাতাসে ঘুরবে। বড় বেদনার গান।

কাল রাতে প্রথম টের পেলুম প্রবাসী হবার কী বেদনা! মানুষ দীর্ঘকাল যেখানে বসবাস করে, গাছের মতো সেখানে তার শিকড় নেমে যায়। গৃহীমানুষ আর যাযাবর মানুষে এই তফাত। জিপসি হলে এইসব ছোটখাটো বন্ধন আমাকে আর এভাবে পীড়া দিতে পারত না। এই সাজানো সংসার। ওরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর আমি এক যক্ষের মতো এ ঘর থেকে ও ঘর, ও ঘর থেকে সে ঘরে দুঃস্বপ্নের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। কেবলই মনে হচ্ছিল, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে, এখুনি নিবে যাবে, যতটা পারি, যতক্ষণ পারি দেখে নিই। একটা জিনিস বড় বেদনার হে, মানুষ চলে যাবার পরও এই পৃথিবী থাকবে। গাছপালা, চাঁদ তারা সব থাকবে, সুর থাকবে সংগীত থাকবে। কালকের রাত বড় গোলমেলে ছিল। জানি না বিদায়ের আগের রাত এইরকমই হয় হয়তো! বর্তমান মানুষকে খুব একটা কষ্ট দিতে পারে না, যত কষ্ট দেয় স্মৃতি। তা ধরো বছর তিরিশ ধরে এই জমিতে আমার শিকড় নেমেছে, তাকে উপড়ে ফেলতে একটু কষ্ট হবে না। তুমি কি জীবনকে অত সহজ ভাবো নাকি! বেঁচে থাকার একটা স্পন্দন নেই! মানুষ যেখানে থাকে সেখানে তার সঙ্গে আরও অনেক কিছু থাকে, দৃশ্য অদৃশ্য। দেহের যেমন ছায়া আছে, মনেরও তেমনি ছায়া আছে। শুধু মাটিতে নয়, মানুষ বেঁচে থাকে আকাশে বাতাসে মাটির গভীরে। চারপাশে বলয়ের মতো অদৃশ্য একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে যায়। মাকড়সার জালের মতো অদৃশ্য জাল তৈরি হয়। সেই জাল ছিঁড়ে আমাকে বেরোতে হবে। মনের অবস্থাটা তা

হলে একবার বোঝো। তুমি হলে কেঁদে ফেলতে। বসার ঘরের সোফাটোফা সব বিক্রি হয়ে গেছে, কাল সকালেই ক্রেতা এসে ঘর খালি করে সব নিয়ে যাবে। আমার সেই চাকা লাগানো সাধের রুপোলি খাট, যেটা আমাকে এক মহারাজা প্রেজেন্ট করেছিলেন, সেটাকেও বেচে দিলুম। অনেক পাওনাদার বাজারে, বুঝলে! এ ছাড়া অন্য আর কোনও রাস্তা চোখে পড়ছে না। সঙ্গে রইল আমার সাধের তম্বুরা আর স্কেল চেঞ্জ হারমোনিয়ম। এ জিনিস সহজে পাওয়া যাবে না। এক গাদা ভাল ভাল ফুলগাছের টব আছে। তোমার যদি নেবার ইচ্ছে থাকে জানাও। বাহাদুরকে দিয়ে ঠেলায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দোব। সাত-আট রকমের গোলাপ আছে। ফুল ফুটলে তবু আমার কথা মনে পড়বে। ছেড়ে চলে যেতে মন কি চায়! কী করব বলো? সাধারণ চাকরি আমি করতে পারব না, অসম্ভব। কলকাতার সংগীত জগতে বড় দলাদলি। এখানে থাকলে, দেহ আর মন দুটোতেই শুকিয়ে মরতে হবে। যাই কিছুদিন ঘুরে আসি।

হ্যাঁ যে-কারণে চিঠি, এক, আজ সন্ধেবেলা ইনস্টিট্যুটে গুরুজি সংগীত পরিবেশন করবেন। সঙ্গে আমিও আছি। পারলে তোমরা এসো। ধরে নিতে পারো, কলকাতার আসরে এই আমার সোয়ান সং। দুই, তোমার পিতৃদেবকে জিজ্ঞেস করো, বাহাদুর ছেলেটি বড় ভাল, ভীষণ কাজের, তোমাদের সংসারে ওর একটু স্থান হতে পারে কি? সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল। যদি না পারি তোমরা ওকে রাখবে কি?

যদি গান শুনতে আসো, গেটে আমার নাম করলেই হবে।

মন ভীষণ খারাপ, সাংঘাতিক আবেগ আসছে। এ আমার জয় না পরাজয়? শোননা তো রবার্ট ফ্রস্ট কী বলছেন:

The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not to bar
Our passage to our journey's end for good
But just to ask us who we think we are.

চলি রে। ইতি তোর মামা॥

চিঠিটা পিতার হাতে তুলে দিলুম। পড়তে পড়তে ক্রমশই তাঁর মুখের ভাব গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হল। চিঠিটা টেবিলের ওপর চশমা চাপা দিয়ে রেখে বাহাদুরের দিকে তাকালেন, তোমার বাবু এখন কী করছেন?

গান করছেন।

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে বললেন, গেট রেডি।

আপনি কি এখন ও বাড়িতে যাবেন?

অফকোর্স! একটা সংসার ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, শেষ চেষ্টা একবার করে দেখা যাক। তোমার কাকিমা নিশ্চয়ই বাড়িটা একটু আগলাতে পারবেন?

কাকিমার নাম শুনে বুক ছাঁত করে উঠল। কণ্ঠতালু শুকিয়ে এল। লোহা তপ্ত হয়েছিল, ভোরবেলায় জলে ডুবিয়ে এনেছি। গুরুজনের মুখের দিকে সোজা তাকাতে পারছি না। ভুলতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। আদৌ ভোলা যাবে কি? চরিত্রের স্ফটিক গোলক হাত ফসকে পড়ে গেছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যা ঘটে গেছে,

তা আর কেউ জানে না, জানে রাত আর জানে দুটি মাত্র প্রাণী। রাতের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ঘটনা চলে যাবে দূর থেকে দূরে, অতীত থেকে অতীতে। ঘটনা কোথায় চলে যায়! মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড কি সময়ের নদীর কোনওখানে গিয়ে পলির মতো সঞ্চিত হয়? চর জেগে থাকে? যেখানে মানুষ আবার কোনওদিন ফিরে গিয়ে খুঁজে খুঁজে দেখতে পারে, জীবনের পর জীবন ধরে সে কী করেছে! সুকর্ম কুকর্মের নুড়ি নুড়ি সঞ্চয়। জানা নেই আমার প্রারব্ধ কী, আর আরব্ধ কী?

পিতা বললেন, কী হল, মনে হচ্ছে তুমি যেন ঘোরে আছ? তোমার গালটা অমন করে আঁচড়ে দিলে কে? বাড়িতে তো বেড়াল নেই!

মিথ্যে যেন জিভের ডগায় ছত্রীসেনার মতো প্রস্তুত ছিল। তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল, আজ্ঞে, সকালে গঙ্গার স্নানে গিয়েছিলুম, মাছে কাঁটা মেরে দিয়েছে।

সে কী? ওষুধ লাগিয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এক মিথ্যে আর এক মিথ্যেকে টেনে আনে। নিজের সাহসে নিজেই অবাক।

তুমি তা হলে কাকিমাকে বলে এসো, আমি ততক্ষণ কাপড়জামা পরে নিই।

নীচে নামতে পা কাঁপছিল। মনে হচ্ছিল অপরাধী যেন অপরাধের জায়গায় ফিরে চলেছে। গিয়ে দেখব ক্ষতবিক্ষত পড়ে আছে পবিত্রতা। আবার ভালও লাগছে। কারা যেন জিভে সাপের ছোবলের নেশা করে! বারেবারে ফিরে ফিরে যায়। শরীর ভেঙে যায়, মৃতমাছের মতো চোখের দৃষ্টি হয়, গাল ভেঙে যায়, তবু যায়। বিষের এতই মাদকতা। গালিবের মতো বলতে ইচ্ছে করছে:

পিনহাঁ থা দাম সখৎ করিব আশিয়াঁ কে,
উড়নে নহ্ পায়ে থে কেহ্ গিরিফতার হম হুয়ে॥

পাখি ফাঁদ পাতা ছিল বাসার খুব কাছে। ধরা পড়ে গেলে উড়তে-না-উড়তেই॥

নীচের দৃশ্যটি ভারী চমৎকার। তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরছেন। আঙুল দিয়ে একবার করে লাগাচ্ছেন। মাথার পেছনের চুলে আঙুল মুছে আবার সিঁদুর তুলে আবার পরছেন। দরজার আড়াল থেকে আমি দেখছি আর ভাবছি, ভাগ্যের এ কী পরিহাস! কিছু বলতে পারছি না, ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরতে পারছিনা। বেদান্তবাদী বলতেন, কী মায়া! যা নেই তা আছে মনে করে কী বিভ্রান্তি।

ঘাড় ঘুরিয়ে কাকিমা বললেন, থাক আর চুরি করে দেখতে হবে না, ঘরে এসো দুষ্টু ছেলে।

কথা শুনে অপরাধবোধ অনেক কমে গেল। এ জগতের বিশেষ কিছুই তো জানি না! কীসে কী হয়! কার মনে কী থাকে! মহিলাকে এই মুহূর্তে ভীষণ তাজা দেখাচ্ছে। বহুদিন আগে এক ফসলের বাগানে শীতের ভোরে বাঁধাকপি দেখেছিলুম। পাতার ফাঁকে কপির ঠাস মুখটি উঁকি দিচ্ছে। সুন্দরী মহিলার নাকের ডগার ঘামের মতো ফুটে আছে সারারাতের শিশির। সেদিন সেই দেখেছিলুম, আজ দেখছি কাকিমার মুখ। সারা পৃথিবীটা ঈশ্বরের কী সুন্দর সৃষ্টি! কোথা থেকে একটু দুঃখ এসে সব মাটি করে দিয়ে যায়।

সিঁথিতে সিঁদুরের শেষ টান মেরে, মাথার পেছনে আঙুল মুছলেন। কৌটোর ঢাকা বন্ধ করে আয়নার সামনে রাখলেন। এ ঘরে বাতাস তো তেমন আসে না। শরীরের কয়েকটি জায়গা এরই মধ্যে অল্প অল্প ঘেমে উঠেছে। এক রাশ ভিজে কালো চুল পিঠ ছেয়ে পড়ে আছে। আজ যেন পটে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে। না কি আমার মনের ভুল! ভাল লাগার দৃষ্টিতে দেখছি বলেই কি ভাল লাগছে? যেমন পরকলা পরে পৃথিবীকে দেখবে পৃথিবী ঠিক তেমন দেখাবে। মায়ের স্নেহের দৃষ্টিতে যেমন সব সন্তানই সুন্দর!

কাকিমা ধীরে ধীরে আমার সামনে এগিয়ে এলেন, কাছে, খুব কাছে। বললেন, তুমি কী! তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই!

ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। কী বলতে চাইছেন? এমন কিছু, যা শোনার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কাকিমা আঁচলের গেরো খুলে, দলা পাকানো একটা সুতোর তাল বের করলেন। সুতোর দলা কপালে ঠেকিয়ে আমার সামনে ধরলেন।।

ছি ছি, তোমার পইতে খুলে পড়ে গেছে খেয়াল নেই। আর একটু হলেই আমার পায়ে ঠেকে যেত। আজকালকার ছেলে তো, কোনও কিছু মানামানি নেই। নাও এখুনি পরে নাও।

অবাক হয়ে যাবার মতো ঘটনা। গলা থেকে পইতে খুলে পড়ে গেছে টের পাইনি। উন্মত্ততার শেষ সীমায় পৌঁছেলে মানুষের এইরকমই হয়। শুনেছি হাঙরে জলের তলায় পা কেটে নিয়ে গেলে মানুষ তখনই টের পায় না। পইতেটা নিয়ে বললুম, এটা আর পরা যাবে না। গঙ্গায় বিসর্জন দিতে হবে। নতুন পইতে চাই।

ব্রাহ্মণ মানুষ, গলা খালি রেখো না। নতুন পইতে আছে তো?

তা আছে। তৈরি করে পরে নোব। আমি আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি। আমরা একবার মামার বাড়ি যাচ্ছি। ওপর খোলা থাকছে।

থাক না। আমি তো এখুনি রান্না চাপাব। কী হবে, কিছু বলেছেন?

না, আপনার যা খুশি।

ওপরে আসতেই পিতা বললেন, তুমি এই বাক্সটা সাবধানে ধরো, বেশি ভারী নয়। আচ্ছা, এখন কি রিকশা পাওয়া যাবে?

কেন যাবে না। ওই তো মোড়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে।

তা হলে চলো। দেরি করে লাভ নেই।

রিকশা চলেছে প্যাঁকোর প্যাঁকোর করে। রাস্তায় লোক থইথই করছে। নিজেকে কেমন যেন বিবাহিত বিবাহিত লাগছে। কেমন যেন পাকাপাকা। পিতার গায়ে গা লেগে গেলে মনে হচ্ছে, একটা মন্দির অপবিত্র করে দিলুম। আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এই মুহূর্তে আমার মুখের দিকে তাকালেই বলে দিতে পারতেন, এই ছোকরাটি কুমারত্ব হারিয়েছে। আমি সব দেখছি; কিন্তু কেমন যেন নেশায় বুঁদ হয়ে। সাপের ছোবল খেয়েছি আমার পরিষ্কার জিভে।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মাতুলের গাড়ি। গাড়িতে স্টার্ট রয়েছে। ইঞ্জিন আদুরে বেড়ালের মতো ঘড়ঘড় করছে। স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন চোখা এক ভদ্রলোক। গাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে মাতুল সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা রিকশা থেকে নামতে-না-নামতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। রাস্তার একপাশে মাতুল এমন

মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে জামাই চলে গেল। গাড়িটার সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। মানুষ কত কষ্ট করে একটা কিছু গড়ে তোলে, সেই গড়া জিনিস ভেঙে গেলে মন তো খারাপ হবেই। আমারই হচ্ছে।

পিতৃদেব এগিয়ে গিয়ে মাতুলের কাঁধে হাত রাখলেন, মন খারাপ কোরো না জয়। এর চেয়ে ভাল গাড়ি তোমার হবে।

মাতুল দুঃখের হাসি হেসে বললেন, যাহা যায়, তাহা যায়। চলুন, ভেতরে চলুন। আমার কী সৌভাগ্য!

সিঁড়ির একেবারে ওপরের ধাপে একটি সাদা লোমওলা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে। তার যেন সবেতেই মহানন্দ। আমাদের দেখে ধেই ধেই নাচ শুরু হল। আমরা বসার ঘরে এসে যে-সোফাগুলো একটু পরেই বিক্রি হয়ে যাবে তারই একটায় বসলুম। কিছু দূরে মেঝেতে গালচে পাতা, শোয়ানো রয়েছে বিশাল একটি তম্বুরা। বসে আছে সেই হারমোনিয়ম। রুপোর পাত আর মাদার অফ পার্লসের কাজ করা।

মাতুল বললেন, বসুন, আমি একটু চায়ের কথা বলে আসি।

শুধু চা, সঙ্গে আর কিছু নয় কিন্তু!

কেন আর কিছু নয় কেন?

আমরা মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালুম। মাতামহ এসে দাঁড়িয়েছেন। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সাদা একটি পইতে প্রশস্ত বক্ষদেশের এ কোণ থেকে ও কোণে চলে গেছে। পায়ে খড়ম। খুটুর খুটুর আওয়াজ হচ্ছে। কপালে বেশ বড় মাপের একটি লাল চন্দন-টিপ।

পিতা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, আসুন, আসুন, এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? এতদিন ছিলেন কোথায়?

মাতামহ চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে এলেন, খড়াস করে খড়মের শব্দ হল। মাতামহ বললেন, একটু ভাঙাগড়ার মধ্যে রয়েছি হরিশঙ্কর। অনেক কিছু ভাঙতে হচ্ছে, অনেক কিছু গড়তে হচ্ছে। তোমাকে একটা কথা বলি।

মাতামহ সামনের সোফায় বসলেন, মাতুল বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কুকুর চলল পেছনে পেছনে।

মাতামহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, বুঝলে, অত সহজ নয়। অনেক সময় লাগে। সবসময় সময়েও হয় না। আলাদা একটা মন চাই।

কীসের কথা বলছেন বলুন তো!

ছাড়ব বললেই সব ছাড়া যায় না। হাসিহাসি মুখে ভাঙা যায় না। বড় কষ্ট হয় বুঝলে, সবচেয়ে কষ্ট দেয় স্মৃতি। এই ঘরটা তোমার মনে পড়ে হরিশঙ্কর!

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব পড়ে।

মনে পড়ে, ওই গালচেটা এখন যে জায়গায় পাতা আছে, ঠিক ওই জায়গায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ ওই জায়গায়, ওই কোণটায় আমি বসেছিলুম।

আচ্ছা বলো তো, কত বছর, কত বছর পেছোলে আবার সেই রাত ফিরে আসবে? সেই সানাইয়ের সুর, সেই ফুলের গন্ধ। সময়ের চেয়ে মানুষের আর বড় শত্রু কে? দেখো না, এই দশ মিনিট আগেও আমার বয়েস দশ মিনিট কম ছিল। জয়ের গাড়িটা ছিল। আমাদের বয়েসে দশ মিনিটি যোগ হল, পরমায়ু দশ মিনিট ক্ষয়

হল, একটা সম্পদ চলে গেল। সময়কে আর একটু এগোতে দাও, দেখবে এই ঘর খালি, আর একটু এগোতে দাও, সব ভোঁ ভাঁ। শূন্য ঘরে, ঘুলঘুলির চড়াইয়ের ডাক ঝনঝন করছে, যেন শাঁখার ওপর শাঁখারির আধ-খাওয়া চাঁদের মতো করাত চলছে। এ বড় শক্ত ঠাঁই হে হরিশঙ্কর। এত দেখেও মনটাকে বাঁধতে পারলুম না!

মাতামহ সোফা ছেড়ে গালচের ওপর স্থান নিলেন। ভীষণ ব্যস্ততায় কাঁধে তুলে নিলেন তম্বুরা, সুর বাঁধাই ছিল, আঙুল ঠেকাতেই বাতাস ভরে গেল। গান ধরলেন:

উঠো গো করুণাময়ী
খোলো গো কুটিরদ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি
হৃদি কাঁদে অনিবার॥

মাতামহ ওস্তাদের মতো হাঁটু মুড়ে বসেছেন। সামনে খাড়া হয়ে আছে তম্বুরা। চোখদুটি মুদিত। মুখ জবাফুলের মতো লাল। চোখের কোল বেয়ে নামছে জলের ধারা। এত সুন্দর গান কদাচিৎ শোনা যায়। এ যেন মাতামহের 'সোয়ান সং'।

পিতা বললেন, নেমে বোসো, নেমে বোসো।

দু'জনেই নেমে বসলুম। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। মাতুল এ ব্যাপারে একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত। যা কাল ছেড়ে যেতে হবে, তাকে আজও সুন্দর করে রেখেছেন। অবহেলায় এলোমেলো নয়। মাতুল এসে আসরে বসেই মাতামহের সঙ্গে হারমোনিয়ম ধরলেন। এ যেন এক মণিকাঞ্চন যোগ। বাইরে প্রথম শরতের রোদ ঝলমল করছে। গোটাকতক হলদে আর সাদা প্রজাপতি খুব নাচানাচি করছে।

পিতা আপন মনেই বললেন, আহা এ লীলা কি ভাঙা যায়!

মাতামহ প্রথম গান শেষ করে, দ্বিতীয় গান ধরলেন,

রাজরাজেশ্বর দেখা দাও।
করুণা-ভিখারি আমি, করুণা-নয়নে চাও॥

পিতা বললেন, আহা সকালেও কাফি কী সুন্দর লাগে।

মাতুল সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন,

চরণে উৎসর্গ দান, করিয়াছি এই প্রাণ,
সংসার-অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও॥
কলুষ কলঙ্কে ভরা আবরিত এ হৃদয়,
মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
মৃতসঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়া লও॥

একটি সুন্দর ট্রে-তে বেশ দামি কাপডিশ সাজিয়ে মাইমা ঘরে এসেছেন। মাথায় পরিমিত ঘোমটা। গরম শিঙাড়ার গন্ধ ভাসছে। চায়ের পট তোয়ালের জামা পরেছে। বাহাদুর ট্রে-টি মেঝেতে সাবধানে নামিয়ে রাখল। ভোজনরসিক মাতুল আজও আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখেননি। রাতে নিশ্চয়ই লুচিমাংসের ব্যবস্থা হয়েছে। মাতুল প্রায়ই ঠাকুরের একটি কথা বলেন, রাজার ছেলের মাসোহারার অভাব হয় না।

রাজরাজেশ্বর দেখা দাও

প্রথম চরণটি গেয়ে, গান শেষ হল। তম্বুরা রেখে মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। পিতা বললেন, চললেন কোথায়? বসুন স্থির হয়ে।

আমি, আমি বসব? আমি যে একটা গেঁয়ো লোক, হেটো লোক!

আমিও তো তাই, আমি বসলে আপনিও বসবেন।

মাতুল মাথা নিচু করে আছেন। মাইমা একপাশে জড়োসড়ো। বাহাদুর নিলডাউন। পিতার কথা অমান্য করার সাহস মাতামহের নেই। তিনি বসলেন।

পিতা বললেন, বউমা, দাও, এবার সবাইকে দাও। শিঙাড়া কি তুমি ভাজলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমাদের সামনে ডিশ ধরে দেবার জন্যে মাইমা যেই হাত বাড়ালেন, তখনই নজরে পড়ল, হাতে শাঁখা ছাড়া আর কিছু নেই। সব অলংকার ছায়াছবিতে ভোজবাজি হয়ে গেছে।

প্লেটে প্লেটে সকলকে শিঙাড়া এগিয়ে দিয়ে মাইমা উঠে যাচ্ছিলেন, পিতা বললেন, বউমা, বোসো।

তিনি মেঝেতে ভব্য হয়ে বসে আদেশ পালন করলেন। পিতা আমাকে বললেন, দেখি বাক্সটা।

খড়খড়ে কুমিরের চামড়ার সুদৃশ্য বাক্স খুলে তিনি দু'গাছা মোটা মোটা রুলি বের করলেন। সোনার রংটা যেন সকালের প্রথম রোদের মতো। রুলিদুটো মাইমার দিকে এগিয়ে ধরে তিনি বললেন, নাও, পরে নাও। মেয়েদের হাত খালি রাখতে নেই।

মাইমা ভীষণ বিপদে পড়েছেন, একবার মাতুলের মুখের দিকে, একবার মাতামহের মুখের দিকে, একবার পিতার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন আর ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন।

মাতামহ শেষে বললেন, এ কী করছ হরিশঙ্কর, ও যে সোনার, অনেক দাম!

হ্যাঁ, অনেক দাম, তাতে কী হয়েছে? তার চেয়েও দামি আমাদের দিতে পারার মন। লাখোপতি কোটিপতিও দরিদ্র, যদি তার মনটা ক্ষুদ্র হয়।

তুমি এ কী হঠকারিতা করছ হরিশঙ্কর! আমার নাতিটার বিয়ে এসে গেল, এসব তখন তোমার খুব লাগবে।

হ্যাঁ, তা লাগবে, তবে একটা কথা জেনে নিন, ঘুড়ি দু'ভাবে ওড়ে। এক, কেউ ধরাই দিয়ে তুলে দেয়। দুই, নিজেই হেঁচকে হেঁচকে আকাশে তোলা যায়। নাতি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেবে, না পারলে আপনার নাতবউ নিরালংকারাই থাকবে। তা ছাড়া, বউমা যে-ঘর থেকে আসবে, তাঁরা মেয়েকে সাজিয়েই পাঠাবেন।

মাতামহ নীরব। মাইমা মৃদু গলায় মাতুলকে বললেন, তুমি কিছু বলছ না কেন?

মাতুল উদাস মুখে বললেন, এ তো আমারই অক্ষমতা!

পিতা গম্ভীর গলায় বললেন, ভুল কোরো না, আমার উপর কারুর কিছু বলার নেই। বাধ্য মেয়ের মতো নিয়ে আমার সামনেই হাতে পরে ফেলো। অবাধ্যতা আমি ভীষণ অপছন্দ করি।

মাতুল নিজের মনেই বললেন, ছি ছি, এ আমার অক্ষমতা।

পিতা বললেন, অক্ষমতা অক্ষমতা করে পেন্ডুলামের মতো দুলছ কেন? যুদ্ধে হেরে গিয়ে কম্যান্ডার ফিরে এলেও দেশের মানুষ তাকে মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে, বলে হিরোইক-ডিফিট। স্পেকুলেশনে হার-জিত থাকবেই। নাও, পরে নাও। নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।

মাতামহ বললেন, বউমা, পরে ফেলো। জামাইকে আমার চিনি। বাধা পেলেই সে পাহাড়ি নদী।

মাইমা রুলিদুটি মাথায় ঠেকালেন, তারপর মর্যাদা অনুসারে সকলকে একে একে প্রণাম করলেন। দরজার সামনে বাহাদুর। তার মুখে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। যেন হিমালয়ে রোদ পড়েছে।

সদর থেকে ধরাধরা গলায় কে ডাক ছাড়লেন, জয়বাবু আছেন, জয়বাবু!

সামনে যখন যাবি ওরে থাক-না পিছন পিছে পড়ে

আসুন, আসুন, বিষ্টুবাবু আসুন।

বিক্রেতা মাতুলের খাতির করার ধরন দেখে মনে হচ্ছে ইনি একজন ক্রেতা। পরনে ঝলঝলে ট্রাউজার, দু'পকেটঅলা বুশশার্ট। পকেটদুটো কাগজপত্রে ঠাসা। একটা পকেটে উঁকি মারছে সোনালি সিগারেট কেস। আর এক পকেটে লেদার পার্স। ভদ্রলোকের বেশ গোদা চেহারা। ভুঁড়ি-ওলটানো গামলার মতো বুশশার্টকে সামনের দিকে ঠেলে রেখেছে। চৌকাঠের ওপর দিয়ে ঘরে একটা পা ফেললেন, বেশ কম্পন অনুভব করা গেল। কাপডিশ চিন করে উঠল।

অ, আসর বসে গেছে!

আমার বলতে ইচ্ছে করল, আ, বসেছে। মুখে এসেও আটকে গেল। ভদ্রলোকের অবয়ব থেকে ঐশ্বর্যের বদ গন্ধ বেরোচ্ছে। যা ধান্যেশ্বরীর গন্ধকেও হার মানায়, এমন বদবিটকেলে! আমরা সবাই মেঝেতে গালচের ওপর বসে আছি, তিনি দুম করে সোফায় গিয়ে বসলেন। সোফা সেই শরীরের ভারে নাচতে লাগল।

পিতার চোখ অনুসরণ করছে প্রতিটি গতিবিধি, ভাবভঙ্গি। বেশ বুঝতে পারছি, মনে মনে বারকতক ভালগার বলা হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের নীচের ঠোঁট অসম্ভব পুরু। দুধে ভেজানো কালো পাউরুটির মতো। আমার মনে হয়, ইনি খাবার সময় হুসহাস শব্দ করেন। ঢেউ করে ঢেঁকুর তোলেন। খেয়ে উঠে দাঁত খোঁচান, দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যাংশ বের করার জন্যে এক ধরনের চুসুক চুসুক শব্দ করেন। খাট কাঁপিয়ে দুম করে পাশ ফেরেন এবং পাশবালিশ ব্যবহার করেন। নিঃসন্দেহে ইনি একজন মদমত্ত পুরুষ। ঘামে অবশ্যই দুর্গন্ধ আছে। পিতা একদিন নিশ্চয়ই বলবেন, ওয়েলদি ফ্রগ। সর্ব অঙ্গে টাকার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড।

সোফাকে আর একবার নাচিয়ে বললেন, স্প্রিং ঠিক আছে তো! একটু দেবে দেবে গেছে মনে হচ্ছে।

মাতুল বললেন, না না, একেবারে নতুনের মতোই আছে। আমার কাছে জিনিসপত্র খুব যত্নেই থাকে। তা ছাড়া বাড়িতে ছোট ছেলেপুলে নেই।

অ।

পায়ের ওপর পা তুলে বারকতক নাচিয়ে নিলেন। বাহাদুর এসে এক প্লেট শিঙাড়া আর এক কাপ চা ধরে দিয়ে গেল। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে শিঙাড়ার প্লেট নিতে নিতে বললেন, এসব আবার কেন, এসব আবার কেন। দু'আঙুলে একটা শিঙাড়া ধরে কামড় মেরেই হা হা করতে লাগলেন। গরম লেগেছে। মুখ দিয়ে যেন ড্রাগনের নিশ্বাস বেরোচ্ছে। কতটা গরম ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি। কোনওরকমে গলা দিয়ে নামালেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, বেশ কাবু হয়ে পড়েছেন। মা যেমন গরম-লেগে-যাওয়া সন্তানকে দুলিয়ে দুলিয়ে হাওয়া

খাইয়ে শান্ত করার চেষ্টা করেন, ভদ্রলোক তেমনি আধ-খাওয়া শিঙাড়াটিকে হাওয়া খাওয়াতে লাগলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, গান থামল কেন? চলুক না চলুক। একটু ভৈরবী-টেরবি।

মাতুলের ভুরুর কাছটা কুঁচকে গেল। আমি জানি এই ধরনের কথা তিনি সহ্য করতে পারেন না। ভেতরে ভেতরে তেতে উঠছেন। ফেটে পড়লেন বলে। মাতামহের হাতের মুঠো খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত তাঁর যা বলার ইচ্ছে হয়, তা হল, ধুর মড়া! খুব কষ্টে নিজেকে সংযত রেখেছেন।

এতক্ষণে পিতা মুখ খুললেন, জয়, ইনিই কি তোমার সেই সোফার ক্রেতা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

পেমেন্ট করেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কত?

হাজার।

ভদ্রলোক ফড়াস করে চায়ে চুমুক মেরে বললেন, এখন মনে হচ্ছে দামটা একটু বেশি হয়ে গেছে। সাতশো-টাতশো হলেই ভাল হত। আবার একটা দোর্দণ্ড চুমুক।

পিতা কুমিরের চামড়ার সেই বাক্সটি খুলে, একটা দশ টাকার নোটের কড়কড়ে বান্ডিল হাতে তুলে নিলেন। বান্ডিলটা ভদ্রলোকের দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, হিয়ার ইউ আর।

নোটের বান্ডিল সোফায় পড়ে অল্প একটু নেচে উঠল। ভদ্রলোক কাপ নামিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, এর মানে?

পিতা বললেন, ভেরি সিম্পল। হাজার আছে কি না দেখে নিন, তারপর যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে যান।

কেন কেন, সোফা বিক্রি হবে না?

না।

তার মানে? আপনি কে?

জানার প্রয়োজন নেই। চা খাওয়া হয়েছে? আচ্ছা, তা হলে আসুন।

পিতা হাত জোড় করে মুখে অদ্ভুত এক হাসি ভাঙলেন। ভদ্রলোক বললেন, সেকী! মেয়ের বিয়ে, জামাইকে সোফাসেট দোব, সব ঠিক।

বেশ তো নতুন কিনে দিন, কত আর পড়বে, এই ধরনের জিনিস হাজার তিনেকে হয়ে যাবে, তবে বাঘছালের কভার হবে না।

অ্যাঁ, এটা বাঘছাল নাকি?

বসে আছেন, বুঝতে পারছেন না!

বাঘছাল! সোফায় বাঘছালের কভার। এর দাম তো তা হলে দশ-বারো হাজারও হতে পারে।

অবশ্যই পারে।

তা হলে?

তা হলে টাকাটা তুলে নিয়ে দয়া করে আসুন।

কে যে আপনি? কোথা থেকে যে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন!

মাতামহ দুম করে গালচের ওপর একটা চাপড় মেরে জানিয়ে দিলেন, আর বেশিক্ষণ সহ্য করব না। এইবার লেগে যাবে ধুন্ধুমার। মাতুল বললেন, কাকে কী বলছেন? জানেন ইনি কে?

ভদ্রলোক বললেন, আমার জানার দরকার নেই। বিক্রির সময় উনি কি ছিলেন?

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, আর তো সহ্য করা যাচ্ছে না। তোমার রাগ হচ্ছে না?

রাগের বদলে দুঃখ হচ্ছে। এই ভদ্রলোকের কী অবস্থা দেখেছেন, লোভে একেবারে জরোজরো। দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য। শিকার ফসকে গেলে সব পশুরই এক অবস্থা হয়।

ভদ্রলোক এবার উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছিল, সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা কী হবে?

পিতা বললেন, ওটা যেমন ঝুলছে, ঝুলবে, আলো দেবে।

অ। আর কিছু বিক্রি হবে, টি-সেট শরবত সেট?

মাতামহ বললেন, হ্যাঁগো, এ যে একের পর এক ফ্যাচাং বার করছে।

মাতুল বললেন, না, আর কিছু বিক্রি হবে না।

অ, হঠাৎ তা হলে অবস্থার উন্নতি হয়ে গেল!

সোফার কভারে আদরের হাত বুলিয়ে বললেন, সত্যি বাঘের ছাল?

মাতামহ বললেন, সন্দেহ থাকলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘের গায়ে একবার হাত বুলিয়ে এসো না বাপু।

ভদ্রলোক দু'পা ফাঁক করে অসভ্য অহংকারীর মতো দাঁড়িয়ে, সোনার সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করতে করতে বললেন, আর এক হাজার বাড়িয়ে দোব? কড়কড়ে হাজার।

মাতামহ বললেন, একী গো! এ যে আমাদের সামনে সিগারেট ফোঁকার তালে আছে।

মাতামহ গালচে ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন, পিতা হাত ধরে টেনে বসালেন, যাবেন কোথায়? পয়সা আর শূকরের বিষ্ঠা, দুটোরই একরকম গন্ধ, একটু সহ্য আপনাকে করতেই হবে। পালাবেন কোথায়?

ভদ্রলোক বাঁকা চোখে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, মাতুল হাত ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেলেন। আর তখনই দেখলুম, লোকটির ঘাড়ে এক ধ্যাবড়া পাউডার।

মাতামহ বললেন, বুঝলে হরিশঙ্কর, আমাদের বাবুর অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে।

কী ক্ষমতা?

ভূত ধরার। এই মড়াকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এল বলো তো! সারাজীবন শুধু ভূত ভোজন আর ভূতের নৃত্য!

কী করবে বলুন? আজকাল ভূত যে খুব জন্মাচ্ছে।

ঘরের বাইরে ভদ্রলোকের চড়া গলা শোনা গেল, মাল তো পেলুমই না, উলটে ঠ্যালাভাড়াটাই আমার লস।

পিতা উঠে বাইরে গেলেন। মাতামহ বললেন, আরে ওকে ধরো ধরো, চড়চাপড় মেরে দিতে পারে। বড় রাগী মানুষ।

বারান্দার রেলিং-এ কনুই রেখে ভদ্রলোক সিগারেট ফুঁকছেন। পিতা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ধোঁয়ার প্রকোপ বাঁচাতে বাঁচাতে জিজ্ঞেস করলেন, মহাশয়ের ঠ্যালাভাড়া কত?

দশ।

পিতা বুকপকেটে হাত দিলেন। দরজার সামনে মাতামহ। তিনি বললেন, দশ কী হে! কোথায় যাবে? বেশি বলছে হরিশঙ্কর। ঝট করে দিয়ে দিয়ো না, একটু দরদস্তুর করা ভাল।

ভদ্রলোক বললেন, কতটা যেতে হবে জানেন?

কতটা? যতটাই হোক, তুমি যে লরির ভাড়া বলছ। পাঁচ দিয়ে ছেড়ে দাও, হরিশঙ্কর। পাঁচের বেশি হতেই পারে না।

ভদ্রলোক বললেন, এই লোড নিয়ে কেউ পাঁচ টাকায় যাবে না।

না যায় না যাবে, থাক আমার মাল পড়ে।

পিতা বললেন, আপনি চুপ করুন। এই ক্লাসের সঙ্গে আজকাল আর তর্ক চলে না। যা চাইবে তাই দিতে হবে। দেশ যে স্বাধীন হয়েছে।

ভদ্রলোক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কোন ক্লাস?

এই ঠ্যালাঅলা, রিকশাঅলা, রেলওয়ে পোর্টার।

অ। তাই বলুন। আমি ভাবলুম, আমাকে বলছেন বুঝি।

না, আপনাকে বলব কেন? এই নিন আপনার দশ টাকা।

ভদ্রলোকের প্রকৃতই কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। হাত বাড়িয়ে টাকা নিয়ে পকেটে পুরলেন।

মাতামহ বললেন, বাবু এখনও হাল ছাড়েননি, জপাবার চেষ্টা চলছে।

পিতা মাতামহের হাত ধরে ঘরে টেনে আনলেন। ঢুকতে ঢুকতে বললেন, আমাদের ছুটি। এখন আমাদের আর কিছু করার নেই। বেশ একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল, কোথা থেকে এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

মাতুল ঘরে এলেন। ভদ্রলোক বিদায় নিয়েছেন। ঘরে ঢুকে মাতুল মৃদু হাসলেন। অপরাধীর হাসি।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, কোথা থেকে তুমি এসব জিনিস আমদানি করো? যেমন সিন্ধুঘোটকের মতো চেহারা!

এর বাবা মস্ত বড়লোক ছিলেন। ছেলেটা কেমন যেন একটু বখে গেছে।

ছেলে আর বোলো না। দামড়া বলাই ভাল।

পিতা বললেন, ওইরকমই হয়! বাপ বড় হলে ছেলে খারাপ হয়। বিদ্যাসাগরের ছেলে পানাপুকুর।

মাতুল প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, এসব আপনি কী করছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝলে না? একে বলে শেষের সময় হাল ধরা। মেরামতির কাজ।

এমন তো কেউ করে না।

কেউ কেউ করে। করে বলেই সংসার অচল হয় না। কেউ-না-কেউ ঘড়িতে দম দেয় তাই সময় চলে, কাঁটা ঘোরে। এ বাড়ির যা গেছে তা গেছে। আর নতুন করে কিছু যাবে না।

আমাকে তো যেতেই হবে।

তুমি যাবে, অবশ্যই যাবে। স্থির পুরুষের কাছে ভাগ্য ফিরে আসে না। যে-জলে স্রোত নেই, সে জলে কচুরিপানা, ঝাঁজির দঁক তৈরি হয়। তুমি বউমা দু'জনেই যাবে। বউমা তোমার সঙ্গে না থাকলে তুমি ভেসে যাবে। সব নৌকোরই নোঙর থাকা চাই। এ বাড়ি দেখবে বাহাদুর। মাইনে আমি দোব। আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখাশোনা করে যাব।

মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হঠাৎ এইসময় মাথায় হিমালয় চাপল। এই তো গত বছর, না আগের বছর ঘুরে এলেন।

পদ্মাসনে মাথা নিচু করে বসে ছিলেন তিনি। প্রশ্ন শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, মাথা দোলাচ্ছেন, আর মেঝেতে আঙুল ঠুকছেন।

পিতা বললেন, কী? উত্তর দিন।

মাতামহ মুখ তুললেন। সারামুখে অদ্ভুত এক ধরনের বিষন্ন হাসি। বললেন, উত্তর চাও হরিশঙ্কর, উত্তর? নৌকো আর নোঙরের কথা বললে না? কোনও কোনও নৌকোর নোঙর না থাকাই ভাল হরিশঙ্কর। তাদের যে ভেড়ার মতো ঘাট নেই। বাণিজ্য করার মতো হাট নেই। সে নৌকো কেবল ভেসেই চলে, ভেসেই চলে। ভাসতে ভাসতে একদিন সাগরে।

বড় অভিমান জমেছে মনে? কীসের অভিমান? প্রসাদের গান করেন, সব অভিমান মায়ের দিকে ঠেলে দিতে পারেন না?

তুমি পারো হরিশঙ্কর? কোনও মানুষ পারে?

পিতা নীরব হয়ে গেলেন। একটা বয়েসে সব মানুষের চোখেই কেমন এক ধরনের দৃষ্টি আসে, মরা আগুনের মতো। সে দৃষ্টি জগতের কোনও কিছুকেই যেন স্পর্শ করতে চায় না। এখানে নেই, ওখানে নেই, কোথায় যে আছে ধরা যায় না। মেঘলা আকাশের মতো নিষ্প্রভ। মাতামহের চোখদুটি বেশ আয়ত। সেই আয়ত দুটি চোখে যেন একজোড়া গাংচিল উড়ছে। সমুদ্রের দূর দিকচক্রবালে তারা ডানা মেলে চক্কর খেয়ে চলেছে।

পিতা উঠে পড়লেন। ঘরের এ পাশ থেকে ও পাশে দু'বার ঘুরে এলেন। কল্পনায় অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। দশ বছর আগে, বিশ বছর আগে, তিরিশ বছর আগে, যেখানে যা ছিল সেই সব বসাতে চাইছেন, জহুরি যেমন জড়োয়ার গহনায় চিমটে দিয়ে লাল নীল সবুজ পাথর সেট করার চেষ্টা করেন।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যাই। যা ছিল তা আর নেই। যা আছে তাও হয়তো থাকবে না। যা যাবেই তা যাবেই, ব্যর্থ চেষ্টা, তবু চেষ্টা। মন যখন চাইছে, তখন ঘুরে আসুন একবার হরিদ্বার। তবে

পনেরো দিনের মধ্যে ফিরতে হবে। সব ব্যাপারে জীবনদর্শন, মৃত্যু, লক্ষ রকমের প্যানপ্যানানি টেনে আনা এক ধরনের কল্পবিলাস। আমাদের অলস জীবনেই এসব প্রশ্রয় পায়, ইয়োরোপের মানুষ পাত্তা দেয় না। জয়, তোমার সেই খাটটা কত টাকায় বিক্রি করলে?

এখনও দাম পাইনি। দুপুরে তারা আসবেন দেখতে।

এলে বোলো, খাট বিক্রি হবে না। বিষয় সম্পত্তি বিক্রি করার অভ্যাস বড় খারাপ। আমি সহ্য করতে পারি না। তোমার টাকাপয়সার অবস্থা কীরকম? নতুন জায়গায় গিয়ে ক'দিন সামলাতে পারবে?

শ'পাঁচেক আছে।

আরও শ'পাঁচেক রাখো।

পিতা মাতুলের দিকে পাঁচখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দিলেন। মাতুল ইতস্তত করছেন।

নাও ধরো। জীবনে একটু বাস্তববুদ্ধি আনার চেষ্টা করো। পুরুষ হবে পুরুষের মতো। মেয়েরা হবে মেয়েদের মতো। নাও নাও, আমার সময়ের অনেক দাম।

মাতুল হাত পেতে নোট পাঁচখানা নিয়ে মাথায় ঠেকালেন। পিতা বললেন, সেন্টিমেন্টাল হয়ে সিন ক্রিয়েট কোরো না।

দরজার বাইরে আসতেই মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, তুমি একবার আমার ঘরে আসবে? তোমার সঙ্গে একান্তে আমার দু'-একটা কথা আছে।

হ্যাঁ, কেন যাব না?

মাতামহ আমার মাথার পেছন দিকে হাত রেখে বললেন, সুদের সুদ তুমিও আসতে পারো।

নারকেল গাছের তলায় মাতামহের কুটির। ঠিক যেন বৈরাগীর আশ্রম। এই ঘরে আমাদের দু'জনের কত গানের আসর বসেছে। বেসুরো, বেতালা। পেছনের দিকের ওই জানলায় এসে রাস্তার ছেলেরা কুকুর ডেকেছে, বেড়াল ডেকেছে।

আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মাতামহ দরজা ভেজিয়ে দিলেন। ঘরটি বেশ নিভৃত হয়ে উঠল। চৌকির ওপর কম্বল-মোড়া বিছানা গোল করে গোটানো। দেয়ালে মা জগদম্বা রোজ যেমন হাসেন তেমনই হাসছেন। পুণ্যবান হয়তো সে হাসির খলখল শব্দ শুনতে পাবেন।

মাতামহ বললেন, তোমাকে আমি দুটো জিনিস দেখাব হরিশঙ্কর। প্রথমে, তুমি আমাকে দেখো।

আপনাকে আর নতুন করে কী দেখব বলুন!

হরিশঙ্কর, আমার একটা কিছু হয়েছে, বুঝলে।

বৈরাগ্য!

সে তো মনে। আমি বলছি দেহে। দেখবে তুমি? এই দেখো।

মাতামহ ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। পায়ের পাতা ফুলে তপতপ করছে। একটু নয়, বেশ ফুলেছে। পিতা বললেন, একী? এ যে বেশ ফুলেছে! দেখি।

পিতা নিচু হয়ে পায়ের পাতার একটা জায়গা আঙুল দিয়ে টিপে আঙুলটা তুলে নিলেন। জায়গাটা দেবেই রইল। জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন হল এইরকম হয়েছে?

ক'দিন ধরেই অল্প অল্প ফুলছিল। আজ দিন তিনেক হল ভীষণ ফুলেছে।

দুটো পাতাই?

হ্যাঁ দুটোই, এই দেখো না।

এর সঙ্গে আর কোনও অসুবিধে আছে?

আছে। প্রস্রাব তেমন ভাল হচ্ছে না। চলাফেরা করলে হাঁপ ধরছে, মাথা ঘুরছে।

খিদে?

একেবারে নেই। খেলেই গা গুলোচ্ছে। বমিবমি লাগছে। ওই দেখো না, অনেকদিন আলুর চপ খাইনি, সকালে গোটা চারেক গরম চপ এনেছিলুম, আধখানা খেয়ে ফেলে রেখেছি। ওপরে গরম শিঙাড়া দিলে মুখে রুচল না। চা অত ভালবাসতুম, চা-ও আর ভাল লাগে না। এক চুমুক খাই আর ফেলে দিই। আমার কী হল বলো তো?

পিতা চৌকির একধারে বসে বললেন, হুঁ। আজই, এখুনি হগ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, না হয় কল দিতে হবে। ফেলে রাখা যাবে না।

তুমি এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি দাও না আগে। তোমার ওষুধে আমার ভীষণ কাজ হয়।

শুনুন, আমি ঠেকা দিতে পারি, পারিবারিক চিকিৎসা পর্যন্ত আমার জ্ঞান। ওর ওপর বিশেষ ভরসা করা যায় না।

আমি হরিশঙ্কর অ্যালোপেথিতে যেতে চাই না। ভীষণ খরচ।

খরচের কথা কে আপনাকে ভাবতে বলেছে? সে ভাবনা আমার। আপনি জামাকাপড় পরে নিন।

এ বেলা থাক, ও বেলা হবে।

কথা একদম বাড়াবেন না। যা বলব তাই শুনতে হবে।

আচ্ছা, সে আমি পরছি। তোমার অবাধ্য হবার সাহস আমার নেই। তার আগে তোমাকে আর একটা জিনিস দেখাই। বড় মূল্যবান!

মাতামহ সেই সিন্দুকটি খুললেন। কতকাল আগের কোন পূর্বপুরুষের জিনিস কে জানে! একসময় অনেক কারুকাজ ছিল। কাঠের দুটো চোখ বসানো। বয়েসে চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে গেছে। ডালা-খোলা সিন্দুকের সামনে মাতামহ ঝুঁকে পড়লেন। দু'হাত ক্রমশ নীচের দিকে নেমে চলেছে। এত কী জিনিস আছে!

একেবারে তলা থেকে কাপড়ের বাক্সের মতো একটা জিনিস বেরোল। সেটি নিয়ে তিনি চৌকিতে এসে বসলেন। সুতোর ফাঁস খুলতে খুলতে বললেন, বড় পবিত্র জিনিস হরিশঙ্কর, তুমি কুমারী পুজোর কথা শুনেছ?

শুনেছি, দেখিনি কোনওদিন।

তুলসীর বয়েস তখন সাত কি আট।

মাতামহ কথা বন্ধ করে বাক্সর ঢাকা খুললেন। অদ্ভুত এক ধরনের গন্ধ বেরোল। প্রাচীন কালেরও একটা গন্ধ আছে। সময়ের সুবাস। মাতামহ বললেন, এটা একটা বেনারসি। এর বুননে বুননে সোনা আর রুপোর সুতোর কেরামতি! জমি আর আঁচলা খুললে তোমাদের তাক লেগে যাবে। জমিদার প্রসন্ন চৌধুরীর বাড়িতে খুব বড় পুজো হত।

কোথায়?

বলাগড়ে। সেইখানে তুলসীকে কুমারী করেছিল। সে এক দৃশ্য, হরিশঙ্কর! তুলসীর সেই রূপ! বেনারসি পরেছে। গায়ে গহনার সাজ, এলো চুল, ফুলের মালা, মটুক, রাজরাজেশ্বরীর মতো সিংহাসনে বসেছে, ধূপ আর ধুনোর ধোঁয়া। তুমি দেখো হরিশঙ্কর, পৃথিবীতে মানুষের চেয়ে একটা বেনারসির পরমায়ু কত বেশি। তুলসী কোথায় চলে গেল! তুলসী! যাবার আগে তোমাকেই দিয়ে যাই, বড় পবিত্র জিনিস। যে-সংসারে থাকবে, সে সংসারের মঙ্গল।

আয় আয়, প্রণাম কর।

কাছে এগিয়ে গেলুম। একজনের না-থাকাটা যত দূরে সরে যাচ্ছে, তাঁর রেখে-যাওয়া জিনিসের মূল্য তত বেড়ে যাচ্ছে। তুমি ছিলে এই তো তার প্রমাণ। এই ঘরে, ও ঘরে, এ বাড়িতে, ও বাড়িতে, দুটি পা চলে বেড়াত, একটি শরীর নিশ্বাস নিত, দুটি চোখ দেখত, হাসি খেলত ঠোঁটে, কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াত। সেই বলাগড় জানি না কোথায়। যাইনি কোনওদিন। গ্রামের পথে ধুলো উড়ছে। শরতের শিশির পড়ে আছে ভোরের ঘাসে। শিউলি ঝরে, এখনও ঝরে। জমিদার প্রসন্ন চৌধুরী, কে তিনি? অষ্টমীর দ্বিপ্রহর, একটি মেয়ে এই বেনারসি পরে সিংহাসনে বসে আছে, জলচৌকিতে রুপোর থালার ওপর তার দুটি পায়ে কী ফুল? জবা, পদ্ম, টগর, শিউলি। হোমের আগুন, ধূপের ধোঁয়া, ধুনো, গুগগুল, চন্দন। কপালে ঘাম, ঠোঁটে মুক্তোর বিন্দুর মতো ঘাম। আমার মা। পৃথিবী আরও সাত বছর, দশ বছর পাক খেল মহাশূন্যে। কে জানত তখন তিনিই আমার মা হবেন। তারপর খেলা না ফুরাতে খেলাঘর ভেঙে যায়। কেউ যদি এইসময় ওই রবীন্দ্রসংগীতটি একটু শোনাতে পারতেন:

ওই-রে তরী দিল খুলে
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে,
থাক না পিছন পিছে পড়ে—

পিতা বললেন, মনটা বড় খারাপ করে দিলেন।

শোনো হরিশঙ্কর, এ খারাপে বড় আনন্দ আছে। তোমাকে বলি, আনন্দে তেমন আনন্দ নেই। থাকার চেয়ে না-থাকাটা আরও বেশি থাকা। তুমি কত লেখাপড়া জানা মানুষ, তোমাকে আমি কী বলব? আমার কাছে আর একটা জিনিস আছে, দেখবে? সেটা কিন্তু তোমাকে আমি দিতে পারব না।

মাতামহ আবার উঠে গেলেন সিন্দুকের কাছে। তলার দিকে হাত চালালেন। একটা বড় খাম বেরিয়ে এল। তার মধ্যে অজস্র টুকরো টুকরো কাগজ। বেছে বেছে ভাঁজ করা একটা কাগজ তুলে নিলেন। দোক্তার পাতার

মতো রং হয়ে গেছে। ভাঁজে ভাঁজে ফাট ধরেছে।

এটা কী বলো তো? তুলসীর চিঠি। বিয়ের পর বাপের কাছে তার প্রথম চিঠি। সেই তোমরা জামতাড়ায় চেঞ্জে গিয়েছিলে, সেইখান থেকে লিখছে। দেখো, তোমার সম্পর্কে কী লিখেছে!

'তোমার জামাই একটু রাগী হলে কী হবে, মনটা আকাশের মতো, কিছুই লেগে থাকে না। সিল্কের কাপড়ের মতো মসৃণ, তবে ঘষা লাগলেই গরম হয়ে ওঠে। তুমি কিছু ভেবো না, আমার চারদিকেই সুখ।'

জানতে তুমি! এসব তুমি জানতে? কত বড় ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট! বলো একবার! হাতের লেখাটা দেখো, ছোট্ট ছোট্ট, মুক্তোর দানার মতো। ছিল কালো, হয়ে গেছে বাদামি। হ্যাঁগো, অদৃশ্য হয়ে যাবে না তো?

The road of excess leads to the Palace of Wisdom.

পিঁক পিঁক করে বারকতক হর্ন বাজল। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হবার শব্দ হল। বাথরুমে চান করতে করতে শুনছি। এই অবেলায় কে আবার এলেন! তিনজন গাড়িধারী আসতেন এ বাড়িতে। প্রতাপ রায়। তাঁর খেলা শেষ। ফুল ঝরে গেছে, ভ্রমর উড়ে গেছে। মাতুল, তাঁর গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। পড়ে রইলেন পঙ্কজবাবু। মনে হয় তিনিই এসেছেন। পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হঠাৎ ভীষণ বেড়ে গেছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কে নদীর মতো জোয়ার ভাঁটা খেলে। দিনকতক খুব আসা-যাওয়া চলে। মাখামাখি, আহার-বিহার, তারপর মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, কারুর সঙ্গে কারুর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই।

সিঁড়ি দিয়ে একটা গলা উঠে আসছে, সঙ্গে জুতোর সংগত। পঙ্কজবাবুই এলেন। আজ বেশ একটু একা একা থাকতে ইচ্ছে করছিল। ভেবেছিলুম নিস্তব্ধ দুপুরের নির্জনতায় মুকুর খামটা খুলব। সূর্যের আলোর দিকে তুলে ধরে দেখেছি, ভেতরে একটা আংটি আছে। পাট করা পুরু এক খণ্ড কাগজ আছে। সব ভেস্তে গেল। এইবার শুরু হবে চা আনো, কিছু খাবার ব্যবস্থা করো।

স্নান করে বেরোতেই পিতা বললেন, কী ব্যাপার বলো তো! আজ এতবার চান করছ! ঋতু পরিবর্তনের সময়, অসুখবিসুখে পড়বে নাকি?

ভীষণ গরম লাগছিল, তাই!

তোমাদের সহ্যশক্তি বড় কম।

পঙ্কজবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, কার সহ্যশক্তি?

আজকালকাল ছেলেমেয়েদের।

ও সে আমাদের জন্যেই, আমরাই দায়ী। আমরা সব শিখিয়েছি, সহ্য করতে শেখাইনি। দ্যাট ইজ নট এ পার্ট অফ আওয়ার এডুকেশন।

বাট দ্যাট ইজ অ্যান্ড ওয়াজ এ পার্ট অফ মাই এডুকেশন। আমাদের বাড়িতে তুমি একটা পাখা খুঁজে পাবে না। গরমে গরম সহ্য করো, শীতে শীত। তুমি মানুষ, জীবজগতের জীব, নিজেকে অ্যাডজাস্ট করো ঋতুর সঙ্গে। বাঘ পাখার বাতাস খায়!

তোমার আবার সবকিছু একস্ট্রিম। বাঘ থাকে জঙ্গলে, গাছের ঠান্ডায়, মানুষ থাকে শহরে কংক্রিটের জঙ্গলে। বাতাসের জন্যে একটু বাতাসের প্রয়োজন হতেই পারে। সহ্য জিনিসটা একটু অন্যধরনের।

যেমন?

সহ্য মানে উতলা না হওয়া। সহ্য মানে নেগেশন নয়। সব আসুক। আমার পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠুক অমৃতে গরলে, আমি কিন্তু অটল।

রাইট ইউ আর। খুব ভাল বলেছ। আমরা বলি ভাল, করি তার উলটো।

আঃ সে তুমি ঠিক বলেছ। মানুষের আধখানা শয়তানের দখলে, আধখানা দেবতার দখলে। একবার এ চুলের মুঠি ধরে, একবার উনি ধরেন। আর আমরা চিৎকার করে বলি, প্রাণ যায় রে পাঁচু।

দার্শনিক আলোচনা হঠাৎ থামিয়ে পঙ্কজবাবু বললেন, নাও বাবা রেডি হয়ে নাও, রেডি হয়ে নাও, ভীষণ দেরি হয়ে গেছে। দেরি হত না, টায়ার ফেঁসে গিয়ে এমন বিপদে ফেলে দিয়েছিল!

আমি কিছুই না বুঝে, দুই গুরুজনের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। পিতা বললেন, নাও নাও, জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও, উনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?

কোথাও যেতে হবে?

হ্যাঁ, তোমাকে নিতে এসেছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, বিলেত থেকে হঠাৎ আমার ভায়রা এসেছে, তারা তোমাকে দেখার জন্যে একেবারে পাগল। কিছুতেই শুনবে না।

আমাকে আর দেখার কী আছে? আমি তো তেমন কেউ নই।

পিতা একটু রুষ্ট হয়ে বললেন, তোমার সব ভাল, তোমার ওই ঠোঁট-ফোলানো অভিমানের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়।

পঙ্কজবাবু বললেন, আহা, ওকে তুমি শুধু শুধু বকছ। তোমার রসকষশূন্য জীবন, অত রুক্ষ কি সবাই হতে পারবে। এসব কথা আসে অ্যামবিশন থেকে। আমাকে সবাই দেখুক এই ইচ্ছে পূর্ণ না হলেই অভিমানে মানুষ বলে, আমাকে দেখে কী হবে! বিজ্ঞান নিয়েই জীবন কাটালে, এইবার একটু সাইকোলজি নাড়াচাড়া করো। আমি এখন খুব সাইকোলজি পড়ছি, মেয়ে বড় হয়েছে তো, স্ত্রীর বয়েস হচ্ছে। যাও বাবা, যাও, একটু সাজগোজ করে এসো।

ঘরে এসে জামাকাপড় পালটাতে পালটাতে মেজাজটা ভীষণ খিঁচড়ে গেল। সারারাত জেগে, তালগোল পাকিয়ে শরীরটা তেমন ভাল নেই। চোখদুটো ভেতরে টানছে। জ্বালা করছে। ঘুমঘুম পাচ্ছে। এখন সেজেগুজে আদিখ্যেতা করতে যাও! কতরকমের বিপদ যে পৃথিবীতে আছে। নিজেকে নিয়ে মানুষ কতটুকু সময় বাঁচতে পারে। সব সময় দানখয়রাত করে দাও। ইনি আবার সাইকোলজি ধরেছেন, মনের ভেতর শুঁড় চালিয়ে কখন কী টেনে বের করে আনবেন কে জানে! আমার সাইকোলজি এখন খুব একটা সোজা রাস্তায় চলছে না।

গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে পঙ্কজবাবু বললেন, সামনে বোসো, সামনে বোসো। তোমাকে ছোট্ট একটু জ্ঞান দিই। এ গুড পিস অফ অ্যাডভাইস। ডোন্ট মাইন্ড মাই বয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ বলুন। কিছু মনে করব না।

সহ্যশক্তি আছে তো!

নিশ্চয় আছে।

ওয়েল। উঠে বোসো, বলছি।

সামনের আসনে বসলুম। পঙ্কজবাবুর আসনের পেছন দিকে একটি তোয়ালে ঝুলছে। তিনি খুব শান্ত মেজাজে, ধীরে সুস্থে স্টিয়ারিং-এ বসলেন। নিচু হয়ে সামনে ঝুঁকে পাশে হেলে পড়ে, গাড়ির কলকবজা

দেখলেন, তারপর সোজা হয়ে আমার দিকে তাকালেন। মুখে একঝলক হাসি। এতক্ষণ মাথা নিচু করে ছিলেন। এত ফরসা, শরীরে এত রক্ত, চোখমুখ গোলাপি হয়ে গেছে। হাসির রেখা আরও দীর্ঘ হল। মৃদু স্নেহের গলায় বললেন, ড্রাইভারে যখন গাড়ি চালায়, তখন তুমি সামনে বসো, পিছনে বসো, কিছু এসে যায় না। কিন্তু গাড়ি যখন এমন কেউ চালান, যিনি তোমার আত্মীয়, বন্ধু, কি প্রিয়জন, তখন তোমাকে সামনে চালকের পাশে বসতে হবে। ভদ্রতা। পেছনে বসলে মনে হবে তিনি ড্রাইভার, মনিবকে নিয়ে চলছেন। খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। হলে কী হবে! এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সেন্টিমেন্ট।

চাবি ঘোরাতেই ইঞ্জিন শব্দ করে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করল। বাতাসে ঘুম এসে যাচ্ছে।

রোদ, ছায়া, লোকজন, কলরব, কোলাহল, সব যেন চলেছে স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। শরীরে বেশ একটা আমেজ আসছে। শীতকালে গরমজলে স্নান করলে এইরকমের একটা আরাম হয়।

বুঝলে, গাড়িটাকে এবার সার্ভিসিং-এ পাঠাতে হবে।

জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তুমি ঘুমোচ্ছ নাকি?

ঘুমঘুম পাচ্ছে।

অত রাত জেগে পড়ার অভ্যাস ছাড়ো। খুব তাড়াতাড়ি হজমশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ভোরে উঠে পড়বে। ভোরের মতো ভাল সময় আর কিছু নেই। তুমি আবার ভীষণ স্টুডিয়াস।

লাজুক-লাজুক ভাবে বললুম, না না।

তোমার বাবার মুখে সব শুনেছি। তুমি একটু ইনট্রোভার্ট, তাই না?

সেরেছে, সদ্য-পড়া সাইকোলজির জ্ঞান তেড়ে আসছে। বললুম, মাঝে মাঝে ইনট্রোভার্ট, মাঝে মাঝে একসট্রোভার্ট।

তার মানে, তোমার স্প্লিট পার্সোনালিটি। দুটো ব্যক্তিত্ব, দুটো চরিত্র। একই শরীরে দু'ধরনের মানুষ। এটা মনে হয় তোমাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য। হরিরও দুটো পার্সোন্যালিটি। কখনও বিমর্ষ, কখনও উচ্ছ্বসিত, কখনও ভীষণ হিসেবি, কখনও ভীষণ বেহিসেবি। আমরা সবাই তাই, বুঝলে। নানারকম বুদ্ধি প্যাক করে ঈশ্বর আমাদের এইখানে পাঠিয়েছেন। যখন যেটা ঠেলে ওঠে, তখন আমরা সেইভাবে কাজ করি। শুনেছি তোমার খুব ধর্মভাব, ভগবৎ বিশ্বাস। খুব ভাল কথা। আজকালকার ছেলেরা সব অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। দেশে যেন একটা মর‍্যাল ফেমিন এসেছে। তবে কী জানো, ধর্ম মানে কিন্তু সংসার ত্যাগ নয়। আমার মাকে দেখলে তো সেদিন! ওঁর দর্শনটর্শন হয়। ঠাকুর ওঁর সঙ্গে কথা বলেন। কিছু ক্ষমতাও লাভ হয়েছে। মুখ দেখে মানুষের স্বভাব, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব বলতে পারেন। ভালমানুষ খারাপমানুষ চিনতে পারেন। যাকে যা বলেন সব মিলে যায়। সবাই বলেন বাকসিদ্ধা।

গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলা ঠিক নয়। অন্যমনস্ক হয়ে যেতে হয়। আর একটু হলেই রিকশার পেছনে ভিড়িয়ে দিয়েছিলেন। খ্যাঁক করে ব্রেক কষে কোনওরকমে দুর্ঘটনা এড়িয়ে গেলেন। এইবার রাস্তার দিকে মন চলে গেছে। কথা বন্ধ। ঘুমঘুম ভাব কেটে গেছে। নানারকম চিন্তা আসছে। নানারকম আশঙ্কা। কেবলই মনে পড়ছে ঠাকুরের সেই গল্প:

এক জেলে রোজই অন্যের পুকুরে মাছ চুরি করতে যায়। চোরকে ধরার জন্যে একদিন সবাই খুব সতর্ক হয়ে রইল। গভীর রাত, জেলে জাল ফেলেছে জলে। ঝপাত করে যেই না শব্দ হওয়া, সবাই তেড়ে এল ধর ধর করে। জেলে দেখলে মহা বিপদ। পালাবার সব পথ বন্ধ। সে তখন ঢুকে পড়ল এক মানকচুর জঙ্গলে। ছাইগাদা। সর্বঅঙ্গে ছাই লেগে গেল। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সারাগায়ে বেশ করে ছাই মেখে সে গিয়ে বসল এক গাছতলায়। চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। যারা চোর ধরতে এসেছিল তারা চোর পেল না, পেল ধ্যানমগ্ন এক সাধুকে। খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই এসে সাধুকে প্রণাম করতে লাগল। ফলমূল মিষ্টি পয়সা প্রণামী পড়তে লাগল। সাধু কিন্তু চোখ খোলে না, কিছু গ্রহণ করে না। এতে সকলের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল। সাধু চোখ বুজিয়ে সেই কপট ধ্যানে ভাবতে লাগল, ছিলুম চোর, সাধুর ভান করাতেই আমার এত খাতির। সত্যি সাধু হলে আমার কী অবস্থা হবে। বলা যায় না ঈশ্বরকেও হয়তো পেয়ে যেতে পারি।

আমি কি সেই চোর! বসে আছি সাধুর আসনে! দু'দিন আগে হলে জোরগলায় বলতে পারতুম, না, আমি সাধুই। আজ আর বলার ক্ষমতা নেই। মেফিস্টোফিলিস অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছে। চুরুট আর ওডিকোলোনের গন্ধ। ফাউস্ট এখন ক্রীতদাস। ব্লেক হলে বুক ফুলিয়ে বলতে পারতুম:

The pride of the peacock
is the glory of God
The lust of the goat
is the bounty of God
The wrath of the lion
is the wisdom of God
The nakedness of woman
is the work of God.
The road of excess
leads to the palace of wisdom.

গাড়ি ঢুকল বাড়িতে। সেই রাতের চেয়ে বাড়িটিকে আরও বিশাল মনে হচ্ছে। আরও সুন্দর। আজ মনে হচ্ছে, অনেকের মধ্যে থাকলে মানুষ খুব একটা বেচালে চলতে পারে না। যে ফাঁক গলে শয়তান ঢোকে, সেইসব প্রবেশপথে প্রহরী মোতায়েন হয়ে যায়।

আরে এসো এসো, বলে যিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, তিনিই মনে হয় সেই বিলাতবাসী ভদ্রলোক। আমাকে একটু বাজিয়ে দেখতে চান, সুরে বলব না বেসুরো বাজব! কাঁচায় পাকায় মেশানো একমাথা চুল। চোখে সোনার ফ্রেমের ধোঁয়াটে চশমা। পরনে বিলিতি সুট। সাদা শার্টে অদ্ভুত সুন্দর ডোরা কাটা। দেখলেই বোঝা যায় এ দেশের জামাকাপড় নয়। কেটেছে সায়েব দরজি।

সেদিন ভাল বুঝতে পারিনি, নীচের দিকে সেভাবে তাকিয়ে দেখা হয়নি, মেঝেটেঝে পুরো মার্বেল পাথরে মোড়া। পা দিতে ভয় করে। ভয়ে জুতোজোড়া খুলে ফেললুম। আমার পায়ের চেয়ে মেঝে অনেক দামি।

পঙ্কজবাবুর ভায়রাভাই কিন্তু জুতো পরেই চলাফেরা করছেন। সে জুতোর কী বাহার! বাদামি রং, মুখটা সরু, পালিশ পেয়ে আয়নার মতো ঝকঝক করছে।

স্টেশনের প্রথম শ্রেণির ওয়েটিং রুমে যেরকম হাতলঅলা বড় ডেকচেয়ার থাকে সেইরকম চেয়ারে বিলিতি ভদ্রলোক বসলেন। পায়ের ওপর পা তুলে। ভেবেছিলুম তোলা পা-টা থিরথির করে নাচাতে থাকবেন। ইংলিশ এটিকেট। পা পক্ষাঘাতের পায়ের মতো অনড় রইল। পিতা উপস্থিত থাকলে বলতেন, দেখেছ কী সংযম! দেখে শেখো।

সোনালি প্যাকেট থেকে সাধারণ মাপের চেয়ে বড় একটি সিগারেট বের করে ঠোঁটে চাপতে চাপতে বললেন, তোমার নাম?

পলাশ চট্টোপাধ্যায়।

প্যাট করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া রিং রিং করে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বললেন, কী করো!

আজ্ঞে কেমিস্ট।

হাউ নাইস, হাউ নাইস! তোমার সঙ্গে মিলবে ভাল। আমি ডাক্তার, তুমি কেমিস্ট।

পঙ্কজবাবু ভেতরে গিয়েছিলেন, এক হাতে একটা বোতল, আর এক হাতে একটা গেলাস নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বোতল আর গেলাস টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, আপনি জল চেয়েছিলেন দাদা?

হ্যাঁ, সে প্রায় এক যুগ আগে।

এই যে, এইমাত্র নিয়ে এল। এ তল্লাটে মিনারেল ওয়াটার কেউ রাখেই না। সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে নিয়ে এল!

যাক, পেয়েছে এই যথেষ্ট। এ দেশে এলে, একটাই আমার অসুবিধে, জল। জলাতঙ্ক বলতে পারো।

কই আমাদের তো কিছু হয় না!

হয় না মানে, হয়েই তো আছে। তোমরা গ্রাহ্য করো না।

গেলাসে জল ঢালব দাদা?

থাক, প্রয়োজন হলে আমিই ঢেলে নোব। সিগারেটটা শেষ করে নিই। আচ্ছা, কফির কী হল!

আসছে। তৈরি হচ্ছে। ভেতরে জটলা হচ্ছে। অনেকদিন পরে দুই বোনে দেখা হয়েছে। কলরবলর খুব চলেছে।

শোনো শোনো, বলতে বলতে এক ভদ্রমহিলা ভেতর থেকে বাইরে আসছিলেন, আমাকে দেখেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বারকয়েক তাকালেন। বিলেতের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এঁরা দু'বোনেই অসাধারণ সুন্দরী। বিলেতে থাকার ফলে আরও ফরসা হয়েছেন। ঠান্ডা দেশ গালে আপেলের রং তুলে দিয়েছে। চুলে ববছাঁট। ঘাড়ের কাছে রেশমের চামরের মতো দুলছে। মেয়েদের বিউটি কেমন বুঝতে শিখেছি। এক রাতেই পেকে ঝানু। হায় হায় সন্ন্যাসার্থী! কী তোমার অধঃপতন! মহিলা কিছু একটা মেখেছেন। বিলিতি সেন্ট। ইংল্যান্ড হল ইয়ার্ডলের জায়গা। তারই সুবাসে ঘর আমোদিত।

মহিলা সংযত গলায় বললেন, অঞ্জু অপর্ণার চেয়ে কত বড় হবে?

তুমি আবার ওইসব মেয়েলি হিসেব নিয়ে এলে। আমার কি আর খেয়াল আছে! কফির কী হল বলো তো!

আসছে আসছে। মিনু বলছে, অঞ্জু অপর্ণার চেয়ে আট বছরের বড়। ইমপসিব্‌ল, আমার মনে হচ্ছে, হয় তিন না হয় চার।

তোমার ছেলে, তুমিই ভাল জানবে। হঠাৎ তোমাদের এত হিসেব নিকেশ শুরু হয়ে গেল!

পঙ্কজবাবু বললেন, মেয়েদের নিয়মই ওই, এমন এমন সমস্যা টেনে বের করবে। ডায়েরি রাখার অভ্যাস না থাকলে উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে, তোমার কত সালে কত তারিখে বিয়ে হয়েছিল, বলতে পারব না। মাসটা মনে আছে ঋতুর জন্যে। ফাল্গুন মাস, বসন্তের বাতাস, কোকিলের ডাক।

ভায়রাভাই যোগ করলেন, চাঁদের আলো।

চাঁদ? চাঁদ কি ছিল? মনে পড়ছে না।

অপর্ণার মা কফির ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলেন। মাথায় অল্প একটু শাড়ির আঁচল টানা। সকালেই স্নান করেছেন। এলো চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। কোথায় নেমেছে! কোমর ছাপিয়ে আরও কত দূরে। এই বয়সেও এত চুল। কেমন করে এমন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য বজায় রেখেছেন। আনন্দে থাকলে মানুষ মনে হয় অমর হতে পারে। জীবন থেকে চিমটে দিয়ে একে একে অশান্তির কাঁটা তুলে তুলে ফেলে দাও, মৃত্যু চিন্তা, অর্থ চিন্তা, স্বার্থ চিন্তা, পারস্পরিক সম্পর্ককে মখমলের মতো মসৃণ করে দাও, জীবনের দৈর্ঘ্য, যৌবনের দৈর্ঘ্য অনেক বেড়ে যাবে। এ পরিবারে সেটা সম্ভব হয়েছে। সব পরিবারে তা তো আর হয় না। নরম আঁচে, মুখ চাপা হাঁড়িতে, আঙুল মাপ জলে, জীবনের বিরিয়ানি গুমসোচ্ছে। জাফরান, জায়ফল, গরমমশলা, আবার এক ফোঁটা আতর। খুব সুতার; কিন্তু খাদ্য!

অপর্ণার মা বললেন, তুমি লক্ষ্মীছেলে হয়ে এখানে বসে আছ! বড় লাজুক ছেলে।

কফির পেয়ালা চামচে সমেত তুলে নিতে নিতে ডাক্তারবাবু বললেন, লাজুক হলে কী হবে, ভীষণ বুদ্ধিমান। আমি এতক্ষণ বসে বসে ওর ওপর নজর রেখেছিলুম, হি ইজ ওয়েল কম্পোজড, বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি ম্যাচিয়োর্ড। সামহাও হি ইজ ভেরি ডিস্টার্বড, ডিপ্রেস্‌ড, সাইকোলজিক্যালি শেক্‌ন।

পঙ্কজবাবু বললেন, কী করে বুঝলেন দাদা?

বুঝব না? লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি যে ওই করছি। অবজার্ভ এ পেশেন্ট, সাজেস্ট এ রেমিডি। হি হ্যাজ এ ক্লোজড টাইপ অফ পার্সোন্যালিটি। ওর বাইরে যতটা আছে তার চেয়ে দশগুণ আছে ভেতরে। ফ্লোটিং লাইক অ্যান আইসবার্জ।

কাপেতে চামচেতে টিং করে একটা শব্দ হল। বাইরের সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ। একজোড়া নারীপুরুষের কলকণ্ঠ। দ্বারপথে সেই যুবক। বুকের কাছে একটি ফুলের তোড়া, পাশেই গায়ে গা ঘেঁষে অপর্ণা। কী বিচিত্র চিত্র!

বিশাল ধরার চতুঃসীমায় যা কিছু পাও, স্বপ্ন শুধু

বুক জ্বলে গেল। দরজার সামনে অপর্ণা ওই বিলিতি যুবকটির পাশে লেফাফার গায়ে ডাকটিকিটের মতো কেমন সেঁটে আছে। ছেলেটির হাতে আবার ফুলের তোড়া। ম্যারেজ রেজিস্টারের অফিস থেকে এল, না চার্চ থেকে? আমার এমন হিংসে হবার তো তেমন কোনও কারণ নেই। তবু হচ্ছে কেন? পঙ্কজবাবুর ডাক্তার ভায়রাভাই ঠিকই বলেছেন, এ ছোকরার প্রকাশিত অংশের চেয়ে অপ্রকাশিত অংশই বেশি। ব্যাটা ডুবসাঁতার কাটছে।

ঠিক টেনিস খেলোয়াড়দের মতো লম্বা চওড়া চেহারা। ইংরেজ নবাবদের মতো বাদামি চুল, ঘাড়ের ওপর কানের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে। ঝুলপির কী বাহার! বিলেতে মানুষকে কী জিনিস বানিয়ে দেয় রে বাবা! প্যান্ট, শার্ট, জুতো, নেকটাই এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। হাতের কবজি আমার পায়ের গোছের মতো। টকটকে ফরসা। মণিবন্ধে কালো ব্যান্ডে সোনার রিস্টওয়াচ। একেবারে ছবির নায়ক। মুখ সামান্য লম্বাটে হলেও, অসম্ভব ধারালো। গ্রিসিয়ান নাক, স্পার্টান চোখ, স্প্যানিশ গোঁফ। আমি গোহারান হেরেছি। স্বয়ংবর সভা হলে রাজকন্যে আমার গলায় ঘেঁটুফুলের মালা ঝুলিয়ে, গাধার পিঠে উলটো বসিয়ে রাজ্যছাড়া করে দিত।।

পঙ্কজবাবুর ভায়রাভাই বললেন, কী হল, ফিরে এলে? দিয়ে এলে না?

যুবক খটখট করে জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে এলেন। চলনের কী দৃপ্ত ভঙ্গি। যেন লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধের পর বিজয় সেনানীর পুরোভাগে মুর্শিদাবাদে ঢুকছেন। এ হাঁটা আমার কাঠামোয় সম্ভব হবে না। ঠ্যাং খুলে যাবে। যুবক বললেন, মিসেস পার্কার কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন।

সেকী, কোথায়?

নেপাল।

ফিরবেন কবে?

কেউ জানে না।

তা ফুল রেখে এলে না কেন?

কার কাছে রাখব! ফ্ল্যাটে চাবি।

জানলে কী করে নেপাল গেছেন!

ওঁর টেলার বললেন। সামনেই তাঁর টেলারিং শপ।

দেন প্রেজেন্ট ইট টু অপর্ণা।

যুবক সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া হাসিহাসি মুখে আমার পিতার বধূমাতার হাতে তুলে দিলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নে মশগুল হয়ে বসে আছেন ওদিকে, এদিকে এইসব হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে চলেছে। অপর্ণা ফুল নিতে নিতে বললে, কার জিনিস কে পায়!

অপর্ণা এই কথাটি বেশ বলেছে। কথার মধ্যে অল্প একটু দংশন আছে। পিঁপড়ের কুটুস কামড়। নিরাশ মনে আলোর সামান্য ঝিলিক খেলে গেল।

পঙ্কজবাবু বললেন, একেই বলে মানুষ বরাতে খায়। যাও মা ফুলদানে জল দিয়ে যত্ন করে রেখে এসো। দেখাশোনা করলে সাত দিন ঠিক থাকবে। জলে একটু নুন ফেলে দিয়ো।

বুকের কাছে নীল সাদা লাল হলুদ ফুলের স্তবক ধরে দেবী অপর্ণা এতক্ষণে আমার দিকে তাকাবার অবসর পেলেন। মানুষের মুখ যে কত উজ্জ্বল হতে পারে, আমার ধারণা ছিল না। হাসি যে কত স্বর্গীয় হতে পারে দেখা ছিল না। ভেতরে এতক্ষণ যে অভিমান গুমরোচ্ছিল এই হাসিতে সব শান্ত হয়ে গেল। আমার হাসি আমাকে ছেড়ে ঠোঁটে গিয়ে বসল। বেশ বুঝলাম আমার নিয়ন্ত্রণ এখন ওই ফুলওয়ালির হাতে। সেদিন কীভাবে দেখেছিলুম জানি না, আজ দেখছি সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মনের নানারকম রসে জারিয়ে আচারের মতো করে।

অপর্ণা হেসে ভেতরে চলে গেল। তার আসা, তার দাঁড়ানো, তার চলে যাওয়া, শরীরে সূক্ষ্ম শাড়ির বাঁধন, ভেতর থেকে ফুটে ওঠা অন্তর্বাসের আভাস, সবকিছুরই আজ কেমন যেন অন্য এক জগতের ইশারা। একই জগৎ, শিশুর চোখে একরকম, সাধকের চোখে একরকম, লম্পটের চোখে একরকম।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে অঞ্জনের পরিচয় করিয়ে দিই। অঞ্জন, পলাশ চট্টোপাধ্যায়, আমার এক নিকট বন্ধুপুত্র। তোমার মতোই ভাল ছেলে। তবে তুমি বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন বিলেত, তোমার 'শিন অ্যান্ড লাসচার' এই দিশি বস্তুটির চেয়ে অনেক বেশি।

পঙ্কজবাবুর ভায়রা বললেন, ও দেশে মানুষের ভেতর থেকে ঠিক মানুষটিকে বের করে আনার কতরকম ব্যবস্থা। এ দেশের মতো ও দেশে গাধা পিটে ঘোড়া বানাবার চেষ্টা হয় না। গাধাকে দেওয়া হয় গাধার ট্রেনিং, ঘোড়াকে দেওয়া হয় ঘোড়ার ট্রেনিং। সাধে ওরা অত বড় হয়েছে!

অঞ্জন সোফা ছেড়ে উঠে এসে, আমার দু'হাত ধরে করমর্দন করলেন। হাতের পাঞ্জায় বেশ জোর। উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল, আবার যে যার আসনে বসে পড়লুম। সারাদিন এইভাবেই বসে বসে কাটাতে হবে নাকি? সে তো হবে মহা শাস্তি।

অঞ্জনের দিকে তাকালেই সে মৃদু হাসছে। একটা কিছু বলতে হয়, কিন্তু হীনম্মন্যতা গলা চেপে ধরছে। নিজেকে ভীষণ ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। বোকার মতো বসে থাকা যায় না, তাই বললুম, আপনি কী করেন?

আমি রোলস রয়েস ফ্যাক্টরিতে অ্যারোনটিক্সের ট্রেনিং নিচ্ছি।

পঙ্কজবাবু বললেন, যাকে বলে অ্যাভিয়েশন টেকনোলজি। দারুণ লাইন। তোমার আর ক'বছর বাকি আছে?

এক বছর।

তারপর কী করবে?

তারপর হল্যান্ডে যাব হায়ার ট্রেনিং-এ। ফ্রানসেও একবার যেতে হবে।

ব্রাইট ফিউচার, ব্রাইট প্রসপেক্ট।

অঞ্জনের বাবা বসে বসে পাইপ খাচ্ছেন। বিদেশি টোব্যাকোর গন্ধ বাতাসে ভাসছে। কী সুন্দর এঁদের জীবন! বড় হতে হতে কত বড় হয়ে যাবেন। তুলনায় সত্যি আমি এক পিগমি। কী দেহে, কী মেধায়, আমার কোনও বিকাশই হল না। এ পরিবারে আমার কোনও স্থান হওয়া উচিত নয়। এঁদের এত বড় বড় আত্মীয়স্বজন। গর্ব না থাকলেও ধনী। আমাকে উপেক্ষার চোখে দেখলে কিছু বলার নেই। যেমন করেই হোক সরে পড়তে হবে।

অপর্ণার মা এসে আমাদের দু'জনকে ডাকলেন, তোমরা ভেতরে এসো বাবা। একটু মেলামেশা করো। সবই যে কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে!

অঞ্জন জুতোর ফিতে খোলার জন্যে নিচু হচ্ছিল, অপর্ণার মা বারণ করলে, থাক থাক, তুমি জুতো পরেই এসো, পরেই এসো। সায়েব মানুষ!

অঞ্জন জুতো খুলেই ফেলল। মোজা পরাই রইল। মাথা তুলে বললে, না না, বাইরের জুতো ভেতরে না ঢোকানোই উচিত। আমার কোনও অসুবিধে হবে না। অঞ্জনের বাবা বললেন, সায়েব তখন যখন বিলেতে। এখন বাঙালি।

সেই বারান্দা পেরিয়ে, উঠোন পেরিয়ে, চওড়া সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলায় উঠে এলুম। ঢাকা বারান্দায় জাফরির ফাঁকে ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে। চারদিক মন্দিরের মতো পরিচ্ছন্ন সুন্দর। কোথা থেকে মৃদু ধূপের গন্ধ আসছে।

যে-ঘরে আমরা এলুম, সে ঘর আগে দেখিনি। মেঝেতে সুন্দর একটা কার্পেট পাতা। ঘরটা বেশ বড়। গোটা তিনেক ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। সুন্দর সুন্দর আলমারিতে রাশিরাশি বই। একপাশে একটা ঝকঝকে রিডিং টেবল। গোটা দুয়েক সোফা। ঘরে আর কিছু নেই।

সেই ঘরের মধ্যে আমাদের দু'জনকে ছেড়ে দিয়ে অপর্ণার মা বললেন, নাও তোমাদের মনের খোরাক রয়েছে। বসে বসে বইয়ের পাতা ওলটাও। আমরা আসব যাব। আজ আর বসে গল্প করার সময় নেই। ইচ্ছে হলে, তোমরা ঘুরেও বেড়াতে পারো। ছাদেও যেতে পারো। বাগানেও নামতে পারো। ওই যে রেডিয়ো, গান শুনতে পারো।

অঞ্জন বললে, ঠিক আছে মাসিমা। আপনার কোনও দুশ্চিন্তা নেই।

অঞ্জন আমার চেয়ে হাজার গুণ স্মার্ট। চালচলনে কোনও জড়তা নেই। আমার যেন সবসময় পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। লাজুকলতা লজ্জাবতী। অঞ্জনকে আদৌ দাম্ভিক অহংকারী বলে মনে হচ্ছে না আর। অপর্ণার পাশে প্রথম দেখাটা ছিল হিংসের দেখা। কুৎসিত দৃষ্টিতে দেখেছিলুম বলেই কুৎসিত লেগেছিল। আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ।

অঞ্জন সারাঘরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বললে, মেসোমশাইয়ের বেশ টেস্ট আছে দেখেছেন! সাধারণ বাঙালির মতো নয়।

সবই হল পয়সার ব্যাপার।

পয়সায় হয় না জানেন। কালচার একটা বড় জিনিস। এখনকার ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টদের অনেকেই বেশ বড়লোক, ক'জনের রুচি আছে। কাল বাবার সঙ্গে বেলেঘাটায় এক ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিলুম। কী ব্যাড টেস্ট। ইউ কান্ট ইম্যাজিন। গায়ে এমন পারফিউম ঢেলেছেন পাশে বসা যায় না। বিদেশি জিনিস। হলে কী হবে, কোনটা ছেলেদের পারফিউম, কোনটা মেয়েদের সে জ্ঞান নেই, সেনস অফ প্রোপোরশন নেই। এমন কাপড়ের সুট বানিয়েছেন, যা আমেরিকান গ্যাংস্টারদেরই মানায়। একটা কুকুর পুষেছেন, যাকে ট্রেনিং দিতে ভুলে গেছেন। সারাবাড়ি অপ্রয়োজনীয় জিনিসে বোঝাই। যেমন লাউড, তেমনি ভালগার।

তা ঠিক। আগেকার জমিদার আর এখনকার নিউ রিচদের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তাঁদের আলাদা একটা মেজাজ ছিল। মন অনেক বড় ছিল।

এই ঘরটাই দেখুন। কত নিট! অন্য কেউ হলে এর মধ্যে রাজ্যের জিনিস ঢুকিয়ে আগলি করে ফেলতেন। আসলে মা আর মাসিমা দু'জনেই তো শান্তিনিকেতনের মেয়ে। গুরুদেবের ট্রেনিং-এ রুচিবান।

অপর্ণা একজোড়া চটি এনে অঞ্জনের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, নিন পরে নিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। মোজা ময়লা হয়ে যাবে।

অঞ্জন পা গলাতে গলাতে বললে, মাপে একটু বড়।

বাবার পায়ের মাপ সাধারণের চেয়ে একটু বড়।

অপর্ণা বসল না, চলে গেল। শাড়ি পালটেছে। চুল এলো ছিল, এখন খোঁপা করেছে। আমার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছিল। সে তাকানোয় কোনও প্রাণ ছিল না। ইট কাঠ পাথর পুতুলের দিকে মানুষ অমন দৃষ্টিতে তাকায়।

মন আবার ধোঁয়াটে ঘরের মতো ভারী হয়ে উঠল। আমিও তো খালি পায়ে রয়েছি, চটি এল না কেন? দিশি ছেলে শুধু পায়ে ঘুরতে পারে, বিদেশি ছেলের মোজা ময়লা হয়ে যায়। অদ্ভুত বিচার! আমি রোলস রয়েস থেকে এলে আমারও খাতির হত।

অঞ্জন বললে, আপনি কী করেন?

চাকরি, একটা কেমিকেল ফার্মে কেমিস্ট হিসেবে সবে ঢুকেছি।

ও আপনারও টেকনিক্যাল লাইন? আমি ভেবেছিলুম লিটারেচার।

কেন?

আপনাকে দেখলে তাই মনে হয়, কেমন একটা ড্রিমি পোয়েটিক লুক।

বাংলাদেশের এই বয়েসের সব ছেলেকেই মনে হয় ওইরকম দেখতে।

আপনারা অনেক আরামে থাকেন তো? ওদেশে ভীষণ খাটতে হয়। এতটুকু বসবার কি তাকাবার সময় পাওয়া যায় না। আপনি আমাদের ওখানে চলে আসুন। এ দেশে কোনও কিছুরই তেমন ফিউচার নেই। বাবাকে বললে আপনার আই সি আইতে একটা পোজিশন হয়ে যেতে পারে। বিরাট ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি।

ওঁরা অনেক ভাল ছেলে চাইবেন, অনেক বেশি কোয়ালিফায়েড।

আপনি কি খারাপ ছেলে নাকি! তা ছাড়া এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।

অঞ্জনের মা পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন এই ঘরের আরও তিনটে দরজা। কোনটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়, না গেলে বোঝা যাবে না। অঞ্জনের মা ঢুকতেই আমি উঠে দাঁড়ালুম।

তিনি বললেন, বোসো বোসো, উঠলে কেন?

আমি প্রণাম করার জন্যে নিচু হতেই, তিনি খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন, না না, পায়ে হাত দিতে হবে না, কেউ আমাকে প্রণাম করলে মনে হয় আমি বুড়ি হয়ে গেছি। তুমি বোসো। আমি বসলে ওই চেয়ারে বসব।

হাত ছেড়ে দিলেন। নিজেকে কেমন যেন বোকাবোকা লাগছে। মহিলার চেহারা প্রবীণা ফিল্‌মস্টারের মতো। বার্ধক্য আসছে বেশ বোঝা যায় হাতের দিকে তাকালে। চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে অল্প অল্প। তবে চোখদুটো দেখার মতো। টানাটানা বিশাল। অলস চোখ নয়। প্রতিটি কথার সঙ্গে চোখ হেলছে, দুলছে, ছোট হচ্ছে, বড় হচ্ছে। একই সঙ্গে দু'ধরনের ভাষায় তিনি কথা বলছেন। ভদ্রমহিলা নিশ্চয় নাচ জানেন। যাঁরা নৃত্যশিল্পী একমাত্র তাঁরাই চোখে কথা বলতে পারেন। সারা শরীরের বাঁধুনি দেখে মনে হচ্ছে নাচার অভ্যাস এখনও আছে। হাতের আঙুল মুদ্রার খেলছে।

আমি আমার জায়গায় বসে পড়লুম। অঞ্জন বললে, মা, মাসিমাকে তুমি বলে দিয়েছ তো আমরা ঝালমশলা এসব একেবারে সহ্য করতে পারি না?

ও জানে। নতুন করে বলার দরকার হবে না। তুই একবার ভেতরে আয় না। দরকার আছে।

ও তোমাদের মেয়েমহল আমার ভাল লাগে না মা। বেশ তো এখানে বসে আছি দু'জনে।

আয় না একবার। চলে আসবি এখুনি।

অঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে বলল, একটু বসুন, শুনে আসি কী বলছেন। মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, মা, আমি কিন্তু আগে থেকেই তোমাকে বলে রাখছি, ম্যাজিক আমি দেখাতে পারব না। আমার মুড নেই।

ম্যাজিক তোকে দেখাতে হবে না।

দু'জনেই দ্বিতীয় দরজা দিয়ে ভেতরে কোথাও চলে গেলেন। পাশাপাশি দু'জনকে মা আর ছেলে বলে মনেই হয় না। যেন অন্য কোনও জুটি। ম্যাজিক আবার কী? অঞ্জন ম্যাজিক দেখাতে পারে নাকি! গুণের ঘাট নেই। আবার এক ধাক্কা! এক পাল্লায় আমি, আর এক পাল্লায় অঞ্জন। অঞ্জনের দিকটা ভারে ভূমি স্পর্শ করবে।

আচ্ছা, আমাকেও তো ভেতরে যেতে বলতে পারত। অপর্ণাও তো একবার আসতে পারত। মানুষকে যত দেখা যায় তত চেনা যায় নিত্য নতুন রূপে। এই বোকার মতো বসে না থেকে, আমার কিছু একটা করা উচিত। বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার স্ট্যাটাসে যদি কেউ মিলতে পারে সে হল মায়া। সে হল ওই কাকিমার মতো কোনও মহিলা। অ্যারিস্টোক্র্যাট আমার ধাতে সইবে না। এইরকম জড়পিণ্ড করে চেয়ারে বসিয়ে রেখে দেবে। এখন আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটাই খাড়া হয়েছে আমার পিতৃদেবের অনুরোধে। এঁরা ভদ্র। কোনও এক দূর অতীতে বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন, তোর ছেলে আর আমার মেয়ে। তখন জানতেন না ছেলে কী আকার আকৃতি নেবে, মেয়েই বা কী চেহারা পাবে বড় হয়ে। এখন সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা।

না, এভাবে বসে থাকা যায় না। নিজেকেই নিজের ইডিয়েট বলতে ইচ্ছে করছে। আমি এই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। ঘরের বাইরে যাই। করিডর ধরে ফিরে চলি সিঁড়ির দিকে। ধাপে ধাপে নীচে। উপেক্ষায় শরীর

জ্বলছে।

সিঁড়িতে কারুর সঙ্গে দেখা হল না। রোদের রেখা সরে গেছে। নীচের ঘরে টোব্যাকোর গন্ধ ভাসছে। গ্র্যান্ডফাদার চেয়ারের হাতলে সোনার ঠোঁট লাগানো পাইপ কাত হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সবাই এখন কীসের প্রবল আকর্ষণে অন্দরমহলে। হাওয়াই জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার সেখানে হাতের খেলা দেখাচ্ছেন।

ছ'ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আরও নীচে। পঙ্কজবাবুর গাড়িটা নেই। তার মানে ভায়রাকে নিয়ে কোথাও বেরিয়েছেন। দু'সার সাবু গাছের ভেতর দিয়ে পথ এগিয়ে গেছে গেটের দিকে। বাইরের পথে দাঁড়িয়ে মুক্তি আমাকে ডাকছে, পালিয়ে আয়। শিকল সোনার হলেও শিকল।

গেট আর প্রায় হাতখানেক দূরে। এখনও কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। ভেতরটা কেমন যেন ধুকপুক করছে। যেন চুরি করে চোর পালাচ্ছে। আর মাত্র দু'পা।

পলাশদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?

নিজের হাতফসকে নিজেই পড়ে গেলুম। দূর আকাশের গায়ে, ছাদের আলসেতে অপর্ণা। ভিজে শাড়ি ভাঁজে ভাঁজে খুলে খুলে নেমে আসছে। নীল জমিতে ঝরছে শিউলি।

পাগলা মনটারে তুই বাঁধ।
কেন রে তুই যেথা সেথা
পরিস প্রাণে ফাঁদ?

যত জোরেই হাঁটি না কেন, কী যেন এক আকর্ষণ পেছন থেকে টানছে। হাঁটার বেগ যতটা হওয়া উচিত কিছুতেই যেন তা হচ্ছে না। স্বপ্নে একবার বাঘ দেখে দৌড়াবার চেষ্টা করেছিলুম। কী ভীষণ চেষ্টা! মাটিতে পা খচমচ করছে অথচ শরীর ছুটছে না। এদিকে বাঘ এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে, মুখে তার কথামালার বাঘের মতো এক ধরনের মিচকি হাসি। পালাতে না পেরে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিলুম। বাঘ সামনে এসে দু'পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলুম বাঘ নয়, মানুষ। আমার সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই। চোখে নিকেল ডাঁটির তলতলে গোল চশমা। খপ করে ডান হাতটা আমার কাঁধে ফেলে বললেন, শাখামৃগ, ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে পার পাবি ভেবেছিস! বল লতা শব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গ আছে, না নেই? আমি আরও জোরে কেঁদে উঠে বললুম, বিশ্বাস করুন আমি জানি না।

তবু আমি হাতিবাগানে এসে গেলুম। বাজার এখন জমজমাট। গাছের বাজার, পাখির বাজার, জীবজন্তুর বাজার। পা থেমে পড়ল। অপর্ণা এখন অনেক দূরে। ছাদের আলসেতে ঝুঁকে আছে। মাথার ওপর সূর্যের অগ্নিগোলক জ্বলজ্বল করছে। গহনগভীর চুলের অরণ্যে ভেসে আছে একটি গোলাপের মুখ। মানুষ আবার গোলাপ হয় কী করে! গোলাপ দেখতে চাও সামনে তাকাও।

সারি সারি টবে তাজা তাজা গোলাপ ফুটে আছে। ছোট ছোট গাছে একটি করে নমুনা ফুল। সাদা, টকটকে লাল, ফিকে গোলাপি, হলদে। এর মধ্যে কোনও এক জাতির গোলাপের নাম মিস মারসেল। মানুষ পাগলের মতো কিনছে। দরদাম করছে। কাঁধ দিয়ে এ ওকে ধাক্কা মারছে, ও একে। খাঁচার চন্দনা কর্কশ গলায় চিৎকার করে ক্রোধ প্রকাশ করছে। বাচ্চা দুটো বিলিতি কুকুর তিড়িং লাফাচ্ছে, আর শিশুর গলায় ডাকছে। চুলে পমেড মাখা, কাটগ্লাস চেহারার, গিলে করা হাফহাতা পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক নীল সিল্কের শাড়ি পরা এক ভদ্রমহিলাকে বলছেন, টেরিয়ারের জাতই আলাদা। তেজ দেখেছ, তেজ!

মহিলার বয়স অনেক কম, সম্পর্ক দেখে মনে হচ্ছে মেয়ে নয়, স্ত্রীও নয়। অন্য কোনও ব্যাপার। বড়লোকদের সব থাকে, জীবনদায়িনী ব্যাধি। মহিলা কুকুর ছেড়ে সোনালি রঙের একটা খরগোশের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেকেচো, দেকেচো, কী সুন্দর!

ভদ্রলোকের ওপর-হাত খামচে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন খরগোশের কাছে। অমন খরগোশ আমিও দেখিনি জীবনে। খরগোশ সাদা হয়। এ আবার কোন জাতের জীব! ভদ্রমহিলার আকর্ষণে ভদ্রলোক

টাল সামলাতে না পেরে উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন। পায়ে বার্নিশ-করা জুতো। মহিলার কোমর আঁকড়ে ধরে টাল সামলাতে সামলাতে বললেন, কী যে তুমি করো সুকু!

রাগের সঙ্গে স্নেহ, দেহবোধ মিলেমিশে মানুষের গলাটাকে কেমন করে দেয়। মহিলা চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, কোনও কম্মের নয়, একেবারে ঢ্যাঁড়োস।

আমি যেন সিনেমা দেখছি। ভীষণ মজা লাগছে। একজায়গায় কতরকমের মানুষ! একটু চিন্তা করলেই সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম রসবোধে মুগ্ধ হতে হয়। মহিলা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন। আমাকেই বললেন, গায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই। একটানেই উলটে পড়ে যাচ্ছে।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে নিজের মাথার চারপাশে গোল করে হাত ঘুরিয়ে বললেন, নাটবলটু ঢিলে আছে।

ভদ্রমহিলার কানে গেল না। সোনালি খরগোশ মন কেড়ে নিয়েছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে বলছেন, কী সুন্দর দেখো, কী সুন্দর দেখো।

সীতা যেন সোনার হরিণ দেখেছেন। মানুষ কেমন মেতে ওঠে। মন যেন ছটফটে মাছির মতো। একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে। সোনার খরগোশের দিক থেকে সরে এলুম। ডলপুতুলের মতো ফুটফুটে একটি মেয়েকে তার বাবা লোমওয়ালা সাদা একটা কুকুরছানা কিনে দিয়েছেন। মেয়েটির কোলে সেই কুকুর। কাকে দেখি, মেয়েটিকে না কুকুরটিকে? পৃথিবীর এই প্রান্তে হাটের একটি বৃত্তে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে।

সরতে সরতে পায়রা-পাড়ার কাছে চলে এসেছি। গাট্টাগোট্টা চেহারার এক ভদ্রলোক, ছুঁচোলো গোঁফ ঠোঁটের ওপরে কথা বলার তালে তালে নাচছে, পায়রা দর করছেন। পায়রা যে কত রাজকীয় পাখি এই প্রথম কাছ থেকে দেখে চিনলুম। দুধের মতো সাদা। আদুরে আদুরে মুখ। দৈত্যের মতো মানুষটির হাতে পায়রা যেন ঠিক মানাচ্ছে না। এ হাতে থাকবে বাজপাখি।

রংমহলের রং দেখতে দেখতে সময় যে কীভাবে হুহু করে কেটে গেল। মানুষের বরাত। রাজভোগের বদলে হরিমটর। এতখানি বেলা হল, পেটে এখনও দানাপানি পড়ল না। অনেক আগেই খিদেয় পেট জ্বলছিল, এখন পিত্তি পড়ে মুখ তেতো লাগছে। বাড়িতেও মনে হয় আহারের ব্যবস্থা থাকবে না। কিছু খেতে পারলে মন্দ হত না। সিনেমা আর বাজার পাড়ায় চপকাটলেট ছাড়া কিছু পাওয়া যাবে না।

ঝোঁকের মাথায় তেড়ে বেরিয়ে এসে কেমন যেন লাগছে এখন। খুব ছেলেমানুষি হয়ে গেল। কী ভাবলেন ওঁরা কে জানে! কী করব! পালিয়ে না এসে আমার উপায় ছিল না। যেখানে গেলে মন কুঁকড়ে যায়, সেখানে এক মুহূর্তও থাকা চলে না। ও বাড়ি আমার বাড়ি নয়। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ছোট মাপের মন। রাজাউজির মারতে শেখেনি। আমার জগৎ আলাদা।

আমার জগৎ আলাদা, এই ভাবনা আসামাত্রই মনে বেশ একটা বল পেয়ে গেলুম। ঘিনঘিনে সেই পাপবোধটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। পতন আর উত্থান এই তো মানুষের জীবন। একবার পড়েছি বলে পড়েই থাকব, তা কেন? আবার উঠব ঠেলে। তবে এ কথাও ঠিক, মনে এক ধরনের স্বাদ লেগেছে। জীবনে যেদিন প্রথম মাংস খেয়েছিলুম সেদিন কেমন লেগেছিল। সবকিছুরই একটা প্রথম আছে। অক্ষর পরিচয়। অ লিখতে শেখা, আ লিখতে শেখা; প্রথম একা একা পথে বেরোনো। প্রথম ইস্কুল, প্রথম কলেজ। প্রথম চুম্বন। মায়া

যেদিন প্রথম আমাকে চুমু খেয়েছিল। ঘুঘু-ডাকা এক দ্বিপ্রহরে, সবুজ গাছপালা চারপাশে। কচুরিপানা ভরা পুকুর। ফড়িং উড়ছে নেচে নেচে। কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবু ভেতরটা ঠিক সুরেই বেজে উঠেছিল। সে ঝংকার যে কী ঝংকার, যে জানে সে জানে।

পাঁচমাথার মোড়ে এসে ঘোষেদের একদা-বিখ্যাত মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকে পড়লুম। সামান্য কিছু খাওয়া দরকার। নিজেকে জেল-ভাঙা আসামির মতো মনে হচ্ছে। পেছন থেকে কেউ না এসে চেপে ধরে! কী করা যায়! বড় দোটানায় পড়ে গেছি। দুটো জগৎ দু'পাশ থেকে কান ধরে টানছে। ভোগ আর ত্যাগ। কোথায় গেল আমার সেই রোম্যান্টিক মন। দেহ ঢুকেছে মনে। অপর্ণার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দৃষ্টি আমার কোথায় ঘুরছিল! ছিঃ ছিঃ মন।

কে যেন খুব চড়া গলায় বললেন, কী খাবেন বলুন? আমাদের অন্য কাস্টমার আছে।

ও হ্যাঁ, হিং-এর কচুরি খাব।

ক'খানা?

চারখানা।

মিষ্টি?

দুটো বালুসাই।

দোকানে খুব একটা ভিড় নেই। লোকটি খুব কাস্টমার দেখিয়ে গেল। ভাবজগতে থাকলে মানুষ সহজে কিছু শুনতে পায়! আমার বলে এখন জীবনমরণ সমস্যা। মচকাব তবু দোমড়াব না। কিন্তু কীসের এ লড়াই! বিয়ে যদি করতেই হয় তা হলে করে ফেলতে দোষ কী! এমন তো কিছু গর্হিত কর্ম নয়! সকলেই করে। সংসারে থাকতে হলে সংসারীই হতে হয়। সন্ন্যাসী হতে হলে সংসার ছাড়তে হয়। ন্যাজে খেলার কোনও মানে হয় না। আর বিয়ের আগে একটু এদিক-সেদিক। বিলেতে অমন অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়। এ দেশের বিলেত হতে বাকি কী আছে। সাজে পোশাকে, আহারে বিহারে সবেতেই সায়েবি ঢং এসে গেছে। প্রাচীনের যুগ প্রায় শেষ হয়ে এল। দোকান হলে লিখে দিত। রেম্‌নান্টস ফর সেল। প্রাচীন বিশ্বাসের ঝড়তিপড়তি কিছু পড়ে আছে। জলের দামে বিকিয়ে যাবে।

তিনটে বেজে পনেরো মিনিট হল। বাড়ির সামনে দূর থেকে সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে গেলুম। পঙ্কজবাবু ঠিক ধাওয়া করে এসেছেন। কতক্ষণ এসেছেন কে জানে। পা থেমে পড়তে চাইছে। মনে হচ্ছে, যেদিক থেকে এসেছি আবার সেই দিকেই পালাই। ভাবলে কী হবে! ঘটনা যেন অজগরের নিশ্বাস। নিশ্বাসের টানে ছাগলছানা পায়ে পায়ে এগিয়েই চলল। এই প্রথম নিজেকে মনে হল শিকার। ঘটনার শিকার, পরিস্থিতির শিকার, দুটো মনের লড়াইয়ের শিকার।

সদর দরজার পাশেই কাকিমা দাঁড়িয়ে আছেন। দরজার একটা পাল্লা ভেজানো। আর একটা ঈষৎ ফাঁক, সেই ফাঁকে চোখ রেখে কাকিমা স্থির। দৃষ্টি এতই সুদূরে, মন এমনই তন্ময়, আমি একেবারে সামনে না গিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তিনি আমার আগমন টেরই পেলেন না। চমকে উঠে বললেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে আমাকে ঢুকতে দিলেন, তারপর দরজা আবার ভেজিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, ছিলে কোথায়? তুমি নাকি কিছু না বলে ওঁদের বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ?

পালিয়ে এসেছ শব্দটা কানে বড় কর্কশ লাগল। মনে হল বলি, বেশ করেছি। আমি কি কারুর বন্দি পাখি? বলতে পারলুম না। সামনে যে-মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। মুখে বলার সাহস নেই, মন বলছে, আমি তোমার জন্য বড় বিচলিত। একে ভালবাসা বলা যায় কি না জানি না। হয়তো যায় না। শীতের সকালে উষ্ণ জল অথবা নরম আঁচের রোদ যেমন মনের ভেতর একটা আমেজ তৈরি করে দেয়, তুমি সামনে এলে আমার সেইরকমের একটা সুখসুখ অনুভূতি হয়। খুব বিশাল একটা ঘরে সার সার ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। লম্বা খাবার টেবিলে সুদৃশ্য চিনামাটির প্লেটে অদ্ভুত সব ভোজ্য সামগ্রী। বাদামি রঙের রোস্ট করা মুরগির ঠ্যাং, ফিকে হলুদ পুডিং, তার ওপর কাঠি গোঁজা লাল একটি চেরি ফল। পাল-তোলা গেলাসে স্বচ্ছ লাল পানীয়, রুপোর পাত্রে সরু চালের হালকা হলুদ বিরিয়ানি। জাফরানের রং, জায়ফল আর আতরের সুবাস। দু'খণ্ড করা লাল বেদানার দানা, থোলো থোলো আঙুর, পালিশ করা আপেল, দূরে কোথাও কোনও ঝরনার ফিনিক ফিনিক শব্দ। তোমাকে দেখলে আমার কেন জানি না এইসবই মনে পড়ে। বড় ভোগের ইচ্ছে হয়। কৃশকায় এক সন্ন্যাসীকে চোখে হাত চাপা দিয়ে চলে যেতে দেখি। তাকে আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। বিশাল আকাশের চেয়ে কূপকেই সুখের মনে হয়। আগুন জ্বলে। সে আগুন হোমের নয়। যে-আঁচে মশলা-মাখা মুরগি ধীরে ধীরে বাদামি হতে থাকে, সেইরকম কোনও কাবাবের আঁচ। মহিলা আমার দু'কাঁধে হাত রেখে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, কী হয়েছে তোমার?

চমকে উঠে বললুম, না কিছু হয়নি। আমার কি ওপরে যাওয়া উচিত, না সরে পড়ব?

সরে পড়বে কেন? ওঁরা দু'জনেই ভীষণ চিন্তায় আচ্ছন্ন। তুমি এখুনি ওপরে যাও।

ফাঁসির আসামি যেভাবে বধ্যভূমির দিকে এগোয় আমি সেইভাবে ওপরে উঠে গেলুম। ভাবতে লাগলুম, কীভাবে আমার কাহিনিকে সাজাব। বিশ্বাসযোগ্য একটা কিছু বলতে হবে। মিথ্যেকে করে তুলতে হবে সত্যি।

সকালের সেই পোশাকে পঙ্কজবাবু বসে আছেন সোফায়। আমি পেছন থেকে দেখছি। বাতাসে চুল এলোমেলো। ঘরে পিতৃদেব নেই। দেয়ালে প্রায় নিঃশব্দে ঘড়ির দীর্ঘ পেন্ডুলাম সময়ের রেখা টেনে চলেছে।

আমি অবাক হয়ে দেখছি। এমন সময় ভেতরের ঘর থেকে পিতা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন, চলো তা হলে, আর দেরি করে লাভ নেই। নিশ্চয় কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

কোঁচার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। মুখ তুলেই আমাকে দেখতে পেলেন। মুখের চেহারা একবারে পালটে গেল। মনেই হল না কঠোর একটি পুরুষের মুখ। স্নেহের নরম ছায়া নেমেছে। মা যেন যুদ্ধ-ফেরত সন্তানকে দেখছেন। অদ্ভুত গলায় বললেন, তুমি এসেছ!

পঙ্কজবাবু ধড়মড় করে ঘাড় ফেরালেন। সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?

পিতা বললেন, ওকে আগে ভেতরে আসতে দাও। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুব বিপদে পড়েছিল।

পঙ্কজবাবু এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন, কী হয়েছিল বাবা?

সত্যি কথাই মুখে আসছিল। চাপা অভিমানে আমি পলাতক হয়েছিলুম। স্টেটাসে মিলবে না বলে সরে যেতে চেয়েছি। বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা মানায় না। বলা গেল না, কিছুতেই বলা গেল না। পরিবারের বাইরে এই মানুষটি একেবারে আমাদের মতো, যেন আর এক পিতা। মৃদু গলায় বললুম, আমার ভীষণ বড়বাইরে পেয়েছিল।

অ্যাঁ, সেকী? তা তুমি কী করলে?

আমি তিরবেগে বেরিয়ে এলুম। প্রাণপণে চেষ্টা করলুম বাড়ি আসার। হল না। শেষে কলেজে চলে গেলুম। সেখানে কোনওরকমে, এই আর কী?

আমাদের বাড়িতে সাত-সাতটা বাথরুম, তুমি তিরবেগে ছুটলে, একবার বললে না?

আমার বলতে ভীষণ লজ্জা করল।

পিতা বললেন, হি ইজ এ ফুল। পঙ্কজ, এই হল বাঙালি। বাইরের জগতে নিজেকে এমনভাবে প্রোজেক্ট করতে চায়, যেন দেবতা। মানুষও যে অ্যানিম্যাল, তারও যে আহার, নিদ্রা, মৈথুন— আই অ্যাম সরি, রিয়েলি আই অ্যাম সরি, এক্সকিউজ মাই ল্যাঙ্গোয়েজ।

পঙ্কজবাবু বললেন, তুমি একবার বললে না কেন বাবা? ইস কত কষ্ট পেলে।

ও প্রশ্ন আর নাই বা করলে পঙ্কজ। লজ্জা, লজ্জা। লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু পুরুষের? পুরুষের ইডিওসিনক্রেসি। একবার ঠিক এই কাণ্ড করেছিল আমাদের অফিস-রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংশনে গিয়ে। আমি ডায়াসে অরকেস্ট্রার সঙ্গে এসরাজ বাজাচ্ছি। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি, বেশ বসে আছে সামনের সারিতে। হঠাৎ দেখি নেই। ভাবলুম ছোটবাইরে করতে গেছে। অনুষ্ঠান শেষ। তবু বাবুর পাত্তা নেই। খোঁজ খোঁজ। কাকস্য পরিবেদনা। পরের দিন পনেরো টাকা ফাইন দিয়ে বাবুকে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট থেকে খালাস করে আনলেন আমার শ্বশুরমশাই। পুলিশ পাঁচ লাইনে চালান করে দিয়েছিল। লজ্জা!

পঙ্কজবাবু বললেন, কীসের লজ্জা! আমাদের বাড়িতে তোমার কীসের লজ্জা! তুমি তো ব্যাটাছেলে! আজকাল মেয়েরাই উদোম হয়ে ফিরিঙ্গি নাচ, আই অ্যাম সরি। এক্সকিউজ মাই ল্যাঙ্গোয়েজ।

পিতা বললেন, কীসের লজ্জা, শুনবে? সব খুলে গামছা পরে...।

গামছা পরবে কেন? তোয়ালে, তোয়ালে পরবে।

আরে তার চেয়েও বড় কথা, যে-মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়, ওর ব্যাখ্যায় সে মানুষ মানুষই নয়, জন্তু। যাক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ওকে ছেড়ে দাও। একটু সাফা হয়ে আসুক। অশুদ্ধ হয়ে আছে।

হ্যাঁ বাবা যাও, চট করে সেরে এসো। ওরা সব না খেয়ে তোমার জন্যে হাঁ করে বসে আছে। পঙ্কজবাবুর কথা শুনে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। আবার যেতে হবে! মিউমিউ করে বললুম, আবার যেতে হবে!

বাঃ যেতে হবে না! তুমিই তো সব। তোমার জন্যেই তো সব আয়োজন!

পঙ্কজবাবু বললেন ভাল। তবে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আয়োজন আমার জন্যে নয়। উপলক্ষ ভায়রাভাই। এক ঢিলে দু'পাখি মারা হচ্ছে। তবু বলেছেন, এই যথেষ্ট। এসে বসে আছেন কতক্ষণ! সেও তো কম কথা নয়! নিজের বোকামির জন্যে সকাল গেল, দুপুর গেল, এইবার রাতটাও যেতে বসেছে। পেটে হিং-এর কচুরি ঠেলেঠেলে উঠছে। এই অসময়ে আর কি কিছু ভালমন্দ খাওয়া যাবে।

পঙ্কজবাবুর খুরখুরে গাড়ি আবার কলকাতামুখো। আবার সেই মনস্তত্ত্ব। দু'হাতে স্টিয়ারিং। দু'চোখ রাস্তায়। মুখে ক্লান্তির ছায়া। আমাকে বললেন, বুঝলে, তোমার মন আমি বুঝে ফেলেছি। তুমি সত্যি কথা বললে না। আসলে তোমার অভিমান হয়েছে। বলো, ঠিক ধরেছি কি না! এইবার তুমি সত্যি বলো!

পঙ্কজবাবুর কথা শুনে গলা শুকিয়ে এল। মিথ্যে কীভাবে ধরা পড়ে যায়। পাপ অনেকটা পক্সের মতো। গায়ে গুটি বেরোয়। অভিজ্ঞ মানুষ দেখেই ধরে ফেলেন। পঙ্কজবাবু তন্ময় হয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসিটি লেগে আছে। ইনি এক অন্য জাতের মানুষ। পাকা পিচফলের মতন নরম। ভেলভেটের মতো মন। এঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়ে গেলে ক্ষতি কী! আবার একটা জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ার চেয়ে, মনে যা হয়েছে তা বলে ফেলাই ভাল।

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি ধরেছেন ঠিক, আমি সত্যি কথা বলিনি। বলার সাহস হয়নি।

তুমি ওভাবে তা হলে পালিয়ে এলে কেন?

আমার মনে হল□—

মনে হল, বলে থেমে পড়তে হল। ভাষায় কুলোচ্ছে না। এমন কিছু শব্দ চাই যা বেশ ভদ্র, নরম অথচ স্পষ্ট।

বলো, কী তোমার মনে হল? আমরা খারাপ লোক?

আজ্ঞে না। ছি ছি, খারাপ লোক কেন হবেন! আপনারা অসাধারণ। সেই তুলনায় আমি ভীষণ সাধারণ। আমার মনে হল, আপনাদের পরিবারে আমি একেবারেই মিসফিট।

মিসফিট? এমন মনে হবার কারণ!

আপনারা ধনী। আপনাদের আত্মীয়স্বজন সব বড় বড় ব্যক্তি, জীবনে কত সুপ্রতিষ্ঠিত! সেই তুলনায় আমি একটা বোগাস। জীবনে খুব বেশি দূর ওঠার যোগ্যতাও আমার নেই। এইরকম একটা মিডিয়োকার ছেলে ও পরিবারে অচল।

এই তোমার ধারণা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমরা তা হলে তোমাকে আপন করে পেতে চাইছি কেন?

ঠিক জানি না। ধরতে পারছি না বলেই আশ্চর্য হচ্ছি।

তুমি খুব মেটিরিয়ালিস্ট!

একেবারেই না।

তা হলে তুমি ও রাস্তায় ব্যাখ্যা খুঁজতে যাচ্ছ কেন?

আজ্ঞে ওইটাই তো পৃথিবীর রাস্তা। জীবনের রাজপথ।

রাজপথের পাশে পায়ে-চলা পথও থাকে যে-পথে তীর্থযাত্রীরা যাওয়া-আসা করে।

পঙ্কজবাবু গাড়িটাকে হেদোর ডান পাশে নির্জন একটা রাস্তার ধারে দাঁড় করালেন। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। একপাশে সার সার বাড়ি, বাগান। আর একপাশে বড় বড় গাছ। দেবদারু, কৃষ্ণচূড়া। বিকেলের আলো মরে আসছে। ঝাঁক ঝাঁক পাখি কিচিরমিচির করছে। ডাইভিং বোর্ড থেকে মাঝে মাঝে এক-একজন জলে ঝাঁপ মারছে। শব্দ হচ্ছে ঝপাং।

স্টার্ট বন্ধ করে পঙ্কজবাবু আমার মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। কাল রাতে সদ্য-পাওয়া মুখের কাটা দাগ আমার ভেতরটাকে কেবলই সামনে ঠেলে দিতে চাইছে আর আমি ক্রমশই কুঁকড়ে যাচ্ছি। পঙ্কজবাবু হঠাৎ খপ করে আমার হাতদুটো চেপে ধরলেন। হাত কাঁপছে। ভদ্রলোক যে-কোনও কারণেই হোক উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।

চাপা গলায় বললেন, তোমাকে আমি ধরে ফেলেছি।

ধরে ফেলেছি বলায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। কী ধরে ফেলেছেন! আমার মন, আমার চিন্তা! বলা যায় না। কোনও কোনও মানুষের ভীষণ শক্তি বাড়ছে। পঙ্কজবাবুর পরের কথায় ভয় কেটে গেল।

তুমি গ্রহণ করেছ।

কাকে?

আমার মেয়ে অপর্ণাকে। তার ওপর তোমার একটা অধিকারবোধ জন্মেছে। বলো ঠিক কি না?

আজ্ঞে তা কী করে হয়?

হয়, খুব হয়, তা না হলে তোমার অভিমান হত না। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। শোনো, অর্থ, কেরিয়ার এসবের প্রয়োজন আছে, তবে সব নয়, সবার ওপরে হল বংশ, কৌলীন্য, চরিত্র। প্রাচীনকালে গৌরীদানের প্রথা ছিল। যুগ পালটেছে। পালটালেও, ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া উচিত। জানো তো, প্রবাদ আছে মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয়ে যায়। ছেলেদেরও পঁচিশের মধ্যে বিয়ে দেওয়া উচিত। এই তো সেই বয়েস। স্বপ্ন দেখার বয়েস, রোমান্সের বয়েস, ঘর বাঁধার বয়েস, আনন্দ করার বয়েস, দুঃখ সহ্য করার বয়েস। তোমার ঠাকুর বলতেন, হাঁড়ি যতক্ষণ কাঁচা, তলতলে, ততক্ষণই তার গায়ে আঁকিবুকি চলে। পেকে গেলে পুড়ে গেলে আর কিছু চলে না। তুমি ওই বিলিতি বস্তু দেখে ভয় পেয়ো না। ওরা আমাদের ঘন্টাকয়েকের অতিথি। আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের আদর্শ আলাদা। তুমি একটু হাসো। তোমার সেই হাসিহাসি মুখ ফিরিয়ে আনো।

আমাকে হাসতেই হল। পঙ্কজবাবু সত্যিই আমাকে ধরে ফেলেছেন। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার রাস্তায় ভেসে পড়ল। উনি গুনগুন করে গান ধরেছেন, পাগলা মনটারে তুই বাঁধ। সেই বিশাল বিশাল থামওলা শ্বেতপাথরের মতো শুভ্র বাড়িটি ক্রমশই এগিয়ে আসছে। গাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়াল। সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে অপর্ণা, বাবা, খুঁজে পেয়েছ, খুঁজে...একটি মুখ ঝুঁকে এল জানলার কাছে। সুন্দর এক সুবাস।

দিয়েছিলে জ্যোৎস্না তুমি, নিয়ে আছি অন্ধকার

সারাশহরের যানচলাচল বিপর্যস্ত করে বিশাল এক মিছিল বেরিয়েছে। কোনও এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের। সিংহাসনে বসে আছেন ধর্মগুরু। সিল্কের গেরুয়া পরে। সিংহাসন চলছে কলে। একটা হুড-খোলা মোটরগাড়িকেই ওইভাবে সাজানো হয়েছে। ফুলে ফুলে ছয়লাপ। ধর্মগুরুকে দেখতে ভারী সুন্দর। তপ্তকাঞ্চনের মতো গাত্রবর্ণ। মুখশ্রী যিশুখ্রিস্টের প্রায় কাছাকাছি। অতি সুন্দরী দুই মহিলা দু'পাশে বসে চামর ব্যজন করছেন। তার মধ্যে একজন বিদেশিনী।

জ্যামে আটকে পড়া বাসের জানলায় বসে বসে মিছিল দেখছি। ধর্মোন্মাদ নরনারী সুললিত সংগীত করতে করতে গুরুকে নিয়ে চলেছেন। এই যে সব বলেন ধর্মজগতে নারীসঙ্গ বর্জন করে চলতে হয়! ও না, সে মনে হয় প্রাথমিক স্তরে। একটু এগিয়ে গেলে, কী বা নারী, কী বা পুরুষ! 'সেক্সলেস' দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা। সে দেখাটা কেমন কে জানে! অমন কন্দর্পকান্তি চেহারা পেলে বুক ঠুকে সংসার ত্যাগ করে সাধনজগৎ তোলপাড় করে দেখা যেত। পৃথিবী মোটেই মর্কটের জন্যে নয়। মিছিলে দু'-একজন ভক্ত মহিলার ভাবোন্মেষ হয়েছে। তাঁরা টলেটলে চলেছেন। শাড়ির আঁচল শরীর থেকে খুলে পথে লুটোচ্ছে। একেই বলে, সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে।

অফিস থেকে যেটুকু আগে বেরোবার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, সেটুকু সময় পথেই পড়ে রইল। বাড়ি ফেরার জন্যে মন ছটফট করছে। মুকুর রেখে-যাওয়া খাম আমাকে আজ খুলতেই হবে। পৃথিবী যদি উলটেও যায় আজ আমি খুলে দেখবই।

মিছিল ধীরে ধীরে দক্ষিণে চলে গেল। ট্রাম আর বাসের জট একটু একটু করে খুলছে। ভেবেছিলুম সন্ধের আগে বাড়ি পৌঁছে যাব, তা আর হল না। মুকুরা এতদিনে বাড়ি পৌঁছে গেছে। সেখানে কী হচ্ছে কে জানে! এসেছিলেন তিনজন, ফিরে গেলেন দু'জন। আমার মাতুলও মনে হয় এতক্ষণে তাঁর নতুন কর্মস্থলে পৌঁছে গেছেন। কতক্ষণের পথ। মাতামহকে পিতা আটকে দিয়েছেন। আগে শরীর, তারপর তীর্থধর্ম। আজ আসবেন একজন বড় ডাক্তারবাবু। তাঁরই নির্দেশে চিকিৎসা চলবে। রক্ত পরীক্ষা, দেহনির্যাস পরীক্ষা। ছুটোছুটি আমারই বাড়বে। তা বাড়ুক, কাউকে আমি হারাতে চাই না। জীবন হবে পূর্ণ, তা নয় কেবলই শূন্য হয়ে আসছে। সবাই যেন পা নামিয়ে বসে আছেন। ঈশ্বর একবার স্টার্ট বললে হয়। দৌড়োতে শুরু করবেন। যে-সূর্য রোজ সকালে ফিরে আসেন, দিবাশেষে তাঁর অস্তমুহূর্তে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। মানুষের অস্তের তো আর উদয় নেই। সব সম্পর্ক শেষ করে, সব ঘুচিয়ে চলে যাওয়া। নাঃ, ক্ষমতা থাকলে ধর্মগুরুই হতুম। তাঁকে ধরেই পড়ে থাকতুম, যাঁর উদয় নেই, অস্ত নেই, ক্ষয় নেই। সদা পূর্ণ।

বাস এতক্ষণ আটকে থাকার শোধ তুলে নিচ্ছে। ঝড়ের গতিতে ছুটছে। যাত্রীরা খুব খুশি। গতির উত্তেজনায় সব বাহবা বাহবা করছেন। আমার পাশে বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ। তিনি কেবলই বলতে লাগলেন,

যখন ভিড়িয়ে দেবে তখন বুঝবে মজা, বাহবা বেরিয়ে যাবে। একটু গলা চড়িয়ে কনডাক্টরকে বললেন, ওহে, আমরা বাড়ি যেতে চাই, হাসপাতালে নয়। পেছন থেকে এক ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করলেন, দাদু, এখনও এত প্রাণের মায়া! ঘাড় না ঘুরিয়ে বৃদ্ধ বললেন, নাতি, আমার জন্যে নয়, ভাবছি তোমার জন্যে, নাতবউ যে কাঁচা বয়েসে বিধবা হবে।

নাতির মুখে আর কথা সরল না। দুটো স্টপেজ পরে বৃদ্ধ নেমে গেলেন। তিনটে স্টপেজ পরে নেমে গেলেন ব্যঙ্গকারী যুবক। আকাশের আজ খুব শোভা। পুব আকাশে গুটিগুটি শামুকের গতিতে চাঁদ উঠে পড়েছে। আমাদের এ তল্লাটে এখনও বড় বড় গাছ আছে। ডালপালা থেকে জলের ফোঁটার মতো ভিজেভিজে চাঁদের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।

বাড়ি একেবারে শান্ত। কাকিমা সবে গা ধুয়ে তারে ভিজে জামা মেলছেন। ভিজে শাড়ি জড়ানো শরীর। আমার পায়ের শব্দে ফিরে তাকালেন। সামান্য অনুযোগের গলায় বললেন, তুমি বলেছিলে আজ তাড়াতাড়ি আসবে, এই তোমার তাড়াতাড়ি?

কী করব। এক ঘণ্টার পথ আসতে দু'ঘণ্টা সময় লাগল।

আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারে বোধহয় বেশি টান পড়েছিল, পটাং করে ছিঁড়ে সায়াব্লাউজ সমেত উঠোনে নেমে এল।

কাকিমা বললেন, যাঃ হয়ে গেল, আবার কাচো।

আগে ভিজে কাপড়টা শরীর থেকে খুলুন। ঋতু পরিবর্তনের সময়, জ্বরে পড়লে কে দেখবে?

দেখার মানুষ আছে।

সে কে?

এই যে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

কাকিমা নিচু হয়ে জামাকাপড় তুলতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হল, আমি সংসার পেতে ফেলেছি। আমাকে আর গৃহী করার প্রয়োজন কী? গৃহী তো হয়েই গেছি। আবার সেই রাত আসছে। আজ কী হবে! কে কোথায় থাকবে? আসুক রাত, তখন ভাবা যাবে।

কাকিমা বললেন, আজ সারাদুপুর বসে বসে তোমার জামাকাপড় সব কেচে দিয়েছি। ওপরের চেয়ারে পাট করা আছে। ইস্ত্রিতে দেবার হলে দিয়ে দিয়ো।

এত কষ্ট করতে গেলেন কেন?

আমার খুশি। তুমি এখন চা খাবে?

খাব।

তা হলে হাত মুখ ধুয়ে এসো।

সিঁড়ির ধাপ দুয়েক উঠেছি, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল খড়খড় করে। কাকিমা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়লেন। আবার নেমে আসতে হল। দরজা খুলেই চমকে উঠতে হল। কী আশ্চর্য, ইনি তো সেই ভদ্রলোক। হাতিবাগানে সোনালি খরগোশ দর করছিলেন, সাথে এক ঢলে-পড়া সুন্দরী মহিলা নিয়ে।

আমি চিনতে পেরে চমকে উঠলেও, ভদ্রলোক আমাকে চিনতে পেরেছেন বলে মনে হল না। কাকিমার নাম করে বললেন, আছে?

খুবই ঘাবড়ে যেতে হল, কে এই ভদ্রলোক? সাজপোশাক ঠিক সেদিনকার মতোই। শরীর থেকে ফিনফিনে ধারালো এক গন্ধ উঠে এসে নাকে লাগছে। মুখে পাউডার মেখেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এইরকম একজন মানুষ কাকিমাকে খুঁজছেন কেন? বেশ সাবধানে সংযত হয়ে বললুম, কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক হাসলেন। বাঁধানো দাঁত। ভয় নেই। তুমি আমাকে চেনো না। আমি তার মামাশ্বশুর। আমার কথা নিশ্চয়ই শুনেছ?

তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালুম। বললুম, আসুন, আসুন।

কালো ফিতেপাড় ধুতির কোঁচাটিকে সাবধানে হাতে ধরে ভদ্রলোক চৌকাঠ টপকে ভেতরে এলেন। জুতোর বার্নিশ ঝিলিক মেরে উঠল। আমি জানি ভদ্রলোকের শরীরে তেমন জোর নেই। সেদিনে সেই ‘বাকসম’ মহিলার উৎসাহের আকর্ষণে উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন। ভেতরে পা রেখেই ভদ্রলোক গ্রাম্যসুরে চিৎকার করে উঠলেন, কই গো, কোথায় গেলে?

কাকিমা কোনওরকমে একটা শাড়ি জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছেন, আসুন মামাবাবু, আসুন।

নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেলেন, ভদ্রলোক হাতদুটো খপ করে চেপে ধরে মহিলাকে প্রায় বুকের কাছে টেনে নিতে চাইলেন। এক সার সোনার বোতাম বুকের কাছে দাঁত বের করে হাসছে। বয়েস মানুষকে কিছু লাইসেন্স দেয়; কিন্তু এ মানুষটি তো লাইসেন্সাস। কেউ না জানুক আমি জানি।

কাকিমা সরে যাবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, মামাবাবু, আপনি তা হলে ওপরেই বসুন।

ওপরে কেন? নীচেটাই তো বেশ ভাল।

না না, বড় ড্যাম্প, মশা। আপনি বসতে পারবেন না।

এখন আমি সব পারি গো। একসময় ছিল যখন গোকুল আড্ডি ওয়েলার ঘোড়া জুতে ফিটন চাপত। স্কচ ছাড়া কিছু গলায় ঢালত না। এখন সব শেষ। কলসির জল গড়াতে গড়াতে এখন সব ফৌত।

মনে মনে ভাবলুম ফৌত তো হবেই, অসুখটা যে খুব সিরিয়াস! সোনার হরিণ ধরে দিতে গিয়ে রামচন্দ্র কাত হয়ে গিয়েছিলেন, ইনি আবার সোনার খরগোশ কেনেন!

কাকিমা বললেন, তা হোক, আপনি ওপরেই বসুন, আমি চা চাপাচ্ছি।

কাকিমা যেমন করেই হোক ভদ্রলোককে ওপরে পাঠাতে চান, ভদ্রলোকও নাছোড়বান্দা। নীচেটাই তাঁর পছন্দ। শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা কোথায়?

এখনও ফেরেননি। অফিসে।

তা হলে একা একা আমি ওপরে কী করব? এলুম তোমার কাছে, তুমি আমাকে ওপরে পাঠিয়ে দিচ্ছ! ভদ্রলোকের মতিগতি ভাল নয়। সন্ধেবেলা শাঁখের শব্দে ঘরে ঘরে দেবতারা আসেন, কোথা থেকে এই বৃদ্ধ মদন-মঞ্জরি এসে হাজির হলেন! মেয়েদের জীবন কী ক্যাডাভারাস! খোলা পড়ে থাকার উপায় নেই। মিষ্টির মতো। ভ্যানভ্যান করে মাছি আসবে, বোলতা আসবে। তা আমার এত গায়ের জ্বালা কেন? কারণ আছে। অবচেতনায় একটা অধিকারবোধ জন্মেছে। ঘটার আগেই ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। যাক গে, মরুক গে, এই

কচলাকচলি দেখতে আর ভাল লাগছে না। আমার অত মাথাব্যথার কোনও কারণ নেই। আমার চেয়েও মামাশ্বশুর নিশ্চয়ই আপনার জন। অন্যের চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ করার আগে নিজের চরিত্র সামলানো উচিত। চালুনির কি আর ছুঁচের বিচার চলে!

ওপরটা একেবারে পরিপাটি করে সাজানো। দেখলেই বোঝা যায় এর পেছনে বেশ রুচিবান একজন মহিলার সারাদিনের হাতের স্পর্শ রয়েছে। রাগতে গিয়েও রাগা যায় না। অভিমান ফেলে দিতে হয় ছুড়ে। চান করে নিতে পাঁচ মিনিটেরও বেশি সময় লাগল না। চায়ের আশায় বসেই আছি, বসেই আছি। কাকস্য পরিবেদনা। নীচে নামতেও ভরসা পাচ্ছি না। কী দেখতে কী দেখে ফেলব! চোখে উড়ে এসেছে পাপীর দৃষ্টি। বৃদ্ধ, তায় আবার আপনজন, তার ওপর ভোগী। অসীম ছাড়পত্র হাতে। মাঝখান থেকে এক কাপ চা জুটল না বরাতে। নিজে করে খাব, সে উৎসাহেও ভাঁটা পড়ে গেল।

হঠাৎ বুকসেলফের দিকে নজর চলে গেল। পিতৃদেবের ধর্মভাব আসায় একের পর এক আধ্যাত্মিক বই কিনে চলেছেন। সম্প্রতি পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ কিনে এনেছেন। পাঁচটি খণ্ড পরপর পাশাপাশি সাজানো। এখনও পর্যন্ত একদিনও আমি খুলে দেখিনি। কী খেয়াল হল, দ্বিতীয় খণ্ডটা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম। শুনেছি ধর্মজগতে এর চেয়ে খোলাখুলি ডায়েরি বিরল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনে হল, বইটির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি। যেখানেই খুলছি, সেইখানেই চোখ আটকে যাচ্ছে। সংস্কারমুক্ত প্রকৃত সাধকের উপলব্ধি বলেই এমন হচ্ছে।

পাতার পর পাতা ঘুরতে ঘুরতে একটি পরিচ্ছেদে এসে চোখ আটকে গেল। হেডিং, প্রলোভনে অবিকার, অহংকারে পতন। অংশটি পড়ে অবাক হয়ে গেলুম। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে ব্রহ্মচারী বাড়ি ফিরছেন। তাঁর নিজের ভাষায়, 'কিন্তু বিধির পাকে দুর্মতিবশতঃ এদিকে সেদিকে মাসাধিককাল ঘুরিয়া বেড়াইলাম। এই সময়ে কিছুদিন এক পরিচিত লোকের ভবনে আমায় অবস্থান করিতে হইল।' যে-ভদ্দরলোকের বাড়িতে উঠলেন, তিনি একদিন বিষয়কর্মে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যেতে বাধ্য হলেন। যাবার সময় ব্রহ্মচারীজির ওপর বাড়ি এবং এক অবিবাহিতা মহিলার তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে গেলেন। 'চাকর চাকরানী ব্যতীত অন্য পরিজন না থাকায়, কামিনীর তত্ত্বাবধানের ভার বাবু আমারই ওপর রাখিয়া গেলেন। বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হেতু সজনে নির্জনে নিঃসংকোচে আমার সহিত উঁহাদের আলাপন, উপবেশন বহুকাল যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। আমার আসন ও শয়নের স্থান উঁহাদের আগ্রহে ও জেদে ভিতরেই হইল। বেলা বারটা পর্যন্ত আমি নির্জনে সাধনভজনে কাটাইতাম, রমণী তখন আপন গৃহকর্মে রত থাকিতেন। মধ্যাহ্নে আহারান্তে ভৃত্যবর্গ বাহিরে চলিয়া যাইত। কামিনী তখন একাকিনী এক ঘরে না থাকিয়া আমার ঘরে আসনের কিঞ্চিৎ অন্তরে শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। এই সময়ে তিনি ধর্মপ্রস্তাব তুলিয়া, সরলতার ভানে, নিজের আভ্যন্তরিক কুভাব আমার নিকটে ধীরে ধীরে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি বিষম সংকট সমস্যায় পড়িয়া কি করিব ভাবিতে লাগিলাম।'

ব্রহ্মচারীজি এরপর লিখছেন, 'উঁহার কোন চেষ্টায়ই বাধা দিতে আমি সাহস পাইলাম না। মনে হইল এই অবস্থায় উঁহাদের অসাধ্য কার্য কিছুই নাই। আমার কোন বিরুদ্ধ ব্যবহারে যদি উঁহার মর্মে ও অভিমানে আঘাত পড়ে, এখনই যুবতী আমার নামে কুৎসিত কথা বলিয়া, চিৎকার করিয়া দশজনকে একত্রে করিবেন, এবং মুহূর্ত মধ্যে আমাকে অপদস্থ করিয়া চিরকালের মতো আমার অখ্যাতি অপযশ দেশে বিদেশে রটনা করিবেন। এক

দিবস আমি বিষম বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া আতঙ্কে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। ঠাকুর কতবার বলিয়াছেন— *পুরুষ অভিভাবক উপস্থিত না থাকলে কোন গৃহস্থের বাড়ীতে ক্ষণকালও অবিবাহিত যুবকের থাকা উচিত নয়।* মনে হইল ঠাকুরের এই অনুশাসন বাক্য, সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করিয়াই আজ আমি বিপন্ন হইলাম। তখন গুরুদেবের অভয়-চরণ স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ কামিনী অতিরিক্ত সাহসে বিষম চঞ্চলতা প্রকাশ করিয়া অবশেষে "ও হরি! তাই তুমি ব্রহ্মচারী।" বলিয়া সলজ্জ হাসিমুখে অন্যঘরে চলিয়া গেলেন।'

তারপর কী হল! নিজের জীবনের প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাইনি কাকিমা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন চা হাতে।— কী পড়ছ অত মন দিয়ে?

গম্ভীর গলায় বললুম, বই।

সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কী বই?

একটা বই।

বাবুর রাগ হয়েছে?

রাগ হতে যাবে কোন দুঃখে?

হ্যাঁ, হয়েছে তো। কাটা কাটা কথাতেই বোঝা যাচ্ছে। কী করব বলো? বুড়োর যেন ছেলেমানুষের মতো বায়না!

কাকিমা টেবিলের ওপর চায়ের কাপ রেখে আমার চেয়ারের পিঠে বুক ঠেকিয়ে মাথায় হাত রেখে দাঁড়ালেন। মাথার চুলে সরু সরু আঙুল খেলছে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে রিনিঠিনি। শ্বাসপ্রশ্বাসে ঘাড়ের কাছে অতি কোমল কিছুর ওঠা-পড়া। গা শিরশির করছে। আয়েশে চোখ বুজে আসছে। শিথিল থেকে শিথিলতর হয়ে পড়ছি। কোমল অন্ধকার কম্বলের মতো ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে। আমিও কি সাধক ব্রহ্মচারীর মতো এঁকে প্রণাম করব? পায়ে ধরব? পা যে বড় সর্বনেশে অঙ্গ। পদযুগলে যে আমার মাতৃদর্শন হয় না। মন যে অন্যভাবে উতলা হয়ে ওঠে।

চিবুকটি মাথার ব্রহ্মতালুতে রেখে, আলগা দুটো হাত আমার দু'কাধের ওপর দিয়ে বুকের কাছে মৃণালকাণ্ডের মতো ফেলে, মহিলা বড় আদরের গলায় বললেন, কী, তুমি চা খাবে না?

আমার ভেতরে আমার মৃত্যু হল। রমণীর সোহাগে গলে গিয়ে, শুভ্র সুগোল দুটি হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বললুম, নিশ্চয়ই খাব। না খেয়ে পারি!

চিবুকটা ঘষে দিয়ে, বুকের কাছে হাত খেলিয়ে কাকিমা বললেন, আমার লক্ষ্মী ছেলে। তুমি চা খাও, আমি আসছি। বুড়োকে ভাগাই।

ঘাড় ঘুরিয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে গিয়ে ছোট্ট চুল-ঘেরা কপালের দিকে নজর পড়ে গেল। কপালের মাঝখান থেকে টিপটা অনেকখানি ডানপাশে সরে গেছে। কেন গেছে? কী করে গেছে? নানা সন্দেহে মন আবার জল থেকে সদ্য-তোলা এক মুঠো কুচো কাঁকড়ার মতো লাফাতে লাগল। কাকিমা নীচে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই চেকচেক শাড়িটা আজ পরেছেন। স্বাস্থ্যেরও যেন কিছু উন্নতি হয়েছে। মুখ

যেন মোমের মতো মসৃণ, কপালের দুটো পাশ ঝকঝক করছে। শাড়ির আঁটসাঁট বাঁধনে শরীরে অদ্ভুত এক ছন্দ খেলা করছে। দেখব না, দেখতে চাই না, তবু চোখ উড়ে যাচ্ছে।

রমণীরে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
বিধাতার দৃষ্টি যথা
জড়িত প্রকৃতি সনে
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা!

এ আবার কোথা থেকে কী লাইন এসে গেল! পড়ছিলুম সাধকের সাধন-জীবনের বিভ্রান্তির কথা। আলো আসতে আসতে অন্ধকার ঘিরে এল। অবশেষে ব্রহ্মচারীজির কী হল—

'আমি তখন স্পর্দ্ধিত মনে ভাবিতে লাগিলাম—"ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া, নিশ্চয়ই আমার অপূর্ব শক্তিলাভ হইয়াছে; তাই ঈদৃশ ব্যাপারে আমি নির্বিকার অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি যথার্থই সাধনরাজ্যের পিচ্ছিল পন্থা অতিক্রম করিয়া, নিরাপৎ ভূমি লাভ করিয়াছি।" কিন্তু হায়, এই প্রকার অযথা অহংকারের কয়েকদিন পরেই আমার সর্বনাশ হইয়াছে বুঝিলাম। ঘটনার সূত্র ধরিয়া ধীরে ধীরে আমার ভিতরে আগুন লাগিল। বেড়াপাক বহ্নির কালধূমে দুর্লভ ব্রহ্মচর্যের উজ্জ্বল দীপ্তিকে অন্তর্হিত করিল। আমি পূর্বের অপূর্ব পবিত্র অবস্থা হইতে স্খলিত হইলাম।'

বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ কাটার সময় যেরকম শব্দ হয় সেইরকম একটা শব্দ সদর রাস্তায় উঠেই থেমে গেল। গাড়ির দরজা বন্ধের শব্দ হল। আবার গাড়ি! আবার এই অসময়ে কে এলেন। চকোলেট রঙের নতুন একটা গাড়ি বাড়ির সামনে থেমেছে। বিদেশি গাড়ি। বেশ লম্বাটে চেহারা। এ গাড়ির পেট্রলেও বিদেশি সুবাস। পেছনের দরজা খুলে পিতৃদেব নেমে এসে ওপর দিকে মুখ তুলে তাকালেন। সোজা অফিস থেকে আসছেন। সেই ধরনের ব্যক্তিত্ব মুখেচোখে এখনও লেগে রয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদ অনেকটা ডক্টর বি সি রায়ের মতো। চেহারাতেও বেশ কিছুটা মিল আছে।

এতক্ষণের সৎ-অসৎ চিন্তা মাখানো আমার মুখটি দোতলার বারান্দায় ঝুলে ছিল। আঙুলের ইশারায় নীচে ডাকলেন। যেন মুক্তি পেলুম! নিজের চেষ্টায় নিজের থেকে বেরোতে পারছিলাম না। ক্রমশই এক অতলান্ত ইন্দ্রিয়ের জগতে ডুবতে বসেছিলুম।

পিতা বললেন, তুমি প্রস্তুত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সামনে উঠে বোসো। ডক্টর সেন।

নামেই বাঙালি। চেহারায়, সাজপোশাকে পাকা সাহেব। টকটকে ফরসা মুখে সোনার ফ্রেমের চশমা। চোখদুটো চাপা অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করছে। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে মাতামহের বাড়ির দিকে ছুটল। আমার ডান পাশে ডাক্তারি ব্যাগ, যন্ত্রপাতি শুয়ে আছে। একটু পরেই লাফিয়ে উঠবে। গাড়িতে যেতে যেতে মনে হল,

আমার জীবনে শূন্যতার পরিমাণ খুব বেড়ে গেছে, যে-কারণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ছি ক্রমশই। আমি যদি মুটেমজুরও হতে পারতুম মনের চেহারা ফিরে যেত!

ডক্টর সেন খুব মৃদু স্বরে কথা বলেন। গলা কিন্তু বেশ গম্ভীর, একধরনের ঝংকারও আছে। ডক্টর সেন বললেন, কে দেখছেন?

পিতা বললেন, কেউ না। জীবনের এই প্রথম অসুখ।

বয়েস?

প্রায় সেভেন্টি ফাইভ।

একেবারে ভার্জিন সিস্টেম। দেন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর মি।

সারাপথে এই ক'টিমাত্র কথা। দু'জনে দু'জনের ভাব নিয়ে বসে রইলেন। গাড়ির চাকা মাইল খেয়ে চলেছে। সংকীর্ণ পথ, বিশাল গাড়ি। সবেগে সদম্ভে ছুটতে পারছে না। গাড়ির রূপ দেখে দু'পাশের মানুষ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। আর আমার বেশ অহংকার হচ্ছে। মনে হচ্ছে সাধারণ স্তর থেকে কত ঊর্ধ্ব স্তরে উঠে পড়েছি। মনের কতরকম মতিভ্রম!

বাহাদুর এসে দরজা খুলে দিল। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, বাবু কোথায়?

বুড়াবাবু পুজোয় বসেছেন।

পিতার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর সেন। তিনি কপাল কুঁচকে বাড়িটার দিকে তাকালেন। নারকেল পাতা ঝুলে এসেছে। বাতাসে ঝিরিঝিরি কাঁপছে। ভেবেছিলাম মাতামহ বোধহয় দোতলায় আস্তানা নিয়েছেন। না, তিনি যেখানে যে-ঘরে ছিলেন, সেই ঘরেই আছেন। সেই নারকেল গাছের তলায় আউট হাউসে। ঘরের মাঝখানে বসে আছেন আসনে স্থির হয়ে। মায়ের ছবি ঝুলছে দেয়ালে, একপাশে কাত হয়ে। জগদম্বার সঙ্গে মাতামহের বড় সুন্দর সম্পর্ক। মা কখনও ডান পাশে কাত, কখনও বাঁ পাশে, কখনও সোজা। কখনও আদর, কখনও গালাগাল।

দরজার সামনে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে। মাতামহ বসে আছেন আমাদের দিকে পেছন ফিরে। স্থির অচঞ্চল দীপশিখার মতো। পিতা আমাকে ইশারা করে বললেন, যাও, ভেতরে যাও, আসন থেকে তোলো। ভেতরে গিয়ে আসনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লুম। চোখদুটো বোজা। মুখে একটা অলৌকিক উদ্ভাস। অত্যাশ্চর্য একটা কিছু দেখে যেন পুলকিত! শ্বাসপ্রশ্বাস অতি ধীর। ডাকতে সাহস পেলুম না। এমন মানুষের জন্যে ডাক্তার কী হবে! তবু ফিসফিস করে বাতাসের সুরে ডাকলুম, দাদু। দ্বিতীয়বার ডাকতেই শরীরে একটা মৃদু কম্পন লাগল। তৃতীয়বার ডাকতেই মাতামহর চোখদুটো নীচের দিকে অল্প একটু খুলে গেল। যেন করমচা দ্বিধাবিভক্ত হতে চলেছে। লাল ভেলভেট। আমাকে দেখতে পেয়েছেন। মৃদু একটুকরো হাসি নেমে এল ঠোঁটের কোণে। দুটো চোখ এবার পুরো খুলে গেল। শ্রীরামচন্দ্রের চোখের মতো আরক্তিম। দু'কোণে, তলার দিকে জল টলটল করছে। সারামুখে এমন এক ধরনের হাসি, যে-হাসি মানুষ চেষ্টা করে হাসতে পারে না। বাঁ হাত মাথায় রেখে বললেন, কী রে কখন এলি?

আমি একা নই। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখুন।

মাতামহ খুব ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরালেন। কোনও উত্তেজনা নেই, তাড়াহুড়ো নেই। গন্তব্যের সীমায় পৌঁছে গেলে মানুষ বোধহয় এইরকমই মন্থর হয়ে আসে। শূন্য ঘট আর পূর্ণ ঘটে যে তফাত। মেঝেতে বাঁ হাত ফেলে শরীরকে বাঁ দিকে সামান্য মোচড় মেরে মাতামহ আসন ছেড়ে উঠলেন, কী ব্যাপার! তোমরা?

পিতা বললেন, হ্যাঁ, আমরা। ডক্টর সেন এসেছেন। আপনাকে পরীক্ষা করবেন।

আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।

পিতা বললেন, এখানে কেন? ওপরে গেলে হয় না?

হরিশঙ্কর, এইটাই যে আমার স্বস্থান।

ডক্টর সেন বললেন, এ ঘরেও কোনও অসুবিধে নেই।

মাতামহ বললেন, একটু আছে। তেমন সাজানো গোছানো নয়, তা ছাড়া পাখা নেই।

পাখা কী হবে? পাখার কোনও প্রয়োজন নেই। জুতো কি খুলতে হবে?

না না, জুতো পরেই আসুন। এ ঘরে সবই চলে।

ঘরে একটা হাতল-ভাঙা ধুমসো চেয়ার। পালিশ নেই। কাঠের দানা বেরিয়ে পড়েছে। চেয়ারে একটা কম্বলের আসন পাতা। মাতামহ চেয়ারটা দেখিয়ে ডক্টর সেনকে বললেন, বসুন।

আমরা বসলুম চৌকির ধারে। মাতামহ দাঁড়িয়ে রইলেন। পিতা বললেন, আপনি বরং শুয়ে পড়ুন।

মাতামহ ভয়ে ভয়ে বললেন, হরিশঙ্কর, একে মনে হচ্ছে খুব বড় ডাক্তার। বড়লোকের ডাক্তার। অনেক টাকা ভিজিট। আমার যে ভীষণ লজ্জা করছে।

ডক্টর সেন বললেন, লজ্জার কোনও কারণ নেই। ডাক্তারদের চেহারা একটু ভারিক্কিই হয়। ইনি আমার মাস্টারমশাই। ছাত্রজীবনে এমন শিক্ষক পেয়েছিলুম বলেই আজ দাঁড়াতে পেরেছি। আমিও মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

মাতামহ যেন সামলে উঠলেন। খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। মুখে হাসি ফুটল, বললেন, তা হলে একটু করে চা হোক ভাঁড়ে।

হোক, আপত্তি নেই।

একটা করে নানখাতাই বিস্কুট।

সেটা কী জিনিস?

ওই যে গো, এত বড় বড়, সুজি আর মিষ্টি দিয়ে তৈরি করে, খাস্তা মুচমুচে।

আপনার তো বেশি মিষ্টি খাওয়া উচিত হবে না।

আমি তো খাব না। আমি তো কিছু খেতেই পারছি না।

কেন? কী অসুবিধে হচ্ছে?

ডাক্তার, আমি খুব ভোজনবিলাসী ছিলুম। অশিক্ষিত গেঁয়ো লোক যেমন হয় আর কী! লোভী। সেই লোভী বামুন এখন মরেছে। বেটি বললে, দাঁড়া, এমন করে দেব, যা মুখে দিবি সব অমনি গা গুলিয়ে বেরিয়ে যাবে।

তার মানে নশিয়া?

হ্যাঁ নশিয়া।

কী খাচ্ছেন তা হলে? আজ কী খেয়েছেন?

সত্যি কথা বলব?

সত্যিই তো বলবেন, তা না হলে চিকিৎসা হবে কী করে?

হরিশঙ্কর, তুমি রাগ কোরো না, আমি সত্যি বলছি। দুটো আলুর চপ আর একগাল মুড়ি।

দু'জনে সমস্বরে বললেন, আলুর চপ?

ওই যে বললুম, লোভ। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। তারপর থেকেই পেট ফুলতে শুরু করল। বুকে পেটে এক হয়ে জয়ঢাক। খাদ্যটা বেশ বার করেছি কিন্তু। কম খরচে। একদিন খেলে দু'দিন আর হাঁ করতে হয় না।

ডক্টর সেন বললেন, চা এখন থাক। আগে আপনাকে পরীক্ষা করি।

মাতামহ বললেন, একটা কথা বলব? তোমরা রাগ করবে না বলো? আমার নোটিশ এসে গেছে। ভেতরে যেখানে যা যেমন আছে, সেইরকম থাক। শুধু শুধু নাড়ানাড়ি করে লাভ কী? জমি থেকে গাছ উঠেছিল, শেকড় নামিয়েছিল, রস শুষেছিল, ডালপালা মেলেছিল, এবার শুকোবার পালা। দেখতে পাচ্ছি, কাঠুরিয়া আসছে কাঁধে কুড়ুল নিয়ে।

ঘরের বাতাস থমথমে হল। ডক্টর সেন বললেন, তবু তো বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

পিতা হাত ধরে মাতামহকে চৌকির ছোবড়া-ওঠা বিছানায় বসিয়ে দিলেন। ডক্টর সেন এগিয়ে এসে নাড়ি টিপে ধরলেন। শুরু হল পরীক্ষা। বুক, পেট, পিঠ, পায়ের ফোলা পরীক্ষা। পিঠের দিকে কোমরের ওপরে ভীষণ ব্যথা। ডক্টর সেনের হাত পড়তেই মাতামহ কুঁকড়ে গেলেন। ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করে প্রেশার মাপা হল। এই যন্ত্রটি দেখে মাতামহ ভীষণ আনন্দ পেলেন। হাতের ওপরে জড়ানো রবারের তাগাটি বারেবারে দেখছেন আর বলছেন, ঠিক যেন রেল কোম্পানির পোর্টার। বুকে একটা পেতলের চাকতি লাগালেই হয়। ফোঁস ফোঁস করে বাতাস ঠেলে, ফিস করে হাওয়া বের করে ডক্টর সেন যখন যন্ত্রের পারদস্তম্ভকে তুলছিলেন আর নামাচ্ছিলেন, তখন মাতামহের যেন আরও আনন্দ! প্রশ্ন করলেন, ডাক্তার, মানুষের ভেতরটা কি ঠিক এইরকমই ছটফট করে? লোভে, লালসায়, কামনায়?

শিরার ওপর স্টেথিসকোপের গোল ঠান্ডা চাকতি চেপে ধরে ডক্টর সেন নীরবে মাথা নাড়লেন।

About, about, in reel and rout
The death-fires danced at night;
The water, like a witch's oils,
Burnt green and blue and white.

রাত ধীরে ধীরে গড়াচ্ছে। ক'টা বাজল কে জানে। দশটা-টশটা হবে হয়তো! বাইরে বাতাস ছেড়েছে। নারকেল গাছের পাতা থেকে থেকে দুলে উঠছে। আমরা তিনটি প্রাণী গোল হয়ে বসে আছি। মাঝখানে পড়ে আছে একগাদা ওষুধপত্তর। কোনওটা সোনালি রাংতা মোড়া, কোনওটা রুপালি। ছোট বড় ওষুধের ফাইলে তরল টলটল করছে। পিতার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। দরজায় পিঠ রেখে বাহাদুর ঢুলছে। মাতামহের মুখ যথারীতি প্রসন্ন। শিশু যেন চলন্ত গাড়ির জানলায় বসে জগৎ দেখছে।

হঠাৎ মাতামহ নীরবতা ভঙ্গ করলেন, তোমরা অত ভাবছ কেন বলো তো? যেতে হয় যাব। আবার ফিরে আসব, আবার যাব। একদিন তো যেতেই হবে হরিশঙ্কর। আজ আর কাল। কে থাকবে চিরকাল!

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে আপনি একটা রেকর্ড নষ্ট করে দিলেন।

কী রেকর্ড! আমি তো কোনও কিছু নষ্ট করিনি।

আমার একটা গর্ব ছিল, আপনি অন্তত মিনিমাম নব্বই বছর থাকবেন, একশো হলে আরও খুশি হতুম। শুধু থাকা নয়, বহাল তবিয়তে থাকা। দাঁত থাকবে, চোখ থাকবে, হাত, পা, বুদ্ধি নিজের বশে থাকবে। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনি হয়তো ফেল করবেন না। ইউ হ্যাভ মিজারেবলি ফেল্‌ড।

মাতামহ খুব আশা নিয়ে বললেন, তোমার কি মনে হয় পঁচাত্তর খুব একটা কম বয়েস?

পঁচাত্তর একটা বয়েস হল! বিদেশে পঁচাত্তর বয়সে প্রাইম মিনিস্টার হয়, প্রেসিডেন্ট হয়। গ্ল্যাডস্টোনের কথা ভাবুন। কেন চার্লি চ্যাপলিন! সত্তর না আশি বছর বয়েসে আবার বিবাহ করলেন। জানেন, রাশিয়ার একটি অঞ্চলে মানুষের পরমায়ু দেড়শো, একশো আশি, দুশো। তার মানেটা কী? জীবনটাকে ভাগ করুন, শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য। পঁচিশ বছরে তাদের দুধের দাঁত পড়ে, নতুন দাঁত ওঠে। পঞ্চাশে শুরু হয় যৌবন। আশিতে প্রৌঢ়, একশোতে বার্ধক্য। আপনি আমার মনোবল ভেঙে দিলেন। আমাদের ব্যায়াম, কুস্তি, আপনার সাধনভজন, উপবাস, সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা।

মাতামহ অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন, এবারকার মতো তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও হরিশঙ্কর। আর কখনও এমন হবে না। কেন এমন হল বলো তো!

ত্রৈলঙ্গস্বামী কত বছর বেঁচে ছিলেন মনে আছে?

সবাই বলে তিনশো বছর।

সেই জায়গায় সেভেন্টি ফাইভ! হোপলেস। আপনি আমাকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিলেন। এর চেয়ে বড় পরাজয় ভাবা যায় না।

তোমার কি মনে হয়, আমার অসুখটা খুবই খারাপ?

শরীরের দুটো মেজর পার্টস একেবারে নষ্ট করে ফেলেছেন। কমপ্লিটলি আউট অফ অর্ডার। আর আপনি এতই উদাসীন, ভেতরে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে, কিছু টেরই পেলেন না। ধরা পড়ল শেষ সময়ে। এখন কী হবে!

কেন? এইসব ওষুধ খাব। চুপ করে শুয়ে থাকব। যা তা খাব না। খাবার ইচ্ছে থাকলেও খেতে পারব না। আচ্ছা, আমার কী হয়েছে বলো তো?

আপনার কিডনি দুটো আর কাজ করছে না।

যাক গে, না করুক গে। চোখদুটো আর মাথাটা তো কাজ করছে। হাতদুটো দেখো, এখনও গুলো ফোলালে অনেক নবকার্তিক ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। এ বয়েসে কিডনি নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। নাতিটা রয়েছে, বলা ঠিক হবে কি?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ও এখন সাবালক।

মাতামহ ফিসফিস করে বললেন, হাবসি খোজাদের ও দুটো কেটেই দিত। আপদ একেবারে চুকেই যেত। পিতা হতাশ হয়ে বললেন, ও মাই গড! কোথায় কিডনি আর কোথায় কী! অ্যানাটমি সম্পর্কে কোনও জ্ঞানই নেই। হোয়্যার ইগনোরেন্স ইজ ব্লিস, দেয়ার ইট ইজ ফলি টু বি ওয়াইজ।

মাতামহ বিষণ্ণ হলেন। জগদম্বার ছবির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

পিতা বললেন, নিন, প্যাক আপা আপনার আর এখানে থাকা চলবে না। এখানে থাকলে সেবা হবে না। কে দেখবে! ওষুধ আছে, পথ্য আছে।

বাহাদুর ঘুম-জড়ানো গলায় বললে, আমি পারব বাবু। আমাকে সব বলে যান।

তুমি পারবে। তোমাদের আমি ভীষণ বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। তোমরা হলে গ্যালান্ট ফাইটার, তবে একটা কথা কী জানলে, একটু লেখাপড়ার জ্ঞান না থাকলে সব উলটে-পালটে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। তা ছাড়া ও বাড়িতে একজন সেবাপরায়ণা মহিলা আছেন। যদ্দিন আছেন তদ্দিন একটু দেখাশোনা করতে পারবেন। তারপর তো নিজেদের আপনজন এসেই যাচ্ছে। তখন আর আমাদের পায় কে?

মাতামহ বললেন, তার মানে?

আপনার নাতবউ আসছে। এই মাসেই আমি আশীর্বাদ সারব।

ও সেই মেয়েটি! একেবারে তুলসী কেটে বসানো। হরিশঙ্কর তদ্দিন আমি বাঁচব, কী বলো! এইতে তো আমার পরমায়ু, তাই না।

সোনালি একটা ওষুধের ফয়েল হাতে তুলে নিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, একটা খেয়ে নেব এখন?

না, খালি পেটে নয়। কিছু খেয়ে তারপর।

অ', তা আশীর্বাদে আমি যাব তো!

আপনি ছাড়া আশীর্বাদ হবে?

কী মজা! কী দিয়ে আশীর্বাদ হবে?

হিরের নাকছাবি।

ফাসক্লাস, ওই নাকে যা মানাবে না? তুলসীর নাকে একটা হিরের নাকছাবি ছিল, কী হল বলো তো?

পুড়ে গেল।

পুড়ে গেল?

হ্যাঁ, পুড়ে গেল। নাকেই ছিল, দেহের সঙ্গে ছাই।

হিরেও পোড়ে?

সব পোড়ে, সব পোড়ে। পৃথিবী একটা হোপলেস প্লেস। একটা জিনিসও থাকে না। সবই চলছে, চলেই যাচ্ছে। আমি পঙ্কজকে বলব, ও তোমার শীতের শেষফেস চলবে না, সুনার দি বেটার। আমি সময়কে বিশ্বাস করি না, ট্রেচারাস টাইম। আচ্ছা, আপনার কি দয়ামায়া নেই?

কেন? কেন?

আমি এখনও অফিসের জামাকাপড় ছাড়িনি। নিন উঠুন, আর কত দেরি করবেন?

আমি যদি কাল যাই হরিশঙ্কর!

আবার আপনি কালকে বিশ্বাস করছেন? এই মুহূর্তে আপনি কি জানেন, কাল কী হতে পারে আর না পারে! কেউ জানে? এই যে তুলসী ভীষণ দই খেতে ভালবাসত। কবিরাজ বলে গেলেন, বেশ আমি আর বাধা দেব না। চামচে দুয়েক ভাল মিষ্টি দই রুগিকে দিতে পারেন। সন্ধেবেলা বলে গেলেন। আমি ভাবলুম, অত তাড়ার কী আছে, কাল সকালে দেওয়া যাবে। ভোররাতে তুলসী চলে গেল। রাসকেল কাল। আই হ্যাভ নো ফেথ অন হিম। বর্তমান ছাড়া আমি কিছু জানি না, জানতে চাই না। অতীত আমার স্মৃতিতে। ভবিষ্যৎকে আমি হাসিমুখে গ্রহণ করি। গেট আপ।

মাতামহ মিউমিউ করে একটা ছুতো বের করলেন, বাড়িটা হরিশঙ্কর এতটুকু একটা ছেলের ভরসায় ফেলে রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে!

বড় আপনি বিষয়মুখী! কী সোনাদানা আছে যে চোরে নিয়ে যাবে। ভিত থেকে উপড়ে বাড়িটা তো আর চোরে নিয়ে যেতে পারবে না।

সঙ্গে কী কী নোব?

নিজেকে নেবেন। আর আমরা নোব ওষুধ। নাথিং লেস, নাথিং মোর।

রাত বেশ হয়েছে। তবু রিকশা পাওয়া গেল। একটু পরেই সিনেমার রাতের শো ভাঙবে। পাশেই সিনেমা হল। সব তীর্থের কাকের মতো সিটে পা তুলে বসে ছিল। রিকশা নিয়েও দু'জনের কিছু বচসা হয়ে গেল। মাতামহ বললেন, একটা রিকশাই যথেষ্ট। নাতিটাকে কোলে নিয়ে নোব। পিতা বললেন, না দুটো। দুটো, একটা, একটা, দুটো।

একজন রিকশাঅলা রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েই রইল। আর একজনের ভাগ্য দুলতে লাগল। দুটো বলমাত্র সে তড়াক করে লাফিয়ে নামে, একটা শুনলেই সিটে উঠে পড়ে। পিতার সিদ্ধান্তের ওপর কারুর চড়ে বসার ক্ষমতা নেই। শেষে আমরা দুই এক ভাগে দুটো ঝকঝকে রিকশায় উঠে বসলুম। ফুরফুরে বাতাসে রিকশা ভেসে চলল। মাতামহ আমার পাশে। আমার একটা হাত নিজের মুঠোয় চেপে ধরে বললেন, কেমন আছিস রে?

ভাল দাদু।

আমার কী মনে হচ্ছে জানিস, আমরা যেন কলকাতার বাইরে চেঞ্জে এসেছি। তোর মনে হচ্ছে না!

আমারও তাই মনে হচ্ছে।

হ্যাঁরে, আমরা আর কোনওদিন একসঙ্গে বাইরে যেতে পারব না!

কেন পারব না? আপনি ভাল হয়ে উঠলেই আমরা মধুপুর কি শিমুলতলা যাব।

না রে, হরিদ্বার। সেই স্টেশন থেকে বেরোলেই মহাদেবের মূর্তি। মাথার ওপর এক হাত তুলে ঘটি ধরে জল ঢালছেন। ওদিকে গঙ্গা বয়ে চলেছে, হর হর শব্দে। আহা, সে কী জায়গা রে! সব প্রদীপ ভাসিয়েছে ভক্তরা, ফুল ভাসিয়েছে। নেচে নেচে, ভেসে ভেসে চলেছে। সে কী দৃশ্য রে! হর হর গঙ্গে।

মাতামহ ভাবে বিভোর হয়ে গঙ্গা স্তোত্র আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণী তরল তরঙ্গে।
শঙ্কর মৌলিনিবাসিনী বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥

হঠাৎ স্তোত্র থামিয়ে নিজের মনেই বলতে লাগলেন, ওঃ কত বছর বেঁচে আছি! পাগল বলে কিনা আমি রেকর্ড খারাপ করে দিলুম। একশোর আগে যাওয়া যাবে না। আমার দিন যায় বৃথা কাজে, রাত্রি কাটে নিদ্রায়। শূন্য জীবনে একশো বছর বেঁচে লাভ কী? তারা, কোন অপরাধে সংসারগারদে দাসখত লিখে নিয়েছ হায়! মাতামহ হঠাৎ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

কী হল? আপনি কাঁপছেন কেন? জ্বর আসছে?

কাঁপতে কাঁপতে বললেন, মাঝে মাঝে আমার ওরকম হচ্ছে রে! ভয় নেই। তুই আমাকে একটু জড়িয়ে ধর। ঠিক হয়ে যাবে।

মাতামহ যেন শিশুর মতো হয়ে গেছেন। বেশ করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরে কেমন একটা পরিবর্তন এসে গেল। মনে হল দেবালয়ে কোনও পবিত্র বিগ্রহকে আলিঙ্গন করেছি। ধূপ, ধুনো, গুগ্‌গুল, চন্দনের গন্ধ নাকে এসে লাগছে। তরঙ্গের মতো মাতামহের শরীর থেকে একটা কিছু আমার শরীরে চলে আসছে।

বাড়ি পৌঁছেও মাতামহের কাঁপুনি থামল না। অতটা প্রবল না হলেও কাঁপছেন। সেই অবস্থাতেই আমরা বিছানায় শুইয়ে দিলুম। বেশ মোটা একটা চাদরের তলা থেকে মুখটি শুধু বেরিয়ে রইল। মুখে এক ধরনের

হাসি, যেন পুরো ব্যাপারটাই বড় মজার। শরীর শরীর খেলা।

পিতা বলতে লাগলেন, ইমিডিয়েটলি ওষুধ।

টেবিলের ওপর রাখা নানারকম ওষুধ থেকে তিনি সঠিক ওষুধটি খুঁজতে লাগলেন। কাকিমা একপাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কি চা খাবেন?

না, এত রাতে আর চা নয়। তুমি বরং একটু গরম জল আনো। ওঁকে চট করে একটু ওষুধ খাইয়ে দিই।

ওষুধটা দেখিয়ে দিয়ে আপনি জামাকাপড় ছাড়ুন। আমি ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছি।

পারবে তো বউঠান?

আপনি দেখুন না পারি কি না।

পিতৃদেবের ওপরেও কাকিমার স্বাভাবিক একটা কর্তৃত্ব এসে গেছে। মেয়েরা চট করেই কেমন সংসারের হাল ধরে নেয়। ভয়ডরও কম।

মাতামহ বললেন, হরিশঙ্কর, তুমি এবার সেরে নাও। রাত অনেক হল। তুমি আমার জন্যে অত ভেবো না। তোমার ভাবনা কে ভাববে গো?

কাকিমা বিছানার দিকে সরে গিয়ে সামনে ঝুঁকে মাতামহর কপালে হাত রাখলেন। পিতা সেদিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, কী? গরম?

হ্যাঁ, সামান্য ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে।

তুমি বরং দু'পাশে দুটো পাশবালিশ দিয়ে বেশ ঘন করে দাও। মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। পায়ের দিকেরটা খোলা থাক।

কাকিমা মাতামহের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় কষ্ট হচ্ছে আপনার?

না বউমা, তেমন কষ্ট কোথাও হচ্ছে না। তোমরা সব খাওয়াদাওয়া করে নাও। আমি ততক্ষণ একটু বেড়িয়ে আসি।

বেড়িয়ে? কোথায় বেড়াতে যাবেন?

যেসব জায়গায় গেছি, সেইসব জায়গায় মনে মনে বেড়িয়ে আসি।

কাকিমা খাটের কাছ থেকে সরে আসতে আসতে বললেন, জ্বর বেশ বাড়ছে।

পিতা ইশারায় কাকিমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ডক্টর সেন কী বলে গেলেন আমিও শুনেছি। শরীরের প্রধান একটি যন্ত্র বিকল হয়ে গেছে। যে-যন্ত্রের ওপর নির্ভর করছে মানুষের জীবনমরণ।

কেমন এক গা-ছমছমে পরিবেশে রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ হল। অনেকটা নমো নিত্যং ভঙ্গিতে। ঘড়ি জানিয়ে দিলে রাত বারোটা হল। কাকিমা আজ মাতামহের ঘরে মেঝেতে বিছানা করে শোবেন। পাশের ঘরে পিতৃদেব। দু'ঘরের মাঝের দরজাটা ভেজানো থাকবে। ওপাশে আমার ঘরে আমি। সাতসকালেই আমাকে বেরোতে হয়। আমার নাকি নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ঘুমোনো উচিত।

পিতৃদেব বললেন, তুমি এখুনি আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ো। অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। টেক কমপ্লিট রেস্ট। প্রয়োজন যদি হয় ডেকে তুলব।

কাকিমা বললেন, তুমি ঘরে যাও। তোমার দুধ আমি দিয়ে আসব।

দুধ? দুধ আমি খাই না।

তা খাবে কেন? খালি চা খেয়ে শরীর নষ্ট করবে।

পিতা বললেন, ঠিক হয়েছে, এইবার তুমি শক্ত পাল্লায় পড়েছ।

ঘরে এসে অবাক হয়ে গেলুম, কাকিমা কখন এসে পরিপাটি করে আমার বিছানাটি করে রেখে গেছেন। আলোটা আপাতত নেবানোই থাক। জানলার বাইরে প্রশস্ত রাত। বাতাস আজ খুব উতলা। কেন? কার জন্যে! কোথাও যেন একটা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আবার কি আসছে ঘাতক?

জানলার দিকে মুখ করে চেয়ার টেনে বসলুম। কালো আকাশের গায়ে জানলার গরাদ লম্বা লম্বা লাইন টেনেছে। বহু দূরে শ্মশানের দিক থেকে সমবেত কণ্ঠ ভেসে আসছে। আসছে, বলো হরি হরি বোল। বামুণ্ডুলে প্রবীর ওপাশের বাড়িতে বেহালা ধরেছে। সরু সুতোর মতো সুর ভেসে আসছে। পৃথিবী ক্রমশই যেন নেতিয়ে পড়ছে। যারা পেরেছে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা জাগবার তারা জেগে আছে।

ধীরে ধীরে ভেজানো দরজা খুলে গেল। পদশব্দ, কাঁধের কাছে কোনও স্পর্শ, কাপড়ের আঁচল থেকে উঠে আসা বাতাসের ঝাপটার অপেক্ষায় আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। জোর করে একটা ভাব-তন্ময়তা আনার চেষ্টা। দরজা থেকে জানলার কাছ, সামান্য ব্যবধান। সময় চলে যায়। কোথায় কী? কেউ তো এলেন না। আর ধৈর্য নেই। ঘাড় ঘোরাতেই হল। ভেবেছিলুম অন্ধকার এই ঘরে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পাব। হাতে দুধের গেলাস। লাল মেঝের দিকে তাকালে দেখব সাদা দুটি পা। কোথায় কী! দরজার একটা পাল্লা সম্পূর্ণ খোলা। বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে। শূন্য বারান্দা সোজা চলে গেছে উত্তরে। দরজা খুলে গেছে, কেউ কিন্তু আসেননি।

ব্যাপারটা কী হল? দখিনা বাতাসে উত্তরের দরজা খোলে কী করে! যত গা-ছমছমে ব্যাপার কি আমার জীবনেই ঘটবে! বারান্দা পেরিয়ে মাতামহের ঘরে এলুম। খাটের এক পাশে পিতা, আর এক পাশে কাকিমা। মাতামহ বলছেন, আমার তানপুরাটা নিয়ে আয় পিন্টু। বাঁধ, আজ ডি-শার্পে বাঁধ। সুর দিয়ে বেটির চরণ ছোঁব। আহা! কী সুন্দর জায়গা। ওই দেখ, আকাশের গায়ে উত্তরাখণ্ডের পাহাড়। হেসে হেসে আমার মা চলেছে। দে দে তানপুরোটা দে।

পিতা বললেন, কী হল বলো তো! এইটুকু সময়ের মধ্যে এত প্রবল জ্বর এসে গেল। ডিলিরিয়াম!

মাতামহ বললেন, আমি হারিনি, হরিশঙ্কর। আমি হারিনি। আমি এখনও দৌড়াচ্ছি। ঠিক পারব। পেরে যাব। আমার এখনও দম আছে।

কাকিমা বললেন, জলপটি দোব বটঠাকুর?

তার আগে থার্মোমিটার লাগাব?

কী দরকার! আমি হাতেই বুঝতে পারছি তিনের ওপর, চারের কাছাকাছি।

মাতামহ বললেন, খুলে ফেল, খুলে ফেল, সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেল, ওরে গুপ্তধন আছে। গুপ্তধন।

আমি অবাক হয়ে বললুম, এই তো ভাল ছিলেন, এর মধ্যে জ্বর এসে গেল, এত প্রবল জ্বর!

তাই তো ভাবছি! আমার মনে হয় ডাক্তারের কথা শুনে মনোবল ভেঙে পড়েছে। মন দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। নিয়ে এসো, জলপটিই নিয়ে এসো। তুমি পা দুটো দেখো তো!

চাদর তুলে পায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলুম, বরফের মতো ঠান্ডা। পিতা বললেন, জ্বর আরও বাড়বে। দেব নাকি এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি?

কাকিমা বললেন, দিন না।

অ্যালোপ্যাথি চলছে।

চলুক।

টেবিলের ওপর ওষুধের বাক্স তুলে পিতা ওষুধ খুঁজতে লাগলেন। গোল গোল গর্ত থেকে একটি করে শিশি তুলছেন, লেবেল পড়ে ছেড়ে দিচ্ছেন, ঠুকুস করে শব্দ হচ্ছে। শব্দ মৃদু, কিন্তু এই পরিবেশে বড় ভৌতিক। যেন যমে-মানুষে দাবা খেলা চলেছে। কোলরিজের কবিতার লাইন মনে পড়ছে: The naked hulk alongside came/ And the twain were casting dice/ The game is done! I have won! I have won!/ Quoth She, and whistles thrice.

চারটি মাত্র ওষুধের গুলি, তাও তিনটি গেল মুখে, একটি গড়িয়ে পড়ে গেল। পিতা বললেন, হবার হলে তিনটিতেই হবে।

দুটো বোতলে গরম জল ভরে পায়ের পাতায় সেঁক চলতে লাগল। ওদিকে জোয়ারের জলের মতো রাত ক্রমশই বাড়ছে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব শব্দ উঠছে। কাদের বাড়ির শিশু কাঁদছে। ব্রঙ্কাইটিসের রুগি কেশে উঠছে। ছাদের আলসেতে বসে পেঁচা ডেকে গেল। বাসার পাখি রাত শেষ হয়েছে ভেবে দু'বার ডেকে উঠেই মায়ের পাখার ঝাপটা খেয়ে থেমে গেল। কে একজন ও মা করে ডেকে উঠলেন। প্রবল বাতাস থেকে থেকে চারপাশ দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। রাতের আসর খুব জমেছে।

রাত দুটো নাগাদ মাতামহ একটু শান্ত হলেন। জ্বরের প্রকোপ সামান্য কমেছে। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশ জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে। শিশু যেমন ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে হেসে ওঠে, মাতামহের মুখেও সেইরকম হাসি খেলে যাচ্ছে। কিছু একটা হচ্ছে যা আমরা জানি না। মানুষ কখন যে কোন জগতে চলে যায়!

পিতা বললেন, নাও বউঠান, তুমি এবার একটু শুয়ে পড়ো।

পিন্টুর দুধটা স্টোভ জ্বেলে আর একবার গরম করে দিই।

তুমি এখনও দুধের কথা ভাবছ? মেয়েরা কাজের হলে যে কত কাজের হয়! তোমার স্বভাবটি ঠিক তুলসীর মতো। সংসার একেবারে মাথায় করে রেখেছ। আচ্ছা সে কোথায় গেল, প্রফুল্ল! বড় ভাবিয়ে তুললে তো!

কাকিমা করুণ মুখে বললেন, বটঠাকুর, আপনি একটু সন্ধান করবেন। তার তো কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হ্যাঁ, এবার করতে হবে। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। দাঁড়াও, এদিকটা একটু সামলে নিই। নাও, তুমি দুর্গা বলে শুয়ে পড়ো। আজ আর দুধের হাঙ্গামা করতে হবে না। ঘড়ি কী বলছে দেখেছ! রাত ফিকে হয়ে আসছে।

নিজের ঘরে ঢুকে কেমন যেন একটা অতিপ্রাকৃত অনুভূতি হল। আকাশে একখণ্ড সাদা মেঘ উঠেছে। গোটাকতক তারা নেমে এসেছে নীচে। দপদপ করে জ্বলতে জ্বলতে একটা উল্কা মাটির কাছাকাছি এসে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মনে হতে লাগল, আমার ঘরের দেয়াল ছাদ সমস্ত ঘেরাটোপ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

মহাশূন্যে চেয়ার পেতে বসে আছি। প্রচণ্ড বাতাসে চুল উড়ছে এলোমেলো। বিশালের এই অনুভূতি বেশিক্ষণ সহ্য করা গেল না। নিজেকে এত অসহায়, এত নগণ্য মনে হল, কেমন যেন একটা ভয় এসে গেল। নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালতে জ্বালতে মনে হল, আমরা কীসের এত বড়াই করি, বিশাল শূন্যতায় মুঠো মুঠো প্রাণ অসংখ্য জোনাকির মতো জ্বলছে আর নিবছে। সৃষ্টিবৃক্ষের ডালে ডালে কখনও নাচছে, কখনও স্থির। ড্রয়ার টানার শব্দে নিজেই চমকে উঠলুম। ত্যারছা আলোয় মুকুর সেই খাম। যেন এক জীবন্ত প্রাণী। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজছে। দূরে।

হেসে নাও এ দু'দিন বই তো নয়;
কার কি জানি কখন সন্ধে হয়।

খামটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। খুলব কি খুলব না। কত অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের মনের গতি পালটে যায়। হঠাৎ দেহমুখী হয়ে উঠেছিল। আকার, আকৃতি, কণ্ঠস্বর, মহিলাদের অন্তর্বাস, অলংকারের শব্দ, শ্বাসপ্রশ্বাস, স্পর্শ যেন মধুর মতো মন-মাছিকে টেনে নিত। নিজেকে মনে হত প্রবৃত্তির অতলে এক বৃহৎ অক্টোপাস। সবক'টা শুঁড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। মনের ম্যালেরিয়া হঠাৎ কোন কুইনিনে ছেড়ে গেল! ছেড়েছে, না আবার কেঁপে কেঁপে আসবে!

পিতৃদেব ঠিকই বলতেন, ঈশ্বরটিশ্বর জানি না বাপু, সার কথা হল নিজের ওপর নিজের কর্তৃত্ব। দূরে বসে নিজেকে দেখো। যেই বেচাল দেখবে উঠে এসে কান ধরে মারো দুই থাপ্পড়। নিজের শাসনে নিজেকে না রাখতে পারলে সব অনুশাসনই কাগজের ওপর কালো কালির হরফ।

আজ এই ঊষাকালে প্রথম বুঝলুম, এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। কী আমি গুরু গুরু করে বাইরে ঘুরে মরছি। মন না রাঙায়ে কাপড় রাঙালে কী হবে যোগী! মন্দিরে তোর নেইকো মাধব শাঁক ফুঁকে গোল করলি পোদো। মাধবকে আগে বসাতে হবে। যার পিতা এমন তার কি অমন হওয়া সাজে! সবাই বলে আমগাছে আমই হয়, আমড়া হয় না। তা হলে! তা হলে, এসব আমি কী ভাবি! কেন আমি ওসব করি! কী পাওয়া যায় ওতে! জীবনের পথ কোন মহাশিখরের দিকে চলে গেছে। অমৃতের পথ। আত্মোপলব্ধির পথ।

It rises through the mortal's hemisphere
Till borne by runners of the day and dusk.
It enters the occult Eternal Light
And clambers whitening to the invisible Throne.

নাঃ, আর নাচের পুতুলের মতো নাচব না। এ একটা সুতো ধরে টানবে হাতটা নেচে উঠবে। ও টানবে নেচে উঠবে পা। সবকটা সুতো ধরে তালে তালে টানবে, কাঠের পুতুল কোমর-উঁচু মঞ্চে ঘুরে ঘুরে নাচবে। আর না। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে সেই অসাধারণ দুটি লাইন,

The conscious Doll is pushed
a hundred ways
And feels the push but not
the hands that drive.

গোটাকতক হাত আমি দেখতে পেয়েছি। একটা হাত হল এই খাম। এই হাতে একটি সুতো ধরা আছে। নাচালেই নাচতে হবে। দর্শকশূন্য মঞ্চে নিঃসঙ্গ নৃত্য। বাহবা বলে কেউ তালিও বাজাবে না। বেড়াল যেমন ইঁদুর মেরে দু'হাত দূরে বসে থাকে, আমারও সেই অবস্থা। বহু দূরে একটি হাত সুলতো ধরে বসে আছে। আমার সামনে পড়ে আছে টোপ। নির্বুদ্ধি মাছ মাঝে মাঝেই হাঁ করছে। গিলেছে কি মরেছে!

সময় আর বেশি নেই। মন বলছে, ওহে! লগন যে বয়ে যায়। খুলে ফেলো। দেখো কী রহস্য আছে! তোমার জন্যে একটা আংটি আছে। শ্যামদেশের টুকটুকে লাল রুবি বসানো খুব সুন্দর একটি আংটি। যুবতীর নিবেদিত প্রেম। দীর্ঘ একটি চিঠিও আছে। সেই চিঠিতে তুমি হয়তো একটি পরিবারের অনেক গোপন কথা জানতে পারবে। জানতে পাবে একটি মেয়ের হঠাৎ নিরুদ্দেশের কাহিনি। হয়তো অনুসন্ধানের কিছু সূত্রও পেয়ে যেতে পারো। তাতে আমার লাভ? আমি কি গোয়েন্দা? আচ্ছা এই লেফাফায় যদি একটি দীর্ঘ পত্র থাকে, যে-পত্রের ছত্রে ছত্রে মুকু নামক একটি মেয়ের আবেগ উষ্ণ ভালবাসা—থাকবেই এমন কোনও কথা নেই, যদি থাকে তা হলে আমার কী হবে? মনে বেশ একটা দোলা লাগবে। কিছুদিন বেশ কেটে যাবে আবার এক নতুন নেশার ঘোরে। চিঠির উত্তরে চিঠি। তার উত্তরে চিঠি। চলতে থাকবে উত্তর-প্রত্যুত্তরের খেলা। তারপর যা হয়, মন্থর হয়ে আসবে আদানপ্রদান। যোগাযোগের অক্ষর-সেতু স্তবকে স্তবকে খুলে পড়ে যাবে সময়ের স্রোতে। স্মৃতি ছাড়া কিছুই আর থাকবে না। আমি তো আর কিং আর্থার নই যে ঘোড়ার পিঠে চেপে ট্রালা ট্রালা করে উদ্ধার করতে ছুটব আমার লেডি-ইন-ডিস্ট্রেসকে। কনক আমার দুর্বলতা। মুকু আমার পরিচিত। কনকের জন্যে আমি অনেক দূর যেতে প্রস্তুত ছিলুম। সেও একতরফা। কনক আমার জন্যে এক পা-ও যেতে প্রস্তুত ছিল না। সে কথা এখন স্পষ্ট। থাকলে এতদিনে আমাকে অন্তত একটা চিঠি দিত। একটা পোস্টকার্ড, গোটা দুয়েক লাইন। এ বাড়ি থেকে সেই জমিদারপুত্রের বাড়িতে অত সহজে চলে যেত না। স্টুডিয়োতে যেদিন দেখা হল সেদিন মনে হল প্রতাপবাবুকে সে মেনে নিয়েছে। হাবভাবে তেমন কোনও বিদ্রোহ নেই। ওই স্বার্থপর মেসোমশাইয়ের মেয়েরা খুব উদার হবে, ভাবাটাই অন্যায়। ফল তোমার পরিচয়? বৃক্ষে। ওই আইনজীবী ভদ্রলোক আর তার দ্বিতীয় কন্যাটির পাশে পঙ্কজবাবু আর অপর্ণা। মন! তুমি কী বলে? আকাশ আর পাতাল। ফাঁদে যদি পড়তে চাও, কোন ফাঁদ! আর প্রশ্ন নয়। কোনও ফাঁদেই আর এ শর্মা ধরা দেবে না। সংসারী মানুষ শেষটায় এমন ন্যাতাজোবড়া হয়ে যায়। মৃত্যু, অসুখ, উপেক্ষা, উদ্বেগ, অর্থাভাব, অভিমান। সার সার চৌরাশীটি নরকের কুণ্ড, তাহাতে ডুবায়ে ধরি পাতকীর মুণ্ড। ডাঙশ যমদূতকে আর মারতে হয় না, পরিবার পরিজনেই মেরে শেষ করে দেয়। তুমি বীর্যবান হও, মোহশূন্য হও। চোখকান বুজিয়ে যৌবনটি পার করে দাও।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর সঙ্গে ব্রহ্মচারীজির জীবনের আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। পরমাসুন্দরী পূর্ণযৌবনা ব্রাহ্মণকন্যা কাঁদোকাঁদো স্বরে বলছেন, 'ভেতরে অসহ্য জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারি না, তোমাকে মনে পড়লেই আমার বিষম অবস্থা উপস্থিত হয়। ভোগের লালসায় অস্থির হয়ে পড়ি। আমার এই কামনার পরিতৃপ্তি কর।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'এক সময় তোমার উপরেও আমার ভয়ানক লোভ ছিল। গুরুদেব তা এখন শান্ত করেছেন। ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছি। চিরকালের জন্যে ওসব কাজে বঞ্চিত হয়েছি।' যুবতী বললেন, 'তা হলে

আমার এই ভাব যাতে নষ্ট হয়ে যায়, তার উপায় বলে দাও, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারি না।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত হও, নিশ্চয়ই আমি তোমার শান্তির ব্যবস্থা করব।'

শোনো মন, মন দিয়ে শোনো, ওই লেফাফাটি ধরার আগে কুম্ভীপাক কাকে বলে আর একবার শুনে নাও। সেই যুবতী সময় পেলেই ব্রহ্মচারীর কাছে এসে বসতেন, ধর্মকথা সদুপদেশ শুনতেন, আর থেকে থেকেই কাতরভাবে বলতেন, অসহ্য জ্বালা, অসহ্য জ্বালা। যা হয় একটা কিছু করো। তুমি হলে কী করতে মন! এখন যা করছ তাই করতে। ব্রহ্মচারী কী করলেন শোনো।

'যদিও কামোন্মত্তা কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে দেবদুর্লভ ব্রহ্মচর্যের অতুলনীয় অমৃতফল ইতিপূর্বেই আমি হারাইয়াছিলাম, তথাপি বর্তমানে গুরুর কৃপায় কামশূন্য অচঞ্চল অবস্থায় অতিরিক্ত গর্বিত থাকাতে, আমি ভাবিলাম□— শুনিয়াছি বিশুদ্ধ নির্মল হৃদয়ে, নির্বিকার কামশূন্য অবস্থায়, কোনও ব্যক্তি প্রকৃতির রতিমন্দিরে মহাশক্তির পূজা করিলে, তাহাতে কামিনীর কামের উপশম হয়, এবং উপাসকেরও প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা হয়। ভাল আমি তাহাই করি না কেন? যুবতীর অঙ্গস্পর্শ করিতেই আমার নিষেধ, কিন্তু দূর হইতে পূজা করিতে দোষ কি?'

তারপর! মাঘ মাসের কোনও এক পবিত্র তিথিতে!

সুযোগ এসে গেল। এই অনুচ্ছেদটি যতবার পড়ি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

'জনপ্রাণীশূন্য কোন এক নিভৃত স্থানে অবিলম্বে আমরা পৌঁছিলাম। পরে আসনে উপবেশনপূর্বক কামিনীকে কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিতে বলিলাম।'

পূজারির সামনে যজ্ঞবেদি, যজ্ঞের কাঠ, ঘি, বেলপাতা, অতসী, জবা, অপরাজিতা, ধূপ, ধুনো, চন্দন। সময় দিবা দ্বিপ্রহর। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কিছু অংশ পাঠ করলেন, গায়ত্রী জপ করলেন। যজ্ঞাগ্নি জ্বলে উঠল।

'কামিনী আমার ইঙ্গিতানুসারে প্রহৃষ্ট অন্তরে অমনি উলঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন দেবীর অভীপ্সিতা অতসী, অপরাজিতা, জবা, বিল্বদল অঞ্জলি পুরিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম। পরে চণ্ডীর যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পঠনান্তর পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে রমণীর নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্থিরভাবে মনোযোগ পূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আশ্চর্য দেখিলাম□— অকস্মাৎ উঁহার নাভিস্তর হইতে ঊরুদ্বয়ের মধ্যদেশ পর্যন্ত, গোলাকৃতি নিবিড় কালো ছায়ায় একেবারে আবৃত হইয়া পড়িল; মধ্যাহ্নে প্রশস্ত সূর্যালোকে চতুর্দিক আলোকিত। আচম্বিতে গৌরাঙ্গীর অঙ্গবিশেষে মহাকালীর আবির্ভাব হইল। বহুক্ষণ বারংবার দৃষ্টি করিয়াও, ঘন কৃষ্ণবর্ণের অন্তরালে দীপ্তিময়ী কাল বিজলীর ঝিকিমিকি ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না। অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া আমার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।'

কিন্তু তারপর কী হল!

'অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। তখন দেখিলাম, রমণীর গৌর মুখমণ্ডল রক্তিমাভ হইয়া ওষ্ঠাধর ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; কুঞ্চিত নয়নে দৃষ্টিসঞ্চালন পূর্বক মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছেন। উঁহার পানে তাকাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। উঁহার চঞ্চল কটাক্ষে, তড়িৎ বেগে আমার ভিতরে কামোত্তেজনার সঞ্চার হইল।'

None can reach heaven who has not passed through hell.

ব্রহ্মচারীজি গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করছেন, রিপুর উত্তেজনা ক্রমশই যে বাড়ছে। যতই সাধন ভজন করছি ততই বাড়ছে।

গোস্বামীজি বলছেন, 'ও রকম হয় নির্বাণের পূর্বে প্রদীপের মতো। আমার যখন ওইরকম হত, আমি কয়েক ঘড়া জল অমনি মাথায় ঢেলে দিতাম; কখনও বা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ায়ে হয়রান হলেই বসে পড়তাম।'

একই ব্যাপার, এই লেফাফা-রমণীকে উলঙ্গ করলেই মনোহারিণী কটাক্ষে চিত্তচাঞ্চল্য। অভ্যন্তরে মুকু। কনকও থাকতে পারে। মেসোমশাইয়ের জীবনাতিরিক্ত জীবনের ইঙ্গিত থাকাও স্বাভাবিক। জল ঢালতে না পারি জলে ঢেলে দিতে পারি। বিসর্জনের এই তো প্রকৃষ্ট সময়। ঊষাকালেই তো যত মহৎ কাজ হয়। রাতের আততায়ী যাকে মেরে রেখে যায় তাকেও খুঁজে পাওয়া যায়।

বেরি দি পাস্ট। অতীতকে কবরখানায় ভরে দাও। খামটা হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেলুম। গাছপালার বৃত্তের মধ্যে ইঁদারা সদৃশ আমাদের সেই বিশাল কুয়ো। যার মাঝামাঝি জায়গায় একটি সুড়ঙ্গের মুখ। যার ভেতর থেকে বলাইবাবুর অভ্যুত্থান। কুয়োর ভেতর এখনও রাতের অন্ধকার থিরথির করছে। মহাকাল যেন মুখব্যাদান করে রয়েছে। ব্রহ্মচারীজি, যা দেবী সর্বভূতেষু, বলে কামোত্তেজিত কামিনীর অঙ্গে অতসী পুষ্প ছুড়ে মেরেছিলেন, আমি উত্তেজক লেফাফাটি মনের জোরে টুক করে ছেড়ে দিলুম। সেকেন্ড কয়েক সময়, জল স্পর্শ করার মৃদু শব্দ, যেন কোনও রঙিন পাখির ডানার আলতো শব্দ। মনে হল গলায় একটা পাথর বাঁধা ছিল। খুলে পড়ে গেল। জীবনের একটা চাপা অধ্যায় থেকে মুক্তি। বৃত্তে ঘুরছিলুম, আজ সেই বৃত্তের মুখ খুলে গেল। পাতার আড়ালে একজোড়া পাখি শুকশারীর গলায় যেন কথা বলছে। কী করলে, কী করলে!

সত্যিই, এ আমি কী করলুম! বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে লাফ মেরে, বাতাসের মধ্যে দিয়ে পড়তে পড়তে আত্মহত্যাকারীর মনের যে অবস্থা হয়, আমার এখন ঠিক সেই অবস্থা। এ আমার কী ধরনের হঠকারিতা। আমি কি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী! আমি এক ভোগী যুবক। দীর্ঘ ভোগের পথ আমার সামনে। রমণীয় রমণী, সুস্বাদু খাদ্য, সুন্দর উপাধান, বিলাসের সামগ্রী, বংশ বিস্তারের অবাধ স্বাধীনতা। কেউ তো বলেননি, ওহে তোমাকে বুদ্ধ হতে হবে, মহাবীর হতে হবে, চৈতন্য হতে হবে। নির্দেশ তো, তুমিই মানব হও। কাগজের কী দাম? একটু সেন্টিমেন্ট। তৎক্ষণ থেকে ওঠা আবেগের তৎক্ষণ-বিলয়। কিন্তু আংটিটা! নিক্তির ওজনে যার দাম!

মানুষের লোভ! নির্লোভ নিষ্কাম হওয়া মুখের কথা নাকি! আংটির চিন্তায় মন একেবারে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠল। এইরকম ছেলেকেই বলে সেন্টিমেন্টাল ফুল। ভাবার আগেই কাজ করে বসে। ঈশপস ফেবল্‌সের সেই দাড়িঅলা ছাগল। লাফাবার আগে তাকিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না।

সরসর করে পাতকোর বালতি নামিয়ে দিলুম। লেফাফা উদ্ধারের শেষ চেষ্টা। যদি তোলা যায়। বালতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিকে-ওদিকে নানাভাবে চেষ্টা করলুম। কোথায় কী! কূপের শীতল জলে সমাধি। সব রহস্যের অবসান। জল সমেত বালতি তুলছি, পেছনে কাকিমা এসে দাঁড়ালেন, কী, মুখ ধোয়া হল! আমার হাতে একটু জল ঢেলে দাও তো।

হাতময় কয়লার কালি। উনুনে মনে হয় আগুন দিয়ে এলেন। ওপরদিকে তাকালুম। নীল আকাশে আমাদের বাড়ির সেই বিখ্যাত চিমনি দিয়ে ধোঁয়া ফুঁসছে। ভোরের বাতাসে ধোঁয়ার রেখা এঁকেবেঁকে যাচ্ছে।

কাকিমা নিচু হতেই কাঁধ থেকে আঁচলটা সামনে লুটিয়ে পড়ল। কাকিমা বললেন, তুলে পিঠের দিকে পেঁচিয়ে দাও তো।

আবার সেই রমণীয় রমণীয়তা। ঠাকুর বলতেন কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই। আমি যতই অন্য কিছু ভাবার চেষ্টা করি না কেন সেই ভাবনা আসবেই। যে-বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে সে বাঘকে গুলি না-খাওয়া পর্যন্ত মানুষখেকো হয়ে ঘুরতে হবেই।

আঁচলের কেরামতি শেষ করে দু'হাতে জল ঢেলে দিয়ে ওপরে যাবার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছি, কাকিমা এই যাঃ বলে কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কিছু একটা পড়ে যাবার টুকুস টুকুস শব্দ হল।

কী হল বলে ঘুরে তাকাতেই দেখলুম, দু'টুকরো সাদা মতে কী মেঝেতে পড়ে আছে।

ইস, এ কী হল পিন্টু! এতদিনের শাঁখা বেড়ে গেল আজ।

কী করে হল?

পাতকোর পাড়ে হাত রেখেছি, খেয়াল ছিল না। অসাবধানে চাপ পড়ে গেছে। ভীষণ অলক্ষণ। কেন ভেঙে গেল বলো তো!

কতদিনের পুরনো জিনিস! এতে অলক্ষণের কী আছে!

মেয়েদের ব্যাপার, ওসব তুমি বুঝবে না। তোমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে একজোড়া শাঁখা পরে আসব। আর বাবার নামে পুজো দোব। সকালে যাবে, না বিকেলে?

সকালে তো অফিস!

একদিন আমার জন্যে না হয় কামাই করলে।

সে খুব অন্যায় হবে।

অপর্ণা বললে কী করতে?

একই উত্তর দিতুম। কাজ আগে।

ওরে আমার কাজি রে! যাও ওপরে যাও। চট করে গা ধুয়ে নিই। এরপর আজ আর দম ফেলার সময় পাব না।

আমার সামনে গা ধোওয়া যাবে না?

সাতসকালে দুষ্টু দুষ্টু কথা বোলো না।

মাতামহ মশারির ভেতর শিশুর মতো নিদ্রাচ্ছন্ন। পিতার টেবিলে এখনও পাংশু বাতি জ্বলছে। টেবিলে মাথা রেখে নিদ্রাতুর। চারপাশে ছড়ানো বই। কোনওটা উপুড়, কোনওটা চিত। সবই হোমিওপ্যাথির বই। সারারাত এই নিয়েই কেটেছে। ভোরের দিকে টেবিলে মাথা রেখেছেন ক্লান্ত বীর। হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলুম।

সুইচের শব্দ হতেই পিতা মাথা তুললেন। বললেন, সুপ্রভাত।

আজ্ঞে হ্যাঁ, সুপ্রভাত।

কী বুঝছ?

কীসের?

ওয়ান ডোজ, শেষরাতে জ্বর ছেড়ে গেল। এখন কেমন শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন!

কী করে হল?

মিরাক্‌ল। সিম্পলি মি মিরাক্‌ল। এ আমার চ্যালেঞ্জ। একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে পারো! ওই মহিলাকে আর খাটিয়ো না। কাল সারারাত বেচারা চোখের পাতা এক করতে পারেনি।

যাচ্ছি, চা করে আনছি।

চা অবশ্য আমাকে আর করতে হল না। কেটলির খুটখাট শুনেই কাকিমা সব ফেলে ছুটে এলেন। হাত থেকে কেড়ে নিতে নিতে বললেন, থাক, খুব হয়েছে। যার কাজ তার সাজে অন্যের মাথায় লাঠি বাজে। গালে একটা ঠোনা মেরে দিলেন। সবে স্নান করে এসেছেন। হাত দুটো কী ঠান্ডা! মহিলার প্রাণে যেন নতুন জীবনের জোয়ার এসেছে। সুখ জিনিসটা কত ক্ষণস্থায়ী! কাকিমাকে দেখলে আমার আতঙ্ক হয়। ডাক্তার যখন জেনে ফেলেন রুগির রোগ ক্রমশই মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে প্রাণকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন তিনি দেখেন আর মনে মনে বলতে থাকেন, হেসে নাও, এ দু'দিন বই তো নয়। নেবার আগে প্রদীপ একবার তেড়ে জ্বলে ওঠে।

চা পর্ব চলেছে। ক্রুশেন সল্টের শিশি নেমে এসেছে টেবিলে। চামচেটা ভারী অদ্ভুত। বাইচ খেলার নৌকোর দাঁড়ের মতো আকৃতি। ছোট্ট এতটুকু। চিমটে পরিমাণ ওষুধ তোলার ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। বেশিও না কমও না। ডিশে দু'চামচ ওষুধ ফেলে প্রথম চুমুক চা-টি পিতৃদেব স্বাস্থ্যসম্মত করে তুললেন।

ডিশের চায়ে চুমুক মেরে মুখে যে কুঞ্চন উঠেছিল, দূরে কিছু একটা দেখেই সেইটাই হাসিতে রূপান্তরিত হল। মাতামহ বিছানায় উঠে বসেছেন। পিতা চেয়ার ঠেলে এগোতে এগোতে বললেন, কী, কেমন বোধ করছেন?

ভোরের প্রথম ফোটা ফুলের মতো।

ঠিক বলছেন?

কোনও ভুল নেই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ। এবার তা হলে অনুমতি দাও।

কীসের অনুমতি?

একবার ঘুরে আসি হরিদ্বার, লছমনঝোলা, হৃষীকেশ।

আপনি শিশুর মতো বায়নাদার হয়ে উঠেছেন। তারা কেবল খাব খাব করে, আপনি কেবল যাব যাব করছেন। আপনাকে আমি জলধর সেনের হিমালয় দিচ্ছি, বসে বসে পড়ুন। মানুষকে অত বঞ্চিত করতে চান কেন?

বঞ্চিত?

তা ছাড়া আবার কী? আমাদের একটু সেবার সুযোগ দিন।

সেবা!

মাতামহ খলখল করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, কত বছর বয়েসে আমাদের স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে বলো তো হরিশঙ্কর?

তা ঠিক, আমাদের স্ত্রীভাগ্য দু'জনেরই খুব খারাপ।

আমার ছেলেটাকে তো তুমিই মানুষ করলে!

ও কথা বলবেন না। ডোন্ট ফ্যান মাই ইগো। মানুষ হবে বলেই মানুষ হয়েছে। কেউ কাউকে মানুষ করতে পারে না।

অতসব আমি জানি না বাপু। আমি যদ্দিন বাঁচব তদ্দিন বলে যাব। তোমার গুণগান করে যাব।

আপনি না ঈশ্বরবিশ্বাসী?

ঈশ্বরবিশ্বাসী বলেই কোনও কোনও মানুষে ঈশ্বরদর্শন করি।

এই তো সারের সার উপলব্ধি। যে-ঈশ্বর আমার ভেতর সেই একই ঈশ্বর আপনার ভেতরেও আপনার সেবা মানে ঈশ্বরের সেবা।

হরিশঙ্কর, সারাজীবন যে আমি বড় অবহেলা পেয়ে এসেছি। তাই ভেতরটা কেমন যেন কলসিতে রাখা সিল্কের কাপড়ের মতো কুঁকড়েমুকড়ে গেছে।

বিউটিফুল, বিউটিফুল। বড় সুন্দর উপমা। আমিও তা হলে বলি, ভালবাসার জলের ছিটে আর সেবার ইস্ত্রি দিয়ে আপনার রেশমের মতো সেই মনকে আমরা মোলায়েম করে দোব, মসৃণ করে দোব। বমিবমি ভাব আছে না গেছে!

সে তো এখন বোঝা যাবে না, বোঝা যাবে কিছু মুখে পড়লে।

আপনার ওষুধ এখন আমার হাতের মুঠোয়। পথ্যের ব্যবস্থাও করে ফেলেছি। আচ্ছা এই যে আপনি পালাই পালাই করছেন, কালকের মতো বিদেশ বিভূঁইয়ে হঠাৎ জ্বর এলে কী করতেন?

গাছতলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে জগদম্বার নাম জপ করতুম।

তা হলেই সব হত। হ্যাঁ, কে কোথায় গেলে! মুখ ধুয়ে নিন। খুব লাইট চা আর বিস্কুট খান। তারপর সব ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, জয়কে কি একটা টেলিগ্রাম করা দরকার?

না না, ওকে আর বিরক্ত কোরো না। সত্যি কথা বলব তোমাকে, বিয়ের পর অধিকাংশ ছেলেই কেমন যেন হাতছাড়া হয়ে যায়!

আঃ, সে তো একটু যাবেই। নান ক্যান হেল্‌প। বিবাহ একটা রেসপন্সিবিলিটি। ঘরের মধ্যে ঘর।

রাতভোরে পাখি ডাকলে যেমন নতুন দিন আসার আনন্দে মন ভরে যায়, মাতামহর উঠে দাঁড়ানোর আনন্দও অনেকটা সেইরকম। নিবতে নিবতে আবার শিখা জ্বলে উঠেছে।

পিতা বললেন, আমি আজ বাজারে যাচ্ছি। আজকের বাজারে বেশ ঝামেলা আছে। চারামাছ চাই, বরফ চাই, মুড়ি চাই।

বরফ কী করবেন?

সাংঘাতিক একটা টোটকা আবিষ্কার করে ফেলেছি। এক গেলাস জলে এক মুঠো মুড়ি ফেলে, চারপাশে বরফ দিয়ে ঘন্টাখানেক ফেলে রাখো। তারপর সেই শীতল মুড়ির জল বারেবারে চুমুকে চুমুকে খাওয়াও।

কাল জ্বর হল আজ বরফজল, যদি অন্যরকম কিছু হয়ে যায়!

কী হতে পারে?

যদি নিমোনিয়া হয়, কি ব্রঙ্কাইটিস হয়, তা হলে কী হবে?

তারও ওষুধ আছে। নাও তুমি গোটাকতক ব্যাগ নাও, আর দেরি না করাই ভাল। জ্যান্ত চারামাছ এরপর বাজার থেকে উঠে যাবে।

সকালের বাজারের সে কী শোভা! বেঁচে থাকার আনন্দে চারপাশ টগবগ করছে। বেগুনের বেগুনি, শাকের সবুজ, মাছের রুপোলি তবক, ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি। বাজার শেষ করে বরফের ডিপোয় গিয়ে মন বড় মিইয়ে গেল। ছোট্ট একটা গহ্বরে থান থান বরফ কাঠের গুঁড়োর বিছানায় শুয়ে আছে। ঘষা কাচের মতো চেহারা। আগুন নয়, তবু ধোঁয়া উঠছে। মৃত্যুর শীতল মুখগহ্বর থেকে যেন চিতার ধোঁয়া বেরোচ্ছে হিলহিল করে।

সুখের কথা বোলো না আর
বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি
দুঃখে আছি, আছি ভাল
দুঃখেই আমি ভাল থাকি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে ডাক পড়ল। আমার ওপর চায়ের ছাঁট থেকে কেফিন নিষ্কাশনের ভার পড়েছে। ফ্লাস্কে চায়ের ছাঁট আর সলভেন্ট ভিজছে। কাজটা খুব একটা দুরূহ নয়, তবে বিপজ্জনক। আগুন আর দাহ্য পদার্থ নিয়ে খেলা। একটু অসাবধান হলেই অগ্নিকাণ্ড। ডাকছেন যখন, যে-অবস্থাতেই থাকি যেতে হবে।

ঘরে ঢুকতেই বললেন, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি। কী হয়েছে তোমার? এত বিমর্ষ কেন?

আজ্ঞে, আমার দাদু ভীষণ অসুস্থ। মামা কলকাতা ছেড়ে বিদেশে চলে গেছেন।

কোন মামা? যিনি সিনেমা তুলছিলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বোসো। সংসারের ঘোলা জলে সকলকেই ভাই হাবুডুবু খেতে হবে। কাল ঊষা একটা গান গাইছিল। ভারী সুন্দর! সবটা মনে নেই। যে ক'টা লাইন মনে আছে:

এসেছ যখন ভবে
থাকার মাশুল দিতে হবে।
কত ডুববে উঠবে জীবন তরী।
চঞ্চলতা এনো নাকো॥

আজ্ঞে, পুরো গানটাই আমি জানি।

তাই নাকি! তুমি গান জানো?

অল্পস্বল্প চর্চা ছিল। বাবা এসরাজ বাজান। মামা গাইয়ে। এ গানটা আমি ঊষাদির কাছেই শিখেছি।

তাই নাকি? আচ্ছা প্রথম লাইনটা সুরে শোনাতে পারো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রোগ জানুক আর দেহ জানুক/মন তুমি আনন্দে থেকো/দেহাতীত হয়ে সদাই/আনন্দময়ীরে ডেকো॥

যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে প্রথম চারটে লাইন শুনিয়ে দিলুম। সংগীত এমন জিনিস, এম ডি-র চোখ ছলছল করছে। তিনি চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখলেন। তসরের পাঞ্জাবির ঢোলা

হাতা পিঠের কাছে খসখস করছে।

তুমি তো বড় গুণী ছেলে হে!

আজ্ঞে না, এমন কী আর গুণ? গান অল্পবিস্তর সব বাঙালির ছেলেই গাইতে পারে।

না হে, তোমার অনেক গুণ। নিজের গুণ নিজে বোঝা যায় না। তোমাকে একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে। বেশ নির্জনে একপাশে বসে তোমার গান শুনব।

এম ডি নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, বুঝলে, ঊষা মেয়েটি বড় ভাল। দেবী। এসব মেয়ে ক্ষণজন্মা। লাখে এক। ওর কাছাকাছি এলে মানুষের ধর্মভাব হয়। নতুন দিগন্ত খুলে যায়। কত কী যে শেখার আছে ওর কাছে! পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা, পলাশ। ছেড়ে চলে যেতে হবে এই যা দুঃখ। আর কি আসা হবে? আচ্ছা, তুমি ওই গানটা জানো, তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলে যে যাই।

ঠিক সুরে পারি না, তবে মাঝে মাঝে গাইবার চেষ্টা করি।

আহা, কী লেখা। দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই। বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে। নাঃ আমার দ্বারা আর ব্যাবসাট্যাবসা হবে না। যত দিন যাচ্ছে তত রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছি।

সে তো ভালই। শুষ্কং কাষ্ঠং না হওয়াই ভাল।

আর কি আমার সে বয়েস আছে, পলাশ! আমাদের ওই বৈদ্যুতিক চালুনি যন্ত্রটা কোনওদিন দেখেছ!

না স্যার।

আবার সেই বাঙালের মতো স্যার বলছ? ওই সম্বোধনে দূরত্ব বেড়ে যায়। হ্যাঁ যা বলছিলুম, যন্ত্রটা বড় মজার! প্রথমে এক পাশে কাত হয়ে কিছু জিনিস তুলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে আর এক পাশে কাত হচ্ছে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে বড় দানার জিনিস গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। থাকছে ছোট দানা। যন্ত্র তখন সেইগুলোকে নাচাচ্ছে। একেবারে পৃথিবীর কায়দা। এক প্রান্তে প্রবেশ, আর এক প্রান্তে প্রস্থান, মধ্যে নাচানাচি। আমরা সেই বৃদ্ধের দল, নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে নির্গমন-পথের দিকে চলেছি। দিন এলে রাতের প্রদীপ ম্লান হবেই। কোনওদিন দাবার চাল দেওয়া দেখেছ?

আজ্ঞে না।

বড় মজার দৃশ্য! হুক থেকে মুন্ডু ধরে দাবাড়ু একটি ঘুঁটি অল্প একটু তুলে এক পাশে কাত করে ধরে আছেন। চাল ভাবছেন। এগোতে গিয়ে পেছিয়ে আসছেন। ঘুঁটির যাবার সময় হয়েছে। ঘরে স্থির হয়ে বসা আর চলবে না। খেলোয়াড়ের দ্বিধায় যাব কি যাব না ভঙ্গিতে ঘর ছুঁয়ে আছে। ঠিক আমার অবস্থা, একটা পা উঠে পড়েছে। আর একটা পা উঠল বলে। ডালে বসে থাকতে থাকতে পাখির ওড়া দেখেছ?

আজ্ঞে না।

কী দেখেছ তুমি! এবার দেরাদুনে গিয়ে, পাশেই ফরেস্ট, এইসব খুব ভাল করে লক্ষ করবে। পাখি যখন ডাল থেকে উড়তে চায় তখন তার চোখদুটো দেখবে উদাস হয়ে যায়। ডানাদুটো বারকতক খুলব কি খুলব না করে, তারপর কীসের তাগিদে ঝপ করে উড়ে চলে যায়। আচ্ছা যে কারণে তোমাকে ডেকেছি, গেট রেডি ফর দেরাদুন। তোমার শীতের ভাল পোশাক আছে?

আজ্ঞে না, করাতে হবে।

আজকালের মধ্যে অর্ডার দিয়ে দাও। শীত আসছে। ওখানে ভীষণ ঠান্ডা পড়ে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কী করাবে?

একটা গলাবন্ধ কোট।

শুধু ওপরের দিকটা ভাবলেই হবে না, তলার দিকটাও ভাবো। আমরা কী বলি? শীত করে, শীত পায়। তার মানে? করে মানে হাতে, পায় মানে পায়ের পাতায়। একটা গরম সুট করাও। টাকা চাই?

আজ্ঞে না।

না কেন?

আছে। দরকার হলে বলব।

না, তোমাকে আমি উপহার দোব। এই এমপ্লয়ার-এমপ্লয়ি সম্পর্কটা ভাঙতে হবে। ওপন্ আপ মাই ডিয়ার বয়, ওপন্ আপ। আমি আমাদের ট্রাভেল এজেন্টকে বলে দিচ্ছি, সামনের সপ্তাহে তোমাদের জন্যে দুন এক্সপ্রেসে টিকিট বুক করুক। শুক্রবার ভাল বার। রবিবার সকালে পৌঁছে যাবে। এখনও যথেষ্ট সময় আছে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

আমি তা হলে এখন আসি। একটা কাজ চাপিয়ে এসেছি।

হ্যাঁ যাও। তিনটের সময় তোমাকে নিয়ে আমি টেলারের কাছে যাব। সেইভাবে নিজেকে ফ্রি করে নিয়ো।

দুটো ব্লকের মাঝখানের ঝোলা বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে আমার একটা কথাই কেবল মনে হচ্ছিল, সওদাগরি অফিসের ওপরঅলারা কর্মচারীদের সঙ্গে সাধারণত খুব একটা ভাল ব্যবহার করেন না। আমার বরাতে এ কী জুটছে! ঈশ্বরেরও তা হলে করুণা হয়। একসঙ্গে সব দিক শুকিয়ে দেন না। নীলকণ্ঠের গানের মতো, এক কূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে তমকূলে সাজায়। বহু দূরে কোথায় কে জানে, তিনি বসে আছেন রত্নখচিত সিংহাসনে। তাঁর জানলায় সোনার গরাদ। আয়ত দুটি চোখ পড়ে আছে জীবজগতের দিকে। সবই দেখছেন। দেখেছেন, জীবনের ভাণ্ডার থেকে এ ছেলেটা তো কিছু পায়নি। যা ধরতে গেছে, সবই পালিয়েছে হাত ফসকে। একে কিছু দেওয়া যাক। একটু স্নেহ, দুটো ভাল কথা। যা পাওয়া যায়! যা আসে, আসুক সেই অপার করুণাময়ের হাত গলে। যা চাই তা যখন পাই না, যা পাই তা মেনে নেওয়াই ভাল।

ল্যাবরেটরিতে ঘণ্টা দুয়েক চুটিয়ে কাজ করার পর জিনিসটা বাগে এসে গেল। কার ভেতর যে কী অদৃশ্য হয়ে থাকে। চা-বাগানের মেঝে ঝাঁট দেওয়া আবর্জনার মধ্যে কী ঐশ্বর্য! বিকার থেকে সলভেন্ট উড়ে চলে গেছে, পড়ে আছে ধবধবে সাদা মিহি গুঁড়ো, যার নাম কেফিন। দামি একটি ওষুধ। আজ আমার দিনটা খুব ভাল। পিতার এক পুরিয়া চায়নায় মাতামহ আরোগ্যের পথে। এম ডি-কে গান শুনিয়ে খুশি করে দিয়েছি। বিকেলে যাব সুটের মাপ দিতে। চলেছি হিমালয়ের কোলে দেরাদুনে বসবাস করতে। মনে হয় পদোন্নতিও হবে। কেমিস্ট্রিতে হাত পেকেছে। তার হালফিল প্রমাণ চোখের সামনে, বিকারে। প্রসেসটা কমার্শিয়ালাইজ করতে পারলে, টি-ওয়েস্ট থেকে কেফিন বের করে প্রতিষ্ঠান অনেক টাকা লাভ করবে। আর আমাকে পায় কে! আজ আবার জিমূতবাবু মাংসের কোরমা চাপিয়েছেন। সুগন্ধে সব পাগল হয়ে যাচ্ছেন। আর মিনিট পনেরো পরেই তিনি আসছেন নতুন ভাঁড়ে সিঁ সিঁ শব্দ ছাড়তে ছাড়তে।

মৃগ যেমন কস্তূরীর গন্ধে পাগল হয়ে যায়, আমিও তেমনি নিজের অহমিকায় বিভোর। ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠছি, আবার একটু নীচে নামছি। নিজেই নিজের গলায় বিজয়মাল্য পরাচ্ছি। কাঁধের পাশ থেকে কে বললেন, আপনাকে ডাকছেন।

এম ডি-র পিয়োন। কী ব্যাপার, এর মধ্যে তিনটে বেজে গেল? কই না তো, সবে একটা পনেরো। ভাব আর ভাবনার মাকড়সার জাল থেকে নিজেকে বের করে আনলুম। ঝুলবারান্দা দিয়ে যেতে যেতে নাকে নানারকম গন্ধ এসে লাগল। নীচের ফ্যাক্টরিতে সাবান তৈরি হচ্ছে। জুঁই ফুলের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। হঠাৎ অপর্ণার কথা মনে পড়ে গেল। এমন একটা ব্লাউজ পরেছে, গায়ের রঙের সঙ্গে জামার রং মিলে গেছে। বুকের কাছে ছিলে-কাটা সোনার হার দুষ্টু ছেলের মতো চিকমিক করে হাসছে। শরীরের ভেতর কোথাও কোনও একটা কিছু মুচড়ে উঠল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ভিজেভিজে বাতাসের মতো সুখের অনুভূতিতে শরীর যেন অবশ হতে চাইছে।

এম ডি মৃদু হেসেই মুখ গম্ভীর করলেন। আমাকে বললেন, বোসো।

বসলুম। টেবিল আর সকালের মতো খালি নেই। কাগজপত্রে ভরে উঠেছে। স্যাম্পল-ভরতি শিশি সারি সারি একপাশে। নীচের সিন্থেটিক ল্যাবরেটরি থেকে ওপরে উঠে এসেছে। এম ডি স্থির চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছ? স্থির আছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

নিজের ওপর নিজের কন্ট্রোল আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে, তুমি এখুনি একবার মেডিকেল কলেজে চলে যাও। আমি গাড়ি দিচ্ছি।

মেডিকেল কলেজে কেন?

তুমি এমার্জেন্সিতে যাবে। সেখানে তুমি পঙ্কজকে পাবে। হরিশঙ্করের অফিসের আরও কয়েকজনকে পাবে।

সেখানে তাঁরা কী করছেন?

একদম উতলা হবে না। লাগাম টেনে রাখো। হরির মাইনর একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই।

হঠাৎ মনে হল আমি মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছি। প্যারাচুটের দড়ি না খুললে প্যারাট্রুপারের মনের অবস্থা যেমন হয়, আমার মনের অবস্থাও সেইরকম হয়ে গেল। আকাশ বেয়ে হুড়মুড় করে নেমে চলেছি নীচের দিকে। এরই মধ্যে শুনতে পেলুম এম ডি বলছেন, বুঝতে পেরেছি। তোমাকে একা ছাড়া ঠিক হবে না। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। অনেকদিন আমার ওল্ড ফ্রেন্ডকে দেখিনি। বহুবার বলেছি, আয় চলে আয়, আমার পাশে এসে দাঁড়া। পশ্চিমবাংলার মাটিতে আচার্য রায়ের স্বপ্ন সফল করি। বোম্বাই আমাদের কান কেটে দিচ্ছে। শুনবে? কারুর কথা শুনবে? ভগবান একটা ষাঁড় তৈরি করতে গিয়ে হরিশঙ্কর করে ফেলেছেন। নিজের মাথার দাম নিজেই বুঝল না। নাও চলো। গেট আপ।

এম ডি কী করছেন, কী বলছেন, দেখেও দেখছি না, শুনেও শুনছি না। কেমন যেন ভোরের কুয়াশার ভেতর বসে আছি। শীতের সকালে ময়দানের ছবির মতো।

ধীরে ধীরে গাড়িতে এসে বসলুম। এম ডি আমার পাশে বসলেন। একটু আগে সাফল্যের স্বপ্নে বিভোর হয়ে ছিলুম। ভবিষ্যৎ উড়ে আসছিল বার্ডস অফ প্যারাডাইসের মতো রঙিন পাখা মেলে। আশঙ্কায় মন আর কোনও কাজ করছে না। স্থির হয়ে গেছে। দু'পাশ দিয়ে দৃশ্য ছুটে চলেছে। দেখেও দেখছি না।

এম ডি একবার শুধু বললেন, ঘটনার ওপর মানুষের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, পলাশ। যখন যা ঘটার তখন তা ঘটবেই। আমরা শুধু দর্শক। তুমি অত মুষড়ে পোড় না। তুমিই না সকালে আমাকে গেয়ে শোনালে, কত ডুববে উঠবে জীবন তরী। চঞ্চলতা এনো নাকো। এই তো তার হাতেনাতে পরীক্ষা।

মানুষ কী মন নিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে যায় আমার জানা নেই। আমার এই মুহূর্তের মনের অবস্থা দেখে হয়তো কিছুটা অনুমান করা যায়।

মেডিকেল কলেজের বিশাল চত্বরে গাড়ি এসে ঢুকল। এপাশে-ওপাশে এক-একটা ব্লক ইটের দৈত্যের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত নিচু একটা সিঁড়ি দু'পাশ দিয়ে একটা চাপা বারান্দা মতো জায়গায় উঠে গেছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা, ব্লাডব্যাঙ্ক। পাশেই এমার্জেন্সি। সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন পঙ্কজবাবু। আমাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে, অথচ আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না। এম ডি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠলেন—

এ কী? আপনি? না, না তুমি।

হ্যাঁ, আমি। ছেলেটাকে একা ছাড়ি কী করে? ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কী অবস্থা? মারাত্মক কিছু?

তেমন মারাত্মক নয়। তবে হতে পারত। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তেমন হলে চোখদুটো যেত।

ও তো একজন নামকরা পাকা কেমিস্ট। কী করে কী হল?

আর বোলো না, এক জুনিয়ারের কীর্তি। কীসে কী হয় ধারণাই নেই। একোয়ারিজিয়া দিয়ে কী একটা করছিল, ফ্লেম কন্ট্রোল করতে পারেনি। এক টেস্টটিউব মাল ছিটকে বুকে এসে পড়েছে। গেঞ্জিতে সোক করে, খুলে ফেলতে ফেলতেই ড্যামেজ হ্যাজ বিন ডান।

ডাক্তার অ্যাটেন্ড করেছেন?

হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে। ভাগ্য ভাল, এমার্জেন্সিতে আজ তড়িৎ আছে।

তড়িৎ! আমাদের সেই তড়িৎ! যে বলত সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করব!

এখনও সেই ভাবই আছে। সুযোগ খুঁজছে। সংসারে একমাত্র বন্ধন মা। বুড়ি গেলে ওকে ধরে রাখা শক্ত।

চলো তা হলে, আমাদের বীর সৈনিককে এবার দেখে আসি। আজ ছাড়বে, না রেখে দেবে?

পড়েছে তড়িতের হাতে। সহজে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে হয় না।

যেতে যেতে পঙ্কজবাবু বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই। স্কিনটা সামান্য পুড়ে গেছে। দিন পনেরোর মধ্যেই ঠিক হয়ে গেছে দেখবে। শুনলুম, তোমার মাতামহ ভীষণ অসুস্থ।

আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালই অসুস্থ।

হরি সেইসব কথাই বলছিল, এমন সময় ওই কেয়ারলেস কেমিস্ট, সবই মানুষের নিয়তি! কার যে কখন কী হয়!

এমার্জেন্সিতে ঢুকতেই মাথা ঘুরে গেল। দিন আর কতটাই বা গড়িয়েছে, এর মধ্যেই আশেপাশে কত কী ঘটে গেছে! ফুটফুটে ডলপুতুলের মতো একটি মেয়ে বাবার সাইকেলের পেছনে বসে ইস্কুলে যাচ্ছিল। স্পোকের মধ্যে পা ঢুকে চুলের বিনুনির মতো পাকিয়ে গেছে। মেয়েটির পিতা হায় হায় করছেন, এ আমি কী করলুম, এ আমি কী করলুম।

খুড়ো ভাইপোর মাথায় শাবল ঝেড়ে দিয়েছে। মাথা একেবারে ফুটিফাটা হয়ে গেছে। পাশেই ছেলেটির মা দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় ছেলেকে জড়িয়ে ধরে এনেছিলেন। রক্তে থানধুতি ভেসে গেছে। সঙ্গে একজন পুরুষ রয়েছেন। ভালমানুষ স্কুল শিক্ষকের মতো নিরীহ চেহারা।

কোনও এক কারখানার কর্মী এসেছেন। মেশিনে হাত ঢুকে ডান হাতের তিনটে আঙুল কেটে ঝুলে পড়েছে। সঙ্গীসাথীরা রক্ত দিতে হবে রক্ত দিতে হবে বলে চিৎকার করছেন।

এক তরুণী শেষরাতে বিষ খেয়ে বসে আছে। পেট থেকে পাম্প করে বিষ বের করার আয়োজন চলছে। মেয়েটির সাংঘাতিক চেহারার শাশুড়ি মাকে শাসাচ্ছেন, কী মেয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। কুলটা। নিজে মরছে মরুক, আমার সোনারচাঁদ ছেলেটাকে জেল খাটাবার মতলব!

ডাক্তার আর সাদা পোশাক পরা সিস্টাররা ছুটোছুটি করছেন। সকলকে সামলাবার চেষ্টা করছেন। ছিন্নভিন্ন এক-একটি প্রাণী ওটিতে যাচ্ছেন। কারুর হাত যাবে, পা যাবে, কেউ সেলাইফোঁড়াই হয়ে বেরিয়ে আসবে। কারুর চোখ হয়তো আর খুলবেই না। কাঁদতে কাঁদতে এসে হাসতে হাসতে চলে যাবেন।

কেমন যেন দিশাহারা হয়ে যাবার মতো অবস্থা। এই কুরুক্ষেত্রের কোথাও আমার পিতৃদেব নেই। তিনি বসে আছেন ভেতরের একটি বিশেষ ঘরে। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পদ্মাসনে যেন ধ্যানে বসেছেন। বুকে হলদে মলমের প্রলেপ। ডানা মেলে হলুদ রঙের একটি হাঁস যেন উড়ে চলেছে। সুন্দর চেহারার অবাঙালি একজন সিস্টার তাঁর পরিচর্যায় ব্যস্ত। কিছুদূরে বসে আছেন ডাক্তারবাবু। তিনি নানারকম নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমাদের দেখে পিতৃদেব উঠে দাঁড়াতে গেলেন। সিস্টার মৃদু ধমক দিলেন, ডোন্ট মুভ, ডোন্ট মুভ। আই হ্যাভ নট ফিনিশ্‌ড ইয়েট।

ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জে ডিসটিল্‌ড ওয়াটার ভরতে ভরতে তিনি আমাদের দিকে ভুরু তুলে তাকালেন।

প্রথমে কথা বললেন এম ডি, কী রে, চিনতে পারিস?

পিতা দু'হাত তুলে বললেন, হ্যালো, মাই ওল্ড ফ্রেন্ড!

হাত তোলার ফলে বুকে বোধহয় টান পড়ল। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি মুখে ফুটে উঠতে গিয়েও উঠল না। হাসির তলায় চাপা পড়ে গেল। একেই বলে পুরুষমানুষ। উত্তরাধিকার সূত্রে সিকির সিকি গুণও যদি পেতুম।

ইঞ্জেকশনের শিশির রবার ছ্যাঁদা করে জল ভরতে ভরতে সিস্টার বললেন, ইয়োর রেস্টলেসনেস উইল বি কস্টলি ফর মি। মাইন্ড ইট।

পিতা বললেন, আই অ্যাম সরি।

ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। এ যেন কলেজ রিইউনিয়ন। চার বন্ধুর সঙ্গমে আমি এক উত্তরপুরুষ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। ওপাশে দস্তুর জীবনের আক্রমণে শতছিন্ন প্রাণের আর্তনাদ, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জীবনমৃত্যুর সাপে নেউলে খেলা, এদিকে অতীতে-বর্তমানে মহামিলন।

এম ডি বললেন, তড়িৎ, দাড়িটাড়ি রেখে কী হয়েছিস! র‍্যাসপুটিনের মতো চেহারা করেছিস।

ডাক্তার বললেন, তোর চেহারার মধ্যে একটা মুখ্যমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রী ভাব এসেছে রে। পশ্চিমবাংলার নাম্বার ওয়ান শিল্পপতি।

পিতা বললেন, বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। উপায় নেই। থাইমলের দাগ লেগে যাবে।

সিস্টার পুট করে ওপর-বাহুতে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন। হাসিমুখে বললেন, নড়িবেন না, ছুঁচ ভাঙিলে বন্ধুগণ কিছুই করিতে পারিবেন না।

এতক্ষণ লক্ষ করিনি, পিতৃদেবের ডান চোখের ঠিক নীচে একটা পোড়া দাগ। একোয়ারিজিয়া সাংঘাতিক বস্তু। সোনা গলে যায়। মানুষ তো গলবেই। ওই জায়গাটার দিকে ডাক্তারদের এখনও চোখ পড়েনি।

ডাক্তারবাবু বললেন, একটু চা হোক।

তিনজনে সমস্বরে বললেন, হয়ে যাক। হয়ে যাক।

ওয়ার্ডবয় ছুটলেন চা আনতে। মানুষের বুক বড় নরম জায়গা, সেখানে গরম হাইড্রোক্লোরিক আর নাইট্রিকের মিশ্রণ কী ক্ষতি করতে পারে ডাক্তার না হলেও আমার জানা আছে। শুধুমাত্র অসম্ভব মনের জোরে মানুষটি স্থির হয়ে বসে আছেন। ছাত্রজীবনের বন্ধুদের সঙ্গে মাপা রসিকতা করে যাচ্ছেন।

চা শেষ করে ডাক্তারবাবু বললেন, নাও চলো, তোমাকে ভি আই পি কেবিনে পুরে দিয়ে আসি। আমাদের সেবাযত্নে দিনকতক থাকো।

তার মানে? তুমি আমাকে হাসপাতালে ভরে রাখবে? আমার দুঃস্বপ্নেও এমন সম্ভাবনা দেখিনি। এমন আহামরি কিছু হয়নি যে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে।

এম ডি বললেন, বার্নকেসে সেবাযত্নের প্রয়োজন। টোয়েন্টি ফোর আওয়ারস্ সাফারিং। তুমিও কেমিস্ট্রি আমিও কেমিস্ট্রি। কীসে কী হয় ভালই জানিস। গোঁয়ারতুমি করিসনি।

আমার থাকার উপায় নেই।

পঙ্কজবাবু বললেন, ছেলের কথা ভাবছিস?

শুধু ছেলে কেন? শ্বশুরমশাই অসুস্থ। আমার ভরসায় এখানে আছেন।

পঙ্কজবাবু বললেন, তোমার বাড়ির দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।

পিতা চেয়ার থেকে পা নামিয়ে জুতো খুঁজতে লাগলেন। তার মানে জুতো পরেই দৌড় মারবেন। কারুর ক্ষমতা নেই ধরে রাখে।

ডাক্তারবাবু উঠে এসে বললেন, হরি, নাউ আয় অ্যাম সিরিয়াস। এখন আর আমি তোর বন্ধু নই, ডাক্তার। জীবন নিয়ে খেলতে গিয়ে মৃত্যুকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। আমরা মৃত্যুর শত্রু। গেট আপ। তোমার ব্যাপারটাকে খুব সামান্য ভেবো না। পোড়ার ডিগ্রি আছে জানো! এটা তোমার কেমিস্ট্রি নয়। গেট আপ।

অসহায় মুখে পিতা উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছুদিনের জন্যে নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেন হয়ে গেলুম। সামলাতে পারবে তো?

সেই সতীমার হাসি শুনতে পেলুম। গঙ্গার ঘাট ভেঙে ভেঙে উঠছেন আর বলছেন, ওই দেখ তোর পথ। ফণীমনসার ঝোপের পাশ দিয়ে চলে গেছে অন্ধকারের দিগন্তে। জীবনের কাছ থেকে কিছু আশা করিসনি।

আব ইয়ে সমঝ্মে জফরকি আয়া
যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়।

নিখুঁত পরিপাটি বিছানায় মাতামহ বসে আছেন। চাদরের ওপর ধূসর একটি কম্বল বিছানো। হাতে একটি বহুকালের পুরনো কীটদষ্ট বই। বইটি সামনে খুলে ধরে মাতামহ একেবারে তন্ময় হয়ে গেছেন। পোকায় ফুটো ফুটো করে দিয়েছে। সমস্ত পাতা পাঁপড়ভাজার মতো মচমচে। দূর থেকে দেখছি, যেন ধ্যানস্থ মহাদেব।

আমার পদশব্দে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন। চোখদুটি আরক্ত। জলে ছলছল করছে। মৃদু একটি হাসি ঠোঁটের কোণে নেমে এল। আমি জানি। আমি আজ এসেছি সব হাসি শুষে নেবার ব্লটিং পেপার হয়ে। যে-সংবাদ বুকে চেপে রেখেছি, সে সংবাদ যেই লাফ মেরে নেমে আসবে, বজ্রপতনের মতো আতঙ্ক ছড়াবে।

মাতামহ বললেন, এসো লর্ড, তোমাকে আজ যেন একটু কমজোর মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল বুঝি?

তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল। বাবার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

আঁ, কী বললে? হরিশঙ্করের...!

মাতামহের হাত থেকে বইটি বিছানার ওপর খসে পড়ে গেল।

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুড়ে গেছেন।

পুড়ে গেছে? ও তো পুড়েই আছে। আবার নতুন করে কী পুড়বে? এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয়নি তোর মনের মতো? আরও পোড়াবে।

অ্যাসিডে বুক আর মুখের একটু পুড়ে গেছে।

তাকে কোথায় রেখে এলে?

হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে।

আমি যাব। আমি এখুনি যাব। সে এখন কেমন আছে? কথা বলছে? হাসছে?

হ্যাঁ, কথা বলছেন।

তা হলে? ফিরে আসবে তো? না, সবাই যেভাবে চলে গেল, সেইভাবে চলে যাবে? অ্যাসিড নিয়ে সে কী করছিল? জানে না অ্যাসিডে মানুষ পুড়ে যায়? এত জানে, এই সামান্য জিনিসটুকু জানে না!

মাতামহ উঠে দাঁড়ালেন। পা দুটো বেশ তপতপে ফুলে আছে। মুখটা আজ বড় বেশি ফরসা দেখাচ্ছে। শরীরের রক্তস্রোতে ক্রমশই মনে হয় ভাঁটা পড়ে আসছে।

বউমা! মাতামহ গর্জন করে উঠলেন।

নীচের কলতলা থেকে কাকিমার গলা ভেসে এল, যাই বাবা।

আমার জামাকাপড় দাও।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কাকিমা দরজার বাইরে থেকে উঁকি মারলেন।

আমার জামাকাপড় দাও। জানো না কী হয়েছে? হরিশঙ্কর পুড়ে গেছে।

কী বললেন? কী হয়েছে বটঠাকুরের?

কাকিমা জলপায়ে ঘরে এলেন।

অ্যাসিড়ে পুড়ে গেছে। হাসপাতালে আছে। যে-জাহাজে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছিলুম সেই জাহাজ বুঝি এবার ডুবে যায় বউমা! সবই এই বুড়োর ভাগ্য। সুখ সইবে কেন? গাছতলায় যার আস্তানা, রাজপ্রাসাদে সে কি থাকতে পারে! আগুন লাগবেই।

আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন দাদু? সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি যে ঘরপোড়া গোরু।

কাকিমা বললেন, একটু দাঁড়ান, আমিও যাব।

আজ আর আপনাদের কাউকেই যেতে হবে না। আমি যাই। দু'-একটা প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে আসি।

তুমি কি ভাবছ আমি মরে গেছি? অথর্ব হয়ে গেছি! তুমি জানো না, আমি সকলকে মেরে তবে যাব। আমার পালা আসবে সব শেষে। আমি এক লোভী, ভোগী পুরুষ। জীবনে অনেক অপরাধ করেছি। তার প্রায়শ্চিত্ত করে আমাকে যেতে হবে সব শেষে। বেটি, তুই হরিশঙ্করের দিকে হাত বাড়ালি কেন? অবিচার তোর আগাগোড়া। ভবে এসে খেলব পাশা, বড়ই আশা মনে ছিল। মিছে আশ ভাঙা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পালা॥ পো-বারো আঠারো যোলো, যুগে যুগে এলেম ভাল। শেষে কচে-বারো পেয়ে মাগো, পাঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হল॥

কাকিমা অবাক হয়ে মাতামহকে দেখছেন। আমিও এমন মূর্তি কখনও দেখিনি। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নামছে। সংসার-সমরাঙ্গনে পরাজিত নৃপতি আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভর করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন।

কাকিমা এগিয়ে গিয়ে মাতামহের হাতদুটো ধরে ফেললেন। শুধুমাত্র একটি শাড়ি একটু উঁচু করে পাক দিয়ে পরে আছেন। গায়ে জামা নেই। গা ধুতে ধুতে উঠে এসেছেন। উপায় ছিল না এর চেয়ে পরিপাটি হয়ে আসার। ইনি যেন আমার মাতামহের আর এক কন্যা।

হাত ধরে বিছানার দিকে নিয়ে যেতে যেতে কাকিমা বলছেন, বাবা, শান্ত হন। শান্ত হন, আপনার শরীর ভাল নেই। টলছেন। পড়ে যাবেন।

দু'জনে ধরাধরি করে বৃদ্ধ মানুষটিকে বিছানায় বসিয়ে দিলুম। কাকিমা প্রায় জড়িয়ে ধরে আছেন। নিয়তি নামক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে অভিমানের তরোয়াল খুলে বারেবারে যুদ্ধে নামার চেষ্টা। অপরাজেয়কে যে পরাজিত করা যায় না! কে বোঝাবে সে কথা এই অভিমানী মানুষটিকে! মানুষ যদি বোকার মতো কষ্ট পায় কিছু করার আছে? সংসার থেকে শুধুমাত্র আনন্দের অংশটি তুলে নেবার মতো হাঁস কোথায় পাওয়া যাবে! তা হলে তো সকলকেই পরমহংস হতে হয়। এ কি সদলবলে মধুপুরে বায়ু পরিবর্তনে আসা! এলুম একসঙ্গে, ফিরে গেলুম একসঙ্গে। অদৃশ্য মৃত্যুপুরুষ। আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মতো পাশে পাশে হেঁটে চলেছে। কখন কোন সময় সে হঠাৎ গতি থামিয়ে দিয়ে বলবে, চলো, এবার তোমার ফেরার সময় হয়েছে,

কেউ জানে না। সেই মহা অভিভাবকের অবাধ্য হবার ক্ষমতা কারুর নেই। মানুষের বৃথা এই আস্ফালন। আসলে মৃত্যুই আমাদের মধ্যে জীবিত হয়ে ঘুরছে। আচ্ছা চলি, বলে চলে গেলেই হয়ে গেল।

অতি কষ্টে মাতামহকে শান্ত করা গেল। গুম হয়ে রইলেন বিছানায়। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আজ আর তা হলে সে ফিরছে না! এই শূন্য বাড়ি। তুমি আর আমি আর বউমা!

যাবতীয় জিনিসপত্র নিয়ে আমি আবার হাসপাতালে ফিরে গেলুম। দিনের চোখে নিদ্রা নামছে। দু'-একটা আলো জ্বলেছে, তেমন জলুস নেই। পৃথিবী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ছোট্ট একটি কেবিনে শুয়ে আছেন পিতৃদেব। যে-মানুষ সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকেন তাঁর কাছে এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে। আমার সঙ্গে খানকয়েক বইও আছে। এইবার সময়টা হয়তো সহজে কাটবে। আমার নিজের একবার অ্যাসিডে হাত পুড়েছিল। সেই সামান্য পোড়ার যন্ত্রণায় আমি এক রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি। বুকের অনেকখানি জায়গা পুড়েছে। যন্ত্রণার তীব্রতা অনুমান করতে পারছি। যন্ত্রণার অংশীদার হওয়া যায় না। আনন্দ হয়তো ভাগ করে নেওয়া যায়। কষ্ট মানুষকে একাই ভোগ করতে হয়।

ঘরে আমিও ঢুকলুম, একজন সিস্টারও ঢুকলেন। খুবই কম বয়েস। ধড়াচূড়া খুলে ফেললে মনে হতে পারে আমার বোন। মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের আবরণ। আমার হাত থেকে জিনিসপত্র একে একে বুঝে নিলেন। তোয়ালে, সাবান, কাপড়, ঢোলা জামা। চা আনতে বলেছিলেন, এক প্যাকেট ভাল চা। চিনির কিউব। কাপ ডিশ, চামচে, গেলাস, কেটলি, ছাঁকনি। ঝোলা থেকে একের পর এক জিনিস বেরুচ্ছে। যতটা সম্ভব বাড়ির পরিবেশে রাখার চেষ্টা। সে কি আর সম্ভব হবে? হাসপাতালও এক কারাগার, অসুখের কারাগার।

কেবিনের বাইরে উঁকি মেরে সিস্টার কাকে যেন ডাকলেন, সুখী, সুখী।

সাধারণ শাড়ি পরা এক মহিলা টুল থেকে উঠে এলেন। সিস্টার বললেন, প্রায় সবকিছুই এসে গেছে। বুঝে নাও। এঁর যখন যা দরকার হয়, কান খাড়া রাখবে, উঠে এসে দেবে। বসে বসে ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন।

সিস্টার নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। হাইহিল জুতোর খুটখুট শব্দ চওড়া করিডরে দূর থেকে দূরে হারিয়ে গেল। মিষ্টি চেহারার শ্যামবর্ণা সুখী আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে টুলে গিয়ে বসল। সাদা ডোমে ঢাকা একটা ভুতুড়ে আলো দরজার সামনে কুয়াশার আঁচল পেতেছে।

পিতা ডাকলেন, এদিকে এসো।

কণ্ঠস্বর একেবারে পালটে গেছে। পুরনো টিন দিয়ে রেকর্ড বাজালে যেরকম হয়, সেইরকম খসখসে।

আপনার গলাটা এইরকম হয়ে গেল কেন?

ভোকাল কর্ড বেশ খানিকটা অ্যাসিড সোক করে ফেলেছে। ভেতরের মিউকাস মেমব্রেন অ্যাফেক্টেড। কথা বলতে গেলে বেশ লাগছে।

খুব কষ্ট হচ্ছে?

তা তো একটু হবেই। সহ্য করতে হবে। উপায় নেই। একে কী বলে জানো, পিউরিফিকেশন অফ সোল। সুখে থাকলে মানুষ দেহযন্ত্রকে ভুলে যায়। এই যন্ত্রণায় আমি সব অনুভব করতে পারছি, হার্ট, লাংস, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, স্কিন, কিউটিস। চামড়ার আচ্ছাদনে একগাদা সেনসিটিভ যন্ত্রপাতি। হোয়্যার ইজ দি সোল? কোথায় সেই আত্মপুরুষ!

আমারও খুব জানার ইচ্ছে। হয়তো তিনি জানতে পেরেছেন। অসীম আগ্রহে বললুম, কোথায়?

নীচের দিকে নেই। হি মাস্ট বি সামহোয়্যার অ্যাট দি টপ। হি স্পিকস। আমারই কণ্ঠস্বর ধার করে তাঁর প্রশ্ন, তাঁর উত্তর। দেহবিদ খুঁজে পাবে না। খাঁচা খুললেই পাখি ঠিক উড়ে যায়। না, আর কথা বলব না। বেশ কষ্ট হচ্ছে। লেট মি সাফার অ্যালোন ইন সাইলেন্স।

হঠাৎ এমন দুর্ঘটনা ঘটল কেন? আপনি বলেছিলেন, অন্যায় আর পাপের পাথরে ধাক্কা না খেলে, জীবন তরতর করে স্রোতের টানে এগিয়ে যায়।

হ্যাঁ তা ঠিক। পাপের সূক্ষ্ম কাঁটা বড় সেনসিটিভ, চিন্তাতেও নড়ে ওঠে। আমি তো দেবতা নই, আমিও মানুষ। আমার লোভ আছে, লালসা আছে, হিংসা আছে, অন্যের অনিষ্ট চিন্তা আছে, কত কী আছে! মাছের আঁশটে গন্ধ আতরে ধুলেও কি যায় রে বাবা! অরক্ষিত মন পথের পাশে দরজা খোলা ঘরের মতো। কখন কে ঢুকছে, কে বেরোচ্ছে। অবারিত ব্যাপার। কতবার ধাক্কা খেতে খেতে, সাজা পেতে পেতে তবে মানুষ একটু মানুষ হয়।

আজ আমি এখানেই থাকি।

না না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। শুধু শুধু তুমি কেন কষ্ট করবে? আমি এখন প্রোফেশনালদের হাতে। তাঁরাই হ্যাঁন্ডেল করবেন। তা ছাড়া যন্ত্রণা নির্জনে সাফার করতেই ভাল লাগে। তোমার ওপর একজন বৃদ্ধ মানুষের দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর ব্যাপার আরও সিরিয়াস।

আপনাকে একা ছেড়ে যেতে ভীষণ খারাপ লাগছে। বাড়ি একেবারে খাঁখাঁ করছে। একা আমি থাকব কী করে? আপনার বিছানা শূন্য পড়ে থাকবে। ঘরে রাতের টেবিল ল্যাম্প জ্বলবে না। খাবার আসন পড়বে না।

উপায় নেই, বাবা। পৃথিবীটাই এইরকম। কেউ হাসপাতালে যায়, কেউ বাড়ি যায়, কেউ মারা যায়, কেউ সেজেগুজে বিবাহ করতে যায়। কেউ জেলে যায়, কেউ বিদেশে যায়। কেউ মন্দিরে যায়, কেউ যায় নাচঘরে। সবই যাওয়া। যার তেমন গতি। রাত হচ্ছে। তুমি এবার এসো। বাড়িতে তোমার ভূমিকা এখন আমার ভূমিকা। আমার অনুপস্থিতি তুমি একটু ফিল করো। আজ যা সাময়িক কাল তা চিরকালের। মন খারাপের কিছু নেই। পুরুষ হও। পৌরুষ আনো। আবার কাল। যে-জায়গাটা পুড়েছে, সে জায়গাটা বড় ভাল হে। হৃৎপদ্মে আগুন জ্বলছে। আচ্ছা, গুড নাইট।

হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে কলুটোলা পেরিয়ে প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো চিৎপুরে চলে এলুম। মানুষ যে-সময় কাছে স্ত্রীকে পেতে চান, সে সময় সন্তান কিছু করতে পারে না। পিতার পাশে এখন আমার মাতার থাকা উচিত ছিল। সন্তান রক্তের অংশ হতে পারে, স্ত্রী হলেন মনের অংশ। আরও কাছের। দুঃখের, সুখের, দেহের। কী জানি, কী হয়!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। নাখোদা মসজিদের মিনে-করা মিনার সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। সামনেই বিশাল প্রবেশপথ। হঠাৎ মনে হল আমি এক জাতিস্মর। বহুকাল আগে আমি এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতুম। হয়তো রাজা নবকৃষ্ণের আমলে, ভোলা ময়রার কালে। আমার একটা জুড়িগাড়ি ছিল। শ'খানেক বছর আগের আমিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। চিকনের পাঞ্জাবি, জরির নাগরা, কানে

আতর। অনেক রাত। পিরু মিঞার দোকানে ফিনফিনে রুমালি রুটি উড়ছে। কাবারের গন্ধ ছুটছে। নিকি বাই ঘুরে ঘুরে ঘুঙুর পায়ে নাচছে।

অন্ধ একটি মানুষ সামনে হাত পেতে, লাঠি ঠুকঠুক করে চলেছে। মুখে হাঁকছে, আল্লা দেনেঅলা, আল্লা দেনেঅলা। হঠাৎ ভীষণ দাতা হবার ইচ্ছে হল। পুরো একটি টাকা হাতে ফেলে দিলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢক করে একটা শব্দ হল। পেছনেই জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের বিখ্যাত মাংসর দোকান। বৃহৎ একটি খাসির পেছনের ঠ্যাংটি অস্ত্রের আঘাতে নেমে এল। ত্রিপদ মৃত পশু ঘিনঘিনে চর্বির আস্তরণ নিয়ে পেন্ডুলামের মত দুলতে লাগল। বলছে, লোভ, লালসা, লালসা, লোভ। উলটো দিকের একটা দোকানে আজও শিককাবাব হচ্ছে, যেমন হত একশো বছর আগে। কেন যে পা আমাকে আজ এদিকে চালিয়ে নিয়ে এল।

আরে কে রে, পিন্টু না?

প্রশ্ন এবং মানুষ দুটোই যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে সুখেন আর জবা। সুখেনের হাতে নতুন একটা চামড়ার সুটকেস। চেহারা ভালই ছিল। আরও ভাল হয়েছে। জবার চেহারাতেও চেকনাই এসেছে। দেখলেই বোঝা যায় মা হতে চলেছে।

জবা বললে, আপনি এখানে কী করছেন? কারুর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন?

দু'জনকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভীষণ আনন্দ হল। কী সুন্দর মানিয়েছে! জবা ফিকে লাল রঙের একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে। আগেকার সেই চঞ্চল স্বভাব আর নেই। বললুম, না, কারুর জন্যেই দাঁড়িয়ে নেই। বাড়ি ফিরছি।

সুখেন বললে, এ পথে কেন?

এসেছিলুম মেডিকেল কলেজে। কী মনে হল, হাঁটতে হাঁটতে এলুম এদিকে।

হাসপাতালে আবার কী হল?

সুখেনকে সংক্ষেপে সব বললুম। জবা বললে, আপনার তা হলে খুব বিপদ যাচ্ছে।

সুখেন বললে, তোর খুব তাড়া আছে?

তাড়া মানে, যত তাড়াতাড়ি ফেরা যায় ততই ভাল। তোরা কবে এলি, কোথায় আছিস?

তিন দিনের জন্যে এসেছি। উঠেছি বালিগঞ্জে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে। চল না, ওই রয়ালে গিয়ে একটু বসি। জবার ভীষণ চাঁপ খাবার ইচ্ছে। জানিস তো এইসময় মেয়েদের নানারকম খাবার ইচ্ছে হয়।

জবা সুখেনের সুটকেস ধরা ডান হাতটা আদর করে খামচে দিল। রাস্তার দিকে মুখ নিচু করে বললে, অসভ্য!

আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে, বিশাল সুটকেস হাতে নিয়ে সুখেন এগিয়ে চলল রয়ালের দিকে। বউকে আজ চাঁপ খাওয়াবেই রুমালি রুটি দিয়ে। জবা আমার পাশে পাশে ধীরে ধীরে হাঁটছে। শরীরের আয়তন বেড়েছে। আইবুড়ো বেলায় জবার একটা রিপু খুব প্রবল ছিল। সুখেনের হাতে পড়ে ভালই হয়েছে। মা হলে মনটা ঘুরে যাবে। ট্রামলাইন পার হবার সময় আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। চারপাশে লোকজন, যানবাহন, বেচারার ভয় করছে। হাতের তালু বেশ গরম। রক্ত এখনও শীতল হয়নি।

রয়ালের বাইরে বিশাল একটা উনুন। কাঠকয়লার আগুনের ওপর বিশাল এক কানা-উঁচু পাত্রে ঘি আর মশলায় জরোজরো নিখুঁত সব মাংসের টুকরো। মৃদু আঁচে পুটপুট করে ফুটছে মানুষের রসনার সুখখণ্ড। আতরের ভুরভুরে গন্ধ। সুখেনের পেছন পেছন সিঁড়ির ধাপ ভাঙছে জবা। সিল্কের আবরণে শরীর টানটান। জবার দেহ সবসময়েই যেন গলা ছেড়ে চিৎকার করছে, আমাকে দেখো, আমাকে দেখো। অপর্ণার সঙ্গে কনকের সঙ্গে এই তফাত। মুকুর সঙ্গে কিছুটা মেলে। আমার মনে হয় মনের আকারের সঙ্গে মানুষের দেহের মিল থেকে যায়। মন অনুসারে দেহ সূক্ষ্ম হয়, স্থূল হয়।

ধপ করে টেবিলে একটা মেনু ফেলে দিয়ে গেল। এপাশে ওপাশে যাঁরা আহারে বসেছেন, সকলেরই চেহারা যেন কেমন কেমন। পাশবিক মানুষ দেখলেই যেন চেনা যায়। মাংস, মদ, মেয়েছেলে, সব নিয়ে একটা হাঁসফাঁস অবস্থা। দাঁতে মাংস ছিঁড়ছে। গজর গজর বকছে। হ্যা হ্যা করে হাসছে। গলগল ঘামছে। ঢুকে পড়ে বিপদ করেছি। ভেতরটা পালাই পালাই করছে।

জবা মেনু থেকে চোখ তুলে বললে, সবকিছুর বড্ড দাম যে গো! কী করবে?

সুখেন আর আমি পাশাপাশি। জবা আমাদের উলটো দিকে। টেবিলে দু'কনুইয়ের ভর রেখে সামনে ঝুঁকে আছে। এতক্ষণ লক্ষ করিনি, হাতে লাল সুতো দিয়ে একটা মাদুলি পরেছে। ব্লাউজের হাতা ফুঁড়ে লাল সুতোর ছোট্ট একটি অংশ বেরিয়ে এসে দোল খাচ্ছে। তেল চুকচুকে কপালে দিগন্তে লাল সূর্যের মতো গোল একটা সিঁদুরের টিপ।

সুখেন অসহায়ের মতো বললে, কী করবে তা হলে, অন্য কোথাও যাবে?

সুখেন বউয়ের হাতে নিজেকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ে বসে আছে। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। আমি বললুম, আপনি দামের জন্যে ভাবছেন কেন? যা প্রাণ চায় খেয়ে যান। আজ আমি আপনাদের খাওয়াব।

সুখেন বললে, তুই আপনি বলছিস কী রে?

তাতে কী হয়েছে! আমি চট করে কাউকে তুমি বলতে পারি না। নিন খাবার সিলেক্ট করে অর্ডার দিন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তুই খাওয়াবি? চাকরি পেয়েছিস?

হ্যাঁ রে।

সুখেন বললে, তবে আর কী? চালাও চাঁপ, চালাও তন্দুর।

পরের পয়সায় খেতে তোমার লজ্জা করবে না!

না, বন্ধুর পয়সায় আবার লজ্জা কীসের! তুমি জানো, আমার সব প্রেমপত্তর পিন্টু লিখে দিত? কী ল্যাঙ্গোয়েজ! তুমি অমনি কৃষ্ণের-বাঁশি-শোনা রাধিকার মতো নেচে নেচে চলে এলে।

ও যে তোমার ভাষা নয়, তোমার লেখা নয় আমি জানতুম।

অর্ডার নিয়ে দোকানের কর্মচারী গম্ভীর মুখে চলে গেল। আমরা সামান্য পাতি খদ্দের। টেবিলে টেবিলে খাবার ব্যভিচার চলেছে। ঝাঁক ঝাঁক পায়রার মতো ফড়ফড় করে নোট উড়ছে।

জবা বললে, এবার তা হলে একটা বিয়ে করে ফেলুন। না, করে ফেলেছেন?

না, করিনি।

সেই মেয়েটি এখনও আছে? খুব সুন্দরী।

না, তারা চলে গেছে।

সেই শাড়িটার খোঁজ করেনি?

শাড়ি! কোন শাড়ি?

পাঁচিল টপকে এসে, আপনার হাত থেকে যে-শাড়িটা নিয়ে পরে আমি চম্পট দিয়েছিলুম। মনে পড়ছে?

ও হ্যাঁ, না সেটার খোঁজ পড়েনি।

শাড়িটা আর নেই জানেন! চুরি হয়ে গেছে। আমাদের ওখানে যে কী চুরি হয়!

আমাদের নাকের পাশ দিয়ে খাবার এসে টেবিলে নামল। দারুণ মোগলাই গন্ধ বেরোল। জিবে আধপোয়া জল। খাবারের প্লেট টানতে গিয়ে হাত যেন অবশ হয়ে এল। এ আমি কী করছি! পিতা হাসপাতালে, মাতামহ অসুস্থ। আমার সামনে মোগলাই খানা। তার সামনে পরস্ত্রী। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছি। এর চেয়ে স্বার্থপরতা আর কী হতে পারে? এখন আর উপায় নেই। নাচতে এসে ঘোমটা টানা চলে না।

আপনি আমার থেকে একটু মাংস আর ঝোল নিন।

বাটি-ধরা হাত জবার দিকে এগিয়ে গেল। সে না না, এ কী করছেন, এ কী করছেন, বলে দু'হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। শূন্যে চারটি হাত আর পোর্সিলিনের বাটি ঝুলে রইল।

হাত ছাড়ুন, আপনার শাড়িতে পড়ে যাবে। আমি এতটা খেতে পারব না।

সুখেন বললে, দিচ্ছে যখন নিয়ে নাও। অনেকক্ষণ থেকে বলছিলে খিদে পেয়েছে।

তা বলে মরব নাকি!

মরবে কেন? তুমি তো এখন দু'জন।

জবা হাত ছেড়ে লজ্জায় মুখ নিচু করল। একটা তন্দুর, একটা ঝোল, এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নিঃশব্দে আহার পর্ব চলেছে। জবা মাঝে মাঝে হুসহাস করছে একটু-আধটু। গর্ভবতী রমণীর আহারের একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। রয়াল রেঁধেছেও খাসা। যে-দেহে নতুন একটি প্রাণ আসছে, সেই দেহের জিভ এমন জিনিসই পছন্দ করবে। সামান্য ঝাল লেগেছে। চোখমুখ কেমন যেন বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। মৃদু মৃদু হাসছে। অন্যকে খাওয়ানোর এত যে তৃপ্তি, আগে কখনও বুঝিনি। তৃপ্তি মানুষের মুখকে দেবীর মুখের মতো করে তোলে। কী থেকে মানুষের মনে কী ভাব এসে যায়! হঠাৎ মনে হল, আমি যখন গর্ভে ছিলুম আমার মা-ও হয়তো এইভাবে সাধ খেয়েছিলেন। এমনি আগ্রহ নিয়ে, লাল একটি শাড়ি পরে। আজ আর আমার সে দৃষ্টি নেই, যে-দৃষ্টিতে ছাদের ফুলগাছের টবের আড়ালে থেকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতুম। অনেকদিন আগে। গা তখন শিরশির করে উঠত। মনে কুভাব আসত। মনটা বড় উৎফুল্ল হয়ে উঠল, এতদিনে, এতদিনে তা হলে মহিলাকে মা ভাবতে পেরেছি।

বিলের টাকা দেবার জন্যে সুখেন লাফিয়ে উঠল। খবরদার! আমি দোব বলেছি। সত্যভঙ্গ হবে।

খামচাখামচি করে সুখেনকে নিরস্ত করলুম। ঠাকুর বলে গেছেন, বিষয়ীর পয়সার খাবার মুখে তুলতে নেই। অন্তরপুরুষ সংকীর্ণ হয়ে যাবে। জবা বললে, আঃ, এরপর একটা পান খেতে পারলে যেন ষোলোকলা পূর্ণ হত।

পান? পান খাবে, বলে সুখেন ঢাউস সুটকেস হাতে পানের দোকানের দিকে ছুটল। চারপাশে ভীষণ ভীষণ চেহারার মানুষের আনাগোনা। জবা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ছোট্ট লেডিজ রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুচছে। সেন্টের গন্ধ উড়ছে।

জবা বললে, ভাল মেয়ে আছে, বিয়ে করবেন? আমাদের ওখানে। দেখতে শুনতে ভাল। গান জানে, নাচ জানে। বাপের একমাত্র মেয়ে। ভাল দেবেথোবে। আপনার সঙ্গে বেশ মানাবে। ছিপছিপে চেহারা।

আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

তাই নাকি! খবরটা এতক্ষণ চেপে রাখা হয়েছিল! আমাদের নেমন্তন্ন করবেন তো?

যদি হয় নিশ্চয় করব।

আবার যদি কেন? সামনের মাঘেই লাগিয়ে দিন। ও তখন তো আবার...।

জবা চোখ নামাল, নাঃ আমার আসা হবে না।

সুখেন এসে গেল, তুই পান খাবি?

আমি খাই না।

এঃ একটা তা হলে বেশি হয়ে গেল।

জবা বললে, আমাকে দাও। রুমালে মুড়ে রাখি। কাল খাওয়া যাবে। কী দাম নিলে গো?

কুড়ি পয়সা এক খিলি।

বলো কী? তোমায় নতুন লোক দেখে ঠকিয়েছে।

না না, ঠকাবে কেন? মঘাই পান।

রাখো তোমার মঘাই। যা হয় একটা বললেই হল। এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল।

না গো, দেখছ না কেমন সাদা সাদা। বরফে শোয়ানো ছিল।

তোমার কলকাতা এক গলাকাটার জায়গা।

সুখেন ট্যাক্সি ধরতে ছুটছিল। জবা হাঁ হাঁ করে উঠল, ট্রামে চলো, ট্রামে। অত বড়লোকি চাল ভাল নয়। ঢাউস সুটকেস আর একটা লাল বউ নিয়ে সুখেন ট্রামে উঠে পড়ল। যাবার সময় বলে গেল, একবার আমাদের ওখানে আয় না।

সুখেনের কী অদ্ভুত পরিবর্তন! ভেড়ার মতো হয়ে গেছে। ঠাকুরের কথা মনে পড়ছে, সংসারী লোকগুলো তিনজনের দাস, তাদের কি পদার্থ থাকে? মেগের দাস, টাকার দাস, মনিবের দাস।

In the great crisis of life when existence itself is threatened the soul attains transcendent powers.

মানুষের জীবনে ভাল আর খারাপ একই সঙ্গে আসে। কালো আর আলো। আকাশে যখন মেঘের খেলা তখন বিশাল প্রান্তরে আলোছায়ার অদ্ভুত খেলা চলে। ছায়ার পেছন পেছন তাড়া করে আসে আলো। আলোর পেছন পেছন ছুটে চলে ছায়া।

লেটারবক্সে পাশাপাশি দুটি চিঠি শুয়ে ছিল। কবে এসেছিল কে জানে! রোজ লেটারবক্স দেখার অভ্যাস এ বাড়ির কারুরই নেই। চিঠি লেখাতেও আলস্য, চিঠি দেখাতেও আলস্য। চিঠি আদানপ্রদানের পরিসরও খুব কম। আমাদের আত্মীয়স্বজনেরা কে যে কোথায় আছেন আজও জানা হল না। আমাদের বংশের ডালপালা মনে হয় খুবই কম। নেই বললেই চলে? শাখাপত্রশূন্য একটি বৃক্ষকাণ্ড, একটি মাত্র লিকলিকে ডাল মেলে ঊষর প্রান্তরে এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে।

চিঠি দুটির একটি খাম, আর একটি পোস্টকার্ড। দুটিই আমার নামে। আমার সেই মানুষ নামক জ্ঞানগর্ভ, এখান থেকে ওখান থেকে মারা প্রবন্ধটি একটি নামকরা মাসিকপত্রে পাঠিয়েছিলুম। পত্রিকাটি বৃহৎ একটি ধর্মীয় সংস্থার। সন্ন্যাসী সম্পাদক লিখছেন,

মান্যবরেষু,

আপনার প্রবন্ধটি মনোনীত হয়েছে? দু'-একটি জায়গা কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট থাকায় আপনাকে দেখা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যে-কোনও দিন সকাল এগারোটার মধ্যে অথবা বিকেলে তিনটে থেকে ছ'টার মধ্যে দেখা করা যেতে পারে। ইতি সম্পাদক, নির্মলানন্দ।

সংক্ষিপ্ত চিঠি; কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। পৃথিবী যে ঘুরছে এই প্রথম টের পেলুম। নিজের ভেতর নিজে লাফাচ্ছে। চারপাশ থেকে স্বপ্ন ঘিরে আসছে। সাংঘাতিক সেই প্রবন্ধ অবশেষে ছাপা হবে। জ্বলজ্বল করে উঠবে আমার নাম। নিজের হাতে নিজেই একবার হাত বুলোলুম। পাঁচটা আঙুল, একটা মাথা, সমবেত হয়ে পাতার পর পাতা অক্ষর সাজিয়েছে। ছত্রে ছত্রে মানুষ নামক জন্তুর শ্রাদ্ধ। ভাব এসে গেল। চোখ ছলছল করছে। ঠোঁটে-ধরা পাত্র যেন শেষ মুহূর্তে হড়কে না যায়! যদি না যায় তা হলে বাকি জীবন আমি হোমাপাখির মতো মহাশূন্যের ঊর্ধ্বলোকে লাট খেয়ে বেড়াব। পৃথিবীর মাস্তুলে আর পা ঠেকাব না। শেলির স্কাইলার্কের মতো দর্শনের গান গেয়ে ঊর্ধ্বে আরও ঊর্ধ্বে উঠে যাব। উপায় থাকলে আজই ছুটে যেতুম। এখনও এগারোটা বাজেনি। উপায় নেই। কাকিমা খাবার তৈরি করছেন। আজ তিনি আমার সঙ্গে হাসপাতালে

যাবেনই। বাহাদুর এসেছে। মাতামহ তাকে ঘাটশিলার বাড়ির গল্প শোনাচ্ছেন। সুবর্ণরেখার স্বপ্ন দেখছেন। তিনিও যাবার বায়না ধরেছিলেন। ছেলেমানুষের মতো ভুলিয়ে রেখেছি।

খামের চিঠিটা কার বুঝতে পারছি না। হাতের লেখা চেনাচেনা মনে হচ্ছে। খামটা সাবধানে খুলতেই মুকুর চিঠি বেরিয়ে পড়ল। দীর্ঘ দু'পাতা। মুক্তোর মতো ছোট ছোট হাতের লেখা। পুঁতির কিংখাবের মতো ঠাসবুনোনে সাজানো।

এবার বুক কাঁপল অন্যভাবে। আর কেন? আবার কেন? আর আমার সময় নেই। পথ ঘুরে গেছে। মতির গতি অন্যরকম হয়ে গেছে। পিতা সেদিন পাপের কথা বলছিলেন। চমকে উঠেছিলুম। কার পাপে কী হয়ে গেল কে জানে! পিতৃদেব সব ব্যাপারেই একটু হুড়ুম দুড়ুম করলেও সাবধানী মানুষ। সবরকমের রিফ্লেকস অটুট আছে। তবু একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কেন ঘটল? কেন কাল রাতে বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখলুম? গরদের শাড়ি পরে মা এসেছেন, মাথার সামনে। ভোরের ফিকে আলোয় চারপাশ গোলাপি। আমি যেন শুয়ে আছি আমাদের ভোলা ছাদে। আমি শুয়ে শুয়ে মাথার দিকে তাকিয়ে বললুম, মা, তুমি? মা ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখলেন। মুখে ফুটে উঠল সেই বিখ্যাত হাসি। যে-হাসিতে গালে টোল পড়ত। মা বললেন, খোকা, তোর বাবাকে যদি নিয়ে যাই তোর খুব অসুবিধে হবে? আমি ধড়মড় করে উঠে বসে বললুম, সে কী বলছ মা? মা বললেন, তুই তো বড় হয়েছিস। আমার যে বড় একা লাগছে! আমি ভীষণ জোরে না বলে উঠলুম। অনেকটা ধমকের সুরে। মা যেন আমার শত্রু। এত জোরে না বললুম যে ঘুম ভেঙে গেল। তখনও ভোর হয়নি। রাত তিনটে। ঘর অন্ধকার। ঘড়ি যেন অশরীরীর ভয়ে ঠকঠক করছে। মনে এমন একটা ভয় হল। পাশবালিশটাকে মা বলে আঁকড়ে ধরলুম। মনে হল জাহাজ-ভাঙা নিঃসঙ্গ নাবিক অন্ধকার আকাশের তলায় উত্তাল সমুদ্রে মোচার খোলার মতো ভেসে চলেছে। মৃত্যু সুনিশ্চিত। যতক্ষণ ভেসে থাকা যায়।

যতই দেখব না ভাবি, মুকুর চিঠির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। 'প্রিয় পলাশ'। পলাশ কারুর প্রিয় নয়। কেন অশান্তি করছ মুকু? 'তোমাকে একটা সুখবর দিই।' কার সুখবর? তোমার না আমার। আমার সব খবরই কুখবর। কবর খোঁড়ার খবর। 'আমি অনার্সে ফার্স্টক্লাস নিয়ে পাশ করেছি।' ও তাই তো! কয়েকদিন হল তোমার রেজাল্ট বেরিয়েছে। আমার নীরব অভিনন্দন গ্রহণ করো। 'এম এ পড়ার জন্যে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হব ঠিক করেছি। কই তুমি তো আমার চিঠির উত্তর দিলে না! তোমাকে লিখতে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। জানি না, তুমি আমাকে কী ভাবছ? মেয়েরা কোনও একজনের কাছে কিছু যে বলতে চায়। সেই একজন যে কে, তা কি বলা যায়? মানুষেই তো স্বপ্ন দেখে? স্বপ্নও তো বাস্তব হয়? বলো হয় না? অপর্ণাকে আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগেনি। বড় কাঁচা মেয়ে। কাঠের বন্দুকের মতো সারাজীবন কাঁধে বয়েই বেড়াতে হবে। কেন তা জানি না। সেসব কথা তোমার কাছেই গোপন রেখো। ওপর দেখে মানুষ চেনা বড় শক্ত। সম্পর্কের খাতিরে সারাজীবন আমাদের অভিনয় করে যেতে হয়। মেয়েদের অভিধানে বিদ্রোহ শব্দটি নেই। লেখাপড়া শিখে আমরা স্বামীর ঘর করতে চলে যাই। এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারে। ভারত স্বাধীন হলেও আমরা স্বাধীন নই। তুমি কি হোমচৌধুরির খোঁজ করেছিলে?'

সে আবার কী? এ যেন গোটা চারেক কিস্তি বাদ দিয়ে ধারাবাহিক উপন্যাস পড়া। কিছুই বুঝতে পারছি না। হোমচৌধুরিটা আবার কে? মুকুর রেখে যাওয়া কাগজপত্র সব গভীর কুয়োর জলে। সলিল সমাধি হয়ে

গেছে। জানার আর উপায় নেই। সব পারিবারিক গুপ্ত কথা লোপাট।

বিকট শব্দে মোটরবাইক বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। কে আসতে পারেন! ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের ইন্সপেক্টর! না কি পিতার কোনও বন্ধু? মোটরবাইক-অলা বন্ধু তো কেউ নেই। মুকুর চিঠিটা সব আর পড়া গেল না। খামে ঢুকিয়ে রাখলুম। জানলা দিয়ে উঁকি মারতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। একজন পুলিশ অফিসার বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হয়ে গেল। হাত নেড়ে নীচে ডাকলেন।

হঠাৎ পুলিশ কেন? কী আবার হল? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে মনে মনে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করলুম, না জেনে নিজেকে কোনও অপরাধে জড়িয়ে ফেলেছি কি না! একটা কথা ভেবে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল, ভদ্রলোক হাসপাতাল থেকে কোনও খারাপ সংবাদ আনেননি তো! ভাবামাত্রই ভীষণ শীত করতে লাগল।

পুলিশ অফিসার রাস্তার ওপাশ থেকে এপাশে চলে এসেছেন। একেবারে সদরের সামনে। হাতে একটা সুটকেস। রাগীরাগী চেহারার বাইকটা ওপাশে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোককে 'কী বলছেন?' বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। এই প্রথম। অনুভব করলুম, চোর আর পুলিশ দু'জনেই সমান। সামনে এসে দাঁড়ালে ভয়ে কণ্ঠরোধ হয়ে যায়।

বিশাল আকৃতির মানুষটি বেশ মিষ্টি গলায় বললেন, প্রফুল্লবাবু নামে এ বাড়িতে কেউ থাকেন?

মনে হল একটা ঘুষি খেলুম। নাকটা যেন থেবড়ে গেল। প্রথমে মনে হল বলি, না। তারপর ভাবলুম, মিথ্যে বললে জল আরও ঘোলা হয়ে যাবে! আমার তো কিছু জানার কথা নয়। আমি তো মর্গে কিছু দেখিনি। এই মুহূর্তে আমাকে অতি নিরীহ ভালমানুষের অভিনয় করতে হবে। বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, থাকেন।

তিনি এখন কোথায়?

বেশ কিছুদিন হল বাইরে গেছেন।

আপনি তার কে হন?

কেউ না। আমাদের বাড়ির নীচের তলায় তিনি থাকেন। নীচেটা খালি পড়ে ছিল।

প্রফুল্লবাবুর নিজের কেউ আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, স্ত্রী আছেন।

আমি ভেতরে আসতে পারি?

হ্যাঁ, আসুন না।

আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে চাই।

মনে হচ্ছে আমার পক্ষাঘাত হয়েছে। সারাশরীর অবশ। পা যেন চলছে না। অভিজ্ঞ চোখে আমার এই অস্বাভাবিক আচরণ ধরা না পড়ে যায়। আমি আগে আগে, জুতোর ভারী শব্দ তুলে পুলিশ অফিসার পেছন পেছন উঠছেন।

দোতলায় উঠে এলুম কোনওরকমে। ভদ্রলোকের বিশাল চেহারায় ঘরের উচ্চতা কেমন যেন খাটো হয়ে গেল। আমাকে কিছু বলতে হল না। তিনি নিজেই চেয়ার টেনে বসে বললেন, তিনি কোথায়?

যেন তর সইছে না। কত তাড়াতাড়ি একটা মানুষকে গুঁড়ো করে ফেলা যায়, সুখের ডালিমকে দু'হাতে নিংড়ে রস ঝরানো যায়। চাপরাশ পরা এই মানুষটির জগতে কর্তব্য ছাড়া আর কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

ধীরে বললুম, বসুন, ডেকে আনছি।

ভেতরের ঘরে মাতামহ এখনও বাহাদুরের সঙ্গে বকবক করছেন। টের পাননি বাইরের ঘরে শমন এসে বসেছেন। গায়ে আইনের গন্ধ। মুখে মৃত্যুর শীতল হাসি। বৃদ্ধ সোনালি সুতো দিয়ে অতীতের জামদানি বুনে চলেছেন।

রান্নাঘরে কাকিমা বসে আছেন। হাসপাতালে যাবেন, সাজগোজ সারা। সাদা শাড়ি পরেছেন। পিঠে লুটোচ্ছে আঁচল, লতাপাতার কাজ করা। চান করেছেন। গাঁট-বাঁধা ভিজে চুল কোমর ছাপিয়ে মেঝে ছুঁয়েছে। পরিষ্কার মাজা মুখে সিঁদুরের গোল টিপ চকচক করছে। ঝকঝকে টিফিন কেরিয়ারে বাটির ওপর বাটি সাজিয়ে চলেছেন। আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, বটঠাকুর যা যা ভালবাসেন সব আজ রেঁধেছি। কত কম সময়ের মধ্যে সব করে ফেললুম বলো।

সবই শুনছি, কিছু বলতে পারছি না। কাকিমা আমার চোখের সামনে ভোরের কুয়াশার মতো ক্রমশ সাদা হয়ে যাচ্ছেন। আমি অতি কষ্টে বললুম, ওসব এখন থাক। আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

বলেই মনে হল গাছের গুঁড়িতে কাঠুরিয়ার শেষ কোপ পড়ল। বিশাল একটি গাছ বনের মাথা কাঁপিয়ে চারপাশে ভীষণ এক আলোড়ন তুলে আকাশ ছোঁয়ার আনন্দ ফেলে নেমে চলেছে মৃত্তিকার মৃত্যুর দিকে।

আমাকে আবার কে ডাকবে?

বাইরের ঘরে একবার আসুন।

হাতটা কোনওরকমে ধুয়ে কাকিমা আমার পেছন পেছন আসছেন। এখনও জানেন না কে এসেছেন। দরজার কাছে এসে হাত চেপে ধরে বললেন, একী! পুলিশ! আমি তো কিছু করিনি।

অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন। কোনও ভয় নেই। পোশাক দেখে ভয় পাবেন না।

কাকিমা ঘোমটা টেনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। অফিসার বললেন, বসুন, আপনাকে দু'-একটা জিনিস দেখিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

কাকিমা চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিলুম। অফিসার বললেন, আপনিও আসুন। তা হলে একটু সাহস পাবেন ইনি।

অফিসার দু'হাঁটুর ওপর সুটকেস রেখে ডালা খুলে ফেললেন। খুলতে খুলতে বললেন, আপনার স্বামীর নাম প্রফুল্লচন্দ্র দাস?

কাকিমা ঘাড় নাড়লেন।

কতদিন হল বাইরে গেছেন?

খুব মৃদু সুরে কাকিমা বললেন, অনেকদিন।

কোথায় গেছেন?

কোন এক রাজবাড়িতে তবলা বাজাতে।

জায়গার নাম মনে আছে?

না।

কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন?

না।

এতদিন বাড়ি ছাড়া, চিঠিপত্র নেই, খোঁজখবর নেই, আপনি জানার চেষ্টা করেননি তিনি কোথায় আছেন কেমন আছেন?

আমি কেবলই ভেবেছি, এই ফেরেন এই ফেরেন। আপনি কি তার কোনও খবর পেয়েছেন, কোথায় আছেন, কেমন আছেন?

উত্তেজনায় কাকিমার মাথা থেকে আঁচল খুলে পড়েছে। অফিসার বললেন, উত্তেজিত হবেন না। আমার আরও প্রশ্ন আছে।

চেয়ারের হাতল ধরে দাঁতে দাঁত চেপে কাকিমা কোনওরকমে বসে রইলেন। অফিসার সুটকেসের ডালার খাপ থেকে একটি ফটো বের করলেন, আচ্ছা দেখুন তো ইনিই কি আপনার স্বামী?

ছবি দেখে কাকিমা নীরবে ঘাড় নাড়লেন। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে খাদের দিকে নিয়ে চলেছেন। এ সেই ছবি। মর্গে শায়িত অবস্থায় তোলা। মুখ দেখে বুঝতে সামান্য সময় লেগেছিল। এইবার বুঝে ফেলেছেন। সিঙিমাছে কাঁটা মারলে মানুষ যেভাবে লাফিয়ে ওঠে, কাকিমার সারাশরীরে একটা কাঁপন বয়ে গেল। একেবারে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ‘পিন্টু এ কী হল’ বলে আঁচলে চোখ ঢাকলেন।

আমি ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠেছি। যা হবার তা তো হবেই। আর তো রোখা যাবে না। উল্কার বেগে ট্রেন ছুটে আসছে। লাইন ছেড়ে সরে যাবার আর সময় নেই। মাথা দিতেই হবে। ভদ্রলোক বোকার মতো ছবিটা কেন সবার আগে দেখাতে গেলেন! সুটকেসে আরও তো অনেক কিছু দেখাবার ছিল।

কাকিমা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, কী করে এমন হল! কোথায় তাকে রেখেছেন?

অফিসার বললেন, স্থির হন, স্থির হন। এখনও আমার অনেক প্রশ্ন আছে।

আর প্রশ্ন! অনেক প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যাবে। উত্তর আর পেতে হচ্ছে না। পাকা মানুষ, কী করে এমন কাঁচা কাজ করলেন? ভাবনার এই মুহূর্তটিতে মাতামহ ঘরে এলেন। অবাক হয়ে বললেন, একী, তোমাদের এসব কী হচ্ছে বউমা?

কাকিমা কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে মাতামহের প্রশস্ত বুকে আছড়ে পড়লেন। বাঁধ-ভাঙা কান্না শুরু হল। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

আমার দাদু।

কাকিমা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছেন। মাতামহের পায়ের কাছে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন। কিছু বুঝতে না পেরে মাতামহ বললেন, কী ব্যাপার বলো তো? হরিশঙ্কর ঠিক আছে?

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবে বউমা এমন ভেঙে পড়ল?

প্রফুল্লকাকা মারা গেছেন।

অ্যাঁ, সেকী? কোথায় মারা গেছে?

অফিসার উত্তর দিলেন, বসুন, সব বলছি। তার আগে কিছু কিছু জিনিস শনাক্ত করতে হবে। ওঁকে একবার দেখান তো, এই পাঞ্জাবিটা চিনতে পারেন কি না।

আমি বললুম, আমি পারি। পাঞ্জাবিটা প্রফুল্লবাবুর।

তবু একবার সামনে ধরুন না।

পাঞ্জাবিটার দিকে কাকিমা ফিরেও তাকালেন না। তাকাবার মতো অবস্থাও নেই। কেমন যেন হয়ে গেছেন। অফিসার একটা বিড়ির কৌটো আর লাইটার বের করে বললেন, চিনতে পারেন?

খুব পারি।

সুটকেসে আরও অনেক কিছু রয়েছে। সেসব আর বের করলেন না। যা যা বের করেছিলেন সব ঢুকিয়ে ফেললেন। বেরিয়ে এল আরও গোটা তিনেক ফটো। ছবি তিনটে সুটকেসের ওপর পাশাপাশি ফেললেন। জিজ্ঞেস করলেন, এদের মধ্যে কেউ কখনও এ বাড়িতে এসেছিল?

দু'জনকে চিনি না। তৃতীয়জনকে চিনি। সেই অষ্টাবক্র লোকটি, যে আমার ঘড়ি নিয়ে ভেগেছিল। একে চিনি বলতে গিয়েও বলা হল না। নিজেকে সামলে নিলুম। কী থেকে কী হয়ে যায়, বলা শক্ত। মনে হতে লাগল পুলিশের জাল ধীরে ধীরে আমার দিকেও এগিয়ে আসছে। এই মৃত্যুর খবর আমি যে অনেকদিন আগেই জেনেছি, অথচ বলিনি। অফিসার বললেন, কী হল, চেনেন? এসেছে কোনওদিন?

না।

ওঁকে একবার দেখান।

কাকিমা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন, আমি যাব। শেষ দেখা একবার দেখব।

অফিসার বললেন, কোথায় যাবেন? সব শেষ হয়ে গেছে। সে কি আজকের কথা! অনেক আগেই আপনাদের খোঁজখবর করা উচিত ছিল। মর্গে আনক্লেমড় ডেডবডি কতদিন পড়ে থাকবে?

মাতামহ বললেন, আপনাদের খোঁজ করা উচিত ছিল।

খোঁজখবর করতে করতেই তো এসেছি।

তাতে আমাদের কী লাভ হল?

আপনাদের না হোক, আমাদের হল। কেসটা এখন সাজানো যাবে। তিনটেকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। খুনের উদ্দেশ্যটা তেমন ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। সব খুনেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে, হয় নারী, না হয় টাকা, বিষয়সম্পত্তি। দেখা যাক কী করা যায়। ভদ্রমহিলাকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন। দিন সাতেকের মধ্যেই কোর্টে ডাক পড়বে, তখন এইসব আর একবার শনাক্ত করতে হবে।

মাতামহ জিজ্ঞেস করলেন, ডেডবডি আপনারা পুড়িয়ে ফেলেছেন?

ভদ্রলোক সুটকেস হাতে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, ডিসপোজড অফ। আচ্ছা আজ চলি, প্রয়োজন হলে আবার আসব।

বাতাসে শব্দের ঘুসি মারতে মারতে মোটরবাইক দূর থেকে দূরে চলে গেল। ঘরের মাঝখানে কাকিমা উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে। আজ বড় পবিত্র সাজে সেজেছিলেন। সব চুরমার হয়ে গেল। মোটরবাইকের শব্দটা যেন বুক থেকে উঠে দূরে মিলিয়ে গেল। মাতামহ চেয়ারে স্তম্ভিত। হঠাৎ নুয়ে-থাকা বাঁশের মতো ছিটকে উঠলেন। সোজা দাঁড়িয়ে হাহা করে হাসতে লাগলেন। ভয় হল, পাগল হয়ে গেলেন না তো! হাসি থেমে গেল। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, সবই বেটির খেলা, সবই বেটির খেলা। অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। সুখের সংসার জ্বলেপুড়ে যায়।

কাকিমা বাহাদুরের পাশ দিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে ছুটলেন। মাতামহ বললেন, এবার তা হলে কী হবে! এমন সুন্দর মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল। তুমি একবার দেখো, কী করতে কী করে ফেলে!

শোবার ঘরের আয়নার সামনে কাকিমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের মুখোমুখি। সধবার সামনে বিধবা। প্রতিবিম্বের পাশে রাহুগ্রাসের মতো আমার মুখের কিছু অংশ ভাসছে। কাকিমা আঁচল দিয়ে কপালের টিপটা ঘষে তুলে ফেললেন। সিঁথির সিঁদুর তুলে ফেললেন ঘষে ঘষে। সেদিন দোরে ফেরিঅলা ডেকে শাঁখা পরেছিলেন। শাঁখাজোড়া নিজেই ভেঙে ফেললেন মটমট করে।

আমি সবই দেখছি। কিছু করার নেই। হঠাৎ আয়নার দিক থেকে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বটঠাকুর না খেয়ে আছেন।

আচমকা আমি আবার একটা ধাক্কা খেলুম। মহিলা বলেন কী? এত মনের জোর! ইনি কি তা হলে সাধিকা? মায়া, মোহ, সংস্কার সবকিছু জয় করে বসে আছেন! চিনতে ভুল হয়েছিল। আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনি বলছেন কী?

চোখের জল এখনও ভাল করে শুকোয়নি। ঠোঁটদুটো এখনও আবেগে কাঁপছে। পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন ধীর পায়ে। এতই কর্তব্যবোধ যে এত বড় একটা শোক মিলিয়ে গেল, চাপা পড়ে গেল।

নিচু হয়ে টিফিন কেরিয়ার হাতে তুলে নিলেন। খরখরে সিমেন্টের মেঝেতে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল। দূরে চটকলের ভোঁ বেজে উঠল। অদ্ভুত তার বুকখালি করা স্বর। পৃথিবীর সমস্ত মৃত্যুর জন্যে সমবেত এক আক্ষেপ বাঁশি হয়ে কেঁপে কেঁপে বাজছে। ঠাকুর বলতেন, সানাইয়ের সুরে সাধকের সমাধি হয়। এই বাঁশি শুনলে কী বলতেন!

হাতে টিফিন কেরিয়ার। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত চেহারা। কাকিমা আমার সামনে। চাপা গলায় বললেন, চলো।

আপনি যাবেন কী করে? এই অবস্থায়।

ভাল করে কথা বলতে পারছি না। এই প্রথম অনুভব করলুম মন এক। আমার মন, তোমার মন, অহংবোধে খণ্ড খণ্ড। আসলে মন একটাই, বৃহৎ মন। তা না হলে আমার মনে হবে কেন আমিও বিধবা হয়েছি! এই মহিলার শূন্যতা আমার মধ্যেও এসে গেছে।

কাকিমা নিজের মুঠোয় আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আর দেরি কোরো না। যাঁর কাছে গেলে আমি শান্তি পাব তাঁর কাছে আমাকে যেতেই হবে।

মহিলাদের মন বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। শুনেছি ঈশ্বরও জানেন না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাতামহ উঁকি মেরে মেরে দেখছেন। মাতামহ জগৎমাতাকে চেনেন, সাধারণ রমণীর ব্যাপারে তিনি বড়ই অজ্ঞ। কতকাল হয়ে গেল মাতামহী চলে গেছেন। তারপর থেকে তো একেবারেই নাঙ্গাবাবা। স্ত্রীবিয়োগে স্বামীর অবস্থা স্মৃতিতে গাঁথা থাকলেও থাকতে পারে, স্বামীবিয়োগে স্ত্রীর অবস্থা জানবেন কী করে! মঞ্চভীত অভিনেতার মতো উইংসের পাশ থেকে উঁকি মারছেন।

ওঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় ছেলেমানুষের মতো ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চললে তোমরা?

হাসপাতালে।

বউমাও!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তবু আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। কী তোমাদের বিচার! হরিশঙ্কর কি শুধু তোমাদেরই? আমার কেউ নয়।

আর একটু সুস্থ হলেই আপনাকে নিয়ে যাব।

আর কত সুস্থ হব বলতে পারো? আমার বয়েসের মানুষ আর কত সুস্থ হবে? তোমরা মানুষের বয়েসটা ভুলে যাও।

কাকিমা গড়গড় করে কলের পুতুলের মতো কোনও দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চলেছেন, সোজা সিঁড়ির দিকে। আর বেশি কথা বাড়াবার সময় নেই। ঠাস বাঁধাকপির মতো এতকালের অবস্থা হঠাৎ শুকনো ফুলের মতো ঝরতে শুরু করেছে। সবকিছু সামাল দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আর লাভ নেই। সময়ের চলন সহজে বোঝা যায় না। আজ যেন বুঝছি। মুহূর্ত নিমেষে মিনিটের সাঁকো পার হয়ে ঘণ্টার দিকে তরতর করে ছুটে চলেছে। কী দুর্বার তার গতি! একটা জিনিস এতকাল চাপা ছিল, হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ট্যাক্সি চলেছে। পেছনের আসনে দু'জনের মাঝখানে টিফিন কেরিয়ার। এখনও গরম। কনুই লাগলে ছ্যাঁক করে উঠছে। দাঁতে দাঁত চেপে কাকিমা বসে আছেন। কোথায় গেল আনন্দ, কোথায় সেই বেশভূষা! সময় কী আশ্চর্য জিনিস! মুহূর্তের চৌকাঠ ডিঙোলে কে যে কোথায় গিয়ে পড়বে জানা নেই। একটু আগে কী ছিল, একটু পরে কী হল। কিন্তু আমি তো এতদিন এই মুহূর্তটাকে ধরে রেখেছিলুম। প্রায় সফলও হয়েছিলুম। অনেক আগেই যা হত তা হয়েছে অনেক পরে। সময়ও তা হলে চুরি করা যায়!

দূরে মেডিকেল কলেজের হলদে বাড়ি। গাড়ি তো ঢুকছে। ভাবছি এবার কী হয়!

মনে করি এইখানে শেষ
কোথা বা হয় শেষ।
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ॥

হাসপাতালের লোহার খাটে পিতৃদেব বাবু হয়ে বসে আছেন। গায়ে একটি সিল্কের চাদর। জামা পরার উপায় নেই। পইতে গোল করে গলায় ঝুলিয়ে রেখেছেন বৈষ্ণবের কণ্ঠির মতো। কোলের ওপর হলুদ মলাটের একটি বই খোলা। দেখলেই চেনা যায়, শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ। সেদিন বলছিলেন, ধর্মজগতে এইরকম একটি ক্যানডিড ডায়েরি আর দ্বিতীয় নেই। মানুষকে মানুষ বলে মেনে নিয়ে ধর্মের পথে এগিয়ে যাবার এমন শিক্ষা আর কোনও গ্রন্থে আছে কি না জানা নেই। খুঁজে দেখতে হবে। কোনও লুকোচুরি নেই, ওপরচালাকি নেই। পড়তে পড়তে সেই কথাই আর একবার মনে হবে, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। কেউ মোড়কে মুড়ে দেবত্ব তোমার খোলে পুরে দিয়ে যাবে না। ভেতরটাকে আগে খালি করো, ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করো। এই আমির মৃত্যু হলে তবেই সেই আমি এসে ধরা দেবে। সহসা একদা আপনা হইতে/ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে। গোস্বামীজি যদি আজ থাকতেন, ব্রহ্মচারীজি যদি থাকতেন, সামনে গিয়ে একবার দাঁড়াতুম। গুরু একদিনে যা পারেন একা তা করতে কয়েক জীবন লাগে। দুর্ভাগ্য আমার এই ধর্মভূমি আজ শূন্য।

ঘরে ঢোকার আগে কাকিমা ফিসফিস করে বললেন, খাবার আগে কোনও কিছু বোলো না যেন! অসুস্থ মানুষ, একবার মাত্র আহার করেন। সব পণ্ড হয়ে যাবে। আমার যা হবার তা তো হয়েইছে।

অবাক হয়ে মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আমি সন্তান হয়ে এই নিঃসঙ্গ মানুষটির জন্যে কখনও এভাবে ভাবিনি। ইনি কি তা হলে দেবী! আমার চিনতে ভুল হয়েছিল।

গ্রন্থে বড় তন্ময় হয়ে আছেন। মুখে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি একটা ঋষি-ঋষি ভাব এনেছে। পেছনে ছবির ফ্রেমের মতো জানলায় শরতের নীল আকাশ। মেঘের পেঁজা তুলো ভাসছে। সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চোখ তুলে তাকালেন। চোখে অদ্ভুত এক সুদূরের দৃষ্টি। বেশ বোঝা যায় বহু দূরে চলে গেছেন। আমার অত্যন্ত ঈর্ষা হয়। অন্তরের হোমাগ্নি ধীরে ধীরে আমার চেয়ে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এত কাণ্ড করে আগে শুরু করেও আমি হেরে যাচ্ছি।

বই মুছতে মুড়তে পিতা বললেন, একী, তোমরা এরই মধ্যে এসে গেছ!

এরই মধ্যে কী, আজ একটু দেরিই হয়ে গেছে।

বউঠান, তুমিও আজ এসেছ! আজকের দিনটা বড় ভাল। আকাশের দিকে একবার তাকাও। মা আসছেন।

ভেবেছিলুম উত্তর দিতে গিয়ে কাকিমা হয়তো ভেঙে পড়বেন। অদ্ভুত সংযম। নিজেকে ঠিক ধরে রাখলেন। মৃদু হেসে বললেন, পৃথিবী উলটে গেলেও আজ আমি আসতুম। কেউ আটকাতে পারত না।

সত্যিই তাই। ওঁর পৃথিবী তো উলটেই গেছে। পিতৃদেব পা নামিয়ে চটি খুঁজতে খুঁজতে বললেন, একদিকে আমি বড় ভাগ্যবান। তোমাদের অযাচিত স্নেহ ভালবাসায় দিন আমার বেশ ভালই কাটছে। আচ্ছা, প্রফুল্লর কোনও খবর পেলে?

প্রশ্ন করে তিনি হাত ধোয়ার জন্যে ঘরের কোণের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি কাকিমার মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালুম। কী উত্তর দেবেন? মিথ্যে বলবেন? কাকিমা ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখলেন। কী আশ্চর্য, আমাকেই সাবধান করছেন।

টেবিলের ওপর টিফিন কেরিয়ার রেখে ঢাকনা খুলতে খুলতে বললেন, আপনি যা যা ভালবাসেন, সবই আজ রেঁধেছি। জানি না তাড়াহুড়োয় কেমন হল।

তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে টেবিলের কাছে এসে পিতা বললেন, তুমি এ কী করেছ বউঠান? এত খাবার ক্ষমতা কি আমার আছে? তোমার যত্নে, এই ক'দিনে আমার ভুঁড়ি নেমে গেল।

চাদরটা বুক থেকে সরে গেছে। সাবধানে চাপা দিতে দিতে বললেন, কী অস্বস্তিকর হয়েছে একবার দেখেছ? ঘষা লাগলেই শিউরে উঠছে। ভগবান আর ক'দিন যে ফেলে রাখবেন!

কথা বলতে বলতে আহারে বসলেন। কাকিমা পাশে দাঁড়িয়ে বাটি সাজিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন। সরষে মাখা আস্ত একটি পার্শেমাছ ন্যাজা আর মুড়ো দু'পাশে বের করে ধনুকের মতো হয়ে আছে। কাকিমা তার ওপর ফোঁটাফোঁটা পাতিলেবুর রস ফেলছেন। কেউ জানে না, আমি জানি, এ হল চোখের জলের ফোঁটা। একই জগৎ মানুষের কাছে কীরকম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়! যিনি আহারে বসেছেন, তাঁর আকাশে ঝলমলে আলো, যিনি আহার করাচ্ছেন তাঁর আকাশ কালো। আলো আর অন্ধকারের কেমন পাশাপাশি অবস্থান।

পিতা খেতে খেতে বললেন, আজ যা বেঁধেছ বউঠান! বহুকাল এমন সুস্বাদু রান্না খাইনি। আজ তুমি চুটিয়ে রেঁধেছ। এখন মনে হচ্ছে, আমি যদি হরিশঙ্কর না হয়ে ভীমসেন হতুম, তা হলে গোগ্রাসে সব খেয়ে ফেলতুম। রান্নাও এক সাধনা, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

কাকিমা হাসার চেষ্টা করলেন। এইবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। বর্ষার প্রথম বৃষ্টির মতো দু'দানা বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টিন-মোড়া টেবিলের ওপর শব্দ করে ঝরে পড়ল। পিতা হাত ধোয়ার জন্যে আসন ছেড়ে সবে উঠতে যাচ্ছিলেন, কাকিমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, কী হল? আঘাত দিয়ে ফেললুম নাকি!

কাকিমা দাঁতে ঠোঁট চেপে ভীষণ চেষ্টা করছেন, আর যেন কান্না না আসে। পারলেন না। বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। গাল বেয়ে হুহু করে জল নামছে। চোখে আঁচল চেপে ধরেছেন। এই প্রথম লক্ষ করলুম, ফরসা গোল হাতে কবজির কাছে রক্তের ধারা নেমে শুকিয়ে গেছে। জোর করে শাখা ভেঙে ফেলার সময় অসাবধানে ফুটে গেছে।

পিতা উঠে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় দু'জনেই প্রায় সমান সমান। দু'জনেরই সুঠাম শরীর। পিতাকে আজ রাজযোগীর মতো দেখাচ্ছে। কাকিমা যেন নিরাভরণ আশ্রমবালিকা। কিছুই বুঝতে না পেরে পিতা আমার

দিকে তাকালেন, কী হল বলো তো!

আর চেপে রাখার কোনও মানে হয় না। ধীরে ধীরে বলেই ফেললুম, প্রফুল্লকাকা মারা গেছেন।

সেকী? তা কী করে হয়? ওর তো মরার বয়েস হয়নি। আমার চেয়ে অনেক ছোট। আমি এখনও বেঁচে, সে কেন মরবে এত তাড়াতাড়ি! কোথা থেকে তোমরা খবর পেলে?

একটু আগে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, সি আই ডি।

কী হয়েছিল?

খুন। মেরে ফেলেছে। পুলিশ তিনজনকে অ্যারেস্ট করেছে।

সেকী? ভদ্রলোকের ছেলে খুন হয়? ভুল কথা, মিথ্যে কথা।

কাকিমা দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে একপাশে কাত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছেন। আমাকে আবার বলতে হল, আজ্ঞে মিথ্যে নয়, ওঁর শেষ মুহূর্তে ব্যবহার করা বিভিন্ন জিনিস আমাদের দেখালেন, আর দেখালেন মৃত অবস্থায় তোলা একটা ছবি।

সে তো নিদ্রিত অবস্থাও হতে পারে!

আজ্ঞে না, ঘুমন্ত অবস্থা আর মৃত অবস্থার তফাত দেখলেই ধরা পড়ে।

পিতৃদেব কোনওরকমে হাতমুখ ধুয়ে এলেন। কী পরিহাস ভাগ্যের! একটু আগে না জেনেই বলেছিলেন, আজ দিনটা কী ভাল! নীল আকাশ। দেখো মা আসছেন।

হাত মোছার কথা ভুলে গেছেন। মেঝেতে জল পড়ছে টপটপ করে। ভিজে হাতেই বুকের কাছে চাদর চেপে ধরে বললেন, তা হলে কী হবে? ডেডবডি আনার কী ব্যবস্থা হবে!

ডেডবডি আর নেই। ডিসপোজড অফ।

কেন, কার হুকুমে?

মৃত্যু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে।

বাঃ বেশ মজা! এক পাশ দিয়ে নিঃশব্দে এল, আর এক পাশ দিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল। কাউকে একবার জানতে দিলে না। ও কি ফুল ছিল? ও কি পাতা ছিল? ও তো মানুষ ছিল। শিল্পী ছিল। অমন তবলা কে আর বাজাবে? তা বলে বেঁচেও জ্বালাবে, মরেও জ্বালাবে!

পিতা ধীরে ধীরে কাকিমার দিকে এগোতে লাগলেন। আমার ভেতরটা বহুক্ষণ শূন্য হয়ে গেছে। সাধক এই শূন্যতায় ঈশ্বর লাভ করেন। আমি তো এক মিনমিনে কল্পবিলাসী। আমি আর কী পাব! পিতৃদেবের ডান হাত সামান্য ইতস্তত করে কাকিমার মাথার পেছন দিক স্পর্শ করল।

বউঠান, যা হবার তা তো হয়েইছে। সহ্য করা ছাড়া মানুষের আর কী করার আছে? ভাগ্যকে যে মানতেই হবে।

জল-ভরা চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে কাকিমা বললেন, আমি এখন কী করব? আমি এখন কোথায় যাব? আমার যে কেউ নেই বটঠাকুর।

কেন, তোমার মামাশ্বশুর? পয়সাঅলা মানুষ। ভোগ করার কেউ নেই।

প্রবল আতঙ্কে কাকিমা বললেন, না না, মরে গেলেও আমি আর ওখানে যাব না।

তা হলে, তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। আমাদের জন্যে তুমি যা করেছ, সে ঋণ ভোলার নয়। আমাদের দিন চলে গেলে, তোমার দিনও চলে যাবে।

যদি জোর করে নিয়ে যেতে চায়?

তুমি যাবে না।

কী অধিকারে থাকব?

মহিলার আকস্মিক বাস্তববাদী প্রশ্নে আমার আদর্শবাদী পিতা থতমত খেয়ে গেলেন। মহিলারা সমাজ নামক প্যাঁচকলটিকে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি চেনে। কিছু ভেবে না পেয়ে পিতা বললেন, সেসব পরে ভাবা যাবে। তুমি থাকবে তোমার অধিকারে, আমাদের শ্রদ্ধার আসনে।

কাকিমা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হল না। ঘরে একসঙ্গে অনেকে এসে হাজির হলেন। সিস্টার, ডাক্তার, সেই কাজের মেয়েটি। ট্রে-তে গরম জল, ভাসমান বরিক তুলো, ওষুধের শিশি, অ্যান্টিসেপটিক, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। লটবহরের শেষ নেই।

সন্ন্যাসীভাবাপন্ন সেই ডাক্তারবাবু কোনও দিকে না তাকিয়েই বললেন, শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, একটু মেরামতির কাজ আছে। ভালই হিল আপ করছে। পারফেক্ট সিস্টেম। এই বয়েসে ভোগী মানুষের সুগার দেখা দেয়। তুই বেঁচে গেছিস। কৃচ্ছ্রসাধনের এই গুণ।

ডাক্তারবাবু নিজের খেয়ালে কথা বলছেন। সিস্টার মাঝে মাঝে কাকিমার দিকে তাকাচ্ছেন। অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে। এক মহিলার আর এক মহিলার প্রতি স্বভাবসুলভ কৌতূহল। প্রফুল্লকাকা মারা গেছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে আর তেমন শোকাবহ নয়। আমারও চোখ আছে। সে চোখ জলে ঝাপসা নয়। বেমানান হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, কাকিমাকে আজ কালিদাসের বিরহী নায়িকার মতো দেখাচ্ছে। উড়ুউড়ু চুল, ছলছলে চোখ, সাদা শাড়ি। উত্থান পতনে জায়গায় জায়গায় সামান্য ধুলোময়লা লেগেছে। জানি, আমার এ দৃষ্টি ভাল নয়। জানলে কী হবে! বিল্বমঙ্গলের সাহস কোথায়! কাঁটা ফুঁড়ে অন্ধ করে দিতে পারছি কই!

সিস্টার হঠাৎ হাসপাতালের কণ্ঠে বললেন, ঘর খালি করুন, ঘর খালি করুন।

কাকিমাকে কি তাঁর অসহ্য মনে হচ্ছে! তাই নিজের কর্তৃত্ব ফলাতে ব্যস্ত? পিতৃদেব বললেন, তড়িৎ, আজ তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমার আর পড়ে থাকার উপায় নেই। চারপাশ থেকে চাপ আসছে প্রচণ্ড।

আর দু’-একদিন, তারপর ছুটি।

না, আজই। আমার আর উপায় নেই।

বাড়িতে এইসব ড্রেসিংট্রেসিং তোমার করবে কে? ট্রেইন্ড হ্যান্ড চাই।

ও আমি নিজেই করে নিতে পারব।

দিন দুয়েক বাড়ির বাইরে থাকলে কী এমন হবে?

সে তুমি বুঝবে না ডাক্তার! অনেক রকম সমস্যা এসে গেছে।

সেভেন্টি পার্সেন্ট সেরে এসেছে অবশ্য। ছেড়ে দেওয়া যায়। সিস্টার, ছাড়া যায়?

আমাদের সেবাযত্ন ওঁর যখন সহ্য হচ্ছে না, তখন তো ছেড়ে দিতেই হবে।

পিতৃদেব আশার আলো দেখতে পেলেন, তা হলে ড্রেসিংটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন। একটা ট্যাক্সি ডেকে আনুক, ওদের সঙ্গেই চলে যাই।

সিস্টার আবার বললেন, ঘর খালি করুন, ঘর খালি করুন।

লটবহর নিয়ে আমরা বাইরে এসে লম্বা একটা বেঞ্চে বসে পড়লুম। সময় ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। চাদরে ঢাকা একটা দেহ চাকা-লাগানো স্ট্রেচারে চেপে আমাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে দূর থেকে দূরে চলে গেল। একটি মাত্র মানুষ, একটি মাত্র দেহ, শূন্য করিডর। পায়রা ডাকছে একঘেয়ে মন কেমন করা সুরে। অন্ধকার-অন্ধকার জায়গায় পালিশ-করা ঢাউস বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে, পৃথিবী যেন থেমে গেছে। আমাদের কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। মাঝে মাঝে পুরনো দিন উঁকি মেরে যাচ্ছে। প্রথম যেদিন দু'জনে এলেন। সাজিয়েগুজিয়ে সংসার পাতা। ঘোর বর্ষণে ভেজা। মুখোমুখি বসে লুডো খেলা। সরষের তেল আর পেঁয়াজ মেখে মুড়ি খাওয়া। ঝালে হুসহাস করা। এই পৃথিবীতে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়। আজ এক রকম কাল এক রকম। মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে পৃথিবী এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

ডাক্তার আর সিস্টার দু'জনে মার্চ করে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় একবার মাত্র আমাদের দু'জনের দিকে তাকালেন। পৃথিবীতে সকলেই বড় ব্যস্ত। ঘরের দরজার সামনে এসে পিতৃদেব আমাদের ইশারায় ডাকলেন। অ্যান্টিসেপটিকের চড়া উগ্র গন্ধ বেরোচ্ছে।

আচ্ছা, তুমি তা হলে এবার একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো। আমি রেডি।

ট্যাক্সিতে উঠে ঘড়ি দেখলুম, বেলা দুটো বেজে পনেরো মিনিট। আজ আর মাতামহের আহার জুটল না।

সব দিক কি সামলানো যায়! পেছনের আসনে দু'জনে পাশাপাশি বসে আছেন। আমি সামনের আসনে। আমাদের জীবনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, বাইরের জগতে কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই। পৃথিবীর সাংঘাতিক হজমশক্তি। মাতামহের জন্যে ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। মাঝে মাঝে চিন্তাও হচ্ছে, পিতৃদেব এই সমস্যার কী সমাধান করবেন।

বাড়ি ফিরে একটি অসহায় ছবি দেখা গেল। বাহাদুর রকে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। খিদেতে মুখ শুকিয়ে গেছে। মাতামহ মা-হারা শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাশবালিশটা খাট থেকে মেঝেতে পড়ে গেছে।

ঘরে পা দিয়েই পিতৃদেব বললেন, তোমাদের কারুরই নিশ্চয়ই খাওয়া হয়নি। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। আমার নার্ভ ভীষণ শক্ত, তোমার নার্ভ বউঠান আরও শক্ত। টেম্পার্ড স্টিল। এতটুকু জানতে দিলে না!

পিতার গলা পেয়ে মাতামহ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। মুখের অবস্থা দেখে মনে হল, যেন স্বপ্ন দেখছেন! ভাবাবেগে মুখে কথা আটকে যাচ্ছে, তুমি এলে হরিশঙ্কর! তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে মাথা ঘুরে আবার বিছানাতেই বসে পড়লেন। শিশু যেমন অনেকদিন পরে প্রবাসী পিতাকে দেখে আনন্দ পায়, বৃদ্ধের চোখমুখে সেইরকম আনন্দ খেলছে। পিতৃদেব এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিলেন।

মাতামহ বললেন, শুনেছ নিশ্চয়, আর একজন চলে গেল! বুঝলে, এরা সব মজা পেয়ে গেছে, শাসনের বাইরে চলে গেছে। আসছে যাচ্ছে। সবই যেন নিজেদের খেয়ালখুশি! পৃথিবী একটা কুৎসিত জায়গা। তুমি আছ বলেই থাকতে ইচ্ছে করে, তা না হলে কবে পগার-পার হয়ে যেতুম। বড় ভয় হয় হরিশঙ্কর! যেই যাব আবার সঙ্গে সঙ্গে পোঁটলা বেঁধে ফেরত পাঠিয়ে দেবে।

আপনি কিছুই জানেন না, এটা আপনার শেষ জন্ম। আর আপনাকে আসতে হবে না।

ধুত, তোমার হিসেবে ভুল হচ্ছে। আমাকে এখনও বার তিনেক আসতে হবে। আবার সেই নব ধারাপাত, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, স্কুল, নিলডাউন, বেত্রাঘাত। আবার সেই টোপর মাথায় পিঁড়েতে বসা, আবার সেই এক এক করে চলে যাওয়া। পরের বার তোমাকে যেন একটু আগেভাগে পাই বাপু! এবার তুমি বড় দেরি করে ফেলেছ। সামনের বার আমি গৌরীদান করব। তখন তুমি যেন আবার না না করে বেঁকে বোসো না। আর আমিও মেয়েটাকে প্রথম থেকেই খুব যত্ন করব। স্বাস্থ্যই সম্পদ। অসুখ করলে হাতুড়ে আর ডাকব না। প্রথম থেকেই ভাল ডাক্তার। পয়সা একটু বেশি লাগে লাগুক, একেবারে বিধান রায়। ওই হেরম্ব কবিরাজ আর নয়। হ্যাঁগো, তোমার এটা শেষ জন্ম নয় তো! আমার কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে?

আমাকে এখনও লাখোবার জন্মাতে হবে। কয়লা ধুয়ে ধুয়ে হিরে। আপনার এখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি, এই অবেলায় না খাওয়াই ভাল।

মাতামহ অবাক হয়ে বললেন, কেন, আমার আজ খাওয়া হয়নি? কে বললে খাইনি?

কাকিমা ধরাধরা গলায় বললেন, না, খাওয়া হয়নি। আমাদের আসতে দেরি হয়ে গেল।

মাতামহ প্রতিবাদের গলায় বললেন, কে বললে আমার খাওয়া হয়নি। তোমরা বড় তাড়াতাড়ি ভুলে যাও।

পিতৃদেব উৎকণ্ঠিত মুখে মাতামহের দিকে তাকালেন। বুঝতে পেরেছি কীসের আশঙ্কায় তাকাচ্ছেন। মাতামহের স্মৃতি নষ্ট হয়ে আসছে নাকি? যাকে বলে ভীমরতি। মাতামহও বুঝতে পেরেছেন। একগাল হেসে বললেন, একদিন খাওয়া হয়নি তো কী হয়েছে? সারাজীবন তো খেয়েই আসছি। কতজনকে খেলুম বলো তো?

এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলার সময় এ নয়। তবু বলছেন। এলোমেলো কথা বলে সময় নিচ্ছেন। এমন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, যার সমাধান খুব সহজ নয়। কাকিমা দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতেই বসে পড়েছেন। কতক্ষণ আর দাঁড়াবেন! স্বামী অপঘাতে মারা যাবার পর কী কী করার আছে, শাস্ত্রের কী বিধান আছে, এঁরা মনে হয় সঠিক জানেন না। এখুনি আমাকে ছুটতে হবে কুলপুরোহিতের কাছে। অশৌচ হবে কি না, শ্রাদ্ধশান্তির প্রয়োজন হবে কি না, জেনে আসতে হবে। হলে কোথায় হবে? কে করবে? বংশধর তো কেউ নেই।

মাতামহ বললেন, তুমি কি খুব পুড়ে গেছ হরিশঙ্কর?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বেশ ভালই পুড়েছি। শরীরটা মনে হয় দাগরাজি হয়ে গেল। ভেবেছিলুম অক্ষত শরীরে চিতায় শোব, সে আর হল না।

অত ভেবো না হরিশঙ্কর। ক্ষত আর অক্ষত, আগুনের কাছে সবই সমান।

না, সে অনেক পরের কথা। আসুন এখনকার কথা ভাবা যাক। এই মহিলাটির কী হবে?

বউমার? কী হবে বলো তো? বেচারা এত বড় এই পৃথিবীতে একেবারে একা হয়ে গেল। পাশে তো কাউকে দাঁড়াতে হয়।

কে দাঁড়াবে?

কেন, আমরা সবাই মিলে দাঁড়াব। আমরা সব বউ-মারার দল। এইবার আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব।

সমাজ?

জুতো পেটা। তুমি জানো, যৌবনে আমার মেজাজ আর শক্তি দুটোই ছিল। মুখের চেয়ে হাত দুটোই চলত বেশি। সমাজের কাছ থেকে আমরা কী পেয়েছি হরিশঙ্কর! উৎসবে, পালপার্বণে, অনেক তো পাতা পেড়ে খাওয়ানো হয়েছে, সেজেগুজে গিয়ে অনেক উপহার দিয়ে আসা হয়েছে, লাভ কী হয়েছে? এই তো তুমি হাসপাতালে পড়ে ছিলে, ক'জন পাড়ার লোক তোমাকে দেখতে গিয়েছিল?

তা না যাক, সমাজের কিছু নিয়ম তো মেনে চলতেই হবে! বুঝতে পারছেন কী বোঝাতে চাইছি?

খুব পারছি। বদনাম একবার রটে গেলেই হল। তা সে পথ তো আমি মেরে রেখেছি। মাথার ওপর বসে আছি এক পাকা বুড়ো। আমি থাকতে থাকতেই নাতিটার বিয়ে দিয়ে দাও। অনেক মৃত্যু দেখলুম হরিশঙ্কর, এইবার একটা ভাল কিছু দেখি। মৃত্যু কী মূর্খ! ব্যাটা বেহেড, গবেট। জানে না বারেবারে এলে মৃত্যুর ধার কমে যায়। যারা যাত্রার পালা লেখে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করলে নিজেরই উপকার হত। মাঝে মাঝে একটু নাচ-গান, বিবাহ-জন্ম, হাসি-তামাশা না ঢোকালে দুঃখের জোর বাড়ে না। এলিয়ে যায়। বিয়েটা লাগিয়ে দাও হরিশঙ্কর। সানাই বাজুক। অনেক দিন লুচি, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছক্কা খাইনি। শাঁখের শব্দ, উলুধ্বনি। কোমর বেঁধে লেগে পড়ো। দরজায় দরজায় আলপনা। সিল্কের ঝালর, ছাদে ম্যারাপ। রজনীগন্ধার গন্ধ। আহা নাকে যেন এখনও লেগে আছে। রজনীগন্ধার গন্ধ নাকে এলে তোমার মন কেমন করে না হরিশঙ্কর! আমার যে কত কথাই মনে পড়ে!

পিতৃদেব বললেন, ওসব কথা এখন থাক। আমার মনে হয় মামাশ্বশুরের কাছে থাকাটাই সেফ হবে।

কাকিমা সারাশরীরে একটা ঝাঁকুনি তুলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, না না। এর চেয়ে আমার আত্মহত্যা করাই ভাল।

পিতৃদেব বোঝাতে চাইলেন, কেন বউঠান, তিনি তোমার আত্মীয়, আমরা তোমার পাশে থাকব।

উত্তরে আঁচলে মুখ ঢেকে কাকিমা ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকালেন।

দুই অভিভাবক পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মতো বসে রইলেন। কঠিন সমস্যা। জোর করে একজন অসহায় মহিলাকে তো আর দূর করে দেওয়া যায় না। ভগবানের তাজ্জব খেলা। খোঁড়ার পা-ই গর্তে পড়ে! যাঁর কেউ কোথাও নেই তাঁর স্বামীটিকে কেড়ে নিলেন!

কাকিমা হঠাৎ বললেন, আপনারা কোনও বাড়িতে আমাকে একটা রাঁধুনিগিরি জুটিয়ে দিন। কোনওরকমে আমার দিন চলে যাবে।

মাতামহ বললেন, তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। যা-তা আবোলতাবোল বোকো না। হরিশঙ্কর রাগী মানুষ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার কথা শুনে রেগে গেছে।

পিতা বললেন, না, আজ আর রাগারাগি নয়। আজ আমাদের মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। আজ আর কোনও আলোচনাও নয়। তবে মামাশ্বশুরকে খবরটা দিতে হবে। খবর তো দিতে হবে বউঠান!

কাকিমা নিরুত্তর।

খবর না দিলে খারাপ দেখাবে। আমাদের দোষারোপ করবেন।

কাকিমা নিরুত্তর।

মাতামহ বললেন, তুমি এখন আর ওকে খোঁচাখুঁচি কোরো না। এমন একটা কিছু করো যাতে বেচারা শান্তি পায়। কী করলে মানুষ শান্তি পায় বলো তো?

শান্তি! সংসারী মানুষ পায় না। শান্তি পেতে হলে সন্ন্যাসী হতে হবে। সংসারে শান্তি নেই। সাময়িক যুদ্ধবিরতি আছে। ভুলে থাকা যায়, শান্তি পাওয়া যায় না।

কীভাবে তা হলে ভোলানো যায়?

সময়। সময়ের স্রোত পলি ফেলতে ফেলতে দুঃখ সুখ সবই চাপা দিয়ে দেবে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের মতো, কোনওদিন খুঁড়তে খুঁড়তে এক-একটা স্মৃতি বেরিয়ে আসবে। দুঃখের স্মৃতি, সুখের স্মৃতি।

তা যা বলেছ! কত কী-ই তো আমাদের জীবনে ঘটে গেল, সব কি আর মনে আছে! টেনে বের করলে তবেই বেরোয়। এসরাজ বাজাতে বাজাতে তোমার ওই আঙুলের কড়ার মতো, জীবন যত দিন যায় তত দরকচা মেরে যায়।

পিতৃদেব ঘড়ির দিকে তাকাতে-না-তাকাতেই চারটে বাজতে শুরু করল। শেষ ঘণ্টাটি বেজে যাবার পর বললেন, এইবার একটু চায়ের জোগাড় করা যাক। আপনিও হালকা কিছু একটা খান।

তুমি চায়ের কী জোগাড় দেখবে? সে তো আমাদের হাতে।

কাকিমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন, আমি চা করে আনছি। বাবাকেও খেতে দিচ্ছি।

মাতামহ বললেন, আজ আর তোমার কিছু করে দরকার নেই।

পিতা বললেন, সেটা ঠিক হবে না। নিজেকে যত কাজে ব্যস্ত রাখবে ততই ভাল। আমি তো তাই করেছিলুম। ওর মা মারা যাবার পর আমি সারাদিনরাত নিজেকে গাধার মতো খাটাতুম। রাতেও ছাড়তুম না। সারারাত বসে বসে অঙ্ক কষতুম। একটা টেলিস্কোপ কিনেছিলুম। সারারাত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। সেই সময় আমার কত কী যে দর্শন হয়েছিল!

কী দেখেছিলে হরিশঙ্কর? গ্রহ, নক্ষত্র, উল্কা, ধূমকেতু!

সেসব তো ছিলই। প্রকৃতির জিনিস। অতিপ্রাকৃত কত কী যে দেখেছি! একদিন দেখলুম একটা মালা ভেসে চলেছে। দুধের মতো সাদা আলোর ফুলে গাঁথা গোড়ের মালা। দুলে দুলে ভেসে চলছে।

অ্যাঁ, বলো কী? তুমি তো তা হলে সিদ্ধপুরুষ হরিশঙ্কর। আমি শুনেছি। কখনও দেখিনি। ওই মালা কোথায় যায় জানো? কাশীর অন্নপূর্ণার মন্দিরে। তোমার হয়ে গেছে। তুমি পেয়ে গেছ।

আর একদিন কী দেখলুম জানেন? একটা সোনার খাট ভেসে চলেছে। ধীরে ধীরে পালতোলা নৌকোর মতো।

মাতামহ আর কথা বলতে পারলেন না। চোখে জল এসে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে। হঠাৎ যেন ভেঙে পড়লেন, যা ভেবেছি তাই হরিশঙ্কর। এই তোমার শেষ জন্ম। ওই পালঙ্ক তোমার! দেখা দিয়ে চলে গেল। আমি একা পড়ে গেলুম। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে সেই তিনশো বছর পরে। তিনবার আসব। তিনবারের মেয়াদ শেষ করে তারপর ফিরে যাব।

মাতামহ স্তব্ধ। ঘর স্তব্ধ। উত্তরের রান্নাঘরে প্রাইমাস স্টোভ হুহু করছে।

There is no path in the sky and a monk must
find the inner path.

তুমি তা হলে কী করবে পলাশ?

আজ্ঞে, বাবা সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে আমি দেরাদুন যাই কী করে?

আমিও তোমাকে এখুনি যাবার জন্যে পেড়াপেড়ি করছি না। আমি বরং আগে ওদের দু'জনকে পাঠিয়ে দিই। অ্যাডভান্স পার্টি। তারপর তুমি আর আমি দু'জনে যাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে আমি দু'-চারদিনের জন্যে চট করে একবার সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি।

সে মন্দ হবে না। বাবা প্রায় সুস্থ হয়ে এসেছেন।

তোমার দাদু কেমন আছেন?

মোটামুটি ভালই, তবে অসুখটা তো তেমন সুবিধের নয়। দুটো কিডনিই ড্যামেজ হয়ে গেছে।

দুই রুগিকে তুমি একা সামলাচ্ছ কী করে?

আমি ঠিক একা নই। একজন মহিলা আছেন। বাবার এক পরিচিত ভদ্রলোকের স্ত্রী। আমাদের বাড়ির নীচের তলায় এসে উঠেছিলেন। ভদ্রলোক সুন্দর তবলা বাজাতেন।

অতীতকালে চলে গেলে কেন?

আজ্ঞে, তিনি আর নেই। মারা গেছেন।

কবে মারা গেলেন? ওই বাড়িতেই?

আজ্ঞে না। তিনি কোথায় কোন রাজ এস্টেটে যেন বাজাতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন ফেরার নাম নেই। এই দিন কয়েক আগে এক সি আই ডি অফিসার এসে খবর দিলেন ভদ্রলোক খুন হয়েছেন। মর্গে পড়ে ছিলেন আনক্লেমড হয়ে। ডেডবডি যথাসময়ে পাচার হয়ে গেছে।

বলো কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মহিলার কেউ কোথাও নেই। তিনিও বিপদে পড়েছেন আমরাও সমস্যায় পড়েছি। মহিলা অসম্ভব কাজের, সংসার মাথায় করে রেখেছেন। তিনি না থাকলে আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে যেতুম।

যাক ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বইছেন। কিন্তু এরপর তো থানা-পুলিশ হবে। হবে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পুলিশ তিনজনকে পাকড়াও করেছে। বলেও গেছে কোর্টে কেস উঠলে মহিলাকে হাজিরা দিতে হবে।

দেখো দিকিনি হরিটা আবার এক উলটো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ল। ওইজন্যে সংসার খালি রাখতে নেই। তোমার জন্যে বিরাট এক স্যাক্রিফাইস করতে গিয়ে বেচারার জীবনে ঝামেলা ছাড়া আর কিছুই জুটল না।

তোমরা সব সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী করো, এত বড় একজন সর্বত্যাগী গৃহী সন্ন্যাসী হিমালয় চষে ফেললেও পাবে কি না সন্দেহ! নির্লোভ, আদর্শবাদী, জিতেন্দ্রিয়। সংকল্পের কী দৃঢ়তা! তুমি খুব ভাগ্যবান পলাশ! হরির রক্ত তোমার শরীরে, সেইজন্যে তোমাকে আমি শুধু ভালবাসি না, শ্রদ্ধাও করি। দেখো এই মানুষটির প্রতি কখনও কোনও অবিচার যেন না হয়। হিরের মতো যত্ন করে রাখবে। বেশ এই কথাই তা হলে রইল। আর হ্যাঁ, তুমি রোজ সকাল সকাল বাড়ি চলে যেয়ো। ওই আটঘণ্টা থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি ফ্যাক্টরিকে বলে দিচ্ছি, দশ-বারো বোতল ভিটামিন নিয়ে যাও, বাবাকে নিয়মমাফিক খাওয়াও, শরীরটা তাড়াতাড়ি সারবে।

পিতার প্রশংসায় সন্তান খুশি হয়, সন্তানের প্রশংসায় পিতা। কিন্তু এম ডি'র একটা কথা কাঁটার মতো বিঁধে রইল মনে। স্যাক্রিফাইস। আমার জন্যেই আমার পিতা আজ নিঃসঙ্গ। জীবধর্ম ত্যাগ করে ঊর্ধ্বচারী সন্ন্যাসী। সুদীর্ঘ বিশ বছর লোটাকম্বল সম্বল করে ওই ভগ্নপ্রাসাদে স্মৃতির স্তূপে বসবাস করছেন। নিজের কণ্ঠস্বরই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর। স্বপ্ন যদি কিছু থেকে থাকে, সে স্বপ্ন আমাকে ঘিরে। পিতার সন্তান-স্বপ্ন বাঁধা-রাস্তাতেই চলবে। সফল জীবিকা, সম্পদ, সুখের সংসার, সন্তান সন্ততি পিতৃআজ্ঞাপালনকারী। জীবনের পালে বাতাস যখন মৃদু হয়ে আসবে তখন বৃদ্ধ হরিশঙ্কর, ত্যাগী সংযত হরিশঙ্কর, ক্যামেরার সামনে হাসিহাসি মুখে এসে বসবেন, কোলে একটি দেবশিশু, ট্যাঁপা ট্যাঁপা গোলাপি গাল, কুঁচফুলের মতো চকচকে চোখ, সদ্যোজাত দাঁতে হাসির জলতরঙ্গ, এপাশে আধঘোমটা টানা টইটম্বুর যুবতী, ওপাশে ঈষৎ গর্বিত একটি যুবক, অগ্রগামী হরিশঙ্করের পশ্চাদগামী যুবক হরিশঙ্কর। সুখের সংসারের ছায়া ধরা রইল ব্রোমাইড কাগজে। বসে আছেন পক্বকেশ পিতামহ হরিশঙ্কর, দাঁড়িয়ে যুবক হরিশঙ্কর, কোলে শিশু হরিশঙ্কর। তিনটি জেনারেশন সময়ের আঙিনায় কুচকাওয়াজ করে চলেছে। মানুষের টানে সোনপাপড়ির সুতোর মতো সময় লম্বা হয়ে চলেছে। ট্র্যাডিশনের ছায়া লম্বা হয়ে চলেছে মানব-মনুমেন্টের দিকে।

বেলাবেলি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনের অবস্থা তেমন ভাল নয়। জীবনটা কেমন যেন মিইয়ে আসছে আবার। ভবিষ্যতের দিকে একটা রাস্তা খুলছিল। কোথা থেকে কোথায় চলে যাওয়া যেত! দেরাদুনে প্রবাস। পদোন্নতি। সুন্দরী স্ত্রী। মাঝে মাঝে মুসৌরি। গানহিল লালটিব্বা থেকে হিমালয় দর্শন। চাকরিটা নেহাত খারাপ ছিল না। এ লাইনে পাকা হাত, কাজ-জানা লোকের বেশ ডিম্যান্ড আছে। সবচেয়ে বড় কথা খোদ মালিকের স্নেহ ভালবাসা।

হাতে বারো ফাইল ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স প্যাক করা একটা কার্টুন। ওজন নেহাত কম নয়। নড়বড় নড়বড় করতে করতে চলেছি। আজ আমি সেই পত্রিকা অফিসে যাবই। স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। মনে হচ্ছে জীবনে আবার গ্রহণ লাগবে। তার আগেই সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। আমার চিন্তায় ভবিষ্যৎ যখন উঁকি মেরে যায়, ভালই হোক আর খারাপই হোক, তখন তা ফলবেই। এ আমার কী ধরনের শক্তি ঈশ্বরই জানেন।

আজ শহরে খুব হাওয়া ছেড়েছে। সব এলোমেলো করে দিচ্ছে। বাতাসের দাপটে পড়ন্ত বেলার রোদ যেন গুঁড়ো হলুদের মতো উড়ছে। আকাশের মাঝখানটা মরকতমণির মতো নীলচে সবুজ। বিন্দু বিন্দু চিল উড়ছে। বিকেল যেন গিলে-করা পাঞ্জাবি পরে ছড়ি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছে ফুরফুরে মেজাজে।

ওষুধের কার্টুনটা আজ অফিসে রেখে এলেই হত। একটা হাত জোড়া হয়ে আছে। এমন কাউকে দেখছি না যাকে ভিটামিন দেওয়া যায়। দিতে চাইলেও নেবার লোক নেই। কত দাতা এইভাবে জগৎ জুড়ে ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পার্কের কোনায় অন্যদিন এক অসুস্থ বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখি, আজ সেও নেই। কাল রাতে মারাই গেল কি না কে জানে।

পত্রিকার অফিস আর আশ্রম একই বাড়িতে। বড় মনোরম জায়গা। পশ্চিমে গঙ্গা। একপাশে ভদ্রগোছের ছোট একটা বস্তি। বস্তির ঘরে ঘরে শিল্পকর্ম চলেছে। টেলারিং, বই বাঁধাই, শাল রিপেয়ারিং। কালো পিচের রাস্তা এইবার সারাদিনের উত্তাপ ছাড়তে শুরু করেছে। একটা চাপাকলের সামনে মেয়েরা জল নিচ্ছে। একজনের খোঁপায় আবার ফুলের মালা। জল, যৌবন, মালা, বৈরাগ্য সবকিছুর পাশাপাশি অবস্থান। সময় সময় মানুষের কীরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছে হয়। পাছাপাড় শাড়ি পরা খলবলে এক মহিলাকে দেখে ভীষণ ইচ্ছে হল ভিটামিনের শিশিগুলো সব দিয়ে দিই। তাজা শরীর আরও একটু তাজা হোক। হাসির ধার আরও একটু বাড়ুক। যারা আনন্দে আছে, তারা আরও একটু শক্তি লাভ করুক। দিতে গিয়ে মার খেয়ে মরি আর কী!

আশ্রমের দরজার সামনে কালো রঙের একটা মোটর দাঁড়িয়ে। বাড়িটার ওপরদিকে পশ্চিমের রোদ লেগেছে। বড় হবার এই মজা। অনেকক্ষণ আলোয় থাকা যায়। অফিসঘরে সুন্দর চেহারার এক সন্ন্যাসী বসে আছেন। স্বাস্থ্য দেখলে তাক লেগে যায়। মুখে অপূর্ব এক জ্যোতি। অন্তরে সবসময় যেন হাসছেন। সেই হাসির ঝিলিক লেগে আছে চোখে। সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, গান-ফুরোনো জলসাঘর। গান থামলেও ঝংকার ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। এঁর সামনে আমার এই ভিটামিনের কার্টুন যেন এক উপহাস!

সন্ন্যাসী চোখ তুলে তাকালেন। সামনে পড়ে আছে হিসেবের জাবদা খাতা। প্রশ্ন করলেন না, তবু প্রশ্ন রয়েছে। ভাবের ভাণ্ডারীর ভাষায় প্রয়োজন খুব কম। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললুম, মহারাজ, স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে দেখা করব। এই যে তাঁর চিঠি, আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।

একনজরে চিঠিটা পড়ে ফেলে মহারাজ বললেন, আপনি বসুন।

কালো রঙের পালিশ করা চার-পাঁচখানা চেয়ার। একটায় ধীরে ধীরে সংযত হয়ে বসে পড়লুম। ভেতরে বেশ এক ধরনের গাম্ভীর্য আসছে। শান্তি নামছে। তেমন আর ভয় করছে না। চতুর্দিকে রাশি রাশি বই। স্বামীজির ওপর, রামকৃষ্ণের ওপর। ধর্ম আছে, দর্শন আছে। সম্পূর্ণ অন্য এক জগৎ। দেয়ালে ঝুলছে স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি। সমাধিস্থ রামকৃষ্ণ, ধ্যানস্থ রামকৃষ্ণ। আমার একেবারে চোখের সামনে থাউজান্ড আইল্যান্ড পার্কে তোলা স্বামীজির সেই ছবিটি। বড় বড় চুল। মুখে স্মিত হাসি। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তেজের সঙ্গে প্রেম মিশে অদ্ভুত এক মুখচ্ছবি। জলে যেন আগুন লেগেছে। সারাঘরে ধূপের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মহারাজের শরীরেও সুন্দর একটা গন্ধ। সারাশরীরে যেন হোমের গন্ধ। গোস্বামীজি কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজিকে বলেছিলেন, গায়ে হোমের ধোঁয়া মাখবে, শরীর পবিত্র হবে। মন ঘুরে যাবে। নির্দেশ পালন করে মাসখানেকের মধ্যে ব্রহ্মচারীজির তাই হয়েছিল। আমার কী হল? মন বলছে, আজ যেখানে এসেছ তোমাকে তোমার ভবিতব্য সেখানে টেনে এনেছে। জীবনের গতি এবার ঘুরে যাবে। গোলকধাঁধা থেকে বেরোবার পথ পেয়ে যাবে। আজকের দিনটা খেয়াল করে রাখিস।

মহারাজ ইন্টারন্যাল ফোনে স্বামী নির্মলানন্দের সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামাতে নামাতে বললেন, বসুন, আসছেন।

চিঠিটা ফেরত দিতে দিতে একনজরে আমাকে আর একবার দেখে নিলেন। মনে হচ্ছে কত কালের চেনা। মানুষ যেমন নিজের হাতের কি পায়ের দিকে ভাল করে তাকায় না, কোনওদিন ভাল করে তাকালে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, এই আমার হাত, হাতের আঙুল! কী আশ্চর্য! আমারও সেইরকম মনে হতে লাগল, এ সবই আমার চেনা, ভীষণ চেনা। কোনওদিন ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম, আজ আবার ফিরে এসেছি। তাই হইহই অভ্যর্থনা নেই। ঘরের লোক ঘরে ফিরে এসেছে। এই কিছুদিন আগে চিৎপুরে বড় মসজিদের সামনে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, আমার ভীষণ চেনা জায়গা। খুব অস্বস্তি হয়েছিল। চুলকোচ্ছে অথচ শত চেষ্টাতেও ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ডান পাশে ঘাড় ঘোরালেই আমি একটা সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। ধাপে ধাপে উঠে গেছে ওপরে। মহারাজ হাসিহাসি মুখে আবার কাজে মন দিয়েছেন। স্বামীজি সামনের ছবি থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কী যেন বলতে চাইছেন! হয়তো বুঝেছি! বলছেন, উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্ নিবোধত। মাঝে মাঝে সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছি। স্বামী নির্মলানন্দ ওই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসবেন। আর তখনই আমার জীবনের গতি পালটে যাবে। গলিঘুঁজির পথিক হঠাৎ বেরিয়ে পড়ব দিগন্ত-ঘেরা মহাপ্রান্তরে। বিশাল এক ঈগল ইঁদুরের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে একেবারে পাহাড় চূড়ায়।

তরতর করে নেমে আসছেন স্বামী নির্মলানন্দ। জলের ছন্দে নেমে-আসা দুটি পা, গৈরিক বসনের নেচে-ওঠা প্রান্ত দেখতে পাচ্ছি। সাধকের শরীর যোগ-প্রভাবে এইরকমই লঘু গতিময় হয়। আমি পড়েছি। নামার এই ধরনও একপ্রকার প্রাণায়াম। ব্রহ্মচারীজির ডায়েরিতেই আছে। সাধকদের ক্ষিপ্ত হাত-পা ছোড়া অকারণ নয়। গুহ্যকারণে ভরা।

সিঁড়ির শেষ ধাপ লাফিয়ে নেমে স্বামীজি ঝড়ের গতিতে অফিসঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, কোথায় সেই ভদ্রলোক?

যে-ঘরে আমি একাই বসে আছি, সেখানে ভদ্রলোক কোথায় জিজ্ঞেস করার মানেটা কী? তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম, আজ্ঞে, আমি।

স্বামী নির্মলানন্দের ক্ষুরধার চেহারা। শরীরে মেদ নেই। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। গায়ে ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, গেরুয়া রঙে ছোপানো। তার ওপর একটি উত্তরীয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা। উজ্জ্বল দুটি অনুসন্ধানী চোখ আমার দিকে স্থির হয়ে আছে।

মহারাজ হঠাৎ হোহো করে হেসে উঠলেন। বলশালী ভোগী মানুষের লোলুপ হাসি নয়। সাধকের স্ফটিক-স্বচ্ছ, জল কল্লোলের হাসি। যেমন হঠাৎ শুরু, তেমনই হঠাৎ থেমে যাওয়া। ঠোঁটে শেষ সূর্যের আভার মতো সামান্য একটু লেগে রইল।

তুমি পলাশ চট্টোপাধ্যায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দু'হাতে আমার দুটো কাঁধ ধরে শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে দিলেন। পড়েছিলুম শার্লক হোমস কৃশকায় ছিলেন। কিন্তু শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল। স্বামী নির্মলানন্দের ঝাঁকানিতে সবকিছু যেন ঝরে পড়ে গেল। বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সংস্কার, মলিনতা, নীচ চিন্তা। সব ঝরঝর করে ঝরে পড়ে গেল। পায়ের নীচে। যেন সহস্র ধারার উষ্ণ জলে স্নান করে উঠলুম। ধ্বংসস্তূপে জেগে উঠল স্বর্গীয় পাখি, ফিনিকস্।

স্বামীজি বললেন, ভেবেছিলুম ষাট বছরের কোনও বৃদ্ধকে দেখব। তুমি তো যুবক হে! চলো ওপরে আমার ঘরে চলো।

স্বামী নির্মলানন্দ সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে উঠছেন, আমি পেছনে পেছনে। উঠতে উঠতে ভাবছি, আমার এই আরোহণ যেন অবরোহণ না হয়। ক্রমশই উঠে যাব, ওপরে আরও ওপরে। দোতলায় ঠাকুরঘর। বেদির ওপর সারদামায়ের ছবি। মার্বল পাথরের সাদা মেঝে। স্বামীজি বললেন, যাও আগে প্রণাম করে এসো।

মায়ের দিকে তাকিয়ে একপাশে একজন অল্পবয়সি মহিলা বসে আছেন। দৃষ্টি স্থির। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মহিলার দিকে তাকিয়ে বুকটা ছাঁত করে উঠল। কনক নাকি! অনেকটা সেইরকম দেখতে!

মহিলার দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে মাটিতে মাথা ঠেকালুম। মনে মনে বললুম, মা, ক্ষমা করো। পুরো মনটা তোমাকে দিতে পারলুম না। সামান্য একটু টলে গেছে। চোখ বুজিয়ে মাকে দেখার চেষ্টাও সফল হল। তরুণীর অশ্রুসজল দুটি চোখ, বেদনা-মাখা মুখচ্ছবি বারেবারে, ফিরে ফিরে এল। এ কি কোনও কিছু হারানোর বেদনা, না না-পাওয়ার বেদনা!

দশ হাত পেছনে স্বামী নির্মলানন্দ আমার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আরও ওপরে উঠতে হবে। বাঁ পাশে আর একটি সিঁড়ি তিন তলায় উঠে গেছে। তিন তলায় একটি মাত্র ঘর, সেই ঘরটিই স্বামী নির্মলানন্দের। একটি টেবিল, একটি চেয়ার, অসংখ্য বই। ঘরে শোওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই। সন্ন্যাসীর ভূমিশয্যাই শাস্ত্রের বিধান।

একটা মোড়া দেখিয়ে স্বামীজি বললেন, বোসো।

আদেশ পালন করলুম। স্বামীজি চেয়ারে বসে আমাকে দেখতে লাগলেন। তাঁর সেই অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে বসে বড় অস্বস্তি শুরু হল। শোকেসে দাঁড় করানো ম্যানিকুইন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে গেলে কাচের ওধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে দেখলে আমার মতোই মনের অবস্থা হত। ছুটে পালাবারও উপায় নেই। নিজেকে মনে হচ্ছে স্বচ্ছ মানুষ। ধরা না পড়ে যাই। লোভ, লালসা, কুচোকুচো কামনা, বাসনা, অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছের মতো কিলবিল করছে।

মহারাজ বললেন, দেখি, আমার হাতে তোমার ডান হাত রাখো।

নিক্তিতে ওজন করার মতো করে তিনি আমার হাতের ওজন নিলেন। জানি, এ এক আধ্যাত্মিক পরীক্ষা। ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দকে করেছিলেন। হালকা হাতের মালিকের মনও হালকা। হৃদয় অগভীর, সংকীর্ণ। পরীক্ষায় পাশ না ফেল? প্রশ্নও করতে পারছি না।

স্বামীজি বললেন, যাও বোসো।

মোড়ায় বসে পড়লুম। স্মিত হেসে স্বামীজি প্রশ্ন করলেন, কী করো?

আজ্ঞে চাকরি। কেমিস্ট।

বিজ্ঞানের ছাত্র? খুব ভাল। এরকম একটা দার্শনিক প্রবন্ধ লিখলে কী করে? ডেকার্ট পড়েছ? কান্ট, হিউম, হেগেল, স্পিনোজা, হবস্?

কিছু কিছু।

প্রবন্ধটা ভালই লিখেছ! একটা কাজ কেবল বাকি, আর একটু খাটতে হবে।

বলুন, প্রস্তুত আছি।

এই তো চাই। সবসময় নিজেকে তৈরি রাখবে সৈনিকের মতো। মনে মনে সবসময় বলবে, আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে। আমি থাকার জন্যে আসিনি, আমি যাবার জন্যে এসেছি।

আপনি মৃত্যুর কথা বলছেন?

মৃত্যু? মৃত্যু তো দুর্বলের কথা, ভীরুর কথা। মৃত্যু বলে কিছু নেই। ট্রানজিশন। রূপান্তর। তুমি তো গীতা পড়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রোজই এক অধ্যায় করে পড়ার চেষ্টা করি।

তা হলে সেই শ্লোকটি মনে করার চেষ্টা করো,

অবক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥

অব্যক্ত হইতে সব দিনে ব্যক্ত হয়/রাত্রিতে আবার হয় অব্যক্তেই লয়/ এইরূপ ভূতগণ যায় আর আসে/ রাত্রিতে বিলীন হয়, দিবায় প্রকাশে। মৃত্যুর এর চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা তুমি আর কোথায় পাবে? মৃত্যু নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবে না। ও হল এক ধরনের চিন্তাবিলাস। দুটো কথা মনে রেখো, ডেথ্-ইন- লাইফ, আর লাইফ ফিল্ড উইথ লিভিং। জীবনকে বেঁচে থাকায় ভরপুর করে তোলে। কাজে কাজে বেলা বেড়ে গেলে হঠাৎ ঘড়ি দেখে আমরা লাফিয়ে উঠি, আরে এরই মধ্যে বারোটা বেজে গেল! জলের বিম্ব একদিন জলেই মিলিয়ে যাবে। কী? খুব খিদে পেয়েছে?

আজ্ঞে না।

তোমার মুখ বলছে। দাঁড়াও একটা সন্দেশ খাও। শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্ম সাধনং।

মহারাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। ঘরের ও প্রান্তে একটি কাঠের আলমারি। চারচৌকো সুদৃশ্য একটা টিনের কৌটো নিয়ে তিনি ফিরে এলেন আসনে।

কী সন্দেশ খাবে বলো? কড়াপাক? না নরমপাক?

আপনি যা দেবেন।

তোমার নিজের কোনও ইচ্ছে নেই?

আজ্ঞে না।

তুমি কি সব ব্যাপারেই নিজেকে এইভাবে সমর্পণ করে দিতে পারো?

নির্ভর করে ব্যক্তির ওপর, তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। সকলের হাতে নিজেকে ছাড়তে পারি না।

গুরুকরণের ওপর তোমার বিশ্বাস আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব আছে।

কথামৃত পড়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রোজই পড়ি।

আর কী পড়ো?

শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজির শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ।

উপনিষদ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে তুমি নরমপাক খাও। নাও হাত পাতো। সন্ন্যাসী মানুষ কোথায় পাব তোমার জন্যে প্লেট?

মহারাজ আমার হাতে বড় বড় দুটো সন্দেশ দিলেন। আকার আকৃতি দেখে খাবার আগেই প্রাণ ভরে গেল। ওপরে কুচো কুচো পেস্তা ছড়ানো। মহাপুরুষের সামনে হাউহাউ করে খেতেও লজ্জা করছে। খাদ্যগ্রহণকারী মানুষের চোখমুখের চেহারা পালটে যায়। লোভের ছায়া নামে। একটু একটু করে ভেঙে ভেঙে মুখে পুরছি। অতি সুস্বাদু। এমন জিনিস কোথায় পাওয়া যায়? দোকানের নাম জানা থাকলে পিতা আর মাতামহের জন্যে নিয়ে যেতুম।

স্বামী নির্মলানন্দ মহারাজ আমার দিকে আর তাকাচ্ছেন না। একটি পাণ্ডুলিপিতে মন দিয়েছেন। ধীরে ধীরে দুটোকেই শেষ করে ফেললুম। মহারাজ মুখ না তুলেই বললেন, বাইরে ছাদের ওপাশে কল আছে, যাও হাত ধুয়ে এসো।

হাত ধুয়ে এসে বসতেই মহারাজ পাণ্ডুলিপি থেকে মুখ তুলে বললেন, দেখি, হ্যাঁ, এবার তোমার মুখের চেহারা পালটে গেছে। বেশ একটা স্নিগ্ধ ভাব এসেছে। বুদ্ধদেবের ধম্মপদ পড়েছ?

আজ্ঞে মাঝেমধ্যে উলটে দেখি।

তুমি করেছ কী? সব পড়ে বসে আছ? ইমিটেশন অফ ক্রাইস্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শঙ্করের বিবেকচূড়ামণি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঃ জমিতে ভালই সার পড়েছে। এবার তা হলে ফুল ফুটবে!

ধীরে ধীরে আমার সাহস বাড়ছে। মহারাজের চোখের জ্যোতি লাইট হাউসের মতো ঝড়ের রাতের নাবিককে স্থলের সংকেত জানাচ্ছে। সাহস করে বলেই ফেললুম, স্বামীজি, বুদ্ধ কিন্তু বলেছেন, মূর্খ সারাজীবন জ্ঞানীর সঙ্গ করলেও জ্ঞানের পথের সন্ধান পায় না, যেমন চামচে কোনওদিন পায় না সুপের স্বাদ। বাংলা ঠিক হল কি না জানি না, ইংরেজি অনুবাদ আরও সুন্দর, If during the whole of his life a fool lives with a

wise man, he never knows the path of wisdom as the spoon never knows the taste of the soup.

পলাশ, তুমি তো মূর্খ নও। তোমার জন্যে বুদ্ধের সেই উপদেশ, যে-মানুষ জাগ্রত সে যদি জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে মুহূর্তকাল কাটায় সে কিছুদিনের মধ্যেই জ্ঞানের পথ চিনতে পারে, যেমন জিভ চুমুকের সঙ্গে সঙ্গেই সুপের স্বাদ পায়। বুদ্ধের ওই উপদেশটিও মনে রেখো, অনাবৃত শরীর, জটাধারণ, পরিচ্ছন্নতায় উদাসীনতা, উপবাস, ভূমিশয্যা, ভস্মলেপন, আসন, কিছুতেই কিছু হবার নয়। বিশুদ্ধ হবার একমাত্র পথ সংশয় আর কামনা থেকে মুক্তি। এইবার তোমার বিবেকচূড়ামণি কী বলছেন—

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা॥

বিচার, সৎ আর অসতের পার্থক্য বুঝে অসৎকে ত্যাগ করতে হবে। সাহায্য করবেন কে? গুরু। স্থান দান, শত শত প্রাণায়াম, যাই করো না কেন, বিচার আর গুরুর উপদেশ ছাড়া পথ খুলবে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশে তালচটকা পাখির ঝাঁক দিন-শেষের ওড়া উড়ছে। মহারাজ বললেন, আর না, একটু পরেই আরতি শুরু হবে, আমাকে প্রেয়ারে বসতে হবে। তোমার বাড়ির খবর বলো, কে কে আছেন?

থাকার মধ্যে আছেন আমার বাবা, আর আমার দাদু। এ ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

মহারাজ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর আমার নিতান্ত আপনজনের মতো মৃদু হেসে বললেন, ভাগ্যবান, ভাগ্যবান। এই সুযোগ কাজে লাগাও। তোমার পথ ঈশ্বরই পরিষ্কার করে রেখেছেন। মায়ের স্নেহ যখন পাওনি, তখন অন্য আর কারুর স্নেহ-ভালবাসার আশা কোরো না। বিবাহ করার ইচ্ছে আছে নাকি?

একেবারেই না।

চাপাবার চেষ্টা চলছে?

অল্পস্বল্প।

কেটে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করো, রেশমকীট যেমন গুটি কেটে বেরিয়ে যায়—

কোথা হতে আসিয়াছি, নাহি পড়ে মনে
অগণ্য যাত্রীর সাথে তীর্থদরশনে
এই বসুন্ধরাতলে! লাগিয়াছে তরী
নীলাকাশসমুদ্রের ঘাটের উপরি।

কার লেখা?

রবীন্দ্রনাথ। নৈবেদ্য।

পরের স্তবক?

ভাগ্য ভাল, মনে ছিল। কাল রাতেই মাতামহকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে শুনেছেন,

শুনা যায় চারিদিকে দিবসরজনী
বাজিতেছে বিরাট সংসার শঙ্খধ্বনি
লক্ষ লক্ষ জীবনফুৎকারে। এত বেলা
যাত্রী নরনারী সাথে করিয়াছি মেলা
পুরীপ্রান্তে পান্থশালা'-পরে। স্নানে পানে
অপরাহ্ন হয়ে এল গল্পে হাসি গানে।

মহারাজ শেষ স্তবকটি আবৃত্তি করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন,

এখন মন্দিরে তব এসেছি হে নাথ
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তারপর
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর।

টেবিলের ডান দিকের ট্রে থেকে আমার লেখাটি তুলে নিলেন। শোনো, সবই ঠিক আছে, একটা কাজ কেবল বাকি, অনেক উদ্ধৃতি আছে, সব ক'টার ফুটনোট দিতে হবে। প্রথমে নম্বর দেবে, এক, দুই, তিন, চার, তারপর তলায় তলায় উল্লেখ করবে সোর্স। পারবে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যত তাড়াতাড়ি পারো দিয়ে যেয়ো। মনোনীত করে রেখেছি। পারলে সামনের মাসেই ছেপে দোব। হ্যাঁ, তোমাকে একটা বইও দিচ্ছি, রোজ নিয়ম করে দু'-চার পাতা পড়বে।

বই আর পাণ্ডুলিপি দুটোই আমার হাতে এসে গেল। বইটির নাম স্বামী-শিষ্য সংবাদ। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই মহারাজ বললেন, এত বড় বড় চুল রেখেছ কেন?

ভীষণ অপ্রস্তুতে পড়ে গেলুম। শরীরে একমাত্র এই চুলই দর্শনীয়। আর তো দেখাবার মতো কিছু নেই। না বুকের ছাতি, না হাতের গুলো। মিউ মিউ করে বললুম, বড় হয়ে গেছে, এইবার কাটব।

হ্যাঁ কেটে ফেলো। দুর্বলতার সেবা কোরো না। পুরুষ হও, তবেই না পৌরুষ আসবে।

স্বামীজি হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীর পায়ে আমার সঙ্গে ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন। চৌকাঠ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ভেজিয়ে দিলেন। দোতলার ঠাকুরঘর আলোয় আলোকময়। মেঝেতে ঢালাও কার্পেট। ধূপের গন্ধ। একটি হারমোনিয়ম। সারদামায়ের পুজো শুরু হয়েছে। সেই তরুণী এখনও একইভাবে স্থির। আরও অনেক ভক্ত এসেছেন। নীচের অফিসঘর বন্ধ। নির্জন একটি বেঞ্চের তলায় অসংখ্য জুতো। একটি শিশু একা বসে।

One life, one death, one heaven
one hell, one immortality and
one annihilation

‘দিদি আত্মহত্যা করেছে বলে মনে হয় না। দিদিকে তোমার চেয়ে আমি ভাল চিনি। দিদি ভয়ংকর একরোখা মেয়ে, তেমনি সাহসী। অভদ্র নয়, বাচাল নয় কিন্তু অন্যায় দেখলেই রুখে দাঁড়ায়। শ্রদ্ধেয় গুরুজনকে শ্রদ্ধা করে, গুরুজন শুধু বয়সে কি সম্পর্কের দাবিতে দিদির কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করতে পারবে না। বাবা ইদানীং যা যা করেছেন তোমাকে আমি জানিয়ে এসেছি। আমার যা সন্দেহ দিদি যদি তাই করে থাকে আমি বলব ভালই করেছে।’

মুকুর চিঠি ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠছে। মেসোমশাই ইদানীং কী করছেন! মাসিমা তো শ্যামদেশ থেকে হাঁটাপথে আসার সময় আরাকানের জঙ্গলে দেহ রেখেছেন। পথের ক্লেশ সহ্য করতে পারেননি। বিপত্নীক মেসোমশাই কি তা হলে ইন্দ্রিয়ের কাছে হার মেনেছেন? প্রৌঢ় মানুষটির কি তা হলে পদস্খলন হয়েছে! কী জানি! সেসব বৃত্তান্ত ছিল মুকুর রেখে-যাওয়া লেফাফায়। কনক কী এমন ভাল কাজ করলে! হোমচৌধুরিটি কে? কনকের কোনও পূর্ব পরিচিত। গড নোজ। এসব ব্যাপারে আমার আর কোনও আকর্ষণ নেই। বাতাস ঘুরে গেছে। হাওয়া-মুরগির মুখ এখন অন্য দিকে। সব ধর্মগুরুই আমাকে নেতিবাচক কথা শুনিয়েছেন। এখন না, পরে। সতীমা ভয় দেখিয়েছেন। ঘুরঘুরে বাবা ভূত দেখিয়েছেন। জয়ামাতা বলে গেছেন বছর চারেক পরে। একমাত্র স্বামী নির্মলানন্দের কাছে কিছু পজেটিভ কথা শুনেছি। ঈশ্বর নয়, ভক্তিরস নয়, জ্ঞানমার্গ। নিজেকে ধরো। হাত জোড় করে বলো— দুর্বল আমি, সবল হও। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ। নিজের ওপর নিজে উঠে পড়ে লাগাম ধরে বোসো। সেই আমির বশে এই আমিকে সঁপে দাও। সেখানে মুকুর ভালবাসা নেই, কনকের আকর্ষণ নেই, অপর্ণার আগমন-প্রত্যাশা নেই, কাকিমার কী জানি কী নেই। প্রফুল্লকাকার মৃত্যুর খবর অফিশিয়ালি জানাজানি হয়ে যাবার পর আমি কাকিমাকে হিন্দুর ঘরের বিধবার মতোই দেখতে চাই। শুদ্ধ, সাত্ত্বিক, আচারনিষ্ঠ। তবু কেন জানি না, নারীর মন জয় করার আনন্দে ভেতরটা থেকে থেকে গুনগুন করে উঠছে। কী একটা হচ্ছে যা বলে বোঝানো যায় না। কোয়েলিয়া গান থামা এবার বললেও গান থামছে না। তাই চিঠির দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। সারি সারি মুক্তো দিয়ে সাজানো জ্বলজ্বলে যৌবনের আবেগ।

‘তোমার চিঠি আমি আশা করিনি। তুমি জানো না, আমি জানি, তোমার মধ্যে চাপা একটা অহংকার আছে। অহংকার তোমাদের রক্তে। তোমার দোষ নেই। তোমার চেয়ে বয়েসে আমি অনেক ছোট, রাগ কোরো না, তোমাকে একটা কথা বলি, নিজেকে বেশিদিন খোলা ফেলে রেখো না। আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে দেখে এই

শিক্ষাই হল, মানুষ বড় জটিল প্রাণী। কখন কীভাবে কোন আবেগে কেঁপে উঠবে নিজেই জানে না। লক্ষ প্রলোভনের তরঙ্গ খেলছে। কখন কোন বাতাস পালে ধরবে কেউ জানে না। আদর্শের শৌখিন পেয়ালা খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়বে। তুমি কি জানো মেয়েরাও ভালবাসতে পারে। ছেলেরা ভালবাসার কিছুই জানে না। পেট্রলও জ্বলে, কয়লাও জ্বলে, পাটও জ্বলে। একটা দপ করে জ্বলেই নেবে। আর একটা ধীরে জ্বলে, নেবেও ধীরে। জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে, নিঃশেষে ছাই হয়। শেষবারের মতো আজ আমি তোমাকে একটা কথা নির্লজ্জের মতো বলে যাই, আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে কাছে পেতে চাই। তোমার কল্পনাবিলাস, তোমার ছেলেমানুষি, তোমার পবিত্রতা, তোমার চাপা অহংকার, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, সবকিছু আমি ভালবেসে পেতে চাই। কেন চাই, তা জানি না। তোমাকে ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারি না। এ আমার কী হল!'

মুকু রসিকতা করছে, না সত্যি কথা বলছে? মেয়েরা এমন প্রাণখুলে লিখতে পারে? কোনও মেয়ে আমার মতো ছেলেকে ভালবাসতে পারে? বিশ্বাস হয় না। কোনও মেয়ে কখনও আমাকে প্রেমপত্র লেখেনি। কো-এডুকেশন কলেজে মেয়েরা আমার পাশ দিয়ে চলে যেত, ফিরেও তাকাত না। সুন্দরী মেয়েদের বেশ অহংকার থাকে। মুকু তো সুন্দরীই। ভরাট গোল চাঁদের মতো মুখ। ছোট চুল-ঢাকা কপাল। উচ্চতায় আমার মাথায় মাথায়। মেয়েরা যাকে গড়ন বলে, সেই গড়নও বেশ সুন্দর। পাশ দিয়ে চলে গেলে ভোগী মানুষকে ফিরে তাকাতেই হবে। সে কেন আমার মতো এক শুকনো খেঁকুরে বাবাজিকে প্রেমপত্র লিখবে? পৃথিবীতে কি এখন প্রেমের জোয়ার বইছে, যে নালা নর্দমা সব ভেসে যাবে!

'প্রথম প্রথম তোমাকে আমি আর পাঁচটা ছেলের মতোই ভাবতুম। একটু চালিয়াত, বড় বড় কথা বলে। একটু বেশি বকে। পরে আমার সে ধারণা একেবারে পালটে গেল। মনে হল, তোমার ভেতরের শিশুটি আজীবন শিশুই থেকে যাবে। যত ঝড়ঝাপটাই আসুক তুমি সহজে ভেঙে পড়বে না। তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাস লোকদেখানো নয়, অন্তরের জিনিস। জন্মসূত্রে পাওয়া। তোমার এ বিশ্বাস এসেছে মাতামহের দিক থেকে। জীবন সম্পর্কে আমার নিজের একটা পরিকল্পনা আছে। অনেক মানুষকে আমি ভয় পাই। যারা দেহের ভেতর মানুষের আত্মাটাকে দেখতে পায় না তারা জন্তু। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়ালে আমরা দু'জনে একটা কিছু করতে পারি। চলার পথে মনের মতো একজন সঙ্গী পেলে পথ যত দুর্গম আর দীর্ঘ হোক না কেন, জানার আগেই ফুরিয়ে যায়। তুমি অবশ্যই আমার এ চিঠির উত্তর দেবে। ঈশ্বরকে যেমন জ্ঞানের পথে ত্যাগের পথে পাওয়া যায়, ভালবাসার পথেও পাওয়া যায়। তা যদি না হবে ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করলেন কেন? তোমাকে আমার কিছুই দেবার নেই। তুমি আমার সব নিয়ে বসে আছ। ইতি, মুকু।'

মুকুর চিঠিতে অদ্ভুত এক মাদকতা রয়েছে। সারা শরীর কেমন যেন করে উঠেছে। ভালবাসা খুব সহজেই মানসিক স্তর থেকে দেহের স্তরে নেমে যেতে চায়। সামান্য একটা চিঠিতেই আমার এই অবস্থা। মুকু কলকাতায় আসবে। শুধু আসবে না। কয়েক বছর থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। তখন আমার কী হবে!

আমার মনের ধাঁচটা বেশ বুঝে গেছি। জুয়া খেলার চাকার মতো। হাত ঠেকাবারও প্রয়োজন হয় না। সামান্য ফুঁ দিলেই ঘুরতে থাকে। মুকু খুব খাঁটি কথা বলেছে, নিজেকে বেশি দিন খোলা ফেলে রেখো না। তোমার কথাই ঠিক। সব ফাঁকফোকর এইবার ভরাট করব, তবে তোমাকে দিয়ে নয়। এমন কিছু দিয়ে যা বঞ্চনা করে না, শিশিরের মতো যা ভোরের প্রথম সূর্যেই উবে যায় না।

তবু চিঠিটা আমি ছিঁড়ে কুচিকুচি করতে পারলুম না। সাবধানে ড্রয়ারে ভরে রাখলুম মূল্যবান ট্রফির মতো।

শ্রীনাথদার সেলুনের দোল-খাওয়া দরজায় নতুন কাচ বসেছে। কাচে আবার নকশা খেলছে। গাছের ডাল ধরে শকুন্তলা দাঁড়িয়ে। ভেতরের দেয়ালে নতুন রং পড়েছে। বেশ একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তেমন ভিড় নেই। একজন মাত্র খদ্দেরের দাড়ি চাঁচা হচ্ছে। খুব খুঁতখুঁতে মানুষ। থুতনির তলায় হাতের উলটো পিঠ ঘষে বলছেন, এই জায়গাটায় আর একবার মারো কবিরাজ, খড়খড় করছে।

চামড়ার ফিতেতে ক্ষুর ঘষতে ঘষতে শ্রীনাথ বলছেন, দাড়ি উলটোপালটা টানলেই পেকে যায়। এই বয়েসে এত শক্ত দাড়ি করে ফেলেছেন! এরপর তো তরোয়াল দিয়ে কামাতে হবে।

ভদ্রলোক বললেন, আমাদের বংশ একটু কড়াধাতের। মেজাজ কড়া, পায়ে কড়া, দাড়ি কড়া, সব কড়া। তুমি শ্রীনাথদা বকবক না করে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও তো।

শ্রীনাথদা চোখের ইশারায় আমাকে দ্বিতীয় চেয়ারে বসতে বলে, খুনির মতো ক্ষুর হাতে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন। দাড়ি কামাবার সময় শ্রীনাথদার ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে যায়। যেমন অন্যের মুখে খাবার ভরে দিতে গিয়ে অনেকের নিজের মুখ হাঁ হয়ে যায়।

দাড়ি কামানো শেষ হল। ভদ্রলোক ঠ্যাং করে পয়সা ফেলে দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। আমার গায়ে আধময়লা মার্কিনের টুকরো জড়াতে জড়াতে শ্রীনাথদা বললেন, দাড়ি কখনও উলটো টানবে না। টেনেছ কি মরেছ। তারের বুরুশ হয়ে যাবে। জামার কলারটা উলটে ভেতর দিকে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, চুল ভীষণ বড় হয়েছে যে গো! তোমার ভীষণ চুলে মাথা। বেশ কবি কালিদাস কবি কালিদাস চেহারা হয়েছে।

মার্কিনের গাঁট বাঁধতে বাঁধতে বললেন, দাঁড়াও, একটু বিড়ি ফোঁকা করে নিই। একটা দাড়ি নামাতে জীবন বেরিয়ে গেল।

বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শ্রীনাথদা ঘাড়ের কাছে এসে সামনে ঝুঁকে পাউডারের কৌটো তুলে নিলেন। এতদিনে পাফটা নতুন হয়েছে। পাউডারে ফুলের গন্ধ লেগেছে। দাড়ির চেয়ে চুলে আর পাউডারে দাদার হাত খুব দ্রুত চলে। ঘাড়ের কাছে ঝপাঝপ পাউডারের থুপপি চালাতে চালাতে বললেন, মেয়েছেলেটি তা হলে তোমাদের বাড়িতেই রয়ে গেল?

কাঁধের ওপর দিয়ে সামান্য ঝুঁকে পাউডারের কৌটোটা ঠকাস করে সামনের তাকে রাখলেন। ভদ্রলোকের জামায় বিশ্রী একটা সেলুন-সেলুন গন্ধ। এমন একটা কথা বললেন যা এই গন্ধের চেয়ে দুর্গন্ধময়। মেয়েছেলে শব্দটাই কুৎসিত। হাতদুটো কাপড়ের টুকরোয় জড়ানো। উঁচু চেয়ারে আয়নার তলার তাকে পা পুরে বেকায়দায় আছি তাই, তা না হলে ছিটকে রাস্তায় নেমে যেতুম। ঠান্ডা গম্ভীর গলায় বোকার মতো বললুম, নতুন মেয়েছেলে?

ওই যে গো সেই তবলচির বউটা।

কানের পাশে মুখ রেখে কথা বলছেন। বিড়ির গন্ধে গা গুলিয়ে উঠছে। কত ব্যাপারেই না মানুষের মাথা ঘামে! কে বলেছে, চার দেয়ালে আমাদের সকলের পারিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা হয়। দেয়ালের অসংখ্য চোখ, অসংখ্য কান। আমরা হাটের মাঝে জীবন মেলে বসে আছি।

শান্ত গলায় বললুম, কোথায় আর যাবেন? মহিলার কেউ কোথাও নেই।

খুব বেশি বয়েস হবে বলে মনে হয় না! কী ভাগ্য বলো তো?

কথা এইবার নিজের রাস্তা ধরেছে। পারিবারিক কথা পেঁয়াজের মতো। যত ছাড়াবে তত কেচ্ছার গন্ধ বেরোতে থাকবে। শ্রীনাথদার কথায় যে সহানুভূতির আভাস, তা অনেকটা মাছধরা চারের মতো। কেচ্ছার রুইকাতলা গভীর জল থেকে টোপে ভেড়াতে হলে চার ফেলতে হয়। ভালমানুষ সাজতে হয়, ন্যাকামো করতে হয়। সেলুন এমন একটা জায়গা যেখানে এলেই সমাজের নাড়ি ধরা পড়ে। ভাগ্যিস এসেছিলুম, মাত্র এই কয়েক দিনেই তা হলে অর্কেস্ট্রা শুরু হয়ে গেছে।

ঘাড়ের কাছে কাঁচির খেলা শুরু হয়েছে। সেই আবহসংগীতে শ্রীনাথদার গলা ভাসছে, এই তবলচি শুনেছি খুব সুবিধের লোক ছিল না। মামাটা তো খুব পয়সাঅলা লোক?

তা হবে।

সে তো আবার বিয়েথা করেনি?

কে জানে!

আরে আমি সব জানি। লোকটার একটা মেয়েমানুষ আছে। এখন ব্যাবসা-ফ্যাবসা সব লাটে তুলে দিয়ে সেইখানেই পড়ে থাকে।

যে যা করে করুক, তাতে আমাদের কী?

তা ঠিক। তবে কী জানো, মানী গুণী লোকের কিছু হলে গায়ে বড় লাগে। কষ্ট হয়।

কার কথা বলছেন?

এই তোমার বাবার কথা।

অ্যাসিড-ট্যাসিড নিয়ে কাজ করতে গেলে ওরকম দুর্ঘটনা যে-কোনও মুহূর্তেই হতে পারে। ভয়ের কিছু নেই।

অ, হরিদার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বুঝি?

হ্যাঁ, আপনি জানেন না?

শুনছিলুম, কী যেন একটা হয়েছে। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে, কোনটা যে কী বুঝি না বাপু। মাথা-ফাথা খারাপ হয়ে যায়। মেয়েছেলে বড় সাংঘাতিক জিনিস মাইরি! বাঘের মতো। ছুঁলেই আঠারো ঘা।

মেয়েছেলে মানে?

ওই যে তবলচির বউ! স্বামীর ঘর তো ভাল করে সাধ মিটিয়ে করতে পারলে না। না পারলে যা হয়, খাইখাই স্বভাব। আর তো সে দিনকাল নেই, ধর্মটর্ম সব আলগা হয়ে গেছে। বিধবাদের আগে কত বাঁধন ছিল! মানুষের মন তো খুব নোংরা! পাঁচজনে পাঁচকথা বললে বড় খারাপ লাগে। তোমাদের পরিবারের একটা সুনাম ছিল।

এখন কি দুর্নাম হচ্ছে?

হলেই হল।

শ্রীনাথদার কাঁচি চলছে 'হলেই হল' ছন্দে। মনটা ভীষণ দমে গেল। মানুষ দেখি সব পারে! আমার আদর্শবাদী একরোখা পিতৃদেবের অনেক শত্রু, সুযোগ পেলেই বোলতার হুল চালাবে। ছাড়বে না। বিবর্তনের ধারায় জীবচক্রে ঘুরতে ঘুরতে মানুষের আগমন। বাঘের রক্তলোভী স্বভাব মানুষে এসে কুৎসালোভী হয়েছে।

শ্রীনাথদাকে তাড়া লাগালুম, আর বসা যাচ্ছে না, অত মেলামিলি, দশআনা-ছ'আনার প্রয়োজন নেই। একেবারে মুড়িয়ে কদমছাঁট করে দিন।

দাঁড়া রে বাবা। চুল কাটতে বসে অধৈর্য হলে হয়! বেশি ছোট করলে কামড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। সবকিছুর একটা শো আছে। যে-মুখে যেমন মানায়।

আমি যা বলছি তাই করুন। একেবারে কদমছাঁট।

হ্যাঁ, কদমছাঁট! তুমি বললেই আমি করছি! আরে লোকের কথায় রাগ করতে আছে! চোরের ওপর রাগ করে ভাই ভুঁয়ে ভাত খেয়ো না। যে যা করার তা করবেই। তুমি চুল বড় রাখলেও করবে, তুমি চুল ছোট রাখলেও করবে। এই যে গজেনবাবু, ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে নিজে বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে চলে এলেন। বেশ তো আছেন বাবা! লজ্জা নেই, নিন্দের ভয় নেই। বুক ফুলিয়ে আসা-যাওয়া করেন। ছেলেটা বিবাগী হয়ে সরে পড়ল। বোকামি, বোকামি! তুই গৃহত্যাগ করলি কোন দুঃখে! তোর বাপের চোখের সামনে থেকে বাপকে আরও বেশি শাস্তি দিতে পারতিস! তোকে চোখের সামনে দেখত, আর বুড়োর বিবেকে খোঁচা লাগত। যাকে বউমা বলার কথা, তাকে বউ বলছে! পৃথিবীটা মানুষেই নষ্ট করে দিলে। হরিদাকে আমি চিনি। কোনও ছোট কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। যারা অপবাদ রটাচ্ছে, তারা সব ঘেয়ো কুত্তা।

শ্রীনাথদা ক্ষুর দিয়ে ঝুলপি সমান করছেন। কুত্তা বলার সময় উত্তেজনায় হাত কেঁপে গেল। লাগল, ভাগ্য ভাল কাটেনি। আর একবার চারপাশে পাউডার মেরে যখন খরখরে বুরুশ দিয়ে চুল ঝাড়তে লাগলেন, তখন প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়। মনে হচ্ছে ছালচামড়া গুটিয়ে যাবে। মার্কিনের টুকরোটা খুলতে খুলতে বললেন, এ পাড়াটা হল ছোটলোকের পাড়া। একসময় ভাল ছিল। যত দিন যাচ্ছে...

কাপড়ের টুকরোটা এত জোরে ঝাড়লেন, বন্দুক ছোড়ার মতো শব্দ হল। ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে এলুম। শ্রীনাথদা মোটামুটি লেখাপড়া জানা মানুষ। শুনেছি ম্যাট্রিক পাশ। নানারকম বই পড়েন। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। ভদ্রলোক আবার কবিতা লেখেন। একবার দু'বার পড়ে শুনিয়েছেন। নেহাত ফেলে দেবার মতো নয়। পাতে দেওয়া চলে। ছেলের পর, পরপর দুটি মেয়ে হয়ে ভদ্রলোককে বড় বেকায়দা করে দিয়েছে। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চুল দাড়ি, দাড়ি চুল, এই কেবল চলছে।

বাজার একেবারে জমজমাট। সাইকেল, মোটর, ভ্যান, যাচ্ছে আসছে। মিষ্টির দোকানে জিলিপির পাহাড়। গরম শিঙাড়া ভাজার গন্ধ বেরোচ্ছে। দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রবীণে প্রবীণে কথা হচ্ছে। স্তূপাকার খড় নিয়ে ঠ্যালা চলেছে। ওপর দেখে বোঝার উপায় নেই, সমাজের কোথায় পচন ধরেছে।

সারাবাড়িতে অদ্ভুত এক বিষণ্ণতা নেমে এসেছে। মাতামহের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে। এইবার বুকোটা দপ করে জ্বলে উঠবে। কথা বললে মনে হয়, কোন সুদূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর। যেন কোনও পর্বতের ওপার থেকে উঠে আসছে মেঘের মতো, জলভারে সিক্ত। হাসি। আর

সে প্রাণ নেই। চোখমুখ সবসময় থমথমে। আমাদের অনেক অব্যবহৃত ঘরের কোনও একটায় মৃত্যু যেন অদৃশ্য অতিথির মতো এসে বসে আছে তার ফোল্ডিং স্ট্রেচার নিয়ে। গভীর রাতে সে আমাদের উত্তরের বারান্দায় ধীর পায়ে চলে বেড়ায়। তালা-আঁটা ঘরের দিকে আমি দিনের বেলায় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। তুমি এসেছ, আমি জানি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তোমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে।

পিতৃদেব সেরে উঠছেন। তবে সে মানুষ আর নেই। বিশাল একটা বোঝা নিয়ে চৈত্রের দুপুরে কোনও মানুষ মাইলের পর মাইল হেঁটে এলে মুখচোখের অবস্থা যেরকম হয়, তাঁর মুখের অবস্থাও সেইরকম। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, বীতশ্রদ্ধ। বই নিয়ে বসে থাকেন, চোখ চলে যায় সুদূরে। যেন কাউকে খুঁজছেন। এমন কেউ, যে পাশে এসে দাঁড়ালে জীবন আবার সহনীয় হয়ে উঠবে।

মাতামহ আমার চুলের দিকে তাকিয়ে পুরনো দিনের মতো রসিকতা করার চেষ্টা করলেন। এ কী করে এলে, তিরুপতি গিয়েছিলে নাকি? একেবারে কচুকাটা করে এলে। ঘাসছাঁটা করে দিয়েছে।

পিতৃদেব একবার মুখ তুলে তাকালেন। কোলের ওপর খবরের কাগজ এলোমেলো। তিনি কোনও মন্তব্যই করলেন না। দু'জন খেয়ালি করিতকর্মা মানুষ আজ কর্মময় জগতের একপাশে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছেন। ইচ্ছে থাকলেও কিছু করার সামর্থ্য নেই। মাতামহ তীর্থে যাবার জন্য ছটফট করছেন। পিতৃদেবের ইচ্ছে ছিল পুত্রবধূকে আনার আগে, এই জরাজীর্ণ বাড়িটাকে ভেঙেচুরে নতুন করবেন। ভেবেছিলেন চারপাশে খুশির ফোয়ারা ছুটবে। সবই বোধহয় ভেস্তে গেল।

কাকিমা চা তৈরি করছেন রান্নাঘরে। শাড়ির রং বদলে সাদা হয়ে গেছে। সাজগোজের আর সে ঘটা নেই। আঁচলে এক থোলো চাবি। পিতৃদেব সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। বিষণ্ণ মন আরও বিষণ্ণ হয়ে গেছে। যে-ভদ্রলোকের অসাবধানতায় বুকে অ্যাসিড ছিটকে লেগেছে, সেই ভদ্রলোককে ট্রান্সফার করা হয়েছে গাজিপুরে।

কাকিমা মুখ তুলে তাকালেন, চা খাবে?

এক চুমুক।

আজ কিন্তু বাজার করতে হবে।

করব।

দু'জনেই চমকে উঠলুম, নীচে কাশির শব্দ হচ্ছে। দমকা, একটানা। ব্রঙ্কাইটিস বেশ চেপে ধরেছে। এক ফাঁকে শোনা গেল, কই গো কোথায় গেলে?

গলা শুনে দু'জনেরই মুখ শুকিয়ে গেল। সেই আলগা চরিত্রের মামাশ্বশুর। চুলে পমেড, মুখে পাউডার, গায়ে আতর। সর্বনাশ, আবার এসেছেন। কাকিমার হাত থেকে চামচে পড়ে গেল। বাঘের সামনে শিকার যেমন কাঁপতে থাকে, কাকিমা সেইরকম কাঁপছেন। আমাকে বললেন, তাড়াও তাড়াও, যেমন করে পারো তাড়াও।

আমি তাড়াবার কে? ভদ্রলোক বড় চটচটে। ধরলে সহজে ছাড়ানো যায় না।

ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে বললেন, ওপরে বুঝি!

জুতোর মুচমুচ শব্দ উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। উঠে বাঁয়ে বাঁক নিলেই রান্নাঘর। কাকিমা আতঙ্কের গলায় বললেন, বটঠাকুরকে খবর দাও। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে।

আসুন না, ভয় করার কী আছে? জোর করে নিয়ে যেতে পারবেন?

না না, ওকে দেখলেই আমার গা-হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসে। আমাকে টেনে নরকে নামাতে চায়।

পিতৃদেব চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে উত্তরের বারান্দায় দাঁড়ালেন। সিঁড়ি ভেঙে ভদ্রলোক উঠে আসছেন ধাপে ধাপে। চেহারা দেখলেই মনে হয় অন্য জীবনের মানুষ। ফোকরে চামচিকি থাকে। এ বাড়ির কোনও ফোকরেও এঁর স্থান হতে পারে না। হাতের আঙুলে আঙুলে লাল, নীল, সবুজ আংটি। ঠোঁটে এতখানি একটা পাইপে লাগানো সিগারেট। মাথার চারপাশ দিয়ে ফিনফিন করে ধোঁয়া ছুটছে। সাদা পাঞ্জাবির বুকের কাছে ধোঁয়ার পুঁয়ে সাপ লিকলিক করছে।

পিতৃদেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আসুন। সামনেও একটা সিঁড়ি ছিল।

একছিটে কাশি মিশিয়ে বাবু বললেন, যে-কোনও এক দিক দিয়ে এলেই হল। তা আছ কেমন?

ভালই।

ভাল তো থাকবেই। সেবাযত্ন পাচ্ছ!

পিতৃদেবের চোখদুটো জ্বলে উঠল। হাত মুঠো হল। অসীম সংযমে নিজেকে ধরে থাকলেন। হাওয়ার মুখে পেপার ওয়েট চাপা কাগজের মতো। ধীর গলায় বললেন, তা হবে।

আঙুর গেল কোথায়? ঝি-গিরি করছে!

আপনার কি তাই মনে হয়?

মনে হবে কেন, তাই হয়। সুখে থাকতে মানুষকে ভূতে কিলোয়। এখানে ওর পড়ে থাকার রাইটটা কী? কী অধিকারে পড়ে আছে?

প্রশ্ন আমাকে না করে তাকেই করুন।

সে এখন নেশার ঘোরে আছে।

কীসের নেশা?

যৌবনের নেশা।

তার মানে?

মানে বুঝে নাও।

পিতৃদেবের চোখদুটো আবার জ্বলে উঠল। হাত মুঠো হল। আক্রান্তকে রক্ষা করার জন্যে মাতামহ উঠে এলেন। অসুস্থ হলে কী হবে! সেই ছ'ফুট লম্বা, সাত্ত্বিক চেহারা। গায়ের রং টকটক করছে। জীবিত স্তম্ভের মতো পিতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই মুহূর্তে লোকটিকে মনে হচ্ছে ইন্দ্রিয়সেবী মর্কট। ভোগের দুর্ভোগে চোখের কোলদুটো টেপারির মতো ফুলে আছে। মাতামহের এইসব পরিস্থিতি সামলাবার অসীম ক্ষমতা। জোঁকের মুখে নুন ছিটোতে জানেন। সাধনলব্ধ একটা শক্তিও আছে। এখন আমি অবাক হয়ে ভাবি, কাকিমা এই মামাশ্বশুরকে একদিন বলেছিলেন দেবতুল্য মানুষ। সাত ভরি সোনার গহনা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন তো হাত পেতে নিতে পেরেছিলেন। রাতের বেলা নির্জনে মামাশ্বশুরের বাতের সেবা করতেন। প্রফুল্লকাকা সন্দেহ করেছিলেন, যে-সন্তানটি এসে নষ্ট হয়ে গেল সেটি কার? মানুষের মন বড় অপবিত্র! সেই কাকিমা এখন মানুষটিকে দেখে গোসাপের সামনে সাপের মতো জড়োসড়ো। মেয়েদের চেনা বড় শক্ত। হতে পারে, এই পরিবারে থাকতে থাকতে কাকিমার রুচি পালটে গেছে।

মাতামহ মানুষের চেহারা দেখে সঙ্গে সঙ্গে একটা নাম উদ্ভাবন করেন। সেই নামেই কথাবার্তা চলতে থাকে। মাতামহ বললেন, এই যে মর্কটানন্দ, সকালেই সেজেগুজে হাজির।

ভদ্রলোক থতমত হয়ে গেলেন। সামলে নিয়ে বললেন, আমার পিতৃদত্ত একটা নাম আছে। সেই নামে ডাকলে সুখী হব।

তোমার সব নাড়িনক্ষত্র আমি যে জানি প্রভু, সে নামে তোমাকে ডাকি কী করে! বাপ যদি আদর করে কানা ছেলের নাম রাখে পদ্মলোচন, তাতে কি লোচন পদ্মের মতো হবে!

ভদ্রভাবে কথা বলুন।

নিজে আগে ভদ্র হও। তুমি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলবে, আর আমরা তোমার প্রজার মতো শুনে যাব, তা তো হয় না মানিক!

পিতা মাতামহের দিকে তাকিয়ে বললেন, অপমান করার অধিকার আমাদের নেই, অপমানিত হবার মতো উদারতা আমাদের আছে। ওই মহিলার সঙ্গে ইনি সম্পর্কিত। একমাত্র আত্মীয়ও বলা চলে। ব্যাবসা করে পয়সা করেছেন। শিক্ষা আর সংস্কৃতি না থাকলে অর্থ মানুষকে একটু অসভ্য করে। ওঁর এই আচরণ আমাদের মেনে নিতেই হবে।

তুমি বলেছ ঠিক। মুখে মেয়েদের মতো কীরকম পাউডার মেখেছে দেখো। যেন যাত্রার দলের মিনসে মাগি!

পিতৃদেব দু'হাতে মাথার দু'পাশ চেপে ধরে বলে উঠলেন, আরে ছি ছি। আপনি ভীষণ ভালগার হয়ে যাচ্ছেন।

রাখো তোমার ভালগার! সারাজীবন আমি অনেক ভাগাড়ে ঘুরেছি। সংসারের ট্র্যাফলগারে সময় সময় ভালগার না হলে, মানুষ বড় পেয়ে বসে।

পিতৃদেব ভদ্রলোককে বললেন, আপনি ঘরে এসে বসুন।

আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভদ্রলোক বললেন, ছেলে তো বেশ বড় হয়েছে, এইবার একটা মেয়ে জুটিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও? সব ল্যাঠা চুকে যাক।

অসভ্যের ভাষা দেখো? মেয়ে জুটিয়ে? স্বভাব যাবে কোথায়! চরকা দেখলেই তেল দিতে ইচ্ছে করে।

গা যেন জ্বলে উঠল। একটু ধাক্কা মারা উচিত! পিতা আজ অন্য নীতি শেখাচ্ছেন। একসময় বলতেন, টিট ফর ট্যাট। হঠাৎ বলে ফেললুম, সোনালি খরগোশ কেনা হল সেদিন?

ভদ্রলোক থমকে গেলেন, কী, কী খরগোশ?

যেন কিছুই জানেন না। বললুম, সেই যে হাতিবাগানে? সঙ্গে একজন সুন্দরী মহিলা! মহিলা আপনার হাত ধরে টানলেন। আপনার বয়েস হয়েছে তো। হ্যাঁচকা টানে উলটে পড়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বলছিলেন, গায়ে কিস্যু জোর নেই। আপনি তখন মাথার চারপাশে হাত ঘুরিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, মহিলার মাথার নাট-বলটু সব ঢিলে। মহিলা মনে হয় আপনার স্ত্রী ছিলেন।

আমি ইচ্ছে করে বয়েস আর স্ত্রী এই দুটো শব্দের ওপর জোর দিলুম।

ধূর্তের চোখে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, আমি? তুমি আমাকে হাতিবাগানে দেখেছ? সঙ্গে সুন্দরী মহিলা? হাসালে বাবা! আমার কি আর সে বয়েস আছে? কাকে দেখতে কাকে দেখেছ? হাতিবাগানে অনেক দাদু-নাতনি দেখা যায়!

মাতামহ শব্দ করে হাসলেন। ছোট্ট একটি কথা বললেন, স্বভাব না যায় মলে, বুঝলে, ইল্লত না যায় ধুলে!

পিতৃদেব বললেন, নোংরা জল যত ঘোলাবেন ততই ঘুলিয়ে যাবে। আমরা যা জানি, যতটুকু জানি, তার অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন নেই।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাকিমাকে ডাকো।

কাকিমা বললেন, এই তিন কাপ চা বাইরের ঘরে নিয়ে যাও। খাওয়া হয়ে গেলে ভাগিয়ে দাও। ভাগনে যখন নেই, ভাগনেবউও তখন নেই। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঘাড়ধাক্কা। ওসব মানুষের আমি পরোয়া করি না। যখন ও বেঁচে ছিল তখন অনেক মিথ্যে বলেছি, অশান্তির ভয়ে। বুড়োর ভাগ্য ভাল যে ভাগনের হাতে খুন হয়নি।

কাকিমা হঠাৎ কীরকম বদলে গেছেন! সেই মৃদু ভীরু স্বভাব আর নেই। তিন কাপ চা ট্রে-র ওপর তুলে লগবগ লগবগ করতে করতে বাইরের ঘরে এলুম। পিতা স্বহস্তে কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, নিন, চা খান।

আমি বললুম, কাকিমা দেখা করতে রাজি হচ্ছেন না।

মাতামহ বললেন? হরিশঙ্কর, আমি কিছু বলতে পারি? তোমার অনুমতি ছাড়া কিছু বলব না।

কী আর বলবেন, ব্যাপার খুব জটিল।

এর মানে কী জানো, সেই পুরনো প্রবাদ, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস...

ব্যস, ব্যস, আর না, আর এগোবেন না।

মাতামহ অন্য পথে ঘুরে গেলেন। ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন, তুমি কীরকম মামাশ্বশুর হে, ভাগনেবউ দেখাই করতে চাইছে না!

আপনারা ওর মাথাটা খেয়ে দিয়েছেন। স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন। জানে না, রক্ষিতার বেশি সম্মান ও এখানে পাবে না।

কী বললে?

মাতামহ আসন ছেড়ে ছিটকে উঠলেন। চোখমুখ জবাফুলের মতো লাল। ছ'ফুট লম্বা মানুষ খাড়া দাঁড়িয়ে আছেন চাবুকের মতো। যতই শরীর অসুস্থ হোক, যৌবনের ব্যায়াম আর কুস্তির চিহ্ন শরীরে এখনও লেগে আছে। হুংকার ছাড়লেন আর একবার, কী বললে তুমি?

পিতৃদেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। মাতামহকে আগলাতে চান। ভদ্রলোক মিনমিনে গলায় বললেন, মারবেন নাকি?

মাতামহ বললেন, তোমার মতো ছুঁচোর গায়ে আমার হাত দিতে ঘেন্না করছে। স্রেফ দু'আঙুলে ঘাড়টি ধরব, আর বেড়ালছানার মতো তুলে বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসব।

মাতামহ সত্যিই এগোচ্ছিলেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বুকের কাছে দাঁড়ালুম। জানি আমাকে ঠেলে এগোতে পারবেন না। শক্তি দিয়ে আটকাতে পারব না। আমার সে ক্ষমতা নেই। স্নেহের দাবিতে এই সাধক মানুষটিকে হয়তো ঠেকানো যাবে। বিশ্রী একটা পরিণতিকে কোনওক্রমে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

ইন্দ্রিয়সেবী মদ্যপ মানুষটি ভয় পেলেও অর্থের অহংকারে যুঝে যাচ্ছেন। কাঁপাকাঁপা হাতে সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমাকে তা হলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে!

মাতামহ বললেন, তোমার আইনের মুখে আমি প্রস্রাব করি।

পেচ্ছাপই বলতেন। এত ক্রোধেও পিতার কথা ভোলেননি, শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করলেন। চাবির থোলোর শব্দে দরজার দিকে তাকালুম। কাকিমা ঘরে এলেন। এমন দৃপ্ত ভঙ্গি আগে কখনও দেখিনি। ঘরে ঢুকেই বললেন, আপনার আইন আমাদের কাঁচকলা করবে। আপনার স্বভাবচরিত্রের কথা একবার বলব এঁদের সামনে? আশ্রয় দিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে কী করেছিলেন? বলব সব কথা এক এক করে! চলুন থানায়, এখুনি চলুন, আমি জানি, নিজের সুবিধের জন্যে আপনিই ভাগনেকে খুন করিয়েছেন। টাকার জোরে মানুষ সব করতে পারে। চলুন থানায়।

কাকিমা কোমরে আঁচল জড়িয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। ভদ্রলোক সিগারেট টানতে ভুলে গেছেন। মিউ মিউ করছেন, এ তুমি কী বলছ? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? এ তুমি কী বলছ?

সদরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। দরজা বন্ধ করার বোদা শব্দ। সামনের সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ।

I shall go to her, but She shall not return to me

আমি শার্লক হোমস নই, তবু সিঁড়িতে জুতোর চলন দেখে অনুমান করতে পারছি, যিনি উঠে আসছেন তাঁর শরীর হালকা। মেজাজ বেশ খুশিখুশি। বেতালা নন, তাল লয় ছন্দের জ্ঞান আছে। অবশ্যই শৌখিন। কারণ পায়ের জুতো পঞ্চমে বাঁধা তবলার মতো আধধায় বাজছে। কে আসছেন? এমন মানুষ একজনই আছেন, তিনি গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন ভাগ্যান্বেষণে।

দরজার আড়াল থেকে একটি মুখ উঁকি মারল। গোল্ড-ফ্রেমের রিমলেস চশমা। কপালের দু'পাশে চুলের স্তবকের বিদ্রোহ। তসরের পাঞ্জাবি নেমে গেছে হাঁটু ছেড়ে। একটা কোণ, হাতার সামান্য অংশ দৃশ্যমান। ফুলপাড় কোঁচার একটু শাসন-ছাড়া অংশ চৌকাঠ ডিঙিয়ে থমকে গেছে। পাতলা ঠোঁটের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা সূক্ষ্ম গোঁফ। টানাটানা দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। চোখে শিশুর কৌতূহল, প্রচ্ছন্ন দুষ্টুমি খেলা করছে।

আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, মামা! মামা এসেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে মামা আত্মপ্রকাশ করলেন। দু'হাত বাউলের মতো ঊর্ধ্বে তুলে গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকলেন, আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।

ঘরের বিশ্রী মারমুখী থমথমে আবহাওয়া হঠাৎ তরল হয়ে গেল। কাকিমা আরও সাংঘাতিক কিছু বলার জন্যে হাত তুলেছিলেন, সে হাত বাতাসে স্থির। মাতামহের বুকে লাগোয়া আমার মাথায় তাঁর স্নেহের হাত। পিতা কোমরের পেছন দিকে দু'হাত রেখে পায়চারির ভঙ্গিতে স্থাণু। কাকিমার মামাশ্বশুর দু'হাঁটুতে দু'হাত রেখে গ্যাঁট হয়ে আছেন। ঠোঁটের পাইপ-লম্বা সিগারেট নিবে গেছে।

দৃশ্য দেখে মাতুলের সংগীত এক লাইনের বেশি এগোল না। তিনি বললেন, কী ব্যাপার, নাটক হচ্ছে নাকি?

পিতা উলটে প্রশ্ন করলেন, কী ব্যাপার জয়, তুমি?

মাতুল উত্তর দেবার আগেই কাকিমা আবার আগের কথার খেই ধরে শাসিয়ে উঠলেন, কী? যাবেন থানায়? যেতে চান? এখুনি চলুন। আজই তা হলে হাতে দড়ি পড়ুক।

মাতুল বললেন, কী ব্যাপার, চুরিটুরি হয়েছে নাকি? আরে এ ভদ্রলোক তো আমার চেনা। সিনেমাপাড়ায় মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন। ভ্যাম্প গার্ল জুলির সঙ্গে আপনার তো খুব মাখামাখি! আরে মশাই চেষ্টা করলেই কি আর নায়িকা বানানো যায়! দুটি জিনিস চাই, শরীর আর এলেম। পয়সা আছে, ঢেলে যান।

মামাশ্বশুর উঠে দাঁড়ালেন। সামনে কুঁজো হয়ে পড়েছেন। কাকিমার দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকালেন। দু'ঠোটের মাঝে সিগারেটের পাইপ। ওপরের ঠোঁটের চাপে নাকের দিকে উঁচিয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় দেহে একটু যেন যুবক-যুবক ভাব এসেছে। ঠোঁট থেকে পাইপ খুলে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, আচ্ছা!

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়ি বেয়ে জুতোর শব্দ নেমে গেল ধাপে ধাপে নীচে। আশ্চর্য মানুষ! কী যে করতে চান বোঝা শক্ত। অসহায় একজন মহিলার উপকার? এ যেন সম্পত্তি দখলের লড়াই চলেছে। কাকিমা তো চলেই এসেছিলেন! স্বামী বেঁচে থাকলে কী হত? স্বামীর সঙ্গেই জীবন বেঁধে পেছন পেছন ঘুরতে হত। আজ অরক্ষিতা দেখে তেড়ে এসেছেন! ব্যবহারের বস্তু করতে চান। মূর্খ! দেহ তো কিনতেও পাওয়া যায়!

মাতুল বললেন, কী ব্যাপার? বাতাসে বারুদের গন্ধ?

পিতা বললেন, তুমি বোসো। আমার চিঠি পেয়েছ?

মাতুল বসতে বসতে বললেন, কই না, চিঠি তো পাইনি! কাল আমার রেডিয়ো প্রোগ্রাম আছে, তাই আজ চলে এলুম। আপনি কি অসুস্থ! কী একটা হয়েছে ঠিক ধরতে পারছি না।

পিতা বললেন, একটা নয়, একসঙ্গে অনেক কিছু হয়েছে!

মাতামহ শব্দ করে হাসলেন। যার অর্থ, সাধ করে ধরা দিতে এলে কেন বাপু! বেশ তো ছিলে মনের আনন্দে।

মাতুল বললেন, আপনি চাদর গায়ে দিয়েছেন? চাদর তো আপনাকে কখনও গায়ে দিতে দেখিনি!

কাকিমা এইসব কথার ফাঁকে ভেতরে চলে গেলেন। অনেক কাজ। বাড়িতে অতিথি এসেছেন। যে সে অতিথি নন, ভোজনবিলাসী শিল্পী। মনের মতো রান্না না হলে, পাতে বসে ঠুকরে চলে যাবেন।

পিতৃদেব ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করলেন। মাতামহের অসুস্থতা। প্রফুল্লকাকার মৃত্যু। নিজের দুর্ঘটনা। মামাশ্বশুরের আক্রমণ। শুনতে শুনতে মাতুল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। এসেছিলেন লঘু প্রজাপতির মতো। ভেবেছিলেন পুস্পোদ্যানে এসেছেন, যেমন আসতেন। বসন্ত যে বিদায় নিয়েছে। বৈশাখের জ্বলন্ত আগুনে সব শুকিয়ে গেছে। শীর্ণ শাখায় উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস। প্রবীণ মানুষ দু'জনের অদ্ভুত প্রাণশক্তি। যতবার ভেঙেছে ততবার গড়েছেন নতুনভাবে। এখনও সেই একই আশা। আবার হবে। আবার একদল আসবে শূন্যতা ভরে দিতে! আমার মন বলছে, এই শেষ। এ নাটকের যবনিকা পতনের সময় আসন্ন।

আমি যা ভাবছি, মাতুলও বোধহয় তাই ভাবছিলেন। সব শুনে উদাস মুখে বললেন, আবার সব ভাঙছে মনে হচ্ছে। ফাটল ধরেছে। বেশ কেমন সব গুছিয়ে উঠছিল!

পিতা বললেন, তুমি দুর্বল মানুষ, তাই তোমার চোখে ফাটল দেখছ, ভাঙন দেখছ। আমার কাছে এসব কিছু নয়। আমি থামতে জানি না, আমি ফিরতে জানি না। সহজে আমার মন ভেঙে পড়ে না। The tree the tempest with a crash of wood/throws down in front of us is not to bar/our passage to our journey's end for good/But just to ask us who we think we are. ভাঙলে ভাঙবে, আবার গড়ব।

মাতামহ বললেন, আমি তোমার দলে। তুমি রাজমিস্ত্রি, আমি তোমার জোগাড়ে। ইট বালি সিমেন্ট এগিয়ে দেব, মশলা মেখে দেব।

মাতুল বললেন, বাবাকে কাল আমি আমার এখানে নিয়ে যাই। ভাল জল বাতাস, শরীরটা সারবে।

নট এ ব্যাড প্রোপোজাল। এটা তো বেদের টোল। তবু ওখানে একটু যত্নআত্তি পাবেন।

মাতামহ সাধকের মতো আসন করে বসেছিলেন। বুদ্ধদেবের মতো ডান হাতের তালুটি বুকের কাছে ধরে, ডাইনে বামে নাড়াতে নাড়াতে বললেন, আই ওন্ট গো। আই ওন্ট গো। আমার এক পাশে হরি আর শঙ্কর, আর এক পাশে হর হর গঙ্গে, হরিপাদপদ্ম বিহারিণী গঙ্গে, হিমবিধু মুক্তাধবল তরঙ্গে। আই ওন্ট গো। আমার যত্নআত্তির প্রয়োজন নেই। এঘর থেকে বের করে দাও, আমি রকে গিয়ে বসব। রক থেকে নামিয়ে দাও, সামনের রাস্তায় গিয়ে বসে থাকব।

মাতুল মুখ ভার করে বললেন, আমার ওপর আপনি এখনও রেগে আছেন!

ধ্যার বোকা, রাগ হল যৌবনের অলংকার। তিনকাল গিয়ে যার এককালে ঠেকেছে, তার আবার রাগ কী! অভিমান হয়তো ছিল, তাও ভেসে গেছে। এখন আমি উদাসী রাজনারায়ণ।

পিতা বললেন, আমি আপনাকে একদিন বলেছি কারুর মনে দুঃখ দেবেন না। দুঃখ টেনিস বলের মতো বাউন্স করে ফিরে আসে।

তুমি আমার গুরু হরিশঙ্কর। তোমার কথা ভুলতে পারি? আমি দুঃখ দেবার জন্যে বলিনি। ছোট্ট একটা ব্যাপার আছে।

কী ব্যাপার?

সে আমি বলতে পারব না। আমার একটু লজ্জা লজ্জা করছে।

পিতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লজ্জা! কীসের লজ্জা!

মাতামহ হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। কান্নার প্রথম আবেগ কোনওক্রমে সামলে নিলেন। বুকটা বিশাল হয়ে উঠল। জোরে নিশ্বাস নিয়ে, বাতাস দিয়ে আবেগের উৎসস্থল চেপে ধরলেন। ছোট ছোট বাক্যে বলতে লাগলেন, আমার মেয়ে তুলসী। তোমার স্ত্রী। আমি তাকে বড় অবহেলা করে এসেছি। সে একটা যুগ ছিল, সংসারে মেয়ের চেয়ে ছেলের আদর হত বেশি। মাছের মুড়ো ছেলের পাতে, দুধের সর ছেলের ভাগে, ভাল জুতো, ভাল জামা। মা-মরা মেয়ে, ডুরে শাড়ি পরে ধুলো পায়ে একা একা ঘুরছে। আমি এখনও সে দৃশ্য দেখতে পাই হরিশঙ্কর। কাকিমাদের মুখঝামটা খাচ্ছে থেকে থেকে। আর আমি? আমি এক শয়তান। আমাকে তখন ধর্মে পেয়েছে। ভণ্ডের ধর্ম। ধর্মের নামে মাংস চলছে, মাছ চলছে, অল্পস্বল্প কারণবারি চলছে। ছেলেকে চপচপে গাওয়া ঘিয়ের মোহনভোগ খাইয়ে কাঁধে করে ওস্তাদের কাছে নিয়ে চলেছি ওস্তাদ বানাতে। তুলসী আমার একা। একদিন হঠাৎ বায়না শুরু করলে, কলকাতায় বিলিতি সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। কোনওদিন বায়না করে না, সেদিন যে কী হল! মাথায় যেন ভূত চাপল। বুঝলে হরিশঙ্কর, মারলুম ঠেসে এক চড়। ঘুরে পড়ে গেল চৌকাঠের ওপর। সামনের একটা দাঁতের কোণ ভেঙে গেল। ওই যে ছবি দেখছ হরিশঙ্কর, ওই যে দেয়ালে ঝুলছে, ওই ছবির তুলসী যদি এখন ফিক করে হাসে, তুমি দেখতে পাবে, একটা দাঁত একটু কোনা-ভাঙা। এই বুড়ো সে জন্যে দায়ী। যার কোনও বিচার হল না। যার কোনও বিচার হবে না। তোমার ভাষায় যে হল, অলমাইটি ফাদার। তুলসীকে আমি কিছুই দিতে পারিনি হরিশঙ্কর, অবহেলা ছাড়া। যখন ভাবলুম, এবার দিতে হবে, তখন সে চলে গেল অভিমানে, পাছে কিছু নিতে হয় বলে। তুমি জানো বিয়ের পর ওকে আমি একটা সাপ-বালা দিয়েছিলুম। জোড়া সাপ। সাপের চারটে চোখে চারটে লাল রুবি বসানো ছিল। খুব বড় কারিগরের তৈরি।

পিতা বললেন, জানি।

তুমি জানো, একদিন সে ওটা ফেরত দিয়ে এল।

জানি। আমিই বলেছিলুম দিয়ে আসতে।

তুমি? কেন বলেছিলে হরিশঙ্কর?

আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যে। আমি তখন খুব নীচ ছিলুম। অহংকারে ফেটে পড়তুম। ক্রুড ছিলুম, ভালগার ছিলুম। আপনাকে বলেইছি, দুঃখ টেনিস বলের মতো। কারুর দিকে ছুড়ে দিলেই ফিরে আসে। আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। কোনও মানুষই পারফেক্ট নয়। যত জ্বলবেন যত পুড়বেন তত বিশুদ্ধ হবেন। আমি আপনাকে সান্ত্বনা দিতে চাই না। দুঃখে আপনার ভেতরটা গুমরে গুমরে উঠুক। প্রতি স্পন্দনে একটি করে দেবদূত মুক্তি পাক। মনে পড়ে বায়রন তাঁর কন্যার দুঃখজনক অকাল মৃত্যুতে সমাধি ফলকে কী লিখেছিলেন?

মাতুল বললেন, I shall go to her, but she shall not return to me.

পিতা বললেন, তার মানে, আমি তার কাছে যেতে পারি, সে কিন্তু আমার কাছে আর ফিরে আসবে না।

মাতামহ বললেন, আমি যে তার কাছে যাব বলেই বেরিয়ে এসেছি। আমি তো জানি সে আর আসবে না। যাহা যায় তাহা যায়। আমার যৌবন আর ফিরবে না। কিশোরী তুলসী আর ফিরে আসবে না। পেছন দিক থেকে গলা জড়িয়ে ধরবে না। জীবনে যত ভুল করে এসেছি সেসব আর শোধরানো যাবে না। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে।

যাক না। আমার একটা ধারণা আছে শুনবেন! আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে অশরীরী ভৌতিক সত্তা আছে। ছাঁচের মতো। আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমার একটা আমি আছে। আপনার একটা আপনি আছেন। কোথাও আছে। কোথায় আছে তা জানি না। প্রতিটি অনুশোচনার তরঙ্গে সেই ছাঁচের হৃদয় পালটাচ্ছে, মন পালটাচ্ছে, আকার আকৃতি পালটাচ্ছে। আবার যখন আমরা ঢালাই হব তখন আমরা আরও সুন্দর হব। নিখুঁত হব। ভয় কী? আপনি প্রাণ খুলে কেঁদে যান। অনুশোচনায় চড়চড় করে পুড়তে থাকুন। আমারও দিন আসছে। সকলেরই দিন আসবে। অতীত হাত ফসকে চলে গেছে যাক। ভবিষ্যৎ তো আছে।

মাতুল বললেন, দিদির তো তেমন দুঃখ করার কথা নয়। আমি তো সবসময় পাশেপাশেই থাকতুম। তারপর বিয়ের পর জামাইবাবু!

পিতা বললেন, জামাইবাবুর কথা আর বোলো না। তখন আমার তিন ভাগ অমানুষ ছিল আর এক ভাগ মানুষ। দোর্দণ্ডপ্রতাপে সংসার করতে গিয়ে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে পড়ে গেলুম। তোমার দিদিকে আমি একেবারে চেপে রেখেছিলুম। আমার তখন কী অহংকার! আমি পুরুষ! জুজুর মতো ভয় দেখিয়ে মজা পেতুম। আমার সেই রেপ্লিকা, যেটা কোথাও-না-কোথাও আছে, সেটা দিন দিন আমার সংকীর্ণতায় শুকিয়ে চামচিকির মতো হয়ে গেল। সামলে দেবার মতো কেউ তো ছিল না পাশে। আমাকে ধাক্কা মারার সাহস কারুর ছিল না। ভীরু আর কাপুরুষ নিয়ে সংসার করেছে অত্যাচারী হরিশঙ্কর। আর তুলসী ছিল ঠিক তুলসীরই মতো। বুক ফাটত, তবু মুখ ফুটত না। রাবিশ। আমি একটা রাবিশ।

মাতামহ বললেন, তুমিও জ্বলছ হরিশঙ্কর?

সর্বক্ষণ আমি জ্বলছি। আই অ্যাম এ বার্নিং মাস! অন্ধকার নক্ষত্রের মতো ধকধক করে জ্বলছি। জীবনের পর জীবন জ্বলতে জ্বলতে একদিন হয়তো পৃথিবীর মতো হরিতাভ একটি গ্রহ হব, তখন সেই মাটিতে জীবন জীবনের মতো খেলবে, প্রেমে ভালবাসায় স্নেহে আনন্দে। নিজেদের চিতা নিজেরাই সাজিয়ে যাই ততদিন। তাই তো আমি প্রফুল্লর স্ত্রীর প্রতি কঠোর হতে পারছি না আর আগের মতো। বলতে পারছি না নিজের পথ নিজে দেখে নাও। সে যে একেবারে অসহায় আশ্রিতা।

মাতুল বললেন, আপনার প্রতিপালনের মতো সংগতি আছে, একটা জীবন যদি আশ্রয় চায় আশ্রয় দেওয়া উচিত।

জয়, মানুষের তুমি কতটুকু জানো? এই সামান্য ব্যাপার কত অসামান্য হয়ে ওঠে একবার দেখো। আমিও প্রস্তুত। এতকাল অকারণে লড়েছি, এইবার একটা কারণে লড়ব। ছোবল খেতে খেতে নীলকণ্ঠ হয়ে যাব।

মাতামহ বললেন, তোমার পাশে আমি না থাকলে তুমি লড়বে কী করে! যত লড়াই তো আমরা দু'জনে করে এসেছি। এই যেমন একটু একপক্কড় হয়ে গেল। ব্যাটাকে আমি মেরেই দিতুম। নেহাত তোমার অবাধ্য হতে পারি না তাই!

মাতুল বললেন, লড়াইয়ের জন্যে সুস্থ শরীর চাই। ওখানে এক নম্বর হাসপাতাল, এক নম্বর ডাক্তার, ভাল জল, ভাল হাওয়া। দিনকয়েক থেকেই চলে আসবেন।

মাতামহ মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, যদি রাগ না করো একটা কথা বলব?

পিতা বললেন, নিশ্চয় বলবেন।

আমার ভাল লাগে না। ওদের স্বভাবটা একটু ম্লেচ্ছ ধরনের। মুরগি, মুরগির ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, এঁটোকাঁটার বিচার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিক নেই। ধূপধুনো নেই। আমার ভাল লাগে না হরিশঙ্কর। ওস্তাদের বাড়ির হালচাল ওস্তাদের মতো।

মাতুল বললেন, আপনি যেভাবে থাকতে চান, সেইভাবেই থাকার ব্যবস্থা করে দোব। মাছমাংস, ডিম বাড়িতে ঢুকবে না। আলাদা ঠাকুরঘরের ব্যবস্থাও আছে।

কিন্তু! মাতামহ মুখ নিচু করে রইলেন। যখন মুখ তুললেন, চোখদুটো ছলছল করছে। আবেগে বুক আবার প্রশস্ত হয়েছে। কোনওরকমে ঢোঁক গিলে বললেন, কিন্তু এখানে যে তুলসী আছে। তোমরা কেউ দেখতে পাও না হরিশঙ্কর, আমি দেখতে পাই, তুলসী এখনও এখানে আছে। আমার নাতিটার মুখের দিকে তাকাও। সেই চোখ, সেই নাক, মুখ, হাসির ধরন, ভাবভঙ্গি, সব তুলসীর মতো। তার আত্মাও এখানে আছে। আমি যখনই আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকি, সে এসে আমার কপালে হাত রেখে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, বাবা, বড় কষ্ট? এই তো আমি তোমার মাথার কাছে রয়েছি।

মাতুল বললেন, ও আপনার মনের ভুল। দিদির খুব পুণ্য ছিল। দিদি কখনও ভূত হয়ে ঘুরতে পারে না।

পিতা বললেন, জয়, ব্যাপারটা ভূতপ্রেতের ব্যাপার নয়। এসব বোঝার ক্ষমতা তোমার হবে না। এ বুঝতে হলে তোমাকে আর এক প্লেনে চলে যেতে হবে। আমি জানি, উনি যে কথা বলছেন তা সেন্টপারসেন্ট সত্য। এখানে যা শূন্য ওখানে তা পূর্ণ। তোমার চোখে যা নেই, আমার চোখে তা আছে, তোমার ভাবে নেই আমার

ভাবে আছে। তুমি তো শিল্পী! তোমার তো এসব বোঝা উচিত। সুরের পথে তুমি তো বিভিন্ন লোকে চলে যেতে পারো! পারো না?

হ্যাঁ, তা পারি।

পিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, জগতে কেউ দেখতে না পায়/লুকানো তাঁর বাতি/আঁচল দিয়ে আড়াল করে/জ্বালান সারা রাতি/ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই/আনাগোনা করে/অন্ধকারে হাসেন তিনি/আমাদের এই ঘরে।

মাতামহ ছেলেমানুষের মতো বললেন, আমি তোমার সঙ্গে যাব না। যেতেই যদি হয় আমি হরিদ্বারে যাব।

কাকিমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, কী, তুমি বাজার করবে না? বেলা যে বেড়ে গেল।

মাতুল বললেন, চল, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, দু'জনে একসঙ্গে যাই। চল আজ বড়বাজারে যাই। কতদিন পরে এ বাড়িতে আমি পাত পাড়ব! বেশ গুছিয়ে বাজার করি দু'জনে মিলে।

পিতা বললেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে, জয়। কখন রান্না হবে?

আপনি সময়ের কথা বলছেন? আপনি না বলেছিলেন, আমি সময়ের দাস নই। সময় আমার দাস। চালাও পানসি বেলঘরিয়া।

কয়েক মাস আগে হলে পিতৃদেব এর উত্তরে কী বলতেন জানা নেই, আজ শুধু মৃদু হাসলেন। এ যেন বোমাবর্ষণের দিনে, নহবতে সানাই বসিয়ে বিবাহের আয়োজন। মাতুল আমার এক এমন চরিত্র যাঁর উৎসাহ দমিয়ে দিতে সকলেরই খারাপ লাগে। প্রজাপতি ফুলের আনন্দে ডানা মেলে উড়বে। সেইটাই স্বাভাবিক। অ্যালবামে পেস্ট করে রাখবেন তাঁরা যাঁরা হৃদয়হীন।

ঝকঝকে নতুন গাড়ি। সামনে লেখা অস্টিন অফ ইংল্যান্ড। উর্দি-পরা ড্রাইভার ফেদার ডাস্টার দিয়ে আদুরে গাড়ির ধুলো ঝাড়ছিলেন। মাতুল বললেন, গাড়িটা কীরকম ম্যানেজ করেছি বল?

কিনলেন?

ধ্যার, আমি তো এখন ফকির। জানিস তো, রাজার উলটো পিঠ ফকির, ফকিরের উলটো পিঠ রাজা। ওখানে আমার খুব খাতির, বুঝলি। একেবারে ডনজুয়ান। চাটুজ্যেমশাইকে যেন বলিসনি। ডন জুয়ান কথাটা তেমন ভাল নয়।

ড্রাইভারকে বললেন, নিউমার্কেটে যাব। কলকাতার কিছু চেনো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি তো কলকাতারই ছেলে।

আমাকে বললেন, কতক্ষণ লাগবে বল তো?

আধঘণ্টা।

বুঝলি, বেশ জমে গেছে। কিছু একটা জানলে কিছু-না-কিছু করা যায়, একেবারে বেকার বসে থাকতে হয় না। তোকে আমি কিছুতেই আর্টের লাইনে আনতে পারলুম না। কী যে এক চাকরি ধরেছিস!

আপনাকেও তো শেষপর্যন্ত সেই চাকরিতেই যেতে হল।

এটাকে তুই ঠিক চাকরি বলতে পারিস না। অধ্যাপনা। না, এও চাকরিই রে। হল না, জীবনে যেসব স্বপ্ন ছিল, কিছুই তো বাস্তবে পরিণত করা গেল না। চতুর্দিকে ব্যর্থতা। তোদের বাড়িতেও তো এলোমেলো হাওয়া

হইছে! প্রফুল্লদার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে হয়েছে!

বেশ ঘোলাটে। চারপাশে যা-তা কথা চালু হয়ে গেছে।

তোরা কিছু বললি না, আমিও সাহস করে তখন জিজ্ঞেস করলুম না। প্রফুল্লদা কি সুইসাইড করেছেন?

আজ্ঞে না! সন্দেহজনক মৃত্যু। ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।

বাবা! সেকী রে? ভদ্রলোক খুন হয়?

তাই তো হলেন।

চাটুজ্যেমশাইয়ের সারাটা জীবনে একের পর এক কেবল উটকো ঝামেলা। এক যায় তো আর এক আসে। তুই তখন ছোট, বাড়িতে কাজ করতে এল সুধীর। খুব ভাল, খুব ভাল। সুধীরের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল। কী ব্যাপার! সুধীর এক ফেরারি ডাকাত। পোঁটলার ভেতর থেকে রিভলভার বেরোল, আরও সব চোরাই মাল। সে এক হইহই ব্যাপার। কিছুদিন পরে এক বিধবা ভদ্রমহিলা এলেন রাঁধুনি হয়ে বছর না ঘুরতেই তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বাবা এসে চেপে ধরলেন। জেরায় জেরায় অপরাধীর সন্ধান বেরোল। ওই তোদের পাড়ার মিষ্টির দোকানের বছর কুড়ি বয়সের এক ছেলে। মার মার কাট কাট ব্যাপার। শেষে দু'জনেই পাড়া-ছাড়া হল। কিছু বলার নেই। সবই হল গ্রহের কারসাজি। দেখ এ যাত্রা আবার কী হয়! আমিও চলে গেলুম বহুদূরে। তুই ওই ভদ্রমহিলাকে বুঝিয়ে বল না, কেন এই সৎ ভালমানুষটিকে বিপদে ফেলছেন? পয়সাঅলা... ও লোকটা কে হয় রে? ওই যে মর্কটমুনি?

মামাশ্বশুর।

তার মানে প্রফুল্লদার মামা! তুই বল আপনি ওইখানে গিয়ে সুখে থাকুন।

উনি যাবেন না। লোকটা ডিবচ।

সে আমি জানি। খুব ঘোড়েল লোক। তা হলে, আমিই বরং আমার ওখানে নিয়ে যাই। তোর মামির ছেলেপুলে হবে। আর একজন মহিলা থাকলে সুবিধে হবে।

চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

তোরা বল, তা না হলে ভদ্রমহিলা অন্যরকম ভাববেন। মানসম্ভ্রমে লাগবে।

দেখি আজ রাতে বাবাকে বলব।

কথায় কথায় গাড়ি নিউমার্কেটে এসে গেল। সায়েবি ব্যাপারস্যাপার। মাতুল আনন্দে ছটফট করছেন। কখনও বলছেন বোনলেস ভেটকি কিনবেন। কখনও বলছেন, ম্যাওয়া কিনবেন। কখনও বলছেন, একঝাঁক মুনিয়া পাখি কিনবেন। একবার এদিকে ছুটছেন, একবার ওদিকে ছুটছেন। পেছন পেছন গোটা তিনেক মুটে ছুটছে সাহাব সাহাব করে। মাতুলের হাত চেপে ধরে বললুম, আগে ঠিক করুন কী কিনবেন? মনে মনে একটা ফর্দ তৈরি করুন।

তা হলে মাছ দিয়ে শুরু হোক, বোনলেস ভেটকি।

মাছের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে মাতুল ওজন বললেন। কাটাছেঁড়া চলছে। হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁরে প্রফুল্লদার স্ত্রী, মানে বউদি তো বিধবা হয়েছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে মাছ মাংস ডিম তো চলবে না! তা হলে থাক। আমরা খাব আর উনি দেখবেন তা তো হয় না। চল তা হলে ভেজিটেবলের দিকেই যাওয়া যাক।

I could give all to time, except what I myself have held.

তম্বুরাটি বেশ মনের মতো বাঁধা হয়েছে। মাতামহ ঠিক যেমনটি চান। মাতুল হারমোনিয়মে ছোট ছোট তান ছাড়ছেন, ঠুংরির মুখ মোচড় মেরে মেরে উঠছে। আমার কাঁধে তানপুরা। সামনে পাশাপাশি বসেছেন মাতামহ আর পিতৃদেব। সন্ধে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এইমাত্র চা হল। এইবার আসর বসবে। কারুর মনেই তেমন সুখ নেই। সকলেরই মন বলছে, কিছু একটা ঘটবে। কী ঘটতে পারে জানা নেই। আজ অক্ষয় কাকাবাবু এলে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে বলতে পারতেন, কার ভাগ্যে কী নাচছে! মাতুলের একটু রেওয়াজের প্রয়োজন। আগামীকাল তিন তিনটে সিটিং এ আই আর-এ। সকালে খেয়াল। গাইবেন দেশি টোড়ি। সন্ধেবেলা গাইবেন ইমন। রাতে ঠুংরি!

মাতুল হারমোনিয়মে একটা সাপট তান মেরে সুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আহা, আজ যদি প্রফুল্লদা থাকতেন!

পিতা বললেন, আমার শরীরটা ঠিক থাকলে তোমার সঙ্গে সংগতে বসতে পারতুম। বুকটা এখনও ইনফ্লেমড হয়ে আছে।

মাতুল ঘাড় নিচু করে বার দুয়েক সুর ভেঁজেই গান ধরে ফেললেন। নিমেষে ঘরের আবহাওয়া পালটে গেল। শ্রোতারা স্তম্ভিত। এত বেলায় খাওয়া হয়েছে, তবু মাতুলের গলা অসাধারণ বলছে। ডি শার্পে গান ধরেছেন। তারায় গিয়ে যখন সুর টেনে দাঁড়িয়ে পড়ছেন ঘরের কাচের শার্সি চিনচিন করে উঠছে। পাশে-রাখা চায়ের খালি কাপডিশ উল্লাসে গলা মেলাচ্ছে। গানে বসলে মাতুলের চোখমুখ, হাবভাব একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। পুরো ব্যক্তিত্বটাই একেবারে পালটে যায়। মনে হতে থাকে বহু দূরের মানুষ। পৃথিবীর সব সম্পর্কের বাইরের এক সুরসাধক। মীড়, মূর্ছনা, গমক, চক্রধা তানে ইমনের রূপ-কল্পনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

মাতামহ যে-জায়গায় বসেছেন সেদিকে আলোর শেড একটা ছায়া ফেলেছে। তপ্তকাঞ্চনের মতো গাত্রবর্ণ, স্থির বসে থাকার ভঙ্গি, সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে, মহাদেব যেন গান শুনতে এসেছেন। চোখদুটি নিমীলিত। মুখে অসাধারণ এক তৃপ্তির ছোঁয়া লেগেছে। ছেলের মতো ছেলে হলে কোন পিতার না গর্ব হয়! আমিও যদি কিছু একটা হতে পারি, পুত্রগর্বে আমার পিতার বুক ভরে যাবে। আমার দ্বারা আর কী হওয়া সম্ভব? দরকচা মেরে গেছি।

মাতুল আমার হাতে কনুইয়ের খোঁচা মেরে ইশারায় বললেন, ধর, ধরে ফেল।

আমার গলা সি শার্পে, ডি-তে তুলি কী করে? মাতামহ চাপাস্বরে বললেন, ধর, ধর, ধরে ফেল। মাতুল ছোট্ট একটি তানের কাজ করে গানের মুখটি আমায় দিয়ে দিলেন। আর উপায় নেই। সময় সময় মানুষের

ভেতরটা জেগে ওঠে। তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়। দুর্বলও লোহার গরাদ বাঁকিয়ে ফেলতে পারে। আমারও তাই হল। সুর আমার পরিচিত। আরোহণ অবরোহণ বাদী সমবাদী জানা। গানের বাণী আমার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতের বাণী অধিকাংশ সময়েই অস্পষ্ট। সুরের তলায় লুকিয়ে থাকে। কীভাবে জানি না মুখটাকে ঘুরিয়ে সমে ফেলে দিলুম। মাতুল বললেন, বহত আচ্ছা!

সুরকে কী কী ভাবে কত ভাবে যে মোচড়ানো যায়! কত বিচিত্র যে তার গতিপথ! প্রায় ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল একই ইমন চলছে, তবু একঘেয়ে ক্লান্তিকর মনে হচ্ছে না। লয় চলেছে ঘড়ির মতো। সুরে আর সময়ে টানাপোড়েন চলেছে। সুরের একটা আবরণী তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে সময় আর শ্রোতা স্তব্ধ।

শেষ চরণটি গেয়ে মাতুল গান ছাড়লেন। চোখ আধ-বোজা, ফরসা মুখে চাপা আলো খেলছে। ফিসফিস করে আমাকে বললেন, গান শেখ গান শেখ। বড় আনন্দ পাবি! কোথায় যে চলে যাবি! ম্যাজিশিয়ানের দড়ির খেলার মতো সুর ওপরে উঠতে উঠতে তোকে অনন্তে নিয়ে যাবে। লেগে যা ব্যাটা।

মাতামহ তৃপ্ত মুখে মৃদু মৃদু হাসছেন আর হাঁটুতে ধীরে ধীরে চাপড় মারছেন। পিতা বললেন, নিজের মেজাজের জন্যে তুমি একঘরে হয়ে রইলে। বাইরের জগতের সঙ্গে একটু যদি মানিয়ে চলতে শিখতে?

মাতুল হারমোনিয়মে সুর টিপে বললেন, গান আমি ফেরি করতে পারব না। এ আমার অহংকার নয়, আমার আদর্শ। এর জন্যে না খেয়ে মরতে হলেও আমি প্রস্তুত।

তুমি যে সংসার করে ফেলেছ জয়।

বাউলেরও তো সংসার থাকে। সেইভাবেই নেচে নেচে আকাশবৃত্তি করে বেড়াব।

মাতুল হঠাৎ প্রচণ্ড আবেগে গান ধরলেন। দেশ রাগে ঠুংরি। ধরামাত্রই বাতাসে একটা ব্যাপার ঘটে গেল। নির্বাপিত হোমকুণ্ডে আঘাত করলে চারপাশে যেমন স্ফুলিঙ্গ উড়তে থাকে, সেইরকম কণা কণা সুর সারাঘরে লম্বা লম্বা আলপিনের মতো ছুটতে লাগল। মাতুল গাইছেন, সেঁইয়া করো তোরে শ্যাম। দেশ, একেবারে কান্নার রাগিণী। ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে দেয়। প্রথম লাইনটাই মাতুল কতভাবে গাইছেন।

সেঁইয়া করো তোরে শ্যাম
করত জিয়া বিমতি রাতি॥
মানত নেহি মেরি বাতিয়া
ক্যায়সে কাটাঁউ দিন রাতিয়া॥

এক একটি শব্দ যেন সুরের ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কোনওটা জানলা গলে উড়ে যাচ্ছে দূর তারা-ভরা আকাশের দিকে। কোনওটা লাট খেয়ে ফিরে আসছে। কী যে হচ্ছে, বলে বোঝানো যাবে না। ফিনফিনে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবি পরে মাতুল বসেছেন। অনামিকায় হিরের আংটি চিকমিক করছে। সিনেমা সব নিয়েছে, আংটিটা নিতে পারেনি। ঘাড়ের কাছে চুল নেমে কুঁকড়ে আছে।

সেদিন চিৎপুরে বড় মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্বজন্মের হঠাৎ যে অনুভূতি হয়েছিল, আজও যেন তাই হচ্ছে। ছায়াছায়া নির্জন রাস্তা ধরে জুড়িগাড়ি চেপে চলেছি। মধ্যরাতের নির্জন পাতা-কাঁপানো বাতাস। ঘোড়ার গলার রুপোর ঘণ্টা বাজছে শৌখিন সুরে। দূর থেকে ভেসে আসছে বাইজির গলা। কাফি সিন্ধুতে দাদরা

ধরেছে। তবলার লগ্‌গি চলেছে। কতকাল আগের সেই নেশার রাত আজ আবার ফিরে এসেছে। গোলাপি বেনারসির আবরণে সুঠাম শরীর। এক হাতে কান চেপে আর এক হাত শূন্যে ভাসিয়ে তেহাই মেরে সমে আসছে। নাকছাবির হিরের চোখ মাঝে মাঝে আলোর ছোবল মেরে যাচ্ছে। তবক লাগানো পানের খিলি, মোহরের থলি। আমি যে তখন কী ছিলুম! কী থেকে কী হলুম! একই সংগীত আমরা তিনজনে শুনছি। পিতার চোখ মুদ্রিত। মাতামহের অশ্রুসজল। আর আমার? বড় সংসার করতে ইচ্ছে করছে। একে একে তারা আসছে। কনক, অপর্ণা, মুকু, এমনকী আমার প্রথম প্রেম মায়া। রাতের উতলা বাতাসে সুরের পথ বেয়ে তারা সব একে একে আসছে। এ যেন আমার ফুলশয্যার রাত।

রাস্তা দিয়ে হেঁকে চলেছে সেই চেনা ফেরিঅলা, ভারী চাপা গলা, মালাই। এ গলা আমি পূর্বজন্মে বহুবার শুনেছি। তখন হাঁকত, বেলফুল। পিতৃদেব বলেছিলেন, কোথাও-না-কোথাও আমাদের একটা অশরীরী ছাঁচ আছে। দেহগত আত্মার ক্ষণ আবেগে প্রতি মুহূর্তে সেই ছাঁচের আদল পালটাচ্ছে। সেনসিটিভ ফটোগ্রাফিক প্লেটের মতো পরবর্তী ব্যবহারের জন্যে সব ইমোশনের ছাপ ধরা থাকছে। সৃষ্টিকর্তা আলোর দিকে এক্সরে প্লেটের মতো তুলে ধরবেন, পরবর্তী জন্মের সময় মেপে মেপে হৃদয়বৃত্তি, দেহবৃত্তির পাওনা বুঝিয়ে দেবেন। এই নাও তোমার অর্জিত ফল। প্রারব্ধ বুঝে নিয়ে প্রবেশ করো মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে। এই মুহূর্তে আমার মন ছেয়ে গেছে অদ্ভুত এক কামমিশ্রিত আধ্যাত্মিক ভাবে। একজন মানবীকে পেতে চাইছি উপাস্য দেবী হিসেবে।

মাতুল গান শেষ করলেন। সুর জলপ্রবাহের মতো ছোট বড় তরঙ্গের আকারে অসীমে ধাবিত হল। বাইরের জগতের প্রাত্যহিক কোলাহলের ছিটেফোঁটা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। গাড়ির শব্দ, লোক চলাচলের শব্দ, পথচারীর বাক্যালাপ।

মাতামহ হঠাৎ গান ধরলেন। সেই এক সুর। দেশ। উগ্রচণ্ডা ভাবে নয়। মৃদু সুললিত। মাতামহের এত সংযত সুর ভাঁজা আগে কখনও শুনিনি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যার অর্থ তানপুরাটা আমার হাতে দাও। মাতুল হারমোনিয়মে অনুসরণ করছেন। মাতামহ সোজা বসেছেন। কাঁধে তানপুরা। ধীরে সুর ছাড়ছেন। আলাপে সুরের অবয়ব তৈরি হল। গান ধরলেন,

উঠো গো করুণাময়ী খোলো গো কুটির দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি হৃদি কাঁদে অনিবার॥

দুটি চরণই বারেবারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন। সুর থেকে এতটুকু সরে যাচ্ছেন না। আবেগে মাঝে মাঝে গলা বুজে আসছে। ক্রমশই বুক চিতিয়ে উঠছে। মেরুদণ্ড সোজা হচ্ছে, হৃদি কাঁদে অনিবার বলার সময় সত্যিই কেঁদে ফেলছেন। দু'চোখে ধারা নেমেছে। মুখে অদ্ভুত এক ধরনের দ্যুতি খেলছে। বহু আসরে বসে বহু নামজাদা সংগীত গুণীর পরিবেশন শুনেছি, এমন জীবন-মরণ সংগীত আগে কখনও শুনিনি। সুর মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ বর্শার ফলার মতো আমাদের অন্তরাত্মা ভেদ করে যাচ্ছে। মাতুলের সংযত হারমোনিয়ম অনুসরণ করে চলেছে। দরজার চৌকাঠে কাকিমা এসে বসেছেন। সারাঘর ঝিমঝিম করছে। মাতামহ তারা থেকে মুদারায় নেমে এসে করুণ আকুতিতে বললেন, খোলো গো কুটিরদ্বার, তারপর নাভিপদ্ম থেকে একটি শব্দ তুললেন, ওঁ। এমন ওঁ-কার ধ্বনি শুনিনি কখনও। পর্বতের নির্জন গুহার নিবিড়তা থেকে মেঘ গর্জনের শব্দের মতো

উচ্চারিত হল। আমাদের সমস্ত শরীর শব্দতরঙ্গে কেঁপে উঠল। তানপুরাটি মাতামহের শিথিল হাত থেকে ধীরে ধীরে মাটির দিকে নেমে আসছে। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললুম। পিতৃদেব আর মাতুল দু'জনে একসঙ্গে বললেন অপূর্ব, স্বর্গীয়!

মাতামহের কোনও ভাবান্তর নেই। নিশ্চল, ভাষাহীন। সারাঘরে অপূর্ব এক সুগন্ধ। একই সঙ্গে গোলাপ আর চন্দনের সুবাস। পিতা বললেন, কোথা থেকে ধূপের গন্ধ আসছে!

মাতুল বললেন, মৃগনাভি।

মাতামহ স্থির নিশ্চল। পদ্মাসনে বসে আছেন। সারা মুখমণ্ডলে অদ্ভুত এক দ্যুতি। মুদ্রিত চোখে কাকে যেন দেখেছেন, যিনি সচরাচর সাধারণ মানুষকে দেখা দেন না।

পিতা বললেন, এবার আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

কোনও উত্তর নেই।

মাতুল হারমোনিয়ম ছেড়ে পাশে সরে এসে বললেন, আপনাকে প্রণাম করি। আপনার গান শুনে সময় সময় কত ব্যঙ্গ করেছি, আজ যা শোনালেন, তার কোনও তুলনা হয় না।

মাতুল পায়ের আঙুল স্পর্শ করে চমকে উঠলেন, একী, বরফের কুচি! চাটুজ্যেমশাই একবার দেখুন তো!

পিতা সামনে ঝুঁকে মাতামহের মুখের দিকে তাকালেন, হামাগুড়ি দিয়ে বুকে কান রাখলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীর কণ্ঠে বললেন, হরি ওঁ, হরি ওঁ।

মাতুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কী হল?

উঠে দাঁড়াও।

আমরা দু'জনেই উঠে দাঁড়ালাম।

এদিকে এসো। এই দেখো ব্রহ্মতালু খুলে গেছে। সাধক দেহত্যাগ করেছেন।

মাতুল হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন। দু'হাতে মুখ ঢেকে শুধু একবার বললেন, বাবা। সকলের চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলেন ধরতে পারলুম না!

পিতৃদেব প্রহরীর মতো পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। দু'চোখে জল নেমেছে। মায়ের ছবির দিকে তাকালুম। চোখের ভুলও হতে পারে। মনে হচ্ছে মা যেন কিছু একটা বলে ঠোঁট বোজাচ্ছেন। কী বললেন তাও যেন শুনতে পাচ্ছি—বাবা চলে এসো। অনেকদিন হয়ে গেছে, আর না। এবার ঘরে ফিরে এসো।

কাকিমা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন। আমি আর সইতে পারলুম না। মৃত্যু যতই মহান হোক, সব থেকেও মানুষের ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে যেতে পারে, সেই প্রথম অনুভব করলুম। শূন্য একটা খোলসের মতো মাতামহের পায়ের কাছে পড়ে গেলুম। সতীমা গঙ্গার ঘাটে যেদিন আমাকে স্পর্শ করেছিলেন সেদিন আমার ঠিক এইরকমই হয়েছিল। সেই ভয়াবহ প্রান্তর আবার ফিরে এসেছে। প্রদোষের অন্ধকার। ছাইছাই রঙের মাঠ, গাছপালা, কাঁটাঝোপ। ছোট ছোট টিলা। মাতামহ আগে আগে চলেছেন। সোনালি গেরুয়া বসন। মনে হচ্ছে পা যেন ফেলছেন না, অথচ আমি তাঁকে কিছুতেই ধরতে পারছি না। সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট ব্যবধান থেকে যাচ্ছে। দূর থেকে ঝাঁক ঝাঁক বাদুড় উড়ে আসছে। ডানার সামান্যতম আস্ফালন নেই। তারা যেন ঘন অন্ধকারের চাদর টেনে আনছে। বহুবার ডাকার চেষ্টা করছি, বলার চেষ্টা করছি দাদু, আপনি

কোথায় চলেছেন? গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি দিয়ে সাজানো, অদ্ভুত চেহারার একটা-দুটো বাড়ি। মনে হচ্ছে ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। পত্রহীন একটি গাছের তলায় মাথায় হাত রেখে দুটি মানুষ পাশাপাশি উবু হয়ে বসে আছে। যেন উইয়ের ঢিবি। ফুটো ফুটো, বিঁধ বিঁধ হয়ে গেছে। মাতামহ সোজা চলেছেন। হঠাৎ আমার চোখ ঝলসে গেল। সামনে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সোনার পাতে মোড়া দিগন্তে রুপোর চাঁদ উঠেছে। আমার সামনে বিশাল এক জলাশয়, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সোনালি আর রুপোলি তরঙ্গ খেলছে। মাতামহ ধীরে ধীরে সেই জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সোনালি ছায়া ক্রমশই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই জলের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমি সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখছি। রুপোলি সমুদ্রে স্বর্ণপ্রতিমার ধীর নিমজ্জন। স্বচ্ছ জলে একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলে দিলে যেমন হয়, মাতামহ ধীরে ধীরে গভীর থেকে গভীরে নেমে গেলেন, স্বর্ণদ্যুতি নিক্ষেপ করতে করতে। আর তাঁকে দেখা গেল না। অসীম শূন্যতায় নির্জন দিগন্ত। হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝাঁক নীল পাখি এসে জলের ওপর নিঃশব্দে উড়তে লাগল। মনে হল আমি এক তরল হোমকুণ্ডের তটভাগে এসে দাঁড়িয়েছি।

অচৈতন্য হয়েছিলাম কি না জানি না, হঠাৎ পরিবেশে ফিরে এলুম একটি শব্দতরঙ্গ ধরে— জয় রাম, জয় রাম। এ যেন আর এক স্বপ্ন। ঘরে প্রবেশ করছেন হরিদ্বারের সেই সন্ন্যাসী। মাতামহের গুরুদেব। বেটা হাম আ গিয়া। ঠারো ঠারো।

মাতামহকে উপবিষ্ট অবস্থা থেকে শায়িত করার চেষ্টা চলেছে। কাকিমা দরজার কাছ থেকে ঘরের আর একটু ভেতরে এসেছেন। পিতৃদেব আর মাতুল দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ন্যাসীকে দেখে দু'জনেই অবাক হলেন, গুরুজি, আপ?

হাঁ বেটা, হাম আ গিয়া।

সন্ন্যাসী পরপর কয়েকটি কাজ করতে বললেন। বেলপাতা চাই, তুলসীপাতা চাই, চন্দনবাটা চাই। গঙ্গাজলের প্রয়োজন। ফুল, ফুলের মালা, একটি সোনার তবক। মৃত্যুর পর মানুষের শরীর শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়া উচিত। মাতামহ কিন্তু প্রস্তর মূর্তির মতো একই ভাবে মৃত্যুস্থ। ধ্যানস্থ বলি কী করে!

আমার আচ্ছন্নভাব কেটে এসেছে। এখন অনেক কাজ। তুলসীপাতা বাড়িতেই আছে। বেলপাতা চাই। সোনার তবক, সে কোথায় পাব? পিতা কাকিমাকে বললেন, বউঠান, একটু চন্দন ঘষে ফেলো। অন্তত এক বাটি। আমাকে বললেন, বেলপাতা, ফুল, ফুলের মালা নিয়ে এসো। যত তাড়াতাড়ি পারো। কোনও কৃপণতা কোরো না। সন্ন্যাসী মাতামহের পাশটিতে আসন করে বসেছেন। মৃদুস্বরে একইভাবে বলে চলেছেন, জয় রাম, জয় রাম। বেরোবার সময় পিতৃদেব বললেন, বাইরে তুমি এই মৃত্যুর কথা বলবে না।

রাস্তায় নেমে গোটাকতক কথা ভাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। রাত নেহাত কম হয়নি। ফুল পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে। সমস্যা বেলপাতার। আজ বৃহস্পতিবার হলে কথা ছিল না। মায়াদের পেছনের বাগানে বেলগাছ আছে। পুকুরধারে। টাটকা বেলপাতা। কিন্তু যাই কোন মুখে? বহুকাল মায়ার খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। ভয়। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার ভয়। স্বার্থপর ভাবে ভাবুক আমাকে যেতেই হবে। দু'-চারটে কথা শোনাবে বাঁকা বাঁকা। তা শোনাক।

বেড়ার পাশ দিয়ে অন্ধকার ছায়াঘেরা পথ। আঁস্তাকুড়ে সাদামতো একটা বেড়াল বসে ছিল। পায়ের শব্দে থমকে থমকে পালাল। মন্দিরের দরজা বন্ধ। রাতের মতো দেবী শয্যা নিয়েছেন। ধূপ আর ধুনোর গন্ধ এখনও বাতাসে ভাসছে। মায়ার পিসিমা দাওয়ায় বসে দুলে দুলে মহাভারত পড়ছেন। অনেকটা গোঙানির মতো শোনাচ্ছে। মাটির উঠোনে তাঁর ছায়া দুলছে।

মায়া দেয়ালে পিঠ দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। আমি দাওয়ার পাশে দাঁড়াতেই সে হাই তুলল। গোটাকতক তুড়ি বাজিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে? অন্ধকারে আমি তেমন স্পষ্ট নই। উত্তর দিলুম, আমি পিণ্টু।

তুমি? তা কী মনে করে? পথ ভুলে গেছ নাকি?

মায়া উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দু'হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙল। এত দুঃখেও আমি দেখলুম, মায়ার শরীরে জোয়ার এসেছে।

ফলপাকা বেলী ততী ছিটকায়া সুখ যাহিঁ।
সাঙ্গঁ আপনা করি লিয়া সো ফিরি ঊগৈ নাহিঁ॥

মায়া আমার সামনে দাওয়ায় এসে বাঁশের বাতা ধরে সামনে ঝুঁকে দোলখাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াল। আমি এক ধাপ নীচে মেটে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার চোখের সামনে মায়ার বুক শরীরের আন্দোলনে থরথর করছে। বিকেলে চুলে তেল দিয়ে বড় খোঁপা বেঁধেছে। কপালে কাচপোকার টিপ। পাশ থেকে লণ্ঠনের আলো ছিটকে এসে মুখের একপাশে পড়ে চিকচিক করছে।

মায়ার পিসিমা বললেন, এসো বাবা এসো। এতদিনে আমাদের মনে পড়ল? ঘর থেকে একটা আসন এনে দে মায়া।

আমি এখন বসতে পারব না। দুটো বেলপাতা নিতে এসেছি।

মায়া হিহি করে হেসে মাথার চুল খামচে দিয়ে বললে, পার্বতীর কাছে যাও, মহাদেবের মাথায় রাত বারোটার সময় একমাত্র তিনিই বেলপাতা ফেলতে পারেন, আর নয়তো দস্যু রত্নাকর।

এরা কেউই জানে না আমি আজ কী মন নিয়ে এখানে এসেছি। মায়ার দেহতত্ত্ব, পিসিমার ধর্মতত্ত্ব, সবকিছুই আজ স্বাদহীন। আমি খুব মৃদুস্বরে বলতে বাধ্য হলুম, মায়া, এইমাত্র আমার দাদু মারা গেলেন।

মায়া সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গুছিয়ে দাঁড়াল। আর সামান্যতমও চপলতা নেই। পিসিমা মহাভারত মুড়ে রেখে বললেন, অ্যাঁ, সেকী! অমন স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ মানুষ! এই তো কালও দেখলুম বেশ সুস্থ মানুষ!

ঘণ্টাখানেক আগেও সুস্থ ছিলেন। গান গাইতে গাইতে সমাধি।

সমাধি?

হ্যাঁ বসে বসেই মৃত্যু। ব্রহ্মতালু খুলে গেছে।

বলো কী, সাধকের মৃত্যু? শুনেছি, খুব সাধন-ভজন করতেন।

মায়া বললে, বেলপাতা যে গাছে। রাতে বেলগাছে হাত দিতে আছে গো পিসি!

ঘরে চৌকির তলায় দেখ না। চুবড়িতে আছে কি না!

মায়া লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকল। পিসি বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমি একবার দেখতে যেতে পারি?

কী উত্তর দেব ভেবে পেলুম না। পিতৃদেব নিষেধ করেছিলেন, মৃত্যুর কথা রাষ্ট্র কোরো না। কেন তা জানি না। বেলপাতা নোব অথচ কিছু বলব না, তা কী করে হয়? আমতা আমতা করে বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন আসতে পারবেন না! নিশ্চয় পারবেন।

অনেকে এসেছেন?

না না। আপনাকেই আমি প্রথম বললুম। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পরেই আশ্চর্যজনক ভাবে হরিদ্বার থেকে এক সন্ন্যাসী এলেন। দাদুর গুরুদেব।

সাধকের মৃত্যুসংবাদ এইভাবে বাতাসে ছড়ায়।

মায়া গোটাকতক শুকনো বেলপাতা হাতে সামনে এসে দাঁড়াল। মায়াটাকে আমি আর কিছুতেই মানুষ করতে পারলুম না। এত কাছাকাছি গায়ে গা লাগিয়ে এসে দাঁড়ায়, নিজেরই লজ্জা করে। এইভাবে কোনদিন আমার একটা দাবি জন্মে যাবে, তখন আমার জায়গায় অন্য কাউকে দেখলে হয়তো খুনই করে ফেলব!

মায়া বললে, দেখো, এতে হবে?

একেবারে শুকিয়ে গেছে!

জানি এতে হবে না। পিসি, গাছে হাত দোব?

তুই হাত দিসনি। ব্রাহ্মণ মানুষকেই বল। বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকে। আর একটা লণ্ঠন জ্বেলে নে।

অন্ধকার ঝুপসি বাগান। অসংখ্য ঝিঁঝি ডাকছে। মজা পুকুরে একটা ব্যাং কটর কটর করে অন্ধকার চিবোচ্ছে। ঝোপের মধ্যে খসখস করে কী সব চলে বেড়াচ্ছে। মনে হয় সাপ। গরমকাল, সাপেদের এই তো নিশাভ্রমণের সময়। আঙুলে একটু ঠুকরে দিয়ে গেলেই হল। মৃত্যুশোকে এত কাতর হলে কী হবে, নিজের জীবনের চিন্তা কত প্রবল!

মায়া আমার পাশে। মাঝে মাঝে আমার পায়ে তার শাড়ির তলার অংশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কাঁধে কাঁধে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। সরু পথ। লম্বা লম্বা ঘাস। পুকুরে ছাঁচি পানা। জোলো গন্ধ ছাড়ছে। পুরনো পাঁচিলের গা ঘেঁষে বেলগাছ। বেশ ডালপালা মেলেছে। কোনও এক সময় তলায় একটা বেদি ছিল। ভেঙে উলটেপালটে পড়ে আছে। বেলগাছের কম তেজ!

মায়া লণ্ঠনটা নীচে রাখল। ঝোপে আলো পড়েছে। রাতের বেলা ঝোপঝাপ কেমন যেন রহস্যময় হয়ে ওঠে। অসংখ্য চোখ সন্দেহের চোখে তাকিয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে যেন বলাবলি করছে—এরা কারা! বেলগাছের সবক'টা ডালই আমার হাতের নাগালের বাইরে। ডিঙি মেরে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করা গেলেও টেনে নামানো সম্ভব নয়। মায়া বললে, দাঁড়াও, ওভাবে হবে না। হয় তুমি আমাকে কোলে তুলে ধরো, না হয় আমি তোমাকে তুলে ধরি।

লণ্ঠনের আলোয় মায়ার দিকে একবার তাকালুম। ভরাট স্বাস্থ্য। নিটোল নিতম্ব। আমি জড়িয়ে ধরতে পারি। তুলতে পারব না। মায়া আমার মুখ দেখে বললে, বুঝেছি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ছোঁয়া পাতা তুমি নেবে না।

কী বলছ তুমি? আমাদের পরিবারে জাতের বিচার নেই।

খুব আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র না থাক বড়লোক গরিবলোক আছে।

সেকী?

তা হলে তুমি আসো না কেন? কেন আসো না?

কথা বলতে বলতে মায়া কোমরে আঁচল জড়াচ্ছে। মায়ার ঠোঁটদুটো ভারী পাতলা। মুখটা পানের মতো। চোখদুটো অদ্ভুত সজীব। আমি কিছু বোঝার আগে খপ করে দু'হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে

অনেকটা উঁচুতে তুলে ফেলল, নাও এবার ব্রহ্মদত্যি হয়ে পাতা ছেঁড়ো। ধেড়ে ধেড়ে কাঁটা আছে, খোঁচা খেয়ে মোরো না যেন।

সেই কোন কালে শিশু ভোলানাথ মায়ের কোলে উঠত। আজ মায়ার কোলে। টাটকা কচি কচি পাতা এখন আমার হাতের নাগালে। শরীরের নিম্নাংশ এদিকে বড়ই অসহায়। ভাঙা বেদির ঢকঢকে ইটে মায়া তেমন অবলম্বন পাচ্ছে না। অল্প অল্প টলছে। দু'জনে একসঙ্গে হুড়মুড় করে পড়ে না যাই।

মায়া বললে, হয়েছে? আর তোমাকে রাখতে পারছি না। আগের চেয়ে একটু মুটিয়েছ।

আমি বললুম, হয়েছে, এইবার নামাও।

ধীরে ধীরে পা দুটো মাটিতে নেমে এল। মায়া তখনও জড়িয়ে ধরে আছে।

কী হল ছাড়ো!

যদি না ছাড়ি?

মায়া, প্লিজ, আমার দাদু মারা গেছেন। তুমি জানো না, এর চেয়ে শোকের আমার কাছে আর কিছুই নেই।

মায়া অনায়াসে বললে, দাদুরা মরবেই। এ আবার এমন শোকের কী? বুড়ো হলেই মানুষকে মরতে হয়।

তুমি ছাড়া মায়া, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ছাড়তে পারি, যদি কথা দাও আজকালের মধ্যে তুমি অবশ্যই আসবে।

হ্যাঁ আসব।

মনে থাকে যেন হাতে বেলপাতা।

মনে থাকবে।

আচ্ছা তুমি না বলছিলে, জাত মানো না!

না মানি না, ওসব সেকেলে বিচার।

তুমি আমার ঠোঁটে চুমু খেতে পারবে?

মায়ার প্রস্তাবে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ আবার কী অদ্ভুত আবদার! হঠাৎ মনে হল স্বামীজি যদি জাত যায় কি না দেখার জন্যে ব্রাহ্মণেতর জাতির হুঁকো খেয়ে থাকতে পারেন, আমি পারব না কেন, তাঁর মন্ত্রশিষ্য হয়ে?

মায়া চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললে, কী? পারবে?

হ্যাঁ, পারব।

তবে দাঁড়াও, ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে বেশ করে ভিজিয়ে নিই। নাও এসো।

মায়া দু'হাত দু'পাশে মেলে এমনভাবে এসো বললে, সারাশরীর কেমন যেন করে উঠল। ঈশ্বর আমার চলার পথেই কি যত গর্ত খুঁড়ে রেখেছেন! এক কদম এগোই কী একটা করে গর্তে গিয়ে পড়ি। এই অন্ধকারে বেলতলায় এ কী কাণ্ড! পিসি অবিলম্বে মায়ার কেন বিয়ে দিচ্ছেন না! মায়ার সময় হয়েছে।

রক্ত দিয়ে মানুষ ঋণ শোধ করে। আমি আমার ঠোঁট ক্ষতবিক্ষত করে বেলপাতা নিয়ে নিজেকে ধিক্কার জানাতে জানাতে রাস্তা হাঁটছি। নিজেও এক শয়তান। অছিলার অভাব নেই। পাপের পথে যেতে চাস তো যা, আধ্যাত্মিক নজির খাড়া করিস কেন! ক্ষুদ্র কীট পর্বতের সঙ্গে তুলনা!

বিষ্টুদা সামনের কল থেকে জল নিয়ে দোকানে ঢুকছিলেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কী ব্যাপার পিণ্টু, তুমি এত রাতে ডালপালা নিয়ে বাজারের দিকে চললে কোথায়?

এমন একজন মানুষকে সব কথাই বলা যায়। বললুম, বিষ্টুদা, একটু আগে দাদু মারা গেলেন। গান গাইতে গাইতে সমাধি।

সেকী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বাজারে যাচ্ছি ফুল কিনতে। এই যে বেলপাতা জোগাড় করেছি অতি কষ্টে।

একটু দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। একা পারবে না। আরও তো অনেক কিছু কিনতে হবে। এত রাতে দোকানপাট কি খোলা পাবে!

ফুলের দোকান কি খোলা থাকবে না?

না থাকলেও জগন্নাথের বাড়ি আমার চেনা। সেখান থেকে তুলে নোব।

রাত বারোটার আগে বিষ্টুদার দোকান বন্ধ হয় না। আজ আমাদের জন্যে সাড়ে ন'টার মধ্যেই ঝাঁপ ফেলে দিলেন। বিষ্টুদা হনহন করে হাঁটেন। আজ হাঁটার বেগ আরও বেশি। হাঁটতে হাঁটতে বারেবারে বলছেন, আহা, বড় পুণ্যাত্মা মানুষ, আহা, বড় পুণ্যাত্মা মানুষ। আমরা কি আর এভাবে যেতে পারব! ভুগে, ভুগিয়ে তবে যাব।

ফুলের দোকান খোলাই ছিল। এরকম সাধারণত হয় না। সবে ফুলের চালান এসেছে। এক ঝাঁকা টাটকা ফুল, আর মালা। গোলাপ আছে, পদ্ম আছে, রজনীগন্ধা আছে। বিষ্টুদা বললেন, বাঃ, অনেক ফুল।

জগন্নাথ বললে, ফুল যে সব বিক্রি হয়ে গেছে।

বিক্রি হয়ে গেছে মানে?

রাজাবাবু সব নিয়ে নিয়েছেন। বলে গেলেন, আমার নাতি এসে দাম দিয়ে নিয়ে যাবে।

রাজাবাবু কে?

ওই যে রাজনারায়ণবাবু, যাঁর ছেলে জয়নারায়ণবাবু, বিরাট বড় গাইয়ে।

আমি অবাক হয়ে বললুম, সেকী? আমিই তো তাঁর নাতি। তিনি কখন এসেছিলেন?

তা হবে। দেড়ঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা হয়ে গেল। ওঁর যত ফুল তো সব আমার দোকান থেকেই যায়। আমার বাবা সাপ্লাই করতেন, এখন আমি করি। পুজোপার্বণের তো শেষ ছিল না! ছেলের বিয়েতে হাজার টাকার ফুল কিনেছিলেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, সেকী, দু'ঘণ্টা আগে তো তিনি জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন।

বিষ্টুদা একটা খোঁচা মারলেন। মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। বিষ্টুদা জগন্নাথকে বললেন, কত দাম?

ওঁর জিনিস বেশি আর কী নোব! শ'খানেক দিয়ে দিন।

বিষ্টুদা আমাকে বললেন, টাকা আছে? না, আমি দোব!

না না, আমার কাছে অনেক আছে।

জগন্নাথ বললে, টাকার চিন্তা করছেন কেন? না থাকে পরে দিয়ে যাবেন।

না, টাকা আছে। কিন্তু এত ফুল বইবে কে?

জগন্নাথ হাসতে হাসতে বললে, সব ব্যবস্থা আছে।

দোকান ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসে হাঁকতে লাগলে, দুখিয়া দুখিয়া!

গায়ে গোলাপি রঙের সিল্কের গেঞ্জি। গলায় সোনার হার। চওড়া পাড় দিশি ধুতি। বড় বড় চুল। কেষ্টঠাকুরের মতো মুখ। ফুল বেচার মতোই চেহারা। একেবারে ফুলবাবু। জগন্নাথ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছে, রাজাবাবু এখন কেমন আছেন? মাঝে বলেছিলেন, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না। আজ দেখলুম একেবারে ফিট। বয়েস যেন পঞ্চাশ বছর কমে গেছে। একেবারে রাজবেশ। তাকালে চোখ আর ফেরাতে ইচ্ছে করে না। সাধকমানুষের ধরনই আলাদা।

দুখিয়া এসে গেছে। জগন্নাথ নিচু হয়ে ঝাঁকার দু'পাশ ধরে বললে, নে তোল। বাবুরা এসে গেছেন। যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, জগন্নাথ বললে, আপনার বিয়ে কবে লাগছে?

আমার বিয়ে?

হ্যাঁ, রাজাবাবু এর আগে যেদিন এসেছিলেন, আমাকে বললেন, জগন্নাথ, আমার শেষ কাজ নাতির বিয়ে। ছেলের বিয়েতে কী দেখেছ! ধুমঘটা করব। বেনারস থেকে সানাই আনাব, বাজি পুড়বে। দু'হাজার টাকার ফুল দিয়ে বাড়ি সাজাব। আমি বললুম, বাবু শীতে করুন। ফুল দিয়ে কীভাবে সাজাতে হয় আমিও দেখে নোব। কৃষ্ণনগর থেকে মালাকার আনাব। আচ্ছা নমস্কার!

দু'পা এগোতে-না-এগোতেই জগন্নাথ আবার জিজ্ঞেস করলে, কাল কী আছে? এত ফুল যাচ্ছে! আশীর্বাদ।

আর তো চেপে রাখা যায় না। এবার তো সত্যি কথা বলতেই হয়। বিষ্টুদার দিকে তাকালুম। জবাব তিনিই দিলেন, রাজাবাবু মারা গেছেন।

অ্যাঁ, সেকী? কখন মারা গেলেন?

ঠিক যে সময়ে তোমার দোকানে এসে ফুলের অর্ডার দিলেন ঠিক সেই সময়ে।

জগন্নাথ অবাক হয়ে বললে, তা হলে কি...

হ্যাঁ, তুমি ধরেছ ঠিক, যাবার পথেই বলে গেছেন।

অসম্ভব, অসম্ভব বলে জগন্নাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল। হাতের মুঠোয় আমার দেওয়া একশো টাকার নোটটি ধরা ছিল। নোটটা আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললে, এই নিন, এ ফুলের দাম আমি নিতে পারব না।

ফুলের দাম নেবেন না কেন? এত টাকার ফুল!

যাবার আগে আমাকে শেষ দর্শন দিয়ে গেলেন। আমাকে কী ভীষণ ভালবাসতেন আপনারা জানেন না। আমার একমাত্র ছেলেটা গতবছর ন্যাবায় মরেই যেত। কতরকম ওষুধ জানতেন! কী এক দাগ খাইয়ে দিলেন, ছেলেটা ভাল হয়ে গেল। বললেন, যাঃ ব্যাটা, এবারের মতো বেটি ছেড়ে দিলে। জীবনে পাপ কাজ করিসনি, তা হলে কোনওদিন আর দুঃখ পেতে হবে না।

কথা বলতে বলতে বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট তুলে জগন্নাথ চোখ মুছল। গলা ধরে এসেছে। ধরাধরা গলায় বললে, বউটাকে ধরে রোজ খুব পিটতুম। রাজাবাবু ছিলেন অন্তর্যামী। আমাকে বললেন, যে-বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদে সে বাড়ি পাপের বাড়ি। কাঁদতে হয় তুই কাঁদ ব্যাটা, তাড়াতাড়ি উদ্ধার পেয়ে যাবি। আমি

তাঁকে গুরুর মতো মানতুম। সেই দিন থেকে আমি আর গায়ে হাত তুলিনি। আর সেই দিন থেকে আমার ভাগ্য ফিরে গেছে। আমি আজ অনাথ হয়ে গেলুম। ব্যাটা ফুলঅলা বলে কে আর আমাকে ভালবাসবে!

বিষ্টুদা বললেন, নাও, টাকাটা ফিরিয়ে নাও।

টাকাটা নিতেই হল। জগন্নাথ বললে, আপনারা এগিয়ে যান। আমিও আসছি। কিছু ভাল ধূপ নিয়ে যাই। বিষ্টুদা যেতে যেতে বললেন, একজন মানুষ কী ছিলেন বোঝা যায় মৃত্যুর পর। বেঁচে থেকে অনেকেই লম্বাচওড়া মারতে পারে, মরলে কেউ আর ফিরেও তাকায় না। কত ছোট মানুষে বড় মানুষ থাকে দেখেছ? সামান্য ফুলঅলা জগন্নাথ আগে নেশাভাঙ করত, বউকে ধরে পেটাত, একজন মানুষের কথায় কীরকম পালটে গেছে! স্বভাবচরিত্র, স্বাস্থ্য। ভাবতে পারো। ব্যাবসাদাররা একটা পয়সার জন্যে মরে বাঁচে, সেই ব্যাবসাদার একশো টাকার ফুল ভালবেসে দিয়ে দিলে! ঠাকুর বলতেন না! হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেই একদিন একটা দেশলাই কাঠি জ্বালালে সব অন্ধকার অমনি নিমেষে চলে গেল।

যত আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসছি ততই একটা সুর ভেসে আসছে। অনেকটা স্তোত্রপাঠের মতো।

মায়ার পিসিমা সিঁড়ির একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওপরে ওঠার সাহস নেই। আমাদের দেখে ভয়ে ভয়ে বললেন, আমি যেতে পারি?

অনুমতি নিয়ে আমাদের পেছন পেছন উঠতে লাগলেন। মহিলা কবে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন জানি না। যবে থেকে দেখছি, গেরুয়াই পরেন। মাথায় জটা ধরেছে। হলঘরের সবকটা আলো জ্বলছে। বাড়ির মিয়োনো ভাবটা হঠাৎ কেমন কেটে গেছে! মৃত্যুর মতো মৃত্যু যেন জন্মের সমান! এই কি সেই সত্য, তোমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই। তুমি মনে করলেই তুমি আছ। তুমি নেই মনে করলে তুমি নেই। বুদ্ধের বাণী স্মরণে আসছে, যে জানে এ জীবন তরঙ্গশীর্ষে ভাসমান ফেনার মতো, মরীচিকার ছায়ার মতো, সে কামনার শতদলে লুক্কায়িত মৃত্যুর তীক্ষ্ণ শরসন্ধান ব্যর্থ করেছে। যমরাজের অলক্ষ্যে তার চলার পথ সামনে, আরও সামনে।

হরিদ্বারের সেই জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী মুদিত নেত্রে স্তোত্রপাঠ করে চলেছেন। শুধুমাত্র তানপুরাটি বেজে চলেছে। নাদগম্ভীর কণ্ঠ। গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্। গোবর্দ্ধনং ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম॥ নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্। নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্॥

ঘামতেল মাখা দেবীদুর্গার মুখ যেমন সন্ধিপুজোর সময় চকচক করে মাতামহের মুখ সেইরকম চকচক করছে। কেমন করে এইভাবে মৃত একটি শরীর বসে আছে। জীবন যে কত বড় তামাশা, মাতামহের প্রাণহীন দেহের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মৃত্যুর পথরেখায় মাতামহের প্রায় আশি বছরের ভোগ-করা খোলসটি পড়ে আছে। আমি কি প্রকৃতই শোকার্ত! শোক নয়, কেমন যেন একটা শূন্যতার বোধে মন আচ্ছন্ন। আমাকে যিনি সবচেয়ে ভালবাসতেন তিনি আর সেই আদরের নাম, পাতুরানি বলে ডাকবেন না। ঠোঙা থেকে একটি গরম আলুর চপ বের করে ফিসফিস করে বলবেন না, খেয়ে নে চট করে। দুর্বাসা মুনি দেখলে আর রক্ষে থাকবে না। সাধু-সন্ত কোথায় কে এলেন, আর সে খবর এনে বলবেন না, চল জীবনটা সার্থক করে আসি। সবচেয়ে বড় পথপ্রদর্শক, সবচেয়ে বড় বন্ধু, থাক তুই পড়ে, বলে আপন মনে চলে গেলেন। নিষ্ঠুর আপনি, স্বার্থপর আপনি।

এইবার বুকের মাঝখানটা কেমন করে উঠল। এখন নির্জনে বসে একটু কাঁদতে পারলে বেশ হত। ফোঁটা ফোঁটা জল জীবনের চিড়-খাওয়া জমিতে পড়ে প্রথম বর্ষার গন্ধের মতো আকুল করে তুলত। সে অবসর এখন আমার নেই। জগন্নাথ কাঁদতে পারে, বিষ্টুদা পারেন, মায়ার পিসিমা আঁচলে চোখ মুছতে পারেন। তুলসীর মালা ঘুরিয়ে জপ করতে পারেন। আমার এখন সে সময় নেই।

সন্ন্যাসী স্তোত্র শেষ করে চোখ মেললেন। সারাঘর দেখে নিলেন। তারপর মায়ার পিসির দিকে তাকিয়ে বললেন, মাইজি ইধার আইয়ে।

একপাশে ফুলের ঝুড়ি। গোলাপ, রজনীগন্ধা, পদ্ম সব মিলিয়ে লিলি অফ দি ভ্যালির মতো অদ্ভুত এক গন্ধ তৈরি করে বাতাসে ছুড়ছে। মায়ার পিসিমা ধীর নম্রতায় সামনে এসে প্রণাম করে বসলেন।

মাতামহের অঙ্গরাগ শুরু হল। পিসিমা ভাগ্যবতী মহিলা। সন্ন্যাসীকে সাহায্যের তিনিই অধিকারী হলেন। চোখের সামনে কত কী যে ঘটতে লাগল! কর্পূরের আগুনে সোনার তবক পুড়িয়ে মস্তকের মধ্যদেশে স্থাপন করা হল। তার ওপর চন্দন চর্চিত বিল্বপত্র স্থাপিত হল। মন্ত্রোচ্চারণের গুনগুন শব্দে ঘর মুখরিত। সর্বঅঙ্গে চন্দনের তিলক। প্রশান্ত কপালে সুবৃহৎ একটি রক্তচন্দনের ফোঁটা। মুদিত নয়নে রাখা হল চন্দন-লেপিত তুলসীপত্র। গলায় গোড়ের মালা। রেশমের উত্তরীয় দুই স্কন্ধের ওপর দিয়ে নেমে এল বুকের কাছে। রাজযোগীর রাজবেশ। চলেছেন রাজাধিরাজের দরবারে। অন্তহীন কালপ্রবাহে মহাকালের সিংহদুয়ার খোলা। মহারাজের সিংহাসন ঘিরে অনন্ত দরবার চলেছে। যার যখন আমন্ত্রণ আসে, সেজেগুজে চলে যায়।

সব আয়োজন শেষ হল। এইবার মনে হয় যাত্রা শুরু হবে। মাতুল কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আর একটু পরেই রাত ভোর হবে। রেডিয়োর ঘোষক বলতে থাকবেন, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে গ্রামাফোন রেকর্ডে গান বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে। চিন্তা ছিঁড়ে গেল। পিতা বললেন, মহারাজ, আমার খুব ইচ্ছে, এই বাড়ির বাগানে এঁকে সমাহিত করি। এখানে আপনার একটা আসন হোক।

নেহি বেটা।

পিতা বললেন, তা হলে চন্দন কাঠে দাহ করার ব্যবস্থা হোক। আহা এইসময় আমার অক্ষয়টা যদি থাকত!

ঘরের দূর কোণ থেকে কে যেন বললেন, থাকত কী, আমি তো রয়েইছি।

সেকী তুমি কখন এলে? লক্ষ করিনি তো!

অনেকক্ষণ এসেছি হরিদা। আজ হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরছিলুম, হঠাৎ কে যেন বললে, একবার ঘুরে যা। চন্দন কাঠ তো! তা একবার হীরালালের কাছে চলে যাই?

তাকে ভোরের আগে পাচ্ছ কোথায়?

সাধুজি বললেন, নেহি বেটা, চন্দন কাঠ জরুরৎ নেহি। অ্যায়সাই হো যায়গা।

শেষ ক'টা দিন মাতামহ যে-ঘরটিতে কাটিয়ে গেলেন, দোর ঠেলে সেই অন্ধকার ঘরে একবার গেলুম। নিভাঁজ শয্যা। শেষ চাঁদের আলোর গলিত একটু অংশ বিছানায় শুয়ে ছিল। পাশের টেবিলে কীটদষ্ট সেই সাধনসংগীতের বইটি। নিখুঁত ভাঁজ করা সাদা একটি গামছা। মানুষের প্রয়োজন কত সামান্য! বাদামি রঙের ন্যাকড়ার সেই জুতোটি বাইরে কোথাও আছে। খড়ম পরতে ভালবাসতেন। খাটের পাশে খড়ম জোড়াটি

হয়তো অপেক্ষা করে আছে। ভোর হয়ে আসছে, এইবার সেই পা দু'টি এসে জাগিয়ে তুলবে। জানে না, হাঁটার ছুটি হয়ে গেছে! আধো আলো আধো অন্ধকার ঘরে সব আছে নেই কেবল একজন। টেবিলে ঝকঝকে বাটি চাপা এক ড্যালা ছানা, গোটা দশ-বারো ভেজানো কিসমিস, দুটি খেজুর। কাঁসার গেলাসে চাপা জল। কাকিমা সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে রেখে গিয়েছিলেন। আসর ভেঙে গেলেই রাতের সামান্য আহার শেষ করে শয্যা নেকেন। কেউ নেই, তবু মনে হল শূন্য ঘরে সেই লঘু তরল কণ্ঠস্বরটি বেজে উঠল, কী করে বেড়াচ্ছিস? আয় এখানে বোস। তোর মায়ের ছেলেবেলার গল্প শোন। কেন তুলসী নাম রেখেছিলুম জানিস? আমি ঘোর শাক্ত। তোর দিদিমা ছিল ঘোর বৈষ্ণব। শাক্তের ঘরে তুলসী এল। যিনিই শ্যাম তিনিই শ্যামা।

চলে এসো।

পিতৃদেবের গম্ভীর গলা। এইবার আমরা বেরোব। সিলি সেন্টিমেন্টের আর সময় নেই।

যে-সময় রাত চলে যায়, সেই সময়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। মাতামহের অসাধারণ এই দেহত্যাগের সংবাদ ঠিকই ছড়িয়েছে। ভোরের সেই স্নানার্থী সন্ন্যাসী, যিনি গঙ্গায় চিত হয়ে ভেসে ভেসে ঘাট থেকে ঘাটে চলে যান, তিনি যে মাতামহকে চিনতেন আমার জানা ছিল না। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, চললে রাজা রাজনারায়ণ! দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আচ্ছা চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। ইচ্ছে যখন হয়েছে। আবার ফিরে এসে হাত দিয়ে খাট স্পর্শ করে দাঁড়ালেন। নাম সংকীর্তনের দল রোজকার মতোই নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন, তাঁরাও স্বেচ্ছায় আমাদের শবযাত্রার অনুগামী হলেন।

হরিদ্বারের সন্ন্যাসীর ঝুলিতে জগন্নাথের ফুল। তিনি মুঠো মুঠো ফুল ছড়াচ্ছেন। সংকীর্তনে প্রভাতী সুর। আমার মাতামহ চললেন চিরযাত্রায়। যে-পথ চলে গেছে আগুনের শিখায় ঊর্ধ্বমুখে। এরপর আজ যাঁরা গঙ্গার স্নানে যাবেন, তাঁরা দেখবেন সারাপথে ছড়িয়ে আছে পদ্ম আর গোলাপের পাপড়ি, রজনীগন্ধা। তাঁরা ভাববেন কেউ হয়তো অভিসারে গেছে। হ্যাঁ এও তো অভিসার!

মর্গ দেখেছি। শ্মশান এই প্রথম। পাশ দিয়ে বহুবার গেছি, ভেতরে কোনওদিন ঢুকিনি। স্থানটি বড় মনোরম। সামনেই একটি গেট। মাধবীলতা ঝুলছে। বড় বড় হরফে লেখা মহাশ্মশান। সেই শ্মশানই মহাশ্মশান যেখানে অতীতে কোনও মহাপুরুষ অগ্নিশয্যা পেতে গেছেন। শ্মশানের চোখে নিদ্রা নেই। দেখেই মনে হচ্ছে, সারারাত জেগেই ছিল। আলো এখনও জ্বলছে। ভিজে কাপড়ে একটি দল আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। দু'-এক ছিটে জল গায়ে লাগল। এঁদের সারা হয়ে গেল। আমাদের এইবার শুরু হবে। কীর্তন যখনই থামছে কানে আসছে পাখির ডাক।

ভেতরে দুটি চিতা তখনও জ্বলছে। বাঁধা বটতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আপনজনেরা বসে আছেন। ভালবাসার, ভালবাসবার নশ্বর দেহখাঁচা চোখের সামনে চড়চড় করে পুড়ে যাচ্ছে। হাড়ফাটার অট্টহাসি মানুষের সমস্ত অহংকারের ওপর ফোয়ারার মতো ঝরে পড়ছে। জীবনের সব চিৎকার মৃত্যুর মুঠোয়। খাটিয়ার বাঁশ খুলে নিয়ে সাহসী একজন চিতার সামনে, আর একজন বলছেন, দাও দাও এইবার মাথাটা ভেঙে দাও। ফটাস করে একটা শব্দ হল। কিছু আগুনের ফুলকি পড়পড় করে আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠল। আমার ভেতরটা যেন ছিটকে উঠল। মৃতের আসরে জীবিতেরা বড় অসহায়।

মাতামহ ধীরে ধীরে সাজানো কাঠের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চিতায় অগ্নি প্রজ্বলিত হল। শিখা উঠছে, ক্রমশই ওপরে উঠছে। শোক নয়, কেমন যেন স্তম্ভিত অবস্থা আমার। দিগ্বিদিক আলোকিত করে ফসফরাসের মতো রুপোলি একটা দ্যুতি মাতামহের অবয়ব নিয়ে সোনালি আগুনের মধ্যে দুলতে লাগল। অলৌকিক দৃশ্য। সকলে একসঙ্গে গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন— হরি ওম্‌। হরি ওম্‌।

সামনে যখন যাবি ওরে থাক-না পিছন পিছে পড়ে

দেহ যে মন্দির একথা কোনওদিন অনুভব করেছ?

স্বামী নির্মলানন্দ প্রশ্ন করে চেয়ারের পেছনে হাসিহাসি মুখে পিঠ রাখলেন। সামনের টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র। খান তিনেক মোটা মোটা বই। একটি দামি কলম। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পার্কার। স্বামীজি আজ গেরুয়া টুপি পরেছেন। সাধারণত সন্ন্যাসীরা যে ধরনের টুপি পরেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, কখনও ক্ষণিকের তরে ওইরকম একটা অনুভূতি হয়, তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

কেন হয় না?

একগাদা চামচিকি ঢুকে কিচিরমিচির শুরু করে দেয়। সময় সময় দেহ বলে যে একটা বস্তু আছে সেই কথাটাই ভুল হয়ে যায়।

কে ভোলায় কখনও লক্ষ করেছ?

হ্যাঁ, করেছি। যেমন ধরুন কোনও একটা জায়গায় যেতে হবে, তখন দেহ নয়, হাঁটাটাই বড় হয়ে ওঠে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, তখন দেহের কথা মনে পড়ে। আক্ষেপ আসে, কেন আমি অফুরন্ত পথ অক্লেশে হেঁটে যাবার শক্তি রাখি না! কেন আমি আরও সক্ষম দেহের অধিকারী হতে পারিনি! সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা আসে, কোনও ধনীর পরিবারে জন্মালে আমি ছেলেবেলায় আরও ভালমন্দ খেতে পেতুম! ব্যস দেহ ভুলে গেলুম, চোখের সামনে ভাসতে লাগল প্রাচুর্যের স্বপ্ন। কী করলে ধনী হওয়া যায়! হাঁটছি, হেঁটেই চলেছি, তবে আমি নয়, হাঁটছে ধনীর স্বপ্ন, হাঁটছে পরিকল্পনা। আই এ এস পরীক্ষাটা দিতে পারলে, ডি এম। ডি এম মানে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। বিরাট একটা জেলার রাজা। ফাইল, ডাকবাংলো, গাড়ি, প্রচুর ক্ষমতা। পরমুহূর্তেই আক্ষেপ, কেন আমি সেই ধরনের ভাল ছেলে হতে পারলুম না, যার কাছে যে-কোনও কমপিটিটিভ পরীক্ষা জলভাত! এই করতে করতে পথ ফুরোল। যে-কাজে যাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলুম, তখন সেই কাজটাই বড় হয়ে উঠল। এইভাবে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন চলেছেই চলেছে। কার দেহ, দেহেই বা কে কদাচিৎ মনে পড়ে। কখনও লোভ, কখনও অহংকার, কখনও ক্রোধ, কখনও হিংসা, এক এক ধরনের প্রবৃত্তি এক এক সময় জেগে ওঠে। এ যেন জুড়ি গাড়ি যে চড়ে সেই তখন মালিক। সাঁই সাঁই চাবুক ঘুরছে গাড়ি চলছে কদম কদম।

বাঃ বলেছ ভাল। আচ্ছা, এই মুহূর্তে তোমার কি দেহবোধ হচ্ছে?

আজ্ঞে না, এখন কথার নেশায় আছি। শুরুতে একটু লজ্জা ছিল। লজ্জার ভাব কেটে এল আত্মম্ভরিতা। বেশ কথা দিয়ে কথা গেঁথে গেঁথে এমন কিছু বলতে হবে যাতে আপনার মনে হবে, ছেলেটা খুব ইনটেলেকচুয়াল। মনে হলে কী হবে, আপনি আমার লেখাটা ছাপবেন।

তোমার লেখা তো আমি ছাপবই বলেছি।

কিন্তু প্রথম দিনেই যে আমার অহংকার জাগিয়ে দিয়েছেন।

অহংকার কীভাবে জাগালুম?

ওই যে বলেছিলেন, আমি ভেবেছিলুম কোনও রিটায়ার্ড জেন্টলম্যানকে দেখব। আমার অহং যার অর্থ করেছে, আমার বুদ্ধি বয়সের তুলনায় অনেক ম্যাচিয়োর, আমার অনেক বেশি পড়াশোনা। আমি আপনার সমতুল্য কিংবা তার চেয়েও বেশি। আবার এই যে আমি সব বলছি, এর পেছনেও একটা ইচ্ছে ঠ্যালা মারছে, যে আমাকে বলছে, এমন কিছু বলো যা অনেকটা সেলফ-অ্যানালিসিসের মতো হয়। তাতে তোমার এই লাভ হবে, তুমি যাঁকে বলছ, তিনি তোমাকে সাধারণের চেয়ে অন্য চোখে দেখবেন।

স্বামীজি হাত তুলে আমাকে থামতে বললেন। থামার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে কেমন যেন বোকাবোকা লাগছে। বাতুল, বাচাল। দুটি উজ্জ্বল চোখ নির্নিমেষে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার অন্তঃসত্তা ক্রমশই যেন নগ্ন হয়ে পড়ছে। বেলুন যেভাবে চুপসে যেতে থাকে আমি সেইভাবে চুপসে যেতে লাগলুম। ন্যালব্যালে একটা রবারের ল্যাতকানো আবরণের মতো পড়ে রইলুম মেঝেতে। ছি ছি, এ আমি কী করলুম?

স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন, কী ভাবছ এখন?

ভাবছি, ছি ছি, এ আমি কী করলুম!

এ 'আমি'টা তোমার কোন 'আমি'?

আজ্ঞে?

এ 'আমি' তোমার কোন 'আমি'? চোখ বুজিয়ে বসে একটু ভাবো। সার্চ উইদিন। আমাদের ক'টা 'আমি'?

দুটো।

রাইট, একটা তোমার দেহের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, অনেকটা মিউকাস মেমব্রেনের মতো। চুলকুনি কাকে বলে জানো? খোস, পাঁচড়া, দাদ, হাজা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।

থেকে থেকে চুলকে ওঠে। অসংখ্য মাইক্রোসকোপিক জার্মস যেই নড়েচড়ে ওঠে অমনি চুলকোতে ইচ্ছে করে। মলম লাগাতে হয়। লাগাতে লাগাতে একদিন সেরে যায়। দ্রষ্টা 'আমি'র হাতে এই 'দেহবদ্ধ আমি টাকে সমর্পণ করে দাও, কমপ্লিট সারেন্ডার, এলোমেলো বিশৃঙ্খল 'আমি'র নির্দেশ মানব না। তুমি কে? আমি কি তোমার দাস?

স্বামীজি, এই 'আমি'টা আবার কে? তৃতীয় কোনও 'আমি'?

ভাল প্রশ্ন। আচ্ছা, তুমি আগুনের শিখা ভাল করে দেখেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রোজই দেখি। লেবরেটরির টেবিলে সারি সারি বুনসেন বার্নার জ্বলে।

তিনটে অংশ দেখতে পাও? একটা নীল অংশ, তাকে ঘিরে লাল একটা অংশ, তার বাইরে সাদাটে একটা অংশ। বাইরের অংশ, যেটাকে বলে পেরিফারি, সেই অংশটি সদা চঞ্চল, বাতাসে হেলছে দুলছে, ফড়ফড় করছে। তারপরের অংশটি স্থির, শিখার সবচেয়ে উত্তপ্ত অংশ, দাহিকা শক্তি সবচেয়ে বেশি। নীল অংশটি শিখার আত্মপুরুষ। স্থির, শীতল। তোমার আঙুল ঢোকালেও পুড়বে না। এই নীল, শীতল অংশটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে অগ্নিশিখা। মানুষও তো শিখা। নিথর নিষ্কম্প নীলাভ আত্মপুরুষ, পরেরটি জ্ঞানপুরুষ যার

অহরহ প্রার্থনা, হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যাষাপি হিতং মুখং, তৎ ত্বং পূষণ অপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। প্রশ্ন উঠছে সেই জ্ঞানময় কোষ থেকে। সংশয়ী, প্রশ্নকারী। তার ওপর বসে আছে বালবৎ চঞ্চল প্রাণময় আমি। সে কখনও অভিমানী, কখনও ক্রোধ, লোভী, কখনও উদার, কখনও সহিংস, কখনও অহিংস। কিন্তু তোমার কী হয়েছে জানো?

আজ্ঞে না।

তোমার শিখাটি বড় কেঁপে কেঁপে জ্বলছে। ভেতরটা বড় কুঁকড়ে আছে। জ্ঞানময় আবরণীটি পূর্ণ তেজে বিকশিত হতে পারছে না। প্রশ্ন করো, কেন? লণ্ঠনের কাচটিকে ভাল করে পরিষ্কার করো। সাধুর কমণ্ডলুও রোজ মাজতে হয়, তবেই ঝকঝকে থাকে। ভেতরটাকে টেনে বাইরে আনো। ছোট উদ্যান নয়, চাই তেপান্তরের মাঠ। দিগন্তকে যত পেছোতে পারবে, মন তত ভাল দৌড়োবে। সব জানলা দরজা খুলে দাও, একটু আলো বাতাস আসুক।

কী করে খুলব?

কেটে বেরিয়ে পড়ো। সংসারে তোমার কীসের আকর্ষণ? ভগবান তো পথ পরিষ্কার করেই রেখেছেন। তোমার সবচেয়ে ভালবাসার মানুষ মাতামহ চলে গেলেন। তোমার পিতা বড় চাকরি করেন। তিনি অথর্ব নন, যে সেবা করতে হবে। স্বভাবে স্বাবলম্বী। তুমি তাঁর সেবা করো না, তিনিই মা-মরা ছেলেটির সেবা করেন। তুমি কেবল পাকা পাকা কথা বলো আর গুমরে গুমরে মরো। তোমার হল ব্রুডিং নেচার। এইবেলা তোমার হাল না ধরলে, তুমি নিউরোটিক হয়ে যাবে। কিছু পেতে হলে বলিষ্ঠ হতে হবে। ঠাকুর বলতেন ডঙ্কামারা হৃদয় চাই। ঘায়ের মাছির মতো ভ্যানভ্যানে হলে, সংসার তোমাকে গিলে চেনে-বাঁধা ক্রীতদাস করে ফেলে রাখবে। এইসব শোনার পর এখন তোমার কেমন লাগছে?

আজ্ঞে, খুব খারাপ। মনে হচ্ছে পাংচার্ড।

ম্যানেনজাইটিস বলে একটা অসুখ আছে, শুনেছ নিশ্চয়?

হ্যাঁ শুনেছি। রুগি সাধারণত বাঁচে না।

ট্রিটমেন্ট জানো? লাম্বার পাংচার করতে হয়। মেরুদণ্ড থেকে খানিকটা ফ্লুইড বেরিয়ে যায়, রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। তোমার অহং খানিকটা বেরিয়ে গেল। মানুষ বাড়ি রং করে, বছর বছর জানলায় দরজায় রং চাপায়, নিজের ভেতরেও যে রং ধরাতে হয়, সেই সত্যটিই ভুল হয়ে যায়। পুরনো সংস্কার সব ফেলে দাও, বেদিটি মুছে পরিষ্কার করে আলপনা লাগাও, নীরবে অপেক্ষা করো, গুহাশায়িত সেই পরমপুরুষ হঠাৎ একদিন আবির্ভূত হবেন, তোমার ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি বলিষ্ঠ আমি হয়ে উঠবে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত/ প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া/ দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কী মানে? ওঠো, জাগো। শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে গিয়ে জ্ঞানলাভ করো। জ্ঞানীরা সেই পথকে দুরতিক্রমণীয় তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম বলেন। তা হলে, তুমি আগে মেঝে থেকে ওঠো। সেপাইয়ের লাঠির মতো হেলে থেকো না। এই নাও টাকা।

টাকা?

হ্যাঁ, কিনে নিয়ে এসো।

কী কিনে আনব?

একটু আগে আমার এখানে আসার সময়, তোমার যা খেতে ইচ্ছে করছিল।

অবাক হয়ে বললুম, সে তো ফিশফ্রাই! আপনি! আপনি কী করে জানলেন?

পড়ে, তোমাকে পড়ে। ভাবনা ভাষা হয়ে অক্ষরে ধরা থাকে। মাধ্যম, কাগজ, ছাপার কালি। যে ভাবনা ভাষা পায়নি তা লেখা হয় অন্তরে, এক ধরনের ম্যাগনেটিক কোডে। আমি যদি তুমি হই, তুমি যদি আমি হও, মানুষ মানুষের কাছে খোলা বইয়ের মতো। বলো, তোমার ফিশফ্রাই খাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছিল কি না?

আরে হ্যাঁ, হয়েছিল। শ্যামবাজারের মোড়ের সেই বিখ্যাত দোকানের সামনে দিয়ে আসার সময় ইচ্ছেটা একবার উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্রাই কি খাওয়া উচিত! ধর্মের পথে...।

ধর্মের সঙ্গে আহারের কোনও সম্পর্ক নেই।

অনেকে বলেন।

ধর্ম কি অতই সহজ পলাশ, যে মাছ ছেড়ে দিলেই ঈশ্বর এসে ধরা দেবেন! ডিম না খেলে তিন দিনে মোক্ষলাভ! তা হলে গোরুকেই তো গুরু বলে ধরতে হয়। সারাজীবন খড় আর ভুষি খেয়ে মাঠেঘাটে হাম্বা হাম্বা করে বেড়ায়।

নিত নাহানসে হরি মিলে তো
জলজন্তু হোয়,
ফলমূল খানে সে হরি মিলে তো
বান্দর বাঁদরি হোয়॥

আপনি টাকা দেবেন কেন? আমার কাছে আছে।

আজ্ঞে না। তোমার টাকা তোমার কাছেই থাক। এই নাও, স্যালাড নিতে ভুলো না। শুধু ওষুধে কিছু হয় না, সঙ্গে অনুপান চাই।

রাস্তায় নেমে আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, সবই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কত রকমের সাধনমার্গ আছে কে জানে! কোনও মতে, কৌপিন সার। কোনও মতে, সিল্কের গেরুয়া। এই সুন্দর বিকেল, মাতামহের কথা মনে পড়ছে। এমনি বিকেলে আমাদের দু'জনের কত জায়গায় যাবার ছিল। কোনওদিন নৌকাবিহার, কোনওদিন সাধুসন্দর্শন। মাঝেমধ্যে উলটোপালটা কথা বলে ফেলতেন আর লেগে যেত লোকের সঙ্গে ধুমধাড়াক্কা। একদিন তো মাঝগঙ্গায় নৌকোর ওপরেই হাতাহাতি বেধে যাবার উপক্রম। একদল হালুইকর এপার থেকে ওপারে যাচ্ছিল। খুব ক্যালোর ব্যালোর করছে নিজেদের মধ্যে। মাতামহ গলুইয়ের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে কেবল বলছেন, ধ্যার ব্যাটা, ধ্যার ব্যাটা। সেই হল সূত্রপাত। মাতামহ এক স্মৃতি ফেলে রেখে গেছেন, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, তিনি কি নদী ছিলেন! জীবনের দু'পাশে অজস্র উপলখণ্ড ছড়িয়ে ছড়িয়ে চলে গেছেন। আজ স্বামীজির কাছে এসে মনটা যেমন হালকা হয়ে গেল, সেইরকম ঘুলিয়েও গেল। মনের তলদেশে অনেক মাটি জমে ছিল। কে জানত! নিজেও জানতুম না। আধ্যাত্মিক মানুষেরা সবই কেমন সহজে টের পেয়ে যান!

বিখ্যাত সেই রেস্তোরাঁয় বিকেলের ভিড় লেগেছে। কাটলেট উড়ছে, ফ্রাই উড়ছে, দোপেঁয়াজা বিজকুড়ি কাটছে ডিমের ফুলকো আবরণের তলায়। ক্যাশবাক্স নিয়ে মালিক যে জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্রাইয়ের অর্ডার দিতে গিয়ে চমকে উঠলুম। রাস্তার দিকে পেছন করে এ কে বসে? ঘাড়ের কাছে আলগা খোঁপা দুলছে। নীল ফুলফুল শাড়ি। সরু সরু দু'আঙুলে ধরা ঝকঝকে কাঁটা ঠোঁটের কাছে, কাটলেটের টুকরো নিয়ে কামড়ের অপেক্ষায় হেলছে দুলছে। দুল ঝিলিক মারছে চাপা আনন্দে। উলটো দিকে যে ছেলেটি বসে আছে, সেই বা কে? বেশ লালটু মার্কা নায়ক নায়ক চেহারা। একে তো কোনওদিন অপর্ণাদের বাড়িতে দেখিনি। ও, কলেজের পর আজকাল এইসব হচ্ছে বুঝি! ভেবেছে কারও চোখে পড়বে না কোনওদিন। পাপ কি চেপে রাখা যায়! বাবা অফিসে, বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। সব শাসনের আড়ালে বসে প্রেম হচ্ছে। পাশের খালি চেয়ারে গিয়ে বসব নাকি! যেন চিনিই না! না, চমকে দেবার মতো সাহস আমার নেই। আমি এত চঞ্চলই বা হচ্ছি কেন? রমণী-মায়ার রমণীয় ঊর্ণনাভ থেকে প্রায় তো বেরিয়ে এসেছি। অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছের মতো অবস্থা। পায়ুপ্রদেশ থেকে বিষ্ঠার সরু সুতো পুরোটাই বেরিয়ে এসেছে। এখন সাঁতার কাটতে কাটতে একসময় বিমোচিত হয়ে পড়ে যাবে।

খুব ফিসফিস করে মালিককে বললুম, দুটো ফিশফ্রাই, ভাল করে স্যালাড দিয়ে প্যাক করে দিন।

প্রকাশ্য স্থানে বাতাসের স্বরে কথা বললে মানুষ কীরকম অবাক হয়ে যায়, ভাবে লোকটা পাগল। দশ টাকার নোটটা তাঁর চোখের সামনে নাচাতে না থাকলে মালিক হয়তো দূর করে আমাকে তাড়িয়ে দিতেন। ব্যালেন্স ফেরত নিতে নিতে ফিসফিস করেই বললুম, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন, যে বয়সের যা। বেশি বয়েসে ডিপথিরিয়া বড় সাংঘাতিক জিনিস!

কিছু না বুঝেই বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাউন্ডবক্স একেবারে নষ্ট করে দেয়। যাক বেঁচে গেছেন, এই ঢের।

আমার সঙ্গে কথা শেষ করেই গলা সপ্তগ্রামে তুলে রেস্তোরাঁর সুরে পাঠশালের সর্দার পোড়োর মতো বললেন, দুটো ফিশফ্রাই, স্যালাড, মুড়ে দাও, বাইরে যাবে।

দোকানের বাইরে চাতালের একপাশে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছি। অপরাহ্নের শ্যামবাজার টগবগ করছে। মনে মনে বলছি, হে ঈশ্বর! অপর্ণা যেন আমাকে দেখতে না পায়। ভাবতে চেষ্টা করছি, আমি অপর্ণার পিতা। মেয়েটা সুপাত্রে পড়ুক। মনে মনে সম্পর্ক পালটালে ঈর্ষাটা হয়তো কমে যাবে। যতই বড়াই করি না কেন, নৈবেদ্য ছাগলে খেতে থাকলে পাথরের দেবতাও নড়েচড়ে উঠবেন। আমি তো মানুষ। ভেতরটা খইয়ের মতো চটরপটর ফুটছে। পাশ থেকে অপর্ণাকে দেখছি। গোল হাতের কবজিতে কালো ব্যান্ডে বাঁধা সোনার ঘড়ি। প্রতিটি নখে লাল আপেলের মতো নেলপালিশ। খুশিতে যেন ডগমগ করছে। মাঝে মাঝে হাসছে। মুক্তোর মতো দাঁতের সারি অলংকারের বাক্স থেকে কঙ্কনের মতো স্বপ্রকাশ, অপ্রকাশ হচ্ছে। টেবিলে টেবিলে পিটপিটে কাটলেটের ওপর মরিচগুঁড়ো পড়ছে না তো, পড়ছে আমার মনে। ভেতরে যেন কোস্তাকুস্তি চলেছে। আসক্তি আর নিরাসক্তি মনের মল্লভূমিতে যেন দুই পালোয়ান, পটাপট তাল ঠুকছে। ওদিকে মোগলাই পরোটার মণ্ডে চটাপট চাপড় পড়ছে।

অপর্ণা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে। ছোট্ট হাঁ করে, মুখে মৌরির দানা ছুড়ছে। মেয়েটাকে সত্যিই ভারী সুন্দর দেখতে। ঈশ্বর কি এর চেয়েও সুন্দর! এখুনি দু'জনে বেরিয়ে আসবে। আর একটু আত্মগোপনের প্রয়োজন। দেখে ফেললে ওর লজ্জাটাই আমার লজ্জা হয়ে দাঁড়াবে। চট করে ফুটপাথে নেমে পড়ে ভিড়ে মিশে গেলুম। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে আবার যখন ফিরে এলুম, দোকান তখন বিপন্মুক্ত।

হাতে গরম প্যাকেট। মৃদু সুবাস নাকে এসে লাগছে। মনে ঘুরছে সেই গানের কলিটি, ঘরে ঘরে আলো/ দেখে লাগে ভালো/ মোর হৃদি গেহ/ অন্ধকারে কালো। মাতামহ-শূন্য পৃথিবীর এই পথের পাশে কোথাও যদি পরপারে যাবার একটা সাঁকো থাকত! এখুনি চলে যেতুম। রুপোর গাছে সোনার পাতা, মণিমুক্তোর ফল ধরেছে, চাঁদির পেখম মেলে ময়ূর নাচছে। তিনি লাল লাল পান্তুয়া খেতে বড় ভালবাসতেন। বড় ভালবাসতেন আমাকে। ভালবাসতেন সাধুসন্তের সঙ্গ। সেখানে গিয়ে যদি দেখি, সকলের সঙ্গে আসর সাজিয়ে কনকও বসে আছে! চাঁদের আলোর রঙের শাড়ি পরে। পাশে হাসিহাসি মুখে বসে আছেন আমার মা। তা কি আর হয়? এ জীবন থেকে যাঁরা হারিয়ে গেলেন, তাঁরা হারিয়েই গেলেন।

কাহার সৃজন এই নগণ্য জীবন?
এ কি শুধু প্রহেলিকা?
ওই আলেয়ার শিখা
জ্বলিতে জ্বলিতে গেল নিবিয়া যেমন!
বাঁধিতে বাঁধিতে সুর সপ্তস্বরা শত-চুর!
মেলিতে মেলিতে আঁখি মিলাল স্বপন!

আমায় তিনি এই বস্তুটি লুকিয়ে চুরিয়ে আনতে বলেননি, তবু আমি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়, উত্তপ্ত বস্তু দুটিকে জামার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলুম। কী অদ্ভুত আমার সংস্কার! স্বামীজি ছাদে পায়চারি করছিলেন। আঁধার আঁধার আকাশের তলায় গেরুয়ার শোভা কী খুলেছে! সন্ন্যাসীর আশ্রম কত পবিত্র হতে পারে, সংসার যে কত বদ্ধ পঙ্ককুণ্ড এই আমি প্রথম বুঝলুম। অর্থনীতির দাসত্ব নেই, ইন্দ্রিয়ের নিয়ত আবদারে চঞ্চল হতে হয় না, নারীর মুখ দর্শন না করলেও চলে। মনকে শুধু ঊর্ধ্বে তুলে রাখো। এখানে সদা বসন্ত।

স্বামীজি আমাকে দেখে দু'চরণ গান গেয়ে উঠলেন: তোমার চরণ পেয়ে হরি! আজকে আমি হেসে মরি/কী ছাই নিয়ে ছিলাম আমি, হায় রে কী ধন চাহি নাই।

বড় সুন্দর সাধা গলা। এই গানটি আমার মাতামহ প্রায়ই গাইতেন। গানটি আমার জানা। আমার এই মুহূর্তের আবেগের সঙ্গে ভীষণ খাপ খেয়ে যাচ্ছে। প্রথম চরণটি গাইবার লোভ সামলাতে পারছি না। গেয়েই ফেললুম, আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে, বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই/দু'জন যদি হত আপন, হত না মোর আপন সবাই।

স্বামীজি সোৎসাহে বললেন, এই তো, এই তো, বেরিয়ে এসো। সহজ হও, সুন্দর হও, নির্মল হও। বৈরাগ্য, বৈরাগ্য। নিত্য আমি অনিত্যরে আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ দ্বারে/ কেড়ে নিলে দয়া করে তাই হে চির! তোমারে চাই।

অনুচ্চ কণ্ঠে, সন্ধ্যার আবেশে, আমাদের দু'জনের কণ্ঠ বাতাসে ভেসে ভেসে মহালোকের দিকে পবিত্র পাখির মতো উড়ে গেল। এমন বৈরাগ্যের ভাব আগে কখনও অনুভব করিনি। স্বামীজি আমার পাশে এসে মাথায় হাত রাখলেন। সে স্পর্শের কী অনুভূতি! কোথায় লাগে প্রেয়সীর হাত, পিতার হাত, মাতার হাত। স্নেহ আমরা কাকে বলি! এ স্পর্শে স্নেহের স্নেহ, প্রেমের প্রেম, ভালবাসার ভালবাসা। আবেগে চোখে জল এসে গেল।

স্বামীজি বললেন, কী হবে সংসারে থেকে! এমন একটা মন যখন পেয়েছ, আধারটিকে শুদ্ধ করে আত্মোপলব্ধির দিকে এগিয়ে চলো। তুমি অর্থ দিয়ে অর্থের সঙ্গে লড়তে পারবে না, তুমি ক্ষমতা দিয়ে ক্ষমতার সঙ্গে পারবে না, তুমি হিংসা দিয়ে হিংসার সঙ্গে পেরে উঠবে না। জাগতিক সবকিছুরই বড়র ওপর বড় আছে। প্রভুর ওপর মহাপ্রভু। একমাত্র বৈরাগ্যই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যার ওপরে আর কেউ নেই। বিহায় কামান্ যঃ সর্বান পুমাংশরতি নিঃস্পৃহঃ/ নির্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ বৎস চরৈবেতি, চরৈবেতি।

হে রাজেন্দ্র, তোমা-কাছে নত হতে গেলে
যে উর্ধ্বে উঠিতে হয় সেথা বাহু মেলে
লহো ডাকি, সুদুর্গম বন্ধুর কঠিন
শৈলপথে অগ্রসর করো প্রতিদিন□—

চলো, ঘরে চলো, কী এনেছ দেখি! টোম্যাটো সসের বোতলটা নিয়ে এসো।

প্লেটে ফিশফ্রাই, স্যালাড, সস, মনে বৈরাগ্য। আকাশে সন্ধ্যা। নীচে আরতির আয়োজন। সামনে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। শুধু সন্ন্যাসী নন, মহা পণ্ডিত। মন, তুমি আর কী চাও!

হে অন্তরযামী ত্রাহি!
তুমি বিনা মোর কেহ আর নাহি॥

আমি সব মেনে নিতে পারি, পারি না কেবল একটা জিনিস, আমার মায়ের ছেড়ে-যাওয়া সংসারে অন্যের কর্তৃত্ব। অন্যের বিশ্বাসে আমি হাত দিতে চাই না; কিন্তু আমার নিজের একটা বিশ্বাস আছে। মানুষের এই আসা আর যাওয়ার পরও, সংগীতের মতো একটা বেশ থেকে যায়। দেহ থেকে মুক্তি পাবার পর আত্মার স্বাধীনতা বেড়ে যায়। যেখানে আছি, সেখানে আছি, যেখানে নেই সেখানেও আছি। বিজ্ঞান ঘোড়ার ডিম কী বলবে! তার পরিধি কতটুকু! দুইয়ের পাশে দুই রেখে গুনবে, এক দুই-তিন-চার। এক যে চার হতে পারে, অনন্ত হতে পারে সেই সত্যটি জানা আছে কেবল সাধকদের। কবিদেরও সে অনুভূতি আছে। তা না হলে এমন লাইন আসে কোথা থেকে?

একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্তদীপ-জ্বালা
দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা
একি শ্যাম বসুন্ধরা, সমুদ্রে চঞ্চল
পর্বতে কঠিন, তরু পল্লবে কোমল,
অরণ্যে আঁধার। এ কি বিচিত্র বিশাল
অবিশ্রাম রচিতেছে সৃজনের জাল
আমার ইন্দ্রিয়যন্ত্রে ইন্দ্রজালবৎ।
প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।

সাধকের কথা মিথ্যে, আর টেস্টটিউব-নাড়া বিজ্ঞানীর কথা সত্য! যাঁরা না চাখলে মিষ্টির মিষ্টতা স্বীকার করেন না, যাঁরা না দেখলে অস্তিকে নাস্তি করে দেন, তাঁদের কথায় কল চলতে পারে, মানুষ চলতে পারে না। কেউ না জানুক আমি জানি, এ বাড়ির সর্বত্র মায়ের অস্তিত্ব বর্তমান। একটা কাঁসার বাটি জোর করে মাটিতে ঠুকে বসাবার পর পাশ থেকে দেখলে কী দেখা যাবে? বাটিকে ঘিরে আর একটি বাটি কাঁপছে। অস্তিত্বের এই কম্পন মানুষের বেলায় অত সহজে বিলীন হয় না। কত লক্ষ যোনি ঘুরে মানুষের জন্ম! জীবচক্রের শেষ ক্রম। তারপর কী? সৃষ্টি বিজ্ঞানীরা জানেন না। জানেন সাধক। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, গান থেমেছে? বলব, হ্যাঁ থেমেছে, কিন্তু সুর ভেসে আছে।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজির ডায়েরি আমি লাইন বাই লাইন পড়েছি। ভাগলপুরের কাছে বস্তি বলে একটি অঞ্চলে ব্রহ্মচারীজির দাদা থাকতেন। সেখানে নির্জন একটি ঘরে সেই মহাপুরুষ রাতে যে-খাটে শুতেন, সেই

খাটটি রোজ রাতে এসে কেউ প্রচণ্ড ঝাকিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে চলে যেত। বন্ধ ঘরে মাঝরাতে এই উৎপাতের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছিল না। হাসপাতাল-সংলগ্ন আবাসস্থল। ব্রহ্মচারীজির অগ্রজ বললেন, আশ্চর্য হবার কিছু নেই, হতেই পারে। বহু অবাঞ্ছিত মৃত্যু এখানে প্রতিদিন হচ্ছে, বহু আত্মা ঘুরছে চারপাশে। সংলগ্ন হাসপাতালের একটি ওয়ার্ডে, একটি বেডের কথা তিনি বললেন। সেই শয্যায় যাঁকেই রাখা হত, তিনিই পরের দিন তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাতেন। কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেল, সেই খাটে যে-ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল, মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর অধিকার ছাড়তে পারেননি। মাঝরাতে এসে আগন্তুকের বুকে চেপে বসে কিল চড় ঘুসি মারতেন। খামচে দিতেন। অবশেষে তুলে ফেলে দিতেন নীচে। কোনও সাধক নিশ্চয়ই ভূতের গল্প বানাবেন না। সাধারণ মানুষের মতো তাঁরা ভূতের ভয়ও পাবেন না। যা সত্য তা সত্য। যার বিশ্বাস আছে তার আছে। প্রেত যদি বায়বীয় একটা ব্যাপারই হবে, তা হলে তার ওজন আসে কোথা থেকে! বুকে চেপে বসলে দম বন্ধ হয়ে আসে কেন? যদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই না থাকবে, তা হলে কিল চড় ঘুসি মারে কী করে! সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা অজ্ঞাত বিজ্ঞান রয়েছে। পরমহংস বিশুদ্ধানন্দজির কাছে গেলে বুঝিয়ে দিতেন, সূর্যবিজ্ঞানে সবই সম্ভব। সূর্যের রশ্মিজালের মিলনে, গঠনে, অমিলনে, বস্তুজগতের উদ্ভব। সেই মহাত্মা শুধুমাত্র হাতে নাড়াচাড়া করে গাঁদাকে গোলাপ আবার সেই গোলাপকে জবাতে রূপান্তরিত করতে পারতেন সকলের চোখের সামনে অক্লেশে। তিনি বলতেন সূর্যবিজ্ঞানই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য। সেইজন্যে সূর্যের আর এক নাম সবিতা। এর পাশাপাশি আরও বিজ্ঞান আছে, যেমন চন্দ্রবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, ক্ষণবিজ্ঞান। এসব জ্ঞান তিনি পেয়েছিলেন তিব্বতে থাকার সময়। তিনি প্রয়োজন বোধে তাঁর শরীরের যে-কোনও অঙ্গকে আকারে বিশাল ও বিপুল করে ফেলতে পারতেন। যেমন আদেশ করার সময় তাঁর তর্জনীকে তিনি এমন স্ফীত করতে পারতেন আদিষ্ট বিস্ময়ে হতবাক হতেন। আমাদের চোখের, কানের, মনের অনেক পরিমিতি আছে। আমরা সব শব্দ শুনতে পাই না, সব আলো দেখতে পাই না। আমাদের মগজের তিনের চার অংশ ঘুমিয়ে আছে। তাকে জাগাবার কৌশল সাধারণ মানুষের নেই। একের চারেই এত সব হচ্ছে। সাধকরা বলেন, ধ্যান করো। বিক্ষিপ্ত মনকে অন্তর্মুখী করো। সহস্রদলকে বিকশিত করো। তখন দেখবে, তুমিই বিশ্ব, বিশ্বই তুমি। যেখানে লয় নেই, ক্ষয় নেই, রূপান্তর আছে। সূর্যের সহস্রধারায় বস্তুপুঞ্জ অণুতে পরমাণুতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন গঠিত পুনর্গঠিত হচ্ছে। একই বহু, বহুই এক। বিশুদ্ধানন্দজি বলছেন, সমস্ত বস্তুর ভেতরেই সমস্ত বস্তু অল্পবিস্তর আছে। পরমাণুর গ্রহণ আর বর্জনই বস্তুর এক এক রূপে আবির্ভাব ও বিলয়। জড় বিজ্ঞানীর কাছে বিজ্ঞানের কী-ই বা শেখার আছে! কিছু দেখা, আর সেই দেখার ওপর ভিত্তি করে কিছু সূত্র নির্মাণ। কিছু শিখতে হলে যেতে হবে যোগীর কাছে, যাঁরা বলছেন: সূর্যই হল সব বিজ্ঞানের মূল স্তম্ভ। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এককথায় জাগতিক আর ব্যবহারিক সবকিছুই সূর্যাধীন। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তির উৎস সূর্যমণ্ডল। শুধু তাই নয়, সূর্যের পথ ধরে দেবযান সম্ভব। সূর্যই মুক্তির দ্বার। যোগে আর বিজ্ঞানে কোনও তফাত নেই, তফাত শুধু প্রণালীতে। যোগের পথে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পথে যোগ দুই-ই সম্ভব।

আমার এইসব বিশ্বাসের কথা আমি কাউকে বলতে পারব না, বলতে চাইও না। কে শুনবে! পাগল ভেবে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবে। আমি জানি, এ সংসার ছেড়ে মা এখনও যেতে পারেননি। তিনি অন্য তরঙ্গে, আমাদের চোখে ধরা পড়ে না এমন রূপে বর্তমান। মাতামহ তা হলে অমন তুলসী তুলসী করতেন না। তাঁর

সেই দৃষ্টি ছিল। তিনি ছিলেন গৃহী তান্ত্রিক। তাঁর অনেক বিভূতি ছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব দুর্ঘটনা থেকে পিতৃদেব কীভাবে রক্ষা পেয়ে আসছেন? এ পাড়ায় আমাদের শত্রুর তো অভাব নেই। মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কে তাদের দাঁত ভেঙে দেন! গুরুজনের সঙ্গে আমি তর্কে নামতে চাই না, আমি শুধু আমার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই।

এই যে কাকিমা এখন ড্রয়ার খুলে সব কাপড়চোপড় গোছগাছ করতে লেগেছেন, কার হুকুমে! নিজের অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ড্রয়ারের দ্বিতীয় খোপে আমার মায়ের কিছু শাড়ি আর ব্লাউজ আছে, রেশমের মতো নরম এক ধরনের পেটিকোট আছে। কী যেন তার নাম, স্যারাঙ্গ না সারঙ্গ। সব ছেড়ে ওইসব নিয়ে টানাটানি করছেন কেন! জানেন না ওগুলো হল পবিত্র স্মৃতি! আমি ঘরে বসে আছি, একবার আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। পিঠের দিকে আঁচলে ঝুলছে চাবির থোলো। আমাদের সংসারের চাবি কবে কীভাবে ওঁর অধিকারে চলে গেল! তাজ্জব ব্যাপার! ভদ্রমহিলা কি আমার মায়ের স্থান অধিকার করতে চাইছেন? চেহারায় বেশ একটা লাবণ্য এসেছে। রং যেন ফেটে পড়ছে। চোখে এক ধরনের জ্যোতি এসেছে। সব ব্যাপারেই বাড়তি উৎসাহ। ধরে আনতে বললে বেঁধে আনেন।

মাঝে মাঝে আমি আড় চোখে তাকিয়ে দেখছি। খুব শুদ্ধ দৃষ্টি নয়। শুদ্ধ হলে শরীরের চিন্তা আসত না। এই মহিলার পাশাপাশি থেকে সাধনভজন অসাধ্য। আচারের ঘরে অম্বলের রুগি বাঁচতে পারে না! তিলে তিলে মৃত্যুই আমার কপালের লিখন।

ভদ্রমহিলা মাঝে মাঝে এটা সেটা প্রশ্ন করছেন, যার উত্তরে আমাদের পারিবারিক ইতিহাস বেরিয়ে আসবে। মায়ের সঙ্গে আমার পিতার সম্পর্ক কেমন ছিল! জানেন আমার কিছুই জানার কথা নয় তবু যতসব মেয়েলি প্রশ্ন। কোনওটারই উত্তর আমি দিচ্ছি না, হুঁ হাঁ করে যাচ্ছি বা চুপ করে থাকছি। এক একটা জিনিস বেরোচ্ছে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে, উত্তর ফিরছে না।

আমি খাটে পাশ ফিরে শুয়ে আছি। পিতৃদেব দ্বিপ্রহরের আহারের পর সামান্য বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমার শরীরও ভাল নয়, তা ছাড়া মাতুল আজ সন্ধের ট্রেনে ফিরে চলেছেন। আজ আর আমার অফিসে যাওয়া হল না। দেরাদুনে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। আর তানানানা করে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। কাকিমা মাতুলের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন না। ভদ্রমহিলার প্রখর মানসম্মান বোধ। বললেন, ওখানে গেলে তো আয়ার মতো থাকতে হবে। এ কথা আর কাউকে অবশ্য বলেননি, বলেছেন আমাকেই, একান্তে। শুনে আমি স্তম্ভিত। সেই মুহূর্তে খুব খারাপ একটা কথা আমার জিভের ডগায় এসেছিল, কোনওরকমে আটকে ফেলেছিলুম, তা না হলে বলেই ফেলতুম, খেতে পেলে শুতে চায়!

হঠাৎ ভালবাসা কেন কুৎসিত ঘৃণার চেহারা নিল! কারণটা কী? স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন, নিজেকে অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধানের ফলে যেসব বস্তু বেরিয়ে আসছে, দেখে চমকে উঠছি। কর্পোরেশনের ম্যানহোলে মনে হয় এর চেয়ে কম ময়লা জমে আছে। মনটা একেবারে পচে গেছে। অ্যামপুট না করলে বাঁচার আশা নেই। কুৎসিত এক ধরনের ঈর্ষায় ভেতরটা পুড়ছে। সর্বনাশ! আমার দেবোপম পিতৃদেবকে কি আমি রাইভ্যাল মনে করতে শুরু করেছি! আমার আত্মহত্যা করা উচিত। সাধুসঙ্গে সদ্গ্রন্থপাঠে আমার ঘোড়ার ডিম হবে।

আমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছি। ঘরে বসে বসে, কারুর সঙ্গে না মিশেও আমি গোল্লায় চলে গেলুম। ভেকের মতো ভোগী একটা সত্তা ভেতরে বসে কর্কশ ডাক ছাড়ছে।

আমার সমস্ত চিন্তায় ছেদ পড়ে গেল। কাকিমা খুব সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি নিয়ে আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'দেখেছ, কী সুন্দর শাড়ি তখন তৈরি হত! একেবারে নরম তুলতুলে। ডিজাইনটা দেখো একবার! কী তখন থেকে শুয়ে শুয়ে উঁ উঁ করছ! ওঠো না।'

কাকিমা আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ওঠাতে চাইলেন। মেয়েদের এ এক ধরনের দানবীয় সোহাগ। ভালবাসার জোয়ারে হজম করা যায়, ঘৃণায় মনে হয় অসহ্য উৎপাত। চুল ধরে তুলতে গিয়ে হাত ফসকে শাড়িটা পাটে পাটে ভেঙে মেঝেতে ধসে পড়ল। দুটো কান আমার গরম হয়ে উঠল। ধৃষ্টতা সীমাহীন! মৃত মানুষ আর দেবতায় কোনও তফাত আছে! এই শাড়িতে আমার মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণ লেগে আছে। যিশুখ্রিস্টের অঙ্গাচ্ছাদনের মতো এই বস্ত্র পবিত্র, আমার কাছে হোলি বাইবেলের মতো।

উঠে বসে বললুম, এ কী করছেন আপনি? এসবে আপনাকে কে হাত দিতে বলেছে! বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে! এ বাড়ির আপনি কে? হু আর ইউ!

রাগের ঝোঁকে এক নিশ্বাসে কথাটা বলে ফেললুম। অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে জমছিল। থাইসিসের রুগির ফুসফুসক্ষরিত রক্তের মতো। অপমানে ভদ্রমহিলার টুকটুকে ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল। মেয়েদের কী অদ্ভুত মন! সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোলে জল এসে গেল। একটি করুণ ছবি ধীরে ধীরে ভোরের শিশির-ভেজা ফুলের মতো চোখের সামনে ফুটে উঠল। নিচু হয়ে অতি যত্নে শাড়িটি তুলে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটি সাদা স্ট্যাচুর মতো পিতৃদেব ঘরে এলেন।

আমি বলেছি, পলাশ।

চমকে উঠলাম। আমার পিতা জীবনে এই বোধহয় প্রথম ভাল নাম ধরে সম্বোধন করলেন। মুখের চেহারা শীতল। চোখদুটি ইস্পাতের ফলার মতো তীক্ষ্ণ। আশ্চর্য! পিতা কি এই মহিলাকে আগলাবার জন্যে ছুটে এসেছেন? এটা কি এক ধরনের আশকারা নয়, যার উৎস মানুষের মনের দুর্বলতা? পিতা আরও ঠান্ডা আরও কঠিন গলায় বললেন, আমি বলেছি। তুমি না জেনে এইরকম রূঢ় কথা বলতে পারলে? তোমার স্বভাব দেখছি বেশ পালটেছে! পাখি তুমি, বেশ উড়তে শিখেছ, আর এ বাসার প্রয়োজন কী, তাই না?

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনিও বেশ পালটেছেন।

ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম, এ আমি কী বলেছি! পিতৃদেব বললেন, আমি? আমি সেই একই আছি, দ্যাট সেম ওল্ড হরিশঙ্কর। তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপারে আমি পালটেছি, কাল আমার যে বয়েস ছিল, আজ তা একদিন বেড়েছে। আগামীকাল বেড়ে যাবে আরও এক দিন। তোমার দেখার ভুল। আমি জানি তোমার কী হয়েছে! তোমার দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে!

আপনি আমার পালটানোর কী দেখলেন?

শুনবে তা হলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রথম পরিবর্তন, তোমার মধ্যে সবসময় একটা রাগের খেলা চলেছে। কোনও কথাই আগের মতো আর সহজ সরল করে বলতে পারছ না। ছিলে ফুটন্ত ফুলের মতো, হয়ে গেছ কুঁড়ি। অকারণে আজকাল তুমি আমাকে এড়িয়ে চলতে চাও।

কারণ আছে।

জানি জানি, কারণ ছাড়া কার্য হয় না।

আপনি কারণটা সঠিক জানেন না।

হতে পারে। অনুমান সবসময় সঠিক পথে চলে না। তবে একটা কথা তোমাকে বলি, স্নেহ আর ভালবাসা দুটো মানুষকে এক সুরে বেঁধে দেয়, একই তরঙ্গে তারা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তুমি আমাকে ঘৃণা করো, বলো ঠিক কি না! সত্য বলবে। বি ফ্র্যাঙ্ক।

স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে ফ্র্যাঙ্ক হতেই বলেছেন। কিছু চেপে রাখবে না। জলের তোড়ে ঠেলে বের করে দেবে। বললুম, ঠিক ঘৃণা নয়, তবে সমালোচনা করতে ইচ্ছে করে। আপনার সবকিছু আর আগের মতো সমর্থন করতে পারি না, মেনে নিই।

সমালোচনার মতো কিছু দেখলে অবশ্যই সমালোচনা করবে। তুমি যেমন আমার পুত্র তেমনই আমার বন্ধু। বলো তুমি, কোথায় আমি তোমার সমর্থন হারিয়েছি?

যেমন ধরুন, যেসব জিনিস আমার মা ব্যবহার করতেন, সেসব জিনিস আমার কাছে ভীষণ পবিত্র। সে জিনিস আমরা ছাড়া অন্য কেন স্পর্শ করবে?

তোমার মা কি আমার স্ত্রী ছিলেন না?

ছিলেন।

দু'জনেরই সমান অধিকার।

আমার কিছু বেশি, পবিত্রতার দিক থেকে। স্ত্রীর চেয়ে মা অনেক বেশি পবিত্র।

স্ত্রী পবিত্র নয়?

মায়ের সঙ্গে সন্তানের রক্তের সম্পর্ক।

ও, তার মানে তুমি দুটো সম্পর্কে একটা ভেদ টানতে চাইছ? একটা রক্তের, সেই হেতু পবিত্র, আর একটা দেহের, সেই হেতু অপবিত্র। দেহ কখন রক্তে এসে যায় জানো কি? তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, ফিউশন কাকে বলে জানো? জানো কি এমন বন্ধন আছে যা অবিচ্ছেদ্য, মৃত্যু ছাড়া যে বন্ধন খোলে না। জানো তুমি?

জীবিত অথবা মৃত স্ত্রীকে মানুষ ফেলে দিতে পারে, অস্বীকার করতে পারে, অবহেলা করতে পারে। মাকে তা করা যায় না, যারা করে তারা পাপী।

তার মানে? তুমি বলতে চাইছ আমি তোমার মাকে জীবিত অবস্থায় অবহেলা করেছি, আর মৃত্যুর পর ভুলে গেছি! হায় রে বিচারক! কী তার প্রমাণ!

যে-জিনিস আপনি আমাকেও স্পর্শ করতে দিতেন না, সেই জিনিস আপনি এই মহিলাকে টেনে টেনে বের করার অনুমতি দিয়েছেন, শুধু তাই নয়, অসন্তোষ প্রকাশ করায় তেড়ে এসেছেন আমাকে। অথচ এই

মহিলা একদিন আপনার বিছানায় বসেছিলেন বলে, আপনি আমাকে তিরস্কার করেছিলেন।

বিছানায় বসলে এখনও করব। পুরুষের শয্যা পবিত্রস্থান, সাধনপীঠ।

আর মায়ের স্মৃতি বাজারের প্রদর্শনী! মা আর আপনাতে জীবিত নেই। এবার সত্যই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তোমার ইঙ্গিত বোঝার মতো বুদ্ধি আমার আছে, পলাশ। তবে একটা কথা, তুমি বড় তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে এসে গেছ। মানুষ সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা নেই।

মনে আছে, সেই জবার ব্যাপারে আপনি আমাকে কী বলেছিলেন?

তুমি কি তার রিটার্ন দিতে চাইছ?

আমি কেন, জনসাধারণ কী বলছে খবর রাখেন?

জনসাধারণ? তারা কে? আমি কি একটা পাবলিক ফিগার, যে তাদের ভয় করে চলতে হবে! আমি হরিশঙ্কর, একটা ইনডিভিজুয়্যাল ম্যান, যে শুধু তার বিবেকের নির্দেশে চলে, বিবেকের কাছে সমর্থন খোঁজে। তুমি আমাকে দেখছ না? ও, না, আমারই ভুল। তুমি তো চোখে দেখো না, তুমি দেখো কানে, লাইক স্নেকস।

আপনি সংসারের চাবি এই ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিয়েছেন কেন? জানেন এই চাবি আমার মায়ের আঁচলে বাঁধা থাকত!

এতে তোমার মহাভারত এমন কী অশুদ্ধ হল? তোমার শিক্ষা কি পরকে আপন করতে শেখায়নি? কনফিডেন্স শব্দটা কি তোমার কাছে অপরিচিত! তোমার বউ আসুক এ চাবি তো তারই। এটা তো স্টপ গ্যাপ।

বউ কোনওদিনই আসবে না। আমি বিয়ে করব না।

তুমি আমাকে ছোট করে বিদ্রোহ জানাতে চাও?

আপনি ছোট হবেন না, জেনে রাখুন সেই মেয়েটি চরিত্রহীন।

তার মানে? এও কি তোমার এক নতুন আবিষ্কার?

নিজের চোখে দেখা।

আশ্চর্য! চরিত্রহীনতা চোখে দেখা যায়! সে তো অনুসন্ধানের বস্তু, আবিষ্কার করতে হয়।

সত্যের মতো মানুষ হোঁচট খেয়েও তার ওপর পড়তে পারে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে আমি সেই সত্যের ওপর পড়ে গেছি। মেয়েটি আমার চেয়েও ভাল একটি ম্যাচ জোগাড় করে ফেলেছে। তার সঙ্গেই সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া, সেদিন বাগবাজারের মোড়ে পঙ্কজবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে এমন একটা কথা বলেছেন, যা শুনলে আপনাদের এতদিনকার বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

শুনতে পারি?

পারেন। তিনি বললেন, পলাশ, তোমার বাবা এটা কী করলেন, আমার মেয়ে ইললিগ্যাল একজন শাশুড়ি নিয়ে কীভাবে ঘর করবে! আমাদের একটা নিখুঁত বংশের ধারা আছে।

ইজ ইট? এই কথা বলেছে? অল রাইট।

পিতৃদেবের চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। কিছু কথা থাকে যা শত চেষ্টাতেও চাপা যায় না। ঠেলে বেরিয়ে আসে, একটার পেছনে আর একটা। এই মুহূর্তে নিজেকে আমার পিতার চেয়েও মহান মনে হচ্ছে। আমি ইস্পাত, উনি খাগড়া। আমার ধারে উড়ে গেলেন।

আচ্ছা, পুরো ব্যাপারটা আমি একটু খতিয়ে দেখি। বিবেকের কাছে সারেন্ডার করব, না জনসাধারণের কাছে!

সদর থেকে হাঁক এল, চিঠি আছে, পার্সেল।

ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেলুম। বারান্দায় পিতৃদেব দাঁড়িয়ে আছেন, উদাসমুখে, আকাশের দিকে তাকিয়ে। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে খোদাই-করা পাথরের মূর্তি। কাকিমা যেন দম দেওয়া পুতুল। শাড়িটা রেখে ড্রয়ার বন্ধ করলেন। টিস করে একটা শব্দ হল।

বেশ মোটা একটা প্যাকেট। পিতার নামে এসেছে। রেজিস্টার্ড পার্সেল। ফর দিয়ে সই করে নিলুম। মনে হচ্ছে একটা বই আছে। হঠাৎ বই এল কোথা থেকে?

বইয়ের প্যাকেট হাতে তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সেইখানে গিয়ে বললুম, আপনার নামে একটা বই এসেছে। আকাশের দিক থেকে তাঁর চোখ ফিরল না। এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে চিকচিক করে। সুদূর থেকে ভেসে এল তাঁর গলা, খুলে দেখো। বই আবার কে পাঠালে?

যে সুরে বাজাই বেসুর লাগে
কোথায় যেন কসুর থাকে;
জমে না হায়, গান থেমে যায়
পরাণ-ভরা হাহাকারে।

পরতে পরতে কাগজ জড়ানো পার্সেল খুলতে একটু সময় লাগল। বই। বেশ স্বাস্থ্যবান। প্রথমেই যে-দিকটা বেরুল, সেটা মলাটের পেছন দিক। হঠাৎ কে আবার বই পাঠালেন! বইটা ওলটাতেই মনে হল আমি আচমকা একটা গুলি খেলুম। সরাসরি একেবারে বুকে। জিভে তামাটে স্বাদ। পা দুটো থিরথির করে কাঁপছে। বরফশীতল সরীসৃপ পা বেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বুকের দিকে উঠে আসছে। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেতুম, আমার মুখ নীল হয়ে গেছে। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। বইটাকে কোনওরকমে উপুড় করে রেখে, প্রায় মাতালের মতো টলতে টলতে নিজের ঘরে ঢুকে খাটে বসে পড়লুম।

সামলাতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। ছি ছি, ভাবা যায় না। এ কার কাজ! তাকে হাতের কাছে পেলে, খুন করে জেলে যেতেও রাজি ছিলুম। পিতাকে এভাবে অপমান করার শোধ তুলতুম। মানুষের ভেতরে ভেতরে কত বড় বড় পয়ঃপ্রণালী চাপা আছে? ওপর দেখলে বোঝা যায় না। হাসছে। জোড় হাতে নমস্কার করছে। সহৃদয়তায় গলে পড়ছে। দেখা হলেই, কী কেমন আছেন, বলে দাঁত বের করছেন। বিজয়ায় কোলাকুলির ঘটা। পিতৃদেব সেই কারণেই মাঝেমধ্যে বাথরুমে গেয়ে ওঠেন, জগতে লোক চেনা ভার মুখ দেখে। মুখে সবাই পরম বন্ধু, হৃদয় ভরা বিষ। এই পৃথিবীর সব ভাল, বৃক্ষ, লতা, স্রোতস্বতী, আকাশ বাতাস, সব ভাল। কুৎসিত হল মানুষ! বাঁদর যে আমাদের পূর্বপুরুষ! কেমন করে ভোলা যায় আমাদের সেই সলাঙ্গুল অতীতকে। একটু আগে আমিই বা কী করে এলুম! নিঃসঙ্গ পবিত্র এক যোদ্ধাকে অহংকারের বল্লম দিয়ে খোঁচা মেরে এলুম। আমি এক মূর্খ।

পিতা বারান্দায় সেই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে যেন বয়ে চলেছে দিকহীন জীবনের নদী, যার পরপার ঝাপসা অনিশ্চয়তায় আচ্ছন্ন। পায়ে হাত রেখে প্রণাম করায় চমকে উঠলেন, কে? হঠাৎ কী হল তোমার?

আমায় ক্ষমা করুন।

সন্তান তো সবসময় ক্ষমার স্রোতেই ভাসছে। পিতার অপরাধের ক্ষমা কোথায়?

আপনার কোনও অপরাধ নেই। কোন সমাজে আমরা বাস করছি আমার জানা ছিল না। ওই দেখুন, কী বিশ্রী নোংরা এক বই পাঠিয়েছে অদৃশ্য কোনও এক প্রেরক।

আমি অনুমান করেছিলুম। একটি মহাপুরুষ-বাক্য তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যব হাতি চলে বাজার, তো কুত্তা ফুকে হাজার। এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। মানুষকে এই ভাবেই এগিয়ে যেতে হবে বন্ধুর পথে, ডোন্ট ফ্লিকার মাই বয়। ন্যায়কে অন্যায় কোনও দিনই পরাস্ত করতে পারে না, কোনওদিন পারেওনি, থমকে দিতে পারে। যাও, কেরোসিনে চুবিয়ে বইটাকে উনুনে ফেলে দাও। তুমি আমার বন্ধু। সমালোচনার অধিকার তোমার আছে। সংশোধনের প্রয়োজন থাকলে নিজেকে সংশোধন করার উদারতা যেন আমার থাকে। মৃত্যুর আর এক নাম 'রিজিডিটি', জীবনের আর এক নাম 'ফ্লেক্সিবিলিটি'। পিন্টু, লেট আস লাভ লাইফ, নট ডেথ।

কুৎসিত কদর্য বইটা যত তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলা যায় ততই ভাল। আর এক মুহূর্ত ফেলে রাখা উচিত হবে না। তার আগে আর একটা কাজ বাকি। কাকিমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। বড় অন্যায় করে ফেলেছি। মহিলার সব গেছে, আছে শুদ্ধ জীবনের সামান্য আশা। কে না বাঁচতে চায়! ফুটপাথে সারারাত ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে যে পড়ে আছে, তার সামনে মৃত্যু এসে দাঁড়ালে সেও একটু সময় চেয়ে নেবে। রোজ সকালে সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে সে-ও মনে মনে ভাবে, হয়তো আমারও দিন আসবে, দেখি না আর একটু অপেক্ষা করে।

মহিলা ওপরের কোনও ঘরেই নেই। কোথায় গেলেন? নীচে! সেই বিমর্ষ, মৃত্যু-শীতল কোটরে যেখানে উচ্ছৃঙ্খল, আশাহত একটি মানুষের প্রেত নিঃশব্দে জীবনকে গ্রাসের অপেক্ষায় আছে। একী? সেই চাবির থোলোটা ড্রয়ারের মাথায় পড়ে আছে, যেটা একটু আগেও কাকিমার আঁচলে ছিল। এবার যদি আমার চোখে জল এসে থাকে, সে কি আমার দুর্বলতা, আমার কোমলতা! সংসার আমার জন্যে নয়। এ বড় করুণ স্থান। প্রতি মুহূর্তেই কাচের ফলার ওপর দিয়ে রক্তাক্ত হতে হতে হাঁটা।

নীচের ওই ঘরে ঢুকতে ইদানীং আমার ভীষণ ভয় করে। মনে হয় হাঙরের মতো এখুনি আমাকে আবার মুখে পুরে ফেলবে। অতীত ফিরে আসবে অনুশোচনা নিয়ে। প্রায়ান্ধকার ঘর থেকে একটা ফোঁসফোঁস শব্দ আসছে। দরজার কাছ থেকে খুব মৃদু সুরে ডাকলুম, কাকিমা! কোনও সাড়া পেলুম না। ফোঁসফোঁসানিটা সামান্য কমে এল।

আবার ডাকলুম, কাকিমা।

এবারে চাপা গলায় উত্তর এল, এসো।

নিরাভরণ ঘরে দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভদ্রমহিলা বসে আছেন। নোনা-ধরা ড্যাম্প ঘরের চারপাশ থেকে হিলহিল করে উঠছে মৃত্যুর শীতল নিশ্বাস। অনেকদিন আগে বোতলে একটা পাথরকুচি গাছ রেখেছিলুম। একদিন নির্জন দুপুরে বোতলটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আঁতকে উঠলুম। নীলচে সবুজ জলে, জালি জালি অসংখ্য সাদা সাদা শিকড় জীবন্ত প্রাণীর মতো, অক্টোপাসের মতো কী যেন খুঁজছে। মনে হল কাচের আবরণের বাধা না থাকলে, আমাকেই জড়িয়ে ধরতে পারে। এই ঘরেও দৃষ্টিকে আমি তেমনভাবে চারপাশে ফেরাতে পারি না। ভয় করে। চারপাশে ঝুলে আছে আমার কৃতকর্মের সরু সরু কীট।

সেই রাতে আমি যতটা কাছে যেতে পেরেছিলুম, আজ আর তা পারলুম না। চিরকালের জন্যে মনে পাপ ঢুকে গেছে। মন অপরিষ্কার হয়ে গেলে মানুষ কেঁচোর মতো গুটিয়ে যায়। বেশ কিছুটা দূর থেকে বললুম,

আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে কাকিমা আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চোখের বড় বড় পাতা জলে ভিজে ভারী হয়ে ঝুলে আছে। গালে এক বিন্দু পলাতক জল টলটল করছে। এই কি বিধবা হবার বয়েস! কথাটা মনে হওয়ামাত্রই চমকে উঠলুম। এ আমি কী ভাবছি?

কাকিমা ধরাধরা গলায় বললেন, তুমি তো কোনও অন্যায় করোনি। ঠিকই করেছ। আমার বোকামি এখন আমি বুঝতে পেরেছি। পর কখনও আপন হয় না, পিন্টু। তুমি ঠিক করেছ, ঠিক করেছ।

ঠিক করেছ ঠিক করেছ বলতে বলতে কান্নায় গলা ভেঙে এল। এখন তো আমার আর কিছু করার নেই। ছোড়া পাথর, ওলটানো দুধ আর বলা কথা, কোনও ভাবেই ফিরিয়ে আনা যায় না। আর কাছের মানুষ নই, দূরের মানুষের মতোই বললুম, আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে, ওপরে চলুন।

কান্না সামলে কাকিমা বললেন, পিন্টু, তুমি আমার একটা উপকার করবে?

বলুন, সম্ভব হলে নিশ্চয় করব।

মামাবাবু আজ রাতে চলে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে তোমরা আমার যাবার ব্যবস্থা করে দাও। তখন আমি না বলেছিলুম, এখন আমি হ্যাঁ বলছি। আমাকে কোথাও একটা যেতেই হবে। এখানে সত্যিই আর থাকা যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি, কী থেকে কী হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। আমি বড় খারাপ মানুষের বউ ছিলুম। আশেপাশে এমন একজন কেউ ঘুরছে, যে আমাকে সুখে থাকতে দেবে না। আমাকে কোথাও একটা যেতেই হবে।

এসব কথা আপনি আমাকে না বলে, ওপরে এসে বাবাকে বলুন। আমি কে?

উত্তরে কোথা থেকে আবার একটু রাগের ছোঁয়া এসে গেল। মেয়েদের চরিত্রটাই এইরকম। এক ইঞ্চি পেলে, এক বিঘত চাইবে। ক্ষমা চাইলুম, তাতে হল না, অন্যায় হয়ে গেছে বললুম, তাতেও হল না। যাঁর কেউ নেই, তাঁর এত অভিমান সাজে না। কীসের অভিমান! কার ওপর অভিমান? পত্রশূন্য বৃক্ষের ছায়ার অভিমান!

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মনে হল, আমি হয় দেবতা, না হয় শয়তান! যতদিন মোহ ছিল, ততদিন আকর্ষণ ছিল। এখন শুধু পড়ে আছে ঘৃণা। আমার দ্বিতীয় কাজটি এবার করা যাক। কে থাকবেন আর কে যাবেন আমার জানার প্রয়োজন নেই। এ সংসার ভেঙেই আছে। দু'-একটি উটকো পাখি মাঝেমধ্যে উড়ে এসে গান শুনিয়ে যায়, তাকে বসন্ত বলে ভুল কোরো না মন!

গিধধোড় বইটার প্রথম মলাটের তলায় একটা চিঠি। মহামান্য হরিশঙ্করবাবু, অনেকদিন সব ভুলেটুলে গেছেন। আবার নতুন করে যখন শুরু করলেন, বইটা যথেষ্ট সাহায্য করবে। আপনি জ্ঞানী মানুষ। চরিত্রের অহংকারে মাথা উঁচু করে চলেন। দ্বিতীয় পক্ষের প্রস্তাব ঝ্যাঁটা মেরে উড়িয়ে দেন। তা মুনিদেরও তো মতিভ্রম হয়। নিজে কিনতে লজ্জা পাবেন ভেবে আমরা যৌতুক পাঠালুম। যে-বউভাত হল না, মনে করুন এটি সেই বউভাতেরই উপহার। খাওয়াটা পাওনা রইল মাইরি। অন্নপ্রাশনে যেন বাদ না পড়ি। বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখি। ইতি জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী।

আগুন আর বাইরে জ্বলবে কী! আগুন আমার ভেতরে জ্বলছে। আমি যদি পিতৃদেব হতুম, তা হলে চারপাশে চার জোড়া নহবত বসিয়ে, আকাশে তারাবাজির লহর তুলে, সকলের চোখের সামনে ওই মহিলাকে বিবাহ করতুম। কেন, বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রথা চালু করে যাননি! তিনি তা পারবেন না। অন্য জাতের মানুষ। অন্তরে যাঁর সন্ন্যাস তাঁর চিন্তায় এসব কখনও আসবে না। এ পল্লিতে আমাদের আর থাকা উচিত হবে না। আমাদের প্রচ্ছন্ন অহংকার আর আভিজাত্য এতকাল যেসব শত্রু তৈরি করেছে তারা এইবার সুযোগ নেবে। এই হল প্রথম আঘাত। এরপর একে একে আসবে।

চিঠি সমেত যৌনবিজ্ঞানকে কেরোসিন-স্নাত করে আগুনে সমর্পণ করামাত্রই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। শিখায় শিখায় সঙ্ঘর্ষে একটা অট্টহাসির মতো শব্দ উঠছে। এ হাসি আমার পিতার পূত চরিত্রের, না নোংরা প্রতিবেশীদের!

মোটা বই পুড়তে বেশ সময় নিল। রান্নাঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। প্রেতিনীর চুলের মতো ধোঁয়া ভেতরের ছাদে পাক খাচ্ছে। ডাইনির নৃত্য। চোখ জ্বালা করছে। পেছন থেকে ধরাগলায় কাকিমা বললেন, একী, এ আবার তুমি কী করছ? এখুনি যে অগ্নিকাণ্ড হয়ে যাবে!

এই চিঠি, ওই বই, এই মহিলা, সেই দুষ্ট প্রতিবেশী আমার মনেও কদর্য ভাব ঢুকিয়ে ছেড়েছেন। একেই বলে দ্রব্যগুণ। পেঁয়াজের সংস্পর্শে গন্ধ ধরবেই। চকিতে মনে উঁকি মেরে গেল, হলেও হতে পারে। নারী আর পুরুষের সম্পর্ক অনেকটা ঘৃত আর অগ্নির মতো। যিনি এই কয়েক মাসে সদ্‌গুরু সঙ্গ প্রায় মুখস্থ করে ফেললেন তাঁর তো জানা উচিত, নারী কী বস্তু। গোস্বামীজি স্পষ্ট বলছেন, স্ত্রী-দেহ এমনই উপাদানে গঠিত যে, নির্বিকার পুরুষের শরীরকেও তা আকর্ষণ করে। ইহা বস্তু-গুণ। অর্থ ও স্ত্রীলোক বড়ই ভয়ানক।

যে-বস্তু পুড়ে ছাই হচ্ছে, তার নাম তো এই মহিলাকে বলা চলে না। ওই গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আমার খুলে দেখার সাহস হয়নি। না হলেও, ওই জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে লাভ করার প্রয়োজন হয় না। রক্তে আছে। যত দিন যায় তত স্পষ্ট হয়, ততই প্রত্যক্ষ হয়। ধমনীতে ধমনীতে আর্তনাদ করে, আমি চাই, আমি চাই।

নির্বিকার গলায় বললুম, আগুন লাগার ভয় নেই। কিছু কাগজ পুড়ছে।

তোমাকে ডাকছেন।

যাচ্ছি।

উনুনের মুখে একটা লোহার ঢাকনা টেনে দিলুম। দেহবিজ্ঞান ছাই হয়ে গেল। ইন্দ্রিয় কিন্তু রয়েই গেল। সাংঘাতিক এক ইঙ্গিত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছে। আমি আর ভাল করে কারুর দিকেই তাকাতে পারব না। কেবলই মনে হবে, হলেও হতে পারে। মানুষের পক্ষে সবই যে সম্ভব?

পিতৃদেবের মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমেছে। বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বহু দূর থেকে বললেন, বোসো, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। ক'টা বাজল?

সাড়ে চারটে।

জয়ের ট্রেন ক'টায়?

আটটা কি সাড়ে আটটা হবে। আমার সঠিক সময়টা জানা নেই।

যাই হোক এখনও সময় আছে। শোনো, এ পাড়ায় আমাদের অনেক শত্রু আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। বাঙালির স্বভাব তোমার অজানা নয়। আমরা কারুর সঙ্গে বড় একটা মিশি না। আমাদেরও এক ধরনের উন্নাসিকতা আছে। নিজেদের বড় বেশি শ্রেষ্ঠ ভাবি। নেকড়ের মতো মানুষও সমাজবদ্ধ জীব। সমাজচ্যুতকে কামড় খেতেই হবে। আমি প্রস্তুত। তবে আমি আর লড়াইয়ে অকারণ শক্তিক্ষয় করতে চাই না। আমার সব শক্তিকে এখন অন্য কাজে লাগাতে হবে। দিন শেষ হয়ে আসছে, কাজের কাজ এখনও কিছুই করা হল না। ঝুলিতে কিছুই তেমন ভরা হয়নি, একেবারেই শূন্য। কিছু না নিয়ে, ম্লান মুখে আমি যাই কী করে! তুমি পবিত্র কোরান পাঠ করেছ?

আজ্ঞে না, আমার পড়াশোনা খুবই কম।

সময় পেলে পড়ে দেখো। তোমাকে আজ একটা কথা বলে রাখি, পরে আর হয়তো সময় পাব না। পৃথিবীতে আমাদের থাকার সময় বড় কম। এক জীবনে সব করে ওঠা যায় না। এলোমেলো পড়াশোনার কোনও দাম নেই। একটা ধারা ঠিক করে নিতে হয়। সেই জিনিসই পড়বে যা তোমাকে পজেটিভ কিছু দিতে পারে, তোমার সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, ধীরে ধীরে তোমার শূন্যতায় পূর্ণতা আনতে পারে। জগৎটাকে টুকরো টুকরো করে দেখো না! সব এক। সব মানুষ এক, সব ধর্ম এক, সব অনুভূতির উৎসও এক। কোরান কী বলছেন জানো, যে-ব্যক্তি পরলোকে ফসল কামনা করে আমি তার জন্যে পরলোকের ফসল বর্ধিত করে দিই। যে-কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে আমি তাকে তারই কিছু দিই। পরলোকে এদের জন্যে আর কিছুই থাকবে না। তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। বিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন বলবে, 'ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিজনবর্গের ক্ষতিসাধন করেছে।' শোনো, আমি আমার হঠকারিতা দিয়ে তোমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে চাই না। আমি পণ্ডিতের সঙ্গে পাণ্ডিত্য দিয়ে লড়তে পারি, অহংকারীর সঙ্গে লড়তে পারি অহংকার দিয়ে, অভিমানীর সঙ্গে অভিমান দিয়ে। অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার দিয়ে লড়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমার ভেতরে কোথাও একটা ছোট্ট শিখা জ্বলে উঠেছে। সেই শিখাটিকে সাবধানে আগলাতে হবে, বাড়াতে হবে। নিবে গেলে, আমার আর কিছুই থাকবে না।

হঠাৎ থেমে পড়লেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, এক গেলাস জল পেলে হত। আজকাল গলাটা বড় শুকিয়ে যায়। অ্যাসিডে বুকটা আমার ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

আমি জল এনে দিচ্ছি।

উদাস সুরে বললেন, দেবে দাও। বয়েসটা সত্যিই বাড়ছে। আগে অন প্রিনসিপল কাউকে কখনও হুকুম করিনি।

তাতে কী হয়েছে?

না না, মানুষের একটা আদর্শ নিয়েই চলা ভাল, অন্তত চেষ্টা করা উচিত।

এক গেলাস জল এনে হাতে দিলুম। গেলাসটা আলোর দিকে তুলে জলটা ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন, এই দেখো, কী সব ভাসছে।

কী ভাসছে? আশ্চর্য হয়ে গেলাসটা হাতে নিলুম। জল গড়িয়েই নিয়ে চলে এসেছি। তেমন খুঁটিয়ে দেখিনি। সত্যিই গুঁড়ো গুঁড়ো কী সব ভাসছে।

আমি পালটে আনছি।

কী বুঝলে?

আজ্ঞে?

স্নেহের বড়ই অভাব। বলো ঠিক কি না! আমি একজন 'পারফেকশনিস্ট' পিন্টু, আর সেইটাই আমার চরিত্রের মহা দোষ। আর একটা শিক্ষা কী হল বলো তো?

আজ্ঞে?

ব্রত ভঙ্গ করলে হতাশ হতেই হবে।

আমারই অপরাধ। আমি এখুনি আনছি পরিষ্কার জল।

জল খেয়ে গেলাসের গায়ের জল কোঁচার খুঁটে মুছে টেবিলে সাবধানে রাখলেন। কত সাবধানী। জলের দাগে টেবিলের পালিশ নষ্ট হতে পারে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি না তো!

আজ্ঞে না, আমার আবার সময়ের দাম কী?

তা হলে বোসো। তোমার আর পাঁচ মিনিট সময় নিই। আমার একটা আশঙ্কা হচ্ছে বুঝলে? আর সেটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। যে-চক্রান্ত প্রফুল্লকে পৃথিবী থেকে সরিয়েছে, সেই চক্রান্ত এবার আমাদের চারপাশে তার জাল বিস্তার করছে। এই মহিলাকে তারা সহজে ছাড়বে না। এমনও হতে পারে এই মহিলা হয়তো তাদেরই একজন। তোমার কী মনে হয়?

আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, এর পেছনে ওই মামাশ্বশুরটি আছেন।

তিনি কী কারণে থাকবেন?

তাঁর স্বভাব।

পয়সার তো অভাব নেই? ভাত যখন ছড়াতে পারেন তখন কাকের অভাব হবার তো কথা নয়।

শুনেছি...

যা বলতে চাই, তা গুরুজনের সামনে বলা যায় না।

কী হল, ইতস্তত করছ কেন? সাহস করে বলো। উই আর ফ্রেন্ডস।

আজ্ঞে, কোনও কোনও মানুষ বিশেষ কারণে কোনও কোনও মহিলায় আসক্ত হয়ে পড়তে পারেন, তখন তাঁরা যে-কোনও সীমায় যেতেও পিছ-পা হন না।

দ্যাটস রাইট। তা হলে চক্রটাকে ভাঙতে হয়।

সে তো আমাদের কাজ নয়। পুলিশের কাজ।

পুলিশ যথেষ্ট 'ইন্টারেস্ট' না-ও নিতে পারে।

না নিলে না নেবে। আমরা আর কী করতে পারি?

আমরা খোঁচাতে পারি। আমাদের সন্দেহের কথা পুলিশকে জানাতে পারি।

যা গেছে তা গেছে, শুধু শুধু ঘাঁটাঘাঁটি করে লাভ কী? ব্যাপারটা তো খুবই নোংরা।

নোংরামি বলে অপরাধীরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে? ভদ্রলোকদের এই ঠুনকো সেন্টিমেন্ট ক্ষমা করা যায়?

নোংরায় ঢিল ছুড়লে যে নিজেদের মুখে ছিটকে আসবে। অনেক জল ঘোলা হবে।

তোমার মতে আমাদের তা হলে এখন কী করা উচিত?

ওঁকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দেওয়া।

কোথায়?

মামার ওখানে উনি যেতে রাজি হয়েছেন।

আমাকেও সেই কথাই বলছিলেন। হঠাৎ রাজি হবার কারণ?

তা জানি না, জেনেও কাজ নেই। যেতে রাজি হয়েছেন, বাধা না দেওয়াই ভাল। এখানে থাকলে অশান্তি দিনে দিনে বাড়বে।

তা হলে তুমি একবার জয়ের কাছে যাও। আর বেশি সময় নেই। জয় শ্রাদ্ধের কাজটা এখানে করলেই পারত!

এখানে যে কেউ নেই।

ওখানেই বা কে আছে? যাক যা ভাল বুঝছে করুক। আমার আর সেদিন নেই যে জোর করব। সিঁড়িতে চুটুরপুটুর চটির শব্দ হচ্ছে। এই দুঃসময়ে কে আবার আসছেন? বড় সুললিত পদধ্বনি।

সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে

মেসোমশাই!

দরজার সামনে মুকু। স্বপ্ন দেখছি না তো? মুকু হঠাৎ উড়ে এল নাকি?

মেসোমশাই, আমি আবার এসে গেছি।

পিতা চেয়ারে নড়েচড়ে বসে বললেন, এসো এসো। তোমার বাবা?

বাবা আসেননি।

সেকী! তুমি একা একা এতটা পথ চলে এলে?

আমি কত বড় হয়ে গেছি!

তা হয়েছ, তবু মেয়েদের একটু সাবধানে চলাফেরা করাই ভাল।

আমরা এক দল চলে এসেছি হইহই করে।

মুকু কথা বলতে বলতে পিতৃদেবের পায়ের কাছে থেবড়ে বসে পড়ল।

ওকী, তুমি মেঝেতে বসলে কেন?

আপনার পায়ের কাছে বসতে ইচ্ছে করল। আপনি যদি আমার বাবা হতেন, কী ভালই হত!

পাগলি মেয়ে।

পিতার মুখে পাগলি সম্বোধন এই প্রথম শুনলুম। মুকু দু'হাতে পা স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাল। পিতা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মুকু কথার ফাঁকে ফাঁকে, বারকয়েক আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসেছে। দুর্দান্ত দেখতে হয়েছে। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরেছে। একই রঙের ব্লাউজ। এলো চুলের গোড়ায় একটি ফিতে বেঁধেছে। রেশমের মতো চুলের গুচ্ছ পিঠের কাছে দুলছে। আরও যেন ফরসা হয়েছে। চোখমুখ আরও ধারালো হয়েছে। একবার তাকালে আধ্যাত্মিক শক্তির বলে মনকে ভগবতমুখী করে, কষ্টে চোখ ফেরাতে হয়। ফিরিয়ে নিলেও নিবে-যাওয়া ধূপের ধোঁয়ার মতো অনেকক্ষণ ভাসতে থাকে। বুকে বড় কষ্ট হয়।

হঠাৎ তুমি চলে এলে?

আবার পড়তে এলুম।

তোমার জিনিসপত্তর?

হস্টেলে।

ও তুমি হস্টেলে থাকবে! কেন, এখানে অসুবিধে আছে?

মুকু মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, না না, অসুবিধে কীসের! একসঙ্গে কয়েকজন থাকব বলেই হস্টেলে থাকা।

ভালই করেছ। পুরো সময়টাই পড়াশোনায় দিতে পারবে।

কেমন আছেন আপনি? একটু রোগা হয়ে গেছেন।

বেশ বড় রকমের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এক মাস বিছানায় পড়ে ছিলুম।

কী হয়েছিল?

অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিলুম।

আপনার খুব দুর্ঘটনা হয়, কেন বলুন তো?

প্রারব্ধ ক্ষয় করছি মা।

কাকিমা নেই?

হ্যাঁ আছে, ভেতরে আছে।

মুকু ভেতরে যাবার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইশারায় আমাকে ডেকে গেল। বেশ সাহস বেড়েছে। সেই চাপা ভাবটা আর নেই। পিতা বললেন, তুমি কিন্তু আর বেশি দেরি কোরো না। জয়কে গিয়ে খবরটা আগে জানিয়ে রাখো।

কাকিমা একটি ছোট পুঁটলি তৈরি করেছেন। দেখে মনে হচ্ছে যাবার জন্যে প্রস্তুত। হাত দুয়েক দূরে মুকু থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও মনে হয় ধরতে পারেনি, মহিলার জীবনে কী পরিবর্তন ঘটে গেছে। হয়তো লক্ষই করেনি, শাড়ির জমি কেন সাদা! সিঁথিতে সিঁদুর আছে না মুছে গেছে। আমি আসার আগে মুকু কি কোনও প্রশ্ন করেছিল?

মুকু অবাক হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে, কী হয়েছে?

এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি সম্ভব! অতীত থেকে ফিরে আসতে হবে বর্তমানে। সে তো অনেক সময়ের ব্যাপার। তা ছাড়া এই মহিলা সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই। সমস্ত পরিস্থিতিটাকে ভদ্রমহিলা এমন ঘোলাটে করে তুলেছেন। পুরো পরিবারের মানসম্মান ডুবে যাবে।

বললুম, কাকাবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। ইনি আজই চলে যাবেন।

তোমাদের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে দেখছি।

মুকু এগিয়ে গিয়ে কাকিমার পুঁটলির সামনে উবু হয়ে বসল। কাকিমা কেমন যেন দিশাহারা, অন্যমনস্ক। নৌকোর হাল ভেঙে গেলে তার আর চালচলনের তেমন ঠিক থাকে না। গাছের মতো। শিকড় নাড়ানাড়ি হলে মুষড়ে পড়বেই।

মুকু বললে, আপনি কোথায় যাবেন? বাপের বাড়ি?

কাকিমা নীরব। একবার চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামালেন। মুকুর প্রশ্নের উত্তর আমাকেই দিতে হল, কাকিমার কেউ কোথাও নেই। উনি আজই আমার মামার সঙ্গে বাইরে চলে যেতে চাইছেন।

কেন? এখানে থাকার কী অসুবিধে ছিল? এমন নির্ঝঞ্ঝাট বাড়ি আর কোথায় পাবেন? আপনি এখানেই থাকুন কাকিমা। মাঝে মাঝে আমি এসে আপনার সঙ্গে গল্প করে যাব। আপনার হাতের রান্না খেয়ে যাব।

দুটো হাত পুঁটলির ওপর রেখে কাকিমা উদাস চোখে মুকুর দিকে তাকালেন। এমন শূন্য দৃষ্টি আগে কখনও দেখিনি। হয়তো কিছু বলার ছিল, ঠোঁটদুটো অল্প কেঁপে উঠল। কিছু বলতে পারলেন না। জলের ধারা নামল দু'চোখে।

মুকুর মুখ দেখে মনে হল, ভীষণ অস্বস্তিতে পড়েছে। জীবন এখনও যার শুরুই হয়নি, সে ভাঙা জীবনের কথা বুঝবে কী করে? মুকু বসে বসেই আর একটু এগিয়ে গিয়ে কাকিমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললে, কাঁদছেন কেন? মামাবাবু খুব ভাল মানুষ। মেসোমশাইয়ের মতো গম্ভীর নন। ভীষণ আমুদে। আমরা মাঝে মাঝে আপনাকে দেখতে যাব।

এইসব কথার উত্তরে কাকিমার অনেক কিছু বলার ছিল। আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ। সামনের বিমর্ষ পুঁটলিতে জীবনের যৎসামান্য উপকরণ। অনেক কিছুই মনে হয় ফেলে রেখে যেতে হবে। জীবনের প্রয়োজন কত সামান্য।

মুকু, তুমি বোসো, আমি মামার ওখান থেকে চট করে একবার ঘুরে আসি।

আমি যাব তোমার সঙ্গে?

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। মুকু জানে না, আমরা শত্রু পরিবৃত হয়ে বসে আছি। প্রায়-সন্ধ্যায় সুন্দরী এক মহিলাকে সাথী করে রাস্তায় বেরোনো, আর নিরস্ত্র সমরাঙ্গনে যাওয়া প্রায় একই ব্যাপার। কায়দা করে বললুম, তুমি এই এলে। কাকিমাও চলে যাবেন। তুমি থাকো, আমি যাব আর আসব।

মুকু চোখের এক ধরনের ভঙ্গি করল, যার অর্থ হতে পারে ভীরু কোথাকার! মুকুর আর আগের সে ভাব নেই। অনেক খোলামেলা, সামান্য চটুলও। স্বাধীনতা পেলে চরিত্রও কেমন পালটে যায়!

রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল, সবাই যেন আমার দিকে কোনও একটা প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে আছে, কী গো, বইটা পেয়েছ তো? তোমার পিতা পড়া শুরু করেছেন? জোড়া জোড়া অসংখ্য চোখের সামনে নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হতে লাগল। পা পথ ভাঙছে দ্রুত গতিতে। বেশ বুঝতে পারছি, এ পল্লিতে আর বসবাস করা যাবে না। পালাতেই হবে।

নারকেল গাছের তলায় মাতামহের ছোট্ট খুপরিতে মাতুল বসে আছেন বিষণ্ণ বদনে। একমাথা রুক্ষ চুল এলোমেলো। জীবনের মতোই বিপর্যস্ত। মুখে সর্বক্ষণের সেই মধুর হাসিটি নেই। পর্বত তার এতকালের আড়ালটি সরিয়ে নিয়েছে।

উদাস গলায় বললেন, আয়, তোর কথাই ভাবছিলুম, এত দেরি করলি?

একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্রী একটা ব্যাপারে আটকে গিয়েছিলুম।

কী আবার হল?

ধীরে ধীরে সব কথাই বললুম, সব শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন, ছি ছি, তোদের পাড়াটা কী হয়ে গেল? বইটা চিঠিটা পোড়ালি কেন? পুলিশের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। জানিস তো, কান টানলে মাথা আসে। খুব ভুল করেছিস। মাঝে মাঝে মানুষকে উচিত শিক্ষা দিতে হয়, তা না হলে পেয়ে বসে।

বিমর্ষ ঘরে ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধার ঘিরে আসছে। দাদুর তম্বুরাটি ঘরের কোণে এক পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। তারামায়ের ছবিটি একটু হেলে গেছে, আর সেই রহস্যময় সিন্দুক একপাশে। কতকালের স্মৃতি যে ওর

মধ্যে জমা আছে। মায়ের চিঠি আছে, ব্যবহার করা জিনিস আছে, গান লেখা খাতা আছে, তন্ত্রসাধনার নানারকম উপকরণ আছে। সিন্দুকটি ছিল মাতামহের প্রাণ। আগলে আগলে রাখতেন, কাউকে স্পর্শ করতে দিতেন না।

মাতুল চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, ভদ্রমহিলাকে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাচ্ছি। ওখানে সুখেই থাকবেন। একেবারে অনাথ হয়ে গেলুম রে পিন্টু! যতদিন জীবিত ছিলেন বুঝিনি। কত আঘাত দিয়েছি, অশান্তি করেছি, অনাদরও করেছি। কোনও কিছু আর সংশোধনের উপায় নেই। শিল্পীর কখনও বিয়ে করা উচিত নয়। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল বিবাহ। সংসার অক্টোপাসের মতো সব সাধনাকে জড়িয়ে ধরতে চায়, ভীরু করে দেয়, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবায়। কিছু কাজ আছে যা একবার করে ফেললে আর নিষ্কৃতি পাবার উপায় থাকে না, কিছু পথ আছে যে-পথে এগোলে আর ফেরার উপায় থাকে না। তুই আমার ভাগনে, দিদি ছিল আমার মায়ের মতো, তোকে আমি কত ভালবাসি তোর ধারণা নেই। একটা কথা বলে যাই, জীবনকে বেশ বুঝেসুঝে খরচ করিস। নিজেকে চেনা বড় কঠিন, সবসময় গুরুজনের পরামর্শে চলিস। নিজেকে এমন কারুর হাতে সমর্পণ করবি যিনি তোর দেহ-মন বুদ্ধি আত্মা সবকিছু খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারেন।

তার মানে গুরু।

পিতার চেয়ে বড় গুরু আর কেউ নেই রে! আমি যে ভুল করেছি, তুই যেন সে ভুল আর করিসনি। জেনে রাখ ভুলও রক্তের প্রবণতা। ভুল মানুষ করে না, ভুলের বীজই মানুষকে ভুল করায়। আমি নিজের দোষে সব ছারখার করে ফেললুম। আজ আমি প্রবাসী। সংসারের ক্রীতদাস। আমার ডানাদুটো কেটে দিয়েছে ভাগ্য। আর আমি উড়তে পারব না। মুক্ত জীব হয়ে গেলুম বদ্ধ জীব।

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরের বাইরে নারকেল গাছের তলায় এসে দাঁড়ালুম। সন্ধের বাতাস লেগেছে পাতায় পাতায়। দীর্ঘশ্বাসের মতো শব্দ উঠছে। হঠাৎ যেন চমকে উঠতে হয়। মাতামহ কি এখনও তাঁর প্রিয় জায়গাটিতে বসে আছেন, যেমন বসে থাকতেন গালে হাত দিয়ে। দোতলায় ওঠার নির্জন সিঁড়িটি চোখে পড়ছে। কেউ কোথাও নেই। সরু সরু ঘাসের ডগা উদ্দাম বাতাসে বিরক্ত হচ্ছে। রাতের প্রথম ঝিঁঝিটি যন্ত্রের সুর মেলাচ্ছে।

সন্ধ্যার উদাস আকাশের দিকে তাকিয়ে মাতুল বললেন, সব ছারখার হয়ে গেল। কোথায় গেল আমার সেই স্বপ্নের শৈশব! ওই সিঁড়িটার দিকে তাকালেই আমি দেখতে পাই, বাবা নেমে আসছেন ধীরে ধীরে। যৌবনের সে চেহারা তোরা দেখিসনি। একমাথা চুল ব্যাকব্রাশ করা। বিলিতি পমেড পড়ে চকচক করছে। গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। পায়ে গ্রিসিয়ান জুতো। সেই বাবু মানুষ ধীরে ধীরে সব ছাড়তে ছাড়তে, শেষে আমার চক্রান্তে শেষ ক'টা বছর এই ভাঙা ঘরে চাকরের মতো কাটিয়ে গেলেন। আমি কার কথা শুনব, বউয়ের কথা, না নিজের বিবেকের কথা? ধীরে ধীরে আমার আমি ঘুমিয়েই পড়ল। আর তো ফিরবে না কেউ! যাহা যায়, তাহা যায়।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে মাতুল বললেন, ইট, কাঠ, পাথর প্রাণহীন তাই প্রাণের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী! মানুষ চলে যাবার পরেও স্মৃতি বুকে করে এরা পড়ে থাকবে কতকাল। সিঁড়ির ধাপে ধাপে আমার মায়ের পায়ের ছাপ, বাবার পায়ের ছাপ, দিদির পায়ের ছাপ। একদিন আমিও থাকব না, তুই থাকবি। তোর মনে পড়বে, এক

সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে ওপরে উঠছিলুম, হয়তো এই আমাদের শেষ দিন, হু নোজ, দি ওয়ার্লড মে এন্ড টু-নাইট! কিছুই বলা যায় না, একেবারেই ক্ষণস্থায়ী বন্দোবস্ত। সুইচ-অন, সুইচ-অফ।

রান্নাঘরের সামনে বাহাদুর তোলা উনুনে কী একটা করছে! তাল-হারা নর্তকের মতো মাতুল এলোমেলো ঘুরতে লাগলেন, ঘর-বারান্দা, বারান্দা-ঘর। কী করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। বারান্দার চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে বললেন, এ বাড়ি রেখে আর লাভ কী? কে দেখবে? বেচে দেওয়াই ভাল, তুই কী বলিস?

না, এ বাড়ি বেচা চলবে না। আমার মাতামহের স্মৃতি আপনি কার হাতে তুলে দিতে চান?

তুই মাঝে মাঝে এসে দেখবি তো!

আপনার অবর্তমানে এ বাড়িতে এলে আমি কেঁদে ফেলব।

কাঁদবি। কাঁদলে মানুষ পবিত্র হয়। সব অহংকার জল হয়ে ঝরে যায়। তোর কাছে চাবি রইল। আর একটা কাজ সময়মতো করিস, সিন্দুকটা খুলে একবার দেখিস, কী রহস্য আছে।

আপনি পরের বার যখন আসবেন তখন দু'জনে একসঙ্গে খুলব। ওর মধ্যে অনেক কিছু আছে। দাদু যেভাবে আগলে আগলে রাখতেন!

আমি আবার কবে আসব তার কি কোনও ঠিক আছে রে?

শ্রাদ্ধশান্তি আপনার কিন্তু এখানেই করা উচিত ছিল।

না রে, আমার মন চাইল না। এখানকার প্রতিবেশীদের আমি সহ্য করতে পারি না, কিছু মনে করিসনি। শ্রাদ্ধ মানেই ভূতভোজন হয়ে যাবে। আমার অন্য প্ল্যান আছে, সাধুসেবা করব। অসাধারণ মৃত্যুর অসাধারণ পারলৌকিক কর্ম। তুই শুনলে আশ্চর্য হবি, তারামায়ের ছবির তলায় দেয়ালে পেনসিল দিয়ে বাবা মৃত্যুর দিন-ক্ষণ-সময় সব লিখে রেখেছিলেন। ঠিক তাই হয়েছে। কী ব্যাপার বল তো? আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে রে! সাধনায় মানুষ কী না শক্তি লাভ করে! আমি যদি ওই শক্তির ছিটেফোঁটাও পেতুম! আমি এক কুলাঙ্গার। সংসার, সংসারই আমাকে মেরেছে।

সময় হয়ে আসছে, তাড়াতাড়ি সেরে নিন।

হ্যাঁ, তুই তা হলে এক কাজ করিস, একটা ট্যাক্সি ধরে কাকিমাকে নিয়ে চলে আয়।

বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেন না?

তাও তো বটে! না দেখা করে যাই কী করে? ঠিক আছে তুই যা, আমি আসছি।

মুকু একা চুপ করে বসে আছে। কাকিমা রাস্তার দিকের জানলার একপাশে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন। পথ? পথকেই এবার জীবনের সাথী করতে হবে। সেই কথাই হয়তো ভাবছেন।

মুকু, বাবা কোথায়?

হঠাৎ উঠে ছাদে চলে গেলেন। তোমাদের বাড়ির সুর কেটে গেছে।

তা একটু গেছে। তোমাকে সব বললে বুঝতে পারবে। দাদু হঠাৎ চলে গেলেন। এই ঘরেই। সে দৃশ্য এখনও ভাসছে চোখের সামনে। প্রফুল্লকাকার অস্বাভাবিক মৃত্যু। কাকিমাকে নিয়ে দুরাত্মাদের টানাহ্যাঁচড়া।

বাবার অ্যাকসিডেন্ট। সব সুর হঠাৎ বেসুরো। তুমি বোসো, আমি ছাদে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

আকাশে একটা-দুটো তারা চোখ মেলেছে। পিতৃদেব পায়চারি করছেন। আগেকার মতো সদম্ভে নয়। ভোরের বাতাসের মতো মৃদু চরণে।

ছাদে চলে এসেছেন?

আর তো আমার কিছু করার নেই।

মুকু একা বসে আছে!

সে তো তোমার জন্যে বসে আছে। আমাকে তো তার কোনও প্রয়োজন নেই।

কথাটা আচমকা গুলির মতো বুকে এসে বাজল। ইঙ্গিতটা মোটেই ভাল নয়। মুকু কি এমন কিছু বলেছে! অপমানজনক! আর কোনও তিক্ততার মধ্যে যেতে চাই না। প্রসঙ্গ পালটাই, নীচে চলুন। কাকিমা যাবেন, মামা আসছেন। সময় হয়ে এল।

আমি আর কোনও কিছুর সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাই না। যেখানে শুরু করেছিলুম আবার সেখানেই শেষ করে দিলুম। কারুর কোনও অভিযোগ থাকা উচিত নয়। এবার আমরা যে যার পথে চলব। জীবনের শেষ যাত্রাপথ নিঃসঙ্গ হওয়াই ভাল।

আমার পথ তা হলে আমিই নির্বাচন করতে পারি। সে স্বাধীনতা তা হলে দিলেন?

অবশ্যই।

তা হলে আপনাকে আমি এই সুযোগে জানিয়ে রাখি, আমি সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমে যোগ দিচ্ছি।

পায়চারি করতে করতে ছাদের দূর কোণে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালেন, সন্ন্যাস?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজেকে আমি সেইভাবে প্রস্তুত করে ফেলেছি।

সন্ন্যাস তোমার রক্তে নেই। জোর করে বৈরাগ্য হয় না। সন্ন্যাস আর ডাকাতি একই রকম সাহসের কাজ। একটা এ দিক আর একটা ও দিক। তোমার সে সাহস নেই। তোমাকে আমি যতটা জানি, তুমি তার সিকির সিকিও জানো না। ওই ইচ্ছেটাও তোমার এক ধরনের রোমান্টিসিজম। জীবন যাদের খুব মাপা, তারা সন্ন্যাসী হতে পারে না। বলহীনের দ্বারা কিছুই লাভ করা সম্ভব হয় না। ড্রয়িংরুমে বসে ঈশ্বর লাভ করা যায় না।

পায়চারির জন্যে তিনি আবার পেছন ফিরলেন। ধীরে ধীরে দূরে ফুলগাছের টবের দিকে চলেছেন। আমার সমস্ত শ্রদ্ধা কেমন ঘৃণায় পরিণত হচ্ছে। আমার সবকিছু জানেন? আমার মানসিক শক্তি, আমার চিন্তা ভাবনা? সব উনি জেনে বসে আছেন? অসম্ভব!

ঠিক আছে, নীচে না আসেন, না আসবেন। মানুষটি কোনওদিন কারুর কাছে নতি স্বীকার করেননি। এ-ও তো এক ধরনের অহংকার। মুকু বললে, কী হল, তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কথা কাটাকাটি করে এলে?

কী করে বুঝলে?

তোমার মুখ দেখে। তুমি আমার দেওয়া আংটিটা ফেললে কোথায়? আঙুলে নেই তো।

রেখে দিয়েছি।

পরলে না কেন? তোমার সামনে আমার ভীষণ লজ্জা করছে। কেন বলো তো? তুমি আমার আবোলতাবোল পড়ে কী ভাবলে?

আমার সব ভাবনার কথা তোমাকে পরে বলব, মুকু। আজ আমার ভীষণ দুর্দিন। মনে মেঘ করেছে।

কাকিমাকে অমন জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছ কেন?

সে-ও আর এক কাহিনি। এখানে থাকলে বিপদ আছে।

তুমি কি ওঁদের ট্রেনে তুলতে যাবে?

হ্যাঁ।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব। অনেক কথা আছে।

চা-টা কিছু খেয়েছ?

সে পরে হবে। তুমি রেডি হয়ে নাও।

বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। মাতুল বাড়ির চাবিটি পিতৃদেবের হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, মাঝেমধ্যে একটু দেখাশোনা করবেন, আবার কবে আসতে পারব জানি না।

পিতা চাবিটি নিতে নিতে বললেন, আমি হয়তো সময় পাব না, তোমার ভাগনেই মাঝে মাঝে যাবে। তবে তুমি চেষ্টা করো যাতে এখানে ফিরে আসতে পারো। জানো তো, কথায় বলে, অপ্রবাসী, অঋণী। ইচ্ছে করলে এখানেও তুমি অনেক কিছু করতে পারো।

কাকিমার বাঁ হাতে পুঁটলি। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। পিতা বললেন, ওঠো বউঠান। মন খারাপ কোরো না। মেয়েছেলের জীবন, ঝড়ের এঁটো শালপাতার মতো, যখন যে দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়! সাবধানে থেকো, মানিয়ে থেকো, আনন্দে থেকো।

দাঁতে আঁচল চেপে কাকিমা কান্নার শব্দ করলেন। অনেক চেষ্টায় বললেন, সাবধানে থাকবেন। শরীরের একটু যত্ন নেবেন। হয়তো আরও কিছু বলার ছিল। ভাষা এল না। মাতুলের সুটকেসটি হাতে নিয়ে বাহাদুর অদূরে দাঁড়িয়ে। লাল একটা জামা পরেছে। একমাত্র বাহাদুরের মুখেই হাসি। পাহাড়ের ছেলে পাহাড়ে চলেছে। যে একবার ঘর ছাড়তে পেরেছে, তার আর ভয় কী? বহতা নদী, রমতা সাধু।

পিতা বললেন, আর দেরি কোরো না। মায়ার বাঁধন যত তাড়াতাড়ি খুলে বেরোনো যায়, ততই ভাল। মাতুল চমকে উঠলেন, উদাস সুরে বললেন, আসি তা হলে। মায়ের ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, উঠাও গাঁটরি।

Tell me in what part of the wood
Do you want to flirt with me.

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। কবজির কাছটা এখনও জ্বালা করছে। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে কাকিমা চেপে ধরেছিলেন। জলে ডোবার আগে মানুষ এইভাবে আঁকড়ে ধরে। এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিতে হয়েছে। নয়তো চাকার তলায় চলে যাবার সম্ভাবনা ছিল। ট্রেনের পেছনের লাল আলোটি ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এখনও ভাসছে। একটি মুখ দূর থেকে দূরে ক্রমশই আরও দূরে সরে যাচ্ছে। চেষ্টা করলেও যে-মুখটিকে আমি কোনও দিনই ভুলতে পারব না। আকাশের দিকে তাকালে ভেসে উঠবে। স্থির জলে ভাসবে। স্বপ্নে উঁকি মেরে যাবে। বিষণ্ণ আশাহত দুটি চোখ। ভেজাভেজা চোখের পাতা। বারেবারে কেঁপে-ওঠা পাতলা দুটি ঠোঁট।

মুকু হাত ধরে টান মারল, তোমার দেখছি ঘোর লেগে গেছে! এমন ভাব করছ, কেউ যেন কখনও বিদেশ টিদেশ যায় না! মানুষে মানুষে যেন ছাড়াছাড়ি হয় না! আমি বলে কোথাকার মেয়ে সব ছেড়েছুড়ে এককথায় কোথায় চলে এলুম, একটুও মন খারাপ হল না আর তুমি পুরুষমানুষ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ফোঁসফোঁস করছ! চলো।

শূন্য প্লাটফর্ম কী অদ্ভুত দেখতে! একজোড়া লাইন পড়ে আছে। কিছু কাগজ, দু'-একটা ভাঁড়, তেল, কালি, রেল-রেল গন্ধ। বাক্স প্যাঁটরা বেডিং-এর ওপর গালে হাত দিয়ে বসে থাকা অপেক্ষমাণ কিছু যাত্রী। সকলকেই যেতে হবে। আগে আর পরে। নীল পোশাক পরা দু'-একজন রেলকর্মী। গল্পরত দু'-একজন টিকিট চেকার। লোহার ঠ্যালাগাড়ি চেপে মালপত্র আসতে শুরু করছে। সতর্ক সময়নিষ্ঠ যাত্রীরা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে আসছেন। কাঁধে জলের বোতল, হাতে ব্যাগ। লাল জামা পরা পোর্টারের মাথায় মোটঘাট। সায়েবি চেহারার পাঞ্জাবি যুবক। কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে লাস্যময়ী যুবতী। প্ল্যাটফর্ম আবার জমজমাট হয়ে উঠছে। একটু পরেই দুন এক্সপ্রেস ছাড়বে। সুরেলা গলায় মহিলাকণ্ঠ বারেবারে বিভিন্ন ভাষায় সেই সংবাদই ঘোষণা করছে। জোড়া লাইন কোন সুদূরে চলে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আমিও এখুনি কোথাও চলে যাই। বারেবারে আসি, বারেবারে ফিরে যাই। আজ যদি না ফিরি কেমন হয়! স্বামী নির্মলানন্দ দেরাদুনে, আলমোড়ায়, মাদ্রাজে, যে-কোনও জায়গায় আমার স্থান করে দিতে পারেন। আমি একবার হ্যাঁ বললেই হয়। মুকু বললে, তুমি অমন হাঁ করে লাইনের নিরুদ্দেশ যাত্রা দেখছ কেন? প্রাণ ছটফট করছে বুঝি?

ধরেছ ঠিক।

আমারও ওইরকম করে। মনে হয় চলে যাই। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। শুধু চলেই যাই। নাও চলো। কফি খেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

মুকু আমার শরীরের সঙ্গে লেপটে আছে। কেউ দেখলে ভাববে স্বামী-স্ত্রী। মুকু কি আমাকে জালে জড়াবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছে?

রেলের ক্যান্টিনটি বেশ বড়। লোকজন রয়েছে, তবে বসার জায়গা পেতে অসুবিধে হল না। কোণের দিকে পাশাপাশি দুটি আসন। পাশের টেবিলে সৌম্য চেহারার এক প্রৌঢ় বসে আছেন। তাঁর উলটো দিকে বসে আছেন এক প্রৌঢ়া। কাঁচাপাকা চুল। হালকা রঙের সিল্কের শাড়ি। ধবধবে সাদা ব্লাউজ। রং আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। কপালের মাঝখানে লাল টিপ, ভোরের সূর্যের মতো ভাসছে। দু'জনেই কফির পেয়ালায় হালকা চুমুক মারছেন। মৃদু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন। চারপাশে মৃদু একটি সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি। সুখ যেন মানুষের চেহারা ধরে এই রেলের ক্যান্টিনে কফির কাপ নিয়ে বসেছে। পৃথিবীতে সব আছে। যা চাইব, তাই দেখতে পাব। পমেড-মাথা কাকিমার মামাশ্বশুর। মানী মানুষের কাছে যৌনবিজ্ঞান পাঠাবার মতো কদর্য চরিত্র। মাতামহের মতো গৃহী সাধক। মাতুলের মতো আত্মভোলা শিল্পী। পিতার মতো নিঃসঙ্গ সৈনিক। স্বামী নির্মলানন্দের মতো সর্বত্যাগী জ্ঞানী সাধক। আলোয় কালোয় বেশ সাজিয়েছ ভগবান!

দু'হাতের তালুতে চিবুক ধরে মুকু বেশ বসেছে! যেন হাতের ফাঁকে পদ্ম ফুটেছে। অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। চোখাচোখি হতেই মৃদু হাসল। চোখদুটো গভীর সরোবরের মতো কেঁপে উঠল। নাকের পাশের ছোট্ট নাকছাবি উৎসব রাতের চুমকির মতো ঝিলিক মেরে উঠল। বসন্ত নয়, তবু মনে হল মনের সব জানলা দরজা খুলে গেছে। দখিনা বাতাস বইছে। পাপিয়া বড় আকুল সুরে ডাকছে, পিউ কাঁহা! মরেছে, আমি প্রেমে পড়ে গেছি। মুকুর মুখের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। শুনেছি গভীর রাতে নির্জন পাহাড়ের ফাটল থেকে এক ধরনের রস বেরিয়ে আসে। যার নাম শিলাজতু। বড় দুর্লভ বস্তু। আমার মনের স্তরেও শিলাজতু জমছে ধীরে ধীরে। ধ্যাত, কী আমি সন্ন্যাস সন্ন্যাস করছি! জীবন্ত দেবী ছেড়ে মৃত ঈশ্বরের সন্ধানে মহামূল্য জীবন অপচয় করে ফেলছি। কে জানে আবার এই পৃথিবীতে আসা হবে কি না! শুদ্ধ কোনও পিতামাতার দৈহিক মিলনে, নির্জন কোনও প্রকোষ্ঠে, রজনীর গভীরে ছোট্ট একটি ভ্রূণের আকারে আবার এই জীবন কি ধরা পড়বে! বাইরে তখন শ্রাবণের ধারা, ভিজে বাতাস, সিক্ত পাতার আনন্দোচ্ছ্বাস। কেউ-ই কারও দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। দুটি দৃষ্টি মাইলের পর মাইল কী সব অপ্রকাশিত কথা লিখে চলেছে ভাষাহীন ভাষায়। সুখেনের কথা, জবার কথা মনে পড়ছে। জবা মা হবে। আমার মা যেমন মা হয়েছিলেন! নরনারীর মিলন যদি পাপের হত, তা হলে শঙ্কর, বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ আসতেন কী করে?

আমার ডান হাত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে মুকুর কবজি ধরে ফেলল। সারাশরীরে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ! আমার সমস্ত মন সেই স্পর্শে নিবেদিত। সবুজ ফসলের খেতে যেন সেচের জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে। লক্ষ করিনি, কখন ওয়েটার এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। এ জগৎ থেকে চলে গেছি কোন মায়ার জগতে! মানুষের এখনও রসবোধ আছে। ওয়েটার ভদ্রলোক কতক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে আমাদের দু'জনের এই তন্ময়তা দেখছিলেন জানি না। চোখাচোখি হতেই মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কী খাবেন?

বেশ খিদে পেয়েছে। মুকুকে জিজ্ঞেস করলুম, কী খাবে?

যা হয় কিছু বলো না।

মুকু ভদ্রলোককে সামনে থেকে সরাতে চাইছে। আমার সারাশরীরে আড়ামোড়া ভাঙার মতো অদ্ভুত এক অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠছে। মন যেসব উপাদান আর উপাধানে সেজে উঠছে, তাতে এই মুহূর্তে নির্জন একটি ঘর পেলে ভাল হয়, একটি শয্যা থাকা চাই। বলশালী এক দৈত্যকে কোমর ধরে আটকাতে চাইছি। সে আমায় খানাখন্দের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে।

ও হ্যাঁ, ওমলেট আর কফি।

ওয়েটার ধীরে ধীরে চলে গেলেন। টেবিলের ওপর ফেলে রাখা আমার হাতের আঙুল নিয়ে খেলতে খেলতে মুকু বললে, তুমি বেশ সুন্দর হয়েছ।

তুমিও।

সে তোমার চোখে। আয়না কিন্তু অন্য কথা বলে।

একটু রোগা হয়ে সত্যিই তুমি সুন্দর হয়েছ। আমি চোখ ফেরাতে পারছি না।

মুকু মাথা নিচু করল। কপালের সামনে থেকে মাথার পেছন অবধি সিঁথি চলে গেছে। স্বপ্ন দেখছি, আমি যেন রাজবেশে সিঁদুর পরাচ্ছি। দূর থেকে ভেসে আসছে সানাইয়ের শব্দ। রজনীগন্ধার সুবাস।

পাশের টেবিলে প্রৌঢ় দম্পতি মৃদু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছেন। মাঝে মাঝেই কানে আসছে একটি অঞ্চলের নাম, আলমোড়া। স্বামী নির্মলানন্দ আমাকে আলমোড়া পাঠাতে চান। হিমালয়ের কাছাকাছি। আজ থেকে বেশি না, মাত্র তিরিশ বছর পরে আমি আর মুকু ওই আসনে বসতে পারি। সুখী আর সাত্ত্বিক চেহারা নিয়ে। এমন তো কিছু খারাপ নয়, বড় মধুর ভবিষ্যৎ!

মুকু মুখ তুলে তাকাল। মন যদি চোখে আসে, চোখের চেহারা কীরকম হয়? যেমন দেখছি এই মুহূর্তে। মুকু বললে, তোমাকে একটা ছবি দেখাব?

কার ছবি? তোমার?

না। দেখাতে পারি একটা শর্তে। রাগ করা চলবে না।

দেখাও।

দু'প্লেট ওমলেট টেবিলে এসে নামল। মুকু মাথা নিচু করে কোলের ওপর রাখা হাতব্যাগে ছবি খুঁজছে। ডান হাতের দু'গাছা চুড়ি, সংসারের শব্দে ঠুনুর ঠুনুর করছে। বড় একান্ত, বড় আপন, ভীষণ মায়ায় ভরা। গরম ওমলেটের অল্প অল্প ধোঁয়া মুকুর কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলের কাছে পাক খাচ্ছে। ব্যাগ থেকে হলদে রঙের একটা খাম তুলে মুকু টেবিলে আলগোছে রাখল। উদাস দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওমলেটের দিকে। তাকাবার মতোই ভাজা হয়েছে। কাঁচা সোনার রং ছাড়ছে।

কী আছে খামে?

খুলে দেখো।

খামটা খুলতেই হাফ সাইজের একটা ছবি বেরিয়ে এল। কনক। কনক আর সুদর্শন চেহারার এক যুবক পাশাপাশি। কাঁধে কাঁধ লেগে আছে। কতদিন পরে কনককে আবার দেখতে পেলুম! সেই উজ্জ্বল ধারালো মুখ। টানাটানা চোখ, বাঁশির মতো নাক।

ছেলেটি কে মুকু?

বুঝতে পারছ না?

কী? সেই?

হ্যাঁ সেই। আমার সন্দেহই ঠিক হল। সেই হোমচৌধুরী। যার কথা তোমাকে আমি চিঠিতে লিখেছিলুম।

বিয়ে হয়ে গেছে?

কী মনে হচ্ছে?

কনক তা হলে বেঁচে আছে?

বহাল তবিয়তে। আমার দিদি অত সহজে হার স্বীকার করার মেয়ে নয়।

কোথায় আছে?

জাহাজে।

তার মানে?

দিদির বর রেডিয়ো অফিসার। প্রচুর টাকা মাইনে। বিশ্ব-ঘোরা চাকরি। আজ এ বন্দরে, কাল ও বন্দরে। কী মজা! সারাপৃথিবী দেখে বেড়াবে।

কাদের জাহাজ?

পি. ও. লাইনার।

কত টাকা মাইনে মুকু?

দশ-বারো হাজার তো হবেই।

মাসে?

হ্যাঁ গো মাসে। পুরো মাইনেটাই সেভিংস, কারণ সবই তো ফ্রি।

ঈর্ষায় সারাশরীর জ্বলে উঠল। কী করলুম জীবনে? ইডিয়টের মতো কল্পবিলাসে জীবনটা নষ্ট করে ফেললুম। সময় চলে গেছে। আর নতুন করে সুরে বাঁধতে চাইলেও বাঁধা যাবে না। যে-বীজ বুনেছি সেই ফসলই তুলতে হবে। কেউ ফলায় জাফরান, কেউ খেসারি। যার যেমন বরাত।

মুকু চামচে দিয়ে ওমলেট কাটছে। ডিশের সঙ্গে চামচে লেগে কড়াশ কড়াশ শব্দ হচ্ছে। আঁতে ঘা লাগছে। মুখ তুলে বলল, কী, মন খারাপ হয়ে গেল?

না না, মন খারাপ হবে কেন?

সত্যি বলো তো, দিদিকে তুমি ভালবেসেছিলে কি না?

ভালবাসা অনেক উচ্চস্তরের জিনিস। বেসেছিলুম কি না জানি না, তবে ভাল লেগেছিল। বিয়ের কথা ভাবিনি।

সে তুমি কোনও দিনই ভাবতে পারবে না। তুমি স্প্লিট পার্সোন্যালিটিতে ভুগছ। কেউ যদি তোমার দুটো সত্তাকে কোনওদিন জোর করে এক করে দিতে পারে, তবেই তুমি সুখী হবে। যে বোঝে সে বোঝে।

তার মানে?

তোমার মুখের কথা এক, তোমার মনের কথা আর এক। যে তোমার মুখের কথা শুনে চলে যাবে সে তোমার ওপর অবিচার করবে, তোমার ক্ষতি করবে। তোমাকে বাঁধতে হবে, যেমন করে মানুষ নদীকে বাঁধে।

আমার সন্ন্যাস, আমার পরমার্থ!

রাখো তোমার সন্ন্যাস, তোমার পরমার্থ। সন্ন্যাস কাকে বলে জানো?

অ্যাঁ!

সন্ন্যাস কাকে বলে জানো?

সন্ন্যাস মানে ত্যাগ।

কী ত্যাগ?

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য।

তা হলে মানুষের আর রইলটা কী? ধরো বাঘ যদি আলোচালের হবিষ্যি খায়, সিংহ যদি কলাপাতা চিবোয়, গন্ডার যদি জাবনা চিবোয়, তাতে বাঘত্ব, সিংহত্ব, গন্ডারত্ব বজায় থাকে?

তোমার ব্যাখ্যায় সন্ন্যাস তা হলে কী?

সৎ জীবন, কর্মময় জীবন।

পাশের টেবিলের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আপনার রুমাল পড়ে গেছে।

নিচু হয়ে রুমালটা তুলছি, প্রৌঢ়া বললেন, তোমাকে চেনাচেনা লাগছে। তুমি কি স্বামী নির্মলানন্দের কাছে যাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠিক ধরেছি। মুকুকে দেখিয়ে বললেন, এ তোমার কে হয়?

উত্তর দিতে গিয়ে দু'বার ঢোঁক গিলতে হল, আমার বোন হয়।

বাঃ, বেশ মেয়েটি। কী পড়ছ মা?

মুকু মুখে ওমলেট তুলছিল, নামিয়ে রেখে বললে, এম এ।

ভদ্রমহিলা চোখের ভঙ্গি করে বললেন, তাই নাকি? বাঃ এত কম বয়েসে এম এ করছ? প্রৌঢ় মানুষটিকে বললেন, হ্যাঁগা, একবার তাকিয়ে দেখো, আমাদের সুজয়ের সঙ্গে ভারী সুন্দর মানাত, তাই না?

ভদ্রলোক সরাসরি মুকুর দিকে না তাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বলে হাসতে লাগলেন আপন মনে, তৃপ্ত মানুষের মতো। দাঁতগুলি বড় সুন্দর। মুক্তোর মতো সারি সারি বসানো। হাসি থামিয়ে ভদ্রলোক ঘড়ি দেখলেন। তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে বললেন, চলো চলো, সময় হয়ে গেছে। এখুনি ট্রেন ইন করবে।

ভদ্রমহিলা মুকুর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে মুকুর মাথায় হাত রেখে বললেন, পবিত্র হও, পবিত্র হও। আমাকে বললেন, একদিন তোমার বোনকে স্বামীজির ওখানে নিয়ে এসো।

দু'জনে আগে পরে বেরিয়ে গেলেন। মুকু ওমলেটের ডিশের পাশে টেবিলের ধারে মাথা ঠেকিয়ে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। ঘাড়ের কাছে এলিয়ে-থাকা খোঁপা দুলে দুলে উঠছে। চওড়া পিঠে ব্লাউজের ভি-অংশ

হাসির দমকে হুক ছেড়ে খুলে যাবার মতো হচ্ছে। মায়াবী মেয়ে, মায়াবী রাত, পাপীর চোখ।

ওয়েটার ভদ্রলোক দু'কাপ কফি এনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। কোথায় রাখবেন? মহাসমস্যা। বোঝা মুশকিল, মুকু হাসছে না কাঁদছে। জলের গেলাসদুটো একপাশে সরিয়ে কাপদুটোর জায়গা করে দিলুম। ভদ্রলোক সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, কফি রেখে চলে গেলেন।

মুকু মাথা তুলল। জিজ্ঞেস করলুম, হাসছ কেন?

গম্ভীর মুখে বললে, আমার বাজারটা একবার দেখলে?

কথা শেষ করেই আবার হাসতে লাগল। মেয়েদের এই এক দোষ। শুরু করতে জানে, শেষ করতে জানে না। হাসলে হাসি থামে না। কাঁদলে কান্না থামে না। এইভাবে ফুলেফুলে হাসলে, আর পাঁচজন কী ভাববেন!

হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলতে লাগল, ভদ্রমহিলা আমাকে ছেলের বউ ঠিক করে ফেলেছেন, আমি এদিকে আর একজনের বউ হব বলে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি।

কার?

টেবিলের ওপর দিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে সরু সরু আঙুল তুলে খিলখিল হেসে বললে, তোমার, তোমার।

হাতের চারটে আঙুল সাপের ছোবলের মতো মুখের এখানে ওখানে লাগছে। হাতের চুড়ি দু'গাছা দুলছে, ঝিলিক মারছে। মুকু পরিবেশ ভুলে গেছে। চারপাশে এত লোকজন! পাগল হয়ে গেল নাকি? ফিসফিস করে বললুম, অ্যায় মুকু, কী হচ্ছে কী?

দু'হাত মাথার ওপর তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে বললে, কী গো সন্ন্যাসী! দেখি, কে হারে কে জেতে? উনি বলে গেলেন, পবিত্র হও। আমি যে অপবিত্র হবার জন্যেই এসেছি।

আবার হাসি।

মুকু প্লিজ। তোমাকে আমার ভয় করছে। ওরকম করছ কেন?

ভয় করছে? তুমি না পুরুষমানুষ? যে-মানুষ মাতৃগর্ভে জন্মেছে সে মানুষ কখনও পবিত্র হতে পারে না।

কী বলছ তুমি? ড্যামেজিং কথাবার্তা!

ভেবে দেখো। জীবনের সব মুহূর্ত একজায়গায় জড়ো করে করে, বেছে বেছে দেখো সাদা, কালো, হলদে, সবুজ। জীবন বহু বর্ণের মুহূর্তের মালা।

মুকু কফিতে চুমুক চালাল। ফুড়ুত করে পাখি উড়ে যাবার মতো শব্দ হল। চোখ মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। ছোট্ট কপালের চারপাশে চুল ঝুলে পড়েছে। অসাধারণ দেখাচ্ছে। মানবীকে মনে হচ্ছে দেবী। মনের কী মতিভ্রম! একটু ভালবাসার কথা শুনেই কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। মেয়েটা আমাকে ঠকাতে আসেনি তো?

প্রশ্ন করলুম, হঠাৎ এই উদ্ভট খেয়াল চাপল কেন, আমাকে বিয়ে করবে?

শুনবে তা হলে, তোমার জন্যে নয়, তোমার বাবার জন্যে।

সে আবার কী?

তোমার বাবাকে আমি ভালবাসি। অমন চরিত্র লাখে এক মেলে। উপায় থাকলে আমি তাঁকেই বিয়ে করতুম।

মুকুর কথা শুনে ঠোঁটের কাছে ধরে থাকা কাপ হাত ফসকে পড়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা বলে কী? সত্যিই পাগল হয়ে গেল নাকি?

I am no prophet
and here is no great matter
I have seen
the moment of my greatness flicker

দুন এক্সপ্রেস স্টেশন ঝাড়পোঁছ করে নিয়ে চলে গেল। দু'-একজন পোর্টার আর রেলকর্মী ছাড়া আর কেউ পড়ে রইল না। আমরা দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে স্টেশনের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। আজ খুব হাওয়া ছেড়েছে। চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে। সুবাস উড়ছে। কোথা থেকে এই ওমর খৈয়ামের রাত এল শহরে!

প্রায়-শূন্য ট্রাম চলেছে এঁকেবেঁকে, ঘণ্টা বাজিয়ে। একটা-দুটো ট্যাক্সি পড়ে আছে শেষ যাত্রীর অপেক্ষায়। পাঞ্জাবি ড্রাইভার বনেটে হেলান দিয়ে সিগারেট টানছে অলসভাবে। কাঠের গোল ড্রামের ওপর নিঃসঙ্গ পুলিশ। শহর এবার শুয়ে পড়বে।

কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মুকু আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার অনাবৃত ওপর-বাহু আমার হাত স্পর্শ করছে। পাথরের মতো শীতল। ভেতরে যার আগুন জ্বলছে তার আধার কী করে এমন স্নিগ্ধ হয়! মানব শরীর ঈশ্বরের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। একই সঙ্গে গদ্যময়, কাব্যময়। জলে যেন আগুন জ্বলছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এ রাত যেন শেষ না হয়। ভেতরে এক পূর্ণতার ভাব আসছে। অর্ধাঙ্গ যেন পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেছে। মনের সঙ্গে মনের লড়াই চলেছে। আচ্ছা, তন্ত্রে তো প্রকৃতি নিয়ে সাধনার ইঙ্গিত আছে! ইঙ্গিত কেন, নির্দেশ আছে। পঞ্চ ম-কার ছাড়া তন্ত্রসাধনা হবেই না। তন্ত্রের পথও তো সাধনার পথ, ঈশ্বরলাভের পথ। মুকু তো আমার ভৈরবীও হতে পারে। যার চুল কোঁকড়া, গুরুনিতম্ব, সে তো আদর্শ ভৈরবী। কিন্তু তন্ত্র যে বলছে শ্যামা রমণী না হলে ভৈরবী করা যায় না! ও ওরকম বলে! গাত্রবর্ণে কী এসে যায়! আসল বর্ণ তো মনে! কবি বলেছেন, ওপরে যত কালো আর ধলো, ভেতরে সবার সমান রাঙা। আচ্ছা, আমিই বা এত ঈশ্বর ঈশ্বর করছি কেন? দেরাদুনে একটা প্রোমোশন নিয়ে চলে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমাদের লাইনে অভিজ্ঞতা যত বাড়বে, মাইনেও তত বাড়বে। ফ্রি কোয়ার্টার। চিফ হলে গাড়ি। মুকুকে বগলদাবা করে নিয়ে গেলেই তো হয়। ওপাশে হরিদ্বার, এপাশে অরণ্য, মাথার ওপর মুসৌরি।

মুকু হঠাৎ দু'হাতে আমার ডান হাত ধরে ঝুলে পড়ল। মাথাটা আমার ডান কাঁধে। আর একটু হলেই কেতরে পড়ে যেতুম। কোনওক্রমে সামলে নিলুম।

তখন থেকে কী দুষ্টুমি করছ বলো তো!

মুকু হিহি করে হেসে বললে, শীত করছে। কেন বলো তো! জ্বর এল নাকি!

তোমার গা বরফের মতো ঠান্ডা।

শীত কেন করে আমি জানি। স্নায়ুর শিহরনে মনে হয় জ্বর আসছে। আমি যে পুরুষ, এ প্রমাণ পেয়ে বড় ভাল লাগছে। আগুন যদি আগুন লাগাতে না পারে, তা হলে সে তো জোনাকি। আলো আছে, দাহিকা শক্তি নেই। আমারও একদিন শীতে এইরকম গা কেঁপে উঠেছিল। সে রাতের কথা এখনও ভুলতে পারিনি।

মুকু বললে, অনেক রাত হয়ে গেল। হস্টেলে ঢুকতে দেবে তো!

তোমার হস্টেল তুমিই জানো। না দেয়, আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

মেলোমশাই আজ কেমন যেন হয়ে আছেন! প্রথমে বেশ ভালভাবেই কথা বলছিলেন, হঠাৎ কী হল উঠে চলে গেলেন।

মাঝে মাঝে উনি ওরকম হয়ে যান, এতক্ষণে ঠিক হয়ে গেছেন। তুমিই তো একটু আগে কী সব বলছিলে? তুমি গিয়ে সামলাবে।

তোমাকে তো তা হলে আমায় মা বলে ডাকতে হবে। পারবে?

তোমার মাথায় একটা গাঁট্টা মারব।

মুকু হিহি করে হেসে উঠল। পাশ দিয়ে একজন রেলের ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন, ঘুরে তাকালেন। নাঃ, মুকুকে আর খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ রাখা যায় না, বিপদের সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের সাহস মানে দুঃসাহস। জবাকে মনে পড়ছে। স্রেফ একটা সায়া আর ছোট্ট একটা ব্লাউজ পরে পাঁচিল টপকে আমাদের ছাদে পালিয়ে এল। সুখেনের এত টান! এই টানটাকে নিজের মধ্যে এনে যদি ঈশ্বরকে টেনে আনতে পারতুম, তা হলে নিজের সঙ্গে এই দোটানায় পড়তে হত না।

মুকু বললে, আমার আর ট্রামেবাসে চাপতে ইচ্ছে করছে না, একটা ট্যাক্সি করো।

তুমি খুব এক্সপেনসিভ।

জানো আমার কোষ্ঠীতে কী আছে, বড়লোকের বউ হব।

সে যবে হবে তবে হবে। আগে লেখাপড়া শেষ করো। অত বউ হব বউ হব করছ কেন?

নিজেকে তৈরি করছি।

থাক আর তৈরি করতে হবে না। তৈরি হয়েই আছ।

কথাটার মধ্যে অশ্লীল একটা ইঙ্গিত আছে।

শব্দটা তুমিই প্রথম বলেছ।

আমার মানেটা ছিল অন্যরকম, তোমার মানেটা একটু যেন কেমন কেমন।

তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো?

ভূতে ধরেছে।

সে ভূত কি আমি?

তুমি ভূত হতে যাবে কেন? তুমি ভগবান।

পাঞ্জাবি ড্রাইভার ট্যাক্সির পেছনের দরজা খুলে দিল। মুকু আগে ঢুকল, পরে আমি। আমার আসনে তার আঁচল বিছিয়ে আছে। কী যে হয়েছে কে জানে! কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। মেয়েদের ব্যাপার আমি কিছুই

বুঝি না। শুনেছি, এই বয়েসটা খুব খারাপ। ফাঁদে পড়ার বয়স, ফাঁদে ফেলার বয়েস। জয় গুরু! তুমি আমায় রক্ষা করো। এতকালের শক্ত মন থ্যাসথেসে হয়ে আসছে।

চালক মিটার-ফ্ল্যাগ নামালেন। রিনরিন করে শব্দ হল। আমাদের অন্ধকার কেঁপে উঠল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। হাওড়ার ব্রিজে উঠছে। গঙ্গার বাতাস যেন আরও উতলা। সারি সারি আলোর মালা মাথার ওপর দিয়ে সামনে চলে গেছে। গঙ্গার দু'কূলে আলোর খই ছড়িয়ে আছে।

মুকু ডান দিকে, আমি বাঁ দিকে সম্মানজনক দূরত্বে। মাঝে ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে শাড়ির আঁচল। আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সামনে পাথরের মতো মুখ করে গাড়ি চালাচ্ছেন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক। গঙ্গাবক্ষে আলোকিত একটি স্টিমার সাগরের দিকে চলেছে।

কাঁহা যাইয়েগা জি?

কোথায় যেতে হবে মুকু?

বিবেকানন্দ রোড।

গাড়ির গতি বাড়ছে। সর্দারজি পোল থেকে নেমে ডান দিকে স্ট্র্যান্ড রোড ধরলেন। আমাদের বাঁ পাশে টাঁকশালের বিরাট বাড়ি। মুকু হঠাৎ বাঁ দিকে হেলে আমার কাঁধে মাথা রাখল।

মনে মনে বললুম, ঈশ্বর তুমি দেখো, আমি কিন্তু কিছুই করিনি। জলজ্যান্ত একটি যুবতী মেয়ে আমাকে একা পেয়ে কীভাবে প্রলুব্ধ করছে! আমিও তো মানুষ! দেবতাও নই, বৃদ্ধও নই।

মুকু আমার ডান হাতটা দু'হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, পলাশ, বি সিরিয়াস!

তার মানে?

মুকুর মুখে আলো পড়েছে। উলটো দিক থেকে আসা গাড়ির হেডলাইট। আমাদের চালক রেগে গিয়ে বললেন, আঁরে তেড়দেনি।

কী অর্থ কে জানে! মুকুর মুঠোর জোর বাড়ছে, পলাশ, বি সিরিয়াস। গলাটা ধরাধরা শোনাল। এ আবার কী খেলা রে বাবা! চোখে যেন জল এসেছে। এসবের অর্থ কী?

বি সিরিয়াস বি সিরিয়াস করছ, তার মানেটা কী?

তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না।

তার মানে?

আমি তোমার জন্যেই কলকাতায় পড়তে এসেছি। আমি আর ফিরে যাব না।

কেন মিছে কথা বলছ! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

মুকু আমার শার্টের বুকের কাছটা খামচাতে লাগল, কী করলে বিশ্বাস করবে?

বড় কঠিন প্রশ্ন। সত্যিই তো, কী করলে আমি বিশ্বাস করব!

মুকু বললে, আমি আমার বাবাকে ঘৃণা করি।

কী যা তা বলছ? বাবাকে ঘৃণা করো বলে আমাকে, আমার মতো অপদার্থ একটা ছেলেকে ভালবাসতে হবে?

আমার বাবাকে তুমিও ঘৃণা করো, আর সেইজন্যে তুমি আমাকেও ঘৃণা করো।

আগে করতুম, আজ এই মুহূর্ত থেকে আর করি না।

আমি তোমাকে প্রথম থেকেই ভালবাসি পলাশ। সত্যিই বাসি।

মুকুর গলা ভেঙে এসেছে। ভালবাসা শব্দটা এমনিই এলানো, আরও যেন এলিয়ে গেল ভাঙা গলার গুণে।

কোনওরকমে বললুম, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

তোমার ওই বইয়ের ভাষা ছাড়ো। ওতে মন ভরে না। কাম আউট পলাশ। তুমি বেরিয়ে এসো।

এ কি নাটক হচ্ছে? চলমান মঞ্চে! এমন নাটক করে যদি ভালবাসতে হয়, বেসে কাজ নেই। ঘৃণা অনেক বেশি বাস্তব! আমার জামা খামচে ধরা মুকুর হাত ক্রমশ শিথিল হয়ে এল। শরীরে শরীর এলিয়ে পড়ল। আমার দক্ষিণ অঙ্গ এখন মুকুর দখলে। বেশবাস বিস্রস্ত। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে। চুল উড়ে উড়ে এসে চোখেমুখে লাগছে। কী আর করি! তার পিঠের পেছন দিয়ে আমার ডান হাত প্রসারিত করে, ডান হাতের তলা দিয়ে হাত ঘুরিয়ে মুকুর শরীরকে ঘনিষ্ঠ করে নিতে হল। সামান্য শিহরন খেলে গেল মুকুর শরীরে। জানি আমার এ সাহস দুঃসাহসেরই সামিল, কিন্তু উপায় নেই। ডাকে সাড়া না-দেওয়া এক ধরনের উপেক্ষা। মেয়েরা বড় অভিমানী হয়। তা ছাড়া শরীরের যখন যে-অঙ্গ কাজ করে, তখন সেই অঙ্গের আলাদা একটা মগজ তৈরি হয়। মিটারের যেমন সাবমিটার! মেন লাইনের যেমন এক্সটেনশন লাইন। পা যখন লাথি মারে, পায়ের একটা মগজ হয়। হাত যখন কিছু স্পর্শ করে হাতের একটা মগজ হয়।

মানুষের আবেগ বাঁধ-বাঁধা নদীর মতো। জল কেবলই পথ খোঁজে, কোথায় একটা ছিদ্র পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে চাপ বেড়ে একসময় বাঁধের দেয়াল চৌচির হয়ে যায়। এতদিন জমে থাকা মুকুর আবেগ বন্যার জলের মতো তেড়ে বেরিয়ে এল। সমস্ত শরীর যেন দুমড়ে মুচড়ে উঠছে। আমি না জেনে বড় স্পর্শকাতর স্থানে হাত দিয়ে ফেলেছি। এ যন্ত্রণা, না সুখ! হাতখানেক ব্যবধানে অপরিচিত একজন মানুষ। পাথরের মতো মুখ করে গাড়ি চালাচ্ছেন। আলোর ঝটকা আসছে, চলে যাচ্ছে। মুকু পা দিয়ে আমার পা খুঁজছে। ভুলে গেছে আমরা বসে আছি ট্যাক্সির পেছনের আসনে।

মুকুর মাথা এখন কাঁধ ছেড়ে আমার বুকে নেমে এসেছে। আমি ভাবতেই পারছি না, রক্তমাংসের এক যুবতী আমার বক্ষলগ্না! যে-ইচ্ছা কল্পনায় উঁকি মেরে যেত, রাতের স্বপ্নে এসে ঘুরপাক খেত, তা এখন বাস্তব। ঈশ্বরলাভ হলে কী হয় আমার জানা নেই। তুলতুলে যুবতীলাভ হলে যা হয়, তা যার হয় সেই জানে। মনে হচ্ছে স্বর্গে ভেসে চলেছি পুষ্পক রথে। বৃষ্টি থেমে যাবার পর গাছের ডালে বসে দোয়েল যেরকম পুচ্ছ তুলে ডাকে আর নাচে, আমার মনও যেন বুকের কাছে সেইভাবে নাচছে। খোঁপা হয়ে ভেঙে পড়ছে। দেহ হয়ে দেহের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কোথায় আমার তীর্থ বারাণসী! কোথায় আমার পিতৃদেব! কোথায় আমার মৃত মাতামহের জন্যে শোকাকুল মন! সব এই দেহে নিমজ্জিত! চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি পথ ঘুরে যাচ্ছে। হিমালয় সরে যাচ্ছে।

মুকু বললে, আমি আর কিছুতেই বাবার সংসারে ফিরে যাব না পলাশ। তুমি তোমার বাবাকে বলো।

মুকু, তিনি তোমার গুরুজন।

গুরুজন? তুমি জানো, তিনি কী ধরনের নোংরা! তুমি ছেলেমানুষ, সেসব কথা তোমাকে বলা যাবে না। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তিনি আমাকে আর পিতার চোখে দেখেন না।

তুমি যা বলছ, সেকথা আমি কেমন করে বাবাকে বলব! আমারও তো লজ্জাশরম আছে।

তুমি না পারো, আমি বলব। এতে তো অন্যায়ের কিছু নেই! আমরা তো পাপ করতে ছুটছি না! তুমি শুধু অনুমতি দাও।

আজ আর ভাবতে পারছি না, আমাকে দু'-একদিন সময় দাও। এত তাড়া কীসের?

তোমাকে আমি চিনি, তোমার সময় বড় দ্রুত চলে। তোমাকে এখুনি ধরতে না পারলে পিছলে যাবে।

আমি একটু ভাবি।

তোমার কি মনে হয় আমি খারাপ মেয়ে, তোমার অযোগ্য?

এ প্রশ্ন তো আমারও হতে পারে?

এর উত্তরে তোমাকে আমি একশোর মধ্যে একশো দিয়ে দিলুম।

লক্ষ্মীটি তুমি এবার সোজা হয়ে বোসো।

মুকু সোজা হয়ে উঠে বসল। খোঁপা ভেঙে পড়েছে। শাড়ির আঁচল অনেক আগেই খসে পড়েছে। নারী আর মৃত্তিকা প্রায় একই জাতের জিনিস। গাড়ি বিবেকানন্দ রোডে প্রবেশ করল। মোড়ের মাথায় একটি অলংকারের দোকান। আধপাল্লা তখনও খোলা। সোনার অলংকার পেছনের আয়না থেকে চোরা চাহনিতে তাকিয়ে আছে।

হস্টেলের প্রবেশ পথের দু'পাশে দুটি সাবুগাছ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। গভীর বারান্দায় ফানুসের মতো আলো ঝুলছে। বাড়িটির চেহারায় সাবেক কালের গাম্ভীর্য। এক ধরনের বিষণ্ণতা লেগে আছে। গাড়ি ভাড়া বুঝে নিয়ে সোজা চলে গেল। মুকু আমার সামনে নায়িকার মতো দাঁড়িয়ে। তার দিকে তাকিয়ে মন ভবিষ্যতের ছবি আঁকছে। স্ত্রী নয়, তবু মনে হচ্ছে আমার স্ত্রী। সুন্দরী স্ত্রী যে-কোনও মানুষের গর্ব।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, ঢুকতে দেবে তো?

হ্যাঁ দেবে।

আমি তা হলে চলি।

রোজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে তো?

রোজ কী করে হবে?

তা না হলে আমি মরে যাব।

কীভাবে হবে?

তুমি আসবে। এসে আমার খোঁজ করবে।

দেখি।

কোনও কথাই কি তুমি স্পষ্ট করে বলতে পারো না?

তোমার কাছে আজ যা স্পষ্ট কালই যে অস্পষ্ট হয়ে যাবে না, কে বলতে পারে?

তুমি না পারো, আমি পারি। মেয়েদের কামড় কচ্ছপের কামড়ের মতো।

দুটো সাবু গাছের মাঝখান দিয়ে মুকু ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। কোথাও কেউ একজন ভীষণ জোরে জোরে কাশছে। মনে হচ্ছে এখুনি দম আটকে যাবে। সাবু গাছের পাতায় পাতায় রাতের বাতাস শাড়ির আঁচলের মতো খসখস করছে। প্রায়-জনশূন্য পথে দু'কদম হাঁটার পরেই মনে হল, আমি বড় নিঃসঙ্গ। বাড়ি ফিরে যেতেও মন চাইছে না। পিতৃদেবের একটি কথা মনে বড় লেগেছে। 'মুকু তো তোমার কাছে এসেছে। তার মানে? কাকিমা সম্পর্কে সমালোচনার প্রতিশোধ তিনি কি এইভাবেই নিলেন? অতটা নীচে নেমে আসার মানুষ তো তিনি নন। ওঁর যত তর্জগর্জন সবই তো ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে। কী জানি? মানুষের দুর্গম অঞ্চলের কোথায় কী যে ঘাপটি মেরে বসে আছে! পৃথিবীতে এমন কোনও লিভিংস্টোন নেই যে আবিষ্কার করেন! তৃপ্তি, অতৃপ্তি, সুখ, দুঃখ, দড়ির মতো পাকে পাকে এমন জড়িয়ে আছে, এককভাবে কোনওটাই পাওয়া সম্ভব নয়। একটু আগে বেশ লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আমি একটা মহাদেশ জয় করে ফেলেছি। এখন মনে হচ্ছে নেপোলিয়ানের মতো সেন্ট হেলেনায় চলেছি নির্বাসনে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি পুরোপুরি মুকুর ক্লাচে চলে গেছি। মন, সংস্কার সবকিছুই তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। যতটা উচ্চে উঠেছিলুম তার চেয়ে ঢের নীচে নেমে গেছি। আবার আমি পরাজিত। পিতার তিক্ত কথাই সত্য হল। সন্ন্যাস আমার রক্তে নেই, সংস্কারে নেই। একবিন্দু রক্ত অণুবীক্ষণের তলায় ফেললে হয়তো চমকে উঠব। অক্টোপাসের মতো অসংখ্য প্রাণী লোভ লালসার শুঁড় নেড়ে নেড়ে ভোগের বস্তু খুঁজছে। কোথায় আমার সেই নির্বেদ! আজ যদি আমার কোথাও যাবার জায়গা থাকত! কিংবা, কোথায় চলে যেতে পারতুম চিরকালের জন্যে! এই নির্বান্ধব রাতের পৃথিবীতে সেই গৃহটি ছাড়া আমার আর কোনও আশ্রয় নেই। বেড়ালের মতো ঘুরে ঘুরে সেই একই জায়গায় ফিরে যেতে হবে ন্যাজ তুলে।

হেঁটেই চলেছি, হেঁটেই চলেছি। কোথায় যে যেতে চাই! যে-দিকেই যাই না কেন, বাড়ির দিকেই চলেছি। একেই বলে হোমিং ইনস্টিংক্ট। সানাইয়ের সুর ভেসে আসছে। শরবতের দোকানে রাতের লাইন পড়েছে। বরফের চাংড়ায় থলে জড়িয়ে কাঠের মুগুর পেটাচ্ছে। সুখস্বপ্ন ভেঙে যাবার মতো ঝুরঝুর শব্দ হচ্ছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় বরফের বাতাস এসে গায়ে লাগল। ভিজেভিজে কাঠের গুঁড়ি ছড়িয়ে আছে চারপাশে।

সানাইয়ের উৎসস্থলে এসে পড়েছি। বেহাগের সুরে বিয়েবাড়ি জমে উঠেছে। সারাবাড়ির দেয়ালে লাল নীল টুনির মালা ঝুলছে। কাপড়-মোড়া টুঙির মাথায় বসে, মিহি পাঞ্জাবি পরে ওস্তাদজি সুর ছাড়ছেন। চারপাশে আলো আর ফুলের মালার ঘেরাটোপ। ছাদের ওপর বিশাল ম্যারাপ, আলোর চাঁদোয়া তুলেছে। তেরপলে মানুষের ছায়া নাচছে। হইহই উপচে পড়ছে, ফ্রাই, ফ্রাই। সামনের রাস্তাটা ভিজেভিজে। পেন্ট-করা মুখ নিয়ে দু'-তিনজন যুবক সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছে। সবচেয়ে লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান যুবকটিই মনে হয় আজকের রাতের নায়ক। সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি, পায়ে নিউকাট। তিন-চার রকম গন্ধ, একসঙ্গে মিলেমিশে বিয়েবাড়ির গন্ধ তৈরি করেছে। রজনীগন্ধা, সেন্ট, লুচিভাজা, মাছ, জল, কলাপাতা, সব মিলিয়ে স্বপ্নগন্ধী এক রাত। পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চললুম। ফেলে দেওয়া পাতা আর গেলাসের গাদায় গুন্ডা চেহারার কুকুরের খেয়োখেয়ি লেগেছে। আরও দূরে খাটিয়ায় চিতপাত হয়ে পড়ে আছে ভুঁড়ি-খোলা এক দৈত্য।

বাড়ির সদরে যখন এসে পৌঁছোলুম তখন প্রায় রাত দশটা। সদর হাট খোলা। এমন তো বড় একটা হয় না। পিতৃদেব তো এত উদাসীন নন। কী জানি, কী ব্যাপার! ওপরে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। আলোর আভা অসুস্থ বৃদ্ধার মতো ঘষটে ঘষটে সিঁড়ি বেয়ে কিছু দূর নেমে এসে এলিয়ে পড়েছে। সিঁড়ির শেষ ধাপে এটা আবার কী! বলাইবাবু! খোলের বাইরে মুখটি বের করে একপাশে চুপ করে বসে আছে।

বলাইবাবু, তুমি তো কোনওদিন নীচে নামো না, আজ হঠাৎ নেমে এলে?

বলাইবাবুর মুখটি নড়ে উঠল। কচ্ছপও পোষ মানে। পোষ মানে না মানুষ। কাকিমা চলে গেছেন। ছোট্ট এই প্রাণীটি খুঁজতে খুঁজতে টাল খেতে খেতে নীচে নেমে এসেছে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে আছে সেই পরিচিত পদশব্দের অপেক্ষায়। কাকিমা বলাইবাবুকে রোজ একবার করে পালিশ করতেন। খোলটি বহু বর্ণে চিত্রিত হয়ে উঠেছে।

চলো, ওপরে চলো। বলাইবাবু, আমরা তো আছি! এক যায়, আর এক থাকে। মানুষের মতো ভুলতে শেখো। এই দেখো, একে একে আমার তো সবাই চলে গেছেন। যান না, আমি ধীরে ধীরে সব ভুলে যাব। একে একে নতুন চরিত্র এসে আমার চারপাশে ঘিরে বসবে। মাইফেল চলবে দিনের পর দিন। তারপর আবার একদিন সব ভোজবাজি! শুন্য কার্পেট, ছেঁড়া ফুলের মালা, ঘুঙুরের দানা, বাতি ম্রিয়মাণ, ভোরের পানসে আলো, ঘুলঘুলিতে তন্দ্রাতুর পায়রার ডানার ঝটাপটি, মৃতের নিশ্বাসের মতো ফিকে বাতাস। ছিল সব, নেই কিছু। নদীর এক পাড় ভাঙে, আর এক পাড় গড়ে। চলো বলাইবাবু, ওপরে চলো। তুমি আমার কোলে উঠে চলো। বর্ষার দুপুরের স্মৃতি। মাতামহ একেই বলতেন□—সব ধুস।

যে কথা ফোটে না গানে
বুঝি তাহা সুরে,
যে ছবি ফোটে না রঙে
ফোটে তা রেখায়।

সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই এসরাজের সুর উঠল। বাগেশ্রীর ধরতাই। বড় সুন্দর ধরেছেন, যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে। সুরের টানে শূন্য বাড়ি যেন কেঁদে উঠছে। আরও দু'ধাপ উঠতেই নাকে একটা সুন্দর গন্ধ এসে ঢুকল। এমন একটা কিছু রান্না চেপেছে, যাতে ঘি আছে, গরমমশলা আছে। বুকের কাছে বলাইবাবু খোলে ঢুকে পড়েছে।

সেই হলঘর। একটি মাত্র আলো জ্বলছে। যে-ঘর একসময় গাইয়ে, বাজিয়ে আর শ্রোতায় ভরে থাকত সেই ঘরে একপাশে ছোট্ট একটি জাজিম পেতে পিতৃদেব এসরাজ নিয়ে বসেছেন। দক্ষিণের জানলা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডারের পাতা উড়ছে। মেঝেতে বলাইবাবুকে রাখতেই গুটিগুটি এগিয়ে চলল পাতা জাজিমের দিকে। বেশ সংগীতরসিক হয়ে উঠেছে।

বাজাতে বাজাতে চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সব হল?

বুকটা কেমন যেন ছাঁত করে উঠল। সব হল, মানে? যা হল, সে হওয়া তো ওঁর আশঙ্কাকেই সমর্থন করে। ভেতরে ভেতরে হয়তো এমন শক্তি অর্জন করে বসে আছেন, যাকে বলা চলে থার্ড আই। গাড়ির পেছনের আসনের মাথার ওপর দুটি অদৃশ্য চোখ। ভাবতেই ভেতরটা আবার কেঁপে উঠল।

কাঁপাকাঁপা গলায় বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ।

বেশ, বলে মাথা নাড়লেন। এসরাজ বাজতে লাগল, সব যে হয়ে গেল কালো।

সামনে গিয়ে বসার সাহস হল না। নিজেকে বড় অশুচি মনে হচ্ছে। যেন নিজেকে সৎকার করে শ্মশান থেকে ফিরে এলুম। রান্নাঘরই ভাল। নির্জনে উনুনের ওপর ছোট্ট একটি হাঁড়িতে খিচুড়ি ফুটছে। বড় মধুর সুবাস। বহুদিন পরে পিতৃদেব আবার রন্ধনের হাত খুলেছেন। আহা! মাতামহ নেই। সমঝদার চলে গেছেন। খিচুড়ি বড় প্রিয় বস্তু ছিল। প্রিয় ছিল মোহনভোগ। আর ছিল তেলেভাজা। রান্নাঘরের চারপাশে তাকিয়ে কাকিমার অনুপস্থিতি প্রথম অনুভব করলুম। বিশাল এই জগতে নিঃসঙ্গ এক মহিলা ক্রমশই দূর থেকে দূরে অনিশ্চিত এক পরিবেশের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আবার নতুন করে সকলের মন জয় করতে হবে। নিজের সংসার আর পরের সংসারে অনেক তফাত। এই যাওয়ার ব্যাপারে আমার কথা বলা অনুচিত হয়েছে। কেন আমি সব তছনছ করে দিলুম? বলা যায় না, ওই নারীপাগল মামাশ্বশুর হয়তো খুঁজে খুঁজে ওইখানেই গিয়ে

হাজির হবেন। পাশে দাঁড়াবার মতো আমাদেরও আর কেউ রইলেন না। মাতামহ তাঁর রাজসিকতা নিয়ে আর এগিয়ে আসবেন না। মাতুল প্রবাসী। প্রতিবেশীরা ঈর্ষাপরায়ণ।

এসরাজ থেমে গেল। পিতা উঠে এলেন।

কী, খুব খিদে পেয়েছে?

আজ্ঞে না।

বিকেলে কিছু খেয়েছিলে?

একেবারে সরাসরি দুম করে মিথ্যেই বললুম, আজ্ঞে না।

তা হলে তো খিদে পাওয়া উচিত। এই তো তোমার খাবার বয়েস। আজ আর বেশি হ্যাঙ্গাম করলুম না, বুঝলে? লাগিয়ে দিলুম ডালেচালে। অনেকদিন রাঁধিনি, জানি না কী বস্তু দাঁড়াল!

দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে।

গন্ধ কিন্তু ভাল রান্নার পরিচয় নয়। ঘি আর গরমমশলা, অনেকটা কীরকম জানো, ধাপ্পামারা মানুষের মতো। মুখে না দিলে বোঝা যাবে না। টেস্ট অফ দি পুডিং ইজ ইন দি ইটিং।

খিচুড়ির হাঁড়িতে পিতৃদেব হাতা চালাতে লাগলেন। তলা ধরে গেলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। দেয়ালে ছায়া নাচছে। হাতাটা হাঁড়ির মুখে শুইয়ে রেখে পিতা বললেন, বাড়ি একেবারে পরিষ্কার, কী বলো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথা থেকে উড়ো সব ঝামেলা এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে চলে গেল। একেই বলে গ্রহ। আবার সেই পুনর্মূষিক ভব। পিতা আর পুত্র। তুমি এখন সুখী তো?

সুখী?

প্রশ্নকে প্রশ্ন দিয়ে ঠেকালুম। সুখী কি না, অত সহজে বলা চলে। দুঃখের অভাব যদি সুখ হয়, তা হলে সুখী! এইবার মনে হয় একটি সত্য কথা বলছি, আজ্ঞে সুখী কি না বলতে পারব না।

কেন? অশান্তির কারণ তো সব চলে গেছে। এখন আমরাই তো একচ্ছত্র নৃপতি।

বড় ফাঁকা হয়ে গেল না!

সেইটাই তো আমাদের পরিবেশ।

সইয়ে নিতে কয়েকদিন সময় যাবে।

তা ঠিক! আমরা বড় জড়িয়ে পড়েছিলুম। ধীরে ধীরে নিজেদের হারিয়ে ফেলছিলুম। একেই বলে মন না মতিভ্রম। তুমি ঠিকই বলেছ, সংসার আমাদের ধাতে সইবে না। আমরা বেশ পুরোমাত্রায় একলষেঁড়ে হয়ে উঠেছি। আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর। হয় এইভাবেই আমাদের কাটাতে হবে, না হয় সন্ন্যাসীর ভেক ধরতে হবে।

ভেক বলছেন কেন?

না, রেগে যেয়ো না। তোমার কথা আমি বলিনি। আমি আমার কথা বলছি।

আপনি বিকেলেও আমাকে প্রায় একই কথা বলেছেন। অনেকটা চ্যালেঞ্জের মতো। আমার দ্বারা ভাল কিছুই কি করা সম্ভব নয়!

শোনো শোনো, ভাল কিছু এক জিনিস, আর স্বভাববিরুদ্ধ আর এক জিনিস। তোমাকে আমি যতটা চিনি, তুমি নিজেই হয়তো নিজেকে ততটা চেনো না। ছেলেবেলা থেকে শিবরাত্রির সলতের মতো তোমাকে আগলে আগলে মানুষ করা হয়েছে অনেকটা তুলোয় রাখা আঙুরের মতো করে। প্রকৃতি থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন। ঝড় উঠলে ভয় পাও, বিদ্যুৎ চমকালে বালিশে মুখ গোঁজো। সামান্য আরশোলা দেখলে নৃত্য করো। তুমি কেমন করে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হবে! মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে দেখো, তাঁরা কেউ আদুরে ছিলেন না। ওই তো বইয়ের র‍্যাকে গোপীনাথ কবিরাজজির লেখা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসজির জীবনী রয়েছে, পড়ে দেখো। গেরুয়ায় সন্ন্যাস নেই, সন্ন্যাস আছে মনে।

কে যে কখন কী করে ফেলতে পারে, তা কি আগে থেকে বলা যায়!

পিণ্টু, সে হল হঠকারিতা। হঠাৎ খুন করা যায়, আত্মহত্যা করা যায়, হাততালির লোভে ছোটখাটো বীরত্ব দেখানো যায়, নামের লোভে দাতা হওয়া যায়, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার বলি পূর্বজন্মের অসীম সুকৃতি ছাড়া সন্ন্যাসী হওয়া অসম্ভব। তর্ক করে লাভ নেই, তিক্ততা বাড়বে। তৈরি হয়ে নাও, ঠান্ডা হয়ে যাবার আগেই খেতে বসতে হবে।

নীরবে আহারপর্ব শেষ হল। আজ আর পরিবেশনের ঘটা নেই। নানারকম পদ নেই। বেগুনভাজা আর খিচুড়ি। চোখে পড়ছে মাতামহের খড়মজোড়া। একটি জলচৌকির ওপর সযত্নে রক্ষিত। বারান্দার তারে ঝুলছে কাকিমার শাড়ি। সারাবাড়ি স্মৃতিতে স্মৃতিতে ছেয়ে আছে। স্মৃতিই বেদনার উৎস।

রান্না অতি উপাদেয় হয়েছিল। এমন মানুষ যে-কোনও মহিলাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন। সূক্ষ্ম সেলাই, রিপু, ফ্যান গালা, বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, সবই জানেন। এমন জানেন যার কোনও তুলনা হয় না। মাতামহ থাকলে এতক্ষণ প্রশংসায় প্রশংসায় বাড়ি মাত করে দিতেন। সব ফাঁকা। সব ধুস হয়ে গেছে। কয়েকটি ব্যবহৃত জিনিস মাত্র পড়ে আছে। পাট-করা একটি গামছা। কীটদষ্ট একটি বই। সিন্দুকে কী আছে খুলে দেখা হয়নি। আমি নিজে কোনওদিন খুলবও না। খুলতে হলে মাতুলের সামনেই খুলব।

পিতৃদেব বললেন, সারাদিন খুব খাটাখাটুনি করেছ, এইবার শুয়ে পড়ো। আমি আমার পুরনো অভ্যাসটা আবার ফিরিয়ে আনি। একা একা রাত জাগা। কত কী পড়ার রয়েছে! জমে জমে পাহাড় তৈরি হয়েছে।

টেবিলে আলোর সামনে গিয়ে বসলেন। একদিকে থাক থাক বই, আর একদিকে ছোট-বড় নোটখাতা। মাঝে একফালি কাচে-ঢাকা জায়গা। আজ আর আমার লেখাপড়ার মেজাজ নেই। শুয়ে শুয়ে চোখের সামনে দেখছি অনন্ত আকাশ। তারার ফুল ছড়িয়ে আছে। সামনে পড়ে আছে জীবনের অনন্ত পথ। কনকের কথা মনে পড়ছে। সে ঠিকই করেছে। আমার দুর্বলতাকে আদৌ পাত্তা দেয়নি। দিলে বিপদেই পড়ত। যে নিজে চলতে পারে না, সে অপরকে চালাবে কী করে! মুকু মনে বড় টোল ধরিয়েছে। কী সব ঘটছে জীবনে? আগামীকাল আমি অফিসফেরতা স্বামী নির্মলানন্দের কাছে যাব। য পলায়তি স জীবতি। আর এখানে নয়। ওই কাকিমা অবশ্যই আবার ফিরে আসবেন। পিতার এই নিঃসঙ্গতা অবশ্যই ঘুচে যাবে। সংসার কারুর জন্য বসে থাকে না। সব যেমন চলার তেমনি চলে। মায়ের অভাবে পিতার জীবন তো কই অচল হয়নি। আমার অভাব, অভাব বলেই মনে হবে না। কর্মী মানুষ, কাজে কাজেই ঠিক চালিয়ে দেবেন। কিন্তু আমি কীভাবে ছেড়ে থাকব! যেখানেই যাই মন যে আমার কাঁদবে। মুকুর কথার কোনও মাথামুন্ডু নেই। মুকু আমার মা হবে, সৎ

মা! সত্যিই যদি হয়, আমার আর কোনও পিছুটান থাকে না। অপরিসীম ঘৃণায় বৈরাগ্যের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তা কি আর হবে? ঘটনা আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে পথে নামাবে না। আমাকেই নামতে হবে ধাক্কা মেরে।

চোখ কখন বুজে এসেছিল জানি না। গভীর রাতে এসরাজের সুর শুনেছিলাম মনে হয়। জয়জয়ন্তী বেজেছে কেঁদে কেঁদে। মুখে যা প্রকাশিত হয়নি, হয়েছে সুরে সুরে। ধড়মড় করে বিছানায় যখন উঠে বসলুম, তখন যথেষ্ট বেলা হয়েছে। এভাবে কোনওদিন তো ঘুম ভাঙে না। কে যেন ঠেলা মেরে উঠিয়ে দিল। অনেকটা হাত ধরে ঠেলে তুলে দেবার মতো করে। আলোয় চোখ ক্রমশ সয়ে এল। বাইরে কাকের কর্কশ চিৎকার। বালিশের পাশে পোস্টকার্ডের মতো ছোট্ট একটা কী পড়ে আছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, জানলা দিয়ে আসা রোদের টুকরো। না, তা তো নয়! মুক্তোর মতো কয়েকটি অক্ষর ভাসছে। তুলে চোখের সামনে ধরলুম। সাতসকালে চিঠি ডেলিভারি হল বিছানায় বালিশের পাশে। কে সেই পিয়ন।

একটি মাত্র লাইন, লোহা গরম থাকতে থাকতেই হাতুড়ি মারা উচিত। হরিশঙ্কর।

তার মানে? এ কথার অর্থ কী! কোথায় তিনি? আমার সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনি মেরে কে আমায় জাগাল? আমার কোনও আতঙ্ক! মশারি তুলে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পা জড়িয়ে টান লেগে একপাশের ফিতে ছিঁড়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে যাইনি এই আমার ভাগ্য!

টেবিলের আলো তখনও জ্বলছে। রাত-জাগা পাণ্ডুর রুগির মতো। বইপত্র সামান্য এলোমেলো। আলো না নিবিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে যাবার মানুষ তো তিনি নন। তাঁর জগৎ তো কারণ-জগৎ। কার্য ছাড়া কারণ, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। অকারণে আলো জ্বলুক, এ তো তিনি চাইবেন না। বিছানায় শুয়েছিলেন বলে মনে হয় না। চাদর টানটান। মশারি ফেলে চারপাশ গুঁজে রেখেছিলেন, সেইভাবেই গোঁজা রয়েছে, টেনে খোলার চিহ্ন নেই। মাতামহ যে-ঘরে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিয়ে গেলেন, সে ঘরের দরজা খুললেই, সুন্দর অপার্থিব একটা গন্ধ নাকে এসে লাগে। এ ঘরেও তিনি নেই। বিছানার ওপর একটি ফুল পড়ে আছে। চাদরের মাঝখানে। রান্নাঘর শূন্য। বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর চাপা গন্ধে গুমোট হয়ে আছে। শুকনো, খসখসে, স্নেহহীন মেঝে। কোনও কোনও জায়গা চাটনি কিংবা টক পড়ে সাদা সাদা হয়ে গেছে। এই ঘরে কনক রেঁধে গেছে, এখন সে কার ঘরনি। কাকিমা তাঁর নতুন গন্তব্যস্থলে এতক্ষণে মনে হয় পৌঁছে গেছেন। বাথরুমের দরজা বন্ধ। দরজা খুলতেই ভস করে একটা বন্দি হাওয়া বেরিয়ে চলে গেল। ঘষা কাচ লাগানো পুবের জানলায় রোদ এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

দোতলার সব দেখা হয় গেল। কোথাও তিনি নেই। অথচ মনে হচ্ছে আছেন। ধূপের গন্ধের মতো। এইমাত্র জ্বলছিল। জ্বলতে জ্বলতে নিবে গেছে। শেষ ধোঁয়া এখনও যেন বাতাসে সরু সুতোর মতো পাক খাচ্ছে। ছাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আর একবার ভাবার চেষ্টা করলুম, কী হতে চলেছে? কী মানে ওই লাইনটির? ইংরেজিরই বাংলা তর্জমা, স্ট্রাইক হোয়াইল দি আয়রন ইজ হট। কোন লোহা? কে লোহা? মশারি তুলে বালিশের পাশে একটি কার্ড ফেলে রেখে তিনি গেলেন কোথায়! এ আবার কী ধরনের রসিকতা! ভোরবেলা বাজার? জীবনে যাননি। মর্নিং ওয়াক! ওসব শৌখিন ব্যাপারে আদৌ অভ্যস্ত নন।

খোলা ছাদ চারপাশে দৌড়োদৌড়ি করছে। ঝলমলে পৃথিবী সকালের বাতাসে দু'বাহু তুলে যেন নাচছে। আলোয় আলোকিত। সেই পায়রার ঝাঁক উড়ছে পুব আকাশে ঘুরে ঘুরে। একটা-দুটো পাখি খুব নিচু দিয়ে

ফুড়ুত করে উড়ে গিয়ে এ গাছ থেকে ও গাছে গিয়ে বসছে। দিন এল বলে প্রকৃতিতে যেন শোরগোল পড়ে গেছে। আশা ছিল, হয়তো পিতৃদেবকে দেখব পরিচিত ভঙ্গিতে। সার সার ফুলগাছের টবের সামনে উবু হয়ে বসে আছেন। শীত আসছে। ফুল আসবে। ছাদ ফাঁকা। প্রতিবেশীরা জেগে উঠেছেন। কলরব কানে আসছে। জলের বালতি জোরে বসাবার ধাতব শব্দ। এক মহিলা রোদের আলসেতে হলদে শাড়ি মেলছেন পরিপাটি করে। মাটি খোঁড়ার যন্ত্রটি একপাশে পড়ে আছে। কালো পিঁপড়ের দল ভীষণ ব্যস্ত। মিছিল করে এগিয়ে চলেছে টবের পাশ দিয়ে দিয়ে। গাছের পাতা থেকে কাণ্ড থেকে এক ধরনের তিক্ত গন্ধ বেরোচ্ছে। বড় পরিচিত। গন্ধে যেন কীসের খবর ভাসছে। পুজো প্রায় এসে গেল। শিশিরের কাল আসছে। মাটির গভীরে, কোন অদৃশ্য লোকে কুঁড়ি জাগছে, এইবার তার মুখটি উঁকি দেবে পাতার ফাঁকে। পাশের নিমগাছ থেকে চকচকে দুটি কাঠবেড়ালি নেমে এসেছে। আলসে বেয়ে ন্যাজ তুলে ছুটছে।

শূন্যতার আঘাত এই প্রথম উপলব্ধি করলুম। কিছু না-থাকা যে কত বড় শাস্তি! পাখিদের কি এরকম মনে হয়! আতঙ্ক হয়! ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল! মৃত্যু সুস্পষ্ট একটা আঘাত। তবু, সহ্য করা যায়। প্রাণ না থাকলেও সামনে একটা দেহ পড়ে থাকে। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের অনেকদিনের বোঝাপড়া। মনের একটা প্রস্তুতি আছে। কিন্তু শূন্যতা! রহস্যময় অনুপস্থিতি! বুকটা ধক করে ওঠে। ভীষণ আচমকা একটা আঘাত। সামলাতে কষ্ট হয়।

উদ্বেগ চেপে আবার নীচে নেমে এলুম। অসম্ভব রাগে শরীর জ্বলছে। পৃথিবীটা ক্রমশই যেন নাটুকে হয়ে উঠছে। একজন প্রৌঢ় মানুষ হঠাৎ এমন নাটকীয় হয়ে উঠলেন কেন? পুত্রের সঙ্গে মজা করছেন! অন্ধকার একতলায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে দিনের আলো ঢুকেছে। অন্ধকারের স্তরে কোথাও এখনও একটা ঝিঁঝি ডাকছে থেমে থেমে। রাত যে ভোর হল, সে খবর এখনও পায়নি। কাকিমা যে-ঘরে রাঁধতেন, সেই ঘরে খুটুস খাটুস করে এক ধরনের শব্দ হচ্ছে। ইঁদুররা ফিরে এসেছে আবার। ঝিঁঝি থামলেই চারপাশ থেকে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা ফিরে আসছে। চিড়-খাওয়া সদর দুয়ার বাতাসে কাঁপছে। একপাশে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে খিল। আর কোনও সন্দেহ নেই। যতই খুঁজি না কেন, এ গৃহে তিনি নেই। দরজার বাইরে রাজপথ। এক বাহু পশ্চিমে চলে গেছে গঙ্গায়, আর এক বাহু পুবে, প্রসারিত অনির্দেশ যাত্রায়। আমি এখন কী করি!

দুয়ার খুলে থাকি বসে
আসবে তুমি ফিরে।
প্রদীপটিকে জ্বালিয়ে রাখি
তোমার পথের ধারে॥

ধীরে, খুব ধীরে, ভয়ে ভয়ে সদর দরজার একটা পাল্লা সামান্য একটু ফাঁক করতেই বাইরের জগৎ যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একঝলক পরিষ্কার বাতাস, শুভ্র রুপোলি আলো, শব্দের গমক ছুটে এল। কিছুই হয়নি যেন! উদাসীন বহির্বিশ্ব যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চলছে। সাইকেলের হাতলে পাটপাট কাগজ ডাঁই করে খবরের কাগজঅলা ছুটছে পুব থেকে পশ্চিমে। গয়লা চলেছে দুধের বালতি নিয়ে। খড়ের নুটি তালে তালে নাচছে। এপাশ থেকে ওপাশ, যত দূর দৃষ্টি যায় একবার তাকিয়ে দেখলুম। অজগরের মতো পথ চলে গেছে এঁকেবেঁকে। ভেঙে-পড়া ঝাড়লণ্ঠনের মতো টুকরো টুকরো মানুষ এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। রাতের মুঠো আলগা হয়ে দিনের পৃথিবী খুলে পড়েছে। পাউরুটির সাইকেল ভ্যান বিকট শব্দে চমকাতে চমকাতে চলেছে। হাফপ্যান্ট পরা চালক সিটের ডাইনে বাঁয়ে উঁচু-নিচু হয়ে প্যাডেল ঠেলছে।

দরজা বন্ধ করতেই জগৎ কাটা পড়ে গেল। ঘোলাটে আলো অন্ধকার। স্যাঁতসেঁতে বাতাস। বিষণ্ণ দরজা জানলা। মরচে-ধরা সোজা সোজা গরাদ। ঝিঁঝি এখনও থেমে থেমে তাল ঠুকছে। উত্তরের বাগানে নিমগাছে বসে কাক ডাকছে খা খা করে। দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে আলো-অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালুম। কী ভীষণ শূন্যতা! ঊর্ধ্বাকাশে প্যারাচুট না খুললে, নিরালম্ব পড়ে যেতে যেতে মনের যেরকম অবস্থা হওয়া উচিত, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেইরকম। পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ির যোগ কেটে গেছে। যার পা নেই তার বগল থেকে ক্রাচ কেড়ে নিলে এইরকমই হয়। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। একেবারে একা। পূর্ণ কুম্ভ থেকে শূন্য কুম্ভ। হঠাৎ মনে হল, সেই অসহায় মহিলাটির তা হলে কাল কেমন লেগেছিল! কী মন নিয়ে তিনি চলে গেলেন! আমি তো পুরুষ! তাও মনে হচ্ছে মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।

পিতৃদেব! এ কি লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল না! এইভাবে প্রতিশোধ নিলেন? ভয়ে, লজ্জায়, আমি যেন খুনির মতো এই আবছা আলোয়, নোনা বাতাসে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বিচারক-জগৎ বাইরে বয়ে চলেছে। কোনওক্রমে খবর একবার বাইরে রটে গেলে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। নিরুদ্দেশ সংবাদটিকে গুম করে দিতে হবে। তারপর সারাভারত আমি চুঁড়ে ফেলব। কিন্তু! ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। যদি আত্মহত্যা করে থাকেন! অসম্ভব! তিনি ভীরু ছিলেন না। জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার ক্ষমতা রাখেন। এইসময় কেউ যদি আমার পাশে থাকত। এমন কেউ যাকে সব কথা খুলে বলা চলে। যার পরামর্শ নেওয়া চলে। এমনকী মুকুর মতো কেউ থাকলেও এই শূন্যতা সহনীয় হত।

ধীরে ধীরে আবার ওপরে উঠে এলুম। নিজেকে মনে হচ্ছে, ট্রেন দুর্ঘটনার পর, কী বোমা বর্ষণের পর একমাত্র জীবিত মানুষ! প্রতিদিনের অভ্যস্ত জগৎ উলটে পড়ে গেছে। সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর নেই, পদশব্দ নেই, উত্তাপ নেই, চাহিদা নেই। অন্যদিন এতক্ষণে চা বসে যেত। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হত। চটি ঘুরে বেড়াত ফটফট করে। বিশ্বাস হচ্ছে না। এ কোনও রসিকতা নয় তো! কিছু তো একটা বলে যাবেন? কী সাংঘাতিক মানুষ! কত বড় একজন অভিনেতা! কাল রাতে এতটুকু বুঝতে দিলেন না। মনে হল পুরনো সেই মানুষটি ধীরে ধীরে ফিরে আসছেন। বজ্রের মতো কঠোর, আবার কুসুমের মতো কোমল। লাস্ট সাপারের অভিনয় করে গেলেন। নিজে রেঁধে শেষ আহার করে গেলেন আমার সঙ্গে। পরিকল্পনাটা কী, একবারও যদি বুঝতে পারতুম! শেষরাতেই যদি চলে গিয়ে থাকেন, কতদূর আর যেতে পেরেছেন? শহর থেকে বেরোবার তো মাত্র দুটি দরজা, হয় শেয়ালদা, না হয় হাওড়া। চাকরিতেও কি ইস্তফা দিলেন! আমার তেমন লোকবল থাকলে এক্ষুনি দিকে দিকে সকলকে ছুটিয়ে দিতুম। পালানোর সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যেত! থানায় গেলে কেমন হয়? সে বড় লজ্জার। চারপাশে ঢিঢি পড়ে যাবে। ধূর্ত প্রতিবেশীর দল সান্ত্বনা জানাবার ছলে এসে জল আরও ঘোলা করে দিয়ে যাবে। কী আমি করতে পারি? এই বাড়ি ফেলে কোথায় আমি দৌড়োই? কায়ার পেছনে ছায়ার মতো! আমার সব পরিকল্পনা এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল।

টেবিলের আলোটা নিবিয়ে দিই। এ বাড়িতে আলো আর জ্বলবে না। মাতামহের ভাষায়, সব ধুস হয়ে গেল। পঙ্কজবাবুর কাছে গেলে কেমন হয়? পাকা মাথা থেকে পাকা পরামর্শ বেরোতে পারে। একদিন অকারণে পিতৃনিন্দা করেছেন। না যাওয়াই ভাল। মানুষটির মনে তিন-চার রকমের অহংকার প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। অর্থের, রূপের, সুন্দরী স্ত্রী কন্যার। স্বপ্নে আছেন, স্বপ্নেই থাকুন। জাগিয়ে লাভ নেই। বরং অক্ষয় কাকাবাবুর কাছে যাওয়া চলে। মাতুলকে খবর দিতে পারা যায়। তবে তিনিও কি কম বিব্রত! বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপিয়ে লাভ কী!

হাতলঅলা মেহগনি কাঠের ভারী চেয়ার টেবিলের দিকে আড় হয়ে আছে। এইমাত্র কেউ যেন ঠেলে উঠে চলে গেছেন। টেবিলঘড়ি প্রবল শব্দে টিকটিক করে চলেছে। উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে সময়ের টাট্টু ঘোড়া যেন দুলকি চালে ছুটছে ভবিতব্যের সওয়ার নিয়ে। যে-চাবি নিয়ে এত লাঠালাঠি সেই চাবির গোছা পড়ে আছে টেবিলে অনাদরে, অবহেলায়। একটি নোটখাতার মাঝামাঝি জায়গায় কলম গোঁজা। কিছু কি লিখছিলেন! পাঁচখণ্ড সদ্গুরু সঙ্গ একপাশে পরপর সাজানো। আর এক পাশে কথামৃত।

খাতাটা খুলতেই চোখে পড়ল কী লিখছিলেন! নিজেকেই লেখা নিজের চিঠি□—

হরিশঙ্কর, অনেকদিন হল পৃথিবীতে এসেছ। কেন এসেছ জানো কি? আমার নির্দেশ কি তুমি বোঝো না! সংসার তোমার জন্যে নয়। যতবার তুমি গড়তে চেয়েছ, ততবারই আমি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছি। তোমার জীবনে ভোগ নেই, আছে দুর্ভোগ। আর কতকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে! তেল পুড়ে আসছে। আলোটা এবার নিজের দিকে তুলে ধরো। অন্ধকারে এসে অন্ধকারে কেন বিদায় নেবে! প্রস্রবণের মুখ চাপা আছে। পুরুষকার দিয়ে সামান্য একটু উসকে দাও। কী সব বাজে অন্তঃসারশূন্য জিনিস নিয়ে মেতে আছ! বিজ্ঞানীর গর্ব তোমার সাজে না। তুমি আইনস্টাইন নও, তুমি রাদারফোর্ড নও। শুষ্ক দফতরের সামান্য একজন রাসায়নিক। তোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জগৎ একটি কানাকড়িও পাবে না। জীবনসঙ্গিনীকে অনেক

আগেই কেড়ে নিয়েছি। যে-কর্তব্যের মুখ চেয়ে এতকাল পুতুল খেলছিলে, তোমার সেই উত্তরপুরুষ আজ তৈরি। জীবনের সুপথ, কুপথ, ঘুরপথ সবই চিনতে শিখেছে। স্নেহের শিকল কেটে এবার পাখিটিকে উড়িয়ে দাও। তার স্বাধীন ইচ্ছে তৈরি হয়েছে। আর তাকে প্রদীপের মতো আগলে রেখো না। এবার তাকে সাবালক হতে দাও। হাবুডুবু না খেলে সাঁতার শেখা যায় না। জেনে রাখো এক জঙ্গলে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। তুমি তো বৃদ্ধ বাঘ হে! লোলচর্ম, পলিত কেশ। স্বপ্ন ছিল? অনেক স্বপ্ন! কীসের স্বপ্ন হরিশঙ্কর? জীবনটাই তো দীর্ঘ এক স্বপ্ন! স্বপ্নের আবার স্বপ্ন কী? জীবন তো সময়ের বুদবুদ। কেন পড়োনি, ব্রহ্মই বস্তু, আর সমস্ত মায়া, স্বপ্নবৎ অবস্তু? অহংরূপ একটি লাঠি সচ্চিদানন্দ-সাগরের মাঝখানে পড়ে আছে। অহংলাঠিটা তুলে নিলে এক সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। অহংলাঠিটি থাকলে দুটো দেখায়, এ একভাগ জল ও একভাগ জল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সমাধিস্থ হয়। তখন এই অহং পুছে যায়। ভেবে দেখো, এই জাগরণ অবস্থাও কিছু নয় হরিশঙ্কর। সেই গল্পটা মনে পড়ে? এক কাঠুরে স্বপ্ন দেখেছিল। একজন হঠাৎ তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়াতে কাঠুরে রেগে আগুন। 'তুই কেন আমার ঘুম ভাঙালি? আমি রাজা হয়েছিলাম, সাত ছেলের বাপ হয়েছিলাম। ছেলেরা লেখাপড়া, অস্ত্রবিদ্যা সব শিখছিল। আমি সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছিলাম। কেন তুই আমার সুখের সংসার ভেঙে দিলি?' যে ঘুম ভাঙিয়েছিল সে বললে, 'ও তো স্বপ্ন, ওতে আর কী হয়েছে!' কাঠুরে বলল, 'দুর! তুই বুঝিস না, আমার কাঠুরে হওয়া যেমন সত্য, স্বপনে রাজা হওয়াও তেমনই সত্য। কাঠুরে হওয়া যদি সত্য হয়, তা হলে স্বপনে রাজা হওয়াও সত্য।' সবই স্বপ্ন, হরিশঙ্কর! কোনওটা দীর্ঘস্থায়ী, কোনওটা ক্ষণস্থায়ী। শঙ্কর তো পড়েছ? অত বড় অদ্বৈতজ্ঞানী আর কি এসেছিলেন? স্বপ্নে স্বপ্ন সত্য, জাগরণে সব মিথ্যা। তোমার অজ্ঞান জগৎকে সত্য, অবিনশ্বর এইরকম একটা ভ্রম তৈরি করে তুলছে। আসলে তা নয়। সত্যদ্রষ্ট ঋষির বাক্যে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলো। যখন জেগে আছ তখন স্বপ্ন মিথ্যা, যখন স্বপ্নে আছ তখন জাগরণ বৃথা, যখন তুমি গভীর নিদ্রায় তখন স্বপ্নও নেই, জাগরণও নেই। এইবার স্বপ্ন আর জাগরণকে এক করে ফেলো তখন নিদ্রাটাকেই মিথ্যা বলে মনে হবে। কী সুন্দর কথা! একবার অভ্যাস করে দেখো, পারবে, তুমি পারবে। আমি ধীরে ধীরে তোমার মোহ ছেদন করে দিয়েছি।

যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা।
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতির্জীবসংজ্ঞা তথাপরে॥

মৃত্তিকায় দিলে ঘট নাম, কনকে লাগালে কুণ্ডল নাম, শুক্তিতে নিয়ে এলে রজতের কল্পনা, তেমনি আত্মাকে দিলে জীবনের চেহারা। রজ্জুতে সর্পভ্রম এনো না। ঘট মৃত্তিকাই, দেহ চিদাত্মময়। তোমার প্রারব্ধ ক্ষয় হয়েছে, এবার আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হও।

আর ঘুমাইও না মন।
মায়াঘোরে কতদিন রবে অচেতন।
কে তুমি কী হেতু এলে
আপনারে ভুলে গেলে
চাহ রে নয়ন মেলে

ত্যজ কুস্বপন॥

সময় ঝুরঝুর করে বালির মতো ঝরে পড়ছে। দেহপিঞ্জর খুলে যাবার সময় আসন্ন। এতকাল স্নেহে অন্ধ হয়ে ছিলে। কর্তব্যের চাকা অবিরত ঘুরিয়েই গেছ, ঘুরিয়েই গেছ। কে তোমার আবেগের মূল্য দেবে! জগৎ বড় স্বার্থপর। কেউ কারুর নয় হরিশঙ্কর! আঁতে ঘা লাগলে সবাই বেঁকে বসবে, এমনকী সন্তানও! সমালোচনা এক জিনিস, সন্দেহ আর এক জিনিস। বার্ধক্যে যখন স্থবির হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি কমে যাবে, বুদ্ধিভ্রংশ হবে, তখন কি তুমি অপমানের বোঝা নিয়ে পরাজিত সৈনিকের মতো যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করবে! ধিক হরিশঙ্কর, ধিক তোমাকে! সংসার এক ছোবড়া। যতই নিংড়োও এক ফোঁটাও রস বের করতে পারবে না। বৈরাগ্য হিসেব করে আসে না। মুহূর্তে উদয় হয়, মুহূর্তেই মিলিয়ে যায়। যেন ঝড়ের পাখি। বন্ধ জানলার কাছে এসে সরু ঠোঁটের ঘা মারে। খুলে দাও, খুলে দাও, নয়তো উড়ে চলে যাবে। ঠাকুরের বলা সেই গল্পটি মনে পড়ছে! একজনের পরিবার বললে, ‘অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হল না। যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোলোজন স্ত্রী,□— এক একজন করে তাদের ত্যাগ করছে।’

সোয়ামি নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, বললে, ‘খেপি! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,□— একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়? আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ,□— আমি চললুম!’

সে বাড়ির গোছগাছ না করে□— সেই অবস্থায়□— কাঁধে গামছা□—বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। অ্যায়!!!□— ডাকাতি করার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে□— মারো! লোটো! কাটো!

তুমি তো বারেবারে এই জীবনেই নতুন করে জন্মাতে চেয়েছ। এই কূপ থেকে আর একবার বেরিয়ে পড়ো। স্লেটের লেখার মতো অতীতকে মুছে দিতে না পারলে, বর্তমানকে ফেলে দিতে না পারলে, ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়া যায় না। কিছুকাল কিছু মানুষের সঙ্গে প্রারব্ধ ক্ষয় করে গেলে, এবার তবে চলো নতুন জন্ম নিতে।

কালির ফোঁটায় লেখা এইখানেই শেষ হয়েছে। এ কবেকার লেখা! কাল রাতের, না তারও আগের? মনে হয় কাল প্রথমরাতে এইসব লিখেছেন। তারপর জীবনের প্রিয় সঙ্গী এসরাজটিকে কাঁধে নিয়ে বসেছেন। শেষ ছড় টেনে জয়জয়ন্তীর করুণ সুরে রাতকে কাঁদিয়েছেন। আমি আধো-তন্দ্রায় সেই সুর শুনেছি।

ছোট্ট আর একটি নোট খাতা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সেই বিখ্যাত হিসেবের খাতা। পাতায় পাতায় পরম নিষ্ঠায় পাইপয়সা খরচেরও হিসেব লেখা। শেষ পাতায় নতুন একটি সংযোজন। গহনার তালিকা, বিছাহার, সাতনরি হার, বাজু, মানতাসা, টায়রা, রুলি, চুড়ি, ব্রেসলেট, আংটি। পরপর তালিকা নেমে গেছে নীচের দিকে। চল্লিশ ভরির মতো সোনা। গোটাকতক গিনিও আছে। সোনার রিস্টওয়াচ।

খাতার তলা থেকে ব্যাঙ্কের পাসবই উঁকি মারছে। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে প্রায় সত্তর হাজার টাকা পড়ে আছে। বড় কোম্পানির কিছু শেয়ারও কেনা আছে। বছরে বছরে ডিভিডেন্ড আসতে দেখি। বুকটা হঠাৎ দুধের মতো উথলে উঠল। সব আমার, সব আমার। আমি ধনী, ভিখিরি নই। সব সাজিয়ে রেখে গেছেন আমার জন্যে। আমার সামান্য একটি কথায় একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করলেন। কী অসম্ভব মনের তেজ! কী দুর্জয় অভিমান! দিনের

পর দিন আমি বসে থাকব এই ভগ্ন অট্টালিকায়। যা দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দশ কাঠা জমির ওপর। যক্ষের মতো আগলাব এইসব সোনাদানা। আর সেই মানুষটি পড়ে থাকবেন অজানা অঞ্চলে। কোনও অরণ্যে, কি পর্বতে, কি কোনও আশ্রমে। শীত আসবে, বসন্ত বিদায় নেবে, বর্ষার আকাশ মাথার ওপর গর্জন করবে। এদিকে ছাতে ফুলগাছের টবে টবে কুঁড়ির মুখ উঁকি দেবে। একটি-দুটি ফুল ফুটবে। আমি শুধু বসে থাকব সুখী যক্ষের মতো, আমার ভোগ নিয়ে, আমার ন্যাজে-খেলানো স্বভাব নিয়ে, আত্মদর্শন-ইচ্ছার মুখোশ পরানো দেহবাসনা নিয়ে। বিষকুম্ভ পয়োমুখং হয়ে বসে থাকব এই স্মৃতির সৌধে। ভাঙছে যখন ভাল করেই ভাঙুক। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক এই অভিশপ্ত বংশ। যা কিছু আছে সবই দান করে দিই আশ্রমকে। মানুষের চেষ্টায় যা গড়া সম্ভব হল না, গড়ে উঠুক ঈশ্বরের নামে। ওই লেখার পাশে আমিও তো লিখতে পারি, ঠাকুরের কথাতেই লিখতে পারি, 'বাপ কত বড় বস্তু! বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে! মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে।' সব ঋণ শোধ করে আমি অঋণী হয়ে যেতে চাই।

হরিশঙ্করের পুত্র হরিশঙ্করই হবে। এক প্রান্তে আপনি উঠুন, আর এক প্রান্তে আমি। সময় হলে দেখা হবে দু'জনে, কোনও অরণ্যে, কোনও পর্বতশীর্ষে, কোনও দেবালয়ে। তখন দু'জনেই দু'জনকে যাচাই করে নোব। কে কত দূর এগিয়েছে বিচার করবেন সেই তিনি।

কোণের দিকে ঠকাস করে একটা শব্দ হল। বলাইবাবু উলটে গেছে। যাবার আগে বলাইবাবুর একটা ব্যবস্থা করে যেতে হয়। পুকুরে ছাড়লে সর্বগ্রাসী মানুষ খেয়ে শেষ করে দেবে। নদীতে ছাড়লে অনিশ্চয়তায় হারিয়ে যাবে। চলো, তুমি যেখান থেকে এসেছিলে সেইখানেই ফিরে চলো। নাটক শেষ হয়ে গেছে বলাইবাবু। যবনিকা নেমে গেছে। দর্শকের আসন শূন্য। অভিনেতারা সবাই চলে গেছে। শূন্য মঞ্চে শুধু তুমি আর আমি। চলো, আর না। এখানে এবার শুরু হবে নতুন নাটক। সে কাহিনিতে তোমার আর আমার স্থান নেই।

বারান্দার কোণে ঝুড়িতে বলাইবাবুর খাদ্য। শাকপাতা, পাকা কলা। মানুষের হাতে শেষ খাওয়া খেয়ে যাও। বলাইবাবুর বেশ খিদে পেয়েছিল। শরীরের পাশ দিয়ে বিচিত্র মুখটি বের করে শাকের কুচি, কলার টুকরো টেনে নিতে লাগল। অবোধ জীব জানে না, এরপর কী হবে! কে-ই বা জানে। আমি-ই কি জানি, একটু পরে আমার কী হবে! কাল কি জানতুম, আজ আমার কী হবে!

খাওয়া হয়ে গেল? চলো, লক্ষ্মী ছেলে। তুমি ছেলে, না মেয়ে!

বলাইবাবুকে বুকের কাছে ধরে, পেছনের অন্ধকার-অন্ধকার, ভাঙা-ভাঙা-সিঁড়ি বেয়ে নীচে পাতকোতলায় নেমে এলুম। নতুন দিনের আলো লেগেছে গাছের পাতায় পাতায়। বহুকাল পরে বউ কথা কও এসে বসেছে নিমগাছের ঝিরিঝিরি পাতার আড়ালে। বড় অদ্ভুত ডাক। তার হলদে শরীর এক ঝলক নেচে গেল চোখের সামনে ঈশ্বরের খুশির মতো। কুয়োর স্থির জলে নিজের মুখের প্রতিচ্ছবি। বহু দূর থেকে বিষণ্ণ একটি মুখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সত্যিই আমি যেন জলে পড়ে গেছি। মন-কেমন করা একটা শীতলতা ওপর দিকে ঠেলে উঠছে।

বলাইবাবু আজকাল আর খোলের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে নেয় না। গলার কাছে তার মুখ খেলছে। ভিজেভিজে স্পর্শ। ভেষজ-ভেষজ গন্ধ। বলাইবাবু, ওই যে তোমার বর্তুলাকার জগৎ। ওইখান থেকেই তুমি এসেছিলে এক বর্ষার দুপুরে। যাও, আবার তুমি তোমার জল-জগতের নিঃসঙ্গ গভীরতায় ফিরে যাও। বড় মনকেমন করছে

বলাইবাবু। আর কোনওদিন তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে না। না, ওপর থেকে তোমাকে দুম করে ফেলব না। বালতিতে রেখে ধীরে ধীরে নামাব।

বলাইবাবু কিছুক্ষণ ভেসে রইল জলে। কূলকিনারা পাচ্ছে না। মাথাটা বৃত্তাকারে জলে ঘুরে গেল একবার, তারপর ডিগবাজি খেয়ে বলাইবাবু তলিয়ে গেল জলে। একরাশ বুড়বুড়ি ভেসে উঠল জলের ওপর। পিতৃদেব লিখে গেছেন, আমরা সব সময়ের বুদবুদ।

গোটাকতক কাক ডেকে উঠল খা-খা করে। সমস্ত পৃথিবী যেন শুকিয়ে গেছে। বড় তৃষ্ণার্ত ডাক।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়ছে। পিতৃদেব যে-উদ্দেশ্যেই যাত্রা করুন, আমার সঙ্গে ব্যবধান তাঁর ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কোথায় যেতে পারেন? হরিদ্বারে? বৃন্দাবনে? বিন্ধ্যাচলে? এই এত বড় একটা দেশ। হারাব মনে করলে অতি সহজেই হারিয়ে যাওয়া যায়।

চৌকির ওপর বসে চারপাশে একবার তাকালুম। কড়িকাঠে চারটে আংটা ঝুলছে। দূর অতীতে ওই আংটা থেকে ঝুলত একটা দোলা। সেই দোলায় শুয়ে শুয়ে হাতপা ছুড়ত একটি অসহায় শিশু। ওই যে ছবি, আমার মা। ডুরে শাড়ি পরে হাঁটু গেড়ে সেই দোলার পাশে বসে ধীরে ধীরে দোলাতেন, হাতের চুড়ি বেজে উঠত জলতরঙ্গের সুরে। ঘুমপাড়ানি গান গাইতেন চিরকালের সুরে, আয় ঘুম, যায় ঘুম, বর্গিপাড়া দিয়ে। তুমি আবার আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও মা। অতীতকে অলৌকিক কায়দায় টেনে আনো বর্তমানে। আবার একবার নতুন করে জীবন শুরু করি। যেসব ভুল এবারে করেছি, দ্বিতীয়বার আর তা করব না। না, তা বুঝি আর হয় না! জীবন টুথপেস্টের মতো। যা একবার বেরোয়, যতটুকু বেরোয়, ততটুকুই খরচ করে ফেলতে হয়।

পাশের অন্ধকার ঘর থেকে ঘড়ির চলনে টুপটুপ শব্দ ভেসে আসছে। এ শব্দ তো এতক্ষণ কানে আসেনি। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম। নীল কাচ বসানো জানলা দিয়ে বিষাক্ত আলো এসেছে। দেয়াল-ঘেঁষে সার সার কালির বোতল। একটার মুখে বিশাল এক ফানেল। টুপটুপ করে নীল কালি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। হলাহলের মতো। কী আশ্চর্য! যাবার আগে ফিল্টারে কালিও চাপিয়ে গেছেন। এ এখন সারাদিন ধরে পড়বে। বলেছিলেন, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, সেইখানেই আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম। তুমি সুখী তো!

রাস্তায় বেরিয়ে সময়টা একবার দেখে রাখলুম। বেলা এগারোটা। সদরের দরজায় সবচেয়ে বড় তালাটা ঝুলিয়েছি। যক্ষপুরীর তালা। শূন্য বাড়িতে কিছু না থাক, সোনা আছে, দানা আছে, আর আছে স্মৃতির স্তূপ। মনের ঝুলিতে ভরে স্মৃতি বহন করা যায়, পার্থিব সম্পদের জন্যে সিন্দুক চাই, তালা চাই।

ক্রমশ ব্যবধান বাড়ছে। মোড়ের মাথায় এসে বাড়িটার দিকে তাকালুম। বিমর্ষ ইটের স্তূপ রোদে পুড়ছে। মাথার ওপর শরতের নীল আকাশ। সাদা ভেলার মতো ভাসছে মেঘখণ্ড। পায়রা উড়ছে চিকচিক করে। আমার বাড়ি। যতই এগোচ্ছি, ততই যেন লোভ বাড়ছে। অসংখ্য অদৃশ্য হাত পেছন থেকে টানছে। দশ কাঠা জমি, বাড়ি, চল্লিশ ভরি সোনা, ষাট-সত্তর হাজার নগদ টাকা, কোম্পানির কাগজ, আমার চাকরি, পদোন্নতি, দেরাদুন। সাবুগাছ লাগানো সেই বাড়িতে একটি মেয়ে। মুকু যার নাম। আজ বললে কালই যে জলে নামতে প্রস্তুত। আবার ওই আংটা থেকে দোলার চেন নেমে আসবে। নির্জন শ্মশানসম বাড়িতে কচি প্রাণের ক্রন্দন শোনা যাবে। চুড়ির জলতরঙ্গ বেজে উঠবে। রং-বেরঙের শাড়ি ঝুলবে। চুলে চিরুনি চালাবার দীর্ঘ শব্দ শোনা যাবে, ঝাউয়ের ডালে নীল সমুদ্রের বাতাসের মতো। আমার তো ভোগই হল না, ত্যাগ হবে কী করে! আমার

লোটাকম্বলটি নিয়ে গেলেন যিনি পারেন তিনি। আমি হাঁটছি, হেঁটেই চলেছি, উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। মনের প্রান্তরে খুলে গেছে দুটি পথ, ডান দিক গেছে স্বামী নির্মলানন্দের দিকে বৈরাগ্যের পথ, বাঁদিক গেছে সেই সাবুগাছ-ঘেরা মনোহর নিকেতনে। সেখানে আছে জীবনসঙ্গিনী। মন, তুমি বামাচারী হবে! মুকুকে রেখে তুমি তো ভারত টুঁড়ে পিতৃদেবকে খুঁজে আনতে পারো। দেবসেবা, পিতৃসেবা দু'হাতে চালাতে পারো।

ঠাকুর বলেছেন, না পলাশ! তাঁকে জেনে— এক হাত ঈশ্বরের পাদপদ্মে রেখে আর এক হাতে সংসারের কার্য করো। যেকালে যুদ্ধ করতেই হবে, কেল্লা থেকেই যুদ্ধ ভাল। তোমরা ত্যাগ কেন করবে? বাড়িতে বরং সুবিধা, আহারের জন্য ভাবতে হবে না। সহবাস স্ব দারার সঙ্গে তাতে দোষ নেই। শরীরের যখন যেটি দরকার কাছেই পাবে। রোগ হলে সেবা করার লোক কাছে পাবে। জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ জ্ঞানলাভ করে সংসারে ছিলেন। এঁরা দু'খানা তরবারি ঘোরাতেন— একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্মের।

তা হলে! আমার দশ কাঠা জমি, রাস্তার ধারের বাড়ি, চল্লিশ ভরি সোনা, হার্ড ক্যাশ সত্তর হাজার, কোম্পানির কাগজ! জ্ঞান-সূর্যের উদয়ে, পিতৃদেবের অভিমান-শিশির উবে যাবেই। তিনি জ্ঞানী, হঠকারী নন। ফিরে তিনি আসবেনই, সংসারের টানে। অপেক্ষা করে দেখতে দোষ কী? হঠকারিতার আর এক নাম মূর্খতা।

বেশ, তা হলে তাই হোক। মুকুকে এনে কয়েকদিন পাহারায় রেখে, আমি অনুসন্ধানে বেরোই। চমৎকার সিদ্ধান্ত! মনের কথা শুনতে হয়! মনই তো ঈশ্বর! তা হলে বাঁ দিকেই ঘুরি।

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রদ্ধেয় বিঠ্ঠল রামানুজ
শ্রীচরণে

Does the road wind up-hill all the way?
Yes, to the very end.
Will the day's Journey take the whole long day?
From morn to night, my friend.

জগৎ যেমন চলছিল, ঠিক সেইরকমই চলছে। একজন মানুষের যাই হোক না কেন, বহু মানুষের তাতে কিছু যায় আসে না। পৃথিবী বড় উদাসীন। রাজপথ খোলা ফিতের মতো সুদূরে উধাও। ব্যস্ত মানুষ। ব্যস্ত যানবাহন। সবাই যাচ্ছে। কোথাও-না-কোথাও যাচ্ছে। দোকানপাটে গিজগিজ করছে মানুষ। রোদ যেন রুটি সেঁকছে। কাচের মতো আকাশ।

আমি হনহন করে অনেকটা হাঁটলুম। কোথায় যাব তা জানি না। পরামর্শ নেবার মতো কেউ নেই। হাঁটছি আর ভাবছি, থানায় যাব নাকি! একটা ডায়েরি করা যায়। তাতে যে ঘরের কথা বেরিয়ে আসবে। লজ্জার কথা। অফিসার প্রশ্ন করবেন, একজন প্রবীণ মানুষ হঠাৎ ভোররাতে বাড়ি ছেড়ে প্রায় একবস্ত্রে চলে গেলেন কেন? কী ঘটেছিল? একজন শিক্ষিত, সর্ব অর্থে সম্পন্ন মানুষ কেন চলে গেলেন? উপেক্ষা আর অত্যাচারের মাত্রা কতটা উঠেছিল? তুমি তো তাঁর ছেলে? কী এমন করেছিলে? নেশাভাং করো? কোনও নারীঘটিত কেলেঙ্কারি? আমি তার কী উত্তর দোব? আমি তো বোঝাতে পারব না, মহাশয়, সে এক অদ্ভুত আত্মিক সংকট! মনের সেই অবস্থা, যখন মনে হয় আমার সব থেকেও কিছু নেই। আমি রিক্ত, শূন্য, শ্রান্ত।

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল॥

এই তুমিকেই তো বোঝানো যাবে না। আমির সংসারে তুমি আবার কে? তারপর চাইবেন ছবি। জানতে চাইবেন, কোথায় যাওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আরও আধ মাইলটাক হাঁটার পর সিদ্ধান্তে এলুম, থানায় যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। থানার পরিবেশে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। সিদ্ধান্তে আসার পর আমার গতি মন্থর হল— তা হলে আমি চলেছি কোথায়! সারাভারত পদব্রজে ঘুরে বেড়ালেই কি আমার পিতা হরিশঙ্কর ফিরে আসবেন? তিনি হঠকারী নন। আবেগের বশে কোনও কাজ করেন না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মত, তাঁর সিদ্ধান্ত পালটায় না। ইস্পাত-কঠিন এক মানুষ। সব ছেড়ে, সব ঝুট হ্যায়, বলে চলে গেছেন। আমি থেমে পড়লুম। পথের পাশে কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায়। এলোমলো ভাবনা আমাকে উতলাই করছে, কোনও পথ দেখাতে পারছে না। পিতার খাতায় তাঁরই হাতে লেখা সেই লাইন ক'টি ফিরে ফিরে আসছে 'যে-কর্তব্যের মুখ চেয়ে এতকাল পুতুল খেলছিলে, তোমার সেই উত্তরপুরুষ

আজ তৈরি। জীবনের সুপথ, কুপথ, ঘুরপথ সবই চিনতে শিখেছে। স্নেহের শিকল কেটে এবার পাখিটিকে উড়িয়ে দাও। তার স্বাধীন ইচ্ছে তৈরি হয়েছে। আর তাকে প্রদীপের মতো আগলে রেখো না। এবার তাকে সাবালক হতে দাও। হাবুডুবু না খেলে সাঁতার শেখা যায় না। জেনে রাখো এক জঙ্গলে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। তুমি তো বৃদ্ধ বাঘ হে!'

হাঁটতে হাঁটতে আমি বাস রাস্তায় এসে পড়েছি। এদিকে ওদিকে বাসের ছোটাছুটি। হাঁ করে দেখছি সব। আমি যেন অন্য জগতের মানুষ। এইমাত্র পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছি অন্য কোনও গ্রহ থেকে। কোনও কিছুর সঙ্গেই আমার মনের যোগ নেই। জীবন্ত এক স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। অভিমানে ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠছে। পিতা পুত্রের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে পারেন! জগতের সামনে আমাকে কতটা ছোট করে গেলেন। তাঁর মনে যাই থাক, পৃথিবী তো এর অন্য ব্যাখ্যা করবে! সবাই বলবে, আমি তাঁকে তাড়িয়েছি। সবাই বলবে, আমার জন্যেই তিনি আলাদা হয়ে গেলেন।

আমি এখন যাই কোথায়? অফিস তো মাথায় উঠল। কলকাতার হস্টেলে মুকু আছে। আমার প্রেমিকা। আমার জন্যেই সে কলকাতায় পড়তে এসেছে। ঠুনকো প্রেম নয়। অনেকদিন ধরেই লালন-পালন করছে। মুকুর কাছে যাব বলেই বেরিয়েছিলুম। এখন মনে হচ্ছে কী লাভ! প্রেম বড় সুখী। আমার জীবনের ভিত ভূমিকম্পে দুলে উঠেছে। পায়ের তলায় জমি আছে বলে মনেই হচ্ছে না। সুখের বাগানে বসেই প্রেমের বাঁশি বাজানো চলে। মরুভূমির তপ্ত বালিতে, মনসা গাছের ঝোপের পাশে বসে সুন্দরী রমণীর সোহাগের কথা ভাবা যায় না। মানুষ তখন কোনওরকমে বাঁচার কথাই ভাবে। সংসার মানে সমর্থন। একা একা হয় না। সবাই হাত তুলে সমর্থন জানাবে, তবেই না আনন্দ। প্রেম মানে আনন্দ, প্রেমানন্দ।

আমি জানি, এখনই মুকুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, সে চলে আসবে। কোনও কিছুর পরোয়া করবে না সেই বেপরোয়া মেয়ে। বাড়ির সদরের বিশাল তালা খুলে, মুকুকে নিয়ে আমি সেই নিরানন্দ পুরীতে গিয়ে ঢুকতে পারি। হাসতে পারি, গাইতে পারি, ভোজসভা বসাতে পারি। মনে মনে ভাবতে পারি কে কার পিতা! সাধ করে কেউ বৈরাগী হতে চাইলে, আমি কী করতে পারি! আমি সানাই বাজিয়ে, আলোর মালা ঝুলিয়ে মুকুকে বিয়ে করতে পারি। আমি চাকরি করি। আমার পদোন্নতি হয়েছে। দেরাদুনে আমি বদলি হয়েছি। সেখানে নতুন যে লেবরেটারি হচ্ছে, আমি তার ভারপ্রাপ্ত। ব্যাঙ্কে জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে সত্তর হাজার টাকা। ষাট-সত্তর ভরি সোনা বাড়িতে মজুত। আমি তো বড়লোক। আমি যদি সত্যসত্যই একটা স্কাউন্ড্রেল হতুম আমার এই মনস্তাপ হত না। বরং আনন্দে নাচতুম, সব আমার। আমি রাজা। আমি মালিক।

আমি তা পারব না। কোথায় কোন সুদূরে আশ্রয়হীন এক মানুষ আকাশবৃত্তি করে দিন কাটাবেন, আর আমি থাকব সুখশয্যায়, যুবতীর নরম বুকে মুখ গুঁজে? এ হতে পারে না। তিনি পথে নেমে আমাকেও পথে নামার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

ব্যস্তসমস্ত লোকজন আমার চারপাশ দিয়ে চলেছে পৃথিবীর কাজে। জীবনসমুদ্রে আমি দাঁড়িয়ে আছি নিঃসঙ্গ নাবিকের মতো। আমার জাহাজের হাল ভেঙে গেছে। কম্পাসের কাঁটা খুলে পড়ে গেছে। কিন্তু বিষয় কী সাংঘাতিক জিনিস! হঠাৎ মনে হল, বাড়িতে কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস পড়ে আছে, আর আমি এক সামান্য তালার ভরসায় বাড়ি ফেলে রেখে কোথায় চলেছি! কতদিনের জন্যে চলেছি!

আমি যক্ষ। আমার পিতা আমাকে যক্ষ করে রেখে চলে গেলেন। এ কী ভয়ংকর শাস্তি! সকাল থেকে এক কাপ চা-ও পড়েনি পেটে। খিদেতে নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। ঠান্ডা জলে স্নান করার জন্যে শরীর ছটফট করছে। গাছের ছায়া ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও আর ভাল লাগছে না। অবশেষে নিজের সঙ্গে একটা সমঝোতা হল। কোনও ব্যাপারেই হঠকারিতা ভাল নয়। আগে বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সোনাদানার একটা সুরক্ষার প্রয়োজন।

আবার আমি উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। পরামর্শ নেবার মতো একজন কাছের মানুষের নাম মনে পড়েছে। তিনি হলেন বিষ্টুদা। এতক্ষণ ওই নামটা কেন মনে পড়েনি! মাইলটাক হেঁটে বিষ্টুদার দোকানে এসে হাজির হলুম। দোকান প্রায় খালি। আজ অফিসবার। এইসময় কে আর দোকানে থাকবে! বিষ্টুদা সবে টিফিন করতে বসেছেন। তাঁর টুকটুকে ফরসা মেয়েটি খাবার এনেছে বাড়ি থেকে। বিষ্টুদার প্রিয় খাবার, পরোটা, আলুর তরকারি। আমি ধপাস করে একটা বেঞ্চে বসে পড়লুম। আমার আর ক্ষমতা নেই।

একটা ঢোঁক গিলে বিষ্টুদা বললেন, কী হল? আজ তোমার ছুটি নাকি?

আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। সবার আগে এক কাপ চা চাই। সকাল থেকে আমার এক গেলাস জলও জোটেনি।

সেকী? পরোটা খাবে? কৌটোয় আছে। খুব ভাল খেতে হয়েছে। টিপের মা খুব ভাল রাঁধে।

বিষ্টুদার মেয়ের নামটা খুব সুন্দর, টিপ। পরোটা আমার খুব প্রিয় খাদ্য। পেট খালি। আগুনের মতো জ্বলছে। বললুম, খাব। আরও বললুম এই কারণে, আজ আর অন্য কিছু জোটার আশা নেই। কে রাঁধবে! উনুন ধরিয়ে রান্না চাপাবার মতো মনের অবস্থা আমার নেই।

টিপ হাসিমুখে অ্যালুমিনিয়ামের গোল টিফিনকৌটোটা আমার হাতে তুলে দিল। টিপের বয়েস হবে তেরো থেকে চোদ্দোর মধ্যে। অপূর্ব সুন্দরী। এই মেয়ের জন্যে বিষ্টুদার ভাবনার শেষ নেই। চারপাশের পরিস্থিতি ক্রমশই খুব জটিল হয়ে উঠছে। যুবশক্তি জেগে উঠেছে তো! পুলিশ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়। টিপকে দেখলে কেবলই মনে হয়, আমার যদি ওইরকম একজন বোন থাকত!

ময়ান দেওয়া ময়দার বাদামি করে ভাজা পরোটার একটা টুকরো মুখে তুলতে গিয়ে আমার হাত থেমে গেল। কেমন করে খাব! কেবলই পিতার কথা মনে পড়ছে। এই মুহূর্তে তিনি কোথায়! তিনি তো পথেঘাটে দিন কাটানোয় অভ্যস্থ নন। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অতিশয় খুঁতখুঁতে। বারেবারে চা খেতে ভালবাসেন। নিজস্ব বাথরুম ছাড়া অস্বস্তি বোধ করেন। মানুষের সঙ্গে তেমন মিশতে পারেন না। গ্রাম্য আলাপ-আলোচনা অপছন্দ করেন। এমন একজন মানুষ কেমন করে সন্ন্যাসী হবেন! সহসা গুরু বলে কারওকে মানতে পারেন না। তাঁর পক্ষে আশ্রমজীবন তো অসহ্য হবে! অভুক্ত, অস্নাত সেই মানুষটির মুখ আমার চোখে ভেসে উঠেছে। পরোটা খাই কেমন করে! হাত ঠোঁটের কাছে উঠছে, আবার নেমে আসছে।

টিপ দেখছিল। বললে, তুমি খেতে পারছ না কেন? ঘেন্না করছে?

আমি তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। চোখে জল এসে গেল।

তুমি কাঁদছ?

বিষ্টুদা আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, একী? সত্যিই তো তুমি কাঁদছ। কী হয়েছে?

পরোটার টুকরোটা আলুর তরকারি সমেত মুখে ঢুকিয়ে দিলুম। এককথায় উত্তর দেবার মতো সহজ ঘটনা ঘটেনি।

বিষ্টুদা বললেন, ব্যাটাছেলে যখন কাঁদে তখন বুঝতে হবে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে।

পরোটা দু'খানা কোনওরকমে খেয়ে ফেললুম। টিপ বাটি, কৌটো, যাবতীয় সব নিয়ে বাড়ি চলে গেল। বিষ্টুদা বেশ তরিবাদি করে দু'কাপ চা করলেন। চা খেতে খেতে পুরো ঘটনাটা বিষ্টুদাকে বললুম। কোনও ঝগড়া নয়, কথা কাটাকাটি নয়, তেমন কোনও ভুল বোঝাবুঝি নয়। হঠাৎ সব ছেড়ে, যতদূর মনে হয় একেবারে শেষরাতে আমার সর্বাধিক প্রিয়, শ্রদ্ধেয় বাবা, কোনও নির্দেশ না রেখে, কোনও হদিস না দিয়ে চলে গেলেন।

আমাদের দু'জনের জীবন খুব একটা সুখের ছিল না। অর্থের জন্যে নয়। অর্থের অভাব আমাদের ছিল না। ধনী না হলেও গরিব ছিলুম না আমরা। মৃত্যু। মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাদের সংসারের খোঁটা নড়িয়ে দিয়ে গেছে। সব এলোমেলো, ছত্রাকার। কোথাও একটা আদর্শের সংঘাতও ঘটছিল। একটা সন্দেহ খেলা করছিল দু'জনের মনে। সেই সন্দেহের উৎস নারী। বিষ্টুদাকে সব কথা বলা গেল না। বলতে পারা গেল না। সন্দেহের মধ্যে একটা নীচতা থাকে যে! যাকে সন্দেহ করা হয় তার কিছু নয়, যে সন্দেহ করে সে-ই ছোট হয়ে যায়, সংকীর্ণ হয়ে যায়। আমি কিছুতেই বলতে পারলুম না, তবলাবাদক প্রফুল্লবাবু, যিনি আমার পিতার আশ্রয়ে ছিলেন, সন্দেহজনক অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন, সেই ভদ্রলোকের স্ত্রীকে ঘিরে পিতা-পুত্রে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হচ্ছিল। বলতে পারলুম না আমি নিজে একটা কামুক, লম্পট। ভাবটা দেখাই সন্ন্যাসী হতে চাইলেই হতে পারি। আমি এক মহা ধার্মিক, বেদান্তবাদী, ত্যাগী। সাধুসঙ্গ করি। এটা আমার মুখোশ। আসলে আমি এক দুর্বলতম যুবক। কোপন স্বভাবের ভয়ংকর এক চরিত্র। বয়স, সম্পর্ক কিছুই আমি মানি না। দেহবাদী শয়তান আমি। সুযোগ পেলে যে-কোনও কুকর্ম আমি করতে পারি। আমার মুখ দেখে মনের ভাব পড়ার উপায় নেই। আমার ভেতর দুটো মানুষ বাস করে, সাধু আর শয়তান। সেই শয়তান কিন্তু প্রফুল্লবাবুর স্ত্রীতে আসক্ত। সেই নারী আবার পিতার ওপর নির্ভরশীল। দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র। ব্যাপারটা অতিশয় জটিল। পিতা হরিশঙ্কর পর্বতের মতোই অচল অটল। তাঁর মন বোঝার সাধ্য কারও নেই। তিনি গুপ্তযোগী। কিন্তু! এর মধ্যে একটা কিন্তু এসে হাজির হয়েছে। হঠাৎ আমার মনে হয়েছে, ব্রহ্মচারী পিতা কিঞ্চিৎ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। আমার পরলোকগতা মাতার স্মৃতি ক্রমশ ম্লান থেকে ম্লানতর হয়ে আসছে। সংসারের সমস্ত কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছে ওই মহিলার হাতে। ওই মহিলা আমার পিতাকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছিলেন। ওই নিঃসন্তান মহিলার কামনা-বাসনা নির্বাপিত হয়নি। যৌবন বিদায় নেয়নি তাঁর শরীর থেকে। মুহূর্তে তিনি বাঘিনী হতে পারেন। একদিন ওই মহিলা আমারই এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে শরীর দান করেছিলেন। অক্লেশে। সেই দুর্বার আকর্ষণে আমি বড় অসহায় বোধ করেছিলুম। সেই ছিল আমার জীবনের প্রথম যোষিৎ সংসর্গ। একই সঙ্গে প্রচণ্ড পাপবোধ আর পরমানন্দে আমি দীর্ণ হয়েছিলুম। সেইরাতেই একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, সম্পর্ক যাই হোক আমরা স্বামী-স্ত্রী। বয়সের ব্যবধান বিচারের বিষয় নয়। আমি ভালবাসি, তুমিও ভালবাসো। কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সেই মহিলা এক ত্রিভুজ তৈরি করে বসলেন। পিতার কঠিন বর্ম ভেদ করে জয় করে ফেললেন তাঁর মন। আমার মায়ের আঁচলে যে চাবির গোছাটি বাঁধা থাকত সেটি চলে গেল তাঁর আঁচলে। যেসব স্মৃতিতে আমরা ছাড়া বাইরের কারও হাত দেবার অধিকার ছিল না, সেই সব বস্তু তিনি নিঃসংকোচে নাড়াচাড়া করতে

লাগলেন। আমার মায়ের জামাকাপড় সব টেনে টেনে বের করছেন, ঝাড়ছেন, গুছোচ্ছেন, প্রশ্ন করছেন। আমাদের সমস্ত গোপনীয়তার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছেন। একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার অযাচিত প্রয়াস। অবশেষে আমাকে রূঢ় হতে হল। কেন হলুম! আজ এই মুহূর্তে, বিষ্টুদাকে বলতে বসে সেই প্রশ্নের উত্তর পেলুম। ঈর্ষা। প্রচ্ছন্ন কাম। প্রবল অধিকারবোধ। জৈব তাগিদ। হাড়ে মজ্জায় লুকিয়ে বসে থাকা রিরংসা। কেন এই বিকৃতি? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরও আমি যেন দিতে পারছি নিজেকে। বড় আগলে আগলে মানুষ করা হয়েছিল মা-মরা এই ছেলেটিকে। পৃথিবী থেকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। চেষ্টা করা হয়েছিল দেবোপম করার। নানাভাবে ঠেলার চেষ্টা হয়েছিল ব্রহ্মচর্যের দিকে। সন্ন্যাসীর আদর্শের দিকে। শৈশব থেকেই যে মা-হারা, যার পরিবারে শুধুই পুরুষ, নারী তো তার কাছে এক দুর্বার কৌতূহল। স্বাভাবিক থেকে যে বঞ্চিত, সে তো অস্বাভাবিকের দিকে ছুটবেই। মহাপুরুষ সে হবে কী করে? সে কি হওয়া যায়? হয়ে আসে।

বিষ্টুদা বললেন, মনমরা হয়ে বসে থেকো না। যা হয়েছে তা হয়েছে। যা হবে তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো। সবচেয়ে বড় ভুল করেছ ওই মহিলা, মানে তোমার পাতানো কাকিমাকে মামার সঙ্গে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে।

তা না হলে যে বাবার নামে যা-তা বদনাম হচ্ছিল। আপনি জানেন, ডাকে একটা পারসেল এসেছিল? এই পাড়ারই কোনও বদমাশ পাঠিয়েছিল। সেই পারসেলের মধ্যে ছিল যৌনবিজ্ঞান, আর একটা চিঠি। অশ্লীলতম সেই চিঠি। কী লেখা ছিল জানেন? 'নিজে কিনতে লজ্জা পাবেন ভেবে আমরা উপহার পাঠালুম। যে-বউভাত হল না, মনে করুন এটি সেই বউভাতেরই উপহার। খাওয়াটা পাওনা রইল মাইরি। অন্নপ্রাশনে যেন বাদ না পড়ি। বুড়ো হাড়ের ভেলকি দেখি!'

বিষ্টুদা উত্তেজিত হয়ে টুল ছেড়ে উঠে পড়লেন। এগিয়ে গেলেন চা তৈরির টেবিলটার দিকে। নিজের মনেই বললেন, দুনিয়াটা শালা ভগবানের চিড়িয়াখানা! নেই কাজ তো খই ভাজ।

দু'কাপ চা তৈরি করে, এক কাপ আমাকে দিলেন, এক কাপ নিজে নিলেন, বুঝলে, এই পাড়াটা একেবারে থার্ডক্লাস হয়ে গেছে।

এটা করেছে, ওই মহিলার সেই লম্পট মামাশ্বশুরটা।

মিস্টার বার্নিশ?

মিস্টার বার্নিশ মানে?

বার্নিশ করা জুতো পরে না? পাইপ লাগিয়ে সিগারেট খায়! গুরুদেব লোক। যুদ্ধের সময় মিলিটারি ইউনিফর্ম সাপ্লাই করে বহুত পয়সা কামিয়েছিল। তোমার ওই প্রফুল্লকাকা তো ওই বাড়িতেই ছিল। অনেকদিন ছিল, তারপর আর পারলে না। লোকটা একটা অমানুষ। আজ বাদে কাল ঘাটে যাবে এখনও খিদে গেল না। ভগবান এসব লোককেই বড়লোক করেন। কী বিচার মাইরি! সাধু মরে ভিক্ষে করে, শয়তানে মারে চামরমণি চাল।

বিষ্টুদা আবার টুলে এসে বসলেন। হাতে চায়ের কাপ। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে তা হলে দেখাশোনা করার কেউ রইল না?

নাঃ, একেবারে একা। আপনি আমাকে বলুন, এখন আমার কী করা উচিত! আমি একটা তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। অনেক দূর চলেও গিয়েছিলুম, শেষে আপনার পরামর্শ নেব বলে ফিরে এলুম। আমার মাথায় আসছে না কিছু। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করি।

তোমার সঙ্গে আমার মনে হয় পূর্বজন্মের কোনও সম্পর্ক ছিল। আত্মহত্যার কথা মনেও এনো না। কাপুরুষতা। জানো তো আমারও কেউ ছিল না। একেবারে অনাথ। মামার বাড়িতে পাত কুড়িয়ে মানুষ। লেখাপড়া ছেলেবেলায় হল না কেউ স্কুলে ভরতি করলে না বলে। চেহারাটা ভাল ছিল, কিছুকাল যাত্রাদলে নায়ক হয়েছিলুম। চরিত্রটা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে পালিয়ে এলুম। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখলুম। ছাপছোপ নেই, কিন্তু খুব একটা অশিক্ষিত নই। জীবন হল ঠান্ডা মাথায় অঙ্ক কষা। দেখেশুনে পথ চলা। গর্তটর্তে পড়লেই বিপদ, আর পথে অনেক গর্ত থাকবেই। আপাতত তুমি একটা কাজ করো। বাড়ি যাও। চান করো। দাড়ি কামাও। বাবার চলে যাওয়াটা পাঁচকান কোরো না। চেষ্টা করো নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে। যেন কিছুই হয়নি। আজ দুপুরে তুমি আমার বাড়িতে খাবে। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা দু'জনে একটা প্ল্যান করব।

আপনার বাড়িতে খেতে আমার লজ্জা করবে।

তার মানে তুমি আমাকে ঠিক আপন ভাবতে পারছ না। আর তা না হলে, আমাদের বাড়িতে খেতে তোমার ঘেন্না করছে। জাতের বিচার আসছে।

জাত আমাদের পরিবারের কেউই মানে না, বিষ্টুদা। ঠিক আছে, আমি সব সেরে আসছি।

সেই বিপুল বিশাল তালাটা খুলে আবার আমার গৃহপ্রবেশ। মন চাইছে না। পা যেন আর চলছে না! এ যেন বইয়ের মলাট খুলে অক্ষর হয়ে যাওয়া। সারা বাড়িটা যেন স্তব্ধ সংগীতের মতো। প্রতিটি ইট যেন কথা বলতে চাইছে। প্রতিটি কোণে যেন ঘটনা জমে আছে। অজস্র ঘটনা। বিশাল এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে। বহুদিন আগের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে। ইঁদুরকল পাতা হয়েছিল। ভোরে উঠে দেখি ছোট্ট একটা ইঁদুর সেই কলে পড়েছে। পুঁতির মতো উজ্জ্বল দুটো চোখ। ভেলভেটের মতো মসৃণ চকচকে গা। ইঁদুরটা একেবারে শেষ মাথায় বসে আছে ভয়ে ভয়ে। মৃত্যুকে সবাই চেনে। নির্বোধ ইঁদুরও। কলটার সামনে গিয়ে বসতেই করুণ চোখে ইঁদুরটা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পেরেছিল, আমি এক ঘাতক। ইঁদুরটাকে আমি মারতে পারিনি। ছেড়ে দিয়েছিলুম। কী আর করবে! কিছু বই আর কাগজ কাটবে। বাড়িতে পা দিয়েই মনে হল, আমি সেই কলে-পড়া ইঁদুর। বিশাল এক কলে একা পড়ে আছি।

ঘরের আলনায় বাবার জামাকাপড় হ্যাঙারে ঝুলছে। সমস্ত জামা আর কাপড় পাট করে আলমারিতে তুলে রাখলুম। কী পরে গেছেন বুঝতে পারছি না। চটিজোড়া পড়ে আছে। নিউকাটটা নেই। একবার সন্দেহ হল, বাড়ির কোথাও নেই তো? মন কত অবুঝ! সত্যকে মেনে নিতে পারে না। গোটা বাড়িটা আবার আমি ঘুরে এলুম। বাথরুমে উঁকি মারলুম। নীচের সমস্ত ঘর। নীচের যে-ঘরে কাকিমা থাকতেন, সেই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলুম। চৌকি। তার ওপর পুরু বিছানা। নিপাট চাদর। কাকিমা সবই ফেলে রেখে গেছেন! সামান্য কিছু নিয়ে গেছেন, যা না নিলেই নয়। সাধের সেই আয়নাটা পড়ে আছে কুলুঙ্গিতে। চিরুনি। চুলবাঁধার ফিতে। বড় একটা পাউডারের কৌটো। সিঁদুর। একপাতা টিপ। মেয়েলি যত কিছু সব পড়ে আছে। এসবের

আর কোনও প্রয়োজন নেই সেই মহিলার, কারণ তিনি বিধবা হয়েছেন। সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, নিঃসন্তান এক মহিলা।

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হল, সংসারের যে ছেঁড়া টুকরোটি অবশিষ্ট ছিল, আমিই সেটাকে শেষ করে দিয়েছি। আর কিছু করার নেই। উঠে এলুম নির্জন দোতলায়। বাবার পড়ার টেবিলে রাজ্যের বই, নোটখাতা। একটু গোছগাছ করে রাখার চেষ্টা করলুম। যদি কোনওদিন ফিরে আসেন হঠাৎ। জানি সে সম্ভাবনা খুবই কম। তিনি এগোতে জানেন। পেছোবার মানুষ তিনি নন।

যে-মেয়েটি কাজ করে সে এসে তালা ঝুলতে দেখে ফিরে গেছে। গত রাতের এঁটো থালাবাসন সব পড়ে আছে। ওগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। আমার এখন গুটোবার সময়। ফলাও করে ফেঁদে বসার দিন চলে গেছে।

বেশি না, গোটাকতক বাসন। কুয়োতলায় টেনে নিয়ে মাজতে বসে গেলুম। একবার গভীর জলের দিকে তাকালুম। এই কূপ থেকেই ঘনঘোর এক বর্ষার দুপুরে বলাইবাবু উপচে পড়েছিল। কচ্ছপ। কেমন পোষ মেনেছিল? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলুম! কচ্ছপ, কিন্তু ভীষণ ভদ্রলোক। সারা বাড়িতে আপন মনে ঘুরে বেড়াত। আবার কেমন? বলাইবাবু বলে ডাকলে, যেখানেই থাকুক, গুটিগুটি ঠিক ছুটে আসত। বাড়ি ছেড়ে চিরতরে চলে যাচ্ছি ভেবে, সকালে বলাইবাবুকে আবার কুয়োর মধ্যেই নামিয়ে দিয়েছিলুম। এখনও সে কি ওইখানেই আছে! বহুদিন জল ছাড়া। মরে গেল না তো! বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম, যদি একবার দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্যে! বারকতক ডাকলুম, বলাইবাবু, বলাইবাবু! জল এক অন্য জগৎ। শব্দ সেখানে পৌঁছোবে না। এই ছোট্ট কূপে বলাইবাবু কি বেঁচে থাকবে! তেমন পরিসর তো নেই! মরেই যাবে হয়তো! তার জীবনে এতকাল আমরাই হয়েছিলুম সঙ্গী। কত কী খেত! তার জন্যে বিশাল বড় মাটির গামলায় জল রাখা হত টইটম্বুর। মাঝে মাঝে সেই জলে নেমে সাঁতার কেটে আসত। ওই কূপে তার তো কোনও খাদ্য নেই!

বাসন মাজা হয়ে গেল। ভাল করে মুছে যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলুম। বেশ বুঝতে পারছি, এই বাড়িতে একা আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না। সে প্রশ্নও নেই। চাকরিটা আমি যদি না ছাড়ি, তা হলে আমাকে দেরাদুনে গিয়ে নতুন দায়িত্ব নিতে হবে। সেইখানেই ফেঁদে বসব নতুন ব্যবস্থা। উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি সম্ভব-অসম্ভব নানা কিছু ভাবতে লাগলুম। কোনও হদিশ না রেখে বাবার এই চলে যাওয়া, এ তো মৃত্যুরই সামিল। তিনি নেই। যদি সন্ন্যাস নেন, তা হলেও নেই। সংসারের কাছে তিনি অবর্তমান। তা হলে? তা হলে আমাকে তো আমার স্বাধীন পথেই চলতে হবে। এ সংসারে কে কার? একমাত্র আমিই আমার। তাঁর অভিমান থাকতে পারে, আমার অভিমান থাকতে পারে না! পিতাই এখন আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার জ্যাঠামশাইয়ের ভায়রাভাইয়ের ছোট মেয়ে মুকু। মুকুর দিদি কনককে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম। সে ছিল আমার মনের মতো। তার চাবুকের মতো শরীর। তার রসবোধ, পরিমিতিবোধ, আপন করে নেবার ক্ষমতা আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। সেই কনক কিন্তু আমাকে ছেড়ে চলে গেল। শুধু আমাকে নয়, চলে গেল সংসার ছেড়ে। মনে হয়েছিল কনকও আমাকে ভালবাসে। আমার সে ধারণা ভুল। নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়। আমাকে ভালবাসলে কী ক্ষতি হত তার! আমি যে তাকে ভীষণ ভালবাসতুম। যে ভালবাসে মেয়েরা তাকে ভালবাসবে না। কিছুতেই না, কোনও দিনও না। এইটাই নিয়ম। যে ঘৃণা করবে, তাকেই জয় করার

জন্যে এগিয়ে যাবে। সব লিভিংস্টোনের জাত। ডার্কেস্ট আফ্রিকা ছাড়া কিছুই মনে ধরে না। মুকুকে আমি তেমন ভালবাসতুম না, অথচ সেই মুকুই আমার জন্যে কলকাতায় চলে এল কায়দা করে, এম এ পড়ার ছুতোয়।

এই মুকুকে আমি এই মুহূর্তে বিয়ে করে, দেরাদুনে গিয়ে শুরু করতে পারি আমার সর্বোত্তম নতুন জীবন। তোফা জীবন। পাহাড়ের কোলে সুরম্য বাংলো। টিয়াপাখি রঙের একটা গাড়ি, দু'পা দূরে মুসৌরি। তিন পা দূরে হরিদ্বার।

মাঝে মাঝে মানুষ দিবাস্বপ্ন দেখে। কল্পনায় প্রাসাদ রচনা করে। কারও কল্পনা বাস্তব হয়, কারও হয় না। ভেলভেটের বাক্সে জড়োয়ার অলংকারের মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। মাঝে মাঝে জীবনের অলস মুহূর্তে বের করে নাড়াচাড়া করে। আবার তুলে রেখে দেয়। তাতেও কত সুখ! পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার আনন্দ প্রভূত। বিষণ্ণতার চেয়ে একান্ত উপলব্ধি আর কী আছে! আমার বন্ধুর লেখা একটি কবিতা মনে পড়ছে:

শুরু না সমাপ্তি ভাল অথবা খারাপ
প্রতিটি প্রহর পল অনুপল মৃত্যু না জীবন
পৃথিবী যশোদা মাতা অথবা পুতনা
ভালবাসা শেষ হলে স্বস্তি না বিষাদ
কে আগে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে যায় পঙ্গু না সক্ষম।

Good night? ah! no, the hour is ill
Which severs those it should unite

স্মৃতির চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু নেই। বাথরুমের দরজার ফ্রেমে একটা ছোট পেরেক। সেই পেরেকে ঝুলছে টুথব্রাশ। বাবার টুথব্রাশ। নিয়ে যাননি সঙ্গে করে। বাড়িতে পরার চটি দরজার পাশে। কলম, রুমাল, পকেটঘড়ি। প্রিয় বই, নোটখাতা। হিসেবের খাতা। বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করামাত্রই কী অদ্ভুত এক নির্জনতা নেমে এল। হিমশীতল জল। যেন মৃত্যুর সঙ্গে, বিচ্ছেদের সঙ্গে কোলাকুলি। গায়ে জল ঢেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশাল বড় গোলমতো গায়ে মাখার সাবান জলে গলছে। গোলাপের গন্ধ। এই সাবান বাবার খুব প্রিয়। ইংরেজ আমলে সাবান আসত বিলেত থেকে। টার্কিশ বাথ সোপ। কেমিস্ট মানুষ। সাবান, পারফিউম, ট্যালকম পাউডার, ফেসক্রিম— এইসব খুব ভাল বুঝতেন। নিজে তৈরিও করতে পারতেন। সাবান তৈরির উপায় ছিল না, বড় প্ল্যান্টের প্রয়োজন। বয়লার চাই। বাষ্প খাওয়াতে হয় সাবানকে। আমাকে শেখাতেন, সাবানের সিজনিং কাকে বলে! সাবানে বুড়ো আঙুলের নখ বসিয়ে দেখবে, কড়কড় করে গুঁড়ো গুঁড়ো উঠলে বুঝবে, সিজনড সাবান। জাত ভাল। বাজার চুঁড়ে দিশি সাবানের মধ্যে এই সাবানটাকেই তাঁর মনে হয়েছিল প্রায় বিদেশির মতো। কত শৌখিন মানুষ ছিলেন! সবাই বলত, এ ম্যান অফ টেস্ট।

চৌবাচ্চার পাড়ে সাবানগোলা জল সাবানটাকে ঘিরে বৃত্তাকারে ছড়াচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল আত্মহত্যা করলে কেমন হয়। নির্জন বাড়ি। কেউ কোথাও নেই। অনেক উঁচুতে একটা জানলা। তার বাইরে ঝোপঝাপ গাছের জটলা। শালিকের কর্কশ চিৎকার। এমন একটা ভিজেভিজে, মনমরা জায়গায় ঝুলে পড়তে মন্দ লাগবে না। ভীষণ একটা প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে করছে। কিন্তু কার ওপর? বড় মায়া নিজের জীবনের ওপর। সুন্দর সুন্দর দেশ দেখব। জীবনে বড় হব। আরও বড়। কত মানুষের সঙ্গে আলাপ করব। মেয়েদের ভালবাসা পাব। মানুষের প্রশংসা কুড়োব। এত সহজে শেষ করে দিলে চলে! স্নান শেষ হল।

অজস্র জানলা, দরজা। সব একে একে বন্ধ করলুম। ছাদের দরজা বন্ধ করতে গিয়ে ফুলগাছের টবগুলোর দিকে নজর চলে গেল। ঋতু ঘুরছে। রোদ নরম হয়ে আসছে। চন্দ্রমল্লিকায় এইবার ফুল আসবে। কে দেখবে! কে পরিচর্যা করবে! প্রেমিক যে সব ফেলে রেখে চলে গেছেন। কী নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে?

পিতার শিক্ষা তো ভোলা যায় না। এক বাক্স মিষ্টি কিনে নিলুম। বিষ্টুদার বাড়িতে তো শুধু-হাতে যাওয়া যায় না। টিপ দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা। আমার কথা বোধহয় কিছু শুনেছে, তাই মুখে সেই সুন্দর হাসিটা লেগে নেই। বিষণ্ণ, থমথমে মুখ। জিজ্ঞেস করলে, আপনি এত দেরি করলেন? বাবা আর মা খুব ভাবছেন।

ভেতর থেকে টিপের মায়ের গলা ভেসে এল, হ্যাঁরে, এসেছে?

ছোট্ট একটা উঠোন। একপাশে একটা কলকে গাছ। ফুলে ফুলে হলুদ হয়ে আছে। ঝোলাগুড়ের মতো রোদ মাখামাখি হয়ে আছে চারপাশে। অনেকদিন বৃষ্টি হয়নি। মাটিতে ফাট ধরেছে। ঘাস ফুরফুর করছে। বিষ্টুদার বাড়িতে আগে কখনও আসিনি। মাঠকোঠা। চারপাশ তকতকে পরিষ্কার। দাওয়ার লাল মেঝে আয়নার মতো চকচক করছে। দুটো ভেলভেটের আসন পাশাপাশি পাতা। দু'গেলাস জল চাপা দেওয়া। কাঁসার গেলাস দুটো সোনার গেলাসের মতো ঝকঝক করছে।

টিপের মা যে এত সুন্দরী আমার জানা ছিল না। মা আর মেয়েকে প্রায় একই রকম দেখতে। সাধে বিষ্টুদা কবিতা লেখেন! গোটা পরিবার যেন সুখ আর শান্তির কোলে ঢলে আছে। ঘরদোর সব ছবির মতো সাজানো। সত্যিই, সুখ হল ঈশ্বরের দান। পূর্বজন্মের সুকৃতি। পরিষ্কার ধুতি আর গেঞ্জি পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি বিষ্টুদা।

আমার হাতদুটো ধরে বললেন, এসে গেছ ভাই? আমি ভাবছিলুম, তুমি বোধহয় আর এলে না!

বিষ্টুদা আমাকে ধীরে ধীরে সাবধানে দাওয়ায় তুলে আনলেন, যেন না আনলে আমি পড়ে যাব। ভালবাসার স্পর্শ বেশ বোঝা যায়। একটা অনুভূতি ছড়িয়ে যায় সারা শরীরে। এমন ভালবাসার স্পর্শ আগে আমি কখনও পাইনি। শাসন পেয়েছি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পেয়েছি। আঁতে ঘা মারা কথা সহ্য করেছি প্রচুর। আদর্শের ট্র্যাক্টর কুদলে দিয়েছে আমাকে। আতঙ্ক ছাড়া আমার জীবনে কিছুই তো ছিল না। পেপারওয়েট চাপা এক খণ্ড কাগজের মতো আমার জীবন।

জুতোটা খুলে দরজার পাশে রাখো। সাবধানে ঘরে এসো, আমাদের চৌকাঠ আবার উঁচু উঁচু।

বিষ্টুদার কত দিকে নজর। ঘর নয় তো, দেবালয়। খাটের ওপর টানটান করে পাতা নকশি চাদর। দুধসাদা কয়েকটা বালিশ। সমস্ত জিনিসপত্র নিখুঁত করে গোছানো। পেতলের জিনিস সব ঝকঝক করছে। রাধাকৃষ্ণ, ফুলদানি, মা লক্ষ্মী, গণেশ। দেয়ালে একটি মাত্র ক্যালেন্ডার, মা দুর্গার। কোথাও কোনও প্রাচুর্য নেই, অথচ কী সুন্দর! একপাশে একটা টিনের চেয়ার। চেয়ারে একটা হাতের কাজ করা পুরু আসন। সেই চেয়ারে আমি বসলুম। বিষ্টুদার স্ত্রীর মাথায় ছোট্ট করে ঘোমটা তোলা। তার তলায় এলিয়ে আছে ভিজে চুলের ঢল। কালো কুচকুচে। কী সুন্দর চুল! টিপ মায়ের মতোই চুল পেয়েছে।

বিষ্টুদা স্ত্রীকে বললেন, পিন্টুর সামনে তোমাকে আর ঘোমটা দিতে হবে না, খুলে ফেলো।

বউদি আমার দিকে তাকিয়ে ফিক করে একটু হেসে পাশের ঘরে চলে গেলেন। সেই হাসির রেশ অনেকক্ষণ আমার মনে লেগে রইল। অপূর্ব সুন্দর সাজানো দাঁত! বিষ্টুদা আমাকে বললেন, যাও, টিপের সঙ্গে গিয়ে হাত ধুয়ে এসো, আমরা এইবার খেতে বসি, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

দাওয়ার একেবারে পুব মাথায় একটা জলের বালতি আর ঘটি। সামনেই একটা শিউলি গাছ। তলায় সবুজ ঘাসের উপর একরাশ ফুল বিছিয়ে রেখেছে। যেন ভোরবেলা পুজোয় বসেছিল। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে টিপ বললে, সকালে এক চুবড়ি তুলেছি। তাও কত! গাছটায় ফুল হয় বটে।

দাওয়া থেকে হাতদুটো সামনে বাড়িয়ে দিলুম। টিপ আমার হাতে ধীরে ধীরে জল ঢালছে।

জমিতে সরু একটা নালি কাটা রয়েছে, সেই নালি বেয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে। মাথার ওপর সূর্য। টিপ যে কত ফরসা, সেই বুঝলুম। হাতদুটো যেন জ্বলজ্বল করছে। ফ্লোরেসেন্ট। ছোট্ট একটা পাথর

বসানো আংটি আঙুলে। সরু সোনার বালা। কারও কারও গায়ে সোনা ভীষণ উজ্জ্বল হয়। অঙ্গের গুণে। টিপ একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। নীল একটা শাড়ি পরেছে। সাদা জামা। ব্লাউজের হাতা ওপর-বাহুতে একেবারে কাপ হয়ে বসে আছে। লাল একটা তাগার অল্প একটু বাড়তি অংশ লিটলিট করে দুলছে। কিছুক্ষণের মতো আমি আমার জীবনসমস্যার বাইরে চলে গেলুম। সেই হিট গানের লাইন মনে ঘুরছে, সোনার হাতে সোনার কাঁকন।

পরিষ্কার পাট করা একটা গামছা টিপ আমাকে এগিয়ে দিল। একেবারে মুখোমুখি দুজনে। বাদাম-চেরা চোখ, বড় বড় পাতা ঘেরা। যেন নারকেল কুঞ্জের মধ্যে টলটলে নীল দিঘি। হাত মুছে গামছাটা ফিরিয়ে দিতে দিতে আমি একটু মুচকি হাসলুম। মুখে কোনও কথা সরছে না। বিস্ময়কর কিছু দেখলে মানুষের এমনই বাক্যহারা অবস্থা হয় বোধহয়।

টিপ বললে, চান করে উঠে চুল আঁচড়াতে ভুলে গেছেন। দাঁড়ান, চিরুনি আর আয়নাটা নিয়ে আসি।

চুল আঁচড়াইনি বুঝি? তাড়াতাড়ি এসেছি তো!

না আঁচড়েও বেশ ভাল দেখাচ্ছে।

টিপ একটা মেয়েদের চিরুনি, খুবই পরিষ্কার, তবুও দুই আঙুল চালিয়ে, ফুঁ দিয়ে, চোখের সামনে তুলে পরীক্ষা করে আমার হাতে দিল। চুল আঁচড়াতে গিয়ে বুঝলুম, মাথাটা মুছতেই ভুলে গেছি। চিরুনি চালানো মাত্রই টসটস করে জল গড়িয়ে পড়ল।

টিপ বললে, একী মাথাটাই তো মোছা হয়নি! জল টসটস করছে। এইবার নির্ঘাত একটা অসুখে পড়বেন। গামছাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, আগে মুছুন শুকনো করে।

আমার পেছন দিকটা ভিজে গেল চুলের জলে। একটু লজ্জা লজ্জা করছিল নিজের নোংরামির জন্য। টিপ কী ভাবছে! ভাবছে, ছেলেটা একটা জড়ভরত। চুল আঁচড়াবার পর টিপ বললে, দেখুন তো, কী সুন্দর দেখাচ্ছে এইবার! টিপ পেছনে এসে জামার ওপর গামছা চেপে চেপে জল শুকোবার চেষ্টা করল। দু'-একটা চুল লেগেছিল, দুআঙুলে তুলে দিল।

বিষ্টুদা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক পাল্লায় পড়েছ এইবার।

টিপ বললে, তোমার এই ছেলে এবার একটা শক্ত অসুখ বাধাবে। মাথা ডবডবে ভিজে। মুছতেই ভুলে গেছেন।

আমরা পাশাপাশি খেতে বসলুম দু'জনে। খুবই পরিচ্ছন্ন আয়োজন। টিপ আর বউদি পরিবেশন করছেন। মুখে ভাত তুলতে গিয়ে হাত থেমে গেল। মনে হল, আমি তো বেশ পরিপাটি আহারে বসলুম, আমার বাবা এখন এই মুহূর্তে কোথায়? তাঁর কি কিছু জুটবে! বারেবারে চা খেতে ভালবাসতেন। খাওয়ার তরিবাদিও বেশ ছিল। যেখানে সেখানে, হোটেলে রেস্তোরাঁয় খেতে পারেন না। আজ মনে হয় উপবাস!

বিষ্টুদা আমাকে লক্ষ করছিলেন। বললেন, বুঝতে পেরেছি, তোমার মনে কী হচ্ছে! তবু খেতে হবে। শরীরটাকে ঠিক রাখতে হবে। অসুস্থ দুর্বল হয়ে পড়লে তো চলবে না। নাও খেয়ে নাও। মনটাকে শক্ত করো। এখন তোমার ওপর অনেক দায়িত্ব।

কেবল মনে পড়ে যাচ্ছে বিষ্টুদা। চোখের সামনে তাঁর মুখটা ভাসছে।

দেখো পিন্টু, দুঃখ হল মনের ব্যাপার, আর খাওয়া হল দেহের ব্যাপার। তুমি তো নিজেই দেখেছ প্রিয়জনকে শ্মশানে দাহ করে এসে মানুষ কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার চিন্তা করে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কি উপোস করে মারা যায়? না, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী? মন কীরকম জানো, সমুদ্রের বেলাভূমির মতো। কোনও ছাপই চিরস্থায়ী নয়, কালের ঢেউ এসে মুছে দিয়ে যায়। নিজেকে শক্ত করো। একটা ব্যাপার কী হয়েছে জানো, তোমাকে তোমার বাবা খুব আগলে আগলে মানুষ করেছেন। আসল পৃথিবীটা বুঝতে দেননি। এ বড় কঠিন ঠাঁই। লড়াইয়ের জায়গা। আমাকে দেখো। তোমাকে আগেই বলেছি, মামার বাড়িতে মানুষ। বিরাট পরিবার। জমিদারিই বলতে পারো। মামা আমাকে বলতেন, লেঠেল। যত কঠিন কাজ সব আমার ওপর। বাজার সরকার, ম্যানেজার, ঝাড়ুদার, কনট্রাক্টর। লেখাপড়ার দফারফা। শেষে মামার সঙ্গে শুরু হল আদর্শের লড়াই। বনিবনা হল না। নিত্য খিটিমিটি। একদিন দূর করে দিলেন। একটু হাতেপায়ে ধরলে আখের ফিরে যেত। চাই কী, একটা বাড়ির মালিক হওয়াও অসম্ভব ছিল না। আমি রফা করিনি। আমি আমার পথ ধরে চলেছি। জীবিকার জন্যে কী না করেছি! সিনেমা হলের গেটকিপার, ট্রেনে দাঁতের মাজনের ফেরিঅলা, জমির দালাল, সবশেষে চা-অলা। গোলাগুলি অনেক চলেছে, দুর্গ কিন্তু ভেঙে পড়েনি। ভগবান যেমন সব কেড়ে নিয়েছেন আবার দিয়েছেনও। সবচেয়ে বড় দান ইতুর মতো বউ। ইতু না এলে, হয় আমি পাগল হয়ে যেতুম, নয় টিবিফিবি হয়ে পথের ধারে মরে পড়ে থাকতুম, কি আত্মহত্যা করতে হত। বিশ্বাস করো, আজ আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী লোক অথচ আমার কিছুই নেই। দিন আনি দিন খাই। সুখে ঘুমোই। তুমি যদি সহজে কাবু হয়ে যাও, পৃথিবী তোমাকে আরও চেপে ধরবে।

টিপ আমার সামনে বসে আছে। ভারী করুণ মুখে বললে, লক্ষ্মীটি খেয়ে নিন, তা না হলে আমরা খেতে পারব না। মা উপোস করে আছে।

বেশ বুঝতে পারছি টিপ আমাকে দখল করে ফেলেছে। ইতুর মেয়ে টিপ। মায়ের মতোই তো হবে! গানটা মনে পড়ছে, যার কেহ নাই তুমি আছ তার। সেই তুমি দুঃসময়ে এইভাবেই পাশে এসে দাঁড়ায়। দেবতা তো মানুষের রূপ ধরেই আসেন।

রান্না এত অপূর্ব হয়েছে যে সব বাধা ভেসে চলে গেল। সামান্য মুগের ডাল তারই কী স্বাদ! কুচো কুচো নারকোল। লাল নটে শাক, কাবাব ফেলে খাওয়ার মতো। কতকাল আমি এত অপূর্ব রান্না খাইনি! নারকোলকোরা দিয়ে মোচার ঘণ্ট। মুচমুচে বেগুনি। বউদি কেমন করে জানলেন, আমি এইসবই ভালবাসি। বিষ্টুদার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনি মনে একটা বল এনে দিয়েছে। খাওয়া শেষ হল। বেশ ভালই হল।

বিষ্টুদা ঘরে এসে বললেন, নাও, আধ ঘণ্টাটাক একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে থাকো। সব হজম হয়ে যাবে।

আমাদের পরামর্শ কখন হবে?

শুয়ে শুয়ে হবে। ধূমপানের অভ্যাস আছে?

না।

আমারও নেই। তুমি দেখছি একালের ছেলেদের কোনও গুণই পাওনি।

শুয়ে শুয়ে দেখছি, দেয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। সবচেয়ে বড় ছবি শরৎচন্দ্রের। বিষ্টুদা শরৎচন্দ্রকে দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। অভিনেতাদের সঙ্গে তোলা ছবি। জহর গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস,

প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, শিশির ভাদুড়ী। আরও অনেকে। আমি তাঁদের চিনি না। সাহিত্য আর নাটকে বিষ্টুদা মশগুল। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকের সংলাপ গলগল করে বলে যেতে পারেন। ঝকঝকে আলমারিতে পরিপাটি করে সাজানো বই। বিষ্টুদার নিজের চেহারাও নায়কের মতো। যখন দোকানে তখন একরকম সাজপোশাক। কথা বলার ধরনধারণ। পাক্কা চা-অলা। হাঁটুর ওপর তোলা মালকোঁচা মারা ধুতি। একটা গেঞ্জি। শীতকালে ওরই ওপর একটা পুলওভার। ভোরবেলা আর রাতের দিকে মাথায় একটা মাফলারের পাগড়ি। হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল মানুষটিকে তখন সন্ন্যাসীর মতো দেখায়।

টিপ দু'গেলাস জল এনে টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রেখে গেল। যাবার সময় জিজ্ঞেস করলে, আপনি পান খাবেন?

না ভাই, পান আমি খাই না।

বিষ্টুদা বললেন, একটু মশলা দিয়ে যা।

টিপ পরক্ষণেই মশলা নিয়ে এল। আমি হাত পাতলুম। টিপের ফরসা হাত আমার ডান তালুতে কাত হল, মৌরি, বড় এলাচ, সুপুরির ছোট ছোট টুকরো। মেয়েটার আঙুলগুলো কী লম্বা লম্বা! শিল্পী হাত। আমার আঙুলও লম্বা লম্বা, কিন্তু শিম্পাঞ্জির মতো। নিজের হাত দেখে নিজেই ঘাবড়ে যাই। শয়তানের হাত মনে হয় এইরকম ছিল। ছিল বলছি কেন? শয়তান তো এখনও আছে। তা না হলে, আমার কেন ইচ্ছে করছে টিপকে ভালবাসি? ভীষণ ভালবাসা। একমাত্র টিপই আমার এই পথে-বসা জীবনকে ঘরে তুলতে পারে। টিপের পাশে মুকু লাগে না। লেখাপড়ায় সাংঘাতিক হলেও, একটু পুরুষালি ভাব। টিপ হল কবিতা, মুকু হল গদ্য। টিপ পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে, আমার চোখ যেন আটকে গেছে। আমার মতো মানুষকে কারও অন্দরমহলে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। আমার মন বড় বেসামাল।

বিষ্টুদা বললেন, তোমার এখন প্রথম কাজ হবে সোনাদানা যা আছে সব ব্যাঙ্কে জমা করে দেওয়া। কোন ব্যাঙ্কে তোমাদের অ্যাকাউন্ট?

স্টেট ব্যাঙ্ক।

আজ তুমি একটা লিস্ট তৈরি করো, সাবধানে। কাল আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে জমা করে আসব। তা হলে বিরাট এক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আমার বাবাকে খুঁজে বের করার কী হবে বিষ্টুদা?

দেখো, থানার সাহায্য নেওয়া যায়। মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে একটা ছবি দিয়ে ডায়েরি করালে ওরা অনুসন্ধান করবে। কাগজেও একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারি আমরা। সেটা কিন্তু কেমন একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার হবে। লোক জানাজানি। আমাদের পক্ষেও অপমানের, তাঁর পক্ষেও অপমানের। পাঁচজনে পাঁচকথা বলবে। অনুসন্ধানটা আমাদেরই করতে হবে তলে তলে।

আমরা কী করে করব?

কোথায় কোথায় যাওয়া সম্ভব ভেবে দেখো। কোনও আত্মীয়ের বাড়ি? কোনও আশ্রম?

আমাদের তো তেমন কোনও আত্মীয় নেই। এক মামা।

সেখানে যেতে পারেন?

অসম্ভব। এই কারণেই অসম্ভব, কারও বাড়ি গিয়ে একটা রাতও কখনও কাটাননি। অস্বস্তি বোধ করেন। বহুবার আমরা বেড়াতে গেছি। যেখানে গেছি ইচ্ছে করলে পরিচিত বন্ধুর বাড়িতে ওঠা যেত। ওঠেননি। সোজা চলে গেছি হোটেলে। বলতেন, এক এক সংসারের এক এক সুর। সেই সুরে সুর মেলানো কষ্টকর। অনেকে পারে আমি পারি না।

তা হলে কোথায় যেতে পারেন?

একবার ভাবছি হরিদ্বার থেকে আমার দাদুর কাছে এক সন্ন্যাসী আসতেন। দাদুর সমাধির রাতে তিনি হঠাৎ এসে হাজির। যেন আগেই জানতেন। সেই সন্ন্যাসীকে বাবার খুব মনে ধরেছিল। সাধারণত সাধু-সন্ন্যাসী তেমন পছন্দ করতেন না। এক ধরনের নাস্তিক ছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে যেতে পারেন। যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

সেই মহাপুরুষের নাম-ঠিকানা তুমি জানো?

না।

তোমার বাবা জানতেন?

সন্দেহ আছে। তিনি জানলে, আমিও জানতুম।

তা হলে সেখানে তিনি যাবেন কী করে? ঠিকানা না হয় না জানলেন, নামটা তো জানা দরকার।

তা ঠিক। তা হলে কোথায় যেতে পারেন?

এমনও হতে পারে সোজা কোনও হোটেলে গিয়ে উঠেছেন। কলকাতারই কোনও হোটেলে। সেখানে দিনকতক থেকে তোমাকে একটু শিক্ষা দিতে চাইছেন। সেটা রাগেও হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। তোমাকে একটু হাত ছেড়ে দিয়ে স্বাবলম্বী হতে শেখাচ্ছেন। ছোট ছেলেকে মা যেমন হাঁটতে শেখান। সত্যিই তো তুমি তাঁর হাতধরা ছিলে। বুক দিয়ে আগলে আগলে রেখেছিলেন।

সঙ্গে তো কিছুই নিয়ে যাননি!

টাকা?

সেইটা আমি বলতে পারব না।

শোনো, তিনি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ, হিসেবি মানুষ, জেনেশুনে নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। পথ চলতে কড়ি, একথা তিনি জানেন। সঙ্গে টাকা থাকলে আর কিছু নেওয়ার দরকার হয় না। মনে করে দেখো, আগের দিন তিনি ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেন কি না!

মনে হয় গিয়েছিলেন।

বাড়ি গিয়ে চেক বইটা পাও কি না দেখো। কাউন্টার ফয়েলটা দেখো। কত টাকা কোন তারিখে তুলেছেন। ব্যস, প্রবলেম সলভড। উইদাউট টিকিটে ট্রাভেল করে জেলখানায় যাবার মানুষ তিনি নন। লোকের কাছে হাতপাতার মানুষও তিনি নন। আমার মনে হয় খুব একটা উতলা না হয়ে কয়েকদিন চুপচাপ দেখলে হয়। ফিরেও তো আসতে পারেন। কোনও বাবা তাঁর ছেলেকে এত ভালবাসতেন না, তিনি যেমন তোমাকে বাসতেন। তোমার যেমন কষ্ট হচ্ছে, ছটফট করছ, তাঁরও তো সেই একই অবস্থা।

তা হলে ব্যাঙ্কে যাবার প্রয়োজন নেই?

খুব আছে। অত সোনাদানা বাড়িতে কেউ ফেলে রাখে! তোমাদের ওই বিশাল বাড়ি আর তুমি একজন মাত্র প্রাণী।

আর আমার চাকরির কী হবে?

চাকরি করবে। চাকরি না-করার প্রশ্ন আসছে কেন?

আমাকে যে দেরাদুনে বদলি করে দিয়েছে।

তা হলে অবশ্য খুবই মুশকিল। তোমার তো এখন বাইরে যাওয়া কোনওমতেই চলবে না। তুমি কর্তৃপক্ষকে বলো। তাঁরা নিশ্চয়ই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন।

আমার প্রোমোশনটা যে তা হলে হবে না। বাইরে পাঠাচ্ছিল বিরাট একটা প্রোমোশন দিয়ে।

ওই লোভটা তোমাকে ছাড়তে হবে ভাই।

আর একটা বাজে ব্যাপার আছে বিষ্টুদা, ওই বাড়িতে রাত্তিরবেলা আমি একা থাকতে পারব না। ভূত আছে।

ভূতের ভয় অবশ্য আমারও আছে। তুমি এক কাজ করো, তুমি আমাদের বাড়িতে থাকো।

আমার লজ্জা করে।

লজ্জা? কীসের লজ্জা?

আমি কারও সামনে জামাকাপড় খুলতে পারি না।

এখানে কে তোমাকে উলঙ্গ হয়ে থাকতে বলেছে! পাজামা আর গেঞ্জি পরে শোবে।

আমি যে কারও বাড়ির বাথরুমে যেতে পারি না বিষ্টুদা।

আমাদের বাড়ির বাথরুম খুব ভাল জায়গায়। কারওকে জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন নেই। আলো জ্বালবে, ঢুকে পড়বে। আজ রাত থেকেই তুমি এখানে থাকবে, কিন্তু দামি গয়নাপত্তর যা আছে সব আজই নিয়ে আসবে এখানে। রাতটা আমাদের আলমারিতে থাকবে।

একা আমি গোছগাছ করতে পারব না বিষ্টুদা। আপনিও চলুন না!

এসব ব্যাপার আমার চেয়ে ইতু আর টিপ ভাল পারে। ওরা তোমার সঙ্গে যাবে, তোমাকে সাহায্য করবে। যেভাবে বলবে, সেইভাবে। এখন তুমি একটু বিশ্রাম করো।

কুঁকড়েমুকড়ে খাটের এক ধারে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলুম। বড় শান্ত সংসার। ইতু বউদির গলা তো শোনাই যায় না, টিপও সেইরকম। শালিকের কিচিরমিচির কানে আসছে। ঘুঘু ডাকছে উদাস সুরে। বিষ্টুদা আমার পাশেই শুয়ে আছেন চিত হয়ে, বুকের ওপর হাতদুটো জড়ো করে। বিষ্টুদার মনে হয় দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যাস। শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘ হয়েছে। আমি ডাকলুম, বিষ্টুদা।

বলো।

কলকাতার সমস্ত হোটেলে একবার খোঁজ করলে হয় না?

হয়; কিন্তু তিনি যদি অন্য নাম নিয়ে থাকেন? আর সেটাই সম্ভব।

কাল সারাটা দিন তা হলে হোটেলগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি।

দেখতে পারো, তবে ব্যর্থ হবে। এখন মনে হচ্ছে অমন একজন মানুষ হোটেলে থাকবেন না। তিনি বাইরেই গেছেন কোথাও।

মানে হিমালয়ের দিকে?

আচ্ছা, তোমার বাবা তো বড় সরকারি চাকরি করতেন?

হ্যাঁ, এই কয়েকমাস হল রিটায়ার করেছেন।

আইডিয়া। যেখানেই থাকুন, পেনশন নেবার জন্যে মাসে একবার তাঁকে কলকাতায় আসতেই হবে। ওঁর পেনশনের তারিখটা তুমি যেভাবেই হোক বের করো। আমরা তক্কে তক্কে থাকব, ঠিক ধরে ফেলব। একবার ধরতে পারলে কোনও কথা নয়, সোজা তাঁর পায়ের ওপর, যদি কোনও অপরাধ করে থাকি ক্ষমা করুন।

আমি তো কোনও অপরাধ করিনি।

শোনো, তোমার মনে হচ্ছে করোনি, কিন্তু করেছ। একটা কিছু হয়েছে। ভীষণ একটা আঘাত পেয়েছেন মনে। সেই অভিমান তাঁকে ঘর-ছাড়া করেছে।

Love means never having to say you are sorry

একটু ভালবেসে ফেলেছিলুম, ঈশ্বর, এই কি আমার অপরাধ! তা হলে তুমি কেন নারী সৃষ্টি করলে! মুকু হস্টেল থেকে বেরিয়ে পড়েছিল কোথাও যাবে বলে। আমাকে দেখে অবাক।

মুকু বললে, একী, তুমি কোথা থেকে এলে? অফিস থেকে?

মনে হচ্ছে, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?

তা একটু হয়েছি। ভাবতেই পারিনি তুমি আসবে। তুমি তো ব্রহ্মচারী। তোমার বাবা গৃহী সন্ন্যাসী। তুমি একটা মেয়ের কাছে আসো কী করে! মেয়েরা তোমার কাছে যাবে, তোমার তপোভঙ্গ করাবার জন্যে। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল!

তুমি কোথায় যাবে বলে সেজেগুজে বেরোলে?

যদি বলি একটা ছেলের কাছে!

তা হলে আমার অভিমান হবে।

যদি বলি সেই ছেলেটি হলে তুমি?

তা হলে আমার অভিমান হবে না।

আমি যদি আর একটু আগেই বেরিয়ে যেতুম, তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।

তা অবশ্য হত না। মন খারাপ করে ফিরে যেতে হত।

চলো তা হলে দু'জনে মিলে কোথাও যাই।

তখনই মুকুকে কিছু বলতে ইচ্ছে করল না। কেমন যেন একটা উড়ুউড়ু ভাব। অন্যের দুঃখের কথা মনে ধরবে না। সুখে সে রয়েছে, সুখে সে থাকুক। মোর কথা তারে বোলো না, বোলো না। দেখলেই মনে হয় সুখী মেয়ে, আদুরে মেয়ে। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা নেই। মরশুমি ফুলের মতো বাহারি। বড়লোকের মেয়ে। বাবা বড় অ্যাডভোকেট। মুকুর সবটাই কেমন ভাসাভাসা। আজ খুব সেজেছে। পিঙ্করঙের শাড়ি। কাঁচুলি ধরনের ব্লাউজ। চুলে শ্যাম্পু করেছে। ফুরফুর করে উড়ছে। গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। মুকু যথার্থই সুন্দরী। অন্য কোনও দিন হলে আমি হয়তো চনমন করে উঠতুম। যা আমার স্বভাব। আজ ভেতরটা কুঁকড়ে আছে।

মুকু বললে, আমাকে কিছু খাওয়াবে? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

চলো। কোথায় খাবে বলো?

বেশ ভাল একটা জায়গায়, যেখানে নির্জনে কিছুক্ষণ বসা যাবে।

তা হলে তো পার্ক স্ট্রিটে যেতে হয়।

অত দূরে না, কাছাকাছি কোথাও।

হঠাৎ মনে হল ওয়াই এম সি এ রেস্তোরাঁয় গেলে হয়। দু'জনে ট্রামে উঠলুম। খালি ট্রাম। বসার জায়গার অভাব নেই। উঠে বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলুম। একটি আসনে বেশ আয়েশ করে বসে আছেন আমার পিতার প্রাণের বন্ধু, সেই জ্যোতিষী অক্ষয় কাকাবাবু। সামনের দিকে বসেছেন। আমরা পেছনে। কী একটা ভাবে তন্ময়। ঘাড় ঘোরালেই আমাদের দেখে ফেলবেন। দেখে ফেলুন এটা আমি চাই না। মুকু এক বিস্ফোরক সুন্দরী। পাঞ্জাবি মহিলার মতো উগ্র সাজ। মুকুর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললুম, চলো পরের স্টপেজে নেমে যাই।

কেন?

ট্রামটা ভাল নয়।

এর চেয়ে ভাল ট্রাম কলকাতায় পাবে কোথায়?

হঠাৎ অক্ষয় কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। আমি যতদূর সম্ভব মুখটা নিচু করে রাখলুম। পাশ দিয়ে চলে গেলেন দরজার দিকে। আমার গা ছুঁয়ে গেল তাঁর পাঞ্জাবির পকেট। পকেটে মনে হয় হাত দেখার লেন্সটা রয়েছে। ঠকাস করে আমার কাঁধে লাগল। সাবধানের মার নেই। আমি মাথা তুলিনি।

মুকু বললে, কাকে দেখে অমন করছ? পাওনাদার?

মাথা না তুলেই বললুম, এখন চুপ। আমাকে আড়াল করে রাখো।

ট্রাম থামল। থেমে আবার চলল। তখন আমি সাহস করে মাথা তুললুম।

মুকু বললে, ব্যাপারটা কী? অমন চোরের মতো লুকোলে কেন?

অক্ষয় কাকাবাবু।

কে অক্ষয় কাকাবাবু?

আমার বাবার বন্ধু।

তাতে হলটা কী? আমার সঙ্গে দেখলে তোমার চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে ভাববেন? তুমি এইরকম ভয়ে ভয়ে মেয়েদের সঙ্গে মেশো নাকি? তোমার সাহস নেই? ডরপুক। আমার যেমন বেণি তেমনি রবে চুল ভিজাব না। ভুখ লাগাব, ভুখে মরব তবু আমি জানতে দেবনা। রাঁধিব বাড়িব, বাঞ্জন বাঁটিব তবু আমি হাঁড়ি ছোঁব না। পলিসিটা তোমার ভালই। তোমার বাবাকে বলে দেবেন, এই ভয়? আর কত দিন বাবার কাছে গোপালটি সেজে থাকবে? এইবার একটু উড়তে শেখো না! জীবনটাকে একটু দেখো না!

মুকু রাগে মুখ ঘোরাল জানলার দিকে। একটু রোগা হয়ে আগের চেয়ে দেখতে যেন আরও সুন্দর হয়েছে। আমার বন্ধু আশিসের কথা মনে পড়ছে। আশিস বলত, দেখ পিন্টু, এমন একটা বিয়ে করব যেন নিয়ে রাস্তায় বেরোতে গর্বে বুক দশ হাত হয়ে যায়। তেমন একটা বউয়ের সন্ধান আজও পায়নি। আশিস যদি মুকুকে দেখতে পায় তো ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। ডিগ্রি ডিপ্লোমার পেখম তুলে নাচবে। ওর ধারণা মেয়েরা এইসবেরেই প্রেমে পড়ে। নিজেদের বাড়ি, সেকথাও বলতে ভোলে না। যেন বাড়ি আছে বলেই সুন্দরী মেয়েরা জামার বোতামের গর্তে গোলাপফুল হয়ে সেঁটে যাবে। মুকুর পাশে গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছি বলে আমার অবশ্য তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

ওয়াই এম সি এ-র রেস্তোরাঁয় ঢুকেই পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এই তো কয়েক বছর আগেই ছাত্রজীবনে আমরা প্রায়ই এখানে আসতুম। সস্তার খাওয়া ছিল, টোস্ট ওমলেট, চা। যেসব ভাগ্যবানের মেয়ে বন্ধু ছিল, তারা সোজা গিয়ে ঢুকত কেবিনে। লম্বা পরদার আড়ালে গল্প করার সুবিধে হত। এইরকম একটা কেবিনে আমাদের গ্রেট পার্থ আরতিকে চুমু খেয়েছিল। জীবনের প্রথম নারী-ওষ্ঠ চুম্বনের অভিজ্ঞতা। ছাদের নল দিয়ে অনর্গল বর্ষার জল বেরোবার মতো, টানা এক মাস গলগল করে কবিতা বেরোতে লাগল। খাতাপত্তর সব ভরে গেল। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। পার্থর নিরীহ মা একদিন আমাদের সামনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ওরে আমার ছেলেটার কী হল! কেন এমন করছে! খেতে বসে, ডালেতে দুধেতে ঝোলেতে অম্বলেতে মিশিয়ে ফেলছে। জামার বোতাম ঘরে ঘরে মেলাতে পারছে না। সবাই বলছে, ছেলে তোমার সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কৃষ্ণ-বিরহে মহাপ্রভুর এই অবস্থা হয়েছিল। আমরা কুঁইকুঁই করে হেসে মরি আর কী! বলতে পারছি না, মাসিমা, কৃষ্ণবিরহ নয়, ওষ্ঠে ওষ্ঠ ঠেকিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। সন্ন্যাসী নয়, ছেলে আপনার গৃহী হবে। পেখম তুলেছে।

আমরা ধারের দিকে একটা কেবিন পেয়ে গেলুম। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ছাত্রজীবনে ভয় পেতুম। সেই ভয় এখনও যায়নি। কেউ যদি দেখে ফেলে, কেউ যদি বলে দেয় বাড়িতে। মনে হয় ছবির মানুষও জীবন্ত। হঠাৎ বলে উঠবে, অ্যায়, কী কচ্চিস! তোর বাবাকে বলে দোব।

মুকু কেবিনের পরদাটা টানছে। বললুম, থাক না, খোলাই থাক না।

কেন? খোলা থাকবে কেন? পরদাটা তা হলে আছে কীসের জন্যে?

মুকু আমার পাশে বসল। আমি বললুম, উলটো দিকে বোসো না।

কেন? তোমাকে পুলিশে ধরবে? আজ আমি তোমার ভয় ভাঙাব। তোমাকে আজ আমি মানুষ করব!

শক্ত পাথরের মতো হয়ে গেছে আমার শরীর। এখনই পরদা সরিয়ে বয় ঢুকবে। সে যখন দেখবে আমরা এইভাবে বসে আছি, ছি ছি, কী ভাববে! এইভাবে বসে থাকাকেই তো ইংরেজিতে বলে, কম্প্রোমাইজিং পজিশন। মুকু যে-ব্লাউজ পরেছে, সর্বাধুনিক ডিজাইনের। দুঃসাহসী মেয়েরা পরতে শুরু করেছে কলকাতায়। পরলেই লোকে কেমন কেমন নজরে তাকায়। আমিও তাকাই। ভেতরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। বিশ্রী একটা ভাব হয়। মুকুর কোমরের অনেকটা অংশ বেরিয়ে আছে। ধবধবে সাদা। গোলাপি ব্লাউজের তলা খাপ হয়ে বসে আছে। অস্বাভাবিক রকমের ভরাট বুক। যৌবন নয়, যৌবনের জোয়ার। ভয় আর লোভ দুটোই একসঙ্গে খেলা করছে আমার মনে। কখনও মনে হচ্ছে, আমি কী ভাগ্যবান! পরক্ষণেই মনে হচ্ছে, হায়, কী সর্বনাশ! মুকু টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকে মেনু পড়ছে। আমি দেখছি মসৃণ চওড়া পিঠ। নিখুঁত একটি ঘাড়। পিঠে ছড়িয়ে আছে রেশমের মতো চুল। মুকু ইচ্ছে করলেই ফিল্‌মে নামতে পারে। বম্বের এক নায়িকা, যার এখন খুব নামডাক, অবিকল তার মতো দেখতে।

মুকু বললে, এইবার কী হবে! তুমি পালাবে কোথায়! পড়েছ মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। এইবার আমার কবলে তুমি। আমার যা প্রাণ চায় আমি তাই করব।

মুকু কঁধ দিয়ে আমাকে দেয়ালে ঠেসে ধরল। আর ঠিক সেই সময় দুলে উঠল পরদা। প্রবীণ এক মানুষের মুখ। মুখটা ভিতরে, দেহটা বাইরে। শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন, বলুন?

কী বলব মুকু?

কাটলেট আর চা।

লোকটি মুকুর দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে। মেয়েরা ক্রমশই স্বাধীন হচ্ছে। প্রেম ছাড়া পেয়েছে বাজারে। রেস্তোরাঁর কেবিন এখন কুঞ্জবন। সারাদিনে জোড়ায় জোড়ায় আসে আর চলে যায়। ভদ্রলোক দেখছেন, এ জোড়াটা কেমন!

দেয়াল আর মুকুর মাঝখানের খোপ থেকে আমি বলে উঠলুম, কাটলেট আর চা।

মুখ অদৃশ্য হল। পরদাটা দুলতে লাগল।

মুকু আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, বলো, কেমন লাগছে তোমার? কী ভাল, তাই না!

আমি তখনই মুকুকে সব কথা বলতে শুরু করলুম। দু'হাতে মুখ রেখে মুকু শুনছে। তার সব চপলতা চলে গেছে। মুকু যখন সিরিয়াস, তখন তার চেহারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়।

সব শুনে মুকু বললে, তিনি চলে গেলেন? এইভাবে চলে গেলেন?

বলতে বলতে মুকু কেঁদে ফেলল, অমন একজন মানুষ চলে গেলেন! আমি তা হলে কী নিয়ে বাঁচব! মুকু মুখ নিচু করে আছে, টপটপ করে জল পড়ছে চোখ থেকে। টেবিলের পাশে, কোলে। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে বললে, তোমার রুমালটা দাও। রুমালটা নিয়ে চোখ মুছে বললে, চলো।

সেকী, আমরা যে অর্ডার দিলুম!

দাম মিটিয়ে দাও। আমরা খাব না। খাওয়ার আর মুড নেই। তুমি জানো না মেসোমশাই আমার কতটা অধিকার করে আছেন! অমন ফ্যান্টাস্টিক মানুষ হয় না। আর দ্বিতীয় নেই। তোমার বাবা তো, তাই তুমি চিনতে পারোনি। তুমি একটা ছাগল। দেবতার আসন তুমি টলিয়ে দিয়েছ।

ছাগল বলায় রেগে যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু মুকুর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। ওর উগ্র সাজ চটুল ব্যবহারের আড়ালে লুকিয়ে আছে গভীর একটা মন। আমার পিতাকে যে এত শ্রদ্ধা করে সে আমারও শ্রদ্ধেয়।

ভদ্রলোক কাটলেট হাতে সামনে দাঁড়িয়ে। থতমত হয়ে গেছেন। বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা কী! খুব ভদ্রভাবে বললেন, তেমন তো দেরি করিনি! উঠে পড়লেন?

আমি বললুম, দেরির জন্যে নয়। অন্য ব্যাপার। আপনি একটা প্যাকেট করে দিন। আমি দামটা দিয়ে দিই।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলুম। হনহন করে কিছু দূর হাঁটার পর জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এখন কোথায় যাবে মুকু?

তোমাদের বাড়িতে।

বেশি রাত হয়ে গেলে তোমাকে তো আবার হস্টেলে ঢুকতে দেবে না।

সে আমি বুঝব। তুমি একটু কম চিন্তা করো।

আমরা একটা বাসে উঠে পড়লুম। বেজায় ভিড়। মানুষের চটকাচটকি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুকু একটা বসার জায়গা পেয়ে গেল। বাস যেন আর নড়তেই চায় না। দু'কদম যায় তো থেমে পড়ে। তিরিশ মিনিটের

পথ যেতে এক ঘণ্টা লেগে গেল। গলদঘর্ম হয়ে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে ভূতের বাড়ির মতো। সদর দরজায় বিশাল এক তালা। বাইরের রকের একপাশে দুটো কুকুর শুয়ে আছে।

মুকু বললে, প্যাকেটটা ফেলে দাও না! বিশ্রী গন্ধ বেরোচ্ছে।

পয়সার জিনিস ফেলে দেব?

হ্যাঁ দেবে। ও আর কে খাবে? বাসে অত লোকের নিশ্বাস আর ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে ছিল। খেলেই অসুখ করবে। ওই কুকুরদুটোকে দিয়ে দাও।

কুকুরদুটো অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। কাটলেটের গন্ধে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল।

তালাটা খুলে গভীর অন্ধকারে আমরা দু'জনেই হাতড়াতে লাগলুম। সুইচবোর্ড আন্দাজ করে পায়ে পায়ে এগোতে লাগলুম। ভয় করছে, সাপ থাকা অসম্ভব নয়। নীচের তলাটা একেবারেই ব্যবহার হয় না। হামেশাই সাপের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। মুকুর একটা হাত আমার কাঁধে। আমাকে ধরে ধরে আসছে। তার শাড়ির নীচের অংশ আমার পায়ে মাঝে মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমার শরীরে তার শরীরের ভার। একটু অস্বস্তি হচ্ছে। মন একটু উতলা হচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। থকথকে আলকাতরার মতো অন্ধকার। মানুষের মন যখন ভাল থাকে না, তখনই সে দুটো ম খোঁজে। মদ আর নারী। এতকাল শুনেছিলুম, আজ অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, কী আর হবে, যা হয় হবে! যতরকম অন্ধকার আছে, তাতেই জীবনটাকে ডুবিয়ে দিই। আলোর পথিক তো হওয়া গেল না। আঁধারকেই চিনি ভাল করে। এখন তো আমারই দিন। এই অন্ধকার ইমারতের আমিই সম্রাট।

অবশেষে সুইচবোর্ডে হাত ঠেকল। আলো যেন লাফিয়ে পড়ল মল্লবীরের মতো। সেই আলোয় মুকুকে মনে হল বেসামাল কোনও রাজনর্তকী। দু'পা এগোলেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির তলায় বাগান করার যন্ত্রপাতি। নানা মাপের শাবল, কোদাল, খুরপি, ঝুড়ি, বালতি, ঝাড়ু। মুকু সিঁড়ির হাতল ধরে ধরে ওপরে উঠছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই অক্লান্ত মাকড়সা এমাথা থেকে ওমাথা জাল বুনে বসে আছে। ভেবেই নিয়েছে, আর তো কেউ আসবে না। বিস্মৃতির সূক্ষ্ম পরদায় বাড়িটাকে ঢেকে দিই। অতি মিহি এক শবাচ্ছাদন। সিঁড়ির ধাপগুলো ভাঙাভাঙা। কথা হচ্ছিল, বাড়িটাকে ঢেলে মেরামত করার। সব ভেস্তে গেল।

সিঁড়ির প্রথম বাঁক পর্যন্ত নীচের আলো ছিল। দ্বিতীয় বাঁক পড়ে আছে অন্ধকারে। তৃতীয় বাঁক একেবারেই অনিশ্চিত। দ্বিতীয় বাঁকের মুখে মুকু থমকে গেল। আমি বললুম, দাঁড়াও, আমাকে আগে যেতে দাও। অন্ধকারে তুমি কোনও কিছুর হদিশ পাবে না।

সিঁড়ির ধাপ আমার মুখস্থ। তরতর করে উঠছিলুম। মুকু বললে, আমার কথা একটু ভাবো।

তুমি দাঁড়াও, আমি আলোটা আগে জ্বালি।

সব ঘরের আলো জ্বেলে দিলুম। সারাদিন বন্ধ ছিল। ঝাড়া-মোছা হয়নি। ধুলো-ধুলো লাগছে। প্রচুর চড়াই পাখি এ বাড়িতে আশ্রিত। তাদের এখন বাসা বাঁধার সময়। খড়কুটো এনে জড়ো করেছে ভেন্টিলেটারে! সেইসব পড়েছে মেঝেতে। একটা ব্যাপারে মনে একটু খটকা লাগল। বাবা যে-টেবিলে বসে লেখাপড়া করতেন, তার সামনে একটা জানলা আছে। বেশ মনে পড়ছে জানালাটা আমি ভাল করে বন্ধ করে গিয়েছিলুম! এখন দেখছি একটা পাল্লা খোলা। কে খুলল? আমি তো ছিটকিনি বন্ধ করে গিয়েছিলুম। বেশ একটা ভয়ভয়

করছে। এই বাড়িটার বদনাম আছে। নানা জনে নানা কথা বলে। অশরীরী কেউ ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে যায়নি তো!

মুকু টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। বই খাতা সব সুন্দর করে সাজানো। একপাশে পড়ে আছে পার্কার কলম। সুন্দর সুন্দর পেপারওয়েট। কিছুকাল হল বাবা মডেলিং নিয়ে মেতেছিলেন। মাটি দিয়ে তৈরি করছিলেন নানা মূর্তি। হেলাফেলার নয়। সুন্দর কাজ। টেবিলের ওপর সম্প্রতি তৈরি একটা মূর্তি রয়েছে। দু'হাত তুলে এক বাউল নাচছে। মুকু টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল। নীল সিল্কের কাপড়ের শেড। মায়াবী আলোয় একটা সুখের ভাব। মুকুর মুখে ছায়া পড়েছে। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। মাথার দু'পাশে এলো চুলের ঢল। কলমটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মুকুর চোখে আবার জল এসে গেল।

আমি কেন মুকুর মতো কাঁদতে পারছি না! আমার ভেতরটা ক্রমশই কেন শান্ত হয়ে আসছে! আমার অনুভূতি কি মরে যাচ্ছে! মুকু কলমটা সযত্নে সাবধানে রেখে শোয়ার ঘরের দিকে চলে গেল। আমি একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে খানিক পায়চারি করে নিলুম। তারপর মনে হল মুকুর খিদে পেয়েছে। কিছু একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

বাবার বিছানায় মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে মুকু। আমি আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত রেখে বললুম, কিছু একটা খাবে তো? তোমার খিদে পেয়েছে!

মুকু পাশ ফিরে বললে, আর আমার খিদে নেই।

মুকু এমন একটা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে মনে হচ্ছে আমিও শুয়ে পড়ি তার পাশে, তারপর যা হয় হবে। যা ঘটে ঘটুক। ভবিষ্যৎ এখন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আজই আমার বিয়ের রাত হোক না, ক্ষতি কী! আমাকে বাধা দেবার তো কেউ নেই। মন, ভেবে দেখো, মাত্র এক বিঘত দূরে এক মোহময়ী নারী। সারা শরীরে যার যৌবন খেলা করছে জোয়ারের জলের মতো। নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়ি। একবার যদি সেইভাবে স্পর্শ করি ক্ষতি কী! স্বর্গসুখ তো কয়েক মুহূর্ত দূরে! হাতদুটো শুধু এগিয়ে যাক। কিছুক্ষণের মতো তুমি তোমার পরিবেশ ও জগৎ ভুলে থাকতে পারবে। দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ওপর প্রেমের প্রলেপ নেমে আসবে। আবেগের ঝড়ে খড়কুটোর মতো সব উড়ে যাবে।

প্রায় আমি সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলুম, এমন সময় মুকু ঝট করে উঠে বসল। গোলাপি আঁচল খুলে পড়ল। ভয়ংকর সেই দৃশ্য থেকে জোর করে চোখ সরালুম। প্রলোভন কী সাংঘাতিক জিনিস! চরিত্রকে দুর্ভেদ্য করতে হলে মানুষকে কোন লগ্নে জন্ম নিতে হয়! আজ বুঝতে পারছি, আমি সেইরকম কোনও লগ্নে জন্মাইনি। আমি শের নই, চুহা। বেড়াল আমাকে আধমরা করে একপাশে ফেলে রেখে নিজের থাবা চাটছে। আমার মনে হয় মূষিক-লগ্নে জন্ম। আমি সকালেই আশ্রমে চলে যেতে পারতুম, স্বামী নির্মলানন্দজির কাছে। সেখানে গেলে, আজ আমি যে বিড়ম্বনায় পড়েছি তার চিরসমাধান হয়ে যেত। আমাকে তিনি শক্ত মুঠোয় ধরতে পারতেন। আমি সেই পথে না গিয়ে, গেলুম বিষ্টুদার কাছে পরামর্শ নিতে। সেখান থেকে বিষ্টুদার বাড়িতে। মনে জড়িয়ে নিয়ে এলুম টিপকে। আমার মনের খবর কেউ জানে না। একমাত্র আমিই জানি। মুকু কি জানে, এই মুহূর্তে আমার অন্তরআত্মা কীসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে! আমি যেন এক চামচ ঘি, আগুনে পড়ার জন্যে ছটফট করছি। একটা দেয়ালি পোকা!

মুকু সচেতন হয়ে গুছিয়ে নিল নিজেকে। বুঝতে পেরেছে আমি টলছি, যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

মুকু বললে, তোমার রাতের কী ব্যবস্থা!

ব্যবস্থা মানে?

রান্নাবান্নার কী ব্যবস্থা করেছ?

কিছুই না!

সকালে কী করেছিলে?

নির্জলা একটা মিথ্যে কথা বেরিয়ে এল, কিছুই না। চর্ব-চুষ্য খেয়েছি, একথা বলা গেল না। নিজের শোক তা হলে যে তরল হয়ে যায়।

সারাদিন উপোস করে আছ?

ওই টুকটাক যা হয় কিছু খেয়ে নিয়েছি।

রান্নাঘরে কী মজুত আছে?

সবই আছে।

তা হলে চলো, রান্না বসাই। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল খিচুড়ি।

ঘড়িটা দেখেছ? তোমাকে তো এখুনি ফিরতে হবে। তা না হলে তোমাকে আর ঢুকতে দেবে না।

মুকু চাবুকের মতো উত্তর দিল, আমি যদি আর না ফিরি? মেসোমশাই আমাকে এই বাড়িতেই থাকতে বলেছিলেন।

তখন তিনি ছিলেন, এখন যে আমি একলা! পাঁচজনে কী বলবে?

পাঁচজন? সেই পাঁচজন কারা?

পাড়াপ্রতিবেশী।

তারা তোমার চরিত্রে কলঙ্ক দেবে? তাই তো! ভণ্ড তপস্বী! সন্ন্যাসী হবে! ভগবানের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করবে শয়তান! আমার পবিত্র শিউলি ফুল! তোমার সেই কাকিমার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ছিল! সাহস থাকে তো সত্য কথা বলবে? আমার দিদিকে তুমি কী চোখে দেখেছিলে? পবিত্র সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখে? তুমি ভাবো তোমাকে আমি চিনি না! ভণ্ডামির একটা সীমা আছে। তোমার মস্ত সুবিধে করে দিয়েছিল ওই বাঁজা মেয়েছেলেটা। তোমার আদরের কাকিমা। তোমার ওই বকধর্মের চোটে তোমার বাবাকে সব ছেড়ে পালাতে হয়েছে। তুমি তাঁকে তাড়িয়েছ! আমি সব বুঝি। তুমি আমার দিদির পেছনে ছোঁকছোঁক করতে। সেও আমি জানি। চোখ উলটে ধ্যান, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ, সব তোমার ভণ্ডামি। তুমি এক বেড়াল-তপস্বী। তুমি দেখবে, দেখতে চাও, এই মুহূর্তে তোমাকে আমি ফেলে দিতে পারি? সাতঘাটের জল খাইয়ে দিতে পারি? সে ক্ষমতা আমার শরীরের আছে।

একসঙ্গে অনেকগুলি তির এসে আমার বুক যেন ঝাঁঝরা করে দিল। ধরা পড়ে গেছি। রাগ হচ্ছে। উত্তর দেওয়া দরকার। আমি যদি বলি, তোমার জন্যেই তিনি চলে গেলেন? বুঝতে পেরেছিলেন, কী ঘটতে পারে।

তাঁর সমস্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে। তিনি তোমাকে পছন্দ করেননি।

আজ্ঞে না! তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। পছন্দ করতেন না তোমাকে। তোমার ঘিনঘিনে শতখণ্ড ব্যক্তিত্বকে। তোমার ওই মাকড়সার জাল আমি ছিঁড়বই। যা হতে পারবে না কোনওদিন সেই হওয়ার চেষ্টা থেকে তোমাকে আমি ফেরাব। তুমি আমার চ্যালেঞ্জ। আমি এইখানে থাকব। ওই পাঁচজনের নাকের ডগা দিয়ে তোমাকে নিয়ে আমি ঘুরব। এমনভাবে ঘুরব, লোকে যাতে মনে করতে না পারে, আমরা ভাইবোন। মনে করুক চরিত্রহীন দুটো ছেলেমেয়ে। বিয়ে না করেই স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকছে।

আমাদের পরিবারের মুখে চুনকালি পড়বে!

কারা দেবে সেই চুনকালি? যাদের নিজেদের মুখেই কালি। সেই তারা, যারা মেসোমশাইকে নোংরা বই আর কুৎসিত চিঠি পাঠিয়েছিল? তোমার বাবা, তোমার দাদু কখনও ভয় পেতেন না। তাঁরাই ছিলেন প্রকৃত সাহসী, মহাপুরুষ। কী তুমি গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর কথা বলছ! তোমাকে আজ রাতেই গেরুয়া পরিয়ে দিলে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে যাবে! তোমাকে যদি আমি জড়িয়ে ধরি? তোমার সামনে দাঁড়িয়ে যদি আমি একে একে সব খুলতে থাকি?

মুকুর হাবভাব দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। মাঝে মাঝে ভয় হয় মানসিকভাবে ও সুস্থ কিনা! ভয় হয় হিচককের ছবির চরিত্র না হয়ে ওঠে। কিছুই হয়তো বোঝা গেল না, ঝপ করে বুকে ছুরি বসিয়ে দিল, কি গলা টিপে ধরল! মনের ব্যাপার নদীর মতোই, কখন কোন ধারায় বইবে! এমন একরোখা মেয়ে সহসা দেখা যায় না। মুকু আমাকে হতবাক করে রেখে পাশের ঘরে চলে গেল। আলমারি খোলার শব্দ পেলুম। মুকু সবই জানে কোথায় কী আছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে, একটা শাড়িটাড়ি কিছু দেবে তো! না কি এই বিয়ের পোশাকেই রান্নাঘরে ঢুকব?

তুমি তো জানো কোথায় কী আছে।

জানি বলেই জিজ্ঞেস করছি। শাড়ি এ বাড়িতে পাব কোথায়? শাড়ি পরার মানুষ কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল কার বিবাহে উপহার দেওয়া হবে বলে একটা শাড়ি কেনা হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া আর হয়নি। সেই শাড়িটা কি তা হলে মুকুর জন্যেই আছে! নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে রেখেছে। যেমন পুজো পাবেন বলে ঈশ্বর পৃথিবীতে ফুলের বাগান করে রেখেছেন!

What if the Universe wears a mask?
What if no latitudes exist
With lips they would not seal with putty
Against the winter's blast?

সেতারের রিমঝিম ঝালার মতো রাত বাড়ছে। স্বস্তি তো কিছুই ছিল না, অস্বস্তি আরও বাড়ছে। মুকুর উত্তম-মধ্যম তিরস্কারে আমার ভণ্ডামির মুখোশ খুলে পড়ে যাবার উপক্রম। সারা ঘরে পায়চারি করছে। কখনও থমকে দাঁড়াচ্ছে জানলার সামনে। বাইরে রাতের পরদা ঝুলছে, তারার চুমকি বসানো। মোড়ের মাথায় খেয়ালি সঙ্ঘ। সেখানে উত্তরা নাটকের মহলা চলেছে। প্রবীণ আর নবীনদের দল। এই প্রথম দলে একজন মহিলা এসেছেন। এ পাড়ার দুঃসাহসী সুন্দরী মেয়ে। তার নাম মুক্তি। মুকু আর মুক্তি প্রায় একরকম। দু'জনেই সমান স্বাধীন। সমান সুন্দরী। মুক্তি আমাদের ক্লাসেই পড়ত। স্কুল থেকেই সে আগুন জ্বালিয়ে আসছে। এক শিক্ষক মহাশয়ের কোচিং ক্লাস ছিল। আমরাও সেখানে পড়তুম। সেই শিক্ষকের খুব ক্ষমতা ছিল। তিনি টেস্ট পরীক্ষা ও ফাইনাল ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রশ্ন আউট করতে পারতেন। তাই তাঁর খুব পসার ও প্রতিপত্তি ছিল। একদিন মহা হইচই। শোনা গেল, সেই শিক্ষকমহাশয় মুক্তিকে কোলে বসিয়ে খুব ঘাঁটুঘাঁটু করছেন। আমরা, যারা কাঙালের দল, চেল্লাচিল্লি শুরু করে দিলুম। আমাদের স্কুলে ছাত্র-আন্দোলনের সেই সূত্রপাত। চরিত্রহীন শিক্ষকের পদত্যাগ চাই। শুধু পদত্যাগ নয়, শিক্ষকমহাশয়ের মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে মিছিলে ঘোরানো হবে। বামপন্থী রাজনীতি তখন মাথা তুলতে শুরু করেছে। ছাত্রদের আর সেই প্রাচীন মেজাজ নেই। শিক্ষাগুরুর সামনে কেঁচো হয়ে থাকার দিন শেষ। প্রথমে হল ছাত্র ধর্মঘট। চিৎকার, চেঁচামেচি। ছাত্রনেতার জ্বালাময়ী বক্তৃতা। প্রধানশিক্ষক ঘেরাও। অতঃপর চেয়ার টেবিল ভাঙাভাঙি, অবশেষে ছোট মাপের কয়েকটা বোমা ফাটানো। সেই সময় স্কুলে একটা শাস্তি প্রচলিত ছিল, রাস্টিকেট করা। তিন নেতাকে সেই শাস্তি দেওয়া হল। ছাত্র-আন্দোলন আরও জোরদার হল। দিনের পর দিন স্কুল বন্ধ। শেষে সেই 'মুক্তি'কামী শিক্ষককে স্কুলের কম্পাউন্ডে ঘেরাও করা হল। কুৎসিত গালিগালাজ, দু'-একটা চড়চাপড়। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা। শিক্ষকের ভাবমূর্তি চটকানো। শিক্ষককে শেষপর্যন্ত অপমানের বোঝা নিয়ে সরতে হল। পরে জেনেছিলুম, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। একটা ষড়যন্ত্র। অপূর্ব সেই রহস্যজাল! শিক্ষকমশাই যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়িটা ছিল পুরনো আমলের বিশাল বাড়ি। মুক্তির বাবা ওষুধের কারবার করে বেশ দু'পয়সা করেছিলেন। তিনি বেশ দাঁও মেরে বাড়িটা কিনলেন। ভেতর ভেতর হাত বদল। মাস্টারমশাই গোটা চল্লিশ টাকা ভাড়ায় অত বড় একটা বাড়ি ভোগ করছিলেন। তাঁকে তো তুলতে হবে! যেমন বাপ তার তেমন মেয়ে। টাকার চেয়ে বড়

দুনিয়ায় আর কী আছে! আমাদের সঙ্গে হেমন্ত বলে একটা ছেলে পড়ত। মহা তেএঁটে। সে-ই প্রথম রটালে। সন্ধের মুখে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখে।

কী দেখে!

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আদিরসই শ্রেষ্ঠ রস। কোথায় লাগে খেজুর রস! হেমন্ত মনে মনে যা করতে চায়, সবই করিয়ে দিলে সেই নিরীহ সৎ শিক্ষককে দিয়ে। হেমন্ত আড়াল থেকে দেখছে— মুক্তির অন্তর অঙ্গ। আমাদের ধমনীতে রক্ত টগবগ করে উঠল। কান গরম, চোখ লাল। সেই অঙ্কুরিত বয়সে ওইসব বর্ণনায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। শুনতে শুনতে প্রদ্যোত আমাকে জড়িয়ে ধরে গাল কামড়ে দিলে, যেন আমিই মুক্তি। মাঝখান থেকে হল কী? হেমন্তর নতুন একটা সাইকেল হল। ঠেলাগাড়িতে রাজ্যের মাল তুলে শিক্ষকমশাই চলে গেলেন পাড়া ছেড়ে। সেই দৃশ্য আজও আমার চোখে ভাসছে। চৈত্রের দুপুর। গাজনের গেরুয়া সন্ন্যাসীরা পথে হাঁকছেন, বাবা তারকনাথের চরণের সেবায় লাগি। ঠেলা চলেছে, পেছনে বিবর্ণ একটি ছাতা মাথায় মাস্টারমশাই হাঁটছেন। আর মুক্তি রাতারাতি হয়ে গেল নায়িকা। গৌরব বেড়ে গেল তার। ছেলেদের মধ্যে লাঠালাঠি, ফাটাফাটি। সবাই মুক্তির প্রেমিক হতে চায়।

মহলার শব্দে পাড়া কাঁপছে। হঠাৎ মনে হল, হেমন্তর সঙ্গে আমার তফাত কোথায়? সৎ, সাত্ত্বিক, আদর্শবান, আচার্যস্বরূপ এক মানুষকে দেশত্যাগী করে নিজে জাঁকিয়ে বসেছি জমিদারের মতো। লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সবই আমার আছে পুরোমাত্রায়। সর্বোপরি ভীরু। নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে নড়তে চাইছি না।

মুকু সোজা এগিয়ে গেল কাপড়জামার আলমারির দিকে। এক টানে পাল্লাটা খুলে ফেলল। নাড়ানাড়ি করল খানিক। টেনে বার করল একটা শাড়ি। সেই ফিকে হলুদ রঙের শাড়িটা, যেটা আমি কাকিমাকে পুজোয় দোব বলে কিনেছিলুম। দেওয়া আর হল না।

মুকু শাড়িটা তুলে ধরে বললে, এটা কার? তোমার সেই কাকিমায়ের?

সহসা উত্তর দিতে পারলুম না। আমতা আমতা করে বললুম, পুজোর সময় দোব বলে কিনেছিলুম।

দিলে না কেন?

পরিস্থিতি বদলে গেল।

মুকু খাটে বসল। শাড়িটা কোলের ওপর। প্রশ্ন করল, সত্যি কথা বলো তো, ওই মহিলার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী ছিল? আমি তোমার কনফেশন চাইছি।

কেন প্রশ্ন করছ মুকু? তুমি তো জানো। তুমি তো অনুমান করতে পারো। আমি একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিলুম। এখন আবার ঠিক হয়ে গেছি।

তোমার লজ্জা করেনি? নিজের ওপর ঘৃণা আসেনি?

এসেছে। সামলাতে পারিনি নিজেকে।

তুমি না সন্ন্যাসী হবার স্বপ্ন দেখো? কথায় কথায় শঙ্কর, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলো। তোমার লজ্জা করে না! বুঝতে পারো না তুমি কত ঘিনঘিনে! তুমি একটা পারভার্ট! আমার কাছে খুব

বোলচাল মেরেছিলে। মুকু, আমি ব্রহ্মচারী। আমার পথ ভোগের নয় যোগের! কত রঙ্গই না জানো! এইভাবে চললে, তুমি কোথায় শেষ করবে জানো কি? বেশ্যালয়ে!

আমি চিৎকার করে উঠলুম, মুকু!

এ তোমার আর্তনাদ, ধমক নয়। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে গেছ। এইবার আমি তোমাকে ধরব। আমাকে তুমি চিনতে পারোনি এখনও। আমি তোমার বাবার প্রতিনিধি।

তিনি কি তোমাকে পছন্দ করতেন?

না, করতেন না। তার প্রধান কারণ তুমি। তুমি যে কত দুর্বল চরিত্রের তিনি তা জানতেন। যে-কোনও মেয়ে একটা টুসকিতে তোমার ঠাটঠমকের দুর্গ ভেঙে দিতে পারে। প্রমাণ চাও? দেখবে, এখুনি তোমার কী করুণ অবস্থা আমি করে দিতে পারি? দেখতে চাও?

মুকুর হাতদুটো আমি ধরে ফেললুম, আমাকে তুমি বাঁচাও। তুমি আমাকে পড়ে ফেলেছ মুকু, খোলা বইয়ের মতো। আমি উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছি। এঁটো হয়ে গেছি। অপবিত্র হয়ে গেছি।

তুমি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছ। মেয়েরা যে-ধরনের চরিত্রকে ভয় পায়, ঘৃণা করে, তুমি ক্রমশই সেই ধরনের একটি চরিত্র হয়ে উঠছ। এই হলে জীবনে তুমি কোনওদিন সুখী হতে পারবে না, সুখীও করতে পারবে না কারওকে। শেষ পরিণতি আত্মহত্যা। আমার হাত ছাড়ো। তুমি কাঁপছ?

ভয়ে ভয়ে হাত ছেড়ে দিলুম। মুকুর চোখে নিজেকে খুব ছোট মনে হচ্ছে। অক্ষমের লেখা উপন্যাসের মতো অপাঠ্য।

মুকু বললে, ওই ঘরে ঠাকুরের কাছে আজ প্রদীপ ধূপ জ্বালিয়েছিলে?

না।

কেন?

আমরা তো এই সবে এলুম।

কথাটা তোমার মনে ছিল?

বোধহয় না।

নিষ্ঠা বলে একটা শব্দ আছে, জানো?

জানি।

তোমার কি তা আছে? একটা জিনিস তুমি কতদিন ধরে থাকতে পারো, হিসেব করে দেখেছ?

বেশিদিন পারি না।

তোমার স্বভাব হল মাছির স্বভাব। একবার এখানে বসছ, একবার ওখানে বসছ। কখনও ফুলে, কখনও গুয়ে। নতুন নতুন খেয়ালের পেছনে ছুটছ। নতুন নতুন মেয়ে। গলে যাওয়া আইসক্রিমের মতো বসে না থেকে উঠে পড়ো। বাথরুমে গিয়ে চান করো ভাল করে। ঠাকুরের জায়গায় প্রদীপ জ্বালো। ধূপ দাও। কিছুক্ষণ চুপচাপ আসনে বসে থাকো চোখ বুজিয়ে। রুটিন থেকে সরে গেলে চলবে না। আমি এই শাড়িটা পরছি।

তুমি হস্টেলে ফিরবে না?

একবার বলেছি, না। বারেবারে একই প্রশ্ন আমার ভাল লাগে না। কাল সকালে গিয়ে আমার মালপত্র সব নিয়ে চলে আসব চিরকালের জন্যে।

আমাকে তো দেরাদুনে ট্রান্সফার করেছে।

সে তো আরও ভাল। দু'জনেই যাব।

তোমার এম এ?

বিয়ের পর চিন্তা করা যাবে। দেরাদুন থেকে হরিদ্বার খুব কাছে। হৃষিকেশ, লছমনঝোলা, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ। আমরা বাবাকে খুঁজতে বেরোব। আশ্রমে আশ্রমে। ঠিক পেয়ে যাব। পাহাড়, নদী, ঝরনা, এই তিনের মধ্যেই তো তিনি ঈশ্বরকে দেখেছিলেন। তাড়াতাড়ি বাথরুমে যাও। তোমার পরে আমি যাব।

সদরের কড়া নড়ে উঠল। আমরা দু'জনে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। তিনি ফিরে এলেন নাকি? আমি ফিসফিস করে বললুম, কে বলো তো? বাবা?

কড়া নাড়ার ধরন দেখে বুঝতে পারছ না! এলোমেলো। ছন্দ নেই। কড়া নাড়ার ধরন দেখে ব্যক্তিত্ব বোঝা যায়। নতুন কেউ। ভয়ে ভয়ে নাড়ছে। যাও দেখে এসো।

দরজা খুলে অবাক হয়ে গেলুম। দাঁড়িয়ে আছেন টিপ আর টিপের মা।

বউদি বললেন, কত রাত হয়ে গেল! আরও একটু আগে আসা উচিত ছিল।

টিপ বললে, মাকে আমি সেই সন্ধে থেকে তাড়া লাগাচ্ছি, চলো, চলো, চলো। কাজ যেন আর শেষই হয় না।

বউদি বললেন, চলো, তোমার কোথায় কী আছে, সব গুছিয়ে নিয়ে একেবারে চলে যাই। তোমার জন্যে একটু অন্যরকম রাঁধতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল। বেশিরভাগ রান্নাই অবশ্য টিপ রেঁধেছে। বললে, পিন্টুদাকে আজ জন্মদিনের খাওয়া খাওয়াব।

আমার গলা শুকিয়ে আসছে। মুকু তো আমাকে যেতে দেবে না। সবাই ওপরে উঠে এলুম। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে মুকু রাজমহিষীর মতো। টিপ, ইতু বউদি দু'জনেই থতমত খেয়ে গেছেন। মুখেচোখে একটা অপ্রস্তুত ভাব। সেই ভাবটা কাটাবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিলুম, আমার মাসতুতো বোন মুকু। মুকু দু'হাত তুলে নমস্কার করল।

আমি আরও একটু যোগ করলুম, বাইরে থাকে। কলকাতায় এসেছে লেখাপড়া করার জন্যে।

বউদি নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন, পিন্টু আমাকে বউদি বলে। এই আমার মেয়ে টিপ।

মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, যাও দেরি কোরো না। তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে। বিকেলের সাজে বউদিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। কালো কুচকুচে চুল। টানটান খোঁপা। ডুরে শাড়ি। টিপ বেশ কুঁচিয়ে শাড়ি পরেছে। চুলে বিনুনি। ফুলের মতো সুন্দর। আমি পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে। মুকু বোধহয় দেখাতে চাইছে আমার ওপর তার কতটা কর্তৃত্ব! মুকুর ভিতরে একটা ডিক্টেটর বসে আছে। শীত আসছে। জল বেশ ঠান্ডা। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভাবছি, ব্যাপারটা বেশ জটিল হল। বউদিকে এখন আমি কী বলব? মুকু যেভাবে হাল ধরেছে, সহজে টাল খাবার নয়। ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালালুম। একগোছা ধূপ। সারাবাড়ি গন্ধে ভরে গেল। আসনে বসামাত্রই মনটা অন্যরকম হয়ে গেল। এই আসন সাধকের আসন। বাবা বসতেন।

কোনও আসনে দিনের পর দিন বসে অবিরত সৎ চিন্তা করলে, সেই আসনে শক্তি সঞ্চারিত হয়। সেই আসনে বসামাত্রই, আসন তাকে গ্রাস করে। অনধিকারী কেউ বসলে আসন তাকে ঠেলে ফেলে দেয়। একটা ঝিমঝিম শান্তির ভাব ছেয়ে আসছে শরীরে। মনে হচ্ছে, দেহের বাঁধন খুলে পড়ছে। কোথা থেকে কোথায় যেন চলেছি ভেসে ভেসে। এইভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকা যেত, কিন্তু উঠে পড়তে হল।

ঘরে ঢুকে দেখি মেয়েদের মজলিশ বসে গেছে। মুকু মধ্যমণি। বউদি তার গায়ের ওপর হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। টিপের মুখ উদ্ভাসিত। যাক, মুকু তা হলে মিশে গেছে!

বউদি বললেন, পুজো করে এলে?

মুকু বললে, ও তো ধ্যান-জপ নিয়েই থাকে। মাঝে মাঝে ভয় করে, সংসার ছেড়ে চলে না যায়!

বউদি বললেন, হবেই তো, এ যে সাধকের বাড়ি। রক্তে সাধনা আছে।

মুকুর কথায় অবাক হয়ে গেলুম। বলে কী! আমাকে ঠেলে কোথায় তুলছে! একটু আগে বললে, কাপুরুষ। পর্যাপ্ত তিরস্কার। এমন কথা নেই, যা বলেনি। এখন বলছে মহাপুরুষ।

মুকু বললে, চলো, রান্নাঘরে কোথায় কী আছে দেখে নিই। আজ তোমাকে বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল খিচুড়ি।

বউদি বললেন, সে আর কী কথা! তোমরা আমার ওখানে খাবে। আমি এতক্ষণ সব রান্না করলুম কীসের জন্যে?

মুকু বললে, সে আপনি একজনের জন্যে করেছেন, আমার কথা তো ছিল না। ও তা হলে যাক। আমি আমার মতো ফুটিয়ে নিই।

বউদি খপ করে মুকুর হাতদুটো ধরে বললেন, এ তুমি কী কথা বলছ? অভিমানের কথা। তুমি যে আসবে আমার কি তা জানা ছিল? আর সংসারে কেউ ঠিক ঠিক একজনের জন্যে রাঁধে না। সংসার অনেককে নিয়ে। তোমাদের দু'জনকেই আমরা ধরে নিয়ে যাব।

টিপ মুকুর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল। জড়িয়ে ধরে বললে, তুমি কী সুন্দর! তুমি কত কী জানো? মুকুদি, তুমি আমাকে পড়াবে? আমার খুব লেখাপড়া করতে ইচ্ছে করে।

আমি যদি এখানে থাকি নিশ্চয় পড়াব তোমাকে। তুমি এত সুন্দর মেয়ে!

বউদি বললেন, আজ তা হলে তোমার সেইসব জিনিসপত্তর মেলানো হচ্ছে না?

আজ আর থাক বউদি। হাঙ্গামা করে দরকার নেই। মুকু এসেছে। যা করার কালই হবে।

আমি তা হলে একটু চায়ের চেষ্টা করি। মনটা চা-চা করছে।

বউদি বললেন, রাত নটার সময় আর চা খায় না। আমাদের বাড়িতে চলো। তখন দেখা যাবে।

এত তাড়াতাড়ি গিয়ে কী হবে? বিষ্টুদার দোকান বন্ধ হতে হতে সেই রাত এগারোটা!

ওর জন্য বসে থাকবে নাকি?

থাকব না! বিষ্টুদা ছাড়া কিছু জমে! ফাঁকাফাঁকা লাগবে।

মুকু বলল, বউদি, আপনারা এগিয়ে যান, আমরা দশটার মধ্যে যাচ্ছি।

নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলুম। যাবার সময় টিপ বলল, মুকুদিকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে আসব।

মাঝে মাঝে কেন, তুমি রোজই এসো। তোমরা এলে আমার খুব ভাল লাগবে।

বউদি কানে কানে বললেন, তোমার কেমন বোন? সত্যি বলো তো? দূর সম্পর্কের?

আমার জ্যাঠাইমার বোনের ছোট মেয়ে।

বুঝেছি। বউদি মুখ টিপে একটু হাসলেন! আমার হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললেন, তা ভালই। শাসন করতে জানে।

মুকু দাঁড়িয়ে আছে খোলা জানলার সামনে। ঢুকতেই ফিরে তাকাল। ডুরে শাড়িটা বিছানার ওপর ছড়ানো। মুকু রাগরাগ গলায় বলল, নিজের সিদ্ধান্তে নিজে আসতে পারো না? নিজেকে ছড়িয়ে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতা তোমার। গোপনীয়তা রাখতে জানো না? ওঁরা কী করতে এসেছিলেন? যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধে হয়। কাকিমা গেলেন তো বউদি এলেন। সঙ্গে আবার পরি! কিছু পারো বটে!

কী করব বলো, সকালে আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কী করি, কোথায় যাই!

আমি কি মরে গিয়েছিলুম? আমার কাছে আসতে তোমার কী হয়েছিল?

তোমার কাছে যাব বলেই তো বেরিয়েছিলম। বাসস্টপে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলুম। তখন আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে।

তোমার মন কবে আস্ত ছিল? না ভোগে, না যোগে, আরশোলার মতো ফড়ফড় করে উড়ছে একবার এ দেয়াল একবার ও দেয়ালে। নিজেকে আগে একটু স্থির করো তো। তা না হলে তোমার সব যাবে। ভেসে যাবে।

মুকু, তুমি আমাকে আর বোকো না। বিশ্বাস করো, আমার মন ভীষণ খারাপ হয়ে আছে।

সেইজন্যেই তো উত্তম-মধ্যম দিচ্ছি। তোমার মনটাকে ঘোরাবার চেষ্টা করছি। ওরা কী গোছগাছ করতে এসেছিল?

বাড়িতে অনেক সোনার গয়না রয়েছে। ওইভাবে তো ফেলে রাখা যায় না। বিষ্টুদা বলছিলেন, একটা লিস্টি করে ব্যাঙ্কে জমা করে দাও।

তুমি ওদের সামনে সেই গয়না বের করবে! বলিহারি তোমার বুদ্ধি! ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী করতে আছে?

ওঁরা সবাই ভীষণ ভাল মানুষ, তুমি জানো না।

যতই ভাল মানুষ হন, কাঙালকে শাকের খেত দেখাতে আছে?

তুমি ওঁদের কাঙাল বলছ?

সংসারী মানুষ মাত্রেই কাঙাল। কখন কী অভাবে পড়বেন বলা যায়। তখন তোমার কাছে আসবেন সাহায্যের জন্যে। ফেরাতে পারবে না। দিতেই হবে।

বিপদে সাহায্য করা খারাপ?

সাহায্য তাঁরাই করতে পারেন, যাঁদের অনেক আছে। আর অনেক যাঁদের আছে, তাঁরা কখনই সাহায্য করবেন না। তাঁরা থাকেন সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। মাঝামাঝি জায়গায় যারা আছেন তাঁরাই মরেন। কত তুমি সাহায্য করবে? কজনকে তুমি সাহায্য করবে? একটু বুঝতে শেখো। অত হলহলে হলে চলবে না। পরিবারের গোপন কথা মানুষের মুখে মুখে ছড়ায়।

তুমি বড় সংসারী মুকু। বড় বেশি হিসেবি।

একজন বেহিসেবি হলে আর একজনকে তো হিসেবি হতেই হবে। তা না হলে ব্যালেন্স হবে কী করে? তোমার গয়নার লিস্ট আমি করে দেব। আজ রাতেই করে দোব। এখন চলো খেয়ে আসি।

দোরতাড়া বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এলুম। কোথায় পা ফেলছিলুম জানি না, মুকু হাঁ হাঁ করে উঠল, দেখে দেখে, কীসের ওপর পা পড়ছে একবার দেখো। গোবর।

অতটা খেয়াল করিনি। সামলে নিলুম। মুকু শুধু হিসেবি নয়, সাবধানী। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। খোলা রাস্তা চলে গেছে সামনে পিছনে। ছাড়াছাড়া ল্যাম্পপোস্ট আলোর জাল ফেলে পোকা ধরছে। এ রকে ও রকে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে মানুষ পড়ে আছে। মিষ্টির দোকানের বাইরে ভিয়েন শেষ করে হাওয়া খেতে বসেছেন ঘর্মাক্ত হালুইকর। আমাদের পাড়ার বিখ্যাত মাতাল শামুদা তাঁতের মাকুর মতো টলে টলে ফিরছেন, একবার এদিকে একবার ওদিকে। এইসময় সামনাসামনি পড়ে গেলেই মহা বিপদ। দু'কাঁধ ধরে প্রেম বোঝাবার চেষ্টা করবেন। প্রেম কাকে বলে। খাঁটি প্রেম। পেটে পড়লেই ভদ্রলোক প্রেমের লাইনে চলে যাবেন, অথচ বিয়ে করেননি। ভাল চাকরি করেন। সকালে ফিটফাট ভদ্র। যত রাত বাড়তে থাকে ততই রূপান্তর! মধ্যরাতে সম্পূর্ণ বেসামাল। মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান ধরেন, মোর প্রিয়া হবে এসো রানি, দেব খোঁপায় তারার ফুল। সুন্দর গলা।

মুকুকে বললুম, পা চালাও।

মুকু বললে, কেন?

টলমলে ওই ভদ্রলোক অতিশয় বিপজ্জনক। একবার ধরলে আর রক্ষে নেই।

জানো, ষাঁড় দেখলে আমি ভয় পাই না। আমি মগের দেশের মেয়ে। বাবার হাত ধরে আরাকানের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বার্মা থেকে পালিয়ে এসেছিলুম।

কথায় কথায় শামুদা আমাদের দূর দিয়ে আপনমনে চলে গেলেন। পড়তি জমিদার বংশের ছেলে। ভারী সুন্দর দেখতে।

মুকু বললে, মাতালরা ছাতাকে ভীষণ ভয় পায়।

যাঃ, ছাতাকে কেন ভয় পাবে?

সত্যি! আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। একদিন দুপুরবেলা হরি ঘোষ স্ট্রিটে আমাকে দেখে এক মাতালের প্রেম চাগিয়েছিল। আমার হাতে ছিল একটা ছাতা। ভুটাস করে খুলতেই লোকটা ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে বললে, দেবী, দেবী, মাতা, জননী, বজ্রাঘাত কোরো না। জানো তো, বাঘ গুলির চেয়ে ভয় পায় হাঁচিকে? কেঁদো বাঘের সামনে ফ্যাঁচ করে হেঁচে দেখো লেজ তুলে পালাবে! হাতিকে যদি পায়রার পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দাও দুদ্দাড় করে পালাবে।

এসব তুমি পরীক্ষা করে দেখেছ?

ছাতাটা করেছি। বাকিগুলো শুনেছি।

আমরাও ঢুকছি, বিষ্টুদাও ঢুকছেন। মুকুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না। পরিচয় করিয়ে দিলুম। বিষ্টুদা অসম্ভব খুশি হয়ে বললেন, ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন মা। ছেলেটা মহা বিপদে পড়েছে, কেউ দেখার নেই। পরামর্শ দেবার মতো কেউ নেই। কী খাবে, কোথায় শোবে, তারও কোনও ঠিক নেই। তুমি এসে যে কী ভাল করেছ! চলো চলো ভেতরে চলো।

শিউলির গন্ধে উঠোন ভরে আছে। গাছ একেবারে ফুলে ফুলে সাদা। মা আর মেয়ে দু'জনেই বেরিয়ে এলেন। বউদি মুকুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কী ভাল যে লাগছে! ঘর যেন আলো হয়ে গেল।

মুকু বললে, একটু বেশি বেশি হয়ে গেল। এ বাড়ির আলো আপনারা দু'জনে।

বিষ্টুদা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে হুড়হুড় করে চান করছেন। শীতশীত রাত। ঠান্ডা না লেগে যায়। সবই মানুষের অভ্যাস। অপূর্ব খাওয়া হল। যেন কোনও উৎসবের ভোজ!

মুকু বললে, বউদি, আপনি আর টিপ এইবার বসে যান, আমি পরিবেশন করি।

পরিবেশন করার কিছুই নেই গো, সব আমরা গুছিয়ে রেখেছি। তুমি শুধু আমাদের সামনে জমিয়ে বোসো, গল্প করি আর খাই।

বিষ্টুদা বললেন, আর গল্প করার সময় নেই। রাত হয়েছে বেশ। চলো, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

বেরিয়ে আসার সময় মুকু বললে, দেখে রাখো, একেই বলে লক্ষ্মীর সংসার। ঠিক যেন একটা আশ্রম। শান্তিকুঞ্জ। ভীষণ ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই।

বউদি বললেন, আজ রাতে না-ই বা গেলে। সবাই মিলে বেশ গল্প হবে।

কিন্তু! সেই আশি না কত ভরি সোনা! তারই টানে বাইরে তো রাত কাটানো যাবে না। ভীষণ চুরি হচ্ছে চারপাশে। যক্ষ হয়ে বিষয় আগলাতে হবে। বিছে হার, চন্দ্র হার, বাজু, বাউটি। মৃতাদের যত অলংকার।

Happiness is beneficial for the body
but it is grief that develop the Powers of the mind

গভীর রাতকে মাঝে মাঝে মনে হয় কালো এক অশ্বারোহী। ছুটে চলেছে নতুন এক দিনের দিকে। কখনও মনে হয় জুয়াড়ি। প্রদীপের আলোয় মাথা নিচু করে বসে তিন তাস খেলছে। আগামী প্রভাত কে দেখবে আর কে না দেখবে!

পাশের ঘর থেকে মুকু বেরিয়ে এল সেই ডুরে শাড়িটা পরে। ঘরে ঢুকেই বললে, সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করো। নীচের সব বন্ধ হয়েছে?

হয়েছে।

ঘুপচিঘাপচি সব দেখে এসেছ, কেউ ঢুকে বসে নেই তো ঘাপটি মেরে!

না, তা তো দেখিনি। সদরে খিল লাগিয়ে উঠে এসেছি।

বাঃ, টর্চের আলো ফেলে একবার দেখে এলে না? লুকিয়ে থাকার জায়গার তো অভাব নেই। যাও একবার দেখে এসো।

কঠিন পরীক্ষা। আমি ভিতু। ভয়ংকর রকমের ভিতু। ভূতের ভয়, চোরের ভয়, সাপের ভয়, এমনকী ব্যাংকেও ভয় পাই আমি। ব্যাঙের বিশ্রী একটা স্বভাব হল, লাফিয়ে কোলের ওপর আসার চেষ্টা। সেইজন্যেই বলে কোলা ব্যাং। আমাকে ইতস্তত করতে দেখে মুকু বললে, ধরেছে তো! ভয়ে একেবারে মরে যাচ্ছ!

তুমিও চলো না।

না, তোমাকে একা যেতে হবে। পুরুষমানুষ, সাহস করো। ছায়া দেখে চিৎকার করে উঠো না। সেই পাঁচ সেলের টর্চটা নিয়ে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি। ড্যাম্প। সোঁদা সোঁদা গন্ধ। দেয়ালে নোনা ধরেছে। আপনা আপনিই নানা দেশের মানচিত্র হয়ে বসে আছে। দরজার ফাটলে ফাটলে উচ্চিংড়ের কলরোল। রাতের ঝিল্লি যেন কাঁপছে দিনের গর্ভযন্ত্রণায়! মনে হচ্ছে পাতালে নামছি। পায়ের দিক থেকে একটা গুড়গুড়ে শীত তলপেট পর্যন্ত উঠে আসছে। অন্ধকার যেন কফিনে শুয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি কাঁধে কেউ হিমশীতল হাত রাখবে। ঘাড়ে ফেলবে বরফ-নিশ্বাস।

দেখেশুনে ফিরে এলুম। মুকু খাটে আড় হয়ে শুয়ে আছে রাজরানির মতো। কিছু চুল সামনে ঝুলছে, কিছু পিঠের দিকে। একটা ডায়েরি খুঁজে বের করেছে কোথা থেকে গম্ভীর মুখে পাতা ওলটাচ্ছে। নীল চাদরের ওপর মুকুকে বেশ মানিয়েছে। মুখ তুলে বললে, সব ঠিক আছে?

আছে।

আমি মেসোমশাইয়ের একটা ডায়েরি খুঁজে বের করেছি। বেশ কিছু ঠিকানা লেখা আছে। এই ঠিকানা ধরে আমরা অনুসন্ধান করে দেখতে পারি।

সবই কি কলকাতার?

বেশির ভাগই কলকাতার, বাইরেরও আছে কিছু। দক্ষিণভারত, উত্তরভারত, মধ্যভারত।

ওইসব ঠিকানার সঙ্গে বছরে একবারই যোগাযোগ। বিজয়ার চিঠি। ওর কোনওটাতেই তাঁকে পাওয়া যাবে না।

তোমার অনেক দোষের একটা হল, তুমি নিরাশাবাদী। সব কিছুতেই না। হ্যাঁ বলতে জানো না? যাক তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। দরজা বন্ধ করে গয়নার বাক্স বের করো। আজই লিস্টটা তৈরি করে ফেলি।

অনেক রাত হল, না?

হল তো হল, তাতে তোমারই বা কী, আমারই বা কী? রাতের সম্পর্ক ঘুমের সঙ্গে। সময় নষ্ট না করে সব নিয়ে এসো।

গয়নার বাক্সটা খাটের মাঝখানে রাখা হল। একপাশে আমি আর একপাশে মুকু। মুকুর হাতে কাগজ আর কলম। প্রথমেই বেরোল ছ'টা আংটি। একটা আংটি হাতে নিয়ে মুকু বললে, পাথরটা মনে হচ্ছে হিরে?

হ্যাঁ, হিরে। ওটা আমার মায়ের আঙুলের। বিয়ের আংটি।

আংটিটি নিজের অনামিকায় গলিয়ে মুকু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। একটা অশরীরী আলো ছিটকোচ্ছে। মুকু বললে, মায়ের আঙুল আর আমার আঙুল একই মাপ। আমি যে আসব মা বোধহয় জানতেন। এ সবই তো আমার।

অবাক হয়ে মুকুর দিকে তাকালুম। এত লোভী!

মুকু বললে, খুব খারাপ লাগল শুনতে, তাই না? ইচ্ছে করে বললুম, তোমার মনে ছেঁকা দেবার জন্যে। সবই তোমার, গয়নার লোভ আমার নেই। পুরো বাক্সটা উপুড় করে দাও। আমি এক একটা লিখব, আর তুমি তুলবে।

বাক্সটা উপুড় করে দিলুম। চুড়িতে রুলিতে ঠোকাঠুকি হয়ে কিনকিন শব্দ করে উঠল। মনটা কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। যাঁদের অঙ্গে এইসব শোভা পেত, তাঁরা পৃথিবীর খেলা শেষ করে বহুদিন হল চলে গেছেন। হিরের আংটি আঙুলে। মা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছেন। হিরে ঝিলিক মারছে। নাকে হিরের নাকছাবি। কানে মুক্তোর দুল। কত সুখ ছিল এই সংসারে! মৃত্যু এসে ঈগল পাখির মতো একে একে সব ছোঁ মেরে নিয়ে চলে গেল।

মুকু বললে, অতীত থেকে দয়া করে ফিরে এসো বর্তমানে। এই নাও, নাম্বার ওয়ান। হিরের আংটি। নাম্বার টু, রুবির আংটি, পোখরাজ, নীলা।

লিস্ট ক্রমশই বড় হচ্ছে। বিছে হার, প্রজাপতি হার, চেন, সাপ বালা। জোড়া সাপ। সাপের চোখে রুবি। প্রজাপতি হারটার অবাক করা শোভা। মোটামোটা চুড়ি, রুলি, আর্মলেট, টায়রা, ব্রোচ। শেষ গয়নাটা যখন

বাক্সে ফিরে এল ঘড়িতে তখন রাত দুটো। আমার হাই উঠছে। মুকু আমার চুলে হাত বুলিয়ে বললে, এইবার বাবুর ঘুম পেয়েছে গো! যাও সব তুলে রাখো। কাল আমরা দু'জনে গিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

আলমারির মধ্যে বাক্সটা চালান করে দিলুম। চন্দনের গন্ধ, ন্যাফথালিনের গন্ধ ছড়িয়ে গেল ঘরে। নানারকম সুগন্ধীর সঙ্গে আমার পিতার যোগ ছিল। ফালি ফালি কাপড়ে নানারকম সেন্ট মাখিয়ে জানলায় জানলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মোটা গালচে পেতে এসরাজ বাজাতে বসতেন। সুর আর সুগন্ধ একসঙ্গে ছড়াত সারা বাড়িতে। এসরাজটা সিল্কের আলখাল্লা পরে কোণের টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। আর কি কোনওদিন বেজে উঠবে!

মুকু আলগোছে ঢকঢক করে জল খেল। খাটের চাদরটা টানটান করে বালিশ পেতে দিয়ে বললে, নাও শুয়ে পড়ো। শোওয়ার আগে জল খেয়ো।

আর তুমি?

আমি পাশের ঘরে।

সেকী? এই বিশাল খাটে আমাদের দু'জনেরই তো চমৎকার হয়ে যেতে পারে!

আরে ছি, ছি, দু'জনে একই বিছানায় শোওয়া যায়, না শোওয়া উচিত? তিনি থাকলে পারতে? না-থাকায় তিনি আরও আছেন। এই কথাটা যেন ভীষণভাবে মনে থাকে! কোনও অপবিত্র আদর্শবিরোধী কাজ এই বাড়িতে চলবে না। এটা জ্ঞানপীঠ, সাধনপীঠ!

পাশাপাশি চুপচাপ দু'জনে শুলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

মহাভারত অশুদ্ধ না হলেও, দেহ অশুদ্ধ হবে। তুমি একটু একটু করে আমার দিকে সরবে, আমি সরব তোমার দিকে। রাত ভোর হবার আগেই যা হবার তা হয়ে যাবে। লোহা আর চুম্বক দূরে দূরে থাকতে পারে না।

আমি কথা দিচ্ছি।

তোমার কথা যে আমি বিশ্বাস করি না মহারাজ। তুমি মিথ্যাবাদী।

মিথ্যাবাদী? আমি মিথ্যাবাদী?

ডাহা মিথ্যাবাদী। বিকেলে তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, সারাদিন তুমি কী খেলে? অম্লান বদনে বললে, টুকটাক, সামান্য কিছু। মানে, প্রায় উপোসই করে আছ। ইতু বউদি বললেন, তুমি দুপুরে পাত পেড়ে চর্ব-চুষ্য খেয়ে গেছ। এই ডাহা মিথ্যেটা তুমি বললে কেন? আমি জানি কেন বললে! তোমার সবটাই লোকদেখানো। তুমি দেখাতে চাইলে, দেখো, আমি কত বিচলিত, নাওয়া খাওয়া ভুলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি আওয়ারা হয়ে। আসলে, ব্যাপারটা তুমি বেশ মেনে নিয়েছ শান্ত মনে, হজম করে ফেলেছ। কোনও কিছু তোমার মন স্পর্শ করে না। মন ছুঁয়ে চলে যায়। ছোট ছোট ব্যাপারেই মানুষকে চেনা যায়, বড় ব্যাপারে যে কী করবে! আর যেই করুক তোমাকে আমি আর বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করেননি তোমার বাবাও। নাও এখন শুয়ে পড়ো। আমি পাশের ঘরে চললুম। আমার প্রবল ঘুম পেয়েছে এইবার। আর দাঁড়াতে পারছি না। শোওয়ার আগে হাত জোড় করে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর! আমাকে চরিত্র দাও, আবেগ দাও, চোখে জল দাও।

লোককে দেখাব না, নিজেকে দেখাব। নিজেই নিজেকে দেখে বাহবা করে উঠব। সার্টিফিকেট বাইরের কেউ দিতে পারে না। নিজের সার্টিফিকেট নিজেই দেওয়া যায়।

মুকু যেন আগুনের মতো জ্বলছে। আমার বিবেক যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। আমি বসে রইলুম গুম মেরে। আমার ঘুম ছুটে গেছে। হাওয়া কোন দিকে ঘুরছে কে জানে? নিস্তব্ধ চরাচর। উত্তুরে বাতাস ছেড়েছে। দমকে দমকে। গাছের পাতায় ঝুপঝাপ শব্দ। হঠাৎ একটা গান ভেসে এল মনে,

সুদূর কোন নদীর পারে গহন কোন বনের ধারে
গভীর কোন অন্ধকারে হতেছ তুমি পার॥

তিনি কে? তিনি আমার পিতা, শ্রীযুত হরিশঙ্কর। নিরুদ্দিষ্টের কলামে বিজ্ঞাপন দিতে হলে লিখতে হবে: প্রবীণ এক মানুষ। সুঠাম শরীর। উচ্চতা, পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। বুকের মাঝখানে অ্যাসিডে পুড়ে যাওয়ার দাগ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পাতলা ক্ষুরধার ঠোঁট। উন্নত নাসা। তিনি সুদূর কোন নদীর পারে গহন কোন বনের ধারে এই গভীর নিশায় দাঁড়িয়ে আছেন একা। একটি খেয়া হঠাৎ খুলে গেল তীর থেকে। গভীর কোন অন্ধকারে হতেছ তুমি পার। আর ভাবতে পারছি না। এইবার শুয়ে পড়ি।

ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় টকটক শব্দ। জানলায় উজ্জ্বল প্রভাত। মুকুর গলা, গেট আপ মাই বয়। বাইরে এসে অবাক হয়ে গেলুম। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। হাতে একটা ঝাড়ু। খোঁপা মাথার উপর উঁচু করে বাঁধা।

মুকু বললে, গুড মর্নিং।

মর্নিং। তোমার এ কী বেশ?

কাজের লোকের বেশ। তোমার ঘরটা ছাড়া সবই পরিষ্কার করা হয়ে গেছে। উনুনে আগুন পড়েছে। এইবার চা চাপছে। মুখ ধুয়ে নাও।

কখন উঠেছ তুমি?

উঠেছি? কখন শুয়েছি তাই বলো?

সেকী, সারারাত জেগে ছিলে? কেন? ঘুম এল না?

তা হলে এই দেখো।

মুকু নিমেষে তার ডান উরুটা আমার সামনে খুলে ধরল। ফরসা ধবধবে। এত ফরসা যে চোখে ধাঁধা লেগে গেল। সেই শুভ্র ত্বকে থর নিয়ে উঠেছে লাল চাকামতো একটা কী।

চমকে প্রশ্ন করলুম, কী ওটা?

শাড়ি নামিয়ে দিয়ে মুকু বললে, যন্ত্রণা। সবে শুয়েছি। ঘুমও প্রায় এসে গেছে। এমন সময় দিলে কামড়ে।

কী কামড়াল?

বিছে। খপ করে চেপে ধরলুম অন্ধকারে। চটকে রগড়ে রসটা মাখিয়ে দিলুম। জানো তো, বিষের ওষুধ বিষ। সারারাত জ্বলল হুহু করে লঙ্কাবাটার মতো। বসে বসেই রাতটা কেটে গেল।

আমাকে ডাকলে না কেন?

তুমি আমার সুখের সাথী। দুঃখের সাথী হতে যাবে কেন?

কাল থেকে তুমি খুব পাকাপাকা কথা বলছ। কই দেখি আর একবার?

মুকু হেসে বললে, আর না মশাই। একবারই যথেষ্ট।

তুমি আমাকে কী ভাবো বলো তো! চলল, একটু ওষুধ লাগিয়ে দিই।

কোনও প্রয়োজন নেই, আপনিই সেরে যাবে। তুমি তোমার কাজে যাও, আমি যাই আমার কাজে। মুকু আমার ঘরে ঢুকে গেল। মশারি তুলে, বিছানা গোছগাছের কাজে লেগে গেল। দাঁত বুরুশ করতে করতে নিজেকে ধিক্কার দিলুম— সত্যিই তুমি বাপু শয়তান। তোমার ছলের অভাব নেই। মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছ না? মানুষের একটা প্রত্যঙ্গ তোমাকে এমনভাবে কাবু করে ফেলল? হবে না, তোমার কিছু হবে না। সেই দুই সন্ন্যাসীর গল্প। দু'জনেই চলেছেন, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। খুব বৃষ্টি হয়েছে ক' দিন। চারপাশে জলকাদা। ডোবা, খানাখন্দ। সন্ন্যাসী দু'জন চলেছেন। পেছনে আসছিলেন এক সুন্দরী যুবতী মহিলা। তেমনি তাঁর সুন্দর সাজপোশাক। সামনেই একটা কাদার দঁক। মহিলা ইতস্তত করছেন। এই কাদায় নামলে শাড়ি জুতো সবই যাবে। তাঁর ইতস্তত ভাব দেখে এক সন্ন্যাসী তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। মহিলা কিছু বলার আগেই পাঁজাকোলা করে তাঁকে কাদার অংশটুকু পার করে দিলেন। আবার চলতে শুরু করলেন দুই সন্ন্যাসী। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এসে পৌঁছোলেন এক মঠে। রাত হল। দু'জনেই শুয়েছেন এক ঘরে। হঠাৎ দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বললেন, পরমানন্দ! তুমি এটা কী করলে?

কোনটা?

তুমি তো জানো, আমাদের মতো সন্ন্যাসীর নারীদর্শনেও চিত্তচাঞ্চল্য হতে পারে। স্পর্শ! সে তো আরও ভয়ংকর! আর তুমি সেই মহিলাকে কোলে করে কাদা পার করালে! কাজটা কি ভাল করলে?

পরমানন্দ হাসতে হাসতে বললেন, হায় হরি! আমি তো তাকে কখন কোল থেকে নামিয়ে দিয়েছি, তুমি এখনও তাকে বয়ে বেড়াচ্ছ!

ওই দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর অবস্থা হয়েছে আমার। কতক্ষণে ওই নিদারুণ প্রত্যঙ্গ মন থেকে সরে যায় দেখি! সারাটা দিনই থাকবে। নিজেকে তো ভালই চিনি। মুকুর ডাক ভেসে এল, কতক্ষণ ধরে দাঁত মাজবে! তোমার ক'টা দাঁত? বত্রিশটা না চৌষট্টিটা?

মুকুর বেশ দেখে চমকে উঠলুম। আমার একটা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে দু'কাপ চা হাতে নিয়ে ঘরের দিকে চলেছে।

এ তোমার কী বেশ?

কী করব, বাসী কাপড়চোপড় সব কেচে দিয়েছি। আর তো নেই কিছু।

কেন, যে শাড়িটা পরে এসেছিলে?

সেটা তো রাস্তার কাপড়। ওটা পরে রান্নার কিছু ছোঁয়া যায়!

উঃ, তুমি একটা হয়েছ বটে! তোমার ওই জায়গাটা কেমন আছে?

আবার সেই চিন্তা! বেশ আছে, ভাল আছে। মাঝে মাঝে চিনচিন করছে।

ডাক্তারবাবুকে কল দোব?

তার আগে এসো দু'জনে মিলে বাড়িটা পরিষ্কার করি। বাজারে যাবে তো?

কী রাঁধবে?

সব নিরামিষ।

আমরা তো শাক্ত!

মেলোমশাই মাছ, মাংস, ডিম সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। দাদু শেষটায় হয়েছিলেন বিষ্ণুর উপাসক। পিতার আদর্শকে যে-ছেলে ধরে রাখতে পারে সে-ই সুসন্তান। একথা আমার নয় কনফুসিয়াসের।

তোমার হস্টেলের কী হবে!

বারোটার সময় আমরা দু'জনে বেরোব খেয়েদেয়ে। প্রথমে যাব ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে হস্টেলে। যা আছে সব নিয়ে চলে আসব।

আর ইউনিভার্সিটি?

কাল থেকে আবার ক্লাস শুরু হবে।

আর আমার চাকরি?

কাল থেকে বেরোও। কতদিন আর বাড়িতে বসে থাকবে।

আমাকে তো দেরাদুনে বদলি করেছে।

তুমি তোমার অসুবিধের কথা গিয়ে বলো। বলো আমি এখন কলকাতায় থাকব।

সে হয় না। অত বড় একটা প্রোমোশন নেব না!

তাই বলো! লোভ! লোভে ধরেছে। তা হলে দোরতাড়া বন্ধ করে দেরাদুনে চলে যাও। আমি আমার হস্টেলেই ফিরে যাই।

একটা কথা বলব সাহস করে?

বলো।

বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত করলুম। বলব কি বলব না? শেষে আমতা আমতা করে বলেই ফেললুম, আমরা যদি বিয়ে করি? করে সোজা দেরাদুনে চলে যাই?

মুকু হাহা করে হেসে উঠল, বিয়ে করবে? মেসোমশাইয়ের অবর্তমানে, অনুমতি ছাড়াই? তিনি বাঁচলেন কি মরলেন একবার দেখবে না! নিজের সুখ নিজের কেরিয়ারটাই কেবল দেখতে চাও! যে-মানুষ সমস্ত ত্যাগ করে তোমাকে মানুষ করলেন, শেষটায় তিনি এইভাবেই হারিয়ে যাবেন!

তা হলে আমি করবটা কী? শূন্য ঘাটে আমি কী-যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী?

একটা কাজই তুমি করবে, ওই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম লাইনে যা আছে, তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে। তুমি বসে থাকবে, সব যেমন ছিল সেইভাবে বজায় রেখে। একেবারে টিপটপ করে রাখতে হবে। তিনি আসবেন, আসতে তাঁকে হবেই। আমার মন বলছে। প্রয়োজন হলে তোমাকে চাকরি ছাড়তে হবে।

খাব কী?

খাবে না। মাস্টারি করবে। অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করবে। টেকনিক্যাল লাইনে চাকরির অভাব হবার কথা নয়। না হয় দু'পয়সা কমই মাইনে হবে। মা-মরা ছেলেরা অবশ্য স্বার্থপরই হয়। তুমি একটু বেশি স্বার্থপর, এই যা তফাত।

তা হলে কী করব এখন?

বাজার করবে। বারোটার মধ্যে বেরোতে হবে। একেবারে বর্তমানের কথাটাই আগে ভাবো, তারপর আগামী দিনের কথা ভাবা যাবে। তোমাকে আমি বাজে পরামর্শ দোব না।

ব্যাগ বগলে রাস্তায় নেমে এলুম। চারপাশে যেন গ্যাজগ্যাজ করছে। রাস্তায় নেমে মনে হল, আমি ভীষণ অসুস্থ। জীবনের সুর কেটে গেছে। দু'পা যেতে-না-যেতেই পেছন থেকে মেয়েলি গলায় ডাক এল, এই যে পিন্টু, পিন্টু।

এ পাড়ার বিখ্যাত মেনিদা। সাতসকালেই মুখে ডবল খিলি পান। চ্যাকোর চ্যাকোর করে চিবোচ্ছেন। হাতে ধরে আছেন পানের বোঁটায় চুন। জিজ্ঞেস করলুম, কী বলছেন?

তোমার বাবা উঠেছেন?

না।

আঃ, ভেরি লেট রাইজার। ভোরে ওঠার মহিমা বুঝল না। সারাজীবন শুধু শুনেই গেল সূর্য পুব দিকে ওঠে। দেখা আর হল না। তুমি তো ডেকে দিতে পারো। এই বয়েসে ভোরবেলা বেড়ানোই হল বেস্ট একসারসাইজ। আমি সেই ভোর পাঁচটা থেকে ঘুরছি। তা কখন গেলে দেখা হবে বলো তো?

তিনি কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেছেন।

তাই নাকি, চেঞ্জে? তা আমি যে আবার অন্যরকম শুনলুম। সেই বিধবা মাগিটাকে নিয়ে সংসার পাততে গেছে!

আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলুম না। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। সপাটে এক চড় ভদ্রলোকের মুখে। মাথাটা একপাশে টলে গেল। জীবনের প্রথম চড়। জামার কলারটা বুকের কাছে খামচে ধরলুম। এক ঝাঁকানি মেরে বললুম, কী বললেন?

মেনিবাবু বললেন, বাস্টার্ড! থুঃ করে এক ধাবড়া পানের পিক ছুড়ে দিলেন আমার দিকে। এক ধাক্কা মারতেই ভদ্রলোক পড়ে গেলেন চিতপাত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লোক জড়ো হয়ে গেল। মেনিবাবু শুয়ে শুয়েই বললেন, গুরুজনের গায়ে হাত তোলা! হারামজাদা! যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে!

আমি একটা লাথি মারার জন্যে ডান পা-টা তুলেছিলুম। আমাকে কে একজন পেছন থেকে জাপটে ধরলে, কী হচ্ছে কী! খুন করে জেলে যেতে চাও?

চতুর্দিক থেকে প্রশ্ন, কী হয়েছে কী! একটা বৃদ্ধ নিরীহ মানুষকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছ? ভদ্রলোকের ছেলের এ কী দুর্মতি!

কী হয়েছে, এককথায় বলি কী করে! আমার পিতাকে অপমান! লোকটার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে দোব। জেলে যেতে হয় যাব। জমায়েত দু'ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ আমার দিকে, এক ভাগ মেনিবাবুর দিকে। মেনি

খুব তড়পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বাবা কোথায়? তা ঝড়াকসে একটা চড় কষিয়ে দিলে! আমার দিকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রবীণ পরেশবাবু খুব রাশভারী মানুষ। তিনি বললেন, মেনি, এই প্রশ্নে কেউ চড় মারতে পারে না, পাগল ছাড়া? এই ছেলেটিকে আমি ভালভাবেই চিনি, তোমাকেও আমার চিনতে বাকি নেই। পিন্টু, মেনি তোমাকে কী বলেছিল?

জ্যাঠামশাই, এমন অশ্লীল কথা, যা আমি মুখে আনতে পারব না।

মেনিবাবুর তিন মেয়ে খুব ওড়াওড়ি করে। মেনির দিকে আমার বয়সি কিছু স্বাভাবিক কারণেই জুটেছে। তাদের একজন বললে, অকারণে কেউ অশ্লীল কথা বলে! হয় ও পায়ে ধরে ক্ষমা চাক, নয় পেঁদানি খাক।

পরেশবাবু বললেন, পিন্টু, পায়ে ধরে নয়, এমনিই তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, যতই হোক প্রবীণ মানুষ।

আমি পারব না জ্যাঠামশাই। কে কাকে পেঁদায়, আমি একবার দেখতে চাই। হয়ে যাক।

কখন আমার বন্ধু মিহির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ করিনি। সে এগিয়ে এল, কে মারবে? মারবে কে? সাহস থাকে এগিয়ে আয়! মিহির আমাকে জিজ্ঞেস করলে, মেনিমুখোটা কী বলেছিল রে! তোর মতো ঠান্ডা ছেলে খেপে গেল! আমি বললুম মেনির মন্তব্য।

পরেশবাবু বললেন, আরে ছি ছি। একজন ঋষিতুল্য মানুষ। আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করি। মেনি, তুমি তো একেবারে উচ্ছন্নে গেছ হে! এ পাড়ায় তো তোমার থাকা উচিত নয়। তোমার এ কী স্বভাব! তুমি চোদ্দোটা ছেলেমেয়ের বাপ। আজ বাদে কাল ঘাটে যাবে!

মিহির বললে, তোর জামার বুকে লালমতো কী রে! রক্ত?

না, পানের পিক দিয়েছে।

মিহির বললে, মেনিবাবু, আজ আপনাকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, নিজের ব্যাপার ছাড়া অন্যের ব্যাপারে নাক গলালে খুব খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে আপনি ভালই চেনেন। নিজের মেয়ে তিনটেকে আগে সামলান। পিন্টু, তুই বাড়ি যা।

আমি জিতেছি না হেরেছি বুঝতে পারলুম না। দাগরাজি বুকে বাড়ি ফিরে এলুম। বাজার আর হল না।

একদিন কুম্ভকার-গৃহ-পার্শ্ব দিয়া
যাইতে, শুনিয়াছিনু,□— কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কহিছে কর্দম-পিণ্ড-নরকণ্ঠে যেন,□—
‘ধীরে, বন্ধু, বাজে বড়, মেরো না বাঁধিয়া!’

একটা কথা আছে, ‘মহাগুরু নিপাত যোগ’। পিতার মৃত্যুর পর একটা বছর এই যোগ চলে। যতরকম দুর্ভাগ্য নেমে আসে মানুষের জীবনে। আমি যেন সেই যোগের মধ্যে পড়েছি। শ্রীহরিশঙ্কর কোথায় অদৃশ্য হলেন জানি না। তিনি নেই। এই না-থাকাটা মৃত্যুরই সামিল। অসভ্য ইতর মেনি, তাল-তোবড়ানো মুখ। ঠোঁটদুটো ছুঁচোলো করে, এক ধাবড়া পানের পিক দিয়ে দিলে আমার বুকে! সারা গা ঘিনঘিন করছে। জামাটা তো গেলই। ভেতরের গেঞ্জিটাও গেছে।

মুকু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। একটাও কথা নেই মুখে। তীব্র চোখে দেখছে আমাকে। অপরাধী সন্তানের মতো মাথা নিচু করে আছি আমি। আমি দোষী? আমার দোষটা কোথায়?

মুকু ঝাঁঝালো গলায় বললে, আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা কাণ্ড করে চলে এলে! গেলে এক কাজে, করে এলে আর এক কাজ? তোমার কী দরকার ছিল খুঁচিয়ে ঘা করার!

বাঃ, আমার বাবার নামে যা-তা বলবে আর আমি চুপ করে থাকব?

তুমি হাত তুলতে গেলে কেন? তোমার তো মুখ ছিল। এই যে জল ঘোলা করে এলে, আরও কিছু শত্রু তৈরি হল। এরপর তুমি এ পাড়ায় টিকতে পারবে? যেতে আসতে টিটকিরি মারবে। একজন মানী মানুষের মানসম্মান ধুলোয় লোটাবে। এত সহজে মেজাজ খারাপ করলে চলে? পৃথিবীটা পৃথিবীই, স্বর্গ নয়। তোমার মতো বোকা পৃথিবীতে আর দুটো নেই। ঠিক ফাঁদে গিয়ে পড়লে!

ফাঁদ আবার কী!

মানুষ কত উদ্দেশ্যে কত কাজ করে তোমার ধারণা আছে? নেই।

এ পাড়ায় আমারও কিছু বন্ধু আছে।

বিপদে কারওকে খুঁজে পাবে না। যাও, জামাটা খুলে ফেলে দিয়ে চান করে এসো।

কোনওরকমে খাওয়াদাওয়া হল। নিরানন্দ ভোজন। মুকু সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা প্রায় বলছেই না। নীরবে সবকিছু করে যাচ্ছে। তার সাজগোজ হয়ে গেছে। গয়নার বাক্সটা আলমারি থেকে বের করলুম। মুকু হঠাৎ বললে, ওটাকে তুমি কি ওইভাবেই নিয়ে যাবে?

তা হলে?

কী তোমার বুদ্ধি? এ যেন ফুল দিয়ে সাজিয়ে শ্মশানে মড়া নিয়ে যাওয়া। বলো হরি! এক ঝটকায় কেড়ে নিলে কী করবে? ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কাঁদবে?

তা হলে কী করে নিয়ে যাব?

বাজার করার চটের ব্যাগটা নিয়ে এসো। একটা খবরের কাগজে সব জড়িয়ে ওর মধ্যে ফেলো। তার ওপর একটা কাপড় চাপা দাও।

অক্ষরে অক্ষরে মুকুর নির্দেশ পালন করে পৌনে বারোটা নাগাদ আমরা রাস্তায় নেমে এলুম। মোড়ের মাথায় তিন-চারটে ছেলে জটলা করছে। একজনের সঙ্গে একটা সাইকেল। আমরা কাছাকাছি যেতেই একজন সিক করে একটা সিটি মারল। তিরের মতো লাগল। মন ফুঁড়ে গেল।

মুকু বললে, উঁহু, একেবারে পাত্তা দেবে না।

দু'পা এগোতে-না-এগোতেই আর একজন বলে উঠল, মালটা ভালই জুটিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মন্তব্য, আসবে নাকি? খাওয়াব চাটিম কলা।

আমার কানদুটো গরম হয়ে গেল। হাতের মুঠো কষকষ করছে। ইচ্ছে করছে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমি যাঁর সন্তান, সেই হরিশঙ্কর হলে রক্তগঙ্গা বয়ে যেত। আমার মাতামহ হলে, সবকটাকে এক এক করে তুলে আছাড় মারতেন। ঠিকই বলতেন তিনি, ডাঁটে চলাফেরা করার দুটো হাতিয়াব, ব্রহ্মচর্য আর মুগুর।

এলাকা ছাড়িয়ে আসার পর মুকু বললে, একা হবে না, দল চাই। লোফারদের চেনো!

একটাকে মনে হল চেনাচেনা। আর তিনটে বেপাড়ার। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? সবক'টাকে ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড করি।

একা পারবে না। নিজেই খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। দলের সঙ্গে লড়তে হলে দল চাই। তুমি একা। তোমাদের পাড়াটা খুবই খারাপ।

আগে এইরকম ছিল না। হঠাৎ হয়ে গেছে।

এর একমাত্র কারণ, দেশবিভাগ।

এ পাড়ায় আর থাকা যাবে না মুকু!

তা বললে তো চলবে না। এত বছরের বসবাস ছেড়ে পালাবে কোথায়? আরও খারাপ দিন আসছে। হেরে গেলে হবে না। কায়দা করে থাকতে হবে। কোনও কিছু গ্রাহ্য করবে না। যব হাতি চলে বাজার কুত্তা ভুকে হাজার।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার খুব ভাল ব্যবহার করলেন। আমি একা থাকলে হয়তো করতেন না। মুকুই কারণ। চোখ ঠিকরে দেবার মতো রূপ, তেমনি স্মার্ট। ম্যানেজার ভদ্রলোক চেয়ার থেকে শরীরটাকে আধখানা তুলে ফেলে এদিকে-ওদিকে দুলতে লাগলেন লগবগে নাচের পুতুলের মতো। মুকুই হেসে বললে, বসুন আপনি। ভদ্রলোকের চোখদুটো টিপের মতো আটকে রইল মুকুর মুখে। আমার বেশ মজা লাগছিল। হঠাৎ এক ছত্র কবিতা প্রজাপতির মতো উড়ে এল,

Man is the hunter, woman is his game;

The sleek and shining creatures of the chase,
We hunt them for the beauty of their skins
They love us for it, and we ride them down.

কিছু কিছু মানুষ আছেন উত্তেজনায় তোতলা হয়ে যান। ভদ্রলোকের তাই হল। অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস, এই একটি লাইন বলতে চেয়েছিলেন। কী বিপদেই যে পড়লেন! অল অল করলেন বারকতক। শব্দজব্দের মতে, পরের শব্দটা কী হবে আমরা অনুমান করার চেষ্টা করছি। ওয়েজটা মুক্তি পাবার পর আমরা সাহায্য করলুম, অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস। ভদ্রলোক যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন। বেল টিপলেন। দৌড়ে এল বেয়ারা। বেয়ারার সামনে তিনি ক্ষমতাশালী ম্যানেজার। দাপটে হুকুম দিলেন, চা নিয়ে এসো।

ইন্টারনাল ফোন তুলে কাকে যেন আসতে বললেন। চা আর ভদ্রলোক আসার ফাঁকে ম্যানেজার মুকুকে আবার একটা কিছু বলতে চাইলেন। সেই একই সমস্যা। আপনিতে এমনভাবে আটকে গেলেন, মনের কথা মনেই রয়ে গেল। কথা যখন চিউয়িংগাম হয়ে যায় তখন আর কিছুই করার থাকে না।

চটের ব্যাগ থেকে একে একে গয়না বেরোচ্ছে। ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক মুকুর বুদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কী প্র্যাকটিক্যাল, কী ইন্টেলিজেন্ট! ম্যানেজার শুধু তারিফের হাসি হাসতে লাগলেন। কাগজপত্র তৈরি হল। সইসাবুদ হল। মুক্তির আনন্দ নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। এত দুঃখ, যে এই সামান্য ব্যাপারটাকেই মনে হচ্ছে কত বড় সুখ!

মুকু রাস্তায় নেমে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বললে, হারি আপ মাই বয়!

মুকু আমার বাবার এই কথা দুটো কোথা থেকে পেল, কাম অন মাই বয়, হারি আপ মাই বয়! তিনিই কি কথা বলছেন মুকুর কণ্ঠে বসে! বড় পরিচিত কথা।

আমার হাতে সেই বিশ্রী চটের ব্যাগটা। জিজ্ঞেস করলুম, মুকু, এইটার কী ব্যবস্থা হবে?

গোল করে পাকিয়ে বগলে চেপে রাখো। কেন, লজ্জা করছে?

পোশাকের সঙ্গে মানাচ্ছে না।

বাবা! দেখো। সেরকম হলে আমার কাছে দাও।

এরপর আর কিছু বলা যায় না। ঊর্ধ্বশ্বাসে আরও কিছু দূর হাঁটার পর জিজ্ঞেস করলুম, এরপর আমরা কোথায় যাব?

আমার হস্টেলে। তুমি একটা ট্যাক্সি ডাকবে। মালপত্র তুলব। সোজা চলে আসব বাড়ি।

কিছু কথা ছিল।

কী কথা?

কোথাও একটু বসা দরকার।

বসার দরকার নেই। বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাও। ভয়ে মরছ। তুমি চাও না আমি তোমার সঙ্গে থাকি! পাড়ার ওই লোফারগুলো তোমাকে টিটকিরি মারবে। এই হল তোমার এক নম্বর ভয়। দু'নম্বর ভয়, যদি মেসোমশাই ফিরে আসেন, তা হলে আমাকে দেখে কী ভাববেন? তোমার ওইসব ভয়কে আমি পাত্তা দিচ্ছি

না। তোমাকে আমি একলা থাকতে দোব না। তোমার একটা গুণ ছিল না, সেইটা হঠাৎ এসেছে, কথায় কথায় মারামারি করা। একই সঙ্গে তোমার বাবা আর মা হয়ে তোমাকে আগলাতে হবে।

মুকুর কথা শুনে আমি থমকে গেলুম। এ অভিনয়, আদিখ্যেতা, না সত্যিই প্রেম!

মুকু বললে, হাঁ করে তাকাবার মতো আমি কিছু বলিনি। তুমি এখন আমার মুঠোয়।

বাস আসছে। স্টপেজ কিছুটা দূরে। মুকু বললে, হারি আপ মাই বয়!

আমরা বাসে উঠে পড়লুম। ফাঁকা। পাশাপাশি বসলুম। কিছু দূর যেতে-না-যেতেই আমার মাথায় আর এক চিন্তা এল, টাকা। অন্নচিন্তা চমৎকারা। মুকু যদি আমার সঙ্গে থাকে তা হলে রোজগার চাই। ভাল রোজগার। চাকরি ছাড়ার উপায় নেই। সংসারে জড়িয়ে পড়ার এই বিপদ। একা হলে কোনও কথাই ছিল না। খাওদাও বগল বাজাও।

খুব মৃদু গলায় ডাকলুম, মুকু।

চোখ বুজিয়ে বসে ছিল। চোখ না খুলেই বললে, আবার কী সমস্যা!

সবার আগে আমার ফ্যাক্টরিতে তো একবার যেতে হয়।

চলো। এর জন্যে অত ভাবার কী আছে?

তা হলে টিকিটটা সেইভাবেই কাটি।

কাটো। তোমার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে আমি কথা বলব।

আমিই সব গুছিয়ে বলতে পারব।

আমি বললে আরও ভাল পারব। তা ছাড়া আমার সঙ্গে পরিচয়ও হয়ে যাবে।

যদি কিছু মনে করেন?

তোমার এই এক হয়েছে! সবেতেই দুর্ভাবনা। মনে করলে করবেন।

তুমি বললে, এম ডি ভাববেন ছেলেটার কোনও ব্যক্তিত্ব নেই।

তোমার সত্যিই কি কোনও ব্যক্তিত্ব আছে? নিজে নিজে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

চুপ মেরে গেলুম। মুকুর গলা ক্রমশই চড়ছে। যাত্রীরা আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন অবাক হয়ে। একজন সাংঘাতিক সুন্দরী মেয়ে বোকাবোকা একটা ছেলেকে তেড়ে ধমকাচ্ছে। ভাবছেন, ব্যাপারটা কী?

ফ্যাক্টরির গেটের সামনে দু'জনে এসে দাঁড়ালুম। দ্বিতীয় শিফটের কাজ শুরু হয়ে গেছে। অফিস আর ল্যাবরেটরি বিল্ডিং-এর পেছন দিকে কারখানার বিশাল চিমনি, ভুসভুস করে ধোঁয়া ছাড়ছে। বেশ ভারী একটা লাঞ্চের পর যেন ধূমপান করছেন বড়সড় কোনও মানুষ। অফিস গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের পাবলিসিটি অফিসার। খুব সাজগোজ করেন। নিজেই যেন এক জীবন্ত পাবলিসিটি। কোম্পানির যত কসমেটিক্স আছে সবই মেখে বসে আছেন। প্রতিদিনই তাই করেন। এইটাই তাঁর ধরন। মেয়েলি চেহারা, মেয়েলি ভাবভঙ্গি। পোশাকে কখনও বাঙালি, কখনও পাক্কা সাহেব। আজ সাহেব। সাদা জামার ওপর টাই ঝুলছে। আমার সাথে মোটামুটি ভালই খাতির। খাতিরের কারণ, আমাকে মাঝে মাঝেই তাঁর কবিতা শুনতে হয়। প্রবল প্রেমের কবিতা। প্রেমিকা কোথায় আছেন জানি না। সেই প্রেমিকাকে তিনি প্লেটে সাজিয়ে কখনও

দিচ্ছেন রক্তঝরা হৃদয়, কখনও ফুসফুস, কখনও অঞ্জলি দিচ্ছেন নয়নপদ্ম। বাকি আছে, যকৃৎ, প্লীহা। একমাত্র কোনও সার্জেনই এই কাণ্ড করতে পারেন।

আজ সাহেবি পোশাক বলে সাহেবের মতো আচরণ, হ্যাল্লো। হাউ ডু ইউ ডু! শোনাল, হাডুডু। আর একটু হলেই মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিত কিত! সামলে নিলুম কোনওক্রমে। হাতটা ধরে কয়ে ঝাঁকানি মারলেন। তারপর মুকুর দিকে তাকিয়ে কুমড়োর ফালির মতো হাসলেন। হেসেই রইলেন। চোখ দেখে মনে হল, অসীম কৌতূহল পরিচয় জানার।

বলেই দিলুম প্রশ্ন করার আগে, আমার বোন।

দেখেই বুঝেছি মুখের মিল। অসম্ভব সাদৃশ্য।

হাতে একটা চেন-বাঁধা চাবি ছিল। উত্তেজনায় পাঁইপাই ঘোরালেন একবার। শেষে অদ্ভুত এক প্রশ্ন করলেন, তোমার চুল কত বড়?

মুকু অবাক হয়ে বলল, আমার চুল?

হ্যাঁ তোমার চুল।

তা হবে, কোমর পর্যন্ত নামবে তো বটেই।

ব্যস, আমার একটা মস্ত চিন্তা গেল। তোমাকে আমাদের তেলের বিজ্ঞাপনের মডেল করব। এমন সুন্দর চেহারা, চাঁদের মতো মুখ। মডেলিং-এর ফিউচার জানো, ভেরি ব্রাইট। কাপড়ের বিজ্ঞাপন হলে তোমাকে কখনই বলতুম না। চুলের বিজ্ঞাপন অ্যাবসলিউটলি ইনোসেন্ট। চুল আঁচড়াবে, চুল খুলবে, ব্লোয়ার দিয়ে চুল উড়িয়ে দোব, তুমি একটা টার্নটেবিলে ঘুরবে। স্লো-মোশনে দেখানো হবে। গোটা চারেক কথা। কবিতাও হতে পারে। আমাদের পেমেন্ট খুব ভাল। ক্যাশ। তোমাকে আজ আমি বলে রাখছি, তুমি ফিল্‌মস্টার হবে। কেউ আটকাতে পারবে না। লেখাপড়া কী করেছ?

মুকু যেন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কোনওরকমে বেরিয়ে এসে বললে, এম এ পড়ছি।

তা হলে? সেটাও তো একটা ব্যাপার। তুমি তো আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে পারো। একটা ওপনিং আছে। ভাইবোন একসঙ্গে আসবে, একসঙ্গে যাবে। এম ডি-কে বললে এখুনি রাজি হয়ে যাবেন। তোমার ভাইকে ভীষণ ভালবাসেন তো! তা তোমরা দু'জনে যাচ্ছ কোথায়?

আমি বললুম, ছুটিতে আছি, এম ডি-র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

তা যাও যাও, দেখা করো। পারলে কথাটা পেড়ো।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মুকু বললে, মেয়েদের জীবনে কত বিপদ দেখেছ? সামনের বার ছেলে হয়ে জন্মাব।

আমি কী ভাবছি জানো? সামনের বার মেয়ে হয়ে জন্মাব। মেয়েদের কী ডিম্যান্ড!

মুকু শেষপর্যন্ত এম ডি-র ঘরে ঢুকল না। বসে রইল ভিজিটার্স রুমের সোফায়। আমি ঢুকতেই তিনি বললেন, একী, তুমি কলকাতায়? যাওনি এখনও? বোসো বোসো।

চেয়ার টেনে বসলুম। সামনে বিশাল টেবিল ঝকঝক করছে। পেছনে সার সার বুক শেলফে রাজ্যের রসায়ন শাস্ত্রের বই। দেয়ালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছবি। সারাঘরে চোখ ঘুরে এল। চেয়ারে সামান্য নড়াচড়া

করে বললুম, আমি খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার খুব প্যাথেটিক অবস্থা।

এম ডি উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বেশ গুছিয়ে আমার কাহিনি বললুম। শেষে যোগ করলুম, আপনি যদি আমাকে কলকাতায় থাকতে দেন তবেই আমার এই চাকরিটা থাকে।

তিনি অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোমারও দুর্ভাগ্য আমাদেরও দুর্ভাগ্য। নতুন একটি প্রোজেক্ট হাতে নিলুম, এখন তোমার মতো ভাল ছেলে পাই কোথায়!

আমার যা মনে হয় স্যার, মাস তিনেকের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাব এবং ফিরিয়ে আনতে পারব।

আমার তা মনে হয় না। তোমাদের পরিবারে একটা বৈরাগ্যের বাতাস ঘুরছে। তা ছাড়া হরিশঙ্করকে আমি যতদূর জানি, সে কোনও হঠকারিতা করার পাত্র নয়। কলেজ লাইফ থেকে আমি তাকে চিনি। সব ব্যাপারেই ভেরি সিরিয়াস। আর বৈরাগ্য, এ বড় মজার জিনিস। হঠাৎ আসে প্রশ্ন নিয়ে, একেবারে বেসিক প্রশ্ন,

তাই কি? সকলি ছায়া? আসে থাকে আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগ যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়?

এম ডি উজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকালেন, কার লেখা?

রবীন্দ্রনাথ।

এম ডি নিজেই একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলেন। মনে হয় একই প্রশ্ন তাঁকেও পীড়া দিচ্ছে,

কোথা রাত্রি কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা!
কেবা আসে, কেবা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা!
কেবা হাসে, কেবা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা!
কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা!
কোথা খসে পড়ে পত্র জগতের মহাবৃক্ষ হতে,

ফরসা টকটকে মুখ, অনেকটা গ্রিক ভাস্কর্যের মতো। সোনার ফ্রেমের চশমা। ছোট্ট টিকোলো নাক। সর্ব অর্থে সফল একজন মানুষ। মস্ত বড় একজন রাসায়নিক। তাঁর চোখেও জল চিকচিক করছে। কার কথা ভেবে? কোথায় যাবার কথা ভেবে? এত পূর্ণতার মাঝেও রিক্ততা। আমি, আমার, এর নাম অজ্ঞান; তুমি, তোমার, জ্ঞান। আমিই তুমি, তুমিই আমি, এর নাম বিজ্ঞান। এম ডি এই মুহূর্তে সেই বিজ্ঞানী।

হঠাৎ বললেন, তুমি তো গান জানো? এই গানটা গাইতে পারো, গোল ছেড়ে মাল লও বেছে। গোলমালে মাল মিশানো আছে॥ জানো না মন রাগের কারণ। যেমন বালির সঙ্গে চিনির মিলন। সহস্র বর্ণে মিশেছে। পুরোপুরি কেমিষ্ট্রি! কী বলো? ফিলট্রেশন, ডিক্যান্টেশন, ডিস্টিলেশন, অ্যানালিসিস, অ্যাসে, টাইট্রেশন। বিশাল এই হিউম্যান ল্যাবরেটরিতে তিনিই হলেন চিফ কেমিস্ট। আমি কী বলি জানো? আমি তো তোমার পিতার মতোই। একটা ভাল পরামর্শ দোব?

আমি তো আপনার পরামর্শের জন্যেই সব ছেড়ে ছুটে এসেছি।

তুমি দেরাদুনে যাও। বড় কাজের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দাও। আর দেরাদুন হল হিমালয়ান সেন্টার। ওইখান থেকে অনুসন্ধান চালাও হরিদ্বার, ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ। তাঁকে পাওয়ার কাজটা সহজ হবে।

একটাই যে সমস্যা, এখানকার বাড়িতে কে থাকবে!

ওটা কোনও সমস্যাই নয়। অনেক সময় সব সপরিবারে বাইরে বেড়াতে যায়, তখন কী হয়? বাড়ি তালাবন্ধ থাকে। এক মাস, দু'মাস।

সব যে ধুলো পড়ে যাবে! চুরির ভয় আছে।

কেন? তোমাদের পাড়া কি তেমন সুবিধের নয়? ধুলোকে ভয় নেই। ঝাড়লেই উড়ে যাবে। ভয় হল চোরের।

একসময় খুব ভাল পাড়া ছিল। এখন আর তেমন নেই।

তা হলে এক কাজ করা যায়। তোমাকে একজন বিশ্বাসী লোক দিতে পারি, কেয়ারটেকারের মতো। ভীষণ বিশ্বাসী মানুষ। আসলে কী জানো, তোমাকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছি। কেন তা বলতে পারব না। তোমার ফিউচার আমি গড়ে দিয়ে যেতে চাই। আমার আর ক'দিন? হরিশঙ্কর চলে গিয়ে আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। হরিশঙ্করের ছেলে মানে আমার ছেলে। তা ছাড়া আমার ছেলে নেই। একটি মাত্র মেয়ে। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?

আজ্ঞে না।

শান্তিনিকেতন থেকে এবার এলেই তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দোব। তা হলে তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো। চলে যাও দেরাদুনে। ওখানে নিখিল তোমার অপেক্ষায় আছে। দেখবে কী সুন্দর বাংলো। সামনেই মুসৌরি হিলস্। পেছনে ফরেস্ট। একটু দূরেই সহস্রধারা। মিলিটারি অ্যাকাডেমি।

আমি তা হলে আসি আজ।

কাল আমাকে জানাবে। রাতটা ভেবে নাও ভাল করে। বেশি ভেবো না। সারেন্ডার করে দাও নিজেকে। ঘটনা মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কৌশল হল নিজেকে ভাসিয়ে রাখা। জীবন অনেকটা নৌকোর মতো, ভাসতে তোমাকে হবেই। হালটা শুধু ধরিয়ে দাও শক্ত হাতে। তাঁর হাতে।

উঠে প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছি এমন সময় পাবলিসিটি অফিসার ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, তোমার বোনকে বাইরে বসিয়ে রেখেছ কেন? বেচারা মুখ চুন করে বসে আছে।

এম ডি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোমার বোন? তোমার বোন আছে জানতুম না তো? তা হলে তো তোমার দেরাদুন যাওয়া হবে না।

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলুম। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। এম ডি নিজের ঘর ছেড়ে ভিজিটার্স রুমে বেরিয়ে এসেছেন। মুকু উঠে দাঁড়িয়েছে। সহবত জানা মেয়ে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। এম ডি তাড়াতাড়ি মুকুর মাথায় হাত রেখে বললেন, বাঃ ভারী সুন্দর মেয়ে তো। কী নাম তোমার মা?

মুকুলিকা।

পাবলিসিটি অফিসার বললেন, আমার একটা সমস্যা মিটে গেছে। একে আমার বিজ্ঞাপনের মডেল করব। মেয়েটি শিক্ষিতা, এম এ পড়ছে। ভাবছি, আপনার অনুমতি নিয়ে ওকে আমার ডিপার্টমেন্টে নিয়ে নোব। ভাইবোন একই সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবে। বেশ হবে।

এম ডি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, তা হলে তুমি কলকাতাতেই থাকো। তোমার জায়গায় সুহাসকেই পাঠাই। সেইটাই হবে বেস্ট সলিউশন। আচ্ছা, আমি আর তোমাদের সময় দিতে পারছি না। আমার আবার চেম্বার অব কমার্সে মিটিং আছে।

আমি আর মুকু পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে,
অনেক দেরি হয়ে গেল,
দোষী অনেক দোষে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে বাড়িটার দিকে একবার তাকালুম। কারখানার কালো চিমনি ভসভস করে ছেড়ে চলেছে পিঙ্গল ধোঁয়া। সাবান তৈরি হচ্ছে। গন্ধে চারপাশ আমোদিত। মাথা ঝিমঝিম করছে। একটা যা-তা ব্যাপার হয়ে গেল। যে-রাস্তাটা ধরে হাঁটছি, সেইটা কিছুদূরে গিয়ে পড়েছে ট্রাম আর বাস রাস্তায়। ট্রামের শব্দ কানে আসছে। মুকু আমার পাশে পাশে প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে চলেছে।

মুকুই প্রথমে কথা বললে, সব তো ভেস্তে গেল।

কী ভেস্তাল?

ভাইবোনে বিয়ে হয়?

না।

আমরা তো ভাইবোন হয়ে গেলুম।

ও তো একটা বলতে হয় তাই বলা।

কেন? সাহস করে বলতে পারলে না, এ আমার বোন নয়, বউ। বুক ফুলিয়ে বলা গেল না? লোকে খারাপ ভাববে, তাই না? বাঙালি তো, ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচ। বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লেই চরিত্রে চিড় ধরে যাবে।

রাগ করেছ?

দুঃখ পেয়েছি। অভিমান হয়েছে। আমার এই লুকোচুরিটা একেবারে সহ্য হয় না।

যদি অনুমতি দাও তো একটা কথা বলি।

বলো। তুমি তো কথার মালা, কথামালা। কথামালার শৃগাল।

তা হয়তো ঠিক, ধূর্ত এবং ভীরু। তোমার গালাগালের যোগ্য। তুমি ভীষণ কড়া কড়া কথা বলো।

তুমি বলাও।

যে-কথাটা বলতে চেয়েছিলুম সেটা হল, মেয়েরা রাখি বাঁধে জানো তো, দাদা দিয়েই প্রেমের শুরু। অনেক দাদাই শেষে স্বামী হয়। এই কেসটাও সেই কেস।

আমি এতক্ষণ ধরে কী ভাবলুম জানো, তোমার একজন বোনেরই দরকার, বউ নয়। বোন অনেক পবিত্র। আমি ওপর-পড়া হয়ে তোমার জীবন দখল করতে চেয়েছিলুম, সেটা ঠিক হবে না। তোমার চরিত্রটা বড় এলানো।

আমি তা মনে করি না।

আমার তাই মনে হয়।

আমার আসল দিকটা তুমি দেখোনি। দেখলে তোমার সিদ্ধান্ত পালটাতে।

সেই দিকটা কী? তোমার সবই তো তালগোল পাকানো। এই তো দেরাদুনের সুযোগটা হারালে। আর একজন যাবেন তোমার জায়গায়। তুমি কলকাতায় বসে বসে বোন আর বাড়ি আগলাবে। সুযোগ বারেবারে আসে না।

প্রথমে তো তাই ঠিক হল। মাঝখান থেকে বিপুলবাবু ঢুকে সব গোলমাল করে দিলেন তোমাকে বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে। বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হয়েই গিয়েছিল।

তুমি তো বলতে পারতে, আমি হস্টেলে থাকি।

তা কী করে হয়! বাড়ি ছেড়ে বোন খামোখা কেন হস্টেলে থাকবে, কোন যুক্তিতে?

তুমি তো ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করতে পারতে, মায়ের পেটের বোন নয়, মাসতুতো বোন।

তা হলে কী ভাবতেন? ভাবতেন, বাবা নেই, মাসতুতো বোনকে হস্টেল থেকে এনে কী না কী করছে!

আমার কী মনে হচ্ছে জানো, এটা রাস্তা না হলে ঠাস করে তোমাকে এক চড় কষাতুম। একেবারে পারফেক্ট জানোয়ারের মতো কথা। তোমার নোংরা ভাবনাটা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও? একজন সুন্দর শিক্ষিত মানুষ কেন এমন ভাববেন? ছেলেবেলা থেকে কিছু গ্রাম্য মহিলার মধ্যে থেকে তোমার এই অবস্থা হয়েছে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে মানেই উঁহু হুঁহু! ভাশুর, ভাদ্দরবউ, বউদি, ঠাকুরপো, তুতো বোন, তুতো ভাই, যেখানে যত আছে সব ব্যভিচার করে বেড়াচ্ছে। একে বলে ঝিয়ে-সাইকোলজি। তোমার উচিত, তোমাদের ওই প্রাগৈতিহাসিক বাড়ি ছেড়ে বৃহৎ বিশ্বে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া। তোমার মনে নোনা ধরেছে।

মুকু ছিটকে আমার থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গেল। রেগে গেলে মুকুর মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে। চলন-বলন সবই তড়বড়ে হয়ে যায়। কাঁকড়াবিছের মতো খড়খড় করতে থাকে। প্রকাশ্য রাজপথে সিন ক্রিয়েট করার ইচ্ছে আমার নেই। ইতিমধ্যেই লোকজন তাকাতে শুরু করেছে। নীরবে বাকি পথটুকু হেঁটে আমরা ট্রাম স্টপেজে এসে গেলুম। মুকু একটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছে, যেন আমাকে চেনেই না। মধ্যদিনের আলোয় তাকে ভীষণ মায়াবী লাগছে। পানের মতো মুখ। ফুরফুরে চুল। ফরসা দেহত্বক রাতের সমুদ্রের ফেনার মতো জ্বলছে। ভীষণ একটা ভালবাসায় ক্রমশই আমি উতলা হয়ে উঠছি। আমার সমস্ত সমস্যা টমস্যা ভেসে বেরিয়ে যেতে চাইছে। বেশ বুঝতে পারছি মুকুকে ছাড়া আমার চলবে না।

মুকু হঠাৎ আমার কাছে সরে এসে বললে, শোনো, আমি তোমার বোনটোন হতে পারব না। ওসব আদিখ্যেতা আমার সহ্য হবে না। আমি তোমার মতো পাপ করতে পারব না। মুখে বলব এক, কাজে করব আর এক, আমার দ্বারা তা হবে না। তুমি চলো।

কোথায় যাব?

তোমার ওই এম ডি-র কাছে। এইবার যা বলবার আমি বলব।

বেশ ভয় পেয়ে গেলুম, কী বলবে?

বলব, মশাই! আসল ব্যাপারটা হল, আমি বোনটোন নই। ও ওইরকম বলতে হয় বলছে। সাধুপুরুষ সাজবার জন্যে। মায়ের বোন মাসি হয় ঠিকই। একই রক্ত। আমি ওর জ্যাঠাইমার বোনের মেয়ে। তার মানে ঘোড়ার ডিম। আমি ভালবাসি। আজ বাদে কাল বিয়ে করব। স্বামী-স্ত্রী সীমানায় দাঁড়িয়ে আছি। আমরা দু'জনেই দেরাদুনে যাব। চলো চলো। আর দেরি নয়।

দেরাদুনে যাবার প্রয়োজন নেই মুকু। কলকাতাতেই বেশ থাকা যাবে। তা ছাড়া তুমি যদি চাকরিটা পেয়ে যাও, তা হলে দু'জনের রোজগারে রাজার হালে।

ও! এখন থেকেই তুমি আমার রোজগারের আশায় আছ! তা ভাল।

আমি ঠিক অতটা লোভী নয় মুকু। তোমার রোজগারের আশা আমি করি না। আমার একার রোজগারেই দু'জনের সংসার বেশ ভাল চলে যাবে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

ভালবাসো? বাবা, এ যেন ভূতের মুখে রামনাম। শোনো, ওসবে আমি ভুলছি না। তোমাদের ওই বিশ্রী পাড়া ছেড়ে চিরকালের জন্যে প্রবাসী হতে হবে। হিমালয়ের কোলে হলে তো কথাই নেই। চলো চলো।

আমাদের সামনে দিয়ে সাদা রঙের বিলিতি একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। পেছনের আসনে বসে আছেন এম ডি। কী একটা পড়ছেন গভীর মনোযোগে। আমি বললুম, ওই দেখো এম ডি বেরিয়ে গেলেন। আজ আর কোনও কথা হবে না। চেম্বার অফ কমার্সে ওঁর মিটিং আছে।

তাতে তোমার আনন্দে নাচার কোনও কারণ নেই। কাল আমি আসব। এসে সমস্ত পরিস্থিতিটা নিজে বুঝিয়ে বলব। আমি কে, তুমি কে, আমরা ভবিষ্যতে কী হব! তোমার কি মনে হয় আমি ইয়ারকি করার জন্যে ওই মুল্লুক থেকে এই মুলুকে এসেছি। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটা শুনবে?

ট্রাম আসছে।

আসুক। আসবে, থামবে, চলে যাবে, আবার আসবে। ট্রামের অভাব নেই। পরের ট্রামে যাব। না হয় তারও পরের ট্রামে।

কিন্তু এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁহাতক আর তর্কাতর্কি করা যায়, তুমিই বলো?

চলো, তা হলে এই পার্কে গিয়ে বসি। ফাঁকা জায়গায় বসে মন দিয়ে আমার পরিকল্পনাটা তোমার শোনা উচিত।

গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে আমরা দু'জনে অদূরের একটা ছোট পার্কে বসলুম। ছোট হলেও মনোরম। গোটা তিনেক বিশাল গাছ। তিনকোনা সবুজ ঘাসের কার্পেট। দু'-একটা খালি ঠোঙা, আইসক্রিমের কাপ, ঝরাপাতা, সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে আছে। একটা সুন্দর রুমাল পড়ে আছে। কেউ পেতে বসেছিলেন, তুলতে ভুলে গেছেন। আমরা একটা আড়াল দেখে পাশাপাশি বসে পড়লুম। বসেই মনে হল শুয়ে পড়ি, এত ক্লান্ত। কিছু না করেই ক্লান্ত। শরীর হল মনের খেলা। মন গেল তো সব গেল।

মুকু তার ফরসা ফরসা হাতদুটো দিয়ে আমার ডান হাতটা খপ করে চেপে ধরল। ফরসা। দুধের মতো। অনামিকায় রক্তলাল একটা রুবি। যেন ডালিমের দানা। সিল্কের মতো শরীরের ত্বক। টানটান হয়ে আছে।

হাতের কোথাও একটা রোম নেই। শাড়ির তলা দিয়ে পা দুটো বেরিয়ে আছে। মোমের মতো গোড়ালি। পায়ের আঙুল যেন মোচার কলি। ভগবানের নিজের হাতের ভাস্কর্য। এমন কিছু দেখলে আমার ইচ্ছে করে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়তে। কে বড়, কে ছোট, সে বিচার আর থাকে না। মনে হয় হেরে গেছি, পরাজিত আমি। ঈশ্বরের আর্ট গ্যালারির মেঝেতে আমি ছিঁড়ে পড়ে আছি। পুরনো চার চরণ কবিতা মনে পড়ে যায়:

যে হৃদে আছিল শোভা কত অমরার,
অমরী আসিত যেথা ছুটে বার বার
তুমি নারী, মৃদু হেসে, আঁখি-কোণে চেয়ে
নিলে অনায়াসে লুটে সে হৃদি আমার?

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে মুকু একটা গাছের ভাঙা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ঝাঁটার মতো ঘাসের ওপর বোলাল কিছুক্ষণ। মুখটা নিচু করে আছে। কপালের ওপর চুল ঝুলছে কয়েক গুছি। হঠাৎ মুখ তুলে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল। অসাধারণ সেই হাসি! যেন পাথরে চিড় ধরল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। এ কেমন মেয়ে! এই বকছে, এই ধমকাচ্ছে, এই হাসছে!

মুকু গাছের ডালটাকে কোলের ওপর শুইয়ে, বেশ গুছিয়ে বসে বললে, আমাদের সংসারটা ভেঙেছে আমার বাবার ভুলের জন্য, একগুঁয়েমির জন্য। যুদ্ধ যখন বাধল, তখন বার্মা থেকে সবাই পালাতে লাগলেন। আমার একগুঁয়ে বাবা শেষ দিন পর্যন্ত পড়ে রইলেন মাটি কামড়ে। সময়ে পালালে কিছু সঙ্গে নিতে পারতেন। ট্রান্সপোর্ট পেতেন। শেষে কী হল? হাঁটাপথে রওনা দিতে হল। রেঙ্গুনের জেল খুলে দিয়েছে। যত চোর গুন্ডা, বদমাশ, উন্মাদ ছাড়া পেয়ে সারা শহরে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। দোকানের পর দোকান লুঠ করছে। শেষে আমাদের পাশের বাড়ির এক বউকে রাতের বেলা বাড়ি চড়াও হয়ে নৃশংসভাবে রেপ করে মেরে ফেললে। তখন আমার বাবার টনক নড়ল। পরের রাতেই আমাদের টার্গেট করত। আমরা পেগুর পথ ধরলুম। সেখান থেকে প্রোম। শ দুই মাইল। ভাবতে পারো? হাঁটছি তো হাঁটছিই। প্রোম থেকে মান্দালয়। কাতারে কাতারে মানুষ চলেছে। এমনি তবুও হাঁটা যায়, সঙ্গে বোচকাবুঁচকি। পথের ধারে মৃতদেহ পড়ে পচে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। কারও বাবা, কারও মা, কারও মেয়ে। অসুস্থ হয়ে কেউ পড়ে আছে, আর হাঁটতে পারছে না। কে থামবে তার জন্যে! সবাই পালাচ্ছে। টাকার কোনও দাম নেই। হোটেল আছে জায়গা নেই। জল নেই, খাবার নেই। লাখোপতি, কোটিপতি হন্যে হয়ে ঘুরছে। টাকা হয়ে গেছে কাগজ। প্রোমে শুরু হয়ে গেছে কলেরা। আমরা যখন আর হাঁটতে পারছি না, তখন বসে পড়ছি রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নীচে। পাশেই হয়তো পড়ে আছে কেউ, মারা গেছে কলেরায়। কোনওরকমে মান্দালয়ে গিয়ে পৌঁছোলুম। মায়ের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। প্রোম থেকে মান্দালয় পাঁচশো মাইল। তুমি ভাবতে পারো? দূরত্ব ভাবলেই মাথা ঘুরে যায়। কোথাও কোনও সাহায্য নেই। কেউ কারওকে সাহায্য করবে না। মান্দালয়ের পথে আমার মা মারা গেলেন। জঙ্গলের গভীরে একটা জায়গায় দুটো গাছের মাঝখানে কিছু মাটি গাছের ডাল দিয়ে উসকে মাকে শুইয়ে দেওয়া হল। প্রথমে চিত করে শোয়ানো হল। বাবা বললেন, না না, অমন সুন্দর মুখ জন্তুজানোয়ারে খেয়ে যাবে। উপুড় করে শোয়াই। মাকে উপুড় করে দেওয়া হল। মা শুয়ে আছেন ঝুরো ঝুরো মাটির ওপর। চারপাশ দিয়ে চলে গেছে ইলিবিলি গাছের শিকড়। মচমচে গাছের পাতা। আমি আর দিদি

গাছের পাতা জড়ো করে মাকে চাপা দিচ্ছি। কিছু শুকনো কিছু ভিজে দলা পাকানো। আস্তে আস্তে মা তলিয়ে গেলেন পাতার স্তূপে। একসময় বাবা বললেন, চলো, আর তো কিছু করার নেই। সামনে অনন্ত পথ। আমাদের তখন এমন অবস্থা কাঁদতেও ভুলে গেছি। খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, চান নেই। পশুর মতো অবস্থা। আমার কেবল মনে হচ্ছে, আমিও শুয়ে পড়ি মায়ের পাশে। মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে যেমন শুয়ে থাকতুম রেঙ্গুনে আমাদের বাড়ির খাটে। মান্দালয় থেকে ভারত কমসে কম দেড় হাজার মাইল। পথ আরও সাংঘাতিক। একের পর এক খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, ইরাবতী, চিন্ডুইন। ঠিক হল আমরা কোনওরকমে ইরাবতী পেরিয়ে, আরাকান আকিয়াব হয়ে চট্টগ্রামে ঢুকব। এমন কোনও অখাদ্য নেই যা আমাদের খেতে হয়নি। কুমিরের মাংসও খেয়েছি। এমন একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতার পরেও বাবার কিন্তু সংসারে বিতৃষ্ণা এল না। মনকে দিয়ে বলাতে পারলেন না, কী ছার সংসার! উলটে বললেন, এই তো সংসার! ভোগ আর দুর্ভোগ এ ছাড়া সংসারে নেই কিছু। আমার কিন্তু শিক্ষাটা হয়ে গেল অন্যরকম। আর কোনওদিন সেই মান্দালয়ের জঙ্গলে যেতে পারব না। পাতার স্তূপ সরিয়ে দেখতে পারব না, কোনও কঙ্কাল শুয়ে আছে কি না চিরনিদ্রায়? আমার মা। আমি দেখেছিলুম, মৃত্যুর সেই মহোৎসবেও পশু-মানবের নারীমাংস-লালসা। মৃতদেহের পাশে মানুষের মৈথুন। সবসময় ভিক্টিম হয়েছে মেয়েরা। দিদি আমার চেয়েও বড়। ঘোরতর সুন্দরী। আরাকানের পথে বাবা তার সারাগায়ে কাদামাটি মাখিয়ে দিলেন রূপ চাপা দেবার জন্যে। পরিয়ে দিলেন একটা ঢোলা শার্ট, যাতে দেহের আকর্ষণ চাপা পড়ে থাকে। সেই থেকে পুরুষজাতের ওপর আমার প্রবল ঘৃণা।

তার মানে তুমি আমাকেও ঘৃণা করো?

চুপ! আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমি আগে শেষ করি। আমার বাবা আমাদের দু'বোনের জন্যে যথেষ্ট করলেন। লেখাপড়া শেখালেন। কিন্তু তোমার বাবার মতো আমার বাবার জীবনে কোনও ত্যাগ নেই, কোনও আদর্শ নেই। এই বয়সেও নারীসঙ্গের জন্য লালায়িত। আমাদের সমালোচনায় কান দেননি। মায়ের স্মৃতি মুছে ফেলেছেন মন থেকে। কথায় কথায় বলবেন, জীবনের ব্যাপারে আমি একজন পাকা ইংরেজ। আমার আদর্শ চুটিয়ে বাঁচো, মরে যাও। সবারই শেষ একমুঠো ছাই। ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। কিছু মনে কোরো না, আমার বাবাকে দেখলে মনে হয়, এক বৃদ্ধ পশু। তোমার বাবাকে দেখে আমার আবার বিশ্বাস ফিরে এল। মনে হল মানুষও দেবতা হতে পারে। আমি প্রেমে পড়ে গেলুম। সে এক অদ্ভুত প্রেম। মেয়ে, স্ত্রী, বন্ধু, মা সব মিলিয়ে একটা ব্যাপার তৈরি হল। তখনই মনে হল, এই মানুষটিকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা করব। শিবের সংসারকে গৌরী হয়ে সাজাব। তোমার সমস্ত ন্যাকামি তছনছ করে তোমাকেও তোমার বাবার মতো করব কুছ নেহি হ্যায় তো থোড়া থোড়া। অন্তত কুড়িটা ছেলে আমার জন্যে হাঁ হাঁ করে আছে। তাদের মধ্যে একজন অধ্যাপকও আছেন। বেশ বুঝতে পারি সবক'টা দেওয়ালি পোকা। চরিত্রের কোনও জোর নেই। অধ্যাপকের আবার বউ আছে। সবক'টা এমন হ্যাংলার মত ভাব করে, পা থেকে মাথা অবদি জ্বলে যায়। একমাত্র তোমার মধ্যে তোমার বাবার গুণ কিছুটা খুঁজে পেয়েছি। তোমাকে এইসময় ধরতে পারলে আমি একজন মানুষ পাব। তোমাকে একটু টেম্পার করে নিতে হবে। বেশ করে তাতাতে আর পেটাতে হবে। লোহা থেকে তৈরি করতে হবে স্টিল। এও এক ধরনের ভালবাসা। দায়িত্বপূর্ণ ভালবাসা। মেসোমশাই ফিরে এসে যেন বলতে না পারেন, আমার ছেলেটাকে কেউ দেখেনি। এই দায়িত্ব কেউ আমাকে দেয়নি, আমি নিজেই তুলে নিয়েছি কাঁধে।

মুকু মুখ নিচু করে ঘাসের ওপর হাত বোলাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। পাতার ফাঁক দিয়ে পড়ন্তবেলার রোদ এসে পড়েছে তার রেশম চিক্কণ চুলে। আমার আর বলার কিছু নেই। আমার মাতামহের কণ্ঠে শোনা একটি গানের কলি হয়ে গেছি আমি, দিয়েছ তুমি অনেক দিয়েছ/অযাচিত তব দান/বুঝিনি মহিমা দিইনি মূল্য/তবু দান অফুরান/কত করুণার কণিকা ঝরিয়ে নিতি মমতায় রেখেছ জড়িয়ে/ অযতনে আমি ফেলেছি ছড়িয়ে/ করোনি তো অভিমান॥ আমার এই প্রবল দুর্দিনে ভগবানের এ কী করুণা! আমার মতো একটা মর্কটকে এইভাবে কেউ ভালবাসতে পারে, এই বিশ্বাসটাই আমার ছিল না। সেই ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সকলেই আমাকে এলেবেলে ভাবে। খেলার মাঠে যখন টিম তৈরি হত, দু'পক্ষই বলত ও হল এলেবেলে। সেই এলেবেলেকে শিক্ষিতা ডাকসাইটে সুন্দরী এক মেয়ে ভালবেসেছে। প্রেমের আদিখ্যেতা নয়, অভিভাবিকা হতে চাইছে। গভীর একটা ভাবনা রয়েছে আমাকে ঘিরে।

মুকু চোখ তুলে তাকাল। চোখের কোণে জল চিকচিক করছে। বিশ্বাস করো, আমার অনেক জায়গা আছে যাবার, কিন্তু কোথাও যেতে মন চায় না। আমি মানিয়ে নিতে পারব না। কিন্তু তোমাকে পারব। তোমার ভেতর একটা শিশু আছে, যে কোনওদিন বুড়ো হবে না। তোমার ওই অবিষয়ী ভাবালু ভাবটাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। ভালবেসে ফেলেছি তোমাদের সাত্ত্বিক সংসারটাকে।

তোমার মতে আমার তা হলে কী করা উচিত মুকু? তুমি দু'বার দু'রকমের পরামর্শ দিলে। একবার বললে, চাকরি ছাড়তে হয় ছাড়বে। এখানেই থাকবে। সব টিপটপ করে সাজিয়ে অপেক্ষা করবে, তিনি আসবেন। এই মুহূর্তে বলছ দেরাদুনে যেতে হবে।

এটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয় চিন্তা। একরোখা অভিমানী মানুষ। নিজে তিনি ফিরবেন বলে মনে হয় না। তাঁকে ফেরাতে হবে। ধরে আনতে হবে। পাহাড়েই তিনি গেছেন। দেরাদুনে থেকে সন্ধান করা সহজ হবে। সামনেই আসছে কুম্ভমেলা। সেই বিশাল জমায়েতে আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজব।

বেশ, তা হলে তাই হোক। কাল আবার আসব। এখন চলো, তোমার হস্টেলে যাই।

পার্ক থেকে বেরিয়ে আমরা একটা ট্রামে উঠে পড়লুম। হস্টেলের সামনে এসে আমরা একটু অবাক হয়ে গেলুম। পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আছে আছে, আমরা তেমন গ্রাহ্য করলুম না। মন একমুখী হয়ে আছে। অন্য কোনও ভাবনা ঢুকছে না মাথায়। একটাই চিন্তা, আমাদের যেতে হবে। মালপত্র গোছগাছ করে আমরা বেরিয়ে পড়ব।

মুকু বলল, তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। যখন বলব তখন একটা ট্যাক্সি ডাকবে।

মুকু চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে আছি বাইরে। সামনেই জিপগাড়িটা। নিরেট এক ব্যক্তিত্ব। দেখলেই ভয়ভয় করে। হস্টেলের অফিসঘরটা গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মনে হল ঘরের মধ্যে অনেক মেয়ের জটলা। একজন ভারিক্কি মহিলার তর্জন-গর্জন কানে আসছে। ঠিক বুঝতে পারছি না অশান্তিটা কীসের? কোনও মেয়ে কি আত্মহত্যা করেছে? চুরি হয়েছে? মেয়েরা মারামারি করেছে নিজেদের মধ্যে? কিছু একটা হয়েছে। পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম চোখে পড়ছে। মেয়েদের হস্টেল। একেবারে সামনে দাঁড়ানো ঠিক হবে না। একটু দূরে সরে গেলুম। যারা কাগজ কুড়োয়, এইরকম দুটো ছেলে বস্তা থেকে ফুটপাথে সমস্ত কাগজ উজাড় করে কী যেন বাছাবাছি করছে। ভীষণ ব্যস্ত তারা। দিন শেষ হয়ে আসছে। হস্টেলের ভেতর বিশাল দেবদারু। এক

ঝাঁক পাখি চুটিয়ে কলরব করছে। জায়গাটা নিরাপদ বলেই মনে হল। পুলিশের এক বড়কর্তা এসেছেন, তাঁর নির্দেশে ইভ টিজারদের আর রকবাজদের আচমকা খুব ধরা হচ্ছে। কোনও কথা নয়, ধরো আর ভ্যানে তোলো। হস্টেলের ভেতর পুলিশ ঢুকে আছে। বলা যায় না বেরিয়েই আমাকে দেখলে হয়তো চ্যালেঞ্জ করবেন। এ ব্যাপারে আমি বেশ ভিতু। মুকুকে নিয়ে যতক্ষণ আমি পার্কে বসে ছিলুম, কেবলই ভাবছিলুম, এই বুঝি কেউ এসে বলে, অ্যায় কী হচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন একটা মুখ করে কাগজ বাছাই দেখতে লাগলুম, যেন আমারই কাগজ। আমারই জীবনের ছেঁড়া পাণ্ডুলিপি। ছেলে দুটোর চারটে কথার তিনটেই খিস্তি। খিস্তির লেস্ন নেওয়াও চলতে লাগল। কতরকমের গালাগাল যে আছে!

দাঁড়িয়েই আছি। একসময় জাঁদরেল অফিসারকে নিয়ে জিপটা চলে গেল। ছেলে দুটোর সব কাগজ আবার রাস্তার বস্তায় ঢুকে গেল। দু'জনে এক পক্কড় ইয়ারকি মারামারি করে, বস্তা কাঁধে সরে পড়ল ডাইনে-বামে থুতু ছেটাতে ছেটাতে। আমি দাঁড়িয়েই আছি। দিনের আলো নিবে গেল। রাস্তার আলো জ্বলে উঠল পটপট। হাঁকছে মালাই, হাঁকছে ঘুঘনি। রাতের চরিত্ররা সব বেরিয়ে পড়েছে। ঠনঠুন রিকশা। দাঁড়িয়েই আছি। মুকুর পাত্তা নেই। একবার মনে হল, যা থাকে বরাতে, নিজের পরিচয় দিয়ে ভেতরে ঢুকে সুপারকে জিজ্ঞেস করি। হঠাৎ মাথায় খেলে গেল, আচ্ছা জিপটা মুকুর কারণেই আসেনি তো! কাল বিকেল থেকে মেয়েটা হস্টেলে নেই। কোনও খবরও দেয়নি। আমার আর সাহসে কুলোল না। হস্টেলের ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। একটা ছেলে ঘন্টার-পর-ঘন্টা ঠায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কারও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, সব মেয়েই ঢুকছে একজনও বেরোচ্ছে না, যে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করব। ভেতরের নাটক ছেড়ে কেউই বেরোতে চাইছে না।

আর কাঁহাতক দাঁড়ানো যায়! উদ্‌ভ্রান্তর মতো আমি বাড়ির পথ ধরলুম। একা দোকানের সামনে এসে একজনকে ফোন করতে দেখে মনে হল, হস্টেলে একটা ফোন করলেও হয়। বলতেও তো পারি, আমি মুকুলিকার দাদা বলছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে, কেমন দাদা? দাবড়ানি খেয়ে ফোন ফেলে দিতে হবে।

এত ফাঁকা লাগছে নিজেকে! এককথায় জীবনটা অর্থশূন্য হয়ে গেল। এত বছর বেঁচে আছি এমন নিঃসঙ্গ নিজেকে কখনও মনে হয়নি। মধ্যরাতের নির্জন রাজপথে একাকী একটা ষাঁড়ের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। কোথাও কোনও যাবার জায়গা নেই। কথা বলার মতো কোনও লোক নেই। দু'-চারজন বন্ধুবান্ধব সব বিদেশে। আত্মীয়স্বজনের বালাই নেই। পাড়ায় ঢুকব, বলা যায় না মেনির সাপোর্টাররা বদলা নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে কি না! বিষ্টুদার বাড়িতে কথায় কথায় যাওয়া যায় না। লজ্জা করে। বউদি ভাববেন, টিপের সঙ্গে ভাব জমাতে এসেছি। আবোল-তাবোল কীই বা বকব, মনের সে অবস্থা নেই। নিজের বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করছে না। নিরানন্দ পুরী। ভীষণ বিষণ্ণতা আসবে।

সামনেই ঠনঠনের কালীবাড়ি। আরতি হচ্ছে। দাঁড়িয়ে গেলুম একপাশে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। ফিনফিনে পাঞ্জাবি, কোঁচানো মিহি ধুতি। সরু গোঁফ। আরতি চলছে। ভদ্রলোক হঠাৎ আমার হাতে মৃদু একটা চাপ দিলেন। আমি তাকালুম। ভদ্রলোক হাসলেন। চিনতে পারলুম না।

ফিসফিস করে বললেন, চিনতে পারছ না?

আজ্ঞে না?

মনে করার চেষ্টা করো।

আরতির বাজনা দ্রুত চলেছে। পুরোহিতের চামর দ্রুত লয়ে দুলছে। দেখছি আর ভাবছি। হঠাৎ দেখি ভদ্রলোক অদৃশ্য। আরতি শেষ। ভক্ত কণ্ঠের মা মা চিৎকার। প্রণাম করে, সামনেই যে ট্রাম পেলুম উঠে বসলুম। ভাড়া দেবার জন্যে পকেটে হাত দিলুম। ফাঁকা। মালমশলা সব উধাও।

রক্ষা করো হে।
আমার কর্ম হইতে আমায় রক্ষা করো হে।
আপন ছায়া আতঙ্কে মোরে করিছে কম্পিত হে;
আপন চিন্তা গ্রাসিছে আমায়□— রক্ষা করো হে।

সামনেই ট্রামের কনডাক্টর হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শূন্য পকেট থেকে আমার নিরালম্ব হাত বের করে তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি হাহা করে হেসে উঠলুম। এমন মুক্ত হাসি বহুকাল আমার গলা ছেড়ে বেরোয়নি।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কী হল?

একজন সহযাত্রী বাঁকা মন্তব্য করলেন, ঢিলে হয়ে গেছে। ভাড়া দেবার সময় অনেকের এমন হয়।

আমি পাত্তা না দিয়ে বললুম, কেল্লা মার দিয়া।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। ভাড়া যখন দিতে পারব না, তখন নেমে যাই। ভদ্রলোক আমার হাত চেপে ধরে বললেন, মেরে দিয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে ক্লিয়ার।

ভদ্রলোক রসিক। বললেন, কোষ্ঠ সাফ! উঠলেন তো ঠনঠনিয়া থেকে। কালীবাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

টাকা মাটি, মাটি টাকা। তা নামছেন কেন? বসুন। ভাড়া দিতে হবে না। শ্যামবাজারেই বাড়ি?

তা হলে তো ভাবনা ছিল না। মাইল চারেক আরও যেতে হবে।

বাসে চড়তে হবে। এই নিন একটা টাকা রাখুন।

হতভম্ব হয়ে গেলুম। এমন হৃদয়বান মানুষ এখনও পৃথিবীতে আছেন। প্রায় তোতলা হয়ে গেছি, আপনি আমাকে ভাড়া দিচ্ছেন! আমি শোধ করব কীভাবে!

খুব সহজভাবে। কাল কালীবাড়িতে প্রণামী দিয়ে দেবেন এক টাকা।

যে-ভদ্রলোক একটু আগে ব্যঙ্গ করেছিলেন, তিনি বললেন, আরে ভাই যা পাওয়া যায় নিয়ে রাখো না।

লোকটির দিকে এইবার তাকাবার সুযোগ হল। নিখুঁত বাঙালি। সেই দাঁত-বের-করা বোকাবোকা হাসি। সবজান্তা ভঙ্গি। সন্দেহপ্রবণ। তেলচকচকে মুখ। কনডাক্টর ভদ্রলোক সোজা তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, টিকিট?

ভদ্রলোক বললেন, মান্থলি।

দেখান।

বুকপকেটে দু'আঙুল ঢুকিয়ে কী একটা তোলার ভঙ্গি করলেন। বেরোল না কিছুই।

কনডাক্টর এইবার ধমকের সুরে বললেন, নকশা ছেড়ে টিকিটটা দেখান।

হোয়াট ডু ইউ মিন?

বাঙালির মুখে ইংরেজি বেরোলেই বুঝতে হবে, ডাল মে কুছ কালা।

জানো আমি বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার।

প্রথমে আপনি বলতে শিখুন, তারপর টিকিটটা কেটে বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার হন। এমন বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার আমরা সারাদিনে শয়ে শয়ে দেখছি।

আমি কমপ্লেন করব অথরিটির কাছে। হোয়াট ইজ ইয়োর নাম্বার?

এই যে আমার বুকে। পয়সা ছাড়ুন।

ভদ্রলোক একটা দশ টাকার নোট বের করলেন। খুব গোলমেলে লোক। গুরুদেব টাইপের। ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। কনডাক্টর বললেন, খুচরো দিন। দশ টাকার নোটের ভাঙানি হয় না। আপনার মাথার ওপর নোটিশটা পড়ুন।

খুচরো নেই।

ভাবছেন ওই কায়দায় বেরিয়ে যাবেন? দিন, আমি আপনাকে চেঞ্জ দোব।

একটা খালি আসনে বসে কনডাক্টর ভদ্রলোক ব্যাগ উলটে চেঞ্জ বের করলেন। ঠোঁটে মুচকি হাসি। আমার খুব ইচ্ছে করছিল, সিক করে অসভ্য ছেলের মতো একটা সিটি মারি। শ্যামবাজারের মোড়ে না নেমে আমি ডিপো পর্যন্ত চলে গেলুম, শুধুমাত্র কনডাক্টর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। অতুলনীয় মানুষ। তা ছাড়া বাড়ি গিয়েই বা কী হবে। নির্বান্ধব, নিরানন্দ পুরী। স্মৃতিভারাতুর। যে-যাই বলুক, যতই অস্বীকার করুক, আমাদের ওই ওলন্দাজ আমলের বাড়িতে অশরীরী আত্মার উপদ্রব আছে। পাশেই ছিল ওলন্দাজ শাসকের বাড়ি। সেই বাড়ি এখন এক বিশাল ব্যবসায়ীর প্রমোদ ভবন। আমাদের বাড়িটা ছিল সেই বিদেশি বণিকদের কুঠি। খুন-জখম-অত্যাচার-ধর্ষণ সবই হয়েছে। যত রাত বাড়ে তত ভয় বাড়ে।

এই আমার শেষ ট্রিপ, বলে কনডাক্টর ভদ্রলোক ট্রামগুমটির অফিসের সামনে একটা বেঞ্চে বসে পড়লেন। কথা বলতে বলতেই টিকিট আর পয়সার হিসেব চলছে। ভদ্রলোকের নাম পরেশ মৌলিক। বেহালায় থাকেন।

হিসেব চুকিয়ে বললেন, এক ভাঁড় চা চলবে নাকি?

আমার পকেটে তো আপনার দেওয়া টাকাটাই পড়ে আছে!

ভদ্রলোক জিভ কেটে বললেন, আরে ছি ছি। কে কাকে দেয়? দেনেঅলা সেই একজন। লেনেঅলাও সেই একজন। বিশ্বজুড়ে সেই একের খেলা। আমরা শালা ধরতে পারছি না। ভদ্রলোক জিভ কাটলেন, অ্যায় শালা, শালা বলে ফেলেছি। এই অভ্যাসটা আমার এসেছে দাদুর কাছ থেকে। আমাকে শালা বলেই ডাকতেন। চলে আসুন, গুডনাইট চা-টা মেরে আসি। ওই স্টিমে এখনও আমাকে অনেকদূরে যেতে হবে। ট্রাম চলে বিদ্যুতে। বড়লোক চলে বোতলের ইস্পিরিটে। মধ্যবিত্ত চলে চায়ের ইস্টিমে। গরিব চলে কলকেতে। গরিবের ভগবান

মহাদেব। বড়লোকের ভগবান কালী। মহাদেব হয়ে চিতপাত, বুকে নাচছেন মকার। দুই ম-য়ের পায়ের তলায় সারাজীবন ফ্ল্যাট।

আপনি ইস্পিরিট ইস্টিম বলছেন কেন?

ধুর বোকা, স্পিরিট আর স্টিম বললে তো ভদ্দরলোক হয়ে গেলুম। ভদ্দরলোক কে হতে চায়! ভদ্দরলোক হলেই তো ট্রাম-বাসে, ভাড়া মারার টেনডেন্সি হবে, ঘুষ নিতে ইচ্ছে করবে। ভায়ের পোঁ, সরি, গাঁ, সরি, পেছনে বাঁশ ভরতে ইচ্ছে করবে। বাঁশ ভরে দে, বাঁশ ভরে দে হুঁউঁউঁউঁ। জেন্টলম্যান হবার ইচ্ছে আমার একদম নেই। অতটা নীচে নামতে পারব না ভাই। মাপ করো রাজা। দাঁড়ান আপনাদের হিসেবটাকে জমা করে দিয়ে আসি। কুচো পয়সা, কাঁচা পয়সা।

পরেশবাবু এগিয়ে গেলেন কাউন্টারের দিকে। গুমটিতে গোল হয়ে ট্রামের পর ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগই এইবার ঘুমিয়ে পড়বে। আমার হাতে বাবার দেওয়া ঘড়িটা বাঁধা। সময় দেখছি যতটা কাটানো যায়। মুকুর কথা ভাবছি। কী হল মেয়েটার! নিশ্চয় ওদের সাংঘাতিক অধ্যক্ষা ঘরে তালাচাবি দিয়ে রেখেছেন। গোটা পাঁচেক মেয়েকে বসিয়ে রেখেছেন প্রহরায়। লেডিজ হস্টেল মানেই তো জেলখানা। কী জানি কী হয়েছে ভেতরে! যাই হোক, আর একবার আমি আহত হলুম। ঈশ্বর নাকি যা করেন, সবই মঙ্গলের জন্য। হে মঙ্গলময়, কোথায় বসে আছেন আপনি! কিতনি দূর! সামনেই বাগবাজারের খাল। দগদগে অন্ধকার। এ পারে ও পারে দু'সার ঝুপড়ি। টিমটিমে আলো কাঁপছে কোথাও কোথাও। মেয়েদের খ্যানখেনে গলা বাতাসে ওঠা-পড়া করছে।

পরেশবাবু অর্থমুক্ত নিরর্থ মানুষ হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, চলুন, তা হলে একটু ইস্টিম নিয়ে যে যার তাঁবুতে ফিরে যাই। আজকের মতো যুদ্ধ শেষ। কাল কোন ভোরে আমাকে উঠতে হবে, আপনার কোনও ধারণা আছে?

না পরেশদা।

দাদা বললেন? তা হলে আপনাকে তুমিই বলি। নামটা পেলে বেশ হত।

পিন্টু।

বাঃ, আমাদের দু'জনেরই প দিয়ে শুরু।

গ্যালিফ স্ট্রিটের মাঝামাঝি জায়গায় এলোমেলো একটা চায়ের দোকান। ঝাপসা শোকেসে ঠান্ডা ফুলুরি বেগুনি গড়াগড়ি খাচ্ছে। তাকালেই অম্বল। আমরা নড়বড়ে বেঞ্চে পাশাপাশি বসলুম। একজন মহিলা চা তৈরি করছেন। রং ময়লা, কিন্তু বহুত যৌবন। বেশ আদেশের ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলছেন সকলের সঙ্গে। চিবোনো দাঁতনের মতো চেহারার একটি লোক খিদমত খাটছে। আমরা আসার আগেই লোকটি কিছু একটা অন্যায় করে থাকবে। মহিলা তাকে বেদম ঝাড়ছে। আমাদের দেখে একটু নরম হল।

পরেশদা বললেন, দুটো, মোটা করে।

মেয়েটি একগাল হেসে বললে, দুধ কেটে গেছে এই মড়াটার জন্যে। মোটা হবে না, সরু করে দিচ্ছি।

মানুষ কারও দাঁতের প্রেমে পড়ে! আমি পড়ে গেলুম। দু' সেট দাঁত যেন দু'সার মুক্তো। কত বয়স হবে! পঁচিশ-তিরিশের মধ্যে। আমার সহপাঠী সুখেন, জবা যাকে নিয়ে পালিয়েছে, সেই সুখেন এই রমণীকে দেখলে

শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রমাণ করে দিত, এ হল একটা সোনার মোহর, চিনতে পারছিস না অনেকদিন মাটি চাপা ছিল বলে। তোর কোম্পানির আধখানা সাবান দিয়ে প্রথমে ওয়াশ কর, তারপর পাতলা করে অলিভ অয়েল মাখিয়ে স্পঞ্জ। চুল রিঠে মেরে একটু সেন্ট। বিচিলি রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ। কপালে একটা টিপ। পায়ে পড়ে যাও। কালবিলম্ব নয়।

পরেশদা বললেন, জীবন যদি দেখতে চাও, দোতলার ঘর ছেড়ে নেমে এসো ফুটপাথে।

কড়া লিকারের চায়ের মতো কড়া জীবন। কোনও ফ্যাঁসফোঁস নয়, একেবারে বাঘা থাবা। আমি যা চাই, ভগবান আমাকে তাই দিয়েছেন। আহা ঈশ্বর পরম করুণাময়। পরেশদা দুটো হাত মাথার ওপর তুলে আকাশের স্লেটে তাঁর এই বার্তাটা লিখতে চাইলেন। ডানহাতে বেশ একটা মোটা লোহার বালা।

পরেশদা বললেন, ভগবানকে বললুম, ভগবান! আমার সংসার ঘুচিয়ে দাও। পনেরো বছর সময় নিলেন। সব ফৌত। পরিবার, পরিজন, আত্মীয়স্বজন সব চৌপাট। ভগবান বললেন, লেখাপড়া করলে কেরানি হবি। সারাদিন চেয়ারে বসে থেকে থেকে বাতে ধরবে, বদহজমে মরবি। এই তোর সব টাকাপয়সা কেড়ে নিলুম। নে ব্যাটা, এইবার বোঝ অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা। একটু ভাগ্য খারাপ, রেলগাড়ি হল না, হল ট্রামগাড়ি। ভগবান বললেন, এমন করে দিলুম একেবারে ঘোড়ার মতো, সারাজীবন চেয়ারের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। সারাদিন দু' ঠ্যাঙে খাড়া হয়ে ঘড়ঘড় করে ঘোরো। রাস্তায় হাঁটার সময় মনে হয় ফুটকড়াইয়ের ওপর দিয়ে হাঁটছি। কেরানি হলে সাততাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্যে খেপে উঠতুম। বিয়ে মানে মাস তিনেকের স্বপ্ন তারপর সারাজীবন দুঃস্বপ্ন। আলপিনের শয্যা। সে পথেও আর যেতে হল না। মহাদেব মাথায় হাত রেখে বললেন, বাবা পরেশ, তুমি আমার চেলা বনে যাও, দালানকোঠা ফেলে দিয়ে শ্মশানে বৈঠকখানা।

শেষ কথাটা গান হয়ে পরেশদার গলা ছেড়ে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল। বুঝলুম, বেশ ভালই চর্চা আছে গানের। ওদিকে দু'গেলাস চা নিয়ে প্রলয় কাণ্ড চলেছে। একটা লটরপটর হাতপাখা নিয়ে সেই মড়া নামধারী মানুষটি উনুনের আঁচের সঙ্গে লড়াই করছেন, আর শ্যামা মহিলাটি উত্তম-মধ্যম খিস্তি করে চলেছেন। তার মধ্যে দেহ আছে, ভাগ্য আছে, অদৃষ্ট আছে, ওই লোকটির চোদ্দো পুরুষের শ্রাদ্ধ আছে।

পরেশদা বললেন, ল্যাঙ্গোয়েজ শুনছ! স্বামী-স্ত্রীর কম্বিনেশনটা একবার দেখছ! যেমন লিকার তেমনি ফ্লেভার! আসাম দার্জিলিং ব্লেন্ড!

অবশেষে দু'গেলাস চা আমাদের হাতে এল। ভদ্রলোক গেলাসদুটো যখন আমাদের হাতে দিচ্ছেন, তখনই লক্ষ করলুম, তাঁর হাতদুটো পোড়া। সমস্ত চামড়া গুটিয়ে পাকিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেছে। দেখামাত্রই সারাশরীর কেমন করে উঠল। লোকটির মুখ দেখে মায়া হল। একসময় দেখতে নেহাত খারাপ ছিলেন না। জীবন এখন সব রস নিংড়ে নিয়েছে। মুখে কোনও কথা নেই। অসম্ভব উজ্জ্বল দুটো চোখ। গাল ভেঙে যাবার ফলে নাকটা খাড়া। মুখটা ধারালো।

পরেশদা বললেন, হাতদুটো দেখলে?

পুড়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে।

ইতিহাস শুনবে? ওটা আগুনে পোড়া নয়, অ্যাসিডে পোড়া। ওই মেয়েটির নাম লতা। তিনজনে ফাইট করছিল ওই লতার জন্যে। এক ব্যর্থ প্রেমিক, সে আবার সোনার দোকানের কারিগর ছিল। লতাকে অ্যাসিডে গলিয়ে সোনা করতে চেয়েছিল মনে হয়। তখন এই ছেলেটা বাঁচিয়েছিল। ওর গোটা পিঠটা পোড়া, একটুর জন্য মুখটা বেঁচে গেছে। তুমি পারবে, তোমার প্রেমিকাকে এইভাবে বুক দিয়ে বাঁচাতে? পারবে না। মধ্যবিত্ত বাঙালির সবকিছুই ভাসাভাসা, অগভীর। আগে নিজেকে সামলাবে। বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

প্রেমটা তেমন সাকসেসফুল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না!

তোমার মাথা! প্রেমের তুমি কাঁচকলা বোঝো। তোমার চোখের সামনে যা ঘটছে সবই প্রেম। তুমি ওই লোকটিকে কিছু বলে দেখো না একবার, কী হয়! আস্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। তুমি এখনও নাবালক। নবকার্তিকের মতো চেহারা, প্রেমট্রেম করেছ?

প্রেমে চুরচুরে হয়ে আছি। কী আর বলব! মিথ্যে কথাই বলতে হল। পেটের কথা পেটে রাখাই ভাল। দোকানে আর কোনও খদ্দের নেই। মেয়েটি বাইরে এসে বসল। ভগবান চোখ দিয়েছেন, নারীশরীরের আকর্ষণ বোঝার ইন্দ্রিয় আমার জেগেছে। আড়ে আড়ে তাকাচ্ছি। মেয়েটি বললে, আজ আর শালা কোনও খদ্দের নেই। তুমি ভাতের জলটা এইবার বসিয়ে দিয়ে চালটা বেছে ফেলো। আনাজের ঝুড়িতে কী পড়ে আছে দেখো।

এতক্ষণে লোকটির মুখে কথা সরল, আজ রুটি করো না, গরম গরম রুটি।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়ে উঠল, আমার একেবারে লোহার গতর দেখেছ, তাই না! কে এখন বসে বসে আটা ঠেসবে?

পরেশদা গেলাস নামিয়ে বললেন, চলো, এবার যাওয়া যাক।

হঠাৎ কোথা থেকে বেশ জমাটি গান ভেসে এল, সঙ্গে চালু হাতের হারমোনিয়ম। গানের বাণীও স্পষ্ট, চিন্তা না করো শ্যাম। কপাক কপাক করে তবলার ঠেকা। ফুরফুরে বাতাস। ঠুংরি অঙ্গের গান। আসছে খালের ওপার থেকে। পরেশদা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, ওস্তাদ, এসে গেছে। যাঃ, আজ রাতে আর বাড়ি যাওয়া হল না।

কেন পরেশদা?

অসম্ভব! এই গান ছেড়ে যাওয়া যায়? ওস্তাদ এসে গেছে। জোর মাইফেল।

কোথায় হচ্ছে?

ওই তো ওপারে! সাহাবাবুর গোলায়। যাও, তুমি বাড়ি চলে যাও। বাড়িতে ভাববে। আমি আসর মেরে কাল সকালে ডিউটিতে চলে আসব।

আপনার বাড়িতে ভাববে না?

যাতে কেউ না ভাবে তার ব্যবস্থা তো আমার শিববাবু করে দিয়েছে। কেউ নেই, তা ভাববে কে? এমনকী চোরেও আমার কথা ভাববে না। আমি কোথায় থাকি জানো? এক বড়লোকের বাড়ির দারোয়ানের গুমটি ঘরে। পড়তি বড়লোক। দারোয়ান দেহাতে ভেগেছে। পরিবারের ছোটবাবু বললেন, শেয়ালের আস্তানা হওয়ার চেয়ে তুমিই থাকো। পারলে একটু পাহারাটাহারা দিয়ো। তা মন্দ কী? বিনা পয়সায় থাকা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তেনারা, মানে শিববাবুর মাফলাররা।

সেটা কী?

বুঝলে না? জ্যান্ত মাফলার। ফণা আছে। ফোঁস করে। তারা মাঝে মাঝে দেখভাল করতে আসে। নাঃ, তোমার সঙ্গে আর কথা বলা যাচ্ছে না। শুনছ, ওস্তাদ কী ছাড়ছে?

পরিষ্কার কানে আসছে, চিন্তা না করো শ্যাম, আয়ি বাহার। গন্ধর্ব কণ্ঠ শোনাই ছিল, আজ কানে এল। বললুম, পরেশদা, আমিও যাব। গান আমিও ভীষণ ভালবাসি।

তোমার বাড়িতে সবাই ভাববেন।

একই ব্যাপার, আমারও কেউ নেই।

তাই নাকি? আহা কী ভাগ্য! শিবুদার কী কেরামতি! রতনে রতন মিলিয়ে দিয়েছেন। চলো তা হলে।

রাতের খাওয়া?

সে ব্যবস্থাও হবে।

পরেশদা চায়ের ঝুপড়িতে ফিরে গেলেন। লতার সঙ্গে কী একটা ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন। বললেন, হয়ে গেল। তুমি আবার ভদ্দরলোক, শেষপর্যন্ত খেতে পারবে তো!

সন্দেহ আমারও আছে। ঘেন্না করলেও চেষ্টা করতে হবে। আর না। অনেক আদর খাইয়েছি নিজেকে। এইবার দেয়াল ভাঙতে হবে। সংসার-লেত্তি জীবন-লাট্টুকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তালগোল পাকাবার সময় এসেছে। ভাল ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে লাভ কী? জীবন অনেক বড়। একটা দিক দেখা হয়েছে! এইবার আর একটা দিক দেখব। যেটাকে আমরা আলোর দিক বলি, সে তো আমাদের ব্যাখ্যা। সে আলোর কেমন আলো! মুকু কীরকম খেলাটা দেখালে! এই লতারা অনেক ভাল। বোঝা যায়। মুকুরা ধড়িবাজ।

রাস্তা পাক মেরে খালের ওপারে গিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বাগবাজার ব্রিজ হাতির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ব্রিজ পেরিয়েই গেলুম। গেট ঠেলে ঢুকতেই গান আরও স্পষ্ট হল। ভেতরটা বেশ প্রশস্ত। একটা মাথা-ঘেরা চাতাল। লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে আসরে বসে আছেন ওস্তাদ। চেহারা দেখলে তেমন সমীহ হবার কথা নয়; কিন্তু গলায় সুরের ফুলঝুরি। শ্রোতারাও কেউ তেমন বিশিষ্ট নয়। আমরা একপাশে বসে পড়লুম। পরেশদাকে দেখে ওস্তাদজি গানের মধ্যেই ঘাড় নাড়লেন। তিনি চেনেন। আসরে তবলা আছে, ঢোলও আছে। খুব সেজেগুজে পাকা চেহারার এক মহিলা বসে আছেন। অবাঙালি। পরেশদা কানে কানে বললেন, নাচও হবে। এর নাচ দেখলে তোমার ষড়রিপুর প্রথমটা একেবারে ছেতরে যাবে। চোখের কায়দা কী, যেন অর্জুন তির ছুড়ছে। ওস্তাদের গান যেন গলায় গামছার মোচড় মারছে, চিন্তা না করো শ্যাম। মহিলা বাবু হয়ে বসে আছেন মা ষষ্ঠীর মতো। ঊরুতে তাল দিচ্ছেন, সারা শরীরে ঢেউ খেলছে। ওস্তাদ যখন শ্যাম বলে সমে পড়ছেন, মহিলাও গলা মিলিয়ে হাঁটুতে চাপড় মারছেন। শব্দটা শুনতে পাচ্ছি, যেন ক্ষীরসাগরে কেউ ডাইভ মারছেন। শ্রোতারা সব টানটান হয়ে আছে। আমার পক্ষে একটু গুরুপাক হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশটা সহ্য হচ্ছে না। খালপাড়ের মশা মনে হচ্ছে তুলে নিয়ে যাবে। ছোট একটা কলকে হাত ঘুরতে ঘুরতে পরেশদার হাতে এসে গেল। শিশু যেভাবে ফিডিং বোতল চোষে সেইভাবে তিনটে প্রবল টান মেরে বললেন, পরীক্ষা করবে নাকি? শিববাবুর দাওয়াই।

আমার মাতামহের মুখে তাঁর প্রথম গঞ্জিকাসেবনের গল্প শুনেছি, কংখলের এক সাধুর আখড়ায়। টান মেরেই উলটে পড়লেন। তারপর ফুলছে। পেট ফুলতে ফুলতে ফানুস। মনে হল আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে, দুলতে দুলতে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্বর্গের সিংহদুয়ার খুলে ডাকছেন, আইয়ে, আইয়ে। ভোরবেলা মনে হল, রম্ভা তাঁর বুকে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। চোখ খুলে দেখলেন, তাগড়াই একটা কুকুর বুকের ওপর প্রেমসে ঘুমোচ্ছে। এর মধ্যেও তিনি করুণাময়ের প্রেম দেখতে পেয়েছিলেন। কুকুরটা জ্যান্ত জাম্পারের কাজ করেছিল। ওই প্রবল ঠান্ডায় তা না হলে নিউমোনিয়া হয়ে যেত!

পরেশদার মুখের একপাশে একটু আলো পড়েছে। চোখদুটো সুচের মতো সরু, ধারালো। শুনেছি গাঁজা খেলে চোখের মণি আলপিনের মতো হয়ে যায়।

পরেশদা বললেন, বড়প্রসাদ হাতে আটকে রাখার নিয়ম নেই। টান মেরেই ছেড়ে দিতে হয়। আবার রাউন্ড মেরে ফিরে আসবে। সর্বধর্ম সমন্বয়। এক কলকে বহু ঠোঁট। টানো-না-টানো, একবার টাচ করো। ছোট্ট কলকে। সাংঘাতিক গরম। একবার মনে হল, মারি টান। জীবনটাকে একটু অন্য প্ল্যাটফর্মে দেখি। অনেকদিন তো ভদ্দরলোক ছিলুম, যারা মশারি ফেলে প্রেম করে। ভাগবতের মধ্যে পর্নোগ্রাফি পুরে বলে, কৃষ্ণকথা পড়ছি। জীবে দয়া করো, বলে কাজের লোককে বেধড়ক জুতোপেটা করে। ব আর ভ এক করে ফেলে, নিজের জিভেই দয়া করে। যাদের বাড়িতে দু'রকমের চালের ভাত হয়। বাবুদের জন্যে চামরমণি, কাজের লোকের জন্যে বোগড়া। পাওনাদার দেখলে বলবে, কাম-কাঞ্চনে আমার আসক্তি নেই, আর নিজের টাকা আদায়ের সময় কলার খামচে ধরবে। গোঁফ থেকে দুধের সর মুছতে মুছতে বলবে, ভোগ একপ্রকার রোগবিশেষ।

পাশের লোকটি ছোঁ মেরে কলকেটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে, নালায়েক।

পরেশদা কানে কানে বললেন, ভালই করেছ। এ হল মুটেমজুরের নেশা। তোমাদের জন্যে বোতল। তবে কী জানো, গাঁজা খেলে কাম জয় করা যায়। ইন্দ্রিয় হল সাপ। দেখো, মহাদেব কেমন মাফলার করে গলায় পরে আছেন, যেন টনসিল হয়েছে। ওই গাঁজার জোরে বউকে বলছেন, অন্ন দে মা।

কলকে উড়তে উড়তে চলে গেল নাচিয়ের কাছে। তিনি হাঁটু তুলে বসে, দু'হাঁটুর চাপের মধ্যে হাতের কনুই রেখে তিনটি বেদম টান মারলেন। ওস্তাদ তখন গানের কলিতে অলংকার সাজাচ্ছেন, চিন্তা না করো শ্যাম। কাফি আর সিন্ধু মিলে ফাটাফাটি ব্যাপার।

ছোট একটা টিনের কৌটো হাত ঘুরতে ঘুরতে পরেশদার হাতে এল। কী একটা ঘিয়ের মতো জিনিস আঙুলের ডগায় নিয়ে চুষে খেয়ে ফেললেন। কৌটো আমাকে টপকে চলে গেল পাশের লোকের হাতে। পরেশদা বললেন, ভেসলিন।

ভেসলিন খেলেন?

গাঁজা খেলে ভেতরটা ড্রাই হয়ে যায়। ঘি দুধ আমরা পাচ্ছি কোথায়।

তিনটে তেহাই মেরে গান শেষ হল। নর্তকী দু'বার হাত ঝাঁকালেন। চুড়ি বেজে উঠল কিনকিন করে। রাতের শালু যেন দুলে উঠল। সমস্ত লোক নড়েচড়ে বসল। যে ঢোল বাজাবে তার কোলে গিয়ে চড়ল ঢোল। দু'দিকে গোটাকতক চাঁটা মেরে জানিয়ে দিলেন, জাগো জাগো।

নাচিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে ছিলেন। ডান পা-টা সটান সামনে বাড়িয়ে দিলেন। যেন উলটানো এক কদলীকাণ্ড। মসৃণ, নিটোল। অন্তরালে থাকে বলে অতিশয় শুভ্র। আকস্মিক আত্মপ্রকাশে সকলেরই ভেতরটা গেল গেল করে উঠল। পায়ের নিটোল গোছে পটি বাঁধা ঘুঙুর। সদম্ভে তিনবার পা ঠুকলেন তালে। এক, দো, তিন। ঝনঝন করে উঠল ঘুঙুর। শরীরের ওপর দিকে তরঙ্গ খেলে গেল। ঢোল ধরে নিল সেই ছন্দ, তবলা কাটতে লাগল তাল। সেই সাংঘাতিক পদশোভা ডাইনে-বামে দ্রুত আন্দোলিত হয়ে তালের পর তাল ছাড়তে লাগল। ঘুঙুরের ঝনাৎকার। নর্তকী কানে হাত রেখে তীব্র সুরে ধরলেন— সেঁইয়া না মারো লাথ। তেরি গোড় পড়ি সজনীয়া। শুনো মেরি বাত॥

কোমর থেকে নিতম্ব জলস্তম্ভের মতো হিল্লোলিত করে নর্তকী উঠে দাঁড়িয়ে সপাটে একবার ঘুরে গেলেন। শাড়ি ফুলে উঠল ঘাগরার মতো। আমার পাশের লোকটি উঃ করে উঠল। ঠিক জায়গায় গিয়ে লেগেছে।

হঠাৎ আমার কানে বাজল পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, বাঃ, বেশ হচ্ছে! এই তো চাই! এই তো চাই!

স্পষ্ট হরিশঙ্করের কণ্ঠস্বর, Virtue! a fig! ‘tis in ourselves that we are thus, or thus!

কি সুন্দর— কি মহান— উদ্বেগে দাপটে!
কি অস্থির সংক্রমণ!
কি গভীর আলোড়ন!
বিস্মিত-স্তম্ভিত আমি দাঁড়াইয়া তটে।

রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না। সুরের নেশা, দেহের নেশা। ইন্দ্রিয়ের কিলিবিলি। গাঁজার ধোঁয়া। নাচিয়ে মহিলার নাম জিরাবাই। শ'খানেক মানুষকে একেবারে লুটিয়ে দিলে। আমরা খাওয়াদাওয়ার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ লতা এসে পরেশদার পিঠে এক চাপড় মেরে বললে, পেঁয়াজি বাইয়ের শরীরের পেঁয়াজি দেখতে হয় তো, আমাকে উদ্ধার করে এসে দেখো। ঘনিষ্ঠতা দেখে মনে হল, পরেশদাও লতার প্রেমমুগ্ধ। ছিপছিপে দীর্ঘাঙ্গী এই মহিলাও কম যান না। সবেতেই বেশ মাদকতা। শরীরের বাঁধুনি বোতলের নেশাকেও হার মানায়। পরেশদা গাঁজায় চুর হয়ে ছিলেন। গোপাল বালকটির মতো পিছু পিছু চলতে লাগলেন। পশ্চিমের গঙ্গাগর্ভ থেকে জোলো বাতাস বয়ে আসছে। বেশ ভারী। ভিজে আঁচলের মতো। লতার আঁচল উড়ে উড়ে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে মুখে। মহুয়ার গন্ধ। গুনগুন করে গান ধরেছে— তোমার আমার গোপন কথা শোনে শুনুক লোকে। মেয়েটা যে নেশা করেছে বেশ বোঝাই যায়। কপাল চকচক করছে। চোখদুটো ধকধক করছে। টুসকি মারছে। মাথায় অনেক চুল। থেকে থেকে খোঁপা ভাঙছে খোঁপা বাঁধছে। কখনও সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলছে।

পরেশদা সাবধান করছেন, এই কী হচ্ছে! লোকে মাতাল বলবে।

লতা বললে, এই নাবালক মালটাকে জোটালে কোথা থেকে! বাঁদরছানার মতো সেই থেকে আমার দিকে জুলজুল করে তাকাচ্ছে। আমার শরীরে সুড়সুড়ি লাগছে মাইরি।

পরেশদা বললেন, অ্যায় লতু, হচ্ছেটা কী? কাকে কী বলছ! ভদ্দরলোকের ছেলে।

লতা খিলখিলিয়ে বললে, মাঝরাতে দুধের বাছা আর বুড়োহাবড়া ছাড়া কোন শালা ভদ্দরলোক!

পরেশদা ধমক মেরে বললেন, লতু, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড।

আমার বেশ মজা লাগছিল। ভাগ্য আমাকে কী সুন্দর জায়গায় টেনে এনেছে। বলা যায় না, এইটাই হয়তো আমার বাকি জীবনের পরিবেশ। অন্য সময়ে আমি কি আসতুম এখানে? সাতদিন আগেও এখানে আসার কথা আমি ভাবতে পারতুম না। একেই বলে যোগাযোগ। তা সবই যদি ভগবানের ইচ্ছায় হয়, তা হলে এই খালপাড়ে আসাটাও তাঁর ইচ্ছা। কেন? বলছি। ঠনঠনে গিয়েছিলুম মাকে প্রণাম করতে। হৃদয়ের ব্যথা জানাতে। মা সেখানে আমার জন্যে খাড়া করে রেখেছিলেন পকেটমার জামাইকে। জামাই সব আবর্জনা সাফা

করে দিলে। দেখা হল এই পরেশদার সঙ্গে। তিনি টেনে নিয়ে এলেন এই বিচিত্র জায়গায়। এমনই বরাত, শুরু হল গান। সঙ্গে আবার নাচ। ভগবান জানতেন, ছেলেটার মনে ছেঁদা হয়েছে। তালি মারতে হবে।

তালি মেরে পা ঠুকে জিরাবাই গান ধরলে, সেঁইয়া না মারো লাথ। তেরি গোড় পড়ি সজনীয়া। শুনো মেরি বাত॥ ঈশ্বর এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। পাতে দিলেন চাটনি। মাতাল লতা। যা ভেবেছিলুম। খেলা কোয়ার্টার সেমি নয় একেবারে ফাইনালে গিয়ে শেষ হল। খাদ্য যা জুটল সে আর বলার নয়। মাতাল রমণীর পোশাকআশাকের ঠিক থাকছে না। আঁচল খুলে পড়ে যাচ্ছে। চুল এলিয়ে যাচ্ছে। শোচনীয় অবস্থা। তার নয়, আমাদের। সেই অবস্থায় কাজ কিন্তু হয়ে চলেছে। এনামেলের থালায় ভাত, ডাল, আস্ত একটা পেঁয়াজ আর চাটনি। এই হল খাদ্য। মেয়েটির হাতের রান্নার পরিচয় পাওয়া গেল ডালে। অমৃতের স্বাদ। কী দিয়েছিল কে জানে!

যে-লোকটিকে কিছু আগে দেখেছিলুম নির্বাক পশুর মতো বউয়ের পায়ে পায়ে ঘুরছে, মধ্যরাতে তার কী বিক্রম! সে-ও মনে হয় দু'পাত্র চড়িয়েছিল। রাজার মতো বসে বসে হুকুম করছে, অ্যায় ডাল দে। চাইবার মতো একটা জিনিসই তো হয়েছে, সেটা ডাল। মদের একটা অদ্ভুত গুণ। পৃথিবীর সব প্রাণীকেই সম্বন্ধী মনে করায়। শালা ছাড়া সম্বোধন নেই। আর পরস্পরকে খুব নিকট করে। তুই ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোয় না।

ডাল দে, বললেই তো আর ডাল দেওয়া যায় না। সব শেষ। লতা হাতের চুড়ি দিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিটা একবার বাজিয়ে দিলে। মাথার ওপর দু'হাত তুলে শরীরের ওপরটা নাচিয়ে বললে, ডাল নেই, মাল আছে।

লোকটি অদ্ভুত কায়দায় বসে বসেই ডান পা-টা ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো এমন ছুড়ল, ধাঁই করে লতার বুকে। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। স্থলে জলে আকাশে। প্রথমে গোলা যুদ্ধ। গেলাস ছোড়াছুড়ি, ডালের বাটি, আধখাওয়া পেঁয়াজ। রাম-রাবণ তো নয়, রাম-সীতায় লড়াই।

পরেশদা বললেন, আর না। চলো সরে পড়ি। প্রেম জাগছে।

এর নাম প্রেম?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রেমের তুমি কী বোঝো হে ছোকরা? আলোড়ন, আলিঙ্গন, আক্রমণ, আন্দোলন, নিষ্পেষণ, নিপীড়ন।

একটা গেলাস পরেশদার মাথা ঘেঁষে ঠিকরে চলে গেল বাইরে। দুটো নেড়ি কুকুর বসে ছিল প্রসাদের আশায়। দুটোতেই তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। লতা ছুটে বাইরে চলে যেতে চাইছিল। লতার স্বামী চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে পেড়ে ফেলল। পরেশদা বললেন, হয়ে গেল। ফ্লোর করে দিয়েছে। আর না। এইবার পালাই।

রাস্তায় নেমে বললুম, পরেশদা, আবার ওই গানের আসর! শরীরের সমস্ত রক্ত খালের মশা শুষে নিল। আর যে পারছি না।

ওইজন্যেই বলেছিলুম ছিলিমে মারো টান। মশা কেন, কাঁকড়াবিছে কামড়ালেও টের পেতে না। এত রাতে তুমি ফিরবে কী করে? হেঁটে! দিনকাল ভাল নয়। রাত আর বেশি বাকি নেই, কোনওরকমে কাটিয়ে দাও।

গানের আসরের কাছাকাছি এসে পরেশদার মত বদলে গেল, আমরা একটা কাজ অবশ্য করতে পারি। তবে... তবে...

বারকতক তবে শুনে বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলুম, তবে কী?

তোমার হয়তো খারাপ লাগবে। ভাববে, তোমাকে আমি খারাপ করে দিচ্ছি। তবে, সবরকম অভিজ্ঞতাই হওয়া ভাল। একবারই তো জন্মেছি। পরেশ নামে আর তো দ্বিতীয় বার আসা হবে না। জীবনের সব দিক দেখে যাব। আমার ভাই এই মত। তোমার মত অবশ্য অন্যরকম হতে পারে। আচ্ছা একটা সত্যি কথা বলবে?

মরার ভয় না থাকলে নিশ্চয় বলব।

পরেশদা আমার কাছে সরে এলেন আরও। হাতটা চেপে ধরে বললেন, শরীরটা একটু কেমন কেমন লাগছে না?

তা তো লাগছেই। সারাদিন টোটো করে ঘুরছি।

আরে ধুর। সে তো আমিও ঘুরছি। শ্যামবাজার ধর্মতলা, ধর্মতলা শ্যামবাজার। সে নয়। জিরাবাই যা দেখালে তাতে একটু ইচ্ছে ইচ্ছে করছে না? তারপরে তোমার ওই লতা। ভেতরটা একটু টাল খেয়েছে না? সত্যি বলবে। ভণ্ডামি করবে না মাইরি।

বেশ বেকায়দা হয়ে গেলুম। এর উত্তরে সত্যি কথা বলা যায় না। ঝট করে বলে ফেললুম, আমার কিছুই হয়নি।

তোমার তা হলে অসুখ আছে। তুমি পুরুষ নও। তুমি সেই।

খপ করে আমার দুটো হাত চেপে ধরে বললেন, চরিত্র দেখাচ্ছ। চরিত্র! ওই শরীরের ঝটকা দেখে তোমার চটকা ভাঙেনি! মিথ্যে বলার জায়গা পাওনি? চলো আমার সঙ্গে।

কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে পরেশদা?

তুমি আমাকে কতটা খারাপ ভাবছ?

একটুও না।

তোমার কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে কি না?

হয়েছে।

এই এতটা সময় আমরা দুঃখকষ্ট ভুলে ছিলুম কি না?

ছিলুম।

কে ভোলালে?

গান।

গানের সঙ্গে?

নাচ।

ওকে নাচ বলে? এইবার আমি খিস্তি করব। চলো। বেশি দূরে যেতে হবে না। কাছেই।

আপনি আমাকে খুলে বলুন আগে।

ওই কালীমন্দিরের পাশের গলি দিয়ে ঢুকে গেলেই অন্য এক জগৎ। বিশাল এক বস্তি। সেই বস্তিতে জেগে আছে রাত-রূপসিরা। সাংঘাতিক এক মজার জায়গা। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই আমি মাঝে মাঝে যাই ভাই। একটু আদরটাদর করে, একটু আদর খেয়ে, ফ্রেশ হয়ে চলে আসি। এতে তো কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। কারও কোনও ক্ষতিও আমি করছি না। তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। আমাদের এইসব নিয়েই থাকতে হবে। একা তো আর থাকা যায় না। আমার যুক্তিটা তুমি মানে কি না!

পরেশদা, ওখানে আমি যেতে পারব না। আর এই এত রাতে আমাকে আপনি একা ফেলে পালাবেন না। একটা রাত আমার জন্যে একটু কষ্ট করুন। তা ছাড়া, আমার পকেটে আপনারই দেওয়া একটা মাত্র টাকা পড়ে আছে। একটাকায় তো আর ফুর্তি হয় না!

পরেশদার প্রবল উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়ল। বুঝলেন, যেখানে যাচ্ছেন সেখানে বিনা পয়সায় কেউ আদর করবে না। ফেলো কড়ি মাখো তেল। একপাক পায়চারি করে নিলেন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ব্যাড লাক। আমার কাছে আমার মতন আছে। অন্যদিন থাকে। ভেরি ব্যাড লাক। আজকের রাতটা বেশ নরম ছিল। জমত ভাল। আমি যার কাছে যাই একেবারে ঘরের বউয়ের মতো ব্যবহার করে। যাক গে, আর একদিন হবে। চলো তা হলে ওই মশার ডিপোতে গিয়েই বসি।

জিরাবাইয়ের নাচ শেষ হয়ে গেছে। তিনি সাহাবাবুর গদিতে গিয়ে ঢুকেছেন। ওস্তাদজি একটা কাওয়ালির মুখ নিয়ে কসরত করছেন। আমার ভেতরে বেশ একটা ছটফটানি অনুভব করছি। পকেটে আজ টাকা থাকলে সময়টা কী সুন্দর কাটত! অনেকদিনের একটা ব্যাকুল ইচ্ছা, প্রবল কৌতূহল পূর্ণ হত। ওরা কেমন? কী করে? কী বলে? কেমন হাসে! কত কী শুনেছি! দূর থেকে দেখেছি। আজ চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন হত। এ তো পাপ নয়। একটা অনুসন্ধিৎসা। ভেতরটা তোলপাড় করছে। সবই তো তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। তিনি এটারও মালিক, ওটারও মালিক। তা হলে পাপ ভেবে কুঁকড়ে যাচ্ছি কেন? এটা তো ঠিক, ওই একটা জিনিস কিছুক্ষণের জন্যে মানুষের সবকিছু ভুলিয়ে দিতে পারে! হরিশঙ্করের নিষ্ঠুরতা, মুকুর অনিশ্চয়তা, কেউ-না থাকার নিঃসঙ্গতা। বলাও তো যায় না, প্রকৃত প্রেম হয়তো ওই জায়গা থেকেই পাশ ফিরে জেগে উঠবে। কার বরাতে কী লেখা আছে, কেউ কি বলতে পারে? সেদিন এক ভদ্রপাগল দু'চরণ কবিতা হাঁকছিল, হয়তো তারই লেখা: চলতে চলতে মাঝপথে গেলে তার দেখা পাওয়া যায়। সেই পথে জোনাকিরা দেয় আলো। পাগল পরের চরণটা আর শেষ করলেন না। তড়বড় তড়বড় করে বলে উঠলেন, যে-জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি তার শালা কিস্যু হয় না। আমার ওইটা ভাল লেগেছিল, চলতে চলতে। চলতে চলতে তার দেখা পাব। ওই যে বারোদির ব্রহ্মচারী, বিখ্যাত সাধক, তাঁর এক শিষ্যকে বলেছিলেন, যদি মনে হয় আর পারছ না, তা হলে নিজের সঙ্গে অকারণে লড়াই না করে। বেশ্যাগমন করো। তাঁর এই যুক্তি শুনে সারা বৃন্দাবনে হইচই পড়ে গেল। বৈষ্ণবসমাজ অতিশয় অসন্তুষ্ট হলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজি তখন বৃন্দাবনে প্রবল সাধনায়। তাঁরা হায় হায় করে উঠলেন। তাঁদের দাওয়াই ছিল অন্য, দৌড়োও, কোদাল পাড়ো, গায়ে জল ঢালো। কষ্ট দিয়ে, না খেতে দিয়ে মেরে ফেলো। সনাতন পথ। বিদেশিরা বললেন, মরে না। বিকৃত হয়ে বেরিয়ে আসে। মারতে নেই। খাইয়ে খাইয়ে খিদে মেরে দিতে হয়। অরুচি করে দিতে হয়। বাঘের মোটা নেজও নড়বে, রোগা নেজও নড়বে। টিকিটিকিও ছুটবে, কুমিরও ছুটবে। করবেটা কী? ভগবানের যেমন কাণ্ড! এ কি তোমার ইচ্ছে? এ যে তাঁর ইচ্ছে। মনে পড়ছে সেই গান। বাউল গাইছেন:

বিবাদী তোর দেহে সকল
অহর্নিশি করছে রে গোল,
যথা যাবি, তথায় পাগল করবে তোরে॥
নারী ছেড়ে জঙ্গলে যায়,
স্বপ্নদোষ কি হয় না তথায়,
সাথের বাঘে সবারে খায়,
তখন আর কে ঠেকায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ছয়জন,
তারা সদাই করে জ্বালাতন,
কোন দেশে যাবি মনা চল দেখি যাই।
আমি দেখব, কোথায় পির হও তুমি রে,
তীর্থে যাবে সেখানে কি পাপী নাই রে॥

হঠাৎ কানে সুর লেগে গেল। খারাপ ভাবটা শীতের পাতার মতো খুস করে ঝরে পড়ল। মনে হল আমিও একটু গান গাই। কিন্তু আমাকে কি গাইতে দেবে? পরেশদার কানে কানে বললুম, আমাকে গান গাইতে দেবে? পরেশদা বললেন, সেকী, তুমি গান জানো?

অল্প অল্প।

দাঁড়াও, ব্যবস্থা করে আসি।

পরেশদা উঠে গিয়ে ওস্তাদজির কানে কী বললেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে বললেন, আইয়ে আইয়ে। উঠে গেলুম। তিনি হারমোনিয়মটা ঠেলে দিলেন আমার দিকে। প্রথমে একটু ভয়ভয় করছিল। গুরুকে স্মরণ করে নিলুম চোখ বুজিয়ে। ওস্তাদজিকে নমস্কার করলুম। তিনি খুব খুশি হলেন। রাত ভোর হয়ে আসছে। ভৈরবীটা আমার গলায় আসে ভাল। ভৈরবীর পরদা লাগালুম। সুর ঝলমল করে উঠল। মনে মনেই বললুম, আহা! ওস্তাদজি আমার মাথার পেছনে হাত বুলিয়ে দিলেন একবার। ধরে ফেললুম সেই বিখ্যাত গান, দয়ানী ভবানী। তিন সপ্তকে গলা বলছে। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ছেলের মাথায় আপেল বসিয়ে বাবা তিরবিদ্ধ করেছিলেন। আমার অনেকটা সেই অবস্থা। গলির ভেতর বস্তি, সেই বস্তির আধময়লা বিছানায় একটা মেয়ে, সেই মেয়েটিকে ভৈরবী দিয়ে মন থেকে ফেঁড়ে ফেলে দিতে হবে। ভবানী, তুমি দয়া করো। যাক, ভোর হয়ে আসছে। অন্ধকার ফিকে হয়েছে। বেশ ভাল লাগছে এই ভেবে, যুদ্ধে জয়লাভ করেছি। ওস্তাদজি দয়া করে হারমোনিয়ম ছেড়ে না দিলে, আংটিটা শেষপর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত পাপের পথে। খোঁচা মেরেছিল। চল চল করেছিল, আরে আমি তো আছি আঙুলে।

রাজা পরীক্ষিতের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁরই কীর্তি। আমার তো কিছু করার নেই। পরীক্ষিতের সঙ্গে দেখা হল। প্রথমে চিনতে পারেননি। কে এই বিকট দর্শন পুরুষ! হাতে দণ্ড, চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। একটি বৃষ ও একটি ধেনুকে নির্দয় প্রহার করছে। বৃষ ও ধেনুটিকে দেখে রাজা আরও অবাক হলেন।

এ কেমন বৃষ! সুন্দর ধবল বর্ণ, কিন্তু তার একটি মাত্র পা। প্রহারে জর্জরিত ধেনুটির চোখে জলের ধারা। রাজা প্রশ্ন করলেন, বর্বর, তুমি কে?

আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি কলি। আমি এসে গেছি।

রাজা স্তম্ভিত হলেন। আমার রাজ্যসীমায় কলি! কী স্পর্ধা! রাজা তখন প্রশ্ন করলেন বৃষকে, তুমি কে?

বৃষ বললেন, আমি ধর্ম।

আপনার এই অবস্থা কেন ধর্মরাজ?

মহারাজ, কলিতে ধর্মের এই অবস্থাই হবে। কলিযুগ অধর্মের যুগ। ধর্মের তিন ভাগ চলে গিয়ে থাকবে মাত্র এক ভাগ। তাই আমার একটি মাত্র পা।

রাজা ধেনুকে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে?

ধেনু বললেন, আমাকে চিনতে পারলে না পরীক্ষিত! আমি মাতা ধরিত্রী। আজ আমি ভাগ্যহীনা। আমারই বুকে সংঘটিত হবে যত অনাচার। দুর্বৃত্তরা নৃত্য করবে। সাধুসজ্জন নিপীড়িত হবে। রাজা পরীক্ষিত গর্জন করে উঠলেন, তুমি কলি! তোমার সংহার হবে আমার হাতে। রাজা অস্ত্র ধারণ করলেন। মহাতেজা পরীক্ষিত। কলি ভীষণ ভয় পেলেন। রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি তাঁর নেই। তিনি করজোড়ে আশ্রয় চাইলেন, মহারাজা, কালের নিয়মে আমাকে আসতেই হবে। না এসে উপায় নেই। আমাকে শুধু একটু থাকার স্থান নির্দেশ করুন।

বিচক্ষণ রাজা বুঝলেন, কালকে হনন করা যায় না। রাজা তখন কলির স্থান নির্দেশ করলেন। কোথায় থাকবেন কলি! পাশাক্রীড়ায় অর্থাৎ দ্যূতসভায়, মদ্যপানে, পরস্ত্রী অনুগমনে আর প্রাণীহিংসায়। কলি সবিনয়ে বললেন, রাজন, দয়া করে আরও একটি আশ্রয় দিন। আপনি যা দিলেন, তা যথেষ্ট হল না।

মহারাজ পরীক্ষিত সামান্য চিন্তা করে বললেন, ঠিক আছে, সুবর্ণেও আপনার স্থান হোক। কলি সন্তুষ্ট হলেন। আমার আঙুলের আংটিটার দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই সেই সুবর্ণ। ঘোর কলি। আমাকে আর একটু হলেই দুই ম-এ মজিয়ে মারত।

এক লাফে সূর্য উঠল টালার দিকের আকাশে। আমি বসে আছি বাগবাজারের ঘাটে। পরেশদা আর বেগ ধারণ করতে পারেননি। আমার গান শেষ হবার আগেই চলে গেছেন সেইখানে, যেখানে যাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছিল। ওস্তাদজি আর জিরাবাই সাহাবাবুদের গাড়িতে চেপে চলে গেছেন। ওস্তাদজি যাবার আগে ঠিকানা দিয়ে গেছেন। বলেছেন যদি যাই, তা হলে ঠিক ঘরানায় ফেলে দেবেন। জিরাবাই চাঁপাফুল রঙের কোমর বের করে পেছনের আসনে এলিয়ে ছিলেন। শরীর খুবই বে-এক্তার। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

ঘাটের কিনারায় জল ছলাত ছলাত করছে। পশ্চিম আকাশের ঘুম ভেঙে গেছে। মরকত নীল আকাশ। বড় বড় বিচিলির নৌকো মৃদুমন্দ দুলছে। ভোরের স্নানার্থীরা কেউ জলে, কেউ ঘাটে। কেউ বলছেন হরি, কেউ রাম, কেউ তারা। সারারাত বিশ্রীভাবে জেগে থাকার ফলে, চোখদুটো ফুলুরির মতো হয়ে আছে। এইখানে বসে থাকার ফলে, নিজের জীবনের সুরটা ধরতে পারছি। একদিকে মন্দির। মাঝে মাঝে টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যাচ্ছেন ভক্ত। শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে চিৎকার করছেন কেউ, জয় বাবা বিশ্বনাথ। ঘাটের ধাপ কাপড়ের আর পায়ের জলে ক্রমশই ভিজে উঠছে। দু'হাত দিয়ে জল ঠেলার শব্দ। ঢেউয়ের ওপর প্রথম সূর্যের আলো

চিকমিক করছে। গাঁজা নেই, গান নেই, শরীর দোলানো নাচ নেই। কোনও কুপ্রস্তাব নেই। লতার শাড়ি খোলা আধময়লা সাদা ব্লাউজ ফাটা বুক নেই। এই পবিত্রতাই আমার জীবনের সুর। আমি ধরে ফেলেছি। এই জীবনের সুর চিরকালের জন্যে বেঁধে দিয়ে গেছেন আমার পিতা, খ্যাপা হরিশঙ্কর। নিজেকেই নিজে টাইট করে বাঁধো, নইলে ফসকে যাবে। জীবন বড় গোল, পৃথিবীর চেটো বড় সমতল। বেশি নড়াচড়া কোরো না, গড়িয়ে পড়ে যাবে।

বসে থাকতে থাকতে মনে হল বারাণসী যাব। সেই দশাশ্বমেধ ঘাট। সেই বাড়িটা খুঁজে বের করব, যে-বাড়িতে যৌবনে আমার পিতা, পিতামহের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেছিলেন। যে-বাড়িতে বাঁদরের তাড়ায় ছাদের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে পড়ে গিয়ে, নাকের ওপরে, কপালে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি একটি ক্ষতচিহ্ন তৈরি হয়েছিল। যেন মহাদেবের কপালের শশাঙ্ক তিলক। প্রতিজ্ঞাটা তা হলে এই হল, রাত যাকে প্রলোভন দেখায় তাকে দিনের সুরে বাঁধতে হবে। সন্ন্যাসই তার আদর্শ। কাঁটাপেরেকের মতো ভেতরে গজগজ করছে কদিচ্ছা। রাতে কতরকম যুক্তি খাড়া করি! সকালে শঙ্কর, রাতে খৈয়াম। এমন ছেলেই বংশের মুখে চুনকালি মাখায়।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে মাথার ওপর আলতো একটা হাত এসে পড়ল। চমকে ফিরে তাকালুম। গেরুয়া বসনের প্রান্ত। মুখ তুলে তাকালুম। স্বামীজি। স্বামী নির্মলানন্দ। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। অতিশয় অপবিত্র হয়ে আছে আমার এই দেহ। স্পর্শমাত্রই তিনি অনুভব করবেন। পড়ে ফেলবেন আমার চিন্তা। এঁদের সামনে মানুষ কাচ হয়ে যায়। আমি দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম করলুম নিচু হয়ে।

তিনি বললেন, কী ব্যাপার, এই সময়ে তুমি এইখানে বসে?

প্রসন্ন স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখ। পরিষ্কার টকটকে গেরুয়া। একটু ইতস্তত করে বললুম, কাল সারাটা রাত আমি পথেই কাটিয়েছি।

সেকী? কেন? অ্যাডভেঞ্চার?

আজ্ঞে না, সে অনেক কথা।

চলো চলো, আশ্রমে চলো।

মহারাজ তরতর করে হাঁটতে লাগলেন। ভীষণ দ্রুত হাঁটেন। তাল রাখা শক্ত। কাছেই আশ্রম। সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলেন নিমতলা। শুনেছি রোজই তিনি এই পথপরিক্রমা করেন। বাগবাজারের ঘাটে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে ফিরে যান আশ্রমে। তিনতলার ঘরে। সেখানে সারাদিন জ্ঞান-তপস্যা। পত্রিকার সম্পাদনা।

কোনও দিকে তাকাবার অবকাশ নেই। পেছনে পেছনে চলেছি। সিঁড়ি। মহারাজ তরতর করে উঠছেন। ফরসা পায়ের ওপর টকটকে গেরুয়া, কী সুন্দর শোভা! টেবিলের সামনে চেয়ার টেনে বসে আমাকে বললেন, বোসো।

ভয়ভয় করছে। স্বামীজির বিশাল ব্যক্তিত্বকে আমি ভীষণ ভয় পাই। আবার ভীষণ আকর্ষণও বোধ করি। মনে হচ্ছে পাহাড়ের সামনে থম মেরে বসে আছি। স্বামীজি হাড়ের ছুরি দিয়ে একটা খামের মুখ কাটতে কাটতে বললেন, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, তোমার মুখ ধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সবই বাকি আছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

স্বামীজি স্প্রিং-এর মতো চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। এমন এনার্জি আমি একমাত্র হরিশঙ্করের ভেতরেই দেখেছি। কিছু একটা করার সময় একেবারে ছিলে-ছেঁড়া ধনুক। স্বামীজি আলমারি খুলে একটা তোয়ালে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, আগে প্রাকৃতিক কর্ম সারো। তারপর সব কথা শোনা যাবে।

ইতস্তত ভাব এল, আপনার বাথরুম, আপনার তোয়ালে!

হাসেন যখন একেবারে ছেলেমানুষ! সে হাসি আবার কড়া সুরে বাঁধা। বললেন, কর্মটা একই। আশা করি পশ্চিমি পরিচ্ছন্নতাটা জানো? সেইভাবেই ব্যবহার কোরো। আর তোয়ালে? ওটা তোমার। নারীসুলভ লজ্জা ছেড়ে পুরুষমানুষের মতো চলে যাও। একেবারে স্নান সেরে বেরিয়ে এসো।

I do none of the things I promised I would
I listen to exculpations of every imaginable sort—

একটা মিষ্টি বাতাস বয়ে আসছে গঙ্গার দিক থেকে। ঝাঁঝালো মধুর মতো রোদে ঝলমল করছে দিন। সেগুন কাঠের ঝকঝকে টেবিল। চৌকো একটা কাচ পাতা রয়েছে। মহারাজ বসে আছেন চেয়ারে। চোখের সামনে পরপর তিনটি ছবি। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজি। র‍্যাকে আলমারিতে অজস্র বই। বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা-ভাষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্য, সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ, আরও কত কী! মহারাজের উলটো দিকের চেয়ারে আমি বসে আছি। স্নান করলেও একটা অস্বস্তিতে ভুগছি। জামাকাপড় অন্তর্বাস বদলানো হয়নি।

স্বামী নির্মলানন্দজি আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, যাও, নীচে গিয়ে মায়ের মন্দিরে মাকে প্রণাম করে এসো। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসবে। ছটফট করবে না। তারপর চরণামৃত নিয়ে, ওপরে আসবে।

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি, ধর্ম ধর্ম করি বটে, আমার ভক্তিটা কিছু কম। মহারাজের নির্দেশে সিঁড়ি দিয়ে তিনতলা থেকে দোতলায় নামছি বটে, মনে তেমন কোনও উৎসাহ নেই। বরং একটা বিরক্তির ভাব। জোর করে আমাকে লোক-দেখানো বসে থাকতে হবে অন্তত পনেরো মিনিট চোখ উলটে। কতই যেন ধ্যান লেগেছে! সমাধি হল বলে। চোখ বোজাতে আমার ভয় করে। যাঁকে ভাবব, তিনি আসবেন না। আবোলতাবোল নানা দৃশ্য ভেসে আসবে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব চিন্তা দুধের মতো মনে উথলে উঠবে। অবস্থাটা হবে এইরকম, ঝোলার ভেতর থেকে বেড়ালটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাকে জোর করে চেপে ধরে আছি। থলেতে জায়গায় জায়গায় ফুলে ফুলে উঠছে। না আসে চোখে জল, না জাগে মনে পুলক! বড় শুকনো লাগে। মনে হয় বসে আছি ডেন্টিস্টের চেম্বারে দাঁত তোলাবার জন্যে।

শ্বেতপাথরের ঝকঝকে মেঝে। প্রশস্ত ঘর। সামনেই কাঠের বেড়া। বেড়ার ওপাশে সিংহাসন। সিংহাসনে মায়ের বিশাল পট। সামনেই পূজার আয়োজন। ধূপের গন্ধ বাতাসে পাক মারছে। মায়ের মূর্তির দিকে চোখ পড়ার আগেই, চোখের এমনই ট্রেনিং, চলে গেল অন্য দিকে। আটকে গেল আকাশি রঙের পিঠে। চওড়া একটি পিঠ। সামনে ঝুঁকে চরণামৃত নিচ্ছে একটি মেয়ে। মুকুর বয়সি। চোখ কেড়ে নেবার মতোই চেহারা। পরনে আকাশি রঙের ফিনফিনে শাড়ি। জিভ দিয়ে মানুষের লালা পড়ে। যদি চোখ দিয়ে পড়ত, আমার বুক ভিজে যেত। কী ভয়ংকর দুর্বল আমার মন! এই মন নিয়ে তো বেশি দূর যাওয়া যাবে না। মেয়েটি চরণামৃত

খেয়ে হাত ধোয়ার জন্যে উঠে গেল। আমার চোখও পায়ে পায়ে চলল লেজ-তোলা বেড়ালের মতো। মনে মনে নিজেকেই নিজে ঠাস করে একটা চড় হাঁকড়ালুম। রাসকেল, চরিত্রহীন!

বসে পড়লুম একপাশে। আবার যে-সে বসা নয় একেবারে পদ্মাসনে। আসলে যার কিছু হবে না, তার বাড়াবাড়িটা তো খুব হবে। সাধে মুকু বলেছে, আমি একটা ভণ্ড! মায়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, মা, আমার মন থেকে পাপটা বের করে দাও মা। ভয়ংকর জ্বালাচ্ছে। দগ্ধে দগ্ধে মারছে। এ এক অদ্ভুত অসুখ মা। এর কোনও ডাক্তার নেই। আমাকে শাসন করার কেউ নেই তো, প্রাণ যা চাইছে তাই করে বেড়াচ্ছি! মা, তুমি আমার হাত ধরো।

কষকষে করে চোখ বুজিয়ে আছি, যাতে খুলে না যায়। গায়ে একটা বাতাস লাগল। নতুন রকমের একটা গন্ধ। চোখ খুলে গেল। সেই মেয়েটি আমাকে আঁচলের বাতাস মেরে, আমারই সামনে গিয়ে বসেছে সোজা হয়ে। চওড়া কাঁধ, চওড়া পিঠ। না, আমি দেখব না। কিছুতেই দেখব না। মেয়েটি যদি ধ্যানে বসতে পারে, আমিও পারি। হেরে আমি যাব না। দাঁতে দাঁত চেপে আমি আবার চোখ বোজালুম। প্রথমেই লাঠালাঠি বেধে গেল মনে। মাকে কোথায় দেখব? ভ্রূমধ্যে, না হৃদয়ে, না মাথার ওপর সহস্রারে? ঝামেলা কি একটা! নানা মুনির নানা মত। মা আসতে চাইছিলেন, শেষে বসার জায়গা না পেয়ে, আসন না পেয়ে, ধুত্তেরিকা বলে একেবারেই বেরিয়ে গেলেন। কোনও জায়গাই খালি নেই। হৃদয়! হৃদয়ে বসে আছে মুকু। ভুরুর মাঝখানে আপাতত বসে আছে সদ্য-দেখা মেয়েটি। সেখানে, তিনজনের লাঠালাঠি চলেছে, জিরাবাই বলছে নাচব, লতা বলছে খেলব, নীলবসনা বলছে আমি পিঠ দেখাব, পাশ থেকে আমার ধারালো, একটু পুরুষালি মুখ দেখাব। আয় কে হারে, কে জেতে! একটাকে তাড়াই তো আর একটা এসে ঢোকে। জোর ধ্যান হচ্ছে! আমি হাল ছেড়ে বসে আছি। এ তো ভাল জ্বালা যা হোক! একবার পিটপিট করে তাকালুম। ঘরে আরও কয়েকজন একটি ফুল হাতে নিয়ে সংকল্প করছেন। মেয়েটি আমার চোখের সামনে খাড়া ধ্যানস্থ। একটুও বুঝতে পারছে না, সে একই সঙ্গে ওখানেও আছে, আবার আমার মধ্যেও আছে। এর মাঝে কোথাও হরিশঙ্করকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহারাজ আমাকে সুন্দর একটা গল্প বলেছিলেন: একজন সাধু, সর্বদা তার জ্ঞানোন্মাদ অবস্থা। কারও সঙ্গেই কথাটথা বলতেন না। লোকেরা বলত, পাগল। একদিন লোকালয়ে এসেছেন। ভিক্ষে করে কিছু খাবারও জুটেছে। একটা গোদা কুকুর শুয়ে ছিল। পাগল বেশ জুত করে সেই কুকুরের ওপর বসে নিজে খাচ্ছেন, কুকুরকেও খাওয়াচ্ছেন। ভিড় জমে গেল। সবাই হাসাহাসি করছে। বলছে, পাগলার কাণ্ড দেখ! সাধু তখন গম্ভীর গলায় একটি মাত্র প্রশ্ন করলেন, বাবা, তোমরা হাসছ কেন? সবাই বললে, হাসব না? হাসছি তোমার কাণ্ড দেখে। সাধু তখন একটি শ্লোক বললেন,

> বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
> বিষ্ণু খাদতি বিষ্ণবে।
> কথং হসসি রে বিষ্ণো
> সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

সেই গল্প আর শ্লোক একসঙ্গে মনে পড়ল, একটু অন্য অর্থে, অন্যভাবে। আমিও এক উন্মাদ। তবে জ্ঞানোন্মাদ নই। জ্ঞানপাগল নই, মেয়েপাগল। আর আমার শ্লোক হল, মুকুপরি স্থিতো লতা/জিরা খাদতি

লতবে। কথং হসসি রে মনো। সর্বং নারীময়ং জগৎ॥

শাস্ত্র বলছেন, বিচার করবে। রমণী কেন এত রমণীয় ভাবছ? শ্রীরামকৃষ্ণের ধমক ভেসে এল কানে, লজ্জা হয় না! পশুর মতো ব্যবহার! লাল, রক্ত, মল, মূত্র এসব ঘৃণা করে না! যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাসুন্দরী রমণী চিতার ভস্ম বলে বোধ হয়। যে-শরীর থাকবে না, যার ভিতর কৃমি, ক্লেদ, শ্লেষ্ম, যত প্রকার অপবিত্র জিনিস। সেই শরীর নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না!

বুকের ভেতরটা চাপা আগ্নেয়গিরির মতো গুমগুম করে উঠল। পিঠ দেখছি পিঠ। পিঠে কী আছে? কিছুই নেই। মন তুমি বিচার করো। পিঠ হল যে-কোনও মানুষের শরীরের একটা অংশ। মেয়েদের পিঠ চওড়া। বেশ একটা ভরভরতি শোভা আছে। এর বেশি তো কিছু নয়। পিঠ তো আর পীঠস্থান নয়। এইবার পিঠের উলটো দিক, মানে পিঠের অপর পিঠ। সেখানে? মন একটু থমকে গেল। বিচার কতক্ষণ চলত কে জানে! আর সেই বিচারে মন কতটা সরে আসত না আরও ঢুকে যেত, তাই বা কে জানে! হঠাৎ একটা চাপা কান্নায় চোখ খুলতে হল। মেয়েটি কাঁদছে। মনে মনে খুব লজ্জা পেলুম। পৃথিবীতে কত মানুষ কত দুঃখ নিয়ে ফিরছে। তার কোনও খবরই আমি রাখি না। আমি কেবল আমার তালেই ঘুরছি। মনে মনে সম্ভোগ করছি। মানুষের মন না দেখে দেহটাই দেখছি। আরে ছিঃ ছিঃ। মাথায় আঙুলের স্পর্শ। মহারাজ আমার পেছনে। ইশারা করলেন, উঠে পড়ার।

মহারাজের ঘরে আর একটা ছোট টেবিলে খাদ্য অপেক্ষা করছে। চা ধোঁয়া ছাড়ছে ফুস ফুস। মহারাজ প্রশ্ন করলেন, ধ্যান তা হলে বেশ ভালই জমেছিল?

ঠোঁটের কোণে যেন সামান্য মুচকি হাসি। ইস্পাতের মতো ধারালো কঠিন চেহারা। অন্তর্ভেদী চোখ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। সব ছেড়ে সন্ন্যাসী। ধন জন বিত্ত মান। এক মহান সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে জীবন ঘুরে গেল সংসার থেকে সন্ন্যাসে। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। বিজ্ঞানের মানুষ সংস্কৃতে কেমন করে এমন সুপণ্ডিত হলেন? আসলে ব্রহ্মচারীর পক্ষে সবই সম্ভব। পিতা হরিশঙ্কর বারেবারে আমাকে বলতেন, শিশ্নবান হও। সমস্ত সাফল্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ওইখানে।

সহসা হ্যাঁ বলতে পারলুম না। আমার সত্য-মিথ্যা জ্ঞান অতিশয় কম। কথায় কথায় মিথ্যা ঢুকিয়ে দিই। একবারও মনে হয় না, ছি ছি, মিথ্যা বললুম। স্বামীজির ক্ষুরধার চোখের দিকে তাকাবার সাহস হচ্ছে না। ধরা পড়ে যাব।

স্বামীজি বললেন, নাও, জলখাবার খেয়ে নাও। চা ঠান্ডা হয়ে যাবে। চা অবশ্য বেশি গরম খাওয়া উচিত নয়।

ভীষণ লজ্জা করছে। অপরিসীম একটা অস্বস্তি। আমার জন্যে কেউ কিছু করলে, খাতির করলে, ভীষণ কুঁকড়ে যাই। দুঃখ, বঞ্চনা, তিরস্কার, অপমান এইসবই আমার খাদ্য। পেটে সয় ভাল। আমার জন্যে কেউ কিছু করবে কেন? মাথা নিচু করে, যেভাবে মেয়েরা অনেকের সামনে খায়, আমি সেইভাবে খেতে শুরু করলুম।

স্বামীজি তখন অন্য প্রসঙ্গে। বলছেন, ধ্যানে বসলেই মন ছটফট করবে। মনের ধর্মই সেটা। ধ্যানে বসলে মনে যেসব নিচু চিন্তা ঠেলে ঠেলে ওঠে, সে সবই হল আমাদের পূর্বজন্মের সংস্কার। মনের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই। আলগা ছেড়ে দাও। দেখো কী করে! একটা চিন্তা এল। অনুসরণ করো। দেখো কোথায় যায়। কত

দূর যায়। তারপরেই ফুটবলের মতো লাথি মেরে পাঠিয়ে দাও মাঠের বাইরে। আবার একটা চিন্তা আসবে, কারণ মন কখনও খালি থাকে না। সেটাকে ওইভাবে লাথি মেরে বের করে দাও। এইভাবে একদিন তোমার চিন্তাশূন্য অবস্থা আসবে। জানো তো, যোগ দুরকমের— কর্মযোগ আর মনোযোগ। যাক, সেসব কথা পরে। অযাচিত কারওকে জ্ঞান দিতে নেই। জ্ঞানের মূল্য কমে যায়। একমাত্র প্রার্থীকেই দিতে হয়। তোমার চোখ বলছে, তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়। তোমার এই বয়সটা বড় সাংঘাতিক! আবার কোন বয়সটাই বা সাংঘাতিক নয়? আবার সাংঘাতিকের সংজ্ঞাটাই বা কী? যে যার জীবন বেছে নেয়। যে যার ঘর বেছে নেয়।

আমার খাওয়া শেষ। প্লেট কাপ ডিশ নিয়ে বিব্রত। এমনি রাখব, না ধুয়ে রাখতে হবে! এখানে নিয়ম-কানুন খুব সাংঘাতিক।

আমার বিব্রত অবস্থা দেখে স্বামীজি বললেন, যাও, ছাদের একপাশে রেখে দাও। হাত ধুয়ে এসো।

ধুয়ে রাখব না?

তোমাকে ওসব কিছুই করতে হবে না। নিজেকে অত অচ্ছুৎ ভাবছ কেন? তোমার মধ্যে বিশ্রী একটা মেয়েলি ভাব আছে। ওটাকে চেষ্টা করে তাড়াও তো! এফিমিনেসি।

অভিমানে বড় লাগল। ভাল ভেবে যা করতে যাই, সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসি। এই আমার বরাত। যেখানে যা কিছু করতে যাব। পিতা হরিশঙ্করকে ভাল ভেবেই সাবধান করতে গেলুম, একজন পরস্ত্রী, সদ্য বিধবা, যুবতী, একই বাড়িতে একসঙ্গে থাকলে আপনারই নিন্দা হবে। হবে কেন, হয়ে বসে আছে। আমার নিজের কত বড় একটা ত্যাগ। মহিলার সঙ্গে কাকিমা সম্পর্কের আড়ালে আমারই আর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পিতা ভুল বুঝলেন। রেগে নিরুদ্দেশ। পৃথিবী জুড়ে উলটো বুঝলি রামেদের রাজত্ব।

ছাতের একপাশে একটা কল। কলের তলায় সব রেখে চলে এলুম। মহারাজ বললেন, এইবার বলো তোমার কী সমস্যা হয়েছে?

কয়েকদিন আগে বলা নেই কওয়া নেই আমার বাবা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন শেষরাতে।

কোথায় গেছেন বা যেতে পারেন বলে তোমার অনুমান?

আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে। আমাদের আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যেখানে তিনি যেতে পারেন। বন্ধুবান্ধব দু'-একজন থাকলেও তিনি যাবেন না, কারণ তাঁর নেচারটাই একটু অন্য ধরনের।

তোমার মুখেই শুনেছি, ভেরি আপরাইট। তেজস্বী পুরুষ। তুমি কী অ্যাকশন নিয়েছ?

আমি শুধু ভাবছি।

বাঃ বাঃ, আর পথে পথে ঘুরছ, আর মানুষের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছ! বাঃ। শাবাশ বাঙালি!

আমি কী করব বলুন? থানায় ডায়েরি করলে তাঁকে ছোট করা হয়।

মহারাজ টেবিলের দিকে তাকিয়ে সামান্য সময় ভাবলেন। মুখ তুলে বললেন, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। একজন শিক্ষিত, বিচারশীল, বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা করেন, ভেবেচিন্তে পূর্বপরিকল্পনা মতোই করেন। এ তো খেয়ালের ঘর ছাড়া নয়। এ একধরনের বানপ্রস্থ।

মহারাজের কথা বন্ধ হয়ে গেল। ঘরে সেই মেয়েটি ঢুকছে। নীচে মায়ের ঘরে যার দিকে তাকিয়ে আমার ধ্যান মাথায় উঠেছিল। চোখদুটো ছলছলে হয়ে আছে। ইরানি ছুরির মতো চোখ। ভীষণ ধার। এইরকম একটা

পূত সংস্পর্শে বসেও মন প্রজাপতি হয়ে গেল। এ একেবারে অন্য রকমের, অন্য ধারার মেয়ে। লম্বা ছিপছিপে, চাবুকের মতো চেহারা। কাঁধ, বুক, পিঠ পুরুষের মতো চওড়া। অ্যাথলিটদের এইরকম চেহারা হয়। চলনে বলনে কোনও জড়তা নেই। আমার লজ্জা, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

মহারাজ বললেন, এসো, এসো সুরঞ্জনা এসো। কেমন আছ তোমরা?

মেয়েটি নিচু হয়ে প্রণাম করল। প্রণাম করতে করতেই বললে, ভাল আছি মহারাজ।

কোনও খবর পেলে?

নাঃ, কোনও খবর নেই।

আশ্চর্য ব্যাপার। একটা জলজ্যান্ত ছেলে স্রেফ উবে গেল!

সবাই বলছে খুন করে ফেলে দিয়েছে। মেয়েটির চোখে জল এসে গেল। কান্নার কোনও শব্দ নেই। কুলকুল করে জল গড়িয়ে চলেছে দু'গাল বেয়ে।

মহারাজ বললেন, একেবারে একস্ট্রিমটা ভাবছ কেন? হঠাৎ খুনই বা করতে যাবে কে!

আপনি তো জানেন, আমার বাবার অনেক শত্রু আছে। তাদেরই কেউ চরম প্রতিশোধটা নিয়ে নিলে। পুলিশ তো তিন মাস ধরে হন্যে হয়ে খুঁজেও কিছু করতে পারলে না।

মেয়েটি একেবারে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অস্তিত্বটাই যেন সে ভুলে গেছে। শাড়ির আঁচল কখনও আমার মুখে, কখনও মাথায়। শরীরের উত্তাপ, ঘ্রাণ সবই আমার অনুভূতিতে। মুঠোয় ধরা যায় এমন কোমর ঠিক আমার ডান কনুইয়ের পাশে। একবার আড়চোখে তাকিয়েছিলুম, দৃষ্টি সোজা গিয়ে ঠেকল নাভিতে। একে আমি পেটরোগা প্রেমিক। যাকে দেখছি তারই প্রেমে পড়ে যাচ্ছি, তারই বরাতে এই গেরো! উঠে যেতেও পারছি না। মহারাজ ভাববেন, মনে পাপ পুষছে বাইরে পুণ্যের ভেক। আমার তো স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান থাকা উচিত নয়। আমি তো ভাল ছেলে। ধর্মে মতি, দ্বিজে ভক্তি, মহা গুণবান।

মহারাজই বাঁচালেন। বললেন, বোসো মা সুরঞ্জনা!

আমি আমার বাঁ পাশের চেয়ারে নিজেকে তুলে বসালুম। সুরঞ্জনা আমার চেয়ারে বসল। গা থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। শাড়িটা সিল্কের। হাতে একটা সোনার বালা ঝিলিক মারছে। বিশাল বড়লোকের মেয়ে। কোনও সন্দেহ নেই। চেহারায় একশো ভাগ আর্য।

মহারাজ আমাকে বললেন, বুঝলে পলাশ, অনেকটা তোমার মতোই কেস। তোমার বাবা, এর দাদা। বোম্বাইতে ট্রেনে চেপেছিল এইটুকু নিশ্চিত খবর, তারপর সবই অনিশ্চিত।

সুরঞ্জনা যেন ব্যথার ব্যথী পেল। আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, আপনার বাবা!

মুখটাকে করুণ থেকে করুণতম করে বললুম, কয়েকদিন হল আমার বাবা হারিয়ে গেছেন।

মহারাজ বললেন, হারিয়ে গেছেন বোলো না, বলো নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

সুরঞ্জনা বললে, আপনি কী করছেন?

মহারাজ উত্তর দিলেন, কিছুই তেমন করা যাচ্ছে না। তিনি একজন নামী মানুষ, পণ্ডিত মানুষ, বিচক্ষণ মানুষ, স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করেছেন, অনেকটা হঠাৎ বানপ্রস্থের মতো, এ-ক্ষেত্রে থানা-পুলিশ, কাগজে বিজ্ঞাপন

করা মানেই তাঁকে হেয় করা। ঘটনাটা মেনে নিতে হবে। সইয়ে নিতে হবে। এইরকম হয়। হঠাৎ বৈরাগ্য এসে যায়। অনেকে পরবর্তীকালে এইভাবেই মহাপুরুষ হয়েছেন। আমাদের হিমালয় এক বিস্ময়কর মায়াবী স্থান। মানুষকে ঘর থেকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে নিয়ে যায়। এইজন্যেই ভারত এক মহাপীঠস্থান, পুণ্যভূমি, পরমযোগের স্থান।

সুরঞ্জনার বাঁ কনুইটা আমার ডান কনুইয়ে ঠেকে আছে। পুলক, শিহরন সবই চলেছে যুগপৎ। আমি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছি। মনে হচ্ছে খুব কারেন্ট আছে। অনেকের শরীরে এইরকম খাকে। শুদ্ধ সত্তা হলে এমন হয়। আমি শুনেছি, আজ অভিজ্ঞতা হল।

সুরঞ্জনা আবার আমার দিকে তাকাল। মনে হয় আমার করুণ মুখ দেখে তার করুণা হয়েছে। তার মুখও খুব করুণ গম্ভীর। এত কাছ থেকে এমন একটা ধারালো মুখ দেখলে শরীর কেমন করে। মনে নেমে আসে আরব্য রজনীর রাত। বাগদাদের বাজারে ঘুরছি। দেয়ালে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। ছোট ছোট কুপিতে আলো। থরেথরে সাজানো বেদানা, আঙুর, খেজুর, কিসমিস, আখরোট, খরমুজ, খুবানি। হঠাৎ সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে বোরখা-পরা সুন্দরী। আমি তার পায়ের গোড়ালি দেখতে পাচ্ছি। বোরখার ঝালর তুলে এক নজর যেই তাকাল, মনে হল ছুরি চালিয়ে দিলে বুকে আমার। মনে হয় শীতের রাতে একই আলোয়ানের তলায় আমরা দু'জনে। আমি আর সে। বসে আছি যমুনার তীরে। শীত-শীত পূর্ণিমা রাত। দূর থেকে ভেসে আসছে ঠুংরির চরণ। এইসব মনে হয় আমার। এ একটা অসুখ। দুরারোগ্য ব্যাধি। মাঝে মাঝে মনে হয় কোনও এক জন্মে আমি নবাব ছিলুম। এই অসুখের মনে হয় একটাই ওষুধ, বেধড়ক ধোলাই।

সুরঞ্জনা বললে, আপনি আমার বাবাকে একবার বলে দেখতে পারেন। উনি তো ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার। ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান চালিয়ে একটা কিছু করতে পারেন, যা আপনার বাবার পক্ষে অসম্মানজনক হবে না।

আমি একটু কুঁচকে গেলুম। পুলিশ অফিসারের মেয়ে! কোনও চালাকি চলবে না। আমি হ্যাঁ না কিছুই না বলে একটু সরে বসলুম। গায়ে গা না লেগে যায়! সুরঞ্জনা মহারাজকে বললে, অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়িতে আজ একবার যাবেন? বাবা বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন। আপনি না গেলে আমার মাকে সামলানো যাচ্ছে না। আমি গাড়ি এনেছি।

মহারাজ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, তোমার বাবা আমার সহপাঠী ছিলেন। বন্ধুর অনুরোধ তো রাখতেই হবে। পলাশ, তুমিও চলো আমার সঙ্গে। কোনও কাজ নেই তো?

আজ্ঞে না।

তোমার অফিস?

সেখানেও গোলমাল মহারাজ।

তোমার গ্রহ খুব বেঁকেছে পলাশ।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বিদিগিচ্ছিরি সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি।

ঠাকুরকে ডাকো। জীবনের কাছ থেকে বাঁচার শিক্ষা নাও। আচ্ছা, তোমরা দু'জনে ছাদে যাও। আমি তৈরি হয়ে নিই।

ছাদের আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম দু'জনে। চারপাশে গিজিগিজি বাড়ি। বাগবাজার যে কত ঘিঞ্জি এই ছাদে দাঁড়ালেই জানা যায়। আমার থেকে হাত দুয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুরঞ্জনা। একটু পুরুষালি চেহারা, কিন্তু কী ভয়ংকর আকর্ষণ! ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে, ঈশ্বরলাভের সাধনা না করে এই মেয়েটিকে জীবনে পাওয়ার সাধনাই তো ভাল। কোনও পাহাড়ে, নিরালা কোনও নদীর ধারে, ঢেউ-ভাঙা সমুদ্রের কিনারায় দু'জনে পাশাপাশি বসে থাকা। গিরিশ গেয়েছিলেন, 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই। কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই'। যেখান থেকে আসি আর যেখানেই ভেসে যাই, এসেছি, এইটাই বড় কথা। এমন সুন্দর পৃথিবী! নদী, পর্বত, সমুদ্র, বনানী, সুন্দরী রমণী, ঘুরন্ত ঘাগরা, দুরন্ত নিতম্ব, চপল চরণ। গঙ্গার মৃদু বাতাসে সুরঞ্জনার দু'-এক গুছি চুল কপালে এসে কাঁপছে। সুরঞ্জনার কণ্ঠস্বর অনেকটা বেগম আখতারের মতো। একটু ঘষাঘষা। তার ফলে আরও আকর্ষণীয়।

সুরঞ্জনা প্রশ্ন করলে, আপনি কি ছাত্র?

না, আমি একজন কেমিস্ট।

বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন কোন কলেজে?

স্কটিশে। আপনি?

আমি এখনও ছাত্রী। বিজ্ঞানেরই। এবছর আমার ফাইনাল। পড়াশোনা তেমন কিছুই হচ্ছে না।

এই ঘটনাটার জন্যে?

হ্যাঁ। দাদার কী যে হল! অমন একটা ছেলে! গতবছর শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোল। সাংঘাতিক ভাল ছাত্র। তেমনি খেলাধুলোয়। দাদাই তো আমাকে পড়াত। আমার চেয়ে ঠিক দু বছরের বড় ছিল। একেবারে বন্ধুর মতো। বড় একা হয়ে গেছি। বাড়িতে যতক্ষণ থাকি কেবল দাদার কথা মনে পড়ে। সব জায়গায় দাদার স্মৃতি। জানেন তো, আমার গভীর বিশ্বাস, এর পেছনে বাজে একটা মেয়ে আছে। ফেরোশাস। একই সঙ্গে গোটাদশেক ছেলেকে খেলাচ্ছে। এই নিয়ে এক বছর বাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছিল। দাদাও একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মা আর বাবাকে চড়া চড়া কথা শোনাত। আপনিও আমার দাদার বয়সি। আপনার সঙ্গে আমার দাদার চেহারার ভীষণ মিল। ঠাকুরঘরে আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলুম। আপনাদের এই বয়েসটা খুব সাংঘাতিক।

মনে মনে ভাবলুম, সে আর বলতে!

সুরঞ্জনা বলতে লাগল, আমরা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। দাদাকে কত চেষ্টা করেছি এই পথে আনতে। হেসে উড়িয়ে দিত। বলত ওসব বুড়ো বয়সে হবে, যখন শরীর ঝুলে যাবে, দাঁত পড়ে যাবে। মহারাজের কাছে একবার এনে ফেলতে পারলে, এই অবস্থা হত না।

মনে মনে ভাবলুম, কিছুই কি হত! আমার কি কিছু হয়েছে। ভেতরে ঠিকই সে নড়ছে। সে আমার প্রবৃত্তি। যে-প্রবৃত্তিতে সুরঞ্জনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকাটা স্বর্গসুখের মতো মনে হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের একদিন কথায় কথায় বলছিলেন, মনে করলেই ত্যাগ করা যায় না। প্রারব্ধ, সংস্কার — এসব আবার আছে। একজন রাজাকে একজন যোগী বললে, তুমি আমার কাছে বসে থেকে ভগবানের

চিন্তা করো। রাজা বললে, সে বড় হবে না; আমি থাকতে পারি, কিন্তু আমার এখনও ভোগ আছে। এ বনে যদি থাকি, হয়তো বনেতে একটা রাজ্য হয়ে যাবে। আমার এখনও ভোগ আছে।

সেই ভোগ আমারও মনে হয় আছে। আমার এই ভোগের প্রবৃত্তি কোথা থেকে এল? উড়ে তো আর আসেনি। এসেছে জন্মসূত্রে। কার রক্তের ধারায় প্রচ্ছন্ন ছিল এই প্রবৃত্তি? পিতার? মাতামহের? একটু সত্য কথা, একটু মনের কথা সাহস করে কেউ বলবেন কি? একটা স্বীকারোক্তি! পিতা কেন বারেবারে সাবধান করতেন, দেখো, তোমার মাতুল বংশের দিকে যেয়ো না। অনেক ভাইস।

মহারাজ বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অপূর্ব দেখাচ্ছে। নিপাট টকটকে গেরুয়া। কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। মাথায় গেরুয়া টুপি, চোখে সোনার চশমা। বেরিয়ে এসেই বললেন, চলো চলো। সময় খুব কম।

সাদা রঙের গাড়ি। মহারাজই ঠিক করে দিলেন, কীভাবে বসা হবে। পেছনের আসনে একধারে মহারাজ, আর একধারে সুরঞ্জনা। মাঝখানে আমি। কামিনীর স্পর্শ থেকে সন্ন্যাসীকে দূরে রাখার দায়িত্ব আমার। আমার বাঁ দিকে, আমারই পা ছুঁয়ে সিল্ক-ঢাকা মসৃণ জঙ্ঘা। তার ওপর লম্বা লম্বা আঙুল। অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে আংটির বেদানার দানার মতো পাথর। মসৃণ কাঁধে ছুঁয়ে আছে আমার কাঁধ।

As certain as stars at night.
Ordawn after darkness.
Inherent as the lift of the blowing grass
whatever your despair or your frustration
This too, will pass.

আমার অবস্থা কিঞ্চিৎ শোচনীয়। একপাশে সুরঞ্জনা, আর একপাশে মহারাজ। এক পাশে সন্ন্যাস, অপর পাশে সংসার। মহারাজের দিকে চাপতে পারছি না। সংকোচ হচ্ছে। ভাববেন, আমাকে একেবারে ঠেসে ধরছে। সুরঞ্জনার স্পর্শ বাঁচাবার চেষ্টাও করতে হচ্ছে। ভাববে, সুযোগ নিচ্ছে। সিল্ক-জড়ানো ওই শরীরের স্পর্শ যে কী সাংঘাতিক, তা আমার বয়সি একটি ছেলেই কেবল জানে! বাতাস ছুটে আসছে উলটো দিক থেকে। কাঁধের আঁচল মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে আমার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। দু'-এক গুছি চুল খেলে যাচ্ছে বাঁ গাল ছুঁয়ে। কোনও ভাবেই বাঁ দিকে তাকাতে পারছি না। সিল্ক বড় অবাধ্য। জুতসই হয়ে বুকের ওপর থাকতে জানে না। বাঁ দিকে ঘাড় ঘোরালেই সুরঞ্জনা সচেতন হয়ে একটু চাপাচুপি দেবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে। আমার বাঁ পাশে বড় অশান্তি। মহারাজ ভাবস্থ। তাঁর ধারণাই নেই, এক আঙুল তফাতে জীবনের কোন চোরাস্রোত বইছে। যতটা সম্ভব ছোট হয়ে বসে থাকার চেষ্টা করছি আমি। একেই বলে ছোট হওয়ার সাধনা। দেহের অবস্থা আমার মনেরই মতো। ত্যাগ আর ভোগের মাঝখানে কুঁকড়ে বসে আছি। নিজের মনেই হাসছে জ্ঞানপাপী। স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ছে। অনেকে মনে করে, মেয়েমানুষ না দেখলেই হল। মেয়েমানুষ দেখে ঘাড় নিচু করলে কী হবে? যতক্ষণ আমার কাম, ততক্ষণই স্ত্রীলোক, তা না হলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-বোধ থাকে না। শিশুদের তো নারী-পুরুষ ভেদ থাকে না। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের কোথা থেকে কী একটা বেরিয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বাঘের খেলা।

মহারাজ নির্দেশ দিলেন, গাড়ি যেন কলেজ স্ট্রিট ধরে যায়। কলেজ স্ট্রিটের আলাদা একটা আভিজাত্য আছে। গাড়ি সেই মতোই চলেছে। সুরঞ্জনা মৃদু গলায় কথা শুরু করল, অঙ্ক আপনার কেমন আসে?

খুব একটা খারাপ নয়।

বাবা তো অর্থনীতির। দাদা আমাকে অঙ্কটা দেখিয়ে দিত। ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসটা আমার একেবারে মাথায় ঢোকে না। বেশি না, সপ্তাহে একদিন আমাকে দেখিয়ে দেবেন?

কেন দেব না? আজ আমার বাবা থাকলে আপনার কোনও ভাবনাই থাকত না। তাঁর মতো অঙ্কে পাণ্ডিত্য, শুধু অঙ্ক কেন সব শাস্ত্রে, আমি খুব কম দেখেছি। আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে চলে গেলেন।

এইবার আমার কান্না আসছে। বুকের ভেতরটা মথিত করছে অপরিসীম এক নিঃসঙ্গতা। শেষ প্রিয়জনকে হারাবার বেদনা। হঠাৎ সুরঞ্জনা আমার হাতে হাত রাখল। আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। একেই বলে নারী!

সুরঞ্জনা বললে, আপনার আর আমার একই দুঃখ। কী আর করা যাবে বলুন!

মৃত্যু যেমন সকলকে সমান করে, ডেথ দি ইকোয়ালাইজার, দুঃখও সেইরকম। সুরঞ্জনার মুখে এইরকম একটা কথা শুনে ভারী ভাল লাগল। মনের দিক থেকে এরই মধ্যে কতটা কাছে সরে এসেছে আমার। এই মুহূর্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসছে। তিনিই সব করান। আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাইনি/বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাইনি॥/আমার সকল ভালবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়/তুমি ছিলে আমার কাছে/তোমার কাছে যাইনি॥

সুরঞ্জনা ডান হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতটা ধরে রেখেছিল। অনেক ইতস্তত করে মহারাজের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে আমার ডান হাতটা তার হাতের ওপর রাখলুম। মনে হল, জীবনটা যদি এই রকমেরই একটা নিশ্চিন্ত চলা হত! প্রথম অনুভূতি নিয়ে। পাশ দিয়ে বিপরীতে ছুটবে জগৎ জীবন। আমরা নিশ্চেষ্ট। 'ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়।'

সুসময় যে কত সহজে কত দুঃসময় হয়ে যেতে পারে আমার বোধবুদ্ধিতে ছিল না। সেই গানটার মতো, যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে কাঁদতে হবে অবশেষে। ঠিক মির্জাপুরের কাছে এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। পুলিশ হাত তুলেছে। বাঁ দিকে তাকিয়েই শরীর হিম হয়ে গেল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে মুকু। পাছে চোখাচুখি হয়ে যায়। আমি চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। খট করে বাঁ দিকের দরজাটা খুলে গেল। একটা হাত আমার বুকের কাছের জামাটা খামচে ধরেছে। আমার চোখ খুলে গেল। মুকুর রুদ্রাণী মূর্তি, নেমে এসো শয়তান। নেমে এসো। মুকু জামা ধরে হিড়হিড় করে টানছে। সুরঞ্জনা ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। মুকুর শরীরের বেশ কিছুটা সুরঞ্জনার শরীর ছুঁয়ে গাড়ির ভেতর ঢুকে এসেছে। মুকুর রং যেন ফসফরাসের মতো জ্বলছে। মুকু আর একবার ঝাঁকানি মেরে বললে, নেমে এসো শয়তান।

পেছনের সব গাড়ি আটকে গেছে। ভ্যাঁ ভোঁ, প্যাঁ পোঁ হর্ন। মহারাজ যথেষ্ট বিরক্তির গলায় বললেন, নাটক না করে এখনই নেমে যাও। রাস্তার মাঝখানে এ কী অসভ্যতা! আমার একটা মানসম্মান নেই? ছিঃ ছিঃ, তুমি তো মহা বদ ছেলে!

সুরঞ্জনার হাঁটু ছেঁচে কোনওরকমে রাস্তায় গিয়ে পড়লুম। ভালভাবে দাঁড়াবারও অবকাশ মিলল না, মুকুর প্রবল আকর্ষণে প্রায় টলে পড়ে যাই আর কী! এরই মাঝে সশব্দে দরজা বন্ধ হল, গাড়ি চলে গেল। এইবার মুকু আর আমি মুখোমুখি। মুকু দু'হাতে আমার বুকে চাপড় মারতে মারতে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে, শয়তান শয়তান, বলো কোথায় ছিলে, কোথায় ছিলে সারারাত।

মুকু জানে না কলকাতার মানুষ কী সাংঘাতিক কৌতূহলী! চারপাশে লোক জড় হয়ে গেছে। সবাই ভাবছে, কী না কী হয়ে গেছে। আমিও বুঝে উঠতে পারছি না, ব্যাপারটা কী? মুকু হস্টেলে ছিল। মুকু ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছিল, এইটুকু বুঝে নিতে অসুবিধে হল না, কিন্তু তারপর? ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, এই তো চাই। মেয়েরা না জাগলে বাঁদররা শায়েস্তা হবে না। জুতো, জুতো, জুতো লাগাও, জুতো।

মুকু হঠাৎ ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বৈদ্যুতিক করাত দিয়ে কাঠ কাটার গলায় বললে, মজা দেখছেন, খুব মজা! যান এখান থেকে!

ভিড় একটু থমকে গেল। মুকু বীরাঙ্গনার মতো আমার হাত ধরে টানতে টানতে কলেজ স্কোয়ারে ঢুকে পড়ল। এত জোরে টানছে, আমি সামলাতে পারছি না। মনে হচ্ছে, টাল খেয়ে পড়ে যাব। পায়ে পা বেধে যাচ্ছে। ভিড়ের কে একজন বলে উঠল, এ অন্য কেস, অন্য কেস। কানে আর একটা মন্তব্য এল, বিয়ে করব বলে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আজ একেবারে ক্যাচ, কট, কট। বাছা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি!

লজ্জায় অপমানে আমার চোখে জল এসে গেছে। সবচেয়ে প্রিয়জন, সকলের চোখের সামনে এইভাবে অপমান করতে পারে? এ তো প্রকাশ্য রাজপথে জামাকাপড় খুলে নেওয়ার মতো। মহারাজের শেষ কথা ছুঁচের মতো মর্মে বিঁধেছে, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও। যেন আমি তাঁর পাশে বসে কোনও অপকর্ম করে ফেলেছি।

মুকু টানতে টানতে আমাকে একটা নিরালায় নিয়ে এল। গাছের আড়ালে। সরোবরের জল আলোয় টলটল করছে। মুকু আমার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল, তুমি আমাকে ফেলে কাল সারারাত কোথায় ছিলে? কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ! তুমি কোথায় যাচ্ছিলে! আমার জামাটা খামচে ধরে আছে। সেটা ছাড়েনি।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই বসে পড়লুম ময়দার তালের মতো। প্রথমে মুকুর ওপরে রেগে আগুন হয়েছিলুম, এ কেমন ধারা অসভ্যতা! মহারাজের সামনে, সুরঞ্জনার সামনে, রাস্তার কিছু উটকো লোকের সামনে একেবারে বেইজ্জত! তার মুখ, চোখে জল, ভয়ংকর একটা আবেগ দেখে রাগের ভাবটা চলে গেল। এইবার অবাক হবার পালা। মুকু জানল কী করে, সারারাত আমি বাড়িতে নেই?

মুকু আমার সামনে বসেছে বাবু হয়ে। কোলের ওপর অলস ভঙ্গিতে পড়ে আছে ফরসা ফরসা নিটোল দুটো হাত। শিশু কান্না থেমে যাবার পর যেভাবে ফোঁপায় সেইভাবে থেকে থেকে ফুলে উঠছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। দু'চোখে আকাশ। কোনও কথা বলতে পারছে না। দিঘির জলে গোটাকতক ছেলে খুব ঝাঁপাই জুড়ছে।

অবশেষে আমাকেই জিজ্ঞেস করতে হল, তোমার হঠাৎ কী হল! সকলের সামনে এইরকম একটা বিশ্রী কাণ্ড করলে! লোকে তো আমাকে কচুরি ধোলাই দিত আর একটু হলে!

মুকু মুখ ফিরিয়ে রইল। এতক্ষণ যে এত সরব ছিল, প্রায় বাঘিনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শিকারের ওপর, সে এখন শিথিল, নির্বাক। আমি বললুম, বলবে তো, কী হয়েছে? তুমি সেই হস্টেলে ঢুকলে আর বেরোলে না। আমি প্রায় দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলুম।

মুকু এইবার সরাসরি আমার দিকে তাকাল। চোখদুটো জ্বলছে। আবার রাগ আসছে। মুকু দাঁতে দাঁত চেপে বললে, তুমি রাতে বাড়ি ফিরেছিলে?

না।

কোথায় ছিলে তুমি? বলো মিথ্যে বলো। অম্লান বদনে বলো, টিপের বাড়িতে ছিলুম।

তা বলব কেন? কাল আমার অনেক খোয়ার গেছে। আমি সারারাত পথেই ছিলুম।

আবার মিথ্যে কথা! তাই তোমার এই তেল চুকচুকে চেহারা? বাহারি টেরি? একটা মেয়ের হাত ধরে গদগদ হয়ে, নতুন একটা গাড়ি চেপে কোথায় যাচ্ছিলে লীলা করতে?

আমার ওপাশে মহারাজ ছিলেন, সেটা তোমার চোখে পড়েছিল?

তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। তুমি ওরই মধ্যে তোমার কাজ সেরে নিতে পারো। তোমার অসীম ক্ষমতা। সেই ক্ষমতার পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি!

এইবার আমার ভয়ংকর রাগ এল। অকারণে মেয়েটা আমাকে তড়পাচ্ছে। অপরাধ করল নিজে, দোষ দিচ্ছে আমাকে। অফেন্স ইজ দি বেস্ট ডিফেন্স। সেই টেকনিক। আমি একটু ঝাঁঝের গলায় বললুম, চিরকালের জন্যে তুমি আমাকে মহারাজের চোখে ছোট করে দিলে। আমার আশ্রমে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

তোমার মতো চরিত্র আশ্রম-টাশ্রমে যত কম যায় ধর্মের পক্ষে ততই ভাল।

কেন বলো তো! আমার ওপর তোমার অত রাগ কেন?

রাত ন'টার সময় আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলুম।

সেকী? কী করে?

যেভাবে সবাই যায়। বাসে করে।

তোমাকে তো পুলিশে ধরেছিল!

কোন অপরাধে? আমি চোর না ডাকাত?

তা হলে তোমাদের হস্টেলের সামনে পুলিশের গাড়ি ছিল কেন?

হস্টেলে একটা বড় রকমের চুরি হয়েছে। পুলিশ এসেছিল অনুসন্ধানে।

তা তুমি আমাকে দু'ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন?

জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হবে, সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলব, অনুমতি নোব, তারপর তো আসব।

সেই কথাটা আমাকে জানাতে কী হয়েছিল?

নিশ্চয় কোনও কারণ ছিল।

তা হলে আমার অপরাধটা কোথায়?

তোমার অপরাধ? তুমি একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থপর। তোমার জন্যে আমাকে ট্যাক্সি করে পড়ি কি মরি ছুটতে হয়েছে, কারণ তা না হলে তুমি বাড়ি ঢুকতে পারতে না।

কেন?

বাড়ির চাবিটা কার কাছে?

সত্যিই তো চাবিটা কার কাছে? সে খেয়াল তো আমার হয়নি। মুকু বলতে লাগল, হস্টেলে প্রথমে আমাকে একটা মুচলেকা লিখে দিতে হল। আমি আমার দায়িত্বে হস্টেল ছেড়ে আমার মেসোমশাইয়ের বাড়িতে যাচ্ছি। রাত ন'টার সময় ওই ভয়ংকর ভৌতিক বাড়ির দরজা খুলে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে দোতলায় উঠলুম। হঠাৎ সমস্ত বাড়ির আলো ফিউজ হয়ে গেল। না আছে একটা দেশলাই, না আছে একটা হ্যারিকেন। কোনও কিছুই হাতের কাছে নেই। তোমার বাবাও গেছেন, ঘরের লক্ষ্মীও চলে গেছেন। না আছে

হাতের কাছে একটা টর্চ। এদিকে যাই তো চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা, ওদিকে যাই তো টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা। উত্তরের বারান্দায় ধপাস করে কী একটা পড়ল। ভাগ্যিস ম্যাও করে ডাকল।

তুমি রান্নাঘরে গেলে না কেন? ছাতের সিঁড়িতেই তো হ্যারিকেন, তেলের বোতল সবই ছিল।

তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমাদের বাড়ির ওই দিকটায় যেতে আলো থাকলেও বুক কাঁপে তো অন্ধকারে! তাও আমি গেলুম। উঁচু উঁচু চৌকাঠ। এখানে বালতি, ওখানে মগ। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সিমসিম করছে গাছপালা। যাও বা একটা দেশলাই পেলুম, কাঠি নেই। তোলা উনুনের ঝিঁকে লেগে শাড়ির তলাটা ফেঁসে গেল। বেড়ালটা ওত পেতে বসে আছে। অন্ধকারে চোখদুটো ধকধক করছে। আবার হাতড়াতে হাতড়াতে ফিরে এলুম। একটা ছুঁচো উঠে এসেছিল নীচে থেকে। চিঁক চ্যাঁক করে পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে পালাল। আমার অবস্থাটা তুমি একবার ভাবো! ঠোক্কর খেতে খেতে নেমে এলুম নীচে। তালা লাগালুম। দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বেরোতে দেখে এক কলি গান বেরোল। আমি গ্রাহ্য করলুম না। সোজা বিষ্টুদার দোকানে। দোকান ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গে চলে এলেন। দেশলাই আর মোমবাতি নিয়ে। সেই অন্ধকারে তিনি ফিউজ পালটে দিলেন। আলো আবার জ্বলে উঠল। বিষ্টুদা বললেন, একা তুমি থাকবে কেন, চলো আমাদের বাড়িতে। আমি বললুম, দেখি, এইবার হয়তো ফিরবে। দশটা তো বাজল। বিষ্টুদা বললেন, তোমার ভয় করবে না? বললুম, করলেও উপায় নেই। বিষ্টুদা চলে গেলেন। ওই ফাঁকা বাড়িতে আমি একা বসে আছি। দশটা বাজল, এগারোটা বাজল। তোমার পাত্তা নেই। বিষ্টুদা আবার এলেন টিপকে নিয়ে। তোমার জন্যে আমাদের সে কী দুর্ভাবনা! কী হল, আসছে না কেন? কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হল! সারাটা রাত আমরা তিনজনে জেগে বসে রইলুম। তোমার একবারও মনে হল না, বাড়ি ফিরে দেখি সেখানে কী হচ্ছে! সারাটা রাত তুমি আঘাটায় ফুর্তি করলে। দশটা বাজল, সকাল দশটা। তখনও তোমার পাত্তা নেই। শেষে ধ্যাততেরিকা বলে বেরিয়ে পড়লুম। চাবিটা রেখে এলুম বিষ্টুদার কাছে। এইবার বলো, তোমাকে কী করা উচিত! ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো! সারারাত তুমি ছিলে কোথায়! ওই মেয়েটা কে, যাকে জাপটে ধরে বসে ছিলে?

তুমি এখানে কী করছিলে?

ইউনিভার্সিটির সামনে লোকে কী করে?

তুমি আমাকে ওইভাবে টেনে হিঁচড়ে নামালে কেন? এতে কার সম্মান বাড়ল? তোমার না আমার? মহারাজ কী ভাবলেন? আর আমি কোনওদিন ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব?

আমি তো সেইটাই চাই, যাতে তুমি দাঁড়াতে না পারো, যাতে তুমি ধর্মের ভণ্ডামি ছেড়ে কর্মে আসতে পারো।

তোমার ধর্মের ওপর এত রাগ কেন মুকু?

ধর্মের ওপর রাগ নয়, রাগ তোমার ধর্মের ওপর। তুমি হলে কলির কেষ্ট। যেখানে যাচ্ছ সেইখানেই নববৃন্দাবন লীলা। তোমার গুণের তো ঘাট নেই!

এইবার আমার কাহিনিটা একটু শুনবে?

কী হবে শুনে? নব্বই ভাগ মিথ্যে, দশ ভাগ হয়তো সত্য।

এরপর আর কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। যে যার নিজেরটাকেই বড় করে দেখে। এমন একটা মেয়ের সঙ্গে জীবন গাঁথার চেয়ে, কোনওক্রমে সরে পড়াই ভাল। মনে হচ্ছে, মাথার অসুখ আছে। সংসারে থাকলে, যেখানেই থাকি ক্যাঁক করে ধরবে। গোখরোর কামড়। সন্ন্যাসীই হতে হবে। তবে স্বামী নির্মলানন্দজির কাছে গেলে, তিনি আমাকে দূর করে দেবেন। তিনি মুকুকে চেনেন না। মুকুর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তাও জানেন না। বোঝাতে গেলেও শুনতে চাইবেন না।

মুকু আবার জিজ্ঞেস করলে, মেয়েটা কে?

আমি একটু রাগের গলাতেই বললুম, তোমার কী মনে হয়?

ওটি তোমার কত নম্বর?

তোমার এত সন্দেহ কেন মুকু?

মেয়েরা সহজে নিজের অধিকার ছাড়তে চায় না।

তুমি কিছুই না জেনে সন্দেহ করছ কেন? এটা খুবই খারাপ। নিজেকে ছোট করছ। মেয়েটির নাম সুরঞ্জনা। আজই পরিচয় মহারাজের আশ্রমে। সুরঞ্জনার বাবা পুলিশের বড়কর্তা। মহারাজকে নিয়ে আমরা সুরঞ্জনার বাড়িতেই যাচ্ছিলুম। ওঁদের খুব বিপদ। মাঝখান থেকে তুমি এই অসভ্যতা করলে।

আমি দেখিয়ে দিলুম, তুমি কার! আমার চোখের সামনে দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাবে! তাও ওইভাবে? একেবারে গদগদ যেন মোহনভোগ। কোলের ওপর হাত নিয়ে কী করছিলে? ইকির মিকির চাম চিকির খেলা করছিলে? তুমি নিমেষে অত দূর এগোও কী করে?

হেসে ফেললুম, আমার মনে কোনও পাপ নেই বলে। আমার ভেতরের শিশুটাকে আমি কখনও বড় হতে দিই না। সেই কারণেই সবাই আমার সঙ্গে সহজ হতে পারে। যেমন তুমি আমাকে সবসময় বকো। যেন, আমি তোমার ছেলে।

তুমি তো এক এক সময় আমার ছেলেই। কাল সারাটা রাত দু'চোখের পাতা এক করতে দাওনি।

কাল সারারাত আমিও জেগেছিলুম মুকু। খালধারের মশা আমার বোতল বোতল রক্ত শুষেছে।

আমাদের সামনে একটা ছায়া পড়ল। ছায়ার পেছন পেছন এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন। বুকের কাছে তোয়ালে জড়ানো কী একটা ধরে আছেন। মহিলার বয়স বেশি নয়। মুকুর বয়সিই হবেন। চেহারায় একটু অযত্নের ছাপ। চোখের কোণে কালি পড়েছে। পরপর অনেকদিন রাত জাগলে যেমন হয়। শাড়িটা কিন্তু যথেষ্ট দামি। মহিলা মুকুকে বললেন, ভাই, আমার এই বাচ্চাটাকে একটু ধরবেন? এই পাঁচ-দশ মিনিটের জন্যে। আমি একটা কাজ সেরে আসব এই কাছাকাছিই। আর চাপতে পারছি না।

মুকু স্পষ্ট জবাব দিল, সম্ভব নয়।

মহিলা একটু থতমত খেয়ে গেলেন। আমার কেমন মায়া হল। উদাসী চৈত্রের মতো চেহারা। আমি মুকুকে বললুম, ধরো না একটু। কী হয়েছে! বলো তো আমি ধরছি।

মুকু আমাকে এক ধমক লাগাল, চুপ করো। মহিলার দিকে মুখ তুলে বললে, আপনি অন্য কোথাও দেখুন, আমরা উঠে যাচ্ছি।

মুকু উঠে পড়ে বললে, চলো চলো। আমার ক্লাস আছে।

মহিলা অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুটা এসে মুকু আমাকে বললে, তুমি সত্যিই একটা ছাগল। জগতের কিছুই বোঝো না?

কেন, এইরকম কেন বলছ?

ওই বাচ্চাটাকে সারাজীবন তুমি ধরতে পারবে?

তার মানে? মহিলার বড় অথবা ছোট যে-কোনও একটা বাইরে পেয়েছে।

তোমার মাথা। ছাগল একটা। এই বুদ্ধি নিয়ে সংসারে চলা যায়! এমনও তো হতে পারে, ও ওই বাচ্চাটাকে কায়দা করে গছাতে চাইছে। অবৈধ সন্তান, অথবা মানুষ করার সংগতি নেই।

তোমার কল্পনার দৌড় আছে মুকু। ভদ্রমহিলাকে দেখে তোমার কি সেইরকম মনে হল?

সেইরকমই মনে হল। তোমার চোখ থাকলে তুমিও বুঝতে পারতে। চোখের কোলে এক পোঁছ কালি। অসংযমীর জীবন। আর জানবে, মেয়েরা যখন সাধারণ অবস্থায় সিল্কের শাড়ি পরে, তখন শেষ অবস্থা। সবই তার গেছে।

তাই হবে। মেয়েরাই মেয়েদের বেশি বুঝবে। মুকু, আমার এখনও কিছু খাওয়া হয়নি।

খাওয়া আমারও হয়নি। চলো, কোথাও খেয়ে নিই।

আমার পকেটে আছে একটি মাত্র টাকা।

একটা কেন? কাল তো অনেক টাকা ছিল। কোথায় ওড়ালে?

ওড়াইনি, পকেট মেরে দিয়েছে।

বাঃ, খুব ভাল। সংসারে শনি লেগেছে। আমার কাছে কিছু টাকা আছে। দু'জনের খাওয়া হয়ে যাবে, কিন্তু খাব না। বাইরে খাওয়া শরীরের পক্ষে ভাল হবে না, পয়সারও শ্রাদ্ধ। চলো বাড়ি যাই, গিয়ে রান্না করি। এখন থেকে আমাদের বুঝেসুঝে চলতে হবে। কত গেল?

তা শ'তিনেক হবে।

তুমি কোন ভাবে ছিলে? কার ধ্যান করছিলে?

মা কালীর। ঠনঠনের কালীমন্দিরে মায়ের আরতি হচ্ছিল। বিভোর হয়ে দেখছিলুম। আরতি শেষ হল। চোখ বুজিয়ে মাকে হৃদকমলে দেখার চেষ্টা করছিলুম। চোখ খুললুম, ট্রামে উঠলুম, ভাড়া দিতে গেলুম, পকেট ফাঁকা। ট্রামের কনডাক্টর একটা টাকা দিলেন।

যে-মা তোমার পকেট সামলাতে পারেন না, সেই মাকে ডেকে কী লাভ! বুঝতেই পারছ, একালে দেব-দেবীর কোনও ক্ষমতা নেই। অকারণ সময় নষ্ট।

মুকুর সঙ্গে আমার আর তর্কযুদ্ধে যাবার ইচ্ছা হল না। তা হলে আমি বলতে পারতুম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, কী জানো, যার যা কর্মের ভোগ আছে তা তার করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এসব মানতে হয়। বলতে ইচ্ছা করল না। এখনই হয়তো বলবে, রাখো তোমার শ্রীরামকৃষ্ণ। মগের দেশের মেয়ে। ঠাকুরের কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছিল, 'সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আছে যে কালুবীর জেলে গিছিল, তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে।

শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিছিল। একজন কাঠুরে পরমভক্ত, ভগবতীর দর্শন পেলে। তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।' এইসব আমি বলে একটা তর্ক জুড়ে দিতে পারতুম। মনে হল, কী হবে? যার যার বিশ্বাস, তার তার বিশ্বাস। এখন তোমার বয়স কম, তায় আবার সুন্দরী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে, এমন কেউ নেই যে না ফিরে তাকাবে। এইমাত্র একজন সাইকেল চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। নিজের দেমাকেই মটমট করছে। তোমার সমর্পণ আসে কী করে? তবে এ কথা ঠিক, সাংঘাতিক তেজি মেয়ে। অন্য অনেক গুণ আছে।

ভয়ে ভয়ে বললুম, মুকু, বাড়ি গিয়ে রাঁধতে রাঁধতে বিকেল হয়ে যাবে। পেট জ্বলছে। দশ পয়সা, কি দু'আনার ছোলাভাজা কিনব?

ছোলাভাজা ফুটো হয়, দাঁড়াও বাদামভাজা কিনি।

ফুটো হয় মানে?

মানে একশোটা ছোলার পঞ্চাশটাই পোকা ধরা। কোনওটাই নিরামিষ নয় আমিষ।

মুকুর বাদামভাজা কেনা শুরু হল। জীবনে এমন দেখিনি। প্রথমেই দর হল। তারপর দরাদরি। দরে যদিও বা পোষাল, মুকু বললে, বেছে নোব। বাদামঅলা বললে, বাদাম কি বাছা যায় দিদি?

খুব যায়। চালুনিতে ফেলে নাড়ো। বড়গুলো ওপরে চলে আসবে।

তাই হল। বাদামঅলা ওজন করতে যাচ্ছিল। মুকু বললে, দাঁড়াও, আগে খোসা ছাড়াই।

আগে ওজন করে খোসা ছাড়িয়ে দোব দিদি।

আজ্ঞে না। ওজন বেড়ে যাবে। আর তুমি ফুঁ দেবে কী! সে বাদাম আমি খাব কেন?

বাদামঅলা হাঁ হয়ে গেল। এমন খদ্দের সে জীবনে দেখেনি।

মা গো অত আদর, অত স্নেহ সব করিলি মাটি।
চোখ রাঙ্গিয়ে করলে শাসন, হতাম আমি খাঁটি॥

দূর থেকে দেখছি, বাড়ির সামনে রকের ওপর এক মহিলা বসে আছেন উদাস হয়ে। পাশে একটা ছোট টিনের সুটকেস। কোলে একটা পুঁটলি। কে? এ আবার কে? এইবার ঈশ্বর কোন খেলা খেলতে চাইছেন। একেবারে চিনতে পারছি না। জীবনে কখনও দেখেছি বলেও মনে হচ্ছে না। আমি আর মুকু একটু আগু-পিছু হনহন করে হাঁটছিলুম। মুকুর গতি শ্লথ হল। জিজ্ঞেস করলে, কে বলো তো?

ওই একই প্রশ্ন আমারও।

অন্য কোনও বাড়ির নয় তো! কিংবা বিশ্রাম নিচ্ছেন অনাথ কোনও মহিলা!

আমার তা মনে হয় না। আমাদের বাড়িতেই এসেছেন। মুকু, চলো পালিয়ে যাই। আমার লোকজন ভাল লাগছে না মনের এই অবস্থায়।

বাঃ! অসাধারণ! কোনও তুলনা হয় না তোমার! অসহায় এক মহিলাকে পথের ধারে বসিয়ে রেখে তুমি সরে পড়তে চাইছ? অনেক স্বার্থপর দেখেছি, তোমার মতো স্বার্থপর খুব কম দেখা যায়। আমি তোমার দলে নেই।

মুকু এইবার আমাকে পেরিয়ে চলে গেল। হাঁটার গতি হয়ে গেল দ্বিগুণ। বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মধ্যবয়সি সেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। কোথায় যেন এই পরিবারের মুখের সঙ্গে মিল আছে। পরে আছেন নরুন পাড় ধুতি। মুখটা কৃশ হলেও একটা আকর্ষণ আছে। চোখদুটো অসাধারণ জ্বলজ্বলে। মহিলা লম্বার দিকেই।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এইটাই কি হরিশঙ্করবাবুর বাড়ি?

হাতের মুঠোয় বহুকাল আগের একটা পোস্টকার্ড। দোক্তাপাতার মতো মুচমুচে হয়ে গেছে। অতি সাবধানে ধরে রেখেছিলেন সেটিকে।

বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমরা কি তাঁর ছেলেমেয়ে?

আমি ছেলে। এ আমার মাসির মেয়ে।

তোমার মায়ের তো কোনও বোন ছিল না!

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল বলি, অত কথার কী আছে? কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, আমার মেজো জ্যাঠাইমার বোন ছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তাঁরা তো রেঙ্গুনে ছিলেন। আমি ছবি দেখেছি। তা আমি কে, নিশ্চয় চিনতে পারোনি?

আজ্ঞে না।

আমি তোমার বড় জ্যাঠামশাইয়ের বড় মেয়ে। তোমার যখন বছর তিনেক বয়স, তখন তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

আত্মহত্যা করবেন কেন? তিনি দোতলার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমার কাছে সত্য ঘটনা শুনে রাখো, এক বদ মেয়েছেলে তাঁকে ওষুধ খাইয়ে পাগল করে দিয়েছিল। সেই অবস্থায় তিনি একদিন লাফ মেরেছিলেন।

মুকু বললে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইসব কথা না বলে ভেতরে চলুন না!

তালা খুলছি, মহিলা বললেন, ছোটকাকা কোথায়?

কিছুদিনের জন্যে বাইরে গেছেন।

আমরা একে একে ঢুকে পড়লুম। মহিলা ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছেন। বুকের কাছে দু'হাতে ধরে আছেন সেই পুঁটলি। মুকুর হাতে সুটকেস। মুকুর এই একটা গুণ, নিমেষে মানুষকে অধিকার করে ফেলতে পারে। সে এমন অধিকার যেন শিশুর আঁকড়ে-ধরা পুতুল। কিছুতেই আর ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে না নিজেকে।

মহিলা ওপরের বারান্দায় এসে বললেন, আমি তা হলে সম্পর্কে তোমাদের কে হলুম বলো তো? দিদি।

মুকু বললে, হ্যাঁ, তাই তো হলেন। দিদি।

তোমার নামটি কী ভাই! ভারী মিষ্টি মেয়ে।

মনে মনে হাসলুম, একটা ঘণ্টা যেতে দিন, তখন যেন আবার মন্তব্য বদল না হয়।

মুকু বললে, আমাকে আপনি মুকু বলেই ডাকবেন।

বাঃ, ছোট সুন্দর নাম। আমার ভায়ের নামটাও আমি ভুলে গেছি।

আমাকে বলতে হল না, মুকুই বললে, পিন্টু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পিন্টু।

মুকু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, দিদি, আপনার নাম?

আমার নাম পাঁচি।

মুকু থমকে গেল, এইরকম নাম হয় নাকি! আমাদের দিদিটি আবার মেঝেতে বসতে যাচ্ছিলেন, মুকু হাঁ হাঁ করে উঠল, মেঝেতে নয়, মেঝেতে নয়। চেয়ারে, চেয়ারে।

মাটির মানুষ মাটিতেই বসি বোন, আমাকে অত খাতির কোরো না। আমি অত খাতিরের নই। আমাকে একটা ঝিয়ের বেশি সম্মান দেবার প্রয়োজন নেই। যা প্রথম থেকে পেয়ে আসছি তাই যেন পাই শেষে।

পাকা পাকা কথা না বলে এই চেয়ারটায় বসুন।

মুকু এইবার বেরোচ্ছে। মুকু থেকে মুকু বেরোচ্ছে। খোল থেকে শামুক বেরোনোর মতো। হাত ধরে বসিয়ে দিল চেয়ারে। বসিয়ে দিয়ে বললে, ঠিক ঠিক নামটা বলুন তো!

দিদি একটু ঘাবড়েছেন। ইতস্তত করে বললেন, সে নাম শুনলে তোমরা অট্টহাসবে। তবু বলি, অপরাজিতা। সবেতেই যে পরাজিত, তার নাম অপরাজিতা!

আপনি সেই থেকে হাতে কী একটা পাঁপড়ভাজা ধরে আছেন?

ও হ্যাঁ। এটা একটা পোস্টকার্ড। সেই কোন কালে আমার কাকা লিখেছিলেন মাকে। বিজয়ার নমস্কার। আমার মাকে, মানে তোমাদের বড় জ্যাঠাইমাকে তো কেউ দেখতে পারতেন না। আর কেনই বা পারবে! অহংকারে দেমাকে মটমট করছেন। রূপের অহংকার, জমিদার বাপের টাকার অহংকার। আমার বাবাকে তো তোমরা দেখোনি। আমারও তেমন মনে নেই। মহাদেবের মতো দেখতে ছিলেন।

বললুম, শুনেছি। ব্যায়াম আর কুস্তির ভক্ত ছিলেন। বিশাল শরীর ছিল। বাদাম আর সিদ্ধির শরবত খেতেন কাশীর পালোয়ানদের মতো।

ওই সিদ্ধি আর পালোয়ানিই তো কাল হল। কাকার মুখে শোনোনি?

বাবা অতীতের কোনও কথাই বলতেন না।

এই কারণেই। তোমার বড় জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা এই পরিবারের অতীতের মুখে আলকাতরা মাখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। অতীত তো ওইটাই। ধ্বংসের অতীত।

মুকু বললে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কী দিদি! অতীত কবরে আছে কবরেই থাক। এখন কাজের কথায় আসুন। এতদিন পরে আপনি কেন এলেন? কী কারণে? ভুলে যখন ছিলেন, ভুলে থাকতেই তো পারতেন।

মুকুর সত্যি মুখের কোনও আঁট নেই। কতবার শুনেছে, অপ্রিয় সত্য বলতে নেই। মহিলাকে অপ্রস্তুত করা।

দিদি কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন। দৃষ্টি কোন উদাসে। শ্যামলা মেয়েটির শরীরে এখনও সৌন্দর্য ছড়িয়ে আছে। তপঃক্লিষ্ট এক সাধিকার মতো। চোখদুটো ভারী সুন্দর। তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ জল নামল। এক বিন্দু, দু'বিন্দু। নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে গালের ওপর দিয়ে। এত খারাপ লাগছে! মুকুর স্বভাবই হল খোঁচা মারা।

দিদি আঁচলে চোখ মুছে বললেন, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার। যে-মানুষটির কাছে আমি ছুটে এসেছি, তিনি হলেন গিরি গোবর্ধনধারী। বুঝতেই তো পারছ বোন, আমি নিরাশ্রয়। মনে করো, আমি তোমাদের একজন কাজের লোক। চব্বিশ ঘণ্টার ঝি। আমি খুব ভাল রাঁধতে পারি। বাসন মাজতে পারি ঝকঝকে করে। ঝাঁট দিতে পারি পরিষ্কার করে, কোনও কিছুর তলায় ধুলো না জমিয়ে। দাগ না ফেলে মেঝে মুছতে পারি। বড়ি দিতে পারি, গুল দিতে পারি। আচার তৈরি করতে পারি। সেলাই জানি, রিফু জানি। সামান্য ছাঁটকাট জানি। সবার ওপরে রোগীর সেবায় আমাকে কেউ হারাতে পারবে না। টানা তিন বছর আমার মা, টানা দু'বছর আমার স্বামী বিছানায় পড়ে ছিলেন। আমি ঘৃণাকে জয় করেছি, জয় করেছি নিদ্রা। আমার আহার হল পাখির আহার। আমি যে-কোনও জায়গায় ঘুমোতে পারি। যে-কোনও অপমান সহ্য করতে পারি। একটু হয়তো জল

বেরোবে চোখে। বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না। আমি বঙ্গ রমণী। ঝ্যাঁটা, জুতো আর লাথি জন্ম থেকেই খাচ্ছি। বেঁচে আছি শুধু মরতে পারিনি বলে। আমি বঙ্গ রমণী।

এইবার মুকুর পালা। হরিণের মতো চোখ। মা দুর্গার মতো মুখ। জল। পৃথিবীর যেমন তিন ভাগ জল, মেয়েদেরও সেইরকম তিন ভাগ জল, এক ভাগ খিলখিল হাসি। মুকুর জলের ফোঁটা অনেক বড়। দিদির হল মিহি দানা, মুকুর হল বড় দানা।

মুকু দিদির কাঁধদুটো ধরে বললে, আমি ক্ষমা চাইছি। আমার রাগ হয়েছিল, আপনি আমাদের চেনেন না বলে। কেন চেনেন না? নিকট আত্মীয়দের আপনারা কেন কোনও খবর রাখেন না? জানেন না এটা স্বার্থপরতা, এ ভাল নয়। আত্মীয়দের আজ প্রয়োজন না হলেও কাল প্রয়োজন হতে পারে। মানুষের এই ভুলে থাকায় আমার রাগ হয়েছিল, যদিও এই ভয়ংকর দোষ এই পরিবারেরও আছে। এরাও কারও খোঁজখবর রাখে না।

না বোন, এদের দোষ নেই। দোষ আমাদের। বাবা মারা যাবার পর, মা শ্রাদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। আমাদের দু'বোনকে নিয়ে অহংকারে মটমট করতে করতে বাপের বাড়ি চলে এল। মেজকাকা ছোটকাকা সম্পর্ক রাখার বহু চেষ্টা করেছিলেন। শেষে হাল ছেড়ে দিলেন। তার সাক্ষী এই চিঠি। এইটাই ছিল ছোটকাকার শেষ চিঠি। এ-যেন সম্পর্কের শেষ খেয়া। পড়ে দেখতে পারো। এখনও পড়া যায়।

চিঠিটা সাবধানে হাতে নিলুম। কালো কালির লেখা, বাদামি হয়ে গেছে। আমার বাবার কতকাল আগের হাতের লেখা। বাবা লিখছেন,

পূজনীয়া বড়বউদি,

এদিক থেকে এইটাই হবে শেষ চিঠি। তোমাকে বারবার অনুরোধ করা হল, নিজের সংসারে ফিরে এসো। তুমি এলে না। প্রতিটি চিঠির বিলম্বিত উত্তরে তুমি আমার বড়দা, আমাদের পরিবারকে অকথ্য গালাগালই দিয়ে গেলে। একবারও বোঝার চেষ্টা করলে না, তোমারই অহংকারে বড়দা ছিটকে গেলেন পরিবারের বাইরে। পড়তি জমিদারের অহংকারের চেহারাটা কেমন জানো, ভিজে কাঠের আগুনের মতো। আগুন নেই শুধু ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ায় তুমি আচ্ছন্ন। নিজেকেই নিজে দেখতে পাচ্ছ না। আমাদের পরিবার আপাতত রমণীশূন্য। তুমি যদি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে, সংসারজীবনের পুরো স্বাদটা পেতে। তুমি কি খুব সুখে আছ! সুখের সন্ধানে পালিয়ে গিয়ে তুমি মহা দুঃখেই আছ। নিজের অহংকারের জন্যে ভুল সংশোধন করতে পারছ না। আমার অবস্থা ঝড়ের সমুদ্রে ফুটো জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। কখনও পাম্প চালিয়ে জল ছেঁচছি, কখনও স্টিয়ারিং ধরে টালমাটাল সামলাচ্ছি। দু'-দুটো বউ পরপর চলে গেল। সবচেয়ে আদরের ছোটবোন কাপড় শুকোতে দিতে গিয়ে ছাতের আলসে ভেঙে পড়ে মারা গেল। আমরা দু' ভাই, একটা শিশু — এই তিনটি প্রদীপ টিং টিং করে জ্বলছে। এখনও সময় আছে। এসে তোমার কর্তৃত্বের আসনে বোসো। বড়দাকে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ো না। ভাইঝি দুটোকে লেখাপড়া শেখাই। ভালঘরে বিয়ে দিই। সংসারে একটা পূর্ণতা আসুক। বিষয়সম্পত্তিতেও তোমার একটা অংশ আছে। তারও একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আর অধিক কী? প্রণাম নিয়ো। ইতি,

চিঠি পড়া শেষ করে মুকুকে বললুম, একটা খাম দাও। চিঠিটা যত্ন করে রাখা উচিত।

দিদি বললে, নিজের মা যে ছেলেমেয়ের কত সর্বনাশ করতে পারে আমার মা-ই তার উদাহরণ। বুড়ো নায়েবের পরামর্শে দুম করে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে এক আধবুড়ো অকর্মণ্যের সঙ্গে। সে তো বিয়ে নয়, আমার কাশীবাস। সাতটা বছর বেঁচে ছিল শুধু কেশে কেশে। তখন আমার ভরা যৌবন। সেই জ্ঞানপাপী বুড়ো কেবল বলে, এ বউ তো আগুন, আমার তো তেমন ঘি নেই। শ্বাস নিত যখন, মনে হত বাঁখারির খাঁচা। সবক'টা পাঁজর ঠেলে ঠেলে উঠত। তার আবার একটা বখা ভাগনে ছিল। নাম তার পল্টন। মাঝে মাঝে অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরত। মুখে ধেনোর গন্ধ। কানের কাছে মুখ এনে বলত, মামা বিয়ে করেছিল আমার জন্যে। মামা তোমাকে ভাত-কাপড় দেবে, আমি তোমাকে আনন্দ দোব। তুমি আমার ঘরের মুরগি। একদিন বেশ করে ঝ্যাঁটাপেটা করলুম। কর্তা আমাকে চেলা কাঠ পেটা করলে। বললে, জানিস না, ভাগনে শব্দের অর্থ? ভাগ নে। পেটে যদি আসেই, তার জন্যে তো আমি আছি। আর যেন কোনও বেচাল না দেখি। বাংলার বধূ ত্যাগের জন্যে জন্মায়, ছাত পেটাই হবার জন্যে জন্মায়। সর্বংসহা শব্দটা কি অ্যায়সি এসেছে! সেই রাতেই ভাগনে বোতল বগলে মাইফেলে এল, গাইতে গাইতে, মামি নাচবে খেমটা নাচ। মামা ধরবে পোঁ। তার পরের লাইন আমি বলতে পারব না তোমাদের। আমি পেছনের দরজা দিয়ে মাঠময়দান ভেঙে চম্পট। প্রথমে এক গির্জায় গিয়ে ফাদারের কাছে আশ্রয় নিলুম। তিনি আমার খুব করেছিলেন। পড়িয়েছিলেন, নার্সিং শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হিন্দুদের হাত থেকে যদি বাঁচতে চাও খ্রিশ্চান হও। গ্রামে রটে গেল, অপরাজিতা কুলত্যাগ করেছে। কুলটা। বুড়ো বরে শানাল না, তাই বেশ্যা হয়ে ঘর ছেড়েছে। তাকে যে বোতল বাবাজি খাবলাতে এসেছিল, সেই কথাটা কেউ একবারও মুখে আনলে না। শয়তান পুরুষমানুষগুলো আর কত হাজার বছর ধরে যে আমাদের ছিঁড়ে খাবে! এই শয়তানদের ছেলেমেয়েকে আমাদের গর্ভে ধারণ করতে হয়। পৃথিবীতে ভগবান আসবেন কী করে? শয়তানদের ছেলেরা তো শয়তানই হবে।

লক্ষ করছি, মুকুর ফরসা মুখ ক্রমশই লাল হয়ে উঠছে। গোলাপের মতো।

মুকু বললে, আপনি এই সংসারে আপনার মর্যাদায় থাকবেন। এত সব কাণ্ড যখন হচ্ছে, তখন আপনার ছোটকাকাকে কেন জানালেন না? তাঁর মতো মানুষ এককথায় সব টিট করে দিতেন।

আমি তো তখন কিছুই জানতাম না বোন। আমার তখন উথালপাথাল অবস্থা। লম্পটের শিকার ফসকেছে। হায়নার মতো আমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।

কেন, এইসব লোকের জন্যে তো সব জায়গাতেই ঘর আছে!

ও, সে বুঝি জানো না, ব্যাটাছেলেদের অদ্ভুত একটা মজা আছে, ঘরের বউকে খারাপ করে পথে বের করার আলাদা একটা আনন্দ আছে। আমি ওদের হাড়ে হাড়ে চিনে গেছি বোন। সেই ফাদার আমাকে রাতের অন্ধকারে হুগলির গির্জায় পাঠিয়ে দিলেন। আর সেই ভাগনেচন্দ্র চার বছরে মামার যা কিছু ছিল সব ফুঁকে দিয়ে সরে পড়ল। তারপর হল ধর্মের কল বাতাসে নড়ল। একদিন দেখি অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে সাদা একটা পুঁটলি গড়াতে গড়াতে আসছে। প্রথমে ভেবেছিলুম ভূত। তারপর দেখি আমার সোয়ামি। ওগো! আমি এলুম। আমার যে কেউ নেই। তুমিই যে আমার সব। সেকী? আমি তোমার সব কী গো! আমি যে কুলত্যাগী, বেশ্যা গো! ধুঁকতে ধুঁকতে বললে, তুমি দেবী, তুমি অন্নপূর্ণা। সে একেবারে পায়ে পড়ে আর কী! বলে কিনা, আমি তোমার সন্তানের মতো। আর মেয়েদের মন! জানোই তো! মেয়েদের মনে মায়ের বাসা। একবার মা বললে

আর রক্ষে নেই। মানুষটাকে দেখে চোখ ফেটে জল এল। একেবারে জরাজীর্ণ। একটুখানি বাতাসের জন্যে শ্বাস টানছে, মনে হচ্ছে হাপর চলছে। নিজের শরীরস্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে লজ্জা হচ্ছিল; আমি এত সুস্থ, লোকটা এত অসুস্থ! যতই হোক আমার স্বামী। সংস্কার যাবে কোথায়! জীবন আবার ঘুরে গেল পুরনো খাতে। নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েও হারাতে হল একটা কারণে। জানো তো ভাই, বরাত জিনিসটা আগেই তৈরি হয়ে থাকে, পথের মতো। অদৃশ্য ভগবান ঠিক করে রাখেন কে কোন পথে হাঁটবে।

মুকু বললে, ভগবান-টগবান সব বাজে। আসলে যা হয়, তাই হয়। মানুষ ভগবান ভগবান বলে চেঁচায়। মানুষের যতরকমের দুর্বলতা, তারই নাম ভগবান! এ তো সবাই জানে, পৃথিবীটা লড়াই করার জায়গা। লড়তে গেলে অস্ত্র চাই। প্রথম হল শরীর, দ্বিতীয় হল শিক্ষা, তৃতীয় হল মনের জোর, চতুর্থ হল বিচার, পঞ্চম হল নীতি, ষষ্ঠ হল বুদ্ধি, সপ্তম হল মাত্রাজ্ঞান, অষ্টম হল সম্পর্ক তৈরি, নবম হল চেতনা, দশম হল সাহস। মা দুর্গা দশভুজা; কারণ এই দশ অস্ত্র ছাড়া লড়াই জেতা অসম্ভব। পৃথিবীতে সবাই অসুর। সবাই ভগবান ভাবলে মরতে হবে।

দিদি বললেন, জীবনে ভিক্ষে ছাড়া সবই করেছি। হয়তো বরাতে সেটাও লেখা আছে।

আবার বরাত!

তা কী হবে! আমার তো বিদ্যাবুদ্ধি নেই। মাঝবয়সি এক মেয়েছেলে। কিছুকাল খ্রিস্টানদের মধ্যে ছিলুম বলে, জড়ভরত ভাবটা তেমন নেই। আর বলতে পারি কইতে পারি, সে আমার বংশাবলির ধারা। আমার মায়ের বাক্যির শেষ ছিল না।

তা হলে দিদি শুনুন, মনু কী বলে গেছেন। পৃথিবীতে যে নাচতে পারে সে নাচবে, যে গাইতে পারে সে গাইবে, যে পড়তে পারে সে পড়বে, যে যুদ্ধ করতে পারে সে যুদ্ধ করবে, যে কাপড় কাচতে পারে সে কাপড় কাচবে, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুচি, মেথর বলে কিছু দেগে দেওয়া নেই। নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তি বেছে নিয়ে মানুষেরই সেবা করে মানুষকে বাঁচতে হবে। পৃথিবীতে কোনও তোলা-সিস্টেম নেই যে আরামে গড়াব, সকালে রাজবাড়ি থেকে ভারে ভারে তত্ত্ব আসবে। যে ডাকাত সে ডাকাতি করবে, যার অনেক রূপ যৌবন, সে মনোরঞ্জন করবে। যে ব্যাবসা বোঝে সে ব্যাবসা করবে। তা হলে শুনুন দিদি বাইবেল কী বলছেন:

He shall be like a tree
Planted by the rivers of water,
That brings forth its fruit in its season,
Whose leaf also shall not wither
And Whatever he does shall prosper.

ফাদারদের কাছে বাইবেল তো অনেক শুনেছেন দিদি, নিতে কি কিছু পেরেছেন?

তুমি এত জানলে কী করে?

খুব সোজা। বইয়ের শেষ নেই। পড়ো আর কপচাও। আমি তো দর্শনের ছাত্রী। তবে কথাটা খুব সুন্দর।

বলো শুনি। শুনে আর কী হবে! মরণকালে হরিনাম।

সে হবে গাছের মতো। কে? মানুষ। বীজ পুঁতেছে নদীর জল। নদীর জলে বীজ ভেসে এসেছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেই বীজ ডাঙায় উঠেছে। অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমশ একটি বড় গাছ। ঠিক সময়ে বছর বছর তাতে ফল ধরবে। আর গাছটা কেমন? না, তার পাতা কখনও শুকোবে না। পাতা হল মানুষের সৎকর্ম। আর তার কর্তব্য কী? না, সে যা-ই করুক তাতে যেন মঙ্গল হয়। উন্নতি হয়। মানুষকে হতে হবে গাছ। গাছের মতো সহিষ্ণু, ফলপ্রদ। কত সুন্দর সুন্দর কথা মানুষ বলে গেছে, লিখে গেছে।

ও কিছু না। শয়তানে মাঝে মাঝে ভগবান ভর করে। পৃথিবীটা কিন্তু শয়তানেরই।

বিরক্ত হয়ে বললুম, মুকু, আমরা কিন্তু এখনও উপোস করে আছি।

একা তুমি নেই, আমরাও সবাই আছি। দিদি, আপনি ক'দিন উপোসে আছেন? সত্য বলবেন।

একেবারে নির্জলা দেড়দিন। আর আধপেটা ক'দিন আমার মনে নেই।

শুনলে তো! আর খাইখাই কোরো না। বেলা চারটের সময় কেউ ভাত খায় না।

তা, যা হয় টুকটাক তো একটু কিছু হবে। পিত্তি পড়ে গেল। আমার আবার পিত্তর ধাত। সত্যিই আমি আর থাকতে পারছি না। পেটে চোঁ চোঁ শব্দ হচ্ছে।

মুকু বললে, তোমার তো ধাতের শেষ নেই। পিত্তির ধাত, সর্দির ধাত, বাতের ধাত, অম্বলের ধাত। এখনও সময় আছে, রোজ সকালে উঠে মেসোমশাইয়ের মুগুর আর ডাম্বেল নিয়ে ভাঁজো, তা না হলে অকালে বুড়ো হয়ে যাবে।

দিদি বললেন, আমাকে সব দেখিয়ে দাও, ছোটখাটো জলখাবার একটা করে ফেলি।

মুকু বললে, এই অবস্থায় তো আপনাকে আমি খাওয়ার জিনিস ছুঁতে দেব না।

কেন? আমি কিন্তু খ্রিশ্চান হইনি।

আমাদের জাতিভেদ নেই দিদি। আপনার রাস্তার কাপড়। আগে ভাল করে চান করুন। দেখি পুঁটলিতে কী আছে!

মুকু পুঁটলিটা টেনে নিয়ে খুলতে শুরু করল। দু'খানা নরুন পাড় ধুতি, দুটো ব্লাউজ, একটা চাদর, গামছা আর একটা ঝকঝকে পেতলের ঘটি বেরোল। মুকু সব পরীক্ষা করে বললে, নাঃ, আপনার পরিষ্কার স্বভাব। গামছাটা তেলচিটে নয়, ধুতি চাদর বেশ পরিষ্কার, আর ঘটিটা ঝকঝকে। ঘটির মায়া ছাড়তে পারেননি!

না বোন, ওটা মায়া নয়। বড় কাজের। জায়গায় অজায়গায় জল খাওয়া যায়। ধরতে পারলে জলটাই তো বিনাপয়সায় পাওয়া যায়। প্রয়োজনে বাঁধাও দেওয়া যায়। সোনার পরেই কাঁসা। এই ঘটিটা সাতবার বাঁধা পড়েছে। এক রেট, আড়াই টাকা। ভরনের কাঁসা। ফেলনা নয়। ঘটিটা সঙ্গে থাকলে মনে বেশ একটা বল পাওয়া যায়। ধার আর বাঁধা, এ ছাড়া বাঙালি বাঁচবে কী করে? বাপের সম্পত্তি বেচবে আর ফুর্তি করবে। চলো বোন, তোমাদের চানের জায়গাটা দেখিয়ে দাও আর এক টুকরো কাপড়কাচা সাবান দাও।

এখন আর কাপড়জামায় সাবান দিতে হবে না। জলকাচা করে দিন।

সাবান আমি গায়ে মাখব।

গায়ে মাখা সাবান বাথরুমেই আছে।

গন্ধ সাবান মাখব বোন!

বেশি আদিখ্যেতা করবেন না, বিচ্ছিরি লাগছে। যা স্বাভাবিক তাই করুন। দুঃখ নিয়ে দারিদ্র্য নিয়ে নাকে কাঁদবেন না। পৃথিবীতে কেউ দরিদ্র হবে, কেউ হবে ধনী। কেউ খেয়ে মরবে, কেউ না খেয়ে। এতে অবাক হবার কী আছে! কেউ চরিত্রবান হবে, কেউ দুশ্চরিত্র। যান, চান করে আসুন। মাথা ভেজাবেন না। নতুন জল সহ্য হবে না।

দু'জনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমার আর একবার হা হা করে হাসতে ইচ্ছে করল। হায় ভগবান, ম্যান প্রোপোজেস গড ডিসপোজেস। হয়ে গেল। কোষ্ঠীতে একেই বলে, বন্ধনযোগ। দুই রমণীকে এখন বহে বেড়াও। ঈশ্বর এক হাতে নেন, আর এক হাতে দেন। 'কল্য, অহো, গতকল্য করেছে প্রস্থান/লইয়া বঙ্কিম মধু বিহারী ঈশান! আজ আমি আছি যবে, জগৎ-চষকে। প্রাণপণে প্রাণ ভরি করি সুধাপান।'

দিদির পুঁটলিটা খোলা পড়ে আছে মেঝেতে। একটি ধুতি, একটি ব্লাউজ, চাদর, ঘটি। ছোট টিনের সুটকেসে কী আছে জানি না। এত বছর সংসার করে এই মাত্র সম্বল! কী করতে মানুষ আসে এখানে! মাঝে মাঝেই আমার মাথায় একটা গানের লাইন খেলে যায়—'ট্যাঁ করে জন্মে আমি কী পেলাম।' একটু কৃশ হয়েছেন ঠিকই, তবু চেহারায় অভিজাত শ্রেণির ধার। পরিচ্ছন্ন। যে-জীবনই কাটিয়ে আসুন, নিজেকে ধরে রেখেছেন, ভেসে যেতে দেননি। দরিদ্র, কিন্তু দারিদ্র্য দাঁত ফোটাতে পারেনি। একেই বলে, গ্রেট ফাইটার। ঈশ্বর যেন উদাহরণ ভেট পাঠালেন, দেখো পিন্টু! সামান্য এক মহিলা! কোন শক্তিতে আজও যোদ্ধা। তুমি হলে কী করতে? অবশ্যই আত্মহত্যা। দেখে শেখো। দুটো দিক, শ্রুতি আর দর্শন। শুনে শেখা আর দেখে শেখা।

ট্যাঁ করে জন্মে আমি কী পেলাম
প্রথমে মাসি-পিসি তারপরে ঘুংরি কাশি
উঠতে বসতে পড়ছে ড্যাঙ্গোস
কাছা ধরে টানাটানি॥

বেশ রাত। দেয়াল ঘড়ি সময়ের পায়ে টকাস টকাস হাঁটছে। মহাকাল যেন হাইহিল জুতো পরে সান-বাঁধানো পৃথিবীতে বেড়াতে বেরিয়েছেন, কিংবা প্রজাদের কাছে খাজনা আদায়ে। খাজনা হল দিন। একটা করে দিন তুলে দিতে হবে তাঁর হাতে। ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ হয়, আমি একটা গাছ। অনেক পাতা। রোজ একটা করে পাতা খসে পড়ে যাচ্ছে। একদিন শেষ পাতাটি পড়ে যাবে; তখন আমি বলতে পারব, আমার কথাটি ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল।

পাশের ঘরে মুকু আর দিদি একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছে। দু'জনে খুব গজর গজর করছে এখনও। মেয়েদের কথা সহজে শেষ হয় না। রাতের রান্না দিদিই করলেন। কথাটা ঠিকই, অসম্ভব ভাল রাঁধেন। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, ডিমের কারি আর রুটি হবে। মুকু হঠাৎ বললে, আজ থেকে এ বাড়িতে নিরামিষ হবে। দিদি খাবে না, আমরা মাছমাংস খাব, তা হতে পারে না। অসম্ভব।

দিদি বলেছিলেন, তা কেন? তোমরা মাছমাংস খাও না! আমি আমিষ রান্নাও খুব ভাল পারি। আমার জন্যে তোমরা কেন সব ত্যাগ করবে?

মুকু বলেছিল, তাতে আমাদের খাওয়া হবে, কিন্তু আনন্দটা কমে যাবে। একসঙ্গে বসে খেতে পারব না। পাশাপাশি দুটো আলাদা ব্যবস্থা। হৃদয়হীনতার চূড়ান্ত। একধরনের অসভ্যতাও। ওরকম দুই দুই এ বাড়িতে আমি অ্যালাউ করব না। আমি যা বলব তাই হবে। কোনওরকম তর্ক চলবে না।

দিদি হাঁ হয়ে বসে রইলেন। নীল চৌখুপ্পি শাড়ি পরে মুকু হনহন করে চলে গেল। দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এমন মেয়ে তো দেখিনি। যেমন রূপ, তেমন তেজ। তেমন মন তেমন হৃদয়! এ কে! তামারও তো সেই একই প্রশ্ন, এ কে? এ যে দেখি হরিশঙ্করের নারী সংস্করণ। হরিশঙ্করের গুণাবলির মধ্যে কয়েক পোয়া মমতা মিশিয়ে দিলেই মুকুর অন্তঃকরণ। নিখাদ এমন আবেগ, আবার এমন বিচার ও পরিচ্ছন্নতা সহসা দেখা যায় না। আবার এমন স্বার্থশূন্যতা!

বড় নেশাতে পড়েছি শ্যামের বাঁশিতে। জামা ধরে যখন গাড়ি থেকে টেনে নামিয়েছিল, ভেবেছিলুম মুখদর্শন করব না। নিদারুণ অসভ্যতা। পরে চিন্তা করে দেখলুম, যাকে আমি অসভ্যতা ভাবছি, সেটা আসলে আবেগ। মুকু যা কিছু করে তার মধ্যেই জীবন-মরণ একটা নিষ্ঠা কাজ করে। অদ্ভুত এক আন্তরিকতা। কোনও ফাঁকি নেই। সেইটা ধরতে না পারলেই মনে হবে মেয়েটা বুঝি পাগলি।

সে যাই হোক। ভাবনা তো অনেক হল, আমার কী হবে? ব্রেকডাউন গাড়ির মতো জীবনের একপাশে পড়ে থাকব! ফ্যালফ্যাল করে দেখব, হাই স্পিডে সব বেরিয়ে যাচ্ছে জীবনের রাজপথ ধরে! ট্যাঁ করে জন্মে আমি কী পেলাম? সবাই ভাবলে আমি এক রেসের ঘোড়া। শিক্ষার রেসকোর্সে ছেলে আমার ডার্বি নেবে। সেই জোরে জীবিকার বিশাল মাঠে সবাইকে মেরে বেরিয়ে যাবে। সদরে মোটরগাড়ি, লোকজন, দাসদাসী। আজ ভারতে তো কাল বিলেতে! বউটি হবে ডানাকাটা পরি, ইউনিভার্সিটি ব্লু, আধুনিকা, কিন্তু চালচলনে সাবেকি। খোঁপায় তোলা ঘোমটা, বাতাসের স্বরে কথা, তুলোর পায়ে হাঁটা। পাশ ফিরতেও পারমিশন নেবে, হাসবে কিন্তু শব্দ হবে না, সাইলেন্সার লাগিয়ে হাঁচবে। রাগবে না, আবহাওয়া যেমনই হোক, বসন্তের বাতাসের মতো বইবে। এমন ছেলে কই হলাম! ট্যাঁ করে জন্মে আমি কী পেলাম! প্রথমে মাসি-পিসি, এ মাসি-পিসি সেই মায়ের বোন মাসি বাপের বোন পিসি নয়, এক ধরনের ফুসকুড়ি। তারপরে ঘুংরি কাশি। স্মৃতি এখনও অমলিন। যে পারে সে পিটিয়ে যায়। সকালে কানটানা। মাস্টারমশাই ভীষণ রাগী। পড়াবেন কী? ধৈর্য নেই। কান টানাই তাঁর মেডইজি। কান ধরে টানলে অঙ্ক বেরোবে। কান ধরে টানলে ইংরিজি ঝরবে। তিনি ছাড়লে কী হবে! স্কুলে ডাস্টার পেটা। সহপাঠীর ল্যাং। আমি যেন এক বেওয়ারিশ মাল।

পাশের ঘরে মহিলা দু'জন ঘুমিয়ে পড়েছে। দু'জনেরই মন পরিষ্কার। কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। বিছানায় পড়তে না-পড়তেই ঘুমে কাদা হবে না কেন? বাইরের বারান্দায় আজ সেই শব্দ। বহুদিন পরে ফিরে এল। ভয় করে, তবু উন্মুখ হয়ে থাকি। বুঝতে পারি না। সামনাসামনি যাওয়ার সাহসও নেই। শব্দের সঙ্গে শব্দকারীকে যদি দেখে ফেলি! আমার ঘর অন্ধকার। বিছানায় পড়ে আছি মড়ার মতো। ঘুমের পাত্তা নেই। মাথার ভেতর দিয়ে সারা কলকাতা শহর সশব্দে নেচে নেচে চলেছে। বারান্দায় সেই সাবধানী পায়ের শব্দ এ পাশ থেকে ও পাশ, ও পাশ থেকে এ পাশ করছে। বহুকাল কোথাও আবদ্ধ থাকলে, সেই বন্দি মানুষ যেমন নিরুপায় হয়ে এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পায়চারি করে, এ যেন ঠিক সেইরকম। মনে হয় কোনও রমণী। অকালে চলে যাওয়া এ বাড়ির কোনও বধূই হয়তো! দেহ গেছে, আত্মা এখনও যেতে পারেনি মায়ার বাঁধন খুলে। আগেও দেখেছি আজ দেখছি, পদশব্দ যেন এই ঘরেই আসতে চায়। বারেবারে ফিরে এসে এই ঘরের সামনেই থামছে। থেমে থাকছে বেশ কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে যাচ্ছে আবার। আমার শরীরের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠছে। বন্ধ দরজার বাইরে তীব্র একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোর রেখায় হিলহিল করে উঠল দরজার সমস্ত ফাঁকফোকর। আলোটা জ্বলেই মুহূর্তে নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারাঘর ভরে গেল অপূর্ব সুবাসে। এর একটাই ব্যাখ্যা, শব্দকারী জাগতিক দরজার বাধা পেরিয়ে চলে এসেছে ঘরে। এই সুগন্ধই তার প্রমাণ। ভয়ে আমার কণ্ঠ, তালু শুকিয়ে গেল। ধূপ তো কেউ জ্বালেনি! আলোর উৎসই বা কী? বারান্দার পেছনে শুধুই ঝোপঝাড়, বাগান। সব কিছুরই তো একটা কারণ থাকবে। পাশের ঘরের দু'জন অঘোর ঘুমে অচৈতন্য।

হঠাৎ মনে হল, আমার এত ভয় কেন! কীসের ভয়! কাকে ভয়! ভয় পেয়েছি ঠিকই। দেহ অসাড় কিন্তু যুক্তি কাজ করছে। ভয় মৃত্যুকে। মরে যাওয়ার ভয়। এতদিন তা হলে বৃথাই গুনগুন করেছি, 'আমি ভয় করব না ভয় করব না। দু'বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।।' এই তো সেই পরীক্ষার সময়। আমি তো মরতেই চাই। আর একবার ভাল করে জন্মাতে চাই। এবারের সব ভুল-ত্রুটি শুধরে নিয়ে উজ্জ্বল, প্রোজ্জ্বল এক জীবনের প্রত্যাশী। যে-জীবনে কাম বলে কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। রমণীর জন্যে থাকবে না কোনও ব্যাকুলতা। ওইটাই তো এইবারের জীবনে কাল হয়ে উঠেছে।

ঝেড়েঝুড়ে উঠে বসলাম বিছানায়। দেখি ধ্যান লাগাই। চেষ্টা করি আলো আর সুগন্ধের উৎসটাকে ধরার। মনে হয় আমার মা এসেছেন। এসেছেন আমার পিতার খবর নিতে। শুনেছি, তিনি অতিশয় প্রেমিকা ছিলেন। জীবনকে ভয়ংকর ভালবাসতেন বলেই পঁচিশের আগে মৃত্যু নিয়ে গেল হাত ধরে। তিনি এসেছেন ফেলে যাওয়া লন্ডভন্ড এই সংসার দেখতে নিতান্তই এক পর্যবেক্ষকের মতো। ছেলেটা কত বড় হল! পিতা হরিশঙ্কর উপস্থিত থাকলে জিজ্ঞেস করতেন মন দিয়ে মনে, এখনও তোমার শেষ হল না কর্তব্য! জীবননদীর ওপারে আর কতকাল আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে একা? চলে এসো। চলে এসো। তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, 'নিঃসঙ্গ সংগ্রামী। রাখো তোমার ধনুর্বাণ। জীবনেরে কে রাখিতে পারে?/আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে। চলে এসো মহাসিন্ধুর এপারে। সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে। নাহি পারে□—। তাই এ ধরারে। জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে। মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।৷'

মনে মনে বিছানাটাকে মন্ত্র দিয়ে ঘিরলুম। এখন আমি গণ্ডির ভেতরে। এইবার মন স্থির করে দেখি কী হয়! কী পাই! কে আসেন! আজ এসপার ওসপার। স্থির হয়ে বসলুম। ছেলেবেলার সেই মন্ত্রটাও আওড়ে নিলাম, অধিকন্তু ন দোষায়, বুকে আছে রামলক্ষ্মণ ভয়টা আমার কী! এই হল মানুষ। আমার মা যদি এসেই থাকেন আমি তাঁর ছেলে, ভূত ভেবে ভয় পাচ্ছি কেন? মানুষ মারা গেলে জীবিতের পৃথিবীতে তাঁর ফিরে আসার অধিকার নেই! ধীরে ধীরে আমার চোখ বুজে এল। তীব্র হল ঘুরে ঘুরে বেড়ানো সুগন্ধ। বুদ্ধি স্তব্ধ। ব্যাখ্যা অপহৃত। There are more things in heaven and earth Haratio/ Than are dreamt of in your philosophy.

ভয়ের ভাবটা ধীরে কেটে আসছে। শরীর শিথিল হচ্ছে। ভারী হচ্ছে ক্রমশ। যেন দেবে বসে যাচ্ছে বিছানার গদিতে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছে। শরীরের উত্তাপ কমছে। হৃদ্‌স্পন্দন মৃদু থেকে মৃদুতর। ধ্যান জমছে। সমস্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট। বেশ ভাল লাগছে। কিছুই যে পারে না, সে একটা অতিশয় কঠিন জিনিস পারছে। যে পারায় ধন-জন-বিত্ত-অর্থ কোনও কিছুই লাভ হবে না। শুধু একটা আত্মতৃপ্তি, ভিন্নতর একটা জগতের উপলব্ধি হবে। মনটাকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দিয়েছি। তুলোর মতো ভেসে যাক। যেখানে যেতে চায়, যাক চলে। দেহ কোনও বাধা হবে না। দৃষ্টিকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছি ভ্রূমধ্যে। সেইখানেই আছে আমার তৃতীয় নয়ন। তৃতীয় নয়নেই দেখা যায় হৃদয়-আকাশ। সেই আকাশের বর্ণ আর আলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

আমার দেহের নিম্নভাগ থেকে একে একে সব অদৃশ্য হতে লাগল। পা গেল, উদর গেল, বুক গেল, হাতদুটো গেল। নেই। কোনও অনুভূতিই আর রইল না। শুধু আমার মুণ্ডটা ভাসতে লাগল। অন্য ধরনের একটা ভয় এল। মরে যাব না তো! একটা মাথার অনুভূতি ছাড়া আর কিছু রইল না। ভীষণ একটা শৈত্যের বোধ। কপালের সামনে শিশিরে বোনা একটা পরদা দুলছে। মা বলে চিৎকার করতে ইচ্ছে করল। নড়ে বসতে চাইছি। ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছি। পারছি না। আমি আর আমার হাতে নেই। মুণ্ডটা বেলুনের মতো দুলছে। হঠাৎ দৃষ্টি-পরদায় একটা চিড় ধরল। শিশিরের দানা ঝরে পড়ল ঝরঝর করে। জ্বলজ্বল করে উঠল একটা দৃশ্য:

একটা শুকনো নদী। জল নেই। শুধু নুড়ি-পাথর। কিছু দুধের মতো সাদা, কিছু শ্যাওলা সবুজ, কিছু নীল। অজস্র উপলখণ্ড, এ পাশ থেকে ও পাশে চলে গেছে। পরপারে পাহাড়। পাহাড় শুধু পাহাড়। স্পষ্ট দেখছি,

একটি শিলাখণ্ডে নিবিষ্ট মনে উপবিষ্ট হরিশঙ্কর। আমি তাঁর মুখের একটা পাশ দেখতে পাচ্ছি। চোখে সেই সোনালি চশমা। শুভ্র বাস। দু'হাতে হাঁটুদুটি ধরে বসে আছেন। আমি তার পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলুম, সঙ্গে সঙ্গে তিনি সরে গেলেন অসীম দূরত্বে। আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমি টাল খেয়ে বিছানার ওপর পড়ে গেলুম। সংবিৎ ফিরে এল। ভোর হচ্ছে। একটা পাখিই কোনওক্রমে বাসা ছেড়েছে। মৃদু মৃদু ডাকছে। পাশের ঘরে মৃদু স্বরে গান ধরেছেন দিদি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। একেবারে বাঁশির মতো গলা।

কোনওক্রমে উঠে বসলুম। আর একটু হলেই খাট থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতুম। সামনের দাঁতদুটো অবশ্যই ভাঙত। হাঁ হয়ে গেলুম, একী! ঘরের দরজাটা হাট খোলা। আমার বেশ মনে আছে, দরজা আমি ভেতর থেকে বন্ধ করে শুতে গিয়েছিলুম। কোনও কারণই খুঁজে পেলুম না। হয়তো ভুল হয়েছিল। বাতাসে খুলে গেছে। ছিটকিনি হয়তো সত্যই দিইনি। খাট থেকে মেঝেতে নেমে এলুম। ছোট্ট পাখির ডিমের মতো জিনিস ভেঙে কুচোকুচো হয়ে পড়ে আছে। ভোরের আলোয় তার অপ্রাকৃত চেকনাই। সবকিছুই আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হচ্ছে আজ। এই লৌকিক জগৎ আর পারলৌকিক জগতের মধ্যে মাকড়সার জালের মতো যে সূক্ষ্ম ব্যবধান, সেই ব্যবধানে আমি একটু ছুঁচ ফোটাতে পেরেছি অন্তত। সামান্য এক ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে আমি দেখেছি, আলোর কী নীলিম ঔজ্জ্বল্য, বাতাসের কী সূক্ষ্মতা, বস্তুর কী ভারহীনতা!

এটা টিকটিকির ডিমের চূর্ণ আবরণ না অন্য কিছু, মুক্তোও তো হতে পারে! অ্যানালিসিস হবে পরে, আপাতত তুলে রাখি সাবধানে। পাশের ঘরে দুই মহিলাই কীর্তন শুরু করেছে। ওদের মধ্যে কে একজন টিংটিং করে কী একটা বাজাচ্ছে। সম্ভবত কাঁসার গেলাসের গায়ে হাতের বালা ঠুকে শব্দটা তুলছে। বেশ ভালই লাগছে। মনে হচ্ছে কোনও এক আশ্রমে ঘুম ভাঙল।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে চক্ষু স্থির। খুব মিহি, ধূসর কিছু ছাই পড়ে আছে। বাতাসে ঘুরপাক খেয়ে তালগোল পাকিয়ে লম্বা লম্বা সাপের মতো, কিছু এখানে কিছু ওখানে, কিছু যেন ছাড়া ছাড়া শুঁয়ো পোকা। ঠিক আমার ঘরের দরজার বাইরে। বুকটা ছাঁত করে উঠল। ব্যাপারটা কী!

যার সাহায্যের কথা প্রথমেই মনে এল, সে মুকু। বেশ জোর গলায় ডাকতে হল। ওরা গান গাইছে গেলাস বাজিয়ে। মুকু আর দিদি দু'জনেই বেরিয়ে এল। মুকুর পোশাক দেখে অবাক। একটা সাদা চাদর দু'বগলের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে সামনে এনে আড়াআড়ি বুকের ওপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে ঘাড়ের পেছনে একটা গাঁট বাঁধা। বাউলের মতো দেখাচ্ছে মুকুকে। অদ্ভুত এক মজার মেয়ে। একদিনেই দিদিকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। অনিশ্চয়তা কেটেছে আপাতত। একটা নির্ভরতার ভাব এসেছে।

মুকু মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, এসব কী?

সেইজন্যেই তো তোমাদের ডেকেছি। মনে হচ্ছে কোনও কিছুর পোড়া ছাই। বললুম না কাল রাতের দেখা তীব্র আলোর কথা।

মুকু উবু হয়ে বসে বললে, দাঁড়াও, গোয়েন্দাগিরি করি। আঙুল দিয়ে একটা ছাইয়ের নুড়ি নাড়াচাড়া করে বললে, এ তো মনে হচ্ছে ন্যাকড়াপোড়া ছাই। কে কী পোড়াল? কালও তো কিছু ছিল না শুতে যাবার সময়।

হঠাৎ দিদি লাফিয়ে উঠলেন, আরে, আমার থান ধুতিটা কী হল। কাল যে শুতে যাবার সময় এইখানে ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম।

মুকু উঠে দাঁড়াল, সেকী? সে আবার কী! ধুতিতে আপনা-আপনি আগুন ধরে গেল!

আমি চুপ মেরে গেলুম। অতীত ইতিহাস মনে পড়ল। সেই প্রথম ঘটনা। দেখিনি। শুনেছি। আমার মায়ের শাড়ি এইভাবেই জ্বলে গিয়েছিল। আমার মা তারপরে মাত্র তিনমাস বেঁচে ছিলেন। এরই নাম 'ইল ওমেন'। মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। যুক্তিবাদী মন ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী নয়। কিন্তু এই তো আর একবার ঘটল সেই একই ঘটনা। এদের সামনে অতীত প্রসঙ্গ তুলে মনোবল ভেঙে দিতে চাই না।

মুকু নাছোড়বান্দা। অনুসন্ধানের উৎসাহে নীচে নেমে গেল। তার ধারণা, চোর এসেছিল। চুরির আগে চোর অনেক খেলা দেখায়। নানারকম তুকতাক করে। আমারও ডাক পড়ল পরক্ষণেই। মুকুর পক্ষে একলা কিছু করা সম্ভব নয়। সঙ্গে একজন অ্যাসিসটেন্ট চাই। তাকে বকবে, ধমকাবে। তবেই কাজ এগোবে। গলায় ওইভাবে চাদর বাঁধা। চূড়ো করা চুল। একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। চোর ধরব, না মুকুকে ধরব!

বললুম, তোমার এই অদ্ভুত সাজ কেন?

লাজুক লাজুক হেসে বললে, কীর্তন করছিলুম যে। মুকুরও লজ্জা আছে। কীরকম দেখাচ্ছে?

ফ্যান্টাসটিক।

একটা একতারা কিনে দেবে। রোজ সকালে দিদি আর আমি গান গাইব। লাগ গুমাগুম। দিদির গলা যেমন সুন্দর, সেইরকম গানের স্টকও অনেক। সকালটা খুব জমে যাবে। আমার গলাটা কেমন?

বেশ ভাল। গানের চর্চা করো না। বাড়িতে সবই রয়েছে, হারমোনিয়ম, তানপুরা, এসরাজ, তবলা।

তাই তো করব। মেসোমশাই বলতেন, যার যা গুণ আছে, সব ফুটিয়ে তোলো। এমন মানব-জনম আর কি হবে। মন যা করো ত্বরায় করো এইভাবে॥ কত ভাগ্যের ফলে না জানি। মন রে পেয়েছ এই মানব-তরণী॥

মুকু সুরেই বলছে। গলা সাবলীল, হঠাৎ থেমে গেল, এই জায়গায় মন রে, বলে বিশাল একটা টান আছে, ওইটা আমি পারব না। দোতলার বারান্দার দিকে তাকাল। উদাসী ভৈরবীর মতো সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন দিদি। মুকু বললে, আপনি পারবেন দিদি?

পারব, তবে আমার এখন সুর কেটে গেছে। বড় খারাপ লক্ষণ, এই কাপড় পুড়ে যাওয়া। আমি আর বেশিদিন নেই।

মুকু বললে, কুসংস্কার ছাড়ুন তো। যত বাজে ধারণা। এই দেখুন না, কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি। লেডি শার্লক হোমস।

মুকু নিচু হয়ে দুটো পোড়া দেশলাই কাঠি তুলে আমার চোখের সামনে ধরল, দেখেছ! যা বলেছিলুম তাই। কাল রাতে চোর এসেছিল।

ওটা কোনও প্রমাণ নয়। চোর এসে মশাল জ্বেলে জানান দেবে না, আমি এসেছি, আমি এসেছি বঁধুয়া। তারা নিঃশব্দে আসবে, নিঃশব্দে কাজ সেরে পালাবে।

কেন? তুমি শোনোনি চোর এসে আগে বড়-বাইরে করে। নিশ্চয় কোথাও করেছে। খোঁজো।

আমি স্যানিটরি ইন্সপেক্টর নই মুকু। চোরের বড়-বাইরে খুঁজব।

এটা ইনভেস্টিগেশন। সন্দেহের শেষ রাখতে নেই। দেখছ না! দিদি কীরকম ভয় পেয়ে গেছেন। মুকু হঠাৎ নিচু হয়ে কী একটা তুলল। উৎসাহ দেখে মনে হল মানিক পেয়েছে। আমার চোখের সামনে দু'আঙুলে তুলে ধরে বললে, হোয়াট ইজ দিস?

একটা আধপোড়া বিড়ি। মুকু বললে, তুমি বিড়ি খাও। আমরা শুয়ে পড়ার পর কাল তুমি চুপকে চুপকে বিড়ি খেয়েছিলে?

না, আমার কোনও নেশা নেই।

আমি খেয়েছিলুম? দিদি?

না।

তা হলে এই বস্তুটি এমন জায়গায় এল কী করে? উত্তর দাও।

কেউ ফেলেছে।

বেশ, তা হলে একটা কারক আছে। কারক ছাড়া কার্য হয় না। ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম। কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ।

একেবারে হরিশঙ্কর কেটে বসানো। পৃথিবীর যা কিছু তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ, গুরু অথবা লঘু, ঘুরে যাবে শিক্ষার দিকে। দুটো গিয়ারে পৃথিবী ঘুরছে। গ্রামার আর ম্যাথেমেটিক্স। মানুষের দেহটা তো পারফেক্ট জিওমেট্রি, ইলিপ্স, স্ফিয়ার, ট্র্যাঙ্গল, রেকট্যাঙ্গল, অ্যাকসিস, ফালক্রাম। পৃথিবীটা পিয়োর ম্যাথেমেটিক্স, মানুষ হল গ্রামার। একগাদা কারক একে আর-একের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্চ করছে।

মুকু বললে, কী হল? বোবা মেরে গেলে কেন? কর্তা ছাড়া কর্ম হয়।

কেউ বাইরে থেকে ছুড়ে মেরেছে।

বাইরে থেকে এত দূর ছোড়া যায়, একমাত্র আধলা ইট ছাড়া?

তা হলে কাকে এনেছে মুখে করে।

তোমার মুন্ডু! এখানে কাল রাতে কোনও এক ব্যাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ধরিয়েছিল। অন্ধকারে আন্দাজ করতে পারেনি। দপ করে ঝোলা কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। মেরেছে চম্পট। কেস ডিটেক্টেড। এইবার চা।

মুকু তরতরিয়ে উঠে গেল ওপরে। এইবার তার কাজ শুরু হবে ঝড়ের বেগে। কোনও থামাথামি নেই। কাজের বুলডোজার চালিয়ে দেবে। দিদি উনুন ধরাবেন। নীচে এসেছেন কয়লার খোঁজে। ভাঙা একটা ড্রামে কয়লা। মুকু যতই কর্তা আর কর্ম দেখাক, আমার মনে ঘুরছে সেই এক কুসংস্কার। দিদির একটা কিছু হবেই। তারই বার্তা এসেছে ওই কাপড়ে আগুন ধরে যাওয়ার ইঙ্গিতে। দিদির দিকে তাকিয়ে মনে হল, একটা জাওলা মাছ দেখছি। যে-কোনওদিন ছাই মাখিয়ে আঁশ বঁটিতে কুটবে সে। সে কে? জানি না। মহামান্য, মহাপ্রতাপশালী তিনি। মানুষ পেছন ফিরে থাকলেও অনুভব করতে পারে। জাল ফেলে জলে বসে আছে জেলে।

দিদি টিনের দিকে হাত বাড়াতেই বলে ফেললুম, আপনি না আপনি না। আমি বার করে দিচ্ছি।

দিদি থতমত হয়ে বললেন, কেন ভাই!

আপনার হাত কেটে যেতে পারে।

হাত কাটবে কেন?

যদি যায়।

দিদি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। সুন্দর মুখটা। অনেকটা কৃষ্ণের মতো। ভীষণ ধারালো। এমন যার টিকোলো নাক, তার নাকে রসকলি কেমন মানাবে। দিদির ঠোঁটদুটো থিরথির করে কাঁপল কয়েকবার। অতি কষ্টে বললেন, শেষকালে এত ভালবাসা! ঈশ্বর এতদিন যেমন কৃপণ ছিলেন, এবারে একেবারে মুক্তহস্ত। ভাই, একটু-আধটু কেটেকুটে গেলে কী-ই বা হবে। জীবনে কত চোট পেয়েছি।

আপনি জানেন না, মরচে-ধরা টিন কী সাংঘাতিক!

আমি ধুমধাম কয়েক ঢেলা কয়লা বের করে দিলুম। আমার ভয়, টিনের কাটা মানেই টিটেনাস। আর কাটবেই। একটা কিছু হবেই। স্বামী নির্মলানন্দজি আমাকে বারেবারে সাবধান করে দিয়েছেন, নেগেটিভ চিন্তা করবে না। থিঙ্ক গুড অ্যান্ড ইউ গেট পজিটিভ রেজাল্ট। কোথায় কী? আমার মন মানে না। লখীন্দরকে যেমন লোহার বাসরঘরে রাখা হয়েছিল, দিদিকেও সেইরকম রাখতে পারলে কিছুটা শান্তি পাওয়া যেত। সে আর হয় কী করে! ঈগলের দৃষ্টি পড়েছে। মানুষ-ইঁদুরটিকে ছোঁ মারবেই।

দিদি কয়লা ভাঙছেন। মনকে বোঝালুম, ও কাজটা তেমন বিপজ্জনক নয়। দিদির পক্ষে ভয়ের হবে আগুন, বারান্দা কি ছাদের আলসে ভেঙে পতন, ভাঙা টিনের খোঁচা, খাবারে বিষক্রিয়া। এই ক'টা থেকে যতদূর সম্ভব সাবধানে রাখতে হবে দিদিকে। একদিনেই ভীষণ মায়া পড়ে গেছে। ভদ্রমহিলার মধ্যে অদ্ভুত একটা মায়া আছে। ভোরের আকাশের মতো। আমার মনে হল, এমন একজন মানুষকে এইভাবে সাতসকালে কয়লা ভাঙতে দেওয়া উচিত নয়। হাত থেকে হাতুড়িটা কেড়ে নিলুম।

উঠুন আপনি। এ কাজ আপনার নয়। হয় মুকু করবে, না হয় আমাদের বাড়ি যে কাজ করে সে ভাঙবে।

কেন ভাই? আমার ঠিক হচ্ছে না বুঝি!

কেন হবে না! আমার এই দৃশ্য সহ্য হচ্ছে না।

তুমি কি জানো ভাই, কিছুকাল আমি বাড়ি বাড়ি রান্না করেছি?

সে যখন করেছেন তখন করেছেন, এখন আপনি আমার দিদি। আমাদের মাথার ওপর থাকবেন, আমাদের আদেশ করবেন। উঠুন আপনি।

হাত ধরে তুলে দিলুম। একটু যত্ন করলে চেহারাটা সুন্দর হবে। তখন আভিজাত্য একেবারে ফেটে পড়বে। একদিকে মুকু, একদিকে দিদি। আবার আমাদের সংসারে পুরনো দিন ফিরে আসবে। শুনেছি, আমাদের বাড়ির দুই বউ খুব বিদূষী ছিলেন। দুই সখীর মতো। নীল সোয়েটার আর ডোরা-কাটা পাম শু পরে শীতকালের রোদে বেড়াতে বেরোতেন। সঙ্গে থাকত লোমঅলা সাদা কুকুর। পিতাকে যদি ভারত চুঁড়ে একবার ধরে আনতে পারি তা হলে তো কোনও কথাই নেই। সুখের বন্যা বইবে।

দিদি ছলছলে চোখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

কাঁদছেন কেন?

কাঁদিনি ভাই। মন দেখছি মন। এ জল আনন্দের।

কানের কাছে যেন দৈববাণী হল, ঠিক করেছ।

ওপর দিকে তাকিয়ে দেখি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মুকু। হাসছে। বেশ পালটে গেছে। সেই চাদর জড়ানো বৈরাগীর বেশ আর নেই।

মুকু একটা ব্যাগ দোলাতে দোলাতে বললে, বাজারের ব্যবস্থা করো। দিদির আজ জন্মদিন।

ওমা সেকী? আমার জন্মদিন! তুমি কী করে জানলে! আমার জন্মদিন তো আমিই জানি না।

আমার মন বলছে, আমার দিদির আজ জন্মদিন। এখন দয়া করে দু'জনে ওই ঢ্যাবট্যাবে জায়গা ছেড়ে ওপরে উঠে এসো। আমার চা হয়ে গেছে।

দিদি আমাকে বললেন, তোমাদের নীচে একটা বাথরুম রয়েছে না? আমি বরং সেটাই ব্যবহার করি।

দিদি, আবার শুরু করলেন! ওটায় খুব বিপদে না পড়লে আমরা যাই না। তাও যাই ভয়ে ভয়ে। ওখানে অন্য অনেক প্রাণীর বসবাস। সাপও আছে। ওদের সুখের সংসারে না-ই বা হামলা করলেন। ওপরে চলুন।

সারা বাড়িটা আমার একবার ঘুরে দেখা উচিত। এই বাড়িরই কোনও একটা ঘরে আমি জন্মেছিলুম।

বাড়ি তো আপনার! সময়মতো ঘুরে দেখবেন। একটাই কথা। ছাতের আলসেতে ভর দিয়ে দাঁড়াবেন না। বাড়ি পুরনো হয়েছে। তেমন আর জোর নেই।

বারান্দায় সবাই মিলে বসা হল চা নিয়ে। আমরা তিনজন কিন্তু চার কাপ। সুদৃশ্য একটা কাপ-ডিশে আলাদা করে রাখা, যেন একটু পরেই কেউ আসবেন। বড় একটা বাটিতে শুকনো মুড়ি। তুলে তুলে নাও আর খাও। খালি পেটে চা চলবে না। মুকুর কড়া নির্দেশ। বিস্কুট চলবে না। বিস্কুট হল বিলাসিতা।

জিজ্ঞেস করলুম, ওই চা কার? আমরা তো তিনজন।

কপাল থেকে বাঁ হাতে চুল সরাতে সরাতে মুকু বললে, বুঝতে পারলে না? তোমার এত বুদ্ধি! ওটা মেসোমশাইয়ের। এই সুন্দর সকালে সুন্দর বারান্দায় বসে আমরা চুমুকে চুমুকে সুগন্ধী দার্জিলিং চা খাব, আর তিনি? তাঁকে কে চা করে দেবে? জানো, তিনি চা কত ভালবাসতেন। দিনে সাত-আটবার চা খেতেন। আমি তাঁর ছায়ায় আছি। চিরকাল তাঁর ছায়াতেই বাস করতে চাই। আমি ভগবান জানি না। তিনিই আমার ভগবান! আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার। রাখব খুলে রাতে। প্রদীপখানি রইবে জ্বালা। বাহির-জানালাতে॥ মুকু কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বপ্নে-দেখা সেই নদী। উপলখণ্ডের বিস্তার। জল নেই। শিলাখণ্ডে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন তিনি। সেই অভিমানী।

The man that runs away
Lives to die another day.

বড় লজ্জা নিয়ে নেমে এসেছিলুম গাড়ি থেকে। মুকু জামা খামচে ধরে টেনে নামাচ্ছে আর স্বামীজি মহা ঘৃণায় বলেছিলেন, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও। ইংরেজিতে বললে বলতেন, ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট। ফেলে দাও, ফেলে দাও ঘৃণার মাংপিণ্ডটাকে। আনন্দ আর দুঃখের এমন দার্জিলিং-আসাম ব্লেন্ড কদাচিৎ দেখা যায়। উন্মাদ ভালবাসা, অসহ্য ঘৃণা।

আমাকে যিনি ঘৃণা করেন, আমি তাঁর কাছে যাই না। ঘৃণার কাজ করলে ঘৃণা করুন আমি মেনে নেব, অকারণে ঘৃণা কেন! একটা দুঃখের স্মৃতি জেগে উঠছে। বয়েস পেছোচ্ছে। আমার তখন আট বছর বয়স। আমার মেজ জ্যাঠামশাই খুবই অসুস্থ। আমার সেই জ্যাঠামশাই, যাঁর স্নেহ আর ভালবাসার স্মৃতি আমাকে আমার চিতা পর্যন্ত অনুসরণ করবে। শীতের রাতে লেপের তলায় কোলের কাছে নিয়ে গল্প বলা, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি। আমার ক্ষুদ্র হাতটি ধরে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন খেলার মাঠে। বড়দের বলখেলা হচ্ছে, আমরা বসে আছি দু'জনে একপাশে। মাঠের উত্তর দিকের শেষ মাথায় এক বয়স্ক বেলগাছ, যে-গাছটার খ্যাতি সর্বত্র ব্রহ্মদৈত্যের আস্তানা বলে। শীতের অপরাহ্নে ফুটবল খেলা যখন বন্ধ, তখন আমরা দু'জনে ওই মাঠের মাঝখানে এসে বসতুম। চারপাশে জোড়া জোড়া পুকুর। শেষবেলার শীতে জল কালো হয়ে গেছে। বিদেশি হাঁসের দল উড়ে এসেছে আরও কোনও শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে। কেউ জলে মাথা গুঁজছে পেছন উলটে। কেউ জল থেকে শরীর সামান্য উঁচু করে ডানার জল ঝাড়ছে। প্রান্তর পেরিয়ে ছুটে আসছে শীতের শীতল বাতাস। আমার মাথার রঙিন টুপি কান পর্যন্ত টেনে নামিয়ে দিচ্ছেন জ্যাঠামশাই। গলার মাফলার ঠিকঠাক করে দিচ্ছেন। সবে এসেছি পৃথিবীতে। সবই আমার চোখে তখন নতুন। চারিদিকে ছড়ানো পৃথিবীর যাবতীয় বিস্ময়। একপাশে বিশাল খড়ের গাদা, মাথায় চড়ে নাচছে চড়াই শালিক ছাতারে। দুগ্ধধবল দুটি গাভী রোমন্থনে নেশাতুর। আমারই মতো সদ্য-আগত দুটি ছাগশিশু সামনের দুটি পা তুলে নেচে নেচে উঠছে। জ্যাঠামশাই বসে আছেন। আমি সারামাঠে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। আমি ছুটছি, আমার পেছনে ছুটছে ছাগলছানা। হঠাৎ ঘাসের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেলুম নিটোল গোল, মসৃণ একটা গুলি। পোড়ামাটির গোল গুলি। একটি শিশুর কাছে কী বা মাটি, কী বা হিরে, একটা কিছু পাওয়াটাই মহা বিস্ময়ের! কুড়িয়ে পাওয়া সেই অসাধারণ গুলি আমার কাছে বহুদিন ছিল। সেই গুলির নির্মাতাও আমার শ্রদ্ধেয় ছিল। অমন নিটোল, অমন মসৃণ কেমন করে করা সম্ভব হয়েছিল! আমার জ্যাঠামশাইও ছিলেন অদ্ভুত এক মানুষ। বয়স্ক এক শিশুর মতোই। গুলির আনন্দে তিনিও বিভোর। অমন একটা জিনিস কে করেছে, কীভাবে করেছে! পোড়াবার পর একটুও ফাটেনি কেন! মহা গবেষণার পর গুলিটা নিজের পকেটে রেখে বললেন, রবিবার ওইরকম একশোটা গুলি তিনি আমাকে করে দেবেন পুকুর থেকে এঁটেল মাটি তুলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই মাঠ থেকে আবিষ্কার করলুম

আর এক বিস্ময়। গোলাপি মাঞ্জা দেওয়া অনেকটা ঘুড়ির সুতো পড়ে আছে। কড়কড়ে তাজা! হাতের আঙুলে গুটিয়ে আমার হাতে দিয়ে জ্যাঠামশাই বললেন, একে বলে চ্যাঁ-ভোঁ মাঞ্জা। শিশুর কল্পনা বুড়ি হয়ে ঘুড়ি হয়ে উড়ে গেল আকাশে। একের পর এক প্যাঁচ লড়ে যাচ্ছি। সবাই ভোকাটা হয়ে যাচ্ছে। আমি নীল আকাশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। সেই বিকেলেই জ্যাঠামশাই আমাকে একটা নীল ঘুড়ি কিনে দিলেন। পাতলা কাগজ কাঁপকাঠি আর বুককাঠির বাঁধনে টানটান। কাগজের কী সুন্দর গন্ধ! ঘুড়িটা হাতে নিয়ে মনে হয়েছিল, নিজের টানটান হৃদয়টাকেই যেন ধরে আছি। সেই কতদিন আগের কথা। আজও মনে আছে। স্মৃতি এক অসাধারণ ব্যাঙ্ক!

সেই জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বায়ু পরিবর্তনে হাজারিবাগে গেলুম। তখন তিনি ভীষণ অসুস্থ। পরে জেনেছিলুম, অনেক পরে বড় হয়ে, তাঁর টিবি হয়েছিল। কোনও ওষুধ তখনও আবিষ্কার হয়নি। যক্ষ্মা থেকে রাজযক্ষ্মা, অবশেষে মৃত্যু। ডাক্তারবাবুরা বলেছিলেন স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যান। ভালমন্দ খাওয়ান। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই। সেই ভয়ংকর গরমে আমরা হাজারিবাগ হাজির হলুম। আশেপাশে সুন্দর সুন্দর সব বাগানবাড়ি। বাগান, বাগানে থরেথরে ফুটে আছে গোলাপ। গাছে দুলছে পাকা পাকা পিচফল। একটা বাগানবাড়ির নাম ছিল সুরিয়া হাউস। হলদে রঙের বাড়ি। সাদা ইটের কেয়ারি। সেই বাগানে বেশ কিছু আমগাছ ছিল। সিপিয়া ল্যাংড়া। বাগানের দিকের বারান্দায় বেতের আরামকেদারায় ড্রেসিং গাউন পরে এক গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক বসে থাকতেন। ফরসা রং। সুন্দর স্বাস্থ্য। একদিন জ্যাঠামশাইকে বললুম, ওই বাগান থেকে আম চেয়ে আনব? জ্যাঠামশাই তখন ভীষণ অসুস্থ। বেশিরভাগ সময় শুয়েই থাকেন। মুখ শুকনো। চোয়ালের হাড় জেগে উঠেছে। চোখদুটো ঢেকে গেছে। ছোট আমি। কেমন করে বুঝব তাঁর কী হয়েছে? কী দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে তাঁর মনে? অফিস গেছে। বিদেশে পড়ে আছেন। কলকাতায় সংসার টানছেন হরিশঙ্কর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে পৃথিবী কাঁপছে। চিকিৎসায় জলের মতো টাকা খরচ হচ্ছে। অসুখের লজ্জায় জ্যাঠামশাই মরমে মরে আছেন। আমার কথা শুনে, জ্যাঠামশাই স্থির চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। শেষে বললেন, ছি ছি বাপি, তুমি চেয়ে আম খাবে? আমরা এত গরিব হয়ে গেছি! ভিক্ষে করতে হবে?

এতই স্পর্শকাতর আমি, জ্যাঠামশাইয়ের সেই মুখ চোখ আর ছি ছি বলার ধরনে আমি কুঁকড়ে গেলুম। ছুটে বেরিয়ে এলুম ঘরের বাইরে। আমরা যে-বাড়িতে ভাড়া ছিলুম, তারও একটা ন্যাড়ান্যাড়া বাগান ছিল। খুব একটা যত্নের নয়। সেই বাগানে একা একা ঘুরে বেড়ালুম অনেকক্ষণ। একটা পিচফলের গাছ ছিল। ফল ধরেছে অনেক। একটা পেড়ে খেলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, জীবনে জ্যাঠামশাইয়ের সামনে আর কখনও খাব না। কথা তো বলবই না। হঠাৎ আকাশের দিকে নজর গেল। রোদ ঢেকে আসছে মেঘে। কালো মেঘ হুহু করে এগিয়ে আসছে। বিনবিন একটা আওয়াজ। মেঘ তো আওয়াজ করে না। এ আবার কী? মেঘের তো ডানা থাকে না! হঠাৎ দূরে একটা শোরগোল উঠল, পঙ্গপাল পঙ্গপাল। পঙ্গপাল নামটা শোনা ছিল। দলছুট কয়েকটা আমার দিকে উড়ে এল। বিশাল বড় ফড়িঙের মতো। ভয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম ঘরে। চারপাশ অন্ধকার। সূর্যে যেন গ্রহণ লেগেছে। ফিরফির আওয়াজে কানের পরদা কাঁপছে। বাইরে হইহই চিৎকার।

মানুষ কিছু ভোলে না। বেঁচে থাকাটা আর কিছুই নয়। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। গাছে যেমন ফল ধরে, মানুষে তেমনি স্মৃতি ধরে। শেষকালে মানুষ একেবারে নুয়ে পড়ে। বিশাল একটা কেতাবের মলাট বন্ধ হয়ে যায়।

জীবিতের সংসারের একপাশে পড়ে থেকে থেকে একদিন কীটদষ্ট বিস্মৃতি। জ্যাঠামশাই হাজারিবাগে এসেছিলেন হেঁটে হেঁটে, ফিরে চললেন স্ট্রেচারে শুয়ে। এই বাড়ির দক্ষিণের ঘরে তিনি বিছানা নিলেন। দরজার পাশ থেকে উঁকি মেরে মেরে দেখি। সংসার একেবারে এলোমেলো। অনবরতই ডাক্তার-বৈদ্যের আসা-যাওয়া। বড়র বড়, তারও বড়। গম্ভীর মুখে আসেন, ফিরে যান গম্ভীরতর মুখে। গোটা বাড়িতে ফিনাইল আর কার্বলিকের গন্ধ। মহা আহ্লাদে আমি ঘুরি। শাসন নেই কোনও। জ্যাঠামশাইয়ের ঘরের পাশে খোলা বারান্দায় ক্যারামবোর্ড পেতে সমবয়সি ইয়ারদের সঙ্গে সারাদুপুর পিটি। কোনও দৃকপাত নেই। কে মরে আর কে বাঁচে। এক কিশোরের সঙ্গে জীবনমৃত্যুর কী সম্পর্ক? হাজারিবাগের অভিমান কলকাতায় এসে যেন দুধে-ফোলা পাউরুটি! কেন জ্যাঠামশাই আমাকে ডেকে বললেন না, বাপি, রাগ কোরো না! বোধের কী অভাব! একবারও বুঝলুম না। জ্যাঠামশাইয়ের তখন কথা বলার কোনও ক্ষমতা নেই। তরী ভেসে চলেছে নিঃশব্দে জীবনমৃত্যুর মোহানার দিকে। একদিন ক্যারামের আসর খুব জমেছে, ক্ষীণ একটা ডাক কানে এল, বাপি।

কী আনন্দ! আমার সবচেয়ে প্রিয়জন অবশেষে ডেকেছেন। স্ট্রাইকার ফেলে ছুটলুম। জ্যাঠামশাই চিত হয়ে শুয়ে আছেন। ঠোঁটদুটো অল্প ফাঁক। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জ্যাঠামশাই, বলে কাছে ছুটে গেলুম। তিনি তখন বহু দূরে চলে গেছেন। জীবনের ধনুক থেকে প্রাণের তির ছিটকে বেরিয়ে গেছে। বহু, বহু দূর থেকে ডাক ভেসে এল, বাপি, তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। তবে এখানে নয় ওখানে। তোমার খেলা শেষ করে এসো। বাকি কথা হবে পরে।

সেই অভিমান! আজও আমি অতিশয় অভিমানী। জীবনের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারিনি। স্বামী নির্মলানন্দ? আমি কী করি? আপনার কাছে যেতে চাই। আমার অভিমান টেনে ধরে আছে। তবে আমি আর কিশোর নই। পোড়খাওয়া এক যুবক। আমি যাব। আমার হৃত গৌরব উদ্ধার করতে। সঙ্গে হরণকারিণীকেও নিয়ে যাব।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মুকু রান্নাঘরের কাছে বীর দর্পে ঘোরাঘুরি করছে। দিদি ঘরের ভেতরে। টুংটাং খুটখাট নানা শব্দ, সংসারের শব্দ। মুকু আবার মাঝে মাঝে গান গাইছে, হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, ঘোল খাওয়ালে মোরে!

মুকু, শেষটা হল পার করো আমারে।

সে কথাটা এই আমার কাঁচা বয়সে বলি কী করে! জীবনের কত সাধ আহ্লাদ বাকি আছে ভাই। এখনই যাই কী করে! আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে জ্বালিয়ে তারপর যাব, যতদিন না তোমার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার, দাসখত লিখে নিয়েছ হায়!

দিদি কুটনো কুটছিলেন, মুখ তুলে বললেন, হ্যাঁরে! তোরা কি বিয়ে করবি?

মুকু বললে, সেইরকমই ইচ্ছে আমাদের।

বাঃ বেশ হবে। মানাবে ভাল। তা কাকা ঘি আর আগুন পাশাপাশি রেখে চলে গেলেন!

তার কারণ আছে। আমরা সংযমী। কুকুর বেড়াল নই।

দিদি একটা বেগুন নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, যাক বাবা, ভালই হয়েছে। আমার একটা এক ভরির মতো সোনার বালা আছে, সেইটা ভেঙে তোকে একটা সুন্দর গয়না গড়িয়ে দোব। চল আজই কোনও

স্যাকরার কাছে যাই।

একেই বলে উঠল বাই তো কটক যাই। বিয়ের এখনও দেরি আছে। আগে আমরা মেসোমশাইকে খুঁজে বের করব। তারপর আমি এম এ পাশ করব। তারপর।

দিদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মেসোমশাইকে খুঁজে বের করবি মানে?

আমরা দু'জনে থতমত। সত্য বেরিয়ে পড়েছে। সত্যের যা ধর্ম। আর চেপে রাখা সাজে না। প্রকাশ করে দেওয়াই ভাল।

আমিই বললুম, দিদি, আপনাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমরা হাসছি, খাচ্ছি, কথা বলছি, কিন্তু আমরা আজ অনাথ। বাবা কারওকে কিছু না বলে হঠাৎ ভোররাতে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন আমরা জানি না।

দিদির আনাজ কোটা বন্ধ হয়ে গেল। তারার মতো চোখ মেলে বলল, সেকী রে! কাকা নেই।

আছেন। কোথাও-না-কোথাও আছেন, আমরা এখনও জানি না।

তা হলে কী হবে!

আমাদের জানা নেই। ভগবানকে মানুষ যেমন ডাকে, আমরাও মনে মনে অনবরতই তাঁকে স্মরণ করছি। দেখা দিন, দেখা দিন।

দিদি মাথা নিচু করলেন। পিঠের দিকটা ফুলছে। মুখ তুললেন। চোখে জল। ধরা গলায় বললেন, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।

আপনার কোনও ভয় নেই দিদি। আমরা আপনাকে মাথায় করে রাখব।

তা তো হল, কিন্তু আমার কাকাকে ফিরিয়ে আনার কী হবে?

আমাদের দু'জনের মুখেই আর কোনও কথা সরল না। এই সুবিশাল ভারতভূমে কত গুহা, নদী, প্রান্তর, মন্দির, আশ্রম! তিনি কোথায় আছেন! জায়গার তো অভাব নেই আত্মগোপন করার। কেমন করে জানব? দিদি মসৃণ বেগুনটা হাতে তুলে নিয়ে খুব আন্তরিক গলায় বললেন, একটা কিছু কর ভাই।

মুকু বললে, আজ রাতে আমরা পরামর্শে বসব।

মুকুকে ইশারায় ডেকে আমার ঘরে নিয়ে এলুম, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলো।

মুকু কী পরিশ্রম করেছিল কে জানে, ঘেমে গেছে! মুখটা মোমের মতো চকচক করছে। প্রাণের দীপ্তিতে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। সারাশরীর ঘিরে থমকে আছে উষ্ণ আকর্ষণ। বড় দুর্বল মনে হচ্ছে নিজেকে।

আবার এও মনে হচ্ছে, Love's way is life, without it humans are but bones skin-clad. প্রেমই জীবন। প্রেম ছাড়া মানুষ চামড়ার আস্তরণে হাড়ের খাঁচা।

মুকু বললে, কই বলো! কী দেখছ অমন করে? আমার অস্বস্তি হচ্ছে।

তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি।

পাগলকে আর কী পাগল করব বলো! তোমার অনুরোধটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলো। আমার প্রচুর কাজ।

তোমাকে আমার সঙ্গে একবার স্বামী নির্মলানন্দজির কাছে যেতে হবে।

আমাকে? আমি গিয়ে কী করব!

আমার সম্মান বাঁচাবে।

তোমার অসম্মানের কী হল?

আমার জামা খামচে ধরে তুমি আমাকে গাড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছিলে, তিনি ভীষণ ঘৃণায় বলেছিলেন, নামিয়ে দাও, নামিয়ে দাও। যেন আমি কত খারাপ, চরিত্রহীন যুবক। আসল ব্যাপারটা তাঁকে জানানো দরকার।

না জানালে?

আমার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।

যায় যাবে। তাতে তোমারই বা কী, আর আমারই বা কী!

ও কথা বোলো না। আমি কোন জলের মাছ জানো?

খুব জানি। গভীর জলের মাছ। তুমি গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে।

তুমি একটা অধার্মিক, নাস্তিক।

তোমার মতো আস্তিক হওয়ার চেয়ে নাস্তিক হওয়া ভাল।

তুমি তা হলে যাবে না?

অবশ্যই যাব। কখন যেতে হবে বলো?

বিকেলের দিকে।

বেশ তাই হবে।

মুকু চলে গেল। কিছুক্ষণ থম মেরে বসে রইলুম। অদ্ভুত একটা আলস্য এসে যাচ্ছে। নিজের ভবিষ্যতটাকে কেমন তিল তিল করে নষ্ট করছি! কেবল ভাবছি। ভেবেই চলেছি। চাকরিবাকরি লাটে উঠে গেল। পড়াশোনা গোল্লায়। নিজেকে কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবছি, কখনও বিবেকানন্দ। আর বুকে হাত মুড়ে গোল্লা গোল্লা চোখ করলেই কি স্বামীজি হওয়া যায়! সংস্কার চাই, প্রারব্ধ চাই। পৃথিবীতে কত রকমের ইডিয়েট আছে? আমি একটা রকম। যা হতে পারব না, তা হবার চেষ্টায় মরছি। নিজের সম্মান বাঁচাবার চেষ্টায় একবার থানায় গেলুম না। কী? না, লোক জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই বলবে, ছি ছি, ছেলের জন্যে বাবা গৃহত্যাগী। মাসতুতো বোনকে এনে ফুর্তি লুটছে। ভগবানের অসীম কৃপা। কোথা থেকে এক দিদিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বদনামের হাত থেকে কিছুটা। বাঁচা যাবে অন্তত।

বেলা চারটের সময় আমরা আশ্রমে গিয়ে পৌঁছেলুম। আশ্রমের দরজার সামনে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম দু'জনে। স্বামীজির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি কী বলবেন! কঠিন তিরস্কার? মুকু বললে, কবে যে তোমার জড়ভরত ভাবটা যাবে! চলো না। যা হবার তা হবে। চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন না তো! বড়জোর বলবেন, গেট আউট। বেরিয়ে চলে আসব। ঈশ্বর তো কারও একার সম্পত্তি নয়। নিজেদের চেষ্টাতেই তাঁকে ধরব। গেরুয়া পরলেই কি তাঁকে পাওয়া যায়? অত সহজ নয়! শুনবে, তুলসীদাসজি কী বলছেন, তুলসী

পিঁদনে হরি মেলে তো, মেয় পেঁদে কুঁদা আউর ঝাড়। পাত্থর পুজনে হর মেলে তো ময় পুজে পাহাড়। তুলসীর মালা পরলে যদি জগদীশ্বর লাভ করা যায় তা হলে গলায় আমি তুলসীগাছের একটা কুঁদো ধারণ করি, কি তুলসীর একটা ঝাড় ঝুলিয়ে রাখি। আর যদি মনে করে থাকো একটা শিলার অর্চনা করলেই মহেশ্বরকে পাওয়া যাবে, তা হলে আমি একটা পাহাড়কেও পুজো করতে প্রস্তুত আছি। যা চাইছ তা অত সহজ নয়। চেলা মিলে লাখ তো গুরু মিলে এক।

আমরা দু'জনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা গজগজ করছি, কারণ আমাদের মতের মিল তো কোনওদিন হবে না। যদি আমরা কোনওদিন স্বামী-স্ত্রী হই, এটা তো তারই লক্ষণ। অস্কার ওয়াইল্ডের কথা মনে পড়ছে, ম্যারেজ ইজ এ পার্মানেন্ট ডিসএগ্রিমেন্ট।

এক সরল চেহারার মানুষ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবলেন আমরা ঢুকতে ভয় পাচ্ছি। সাহস দিলেন, যান না, যান, ভেতরে যান, কেউ কিছু বলবে না। মহারাজরা খুব ভাল। রাত্তিরবেলা ভোগে গাওয়া ঘিয়ের লুচি হয়। খাঁটি গাওয়া। আমি সবদিন পাই না, তবে রোজ গন্ধ পাই। ভুর ভুর ভুর ভুর। রান্নাঘরের পাশেই তো আমি থাকি। যান যান, ভেতরে গিয়ে দেখুন। জুতো সাবধান। ভীষণ জুতো চুরি হয়।

মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ঝুলিয়ে মানুষটি চলে গেলেন। আমরা নিজেদের ঝাড়াঝাড়ি করে ভেতরে ঢুকে পড়লুম। বাঁ দিকের অফিসঘরে আর গেলুম না। সোজা দোতলার মন্দিরে। ফুলের মালা পরে মা হাসছেন। দু'-চারজন ভক্ত। মুকু বেশ অভিভূত হয়ে থেবড়ে বসে পড়ল। হাত জোড় করে প্রথমেই বললে, মা, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে মেসোমশাইকে ফিরিয়ে এনে দাও।

এই কথাটা তো আমি মাকে বলতে পারিনি। আমি আসি যাই, নিজের কামনাই জানাই। বড় স্বার্থপর আমি। মুকুর মুখের দিকে তাকালুম। অদ্ভুত একটা ভাব খেলছে। ভীষণ হিংসে হল। মুকুর মন কত পরিষ্কার। আমি কত কুচুটে! সবসময় নিজের ধান্দা। মুকু যেভাবে বসেছে, সহজে উঠবে না। ফিসফিস করে বললুম, চলো, মহারাজের কাছে যাই।

মহারাজ আগে, না মা আগে!

থমকে গেলুম। সত্যই তো, মা-ই তো সব। মাকে সব নিবেদন করে আমরা তো ফিরেও যেতে পারি। যাই হোক মুকুর দয়া হল। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। আমরা তিনতলার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালুম। ভয়ে বুক কাঁপছে। কপালে কী লেখা আছে জানি না।

দুরুদুরু বুকে মহারাজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। লাল ঝকঝকে মেঝে। চকচকে টেবিল। চেয়ারে টকটকে গেরুয়া পরে বসে আছেন মহারাজ। মুখ নিচু করে কিছু একটা লিখছেন। মুকু হঠাৎ আমাকে ঠেলে ঘরে ঢুকে গেল। মহারাজ মুখ তুলছেন। মুকু ততক্ষণে মাটিতে গড় হয়ে প্রণামে।

মহারাজ বললেন, কে তুমি? আমাকে দেখেও দেখলেন না।

মুকু সোজা হয়ে হাত জোড় করে বললে, আমি মুকু। মায়ের মেয়ে।

মহারাজ থতমত। মুখ অতিশয় গম্ভীর। এই গাম্ভীর্য ভীষণ ভয়ের। থমথমে মুখ। তীক্ষ্ণ চোখ। সামনে দাঁড়ালে কেঁচো হয়ে যেতে হয়। মুকু কিন্তু নির্ভয়। এমন উত্তর মহারাজ কখনও শোনেননি, মায়ের মেয়ে।

মহারাজ বললেন, অনিশ্চিত পরিচয়কে নিশ্চিত করো। দেশ-কাল-পাত্রের সীমায় বাঁধো।

পেছনে লেজ গুটিয়ে যে ভীরু দাঁড়িয়ে আছে, আমি তার বোন। এইবার কেমন বোন? না মাসতুতো বোন। আরও এক ধাপ এগোলে, আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ দর্শনের ছাত্রী। এইবার আরও একটি সংযোজন, সেদিন আপনার গাড়ি থেকে জামার বুক খামচে ধরে যে-মেয়েটা ওকে টেনে নামিয়েছিল, সেই মেয়েটাই আমি। এইবার প্রার্থনা, প্রণাম করেছি, আশীর্বাদ করেননি। গম্ভীর মুখ। একটু হাসি আশা করি। আশীর্বাদ চাই, স্বামীজি ভারতীয় নারীকে যে-রূপে দেখতে চেয়েছিলেন আমি যেন সেইরকম হতে পারি। স্বামীজি বলেছিলেন, আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও অনন্ত দয়া□— সেই জগজ্জননী ভগবতীর গুণ। জগতে যত শক্তি আছে তিনিই তার সমষ্টিরূপিনী। জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সবই সেই মা। তিনিই প্রাণরূপিনী, তিনিই বুদ্ধিরূপিনী, তিনিই প্রেমরূপিনী।

মুকু একটু থেমে মহারাজের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত মিষ্টি গলায় বললে, মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন না মহারাজ?

There are only three things to be done with a woman.
you can love her, suffer for her, or turn her into literature.

মহারাজ চেয়ারটা আস্তে পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। মুকুর প্রখর বোলচাল স্তম্ভিত। টকটকে গেরুয়া কাপড় ভাঁজে ভাঁজে খুলে পায়ের পাতা ঢেকে দিল। মুকু মেঝেতেই বসে রইল থেবড়ে। মহারাজ তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

মুকুর মাথায় একটা আঙুল আলতোভাবে স্পর্শ করিয়ে তুলে নিলেন। বললেন, উঠে বোসো চেয়ারে। তোমার এই বীরভাব আমার ভাল লাগছে। তবে কী জানো, তোমার কাণ্ডজ্ঞানের একটু অভাব আছে। আমি সন্ন্যাসী। গাড়িতে বসে আছি। তুমি একবারও খেয়াল করলে না, পাঁচজনে কী ভাববে!

মুকু চেয়ারে বসতে বসতে পটাং করে বলে উঠল, মহারাজ, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নয়, আমার আবেগ। অপরাধীকে আমার চাবকাতে ইচ্ছে করে। আপনি যে গাড়িতে আছেন লক্ষ করিনি। গাড়িতে একটি মেয়ে ছিল আর আপনার এই ছেলে তার কোলের ওপর মেয়েটির হাত নিজের হাতে নিয়ে মহা আরামে বসে ছিল। যে-গাড়িতে আপনি সেই গাড়িতে এমন ঘটনা ঘটে কী করে? ইংরেজিতে একেই বলে কমপ্রোমাইজিং পজিশন।

ও! ও তো সুরঞ্জনা! সুরঞ্জনা ছিল গাড়িতে।

সুরঞ্জনা তো একজন মহিলা আর ও তো একটা ছেলে। যে সন্ন্যাসী হবে সে অত ঘন হয়ে বসেছিল কেন? ঠাকুর বলে গেছেন, আগুন আর ঘি পাশাপাশি রাখতে নেই মহারাজ। ঠাকুর কত সাবধান হতে বলেছেন। বলেছেন, সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ে মেয়েদের পাশে যেতে হয়, যদি অ্যাট-অল যেতেই হয়। বলেছেন, মেয়েদের ছবি দেখলেও চিত্ত চঞ্চল হতে পারে। যে সন্ন্যাসী হবে তার এইসব অবশ্যই মানা উচিত। এই দু' নৌকোয় পা দেখে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া তার আগের সারাটা রাত কোথায় ছিল তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর নেই। মিথ্যা কথায় অতিশয় পারদর্শী। গল্প তৈরিতে মহা ওস্তাদ। ওকে দেখার মতো কেউ নেই, তাই আমাকেই কড়া হাতে শাসনের ভার নিতে হয়েছে। ওর মাথায় সদাসর্বদাই অদ্ভুত সব মতলব খেলা করে।

আমার এইবার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলা উচিত। যেভাবে চিত্রিত হচ্ছি তাতে প্রায় চরিত্রহীনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছি।

মাতাল লম্পটরাই রাতে বাড়ি ফেরে না। মেয়ে দেখলেই ল্যাল ল্যাল করে এগিয়ে যায়। ঘোঁতর ঘোঁতর করে। ও কি তাই? মহারাজ গাড়িতে আপনি আছেন, আমি একবারও লক্ষ করিনি। আমার চোখ ছিল শুধু

ওদের দু'জনের দিকে। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন আমার অসভ্যতার জন্যে। মুকু ভাবের আবেগে আমার চরিত্র আরও কিছুটা বিপর্যস্ত করে দিল। মেরামতের বদলে ভেঙে দিল অংশে অংশে, খণ্ডে খণ্ডে।

মিউমিউ করে স্বর বেরোল, যেন ছুঁচো, আমার কিছু বলার ছিল। আমি সুরঞ্জনার দিকে চেপে ছিলুম কোনও বদ মতলবে নয়, মহারাজের কারণে, পাছে মহারাজের গায়ের সঙ্গে আমার গা লেগে যায়! উনি সন্ন্যাসী আমি গৃহী।

মুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।

আমি হতাশ হয়ে বললুম, দেখছেন মহারাজ? আমার কেস হাজির করার সুযোগই দিচ্ছে না।

শোনো, তোমাকে একটা অপ্রিয় কথা বলি। প্রথমে ইংরেজিতেই বলি। পুস্তু প্রবাদ,

The ungrateful son is a wart on his father's face;
to leave it is a blemish, to cut it off is pain.

অকৃতজ্ঞ পুত্র হল পিতার মুখে একটা আঁচিলের মতো। রাখাটা কলঙ্কের মতো, কাটা যন্ত্রণাদায়ক। তুমি যদি তোমার আচরণে পিতার মান-সম্মান, পরিবারের আদর্শ ধুলোয় লুটিয়ে দাও, সেটা হবে এমন কলঙ্ক যা স্বীকার করা যাবে না, অস্বীকারও করা যাবে না, কারণ তুমি পুত্র। আমি তো দেখছি এই মেয়েটির যা তেজ, যা বোধ-বুদ্ধি, তোমার তা নেই। রাগ কোরো না, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি এফিমিনেট, তোমার চরিত্র দুর্বল। আমি তোমার ডান পাশে বসে আছি, আর তুমি তোমার বাঁ পাশে সুরঞ্জনার হাত নিয়ে খেলা করছ? ঠাকুর বলতেন, মেয়েরা যতই ভক্তিমতী হোক, তাদের সংস্পর্শে মন টলে যেতে বাধ্য। যুবতী সম্পর্কে ভয়ংকর সাবধানতার প্রয়োজন। নির্জনে তাদের সঙ্গে ধর্মালোচনাও বিপজ্জনক! তোমার এমন দুঃসাহস, আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও তুমি এমন কাজ করতে পারলে? তুমি তো সাংঘাতিক ছেলে!

আমার খুব রাগ হচ্ছিল। টিনের চালে বৃষ্টি পড়ার মতো, চটরপটর এন্তার কথা আমাকে অকারণে দাগরাজি করে দিচ্ছে। আশ্চর্য বরাত আমার! একটু উষ্ণভাবেই বললুম, আমার মনে কোনও পাপ নেই। যে-হাত আমি ধরেছিলুম, সে হাত কোনও মেয়ের নয়, বন্ধুত্বের হাত। সুরঞ্জনার দাদা নিরুদ্দিষ্ট, আমার পিতা নিরুদ্দিষ্ট। দু'জনেরই এক অবস্থা। সেই কথাই হচ্ছিল।

মুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, কথা তো মুখে মুখে হয় মহারাজ। আর হাতে হাতে হয় হাতাহাতি।

আমি বললুম, সুরঞ্জনা আমার কাছে লেখাপড়ায় সাহায্য চেয়েছে। দাদা অঙ্ক দেখিয়ে দিত। আমাকে অনুরোধ করেছে, অঙ্ক বোঝাবার জন্যে।

মুকু বললে, এত শিক্ষক থাকতে তোমাকে কেন? তুমি তো কেমিস্ট্রির লোক। অঙ্কের তুমি কী বোঝো! মেসোমশাই তো তোমাকে উঠতে-বসতে ধমকাতেন। অঙ্কের মাথা তোমার মোটেই ভাল নয়।

মহারাজ বললেন, প্রসঙ্গটা আর এগোতে দেওয়া ঠিক নয়। এটা আশ্রম। তোমাদের ঝগড়া করার প্ল্যাটফর্ম নয়। কী চাও তোমরা? আমার কাজ আছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই।

মুকু বললে, আপনি ওকে ভালবাসেন। আমিও ভালবাসি। একটা কথা ওকে আপনি বুঝিয়ে দিন, সংসারই ওর জায়গা, আশ্রম নয়। চাকরিবাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে থাকলে কেউ খাওয়াবে না। সন্ন্যাসী হওয়া অত

সহজ নয়!

মহারাজ টেবিলে দেহের ভার রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন এতক্ষণ। এইবার চেয়ারে বসলেন আবার। মুখ থমথমে। মুকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার পক্ষে সন্ন্যাস ছাড়া অন্য কোনও পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নয়। যে-পাখি যে-গান গায়, যে-বাদ্যযন্ত্র যেমন আওয়াজ করে! এই ভোগের পৃথিবীতে আমিও একজন গৃহী হতে পারতুম। এই চেয়ারে গেরুয়া পরে বসে না থেকে কোনও এক বড় কোম্পানির চেয়ারে সুট-বুট-টাই পরে বসে থাকার যোগ্যতা আমার ছিল। আমার যৌবনে আমি এক মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলুম। সে আমার ভাগ্য। তিনি আমাকে প্রথম যে-কথা বলেছিলেন, ভারী সুন্দর। বলেছিলেন, পৃথিবীতে একবারই এসেছ, মেয়েদের আঁচল ধরে না ঘুরে, ঈশ্বরের হাত ধরে ঘোরো। হয়তো পাবে না কিছুই, যতই না পাবে, তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা আমার, ওগো ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি, তোমাতে আমাতে হব একাকার। তিনি অনন্ত। অনন্ত হয়েছ, ভালই করেছ, থাকো চিরদিন অনন্ত অপার। ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে, তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর। ভুলায়েছ যারে তব প্রলোভনে, সে কি ক্ষান্ত হবে তব অন্বেষণে? না পায় না পাবে, যায় প্রাণ যাবে, কভু কি ফুরাবে অন্বেষণ তার? এই অন্বেষণই জীবন। চিদানন্দের চেয়ে বড় আনন্দ পৃথিবীতে আর কি কিছু আছে? কিন্তু? একটা মহা কিন্তু আছে, সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য/কামক্রোধাদিনক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য। দুর্বাসনানিগড়ি তস্য নিরাশ্রয়স্য/চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বম্॥ আমি সংসারে দুঃখসমুদ্রে পড়েছি। পড়েছ তো ওঠার চেষ্টা করো। চেষ্টা করব কী? কাম ক্রোধ প্রভৃতি হাঙর কুমির আমায় গিলে ফেলেছে। তাতে কী হয়েছে, বেঁচে তো আছ, নাড়াচাড়া দাও তা হলেই তো ওরা উগরে দেবে। সে তো জানি, কিন্তু আমি যে নিজের দুর্বাসনায় নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছি। অন্যে বাঁধলে নাড়াচাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করা যেত। এ যে নিজেই নিজেকে জড়ানো। তা হলে অন্য কোথাও যাও। কোথায় যাব? আমি যে নিরাশ্রয়। তুমি ছাড়া আর কোনও আশ্রয়স্থল নেই আমার। বেশ, তা হলে আমার চরণ ধরো! প্রভু! আমি বদ্ধ। আমি যাব কী করে! তুমি এসো। এসে তোমার চরণ-তরী দিয়ে আমায় উদ্ধার করো। শ্রীরামকৃষ্ণ মম দেহি পদাবলম্বম্॥ আমি এই জানি। তা তুমি যদি অন্যরকম জানো তো তাই জানো। যার যার জীবন, তার তার জীবন। এখানে তো জোরজবরদস্তির কোনও ব্যাপার নেই। কে তোমাকে সন্ন্যাসী হতে বলেছে! কেনই বা হবে! সৎ গৃহীই হও না। ঠাকুর বলেছেন, গৃহদুর্গে থেকে সাধনভজন, সে তো খুবই ভাল কথা। সকলকেই সন্ন্যাসী হতে হবে এমন তো কোনও কথা নেই। সন্ন্যাসী হতে হলে, তোমাকে অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। সবচেয়ে বড় ত্যাগ হল কামিনীকাঞ্চন। মনে মুখে এক হতে হবে। ভীষণ একটা রোখ চাই। আমাকে পেতেই হবে। মিনমিনে ম্যাদামারা হলে হবে না। হাজার বই, হাজার উপদেশেও কিছু হবে না। ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়েও হবে না। নায়মাত্মা বলহীনে ন লভ্য। কে তোমাকে সন্ন্যাসী হতে বলেছে বাপু।

মুকু বললে, ও চাইছে ওর বাবাকে কপি করতে। ওর কম্পিটিশন তো মেসোমশাইয়ের সঙ্গে। অসম প্রতিযোগিতা! জীবনে যা পারবে না কোনওদিন। শেয়াল কোনওদিন বাঘ হতে পারে, না পারবে?

রাগে আমার গা জ্বালা করছে। মুকু আমাকে একবার করে তুলছে, একবার করে ফেলছে। আছড়ে আছড়ে আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

মুকু বলেই চলেছে, ও ভীষণ নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। ও যে একটা কেউকেটা, জগৎকে দেখাতে চায়। আপনার মতো মহারাজ হবে। সবাই শ্রদ্ধা করবে, ঢিপ ঢিপ প্রণাম করবে। কী? না সন্ন্যাসী হয়েছেন!

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, মুখে আর নয়, এইবার কাজে। এক ঝটকায় নিজেকে বের করে নিয়ে চলে যাব। একজনের পরিবার বললে, অমুক লোকের ভারী বৈরাগ্য হয়েছে, তোমার কিছু হল না! যার বৈরাগ্য হয়েছে, সে লোকটির ষোলোজন স্ত্রী, এক-একজন করে তাদের ত্যাগ করছে। স্বামী নাইতে যাচ্ছিল, কাঁধে গামছা, বললে, খেপি! সে লোক ত্যাগ করতে পারবে না,— একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়? আমি ত্যাগ করতে পারব। এই দেখ, আমি চললুম। সে বাড়ির গোছগাছ না করে, সেই অবস্থায় কাঁধে গামছা, বাড়ি ত্যাগ করে চলে গেল। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। জ্ঞানই হবে আমার আশ্রয়। আমি যদি জ্ঞানী হতে পারি, আমার আচরণে দুটো লক্ষণ দেখা যাবে। আমার কূটস্থ বুদ্ধি হবে। সে বুদ্ধি আবার কেমন বুদ্ধি, হাজার দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-বিঘ্ন হোক— নির্বিকার, যেমন কামারশালার লোহা, যার ওপর হাতুড়ি দিয়ে পেটে। আর দ্বিতীয়, পুরুষকার— খুব রোখ। কাম-ক্রোধ আমার অনিষ্ট করছে তো একেবারে ত্যাগ! কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁদ করে, চারখানা করে কাটলেও আর বার করবে না।

মহারাজ আমার চিন্তাকে টেনে নিয়ে গেলেন, বললেন, বৈরাগ্য দু'প্রকার। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য হচ্ছে হবে— ঢিমে তেতালা। তীব্র বৈরাগ্য—শাণিত ক্ষুরের ধার—মায়াপাশ কচকচ করে কেটে দেয়। এইবার নিজের অবস্থা নিজেই বিচার করো। ফেরিঅলার মতো দোরে দোরে ঘুরো না। প্রচারধর্মী হয়ে সন্ন্যাসের আদর্শকে হাস্যকর করে তুলো না। অবিশ্বাসকারীর সংখ্যা কম নয়।

আমি খুব বিনীতভাবে বললুম, মহারাজ, আজ তা হলে আমরা আসি।

এসো। তোমার চেয়ে এই মেয়েটিকে আমার বেশি ভাল লেগেছে। ভেতরে একটা ফায়ার আছে। কী নাম মা তোমার?

আমার ডাক নাম মুকু, মহারাজ।

বাঃ বেশ সুন্দর নাম।

মহারাজ পর মুহূর্তেই লেখায় মুখ নামালেন। আমি অপরাধীর মতো, মুকু বীরের মতো, বেরিয়ে এলুম দু'জনে। মুকু রাস্তায় নেমে বললে, তোমার কেসটা মোটামুটি ড্যামেজ করতে পেরেছি। মেরামতের বাইরেই চলে গেছে ধরে নাও। এবার একা-একা এলে তোমার যা রিসেপশন হবে, ভাবা যায় না। তবে হ্যাঁ, আমি এলে অন্যরকম হবে। বুঝতেই পারছ, এখন থেকে সংসার ত্যাগ করতে হলেও তোমাকে আমার সাহায্য নিতে হবে। রাম লক্ষ্মণ সীতা, দৃশ্যটা একবার কল্পনা করো। যাঁর কাছে এসেছিলে তাঁর কথাতেই বলি। তোমার তো কিছু মনে থাকে না। ভাসাভাসা পড়া। পড়লে আর ভুললে।

আমরা বেড়াতে বেড়াতে হাঁটছি। গঙ্গার দিকে, ট্রাম ডিপো লক্ষ্য করে। সামনেই কালীবাড়ি। বহু প্রাচীন। সেখানে এক জ্যোতিষী মায়ের সামনে বসে এক মহিলার হাত দেখছেন। আমারও ইচ্ছে করছিল হাতটা মেলে ধরি। মুকু ধমকাবে, কুসংস্কার! বলবে, পুরুষকারই ভাগ্য। বলবে, মেসোমশাই বলতেন, রোজ সকালে পরপর সাত দিন দুটো করে হাফবয়েল চালাও, ভাগ্যবিশ্বাস চলে গিয়ে পুরুষকারে বিশ্বাস ফিরে আসবে।

আমরা এক ঝলক গঙ্গদর্শনের জন্যে জল ঢোকার স্লুইস গেটের দিকে এগিয়ে গেলুম। মুকু বললে, এসো একটু বসি দু'জনে। ধর্ম আলোচনা করা যাক।

জায়গাটা তেমন পরিষ্কার নয়। একটু ইতস্তত ভাব হচ্ছিল। মুকুর শাড়িটা একেবারে পাটভাঙা। আবার এক দাবড়ানি, অত পিটপিটে স্বভাব হচ্ছে কেন? এই নাও ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দিলুম, বোসো।

বসেই পড়লুম, যা থাকে বরাতে! মুকু হাত দুয়েক তফাতে বসল। সূর্য ডুবে গেছে। পশ্চিম আকাশের তলার দিকটা ঘোলাটে। গঙ্গার জলে অন্ধকার গুলছে। নৌকো যাচ্ছে অলস গতিতে, হরি দিন তো গেল-র ছন্দে।

মুকু বললে, শোনো, ছোট মুখে বড় কথা শোনো। জীবাত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া-আবরণ আছে। এই মায়া-আবরণ সরে না গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। পরস্পর মানে জীবাত্মা আর পরমাত্মা। যেমন আগে রাম, মধ্যে সীতা আর পেছনে লক্ষ্মণ। রাম হলেন পরমাত্মা আর লক্ষ্মণ হলেন জীবাত্মা, মধ্যে জানকী মায়া-আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান না। জানকী একটু সরে পাশ কাটালে তখন লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পান। শোনো, আমি হলুম সেই মায়া। তোমার আর তোমার ঈশ্বরের মাঝখানে আমি আঁচল মেলে দাঁড়িয়ে আছি। হয় আমাকে সরতে হবে, না হয়, না হয় কী?

প্রশ্নের উত্তর না-জানা বিব্রত ছাত্রের মতো আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। তা হলে কী?

মুকু অসাধারণ একটা হাসি ছাড়ল। উদাস, মিষ্টি। আমার সতীমা ধ্যান ভেঙে যাবার পর ঠিক এইরকম আধ্যাত্মিক হাসি হাসতেন। মুকু বললে, পারলে না তো সমস্যার সমাধান করতে! বৃথাই হল তোমার পড়া লেখা। খনার মতো তোমাকে আমি সবেতেই হারিয়ে দিচ্ছি। আবার শোনো, ট্র্যান্সফর্মেশন, রূপান্তর, তোমার কেমিস্ট্রিতে আছে। মায়ার দুটো রকম□— বিদ্যা আর অবিদ্যা। তার মধ্যে বিদ্যা মায়া আবার দু'প্রকার□— বিবেক এবং বৈরাগ্য। আর অবিদ্যা মায়া ছ'প্রকার□— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। বিদ্যা মায়াকে আশ্রয় করলে তুমি ঈশ্বরের সন্ধান পেলেও পেতে পারো। আর যদি অবিদ্যা মায়াকে আশ্রয় করো তা হলে বুঝতেই পারছ, আমি আর আমার করতে করতেই মরবে। কামের শেষ নেই। সেও এক ভিশিয়াস সার্কল। এক থেকে আর এক। গীতা নিশ্চয় পড়া আছে? দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাষট্টিতম শ্লোকটা বলো।

আবার হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম, মুখস্থ নেই।

তোমার আর সন্ন্যাসী হয়ে কাজ নেই। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে, মনে পড়ছে?

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোছভিজায়তে।

এই তো, খোকার আমার মনে পড়েছে। এইবার চেনটা মনে করো। বিষয়ের চিন্তা করতে করতে জন্মায় আসক্তি। আসক্তি থেকে কাম, কাম প্রতিহত হলে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে বিবেকনাশ, বিবেকনাশ থেকে শাস্ত্রজ্ঞান লোপ, শাস্ত্রস্মৃতি লোপ, স্মৃতিবিভ্রম মানে সদসদ্‌বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট, বিচারবুদ্ধি গেলে রইলটা কী? পুরুষার্থের অযোগ্য। তা হলে? একটাই পথ। আমার হাতে পায়ে ধরো, প্রার্থনা করো। আমি মায়া, কিন্তু আমি যেন তোমার বিদ্যা-মায়া হই। তা হলে যদি কোনও রাস্তা হয়!

আমি কেমন করে করব? ও তো তোমার হওয়ার ব্যাপার। তুমি হবে। তুমি আমাকে বিবেক আর বৈরাগ্য দেবে।

বিবেক তোমাকে আমি অনবরতই দিচ্ছি আর বৈরাগ্যের পথ খুলে দিয়ে গেছেন মেসোমশাই। তুমি তো মহাভাগ্যবান। সংসারে তোমার কেউ নেই। সব ফাঁকা। তোমার সব বাঁধনই তো তিনি কেটে দিয়েছেন। আর আমি? মুকু খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। বাতাসে চুল উড়ল। কাঁধের কাছে শাড়ির আঁচল কাঁপল। হাসিতে শান-বাঁধানো ব্যঙ্গ।

মুকু বললে, যে করে তোমার আশ তাকে তো তোমার মতোই করে দেবেন ভগবান। তুমি দেবতার মতো পিতা দেখেছ। মহারাজেরও মহারাজ। তুমি সঙ্গমরত পিতা দেখেছ? বয়েসের ভারে স্থবির তবু... মুকু হঠাৎ গান গেয়ে উঠল সুন্দর গলায়,

এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা।
এখনও মরণব্রত জীবনে হল না সাধা॥
কবে যে দুঃখজ্বালা হবে রে বিজয়মালা।
ঝলিবে অরুণরাগে নিশীথরাতের কাঁদা॥
এখনও নিজেরই ছায়া রচিছে কত যে মায়া।
এখনও কেন যে মিছে চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি-আলো চোখেতে লাগাল ধাঁদা॥

গান শেষ করেই মুকু বললে, আই হেট মাই ফাদার। পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পরিচয় মুছে ফেলাও যায় না। এক জরদগব গদগদে মহিলাকে আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে। সে দৃশ্য সারা জীবনেও ভোলা যাবে না। প্রেম এক জিনিস, কাম আর এক জিনিস। একটা স্বর্গীয় আর একটা পাশবিক। একটা আলো আর একটা অন্ধকার। তোমার মধ্যে কাম দেখলে আমার পেটাতে ইচ্ছে করে। চলো, এই সংসারে কিছু নেই, বেরিয়ে পড়ি দু'জনে। যথা বালস্য বেতালো মৃত্যুপর্যন্ত দুঃখদঃ। অসদেব সদাকারং তথা মূঢ়মতের্জগৎ॥ অবশ্যই মানে বুঝলে না। বুঝলে তারিফ করতে। বালকের কল্পনায় আছে ভূত। আমরণ সেই ভূত তাকে ভয় দেখায়। ঠিক সেইরকম অজ্ঞানীর কাছে এই জগৎ এক ভীষণ সত্য। মৃত্যু পর্যন্ত সে এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে। সোমশর্মার পিতার গল্প জানো? জানো না। কেমিস্ট্রি ছাড়া কিছুই জানো না। একমুখী জ্ঞান। অতি দরিদ্র কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। দেশে তখন আকাল, দুর্ভিক্ষ। একমুঠো ছাতু কাপড়ে বাঁধা। কোনওক্রমে সংগ্রহ করেছে। ভীষণ শ্রান্ত। একটা গাছের তলায় এসে বসেছে। ছাতুর পুঁটলিটা খুলে হাতে সব ঢেলেছে। এইবার সেই ছাতুর দিকে তাকিয়ে সে ভাবছে, ছাতুটা সে বিক্রি করবে। যে-পয়সা পাবে সেই পয়সায় সে গোরু কিনবে। ক্রমে গোরুর বংশ বৃদ্ধি হবে। অনেক বলদও হবে। সেই বলদ দিয়ে হবে চাষবাস। ধনে ধান্যে সে তখন বড়লোক। বিশাল বাড়ি, দাস-দাসী। ঐশ্বর্য দেখে সুন্দরী কন্যার পিতা ছুটে আসবে। বিয়ে হবে। একটি ছেলে হবে। ছেলের নাম রাখব সোমশর্মা। প্রিয়পুত্র। তার অনাদর হলেই বউকে মারব এক চড়। হাতের সব ছাতু মাটিতে পড়ে, বাতাসে উড়ে গেল হুস করে। লোকটি তখন বিলাপ করতে লাগল, হা কষ্ট! আমি কী মন্দভাগ্য। এত কষ্টের সংগ্রহ আমার সব ছাতু কোনও কাজেই লাগল না। তখন শাস্ত্রকার বলছেন, অভূতাভিনিবেশেন স্বাত্মানং বঞ্চয়ত্যয়ম। অসত্যপি দ্বিতীয়েছর্থে সোমশর্মপিতা যথা। যা মিথ্যা, যা কল্পনা, তাতে মশগুল হয়ে গেলে আসল জিনিস

হারাতে হয়। সব মিথ্যা। সব ভ্রান্তি। কামুক কী ভাবে জানো, আহা! কী সুন্দর ভুরু, কী সুন্দর নাক, কী সুন্দর মুখ, কী অপূর্ব চোখ, কী মোহিনী হাসি, হাঁচরপাঁচর করে জড়িয়ে ধরলে। আসলে কী, একটা শরীর। তোমার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে কী বেরোবে, হাড়ের খাঁচা, মেদের স্তর, মাংসের প্রলেপ, চামড়ার আস্তরণ, লিভার, পিলে, মল, মূত্র, কফ। অবিদ্যার এই হল প্রভাব। অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি, দুঃখে সুখবুদ্ধি করিয়ে ছাড়ে। মানুষকে উট করে দেয়। কাঁটাগাছ চিবোচ্ছে, রক্ত গড়াচ্ছে দু'কষ বেয়ে। চলো, তোমাকে আজ আকণ্ঠ মদ খাওয়াব।

মদ!

হ্যাঁ মদ। মদ খেলে মানুষের আসল প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আমি পরীক্ষা করে দেখব, তোমার ভেতর ঠিক ঠিক কী আছে? কে আছে?

মুকু ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়ল।

We're always too much out or too much in

মুকু বললে, সময় নষ্ট না করে ট্রামে উঠে পড়ো। শ্যামবাজারে নেমে আমরা একটা ভাল দোকান থেকে বোতলটা কিনব। আজ তোমার পরীক্ষা। দেখতে চাই শয়তান বসে আছে, না দেবতা! কে বসে আছে?

আমি প্রতিবাদ না করে পারলুম না, আমাকে কি তুমি মানুষ-গিনিপিগ ভাবলে মুকু? তোমার মাথার সব স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। কেউ ওইভাবে মদ খায়! বেশি মদ খেলে মানুষ মাতাল হবেই। জানা কথা। ওটা কোনও পরীক্ষা নয়। পাগলামি। আমার এই দুর্দিনে আমাকে নিয়ে আর খেলা কোরো না। তুমি যেন বেড়াল, আর আমি একটা ইঁদুর। তুমি কেমন করে ভাবলে, তোমার পরীক্ষার জন্যে আমি মদ গিলব। আমার একটা মান-সম্মান নেই!

তোমার উচিত নিজেকে চেনা। নিজেকে নিজে ঠকিয়ো না।

তা বলে আমাকে মদ খেয়ে পরীক্ষা করতে হবে?

মদ খেলে কী হয় জানো? আমি দেখেছি। কেউ ভেউ ভেউ করে কাঁদে। কেউ হোহো করে হাসে। কেউ কাঁচা খিস্তি করে। কেউ ভোম মেরে বসে থাকে। কেউ তার ব্যর্থ প্রেমের কথা বলে। কেউ তার দুঃখ ও আশঙ্কার কথা বলে। কেউ পরিবারকে গালাগাল করে। কেউ তার গোপন পাপের কথা বলে গড়গড় করে। কেউ মা মা বলে চিৎকার করে শ্যামাসংগীত গায়। কেউ আবার মেয়েছেলের জন্যে খেপে ওঠে। মানুষের ভেতরটা বেরিয়ে আসে। প্লিনি সেই কোন কালে বলে গেছেন, In vino veritas. Truth is in wine. আমি একবার খুব খেয়েছিলুম। মীরাবাঈ হয়ে সারারাত সে কী নাচ! ময় সে গরজ নিশাত হৈ কিস রূসিয়াহ কো।/ ইক গুনা বেখুদি মুঝে দিন রাত চাহি এ॥ মজা লুটতে মদ খেয়েছে কোন সে মুখপোড়া? দিবারাত্তির একটু ভুলে থাকার জন্যেই মদ খায় গালিব।

মদ নিয়ে ডিবেটের ফাঁকেই ট্রামটা গড়গড় করে ডিপো ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ট্রামের আর কীসের মাথাব্যথা! পৃথিবীর যাবতীয় মূল্যবান সমস্যার মধ্যে আমাদের এই অদ্ভুত সমস্যা পড়ে না। খাওয়া-পরা আর মাথা গুঁজে বেঁচে থাকার সমস্যা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও সমস্যা তেমন পাত্তা পায় না। আত্মার সমস্যা তো শৌখিন সমস্যা! ভরা পেট, নরম বিছানা, গরম ঘর, নিত্যানন্দ সঙ্গী, তখনই ওইসব ভুতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়। আত্মানং বিজালিখ। জানলেই বা কী? না জানলেই বা কী! পাঁয়তাড়া কষতে কষতেই জীবন ফৌত। নচিকেতা যদি এই শতাব্দীতে জন্মাতেন, তা হলে কি মৃত্যুমহারাজের সঙ্গে অমন অপার্থিব আলোচনা হত। রাজার ছেলে ক্যাডিলাক চেপে লাসভেগাসে ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে টমটম। বেলোয়ারি সুন্দরী। মার কাটারি। আত্মা তো আছেই। অবিনশ্বর। পুলিপিঠের মতো। দাঁত বসানো যায় না। পটলের মতো, টর্পেডোর মতো আকৃতি। গেলাও যায় না। যমরাজ বারকক পাগলে উগরে দেন। অতি অখাদ্য। কনসেন্ট্রেটেড মহাজীবন। আত্মা যে দেহের ক্যাপসুলে বৈঠকখানা করেছে, সেইটাই তো সব। একবারের খেলা। একবারই হরিশঙ্করের

পুত্র। একবারই মুকুর সঙ্গে মেলামেশা। কখনও তিরস্কার, কখনও ভালবাসা। সব একবার। অদূরেই কাশীমিত্রের শ্মশান। এই মুহূর্তে সেখানে দাহ হচ্ছে আত্মার খোল। নামরূপ পুড়ছে পড়পড় করে। ছেলে কাঁদছে। মেয়ে কাঁদছে। বউ কাঁদছে। সব একবার। জন্ম একবার। সম্পর্ক একবার। পরের বার যদিও আসি, পিতা হবেন না হরিশঙ্কর। মুকু আসবে না ভালবাসতে। আমি থাকব না, তবে মানুষ থাকবে। অসংখ্য মানুষ। পিতাপুত্রের সম্পর্ক থাকবে। প্রেম থাকবে। প্রেমিকা থাকবে।

ঝটিতি একটা ভাবনার স্রোত বয়ে গেল। আর খ্যাঁস করে একটা মোটরগাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে থেমে গেল। পেছনের জানলা দিয়ে একটা মুখ বেরিয়ে এল।

সর্বনাশ! সুরঞ্জনা!

নিমেষে দরজা খুলে নেমে এল সুরঞ্জনা। গাড়িটা একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাড়াল। খেল দেখাল মুকু। আমি মুকুর ভয়েই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। মুকু প্রায় ছুটে গিয়ে সুরঞ্জনাকে জড়িয়ে ধরল, সুরঞ্জনা, আমার নাম মুকু। আমিই সেদিন তোমার গাড়িতে হামলা করেছিলুম। আমি একটু পাগলি আছি তো। তুমি কিছু মনে কোরো না।

রাস্তার মাঝখানে সুন্দরী সম্মেলন। আমি বললুম, সরে এসো, গাড়ি চাপা পড়বে।

দু'জনে প্রায় জড়াজড়ি অবস্থায় পাশে সরে এল। ফরফর করে দখিনা বাতাস বইছে। সুরঞ্জনার সিল্কের শাড়ির আঁচল উড়ছে। আজ যেন সেদিনের চেয়ে সুন্দরী দেখাচ্ছে। সুরঞ্জনা মুকুর চেয়ে লম্বা। বিলিতি ফিগার।

সুরঞ্জনা বললে, সেদিন খুব রাগ হয়েছিল। এই মুহূর্তে সব রাগ জল হয়ে গেল। তুমি ওঁর কে হও?

মাসতুতো বোন।

তাই নাকি? সেদিন ভেবেছিলুম অন্যরকম। ইন ফ্যাক্ট ওঁর ওপর আমার একটা খুব খারাপ ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কোন অপরাধে তুমি অমন খামচাখামচি করে নামালে?

ওনার মাথায় ঢুকেছে সন্ন্যাসী হবেন। মাঝে মাঝেই বিবাগী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সাধুসন্ন্যাসীদের আখড়ায় গিয়ে পড়ে থাকে। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া হয় না। আর আমরা ভেবে মরি। একে মা-মরা ছেলে, তায় আবার পিতা নিরুদ্দেশ। গত কয়েকদিন বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিল। সেদিন পড়বি তো পড় আমার সামনে। পাছে পালায় তাই চেপে ধরেছিলুম। তুমিই বলো, আমি কিছু অন্যায় করেছিলুম?

অবশ্যই না। তুমি যা করেছিলে আমিও তাই করতুম। এত বড় ছেলে, তার কোনও বোধবুদ্ধি থাকবে না?

তুমিই বলো ভাই, আমাকে বিশাল একটা বাড়িতে একা ফেলে রেখে উনি উধাও হয়ে গেলেন। সেই বাড়িতে আবার ভূত আছে।

একদিন আমাকে নিয়ে যাবে তোমাদের বাড়িতে।

আজই চলো।

আমি যে মহারাজের কাছে যাচ্ছি। তোমরা যাবে না?

আমরা তো ঘুরে এলুম। মহারাজ আজ ভীষণ ব্যস্ত লেখা নিয়ে। মুখ তুলে কথা বলার সময় নেই। কারওকে দেখলেই ভীষণ বিরক্ত হচ্ছেন।

তা হলে?

তা হলে আজ আর বিরক্ত না করাই উচিত।

সুরঞ্জনা আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ ভাবল। শেষে বললে, তোমরা আমাদের বাড়িতে চলো না! আজ বাবা বাড়িতে আছেন, ওঁর পিতার নিরুদ্দেশের ব্যাপারে কথা বলা যাবে। একটা কিছু করা। দরকার তো?

মুকু বললে, তিনি কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?

তিনি তো পুলিশের বড় অফিসার। আমার দাদাকেও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

নিরুদ্দেশের ধুম পড়ে গেছে।

মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কী, যাবে নাকি?

যেতে পারি। আমাদের তো এখন কোনও কাজ নেই।

আমার মতলব অন্য। সুরঞ্জনাদের বাড়িতে গেলে বেশ কিছুটা সময় কেটে যাবে। মুকু যা একগুঁয়ে, আজ রাতে তা না হলে আমাকে মদ খাইয়ে দিদির সামনে একটা কেলেঙ্কারি করিয়ে ছাড়বে।

মুকু বললে, বেশ তা হলে চলো।

সুরঞ্জনা বললে, তা হলে আমি মাকে প্রণাম করে আসি। তোমরা গাড়িতে বোসো।

তুমি এসো না! আমরা এখানেই আছি।

সুরঞ্জনা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল। গাড়িটা রাস্তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

মুকু সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, ভীষণ স্মার্ট মেয়ে। এর প্রেমে তো তুমি পড়বেই। চাবুকের মতো চেহারা। হাত কেন, পায়ে ধরতেও তুমি প্রস্তুত, কী বলো?

আমি সহজে অত টলি না, মুকু।

তাই নাকি মহারাজ? গোল্লা গোল্লা চোখে তো তাকিয়ে আছ?

আমার হঠাৎ মনে হল, আসন না করলে এমন স্লিম চেহারা হয় না।

সব জরিপ করা হয়ে গেছে? ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স?

তোমাকে আমি পারব না মুকু। তুমি আমার মনের আয়না। ধরেছ ঠিক। কী করব বলো? আমি পারি না। বারেবারে হেরে যাই।

এসো আজ আমরা একটা কাজ করি। আমরা গাড়ির ড্রাইভারকে বলে সরে পড়ি। তোমার এই সেতুটাও পুড়ে যাক। মহারাজের কাছে তো তোমার দফারফা করে দিয়ে এসেছি। এটাও শেষ করে দিই। তা না হলে এই আকর্ষণও তোমাকে কিছুদিন ঘুরিয়ে মারবে। এই মেয়েটির নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার ক্ষমতা আছে। এর দেহ-লক্ষণ ভাল নয়।

তোমার ওটাও কি সাবজেক্ট ছিল?

আমার মায়ের কাছে শেখা। হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী। এ তোমার শঙ্খিনী। লম্বা, একহারা। পুরুষালি চেহারা। হাত পা লম্বা লম্বা। বুক তেমন উঁচু নয়। সাপের ফণার মতো গলা। ধারালো মুখ। গাদা গাদা ছেলেকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। বেশ স্বার্থপর। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। যে-কোনও কাজ আদায়ের জন্যে এর ছলাকলার শেষ থাকবে না। এর পক্ষে পরপর তিন-চারবার বিয়ে করাও অসম্ভব নয়।

কোনওদিনই সেই অর্থে সংসারী হবে না। এর খপ্পরে যে পড়বে হয় তাকে আত্মহত্যা করতে হবে, না হয় সারাজীবন কেঁদে বেড়াতে হবে। ধরবে, সব শুষে নিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দেবে। এর আকর্ষণও হবে ভয়ংকর। ভীষণ রাগী। এখন দেখো কী করবে?

যা মনে এল, জ্যোতিষীর মতো গড়গড় করে বলে গেলে। যার এত ভক্তি, মায়ের সামনে বসে যেভাবে কাঁদে, সে কেমন করে ছেলেধরা হয় মুকু?

তুমি কেমন করে মেয়েধরা হলে প্রভু? নিজেই দেখো। তুমি নিজেই কতরকমের। কত রূপ তোমার? চলো ক্লিন সরে পড়ি।

সেটা খুব খারাপ হবে। প্রচণ্ড অভদ্রতা হবে। অশিক্ষিতের মতো কাজ হবে। তোমাকে আজ আমি এই মন্দিরের সামনে বলছি, মা আমার সাক্ষী, তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।

ওদের বাড়ি একবার যাওয়া মানে, তুমি বারেবারে যাবে। তোমার ধর্মকর্ম, লেখাপড়া, জীবন যৌবন সব যাবে।

তোমার মাথা!

এখন আমার মাথা তো! কয়েকদিনের মধ্যেই তোমার মাথা হবে, এইটা তুমি লিখে রাখতে পারো। এই মেয়ে তোমাকে ভালবাসবে না, তোমাকে ব্যবহার করবে, জুতোর মতো, তোয়ালের মতো, চিরুনির মতো, হাত ধোয়ার গামলার মতো, গা রগড়াবার ছোবড়ার মতো। এইবার কী করবে দেখো।

আমরা যাব। আমার পিতার শিক্ষা, ডোন্ট বি ইনডিসেন্ট। কথা দিলে কথা রাখবে। হ্যাঁ বলবে তো হ্যাঁ, না বলবে তো না। ভদ্রতা, সভ্যতা তোমার নিজের অলংকার।

তা হলে চলো। দেখা যাক তোমার বরাতে কী আছে! দেখি ইঁদুর শেষপর্যন্ত কলে পড়ে কি না!

আমাদের গবেষণা থামতে-না-থামতেই সুরঞ্জনা ফিরে এল। সামনে থেকে দেখে একবারও মনে হল না, মুকু যা বললে তা সত্যি হতে পারে! সুস্থ, সবল, চোখা একটি মেয়ে। তরোয়ালের মতো এগিয়ে আসছে। ঝকঝকে মুখ, ঝকঝকে শরীর। কবিতার মতো।

আমি বুদ্ধি করে সামনের আসনে গিয়ে বসে পড়লুম। সুরঞ্জনা কয়েকবার বললে, পেছনে আসুন, পেছনে আসুন। তিনজনে একসঙ্গে বসি। এড়িয়ে গেলুম, ও চক্করে আমি নেই। কোথা থেকে কী হয় কে জানে বাবা! দু'জনের গজর গজর লেখাপড়ার আলোচনা চলেছে। মাঝে মাঝে হাসি হচ্ছে। গাড়ি চলছে। আমি কলকাতার চলমান দৃশ্য দেখছি। সন্ধ্যা নেমেছে। পুটপুট আলো জ্বলে উঠছে। একটু পরে আলোর চোখ আরও ফুটবে। অন্ধকার আরও একটু ঘন হোক।

সুরঞ্জনাদের সাবেক বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। বিশাল বাড়ি। ফটকে মার্বেল স্ল্যাব। লেখা রয়েছে, শান্তিধাম। বড় বাড়ি দেখলে ভয় করে। ভেতরে কোন অহংকারের পরিবেশে গিয়ে পড়ব কে জানে! পুলিশের বড়কর্তা মানে আই পি এস। সায়েবি মেজাজের মানুষ হওয়াই স্বাভাবিক। ড্রেসিং গাউন। মুখে পাইপ কি চুরুট। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। সেই মানুষের স্ত্রীর ঠাট আর ঠমক কেমন হবে তাও তো জানি না।

ভয়ে ভয়ে প্রবেশ। চকমেলানো বাড়ি। মাঝে বাঁধানো উঠোন। লাল রক। ঘর। ঘরের পর ঘর। সবই বেশ পরিষ্কার। ঝকঝকে তকতকে। কোথাও অর্গান বাজছে। গম্ভীর সুরে। চওড়া সিঁড়ি ধাপে ধাপে দোতলায় উঠছে।

লোহার ঢালাই রেলিং। অর্গানের সুর আরও সুস্পষ্ট হল। দোতলার বারান্দা। আমরা এগিয়ে চলেছি। দরজার পর দরজা। সুরঞ্জনা সামনে, পেছনে মুকু, সব পেছনে আমি। বারান্দার বাহার দেখে মুগ্ধ আমি। বড়লোকরা বাঁচতে জানে। বারান্দায় চিক ঝুলছে। গোটানো। প্রয়োজনে নামানো হবে। পেতলের টবে ভাল ভাল গাছ। ফার্ন। পাম। অর্কিডও ঝুলছে ছাড়া ছাড়া। সাদা শ্বেতপাথরের মেঝে। কোথাও এতটুকু দাগ নেই। আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। কী কাণ্ড রে ভাই! ক্রমশই আমি যেন ছোট হয়ে যাচ্ছি। নেংটি ইঁদুরের মতো। এই বাড়ির মেয়ে সুরঞ্জনা? আমি তার আঙুল নিয়ে খেলা করেছি! অল্প অল্প ডিগবাজি খাওয়ার ভাবও হয়েছিল। মিথ্যে কথা বলব না। ইংরেজি ফিল্মের নায়িকার মতো দেখতে যাকে, সে তো টাল খাওয়াবেই।

আমি পায়ে পায়ে শহরের রাস্তায় গাঁয়ের লোকের মতো লম্বা লম্বা বারান্দা ধরে এগোলেও, মুকু একেবারেই স্বাভাবিক। তরতর করে চলেছে। যেন নিজের বাড়ি। এই বাড়ির সঙ্গে মুকুকে বেশ মানিয়ে গেছে। সুরঞ্জনা আর মুকু দু'জনেই সমানে সমান। হঠাৎ আমার মাথায় আর একটা চিন্তা খেলে গেল। সুরঞ্জনার দাদা যদি ফিরে আসেন তা হলে আমি নিজে সম্বন্ধ করে মুকুকে এই বাড়ির বউ করে দেব। যা মানাবে! সাংঘাতিক!

আমরা অবশেষে একটা বড় ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। সামনের দেয়ালে, একেবারে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত লম্বা বিশাল এক পেন্টিং। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। ছবিটি দেখামাত্রই মনে হল নিজের পরিবেশ ফিরে পেলুম। ঘরে খুব কাজ করা পুরু একটা কার্পেট পাতা। কার্পেটে দশ-বারোজন মহিলা বসে আছেন বিভিন্ন বয়সের, ঘর আলো করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির একপাশে মা সারদা, অন্যপাশে স্বামী বিবেকানন্দ। সিলিং-এ একটা ঝাড়বাতি। ঠাকুরের পায়ের কাছে একটা পাথরের বেদি। ধূপ জ্বলছে। ঠাকুরের দিকে মুখ করে লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক উপবিষ্ট। সিল্কের ধুতি উত্তরীয়। একপাশে অর্গানে বসেছেন এক মহিলা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। দেখলেই মনে হয় পাঞ্জাবি। বাঙালির এমন দীর্ঘ ওয়ালনাটের মতো চেহারা কদাচিৎ দেখা যায়। সুরঞ্জনার মুখের সঙ্গে ভীষণ মিল। সুরঞ্জনার মা-ই হবেন। আমরা পা টিপে টিপে প্রায় নিঃশব্দে কার্পেটের একপাশে বসে পড়লুম। আর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল আরত্রিক ভজন, খণ্ডন ভববন্ধন বন্দি তোমায়।/ নিরঞ্জন। নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥ সাদা মার্বেল পাথরের বেদি। সার সার ফিনফিনে লাল গোলাপ। ধূপের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। অর্গানের গম্ভীর সুরেলা আওয়াজ। ইমনে বাঁধা ভজন। দখিনা বাতাস। রমণীয় রমণীকুল। স্বর্গ যেন স্লিপ করে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। আমার একপাশে মুকু, অপর পাশে সুরঞ্জনা। একেবারে সামনে রক্তলাল ব্লাউজ পরা একটি মেয়ে। সামনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। জননী সারদা। বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ। মাথার ওপর টিংলিং ঝাড়। বড় নেশা। জীবনের নেশা। বেঁচে থাকার কারিগরি। সবাই গাইছেন। আমি আর স্থির থাকতে পারলুম না। ধরে ফেললুম নিখুঁত সুরে। কোনও জায়গাতেই ছুট হবার সম্ভাবনা নেই। বহুবার গেয়েছি এই আরত্রিক সংগীত। আমার গলা ডি শার্পে খেলে। এঁরা ধরেছেন সি-তে। আমার কাছে মাখন। ভজন একসময় শেষ হল। ভদ্রলোক আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ধ্যানে। নিশ্চল প্রস্তরমূর্তি। একসময় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। যেন অ্যাটলাস। অর্ধনিমীলিত চোখে একবার তাকালেন সকলের দিকে। খুব ছোট নিটোল চমচমের মতো প্রসাদ হাতে হাতে আমার হাতেও এল। অপূর্ব স্বাদ। ভুরভুরে গোলাপের গন্ধ।

সুরঞ্জনা ভদ্রলোকের সামনে আমাকে হাজির করল। পরিচয় আর কী দেবে! আমার পরিচয় আর কতটুকু জানে। নিজেকেই নিজের পরিচয় দিতে হল। কী-ই বা আমার পরিচয়। আমার পিতার পরিচয়ই পরিচয়। যেই বললুম আমার পিতার নাম শ্রীহরিশঙ্কর, তাঁর কপালে তিনটে ভাঁজ পড়ল।

হরিশঙ্কর! স্কুটিশে পড়তেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বিশাল বুকে আমি এক ঘুঘু। আমার মাথাটা তাঁর বুকের কাছে। এত লম্বা তিনি।

আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, তুমি হরিশঙ্করের ছেলে! হরিশঙ্কর আমার এক বছরের সিনিয়ার। হি নেভার স্টুড সেকেন্ড ইন এনি এগজাম। যেমন অঙ্কে তেমনি ইংরিজিতে। আমি হরিদার কাছে অঙ্ক শিখেছি। হি ওয়াজ মাই টিচার। তুমি আমার গুরুপুত্র।

আমি আর মুকু তাঁকে প্রণাম করলুম।

মেয়েটি কে?

আমার মাসতুতো বোন।

বেশ দেখতে তো। দেবীর মতো। যোগাসন করো?

আজ্ঞে না।

আসন করবে। অ্যান আউন্স অফ একস্ট্রা ফ্যাট। আমি, সুরঞ্জনা, আমার স্ত্রী, আমরা সবাই আসন করি। একটা দিনও ফেল করি না।

সুরঞ্জনার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তাঁকেও প্রণাম করলুম। ঠাকুরঘর ছেড়ে বসার ঘরে এসে বসলুম। দেয়াল দেখা যাচ্ছে না, সবই বই। সুন্দর একটা লাইব্রেরি। ভদ্রলোক ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে এসে বসলেন। মেহগনি কাঠের ঝকঝকে সুন্দর টেবিল। সুন্দর টেবিলে ভীতিপ্রদ একটা জিনিস পড়ে আছে। ভয়ে ভয়ে আমাকে সেদিকে তাকাতে দেখে ভদ্রলোক বললেন, রিভলভার আগে কখনও দেখোনি, তাই না? বড় সুন্দর জিনিস। মসৃণ। শক্তিশালী। ক্লোজ রেঞ্জ থেকে একবার ট্রিগার টিপলেই ভবের খেলা শেষ। আমার দুই সঙ্গী, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আর এই মারণাস্ত্র। দুটোই মুক্তির পথ। জীবন্মুক্তি আর দেহমুক্তি। তোমার চোখের সামনে থেকে এটা সরিয়ে রাখব?

মুকু আমার পাশে বসে ছিল, সে বললে, থাক না। বেশ সুন্দর দেখতে। গুলি কি ভরা আছে কাকাবাবু? মুকু সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলল। মুকুর নিমেষে এই আপন হয়ে যাবার ক্ষমতা তুলনাহীন।

হ্যাঁ মা। লোডেড। তবে লক করা আছে। এখন বলো, হরিদার জন্যে কী করা যায়? সুরঞ্জনা আমাকে বলেছিল তোমার কথা। তবে ও তো আমাকে তখন নাম বলতে পারেনি! হরিদার হঠাৎ কী হল! সে তো জীবনকে ভালবাসত। আমাদের বলত, সমুদ্রে নামলে ঢেউ তো খেতেই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই তো করতেই হবে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমাদের সঙ্গে ব্যায়াম করত। বলত, নড়বড়ে রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম কোনওটাই হয় না। পৃথিবীটা কল্পনার জায়গা নয়, কাজের জায়গা। ঘোড়াকে দেখে শেখো। ঘোড়া কি কবিতা লেখে? অলওয়েজ অন দেয়ার লেগস। ঘোড়ার শোয়া মানেই মৃত্যু। গতি, বীরত্ব, বিশ্বস্ততা এই তিন গুণের চেহারা হল ঘোড়া। আমরা হরিদাকে কখনও বসে থাকতে, গালগল্প করতে দেখিনি। ডে ড্রিমিং-এর ঘোরতর বিরোধী। মহাত্মা গান্ধীর মতো সত্যের পূজারি। বলত, মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ। সেই মানুষের হঠাৎ কী হল!

চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকছে কাজের মহিলা। সুরঞ্জনার মা আমাদের সামনে কাপ রাখতে রাখতে বললেন, শুধুই চা। অন্য কিছু নেই। কারণ যতদিন না আমার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অতিথি আপ্যায়ন বন্ধ।

মুকু বললে, চায়েরই বা কী প্রয়োজন ছিল কাকিমা?

এইসময় আমরা সবাই চা খাই। এটা আলাদা কিছু নয়।

ভদ্রমহিলাকে যতই দেখছি, ততই মনে হচ্ছে বাঙালি নন। মুখের গড়ন, শরীর, গায়ের রং। যদিও খুব সুন্দর বাংলা বলছেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, আমার ছেলের জন্যে সারা ভারতে তল্লাশি চালিয়ে কোনও সুরাহা হল না আজও। নিজের ক্ষমতার ওপর অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে। সেই ছাত্রজীবনে হরিদা আমাকে একটা কথা বলেছিল, আজও সেই কথার জোরে অচল অটল আছি। বলেছিল, নিজের শক্তিকে একটা ওয়ালনাটের মতো হৃদয়ে ধরে রাখবে। বিক্ষিপ্ত ঘটনা যখন উলটে ফেলে দিতে চাইবে, তখন চোখ বুজিয়ে ভেবে নেবে, একটা শক্তির বেল্ট সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তোমার শরীরের নীচের দিক থেকে ওপরে উঠছে। শরীরের এক ইঞ্চিও ফাঁকা থাকছে না। সোজা ওপরে উঠে গিয়ে পেছন দিক থেকে মাথার ওপর ফণা তুলে দুলছে। কী অপূর্ব! ওই প্রক্রিয়ায় আমি যে কী শক্তি পাই, বলে বোঝাতে পারব না। হি ওয়াজ এ যোগী। সেই আজ আমার গুরু। বলেছিল, মনের টালমাটাল অবস্থায় অঙ্ক নিয়ে বসবে। অঙ্কে আর ধ্যানে মন স্থির হয়। মন যত চঞ্চল হবে পৃথিবীকে ততই চঞ্চল মনে হবে। হরিদা বলত, গণিতের মতো পৃথিবীর সব সমস্যাকে বিচার দিয়ে সহজ করে নেবে। যা আসে তাই যায়। কী সুন্দর কথা! জীবনের সামনে, জীবনের পেছনে মৃত্যু। সত্য একটাই, অনস্তিত্ব। তুমি কেন, কেউই থাকবে না। থাকার একটা নির্ধারিত সময়সীমা আছে। না-থাকাটাই অনির্ধারিত আকাশের মতোই অনন্ত। জীবনের হাসা আর কাঁদা কন্ডিশনাল। না-হাসা না-কাঁদাটাই সাধনা। বি নিউট্রাল। হৃদয়বান, হৃদয়হীন, একটা নেগেটিভ, একটা পজেটিভ। হৃদয়টাকে সমর্পণ করে দাও। হিন্দি হাম আর ইংরেজি হিম প্রায় একরকম ধ্বনি। হাম মানে হিম। অ-এ আকার আ মানে আমি। আ থেকে দু’ বর্ণ স্বরপার্থক্যে ই বসে আছে। ই দীর্ঘ হলেই ঈ। ঈতে ঈগল। ঈগলও ঈশ্বর। ইঁদুরের মতো জীবের অহংকার ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। হরিদাকে আমি খুঁজে বের করবই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই জন্মযোগী নিজের জীবনে একাকার করে ফেলেছে। তোমার কাছে তার ছোট ছবি আছে?

আমার মাথা নিচু। এর চেয়ে লজ্জার কী আছে? তাঁর একটা ছবি নেই।

ছবি নেই? ছোটখাটো কোনও ছবি?

আজ্ঞে না। তিনি ছবি তোলাতে দিতেন না।

একটা ছবি রাখোনি? আশ্চর্য। তা হলে অনুসন্ধান হবে কী করে?

আমি ভাবছি নিজেই একবার বেরোব। সব তীর্থস্থান ঘুরে ঘুরে দেখব। আচ্ছা আপনি বলতে পারেন, কোন সে নদী! দু’পাশে পাহাড় শ্রেণি। নদীতে জল নেই। শুধু নুড়ি পাথর। বড় ছোট নানা মাপের। হঠাৎ হুড়হুড় করে জল নামে। কূল ছাপিয়ে যায়। পরক্ষণেই আবার সেই নুড়ি। জায়গাটা খুব শীতল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, মনে হচ্ছে লিডার। পহেলগাঁওতে ওই নদী। পাহাড়ের ওপরে বৃষ্টি নামলেই জলে ভরে যায়। জল গড়িয়ে নীচের দিকে চলে যাবার পরেই শুকনো। কেন বলো তো?

না এমনি। হঠাৎ মনে হল তাই।

হঠাৎ টেলিফোন বাজল। ভদ্রলোক ঝটিতি রিসিভার তুলে বললেন, হ্যাললো।

As face reflects face in water
So the mind of man reflects man.

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কানে রিসিভার। ওপাশ থেকে কোন সংবাদ ভেসে আসছে বোঝার উপায় নেই। তবে সুরঞ্জনার বাবার মুখের চেহারা যেন পালটাচ্ছে। টেলিফোন ধরা বা করার সময় বোঝা যায় নিজের ওপর একজন মানুষের কতটা নিয়ন্ত্রণ। সুরঞ্জনার বাবা শান্ত স্থির, সংযত। শুধু শুনে যাচ্ছেন। কোনও কথা নেই। সব শেষে স্থির গলায় একটি কথাই বললেন, আমি আসছি। ধরে রাখুন।

ফোন নামিয়ে আমাদের কাছে এসে বসলেন। পরিবারের সকলের এমন ট্রেনিং, কেউ কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না, কার ফোন, কী ফোন? সবাই কিন্তু টানটান হয়ে ছিলেন। সকলেই একটি সংবাদের প্রতীক্ষায়। কোথায় সে? নিজের মন দিয়ে অন্যের মন বুঝতে পারি! দূর থেকে যখন দেখি বাড়ির দিকে পিয়ন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন, আমার হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়।

গলা শুকিয়ে আসে। সুরঞ্জনার বাবা কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির হয়ে। আমরা সকলে নীরবে তাকিয়ে আছি তাঁর মুখের দিকে। হয়তো কিছু বলবেন। সুরঞ্জনার মা কাঠের পুতুলের মতো হয়ে গেছেন। সুরঞ্জনার বাবা অবশেষে বললেন, একটা খবর এল। বিলুর ব্রিফকেসটা পাওয়া গেছে।

সুরঞ্জনার মা সামান্যতম উত্তেজনা না দেখিয়ে শান্তভাবে বললেন, আর বিলু?

কোনও সন্ধান নেই। ব্রিফকেসটা খড়্গপুরের লেফট লাগেজে জমা পড়েছিল। টোকেন নাম্বার টু থ্রি। কেসটা কলকাতায় এসেছে। আমি একবার যাই। দিস ইন্ডিকেটস, বিলু আর নেই। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। মোটিভ? হয় নির্ভেজাল ডাকাতি, না হয় কোনও ষড়যন্ত্র। হোয়াটেভার ইট মে বি, বিলু আমাদের জীবনে আর ফিরছে না! ক্লোজড চ্যাপ্টার। ঠিক এই সময় আমি ফিল করছি হরিদার অভাব। হরিদার গিয়ার যদি আমি পেতুম! হিজ ব্যালেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল। তার ডাইভারশন ট্যাকটিক্স। তার বিচার।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু করার নেই। টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি। মানুষের জীবনে কখনও কখনও এইরকম হয়। অন্য পরিবারে না হয়ে আমাদের পরিবারে হয়েছে। দি চপার ফেল অন আস।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সমস্ত বাতাস কে যেন শুষে নিল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সুরঞ্জনার মায়ের মুখে কালো একটা ছায়া দুলছে। সুরঞ্জনা আমার ডান হাত চেপে ধরেছে। হাত বরফের মতো শীতল। এত জোরে ধরেছে, কোনও খেয়াল নেই, মানুষের হাত না লোহা!

আমার ভেতরে আবার সেই বিদ্রোহ, কী হয়? ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে লাভ কী, যে-ঈশ্বর মানুষকে রক্ষা করতে জানে না। শুধু ভক্তি নেবেন, পূজা নেবেন, ত্যাগ নেবেন, বৈরাগ্য নেবেন, দেওয়ার বেলায় কিছুই

দেবেন না! তিনি কি আছেন? সেই অলমাইটি! হিজ লর্ডশিপ। God is dead! Heaven is empty, weep, children, you no longer have a father। একটু আগে যাঁরা অত বিশ্বাস নিয়ে গান করলেন, ধ্যান করলেন, তাঁদের জন্যে একটু ভাল খবর কি আসতে নেই! বিধির বিধান অতি বিচিত্র! এই সংশয়েরও উত্তর আছে। যাঁরা আছেন মহামানবের দলে তাঁরা জানেন। বলবেন, কী জানো, সুখ-দুঃখ দেহধারণের ধর্ম। কবিকঙ্কন চণ্ডীতে আছে যে, কালুবীর জেলে গিয়েছিল, তার বুকে পাষাণ দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু কালুবীর ভগবতীর বরপুত্র। দেহধারণ করলেই সুখ-দুঃখ ভোগ আছে। আবার, শ্রীমন্ত বড় ভক্ত। আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন। সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। আরও আছে, একজন কাঠুরে পরমভক্ত ভগবতীর দর্শন পেলে; তিনি কত ভালবাসলেন, কত কৃপা করলেন। কিন্তু তার কাঠুরের কাজ আর ঘুচল না। সেই কাঠ কেটে আবার খেতে হবে। কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান দেবকীর দর্শন হল। কিন্তু কারাগার ঘুচল না।

হাতে এক ফোঁটা জল পড়ল। তাকিয়ে দেখি সুরঞ্জনার দু'গাল বেয়ে জল নামছে। ফোঁটা ফোঁটা। একের পর এক গড়িয়ে চলেছে। প্রথামতো কিছু বাঁধা বুলি এইসময় মুখে আসতে চায়, ভাবছ কেন? বিচলিত হচ্ছ কেন? মন শক্ত করো। যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। ভাগ্যে যা থাকে তাই হয়। এখনই কেন ভাবছি তিনি নেই? এইসব ফাঁকা ফাঁকা বহু ব্যবহৃত কথা।

সুরঞ্জনা আমার পাশের চেয়ারেই বসে ছিল। ধীরে ধীরে তার মাথাটা আমার কাঁধে নেমে এল। আলতো, আলগোছে। একমাথা চুল, কিছু আমার গালে, কানের কাছে, এক স্তবক আমার বুকের কাছে, রেশমের চামরের মতো দুলছে বুকের কাছে। অদূরেই মুকু। আমার ভয় করছে। আমার শিথিল বাঁ হাত চাইছে সুরঞ্জনার মাথায় উঠে যেতে। সুরঞ্জনার মনের ভাব আমি পড়তে পারছি না।

সুরঞ্জনার মা বললেন, তোমার সঙ্গে আমার বিলুর চেহারার অনেক মিল। মুখটা তো একেবারে কেটে বসানো। ও কেমন করে বলছে, বিলু নেই! ব্রিফকেসটা কেমন করে না-থাকার প্রমাণ হয়! আমি ঠাকুরকে এত ডাকি! তবু আমার এই সর্বনাশ কেন হবে! তিনি আমার কথা শুনবেন না!

সুরঞ্জনার মায়ের মুখ উদাস, বর্ণহীন। কথাগুলো ভাবে বলছেন। স্বগতোক্তির মতল। সুরঞ্জনার বাবা ফুল-ইউনিফর্মে ঘরে এলেন। রিভলভারটা তুলে নিয়ে ভরে দিলেন কোমরের খাপে। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, সরি! তোমাদের সব কথা শোনার সময় আমার হল না আজ। পরে শুনব। আর একদিন এসো। কী করব বলো? বড় বিপাকে পড়েছি।

সুরঞ্জনার মা বললেন, তোমার সঙ্গে যাব?

না, না, তুমি কোথায় যাবে? আগেই খারাপটা ভাবছ কেন? তোমরা বোসো। অন্য প্রসঙ্গ করো।

একেবারে অন্য একজন মানুষ। সেই কোমল ভাব অদৃশ্য। ঋজু, কঠিন। স্প্রিং-এর মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। সুরঞ্জনা এগিয়ে গেল পেছন পেছন। আমি মুকুকে তৎক্ষণাৎ ইশারা করলুম, চলো, আমরাও উঠি।

মুকু হাতের ইশারায় বললে, আর একটু।

সুরঞ্জনার মা উদ্দেশ্যহীনভাবে সারা ঘরটা একবার ঘুরে এলেন, তারপর টেবিলের সামনে দাড়িয়ে বললেন, এখন আমি কী করি? আমার ভেতরটা যে ভীষণ ছটফট করছে। মনে হচ্ছে ফেটে যাবে।

মুকু বললে, জপ করুন। স্থির হয়ে বসে নিরবচ্ছিন্ন জপ!

অ্যাঁ, তুমি তো ঠিক বলেছ! কেমন করে বললে? এইটুকু মেয়ে, তুমি জানলে কী করে? তুমি কি দীক্ষিতা!

আমার একজন গুরু আছেন। তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন আমাদের পরীক্ষা নেবার জন্যে। একলা আমরা পথ হাঁটতে পারি কি না দেখার জন্যে। যাঁর খোঁজে আজ আমরা এখানে কাকাবাবুর কাছে এসেছি। আমার সব শিক্ষা তাঁর কাছে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, ভেতরে আলো জ্বালাতে পারলে বাইরে আর অন্ধকার থাকে না। কোনও দিনই মেঘলা নয়। সেই দিনই মেঘলা যেদিন তাঁকে স্মরণ করা হয় না। একদিন দুপুরে খুব মন খারাপ করে বসে আছি জানলার ধারে, তিনি এসরাজের খোল সেলাই করছিলেন, আমাকে কাছে ডাকলেন, কী হয়েছে তোমার? বললুম, আমার কেউ নেই, থেকেও নেই। আমি অনাথ। তিনি বললেন, তোমার এই বিশ্বাস নেই, পৃথিবীতে কেউ অনাথ নয়? আমরা সবাই রাজা, সেই রাজার রাজত্বে। বলতে পারছ না, যার কেহ নাই তুমি আছ তার? আমারই বা কে আছে? কিন্তু আমি আত্মসমর্পণ করেছি। যথার্থ আত্মসমর্পণ। তিনি আমাকে একটা উদাহরণ দিলেন, জনক রাজার। তিনি অষ্টাবক্রের কাছে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ চাইতে গিয়েছিলেন। উপদেশলাভের পর জনকরাজা যখন ফেরার জন্যে ঘোড়ায় চড়তে যাচ্ছেন, এক পা জিনের পাদানিতে রেখেছেন, সেই সময়ে অষ্টাবক্র বললেন, কই, আমার গুরুদক্ষিণা দিলে না যে! জনক বললেন, আমার সর্বস্ব আপনাকে দিলাম। আমার রাজ্য, আমার বলতে যা কিছু আছে সব, এমনকী নিজেকে পর্যন্ত গুরুদক্ষিণারূপে আপনাকে দিলাম। অষ্টাবক্র সে দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। রাজা জনক এক পা পাদানিতে রাখা অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন, ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর অষ্টাবক্র তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হল, ঘোড়ায় উঠছ না কেন? মিথিলায় ফিরবে না? জনক বললেন, যাই কী করে? আমার সর্বস্ব তো আপনাকে সমর্পণ করেছি, আমার নিজের বলতে কিছুই তো নেই। কাজেই নিজের ইচ্ছা বলতেও কিছু নেই আর। ঘোড়ায় চড়ার ও মিথিলায় ফিরে যাবার শক্তিই আমার নেই। অষ্টাবক্র তখন জনককে সব ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমার হয়ে তুমি রাজ্যশাসন করো। এরই নাম যথার্থ আত্মসমর্পণ! তুমি সব দিয়ে দাও তাঁকে, দেখবে তোমার সবকিছু ফিরে আসবে। কেউ নেই মানে? তিনি আছেন, ভয়ংকরভাবে আছেন। আছ অনল-অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর-সলিলে গহনে/ আছ বিটপী-লতায় জলদেরি গায় শশী-তারকায় তপনে॥ অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে। সে পায় তোমার হাতে। শান্তির অক্ষয় অধিকার। কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে। শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে। আপন ভাণ্ডারে।

মুকু হুহু করে কেঁদে ফেলল। এ কী ভাব! সুরঞ্জনার মা মুকুকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে। তিনিও কাঁদছেন। অপূর্ব দৃশ্য। অপরাধীর মতো আমি একপাশে চুপ। অপরাধী, কারণ আমার চোখে এক ফোঁটা জল নেই। আমার পিতার প্রসঙ্গে দু'জনে কাঁদছে। আমি কেন কাঁদতে পারছি না? আমি কি এমনই পাষণ্ড! সুরঞ্জনা ঘরে ঢুকল। আমার পাশে এসে ফিসফিস করে বললে, কী হয়েছে?

উত্তর দিতে গিয়ে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। পুঁটলির মতো কী একটা আটকে গেল স্বরযন্ত্রে। জল আসছে চোখে। দীর্ঘ খরার পর বহুকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ। সুরঞ্জনা অবাক হয়ে বললে, কী হল আপনাদের?

অতি কষ্টে বললুম, কিছুই হয়নি। তেমন কিছু নয়।

সুরঞ্জনা এগিয়ে গিয়ে তার মায়ের পিঠে হাত রেখে বললে, তুমি কেঁদো না মা। শরীর খারাপ হবে। আবার তুমি বিছানায় পড়বে।

মুকু একপাশে সরে গিয়ে চোখ মুছল। ভারী গলায় বললে, আমরা তা হলে আসি আজ?

সুরঞ্জনা বললে, এখনই যাবে?

আমরা এখন বেরোলে বাড়ি পৌঁছাতে রাত দশটা বাজবে। আমাদের দিদি একলা আছেন। কাল আমরা খবর নোব। আমার গভীর বিশ্বাস, দাদা ফিরে আসবেন।

লুকিয়ে থাকার তো কোনও কারণ নেই।

হয়তো আছে, আমরা জানি না। আমার মেসোমশাইয়ের অদৃশ্য হবার কারণ কী? কেউ জানে না। আমরা রাস্তায় নামলুম। মুকু বললে, সুন্দর পরিবার! তবে কোথাও একটা পাপ লুকিয়ে আছে। সুরঞ্জনার মা মনে হয় মারাঠি মহিলা। সুরঞ্জনার বাবা তাঁর দ্বিতীয় স্বামী। এই পয়েন্টে একটা গোলমাল আছে।

তুমি একেবারে সবজান্তা। বিকেল থেকে খুব অকাল্ট পাওয়ার দেখাচ্ছ। তোমার অত ক্ষমতা নেই।

এটা অলৌকিক ক্ষমতা নয়, চোখ। চোখ খোলা রাখলে তুমিও দেখতে পেতে।

কী দেখতে পেতুম?

একটা গ্রুপ ফটো। ছবিতে সুরঞ্জনার মা, আর একজন ভদ্রলোক ও একটি শিশু। ওই শিশুটি হল সুরঞ্জনার দাদা। প্রথম পক্ষের ছেলে।

তোমার শার্লক হোমস হওয়া উচিত ছিল।

পিয়োর ডিডাকশন মাই ডিয়ার ওয়াটসন।

ট্রাম ট্রাম বলে মুকু ধড়ফড়িয়ে ছুটল। রাতের প্রায়-খালি ট্রাম। আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলুম। একটু শীত-শীত ভাব। মুকু পাশে থাকায় বেশ একটা নির্ভরতার ভাব আসছে। মনে হচ্ছে, মায়ের একটু হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছে ছেলে। পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ নিজের জীবন বয়ে বেড়ানো। সামনে কত চড়াই উতরাই। কত বছর যে হাঁটতে হবে। চোখ বুজিয়ে ভাবছি। হঠাৎ এক চিমটি, ঘুমোচ্ছ কেন?

ঘুমোইনি তো! ভাবছি!

সুরঞ্জনার দাদা হল প্রথম পক্ষের ছেলে। তিনি তাঁর বাবার কাছে ফিরে গেছেন, কারণ সেই মানুষটি মহারাষ্ট্রের কোনও শহরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন! এক নারীর বিশ্বাসঘাতকতায় সমস্ত নারীর প্রতি তাঁর ঘৃণা! মেয়েদের সাধারণত মাথার ঠিক থাকে না। জানো তো, আবেগও একটা বেগ।

মুকু হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার চশমা?

আমার চশমা? চশমা আমার চোখে নেই? চোখে হাত দিলুম। ফাঁকা।

তোমার চোখে চশমা আছে কি নেই বুঝতে পারছ না?

তাই! তাই ভাবছি, আলোগুলো কেমন যেন ছেতরে গেছে। মানুষের মুখগুলো বড় বড় আর অন্ধকার।

কোথায় ঘুচিয়ে এলে প্রভু!

এখন মনে পড়ছে। তখন চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখ মোছার জন্যে চশমাটা খুলে টেবিলেই রেখে এসেছি।

বেশ করেছ। আবার নামো। আবার ফিরে চলো। একটা কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে হয়! বিরক্তি!

ট্রাম আট-ন'টা স্টপ চলে এসেছে। আমরা নেমে পড়লুম। উলটো দিকের ট্রাম ধরে আবার সুরঞ্জনাদের বাড়িতে। সদর দরজা বন্ধ। কলিং বেল টিপে দাঁড়িয়ে আছি। সুরঞ্জনাই দরজা খুলল। বেশবাস পালটে গেছে। আমাদের দেখে অবাক, কী হল? ফিরে এলেন?

আমার চশমা, আপনাদের ওপরের টেবিলে। যদি দয়া করে এনে দেন।

ভেতরে আসবেন না?

আর না। সেই কোথা থেকে ফিরে আসছি!

ছি ছি, আমারই লক্ষ করা উচিত ছিল।

মুকু বললে, যার চশমা তারই যদি খেয়াল না থাকে, আমরা কী করতে পারি। ফ্যাশনের চশমা। সুরঞ্জনা চলে গেল। দরজার মাথার ওপর ঘষা কাচের শেডে আলো জ্যোৎস্নার মতো ছড়িয়ে গেছে। আমরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বাড়িটা বড় বেশি নির্জন। যেন সব ঘটনা থমকে গেছে! একটা গাড়ির হেডলাইট আমাদের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। বাঁক নিচ্ছিল। দরজার সামনে এসে থামল। পেছনের দরজা খুলে সুরঞ্জনার বাবা নামছেন। মুকুর কী হচ্ছে জানি না। আমি পাথর হয়ে গেছি। কী খবর বাড়িতে ঢুকছে কে জানে!

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে অবাক হলেন, কী ব্যাপার! তোমরা দাঁড়িয়ে?

মুকু বললে, কাকাবাবু, কী খবর?

মুকুর পিঠে হাত রেখে হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, ওটা আমার ছেলের ব্রিফকেস নয়, নামটা যদিও এক। ভেতরের কন্টেন্টসও সব অদ্ভুত। সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। বিলু স্মোক করে না। একটা ময়লা রুমাল। কিছু চিঠি। ছোট্ট একটা নোটবুক। লোহালক্কড়ের হিসেব। একই নাম আর টাইটেলের কত লোক আছে।

সুরঞ্জনা এসে গেছে। হাতে চশমা। মুকু বললে, কী বলেছিলুম সুরঞ্জনা? ওটা দাদার ব্রিফকেস নয়। আমি একটা কথা বলব কাকাবাবু?

বলো মা।

কিছু মনে করবেন না?

কেন করব?

দাদাকে খোঁজ করুন তাঁর বাবার কাছে।

ভদ্রলোক একেবারে স্তব্ধ। সুরঞ্জনা চশমাটা এগিয়ে দিল আমার হাতে। হাত কাঁপছে।

ভদ্রলোক নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললেন, তুমি এই সিক্রেটটা জানলে কী করে মা? কেউ বলেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা গ্রুপ ফটো। দেয়ালে ঝুলছে।

উঃ, তোমার সাংঘাতিক অবজার্ভেশন! কিন্তু দ্বিতীয়টা? কী করে বললে সেখানেই গেছে?

কাকাবাবু, আমার ইনটিউশন।

তুমি আজ আমাকে মস্ত বড় একটা কিউ দিয়ে চলে গেলে। চলো, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।

না কাকাবাবু, সে অনেক দূর। আমরা লজ্জায় মরে যাব। আপনাকে আবার অতটা পথ ফিরে আসতে হবে। আমরা এমনিই বেশ ফিরে যেতে পারব। তেমন বেশি রাত হয়নি কাকাবাবু!

তুমি কি পড়ছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এম এ দিচ্ছি, ফিলজফিতে।

তোমাকে আমি বলে রাখছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে পরীক্ষা দিয়ো। তুমি খুব শাইন করবে। তোমার মতো বাঙালি মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি।

আমাদের বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেল। সদর দরজা বন্ধ। ওপরের ঘরে একটা মাত্র আলো। সদরের কড়াদুটো বিশাল বালার মতো। তাইতে আবার নানা কারুকার্য। একবার মাত্র নাড়তেই দিদির গলা পাওয়া গেল।

দরজা খোলামাত্রই আমরা অবাক, দিদি হঠাৎ মন্ত্রবলে ছেলে হয়ে গেলেন নাকি? বিশাল বড় নাক। ঝোলা গোঁফ। ইনি আবার কে? খাকি ইউনিফর্ম। প্রশ্ন করার আগেই তিনি বললেন, রাখলে ভেতরে থাকব, তাড়িয়ে দিলে রকে রাত কাটাব। লোক খারাপ নই, তবে একটু চরিত্রদোষ আছে। এখন যেমন বিধান দেবেন, আপনারাই মালিক।

আমি তো আমি, মুকু পর্যন্ত হতভম্ব। এ আবার কে? শরীরে নাকটাই যার সর্বস্ব। যেন ভগবান ম্যানুফ্যাকচার করার সময় গন্ডারের ওয়ার্কশপ থেকে একটা নাক এনে ফিট করে দিয়েছেন। মুকু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে ভাই?

মানুষের স্যাম্পলটি হাসলেন! অসম্ভব ঝকঝকে দু'সার দাঁত। বললেন, আমি মনে হয় ঠিক ভাই নই। ভাগনে হতে পারি। আপনারা আমার দূর সম্পর্কের মামা আর মামি!

মুকু বললে, মামি কী করে হলুম? মামি তো এমনি এমনি জন্মায় না! মামা হতে পারে। মামি হতে হয়। কোনও এক মামাকে বিয়ে করলে তবেই মামি হওয়া যায়। অবিবাহিতা মামি হয় না!

দিদির কাছে, তোমাদের দিদির কাছে আমি সব শুনে নিয়েছি। ছেলেমানুষের মতো হইহই করে নেচে উঠল। মামার তুমি মামি হবে। আমি সব শুনে নিয়েছি।

মামার মামি হবে কী রে! বলো, মামার বউ হবে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না, এই বড় খোকাটি কে? মুকু পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেল। আমি পড়লুম মহাবিপদে। লোকটি খপ করে আমার হাতদুটো ধরে ফেলল। সাংঘাতিক জোর। তেমনি খসখসে। হাতদুটো ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, বলো মামা, তুমি আমাকে চরণাশ্রয় দিলে?

ভয় পেয়ে গেলুম, আশ্রয় মানে, কতদিনের আশ্রয়! শক্ত গলায় বললুম, ওপরে চলো। আগে জানা দরকার তুমি কে? হঠাৎ কোথা থেকে এলে? কেনই বা এলে?

এটা কোনও কথা হল? মাকে ছেড়ে ছেলে থাকতে পারে? যেখানে মা, সেইখানেই ছেলে।

কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে ওপরে এলুম। দোতলার সিঁড়ির ওপরের ধাপে বাইশো বাইশ একটা বুট জুতো, মালিক অবশ্যই ওই ছেলেটি। ছেলে বলব, না লোক বলব? বয়েস তো বুঝতে পারছি না! মুখ বলতে

তো নাক, আর কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো গোঁফ!

ওপরে এসে বুঝতে পারলুম, দিদি কেন নীচে নামেননি। ময়দা মাখছেন। ঠেসছেন তো ঠেসছেন। মুকু রাস্তার কাপড়ে রান্নাঘরে ঢুকবে না। আমার পিতার নির্দেশ। রান্না মানে পুজো। সবার আগে কাপড় ছাড়তে চলে গেছে। আমাকে দেখেই দিদি উঠে পড়লেন। আমার খুব কাছে এসে বললেন, ছাতের সিঁড়ির কাছে চলো।

অন্ধকারে তিন-চার ধাপের মতো ওপরে উঠে গেলুম। একটা খুরি ছিল কোথাও। গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেল। দিদি আমার খুব কাছে সরে এসে বললে, ভাই, আমি বড় অপরাধী! আমার ভীষণ লজ্জা করছে। পাগলটা খুঁজে খুঁজে ঠিক এখানে চলে এসেছে। এখন কী উপায় হবে ভাই?

এ কে?

আমার মতোই এক অভাগা। এর মায়ের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না। এ যখন বছর তিনেকের, মা ফেলে পালিয়েছিল। মিশনারিদের অরফ্যানেজে মানুষ। ও আমাকেই মা বলে জানে! ওর অনেক গুণ! বলে, আমি হলুম মানুষ কুকুর। এঁটোকাঁটা খেতে পারি। রাস্তার ধারে ঘুমোতে পারি। নর্দমার জল খেতে পারি চকচক করে। আর আমাকে যে ভালবাসে তার জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পারি। স্কুলে দরওয়ানের কাজ করে। আজ তোমরা চলে যাবার পর এসে হাজির। বলে, কুকুর তো, গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছি। এখন লাথি মেরে তাড়াও, আমি বসে থাকব। মাকে ছেড়ে থাকি কী করে! কী করব ভাই! আমি তাড়াতে পারলুম না! পাগলকে বোঝাই কী করে, আমার নিজেরই চালচুলোর ঠিক নেই। আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাক।

মাথা কি খুব খারাপ? একেবারে পাগল?

না, অল্প ছিটিয়াল! যা বলবে তাই করবে। গাধার মতো খাটতে পারে। রুগির মাথার কাছে বসে সারারাত জাগতে পারে। নিজের মুখের খাবার অপরকে তুলে দিতে পারে। লক্ষ গালাগাল দাও হ্যা হ্যা করে হাসবে। রাগ নেই, মানসম্মান বোধ নেই।

কী নাম?

গগন!

রান্নাঘরের কাছ থেকে গগনের গলা এল, কোথায় গেল সব? আঁচ বইছে! ময়দার তাল পড়ে আছে। গেল কোথায়? মা!

দিদি তাড়াতাড়ি তিন ধাপ নেমে গিয়ে বললে, এই তো আমি। ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছিস কেন?

তুমি থেকে থেকে কোথায় যাও মা! আঁচ বইলে কয়লা পোড়ে তা জানো কি?

জানি বাবা।

করবে লুচি আলুর দম, সেই সন্ধে থেকে খুচুর খুচুর করছ। সরো তো, আজ আমি রাঁদি! আমার। রান্নার বহুত সুনাম! আমি থাকতে তুমি কষ্ট করবে কেন?

ঠিক সেই সময় মুকু এসে হাজির। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, একী একী, রান্নাঘরে কেন? এটা মেয়েদের এলাকা। হাত ধোয়া নেই, পা ধোয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, খাওয়ার জিনিসে হাত!

গগন নিচু হতে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখে স্বর্গীয় হাসি, মাইমা, তুমি আমার গুরুজন, রাগ কোরো না, তোমার একটু ছুঁচিবাই আছে। সামনে এটা কী দেখছ? আগুনে পড়লে সব শুদ্ধ। পচা মড়া, টাটকা মড়া,

জ্যান্ত মড়া, চিতায় ফেলো, পরিষ্কার ছাই। তুমি দাঁতও মাজতে পারবে সেই ছাই দিয়ে! তুমি জানো কি, রোজ আমি দশটা করে তুলসীপাতা খাই!

দিদি এক ধমক লাগালেন, মুখে মুখে তর্ক করছিস? যা বাইরে যা। ঘর থেকে বেরো।

তর্ক করব কেন, ব্যাপারটা বুঝে নিচ্ছি। ছুঁচিবাই থাকলে হাতের আঙুলে হাজা হয়।

মুকু বললে, আমি মুখে মুখে তর্ক, বাজে কথা, ফাজলামো একদম সহ্য করতে পারি না। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাকে আমি বেরোতে বলেছি, বেরোবে। বেরিয়ে আসবে এক কথায়।

গগন এইবার খেপা খোকা হয়ে গেল, না আমি বেরোব না! আমি রান্না করব। তোমাকে খাওয়াব।

মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, বেআদবটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও।

মুকুর সম্পূর্ণ অন্য চেহারা! মুখ থমথমে, যেন দ্বিতীয় হরিশঙ্কর। এ নির্দেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুর মতো জেদি এক যুবক। দুর্গার মতো এক শক্তি। দিদি এক কোণে মহা অপরাধী।

মুকু বললে, কাজটা তা হলে আমাকেই করতে হয়, কারও মুরোদে যখন কুলোচ্ছে না!

মুকু যেই এগোতে গেল, দিদি ছুটে এল, আমি আমি। আমি ঝেঁটিয়ে বের করছি।

দিদি যেই ঘুরতে গেল, আঁচলটা ঝপ করে উনুনে পড়ল। গনগনে আঁচ! দপ করে আগুন ধরে গেল।

If one calls you a donkey, ignore him
If two call you a donkey, check for hoof prints
If three call you a donkey, get a saddle.

আগুন আগুন, বলে ধেইধেই করে আমি একটা বাঁদর নাচ নাচলুম। তারপর এক লাফে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম। মুকু এক ধাক্কা মেরে আমাকে নিজের অজান্তেই সাহায্য করল। যে-থালায় ময়দার তাল, তার পাশেই বিশাল এক ঘটিতে জল ছিল। দিদির আঁচলে আগুন তখন সাপের মতো কিলবিল করছে। চুল পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে। মুকুর হাতে ঘটি। দিদি দু'হাত তুলে সতীদাহের সতীর মতো স্থির। পুরো ঘটির জল দিদির গায়ে ঢেলে দিল মুকু। তারপর দু'হাতে জাপটে ধরে মেঝেতে উলটে পড়ে দু'জনে গড়াগড়ি, জল সপসপে মেঝেতে। গগন কোথাও কিছু নেই, একটিন ময়দা উপুড় করে দিল দু'জনের গায়ে। দুটো বিশাল আকারের পুলি পিঠে যেন মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। আগুন যখন নিবে গেছে, তখন আর ভয় কী! আমি বীর দর্পে ঘরে ঢুকলুম। আর মোচার খোলার মতো সড়াক করে হড়কে পড়ে গেলুম। জলেতে ময়দাতে যে মেঝেটা এত পিচ্ছিল হয়ে আছে, আমি ভাবতেও পারিনি। গগন ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিতে দিতে সুর করে বলতে লাগল, পড়েছে পড়েছে। উলটে তো পড়েছে। মনে হচ্ছে, উঠে কষে এক থাপ্পড় লাগাই। ও হতভাগার জন্যেই এত কাণ্ড। দুটো মেয়ে এখনই পুড়ে মরত।

মুকু উঠে বসেছে। দিদি ওঠার চেষ্টা করছে। দু'জনকেই বৃদ্ধার মতো দেখাচ্ছে। মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, তোমার লজ্জা করে না! তখন ভয়ে পালাচ্ছিলে, এখন চালাকি করতে এসেছ। তুমি এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। তোমাকে দেখলে আগুনে পোড়ার চেয়েও শরীর জ্বলে উঠছে। তুমি এত স্বার্থপর! আত্মপর! কাপুরুষ! ওপরচালাক! দয়া করে ওই পাঁঠাটাকে নিয়ে ঘরের বাইরে যাও। গেট আউট ফ্রম হিয়ার। কাওয়ার্ড। নিনকমপুপ!

কতটা পুড়ল একবার দেখি। ফার্স্ট ডিগ্রি, না সেকেন্ড ডিগ্রি? হসপিট্যালাইজ করতে হবে কি?

তোমাকে আর ডিগ্রি দেখতে হবে না। দয়া করে সরে পড়ো। যা করার আমি করব।

রাত তখন প্রায় বারোটা। অগ্নিপর্ব শেষ করে মুকু ঘরে ফিরে এল। খাওয়াদাওয়া মাথায় উঠেছে। দু'জনেই অল্পবিস্তর পুড়েছে, তবে তেমন মারাত্মক নয়। দেহের চেয়ে মন পুড়েছে বেশি। বিশ্রী একটা এলোমেলো কাণ্ড। কোথা থেকে একটা চটাস চটাস শব্দ আসছে কানে। মুকুর মুখ ভয়ংকর গম্ভীর। তবু সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, শব্দটা কীসের?

গিয়ে দেখে এসো। আমি জানি না।

মুকু সোফার ওপর গোঁজ হয়ে বসল। বাইরে থেকে গগনের গলা ভেসে এল, একে খাওয়াদাওয়া নেই, যেটুকু রক্ত ছিল সব শালা মশায় শুষে নিলে। এরা মাছের চাষ না করে মশার চাষ করেছে। বাড়িটা দেখছি পাগলের আখড়া!

আমি হেসে ফেললুম। মুকু উঠে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এল।

কী করলে? এ যে চরম অভদ্রতা! দিদি কী মনে করবে!

মনে করুক। আমি সেইটাই চাই। এ বাড়িটা মগের মুলুক নয়। ভবিষ্যতে এই বাড়িটা আশ্রম হবে। এটা পাগলা গারদ নয়। অনাথ আশ্রম নয়।

তোমার হঠাৎ মন ঘুরে গেল কেন?

কারণ আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। একের পেছনে আর এক, তার পেছনে আর এক আসবে। আমার গভীর সন্দেহ, এই পাগলটা তোমার দিদিরই ছেলে। ভদ্রমহিলা ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন।

নিজের ছেলে থাকলে কেউ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় না। ছেলের ওপর নির্ভর করে নিজেই সংসার পাতে। আমার পিতারও ছেলে আছে, কিন্তু তিনি আজ পথে পথে ঘুরছেন। ছেলের ওপর কীসের ভরসা?

মেসোমশাইয়ের ওটা স্পিরিচুয়াল ক্রাইসিস। তিনি বেরিয়েছেন অন্বেষণে। পরমার্থের সন্ধানে। আমাকে প্রায়ই বলতেন, পাহাড় আমি ভালবাসি। ভালবাসি নদীর উৎসমুখ। হরিদ্বার আমার প্রিয় জায়গা। শ্রবণনাথ ঘাট, হর-কি-পৌরি, কংখল, নিরঞ্জনী সাধুদের আখড়া। চণ্ডীপাহাড়। অলকানন্দা। মৃত্যু আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে। ভাগ্য আমার প্রিয়জনদের একে একে কেড়ে নিয়েছে। সন্তানটিকে স্বাবলম্বী করাই ছিল আমার শেষ কর্তব্য। করেছি। এইবার শিকল কাটার সময়। সময় হয়েছে নিকট, এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। এর সঙ্গে ওটাকে এক করে ফেলো না! সংসার হরিশঙ্করের পক্ষে একটা অত্যন্ত ছোট জায়গা। তোমার এই মহিলাটি মোটেই সুবিধের নয়। এই ছেলেটির জন্মবৃত্তান্তে গভীর কোনও রহস্য লুকোনো আছে। দিদির মুখের সঙ্গে অনেক মিল। পিতার পরিচয় ছেলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, একমাত্র মা-ই বলতে পারে পিতা কে?

তুমি কী বলছ মুকু?

ঠিকই বলছি পিন্টু। তুমি সর্ব অর্থে একটা গবেট।

যাই হোক, আমাদের একটা কর্তব্য আছে। কোথায় শোবে, কী খাবে, দিদির যন্ত্রণা হচ্ছে কি না?

যেখানে খুশি শোবে। বাড়িতে শোয়ার জায়গার অভাব নেই। আর খাওয়া! একদিন উপোস করলে মানুষ মারা যায় না। ঘড়া ঘড়া জল আছে, তাই খাবে।

শোয়ার জায়গাটা ঠিক করে দিয়ে এসো।

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হাত দুটোর কী অবস্থা দেখেছ! আমার গালেও আগুনের আঁচ লেগেছে। তোমার যদি অতই চক্ষুলজ্জা, নিজে গিয়ে বিছানা পেতে শুইয়ে দিয়ে এসো। পদসেবা করতে চাও তো, তাও করে এসো।

আমি গুম মেরে গেলুম। এরপর আর আমার কিছু করা চলে না। যা হয় তোক। আমি পরিস্থিতির কাছে একেবারে বিকিয়ে গেছি ব্যক্তিত্বের অভাবে। কোনও স্বাধীনতাই আমার নেই। এ বলছে ওই করছি, ও বলছে এই করছি। আমিও এক চরিত্রহীন। আমার পিতার ভাষায় ক্রিস্ট্যালাইজড ইডিয়েট। সংসারের বাইরে

আশ্রমজীবনই আমার ভাল। আটকে গেছি তো গেছিই। দাঁড়ের চন্দনা। পায়ে রিং লাগানো। সোনার শেকলও শেকল। বিষয়ের কথা ছেড়ে দিলে, লোকে বলে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। ঈশ্বরের কথা বললে, বলে ভণ্ড। বিষয়ী লোক দেখলে পালাতে ইচ্ছে করে। সংসারে পঁচিশ বছর হল, সব ফক্কাবাজি। সব অসার। সব দু'দিনের জন্যে। সংসারে আছে কী? আমড়ার অম্বল, খেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আমড়াতে আছে কী? আঁটি আর চামড়া, খেলে অম্লশূল। কোথাও এতটুকু শান্তি নেই, নির্জনতা নেই। সবাই হটটেম্পার। বন্ধ দরজার বাইরে হঠাৎ খঞ্জনি বেজে উঠল, সঙ্গে হেঁড়ে গলা, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। মুকু সঙ্গে সঙ্গে টানটান। মুখ লাল। এইবার কী হয় কে জানে! দু'পালটা গাইতে-না-গাইতেই, ধড়াধ্ধড় মারের শব্দ। লাঠি দিয়েই পেটাই হচ্ছে। গান থেকে কান্না, মা আর মেরো না। মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন করতেন আর কাজি ধোলাই দিত। তুমি কি মা সেই কাজি! বিধর্মী খ্রিশ্চান। আর মেরো না মা। তুমি কি নালিকুল থানার বড় দারোগা? মার থামছে না। হরেক রকম আওয়াজ। বেশ খেলিয়ে মার চলেছে। মুকু ঝড়াক করে উঠে পড়ল। সোজা এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দু'জনেই বেরিয়ে এলুম। ছাতে ওঠার সিঁড়ির ধাপে দু'হাতে মাথা ঢেকে বসে আছে গগন। পাখার হাতল দিয়ে দিদি পেটাচ্ছে। মারে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এলোপাথাড়ি চলছে। দিদির পরনে কোনও শাড়ি নেই। সায়া আর ব্লাউজ। দৃশ্যটা হজম করা শক্ত। এলো চুল। মুকু এক ঝটকায় পাখাটা ছিনিয়ে নিল। ছুড়ে ফেলে দিল দোতলার বারান্দা থেকে নীচে। পাখাও পাখা মেলে। মুকুর পরবর্তী আক্রমণ হল খঞ্জনির ওপর। একটানে গগনের কোল থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে, তারও সেই এক দশা করে দিল। সোজা বাগানে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে। আঁচলটা কোমরে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললে, এইবার? আর কী কী খেলা তোমরা দেখাতে চাও? সারারাত আমরা জেগে থাকি ক্ষতি নেই, পাড়ার আর পাঁচটা মানুষ একটু ঘুমোবে তো? না তাও তোমরা দেবে না? এটা গ্রাম নয়, শহর! একটু আক্কেল হবার মতো বয়েস হয়েছে।

দিদি একেবারে বিস্মৃত। কী পরে আছেন সে খেয়ালটুকুও নেই। থাকলে এইভাবে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়াতে পারত না। চোখের সামনে দুটো ছেলে। শরীরের বসন্ত এখনও বিদায় নেয়নি। এখানে আসার আগে যথেষ্ট তোয়াজে ছিলেন বলেই মনে হয়। আমাকে চোখ নামাতে হল। নিজের লজ্জা নিজের কাছেই।

দিদি বললে, এই জানোয়ারটাকে দূর না করা পর্যন্ত আমাদের শান্তি নেই। নড়া ধরে বাইরে বসিয়ে দিয়ে এসো। গগন অত ধোলাই খাওয়ার পরেও বলতে পারলে, কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনও নয়। আয় মা সাধনসমরে। দেখি মা হারে, না পুত্র হারে। ভ্যাঁপ্পোর, প্যাঁপ্পোর, পোঁ।

দিদি প্রায় কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, আজ বোধহয় একাদশী। একাদশী অমাবস্যাতে ও একেবারে পাগল হয়ে যায়।

মুকু ঝাঁজিয়ে উঠল, জানোই যখন, তখন ঠিকানাটা দয়া করে দিয়ে এলে কেন? ঝাড়ের বাঁশ ঝাড়েই থাকত।

গগন বললে, আমি ডিটেকটিভ মোহন। ঠিকানা ছাড়াই চলে এসেছি। এর আগে তিনবার তুমি আমাকে ফেলে পালিয়েছিলে। সেখানেও আমি গিয়েছিলুম। তুমি আমার কী করতে পেরেছিলে মা? তোমার সেই রেলের গার্ডসায়েব আমাকে পিটিয়ে পানাপুকুরে ফেলে দিয়েছিল। তবু আমি মরিনি। আমি মরছি না, মরব না।

দাঁত কিড়মিড় করে দিদি বললে, মাঝে মাঝে মনে হয়, তোর গলা টিপে শেষ করে দিই। যতদিন বাঁচবি, ততদিন জ্বালাবি!

এখন আমাকে কিছু খেতে দাও। আমার পেট খালি থাকলে আমি ঘুমোতে পারি না। সেই কাল রাত্তিরে আমি মুড়ি তেলেভাজা খেয়েছি। আর আজ এই রাত্তির। আমার যে ভীষণ খিদে পেয়েছে মা!

গগনের শেষ মা ডাকটা হাহাকারের মতো শোনাল। যে-কোনো নিষ্ঠুর বুকও ফেটে যাবে।

মুকুর টানটান শরীর একটু আলগা হল। মুকু বললে, পেট পুরে খাইয়ে দিলে লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোবে?

গগন দু'হাতে মাথা ধরে বললে, আমি পাগল। তাই খেতে চাইলে সবাই আমাকে মারই খাওয়ায়। মুকু কিছুক্ষণ থমকে থেকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। আমি আর থাকতে না পেরে বললুম, দিদি, একটা কাপড় পরে এসো।

দিদি একটু থতমত হয়ে বললেন, পরতে পারছি না ভাই। কোমরের কাছটা পুড়ে গেছে। কোনওরকমে সায়াটা ধরে আছি। সবই তো সহ্য করছ, ক'দিন এইটুকু সহ্য করে নাও।

মুকুর ডাক এল, গগন, খাবে তো এদিকে আলোয় এসো।

বিশাল বাটি। দুধে মুড়ি ভিজছে বিজবিজ শব্দে। তার ওপর গোটা চারেক দানাদার। গগনের সত্যিই খিদে পেয়েছিল। হুপুস হাপুস করে খাওয়া শুরু করল।

মুকু বললে, হাত ধুয়ে, বাটি ধুয়ে, সোজা কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়বে। শোওয়ার জায়গার অভাব নেই। অভাব মশারির। একটা চাদর দিচ্ছি, আপাদমস্তক মুড়ি।

মশা আমার কী করবে! তখন চটাস চটাস করছিলুম ইচ্ছে করে, বদমাইশি করে।

আজ রাতে আর কোনও বদমাইশি কোরো না ভাগনে।

গগন লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নাড়ল। তার দু'ঠোঁটে দুধ। কোণের দিকে একটা মুড়ি। ডান হাত বাটিতে। কপালের একটা পাশ সুপুরির মতো ফুলে উঠেছে। পাখার বাঁটের নির্দয় প্রহারে। মুকু আমার সঙ্গে ঘরে এসে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে।

রাত অনেক হল।

তাতে আমাদের বয়েই গেল। বোসো আমার সামনে।

পেট চোঁচোঁ করছে, দাঁড়াও আগে জল খাই এক গেলাস।

অ্যায়, এইবার শুরু হল তোমার খেলা।

জলযোগ সেরে ফিরে এলুম। মুকু বললে, দরজার ছিটকিনি তুলে দাও। আমাদের এখন ক্লোজড ডোর কনফারেন্স হবে।

বিছানার ওপর বেশ জুত করে বসল মুকু, ষষ্ঠীঠাকরুনের মতো। আমি বসলুম কিছুটা দূরে। যাকে বলে সম্মানজনক দূরত্বে। মুকু উদাস হয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললে, এখানকার পাট আপাতত কিছুদিনের মতো

ওঠাতে হবে। এইসব অবাঞ্ছিত চরিত্র আমাদের জীবন আর সাধনা একেবারে বরবাদ করে দেবে। মেসোমশাইয়ের এই মন্দির শেষ হয়ে যাবে। এই তীর্থ আমাদের রক্ষা করতে হবে জীবন দিয়ে।

বলো, তোমার পরিকল্পনাটা কী?

কাল সকালে আবার আমি হস্টেলে ফিরে যাব।

নেবে কেন?

অবশ্যই নেবে। এখন সেশন নেই, নতুন মেয়ে আসার সম্ভাবনাও নেই।

আর আমি কী করব?

তুমি একটি বড় তালা ঝুলিয়ে সরে পড়বে কিছুদিনের জন্যে।

কোথায়?

তোমার সামনে তিনটে পথ খোলা আছে। প্রথম পথ, তোমার জীবিকা। সোজা দেরাদুন। বসে থাকলে তোমাকে তো আর কেউ খাওয়াবে না! তোমার জমিদারিও নেই। মেসোমশাইয়ের গচ্ছিত টাকায় মরে গেলেও হাত দেবে না। নিজের রোজগারের ওপর নির্ভর করবে। দ্বিতীয় পথ, তোমাকে আমি ছেড়েই দিলুম, তুমি আশ্রমে চলে যেতে পারো। চেষ্টা করে দেখো সন্ন্যাসী হতে পারো কি না! মনে হয়, পারবে না। মনে হয় কেন, একেবারে সুনিশ্চিত, পারবে না তুমি। আজকের আগুন লাগার ঘটনায় তোমার চরিত্রের পুরো পরিচয় স্পষ্ট। তুমি ভীরু। আত্মকেন্দ্রিক। একেবারে নীচ ধরনের গৃহী। নিজেরটি ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝো না। এই চরিত্রের মানুষ কখনও সন্ন্যাসী হতে পারে না। অসম্ভব। গেরুয়া গেরুয়া খেলা করে। ভেতরে ভোগ বাইরে যোগ। গেরুয়ার ডেকরেশন। তৃতীয় পথ, তোমার জীবন-মরণের পথ। তুমি এদের নিয়ে এইখানেই পড়ে থাকো। এরাই তোমাকে রান্নাবান্না করে খাওয়াবে। তোমার আধারটাকে নষ্ট করবে। তোমাকে বিয়ে করার মেয়ের অভাব হবে না। মেয়েরা তোমাকে সহজেই বাঁদর নাচ নাচাতে পারবে। তোমার প্রথম ইন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল। কী হবে হরিশঙ্করের জন্যে ব্যাকুল হয়ে? প্রায় ভুলেই তো এসেছ। আর মাসখানেকের মধ্যে তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তোমাকে নাকি সুরঞ্জনার দাদার মতো দেখতে! ওখানে টোপ ফেলো, বড়লোক শ্বশুর পাবে। হাতের কাছেও একটা মেয়ে আছে, টিপ। যাই বলো, যতই অস্বীকার করো, ওখানেও তোমার দুর্বলতা। তোমার মতো জামাই পেলে ওরা হাতে স্বর্গ পাবে। মেসোমশাইকে খুঁজে বের করার ধৈর্য, সাহস, ইচ্ছে কোনওটাই তোমার নেই। তোমার সে ব্যাকুলতাই নেই। মৃত্যুর মতো ব্যাপারটাকে তুমি মেনে নিয়েছ। কী করে ভাবলে, তুমি ঈশ্বরের অন্বেষণে বেরোবে! সে যে সহস্র গুণ কঠিন কাজ। এই বিশ্বরচনার কোনখানে তিনি বসে আছেন কেউ জানে না। সেই অধরাকে তোমার মতো ধৈর্যহারা ধরবে? বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ। জেনে রাখো, আমি সারাজীবন বসে থাকব আমার মেসোমশাইয়ের জন্যে। সারাভারত একা ঘুরে বেড়াবার সাহস আমার আছে। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসে, ত্যাগ আর বৈরাগ্যের শিক্ষা নেব। তোমার মতো অর্ধনারীশ্বরদের জীবনসঙ্গিনী হওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের গলায় মালা দেওয়াই ভাল। এই আমার শেষ কথা। গুড নাইট।

দমাদ্দম গোলা ছুড়লে দুর্গের যা অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা। প্রাসাদ প্রাকার বিধ্বস্ত। তবু শেষ চেষ্টা। নিজের ইজ্জতের সওয়াল। হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, মেয়েরা যত মারমুখি আর আক্রমণাত্মক হয় ততই তাদের

আকর্ষণ বাড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে একটা বই পড়েছিলুম। লেখা ছিল, বিলেতে মানুষ পয়সা খরচ করে মেয়েদের হাতে চাবুক খেতে যায়। তাইতে নাকি ভীষণ আনন্দ!

আমার শেষ চেষ্টা। যে-জাহাজ ডুবছে তাকে ভাসিয়ে রাখতে চাইছে কাপ্তেন। মুকু ছাড়া আমার জীবন অচল, এটুকু বুঝে গেছি। বললুম, মুকু, আগুন আর সাপ মানুষকে দিশাহারা করে। একে বলে প্রিমিটিভ ফিয়ার। স্বীকার করছি, আমি তোমার মতো সাহসী নই। সকলেই সাহসী হয় না। তার মানে এই নয় আমি স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। আর মেয়েপাগল বললে আমাকে! ওটা পৃথিবীর একটা আদি ব্যাধি। মুনিঋষিরাও নিস্তার পাননি। কোনও পুরুষই পুরোপুরি পুরুষ নয়, কোনও নারীই পুরোপুরি নারী নয়। শাস্ত্র বলছে, মূলে বসে আছেন ভগবান। সৃষ্টিই তাঁর খেলা। খেলাটা তুমি বিজ্ঞান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। সৃষ্টিকে চালু রাখার জন্যে তিনি কী করলেন? মজা করলেন, দক্ষিণ অঙ্গ পুরুষ বাম অঙ্গ স্ত্রী। একটিতে দুটি, দুটিতে একটি। দু'জনে মিলে ধারণ করেন অনন্ত রূপ। এই কারণে পুরুষের আকর্ষণ নারীতে, নারীর আকর্ষণ পুরুষে স্বাভাবিক। এইটা প্রকৃতির কারসাজি। আমরা অসহায়। তুমিও অসহায়, আমিও অসহায়। পৃথিবীর তাবৎ মানুষ অসহায়। কিছুই করার নেই। পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কাঁদে।

আমি মোটেই অসহায় নই। আমার কোনও আকর্ষণ নেই। আমি নিজেকে সেইভাবে শিক্ষিত করেছি।

মুকু, আমার সাফ কথা, তুমি চলে গেলে আমি একেবারেই অসহায় হয়ে যাব। তোমার প্ল্যান। বাজে প্ল্যান।

আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।

অবশ্যই হবে। তুমি এই বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করো। আমি এই অবসরে কাশ্মীর ঘুরে আসি।

কাশ্মীর? সেখানে কী?

আমার সেই স্বপ্নে দেখা নদী, যার তীরে বসে আছেন তিনি।

তোমার মাথা। স্বপ্ন কখনও সত্য হয় না। নিজের চিন্তাই স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। সময় আর পয়সার অপচয় হবে।

হোক। তবু আমি স্বপ্নকেই অনুসরণ করব। স্বপ্নকে অনুসরণ করেই মানুষ বাস্তবে পৌঁছোয়। কাল আমার অফিসে গিয়ে প্রথমেই চাকরিটা ছেড়ে দোব। ওঁদের আর ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই। জীবনটাকে অনিশ্চিত না করতে পারলে আমার রোক আসবে না। নিরাশ্রয়, ছন্নছাড়া। তা না হলে আমার আত্মসমর্পণ আসবে না যাকে বলে রেজিগনেশন।

চাকরি ছাড়ার কী কারণ ঘটল?

কারণ একটাই, আমার আর ছুটি পাওনা নেই।

চাকরি ছাড়লে চাকরি পাবে?

আমাদের লাইনে চাকরির অভাব নেই। যত পালটাব তত মাইনে বাড়বে। তোমাকে শুধু একটাই অনুরোধ, আমার সঙ্গে তুমিও চলো।

কেন খরচ বাড়াবে? এ কি তোমার প্রমোদ ভ্রমণ?

তা কেন? আমরা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই যাচ্ছি। তবে পেতেও পারি, না-ও পারি। আমরা হরিদ্বার হয়ে ফিরে আসব।

সে তো এক মাসের ধাক্কা। আমার পরীক্ষা? আমার ক্লাস?

বিষয়টা আজ ধামাচাপা থাক। কাল আবার ভাবা যাবে।

যাই ভাবো, কাল এই বাড়ির সদরে তালা পড়বে। অদ্যই শেষ রজনী।

দিদিকে দূর করে দেবে এই অবস্থায়, কোমর পিঠ সব পুড়ে গেছে? দেখলে তো, বিপদ আসার আগে কেমন ইঙ্গিত দিয়েছিল!

মুকুর মুখ একটু গম্ভীর হল। ভাবতে বসল। ঘটনার প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে আসছে। মুকু ক্রমশই স্বচ্ছ হচ্ছে। হৃদয় ফিরে আসছে হৃদয়ে। আমি তোমাকে একটা বিকল্প পরামর্শ দিচ্ছি মুকু। তুমি পনেরোটা দিন এই বাড়ির দায়িত্ব নাও, একটু কষ্ট করো, আমি কাশ্মীর থেকে ঘুরে আসি।

মুকু একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দড়াম করে সদর দরজার খিলটা খুলে পড়ে যাবার শব্দে বাড়ি কেঁপে গেল।

Come let us ask life
To show a way out to those who are lost
on endless streets;

আমরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। চোরে সদর দরজার খিল খুলেছে। তড়বড়িয়ে মুকু এগোচ্ছে নীচে নামার সিঁড়ির দিকে। ভয়ে আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। চোর শব্দটা শুনলেই মানুষের গলা বসে যাবে। যাবেই যাবে। চোর যেন ফ্যারেঞ্জাইটিস। ফিসফিস শব্দ বেরোল, মুকু, অন্ধকারে একা নেমো না। ওদের হাতে অস্ত্র থাকে।

আমার মুঠোয় ঘুসি আছে। আলোটা জ্বেলে দাও।

আমাদের গলা শুনে দিদি বেরিয়ে এসেছে, কী হল আবার?

শুনতে পাননি, নীচে খিল খুলে পড়ার শব্দ হল?

শব্দ একটা পেলুম বটে। অপেক্ষা করছিলুম, আবার হয় কি না?

মুকু ততক্ষণে নেমে গেছে নীচে। ভেসে এল তার চড়া গলা, কী হচ্ছে? এই এত রাতে খিল খুলে তুমি যাচ্ছ কোথায়? আবার শুরু করলে পাগলামি!

আমরা তরতরিয়ে নেমে এসেছি। সদর হাট খোলা। বাইরে রাত রাস্তা হয়ে পড়ে আছে। আকাশ-চোঁয়ানো নিশুতি আলো। জমাট ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গগনচন্দ্র। হাতে একটা ব্যাগ। হাত বাড়িয়ে নীচের গলির আলোটা জ্বাললুম। আলোয় গগনকে দেখে চমকে গেলুম। নিখুঁত সায়েবি পোশাক। চোখে চশমা। চশমা আগে ছিল না। মাঝরাতের ফড়ফড়ে ফড়িং-এর মতো বাতাসে মাথার চুল এলোমেলো। গলায় নেকটাই। আমার প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা। আলোয় ওই চেহারা দেখে মুকুও স্তম্ভিত। এ কে? এই সুদর্শন যুবকটি! এ তো সেই একটু আগের আধ-পাগলা গগন নয়। গগন হাসছে। পরিষ্কার বিশুদ্ধ বাংলায় বললে, আমাকে এইবার যেতে হচ্ছে। আমার কাজ শেষ। তোমরা একটা ভুল করেছিলে, বাইরেটা দেখে মানুষের বিচার। আমি এভাঞ্জেলিক্যাল সার্ভিসে আছি। আমি একজন ডি ডি। ডি ডি কী তা নিশ্চয় জানো! ডক্টর অফ ডিভিনিটি। আমাকে সারাপৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হয়।

আমি মনে মনে গুটিয়ে গেলেও মুকু সমান তেরিয়া, আপনি আমাদের বোকা বানালেন কেন? কাজ শেষ বলছেন? কী কাজ?

আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। আজ সাত বছর পরে আমি ডেনমার্ক থেকে ফিরছি।

যাঁকে মা বলছেন, তিনিই বা কেন আমাদের বোকা বানাতে চাইলেন?

লজ্জায়। নিজের পাপ চাপা দেবার জন্যে। এই ভদ্রমহিলার আমি জারজ সন্তান। আমার বাবা একজন ড্যানিশ মিশনারি। এই পাপে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন চার্চ থেকে। তিনি আর নেই। হি ইজ লং ডেড। আমার এই মা আজও আমাকে স্বীকার করে নিতে পারলেন না। নিজের পাপকে ঘৃণা না করে তিনি ঘৃণা করছেন আমাকে। এখনও সেই এক অভিনয়! যে-সমাজ দেখল না, সেই সমাজকে ভয়। অথচ মনে মনে সন্তানের অধিকার ছাড়তে পারছেন না। পাখা দিয়ে যখন পেটাচ্ছিলেন আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল—এই তো আমার মা। যিশুর চেয়ে মা বড়। ওই মুহূর্তে আমি শিশু হয়ে গিয়েছিলুম।

আপনিই বা কেন পাগলের অভিনয় করছিলেন!

তোমরা ছিলে না। আমি এলুম। এই বেশেই এসেছিলুম। আমাকে দেখে মায়ের কোথায় আনন্দ হবে, তিনি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যান আর কী! তিনি আমার পিতার ঘোস্ট দেখছেন। সেই বিশাল নাক। সেই মুখ। পরিচয় প্রকাশ হয়ে গেলে এই শেষ আশ্রয় যদি চলে যায়। আমি অভিনয়ে রাজি হলুম। পরে আমার মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব এল। ট্রুথ, সত্য, তাকে কি চাপা যায়! কেন এই অভিনয়! কার জন্যে এই অভিনয়? বোকা রমণী! তোমরা সাক্ষী রইলে। বিচারের ভার রইল তোমাদের ওপর।

বিচার তো আপনারই হওয়া উচিত। মা পথে পথে ঘুরছেন, আপনি নেকটাই চড়িয়ে বেড়াচ্ছেন!

আমি অনুরোধ করেছি, হয়নি। প্রায়শ্চিত্ত করবেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার আর কিছু করার নেই। আমার কাজ আমি করে গেলুম।

বারেবারে কাজ বলছেন, কাজটা কী?

সত্য প্রকাশ। ছায়ার মতো আমি অনুসরণ করব।

মুকু বললে, এটাও আপনার অভিনয়। আসলে আপনি একটা পাকা চোর। আর এই মহিলাটি আপনার এক শাগরেদ। আপনি আমাদের ঘরের আলমারির তালা ভেঙেছেন। কায়দা করে লক খুলেছেন। জিনিসপত্র হাঁটকেছেন। গয়নাগাটি পাননি কিছুই। আমরা খুবই লজ্জিত। এমন কিছু ঘটতে পারে জেনেই লকারে দিয়ে এসেছি। অতি চালাকের গলায় দড়ি। আপনি আজ আসেননি, এসেছেন কাল রাতে। কাপড়ে আগুন লাগিয়ে সিগন্যাল দিয়েছিলেন, আমি এসে গেছি, গেট রেডি। এই মহিলাকে নিয়েই পালাতেন। বিধি বাম। কাপড়ে সত্যিই আগুন লেগে গেল।

মুকুর কথা শেষ হবার আগেই, সেই জোচ্চর রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। মুকু আমাকে ঝাঁজিয়ে উঠল, হাঁ করে দেখছ কী? ছুটে গিয়ে ধরো। ব্যাগটা সার্চ করতে হবে।

আর ধরো। বহু দূরে ছুটে চলেছে এক ছায়ামূর্তি। একটু আগেই যে বলছিল, তোমরা মানুষ চিনতে ভুল করেছ। সত্যিই মানুষ চেনা অতিশয় কঠিন। সিঁড়ির একপাশে প্রায় বিবসনা এক রমণী স্থাণু হয়ে আছেন। পাথরের মূর্তি। এখন আর আমার তাকাতে লজ্জা করছে না। মহিলা আমার দিদি নয়। হয়তো বিগত-যৌবনা দেহব্যবসায়ী। কোনও রাগ নয়, আমার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে। কী লজ্জা! যাচাই করার উপায় নেই, হয়তো সম্পর্কে দিদি। তুলসীদাসজি, আপনাকে প্রণাম। সেই দোঁহা: উদর ভরণকে কারণে, প্রাণী ন করতয়ি লাজ্। নাচে বাচে রণ ভিরৈ, বাচে ন কাজ অকাজ॥ পেটের জন্যে সব লাজলজ্জা বিসর্জন দিতে হয় মানুষকে, কেউ

সভায় নাচছে, কেউ উত্তাল সমুদ্রে নৌকোর বাইচ খেলছে, কারও শরীরে বল নেই তবু যুদ্ধে যাচ্ছে। পেট। সব পেট। কাজের বাছবিচার নেই।

মুকু সিঁড়ির শেষ ধাপে দু'হাতে মাথা চেপে বসে পড়ে বিশাল এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, আর কতভাবে পরীক্ষা করতে চান আপনি? আর কতভাবে?

দিদি মুকুর পায়ের কাছে বসে পড়লেন। হাঁটুদুটো ধরে বললেন, বিশ্বাস করো ভাই, ও কিছু নিতে পারেনি। চেষ্টা করেছিল। পায়নি কিছুই।

সোনার জরি বসানো মাসিমার বেনারসি?

সন্ধান পায়নি।

এ আপনার সেই ভাগনের ছেলে?

অনেকটা তাই।

অনেকটা আবার কী? জানেন, আমি যদি থানায় যাই কী হবে?

আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ভাই। অত্যাচার করবে। পুরনো জীবন থেকে আমি আর বেরোতে পারব না। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানেই পেছন পেছন তেড়ে আসছে আমার পাপ। আমি কী করি? যাই কোথা?

আমাদের কাছে চাপা দেবার চেষ্টা না করে, প্রথম থেকেই বললে পারতেন। আপনি কি জানেন না, সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না!

আমি যে ফিরতে চাই। আমি ফিরে আসতে চাই সুস্থ জীবনে। সংসারে। রান্নাঘর, ঠাকুরঘর, মন্দির, মেলা, রুগির বিছানার পাশে। আমাকে তুমি একটু সাহায্য করো ভাই। যা জোর করে আমার ঘাড়ে চাপানো হয়েছে, তার থেকে আমাকে আমার মুক্তির পথ বলে দাও। তুমি পারো, একমাত্র তুমিই পারো।

মুকুর হাঁটুতে মাথা রাখলেন দিদি। আমার মনে হচ্ছিল, এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিই। আমাদের বংশের কলঙ্ক। যা শুনেছিলুম ছেলেবেলায় তা ঠিকই, বড় জ্যাঠাইমার চরিত্রে অনেক ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্রেরই একটি ফসল এই মেয়ে। বিষ-জারুলের গাছে কি আর অমৃত ফল ধরে!

মুকুর ব্যবহারে কোনও ঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই, হতাশা থাকতে পারে। দিদির মাথার পেছন দিকে হাত রেখে মুকু বললে, আমি কী করতে পারি দিদি! আপনি যা করে এসেছেন, তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। পাপ ভূমিসে ভারী। পৃথিবীর চেয়ে ভারী মানুষের পাপ। আপনি তো পড়ে আছেন অতীতের খপ্পরে। এখন কী হবে! আমার মাথায় তো কিছু আসছে না!

হঠাৎ মুকু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। আপন মনেই বললে, তাই তো, এটা তো ভেবে দেখা হয়নি!

মুকু দিদির মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারছি দিদির বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। মুকু খপ করে দিদির ডান হাতটা চেপে ধরে বললে, তাই তো বলি, তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। চলো ওপরে চলো, আমি তোমার পোঁটলা সার্চ করব।

মুকু বলে কী? পাগল হয়ে গেল নাকি! নিজেকে ভাবে কি সবজান্তা স্বর্গীয় পুরুষ! পুরুষ তো নয়, নারী। পোঁটলা সার্চ করে পাবেটা কী? মাথায় পোকা নড়েছে।

দিদি বললেন, সে আবার কী? গরিব মানুষের পোঁটলায় তুমি পাবেটা কী? তুমি এইভাবে আমাকে অপমান করছ কেন? অভাবে পড়েছি বলে? অসহায় বলে?

অত কথার তো দরকার নেই। আমি দেখতে চাইছি দেখব। তুমি এই জায়গা ছেড়ে এক পা-ও নড়বে না। আমি আগে ওপরে যাব।

অহংকারে তোমার মাথা বিগড়ে গেছে। রূপের অহংকার, শিক্ষার অহংকার, পয়সার অহংকার।

একটু পরেই তোমার মাথা বিগড়োবে।

তারপর মুকু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, ও নীচেই থাক। তুমি দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ওপরে এসো আমার সঙ্গে। কাণ্ডটা দেখে যাও।

অসহায় সেই মহিলার দিকে একবার ফিরে তাকালুম। আমার চোখে জল এসে গেছে। মানুষের হাতে মানুষের কী অপমান! কেন যে মানুষ এমন করে! মেয়েরাই মেয়েদের এইরকম অপমান করে। ছেলে হলে পারত না। দিদি জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি মুখের ওপর সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে ওপরে উঠে এলুম।

দোতলার ঘরে মুকু ততক্ষণে পোঁটলা খুলে সব জিনিস ছড়িয়ে ফেলেছে। কী-ই বা আছে সম্বল! কিছুই তেমন নেই। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বললে, কী হল? আমার হিসেবে তো কোনও ভুল হবার কথা নয়। তা হলে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, তা হলে কী মুকু! তুমি কী পাবে ভেবেছিলে?

চোরাই মাল।

চোরাই মাল মানে?

মানে খুবই সহজ। চুরি করে আনা মাল।

সে আবার কী?

মুকু রেগে গেল, থেকে থেকে সে আবার কী সে আবার কী কোরো না তো!

মুকু এক লহমার জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে তিরবেগে রান্নাঘরের দিকে ছুটল। আমিও অনুসরণ করলুম। মুকু ঘরে ঢুকেই ডেকচিটা উলটে ফেলল। থালার ওপর বিশাল একতাল ময়দা। সেই ময়দার তালের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণ। মুকু আনন্দে চিৎকার করে উঠল, ইউরেকা!

আর্কিমিডিসের পর এই বোধহয় আর একবার উল্লাসের চিৎকার। ইউরেকা। কী পেয়েছে? কিছু একটা বেরিয়ে আসছে তালের ভেতর থেকে।

মুকু বললে, দেখে যাও।

পাশে গিয়ে বসলুম। পাথর সেট করা একটা হার বেরিয়ে এল। হারটায় কত যে পাথর! কত রকমের পাথর! ময়দা লেগে আছে জায়গায় জায়গায়। তবু মনে হচ্ছে বহুমূল্য। কোনও রানি-মহারানির গলায় ছিল। মুকু বললে, জলের ঘটিটা নিয়ে এসো।

ঘটির জলে একবার ডোবাতেই রূপ বেরিয়ে পড়ল। পাথরের কী ঝিলিক!

মুকু বললে, এই চারটে হিরে। তিনটে দামি রুবি। এই দেখো, এইগুলো পোখরাজ। লাখখানেক টাকা দাম কি তারও বেশি। ব্যাপারটা এইবার বুঝলে, মোটা মাথা? রান্নাঘরে ঢুকে হুলুস্থুলুসের কারণটা। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় তোমার ওই দিদি মালটা ময়দার তালের ভেতর ঢুকিয়েছিল।

মালটা এল কোথা থেকে?

বুঝতে পারলে না! মালটা গগন চোর কোথা থেকে হাতিয়ে এনেছিল। জানত এইখানে কিছুকাল চেপে রাখতে পারলে পুলিশ কোনও সন্ধান পাবে না। তারপর পাচার করে দেবে ঠিকমতো জায়গায়। ওই কারণেই গগন রান্নাঘর থেকে বেরোতে চাইছিল না। ছ্যাঁচড়ামো করছিল।

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। আওয়াজ বেরোচ্ছে না। চোরাই মাল রাখার অপরাধে জেলে যেতে হবে। বরাতে এইটাই বাকি ছিল। কোনওরকমে জিজ্ঞেস করলুম, এখন কী হবে মুকু?

কী আবার? পুলিশ আসবে, তোমার কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে।

জিনিসটাকে হাতে নিয়ে দু'-চারবার চোখের সামনে ঘুরিয়ে মুকু বললে, তাকে ডেকে আনো নীচে থেকে। মাল আর মালের জিম্মাদার দুটোকেই বিদেয় করতে হবে এখান থেকে। এখুনি, এই মুহূর্তে।

বার্তাবাহক চলল নীচে। নীচের দালানের রকে বসে আছেন মহিলা। প্রেতিনীর মতো আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। বেশ কঠিন গলায় বলার চেষ্টা করলুম, এ আপনি কী করলেন? কান্না এসে গেল। কারওকে অসহায় দেখলে মনে হয়, সে আমি। আমিই সেই অসহায় মানুষ। আমিই সেই ভুক্তভোগী। পৃথিবীটা কেন যে এমন বিশ্রী রকমের জটিল! কেন জানি না, কেবলই মনে হচ্ছে, ওই কাজ এই মহিলার নয়। আর যাই হোক, আমাদের বংশের মেয়ে চোরের দলে ঢুকতে পারে না। পরিস্থিতির শিকার।

অতি কষ্টে বললুম, ওপরে আসুন।

দিদি পায়ে পায়ে অপরাধী শিশুর মতো দোতলার ঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিষ্পাপ মুখে অপরাধের ছায়া নেই, আছে ভয়। মুকুর গর্জন শোনা গেল, এটা কী? ভেতরে এসো। এসে বলো এটা কার, এল কোথা থেকে?

দিদি ঘরে ঢুকে মেঝের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, সত্যি বলছি আমি কিছুই জানি না। আমার জানার কথা নয়।

এটা চোরাই মাল।

হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

এটা চোরাই মাল।

বেশ, তাই না হয় হল।

এখন কী হবে? থানা-পুলিশ কে সামলাবে?

এতে থানা-পুলিশ আসছে কোথা থেকে?

খুব সহজেই আসছে। কাল না হয় পরশু। তখন কী হবে?

দিদি পালটা প্রশ্ন করলেন, কী হবে তখন?

তখন হবার আগেই এখন হবে। এখন রাত তিনটে প্রায়। এই মহামূল্য চোরাই মাল নিজের পোঁটলায় পুরে সোজা দক্ষিণমুখো হাঁটা দাও। ওই দিকেই যমের দক্ষিণ দুয়ার। আর তোমার কোনও ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনতে আমি রাজি নই। এই মুহূর্তে তুমি এই বাড়ি ছেড়ে বিদেয় হয়ে যাবে। তোমার ওই পাপমুখ আমি দেখতে চাই না।

দিদি অসহায় মুখে আমার দিকে তাকালেন। আমিও সমান অসহায়। সম্রাজ্ঞী মুকুর মুখের ওপর কথা বলার সাহস আমার নেই। মুকুর যুক্তি আর তর্কের সামনে আমি দাঁড়াতে পারি না। হরিশঙ্করের চেয়েও প্রখর।

দিদি বললেন, এই গভীর রাতে আমি যাই কোথা! আমাকে তো ছিঁড়ে খাবে। আমার একটা অনুরোধ তুমি রাখো। ভোর হলেই আমি চলে যাব।

আমি বললুম, সেই ভাল। আর তো কিছুক্ষণ।

মুকু গুম মেরে রইল। কী ভাবল কে জানে! সময় যেন থম মেরে গেছে। অবশেষে বললে, বেশ, ঠিক আছে, তাই হোক। সূর্যোদয়ের আগে, পাড়া জেগে ওঠার আগে, তুমি ঠিক যেভাবে এসেছিলে সেইভাবেই ফিরে যাবে। কোথায় যাবে আমার জানার দরকার নেই।

সেই বহুমূল্য গয়নাটি মেঝেতে ফেলে দিয়ে মুকু উঠে গেল। আমিও চলে যেতে চেয়েছিলুম, দিদি আমার হাতটা চেপে ধরলেন, পলাশ, এ বাড়ি তো তোমার? আমি তো তোমার আশ্রয়েই এসেছিলুম ভাই! তুমিও কি আমাকে তাড়াতে চাও? আমার শরীরের পেছন দিকের অবস্থাটা কি একবার দেখেছ? আমার জ্বর এসে গেছে।

আমি কী করব? আপনি নিজের পাপেই ভুগছেন।

যদি বলি, পাপ আমি করিনি। পাপই আমার ঘাড়ে এসে চেপেছে। পেছন পেছন ফিরছে তাড়া করে। কার দোষ? দোষ আমার না দোষ তাদের? কার বিচার হবে? সেই ভাগনে, সেই ভাগনের বুড়ো মামা, আমার মা, সেই ফাদার, সেই পুরোহিতমশাই, সেই থানার বড়দারোগা, সেই কোল্ডস্টোরের মালিক, সেই নেতা, সেই স্কুলমাস্টার, হুগলি আদালতের সেই উকিল, এদের, এদের বিচার হবে না ভাই?

আমি জানি না। আপনার সামনে সাপের মতো ওই যে জিনিসটা পড়ে আছে, সাপের চোখের মতো আলো ঠিকরোচ্ছে, ওটা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে জানেন? হাজতে ওইটার জন্যে এখানকার আমাদের তিন পুরুষের বাস উঠে যেতে পারে। কেন, কেন আপনি আমাদের জেনেশুনে এই বিপদের মধ্যে টেনে আনলেন? আমাদের পরিবার আপনার কী ক্ষতি করেছিল?

একেবারেই কোনও ক্ষতি করেনি তা বলি কেমন করে! এই পরিবারেরই এক পুরুষ আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন। আমার মাকে ছেড়ে তিনি স্ফূর্তি করতে গিয়েছিলেন অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে। হয়ে গেলেন পাগল। একবারও ভাবলেন না, তাঁর ছেলেমেয়েদের কী হবে! তোমারই পরিবারের অন্যান্যরা আমার মাকে গুমোরে, ঠেকারে বলে বাড়ি-ছাড়া করলেন। তারপর? তারই তো সব পরপর, পরপর হয়ে গেল। এক থেকে আর এক। নিজেদের অত নিরপরাধ ভাবছ কেন পলাশ? তুমি কতটুকুই বা জানো! তোমাদের পরিবারের ভারী সুন্দর একটা গুণ, বিপদ দেখলেই সরে পড়া। যেমন আগুন দেখেই তুমি এক লাফে ঘর ছেড়ে পালালে। তোমাদের ধরন হল, যা শত্রু পরের পরের।

আপনি একটা অন্যায়কে আর একটা অন্যায় দিয়ে ঢাকতে চাইছেন। জেনে রাখুন, আপাতত মুকু যা বলেছে তাই হবে। অন্যরকম হবার উপায় নেই।

আমি আমার ঘরে চলে এলুম। মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে। পেছন দিকটা আগুনে যার ঝলসে গেছে, সে কেমন করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কোথাও একটা যাবে? সেই কোথাওটা কোথায়? দিদি একটা কথাও ভুল বলেনি। অপ্রিয় সত্য। সহ্য করা শক্ত। সত্য এইরকমই। প্রখর আলোর মতো। বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যত দুশ্চিন্তাই থাক, ঘুমের প্রলেপ পড়বেই। প্রচণ্ড এক ঠেলায় ঘুম ভেঙে গেল। মুকু ডাকছে, শিগগির ওঠো, শিগগির ওঠো, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

জানলায় দুলছে ভোরের পরদা। পাখির ডাকের অভ্রখণ্ড বসানো। এমন একটা গোলাপি শুরুতেই সর্বনাশ! এত সর্বনাশের পরেও সর্বনাশ। ধড়মড় করে উঠে বসলুম ঘোর-লাগা চোখে। কোথায় এতক্ষণ পড়ে ছিলুম তাও জানি না। জানলার ধার। তক্তপোশ। ভোরের ভিজে বাতাস।

আবার কী সর্বনাশ হল মুকু? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

মুকু হঠাৎ আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগল। রুদ্ধ গলায় বললে, দিদি চলে গেছে।

তুমি তো তাই চেয়েছিলে, এখন আবার কাঁদছ কেন?

মুকু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, আমি তো বাড়ি ছেড়ে যেতে বলেছিলুম, দিদি যে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

সেকী? সে আবার কী?

দিদি গলায় শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে নীচের ঘরে ঝুলছে। আমারই সিল্কের শাড়ি।

সেকী?

আমার শরীর পাথরের মতো হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা ধাক্কা। বজ্রের মতো। একই সঙ্গে একরাশ চিন্তা মাথায় খেলে গেল। সেই থানা পুলিশ। সেই পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যাওয়া। ছি ছি, ধিক্কার। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলুম। কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলুম। গৃহদেবতা হরিশঙ্কর চলে গেছেন। মাথার ওপরের ছাদ ধসে গেছে। দুর্যোগ থেকে বাঁচার রাস্তা নেই। বাঁচাবারও কেউ নেই। যা ঘৃণা করতুম, তাই ঘটছে একের পর এক।

One learns to know oneself best behind one's back.

সেই বহুমূল্য হারটা মেঝেতেই পড়ে আছে অবহেলিত। প্রাণহীন দেহ মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে ঝুলছে। কোনও এক রন্ধ্রপথে সকালের বাতাস ঢুকছে, দেহটা অল্প অল্প দুলছে। অভাবনীয় দৃশ্য। ঘণ্টা কয়েক আগেও মানুষটা ছিল। বাঁচতে চেয়েছিল করুণভাবে। জীবনকে কে আর স্বেচ্ছায় ফুরোতে চায়! আমি আর মুকু চলে যাবার পর, আমাদের ঘৃণা নিয়ে বসে ছিল বহুক্ষণ। অবশেষে এই সহজ সিদ্ধান্ত। আবার কোথায় কোন অনিশ্চিত জায়গায় যাওয়া যায়, তার চেয়ে একেবারেই চলে যাই। অনেক খেলাই তো হল, আর কী হবে! আর সে তো কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার! দেহের খাঁচা খুলে জীবন-পাখির উড়ে যেতে কতটুকুই বা সময় লাগে!

কে খুনি?

খুন তো বটেই। কিন্তু কে? আমাদের তিন জনের মধ্যে কে খুনি? আমি, মুকু, গগন? না চতুর্থ আর একজন কেউ? যে আমার দিদির অতীতকে তাড়া করে ফিরছে অলক্ষে বসে, তার এজেন্টের মাধ্যমে। আগুন দেখে যে লাফিয়ে ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিল তার এই সাহস দেখে নিজেই অবাক। সামনে দু'হাত দূরে দিদির দেহ ঝুলছে। অল্প অল্প পাক খাচ্ছে। মুখটা সামান্য বিকৃত। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তবু আমার ভয় করছে না। আমি ভাবতে পারছি। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভাবনা। এরপর কী হবে! কীভাবে পার পাওয়া যাবে আইনের হাত থেকে। এখন তো ডবল ফ্যাকড়া বেরোল। এক, চোরাই মাল, দুই, আত্মহত্যা। বুকের কাছে মাঝে মাঝেই কী একটা দলামতো ঠেলে উঠছে। আমার জমাট কান্না। একটা পুঁটলি, কয়েকখানা আটপৌরে কাপড়, দু'-একটা ব্লাউজ, ছোট্ট একটা গীতা, এই সামান্য সম্বল ফেলে, জীবনের খেলা শেষ করে চিরতরে চলে গেল সংগ্রামী এক জীবন। এই দেখেই গাইতে ইচ্ছে করে, ট্যাঁ করে জন্মে আমি কী পেলাম!

মুকু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। খুব কঠিন হতে গিয়েছিল। পাপ পুণ্যের বিচারক। কেমন শিক্ষা দিয়ে মোলেন মহিলা। এইবার ঠেলা সামলাও। দেখাও তোমার তেজ। আঁচলে চোখ মুছে মুকু বললে, তা হলে তো থানায় যেতে হয়।

তা তো হয়ই। তুমি যাও। সারাপাড়া এইবার ভেঙে পড়ুক। অপমানের একশেষ। আমার পক্ষে আর কিছুই সম্ভব নয়। তোমার হাত ধরে চলতে গিয়ে আমার পতন হল খানায়।

এই মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে সমস্যার সমাধানে লাগাই উচিত। মাথা ঠান্ডা রাখো।

উপদেশটা নিজেকেই দাও।

আমার মাথা খুবই ঠান্ডা। সবার আগে হারটা সরাও।

তাতে লাভ! পরে হারটা যখন আমাদের কাছ থেকে বেরোবে তখন কী হবে? হাজতে? যেখানে যা আছে ঠিক সেইরকমই থাক। চালাকি করে লাভ নেই। এতদিন তোমার কথায় চলেছে, এইবার আমার কথায় চলুক। আমি একটা গাড়ি ধরে সুরঞ্জনাদের বাড়ি যাই। সুরঞ্জনার বাবার সাহায্য এখন কাজে আসবে। পুলিশের ওপরমহলের মানুষ।

দেরি হয়ে যাবে। তুমি বরং তোমার বিষ্টুদার সাহায্য নাও। পুলিশকে জানাতে যত দেরি করবে, ততই তাদের সন্দেহ বাড়বে।

পুলিশ যখন এসে দেখবে কোনও সুইসাইডাল নোট নেই, দেহের কিছুটা অংশ পোড়া, সামনে পড়ে আছে দামি একটা হার, তখন কেসটা কোন দিকে যাবে তুমি জানো?

যে-দিকেই যাক, জানাতে তো হবেই।

অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ নিয়ে জানাব। সেইটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

তুমি চলে গেলে আমি একা থাকব নাকি? এখুনি তো কাজের মেয়েটি আসবে।

মুকুর কথা শেষ হতে-না-হতেই সদরের কড়া নড়ে উঠল। দু'জনেই ভয়ে কাঠ। সর্বনাশ করেছে। এখন কী হবে! যে বাসন মাজে সে এসেছে। এখুনি সারা পাড়ায় রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কাতারে কাতারে লোক ছুটে আসবে গলায় দড়ি দেখতে। এর চেয়ে দর্শনীয় আর কী আছে!

মুকু বললে, আমি দরজা বন্ধ করে রাখছি, তুমি কোনওরকমে ওকে ভাগাও।

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলুম, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন অক্ষয় কাকাবাবু। জীবন্ত স্তম্ভের মতো। পাঞ্জাবির ঝুল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। পরিষ্কার ধুতি। পায়ে চপ্পল। কাঁধে একটা গেরুয়া সাইড ব্যাগ। মনে হল, হাতে স্বর্গ পেলুম। পিতার সর্বাধিক প্রিয় বন্ধু পিতার মতোই। যেন হরিশঙ্করই ফিরে এলেন। ভেতরে প্রবেশ করতে করতে বললেন, অনেক দিন তোমাদের কোনও খবর নিতে পারিনি। তোমাকে একদিন অবশ্য ট্রামে দেখলুম মাথা নিচু করে একটি মেয়ের পাশে বসে আছ। বুঝলুম আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছ, তাই আর বিরক্ত করলুম না।

অক্ষয় কাকাবাবুকে প্রণাম করে যখন উঠে দাঁড়ালুম তখন আমার দু'চোখে জল। তিনি তাঁর বিশাল চওড়া বুকে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে বললেন, কীসের এত দুঃখ? সময় কি সবসময় সমান যায়! কখনও ভাল, কখনও খারাপ। নীলকণ্ঠের সেই গানের মতো, শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস, কখন কী যে ঘটে ভেবে হই মা সারা। এক কূল নদী ভাঙে নিরবধি আবার অন্য কূলে আকুলে সাজায়। খবর আমি পেয়েছি, হরিদা চলে গেছেন। কোথায় গেছেন, সেইটাই হল প্রশ্ন।

কাকাবাবু, তার চেয়ে বড় সমস্যা, এই মুহূর্তে ঘরে একটা ডেডবডি ঝুলছে।

সেকী? এ তোমার কোনও হেঁয়ালি নয় তো!

না কাকাবাবু, আপনি জানেন না, কী ঘোর সংকটের মুহূর্তে আপনি এসেছেন! ঈশ্বর আপনাকে পাঠিয়েছেন।

কাকাবাবু ওপরে উঠতে উঠতে সংক্ষেপে সব শুনলেন। একটাই মন্তব্য করলেন, অজ্ঞাত কুলশীল কারওকে আশ্রয়ে রাখার আগে একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল পিন্টু। তুমি যাকে কখনও দেখোনি,

যার ঠিকানাও তুমি জানো না, তাকে সোজা বলে দিলেই পারতে, আমার বাবা নেই, আপনি পরে আসবেন।

দোতলার বারান্দার রেলিং-এ হাত রেখে কাকাবাবু গুম মেরে দাঁড়ালেন। একমুখ কঁচাপাকা দাড়ি। সেকালের কোনও মুনি যেন একালে ছাড়া পেয়েছেন। মুকু এসে প্রণাম করল। আমার খুব অদ্ভুত লাগছে, সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিদির মৃত্যু নয়, সময়ের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণহীন ঘটনা ঘটে চলেছে। কাকাবাবুর আসা, মুকুর প্রণাম, কথাবার্তা, জল্পনা-কল্পনা, সবই যেন স্থিরচিত্র।

কাকাবাবুকে সামান্য ধরিয়ে দিতে হল মুকুর পরিচয়। মৃদু হাসলেন। মৃতের হাসির মতো। আমরা সকলেই মরে গেছি যেন। দম নেই। আগের বেগেই চাকা ঘুরছে।

কাকাবাবু ঘরে এসে পিতার চেয়ারে বসলেন। হরিশঙ্করের মতোই এক ব্যক্তিত্ব। হাতের আঙুলগুলো বিশাল বিশাল। তর্জনী তুলে আছেন, মনে হচ্ছে সমস্ত ঘটনা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায়। টেবিলে একটা টোকা মেরে বললেন, আমার প্ল্যান রেডি। কোনও লুকোছাপা নয়, সোজা থানায় গিয়ে আমরা অফিসারকে বলব, মশাই এই এই ব্যাপার। তুমি বলবে আমার বিধবা দিদি আত্মহত্যা করেছে। কারণ একটাই□— ছেলের অত্যাচার।

কাকাবাবু, ছেলের কথা বললেই প্রশ্ন হবে ছেলে কোথায়? আমরা তো তার ঠিকানা জানি না কাকাবাবু। বাবা জানলেও জানতে পারতেন।

সেই প্রশ্নেরও উত্তর আছে। বাউন্ডুলে ছেলে, কখনও আসে, কখনও হারিয়ে যায়।

পুলিশ যখন পাড়ার লোককে প্রশ্ন করবেন তারা তো বলবে, এই মহিলা এখানে থাকতেন না। এই কয়েক দিন হল দেখছি। পুলিশ আসামাত্রই শয়ে শয়ে লোক এসে জুটবে। তখন কী হবে। তা ছাড়া পিঠের দিকে ওই আগুনে পোড়া। পুলিশ যদি বলে, এটা আত্মহত্যা নয়, খুন!

কাকাবাবু নিজের কপালে তিনবার আঙুলের টোকা মেরে বললেন, উঃ, কী কঠিন সমস্যা। এ যে দেখি ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছোলেও নির্বংশের ব্যাটা। ঠিক আছে, দেখাই যাক না কী হয়! জলে নেমেই দেখা যাক। সমস্যা আসুক তারপর দেখা যাবে। চলো, থানায় যাই।

কাকাবাবু, ওই চোরাই হারটা?

পড়ে থাক। অথবা ওটাকে আবার ময়দার তালেই ঢুকিয়ে দেওয়া যাক।

সেটা কি ঠিক হবে? দ্বিতীয়বার যখন পুলিশ আসবে হারের খোঁজে, তখন এই আত্মহত্যাটা হয়ে দাঁড়াবে খুন। আমি আর মুকু হারের লোভে মহিলাকে খুন করেছি। তখন সোজা হাজতে।

কাকাবাবু আবার গুম। অবশেষে বললেন, আঃ, আচ্ছা একটা দাবার চাল চেলে গেছে। একেবারে কিস্তিমাতের চাল। তা হলে থাক। যেখানে পড়ে আছে সেইখানেই পড়ে থাক হারটা। আচ্ছা তাই বা কেন? হারের সন্ধান পুলিশ পাবে কী করে?

সহজেই পাবে কাকাবাবু। যাঁদের হার তাঁরা থানায় ডায়েরি করবেন। পুলিশ অনুসন্ধানে বেরোবে। গন্ধে গন্ধে চলে আসবে এখানে। তখন কেস আরও জটিল হবে।

তোমার মাথা দেখছি আমার চেয়ে অনেক সাফ। হরিশঙ্করদার মাথা। চলো, যা হয়েছে তাই বলব, তারপর যা হবার তাই হবে। কেমন? সাহস আছে তো?

আপনি সঙ্গে আছেন আর আমি ভয় পাই না।

থানার বড় দারোগামশাই কোমরে বেল্ট বাঁধছিলেন। সব দারোগার মতোই, এঁরও ভুঁড়ি সমস্যা। এতটাই স্বাধীনতা পেয়ে এসেছে, যে এই মুহূর্তে আর শাসনে আসতে চাইছে না কিছুতেই। এত দুষ্টের দমন করেন, নিজের মধ্যপ্রদেশকে দমন করতে পারছেন না কিছুতেই। বেল্ট বাঁধা হলে তিনি আসনে বসবেন। তিনিও দাঁড়িয়ে, আমরাও দাঁড়িয়ে, একজন হাবিলদারও দাঁড়িয়ে। সময়ও যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে। রিভলভারটা টেবিলের ওপর। তার পাশেই শুয়ে আছে তেলচুকচুকে ব্যাটন।

পেছনের একটা জানলা খোলা। জানলার ওপাশে পাঁচিল। পাঁচিলের মাথায় স্বর্ণগোধিকার মতো একফালি রোদ। পাঁচিলের ওপিঠ থেকে ছোট্ট একটা লতা সবে তার দুটি পাতাকে জাগাতে পেরেছে, যেন গোপনে চুমু খাচ্ছে রোদ। কড়ির পাশে কোমল। অতি কষ্টে প্রথম ফুটোয় বেল্ট বেঁধে দারোগাসায়েব চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকালেন। কাকাবাবুর শালপ্রাংশু চেহারা টেবিলে ছায়া ফেলেছে। কর্কশতম গলায় বললেন, কী চাই?

কাকাবাবু সামান্যতম ঘাবড়ে না গিয়ে বললেন, আপনার সাহায্য।

কে মরেছে?

কী করে বুঝলেন?

আরে মশাই এই সময় গলায় দড়ি দিয়েই তো সব আসে। এত বছর দারোগাগিরি করছি কী কারণে? এইটুকুই যদি না বুঝব! ঠিকানা বলুন।

কাকাবাবু খুব নরম গলায় বললেন, আপনার অদ্ভুত ক্ষমতা। এমন আমি দেখিনি কোথাও।

দারোগাসায়েব গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন।

পুবের জানলা দিয়ে এক চিলতে রোদ চোরের মতো ঢুকেছে। টেবিলের তলায় অন্ধকার খুঁজতে এসেছে। শেষ শত্রুটিকেও আর আস্ত রাখবে না।

কাকাবাবু সবিনয়ে বললেন, আপনার যদি মন ভাল থাকে তা হলে সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই।

দারোগাবাবু বুক চিতিয়ে বললেন, আমি ঘুষ নিই না, এমনকী একটা চালকুমড়োও না।

আমি কিন্তু ঘুষ নিবেদন করতে চাইনি। এপাশে বসে আপনার হাতের যতটুকু আমি দেখেছি, আঙুল, বুড়ো আঙুল, নখ, তাতে আমি বুঝেছি, আপনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। সেন্ট পারসেন্ট স্পিরিচুয়াল। বৃহস্পতি তুঙ্গী, মঙ্গল স্বক্ষেত্রী। কেবল একটাই সমস্যা মাথায় আঘাত লাগতে পারে।

লাগতে পারে কী মশাই, লেগে গেছে একবার। আবার লাগবে?

ওইটাই তো আপনার উইক পয়েন্ট। আর ওই পয়েন্ট থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনা। ওইটাই আপনার জীবনের একটা কার্স। সংসারে ঢোকার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে আমি আপনার রাইট পার্টনার সিলেক্ট করে দিতুম। আপনার স্ত্রীর বৃহস্পতিও প্রবল। প্রবলে প্রবলে একটু বেশি বলাবলি হয়ে যায়। তবে স্ত্রীভাগ্যেই আপনার জীবনের উন্নতি।

দারোগামশাই কেমন যেন হাঁ হয়ে গেছেন। চোখদুটো স্থির পটলের মতো।

কাকাবাবু কোনওরকম দয়ামায়া না করে একটা বম্বশেল ছাড়লেন, আপনার দ্বিতীয়বার বিবাহ হবে এবং আপনার জীবন তখন মহাসুখে ভরপুর হবে।

দারোগামশাই হাবিলদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, অ্যায় তুমি বাইরে যাও।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কাকাবাবুর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, এসব আপনি বলছেন কী করে? সেন্ট পারসেন্ট মিলে যাচ্ছে!

কাকাবাবু হাতির দাঁতের মতো হেসে বললেন, আমার গুরু হলেন তারাখেপা। সবই তাঁর কৃপা, তাঁরই শক্তি। আর যৎসামান্য জ্যোতিষী।

আপনি আমার হাত দেখছেন কী করে? আমি তো টেবিলের এপাশে?

যা বলছি সব আপনার হাতের এ পিঠ, এপারে বসে দেখে বলছি। ও পিঠে আরও কী আছে কে জানে? তারপর বাঁ হাত! বাঁ হাতে আছে আপনার প্রারব্ধ, যা নিয়ে এসেছেন। জানেন তো মানুষ নিয়ে এসে দিয়ে যায়। কীরকম জানেন, একজন সেলসম্যান, হাতে ফোলিও ব্যাগ, এসেছে। একে একে সব বের করে হাতে হাতে তুলে দিচ্ছে। এই নাও সাহিত্য, এই নাও সংগীত, এই নাও চিত্রকলা, আচ্ছা এই নাও সেবা, পরোপকার, এই নাও ভালবাসা, এই নাও সাধনা, আবার, এই নাও নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, হত্যা। ব্যাগ থেকে সব একে একে নামিয়ে রাখছে। এই হল মানুষের জীবনের কাঠামো। জ্যোতিষীর সঙ্গে সাধনা, আধ্যাত্মিকতা যুক্ত না হলে মানুষকে স্টাডি করা যায় না। গুরু কৃপায় আমি শতকরা নব্বই ভাগ মেলাতে পারি। কিন্তু আমার কোনও গর্ব নেই।

দারোগাসাহেব একেবারে অভিভূত। আরও খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বললেন, চলুন না আমার কোয়ার্টারে, কিছুক্ষণ হয়ে যাক। আমার বউয়ের হাতটাও একবার দেখবেন।

নিশ্চয় দেখব, দ্যাটস মাই প্লেজার। শুধু আমাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিন। বড় সমস্যায় পড়ে গেছি। মানসম্মান নিয়ে টানাটানি। কেসটা মন দিয়ে শুনুন।

অফকোর্স অফকোর্স। দাঁড়ান চা আনাই আগে।

পুলিশের হুকুম, সে যেন মাথায় হাত ভেঙে পড়ল। যেন চা নয়, হাবিলদারকে তিনটে মুণ্ডু কেটে আনতে বললেন। চা এসে গেল। কাকাবাবু একটু একটু করে সব বললেন। স্তরে স্তরে। সব শুনে দারোগাসায়েব বললেন, র‍্যাশন কার্ড ছিল?

র‍্যাশন কার্ড থাকবে কী করে? এ বাড়িতে তো সবে এসেছিল।

একটা ঠিকানা, কিছু আত্মীয়স্বজন থাকলে জিনিসটার চেহারা অন্যরকম হত। কিছুটা রিস্ক থেকে যাবেই। যাক সে কী আর করা যাবে! লাশ নামিয়ে এনে পোস্টমর্টেমে ঠেলে দিই। হাপিস করে দোব?

হাপিস কাকে বলে?

একেবারে হাওয়া। আনক্লেমড বডি।

দিদির মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। পাঁচিলের মাথার ওপর দিয়ে উঁকি-মারা লতার দুটো কচি পাতার মতো। নিষ্ঠুর পৃথিবীকে দেখতে চাইছে ভীরু মুখে। একটু বাঁচতে চাই। একটু রোদের ছোঁয়া। আমি ফুল হব, আমি ফল হব। আমি সংসার করব, ভালবাসব, ভালবাসা পাব। আমার একটা অর্থ থাকবে। আমার একটা

মূল্য থাকবে। আমি আলোর অভিসারী। দিদির ধারালো মুখ দেখতে পাচ্ছি। সুরেলা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। দিদির এই আত্মহত্যার পশ্চাৎপটেও গভীর একটা রহস্য আছে, আমি ধরতে পারছি না। আর যাই হোক অজ্ঞাত মৃতদেহ হিসেবে গাদায় ফেলে দেবে, তারপর কঙ্কাল করে বেচে দেবে ডাক্তারির ছাত্রর কাছে, এ আমি চাই না। মৃত্যু আমারও হবে— আজ হোক, কি চল্লিশ বছর পরে হোক। আমার মৃত্যু আমাকে তখন ক্ষমা করবে না। আচমকা গলা দিয়ে প্রতিবাদ বেরিয়ে এল, না, না, তা কেন করবেন, যতই হোক আমার দিদি তো!

দারোগাসায়েব মুচকি হেসে বললেন, এই হল হিন্দু। কিছুতেই সংস্কার ছাড়তে পারে না। বেশ ঠিক আছে। আমি লাশ নামিয়ে পোস্টমর্টেমে পাঠাচ্ছি। সন্ধেবেলা আপনারা ডেলিভারি নিয়ে আসবেন। এক মুহূর্ত বিরতি। নিমেষে চলে গেলেন জ্যোতিষে, আচ্ছা কোনও স্টোন ধারণ করলে পারিবারিক অশান্তি কমা, কি কুইক প্রমোশন, এইসব হতে পারে?

কেন পারে না? কাকাবাবু আবার খেলাতে লাগলেন, জেম থেরাপিতে কিছু কাজ অবশ্যই হয়। তবে দেখেশুনে, কোষ্ঠীবিচার করে পাথর দিতে হবে। আপনার কোষ্ঠী আছে?

শুধু কোষ্ঠী, গাছ কোষ্ঠী। আপনার আজ সময় হবে?।

এই যে এক ফ্যাচাং। সারাটা দিন তো এইতেই যাবে। তা না হলে আজ দিন তো ভালই ছিল।

আপনাদের কিচ্ছু করতে হবে না। সব আমি করিয়ে দিচ্ছি। এই থানা থেকেই বডি পাইয়ে দেব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ আপনি আমার গেস্ট। কী পছন্দ করেন চিকেন না মাটন?

আমি তান্ত্রিক, মাটনই আমার পথ্য।

আমরা সদলে বেরিয়ে এলুম থানা থেকে। কানে লেগে রইল একটি প্রশ্ন, চিকেন না মাটন। পৃথিবী বেলাভূমির মতো, জীবনের ঢেউয়ে মৃত্যুর পদচিহ্ন মুছে যেতে এক লহমা সময় লাগে। গত সন্ধ্যায় দিদি লুচি ভাজার আয়োজন করছিলেন। ময়ান দেওয়া ময়দার তাল এখনও পড়ে আছে ডেকচি চাপা। কড়ায় পড়ে আছে শুকনো আলুর দম। পেটের খিদে, মনের খিদে, খিদে নিয়েই চির বিদায়। পৃথিবীর যতেক মানুষের খিদে কিন্তু রয়েই গেল। এঁরা কী করে চিকেন-মাটনের কথা ভাবছেন!

পুলিশ-পুলিশ করে সারাপাড়া ভেঙে পড়ল। যাঁরা বাজারে যাচ্ছিলেন তাঁরা থমকে গেলেন। কাজের মহিলারা ময়লা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ট্যাঁক থেকে খইনির পুরিয়া বের করে নীচের দাঁত আর ঠোঁটের মাঝখানে পুরে পিচ পিচ করে থুতু ফেলতে লাগল। চারিদিকে দন্ত্য স-এর ছড়াছড়ি। শাড়ি আর তেলচিটে খোঁপা আর বিনুনির মেটেমেটে গন্ধ। বারান্দায় বারান্দায় বউ আর লুঙ্গি-পরা কর্তাদের ঝুঁকে থাকা ঝুল মূর্তি। কারও কারও মুখে সিগারেট। গবেষণার অন্ত নেই। ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া। এ পাড়ায় কবে কে আত্মহত্যা করেছিল। সেই মেনিদার খ্যানখ্যানে গলা।

দারোগাসায়েব ঘটনাস্থলে ঢুকেই জাত-দারোগা হয়ে গেলেন। ঝুলে থাকা দিদির দেহটাকে যৎপরোনাস্তি পর্যবেক্ষণ করলেন। যে-অংশে আগুনের ঝলসানি সেই অংশটা দেখলেন। মেঝে থেকে হারটা তুলে নিয়ে বললেন, এর দাম অনেক।

কাকাবাবু বললেন, ওটার যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন। দেখবেন মালিক যেন ফিরে পায়।

এরই ফাঁকে একবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে জমায়েতকে ধমকধামক লাগিয়ে এলেন। পুলিশের কালো গাড়ি চেপে দিদি চলে গেলেন কাটাই-ছেঁড়াই হতে। আমরা দু'জনে আবার থানায়। পাড়া থেমে পড়েছিল আবার চালু হয়ে গেল। উত্তেজনা থিতিয়ে গেল।

থানায় আমাদের একটা স্টেটমেন্ট লিখে সই করতে হল। যা জানি, যা ঘটেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এক মহিলার চকিত জীবনকাহিনি। গগনচন্দ্রের চেহারার বর্ণনা। সব জমা পড়ে গেল মহাফেজখানায়। দিদির সেই পোঁটলা পড়ে আছে একপাশে। হারের সঙ্গে আমাদের দু'জনের সই করা একটা স্টেটমেন্টও জমা পড়ল।

কাকাবাবু সবশেষে জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কী ধরনের ঝামেলা আসতে পারে?

দারোগাসায়েব ঠোঁটে সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে বললেন, পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। প্রবলেম হল ওই পুড়ে যাওয়াটা। মনে হতে পারে প্রথমে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল, তারপর ঝোলানো হয়েছে। এখন ঝুলোতে গেলে একটা কিছুর ওপর উঠতে হয়। সেরকম কিছু কি ছিল ঘরে? খেয়াল করতে পারছি না তো। ছিল কি?

আমরা তিনজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। সিগারেটের ধোঁয়া রোদের রেখায় পাক মারছে ছিন্নমস্তার ধূমল চুলের মতো। দাঁড়িয়ে আছেন সেকেন্ড অফিসার। হাতের তালুতে ব্যাটন ঠুকছেন।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে আমি তখন জাগে, সেই আমিটা কে?

আঠারো ঘায়ের এক ঘা। কীসের ওপর দাঁড়িয়ে দিদি গলায় ফাঁস আটকেছিল? এই সন্দেহ তুলে দারোগামশাই জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগলেন। ওটা নাকি একটা ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট। একটা টুল, একটা চেয়ার, যা হয় একটা উঁচু কিছু থাকা উচিত ছিল ঘরে। নেই কেন?

সিগারেটের ধোঁয়ায় পাক মারছে দারোগামশাইয়ের প্রশ্ন।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে আপনি কী সন্দেহ করছেন?

সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে, ঠোঁট ছুঁচোলো করে ধোঁয়া ছেড়ে অফিসার বললেন, বিশ্রী রকমের একটা সন্দেহ। ইট মে বি এ কেস অফ মার্ডার। আগে মেরেছে তারপর ঝুলিয়েছে।

কে মেরেছে? কাকাবাবুর প্রশ্ন।

সেটা তো আপনারাই বলবেন।

কেন, পোস্টমর্টেম বলতে পারবে না?

তা অবশ্য পারবে। অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে। সেই সন্ধে পর্যন্ত। জটটা আমাদেরই ছাড়ানো উচিত, তা না হলে আর ইনভেস্টিগেশন কী হল! ভাবছি আর একবার যাই ঘটনাস্থলে।

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সেই প্যাঁচ! পুলিশি প্যাঁচ মারছেন! ভুলে গেলেন আমাদের সম্পর্ক!

দারোগামশাই ফিক করে হেসে বললেন, আইনের সঙ্গে মানুষের একটাই সম্পর্ক, বিচার অথবা অবিচার? আমি যদি অবিচার করি, পাঁচজনে বলবে ব্যাটা ঘুষখোর! পাঁচ হাজার পকেটে পুরে, নিজে খেয়ে অন্যকে খাইয়ে, খুনকে আত্মহত্যা বলে চালাচ্ছে। পাবলিকও কিছু অন্যায় করবে না, এইরকমই তো হচ্ছে আজকাল। আর এ পাড়ার পাবলিক তো একজন, মেনি মুখার্জি। এই এল বলে, মুখে জরদা-পান ঠুসে!

কাকাবাবু বললেন, আর বলতে হবেনা, একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তবে পাঁচ হাজার পারব না, দেড় হাজার। দেড় একটা ভাল সংখ্যা। সবসময় এককে ঘিরে থাকবেন। একে চন্দ্র! আমি। আমার ভাইপোকে বলছি, এখুনি নিয়ে আসছে।

আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। ধরেছেন ঠিক। যে-দেবতার যে-নৈবেদ্য! দেড় খুবই কম। কেস তো সিরিয়াস! অনেককেই খিলাতে-পিলাতে হবে। যাই হোক আপনাকে কী আর বলব! আপনি গুণী মানুষ!

কাকাবাবু থানার বাইরে এসে আমাকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, বাড়িতে ক্যাশ কিছু আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হাজার পাঁচেক আছে।

যাও একটা খামে ভরে দেড় নিয়ে এসো। যেমন কর্ম তেমন ফল। এবার তোমার একটু সাবধান হবার সময় এসেছে। আর ওই মেয়েটির খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসো। ও তোমার জীবনের রাহু, গ্রাস করে বসে আছে।

সংসার তোমার হবে না বাপু। একমাত্র সন্ন্যাস, সন্ন্যাসই তোমার পথ। গতানুগতিক জীবন তোমার নয়। তোমার কোষ্ঠী আমার মুখস্থ। যাও টাকাটা তুমি নিয়ে এসো। দারোগাকে ততক্ষণ আমি একটু মালিশ করি।

বাড়ির সামনে থেকে ভিড় সরে গেলেও, মেনিদা ঠিক ঘুরঘুর করছেন। চোখ-মুখ যেন পুরুষ্টু লাল একটি লঙ্কার মতো। চনমন চনমন করছেন। মানুষের সর্বনাশে মহা উল্লসিত! আমি যখন চাকরি পেলুম, মেনিদা তখন বিষ্টুদার দোকানে চা খেতে খেতে বলেছিলেন, চাকরি পেলে কী হবে, মাইনে পাবে না। এ পাড়ায় কেউ পরীক্ষা দিলে মেনিদা তার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলেন, কী হে তোমার রেজাল্ট কবে বেরোবে! কেউ পাশ করেছে শুনলে ভীষণ দুঃখ পান। কারও অসুখ করেছে শুনলে, দু'বেলা দেখতে ছোটেন! পরিবার পরিজনকে নানাভাবে ভয় পাইয়ে দিয়ে আসেন। ইদানীং এক ভণ্ডামি ধরেছেন, ভোরবেলা একটা খঞ্জনি হাতে নগর-পরিক্রমায় বেরোন। খাঁই খ্যাঁচা শব্দে আর মিনমিনে গলার মিলনে সে এক অপূর্ব মহানাম। ভালভাবে উচ্চারণ করারও ক্ষমতা নেই। হরে কৃষ্ণ, হরে রাম হয়ে দাঁড়ায়, হচে কৃষ্ণ, হচে রাম। ঈশ্বরের কী মহিমা! হরে উচ্চারণ করলে যে উদ্ধার পেয়ে যাবেন। নাকের ওপর পাউডারের তিলক-সেবা। পাউডার আর সাবু একসঙ্গে ফেটিয়ে ওই শিল্পকর্মটি করেন। এক রাউন্ড মেরে এসেই তেলেভাজার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। গনগনে উনুন। কড়ায় টইটম্বুর তেল। গোল গোল ফুলুরি সাঁতার কাটছে। সামনে মেনিদা আর ভোলা ষাঁড়। দোকানির নাম নিত্যানন্দ। মেনিদা তেল মারছেন, নিত্যানন্দ প্রেম বিলোতে এসেছিলেন। তুমি এসেছ ভক্তজনকে প্রেমসে তেলেভাজা বিলোতে। নিত্যানন্দ প্রথমে ষাঁড়কে একটি বেগুনি খাওয়াবে, পরে মেনিদাকে দুটি ফুলুরি শালপাতায় মুড়ে দেবে। সেটিকে কপালে ঠেকিয়ে মেনিদা মিনমিনে গলায় বলবেন, জয় রাধে!

আমাকে দেখে মেনিদা এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, স্কোয়ার আপ স্কোয়ার আপ। সব শত্রুতা ভুলে যাও। জানবে, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মহামতি গোখলে অগ্নিযুগে আমাদের বলেছিলেন। আমরা তখন দেশের স্বাধীনতার জন্যে আলুপটলের মতো প্রাণ দিচ্ছি। সংসার টংসার সব চুলোয় গেছে। টেগার্টকে টার্গেট করে আমরা তখন ছাতা মাথায় ঘুরছি। জামার পকেটে রিভলভার। গলায় গুলির মালা। শ্রীরঙ্গমে যাই। এক এক দিন এক এক মেকআপ। লালবাজারের সামনে ঘুরি। কাওয়ার্ড। সায়েব ভয়ে আর বেরোয় না। এর নাম ইংরেজের বাচ্চা! সাহস থাকে বুক পেতে দে রিভলভারের সামনে। আমরাও ছদ্মবেশে, সে ব্যাটাও ছদ্মবেশে। একদিন দেখি বোরখা পরে বেরিয়ে আসছে। ধরেছিলুম ঠিকই, ভেরিফাই করতে গিয়ে পালাল। ভেরিফাই করতে গেলুম কেন জানো, ক্ষুদিরামের কেস যেন না হয়ে যায়—বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ইংলন্ডবাসী। সত্যিই যদি মুসলমান রমণী হয় তা হলে তো কম্যুনাল রায়ট বেধে যাবে! বিপ্লবের পথ বড় কঠিন পথ! তা ওই মেয়েমানুষটি কে?

গা আমার জ্বলে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক আমার পিতার ভাষায় ক্রিস্ট্যালাইজড ইডিয়েট। তবু ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিতে হল, এই তো আপনিই বললেন, বোরখা-পরা টেগার্ট।

আরে ধুর! মেনিদা কাকতাড়ুয়ার মতো নেচে উঠলেন, আরে আমি অতীত থেকে বর্তমানে চলে এসেছি, গলায় দড়িটা কে? তোমাদের বাড়িতে তো আগে দেখিনি কখনও।

জানার খুব প্রয়োজন?

বাঃ জানতে হবে না। বাইবেলে আছে, লিভ ফর আদার্স। অন্যের জন্যে বাঁচো। বি এ গুড সামারিটান। তুমি তো জানো আমি অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করি। নিজের ঘরসংসার তো ছেড়েই দিয়েছি। জনহিতকর কাজে সারাদিন ঘুরছি। আর মনে মনে বলছি, তোমার পকাতা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শতকি।

কানে খট করে লাগল, এ আবার কী? পকাতা? শতকি?

না বলে পারলুম না, পকাতা শতকি মানে?

মেনিদা খ্যাঁত খ্যাঁত করে হেসে বললেন, একে বলে ম্যালাপ্রপিজম। রোগটা ইংরেজদেরই হয় তবে আমারও তো সাদা চামড়া। ক'জন বাঙালির এমন গায়ের রং ছিল বলো! এখন একটু পুড়ে গেছে পৃথিবীর শোকে-তাপে। তোমার বউদি তো বাসরঘরে প্রথম প্রশ্নটাই করেছিল ইংরেজিতে— হোয়াটস দ্যা টাইম নাও। বোককা মেয়ে, বোককা মেয়ে, ভেবেছিল পাঞ্জাবি পরা সায়েব! ওটা হবে পকাতা। না না পকাতা নয়, পতাকা, শতকি নয় শকতি। আরে লাইনটা তো তুমি বহুবার শুনেছ, তোমার পকাতা, না দাঁড়াও, ধরে ধরে বলি, তোমার পতাকা...।

আমার ভয়ংকর তাড়া! পরে শুনব।

আমারও অনেক কাজ; তবে কী জানো, বিপ্লবী ছিলুম তো, তাই নিজের স্বার্থে দিয়া বলি পরের স্বার্থে ছুটি। এখন আবার মহাপ্রভু ঘাড় ধরেছেন। নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। নাম প্রচার। ঘুমন্ত মানুষের কানে ঢেলে দাও মধুর হরি নাম। উঃ, গায়ে কাঁটা দেয়। মহাপ্রভু স্বপ্ন দিলেন, ওরে যা, তাপিত আর্তজনে নাম বিতরণ কর। আর ঘুমায়ো না মন। মায়াঘরে কত দিন আর রবে অচেতন। কে তুমি কী হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে। দেখো রে নয়ন মেলে অরুণ তপন। নিজেকে ভুলে যেয়ো না পিন্টু। সব আন্ডিল বান্ডিল বেঁধে প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করে দাও। বাই এনি চান্স, তোমার কাছে গোটাদশেক টাকা হবে? জানোই তো আমার দিন চলে মাধুকরী করে।

এক টাকা আছে।

ঠিক আছে, নাইন শর্ট। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আলু কিনে বাড়ি যাই; কিন্তু মেয়েমানুষটি কে ছিল? সাক্ষাৎ বৈষ্ণবী। ওই নাক, ওই কপাল। রসকলি করলে রস যা জমত! হঠাৎ আত্মহত্যা করল কেন? গর্ভবতী হয়েছিল নাকি?

আবার আমার মনে হল, সেদিনের মতো মারি এক থাপ্পড়। লোকটা যেন বজ্জাতের জিলিপি। নিজেকে যথেষ্ট সংযত করে বাড়িতে ঢুকলুম। গোটা বাড়ির পরিবেশ থমকে গেছে। মৃত্যুর গন্ধ। সিঁড়ির প্রথম ধাপে মুকু বসে আছে। গালে হাত। কাজের মেয়েটি বলছে, একেই ভূতের বাড়ি, আরও একটা ভূত বেড়ে গেল। রাতের বেলা সব থাকবে কী করে! আমার তো এখনই গা ছমছম করছে। পুজোটুজো দাও। তোমাদের বাড়িতে গ্রহ লেগে গেছে।

মুকুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করল না। পাশ দিয়ে সোজা উঠে এলুম ওপরে। দেড় হাজার টাকা নিয়ে এখনই আমাকে থানায় ছুটতে হবে। আলমারিতে কাপড়ের ভাঁজে আমার ব্যাগ আছে। সেই ব্যাগে আছে টাকা। আলমারি খুলে যথাস্থানে হাত বাড়াতেই ব্যাগটা পেয়ে গেলুম। চামড়ার ব্যাগ। সোনালি মনোগ্রাম, এইচ

এস। হরিশঙ্কর। ব্যাগটার একটা ইতিহাস আছে। আমার জ্যাঠামশাই কোনও এক কালে আমার পিতাকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি আবার উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। কারণ তাঁর ব্যাগের কোনও প্রয়োজন হত না। তিনি টাকা রাখতেন খামে। সোনার হাতঘড়ি খাপেই থাকত। কখনও হাতঘড়ি পরতেন না, কারণ বিলাসিতা।

ব্যাগটা খুলেই চক্ষু স্থির। একটাও টাকা নেই। সব হাওয়া। পাগলের মতো আলমারি হাঁটকাতে লাগলুম। নিমেষে সব ওলটপালট। আমার স্পষ্ট মনে আছে ব্যাগে আমার সব জমানো টাকা অত্যন্ত সাবধানে রেখেছিলুম। আলমারির চাবি খোলা কেন? খোলা থাকার তো কথা নয়। অদ্ভুত একটা শূন্যতা নেমে এল। সব ঝিমঝিম করছে। আমার নিজেরই আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হচ্ছে।

আলমারির সমস্ত মাল মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলেছি। কোথায় কী? টাকার নামগন্ধ নেই। মুকু এল গম্ভীর মুখে। বিমর্ষ গলায় প্রশ্ন করল, কী খুঁজছ অমন লন্ডভন্ড করে?

আমার টাকা। এই ব্যাগে আমার পাঁচ হাজার টাকা ছিল। ব্যাগ খালি।

তার মানে?

তার মানে ব্যাগে টাকা নেই। আলমারি যদ্দুর জানি চাবি দেওয়া ছিল, এখন দেখছি চাবি খোলা।

মুকু মেঝেতে বসে পড়ে বললে, আমি তখনই জানতুম, চিল যখন পড়েছে কুটো না নিয়ে উড়বে না। আলমারির তালা ভেঙে টাকা নিয়ে হাওয়া।

কী হবে এখন? থানায় যে দেড় হাজার টাকা দিতে হবে!

আমার কাছে ঠিক দেড় হাজার টাকাই আছে, নিয়ে যাও। দিয়ে এসো খেসারত।

নীচে নেমে এলুম। কাজের মেয়েটি বললে, দেখুন তো এটা কোনও দরকারি কাগজ কি?

এক টুকরো কাগজ। একটা ক্যাশমেমোর পেছন দিক। পরিষ্কার লেখা, পিন্টু, চলে যাওয়াই ভাল। তবে পৃথিবীর কোথাও নয়, একেবারে পৃথিবীর বাইরে। যে-হারটা নিয়ে এত সমস্যা, সেটা আমারই। আমার মামার বাড়ির বহুমূল্য চন্দ্রহার। আমার দিদিমা গোপনে আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন। এতকাল বুকে করে আগলে রেখেছিলুম। শেষ পর্যন্ত পেরেওছি। গগন ওইটার সন্ধানেই এসেছিল। ময়দার তালের মধ্যে ঢুকিয়ে গগনকে বোকা বানিয়েছিলুম। আর যাই হোক আমি চোর নই। পিন্টু, ওই হারটা তোমার বিয়ের সময় মুকুর গলায় পরিয়ে দিয়ো। তোমার হতভাগিনী গরিব দিদির উপহার। আমাকে মনে রেখো না। আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। পৃথিবীতে আমরা এইভাবেই আসি, যাই। তোমার দিদি।

স্বার্থপরতার কী খোলতাই রূপ! কোথায় অসহায়া এক মহিলার প্রতি অবিচারের জন্যে মর্মাহত হব, তা না, মনে হল হাতে স্বর্গ পেয়েছি। এই তো সেই আত্মহত্যার চিঠি। অপূর্ব ওই হারটার জন্যে মনে লোভও জেগেছিল। এখন সেইটা বুঝতে পারছি, যাক পুলিশের হেফাজত থেকে হারটা আমাদের হাতে এসে যাবে এই এক চিঠির জোরে। তিরবেগে থানার দিকে দৌড়োলুম। যেতে যেতে ভাবলুম, দেড় হাজার টাকাও তো বাঁচানো যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ হাজারের শোক ভুলে গেলুম।

কাকাবাবু আর দারোগাসায়েব কেউই অফিসঘরে নেই। সেকেন্ড অফিসার বললেন, দু'জনেই কোয়ার্টারে। যান না, চলে যান। পাশের গলিতে ঢুকলেই দোতলার সিঁড়ি।

রারান্দায় বসে আছেন দু'জনে মুখোমুখি। কাকাবাবুর হাতে সেই পরিচিত লেনস্। দরজার সামনে এক রাগী চেহারার ভদ্রমহিলা। দারোগাবাবুর স্ত্রী। মাঝে মাঝেই স্বামী সম্পর্কে একটা-দুটো মন্তব্য ছুড়ছেন। প্রথম যেটা কানে এল তার ভাবার্থ, গাধারাও নাকি ওই ভদ্রলোকটির চেয়ে বুদ্ধিমান।

কাকাবাবুর কানে কানে বললুম, একটা চিঠি পেয়েছি।

চিঠিটা তাঁর হাতে দিলুম। টেবিলের আড়ালে কোলের ওপর রেখে দ্রুত পড়ে নিলেন।

কানে কানেই বললুম, আর টাকা দেওয়ার প্রয়োজন আছে? হারটাও চেয়ে নিন।

কাকাবাবু চিঠিটা এগিয়ে দিলেন অফিসারের দিকে। দিয়ে বললেন, কেসটা মনে হয় একটু সহজ হল। এটা হত্যা নয়, আত্মহত্যাই। আর হারটাও আমাদের সম্পত্তি।

দারোগাবাবু চিঠিটা পড়লেন ভুরু কুঁচকে। তারপর একটা প্যাঁচ মারলেন, দিদি কে? নাম কোথায়? সবাই তো দিদি। কোন দিদি? এই চিঠিটা তো ম্যানুফ্যাকচার্ড হতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, হাতের লেখা মেলান।

হাতের লেখা পাব কোথায়? বেশ বললেন যা হোক!

আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বললুম, পুঁটলিতে একটা পকেট গীতা আছে। তার মধ্যে হাতের লেখা থাকতে পারে।

দারোগাসায়েব হেসে বললেন, অশান্তি করে লাভ কী? কেস তো ফয়সালা হয়েই গেছে। তবে হারটা আমাদের কাস্টডিতেই থাকবে। ওটার জন্যে সেপারেট ইনভেস্টিগেশন। অমন একটা মূল্যবান জিনিস এমন একজন রেচেড মহিলার অধিকারে আসে কী করে? একটা সাধারণ সাদামাটা হার হলে কিছু বলার ছিল না। তা ছাড়া এর পেছনে আর একটা আননোন লোকের কানেকশন আছে। দেখতে হবে কোনও থানায় কোনও কেস জমা পড়ছে কি না? উই আর টু ওয়েট। আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। নিন আমার স্ত্রীর হাতটায় ঝপ করে একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

কাকাবাবু বললেন, টাকাটা কি তা হলে দেওয়ার প্রয়োজন আছে?

অবশ্যই আছে। খরচ নেই? কত খরচ! গলায় দড়ি কি যে-সে জিনিস মশাই? ক'টা গলায় দড়ি দেখেছেন?

কাকাবাবু আমার হাত থেকে টাকাটা নিয়ে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা চালান করে দিলেন স্ত্রীর হাতে। যেমন দ্যাবা তেমনি দেবী। তিনি যেন কপ করে মিড অনে একটা ক্যাচ ধরলেন। মুকুর দেড় হাজার আউট হয়ে গেল। ওই টাকাটা এখুনি আমাকে যেমন করেই হোক জোগাড় করে মুকুকে ফিরিয়ে দিতে হবে। একমাত্র উপায়, ব্যাঙ্কে চলে যাওয়া।

দারোগাসায়েব আমাকে জানালেন, আপনি এখন আসতে পারেন, আমাদের একটু অ্যাস্ট্রলজি হবে।

কাকাবাবু আমাকে ইশারায় জানালেন, সরে পড়ো।

ফিরে এলুম স্বগৃহে। মুকু ভীষণ ভেঙে পড়েছে। আমাকে জিজ্ঞেস করলে, চিরকুটে কী লেখা ছিল?

আর জেনে কী হবে?

আমার ওপর রাগ করেছ? তোমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়েছি বলে?

রাগ করিনি মুকু। আমার ভীষণ অভিমান হয়েছে একজনের ওপর, তিনি হলেন আমার পিতা। তিনি যদি আমাকে পরিত্যাগই করবেন ভেবেছিলেন, তা হলে সেই শৈশবেই ফুটপাথে বসিয়ে দিয়ে এলেই পারতেন! জীবনটা ভিখিরি হয়েই শুরু করতুম। তাঁর নিজের অতীতটাও কেন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেলেন। আমার অতীত আমিই তৈরি করে নিতুম। এই বর্তমানের ওপর দাঁড়িয়ে আমার কোনও ভবিষ্যৎ তৈরি হবে।

মুকু ছলছলে চোখে বললে, তোমার ভবিষ্যৎ থেকে আমি নিজেই সরে দাঁড়াতে চাই। মনে হয় আমি একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলছি।

দিদি আমাদের একটা জবরদস্ত আঘাত দিয়ে গেলেন। ওই হারটা চোরাই নয়। ওটা দিদিরই হার। গগনের গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্যে ময়দার তালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। চিরকুটে সব লিখে দিয়ে গেছেন। চিরকুটে আছে, হারটা আমি মুকুকে দিয়ে গেলুম, বিয়ের উপহার। সেই হার এখন পুলিশের গ্রাসে। আমাদেরই পাকামোর ফল। নিজেকে সবজান্তা ভাবা উচিত নয়। সবসময় ইনটিউশন কাজে লাগে না। অহংকার বেড়ে যায়। মাঝখান থেকে কপর্দকশূন্য হয়ে গেলুম। পাঁচ-পাঁচ হাজার টাকা হাওয়া হয়ে গেল। তোমার কাছে ধার হয়ে গেল দেড় হাজার। তা ছাড়া এই আশ্রয়টুকুও গেল। এ বাড়িতে থাকব কেমন করে? কেবলই মনে পড়ে যাবে একটা মৃতদেহ ঝুলছে। কেবলই শুনতে পাব পায়ের শব্দ, একটা গলার আওয়াজ। ওপরে উঠে আসার সময় তিনি আমাকে করুণ গলায় বলেছিলেন, পিন্টু, আমি তো তোমার আশ্রয়ে এসেছিলুম। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মুকু। নিজেকে দৈবশক্তির অধিকারী ভাবলে এই হয়! ঠাস করে গালে এক চড় মেরে ভগবান উচিত শিক্ষা দিয়ে যান।

মুকু আমার হাতদুটো ধরে বললে, ক্ষমা করে দাও। আজই আমি চলে যাচ্ছি।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। রণে ভঙ্গ দেওয়াটাই সহজ কাজ। বললুম, তা তো যাবেই। সব লন্ডভন্ড করে দিয়ে চলে যাওয়াটাই সহজ কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ। এক মুহূর্তও সময় লাগে না। তোমার যা মন চায় তাই করো, আমি এখন ব্যাঙ্কে যাই। এ বাড়িতে তো আর হাঁড়ি চাপবে না। কাগজপত্র নিয়ে নেমে এলুম পথে। গলগলে রাস্তা রোদে ভাসছে। সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে চোখে প্রশ্ন নিয়ে। রাষ্ট্র হতে আর বাকি নেই। মাননীয় হরিশঙ্কর। ততোধিক মাননীয় তাঁর পিতা। ঊনবিংশ শতকের নামী এক শিক্ষাবিদ। সুপণ্ডিত। সুলেখক। সাধকোপম এক চরিত্র। সেই বাড়িতে বিধবা রমণীর আত্মহত্যা! সেই বাড়িতে পুলিশ! আমার মনে হচ্ছে মাথায় ঘোমটা দিয়ে হাঁটি। একটা মানুষ নয়, পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে মানুষের একটা খোলস। মন না মতিভ্রম! কবিতা আর রোমান্টিক উপন্যাস পড়ে প্রেমিক হতে চেয়েছিলে জানোয়ার! শ্রীরাধার সন্ধানে কলির কেষ্ট! রাসলীলা হচ্ছিল। এইবার তুমি মরো। তোমার মানসম্মান পথের ধুলোয় লুটোতে লুটোতে যাক। এ তো বিবস্ত্র হয়ে যাবার মতোই একটা ঘটনা।

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে গিয়ে চেক জমা দিয়ে হাতে একটা টোকেন নিয়ে ঘিজিমিজি ভিড়ে বেঞ্চের একপাশে সরে এসে বসে আছি জড়োসড়ো হয়ে। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সারারাত ঘুম নেই। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা। ডাক পড়ল। চেক ফিরে এসেছে। সই মেলেনি। আবার সই করুন। চেকটা হাতে নিয়ে একপাশে সরে এসে ভাবছি, জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে কী সই ছিল, পুরো নাম, না ইনিশিয়াল! একা একা এই আমার প্রথম টাকা তোলা।

পাশে এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। হাতের ওপর ফরসা একটা হাত এসে পড়ল। অবাক কাণ্ড, মুকু। তুমি! তুমি এলে কী করে?

সাইকেল রিকশা করে। বাড়ি চলো। তোমার টাকা পাওয়া গেছে। তুলতে হবে না।

কোথায় ছিল?

আস্তে! আস্তে কথা বলো। চলো, বলছি।

ভীষণ তৃষ্ণার্ত আমি। এই নদী, এই ছায়াবট
আমাকে ফিরিয়ে দেয় ফেরত চিঠির মতো বিবর্ণ বিকেলে॥

সবই অদ্ভুত। কোথা থেকে কী হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। টাকাটা বেরোল কোথা থেকে? আলমারিতে কাপড়ের ভাঁজে ছিল না। ছিল রান্নাঘরের তাকে, একটা খালি কৌটোর ভেতরে। কারণটা কী? কে সরিয়েছিল ওখান থেকে এখানে।

মুকু আর আমি দু'জনেই এলিয়ে পড়েছি বারান্দার মেঝেতে। সামনেই বিবর্ণ রেলিং। গাছপাতার আড়ালে আড়ালে ফালি ফালি নীল আকাশ। আমাদের শরীরে আর এক বিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। মনের জোরটাই এখন আমাদের মেরুদণ্ড। আলগা হয়ে গেলেই শুয়ে পড়ব। হরিশঙ্করের ছেলে বলেই বসে আছি। মুকু বসে আছে হরিশঙ্করকে গুরু বলে মানার ফলে। সেই শক্তির নদী থেকে আঁজলাভর তুলে পান করেছে বলে।

দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। যেন আকাশ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। আমার মনে যে অনুভূতি খেলা করছে তা বড় অদ্ভুত। যেন আমরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী। এইমাত্র আদালতের রায় আমাদের হাতে এসেছে— বিবাহবিচ্ছেদের রায়। একটু পরেই আমাদের সম্পর্ক, সংসার সব ভেঙে যাবে। দু'দিনের তরে মিলেছিলুম। দু'দিনের খেলা শেষ।

মুকু বললে, আমার কী মনে হচ্ছে জানো, দিদি ছিলেন এক অসাধারণ চরিত্রের মহিলা। তিনি আমাদের বাঁচাতেই চেয়েছিলেন। গগনকে যখন পাখা দিয়ে পেটাচ্ছিলেন তখন ওই টাকাটা গগনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। টাকাটা গগনই আলমারির তালা ভেঙে হাতিয়েছিল। আর গগনই দিদিকে কায়দা করে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল। আমরা আমাদের বন্ধুকে শত্রু ভেবে কী অন্যায়টাই করে ফেললুম! আর তো তাঁকে ফেরানো যাবে না।

সদর খোলাই ছিল। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। একজোড়া পা উঠে আসছে ওপরে। প্রথমে টিপ। পেছনে টিপের মা। পা টিপে টিপে দু'জনে এগিয়ে আসছেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। উদ্বেগ-মাখানো মুখ। কোনও শব্দ না করে নিঃশব্দে দু'জনে মুকুর দু'পাশে বসলেন। আমি কোনওরকমে সামান্য একটু হাসি আনার চেষ্টা করলুম। ফল হল উলটো। এতক্ষণের জমাট কান্না গলে বেরিয়ে এল। কিছুতেই আর থামাতে পারলুম না নিজেকে। টিপের মা এগিয়ে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। কমলালেবু রঙের শাড়ি। সবে স্নান করেছেন। পিঠে ছড়িয়ে আছে এলো চুল। ছোট্ট কপালে সিঁদুরের টিপ। চুলের তেলের মিষ্টি গন্ধ। ফরসা হাতে মোটা শাঁখা। মনে হল। আমার মা এসেছেন। তিনি কোনওরকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন না। তাঁর নরম

ভারী হাত আমার পিঠ বেয়ে নামছে আর উঠছে। আর আমার ভেতরটা ফেটে যাওয়ার মতো হচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। শাড়ির আঁচলের একটা কোণ দিয়ে তিনি আমার চোখ মোছাতে লাগলেন। বহুকাল পরে এই প্রবল দুঃখের মুহূর্তে আমি যে স্নেহ পেলাম, তা যেন নদীর মতো। ভোরবেলা মুকুলিত আম্রকুঞ্জে গেলে যে অনুভূতি হয় সেইরকম এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে আমার মনে। শীতল পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকালে এমন হয়। বহু ক্রোশ হেঁটে ক্লান্ত সন্তান ফিরেছে মায়ের কোলে। মনে হচ্ছে, কোলে মাথা রেখে তলিয়ে যাই গভীর ঘুমে। যেমন করে ঝিনুক তলিয়ে যায় সমুদ্রের অতলে।

এমন একটা নীরব সভা তছনছ হয়ে গেল। মূর্তিমান দৈত্যের মতো উদিত হলেন অক্ষয় কাকাবাবু। এগিয়ে আসতে গিয়ে থমকে গেলেন। এত মেয়ের মাঝে কেন বসে আছি আমি? আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন এক মহিলা। এ তো ভয়ংকর অপরাধ! অক্ষয় কাকাবাবুর হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগটা নতুন। ব্যাগ কিনে বাজার করে ফিরেছেন। কাঁধে একটা নতুন গামছা। কোনও কথা না বলে একপাশ দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন রাগরাগ মুখে।

টিপের মা সরে বসলেন। টিপই প্রথম কথা বললে, আমরা ছুটে এসেছি রান্নাবান্নার ব্যবস্থা দেখতে। এই অবস্থায় তো আপনারা কিছু করতে পারবেন না। উঠুন, চানটান করুন। সকালে চা-টা কিছু খেয়েছেন?

প্রথমে মনে হল মিথ্যে কথাই বলি। মুকু কিছুই খায়নি, আমি থানায় পাঁচনের মতো এক কাপ চা কোনওরকমে গিলেছি। উত্তর আর আমাকে দিতে হল না। কাকাবাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, এদিকে উঠে এসো। নষ্ট করার মতো সময় নেই। আসল কাজই বাকি। সারারাত শ্মশানে জাগতে হবে।

টিপের মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে উনি?

আমি ফিসফিস করে বললুম, আমার বাবার বন্ধু। আজই হঠাৎ এসেছেন। আসায় খুব উপকার হয়েছে। আমরা তো খুব বিপদে পড়েছিলুম।

আমরা তো কিছুই জানি না। এইমাত্র শুনলুম। শুনেই ছুটে এসেছি। রান্নার ব্যবস্থা করব, আগে একটু চা খাবে?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, জানি না। আমরা এখন কাকাবাবুর হাতে।

ওঁকে জিজ্ঞেস করব?

যদি রেগে যান?

রাগবেন কেন?

বউদি উঠে গেলেন। সোজা কাকাবাবুর সামনে গিয়ে পা স্পর্শ করে নমস্কার করলেন। কাকাবাবু আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে হাত তুললেন।

বউদি বললেন, উনুন ধরিয়ে আগে আপনাদের একটু চা করে দিই।

আমি জানি কাকাবাবু চা ভীষণ ভালবাসেন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, মুখের ভাব নরম হল। প্রশ্ন করলেন, আপনি কে?

আপনি বলবেন না। তুমি বলুন। আমার স্বামী পিন্টুকে ভীষণ ভালবাসেন।

কাকাবাবু বললেন, বুঝেছি। একটু চা হলে মন্দ হয় না। আমি উনুনটা ধরিয়ে দিই।

আমরা থাকতে আপনি উনুন ধরাবেন? আপনি শান্ত হয়ে একটু বসুন। আমরা সব করে দিচ্ছি। রান্নাও আমরা করে দেব।

কাকাবাবু বললেন, ওইখানেই আমি একটু গোলমাল করে রেখেছি, স্বপাক ছাড়া আমি কিছু খেতে পারি না। আমার গুরুর নির্দেশ। একটু আগে থানার দারোগা আমাকে খুব চিকেন মাটনের লোভ দেখাচ্ছিলেন।

বউদি বললেন, স্বপাক খুব ভাল। আমার বাবাও স্বপাকে খান। তবে ভাত ছাড়া তরকারি অন্যের হাতে খাওয়া চলে।

কাকাবাবু এইবার হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, বউমা, রান্না করতে আমার কোনও কষ্ট হয় না। রাঁধতে আমি ভালই বাসি। তুমি চিন্তা কোরো না। তুমি চা করো। বাকিটা আমরাই করে নোব।

কাকাবাবু ইশারায় আমাকে ডেকে ঘরে নিয়ে গেলেন। মুকুর দিকে তাকাচ্ছেনই না। আমার খুব খারাপ লাগছে। সে এমন কী করেছে যে তাকে এইভাবে হেয় করতে হবে! একটা চেয়ারে তিনি বসলেন। আমাকে বললেন, বোসো।

দু'জনেই চুপচাপ বসে রইলুম কিছুক্ষণ। হঠাৎ কাকাবাবু বললেন, তোমার প্ল্যানটা কী?

প্ল্যান মানে?

তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কী?

কোনও উত্তর দিতে পারলুম না। আমার তো কোনও পরিকল্পনাই নেই। ঘটনা যেদিকে নিয়ে যায় ঠেলতে ঠেলতে।

কাকাবাবু বললেন, তোমার পরিকল্পনা হল, ডেস্ট্রাকশন। ধ্বংস। তুমি ক্লীব হয়ে যাচ্ছ। মেয়েদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর থাকলে পুরুষ ক্রমশ ভেড়া হয়ে যায়। আমার কথা শুনবে?

বলুন।

ওই মেয়েটিকে প্রশ্ন করো, সে এখানে কেন আছে? কীসের জন্যে আছে? একটা যুবক ছেলে একটা যুবতী মেয়ে একসঙ্গে রয়েছে, বাড়িতে তৃতীয় আর কোনও প্রাণী নেই। এ কেমন কথা! এতটা অনাচার, এতটা স্বাধীনতা কি ভাল? তোমার কী মনে হয়?

আমি মনে মনে হাসলুম। ভদ্রলোক কিছুই জানেন না। মুকুর চরিত্র সম্পর্কে মানুষটির কোনও ধারণা নেই। মানুষের চিন্তা বাঁধা রাস্তা ধরেই চলে। সহজ হিসেব, দুই আর দুয়ে চার।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি কিছু জানেন না।

বলেই চমকে উঠলুম, উত্তরটা বড় উদ্ধত হল। ভয়ংকর অসম্মানজনক। তাই তাড়াতাড়ি যোগ করলুম, মুকুর চরিত্র আমার বাবার চেয়েও কঠোর। সে এখানে আছে, তিনি নেই বলে। আমাকে ধরে রেখেছে, যাতে আমি টলে না যাই।

স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী বলে একটা প্রবাদ আছে শুনেছ? নিজের সিদ্ধান্ত নিজে করার মতো বয়স তোমার হয়নি? তুমি কি এখনও নাবালক?

কাকাবাবু, ক'টা লোক নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে! পরামর্শ শব্দটা তা হলে আসত না।

মেয়েছেলের পরামর্শ।

কেন মেয়েরা কম কীসের?

জানো, মেয়েদের শাস্ত্রে অধিকার নেই।

কোন শাস্ত্র? সংসার-শাস্ত্রে মেয়েদের দ্বিতীয় আছে? বেদ-বেদান্ত নিয়ে কে মাথা ঘামায় কাকাবাবু?

শোনো, বাঁচতে যদি চাও ওকে বলো ওর জায়গায় ফিরে যেতে, আর তুমি বাড়িতে একটি তালা ঝুলিয়ে কিছুকালের জন্যে সরে পড়ো। তা না হলে বিপদে পড়ে যাবে। চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়েছ?

না ছাড়িনি, তবে ছাড়ব।

ছেড়ে?

দেখা যাক।

আমার ইন্টারফিয়ারেন্স তোমার ঠিক সহ্য হচ্ছে না, তাই না? হরিশঙ্করদার পরামর্শও তোমার পছন্দ হত না। জানো কি তোমার হাতে গার্ডল অফ ভেনাস আছে?

দেখুন জ্যোতিষে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। যা আছে তা আছে। যা হবে তা হবে। আমি ভগবানকে বিশ্বাস করি। আত্মসমর্পণে বিশ্বাস করি। যা করার তিনি করবেন। তিনি করছেন।

তা হলে তুমি মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করো, চাকরিবাকরি ছেড়ে উচ্ছন্নে যাও, বিষয়সম্পত্তি বেচে দাও। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে যা হয় তাই হোক। তুমি কি নিজেকে জিতেন্দ্রিয় ভাবো?

আমি জিতেন্দ্রিয় নই। মুকু জিতেন্দ্রিয়।

মেয়েদের তুমি কিছুই চেনো না। যখন ফেলে দেবে তখন আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকবে না। তোমার অবস্থা এখন অরক্ষিত সীমান্তের মতো। হুহু করে শত্রু ঢুকছে। রাজত্ব দখল হয়ে গেল বলে।

দেখাই যাক না, আপনার জ্যোতিষী জেতে না আমার আত্মবিশ্বাস!

কাকাবাবু বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, বিপদ আর ধ্বংস আসার আগে মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তোমারও তাই হয়েছে। আমার কথা যখন শুনবেই না, তখন আমারই বা কী দরকার পড়েছে বৃথা সময় নষ্ট করার। আগে তুমি গুরুজনদের ভক্তিশ্রদ্ধা করতে। তোমার সেই ভাবটাও চলে গেছে। কাম এক প্রবল রিপু। তোমাদের এই বয়েসটা তো ভাল নয়, তায় মাথার ওপর কেউ নেই। সোনায় সোহাগা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাকাবাবু। নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, আমার তা হলে এখন কী করা উচিত? যেচে অপমানিত হওয়া, না কি নিজের মানসম্মান গুছিয়ে নিয়ে সরে পড়া!

এইবার আমি একটু ভয় পেয়ে গেলুম। থানার দৃশ্য ভেসে উঠল। সন্ধের সময় ডেডবডি আসবে। ডেলিভারি নিতে হবে। ডেথ সার্টিফিকেট, শ্মশান। দারোগা যদি আবার প্যাঁচ মারে! একেবারে একা আমি। চারপাশ থেকে হিমশীতল ভয় আমাকে ঘিরে আসছে। এতক্ষণ নেশার ঘোরে তর্ক করছিলুম। অক্ষয় কাকাবাবুর জীবন সন্ন্যাসীর জীবন। নিজের কোনও সংসার নেই। যে-সংসার যখন বিপদে পড়ে ছুটে গিয়ে হাল ধরেন। জীবনের রোজগার সবই পরার্থে। কোনও কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন।

আমি উঠে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বিশাল শরীর। একসময় প্রচণ্ড ব্যায়াম করতেন। তাঁর হাতদুটো ধরে বললুম, ঠিকই বলেছেন, আমার মনে পাপ ঢুকেছে। আপনি যা বলবেন, আমি তাই করব। তর্ক করেছি বলে ক্ষমা চাইছি।

দু'কাপ চা নিয়ে টিপ ঢুকছে। আমাদের নাটক থেমে গেল। টিপ চায়ের কাপ হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, একেবারে খালি পেটে চা খাবেন? কিছুই যে আর খুঁজে পেলুম না।

কাকাবাবু টিপের মাথায় হাত রেখে বললেন, তুমি বড় ভাল মেয়ে, সর্বসুলক্ষণা। তোমার চন্দ্র তুঙ্গী। তোমার লেখাপড়া খুব ভাল হবে। তোমার মন সরল। সেখানে সবসময় উচ্চ চিন্তা খেলা করবে।

টিপ ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইল কাকাবাবুর মুখের দিকে।

কাকাবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, তোমার মা সংসারের লক্ষ্মী। বলশালী মঙ্গল। লটারি পাবার সম্ভাবনা আছে।

টিপ আমতা আমতা করে বললে, মাকে ডাকব?

আজ নয়। একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ভাল করে সব দেখে, যা বলার বলব। শুধু শুনে রাখো, তোমরা দু'জন যেখানে থাকবে, সেই জায়গা স্বর্গ হয়ে থাকবে।

কথা বলতে বলতে কাকাবাবু কেঁদে ফেললেন। এমন আবেগপ্রবণ মানুষ আমি দেখিনি। প্রশ্ন করলুম, কাকাবাবু, আপনি কাঁদছেন কেন?

আনন্দে। ভাল কিছু দেখলে আমার ইমোশন আমি সামলাতে পারি না। এই মেয়েটির চুল দেখেছ, মুখের গড়ন দেখেছ, বাদামের মতো চোখ, ভুরু দেখেছ, হাতের আঙুল দেখেছ, পায়ের পাতা দেখেছ, শরীরের শ্রী দেখেছ? জ্যান্ত সরস্বতী।

কাকাবাবুর চোখে আবার জল এসে গেল। আমার শরীর জ্বলতে লাগল। কাকাবাবুর এই উচ্ছ্বাসের কারণ আমি জানি। আমাকে প্রকারান্তরে জানাতে চাইছেন, তোমার মুকু টিপের পায়ের নখের যোগ্য নয়। টিপের সব ভাল। লক্ষ্মী সরস্বতী কমবাইন্ড। মুকুর সবটাই অলক্ষণের। মুকু অপয়া, টিপ পয়া। তুমি দেখে দেখে এমন এক মেয়ের পাল্লায় পড়লে কেন? এখুনি ওকে বিদায় করো। বেরিয়ে এসো ওর খপ্পর থেকে। সমস্ত তিরই ছোড়া হচ্ছে আমাকে লক্ষ্য করে। আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে। আমার অপদার্থতা প্রমাণ করার জন্যে। এইসব কায়দা আমার জানা আছে। আমি আর বসতে পারলুম না, ঘরের বাইরে চলে এলুম। এই মানুষটির অদ্ভুত জীবন আমি বুঝতে পারি না। নিজের সংসার ফেলে অন্যের সংসার সামলাতে ছোটেন। অযাচিত উপদেশ দেন সব মানুষকে।

চা শেষ করে কাকাবাবু রান্নায় লেগে গেলেন। মুকু কুটনো কুটে বাটনা বেটে একটু সাহায্য করতে চেয়েছিল। হাঁ হাঁ করে তেড়ে গেলেন, কোনও প্রয়োজন নেই, কোনও প্রয়োজন নেই। কোনও কোনও শাশুড়ি পুত্রবধূকে এইভাবে খেদিয়ে দেন। মুকুকে অপমান করা মানে আমাকেই অপমান করা। মুকু আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাল। এ-ও সেই চোখ, যে-চোখে দিদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, আমি তো তোমারই আশ্রয়ে এসেছিলুম ভাই। তফাত এই, মুকু আমাকে একটা কথাও বললে না। পরিস্থিতির কাছে কীভাবে আমি বিকিয়ে গেছি! কাকাবাবুকে আমি জোর গলায় বলতে পারছি না এ বাড়ি আমার, সংসার

আমার, হু আর ইউ! দিদির ডেডবডি আসবে। সৎকারের পরেও ঝামেলা শেষ হবে না। হারের সমস্যা। হার হাড় হয়ে গলায় ফুটে আছে। আমি অসহায়।

মুকু ঘরে গিয়ে সুটকেস গুছোচ্ছে। আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি মাত্র। হয়তো বলতেও চেয়েছিলুম, মুকু, কিছুক্ষণের জন্যে একটু সহ্য করো। মুকু আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। খুবই খারাপ লাগল। আমি যেন একটা পিংপং বল। একবার এ এদিক থেকে মারছে, তো ও ওদিক থেকে। মুকুর অন্তত বোঝা উচিত ছিল, আমি কোন অবস্থার শিকার।

ঘরের বাইরে চলে এলুম। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা আর করব না। এবার যা কিছু ঈশ্বরের সঙ্গে। বিশ্বাস কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য মানসিক অবস্থা নয়। ফেথ ইজ নট ইন্টেলেকচুয়াল। পাহাড় চূড়া থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ মারার মতো একটা সমর্পণ। যা করার তুমি করো। মানুষকে আর তেল দেব না। মানুষের অনেক বাহানা, অনেক বায়নাক্কা। টিপ আর বউদি দু'জনেই এইবার যাবে। মুকুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। মুকু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দু'জনেই মনমরা হয়ে সিঁড়িতে নামছে। টিপ আমার ডান হাতটা ধরে বললে, আমরা আবার আসব।

আমি কোনওরকমে ঘাড়টা নাড়লুম মাত্র। মনের পিত্ত হয়েছে। জীবনটা তেতো লাগছে। সবকিছু অর্থহীন তামাশা। একটু পরেই মুকু বেরিয়ে এল, শাড়িটাড়ি পরে একেবারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। হাতে সুটকেস।

আমি পথ আগলে বললুম, চললে কোথায়?

তোমার জানার কোনও প্রয়োজন নেই।

কেন নেই?

তুমি বেশ ভালই জানো, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি?

এই সময় রাগারাগিটা না করলেই নয়?

কেন? এটা কোন সময়?

তোমাকে বোঝাতে হবে? আমার কে আছে বলো?

কেন? তোমার ওই কাকাবাবু আছেন। তোমার সর্বসুলক্ষণা টিপও আছে, তার মা আছে, তুমি নিজে আছ। প্রশ্নটা বরং আমারই করা উচিত নিজেকে। আমার কে আছে?

আমি আছি।

তুমি? তুমি হলে এ যুগের হ্যামলেট। সারাটা জীবন শুধু টু বি অর নট টু বি করে যাও। তুমি হলে নাচের পুতুল। ঝড়ের এঁটো পাতা।

এঁটো পাতা শব্দটা তিরের মতো ফুটল। আমি এঁটো পাতা! হরিশঙ্করের পুত্র আমি। যাও তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছে করে সেইখানেই যাও। সারাজীবন অনেকের কাছে অনেক নাকে কেঁদেছি। পায়ে পায়ে ঘোরার চেষ্টা করেছি লেজ-তোলা বেড়ালের মতো। মন দেখার মতো কেউ নেই। সবাই বাইরেটা দেখে। আমার বলতে ইচ্ছে করছিল, মুকু, ভালবাসা বোঝো? তারপরেই মনে হল, প্যানপ্যানে শোনাবে। ভালবাসা শব্দটাই ভালবাসার শত্রু। ভালবাসা একটা ভাবমিশ্রিত, সেবা, সাহচর্য, অবস্থিতি, সহ্যশক্তি। হাত ধরে নীরবে হাঁটা। ওটা বোধের ব্যাপার, বলার নয়।

মুকু নামছে সিঁড়ি দিয়ে। কাঁধের কাছে হাত রেখে কোনওরকমে বললুম, আমাকে ছেড়ে এইভাবে চলে যাচ্ছ মুকু? আমার যে কেউ নেই।

মুকু এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। জল-ভরা দুটি চোখ। পাতলা ঠোঁটদুটি থিরথির করে কাঁপল কয়েকবার। কোনও বাণী ফুটল না। যেন পাখির ছানা, ওড়ার চেষ্টা করেও উড়তে পারল না।

If your only tool is a hammer, then all your problems look like nails.

অসহায় শিশুটির মতো সদরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম মুকুর চলে যাওয়া। বিলিতি সুটকেস হাতে সোজা হেঁটে চলেছে রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে। মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে জাপটে ধরি পেছন দিক থেকে। শিশু যেভাবে জড়িয়ে ধরে মায়ের কোমর। 'জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,/মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,/তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।' অভিমান এক দুর্ভেদ্য পাঁচিল। মুকু রিকশায় উঠে বসল, পায়ের কাছে সুটকেস, দু'হাতে হাতলটা ধরে রেখেছে সামনে সামান্য ঝুঁকে। চওড়া পিঠ। আকাশি রঙের ব্লাউজ। এলো খোঁপা। তাকানো মাত্রই ভেতরের নিবে-আসা আগুন আবার জ্বলে উঠল। অসম্ভব! মুকুকে ছাড়া আমার জীবন শূন্য, অর্থহীন। সিঁড়ি-ছাড়া বহুতল বাড়ির মতো। রিকশা চলতে শুরু করামাত্রই আমি ছুটতে শুরু করলুম। একটা সাইকেল পেছন দিক থেকে আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরেই চলে গেল। রিকশাটাকে থামালুম।

মুকুর হাতটা চেপে ধরলুম। গায়ে হাত রেখেই বুঝলুম, মুকুর বেশ ভালই জ্বর হয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। নাকের ডগায় মতিচুরের মতো ঘামের বিন্দু। মধ্যদিনের দীপ্ত সূর্য ঝলসে দিচ্ছে চারপাশ।

মুকু দাঁতে দাঁত চেপে বললে, রাস্তায় নাটক কোরো না। ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই আমাকে আটকাতে পারতে!

ভেতর থেকে একটা হাহাকার বেরিয়ে এল, আমার কেউ নেই মুকু। তুমি ছাড়া।

রিকশার চালক সিটে বসে আছে একটু তেরছা হয়ে। প্রবীণ মানুষ। আমার চেনা। নাম, জগাদা। জগাদা আড়চোখে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। হঠাৎ বললে, কাজটা ভাল হচ্ছে না।

কোন কাজ! প্রশ্ন করার সময় নেই। মুকু বললে, হাত ছাড়ো। বেরিয়ে যখন পড়েছি আর ফেরাতে পারবে না।

ওই ভদ্রলোকের ব্যবস্থা আমি করছি।

কিছুই করতে পারবে না, কারণ লাঠি ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। মনের দিক থেকে তুমি পঙ্গু।

জগাদা বললে, তা হলে আমি চালাই!

মুকু বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন। এখুনি লোক জড়ো হয়ে যাবে।

রিকশার চাকাটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। মুকু একবার ফিরে তাকাল না! এই হয়। এরই নাম জগৎ। এরই নাম দুনিয়াদারি! সামান্য পান থেকে চুন খসলেই সব সম্পর্ক ফরদাফাঁই। মুকুর যত রাগ আমার ওপর। এই কি রাগ করার সময়! বেশ রাগই না হয় করলে, তা বলে ছেড়ে চলে যাবে? সমস্ত

দোকানপাট বন্ধ। রাজপথ নির্জন। খাঁখাঁ রোদ। বন্ধ দোকানের রকে ছায়ায় শুয়ে হাহা করছে একটা কুকুর। অসহায় অনাথ বালকের মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। পায়ের পাতার ওপর দিয়ে রিকশা চলে গেছে। জ্বালা করছে ভীষণ। আশ্চর্যই বটে। হায় মন, পিতা হরিশঙ্কর চলে যাওয়ায় এতটা অসহায়বোধ করিনি। হঠাৎ শূন্য মনে ভেসে উঠল। একটা কবিতা;

বাসনার লক্ষ্যে তুমি যাত্রী? তবে থেমো না নিখিলে,
স্বয়ং লাইলি যদি সঙ্গী হয় বোসো না মহফিলে।
তুমি ঝরনা বয়ে চলো, তূর্ণগতি নদী হও তুমি,
তীর যদি পাও, তবু ছুঁয়ো নাকো সেই তীরভূমি।
হারিয়ে যেয়ো না, তুমি এ বিশ্ব-মন্দির মাঝে কোথা,
চিরমুক্ত তুমি বন্ধু, আসরেতে বোসো না অযথা।

কুকুরটা হঠাৎ ঝাড়াঝুড়ি দিয়ে রক থেকে নেমে এসে, আমার সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল পুটুসপুটুস করে। এই তো আমার ব্যথার ব্যথী। চিনতে পেরেছে। একজন ফেরিঅলা ধুঁকতে ধুঁকতে চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। কোনওরকমে হাঁকছে, পানি ফলঅ, পানি ফলঅ।

ধীরে ধীরে ফিরে এলুম বাড়িতে। দোতলায় উঠতেই অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, অতটা নরম হোয়ো না। পেছন পেছন ছোটার প্রয়োজন ছিল কি?

একজন না খেয়ে এই ভরদুপুরে চলে যাচ্ছে!

তাতে কী? ডোন্ট মেক ইয়োরসেলফ সো চিপ।

পিতা হরিশঙ্করও ঠিক এই কথাই বলতেন; কিন্তু তাঁর একটা বিশাল হৃদয় ছিল। মানুষের দুঃখ বুঝতেন। অসহায়কে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। কারওকে অপদস্থ করতেন না। রাজসিক অহংকার ছিল। তামসিক নয়। আমার সামনে শ্মশ্রুমণ্ডিত ছ'ফুট যে দৈত্যটি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে চেনা খুব কঠিন।

আমি নীরবে সরে এলুম। হুড়হুড় করে অক্ষয় কাকাবাবুর চান শুরু হল। সঙ্গে সংস্কৃত স্তোত্র। ভারী গলার আওয়াজে বাড়ি কাঁপতে লাগল। প্রবল একটা শক্তি। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল আহার-পর্ব। সে এক বিশাল ব্যাপার। ভদ্রলোক একাহারী। সেই কারণে সবই বেশিবেশি। ডাল-ভাতের তাল দেখে মাথা ঘুরে গেল। যেন ছোট মাপের একটা বল। এই সেই মানুষ, যিনি আগে নিমন্ত্রণ বাড়িতে এক বালতি পোলাও অক্লেশে মেরে দিতেন। তারপর সারারাত ছাদে চিত হয়ে শুয়ে মুখে ড্রপারে করে ফোঁটা ফোঁটা জল ঢালতেন। জলের মাত্রা বেশি হলে পেট ফেটে যাবে। পিতা হরিশঙ্কর বলতেন, এইভাবেই একদিন অকালে মরবে, বেশি খেতে চাও তো কম খাও, আর কম খেতে চাও তো বেশিই খাও! খাওয়াটাই অক্ষয় কাকাবাবুর বীরত্ব।

আমিও বসেছি, কিন্তু মুখে কিছু তুলতে পারছি না। দিদির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মুকুর কথা। মেয়েটা কেমন একা একা চলে গেল। সকাল থেকে একফোঁটা জলও তার মুখে পড়েনি। কোথায় গেল? আবার কি সেই হস্টেলে? না কোনও বন্ধুর বাড়িতে? কে এক সত্যেনের নাম কয়েকবার তার মুখে শুনেছি।

সহপাঠী। জমিদারের ছেলে। আলিপুরে বাগানবাড়ি। তার ঠাকুরদা ছিলেন বিখ্যাত শিকারি। সত্যেনের বাবা একালের একজন বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। মুকু কি সেই সত্যেনের বাড়িতে গেল! একটু যেন প্রেম-প্রেম ভাব আমার মনে হয়েছিল। তা না হলে সত্যেনের অত প্রশংসা করবে কেন? যিশুর মতো রূপ। শিশুর মতো মন। ভাল না বাসলে মানুষ মানুষের নির্ভেজাল প্রশংসা করতে পারে না। মুকু ইদানীং আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল।

কেবল তিরস্কার আর তিরস্কার। আমার সবই খারাপ। কাকাবাবু বিশাল একটা উদগার তুলে বললেন, দেহ আর মন। দুটোকে আলাদা আলাদা রাখার চেষ্টা করবে। দেহের এক ধর্ম, মনের এক ধর্ম। এখন দেহের ধর্ম পালন করো। রাতে কোনও খাবার জুটবে না। শ্মশানেই কাটবে। এখন একটু চেষ্টা করে খেয়ে নাও। মেয়েরা এক মোহ। শরীর নষ্ট করার শ্রেষ্ঠ কল। তোমাকে পেতনিতে ধরেছিল।

আর আমার বসতে ইচ্ছে করল না মানুষটির সামনে। এখনই হয়তো কঠিন কোনও কথা বলে ফেলব। বয়সের সম্মান রাখতে পারব না। থালা নিয়ে ঝাঁ করে উঠে পড়লুম। ধ্যাততেরিকা খাওয়া! এই ভদ্রলোকই আমাকে গৃহছাড়া করবেন। উঠে দাঁড়ালুম। হাঁটুতে খট করে একটা শব্দ হল।

অক্ষয় কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন, শনি। তোমার কোষ্ঠীটা একবার ভাল করে দেখতে হবে। মনে হয় শনির দশা চলেছে। নীচস্থ শনি। জয়েন্টের শব্দ। মানে দারিদ্র আসছে। সব যাবে এইবার। ধন-জন-গৃহসুখ। ঘোর অমানিশা আসছে এইবার।

এ তো অভিশাপ! আমার হাত থেকে থালাটা পড়ে গেল। ভাত তরকারি সব ছিটকে গেল। কিছু পড়ল কাকাবাবুর পাতে। ভদ্রলোক চমকে উঠেছেন, একী? ইচ্ছে করে ফেললে? আমার খাওয়াটা নষ্ট করে দিলে!

কোনও উত্তর না দিয়ে আমি সোজা ঘরের বাইরে। মুকুর নীল শাড়িটা তারে ঝুলছে। শাড়িটা সে ফেলে গেছে। কাকাবাবু ঘর থেকে হেঁকে বললেন, জায়গাটা তো পরিষ্কার করা দরকার।

একটু রাগের গলাতেই বললুম, যথাসময়ে হবে।

কাঁধে একটা গেরুয়া রঙের ভিজে গামছা ফেলে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এখন বুঝতে পারছি হরিদা কেন পালিয়ে গেলেন! কারণটা তুমি। তোমার তমোগুণই তাঁকে গৃহছাড়া করেছে।

নিজের সংযমে নিজেই অবাক। কোনওরকম মন্তব্যই আমার মুখ দিয়ে বেরোল না। শুধু বললুম, বসুন, আমি আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

কোনও প্রয়োজন নেই। ভদ্রলোক বেশ রাগতভাবেই চলে গেলেন। মনে মনে বললুম, যা, যেখানে খুশি যা, আর জ্বালাসনি। বলেই মনে হল, অন্যায় করেছি। পিতার বন্ধুকে অসম্মান করার অধিকার নেই আমার। যা হচ্ছে সবই হচ্ছে তাঁর ইচ্ছায়। এই খেলায় আমি এক দর্শক মাত্র। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুকুর শাড়ির আঁচলটা হাতের মুঠোয় ধরেই ভয়ে ভয়ে ছেড়ে দিলুম। দূরের তামাটে আকাশে তিনটে চিল উড়ছে। আকাশের আঁচলের আড়ালে যে-ঈশ্বর লুকিয়ে আছেন, তাঁকে বললুম, আমার মুকুকে ফিরিয়ে দিন, সে যে আমার মায়ের মতো। কে আমাকে শাসন করবে প্রতি মুহূর্তে! হেসে ফেললুম মনে মনে, হরিশঙ্কর নয়, ফিরে আসুক মুকু! মুকুর জন্যে প্রাণ যত কাঁদছে, পিতার জন্যে কই কঁদছে না তো! মুকুর হাত ধরে পিতাকে খুঁজে পেতে চাই।

এমন যদি হত, পিতা হরিশঙ্কর হঠাৎ ফিরে এলেন, সন্ন্যাসীর সাজে। দেহ বীরের মতো, মুখ প্রেমিকের মতো। আমি আর মুকু দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি হাসিমুখে দু'হাত বাড়িয়ে বলছেন, এসো এসো। আমি তো এই ভবিষ্যৎই চেয়েছিলুম। তোমরা সুখী হও। তোমাদের সুখই আমার সুখ।

নীচে গভীর গম্ভীর গলায় কে যেন বললেন, হরি নারায়ণ।

কী ব্যাপার! স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে বুঝি! দুদ্দাড় করে নেমে গেলুম। এক এক লাফে ডবল সিঁড়ি। সদর দরজা মনে হয় খোলাই ছিল। টকটকে গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসী। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং। অবাক হয়ে গেলুম। সেই হরিদ্বারের সন্ন্যাসী। যাঁর শরীর থেকে পবিত্র হোমের গন্ধ বেরোয়। বহুক্ষণের সাধ্যসাধনায় যাঁর কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয় একটিমাত্র কথা, হরি নারায়ণ। সেই কতকাল আগে এসেছিলেন, মাতামহের মৃত্যুকালে। চেহারা সেই একই রকম আছে। বয়স যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রণাম করামাত্রই মাথায় হাত রাখলেন আমার। সারাশরীর যেন অবসন্ন হয়ে গেল। আলসার-এর পেটে শীতল দুধ পড়লে যেমন স্নিগ্ধ একটা অনুভূতি হয় সেইরকম হল। তাপিত প্রাণে করুণাধারার মতো নীরব আশীর্বাদ। মনে হচ্ছিল, পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়ে থাকি যতক্ষণ পারি। আর উঠব না। হিমালয়ের কোলে এইভাবেই শুয়ে থাকি। ভব-রোগ-বৈদ্য এসেছেন কৃপা করে।

সাদরে তাঁকে নিয়ে এলুম ওপরে। পায়ে সেই পরিচিত গেরুয়া রঙের ন্যাকড়ার জুতো। জুতোজোড়া একপাশে খুলে রেখে ঘরে ঢুকলেন। তাড়াতাড়ি একটা কম্বলের আসন বিছিয়ে দিলুম চেয়ারে। তিনি বসলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন জ্যোতির্ময় মুখে। গেরুয়া কুর্তার পকেট থেকে একটা প্যাড আর পেনসিল বের করে লিখলেন কী সব। বুঝলুম মৌনী হয়েছেন। লেখাটা আমার হাতে দিলেন। পরিষ্কার ইংরেজি□— ইউ আর গোয়িং থ্রু এ ক্রাইসিস।

ইয়েস। লেখাটা এগিয়ে দিলুম তাঁর দিকে।

লিখে লিখেই আলাপ চলল। প্রশ্ন করলুম, হিমালয়ের কোনও তীর্থে আমার পিতাকে কি দেখেছেন?

ওভাবে তো দেখা হয় না। বিশাল জায়গা। বেশিরভাগ সময় আমি আমার ডেরাতেই থাকি।

আমার পিতা কি ফিরে আসবেন? তিনি কি জীবিত আছেন?

সংসার যে ছেড়ে যায়, মুক্তজীবনের স্বাদ যে একবার পায়, সে কি আর বদ্ধজীবনে ফিরতে চায়!

সাধুজি, আমি তা হলে কী করব?

তুমি তার আদর্শের প্রদীপটি ধরে রাখো। দেখো যেন নিবে না যায়!

সন্ন্যাসী লিখলেন : Observe what a man has in mind to do when his father is living, and then observe what he does when his father is dead. If for three years, he makes no changes to his fathers ways, he can be said to be a good son□—Confucious.

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম তাঁর লেখাটির দিকে। পিতা যতদিন জীবিত, লক্ষ রাখো তাঁর সন্তানের দিকে। তার মনের গতির দিকে। এইবার দেখো, তার পিতার মৃত্যুর পর সে কী করছে! যদি দেখা যায় টানা তিনটি বছর সে তার পিতার ধারা থেকে একটুও সরে আসেনি, তখনই বলা যাবে সে সুসন্তান।

কে এই সন্ন্যাসী! এঁর কোনও পরিচয়ই আমার জানা নেই। সামান্য সন্ন্যাসী নন। প্রভূত জ্ঞানী। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। আমি একটু থমকে গেছি। পিতা জীবিত। আমি কী করতে চেয়েছি? ভোগ। দেহভোগ। যৌবনের নীচ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি খুঁজেছি। দেহের বন্ধ কাচের জানলায় ডুমো মাছির মতো অবিরত ধাক্কা খেয়েছি। আর তিনি চলে যেতে-না-যেতেই তাঁর ধারা, তাঁর আদর্শ লোপাট করে দিয়েছি। এর নাম সুসন্তান! এ তো একটা রাসকেলের জীবন-বৃত্তান্ত!

সন্ন্যাসী হাতের আঙুল তুললেন। চিন্তার আবর্ত স্থির হয়ে গেল। বোধহয় অভয় দিতে চাইলেন। বলতে চাইলেন হতাশ হোয়ো না। তিনি হাত বাড়িয়ে প্যাডটা আবার টেনে নিয়ে স্থির হাতে লিখলেন, When you make a mistake, do not be afraid of mending your ways.

ঠিক ধরে ফেলেছেন আমার চিন্তা কোন পথে ছুটছে। অদ্ভুত তন্দ্রালু চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আপনমনে আমার দিকে। পাঞ্জাবির পকেটে আবার হাত ঢোকালেন। বেরিয়ে এল শুকনো একটা ফল। ফলটা আমার হাতে দিয়ে ইশারায় বললেন, খেয়ে ফেলো।

আমি প্রথমটায় একটু ইতস্তত বোধ করেছিলুম। খাব? সন্ন্যাসী-প্রদত্ত ফল! যদি কিছু হয়ে যায়। বলা তো যায় না। যা থাকে বরাতে! মুখে ফেলে দিলুম। অপূর্ব স্বাদ। ক্ষীরের মতো গলে গেল। সুন্দর গন্ধ। প্রশ্ন করার আগেই সন্ন্যাসী লিখলেন, এর নাম অমৃত ফল। হিমালয়ের একটি মাত্র অঞ্চলে হয়। একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীরাই যেতে পারেন সেখানে। অনেক প্রতীক্ষায় পাওয়া যায়। এই ফল মানুষের মনে একটা সাইকোলজিক্যাল পরিবর্তন আনে। বিষন্নতা দূর করে। কুভাব আসতে দেয় না। ঈশ্বরের চিন্তা করো। কথাটা বলা সহজ, শোনা সহজ, করা শক্ত। একমাত্র অ্যামবিশন হওয়া উচিত, আমি হব, কী হব, কেমন হব?

Like bone cut, like horn, polished,

Like jade carved, like stone ground.

কাগজের লেখা ক্রমশই বাড়ছে। ক্রমশই দুর্লভ হয়ে উঠছে আমার সংগ্রহ। আকাঙ্ক্ষা তো আছেই আমার। সংস্কার যাবে কোথায়! আসলে সঙ্গদোষ। ঘেরাটোপে মানুষ। মাতামহ ঠাট্টা করে কতদিন বলেছেন, তুলোয়-রাখা আঙুর। মাকে পাইনি। ছেলেবেলা থেকেই যেসব মহিলার সংস্পর্শে এসেছি, তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন দেহল। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁরা আমার মধ্যে বিকৃত রুচি তৈরি করে দিয়ে গেছেন। তাঁদের আলাপ-আলোচনা, দেহ-প্রদর্শন উঠতি বয়সের একটা ছেলের পক্ষে ক্ষতিকারকই ছিল। নিজের দুর্বলতা আমি জানি। শত্রু আমার অচেনা নয়। পরাভূত করতে পারি, কিন্তু শত্রুকে আমি ভালবেসে ফেলেছি গোলাপি নেশার মতো। মদ ক্ষতিকারক জেনেও লোকে মদ খায়।

সন্ন্যাসী আবার প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন। লেখাটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে,

A blemish on the white jade

Can still be polished away.

আমি তাঁর দিকে তাকালুম। করুণা ঝরেছে চোখে। প্রশ্ন করলুম, আমার কিছু হবে?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন, Heaven is author of the virtue that is in you.

কী অপূর্ব কথা! আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম লেখাটার দিকে। যে-গুণ আমার মধ্যে রয়েছে তার লেখক হলেন ঈশ্বর। অথবা ঈশ্বরই আমার মধ্যে লিখবেন আমার গুণাবলি। অথবা যে-গুণ আমার মধ্যে আছে তার বিকাশ ঘটাবেন তিনি। তাঁকে ধরতে হবে। কেমন করে মন যাবে তাঁর দিকে?

উত্তরে সন্ন্যাসী লিখলেন, সাইলেন্ট প্রেয়ার। কৃপা করো, কৃপা করো। জপই একমাত্র পথ। নাম জপ। ঈশ্বর আর নিয়তি দুটোকেই বোঝার চেষ্টা করো। ঈশ্বরের মর্জি বুঝতে হলে বুঝতে হবে, কেন তাঁর এমন ইচ্ছে হল! কেন তিনি করলেন এমন? আর নিয়তিকে বুঝতে হলে জানতে হবে, আমাদের জীবনের অনেক কিছুই নিয়তির এক্তিয়ারে। নিয়তির হাতে যা, তার পেছনে না-ছোটাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। জন্ম আর মৃত্যু নিয়তির হাতে, ধন, মান, মর্যাদা, মোক্ষ ঈশ্বরের হাতে।

এতক্ষণ খুব আন্তরিক একটা নাসিকা-গর্জনের শব্দ আবহসংগীতের মতো আমাদের ঘিরে ছিল, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। পাশের ঘরে নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রায় যোগস্থ ছিলেন কাকাবাবু। তিনি এইবার ঘরে এলেন। এলেন বললে ভুল হবে। আবির্ভাব হল। আসনে সন্ন্যাসীকে দেখে প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন। শেষে বুদ্ধিমানের মতো বললেন, আরে আপনি? হঠাৎ কী মনে করে? এবার কোন শিষ্যের বাড়িতে উঠলেন?

কাকাবাবুর কথা বলার ধরনটাই কেমন যেন। সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসছেন।

কাকাবাবু বলেই চলেছেন, বছরে একবার করে আপনাদের তো বেরোতেই হয় সংগ্রহে। আপনার শিষ্য-সামন্তের সংখ্যা কত হবে সাধুজি? লাখ না হাজার?

উত্তরটা আমাকেই দিতে হল, উনি মৌনী আছেন।

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সাধুদের অনেক লোকদেখানো কায়দা আছে। অবশ্য তা না হলে শিষ্যরা ভিড়ব কেন?

সন্ন্যাসী প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন, ভদ্রলোককে বলো, উনি কত জ্ঞানী। আরও বলো, আমার কোনও শিষ্য নেই। আমিই শিষ্য। শিষ্য হবার চেষ্টা করছি; কারণ গুরু মিলে লাখ, তো শিষ্য মিলে এক। সময় পেলে কলকাতায় আসি পার্শ্বনাথজিকে দর্শনের জন্যে। জিজ্ঞেস করো, ওঁর ঘড়ি ঠিক চলছে তো!

লেখাটা কাকাবাবুকে দিলুম। তিনি পড়লেন। পড়ে অহংকারীর মতো বললেন, আমার ঘড়ি সুইস-মেক। অলওয়েজ গিভস কারেক্ট টাইম।

সন্ন্যাসী আবার স্মিত হাসলেন। প্যাডে লিখলেন, আই কেম ফর ইউ। কলকাতায় সাত দিন আছি। পারলে, পার্শ্বনাথজির মন্দিরে সকালের দিকে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার জীবনে ভাল সময় আসছে। ইউ আর স্ট্যান্ডিং অন দি থ্রেসহোল্ড। অ্যাভয়েড দিস ম্যান। হি ইজ বেসিক্যালি ক্রুড। আমার হাত থেকে এক গেলাস জল নিলেন। আলগোছে খেয়ে গেলাসটাকে টেবিলের ওপর না রেখে ঘরের এককোণে রেখে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। দেখছি রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে চলেছেন আত্মস্থ হয়ে। যেন একটি জ্যোতির্বলয় চলে গেল।

ওপরে উঠে আসতেই কাকাবাবু বললেন, প্যারাসাইটস। কত টাকা দিলে প্রণামী?

প্রণামী? অমৃতফলের প্রভাব কি না জানি না, ভীষণ হাসি পেল। আমি হাহা করে হাসতে লাগলুম। নিজের হাসি দেখে নিজেই অবাক। এত জোরে আমি কখনও হাসিনি।

কাকাবাবু বললেন, অমন ইডিয়টের মতো হাসছ কেন?

এতেও আমার রাগ হল না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তামসিক একটা মানুষের অবয়ব খসে পড়েছে। ধসে পড়ছে অহংকারের ইমারত। সেই স্তূপের ওপর কুচকুচে কালো একটা ডিম।

কাকাবাবু বললেন, এইভাবে হাসাটা একটা মহা অসভ্যতা। হরিদার ছেলেকে এটা মানায় না। যাও চা করে আনো। আমাদের এইবার প্রস্তুত হতে হবে। খাওয়াটা তো মাটি করেই দিয়েছ, এইবার মনটাও খিঁচড়ে দিলে। চা-টা একটু কড়া করে কোরো। যেন সিস্টেমে অনেকক্ষণ থাকে।

ঘরের একপাশে টুলের ওপর ছোট্ট একটা কুঁজো ছিল। গলাটা ধরে নিজের মুখে জল ঢালতে লাগলেন। এমন হিপোপটেমাসের মতো হাঁ আমি খুব কমই দেখেছি। মানুষ যে সমস্ত পশুর সমাহার, কথাটা মিথ্যে নয়।

সন্ধে নেমে গেছে। আকাশ এখন লাল-কালো। মাঠ পেরিয়ে আমরা চলেছি থানার দিকে। দিদি এইবার আসবেন।

Who can go out without using the door?
Why, then, does no one follow this way?

একটা খাট তো কিনতে হবে। কিছু ফুল। কয়েক প্যাকেট ধূপ। আবার কাঁধ দেবার জন্যেও তো কয়েকজনকে চাই। একা তো পারব না। ভীষণ অসহায় বোধ করছি। আশ্চর্য করে দিলেন মেনিদা। পাড়ার কেউ না, এগিয়ে এলেন তিনিই। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর তিন ছেলেকে।

মৃদু হেসে বললেন, অবাক হচ্ছ? সন্দেহ হচ্ছে, তাই না? ভাবছ আমার মতো একটা ইতর লোক আবার কী মতলবে এসেছে! কোনও মতলব নেই পিন্টুচন্দ্র। আমি নির্ভেজাল এক বাঙালি। জানো তো, বাঙালির কান বড় হয়। পরের কথা শুনতে ভালবাসে। বাঙালির জিভ চেরা হয়। সাপের মতো ছোবল মারতে পছন্দ করে। কিন্তু বাবা হৃদয়টা খুব নরম হয়। আর একটা কী গুণ বলো তো? বিস্মৃতিপ্রবণ। ভুলে যায়। মনে রাখে না কিছু। তুমি আমাকে চড় মেরেছিলে। ভুলে গেছি। মনে রাখিনি। কেন এসেছি জানো? তোমার পিতামহ ছিলেন আমার শিক্ষক। তাঁকে ভোলা যায় না। তাঁর নখের যোগ্য তোমরা হতে পারোনি। আর ওই যে দেখছ আমার তিনটে দামড়া, ওদের আমি মানুষ করতে পারিনি, কিন্তু অমানুষ করতে পেরেছি। একালের মানুষের ডেফিনিশন কী জানো? যে যার সে তার। কেউ কারও নয়। মানুষ হলে, ওরা আমার কথায় ওঠ-বোস করত না। তোমার জন্যে ছুটেও আসত না। বক্তৃতাটা একটু লম্বা হয়ে গেল। এটাও বাঙালির লক্ষণ। কাজ কম, কথা বেশি। দাও, ওদের এখন টাকাপয়সা বুঝিয়ে দাও। সব কিনে আনুক। তোমার ভয় নেই, পাইপয়সার হিসেব বুঝিয়ে দেবে। পকেটে নিয়ে বেরিয়েছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বুদ্ধিমান ছেলে তুমি।

কত লাগবে বলে মনে হয়?

শ'দুয়েক ছেড়ে দাও। অত লাগবে না। তবু কাছে থাক।

ছেলে তিনটিকে এখন আর মোটেই খারাপ লাগছে না। অথচ এরাই একদিন মুকুকে লক্ষ করে অশ্লীল কথা বলেছিল। আমাকে একদিন রাস্তায় ধরে শাসিয়েছিল। বলেছিল, আমার খোলনলচে আলাদা করে দেবে। দাঁতগুলো খুলে মালা করে আমার গলায় পরিয়ে দেবে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এরা এখন সম্পূর্ণ অন্য চরিত্র। দুশো টাকা নিয়ে তারা চলে গেল। মন এমনই এক জিনিস, বারেকের জন্য সন্দেহ খেলে গেল, কেটে পড়বে না তো!

অক্ষয় কাকাবাবু অফিসারের ঘরে গিয়ে বসেছেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা হচ্ছে। সুরাবর্দি সরকারের কেচ্ছা চলেছে নতুন করে। থানার পাশেই চায়ের দোকান। মেনিদা আর আমি বসে আছি পাশাপাশি। জিজ্ঞেস করলুম,

চা খাবেন?

তুমি খাবে?

তা একটু খেতে পারি।

চায়ের অর্ডার দিলুম দু'গেলাস। মেনিদা হঠাৎ বললেন, মানুষ কেন এমন হয় বলো তো?

কীরকম বলুন তো?

এই আমার মতো। জটিলে-কুটিলে টাইপ। সবাই ঘেন্না করে, সন্দেহ করে। দুরদুর করে। মানে অধমেরও অধম। অথচ দেখো লেখাপড়া শিখেছি। সারাজীবন ভাল চাকরি করেছি। দেশবিদেশ ঘুরেছি। কেন এমন হয়? রক্তের দোষ। তাই না?

কী করে বলি বলুন? আমার তো তেমন জ্ঞান নেই।

দেখো সংসার করেছি। এতগুলো ছেলেমেয়ে, তবু কিন্তু কাম গেল না। আড়ে আড়ে তাকাই। ছোঁকছোঁক করি। অসভ্যতার চূড়ান্ত। যেন হেগো রুগি। আমার মতো জ্ঞানপাপীকে তুমি কী বলবে? যেখানে যখন গেছি সেইখানেই একটা কেলেঙ্কারি বাধিয়ে বসেছি। তোমার বউদি তো আমাকে সারাজীবন উঠতে ঝ্যাঁটা বসতে কোস্তা মেরে এল। এখন তো ফিরেও তাকায় না। বলে, আমি নাকি তাকে ডাঁটার মতো সারাজীবন চিবিয়েছি!

চা এসে গেল। মেনিদা এক চুমুক খেয়ে আঃ করে একটা প্রকাণ্ড শব্দ করলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একে বলে পরিতৃপ্তির শব্দ। একধরনের অসভ্যতা। কী আর করা যাবে বলো, যার যেমন স্বভাব।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হল, সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কি কিছু খেয়েছেন আজ?

মেনিদা লাজুক লাজুক হেসে বললেন, এক ডেলা মোদক।

মোদক আবার কী?

সে কী! এত বড় ছেলে তুমি, মোদক কাকে বলে জানো না? ভেরি পাওয়ারফুল অ্যাফ্রোডিসিয়াক। বুড়োরা খায়। খেলে শক্তি খুব বাড়ে। যৌবনশক্তি। বিজ্ঞাপন দেখোনি? মদনানন্দ মোদক। কবিরাজি দাওয়াই। সিদ্ধির অংশই বেশি। ভীষণ টেস্টফুল।

আপনি এইসব খান কেন?

খাব না? যৌবন চলে যাবে, আর আমি বসে বসে দেখব হেল্‌পলেস হয়ে। আমার থিয়োরি, যতদিন দেহ, ততদিন ভোগ।

তা হলে সকালে হরিনাম করেন কেন?

বাঃ, পাপীদের জন্যই তো মহানামের বিধান। রাতে পাপ করি, সকালে ইরেজার দিয়ে ইরেজ করি। পাপও হল না, পুণ্যও হল না। নিউট্রাল। মেনি মেনিই রইল। না হুলো, না পুষি!

মোদকের নেশায় আত্মবিশ্লেষণ হচ্ছে। তার মানে এই নয় যে মানুষটির চরিত্র বদলাচ্ছে। কুকুরের বাঁকা লেজ কি সোজা হয়! গঙ্গায় স্নানে নামলে, পাপ দেহ ছেড়ে গাছের ডালে উঠে বসে থাকে। স্নান সেরে ওঠামাত্রই ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ে ঘাড়ে।

মেনিদার ফ্লো এসে গেছে, এই দেখো না আমার কেমন রেপুটেশন! আমি খুব ভাল মনেই প্রতিবেশীর বউকে হয়তো জিজ্ঞেস করলুম, বউমা, ছেলে কেমন আছে গো? সে অমনি ফেঁস করে উঠবে, কেন বলুন তো? আপনার বুঝি ঘুম হচ্ছে না? তারপরেই রটিয়ে দেবে—আমি কোনও কু প্রস্তাব দিয়েছি। আচ্ছা জ্বালা বাবা!

যখন জানেনই, আপনার ওই আদিখ্যেতার কী দরকার?

বাঃ, বেশ বললে যা হোক। প্রতিবেশী হয়ে প্রতিবেশীর খবর নোব না! বেশ করব নোব। তাতে তোমার কী?

তা হলে বদনাম হোক।

হবেই তো। এর মধ্যে একটা-দুটো কেস তো অন্যরকম আছে। কেউ না-জানুক আমি তো জানি। আমার চরিত্র তো ধোয়া তুলসীপাতা নয়। জীবনভর অনেক কেচ্ছাই তো করেছি।

আচ্ছা এইসব কথা আপনি আমাকে কেন শোনাচ্ছেন?

তুমি ভাল শ্রোতা বলে। তোমারও তো জানা উচিত মানুষের সংসারে কতরকম পাপ আছে। মানুষ কীভাবে তিলে তিলে নিজেকে দুগ্ধ করে! চিরটা কাল নাবালক হয়ে থাকবে নাকি! জীবনে অনুশোচনারও প্রয়োজন আছে। সাপ ছোবল মারে বলেই মানুষ সাপ থেকে সাবধান হয়। সাপ আর পাপ এক জিনিস। শোনো, জ্ঞানপাপীর নাম জানো?

সে আবার কে?

এই যে তোমার পাশে বসে আছে। নাম তার মেনি। অনেক আগে পড়েছিলুম, এখনও মনে আছে। কী সুন্দর কথা দেখো, In his errors a man is true to type. Observe the errors and you will know the man. আমাকে চিনতে তোমার কোনওদিন অসুবিধে হবে না, কারণ আমার অপকর্ম। কিন্তু ভায়া, তুমি নিজেকে কোনওদিন চিনতে পারবে না। এ এক মজার কল। আমারই আমি অথচ আমিই চিনি না। আচ্ছা গ্যাঁড়াকল শালা!

মেনিদা মেয়েলি গলায় গান ধরলেন, কথা কয় রে/ দেখা দেয় না/ নড়ে চড়ে হাতের কাছে/ খুঁজলে জনম-ভর মেলে না/ খুঁজি তারে আসমান-জমি/ আমারে চিনিনে আমি/ একী বিষম ভুলে ভ্রমি/ আমি কোন জন, সে কোন জনা।

তাল মারতে গিয়ে গেলাস উলটে গেল। ভাগ্য ভাল ভাঙেনি। মেনিদা বললেন, একসময় আমি মনোহর সাঁই কীর্তন করতুম। সিল্কের পাঞ্জাবি। গলায় ফুলের মালা। পায়ের ওপর কোঁচা লুটোচ্ছে। এতখানিখানি চুল। কপালে নাকে তিলকসেবা। সে এক ফাটাফাটি কাণ্ড। যাঃ শালা, যৌবনটাই চলে গেল। আবার জন্মাব, আবার তবে যৌবন ফেরত পাব। সে এখনও বহুত দেরি। শোনো, যৌবনটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করো। বড় ক্ষণস্থায়ী। অবশ্য তুমি ঠিকই করছ।

তার মানে?

আবার কেন প্রশ্ন করছ? বুঝতে তো পারছই, অন্যায় তো কিছু নয়, এই তো বয়েস।

এতক্ষণ তো বেশ হচ্ছিল, আবার কেন উলটোপালটা কথা বলছেন?

ওই তো, ওইটাই তো আমার রোগ। পেট-পাতলার মতো মন-পাতলা। চিন্তা লিক করে যায়। ওই রোগেই তো ঘোড়া মরেছে। তবে হ্যাঁ, মেয়েটি একেবারে চোখা, সারের সার। আমার চোখ কেড়েছে। তা হলে বুঝতেই পারছ?

এই কথাটা বলা কি সভ্যতা হল! এখন একটা সত্য কথা বলুন তো, ওরা কি টাকাটা মেরে পালাল?

তুমি কি ওদের অতটাই অসভ্য ভাবো?

দু'হাঁটুর ওপর দুটো হাত টানটান করে রেখে মেনিদা বসে আছেন। মুখে সবসময় যে ভুবনমোহিনী হাসিটি লেগে থাকে সেই হাসি। আমার নিজের মন নিদাঘের প্রান্তরের মতো শূন্যাকার হয়ে আছে বলেই মানুষটিকে এতক্ষণ সহ্য করতে পারছি। সবসময়েই একটা ভয় খেলা করছে, যেন পরীক্ষার ফল বেরোবে। হঠাৎ যদি আইনের প্রভুরা বলে বসেন, না মশাই এটা হত্যা, আত্মহত্যা নয়। গলায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে। হয়ে গেল! কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না, তা কেন বলবে! মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, আমিই যেন খুনি। কেসটাকে সেইভাবে যদি সাজায়। মাঝে যে একটা লোভ ঢুকে আছে। একটা হার। গগনের অস্তিত্ব শুধু আমার মনে। সে যে এসেছিল, এমন কোনও প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমার কথা ছাড়া। আমাকে ফাঁসিয়ে কার কী লাভ! সে কি বলা যায়! অক্ষয় কাকাবাবুরও লাভ হতে পারে। ওই বাড়িতে জাঁকিয়ে বসে গেলেন হয়তো। জড়িবুটির কারবার করেন। সেইটাই আরও ফলাও হবে। মুকুর ওপর রাগের অনেক কারণ থাকতে পারে। তার একটা হয়তো, মুকুকে তিনি নিজেই একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চান। আকর্ষণটাই বিকর্ষণের কারণ। মানুষের মন দুর্গম অরণ্যের মতো। কত জন্তুজানোয়ার যে লুকিয়ে আছে! এমন ঘৃণা দেহবাসনা থেকেই আসে।

মেনিদা বললেন, ভেবে মরছ কেন? আরে আমি তো রয়েছি তোমার সঙ্গে। লোকটা জাতখচ্চর। সে আমি জানি। অনেকদিন পরে একটা গলায়-দড়ি কেস পেয়েছে। চেষ্টা করবে নেংড়াবার। আমিও কাঠপিঁপড়ে। সহজে ছাড়ছি না। লোকটা আমায় হাড়ে হাড়ে চেনে। এই বসেছি, ডেডবডি নিয়ে উঠব। আর এক দলা মোদক মেরে দিই। এক গেলাস চা বলো তো। স্ট্রেংথ কমে আসছে।

হাত চেপে ধরে বললুম, প্লিজ, আর মোদক খাবেন না। চা খান কোনও ক্ষতি নেই।

তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এ হল মহাদেবের নেশা। ভভম ভভম ববম ভাল/ ঘন বাজে শিঙ্গা ডমরু গাল/ রুদ্রতালে তাল দেয় বেতাল/ ভৃঙ্গী নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া। □—বুঝলে? লিঙ্গেশ্বর জেগে ওঠেন।

বিরক্ত হয়ে বললুম, কিছুক্ষণ চুপ করে বসুন না, কথা না বলে।

তা হলেই তোমার যে দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে ভায়া। আমি যে তোমার কারণেই বকরম বকরম করছি গো। এও দেখো মেনির বরাত। যার জন্য চুরি করি সে-ই বলে চোর।

কালো রঙের বিশাল একটা গাড়ি ঝ্যাড়াং ঝ্যাড়াং শব্দ করতে করতে থানার সামনে এসে দাঁড়াল। মেনিদা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, যাক এসে গেছে।

কিন্তু খাট কোথায়?

ওই তো, আসছে পেছন পেছন। তোমার দুটো দুশ্চিন্তাই দূর হল।

একটু লজ্জাই পেলুম। একটু আগে চোর ভেবেছিলুম। মধ্যবিত্ত বাঙালি তো! সবেতেই সন্দেহ। সকলকেই সন্দেহ। অসম্ভব একটা ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললুম। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু।

আমার ডাক পড়ল। দারোগামশাই বেশ আয়েশ করে বসে আছেন। দুপুরে মাংস খেয়েছেন। দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁচছেন। আর ফুঃ ফুঃ করছেন। এঁর আগের অফিসারের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। বড় সুন্দর মানুষ ছিলেন তিনি। আমার মামার গানের ভক্ত।

অফিসার বললেন, যাও, লাশ এসে গেছে। বেশি নাড়াচাড়া কোরো না, পেট খুলে মাল বেরিয়ে পড়বে। ওরা কোনওরকমে ট্যাক সেলাই দিয়ে ছেড়ে দেয়। যাও নিয়ে গিয়ে চাপিয়ে দাও। কাগজপত্তর সব সই করো। পকেটে টাকা আছে?

ফস করে বেরিয়ে গেল, আবার টাকা?

হেসে বললেন, হ্যাঁ টাকা। অনবরত টাকা। যারা তোমার জন্যে সারাটা দিন এত করল, তাদের একটু মিষ্টিমুখ করাবে না! তিনজন আছে, তিনশো হলেই চলবে।

তিনশোটা টাকা তাঁর হাতে দিতে গেলুম, তিনি ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন, আমাকে না আমাকে না। গাড়ির ড্রাইভারকে।

সব ঝামেলা মেটাতে আধ ঘন্টার মতো সময় লাগল। দিদিকে নিয়ে এসেছে চট দিয়ে মুড়ে। পাতলা মুখ আরও পাতলা হয়ে গেছে। রংটা কালচে। রক্ত জমে গেছে। দড়ি দিয়ে ঝোলার সময় ঘাড়টা ভেঙে গেছে, লটরপটর করছে। মৃত্যু যেন অদৃশ্য বাঘ। কখন যে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ে! কেউ জানে না। জানতেও পারে না। চটের রং দেখে আমার ভীষণ ঘেন্না করছিল। রক্তের দাগ। ময়লা। আঁশটে একটা গন্ধ। এই মৃত্যুর মধ্যে কোনও শোভা নেই। পবিত্রতা নেই। জীবন থেকে বেরিয়ে যাবার দরজা দিদি খুঁজে পেয়েছিলেন, তবে সদর দরজা নয়, খিড়কির দোর।

মেনিদার ছেলেরা মেনিদার মতোই। কোনও ঘেন্নাপিত্তি নেই। দু'দিক থেকে দু'জন ধরে ঝপ করে তুলে ফেলল।

আমি বললুম, সাবধান, পেট খুলে যাবে।

একজন বললে, আবার প্যাক করে দোব।

কারও কথাই আমার ভাল লাগছে না। কোথাও কোনও দুঃখ নেই, এক ফোঁটা চোখের জল নেই। একজন মানুষের চিরতরে চলে যাওয়াটা কি কিছুই নয়! চারদিকে চড়া চড়া আলো জ্বলছে। টেলিফোনের কর্কশ বাদ্য। উচ্চকণ্ঠের হ্যালো। জিপগাড়ির স্টার্ট নেওয়ার শব্দ। এ যেন এক ধাতব জান্তব পৃথিবী। হাতকড়ার ক্ল্যাং আওয়াজ। ইউনিফর্মের বিকট গন্ধ।

প্রায় একটা বোঝার মতো দিদিকে খাটিয়ার ফেলা হল। কোনওরকমে চাপিয়ে দেওয়া হল কিছু ফুল, একটা মালা। সবই আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। আমি এক দর্শক মাত্র। তিন জন তিন দিকে। আর একটা কাঁধের দরকার ছিল। সেই কাঁধ আমার। চাপা হরিধ্বনি। দিদি চললেন। এখানে বাঁচতে এসে মরে গেলেন। জীবন খুঁজতে এসে পেয়ে গেলেন মৃত্যুকে। চিরমুক্তি। মেনিদার পকেট থেকে বেরোল করতাল। তিনি আসছেন সবার পেছনে, নাম করতে করতে।

শ্মশানে গিয়ে এক নাটক হয়ে গেল। কাকাবাবু চাইলেন, কোনওরকমে চিতায় তুলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিতে। অনুষ্ঠানাদির কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের দোষে মারা গেছেন। পাপী। যেমন কর্ম তেমন ফল। যাবে

তো নরকেই, তার আবার অত কী!

মেনিদা রুখে দাঁড়ালেন। মৃত্যু আর আগুন দুটোই মানুষকে পবিত্র করে। প্রথা যা তা পালন করতেই হবে। লেগে গেল দু'জনের ঝটাপটি। কাকাবাবু রেগে একপাশে সরে গেলেন। আমাকে একটু খোঁচা মেরে গেলেন, তোমার দেখছি আপন লোকের অভাব নেই। এখন মনে হচ্ছে আমি উড়ে এসে জুড়ে বসেছি।

এসব এত বাইরের কথা, আমার আর কানে নিতে ইচ্ছে করল না। শ্মশানের পুরোহিত এগিয়ে এলেন। শুরু হল যাবতীয় অনুষ্ঠান আর মন্ত্রপাঠ। চিতা জ্বলে উঠল। কিছু দূরে বটতলায় এসে বসলুম। কাকাবাবু ওপাশে ধ্যানস্থ। আমাদের মুখদর্শন করবেন না তিনি। মনে হল কিছু একটা জপ করছেন। এক এক মানুষের এক এক রকম বিচার। আচরণ।

দিদির লম্বা লম্বা চুল বিদ্যুতের মতো লিকলিকে হয়ে জ্বলে কিছু সূক্ষ্ম ছাই আকাশের দিকে উড়িয়ে দিল। পশ্চিমে গঙ্গা। বাতাস আসছে হুহু করে। ঈশ্বরের কী অপূর্ব খেলা! সংসার ছাড়াবার আগে শ্মশানটা একবার দেখিয়ে দিলেন। মানুষের অনিবার্য পরিণতি দেখছি চোখের সামনে। পুড়ে ঝুল কালো হতে হতে দপ করে জ্বলে ওঠা। এক কিশোর মায়ের চিতাভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে গলায় কাছা নিয়ে এগিয়ে আসছে টলতে টলতে। মেনিদার তিন ছেলে সিনেমার গল্প করছে। চিতা জ্বলছে দাউদাউ করে। বিশাল চেহারার এক মানুষ খাটের বাঁশ খুলে নিবে-আসা একটা চিতা দমাস দমাস করে পেটাচ্ছে। আগুনের ফুলকি উড়ছে।

মেনিদা বসে ছিলেন আমার পাশে। শান্তশিষ্ট হয়ে। হঠাৎ ফোঁসফোঁস করে কেঁদে উঠলেন। মাথার ওপর বাতাস কাঁদছে বটের পাতায়। তলায় কাঁদছেন মেনিদা। আমি বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করলুম, কাঁদছেন কেন?

কাঁদব না? শ্মশানে কেউ হাসে! তোমার দিদিকে আমি ভালবেসে ফেলেছিলুম।

সে আবার কী? আপনি দেখলেন কবে?

এই তো আজ সকালে। আমার নিজের দিদির কথা মনে পড়ে গেল। এমনি পাতলা পাতলা চেহারা ছিল। চোখা মুখের গড়ন। দেখেই চমকে উঠেছিলুম, এ কে? এই তো আমার দিদি। জানো তো আমার দিদি মাত্র আঠাশ বছর বয়সে টিবিতে মারা গিয়েছিলেন। আর আমার মহাবিষয়ী কৃপণ বাবা বলেছিলেন, যাক বাবা বিয়ে দেবার খরচটা বেঁচে গেল। সেই বাপের ছেলে আমি। তুমি যে আমাকে চড় মেরেছিলে, বেশ করেছিলে।

কেন আমাকে বারেবারে লজ্জা দিচ্ছেন?

লজ্জা দেবার জন্যে বলিনি। আমার নিজের ওপরে নিজেরই বিশ্রী একটা ঘৃণা এসে গেছে। কবে যে এই স্টেশনে এসে টিকিট কাটব। এ এমন এক স্টেশন যেখান থেকে ট্রেন শুধু ছেড়েই যায়, ফিরে আর আসে না। ওই গানটা আমি কান খাড়া করে শুনি, যেথায় গেলে হারায় সবাই ফেরার ঠিকানা গো, ডাক এসেছে আমার সে দেশ থেকে, বিদায় নেব একটিবার শুধু তোমায় দেখে। মেনিদার গলা ধরে এল আবার। মাথা নিচু করলেন। পিঠের দিকটা ফুলছে। হঠাৎ আমার হাতদুটো খামচে ধরে বললেন, জানো, পৃথিবীতে ভালবাসা ছাড়া কিছু নেই। ভালবাসা হিরের চেয়েও দামি। তুমি আমাকে কোহিনুর দিতে চাইলে আমি বলব, ভালবাসা দাও। এ লিটল লাভ। এবারের বাঁচাটা গেঁজিয়ে গেল। পরের বার আসছি একটু ভাল ঘরে। সাত্ত্বিক পিতামাতার সন্তান হয়ে। আমারও দিন আসবে টুডে অর টুমরো।

চিতাটা ভুসভুস করে ধসে গেল। জোনাকির মতো চারপাশে উড়ে গেল একরাশ ফুলকি।

মেনিদা বললেন, যাও, বাকি কাজটা করে এসো।

অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার ফলে, পায়ে ঝিনঝিন ধরে গেছে। দাঁড়ানোমাত্রই উলটে পড়ে যাচ্ছিলুম। মেনিদা ধরে ফেললেন, সামলে ভাই সামলে।

চিতায় জল ঢালা হল। ধোঁয়ায় সোঁদাসোঁদা গন্ধ। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। এত বছরের বেঁচে থাকা একমুঠো ছাই মাত্র! নাভিটা খুঁজে খুঁজে বের করল মেনিদার বড় ছেলে। একতাল গঙ্গামাটিতে পুরে বললে, চলো, গঙ্গায় ফেলতে হবে।

মাঝরাতের গঙ্গার কী শোভা! যেন তরল মৃত্যু। কুলকুল করে বয়ে চলেছে। কিন্তু অক্ষয় কাকাবাবু কোথায়!

Life is like an Onion. You peel
away layer after layer and when
You come to the end you have nothing.

কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না মানুষটিকে। আমরা সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত পদে শ্মশান ছেড়ে বাইরে চলে এলুম। পুব আকাশে জবাফুলের রং ধরেছে। মেনিদা বললেন, প্রমাণ করে দিলুম, রাজদ্বারে আর শ্মশানে যে সঙ্গী হয় সে-ই প্রকৃত বন্ধু। আমরা তোমার শাস্ত্রসম্মত বন্ধু। তোমার সেই ঘটোৎকচ, দেখলে তো, কোন এক সময় কেটে পড়েছে খুস করে! দ্যাটস ভেরি ব্যাড, অফুলি ব্যাড।

আমাদের অনুসরণ করে আসছে আমাদেরই ভিজে কাপড়ের সপাত সপাত শব্দ, আর পায়ের ছাপ। মেনিদা আমার পাশে পাশে আসছেন কথা কইতে কইতে। হঠাৎ বললেন, তোমার খুব একা লাগে, না? বাবা চলে গেলেন, তোমার সেই মেয়েটিও চলে গেল। যা-ও বা একটা দিদি এসেছিল, সে-ও সরে পড়ল। এইবার তুমি কী করবে! একেবারে একা একা পৃথিবীতে বাঁচা যায়?

আমার কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না। কোনওরকমে বললুম, হুঁ।

মেনিদা বললেন, কোনওদিন অচলাকে দেখেছ?

অচলা? কে অচলা?

অচলা আমার মেয়ে। নিশ্চয় দেখেছ। তাকে না দেখে উপায় নেই। তার যা রূপ, যে-কোনও ছেলেকে তাকাতেই হবে। উঠতি বয়সের ছেলে। আর তা না হলে বুঝতে হবে কোনও অসুখ আছে। আমি নিজেই অনেক সময় হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। একটা পারফেক্ট ক্রিয়েশন। সিনেমাঅলারা পেলে একেবারে খামচাখামচি করবে। ওকে বেশিদিন আর এইভাবে ফেলে রাখাটা সেফ নয়। ধামায় করে প্রেমপত্তর ফেলতে হয়। তাই ভাবছি তোমাদের দু'জনকে গেঁথে দিয়ে চলে যাব। তোমাকে কিছু করতে হবে না, শুধু একটু সাবধানে রাখবে, যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়। ঠিক এই সময় কথাটা কেন বলছি জানো? ইংরেজি প্রোভার্ব, স্ট্রাইক দি আয়রন হোয়াইল ইট ইজ হট। তোমার মনটা এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে আছে। ফাঁকা দেয়ালেই ছবি ঝোলাতে হয়। ঝুলিয়ে দিলুম, তুমি এইবার তাকিয়ে থাকো। রুমাল দিয়ে মোছো। ভাব আনো মনে। একটা অভাববোধ। এরই মাঝে টুক করে একদিন অচলাকে পাঠিয়ে দোব। সে তোমার মন মেরামত করে দেবে।

কেমন করে বুঝলেন আমি বিয়ে করব?

তোমার হাবভাব রকমসকম দেখে।

সে আবার কী?

তুমি পায়রা দেখেছ? পায়রার মেটিং!

আজ্ঞে না, সুযোগ হয়নি, ইচ্ছেও নেই।

নেচারকে অবজার্ভ করবে, স্টাডি করবে, দেখবে কত কী জানতে পারবে। পুরুষ পায়রা গালগলা ফুলিয়ে পেখম ছেতরে, একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়। কোঁক কোঁক শব্দ করতে থাকে। গায়ের রংটং আরও উজ্জ্বল হয়ে যায়। স্ত্রী-পায়রা তখন বুঝতে পারে। প্রকৃতির সে এক অদ্ভুত লীলা। তুমি সাপের মেটিং দেখেছ?

আজ্ঞে না। আমি তো ন্যাচারালিস্ট নই। আর মেটিং দেখা উচিত না। অসভ্যতা।

মেনিদা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, তোমার মাথা! মানুষ ছাড়া আর কিছু চতুষ্পদ ছাড়া, প্রাণীজগতের মেটিং স্বর্গীয় দৃশ্য। কী আর্ট! কী বিউটি! জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঝকঝকে পিচের রাস্তা চলে গেছে। ফটফট করছে চাঁদের আলো। আমরা একটা গাড়ি করে যাচ্ছি। বসেছি সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে। সামনে চাঁদের আলোয় ধোয়া পথ। আহা! হোয়াট এ ম্যাগনিফিশিয়ান্ট সাইট! ড্রাইভার ঝপ করে ব্রেক কষে দিল। ঠিক হাত-কুড়ি দূরে একজোড়া শঙ্খচূড়। মেল সাপটা পেছনের লেজে ভর রেখে খাড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ফিমেলটা তার সারাশরীর পেঁচিয়ে ওপরে উঠেছে, দুটো মাথা হেলছে-দুলছে, যেন অদৃশ্য কোনও সংগীতের তালে তালে। এ একবার ছোবল মারে তো, ও একবার। দড়ির ফাঁসের মতো জড়িয়ে গেছে দুটো শরীর। একটা সার্কল করে দু'জনের শরীরের নীচের অংশ খেলে বেড়াচ্ছে। সাপ দুটোর শরীর যেন ফসফরাসের মতো জ্বলছে। আর একটা সুগন্ধ, যেন কেউ কোথাও কামিনীভোগ চালের পায়েস রাঁধছে। আর একটা ঝুনঝুন শব্দ। দু'জনের শরীরের কাঁটার মতো হাড়ের শব্দ। উঃ সে কী দৃশ্য! গড, আই অ্যাম গ্রেটফুল টু ইউ। তোমার কৃপায় এই মেনি, হাড়হাবাতে এই মেনি তোমার সৃষ্টির এই লীলা দেখে ধন্য হয়েছে। কী বিরাট, স্বরাট, মহারাজ। একটা গাছকে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কী বিশাল বিচিত্র এই সৃষ্টি! কোথায় তুমি বসে আছ মহারাজ? কেন তোমাকে দেখতে পাই না! তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী।

মেনিদা ঝরঝর করে কাঁদছেন। আশ্চর্য চরিত্র! আমাদের বাঁ পাশে গঙ্গা। বড় বড় অশ্বত্থ আর বট গাছ। আকাশের গা থেকে অন্ধকারের নির্মোক একটু একটু করে খুলে পড়ছে। দ্রুত ধাবমান ট্রেনের জানলায় যেমন একটি-দুটি নিরীহ আত্মভোলা মুখ দেখতে পাওয়া যায়, সেইরকম একটি কি দুটি তারা আকাশের চাঁদোয়ায়। গাছের পাতায় বাতাসের ভিজে জাল টানার শব্দ। মেনিদা অবরুদ্ধ গলায় বলে চলেছেন,

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত
তার তরে রাখোনি গোপন রাত্রি
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ

সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জল
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু
এই নিয়ে তাহার গৌরব
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

মেনিদা একটা দম নিলেন বড় করে। চোখ মুছলেন জামার হাতায়। ভিজেভিজে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এক্সকিউজ মি। বিশ্রী একটা ভাব এসে গিয়েছিল। আসলে আমি তো খুব দুঃখী মানুষ। কেন মাঝে মাঝে বজ্জাতি করি জানো? তুমি কি শেকসপিয়ারের রিচার্ড দি থার্ড পড়েছ?

আজ্ঞে না।

তোমরা কেন লেখাপড়া করো না বলো তো, ইয়াংম্যান? আরে, আমরা একজায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই থেকে! ছেলেরা কোথায় গেল?

এগিয়ে গেছে।

চলো চলো, সর্বনাশ! ভিজে কাপড়ে তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে।

আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি আমি। কী করে বুঝলেন আমি বিয়ে করব? আমার কোন রকমসকম দেখে আপনার এই ধারণা হল!

ও তুমি এখনও ওইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছ? প্রথমত, দেখো তোমার চুল। একেবারে এ-ক্লাস বাবরি। শিল্পী-শিল্পী ভাব। দ্বিতীয়ত, তোমার সাজপোশাক। তুমি স্টিমলন্ড্রিতে জামাকাপড় কাচাও। সবসময় ফিটফাট ধোপদুরস্ত। তৃতীয়ত, তুমি রোজ দাড়ি কামাও, মুখে স্নো-পাউডার মাখো। গায়ে সেন্ট মাখো। চতুর্থত, তুমি মেয়ে ছাড়া থাকতে পারো না। আর পঞ্চম, নরানাং মাতুলক্রমঃ, তোমার মামার ধারায় রয়েছে গান, সিনেমা, নায়িকাসঙ্গ। এইবার তুমিই বলো। নিজেকে নিজেই বিচার করো। তোমার ভেতরে প্রেম জাগছে।

আমরা হনহন করে হাঁটছি। একজন-দু'জন স্নানার্থী গঙ্গার দিকে চলেছেন নিদ্রার আলস্য নিয়ে। হঠাৎ মেনিদা পাকা ওস্তাদের গলায় গান ধরলেন, ওগো! কেমনে বলো না ভাল না বেসে থাকি গো তোমায়!

ভদ্রলোকের মাথায় একটা কিছু হয়েছে। কত রকমের ভাব খেলা করছে। মেনিদা কিছু দূর আমার সঙ্গে এলেন, তারপর বিদায় নিলেন। নিত্যকর্ম করবেন। পথে পথে নামগান গেয়ে বেড়াবেন। মেনিদার গুরু বলেছেন, মেনি, নাম ছেড়ো না। নামেই মুক্তি।

বাইরের রকে অক্ষয় কাকাবাবু গুম মেরে বসে আছেন। সদরের চাবি আমার কাছে। ঢুকতে পারেননি। কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না, তবু প্রশ্ন করলুম, কখন চলে এলেন?

জানো না?

আজ্ঞে না। খেয়াল করিনি।

এতই যখন বেখেয়াল তখন আর জেনে কী হবে?

আশ্চর্য কথা বলছেন আপনি! নিজেই উদাস হয়ে বসে রইলেন দলছাড়া হয়ে, আমাদের পেছন দিকে। এক ফাঁকে টুপ করে উঠে চলে এলেন। কেমন করে জানব? আপনার রাগের কারণটা কী?

সে আর তোমার জেনে কাজ নেই। দয়া করে দরজাটা খোলো, আমার জিনিসপত্তর নিয়ে সরে পড়ি। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার।

কাকাবাবু, অত রাগ ভাল নয়। এই রাগের জন্যেই আপনি আজ সংসারছাড়া।

শুকনো ঘাসে আগুন পড়লে যেমন দপ করে জ্বলে ওঠে, কাকাবাবুও সেইরকম দপ করে জ্বলে উঠলেন, শোনো পিন্টু, বয়সকে সম্মান দিতে শেখো। জানি তোমার অনেক ইয়ারবকশি জুটেছে।

ইহকাল-পরকাল দুটোই চিবিয়ে শেষ করবে। তোমার অধঃপতনে আমি অবাক।

বেশ কড়া একটা জবাব জিভে এসেছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, সন্ন্যাসী আমাকে অমৃতফল খাইয়েছিলেন। সহজে বিচলিত হলে তো চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে জিভে লাগাম চড়ে গেল। রাগ-রাগ ভাবে তালাটা খুলতে যাচ্ছিলুম। সংযত ভাব এল। ধীরে দরজা খুললুম। স্যাঁতস্যাঁতে একটা বাতাস ঝাপটা মেরে চলে গেল। পেছন থেকে কে খুব মিষ্টি গলায় ডাকল, পিন্টুদা।

টিপ আর টিপের মা। টিপের হাতে একটা নিমডাল। বউদির হাতে গঙ্গাজলের ঘটি। মিষ্টির বাক্স। হাঁ করে তাকিয়ে আছি। বউদি বললেন, কী দেখছ অমন করে?

আপনারা? আপনারা এলেন আমার জন্যে?

হ্যাঁ এলুম। দেখো ঠিক সময়ে এসে গেছি। দাঁড়াও, ঢোকার আগে নিমপাতা চিবোও। কাকাবাবু বসেই আছেন। বউদি বললেন, চান করেননি আপনি?

না, আমি আমার সময়ে চান করব।

শ্মশানে যাননি?

গিয়েছি।

তা হলে?

শ্মশানেই আমার ঘরবাড়ি। আমার চানের দরকার হয় না।

কাকাবাবু ভেতরে চলে গেলেন। টিপ বললে, মনে হচ্ছে, কোনও কারণে বেশ রেগে আছেন।

বউদি বললেন, কী হল?

কিছু হতে হয় না। উনি দুর্বাসার বংশধর।

তোমার জীবনে দেখছি অশান্তির পর অশান্তি।

ঈশ্বরের পরীক্ষা।

তা যা বলেছ।

কাকাবাবু তাঁর ঝোলা ব্যাগ নিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলেন বীরের মতো। আমরা কেউ বাধা দিলুম না। টিপ আর বউদি দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। শুনেছি ভদ্রলোক এইভাবেই একদিন সামান্য কারণে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। আমার পিতার সামনে বিশেষ ট্যাঁ ফোঁ করতে পারতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে কেঁচো হয়ে থাকতেন। পৃথিবীতে এই ধরনের মানুষের জন্যে প্রয়োজন ভাল রকমের চাবকানির।

কিন্তু হঠাৎ আমার কী হল ভেতরে? রাগ আর ঘৃণার বদলে একটা ভালবাসার ভাব এল। প্রচণ্ড একটা দুঃখের বোধ। আহা! মানুষটার কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীতে একেবারে একা। চাকরি অবসর দিয়েছে। যৎসামান্য পেনশন। একেবারেই অনিকেত। কলকাতার এক পরিবারে একটু আশ্রয় পেয়েছেন। এই মেজাজ নিয়ে কতদিনই বা সেখানে থাকতে পারবেন! এই বৃদ্ধ বয়েস। বাউন্ডুলে হয়ে ঘুরছেন।

তিরবেগে দৌড়োলুম। যেমন একদিন দৌড়েছিলুম আমার পিতার পেছন পেছন। সে ছিল অদ্ভুত এক ঘটনা। নতুন এক কথা শেখার বিড়ম্বনা। সেইদিনই স্কুলে বাংলার শিক্ষকমহাশয় নতুন এক শব্দ শিখিয়েছিলেন, পরাকাষ্ঠা। বেশ নতুন ধরনের কথা। নিজেকে খুব ঐশ্বর্যশালী মনে হচ্ছিল। সেইদিনই সন্ধেবেলা বাড়িতে পুরোহিতমশাই এলেন, পিতা বললেন, প্রণাম করো। সঙ্গে সঙ্গে পরাকাষ্ঠা শব্দটি লাগাবার সুযোগ পেয়ে গেলুম। প্রণাম করতে করতে বললুম, প্রণামটাই ভক্তির পরাকাষ্ঠা নয়। পিতা গুম মেরে গেলেন। পুরোহিতমশাই চলে গেলেন। হঠাৎ বামুনদি এসে বললেন, তুমি কী বলেছ, ছোটবাবু বেগে বেরিয়ে গেলেন! নির্বোধ কিশোরের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। পনপন করে ছুটলুম বাজারের দিকে। রাতের অন্ধকার রাস্তা, গুচ্ছের সাইকেল, রিকশা। দৃকপাত নেই। তিনি ফিরে এলেন, কিন্তু পুরো একটা মাস বাক্যালাপ বন্ধ রইল। কাকাবাবুকে ধরার জন্যে ছুটছি, আর সেই অতীত ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেই একই হাঁকপাঁক ভাব। বেশ কিছুটা যাবার পর কাকাবাবুকে দেখতে পেলুম। খাড়া হেঁটে চলেছেন। একমাথা এলোমেলো পাকা চুল। বাঁ দিকে দুলছে সাইড ব্যাগ। রাস্তার দু'পাশের লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার ছোটার দিকে।

মোটরবাইক-আরোহী সার্জেন্ট যেভাবে আইনভঙ্গকারী গাড়ির পথ অবরোধ করেন, আমিও সেইভাবে কাকাবাবুর সামনে গিয়ে পড়লুম। হাপরের মতো হাঁপাচ্ছি। কথা বলতে পারছি না। তাঁর হাতদুটো ধরে আবেগে কেঁদে ফেললুম। কোনওরকমে বললুম, ক্ষমা করুন। ফিরে চলুন আপনি। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

রাস্তার একপাশে সরে এলুম আমরা। কাকাবাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি ফুলছি ক্রমশই। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, কে কাকে ক্ষমা করে! আমিও তো এক পাঁঠা। চলো চলো, বাড়ি চলো।

সাতসকালেই রাজপথে এক নাটক। সকলেরই চোখে প্রশ্ন। উৎসুক মানুষের মধ্য দিয়ে আমরা দু'জনে ফিরে এলুম। বাড়িতে ঢুকেই কাকাবাবু বললেন, আমি তোমার ওপর কেন অমন রেগে গেলুম বলো তো,

ছোটলোকের মতো?

বউদি বললেন, থাক ওসব ফয়সালা। মুখহাত ধুয়ে ফেলুন। সকালের চা-টা হয়ে যাক আগে। কাকাবাবু দু'হাতে আমার কাঁধদুটো ধরে, সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিই হরিশঙ্করদার ছেলে হবার উপযুক্ত। বোম্বাই আম গাছে বোম্বাই আমই হয়। আসল ব্যাপারটা কী জানো, তোমাকে আমি বোধহয় সর্বাধিক ভালবাসি। আমারও তো কিছু আশা ছিল। শান্ত সংসার, তোমার মতো একটি ছেলে, হরিশঙ্করদার মতো ভাই। সবই তো মরীচিকা হয়ে গেল। ভালবাসার কোনও ব্যাখ্যা হয় না পিন্টু। ইট ফ্লোজ। যেমন করে ধমনিতে রক্ত প্রবাহিত হয়। তোমাকে এত ভালবাসি বলেই তোমাকে অন্য কেউ অধিকার করলে আমার অভিমান হয়। হোয়াট ক্যান আই ডু? আই অ্যাম হেল্‌পলেস।

এক প্রবীণ আর এক নবীন দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে আছি। সময় যেন থমকে গেছে। আমরা কত অসহায়! ভেতরে শূন্যতার তেপান্তর। কারওই কেউ নেই। সকলেই সকলকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি। চাঁদের বাইরে মায়াবী আলো। সে আলোও আবার ধার-করা আলো। চাঁদের পিঠে বীভৎস যত গর্ত। প্রাণহীন এক মহাশ্মশান। বউদি আর টিপ দু'জনেই রান্নাঘরে। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। মনে হওয়ামাত্রই রাতের শ্মশানের দৃশ্য আবার ভেসে উঠল। স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের কথা, পৃথিবীটা কী? বিশাল এক কারাগার। প্রতিদিনই কিছু কিছু কয়েদিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা আর ফেরে না।

কাকাবাবুকে বললুম, আপনি একটু হাসুন। তা না হলে আমার মন ঠিক হবে না।

হাহা করে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। বউদি ছুটে এলেন, কী হল?

কাকাবাবু বললেন, ভয়ের কিছু নয় বউমা। জীবন বেলাইন হয়ে গিয়েছিল, আবার তাকে লাইনে ভেড়ানো হল। সুর কেটে গিয়েছিল না!

বারান্দার টিনের চালে এক ঝাঁক পায়রা এসে বসেছিল। কী কারণে সবকটা ফটফট করে উড়ে গেল। কিছু পরেই কারণটা বোঝা গেল। সেই বাঘা বেড়ালটা ছাত থেকে লাফ মেরে টিনের চালে নেমেছে। বড়ই আফসোস। একটাকেও যমের বাড়ি পাঠাতে পারল না।

দুপুর এল। মুকুর শাড়িটা বউদি তার থেকে তুলে পাট করে রেখে গেছেন। কোনও মেয়েলি ব্যাপার আর চোখে পড়ার উপায় নেই। বর্শার ফলার মতো রোদের রেখা নতুন টিনের চাল থেকে ঠিকরে চোখে এসে লাগছে। নারী-শূন্য বাড়িতে অনেকদিন পরে আমার শৈশবকে যেন ফিরে পেলুম। কেউ তখন ছিল না। আমি আর পিতা হরিশঙ্কর। আমাদের ঘিরে ছিল উচ্চ আদর্শ, ত্যাগ আর তিতিক্ষা। ছিল এসরাজ, হারমোনিয়ম, তানপুরা, বাঁয়া-তবলা। একটা আশ্রমিক পরিবেশ। পিতা যেন বাঘছাল পরা, ত্রিশূলধারী মহাদেব। তিনটে জিনিসকে শূলে বিঁধে হত্যা করা হয়েছিল□—কাম, ক্রোধ আর লোভ।

আজ যেন সেই অতীত সাঁতার কেটে বর্তমানের পইঠায় উঠে পড়েছে। শুধু কাকাবাবুকে পিতা ভেবে নিলেই হল। ভদ্রলোক এই মুহূর্তে কঠিন এক অঙ্ক নিয়ে পড়েছেন। হরিশঙ্করের জন্মসময় আর সাল-তারিখ নিয়ে হিসেব চলেছে। কোথায়, কোন দিকে যেতে পারেন? সবার আগে দেখা দরকার বেঁচে আছেন কি না! ছক পড়ে গেছে। গ্রহনক্ষত্রের ডিগ্রি বেরিয়ে গেছে। দশা-অন্তর্দশার হিসেব চলছে।

দূর থেকে মানুষটির তন্ময়তা দেখছি। কেটলিতে চায়ের জল ফোটার সিঁসিঁ শব্দ। একটু আগে কাজের মহিলা এসে জবাব দিয়ে গেছে। কাজ করতে পারবে না। আসলে ভূতের ভয়। গলায় দড়ি। সাংঘাতিক এক ব্যাপার। না আসে, না আসবে! সিদ্ধান্ত হয়েই গেছে, বাড়িতে কিছুদিন তালা পড়বে। সংসার গুটিয়ে রাখা হবে গালচের মতো। আমরা একটা পরিক্রমায় বেরোব। হরিশঙ্করকে যেভাবেই হোক উদ্ধার করে আনতে হবে। কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন, শোনো, কী করছ ওখানে একা একা! ও, চা বসিয়েছ? গুড বয়। আচ্ছা হরিদার কি হারপিস হয়েছিল? হারপিস জোস্টার? এনি ফর্ম অফ ভাইর‍্যাল ইনফেকশন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, হারপিস জোস্টার।

বাঃ বাঃ, কী আনন্দ! কাকাবাবু উল্লাসে আটখানা, সে ফাইভ ইয়ারস ব্যাক?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ওইরকমই হবে।

মিলছে মিলছে। আচ্ছা, এনি অ্যাকসিডেন্ট?

অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট আই ক্যান রিমেম্বার। তা হলে তো লং লাইফ! তিনি আছেন। বেঁচে আছেন। আচ্ছা দেখি সন্ন্যাসযোগ আছে কি না! নাউ হি ইজ পাসিং থ্রু স্যাটার্ন।

কাকাবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন। বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল।

অন্তরে লভেছি সত্য, ভ্রমণের ফলে,
ধরণী সুদূর নয় আকাশের তলে॥

গাড়ি থামার শব্দে চমকে গেছি। এখন গাড়ি মানে পুলিশের গাড়ি। দুটো দুর্বল জায়গায় এখনও আঘাত আসার সম্ভাবনা আছে। দিদি কীসের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন? ঘরে উঁচু কোনও জিনিস পাওয়া যায়নি। এইটা একটা লুজ-এন্ড। দ্বিতীয় দুর্বল জায়গা হল, ওই হার। যাঁর কাছে অমন মূল্যবান একটা হার, তিনি কেন ভিক্ষা করতে বেরোবেন! হারটা বিক্রি করলেই তো রাজার হালে থাকা যেত! সদরের কড়া নড়ল। ভয়ে ভয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। তিনি বললেন, দেখো, কে এলেন!

যদি পুলিশ আসে?

আসে আসবে। অত ভয়ের কী আছে!

এই ভয়ই তো আমাকে মেরেছে। সব ব্যাপারেই ভয়। আমার পিতাকে ভয় করতে করতে ভয়টা জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে গেছে। সদর দরজা খুলেই চমকে উঠলুম। ইনি কোথা থেকে এসে হাজির হলেন! আরও মোটা হয়েছেন। দুটো চোখের তলায় অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত স্ফীত ভাব। খ্যাসখেসে গায়ের রং। এই সেই মেসোমশাই। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক। দেখলেই মনে হয় অতিশয় চালিয়াত।

দরজার ভেতরে একটা পা, দরজার বাইরে একটা পা। মেসোমশাই থমকে আছেন, সেই ত্রিশঙ্কু অবস্থাতেই প্রশ্ন, মুকু কোথায়?

যেন আমি মুকুকে কিডন্যাপ করে এনেছি।

মুকু মুকুর হস্টেলে।

ধমকের সুরে মেসোমশাই বললেন, না, সেখানে নেই। এই বাড়িতেই আছে। হস্টেল ছেড়ে দিয়েছে।

আবার হস্টেলেই ফিরে গেছে।

না যায়নি। আমি জানতে চাই, কেন সে এখানে? হোয়্যার ইজ হরিশঙ্করবাবু?

তিনি নেই। বেশ কিছুদিন হল কলকাতার বাইরে।

অ্যাঁ, তার মানে তোমরা দু'জনে এই বাড়িতে সংসার পেতে ফেলেছ? টেরিবল!

আপনি ভেতরে আসুন না মেসোমশাই!

এখনও মেসোমশাই আছি না বাবা হয়ে গেছি? টেরিবল, টেরিবল। সুধন্য, হোয়াট ইউ সে! সঙ্গের সাথীটির নাম সুধন্য। কে জানে কে, কী সম্পর্ক!

গম্ভীর গলায় বললুম, মেসোমশাই, ওপরে চলুন।

সে তো যাবই। কিন্তু আমার দুটো মেয়েই কী বোকা, পারফেক্ট ফুল। আমার মেয়ে বলে মনেই হয় না। রোমান্টিক ফুল। ইডিয়টস, ইডিয়টস।

সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে উঠছেন মেসোমশাই, পেছনে সুধন্য কাপ্তেন, তার পেছনে আমি। মিষ্টি একটা মদের গন্ধ নাকে আসছে। অবেলাতেই এক রাউন্ড চড়ে গেছে। সুধন্যবাবু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন, বনেদি বাড়ি, কিন্তু শ্রীহীন। মেন্টিনেন্স ভাল নয়। তেমন নজর নেই। খিলানের কাজ দেখেছেন? এসব কাজের মিস্ত্রি আর নেই।

মেসোমশাই বললেন, এসব কাজের আর দরকারও নেই। মার্টিন বার্নকে দিয়ে তোমাদের লেটেস্ট যে বাড়িটা করিয়েছ, সেটা এর চেয়ে ফাংশানাল। মডার্ন ইজ মডার্ন।

তা হলেও এসব বাড়ির ইজ্জত আলাদা।

তর্ক কোরো না সুধন্য। তর্ক কোরো না।

দু'জনেই ঘোঁত করে থেমে গেলেন। সামনেই পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু। মেসোমশাই থতমত খেয়ে বললেন, ইনি কে?

কাকাবাবু বললেন, চিনতে পারছেন না! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন!

চেনাচেনা মনে হচ্ছে।

কাকাবাবুর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। বিশাল বুক। ভাল্লুকের মতো লোম। একসময় গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তি করতেন। গোপালবাবুর বন্ধু। রায়টের সময় দু'জনে কলকাতা দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। চেহারা দেখে যে-কোনও মানুষই থতমত খাবেন। সে একটা যুগ চলে গেছে এ দেশবাসীর জীবনের ওপর দিয়ে। আমার পিতৃদেব ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে নিত্য ব্যায়াম করতেন। মাতামহ ছিলেন মল্লবীর। পিতামহ যোগী। আমি নেংটি ইঁদুর। পরের প্রজন্মের আমরা একেবারে ওয়ার্থলেস। আমার মাতুল ফিনফিনে পলতোলা গেলাস। আমাদের কোনও আয়তনই নেই। ডিসপেপটিক ইন্টেলেকচুয়াল। মেয়েছেলেরই পুং সংস্করণ। একালের নানা সাজসজ্জা দিয়ে রক-ক্লাইম্বিং শুরুর ঢের আগেই পিতা হরিশঙ্কর ক্লাইম্বিং শুরু করেন। মালকোঁচা মারা ধুতি। গায়ে টুইলের শার্ট। পায়ে কেডস। ডালপালা, গাছের শেকড়, পাথরের খাঁজ ধরে ধরে খাড়া পাহাড়ে উঠছেন। আমি নীচে দাঁড়িয়ে দেখছি। ভয়ে দমবন্ধ। কেউ কোথাও নেই। বাতাসের শনশন শব্দ। মজা নদীর বুকে বালি আর নুড়ি পাথর। গোরুর কঙ্কাল। হয়তো বাঘেই মেরেছিল। নীরব প্রার্থনা, হে ভগবান! ফেলে দিয়ো না। একসময় হারিয়ে গেলেন। আর দেখাই যাচ্ছে না। সময় যাচ্ছে। এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা। কিশোর কাঁদছে ভয়ে। একসময় পাহাড়চূড়ায় মানুষটিকে দেখা গেল। বিন্দু মতো। একটা সাদা রুমাল নাড়ছেন। পিন্টু! এই ডাক ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে সেই নিরালায় ভেসে বেড়াল। সূর্য অস্তে চলেছেন। নামছেন না কেন! এখুনি তো অন্ধকার হবে। আমি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করছি, বাবা, নেমে আসুন। বাবা ডাকটাই, বা বা শব্দে সন্ধ্যার ঘরেফেরা পাখির মতো ঝটপট ঝটপট করে উড়তে লাগল। ছরছর শব্দে নেমে এল একটা পাথর। হঠাৎ একসময় তিনি আমার পেছনে এসে দাঁড়ালেন। কোন দিক থেকে কীভাবে নেমে এলেন কে জানে! হাতের পায়ের দু'-একটা জায়গা ছিঁড়ে, ছেঁচে গেছে। সে ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথাই নেই। মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। রাজমহল পর্বতমালার অজানা এক শৃঙ্গে আরোহণের অপরিসীম আনন্দ। কোনও সংবাদ হবে না। গলায় মালা পরাবার

জন্যে কেউ ছুটে আসবে না। কিশোর পুত্রকে সাক্ষী রেখে দুঃসাহসী পিতার ভয়ংকর অভিযান। মাতামহ যে-গানটি গাইতে গাইতে আত্মহারা হয়ে যেতেন, সেই গানের একটি কলি গেয়ে উঠলেন, পর্বত-সুমেরু ওহে হিমাচল গ্রীবা উন্নত করি কী দেখিছ বলো, দেখিছ কি সেই গুণাকর রূপ। কেউ কোথাও নেই। শুকনো নদী, উপত্যকার জঙ্গল, গোরুর আস্ত কঙ্কাল, পোড়া ইটের মতো লাল আকাশ। চারপাশে পাহাড়ের দেয়াল। তাঁর সেই অক্ষত নেমে আসার আনন্দে একটি কিশোরের ক্রন্দন আরও প্রবল হত। বুঝে ফেলত, পৃথিবীতে পিতা ছাড়া কেউ নেই। তিনি এসে হাত না ধরলে সব মানুষই বড় অসহায়। মানবপিতাকে উপলক্ষ করে জগৎপিতার ধারণা মন স্পর্শ করে যেত। মাতামহের উদাত্ত সংগীত আরও অর্থবহ হত:

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা, জানো না রে মন আমি পুত্র তাঁর।

সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে, সেই অরণ্যপ্রান্তরে পর্বতরাজি ক্রমশ আকাশের গায়ে ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেত। পিতা হরিশঙ্করের বর্ণনা তবু থামত না। শিখরে বাতাস কেমন মসলিনের মতো, সুরার মতো, কেমন তার ফিনফিনে শব্দ, কতটা শীতল। ঊর্ধ্ব থেকে অধের দৃশ্য কেমন খেলাঘরের মতো। কত বর্ণের রেখা টানা মসৃণ পাথর। ফাটলে ফাটলে তুলোঘাস। যেন কোনও ঋষির শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত বিশাল এক সমাহিত মুখ আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। আবার নাকি একটা কালো কুচকুচে সাপও দেখেছেন। সিল্কের কর্ডের মতো মসৃণ আর সরু। এত সব দেখার বৃত্তান্ত দিতে দিতেই নেমে আসত ঘোর অন্ধকার। দূর দূর দেহাতি গ্রামে বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠত লণ্ঠনের আলো। চুলার ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠত অশরীরী প্রেতের মতো। বনভূমির মাথার ওপর ভেসে উঠত হালকা কুয়াশার রেখা। নাকে এসে লাগত বোটকা একটা গন্ধ। পিতা হরিশঙ্কর হঠাৎ অতিশয় সচকিত হতেন। বলতেন, চলো চলো, মনে হয় বাঘ বেরিয়েছে কাছাকাছি কোথাও। তাড়াতাড়ি পা চলবে কী করে! তারার আলো ছাড়া তো আর কোনও আলো নেই। গাছগাছালির গন্ধ। ঝিল্লির রব। ভাসমান জোনাকির আলো। তিনি শক্ত করে আমার হাত ধরে বলতেন, কী ভয় করছে বুঝি! ভয় কীসের? আমি তো আছি। সেই হাত, সেই ধরার হাত খুলে গেছে, কিন্তু আমার সামনে উদার বুক মেলে দাঁড়িয়ে আছেন সেই একই ঘরানার আর এক মানুষ।

চটকা ভেঙে গেল। অতীত থেকে ফিরে এলুম বর্তমানে। কাকাবাবু বলছেন, আপনার কথা শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পের নায়ক ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জীবনের ঘটনা। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এক ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। বাইরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে ঠাকুর কোন্নগরে গেছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাগনে হৃদয়। নৌকো থেকে নামছেন, দেখলেন গঙ্গার ঘাটে সেই ব্রাহ্মণ বসে আছেন। বোধহয় হাওয়া খাচ্ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ব্রাহ্মণ বলছেন, কী ঠাকুর! বলি, আছ কেমন? তার কথার স্বর বলার ধরন দেখে ঠাকুর বললেন, ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা। তা মশাই, আপনার ধরন-ধারণ দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছে, আপনার টাকা হয়েছে। অবেলায় মদ চড়িয়েছেন। সেই অবস্থায় এসেছেন মেয়ের খোঁজ নিতে!

ভদ্রলোক প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। পরমুহূর্তেই সামলে নিয়ে বললেন, আমাদের সোসাইটিতে এটা কোনও ব্যাপার নয়। একে আমরা বলি, হেলথ ড্রিঙ্ক। আমি জানতে চাই আমার মেয়ে মুকু কোথায়?

কাকাবাবু ঠিক অনুরূপ ভঙ্গিতে বললেন, আমি জানাতে চাই মুকু এখানে নেই। ছিল, কিন্তু চলে গেছে।

হোয়াট ডু ইউ মিন! সে হস্টেলে নেই, সে এখানে নেই, তা হলে গেল কোথায়? কে তাকে হস্টেল থেকে ফুসলে এখানে এনেছিল! ফোসলানো একটা পেনাল অফেন্স। ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন ধারায় পড়ে আপনি জানেন?

ঘোড়ার ডিম ধারায়। মেয়ে নিজের ইচ্ছেয় এসেছিল, নিজের ইচ্ছেয় চলে গেছে। ধারাপাত আপনি পড়ুন। আমাদের আর পড়ার বয়েস নেই।

জেনে রাখুন, আপনাদেরও পড়তে হবে। আমি লোকাল থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করে আসি। তখন পড়বেন। কত ধানে কত চাল তখন বুঝবেন!

আপনার মেয়ের বয়েস কত?

অ, আপনি ওই রাস্তায় যেতে চান? অ্যাডাল্ট! মাইনর নয়! তাকে যে ফ্লেশ মার্কেটে পাচার করা হয়নি কে বলতে পারে? আপনার যেরকম যমদূতের মতো চেহারা! খুন করলেও অবাক হবার কিছু নেই।

আপনি যত তাড়াতাড়ি পারেন থানাতে যান। সেইখানেই আবার দেখা হবে। কথা হবে। এমনি তো হবে না। সাক্ষীসাবুদ চাই। কী বলেন?

আমার ভেতরে আবার একটা ভয় গুড়গুড় করে উঠল। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় আমাদের ক্লাবের ক্যাপ্টেন দীনবন্ধুদাকে পুলিশ কীরকম নারীঘটিত ব্যাপারে কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে গিয়েছিল। আমারও সেই একই অবস্থা হবে?

ভয়ে ভয়ে বললুম, আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনি তো আমাদের আত্মীয়!

সো হোয়াট! আমার সঙ্গে তোমার যা সম্পর্ক, তাতে আমার মেয়েকে বিয়ে করা যায়।

বিয়ের কথা আসছে কেন?

অ, তুমি বিয়ের নামে ফুর্তি করবে? আই বিয়িং এ ফাদার সেটা রেলিশ করব!

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আপনি কী করছেন?

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একেবারে ফিউজ। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর এক ডোজ দিয়ে দিলুম, মুকু আপনাকে বাবা বলতে ঘৃণা করে। বড় মেয়েকে তো বিক্রি করতে চেয়েছিলেন। সে তো পালাল। আজ হঠাৎ বোতল টেনে এখানে এসে বাবাগিরি ফলাচ্ছেন! মুকুকে সময়মতো টাকা পাঠান? চিঠি লেখেন? আপনি তো চরিত্রহীন। আমার কাকিমায়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। হাত না বলে থাবা বলাই ভাল।

কাকাবাবু এইবার একটা পাঞ্চ ঝাড়লেন, বাপ হয়ে কী করে বলতে পারলেন, মেয়েকে বেশ্যালয়ে বিক্রি করা হয়েছে? রাবিশ। ভালগার। জেনে রাখুন, এই পিন্টুর আর মুকুর বিয়ে হবে। হরিদা ফিরে এলেই হবে। কারও বাবার ক্ষমতা নেই আটকায়!

মেসোমশাই একটু টাল খেলেন। চোখদুটো কাতলা মাছের মতো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এমন একজন মানুষকে শ্বশুরমশাই বলে মেনে নিতে হবে ভাবলেই মন বিদ্রোহ করে! এমন একজন মানুষের অমন সুন্দর দুটি মেয়ে হল কী করে! মাসিমার রূপে। আমার জ্যাঠাইমার রূপ তো আমি দেখেছি। দুই ব্রাহ্মিকা। কোথায় লাগে একালের আধুনিকা!

সুধন্যবাবু মেসোমশাইকে ধরে টাল সামলাতে সাহায্য করলেন। ভদ্রলোক বললেন, জামাইবাবু, আপনি পুরো ব্যাপারটাকে এমন ঘুরপাক খাইয়ে দিচ্ছেন কেন? তিলকে তাল করছেন!

জামাইবাবু! তার মানে শ্যালক। কোন শ্যালক? দ্বিতীয়পক্ষের ভাই?

কাকাবাবু বললেন, আগেও দেখেছি, সমস্ত ব্যাপারটাকে উনি সবসময় একটা সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চান। গ্রহ-বৈগুণ্য। মঙ্গলটা বেয়াড়া জায়গায় বসে আছে। মানুষের সব কথা বলতে আছে মৃত্যুর কথা বলতে নেই, কিন্তু আজ আমি সেই নীতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি, এই তেঁটিয়া ভদ্রলোকের অপঘাতে মৃত্যু হবে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সুধন্যবাবু বললেন, আপনি অ্যাস্ট্রোলজার?

ফুটপাথের নই। এই নিয়ে আমি রীতিমতো রিসার্চ করছি। আমার অবিশ্বাসকে আমি বিশ্বাসে নিয়ে আসছি। জীবনের কতভাগ ভাগ্যের দখলে আর কতভাগ পুরুষকারের দখলে, এই রেশিয়োটা আমি বার করতে চাই। রহস্যটা প্রায় ধরে ফেলেছি। মৃত্যু, অসুখ, এইটাই আমার রিসার্চের বিশেষ দিক।

মেসোমশাই চোখদুটো বড়বড় করে বললেন, আপনারা কি বলতে চাইছেন, আমার মেয়ে, আমার কোনও দুর্ভাবনা থাকবে না? এত বড় একটা শহর, মেয়েটা কোথায় গেল আমি জানতে চাইব না! আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই, আমাকে অভিশাপ দিচ্ছেন অপঘাতে মৃত্যু হবে। হয় হবে, সব মানুষকেই একদিন-না-একদিন মরতে হবে। আপনিও মরবেন আমিও মরব। আপনার মেয়ে থাকলে বুঝতেন মেয়ের বাপের কী দুশ্চিন্তা! এতটুকু একটা ছেলে আপনার সামনে আমাকে দুশ্চরিত্র বললে। আপনি শুনলেন, কিছু বললেন না!

ইকোয়াল জাস্টিস। আপনি প্রথমেই তাল ঠুকে বললেন, ফুসলে এনেছে, তারপরে বললেন ফ্লেশ-মার্কেটে বেচে দিয়েছে। কোনও ভদ্রলোক এমন কথা বলে?

তার মানে আমি ছোটলোক?

আপনি মেয়ে চান, না ঝগড়া চান?

হঠাৎ পিতা হরিশঙ্কর আমাকে ভর করলেন। কানের কাছে স্পষ্ট তাঁর কণ্ঠস্বর, ফিনিশ ইট, ফিনিশ ইট। ডোন্ট ওয়েস্ট ইয়োর টাইম, সান। ট্যাকল ইট।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে বললুম, আমাকে ক্ষমা করবেন। মুকুকে আমি খুঁজে বের করে দোব। নিশ্চয় কোনও বন্ধুর বাড়িতে আছে। কাল ক্লাসে গিয়ে ধরব। আপনার ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে যান।

মিষ্টি কথায় কাজ হল। ভদ্রলোক কাঁপা কাঁপা হাতে ঠিকানা লিখলেন। মদ স্নায়ুকে ধরেছে। মদ এইবার মানুষটিকে খেতে শুরু করেছে। কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ঢেলা ঢেলা চোখদুটো জলে ভরে এসেছে। আবেগরুদ্ধ গলায় বললেন, দেখো বাবা, সিনসিয়ারলি একটু দেখো। সকলের ঘৃণা নিয়ে বেঁচে আছি। টাকাপয়সায় কী হয়! কেউ কেউ দু'বার বিয়ে করতে বাধ্য হয়, তাতে চরিত্র কেন খারাপ হবে? মায়ের আসনে আর-একটা মাকে বসাতে পারলে না ওরা, সে দোষ আমার! কীভাবে যে মেন্টাল টর্চার করছে আমাকে! আর তো সহ্য হচ্ছে না। আমার তো আর কোনও ছেলেমেয়ে হয়নি। কে দেখত আমাকে? তোমরা দেখতে! সন্ধের অন্ধকারে পাহাড়ি ভাল্লুকের মতো দু'হাত বাড়িয়ে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। মি লর্ড, আই অ্যাম কাস্টিগেটেড। আই অ্যাম ওলড্, এ হ্যাগার্ড হায়না, হাউলিং ইন দি ডাস্ক অফ মাই লাইফ। নো হোয়ার, নো রেসপাইট। মি

লর্ড আপ ইন ইয়োর ডোম, ইউ আর এ সাইলেন্ট অবজার্ভার। ইউথ ইজ এ ব্লান্ডার। ম্যানহুড এ স্ট্রাগল। ওলড্ এজ এ রিগ্রেট। আর আমি আসতে চাই না ইন ইয়োর কিংডম। মি লর্ড হ্যাং মি বাই দি নেক। আমি শুনেছি তার বাঁশি। বাঁশি বাজে দূর বনে। ভুল, ভুল। লাইফ ইজ অ্যান ইনকিয়োরেবল ডিজিজ। উই অল লেবার অ্যাগেনস্ট আওয়ার ওন কিয়োর, ফর ডেথ ইজ দি কিয়োর অফ অল ডিজিজেস।

নেশা চড়ছে। এজলাসে যেন সওয়াল করছেন এক প্রবীণ আইন ব্যবসায়ী।

আবেগের জগৎ থেকে কঠোর রুদ্র বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে আমার প্রস্তাব, চা খাবেন? পিতা হরিশঙ্করের এই সময়টাই ছিল টি-টাইম। নিজের তৈরি ধবধবে সাদা একটি লুঙ্গি পরে, গায়ে অনুরূপ সাদা গেঞ্জি, পায়ে ভবীচরণ দাসের দোকানের চপ্পল, ফটফট আওয়াজ তুলে এই বারান্দায় পায়চারি করতেন আর মাঝে মাঝে ফিনফিনে পাতলা চায়ের কাপে চুমুক দিতেন। পেছন পেছন ফিরত দার্জিলিং চায়ের বিশিষ্ট গন্ধ। দেখে মনে হত দক্ষিণ ভারতীয় মহাসাধক রমণমহর্ষি পায়চারি করছেন। সৎজীবনের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব মিলিয়ে পঞ্চাশটি মৃত্যুর চিতা জ্বলছে বুকে। বৃহৎ একটা আমগাছের মতো ছিল এই যৌথ পরিবার। ডালে ডালে প্রিয় আম ঝুলছে। দক্ষিণের বাতায়ন খুলে এমন একটা ঝড় এল, সব আম ঝরে পড়ে গেল। একটি ডালে দুটি মাত্র আম। পিতা আর পুত্র। কে যায় কে থাকে! ভবে কে বলে কদর্য শ্মশান। পরম পবিত্র মহাযোগের স্থান। হেথা এলে পরে যায় মায়া সব।

চা খেয়ে ভেঙে-পড়া কপিধ্বজের মতো মেসোমশাই চলে গেলেন শ্যালক সুধন্যর হাত ধরে। কাঠের কারবারি। আসামের বড় টিম্বারমার্চেন্ট। চলে যেতেই কাকাবাবু বসলেন আমাকে নিয়ে। বললেন, কেমন হল? তোমাকে আমি ওই কারণেই সাবধান করি। একেবারে অরক্ষিত। মেয়েদের থেকে শতহস্ত দূরে থাকাই উচিত। এই সেই বয়েস, ফিউম আর পারফিউম দুটোই তোমাকে আকর্ষণ করবে। একটা আদর্শ ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে বয়েসটা পার করে দাও। সামনে হ্যাপি-ভ্যালি। হরিদার জীবন থেকে কি কোনও শিক্ষাই নিতে পারলে না? কামজয়ী মহামানব। যে-বয়সে তোমার মা মারা গেলেন, সেই বয়েসটা একবার ভাবো! আর দেখলে তো দ্বিতীয় পক্ষের অবস্থা! আর কোনও কথা নয়, এইবার কিছুদিনের জন্যে পালাও। অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি এই সময়টা তোমার মোটেই ভাল নয়। ছ'টা বছর কোনওরকমে পার করে দাও। এইটাই হল যৌবনের টিথিং টাইম।

মুকুর কী হবে?

তুমি কি মুকুকে বিয়ে করে ফেলেছ?

তার মানে?

মানে, রেজিস্ট্রি।

আজ্ঞে না। মুকু আমার মতো মেয়েছেলেকে বিয়ে করবে না। মুকু হল শক্তি, মুকু ভৈরবী। মুকুকে খুঁজে দেবার দায়িত্ব আমি নিয়েছি।

আর হরিদাকে খোঁজার দায়িত্ব কার ওপর দিয়েছ?

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। সত্যিই তো। কী করেছি তাঁর জন্যে! শুধুই জল্পনা।

কাকাবাবু বললেন, জেনে রাখো, ঠিক তিন দিনের মাথায় আবার একটা ঘোরতর সমস্যা আসছে।

The man that runs away
Lives to die another day

সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা পোস্টকার্ড উলটে পড়ে ছিল। পিয়ন কখন দরজার ফাঁক দিয়ে খুস করে ঠেলে দিয়ে গেছে, কেউ খেয়াল করেনি। আমাদের নীচেটা অন্ধকার-অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে। সদর থেকে পেছন পর্যন্ত টানা একটা রক। সার সার তালা-বন্ধ ঘর। ডাচ আমলের কুঠিবাড়ি এইরকমই ছিল। ঘরগুলোয় সেই দূর অতীতে মুহুরিরা বসতেন। একটা ঘরের জানলার গরাদ থেকে লম্বা একটা চেন ঝুলছে। অতীতের স্মৃতি। এই পরিবারের পূর্বপুরুষদের দুটি মজার শখ ছিল। এক, কুকুর পোষা, দুই, মানুষ পোষা। শেষ কুকুরটি ছিল বিশাল এক হাউন্ড। ধবধবে সাদা। নাম ছিল জিম। এই চেনটা দিয়ে জিমকে বাঁধা হত। চেনটাকে রোজ আমি পরিষ্কার করি আর একটি কুকুরের অস্তিত্ব অনুভব করি। আমার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর কুকুরটি ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে। মানুষ পারবে?

চেনটার পাশে বসে পড়লুম। পেছনে জানলা। সাবেক কালের চল্লিশ ইঞ্চি পুরু দেয়াল। ভেতরে ক'টা আনারকলি আছে কে জানে! পোস্টকার্ডে চোখ রাখলুম ভয়ে ভয়ে। কার চিঠি? পরিষ্কার হাতের লেখা। চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। আবার এক খেলা! দোতলায় এসে কাকাবাবুর সামনে চিঠিটা ফেলে দিলুম, এই নিন, পড়ুন। আর এক বিপদ আসছে। যা বলেছিলেন, সব অক্ষরে অক্ষরে মিলছে।

কাকাবাবু পড়ে বললেন, এইবার কী করবে?

দোতলার বারান্দার মেঝেতে বসে পড়লুম। বেলা ঝুলে পড়েছে। আকাশের নীল শীতল হয়েছে। ছোটপিসিমার চিঠি। পিসেমশাই বেশ কিছুদিন গত হয়েছেন। তিনটি ছেলেমেয়ে। জেলা-শহরে জীবন প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। পুঁজি নিঃশেষ। মাঝে মাঝে অনাহার চলছে। হয় মৃত্যু, না হয় এইখানে আশ্রয়। ছেলেমেয়েরা নাবালক। আত্মীয়স্বজনদের অত্যাচার ও ভীতিপ্রদর্শন। কেটে ফেলব, মেরে ফেলব। কারণ সামান্য কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তার ভাগ শ্বশুরবাড়ির মহামানবরা দিতে প্রস্তুত নয়। আমার চিন্তা দেখে কাকাবাবু বললেন, হরিদা থাকলে হাসিমুখে বুক ফুলিয়ে বলতেন, চলে এসো। আমার এক মুঠো জুটলে তোমাদেরও জুটবে। হরিদা তো গৃহী সন্ন্যাসী, অবধূত। সাগরের মতো মন। সেই পিতার পুত্র তুমি। বিশাল এক পরিবার প্রতিপালনের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে? ভেবে দেখো। তোমার যা রোজগার তা ভাগ করে নিতে হবে। দারিদ্র্য আসবে। অশান্তি আসবে। আয়েশ ঘুচে যাবে। রোজগার বাড়াতে হবে। তিনটি ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রাইভেট টিউশনি করে আয় বাড়াবার ফিকির করতে হবে। এই আদুরে সুখী জীবন আর থাকবে না তোমার। তোমাকে হরিদার মতো ফাইটার হতে হবে। পারবে তুমি? আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। তোমার মেটাল আমি চিনি। তুমি কল্পলোকবিহারী। তোমার চরিত্রে আছে বিরোধ। ত্যাগের কথা ভাবো, কাজে তুমি ভোগী। দ্বিতীয় পথই তোমার পথ। পত্রপাঠ জানাও, আসবেন

না। এ বাড়িতে কেউ থাকছে না। তালা ঝোলাও, সরে পড়ো। অথবা লেখো, যেখানে আছেন সেইখানেই থাকুন, আমি মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাব।

টাকা কী করে পাঠাব কাকাবাবু? আমি তো আশ্রমে যেতে চাই!

তা হলে তো হয়েই গেল। সেইটাই লিখে দাও। কে বাঁচল, কে মরল তোমার দেখার দরকার নেই। সংসার হল মায়া। তাই তো? সন্ন্যাস মানেই তো বেদান্ত। ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বাইভবিতা বা ন ভূয়ঃ। আত্মা। জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। চুকে গেল লেঠা। লোকে বলবে, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, পলায়নী মনোবৃত্তি। ওসবে তুমি কান দিয়ো না। দিনকতক অ্যাডভেঞ্চার করে এসো। তারপর গেরুয়া ফেলে গৃহী। কী বলো? ভাবো। ভেবে দেখো।

এটা কোনও পরামর্শ হল? এ তো ব্যঙ্গ! প্রতিটি কথা যেন দু'মুখো ছুরি! এদিকেও কাটে, ওদিকেও কাটে। ভদ্রলোকটিকে বোঝা দায়। ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটান। এই বন্ধু, তো পরমুহূর্তেই শত্রু। কাগজপত্র গুছিয়ে কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীরমুখে বললেন, আমাকে এইবার যেতে হচ্ছে। আমার নিজস্ব কিছু কাজ আছে। সামান্য ক'টা টাকার পেনশনে তো দিন চলবে না। যত দিন বাঁচব তত দিন আমাকে খাটতে হবে। কে খাওয়াবে! কেউ তো নেই আমার!

কেন, আমি?

কাকাবাবু নাটকীয় ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে, দেখো পিন্টু, যে-কথা বিশ্বাস করো না, সেকথা বোলো না। কোনটা কথা আর কোনটা কথার কথা বুঝতে শেখো। এ যুগে আপনই পর হয়ে যাচ্ছে, পর হবে আপন? ডোন্ট বি সিলি।

গোলার আঘাতে দুর্গ ভেঙে পড়ার মতো আমিও ভেঙে পড়লুম। কথার কথাই বলেছি। ফাঁকা কথা। ধরা পড়ে গেছি। ঠোঁট-কাটা মানুষ। অভিনয় করতে জানেন না বলেই এমন তীব্র ধাক্কা মারতে পারলেন। অন্য কেউ হলে গলে গিয়ে বলতেন, ওরে আমার সোনা রে!

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, আমাকে ফেলে চলে যাবেন?

সেইটাই পৃথিবীর নিয়ম। কেউ চিরকালের নয়। নিজের হাল নিজে ধরো। কারও ওপর নির্ভর কোরো না। আর তোমাকেও তো যেতে হবে। সন্ন্যাসী হবে বললে না?

আবার বাঁকা কথা। একটু খোঁচা। কথা না বাড়িয়ে আবার নতুন কোনও খোঁচার ভয়ে আমিও উঠে পড়লুম। এরই নাম বোধহয় সংসারের শকথেরাপি।

কাকাবাবু যাবার আগে ইট ছোড়ার মতো বলে গেলেন, বি এ ম্যান।

আমার বলতে ইচ্ছে করল, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর অ্যাডভাইস।

দরজা বন্ধ করে অন্ধকার সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলুম। একেবারে চিন্তাশূন্য ফ্যালফ্যালে অবস্থা। মনে হচ্ছে, পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। সৃষ্টি লোপাট। একা আমি দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর কিনারায়। শেষ জীবিত ব্যক্তি। মনে হচ্ছে, এই বাড়ির অসংখ্য ঘরের প্রতিটিতে একটা করে মমি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের কোণের ঘরে যেন তবলা বাজছে। প্রফুল্ল কাকাবাবু মৃত্যুর পর থেকে ফিরে এসে হাত সাধছেন। কাকিমা গা ধুয়ে কুয়োতলা থেকে আসছেন ভিজে শাড়ি পরে। মাতামহ দীর্ঘ শরীর নিয়ে তানপুরা হাতে দোতলা থেকে

নেমে আসছেন। সম্রাটের মতো ভঙ্গিতে। বারান্দায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে কনক। শূন্য বাড়িতে জীবিত-মৃত সবাই ফিরে আসছে একে একে। মহা কোলাহল কলরোল। যেন এক উৎসব হচ্ছে। নিমন্ত্রিতরা আসছেন একে একে। দমাস করে একটা আওয়াজ হল কোথায়। চমকে উঠলুম। বোধহয় ছিটকিনি দেওয়া ছিল না। জানলার পাল্লা পড়ল। ফাঁকা বাড়িতে শব্দটা বড় ভয়ংকর।

বিশাল বড় একটা সিন্দুক খুলে যদি দেখা যায় ভেতরটা একদম ফাঁকা তা হলে মনের যে অবস্থা হয়, আমার মনের অবস্থাও ঠিক সেইরকম। শূন্যতাও হাসে। শূন্যতারও দাঁত আছে। ভাষাহীন ভাষা আছে, অবয়ব আছে। ফাঁপা একটা চেহারা। বিশাল এক ইঁদারার মতো। অতল।

লেজ-তোলা একটা বেড়ালের মতো এঘর ওঘর সেঘর ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম খানিক। সব ছেড়ে যেতে হবে আমাকে! বেঁচে থাকার একটা পর্ব এইখানে এইভাবেই শেষ হয়ে যাবে! অসমাপ্ত উপন্যাসের মতো। মানুষের মৃত্যু না হলেও আয়োজনের মৃত্যু।

অন্ধকার হল, কিন্তু আলো জ্বালাতে ইচ্ছে করল না। পিতা হরিশঙ্করের খাটে বসে আছি। বালিশের পাশে পাটকরা একটা সাদা রুমাল। নিয়ে যাননি। পড়ে আছে। বসে বসে দেখছি, সব বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। হরিশঙ্কর ইমনে একটি সুন্দর গান গাইতেন, নিশি এল দেখে চোখেরি পলকে শূন্য কে সাজাল দীপমালায়/ঘরে ঘরে আলো দেখে লাগে ভাল, আমার হৃদিগেহ অন্ধকারে কালো। তখন ছিল গান, এই মুহূর্তে আমার উপলব্ধি। চারপাশে কেমন সব সুখের সংসার, আমি বসে আছি শ্মশানে। হঠাৎ মনে হল, দিদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন। মনে হওয়ামাত্রই, শরীরে একটা কাঁপুনি খেলে গেল। অদ্ভুত একটা ভয়। এক মুহূর্ত আর এবাড়িতে থাকা যায় না। ভয়ংকর। কিন্তু, যাই কোথায়? কাকে গিয়ে বলি, আজকের রাতটা আমাকে থাকতে দেবেন আপনারা দয়া করে? প্রথমেই মনে পড়ল টিপের কথা। পরমুহূর্তেই এমন ছোটলোক মন, ভাবতে বসল মেনিদার মেয়ে অচলার কথা। অচলাকে আমি দেখেছি। না দেখে কোনও উপায় নেই, এমনই তার আকর্ষণ!

অশরীরী আত্মার ভয়ে আলো জ্বাললুম। অন্ধকার ঘরে আলোটা লাফিয়ে পড়ার মুহূর্তে মনে হল খাটে কেউ বসে ছিলেন। আলো পড়ামাত্রই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভয় যে কত শীতল সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলুম। মাইনাস দশ-কুড়ি ডিগ্রিও হতে পারে। শরীরে একটা কাপুনি ধরে গেল। ওজন মনে হচ্ছে আড়াই মন।

নীল একটা আলো ঝলসে উঠল। কী ব্যাপার? পৃথিবীটা কি বিজ্ঞানের বাইরে চলে গেল! মেঘ ডাকার শব্দে বিজ্ঞান ফিরে এল। বিদ্যুৎ চমকেছে। খেয়াল করিনি, পশ্চিমের আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। ঠান্ডা বাতাস বইছে। মনে হয় ঝড় আসছে। আবার একবার মেঘ ডাকল। দমকা হাওয়ায় টেবিলের ওপর থেকে ফড়ফড় করে কিছু কাগজ উড়ে গেল। আর কোনও উপায় নেই। রাতটা এই কফিনেই আটকে গেলুম।

যাই হোক, তবু একটা কিছু এসেছে। ঝড় এসেছে বৃষ্টি নিয়ে। তাড়াতাড়ি জানলা বন্ধ করলুম। সগর্জনে বৃষ্টি এসে গেল কেটল ড্রাম বাজিয়ে। হিটলারের প্যানজার বাহিনী মার্চ করছে। ঈশ্বরের কী খেলা! এমন এক ব্যবস্থা করেছেন, যদি কারও আসার ইচ্ছাও থাকত সে আর আসতে পারবে না, যেমন টিপ, বউদি, কি অন্য কেউ। খেলা জমে গেল। এরই নাম বেঁধে মারা। যেমন বৃষ্টি, তেমনি বাতাস। জানলা দরজা কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঘনঘন বজ্রপাত। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছে কেঁদে কেঁদে। যতটা চেষ্টা করছি মনটাকে

ঘোরাতে, মন ততই চলে যাচ্ছে ঝুলন্ত একটা মৃতদেহের দিকে। দুলছে। ঘুরছে। বিদ্যুতের আলোয় নীল হয়ে উঠছে।

খাটের তলায় কিছু একটা পাশ ফিরছে। চোরটোর ঢুকে বসে আছে নাকি? শব্দ করে কী একটা গড়িয়ে গেল। আজ রাতে সব জড়বস্তুই কি প্রাণ পাবে? নৃত্য করতে থাকবে আমাকে ঘিরে? জড়জগতে একটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে। ভয়ে ভয়ে নিচু হয়ে দেখলুম, কী থাকতে পারে খাটের তলায়! সাদা কাপড়ের একটা ব্যাগ। তলা দিয়ে বাতাস এসে ব্যাগটাকে কাত করে দিয়েছে। খালি একটা কৌটো গড়িয়ে গেছে।

দিদির ব্যাগ। মনে পড়ল সঙ্গে একটা ব্যাগও এনেছিলেন। ব্যাগটাকে টেনে বের করে আনলুম। বাইরে থেকে স্পর্শ করে মনে হচ্ছে দু'-একটা বই আছে। একটা চশমার খাপ। ছোট ছোট কয়েকটা পুঁটলি। একটাতে কিছু পয়সা আছে বলে মনে হচ্ছে। টিনের কৌটোটা অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারলুম না। ভেতরে একটা কিছু আছে। ঠকাস ঠকাস করে নড়ছে। ব্যাগটির সমস্ত জিনিস উলটে দেখতে ইচ্ছে করছে। সংকোচও হচ্ছে। জানলা দিয়ে জল ঢুকে মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। এই বাড়ির এইটাই দোষ। জল আটকানো যায় না। পিতা হরিশঙ্করের বিজ্ঞানও হার মেনেছে।

হঠাৎ মনে হল সদরের কড়াটা কেউ নাড়ছে। তুমুল বাদলেও শব্দটা কানে আসছে। নীচেটা এই মুহূর্তে আমার কাছে ভীতিপ্রদ কবরখানা। অশরীরীদের মিলনভূমি। মনের জোর করে নামতে হল। বীর হরিশঙ্করের ছেলে আমি। বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। ছাতার ওপর অঝোরে জলপড়ার শব্দ। দরজাটা খোলামাত্রই ছাতাটাতা সমেত মেনিদা ঢুকে পড়লেন। বাইরে নীল ইস্পাতের মতো রাস্তায় বৃষ্টি নাচছে। গাছের পাতা পড়ে আছে। পোস্টের আলোয় জলে খেলছে রুপোলি ফুলঝুরি। ছাতার জলে বৃষ্টির ঝাপটায় বেশ খানিকটা ভিজে গেলুম।

মেনিদা বললেন, ধরো ধরো। দুটো হাতই জোড়া। ছাতা বন্ধ করতে পারছি না।

বাঁ হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার। আমার হাতে দিয়ে ছাতা বন্ধ করে ধেইধেই করে খানিক নেচে নিলেন।

কী করছেন?

সিঙ্গিং ইন দি রেন তো পারব না, তাই ড্যানসিং। সিনেমাটা দেখেছ? বাইরের রাস্তাটা নাচার মতোই।

এই বৃষ্টিতে বেরোলেন কেন?

বাঃ বেরোব না! দেখলুম ঘটোৎকচ কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। জিজ্ঞেস করলুম, কী মশাই, চললেন? তা কোনও উত্তরই দিলেন না। গরম কচুরি হল। শুকনো আলুর দম। তোমার জন্যে নিয়ে এলুম। আর জানি তো, তুমি একলা আছ। পিন্টু, পিতা শব্দটা বড় বিশাল। সকলের ভেতরেই আছে। আমরা খাব, তুমি উপোস করে থাকবে? আমার মনে হয় এইতেই তোমার আজকের রাতটা চলে যাবে। চলো চলো, ওপরে চলো।

মেনিদা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, এই বাড়ি এত ফাঁকা ভাবাই যায় না। অতীতে কী সব দেখেছি আমরা! সংস্কৃতির পীঠস্থান। গানবাজনা, লেখাপড়া। একটা মানুষ যে একশোটা মানুষ হতে পারে, তোমার বাবাই ছিলেন তার প্রমাণ। কী হয়ে গেল। কী করে গেলেন! কত স্মৃতি ভেসে আসছে মনে!

মেনিদা একটা চেয়ারে বিমর্ষ হয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার শুরু করলেন, সব বিষয়ে এমন দখল আমি আর কারও দেখিনি। অমন স্মৃতিশক্তি! অমন মেধা! একজন অতিমানব। আমরা চিনতে পারিনি। কথায় আছে, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না! নিজেরও কোনও প্রচার ছিল না। তোমার সন্ধ্যাহ্নিক হয়ে গেছে তো!

ওসব তো আমি করি না।

সে কী! ব্রাহ্মণের ছেলে। ত্রিসন্ধ্যা তো কর্তব্য! তিনবার না পারো, দু'বার তো করতেই হবে। অবশ্যই করবে। দেখবে মনের জোর বাড়ছে। ভয় কেটে যাচ্ছে। এটা ধর্ম নয়, ডিসিপ্লিন। সবসময় একটা কিছু জপ করবে মনে মনে। যেন মুখে একটা সুপুরি রেখেছ। একেই বলে অজপা। দেখবে অদ্ভুত একটা শক্তি পাবে। আমাদের অনেক কিছু সম্পদ আছে পিন্টু। চর্চার অভাবে মরচে ধরে যাচ্ছে। একালের ছেলেদের কেউ বলেও না। যাও, তুমি হাত ধুয়ে খানকয়েক গরম গরম খেয়ে নাও। ঠান্ডা হয়ে গেলে আর ভাল লাগবে না। আমার সামনে খেতে লজ্জা করবে তোমার। পাশের ঘরে চলে যাও।

মেনিদাকে যতই দেখছি, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। ভুল করেছিলুম, না মানুষটি রাতারাতি বদলে গেলেন? মেনিদা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। যেন বুঝতে পেরেছেন আমার মনের কথা। মেনিদা বললেন, টেক ইট ইজি, টেক ইট ইজি। সবসময় দুঃখু দুঃখু ভাব করে থেকো না। কৃত্রিম মনে হতে পারে। আমাকে হারমোনিয়মটা বের করে দাও, ততক্ষণ হরিশঙ্করকে গান শোনাই।

হারমোনিয়মটা বের করে দিলুম। মেনিদার গলা কী সুন্দর! মিছরির মতো। তিনি গান ধরলেন, ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়/চাহে ধন জন আয়ু আরোগ্য বিজয়/করুণার সিন্ধুকূলে/বসিয়া মনের ভুলে/এক বিন্দু বারি তুলে মুখে নাহি লয়। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে প্রশ্ন করছেন, ঠিক হচ্ছে তো, হরিশঙ্কর!

পাশের ঘরে চোরের মতো একপাশে বসে কচুরি খাচ্ছি, আর মনে মনে হাসছি। ঠিক হয়েছে ব্যাটা! কেউ কোথাও নেই, একেবারে একা। Alone, alone, all all alone/Alone on a wide, wide sea/And never a Soul took pity on/My Soul in agony. বেশ হয়েছে। কাঙালি ভোজনের বাঙালির মতো একপাশে বসে খাচ্ছি। তফাত এই, খাদ্যটা খিচুড়ি নয়, ঘিয়ে ভাজা হিংয়ের কচুরি। মেনিদা গাইছেন, তীরে করি ছুটাছুটি/ধূলি বাঁধে মুঠিমুঠি/পিয়াসে আকুল হিয়া আরো ক্লিষ্ট হয়/ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়।

অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি। লাল মেঝের ওপর বসে হনুমানের মতো একের পর এক কচুরি খেয়ে চলেছি। কচুরি আলুরদম দুটোই সাংঘাতিক সুস্বাদু হয়েছে। এও মনে হয় ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত। হিমালয়ে আশ্রমে চটিতে এইভাবেই তো আমাকে পঙ্গতে বসে খেতে হবে। আর তো কয়েক ঘণ্টা, তার পরেই তো আমি ট্রেনে। হিমালয়মুখো।

হারমোনিয়ম বন্ধ করে মেনিদা বললেন, তুমি কী ভাবছ আমি জানি। তোমাকে জামাই করার জন্যে আমি কচুরির টোপ ফেলছি। না, তা নয়। আজই জানতে পারলুম, অচলার বিয়ে হয়ে গেছে। একালের মেয়েরা নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়। তা হলে কচুরিটা টোপের কচুরি নয়। মুখে তুলতে গিয়ে তোমার মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। করুণ অসহায় একটা মুখ। ছেলেটা কী খাবে! তারপরেই মনে হল, গলায় দড়ি। সারাটা রাত ভয়ে মরবে। বউকে বললুম, ভরো টিফিন কৌটো। ছেলেকে বললুম, ছাতাটা খুঁজে দে। চলে

এলুম। রাতটা তোমার সঙ্গে কাটিয়ে ভোরে চলে যাব। কাল সারারাত তুমি জেগেছ। আজ তোমার ঘুম দরকার, সলিড ঘুম। বেশ বাদলার রাত আছে। আজ তুমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো।

মেনিদার চোখেমুখে অদ্ভুত একটা স্নেহের ভাব। এমন স্নেহ বহুকাল আমি পাইনি। কীভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না। প্রশ্নটা আর চেপে রাখতে পারলুম না, কোনটা আপনার আসল রূপ?

মেনিদা হাহা করে হেসে বললেন, শোনো, আমার থিয়োরির সঙ্গে তোমারটা মিলবে না। বাইরেটাকে এমন করে রাখবে, যেন তোমাকে কেউ চিনতে না পারে। মহাপুরুষের ভেক ধরলে তাঁদের অপমান করা হয়। অভিনয় করা হয়। বাইরেটা ভাল ভেতরটা নোংরা, সে বড় সাংঘাতিক জীব। ভয়ংকর বিপজ্জনক। উলটে নাও। বাইরেটা ভয়ংকর, কিন্তু ভেতরটা সুন্দর। বিহারি নদী দেখেছ? বাইরে বালি, একটু খোঁড়ো, স্বচ্ছ টলটলে শীতল জল। তোমার বাবার কথাই ভাবো না! বাইরেটা রুক্ষ, কঠোর, তীব্র, ঝাঁঝালো, কর্কশ, ঘোরতর নাস্তিক। ভেতরে স্নেহের ফল্গুধারা। মেনি বাইরে খারাপ। সবাই ঘৃণা করে। কেউ কাছে ঘেঁষে না। আরে সেইটাই তো আমি চাই। তলে তলে এগিয়ে যাও। সাধু মরণে সাবধান! গল্পটা জানো?

বলুন না শুনি।

বারাণসীতে এক সাধু ছিলেন। ভক্তদের মাঝখানে বসে আছেন। এক পাগলি কোথা থেকে এসে হাত পা নেড়ে রোজই এক কথা বলে যায়, ওরে সাধু মরণে হুঁশিয়ার! সাধুর অহংকারে লাগে। তেড়ে ওঠেন, বেরো বেরো। পাগলি হাসতে হাসতে পালায়। কিন্তু রোজই আসে, আর রোজই সেই এক কথা বলে যায়। অবশেষে সাধুর মরণকাল এসে গেল। নিজের আটচালায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। প্রাণ যায় যায়। এমন সময় সাধুর নজর হঠাৎ চলে গেল চালের বাতার দিকে। সেখানে গোঁজা রয়েছে একজোড়া নতুন পাদুকা। কোনও ভক্ত দিয়ে গিয়েছিল। সেটি আর ব্যবহার করা হয়নি। সেই আফসোস নিয়েই সাধুর মৃত্যু হল। তারপর! আবার সেই বারাণসী, কিন্তু এর মাঝে বহু বছর পার হয়ে গেছে। দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এক মুচি বসে বসে ঠুকঠুক করে জুতোয় পেরেক ঠুকছে। হঠাৎ এক সাধিকা সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুচিকে বললেন, কী সাধু, মনে পড়ে, বলেছিলুম মরণে হুঁশিয়ার! মনে পড়ে সেই কথা? মুচি চোখ তুলে তাকালেন। চোখে জল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা। জুতোর আফসোস নিয়ে মরেছিলেন। এই জন্মে তাই কত জুতো! জুতোর দুনিয়াতেই জীবন কাটছে। সেই কারণেই খুব সাবধান পিন্টু। গল্প গল্পই। তবে নীতিটা হল বাইরের ভেক কিছুই নয়, আসল হল ভেতর, যেটাকে কেউ দেখতে পায় না। ভেতরটাকে বেশ ভাল করে সাজাও। আরে তুমি কোন বাপের সন্তান! লড়ে যাও। হও কর্মেতে বীর, হও ধর্মেতে ধীর, হও উন্নত শির। দেখো, আমি তোমাকে এইসব বলছি, বাইরে যেন প্রচার না হয়ে যায়। আমার ইমেজ ভেঙে যাবে। ঘৃণা মানুষকে একঘরে করে অচ্ছুত করে। নির্জনতা এনে দেয়। সংসার তাকে খারিজ করে। কী মজা! আচ্ছা, আমি একবার বাথরুমে যাই। হাত মুখ ধুয়ে, ইষ্ট নাম স্মরণ করে এবার ধুপুস করা যাক।

দক্ষিণের একটা জানলা অল্প একটু ফাঁক করলুম। বৃষ্টির দাপট কমে গেছে। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবির মতো বাতাস বইছে। অনেকটা নীচে রাংতার মতো ভিজে রাস্তা। আকাশ ঘোলাটে সাদা। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ এসে গেলেন। ইলেকট্রিক তার থেকে জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। সেইদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল, নবাঙ্কুর ইক্ষুবনে এখনও ঝরিছে বৃষ্টিধারা/বিশ্রামবিহীন/মেঘের অন্তরপথে অন্ধকার হতে অন্ধকারে/চলে গেল দিন/শান্ত

ঝড়ে, ঝিল্লিরবে, ধরণীর স্নিগ্ধ গন্ধোচ্ছ্বাসে/মুক্ত বাতায়নে/বৎসরের শেষ গান সাঙ্গ করি দিনু অঞ্জলিয়া/ নিশীথগগনে।

বৈষ্ণবরা যেভাবে বস্ত্র পরেন ধুতিটাকে সেইভাবে পরে মেনিদা ঘরে এলেন। গুনগুন করে কী একটা গাইছেন! আমি রাস্তার দিকেই তাকিয়ে আছি। হঠাৎ গাড়ির হেডলাইটের তীব্র একটা আলোয় রাস্তা ঝলসে উঠল। খুব মিহি বৃষ্টি এখনও পড়ছে। কালো একটা গাড়ি ঘাস করে থেমে পড়ল বাড়ির সামনে।

আর আমি! এই রে পিসিমারা এসে পড়েছেন, বলে নিচু হয়ে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে চাইছি। মেনিদা বলছেন, এ আবার কী? ছেলের এ কী ছিরি!

Like a sword that cuts but cannot cut itself,
Like an eye that sees but cannot see itself.

দুধের মতো সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি। হাঁসের পালকের মতো সাদা ধুতি। ব্যাকব্রাশ করা লম্বা লম্বা চুল। চাঁপাফুলের মতো গায়ের রং। কুচকুচে কালো মোটরগাড়ি। মাতুল নেমে এলেন। মাতুল জয়নারায়ণ। হালকা আতরের গন্ধ। নেমেই বললেন, অবাক হবার কিছু নেই রে ব্যাটা। ট্রেন দুঘণ্টা লেট। ঝড়বৃষ্টিতে তিন ঘণ্টা ডিটেন্ড। অ্যান্ড দি ক্লক স্ট্রাইকস টুয়েলভ। চাটুজ্যেমশাইয়ের এইটাই তো টি-টাইম।

পাঞ্জাবি চালক হাসতে হাসতে গাড়ির পেছন দিকের ডালাটা খুলছেন। তাঁর খুশির ভাব দেখে মনে হচ্ছে সারাটা পথ মামা মজার মজার কথা বলতে বলতে এসেছেন। মামার সঙ্গে একটানা এক মাস বসে থাকলেও কারও বিরক্তি লাগবে না। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাবে বোঝাই যাবে না। মজলিশি মানুষ। কত সত্য ঘটনা যে সঞ্চয়ে আছে। তেমনি রসবোধ।

গাড়ির পেছন থেকে একটা ঝুড়ি নেমে এল। তাইতে দশ-বারোটা ছোট ছোট ফুলগাছের টব। মাতুল বললেন, কী দেখছ! চাটুজ্যেমশাই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাবেন। রাঁচির সেরা নার্সারির সবচেয়ে সেরা গোলাপ। ফুল দিয়ে পৃথিবী সাজাব বন্ধু। দুঃখ ম্লান হয়ে যাবে। প্রিয়জন ছেড়ে গেছে যাক। গোলাপ এসেছে ফিরে।

ছোট একটা সুটকেস নেমে এল। ভাড়া বকশিশ বুঝে নিলেন চালক। বললেন, এমন ইনসান খুব কমই দেখেছি। সদরে ঢুকে সুরেলা পঞ্চমে মামা হাঁকলেন, চাটুজ্যেমশাই!

আমি তখন বললুম, মামা, তিনি নেই।

জয়নারায়ণও সেই সংবাদে থমকে গেলেন। প্রশ্ন করলেন, নেই মানে? ইয়ারকি করছিস আমার সঙ্গে! নেই মানে? কোথায় গেছেন?

জানি না। চলে গেছেন কোথায়, কারওকে কিছু না বলে।

বলিস কী? তা আমাকে একটা চিঠিতে জানাতে কী হয়েছিল?

আপনার ঠিকানা?

আমার ঠিকানা তোর কাছে নেই?

আপনি দিয়ে যাননি।

সে কী রে? এমনও হয়!

গুম মেরে রইলেন কিছুক্ষণ। আপনমনেই বললেন, জানতুম। এইরকম একটা কিছু হবে। সংসারের ছোট্ট আঁধারে অত বড় একটা মানুষকে ধরে রাখা শক্ত।

মামা পা টিপে টিপে, অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগলেন।

আমি বললুম, ফুলের ঝাঁকাটা?

মামা বললেন, ফুল এনে ফুল বনে গেলুম। ফুলের মর্ম এবাড়িতে আর কে বুঝবে? ভাগ্যিস কুকুরবাচ্চাটা আনিনি! বাড়ি তো শ্মশান।

মেনিদা দাড়িয়ে আছেন সিঁড়ির মাথায়। সেই একই বৈষ্ণবের পোশাকে। দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, এসো, জয় এসো। তুমি ঠিক সময় এসে গেছ।

মামা প্রথমে চিনতে পারেননি। পরে চিনতে পেরেই বললেন, আরে, মাস্টারমশাই আপনি? আপনি এখানে?

অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে বাবা। ছেলেটা যাতে ভয় পায় তাই রাত-পাহারা দিতে এসেছি।

চাটুজ্যেমশাই তো নিরুদ্দেশ? এ ছাড়া আর কী হয়েছে?

পরে শুনো। আগে জামাকাপড় ছাড়ো। খাওয়াদাওয়া করো।

আমাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে মেনিদা কানে কানে বললেন, কী খাওয়াবে?

এখনও কচুরি আলুরদম আছে।

কচুরিটচুরি খাবে তো? শিল্পী মানুষ। এখুনি বলবে, গলা খারাপ হয়ে যাবে।

সে তো তিনটে জিনিসে হয়। চাটনি, দই আর আইসক্রিম।

তবু তুমি জিজ্ঞেস করো। সেরকম হলে আমরা স্টোভ ধরিয়ে কিছু করে দেব।

মামা ততক্ষণে অন্য সমস্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ধুতির কাছার দিকে একটু কাদা ছিটকে লেগেছে। আমাকে বললেন, খাওয়াদাওয়া নিয়ে অত ভাবছিস কেন? চা আছে তো। আগে আমাকে একটা কাপড় কাচা সাবান দে।

এত রাতে কাপড় কাচতে বসবেন? কাল সকালে হবেখন। তা না হলে আমাকে দিন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

শোন, কাপড়ে কাদার দাগ, চরিত্রের কলঙ্ক প্রায় পার্মানেন্ট। সহজে তোলা যায় না। আলাদা কায়দা। ধীরে ধীরে, ঘষে ঘষে, যেন ছড়িয়ে না যায়!

আমি জানি মামা। কায়দাটা আমার জানা আছে।

জানলেও আমি তোমাকে করতে দেব না। আমার অস্বস্তির কারণ হবে।

কচুরি আর আলুরদম আছে। রাতটা চলে যাবে?

খুব যাবে। তুই কি আমার জন্যে এখন রান্না করতে বসবি? শোন, আমাকে মনে হচ্ছে সারারাত জাগতে হবে। কাল ভোরেই আমার রেডিয়ো প্রোগ্রাম। বিলাসখানি টোড়িটা এক রাউন্ড ভেঁজে নিতে হবে তো!

নেবেন। অসুবিধে কী আছে? হারমোনিয়ম বার করাই আছে!

তা হলে লেগে যাই কর্মযজ্ঞে!

বহুকাল পরে সময় লজ্জা পেয়ে গেল। ভেবেছিল বেহুঁশ ঘুমে সবাই অচেতন হয়ে পড়বে। নিঃশব্দে একটি দিনের আয়ু হরণ করে চলে যাবে। তা আর হল না। সব আলো জ্বলে উঠল। অসম্ভব এক কর্মব্যস্ততা। যেন সবে দিন শেষ হয়ে সন্ধে নেমেছে। পিতা হরিশঙ্কর যখন ছিলেন তখন এইরকম সব উদ্ভট কাণ্ড প্রায়ই হত। সময়ের দাসত্ব মেনে নিতে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। না সময়ের, না মানুষের, না অভ্যাসের, কোনও কিছুর তিনি দাস ছিলেন না। তিনিই ছিলেন প্রকৃত প্রভু। রাজার রাজা রাত বারোটার সময় চা-টা খেয়ে যখন বইপত্তর খুলে বসতেন, তখন মনে হত এই সবে শাঁখ বাজিয়ে সন্ধে হল। ছুটির দিন বেলা পাঁচটার সময় গঙ্গার স্নান করে উঠছেন। বৈকালিক ভ্রমণকারীরা ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করছেন, আর ইউ লেট অর টু আরলি ফর টোমরো?

একটা মোড়ার ওপর জয়নারায়ণ বসেছেন, কোলের ওপর তোয়ালে, তার ওপর কাপড়ের সেই অংশটা যেখানে লেগে আছে কাদার ছিটে। রুমালে সাবান মাখিয়ে সন্তর্পণে ঘষছেন আর বলছেন, এ ভেরি ডেলিকেট অপারেশন। ছড়িয়ে ছেতরে না যায়!

মেনিদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, জয় কী খাবে! এত রাতে ঘিয়ে ভাজা খেলে অম্বল হবে, কাল সকালে আর গাইতে পারবে না। এই মানুষটি সম্পর্কে এখন দেখছি আমার কিছুই জানা হয়নি। এঁর অবশ্যই একটা গৌরবের অতীত আছে। যে-অতীতের আমি সাক্ষী নই। গৌরবের অতীতটাকে কী কায়দায় ভদ্রলোক ঘৃণার বর্তমান করে তুললেন, জানতে ইচ্ছে করে। মানুষ কীভাবে পড়ে যায়! কে তাকে পেড়ে ফেলে? মামার মতো একজন সেরা ছাত্রের শিক্ষক ছিলেন। এখন ভোরবেলা ফুলুরি ভিক্ষে করেন! এর-তার ব্যাপারে নাক গলান। অসভ্য অসভ্য কথা বলেন। গৌরব কোথাও একটা মস্ত বড় খোঁচা মেরেছে।

মামা তন্ময় হয়ে কাদার দাগ তুলছেন আর জয়জয়ন্তী ভাঁজছেন—এই সো না বোলো লাগরি রাধা। গলায় যেন মিছরির চাক। বাদ্যবাজনা ছাড়াই যে কী কাণ্ড করছেন! চেহারা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। মুখে জ্বলজ্বল করছে একটা জ্যোতি। যে-ঝড় বইছিল জীবনের ওপর দিয়ে, সে-ঝড় কিছুটা কেটেছে। আমার তাই বিশ্বাস!

মেনিদা খুব চিন্তিত মুখে বললেন, জয়, এত রাতে কচুরি না-ই বা খেলে!

মামা এক মুখ হেসে বললেন আপনি আমার জন্যে এত ভাবছেন কেন? ঘড়ির দিকে তাকান, আর কিছু খাওয়ার প্রয়োজন হবে না। এখুনি পাখির ডাক শুনতে পাবেন। আসুন আমরা সবাই মিলে চা খাই!

মামা আমাকে বললেন, সুটকেস খুলে একটা পাজামা আর গেঞ্জি বের করে আনতে। পাশের ঘরেই সেই সুটকেস। শৌখিন মানুষের শৌখিন সুটকেস। চাপ দিতেই খুটুস করে খুলে গেল। ডালা ওঠাতেই ভুরভুরে সুগন্ধ। সিল্কের পাঞ্জাবি, ধুতি, পাট করা রুমাল, আন্ডারওয়্যার। দাড়ি কামাবার সেট। গানের খাতা। কিটসের কবিতার বই। একেবারে তলায় পাজামা আর গেঞ্জি। সবই পরিচ্ছন্ন, যেন একেবারে নতুন। হঠাৎ নজরে পড়ে গেল জিনিসটা। রুমালে জড়ানো ছিল। একটা পাশ খুলে গেছে। সেই খোলা অংশ দিয়ে উঁকি মারছে একটা চশমার খাপ। শরীর অবশ হয়ে গেল। এই তো সেই চশমার খাপ! এরই মধ্যে থাকত পিতা হরিশঙ্করের গোল্ড ফ্রেমের চশমা। এদিক ওদিক তাকিয়ে খাপটা খুললুম। বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভেতরে সেই চশমা। নিভৃতে শুয়ে আছে। ফ্রেমের একটা ডাঁটি ভেঙে গেছে। তা হলে? মালিক কোথায়? মামা এতক্ষণ অভিনয়

করছিলেন আমার সঙ্গে। সব জানেন তিনি! মহা অপরাধীর মতো খাপটাকে কাপড়চোপড়ের অন্তরালে রেখে ফিরে গেলুম। সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। সন্দেহ, অভিমান, চাপা একটা রাগ উথলে উঠছে ভেতরে। ধরতে পারছি না ষড়যন্ত্রটা কী? কীসের জন্যে এই লুকোচুরি!

পাজামা আর গেঞ্জি পরে মামা হারমোনিয়মের সামনে বসেছেন। হাতে চায়ের কাপ ধোঁয়া ছাড়ছে। ঘড়িতে ঠিক দুটো। মেনিদা অদূরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ধ্যানস্থ। মামাকে বেশ তৃপ্ত দেখাচ্ছে। মুখে একটা হাসির ভাব। অর্থাৎ সব জেনেও না-জানার অভিনয়। মেনিদার দিকে তাকালুম, মনে হল ঢুলছেন।

খালি কাপটা একপাশে রেখে মামা বললেন, কী রে! অমন গুম মেরে গেলি কেন?

মামার দিকে আরও কিছুটা সরে গিয়ে ফিসফিস করে বললুম, আপনি সব জানেন, তাই না?

কী জানি বল তো? অকৃত্রিম অভিনয়।

তিনি কোথায় আছেন।

আমি কেমন করে জানব? আর জানলে তোকে বলব না!

মামা, জীবনে একটা সত্যি কথা বলুন। আমার মনের অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন। পরপর যা ঘটে গেল আপনাকে বলা হয়নি। আরও যা ঘটবে তার আভাস আছে। শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

মেনিদা তন্দ্রা-জড়ানো গলায় বললেন, জানলে বলে দাও। বড় কষ্টে আছে। হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনুক সম্রাটকে। নয়তো ধ্বংস অনিবার্য।

মামা আশ্চর্য হবার ভান করে বললেন, জানলে বলব না? তা কখনও হয়! তা হলে অত কষ্ট করে বয়ে বয়ে গোলাপ আনলুম কার জন্যে!

মামা হারমোনিয়মে সাপাট একটা তান বাজালেন। লম্বা ফরসা আঙুল বিজলির মতো খেলে গেল। অনামিকার আংটির পাথর ঝলসে উঠল।

আমি হাতটা খপ করে চেপে ধরে বললুম, একটা সত্যি কথা বলুন না আমার এই দুর্দিনে!

সংগীতে বাধা পড়ায় আমার রাগী মামা যেন একটু বিরক্তই হলেন, তোর এই ধারণার কারণটা কী?

আপনার সুটকেসে ওটা কার চশমার খাপ?

চশমার খাপ? মামা অবাক হবার ভান করলেন। আমার সন্দেহ আরও ঘোরতর হল।

হ্যাঁ, চশমার খাপ, রুমালে জড়ানো। আমার গলা আর স্বাভাবিক নেই। মেনিদা সোজা হয়ে বসলেন উত্তেজনার গন্ধ পেয়ে। আমার কানদুটো গরম আগুন। দু'জনে ষড়যন্ত্র করেছেন, জামাইবাবু আর শ্যালকে। একটা অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছে আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যে। এই শ্যালক সম্পর্কেই একদিন আমাকে কত সাবধান করেছিলেন, বি কেয়ারফুল, মামার মতো ফুলবাবুটি হোয়ো না। ওর অনেক গুণ, মানাবে। ইউনিভার্সিটি ব্লু, শিল্পী। তুমি মিডিয়কার, ট্যালেন্টলেস। ভাল-মন্দ খেয়ে পেট খারাপের সান্ত্বনা আছে। কুমড়োর ঘ্যাঁট খেয়ে কাত হলে, অতিশয় দুঃখের। তোমার একমাত্র সম্বল চরিত্র, আদর্শ, সততা।

হারমোনিয়মটা ভ্যাঁক করে বন্ধ করে মামা বললেন, অ, ওটা নজরে পড়ে গেছে!

হ্যাঁ পড়েছে। না পড়ে উপায় ছিল না। রুমালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ভেতরে সেই চশমা।

ওটা আমার শ্বশুরমশাইয়ের চশমা।

কেন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন? বাবার চশমা আমি চিনব না! কানের কাছে নাকের ব্রিজে মাদার অফ পার্লস দিয়ে মোড়া। গোল ফ্রেম।

তোর ধারণা পৃথিবীতে ফ্রেম যখন তৈরি হয়, এক পিসই হয়? আমার সঙ্গে বউবাজারে চল। দেখবি একই ফ্রেম একশোটা পাশাপাশি রয়েছে।

আমি অসহায়ের মতো মেনিদার দিকে তাকালুম।

তিনি মামাকেই সমর্থন করলেন, তা অবশ্য হতে পারে। জয়ের চোখে যে-চশমাটা রয়েছে আমি আরও অনেকের চোখে এমন চশমা দেখেছি।

মামা সমর্থন পেয়ে বললেন, তবে! শুনলে তো!

আমার লড়াই থামল না, এটা তো প্রাচীন ফ্রেম।

মামা বললেন, চাটুজ্যেমশাই আর আমার শ্বশুরমশাই দু'জনেই তো প্রাচীন। প্রায় সমবয়সি।

আমি ঝট করে উঠে গিয়ে চশমার খাপটা নিয়ে এলুম। আমি তো পিতা হরিশঙ্করের শুধু সন্তানই ছিলুম না, বিশ্বস্ত কুকুরও ছিলুম। প্রভুর সমস্ত সামগ্রীর বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ আমার জানা। এতটা ভুল তো আমার হবার কথা নয়। খাপটা বহু-ব্যবহারে ছাল ওঠা-ওঠা হয়ে গেছে। মাঝখানে একটু টাক। আমি তো চিনি। কতবার আমি ওই চশমা টেবিল থেকে তুলে খাপে ভরেছি। নরম সিল্কের কাপড় দিয়ে সোনালি অংশ আর কাচ পালিশ করেছি। আমার কখনও ভুল হতে পারে? কাচের দিকে তাকিয়েই হরিশঙ্করের বড় বড় দার্শনিক চোখ আমি দেখতে পেয়েছি। যে-চোখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব খেলা করত। কখনও অ্যাডমিরাল। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন যেন। কখনও কবি। প্রকৃতির সবুজ শোভায় বিভোর। কখনও রুদ্র ভৈরব। কখনও রসিক। কখনও ধারালো ব্যঙ্গ। আকাশের মতো রূপ পালটাত ক্ষণে ক্ষণে।

চশমাটা হারমোনিয়মের ওপর রেখে বললুম, এই চশমাটা বাবার নয়? এই খাপটা বাবার নয়? আমার চিনতে এত ভুল হবে?

মধ্যরাতে আলোর ভোল্টেজ বাড়ে। সেই চড়া আলোয় মামার ফরসা মুখ ফসফরাসের মতো জ্বলছে। খাঁড়ার মতো অহংকারী নাক। তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, আচ্ছা মুশকিল তো! তুই বুঝছিস না কেন, চশমা আর খাপ একই হবে! যে-চশমার যে-খাপ। বউবাজারের একই বড় দোকান থেকে হয়তো একই সময়ে দু'জনে চশমা করিয়েছিলেন। আমি কী করতে পারি বল!

চশমাটা ভাল করে পরীক্ষা করলুম। একটা ডাঁটি খুলে গেছে।

প্রশ্ন করলুম, চশমাটা এনেছেন কেন?

এটা একটা আন-ইনটেলিজেন্ট প্রশ্ন হল। দেখতেই পাচ্ছিস ভেঙে গেছে। মেরামত করতে হবে।

আপনার শ্বশুরমশাই তো দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন। রাঁচি গেলেন কেন?

তুই তো দেখছি পুলিশের জেরা শুরু করলি। রাঁচিতে গেছেন বায়ু-পরিবর্তনে। মেয়ের কাছে কিছুদিন থাকবেন বলে। হয়েছে!

হঠাৎ আমার মাথায় খেলে গেল, পিতা নিজেই একজন বড় মেকানিক। এই সামান্য মেরামতির জন্যে দোকানের শরণাপন্ন হবেন কেন? পরমুহূর্তেই মনে হল, স্ক্রু-টা হারিয়ে গেছে বলেই হয়তো নিজে মেরামতি করতে পারেননি।

মামা আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বললেন, কী? জেরায় সন্তুষ্ট তো?

মেনিদা বললেন, এরপর আর কী প্রশ্ন থাকতে পারে? আর কেনই বা তুমি মিথ্যে কথা বলবে? চশমার খাপটা সুটকেসে ঢোকাতে ঢোকাতে পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের কাহিনি মনে পড়ে গেল। এ যেন অনেকটা সেই রকমেরই ঘটনা। মামা একজন মস্ত বড় অভিনেতা। তাঁর পক্ষে ছোট-বড় যে-কোনও মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো কোনও ব্যাপারই নয়। এর বহু নজির আছে। সত্য আর মিথ্যার সীমারেখা ভেঙে চুরমার করে জীবনকে দাঁড় করিয়েছেন। চশমাটাকে একান্তে আরও ভাল করে পরীক্ষা করলুম। বড়ই চেনা। পিতা হরিশঙ্কর বলতেন, আমার হল 'হুক নোজ'। আর একজনের এইরকম নাক ছিল, তার নাম চেঙ্গিজ খান। সেই নাকের ওপর এই চশমাটাই কি ঝুলত না! চশমা, তুমিই বলো। নিজের সত্য নিজেই উদ্ঘাটন করো।

মামা আলাপ শুরু করে দিয়েছেন। যেন সুরের মিছরি ভাঙছে গলায়। সেই বিখ্যাত গান, আঁখিয়া ভর আয়ি। দরশ তুঁহে লাগি। বিলম্বিত একতালে সুরের রাজহাঁস হেলেদুলে চলেছে। আমার চোখও জলে ভরে এল। বড় সময়ের গান। আমিও তো তাঁর দর্শন চাইছি। দরশ তুঁহে লাগি। আঁখিয়া ভর আয়ি। Who rides so late through the night and storm? It is the father with his child. ওঘরে ভোর যেন ধীর পায়ে ঢুকছে রাতের অবগুণ্ঠন মোচন করে।

মামা সুরের সমুদ্রে তলিয়ে গেলেন। চোখ-মুখের চেহারা একেবারে অন্যরকম। এমন মানুষ মিথ্যে কথা বলেন কী করে! মেনিদার রাত-জাগা মুখে একটা গর্বের ভাব। দেখো দেখো, এই ছেলেটা একসময় আমার ছাত্র ছিল। আমি পতিত, ও উত্থিত।

ঘরের অন্ধকার হামাগুড়ি দিয়ে কোণে কোণে পালাচ্ছে। অনেক আগেই আলো নেবানো হয়ে গিয়েছিল। জানলায় পরদার মতো ঝিলঝিল করছে সদ্যোস্ফুট নতুন একটি দিন। গান শেষ হল। মামা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। মেনিদা ঠিং করে খঞ্জনিতে একটা শব্দ তুলে বললেন, বেরিয়ে পড়ি এইবার। আমি এক দিনের ফেরিঅলা।

মামা শুয়ে পড়লেন খাটে। সামান্য একটু নিদ্রা তো চাই। আমি জানি, এই সময় তাঁর একটু চায়ের প্রয়োজন হবে। চিত হয়ে শুয়ে আছেন বেদি থেকে নামানো গ্রিক দেবতার মতো। অনেকটা কিটসের মতোই রূপ। ঘুমিয়ে পড়েছেন। মসলিনের মতো ফিনফিনে নিশ্বাস পড়ছে। বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলুম সেই নিদ্রিত নিভাঁজ শান্ত মুখের দিকে। গুণের আধার। ভেতরে সুরের সমুদ্র। ওই মুখে কি আমার মায়ের মুখের আদল ভাসছে?

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, পায়ে হাত ঠেকালুম। এইভাবেই নাকি নিদ্রিত মানুষকে জাগাতে হয়। পাতলা ঘুম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকালেন। কিছুক্ষণ সময় লাগল পরিবেশটা বুঝে নিতে।

চায়ের কাপ তুলে ধরলুম। মৃদু হেসে বললেন, তোর কী ভালবাসা রে!

চা শেষ করে মামা উঠে পড়লেন। আড়মোড়া ভেঙে বললেন, বেশ ফ্রেশ লাগছে। জাস্ট এ লিটল স্লিপ। ঠিক ছ'টার সময় মামা বেরিয়ে গেলেন গার্স্টিন প্লেসের রেডিয়ো অফিসে। যাবার সময় বলে গেলেন, প্রোগ্রামটা শুনিস। যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলুম তাঁর চলে যাওয়ার দিকে। সেই নিদ্রিত মানুষ নয়। আত্মসচেতন, কিঞ্চিৎ অহংকারী এক শিল্পী। জিজ্ঞেস করা হল না, কখন ফিরবেন? যতই অহংকার করুন, এ-ও এক নিঃসঙ্গ মানুষের ছবি।

গোলাপের ছোট ছোট টব। একে একে সব ছাতে তুললুম। প্রত্যেকটায় একটা-দুটো করে কুঁড়ি লেগে আছে। জীবন্ত, সতেজ গাছ। সারারাত বাইরে থাকায় তাজা লকলকে। এবাড়ি আর পাশের বাড়ি গায়ে গায়ে। লাগোয়া পাঁচিলটা বেশ উঁচু। পাঁচিলের ওপাশে হঠাৎ একটা মাথা জেগে উঠল।

কী করছ তুমি একা একা?

জবা! সেই ভয়ংকরী, ডাকাবুকো মেয়েটা। যে ওই পাঁচিল বেয়ে এই ছাদে লাফিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে হয়েছে। সে যৌবন আর নেই। এখন শান্ত এক মা। আগে লাল শাড়ি আর লাল ব্লাউজ পরা জবার দিকে তাকালেই শরীর খারাপ হত! জবা কত ছেলেকেই যে গোল্লায় পাঠিয়েছিল! প্রশ্ন করলুম, কবে এলে?

কাল। সব পাট চুকিয়ে এলুম। জানো তো, ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে! কী মজা! এরাও বলছে তাড়িয়ে দেবে। এইবার বেশ ঝি-গিরি করে বাঁচব। তোমাদের বাড়িতে আমাকে রাখবে? খাওয়া-পরা।

জবা হাসছে। ঝকঝকে দাত। বিশাল খোঁপা। জবা কান্নার শব্দে হাসছে।

Still nursing the unconquerable hope
Still clutching the inviolable shade.

মেয়েদের এই এক সমস্যা। যৌবনটাকে সহজেই নয়ছয় করে ফেলে। জবার সেই পাগলামি, আবেগের বাঁধ ভাঙা নদী। সুখেনকে নিয়ে তো বেশ সুখেই ছিল। কী হল, কে জানে! কত রকমের বিভ্রাট যে নেমে আসে জীবনে। ভগবান করুন, আবার যেন সংসার ফিরে পায়! জবাকে বেশ দেখতে হয়েছে। আমার এইসব ভাবা উচিত নয়, শুধু ভয় করে, কোন জীবন যে কোথায় চলে যাবে। কী পরিণতি পাবে! একজন বলেছিলেন, জীবন একটা পিয়ানো। সেই পিয়ানোর রিডগুলো সব কাঁটা দিয়ে মোড়া। বাজাবে। সুর ঝরে পড়বে। কিন্তু আঙুলগুলো সব ক্ষতবিক্ষত হবে।

আমার পিতার একটা সুন্দর নোটবই আমি খুঁজে পেয়েছি। অপূর্ব হস্তাক্ষরে উপাদেয় সব দার্শনিক তত্ত্ব লেখা আছে। উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য। জগৎ জীবন ভুল হয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুলে নিয়ে যায় অন্য লোকে।

হরিশঙ্কর লিখছেন, একদিন স্বপ্ন দেখছি আমি একটা সুন্দর রঙিন প্রজাপতি হয়ে গেছি। ফুরফুর করে উড়ছি। ফুল থেকে ফুলে। কখনও ভেসে যাচ্ছি এক টুকরো কাগজের মতো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ছিঁড়ে গেল স্বপ্ন। ভাবতে বসলুম, কোনটা ঠিক। আমি স্বপ্ন দেখছিলুম আমি একটা প্রজাপতি। না কি আমি একটা প্রজাপতি, স্বপ্ন দেখছিলুম আমি হরিশঙ্কর। বড় কঠিন ধাঁধা। আমার অঙ্কের জ্ঞান হার মেনে যাবে। কোনটা ঠিক! প্রজাপতির স্বপ্নে হরিশঙ্কর, না হরিশঙ্করের স্বপ্নে প্রজাপতি?

এরপরেই লিখছেন, একদিন গঙ্গা পার হচ্ছি নৌকায়। যাব বেলুড়ে। আমাদের বিখ্যাত পতিতপাবন মাঝি নৌকা বাইছে। হাল-ধরায় তার অসাধারণ দক্ষতা প্রবাদের মতো। বর্ষার অশান্ত নদী। বড় বড় ঢেউ। নৌকা হেলছে-দুলছে, সামনে-পেছনে দোল খাচ্ছে। পতিতপাবনের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি বসেছিলুম তার পায়ের কাছে। কী মনে হল, বললুম, নৌকা চালানো কি শেখা যায়? পতিত বললে, কেন যাবে না? খুব যায়। তবে কী জানেন, যারা ভাসতে জানে, ভাসাতে জানে, তারা ডোবাতেও জানে। এই যে আমার নৌকায় এত যাত্রী, আমার হাতে ডুবেও যেতে পারে। ইচ্ছে করে ডোবাব না। ভুল করে। জল আর ডাঙার তফাত তো আমি বুঝি না বাবু। জলে ভেসে ভেসে জলের ভয় আমার কেটে গেছে। আর সেইটাই হল সবচেয়ে ভয়ের। তার চেয়ে আমি কী বলি বাবু, নিজে ভাসতে শিখুন, নিজে সাঁতার কাটতে শিখুন, ডুবসাঁতার শিখুন, ডাঙা যে ডাঙা আর জল যে জল সবসময়ে সেইটা মনে রাখুন। যাকে আমরা সাধারণ সামান্য মানুষ জ্ঞান করি, সেও কত জ্ঞানী। কেমন সহজে আমাকে বুঝিয়ে দিলে, অন্যের সাহায্য নিয়ে ভেসে থাকায় ভয় আছে। পাকা মাঝির নৌকার তলা ফেঁসে যেতে পারে। সংসার-নদীতে ভেসে থাকো নিজের আয়ত্ত করা কৌশলে।

এরপর পিতা হরিশঙ্কর লিখছেন, একটি সুন্দর কাহিনি পড়লুম—এক দারুশিল্পী সুন্দর একটা কাঠের স্ট্যান্ড তৈরি করে উপহার দিলেন রাজাকে। রাজা সেই স্ট্যান্ডে বাদ্যযন্ত্র রাখবেন। সকলেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, এমন স্বর্গীয় শিল্পকর্ম সহসা দেখা যায় না। রাজা তখন শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন সুন্দর কাজ আপনি করেন কী করে! কী আছে আপনার হাতে? রহস্যটা কী?

শিল্পী বললেন, কোনও রহস্যই নেই মহারাজ। তবে হ্যাঁ, কিছু একটা আছে। সেটা কী, তা হলে বলি শুনুন। এই ধরনের কাজ ধরার আগে প্রথমেই নিজেকে সুরক্ষিত করি, প্রাণশক্তি যেন কমে না যায়। তারপর মনটাকে স্থির করতে করতে একেবারে শান্ত করে ফেলি। তিন দিন নিজেকে এই অবস্থায় ফেলে রাখি। প্রাপ্তি পুরস্কারের সব চিন্তা চলে যায় মাথা থেকে। পাঁচ দিনের দিন ভুলে যাই যশ-খ্যাতির চিন্তা। সাত দিনের দিন আমার দুটো হাত, দুটো পা ও শরীর-বোধ চলে যায়। অবশেষে কার কাজ করছি, কোন রাজার, কোন মহারাজার, সে চিন্তাও আর মাথায় থাকে না। তখনই আমার দক্ষতা দানা বাঁধে। তখন আর আমি মানুষ থাকি না, পরিপূর্ণ একজন শিল্পী। বাইরের কোনও গোলমাল তখন আর আমাকে কাবু করতে পারে না। তারপর আমি এক পর্বত অরণ্যে প্রবেশ করে, উপযুক্ত একটা গাছের অনুসন্ধান করি। যে আকার দিতে চাই গাছটায় যেন মোটামুটি সেই আকার থাকে, পরে সেইটাকেই আমি ফুটিয়ে তুলব। এরপর আমি দেখতে পাই। আমি যা করতে চাই সেইটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আমি তখন সেই রূপকর্মকে অনুসরণ করি। প্রকৃতির গঠন ভঙ্গিমা আর আমার তন্ময়তা দু'ইয়ে মিলে তৈরি হয় শিল্প, যাকে আপনারা বলছেন অলৌকিক। এরপর হরিশঙ্কর লিখছেন, এই আমার জীবনের তত্ত্ব। অসীম তন্ময়তা।

মেঝেতে বসে দেয়ালে পিঠ রেখে খাতাটা পড়ছিলুম। অজস্র লেখা। হঠাৎ অদ্ভুত একটা জিনিসের দিকে চোখ চলে গেল। একটা পালক। পায়রার পালক। মুখের দিকে পাখার মতো অল্প একটু লেগে আছে। বাকিটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এইরকম কায়দার পালক দিয়ে হরিশঙ্কর কান চুলকোতেন। আর এই পালক থাকত চশমার খাপে। তার মানে? মানে খুব সহজ—কাল রাতে চশমার খাপটা খোলার সময় পালকটা পড়ে গেছে। আমি নিঃসন্দেহ, ওই চশমা পিতা হরিশঙ্করের। মামা সত্য গোপন করছেন।

ভীষণ একটা শক্তি, ভয়ংকর এক উৎসাহ, ভীষণ এক উদ্দীপনা নড়েচড়ে উঠল ভেতরে। আমি পেয়ে গেছি। আমার বৃক্ষের সন্ধান আমি পেয়ে গেছি। তিনি রাঁচিতেই আছেন। আমি যাব। মামা মনে হয় কালই যাবেন। খাতা রেখে উঠে পড়লুম। উত্তেজনায় গোটা বাড়িটা একবার ঘুরে এলুম। তাঁকে নিয়ে আসব। আবার জমে উঠবে এই গৃহ-সংসার। মাঝরাতে এসরাজের ছড়ে টান পড়বে। কেঁদে উঠবে রাগিণী। বাগেশ্রী, কেদারা কি জয়জয়ন্তীতে! ছাদ ভরে যাবে ফুলে। অন্ধকার ঘরে বোতলের পর বোতল ফিল্টার হবে কালি। পিতা হরিশঙ্কর শেকসপিয়ার আওড়াতে আওড়াতে কাজ করবেন। আমার বর্ণোজ্জ্বল অতীত ফিরে আসবে। মনে হচ্ছে লটারি পেয়ে গেছি। কয়েক লাখ টাকার ফার্স্ট প্রাইজ।

আনন্দে হঠাৎ ছায়া নামল। কত রকমের উৎপাত যে আছে! জবা আর জবার মা একসঙ্গে এসে হাজির। জবার মায়ের স্বাস্থ্য ইদানীং বেশ ফিরেছে। স্বামীর কারবার বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। জবার আকর্ষণও কিছুমাত্র কমেনি।

জবার মা বললেন, তোমার বাবা পালিয়ে গেছেন, খবর পেয়েছি। আসি আসি করে আর আসা হয়নি। পালিয়ে গেছেন, শব্দটা শুনে সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। জবা আর জবার মা দু'জনেই বাবার খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসেছেন। শয্যায় নারীর স্পর্শ। চক্ষুলজ্জায় বলতে পারছি না কিছু। জবার আবার পা দোলানোর অভ্যাস। কাকাবাবু থাকলে বলতেন, শনি নীচস্থ। জবার চিরদিনই লজ্জা-শরম কম। আরও যেন একটু কমেছে। ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে শাড়ির আঁচলটা গোছগাছ করে দিয়ে আসি।

জবার মা বললেন, খবর পেলে কিছু? বেঁচে আছেন তো? না গোবিন্দর বাবার মতো আত্মহত্যা করলেন? এইবার আমার ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে। জবার জন্যে পারছিনা। মনের খুব গভীর গোপনে একটা ইচ্ছের নড়াচড়া টের পাচ্ছি। শয়তান এখনও মরেনি। ঘাপটি মেরে বসে আছে। জবা অসহায়। জবার বন্ধুর প্রয়োজন। শয়তান আবার ইংরেজিতে বার্তা প্রেরণ করে, জবা ইজ নাও অ্যাভেলেবল। জবা ভয়ংকরী। জবার কোনও সংস্কার নেই। কোনও নৈতিক বাঁধন নেই। বিদেশি মনের মেয়ে।

ধুর ঘোড়ার ডিম জবা! কম শক্তির অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎতরঙ্গে শরীর যেন ঝিমঝিম করছে।

জবা বললে, কাকাবাবু আত্মহত্যা করার মানুষ নন। পিন্টুদাকে দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না মা। কাকাবাবুর কিছুই পায়নি। মেয়েছেলেরও অধম। কোনও সাহস নেই। সুখেনের যত প্রেমপত্র ওই লিখে দিত। তবু নিজের একটা লেখার সাহস হয়নি। বাবা বকবে! বাবার আঁচল-ধরা। সেই বাবাই এখন ছেলেকে ফেলে পালিয়েছে। কচি খোকা! এইবার কেঁদে মরো, কোথায় পিতা কোথায় পিতা, জ্বলছে বুকে স্মৃতির চিতা!

তুই থাম। জবার মা মেয়েকে ধমক দিলেন।

জবা খিলখিল করে হেসে পেছন দিকে উলটে পড়ল। দুটো পা টেনে তুলে নিল খাটে। এই সেই জবা। নিটোল পায়ের গোছে গোড়ালির ওপর দুটো পাঁয়জোর। উলটো দিকে আমি বসে আছি। দুটো পা তুলে ওইভাবে শুয়ে থাকলে কী কী প্রকাশিত হতে পারে, সেই বোধটাই জবার নেই। জবার মায়েরও নেই। চিত হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ জবা উপুড় হয়ে গেল। দুটো পা হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে ওপরে উঠে আছে। এপাশে ওপাশে দুলছে। মলের সঙ্গে যুক্ত ছোট ছোট ঝুমকোয় চুনুর চুনুর শব্দ। হাতের ভরে চিবুক। ঘাড়ের কাছে আধ-ভাঙা বাসি খোঁপা। একটা কাঁটা একটু আলগা হয়ে আছে। জবা তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে।

অসুস্থ অভুক্ত মানুষ দেখেছি। গাল ভাঙা। কোটরগত চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঢেলাঢেলা। ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক। শ্বাসকষ্ট। সেইরকম এক মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করলুম ভেতরে। ভীষণ খারাপ লাগছে। ভীষণ ভালও লাগছে। চোখ বলছে বাহবা। দৃশ্যটা স্থায়ী হোক। মন বলছে ছিছি। দেখো না। হতে পারে কবিতা, কিন্তু নিষিদ্ধ কবিতা। জবা মনে হয় পরিবেশ পরিস্থিতি সবই ভুলে গেছে। জবার মা যথারীতি বেহুঁশ। জবার আগুনে কত নির্বোধ যে বেপরোয়া পতঙ্গের মতো পুড়ে মরেছে। আমাকে আরও বিপদে ফেলেছেন জবার মা। মেয়ের একেবারে পাশটিতে তার কোমরের তলায় হাত ফেলে বসে আছেন। তাঁর দিকে তাকাতে গেলেই জবার শারীরিক বিপর্যয়ের দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে আমার অস্বস্তি।

জবার মা হঠাৎ বললেন, তোমার জন্যেই আমার মেয়েটার এই সর্বনাশ হল।

জবা ঘুরে চিত হয়ে বলল, ওর জন্য কেন হবে মা? হয়েছে আমার বরাতে। সংসার যে আমার ভাল লাগে না!

তা কেন লাগবে! জবার মা গলা বিকৃত করলেন, ফুলে ফুলে মধু খেতে ভাল লাগে। যতদিন না বুড়ি হচ্ছে, ততদিন আমাকে জ্বালাবে। শোয়ার ছিরি দেখো। ঠিক করে শো। সামনে একটা পুরুষমানুষ বসে আছে, সে হুঁশ নেই। উঠে বোস না। যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই ঢ্যাস ঢ্যাস লটকে পড়ছে। তোর কিছু হয়েছে নাকি? মেয়ের দিকে সন্দেহের চোখে তাকালেন মা। পরিবেশটা হঠাৎ কেমন দূষিত হয়ে গেল। পিতার খাতা পড়ে ও তাঁকে পাবার সম্ভাবনায় মনে যে স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়েছিল তা ঘুচে গেল! ফুলের বাগান থেকে মাছের বাজারে।

জবার মা বললেন, তোমারও কিছুটা দায়িত্ব আছে। তুমি দু'জনকেই সাহায্য করেছিলে। তোমাদের বাড়িতেই দু'জনের দেখা হত। চিঠি চালাচালি হত।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, আপনি তখন কী করতেন?

জবা কুঁককুঁক করে হাসতে হাসতে বললে, তখন রাজ কাপুরের সঙ্গে প্রেম করত। সিনেমার নেশা।

আমি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললুম, নিজের মেয়েকে নিজে সামলাতে পারেননি?

জবার মা সুর পালটে বললেন, আমি এখন কী করব বাবা! মেয়ে কোলে মেয়ে তো শ্বশুরবাড়ির পাট চুকিয়ে চলে এল। এখন কী হবে!

কী আবার হবে? দু'দিন পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ও অমন ঝগড়াঝাঁটি হয়, আবার মিটে যায়। সুখেন খুব সাদাসিধে, ভাল ছেলে।

জবা বললে, সে ছেলে আর নেই। তার এখন অনেক গুণ। মদ খেতে শিখেছে। খারাপ জায়গায় যেতে শিখেছে। রোজ রাতে বউকে না পিটিয়ে বিছানা নেয় না। খারাপ অসুখও বাধিয়েছে।

সুখেনের এত গুণ হয়েছে! দুটো পয়সার মুখ দেখেছে বুঝি! আমি বললুম, তা হলে তো হয়েই গেল। এরপর তো আর কিছু করার নেই। জবা যে-অসুখের ইঙ্গিত করছে, সেই অসুখে মানুষের পরিবার জীবন নষ্ট হয়।

জবার মা তবু ছাড়লেন না। বললেন, ব্যাটাছেলেদের অমন বেচাল একটু-আধটু হতেই পারে। সব অসুখই চিকিৎসায় সারে। সুখেন তোমার বন্ধু, তুমি একটু খোঁজ নাও বাবা। বড় ছেলেটার তা হলে বিয়ে আটকে যাবে।

জবা উঠে পড়ল। সেই রাগী রাগী, বেপরোয়া ভাব, তোমার ছেলের বিয়ে ঠিকই হবে মা, জবার জন্যে আটকাবে না। জবার ব্যবস্থা জবা নিজেই করে নেবে। জবার জন্য তোমাকে জনে জনে গিয়ে নাকে কাঁদতে হবে না।

জবার মা যেন ঘুরে ছোবল মারলেন, ওই স্বভাবের জন্যে তুমি মরেছ। এখন গতর আছে, অনেককে খেলাচ্ছ, এরপর দোরে দোরে ভিক্ষে।

জেনে রাখো, তোমার দোরে ভিক্ষে করতে আসব না। তোমার জামাইয়ের দশ হাজার টাকা শোধ করেছিলে?

সেটা সুখেনের সঙ্গে আমার ব্যাপার।

তার জন্যে আমাকে রোজ ধোলাই খেতে হয়েছে কেন?

টাকাটা আমি ফুর্তি করব বলে নিইনি। তোর বাপের ব্যবসায় ঢুকেছে। যখন দেবে তখন ঠিকই দিয়ে দেওয়া হবে।

সেই যখনটা কখন মা? কত দিন হল?

ইচ্ছে করলে এরা সারাদিন চালাতে পারবে। এদের সঙ্গ আর এক মুহূর্তও ভাল লাগছে না। বেশ একটু ভারী গলায় বললুম, মাসিমা, আমাকে বেরোতে হবে।

তা বেরোবে। ব্যাটাছেলের কি ঘরে বসে থাকা সাজে! তুমি বাবা সুখেনের সঙ্গে যেভাবেই হোক একটু যোগাযোগ কোরো। তা না হলে এই মেয়ের জন্যে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ওই তোমার জাড়তুতো দিদির মতো। তুমি দেখেছিলে, আমি এসেছিলুম?

লক্ষ করিনি।

ওমা, সেকী? আমি বললুম, পিন্টু, বিপদে বুদ্ধি হারিয়ো না। শুনতে পাওনি?

না, তখন আমি কুইনিন খেয়েছিলুম।

তোমার ম্যালেরিয়া হয়েছে বুঝি? সাবধানে থেকো। ইহসংসারে তো কেউই নেই তোমার। আমরা আর কতটুকুই বা করতে পারব! নিজেদের জ্বালায় জ্বলছি সব।

জবার মা দরজার দিকে এগোতে এগোতে বললেন, চল জবা চল। সৃষ্টি কাজ পড়ে আছে।

জবা বললে, তুমি যাও না! কতদিন পরে এলুম। আমি একটু পরে আসছি। পিন্টুদার সঙ্গে আমার প্রাইভেট কথা আছে।

ওকে আর বিরক্ত করিসনি। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ও বেরোবে।

জবা বললে, তুমি যাও তো! আমাদের ব্যাপারে নাক গলিও না।

নাক না গলিয়ে গলিয়েই তো আজ তোমার এই অবস্থা হয়েছে।

জবার মা চলে গেলেন। জবা আমার খুব কাছে সরে এসে বললে, কেমন আছ? তোমাকে তো আগের চেয়ে বেশ ভালই দেখতে হয়েছে; প্রেমিক প্রেমিক। মনে হচ্ছে বেশ ভালই আছ?

জবা আমার এত কাছে যে অস্বস্তি হচ্ছে। জবার স্বভাব বরাবরই একটু আলগা ধরনের। ভীষণ সরল। বুঝতেই পারে না কী করছে, তার ফলে কী হচ্ছে। টেবিলের কোণে পেছন ঠেকিয়ে জবা আয়েশ করে দাঁড়িয়েছে। একটা পা তুলে দিয়েছে আমার চেয়ারের তলার কাঠে। হাঁটুটা ঠেকে আছে আমার ঊরুতে। ভীষণ একটা বিরক্তির ভাব আসছিল, সেটা কেটে গেল হঠাৎ। বেশ ভালভাবেই বললুম, জবা, তুমি আমাকে এই কথা বলার জন্যে আটকালে?

জবা মাথার পেছন দিকে হাত ঘুরিয়ে খোঁপাটা খুলে, বিনুনিটা বুকের সামনে টেনে এনে খুলতে শুরু করল। আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কিন্তু আমাকে দেখছে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তুমি আমার একটা উপকার করবে? কেলে মানিককে বলবে, আইনত আমাকে যাতে ছেড়ে দেয়।

তার মানে তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছ?

হ্যাঁ। আমি একজনকে ভালবেসে ফেলেছি। ছেলেটা ভীষণ ভাল। ভীষণ দুঃখী। তার কেউ নেই। সে-ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে। সুখেন যদি আমাকে ছেড়ে দেয় আমি তাকে বিয়ে করব।

সুখেনকেও তো তুমি ভালবেসেই বিয়ে করেছিলে!

আমি তো বাসিনি, সুখেনই আমার পেছনে লেগেছিল ফেউয়ের মতো। তখন মনে হল, যাক যা হয় হবে, বিয়েটা করেই ফেলি। তুমি তো আমাকে জাননা, দুমদাম কিছু করে ফেলতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

বয়েস তো হচ্ছে। এইবার একটু নিজেকে বোঝাও না!

বুঝিয়েছি তো! সুখেনের সঙ্গে আমি পারব না। ও নিজে একটা শরীর, বোঝেও শরীর। আর এই ছেলেটা হল শুধুই মন। একদিন সারারাত আমার পাশে শুয়ে ছিল, আমাকে ছোঁয়নি।

তার মানে মানুষ নয়!

ঠিক বলেছ, দেবতা।

আর পারলুম না। উঠে পড়লুম, ঠিক আছে, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। তারপর সামান্য একটু কৌতূহল হল, জিজ্ঞেস করলুম, ছেলেটা কে? তোমাদের ওখানেই থাকে?

জবা একটু হাসল। হেসে বললে, না না, খুব কাছেই থাকে।

কোথায়? এইখানে?

হ্যাঁ, একেবারে সামনেই, এক হাত দূরে। সেই ছেলেটা হলে তুমি। জবা আমার দু'কাঁধে বন্ধুর মতো হাত রাখল। মুখে হাসি, কিন্তু চোখে জল। প্রথম থেকে তোমাকেই আমি ভালবাসতুম।

স্বাস্থ্যবান জীবন্ত একটা মেয়ে ভালবাসার কথা বলছে সরাসরি। কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেলুম। একটা মন জয় করা, বিশাল এক রাজ্য জয় করারও অধিক। জবার মতো দেহবাদী পিচ্ছিল এক মেয়ে বলছে, আমি তোমাকেই ভালবাসতুম। আদর্শ, চরিত্র, ঈশ্বর, প্রখর নদীর স্রোতে এক টুকরো কুটোর মতো ভেসে গেল। জবার কপালে সোনালি টিপ। চিবুকে ছোট্ট একটা তিল। বুকের ওপর দুলছে বিনুনি।

জবা বললে, পারবে না আমার জন্যে সবকিছু ছাড়তে? নদীর ধারে ছোট্ট একটা বাড়িতে আমরা থাকব। একেবারে নতুন একটা জায়গায়, সেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। ছোট্ট একটা ফুলের বাগান। একটু কিছু রোজগার। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা জেগে থাকব। মেলায় গিয়ে নাগরদোলা চাপব। মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে ভাত রাঁধব। তুমি নদী থেকে স্নান করে আসবে সাধুর মতো। কম্বলের আসনে পুজোয় বসবে। সামনে একথালা সাদা ফুল, তার ওপর সাদা একটা জবা, পাশেই একটা লাল পঞ্চমুখী, গোটাকতক টকটকে গেরুয়া কলকে ফুল। চওড়া লাল পাড় শাড়ি পরব আমি। হাট থেকে তোমার জন্যে কাঁচা শালপাতায় মুড়ে সাদা মাখম নিয়ে আসব, কোলে করে আনব লাল তরমুজ। গাছের ডালে ঝোলাব একটা দোলনা। লটলটে কান একজোড়া ছাগলছানা খেলে বেড়াবে। আমাদের জানলা দিয়ে পুবের আকাশে নীল একটা পাহাড় দেখা যাবে। আমাদের বাড়ির ঢোকার মুখে দুটো বেতগাছের ঝোপ থাকবে। আমরা আমাদের নাম পালটে নোব। নতুন শাড়ির পাট খোলার মতো নতুন জীবনের ভাঁজ খুলব। জবার মাথা নেমে এল আমার বুকে। কাণায় ফুলছে। ধরাধরা গলায় বলল, হয় না এসব? হওয়ানো যায় না? এ কি একেবারেই অসীব!

What a great happiness not to be me!

জবা গলা-বড় একটা ব্লাউজ পরেছে। গলা আর বুকের ওপরের অনেকটা উন্মুক্ত। সুঠাম ঢলঢলে শরীর। বুকের ওপর দুলছে সোনার লকেট। জবা সাধাবণ মেয়ের চেয়ে বেশ লম্বা। সুখেনটা একটা রিয়েল গাধা। এমন একটা বউ পেয়েও সুখী হতে পারল না ইডিয়েট। মানুষের জীবনে সুন্দর একটা মেয়ে যে কী ফুল ফোটাতে পারে অনেক মোটা মাথাই তা বোঝে না।

জবা আঁচলে চোখ মুছে বলল, আমি যাই। পরে আবার আসব। পিন্টুদা, তুমি কখনও প্রেম করে বিয়ে কোরো না। প্রেম বলে কিছু নেই। সংসারে ঢুকলেই প্রেম জ্বলে যায়। দেহটাই সব। মনটা কিছু নয়। ওই নরকের কীট আমাকে কীভাবে যে ভোগ করেছে, তুমি কল্পনা করতে পারবে না। ওটা মানুষ নয়, ষাঁড়।

জবা নীচে নামছে। অসহায় একটা মেয়ে। ঈশ্বর আমাকে যদি সেই সাহস দিতেন, আমি জবাকে নিয়ে কোথাও একটা গুছিয়ে বসতুম। মেয়েটা ভীষণ সরল আর ইমোশনাল বলেই ঠকে গেছে। এইবার নোংরা আর লোভী সমাজ ওকে গ্রাস করবে। দশ বছর পরে জবার কী হবে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বারেবারে ঠকার জন্যেই ও পৃথিবীতে এসেছে। সিঁড়ির বাঁকে গিয়ে জবা আমার দিকে তাকাল। চোখদুটো বর্ষার আকাশের মতো। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। জবা বললে, আমার জন্যে ভেবো না। কিছু আশা, আশাই থেকে যায়।

জবা নেমে গেল। খুব ইচ্ছে করছে জবাকে ডেকে ফেরাই। মানুষ যেভাবে জলে কি আগুনে ঝাঁপায়, সেইভাবে ঝাঁপ মারি। সবাই তো হিসেব-নিকেশ করে ভাল হতে চায়, আমি না হয় খারাপই হয়ে গেলুম। লোকে বাহবা বাহবা না করে, না হয় ছিছি-ই করল। মন্দিরের প্রদীপ না হয়ে, একটি মেয়ের অন্ধকার মনেরই না হয় প্রদীপ হলাম। চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে যাক হরিশঙ্করের ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো তাদের কাছে হাত পাততে যাব না। আমার শিক্ষা, জ্ঞান, উপার্জন সবই ঠিক থাকবে। হরিশঙ্করই যখন নেই, তখন আর আমার ভয় কীসের! আজই এই মুহূর্তে আমাদের একটা গোপন সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে। পৃথিবী যেমন চলছে সেইরকমই চলবে। কারও কোনও ক্ষতি হবে না। শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে সুখের একটা কোণ খুঁজে পাবে। দেরাদুনে আমার চাকরিতে ফিরে গেলে জবাকে ওই পরিবেশে ভয়ংকর মানাবে। জবা মুকু নয়। অনবরত শাসনে আমাকে আড়ষ্ট করে দেবে না। জীবনের ভাল দিক, খারাপ দিক দুটোই জানে। একটা মানুষ সবসময় ভাল থাকতে পারে না। কখনও ভোগী, কখনও যোগী। মন্দিরে যেতে পারে, আবার সেই সব জায়গায় ফুর্তি করতেও যেতে পারে। মনের অবস্থা যখন যেমন। একটু আগে জবা শুয়ে ছিল। শরীর ছেড়ে দিয়ে অলস ভঙ্গিতে নায়িকার মতো। তার দেহ থেকে নানা তরঙ্গ ছড়াচ্ছিল। আমার মন দুলছিল হেলছিল। কাবু হচ্ছিল। মজে আসছিল। নেশা ধরছিল। এখন এই বাড়ি নির্জন। কাক ডাকছে। গরম নিশ্বাসের মতো ফিকে বাতাসে খাতার পাতা অল্প অল্প কাঁপছে। রসের মতো অল্প ঘাম। টনটনে শরীর। জবাকে ডাকতে পারি। মনের সব সংস্কার ফেলে দিতে পারি। বর্তমানই সব। আমার অতীত নেই, ভবিষ্যতও নেই। বর্তমান চলে

গেলে যা আসবে, যেভাবে আসবে সেইটাই আমার ভবিষ্যৎ। তারপর? গান থেমে যাবার পর সুরের রেশ। সুন্দর একটা ঘুম ভাঙার আবেশ। একটা আশীর্বাদ। চওড়া মসৃণ একটা পিঠে দিশাহারা ছোট্ট একটি পিঁপড়ে। নিরালায় নিঃশব্দে খসে পড়া একটি ফুল। গাছের পাতায় বহুক্ষণ থেমে যাওয়া বৃষ্টির নোলকের মতো এক ফোঁটা জল। কী? এবার ওঠো। বাড়ি যাবে না? আমার ঘুম পেয়েছে। দুটো হাত এগিয়ে আসছে। আমি আবার তলিয়ে যাব পাহাড়-নদী-উপত্যকায়, একটা দিনের মতো, একটা রাতের মতো। ভাবতে ভাবতেই জবা চলে গেল। এ জীবনটা আমি শুধু ভেবেই যাই। আর সময় আমার ওপর দিয়ে চলে যাক সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো।

হঠাৎ মনে হল, পিতা হরিশঙ্করের জন্যে উতলা হয়ে কী হবে! বেশ তো লায়েক হয়েছি। সুযোগ যখন পেয়েছি তখন বেশ মাংস কষার মতো পেঁয়াজ রসুন মশলা দিয়ে জীবনটাকে কষি। একটু ভোগ করি বিলিতি কায়দায়। মুকু গেছে ভাল হয়েছে। সে ছিল আমার বিবেকের চোখ, প্রতি মুহূর্তে সে আমাকে স্মরণ দিত, সাবধান। মনে রেখো, তুমি কার ছেলে! কোনও বেচাল চলবে না। সরে বোসো। আলাদা শোও। ধর্মের পানে কর্মের সুপুরি দিয়ে খিলি তৈরি করো। ভক্তির জরদা মেশাও। মুকুর মতো স্ত্রী স্বামীকে ধোলাইও দিতে পারে। ঈশ্বর যখন পাঁচিলের ওপাশে জবাকে এনে ফেলেছেন, তখন আর সুযোগের অবহেলা করা কেন! জবা তো একসময় আমাকে উন্মাদই করেছিল। নেমে পড়ি আসরে। এখনই অথবা কখনওই নয়। ভয়ংকর একটা রোমাঞ্চ আছে এই অবৈধ ব্যাপারটার ভেতর।

এই পাপ চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলুম। প্রস্তুত হয়ে থাকি। মামা যদি আজই রাঁচির ট্রেন ধরেন, আমি পিছু ছাড়ছি না। না, আজ কী করে যাবেন? গভীর রাতেও তো প্রোগ্রাম আছে। রাত সাড়ে দশটার সময় বেতারের ঘোষক বলবেন, এখন জয়জয়ন্তী রাগে খেয়াল শোনাবেন। ঠোঁটের ওপর ব্লেডটা একবার হোঁচট খেল। চিনচিন করে উঠল জায়গাটা। সঙ্গে সঙ্গে সাবান ফুঁড়ে ফুটে উঠল এক বিন্দু রক্ত। নীচের ঠোঁটে গড়িয়ে এল রক্তের ধারা। এ আবার কী হল! কী ছিল ওখানে?

ঠোঁটটা ধুয়ে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার রক্ত। বোধহয় একটা ব্রণ হয়েছিল। আমার খেয়াল ছিল না। কী করি এখন? রক্ত তো বন্ধ হচ্ছে না। অসম্ভব জ্বালা। মনে হল চুনই ওষুধ। চুন টিপে দিলে রক্ত বন্ধ হতে পারে।

সামনের পান-বিড়ির দোকানে চুন চাইতে গেছি, মালিক কেষ্টদা ভয় ধরিয়ে দিলেন, করলে কী? ওষ্ঠ ব্রণ ভয়ংকর জিনিস। ব্লেড মেরে দিলে!

দোকানের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুন চেপে ধরলুম। রক্ত বন্ধ হল। কিন্তু স্বস্তি পেলুম না। দেখতে দেখতে ওপরের ঠোঁটটা ফুলে উঠল। আড়ষ্ট ব্যথা। স্নান করার সময় গায়ে জল ঢালামাত্রই শীত করে উঠল। জল একেবারেই ভাল লাগছে না। চোখ জ্বালা করছে। মাথা ঝিম মেরে আসছে। কোনওরকমে স্নান শেষ করে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। ঠোঁটটা আরও ফুলে বনমানুষ কি ওরাং ওটাং-এর মতো হয়ে গেছে। চেহারা দেখে নিজেরই ভয় করছে। কপালে হাত রেখে মনে হল, বেশ জ্বর এসে গেছে। তাই এত শীত করছে। অক্ষয় কাকাবাবুর ভবিষ্যৎবাণী তা হলে ফলে গেল। আজই সেই তৃতীয় দিন। একটা বিপদ আসছে। এই তো সেই বিপদ। এখন আমার কী করা উচিত! বেশ ভালই লাগছে। একেবারে অসহায়। পরামর্শ দেবার মতো কেউ নেই। মামাকে আমি চিনি। বড়লোক-ঘেঁষা মানুষ। কোথায় গিয়ে বসে আছেন কে জানে! আজ আর ফিরবেন

বলে মনে হচ্ছে না। বেলা একটা বাজল। উনুন জ্বেলে রান্না করার প্রশ্নই ওঠে না। খেতেও পারব না। কোনওরকমে ঘরে এসে পিতা হরিশঙ্করের খাটে ধপাস করে উলটে পড়লুম। চাদরটা পালটাব ভেবেছিলুম, জবা শুয়ে গেছে। সেই ভাবনাটা চলে গেছে। এখন বেশ ভালই লাগছে। বোধহয় জবার দিকে মনটা ঝুঁকেছে বলেই। ভালবাসা, কে বলতে পারে! কখন টলটল করে উঠবে ভেতরে তালশাঁসের জলের মতো। আর আমার কোনও ক্ষমতাও নেই যে তুলব, ঝাড়ব, নতুন একটা পাতব।! জবার ওপরই শুয়ে পড়ি। আশ্চর্য, জবার শরীরের কথা চিন্তা করলে যন্ত্রণার কথা আর মনে থাকছে না। জবা ঈশ্বরের চেয়ে শক্তিশালী। সাধ্যসাধনাতেও তিনি আসেন না। ঈশ্বরের আর একটা প্রবলেম হল, এত রূপ, কোন রূপে আমি চিন্তা করব! চলচ্চিত্রের মতো একের পর এক এসে, জড়ভট্টি হয়ে তালগোল পাকিয়ে, শেষে যেন মনের কুস্তি! কোনও প্যাঁচেই পেড়ে ফেলা যায় না। ধোঁয়া ধরার কসরত। সেই তুলনায় জবা কত স্থির। যে-জায়গাটা স্মরণ করছি, সেইটাই সামনে এসে স্থির হচ্ছে। শুধু স্থির নয়, আনন্দ আর আকাঙক্ষা জাগাচ্ছে। সেই গানের মতো, যতইনা পাবে, তত পেতে চাবে, ততই বাড়িবে পিপাসা তাহার। এই জায়গাটায় জবার মাথা ছিল। এইখানে শরীরের মধ্যভাগ। এই জায়গায় হাঁটুদুটো। উত্তেজিত পদযুগল। সাদা ক্রমশ দুধসাদা হয়ে রহস্য হয়ে গেছে নীল অন্তর্বাসে।

জ্বর আরও বেড়ে গেল। যেখানে হাত রাখছি সেই জায়গাটা গরম হয়ে উঠছে। বেশ জমে গেল তা হলে! ওষ্ঠ ব্রণ সেপটিক, মানে মৃত্যু অবধারিত। ভালই হবে। আর একবার ভাল করে জন্মাব। অক্ষয়বাবুর মতো বিশাল এক শরীর চেয়ে নোব, আর তার ভেতর ফিট করে দেব পিতার চরিত্র ও মেধা। মামার সংগীত-প্রতিভাও নিতে পারি। স্বর্গে গিয়ে প্রথমেই দিদিকে খুঁজে বের করে ক্ষমা চেয়ে নোব। মাকে বলব, তাঁর চলে আসার পর আমার বেঁচে থাকার বৃত্তান্ত। নন্দনকাননে কিছুদিন রেস্ট নেবার পর পৃথিবীতে ফিরে আসব।

গোটা মুখ থমথম করছে। এপাশ ওপাশ করলে যেন মল বাজছে ঝমঝম। চোখের মণি নীচের দিকে নামালে নিজের গাল ঠোঁট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আয়না ছাড়াই। ফুলে উঠে চোখের কোলে চলে এসেছে। কী মজা! এ-ও জীবনের এক অভিজ্ঞতা। ঈশ্বরকে ডেকে লাভ নেই। মন দেবী থেকে সরে গেছে মানবীতে। কেউ কি আসবে না আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার মুহূর্তে! চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকছে শালিক। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক শকের মতো যন্ত্রণার তীব্র একটা খোঁচা মাথার দিকে উঠে যাচ্ছে।

বহুক্ষণ ধরে টেলিপ্যাথিতে জবাকে ডাকছি। আসছে না কেন? তিনটে বেজে গেছে। রোদ মরে আসছে। কত তাড়াতাড়ি জায়গাটা বিষিয়ে উঠল! ধুপ করে ছাতে একটা শব্দ হল। বেশ ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ। বোধহয় জবা পাঁচিল টপকাল। অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস, আবার ঝালিয়ে নিচ্ছে। ছাতের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মলের ঝুমকোর চুনুর চুনুর শব্দ। পরক্ষণেই জবা ঘরে এল। হলদে শাড়ি, আটপৌরে সাদা ব্লাউজ। শাড়িটা গ্রামের মেয়েদের মতো উঁচু করে পরা। গাছকোমর আঁচল। চুলের খোঁপা বেদেনির মতো। ঝুরঝুরে কিছু কপালে এলোমেলো।

জবা আমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললে, এ কে?

এই একই প্রশ্ন তো আমারও। এ কে? সন্ন্যাসী, গৃহী, লম্পট, ভণ্ড, শয়তান? কোনটা?

জবা বললে, এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কী করে ফেললে? মারামারি করে এলে নাকি?

জবা সাবধানে আমার মাথার পাশে খাটের ধারে বসল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কী সাংঘাতিক অবস্থা! কী করে করলে এমন?

জবার মুখটা ভীষণ সুন্দর। কিছু পাপ কিছু পুণ্য মিশে বড় আকর্ষণীয়। বিদেশি চলচ্চিত্রের নায়িকার মতো। কুমারী নয় বলেই অন্য এক ধরনের চটক এসেছে। এই যন্ত্রণার মধ্যেও আমার সৌন্দর্যবোধ ঠিক আছে দেখে মনে হল, মৃত্যু আসন্ন হলেও সমাসন্ন নয়। একদিন-দুদিন লড়ে যেতে পারব। বিপরীত স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছে, এখন আসতে যতদিন লাগে। শুনেছি মরণকালে মানুষের মাংসে রুচি চলে যায়। বুকে মৃদঙ্গ বাজে। মনে মহাদেব নৃত্য করেন। আমার ওইসব কিছুই হচ্ছে না। বরং জবার নিটোল পশ্চাদ্দেশ আমার ডান কান ছুঁয়ে আছে বলে শরীরে অন্য আর এক ধরনের যন্ত্রণা টের পাচ্ছি। চলেই যখন যাব, তখন জবার আপত্তি না থাকলে জীবনের শেষ নারীসঙ্গ করে যাব কি? আর হয়তো মনুষ্যজীবন পাব না। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সৌন্দর্য দেখার চোখ, কবিতার মতো শরীর, নৃত্য, গীত, নিষিদ্ধ সম্পর্ক, ছোটখাটো পাপ, একটু পদস্খলন, অপরাধী বিবেক, আসক্তি, নিরাসক্তি এই মানব জীবনের যত মশলা, সবই হয়তো একবার। জবার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিলুম। কোমল অনভিজ্ঞ কুমারী হাত নয়, ঝানু হাত। নখের মাথা সামান্য সামান্য ক্ষয়ে গেছে। সংসারের কাজেকর্মে খসখসে। হাত মানুষের জীবনযাপনের সাক্ষী। কর্মীর হাত, বিলাসীর হাত, দুঃখীর হাত, খুনির হাত, তবলিয়ার হাত, সেতারির হাত। নিজেকেই নিজে ধমক লাগালুম। জ্বরের ঘোরে ব্যথার তাড়সে মন ভুল বকছে।

জবা আমার হাতে চাপ দিয়ে বড় স্নেহের গলায় বললে, বললে না তো কী হয়েছে? মুখ থুবড়ে পড়ে গেছ?

মনে মনে হাসলুম, অনুমানটা তোমার নেহাত মিথ্যে নয়। এমন পড়া পড়েছি, আর উঠতে পারব কি না জানি না। মুখে বললুম যা হয়েছে।

জবা বললে, তা হলে আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

কাচের শার্সির গায়ে লেবড়ে থাকা ডাঁশ মাছি যেমন বুজুর বুজুর শব্দ করে, সেইরকম একটা শব্দ বেরোল আমার মুখ দিয়ে, এখন ডাক্তার কোথায় পাচ্ছ জবা! সন্ধের পর পাবে। এখন তাঁরা বিশ্রাম নিচ্ছেন।

জবা বললে, আমি সব পারি। ডক্টর মিত্রের বাড়ি আমি চিনি। ঠিক ধরে আনব।

তুমি আমার কাছে থাকো। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না।

অদ্ভুত একটা আকর্ষণ বোধ করছি। অদ্ভুত একটা শান্তি। দুটো জীবন প্রায় এক ধাঁচের। দু'জনেরই এক হাল। সমান অসহায়। দু'জনেই পরিত্যক্ত। একজন স্বামী। আর একজন পিতা। বার্ডস অফ দি সেম ফেদার ফ্লক টোগেদার।

জবা বললে, কীসের ভয়! তোমার নিশ্চয় খাওয়াও হয়নি!

আর খাওয়া, আমি ঠোঁট ফঁক করতেই পারছি না।

জবা কিছুক্ষণ কী ভাবল। আমার আঙুলগুলো নিজের আঙুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করল। শেষে একটা যেন কিছু খুঁজে পেল। আমার বুকের ওপর হেলে পড়ে বললে, একটা কাজ করি। সরু একটা পেঁপের ডাল কেটে আনি। এক বাটি দুধ গরম করি। তুমি সেই ডালটা দিয়ে চোঁচোঁ করে খেয়ে নাও।

জবার লকেটটা আমার বুকের কাছে দুলছে। শীত করছিল বলে পাখা বন্ধ। জবার টিকোলো নাকের ডগায় তিলফুলের মতো ঘাম। বুকের খোলা অংশটা ভিজেভিজে। মন কেমন করানো অতি কোমল, অতি নিভৃততম আরও কিছু। আমি লকেটটায় হাত দিলুম। বড় সুখ। জবাকে আমি একদিন আদর করতে চেয়েছিলুম। পৃথিবীকে যখন বিদায় জানাতে হবেই, তখন আর দেরি কেন! মানুষ যখন মরে তখন তো তার সবই বেরিয়ে যায় প্রাণবায়ুর সঙ্গে। দেহের সঙ্গেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার নাম, আদর্শ, চরিত্র। তবে! এই আমার শেষ ইচ্ছে। জবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। ভরাট এক অনুভূতি। এর বেশি কিছু সম্ভব নয়! শরীরে কুলোবে না।

জবা বললে, অমন কোরো না। তোমার লেগে যাবে। জ্বরে তোমার গা পুড়ে যাচ্ছে!

জবার আঁচল খুলে লুটিয়ে পড়েছে আমার বুকে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। এর অর্থ আমি বুঝি। জবা উঠে দাড়াল। নিজেকেই প্রশ্ন করল, এই জ্বরে দুধ দেওয়া কি ঠিক হবে? বলতে বলতে বেরিয়ে গেল। বাইরের রাস্তায় ছেলেরা শোরগাল তুলে চলেছে। স্কুলের ছুটি হয়েছে। ওই জীবনটা ছেড়ে এসেছি আমি। লোভনীয় জীবন। আবার ফিরে পেতে হলে মরে যেতে হবে। জীবন হল নদীর মতো। উৎসের দিকে আর ফিরতে পারে না। সাগরের টানে এগিয়েই চলে। ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে আমার চেতনা। রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমের রোদ এসেছে। এটা তার নিত্য আসা। ধর্মশালার অতিথির মতো। সারাদিনের তীর্থভ্রমণ শেষ করে, বোঝা নামিয়ে বসা। বড় কষ্ট হচ্ছে। খুবই যন্ত্রণার মৃত্যু হবে। পিতা হরিশঙ্কর বলতেন, যন্ত্রণা সহ্য করবে বীরের মতো। উঁ আঁ করবে না। পরাজিত হবে না। হাসবে। গান গাইবে। মনটা তুলে নেবে। অন্য চিন্তা করবে। তবু আমার মুখ দিয়ে মাঝেমধ্যে উঁ আঁ বেরিয়ে পড়ছে। কতটা সময় চলে গেল হিসেব নেই। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জবা ঘরে এল ডক্টর মিত্রকে নিয়ে। ঠিক ধরে এনেছে।

বিছানার পাশে একটা চেয়ারে বসলেন ডক্টর মিত্র। তিনি আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক নন। আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর সেন। সেই কারণেই একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। যেন পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিচ্ছেন। জবা মনে হয় সবই বলেছে। ঠোঁটটা ভাল করে দেখে, চার পাশ আঙুল দিয়ে আলতো আলতো করে টিপে বললেন, ভয়ংকর কাণ্ড। ওয়ান পার্সেন্ট কেস।

জবা বললে, তার মানে কী ডাক্তারবাবু?

মানে হল, একশোতে একজন বাঁচে। এ বড় সাংঘাতিক ব্যাপার—ইরিসিপ্লাস। সোজা ব্রেনে গিয়ে ধাক্কা মারবে। ইস, বিশ্রী কাণ্ড করে বসে আছে। দেখি কী হয়! তেড়ে সালফার ড্রাগস চালাই। একটা পাউডার দোবো, ঠোঁটের ওপর সাবধানে ছড়িয়ে দিয়ো। হরিশঙ্করবাবু কোথায়?

জবা বুদ্ধি করে বললে, কয়েক দিনের জন্যে বাইরে গেছেন।

তবে যে শুনলুম, তিনি জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছেন।

জবা বললে, যাব্বাবা, এ আবার কে রটালে? একখানা পাড়া বটে।

ডাক্তার বললেন, তা যা বলেছ! এক কাজ করো, তাঁকে টেলিগ্রাম করে আসতে বলো। কেস কোন দিকে যাবে বলতে পারছি না।

আবার দু'জনেই বেরিয়ে গেল। জবা সদর পর্যন্ত গিয়েছিল ডাক্তারবাবুকে এগিয়ে দিতে। ফিরে এসে বললে, হ্যাঁগো, তোমার কাছে কিছু টাকাপয়সা আছে?

হ্যাঁগো, শব্দটা ভীষণ ভাল লাগল। এইভাবে স্ত্রীরা স্বামীকে সম্বোধন করে। ভীষণ একটা আন্তরিকতা। দুটো মহাদেশের মাঝখানে অর্থহীন দুটো শব্দের সেতু। জবাকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। লকেটটা বাঁ হাতে একটু তুলে আঁচল দিয়ে বুক আর গলা মুছল। পাশে এসে বললে, কী বলো?

ও ঘরে গিয়ে আলমারিটা খোলো। গোল একটা বাক্স দেখবে। সেই বাক্সটার দুটো তলা। একেবারে নীচের তলায় টাকা আছে। চাবি আলমারিতেই ঝুলছে।

যতক্ষণ কথা বললুম জবা চোখ বড় বড় করে ওপর নীচে ঘাড় দোলাল, যেন ছাত্রী। মাস্টারমশাই কিছু বোঝাচ্ছেন। জবা চলে গেল পাশের ঘরে।

পৃথিবীতে এমন কেন হয় না! মানুষ মানুষের খুবই ছোটখাটো সুখের বাধা হবে না। কিছু দিতে হবে না, শুধু বাধা দোব না। সুখেন বলবে, ঠিক আছে জবা, তোমাকে আমি ছেড়ে দিলুম। পিতা হরিশঙ্কর হাসিমুখে বলবেন, ঠিক আছে পিন্টু, সংসার তুমি করবে। তোমার যদি মনে হয় জবার মতো সংসারে ইতিমধ্যেই পোড়-খাওয়া অভিজ্ঞ এক মহিলা তোমাকে সুখী করতে পারবে, তা হলে আমার আর আপত্তি কীসের! পাড়ার লোকজন বলবে, ঠিকই তো, ঠিকই তো। বিলেতে এইরকম অনবরতই হচ্ছে। তারাও মানুষ আমরাও মানুষ। মানুষের সুখটাই আমাদের কাছে বড়। যে যেখানে আছ সুখী হও। আমরা তো অন্যভাবে সাহায্য করতে পারব না, আমরা বাধা না দিয়ে, ছিছি না করে তোমাদের সাহায্য করব। আর জবা বলবে, এতদিন আমি যা খুঁজছিলুম তাই পেয়ে গেছি। আর আমার কিছু চাইবার নেই। জীবন-জাহাজ এইবার বন্দর খুঁজে পেয়েছে। তখন আমি বাগান-ঘেরা ছোট একটা বাড়ি করব। স্মৃতিভারাতুর এই অভিশপ্ত প্রাচীন কেল্লাটি আমরা পরিত্যাগ করব। স্মৃতির কঙ্কালরা এখানে দোল খাক। মাঝরাতে হা হা করে হাসুক অট্টহাসি। সেই নতুন বাংলো বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘরটিতে থাকবেন পিতা হরিশঙ্কর। মামার আনা গোলাপ গাছগুলো দিয়ে জানলার বাইরে ছোট্ট একটা বাগান সাজাব। যাতে তিনি জানলায় বসে দেখতে পান ফুলের বাহার। জবা কোমরে আঁচল জড়িয়ে, শাড়িটাকে একটু উঁচু করে পরে ঝারি নিয়ে জল দেবে। ছোট্ট রুমালের মতো একটা লন থাকবে। শেষবেলায় জবা আর হরিশঙ্কর সেখানে বসবেন, ভিজে মাটি, ঘাস, রোদ, ফুলের গন্ধ। হরিশঙ্কর রাতের আকাশ থেকে তারা খুঁজে খুঁজে জবাকে কনস্টিলেশন চেনাবেন। গাছের ডালে চেন-বাঁধা দোলা বাতাসে মৃদু মৃদু দুলবে। তারই অস্ফুট শব্দ। কাঠের মেঝেআলা একটা ঘর থাকবে। জবা সেখানে নাচ শিখবে। স্কুলে ভাল নাচত। হরিশঙ্কর নাচ বোঝেন, তাল বোঝেন, ছন্দ বোঝেন। ছেলেবেলায় আমাকে নাচ শেখাতেন। জবা হবে তাঁরই ছাত্রী। কাঠের পাটাতনে পায়ে তাল ঠোকার শব্দ। ঘুঙুরের বোল। তবলায় হরিশঙ্করের ছটফটে আঙুল। মামার হারমোনিয়ম আর গলা। জবার লাল ব্লাউজ ঘামে ভিজে আরও লাল। এরপর রাত যখন গভীর হয়ে যাবে, কালো আকাশের ছায়াপথ ধরে তারারা প্রদীপ হাতে নিয়ে যখন বেরোবে তীর্থযাত্রায়, তখন হরিশঙ্করের টেবিলে জ্বলবে একটি মাত্র আলো, সামনে খোলা কঠিন গণিতশাস্ত্রের বই। পাশে খাতা। সমাধান খুঁজে ফিরবেন যেসব সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। জবা একসময় এসে আলোটা নিবিয়ে দেবে। হাত ধরে বলবে, আজ আর নয়, এইবার শুতে হবে। ফিনফিনে নীল মশারির মধ্যে তিনি ধ্যানস্থ হবেন। ঝকঝকে গেলাসে জল এগিয়ে দেবে জবা। গুড নাইট।

আমার জ্বরের বিকারে মহাজীবন অরণ্যে একটা মায়ামৃগের পেছনে সুপ্ত ইচ্ছার ধনুর্বাণ নিয়ে ছুটতে লাগলুম। কত কী দেখছি জীবনের শেষ পাতায় এসে। জবা কালো চুলে ঘষে ঘষে তেল মাখছে। দু'হাতের বাড়তি তেল মুখে মাখতে মাখতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গায়ে জামা নেই। শাড়ির আঁচল। মেয়েরা তেল মাখলে ভীষণ ভাল দেখায়। তেলের মিষ্টি লেবুলেবু গন্ধ। জবা আমাকে বলছে, উনুনে ডাল চাপানো আছে। আমি ঝট করে চানটা করে আসি। তুমি একটু নজর রেখো। এসে বাবাকে চা করে দিচ্ছি। রান্নাঘরটা হবে বাইরে বাগানের একপাশে। বাথরুমে জল পড়ার শব্দ। বাঁধানো নর্দমা দিয়ে ভেসে ভেসে যাবে সাবানের ফেনা। জবার মসৃণ বুক-পিঠ-তলপেট বেয়ে ফুলের মতো নেমে এসেছে গোলাপ, চামেলি। সব যেন ধন্য ধন্য রবে ছুটে চলেছে। ভীষণ একটা সুখের দৃশ্য। স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকার সুস্থ দৃশ্য।

দিনের শেষ আলোটুকু সরে গেল। কেউ নেই। জবা গেছে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ আনতে। কোনওরকমে উঠলুম। আলোটা জ্বালতে হবে। এক একবার পা ফেলছি, গোটা মুখ ঝনঝন করে উঠছে, জল-ভরতি হটব্যাগের মতো। আয়নার সামনে দাঁড়াবার সাহস হল না। হয়তো নিজের বদল ঘটোৎকচ ভেসে উঠবে। ভাল দেখতেও পাচ্ছি না। চোখ ঢেকে গেছে। আবার এসে শুয়ে পড়লাম। একটা মাথার চুলের কাঁটা পড়ে আছে। ভঙ্গিটা দু'পা ছড়ানো মৃত সৈনিকের মতো। জবার চুল থেকে খুলে পড়েছে। আলোটাকে মনে হচ্ছে থলথলে মাছের পিত্ত।

কখন কী হল! ঘর ভরে গেছে। অনেকে এসেছেন। টিপ, টিপের মা, জবা। বিষ্ণুদার গলাও পেলুম একবার। ঠোঁটটা সাবধানে ফাক করিয়ে জবা কিছু পাউডার ঢেলে দিল মুখে। কোথা থেকে একটা ফিডিং কাপ এনেছে। ফলের রসের মতো কী একটা চলে গেল ভেতরে। কপালে কার নিশ্বাস পড়ল। টিপের। আমাকে ঘিরে মহা কাণ্ড চলেছে। সকলেই এসেছেন আমাকে বিদায় জানাতে। জাহাজ কখন বন্দর ছাড়ে!

একে একে পায়ের শব্দ নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। ঘরে আবার বাতাস খেলল। শুধু জবা ফুলের মতো ঝুঁকে আছে আমার দিকে। মনে হল চোখদুটো ছলছল করছে। অতি কষ্টে বললুম, তুমি এইবার বাড়ি যাও।

আর তুমি? টসটস করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল আমার বুকে।

Nothing at all but three things,
Birth and copulation and death.
I've been born and once is enough.

ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে। মধ্যরাত। মামা আজ আর ফিরলেন না। কলকাতায় তাঁর কত বন্ধু। শ্বশুরবাড়ি। সুন্দরী শ্যালিকা। মামা আনন্দ করছেন। জবা আমার পাশে কাত হয়ে শুয়ে আছে। তার ডান হাতটা আমার বুকে। মোটা শাঁখা। লোহার একটা বালা। কয়েক গাছা চুড়ি। মানুষ কত যন্ত্রণাই সহ্য করতে পারে! আমার গোটা মুখটা হুহু করে জ্বলছে।

হঠাৎ মনে হল, হরিদ্বারের সন্ন্যাসী আমাকে একটা ফল খাইয়েছিলেন। বলেছিলেন, অমৃতফল। সেই ফল খেয়ে আমার কী লাভ হল! দেহ-যন্ত্রণা, দেহ-বাসনা সবই তো রয়েছে। কোনওটাই তো গেল না। জবাকে মনে হচ্ছে আমার কত কালের বিয়ে-করা বউ। সব বাজে সব মিথ্যে। সবই মানুষের ইচ্ছাপূরণ কল্পনা। মানুষ ভাবে, এই হল এই হবে। কিছুই হয় না। যা হবার তাই হয়। যদি আমি সেরে উঠি ঘোরতর নাস্তিক হয়ে যাব। যা মন চাইবে তাই করব।

ভাবামাত্রই ভেতরে একটা শব্দ হল মড়মড় করে, যেন হাড়গোড় সব ভেঙে গেল। একটা কাঠামো ধসে পড়ল যেন। মরেছে, এইভাবেই বোধহয় মৃত্যু আসে। মরার অভিজ্ঞতা তো নেই আমার। জবার হাতে চাপ দিলুম। বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল। একটু চমকে উঠল, কী হল?

তুমি কোনও শব্দ শুনতে পেলে? অতি কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বললুম।

কই না তো? কীসের শব্দ?

আমি কী বোকা! জবা কেমন করে শুনতে পাবে আমার অন্তরের অলৌকিক শব্দ! এ তো আমার সংস্কার ভেঙে পড়ার শব্দ। এ-ও আমার মনের ভুল। সংস্কার একটা মনের ভাব, বস্তু নয়, তার আবার ভেঙে পড়া কী!

জবা আমার কপালে হাত রেখে বললে, বেশ জ্বর। তোমাদের বাড়িতে সব আছে, একটা থার্মোমিটার নেই। তোমার আর একবার ওষুধ খাবার সময় হল। ট্যাবলেটটা গুঁড়ো করি। জবা উঠে পড়ল। বাড়িঘর ছেড়ে আমার জন্যে মেয়েটার কী শাস্তি! এ ঋণ আমি কেমন করে শোধ করব? একটা ভাল শাড়ি! একটা হার! হবে না। উপহার দিয়ে সব ঋণ শোধ করা যায় না। বোতলের পেছন দিয়ে জবা ট্যাবলেট গুঁড়ো করছে। ঠুকঠুক শব্দ। নিস্তব্ধ রাত। ঘড়ির টুকটুক পদশব্দ। দূরে কুকুরের ডাক। আমি চলে যাচ্ছি এই সুন্দর প্রেম-প্রীতির পৃথিবী ছেড়ে। জবা মেঝেতে বসে আছে। তাকাচ্ছি, ভাল দেখতে পাচ্ছি না। চোখে পরদা পড়েছে। রাত ভোর হবার আগেই হয়তো থেমে যাবে আমার যন্ত্র! মৃতজনদের দেখতে পাচ্ছি। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই হাসছেন। আর দেরি কেন? মায়ার খাঁচা খুলে বেরিয়ে এসো। আকাশ কত নীল!

অনেক কসরত করে জবা আমাকে ওষুধটা খাওয়াতে পারল। সে এক পর্ব। লজ্জা করছে, হাসিও পাচ্ছে। অসুস্থ দেহ, টগবগে মন, পাশেই ভোগ, কিছুই করার উপায় নেই। তখনই যেন অমৃত ফলের রহস্য পরিষ্কার হল। সন্ন্যাসী জানতেন, আগুন আর ঘৃত পাশাপাশি আসবে, এমন একটা অবস্থা করে দাও যাতে মাথা তুলতে না পারে। তারপর নারীতে মাতৃদর্শন হোক। একটু একটু করে দুধ খাওয়াচ্ছে, ওষুধ খাওয়াচ্ছে, বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণার মধ্যে মায়ের দর্শন।

জবা একটা কাঁচা টাকা আমার কপালে ঠেকিয়ে ঠাকুরের ছবির কাছে রেখে এল। মায়েরা ছেলের আরোগ্য কামনায় এইরকমই করে। সেরে উঠলে পুজো দেওয়া হবে। আমি ধীরে ধীরে আবার একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাচ্ছি; আর ঠিক সেই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালেন মিশনারিদের মতো সাদা পোশাক পরা এক মূর্তি। প্রথমে চিনতে পারিনি। অন্ধকারে এক ছায়ার মতো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। সাদা পোশাকে একটি অন্ধকার মুখ। চোখদুটো আলপিনের মতো জ্বলছে। হঠাৎ একটা সোনালি আলো ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মূর্তির শরীরে। জল যেমন কাগজে শুষে যায়, সেইভাবে আলোটা ভেতর থেকে ফুটে উঠছে। ক্রমশই উজ্জ্বল হচ্ছে। আলোয় ভেজা এমন এক সুঠাম মানবকে চোখের সামনে দেখে চেতনা স্তম্ভিত। এই কি দেবদূত! মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্তে যাঁর আগমন হয়! তলার দিক থেকে আলো পড়ল মুখে। চমকে উঠলুম। স্বয়ং হরিশঙ্কর এসেছেন দুয়ার খুলে দিতে। একটা ভয় ছড়িয়ে পড়ল, পাশেই জবা। জবাকে দেখে যদি তিরস্কার করেন, এখনও গেল না আঁধার, এখনও রহিল বাধা/ এখনও মরণব্রত জীবনে হল না সাধা॥ হরিশঙ্করের মুখ পাথরের মতো। সেই বজ্রকঠিন মুখ। যে-মুখে তিনি সংসার-সমস্যার মুখোমুখি হতেন। যে-মুখের সামনে কারও ক্ষমতা হত না মুখ তুলে দাঁড়াবার। হরিশঙ্কর দুটো হাত নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ। ভেতরে টলটল করছে সাদা তরল পদার্থ। সিরিঞ্জের গায়ের কালো কালো রেখা সুস্পষ্ট। হরিশঙ্কর সামনে ঝুঁকে আমার হাতে প্রিক করে ছুঁচটা ফুটিয়ে দিলেন। সারা শরীরে ছড়িয়ে গেল পিপারমেন্টের অনুভূতি। ভীষণ একটা আরামে আঃ করে উঠলুম। সাদা আলখাল্লা পরা হরিশঙ্কর সেজ নেবার মতো ধীরে ধীরে নিবে গেলেন। কানে এল জবার গলা, কী হল? খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার? জবার মুখ হেঁট হয়ে আছে আমার মুখের ওপর। কানের দুল টুলটুল করে দুলছে। সোনার চেনে বাঁধা পাথর-বসানো লকেট আমার বুকে নেমে এসেছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই আমার। ডান হাতে তার ওপর বাহুটা চেপে ধরলুম। নরম তুলতুলে। জবার নরম বুক চেপে আছে আমার বুকের একপাশে। স্পঞ্জের মতো ওঠানামা করছে।

হঠাৎ জবা চমকে উঠল। ওটা কী?

জবা আড়ষ্ট কাঠ। কী দেখেছে! জবা অতি সন্তর্পণে আমার মাথা ও পাছার তলা দিয়ে তার হাতদুটো চালিয়ে দিয়ে খুব সাবধানে বিছানা থেকে তুলে নিল। প্রায় পাঁচফুট নইঞ্চির মতো দীর্ঘ সুঠাম শরীর। জবার কোনও অসুবিধেই হল না। আমাকে তুলে নিয়ে একপাক ঘুরে যেতেই ভোরের মৃদু আলোয় চোখে পড়ল, মাথার বালিশ আর খাটের সীমানা ঘেঁষে বিছানার খাঁজ ধরে গলগল করে চলেছে মেটে লাল রঙের একটা সাপ। ঠোঁটের সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে আমি আর্তনাদ করে উঠলুম, সাপ সাপ।

জবা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে মুকু যে তক্তাপোশে শুত তার ওপর ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। সাপ কোথা থেকে এল! অত বড় সাপ! পুরনো বাড়ি, সাপের অভাব নেই।

একতলায় হামেশাই দেখেছি, দোতলায় এই প্রথম। আগে পিছনের সিঁড়িতে সন্ধের দিকে প্রায়ই কামিনীভোগ চালের পায়েসের গন্ধ পেতুম। হরিশঙ্কর একদিন রহস্যটা বলেছিলেন, বাস্তু সাপ বেরোলে অমন গন্ধ বেরোয়। পরে একদিন দেখিয়েও ছিলেন। বেঁটে, চওড়া, শ্যাওলার মতো গাত্রবর্ণ। বয়েসের কোনও ঠিকঠিকানা নেই। হরিশঙ্কর সাপ মারা একদম পছন্দ করতেন না। বলতেন, সাপ তো মানুষ নয় যে অকারণে মানুষের ক্ষতি করবে! সাপ পোষার এই ফল।

জবা বললে, তোমার একটু কষ্ট হল, এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তুমি শুয়ে থাকো, আমি দেখে আসি চলে গেল কি না?

জবা চলে যাচ্ছিল, আঁচলটা চেপে ধরে বললুম, আমার ডান হাতের এই জায়গাটা দেখো তো।

জবা ঝুঁকে পড়ল। স্বপ্নে যে-জায়গাটায় হরিশঙ্কর ছুঁচ ফুটিয়েছিলেন সেই জায়গাটা দেখতে বললুম। জবা দেখে বললে, কী ব্যাপার বলো তো? একটা কিছু ফুটেছিল?

একটা মৃদু হাসি খেলে গেল ভেতরে, শাবাশ! অক্ষয় কাকাবাবু, অভ্রান্ত আপনার গণনা। ডবল আক্রমণ। ওই দাগটা আর কিছুই নয়, সাপের ছোবল। হরিশঙ্করের ছুঁচ নয়। তিন দিনের মধ্যে বিপদ আসছে। সেই বিপদের চেহারা যে এইরকম হবে কে জানত।

জবা প্রশ্ন করলে, কী ফুটল বলো তো? আমার কিছু? হাতের নোয়া? সেফটিপিন?

মনটা আমার বিশাল সমুদ্রে ভেসে চলা ছোট্ট নৌকোর মতো হয়ে গেছে। যেতেই হবে, যেতেই হবে। কোনওরকমে বললুম, জবা, হয়ে গেছে। ফিনিশ। ওটা সাপের ছোবল। একটু আগে মনে হল একটা ছুঁচ ফুটল। তখনই আমি তোমাকে ডেকেছিলুম।

জবাব মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সে কী? সর্বনাশ! তা হলে তো ওর ওপরে একটা বাঁধন দিতে হবে। দাঁড়াও।

বাঁধনে কী হবে জবা? যেখানে কামড়েছে সেটা মাথার খুব কাছে।

আর আমার সামান্যতম শক্তি নেই। ঠোঁটের যন্ত্রণাও আর অনুভব করতে পারছি না। শরীর একেবারেই এলিয়ে গেল। সাপের বিষে এইরকমই হয়তো ঘোর লাগে। তারই মধ্যে দেখলুম জবা শাড়িটা খুলে ফেলল। তারই মধ্যে একঝলক ভেবে নিলুম, আহা! জবার শরীরটা কী সুন্দর! ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নারী। একই নারীর কত রূপ! জবা সায়ার দড়ি খুলছে। একটানে ফস করে দড়িটা খুলে কোমরের একটু নীচে সায়াটাকে কোনওরকমে গাঁট দিয়ে সামলে রাখল। গভীর নাভির দিকে আমার আচ্ছন্ন চোখ চলে গেল। মৃত্যুটা আমার খুবই সুখের হতে চলেছে। নানারকম বিভীষিকা দেখে মরতে হচ্ছে না। জবা আমার হাতে দড়ির ফাঁস পরাতে লাগল। জবার দেহের উত্তাপে দড়িটা গরম। মনের কল্পনাও হতে পারে। ব্লাউজে দুটো সেফটিপিন। সাপটা কি চলে গেছে! এ ঘরে আসবে না তো! এক ঝটকায় কে যেন আমাকে অচেতনায় তলিয়ে দিল।

ক'টা দিন চলে গেছে, কে জানে? আমার মরা হল না। চোখ মেলে তাকালুম। স্বপ্ন দেখছি না তো? সামনেই হরিশঙ্করের মুখ। সেই সোনার চশমা। তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল চোখ। মুখে অদ্ভুত একটা জ্যোতি খেলছে। পাশেই মাতুল জয়নারায়ণ। তার পাশেই জবা। জবার পাশে মুকু, মুকুর পাশে টিপ। টিপের পাশে সুরঞ্জনা। সুরঞ্জনার পাশে টিপের মা। তার পাশে কাকিমা। কাকিমার পাশে অক্ষয় কাকাবাবু। ভাবছি পুনর্জন্ম হল কি না!

হরিশঙ্কর তাঁর সেই পরিচিত ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলে বললেন, ক্রাইসিস ইজ ওভার।

আমি হাত জোড় করে নমস্কার করলুম। তিনিও হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। এই হলেন আমার পিতা। এটিকেট, ম্যানার্স, ফর্মালিটি। অতুলনীয়। শুয়ে আছি বড়ঘরে। পিতারই খাটে। খাটের পাশে একটা স্ট্যান্ড। দুটো বোতল ঝুলছে। তার মানে আমাকে ড্রিপ দেওয়া হচ্ছিল। নিজের মুখটা খুব দেখার ইচ্ছে হচ্ছিল। খুব হালকা মনে হচ্ছে। কোনও জ্বালাযন্ত্রণাও নেই।

জয়নারায়ণ বললেন, মিরাকল্‌স। যমে মানুষে টানাটানি অ্যান্ড যম মিজারেবলি ফেলড্‌।

এই মেয়েটার কাছে যম হার মেনেছে। হরিশঙ্কর জবার পিঠে হাত রাখলেন। এ সব জানে। বাঁধন দিয়েছে। ইনসিশন করে সাক্‌ করেছে। হোয়াটএভার ইট মে বি, দ্যাট ওয়ার্কড।

মাথার কাছে কেউ একজন বসে আছেন, তাঁর গলা, এটা হল ডিভাইন গ্রেস। যেটুকু ভেনাম রয়ে গেল দ্যাট ফট আউট ইরিসিপ্লাস। ইরিসিপ্লাসে কেউ সারভাইভ করেছে, দিস ইজ ভেরি রেয়ার। ডক্টর সেনের গলা। কতদিন কতক্ষণ আমার মাথার কাছে বসে আছেন জানি না। কাকিমা আমার কাছে এগিয়ে এলেন। চিনতে পারছ?

আমি একটু হাসলুম। চেহারা বেশ ভাল হয়েছে। গালদুটো লাল। কুচকুচে কালো ছবির মেয়েদের মতো চুল। অনুমান করার চেষ্টা করলুম, কী ঘটে গেছে এই ক'দিনে? মামা এসেছেন। ফিরে গেছেন। হরিশঙ্কর কোথায় তিনি জানতেন। তাঁকে নিয়ে এসেছেন। মুকু আর সুরঞ্জনা কেমন করে এল!

অক্ষয় কাকাবাবুই বললেন, একে আমরা পুনর্জন্ম বলতে পারি হরিদা।

ওটা তোমার মেয়েলি সাবজেক্ট অক্ষয়। আই বিলিভ ইন সায়েন্স। একে বলে চান্স সারভাইভাল। হয়ে গেছে। বেঁচে গেছে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ সায়েন্স ইন ইট। তবে হ্যাঁ, সাপের ছোবলটা না খেলে কী হত? বা শুধুই যদি সাপের ছোবল হত? উইদাউট ইরিসিপ্লাস। এ ম্যাটার অফ ইনভেস্টিগেশন? লাক্‌ শব্দটা যখন বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, লেট আস অ্যাকসেপ্ট ইট। তবে, উই হ্যাভ এ ফাইন টিম হিয়ার। এ পারফেক্ট সেবাদল। ডাক্তার সেন, আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, জাস্ট ওয়ান ক্ল্যারিফিকেশন। স্নেকবাইটের রোগীকে কখনও ঘুমোতে দিতে নেই। বাট হি ওয়াজ ইন এ কোমা। হাউ ক্যান ইউ এক্সপ্লেন ইট?

ডক্টর সেন হেসে বললেন, আই ডিডন্ট অ্যালাউ হিজ সিস্টেম টু স্লিপ। কেপ্ট হিম অ্যাওয়েক ইনসাইড।

হরিশঙ্কর হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, গেট আপ। গেট আপ। অনেক দিন শুয়ে আছ। অনেক সময় নষ্ট করেছ। অনেকের সময় নষ্ট করেছ। উঠে পড়ো। মনের জোর করো।

কাকিমা বললেন, এখনও বড় দুর্বল। মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ও উঠবে। ঠিক উঠবে। একটু খাওয়াদাওয়া করুক।

জবার সঙ্গে চোখাচোখি হল। জবা কোনও কথা বলেনি, সাহস পায়নি বলার। রাত জাগার ছাপ মুখে। মনে মনে জবাকে নমস্কার করলুম। আমার জন্যে তুমি যা করলে, তার তুলনা নেই। এর কোনও প্রতিদান হয় না। সুরঞ্জনা বললে, আমরা তো সব আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। মেসোমশাই, আপনার নার্ভ হল স্টিলের নার্ভ। আমরা এমন দেখিনি।

হরিশঙ্কর বললেন, ডোন্ট ফোমেন্ট মাই ইগো। তোমার বাবার নার্ভও কিছু কম যায় না। কলকাতার দাঙ্গার সময় আমরা দেখেছি। আচ্ছা এইবার কাজের কথা। নাও উই হ্যাভ আর্নড এ গুড কাপ অফ টি। তোমরা বোসো, আমি করে আনি।

জবা পাশ থেকে সামনে এসে বললে, আমি করছি, আপনারা বসুন।

হরিশঙ্কর বললেন, এই একটা মেয়ে। নেভার গেটস টায়ার্ড। কেউ তোমাকে সাহায্য করুক তা হলে?

সুরঞ্জনা বললে, আই ভলানটিয়ার।

সুরঞ্জনা আর জবা একেবারে মাথায় মাথায়। দু'জন বেরিয়ে গেল। ডক্টর সেন উঠে দাঁড়ালেন, যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, যদি ব্ল্যাক স্টুল হয়, ডোন্ট গেট নার্ভাস।

হরিশঙ্কর বললেন, জানি। আপনি চা খাবেন না?

এক্সকিউজ মি। আমার একটু তাড়া আছে।

হঠাৎ মনে হল, একজনকে দেখছি না কেন? মেনিদা? কাকেই বা জিজ্ঞেস করি! সাহস হচ্ছে না। অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, আমি তা হলে বড় করে একটা বাজার করে আনি।

হরিশঙ্কর বললেন, অফ কোর্স। আজ আমরা খাব।

জয়নারায়ণ বললেন, নিশ্চয় শাক্তমতে?

তুমি যখন আছ শাক্ত না হয়ে উপায় কী!

মাথাটা তরল হয়ে গেছে, যেন টলটলে জলের মতো। গালে হাত দিলুম। দাড়ি। মুখটা চুপসে গেছে। টিপ একটু ফাক পেয়ে এগিয়ে এল। প্রশ্ন করার আগেই বললুম, বেশ ভালই মনে হচ্ছে, জানো? আর কোনও কষ্ট নেই।

টিপ বললে, উঃ কী সাংঘাতিক কাণ্ড! তুমি কিছু জানো, এই ক'দিন কী হল?

বাইরে কী হয়েছে জানি না, ভেতরে যা হয়েছে তোমাকে একদিন বলব।

মুকু কিন্তু কাছে ঘেঁষছে না। দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালে পিঠ রেখে। গলায় তেমন জোর পাচ্ছি না। ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে বললুম, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মুকু গম্ভীর গলায় বললে, ওসব কথা এখন থাক।

তবে থাক। আমার চোখ বুজে আসছে আবার। ভীষণ দুর্বল। খালি বাড়ি আবার ভরে উঠেছে। বহু চরিত্রে সরগরম। কথা, শব্দ। কেউ যদি আমাকে এক কাপ চা দিত! চা যেন সুখ আর জীবনের প্রতীক। আমার জীবনের যত নারী সবাই আজ এক পরিচ্ছেদে সমবেত হয়েছে। পুরাকালে স্বয়ংবর সভায় রাজকুমাররা আসতেন। রাজকন্যারা বেছে নিতেন যে-কোনও একজনকে। এই সভায় রাজকন্যারা এসেছেন। হরিশঙ্কর-কুমারকে বেছে নিতে হবে যে-কোনও একজনকে। নিজেকেই নিজে তারিফ করলুম, ক্ষমতা রাখিস পিন্টু! শুয়ে শুয়ে কী খেলই দেখালি! সেই সংগীত:

চিড়েতন হর্তন ইস্কাবন
অতি সনাতন ছন্দে করতেছে নর্তন

কেউ বা উঠে কেউ পড়ে,
কেউ বা একটু নাহি নড়ে,
কেউ শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে করে কালকর্তন॥

তাসের দেশের রাজা চেত্তা খেয়ে পড়ে আছে। তাও তার কত রোয়াব! কাকিমা খাটের তলা থেকে কী একটা বের করে বললেন, আজ কি তোমার বেডপ্যান লাগবে? না বাথরুমে যেতে পারবে?

লজ্জার কুঁকড়ে গেলুম। ছিছি। এ ক'দিন তা হলে শুয়ে শুয়ে ভুঁয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করেছি। লজ্জা! ছিছি লজ্জা!

আজ আমি মরে গেলেও বাথরুমে যাব।

ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করি, ভাল করে গরম জলে চান করো। তোমার জন্যে জবা যা করেছে কেউ কারও জন্যে অমন করে না। আমরা তো স্রেফ দর্শকের মতো দেখেই গেলুম। এমন সেবা দেখা যায় না। ও না থাকলে তোমার কী হত?

বাবা কি রাঁচিতে আপনাদের কাছেই ছিলেন?

না, কারও আশ্রয়ে থাকার মানুষ উনি নন। সে তো তুমি জানোই।

তা হলে?

কাছাকাছিই ছিলেন। পুরুলিয়ায়।

কার কাছে খবর পেলেন?

পরে শুনো। তাঁর কাছেই শুনো। আমার বলা বারণ।

সবাই যখন চলে গেলেন, মুকু এসে বসল আমার মাথার কাছে, খুব কাহিল হয়ে গেছ। আমার চলে যাওয়াটাই ভুল হয়েছিল। আমি থাকলে এই বিপদ তোমার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারত না। আমি তোমার মাদুলি।

তুমি কোথায় ছিলে?

সুরঞ্জনাদের বাড়িতে।

সুরঞ্জনা? সুরঞ্জনার দাদা ফিরেছেন?

You stand upon the threshold of your Century.
Here is the Cradle in which you wept.
There lie the worlds that await you!

আবার জেগে উঠেছে প্রেতপুরী। ভেতর থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের কলকাকলি। প্রবল শব্দে কে কাপড় থুপছে? আমি চিত হয়ে পড়ে আছি বিছানায়। রান্নার সুবাস আসছে নাকে। দুর্বল শরীর স্বপ্ন দেখছে। অতীত যেন ফিরে আসছে। একঘরে জ্যাঠামশাই আর একঘরে বাবা। মা আর জ্যাঠাইমা হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে কুটনো কুটছেন। রাঁধুনি বামুন তেলে ফোড়ন ছেড়েছেন। সুখী বেড়ালটা একপাশে থুপ্পি মেরে বসে আছে আধবোজা চোখে। কী সদ্ভাব, কী ভরভরন্ত চেহারা সংসারের! একটা হাবাগবা ইজের-পরা ছেলে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লাল চকচকে মেঝে। চুনকাম করা সাদা দেয়াল। জ্যাঠামশাই নিঃসন্তান। সংসারের একটি মাত্র ছেলে, তার কত আদর! সুখ হল শিশিরের মতো। ভোরের নরম আলো যতক্ষণ, ততক্ষণই তার আয়ু। কাল এক নিষ্ঠুর ধুনুরি। সুখের তুলো সব পিঁজে দেয় তার যন্ত্র চালিয়ে। সবাই গেছে চলে, একটি মাধবী শুধু...।

হরিশঙ্কর ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে খাটের পাশে বসলেন। স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিলুম। মানুষকে ভেদ করার ক্ষমতা আছে ওই চোখে। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, কী বুঝলে?

প্রশ্নটারই অর্থ খুঁজে পেলুম না। বললুম, আজ্ঞে?

ফিসফিস করে বাতাসের শব্দে বললেন, ডানার জোর না থাকলে পাখি উড়তে পারে না। তোমার ডানায় এখনও সেই জোর আসেনি।

একেই দুর্বল আমি, প্রখর সেই ব্যক্তিত্বের সামনে নিজেকে কীটের মতো মনে হতে লাগল। ভেতরে যেন ছেঁড়া ন্যাকড়া ঠাসা। যারা কাগজ কুড়োয় তাদের কাঁধের বস্তার মতো। সৎ সাত্ত্বিক কোনও চিন্তা নেই। কেবল ঘিনঘিনে দেহবাসনা।

ডানাদুটো কী বলো তো? ভেবেছ কোনওদিন? ভাবার অবসর হয়নি। আদর্শ ও চরিত্র। আদর্শ কাকে বলে? সমস্ত জীবনের স্বাভাবিক পরিণতির দিকে নজর রেখে সফল জীবনের ছক তৈরি করা। চরিত্র হল, অভ্যাসের দাসত্ব না করা। নৌকোর দাঁড় দেখেছ? দু'পাশে দুটো। একই সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে চলে, জলে ওঠাপড়া করে। মন আর আদর্শ এই দুটো হল দাঁড় আর সংযম হল দাঁড় বাইবার তাল, ছন্দ। কোনওটাই তোমার আয়ত্তে আসেনি। নিজেকে দর্শন করার ক্ষমতাটাও জাগাতে পারোনি। তোমার এখনও চোখ ফোটেনি। কুকুরের ছানা দেখেছ? সবে জন্মেছে? চোখ ফোটেনি? মায়ের কোলের কাছে সবক'টা একসঙ্গে তালগোল পাকাচ্ছে। একটাই প্রবৃত্তি, দুধ খাবে, কিন্তু অন্ধ। গুঁতোগুঁতি। হঠাৎ ঠোঁটে এসে গেল তো গেল। চোখ নেই,

লক্ষ্য নেই, পরিকল্পনা নেই— আছে প্রবৃত্তি। তুমি সেই দৃষ্টিহীন কুকুরশাবক। প্রবৃত্তিমার্গে অন্ধের মতো তালগোল পাকাচ্ছ। শুনতে তোমার খারাপ লাগছে। তোমার ফ্যাকাসে মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে, কান্ট হেল্প। তোমাকে সুযোগ দিয়েছিলুম, নিজের মতো চলার। ইউ হ্যাভ ফেলড মিজারেবলি। কানামাছির মতো ঘুরপাক খেয়েছ। সাধনা করবে, সাধক হবে। সাধনা কাকে বলে? হোয়াট ইজ দ্যাট? কোনও ধারণা আছে? এনি আইডিয়া? প্রবেবলি নট। টেল মি, সাধু কাকে বলে?

হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে। এতদিনের জমে থাকা সব তিরস্কার একসঙ্গে নেমে আসছে। সাধু কাকে বলে? কোনও সংজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছি না। গেরুয়া? সংসার ত্যাগ? কোনটা? আশ্রম? ধ্যানধারণা? নিরামিষ আহার? মাথায় আসছে না। মিউমিউ করে বললুম, কাকে বলে?

হরিশঙ্করের ঠোঁটের কোণে সামান্য একটু হাসি খেলে গেল, খুব সহজ আবার খুবই কঠিন সাধনার পথ। স্মৃতি কাকে বলে জানো?

আমি যেন ইন্টারভিউ দিতে বসেছি। কোনওরকমে বললুম, মনে রাখাটাই স্মৃতি।

হরিশঙ্কর মৃদু হেসে বললেন, প্রায় হয়েছিল। শুধু একটা একারের জন্যে হল না। মনে রাখা নয় মন রাখা। কোথায় রাখবে? রাখবে নিজের কর্ম, নিজের প্রবৃত্তির ওপর। মনের তিন অবস্থা, সংকল্পক মন, অস্মিতা বা অহংকার মন, আর বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্ত্ব মন। এই তিনটে আলাদা আলাদা নয়। এক জায়গায় জড়াজড়ি হয়ে বসে আছে। কেমিস্ট্রির ছাত্র তুমি। তোমার সহজেই বোঝা উচিত। একে বলে, কম্পাউন্ড বা যৌগ। সাধকের কাজ হল বিশ্লেষণ। তিনটেকে আলাদা করে বোঝার স্থির চেষ্টা। সংকল্প যেখানে ওঠে তাকে বলা হয় মন। এর ঠিক ওপরের যে আমি-বোধ তাকেই বলা হবে অস্মিতা বা অহংকারতত্ত্ব। সেইটাই আমাদের প্রথম আমিত্ববোধ। এই আমির নিয়ন্ত্রণে আমাদের সমস্ত কাজ। এক মহাসাধকের সুন্দর একটি উদাহরণ শোনো। এক গৃহকর্তার পাঁচজন ভৃত্য। কর্তা সবার ওপরে থেকে সকলে খাটান। সকলের কাজকে সুসমঞ্জস করেন। একজন মালী হয়তো গাছ লাগালে, আর একজন তাতে জল দিলে, একজন চারপাশের আগাছা উঠিয়ে ফেললে। এমন কখনই হবে না, একজন যখন গাছ লাগাল, অপরজন এসে তা উপড়ে দিল। এই যে সকলে মিলেমিশে কাজ করে তার একটাই কারণ, ওপরে একজন কর্তা, একটা আদর্শ, একটা নির্দেশ আছে। মনের ওপরের স্তর থেকে নীচের স্তরের দিকে লক্ষ রাখাটাই হল সাধনা। ধরো আমার মনে রাগ আসছে। সাধারণ মানুষ রেগে সব তছনছ করবে। সাময়িক উন্মাদ হয়ে যাবে। সাধকের কী হবে? সঙ্গে সঙ্গে ওপরের মন টের পাবে, আমি রাগতে চলেছি। রাগ আমার ক্ষতি করবে। আমি রাগব না। আমার ভোগবাসনা আসছে, আমি ভোগ করব না। আমার আলস্য আসছে, আলস্যে গা ঢেলে দেব না। সংকল্প করা আর সংকল্প রক্ষা করাই হল নীচের মনের ওপর ওপরের মনের নিয়ন্ত্রণ। একেই বলে স্মৃতি সাধনা। তুমি মানুষ, তোমার নীচের স্তরে অস্থিরতা থাকবে। তা থাকুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু ওপরের স্তর থেকে যেন লক্ষ থাকে। স্বস্থ মানে আত্মস্থ, আত্মস্থ মানে আমি কী করছি তা লক্ষ রাখা। রাগে আত্মভাব হারিয়ে ফেলছি। ভাঙছি, চুরছি, গালাগাল দিচ্ছি। কাজটাই সেখানে বড় হয়ে উঠছে আর যে কাজ করে সেই আমি হয়ে যাচ্ছে তার ভৃত্য। সাধু কে? না যিনি তাঁর নীচ প্রবৃত্তির ভৃত্য নন। বৌদ্ধদের নিধ্যান আর সম্প্রজন্য সাধনও এইরকম। নিধ্যান মানে ভেতরে ভেতরে স্মরণ করা। অভীষ্ট স্থির করো। অভীষ্ট চিন্তা করো। অভীষ্ট কী তা বলা হল না। সেটা তোমাকেই

বেছে নিতে হবে। সবকিছু থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখতে থাকাটাই হল স্মৃতিসাধন। তোমার পক্ষে কি স্বস্থ থাকা সম্ভব? ঈশ্বর তোমার ভেতরেই আছেন। সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে। স্বস্থ না হলে দর্শন তো পাবে না বাপু। তুমি তো অস্থির! তুমি তো তোমার দেহের ভৃত্য। তোমার প্রবৃত্তি তো তোমাকে বাঁদর নাচ নাচাচ্ছে। কী? শুনতে খুব খারাপ লাগছে, তাই না?

আপনি কোনওদিনই আমার মধ্যে ভাল কিছু দেখতে পাননি।

তা বটে। তোমাকে তো আমি সুযোগ দিয়েছিলুম, তুমি তোমার আশ্রমে গেলে না কেন? কেন এই বাড়িতে নববৃন্দাবন খুলে বসলে? তোমার জন্যে এই বাড়িতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে গেল। এই কেন-র কোনও সন্তোষজনক উত্তর কি তুমি দিতে পারবে?

আমি আপনার অপেক্ষায় ছিলুম।

তা হলে আমি যখন তোমার হাত ধরেছিলুম, তখন তুমি সেই হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিলে কেন?

ভেবেছিলুম আমি লায়েক হয়ে গেছি, তারপর দেখলুম আমি একেবারে অসহায়। আমি কোনও ডিসিশন নিতে পারি না, ভিতু। অতীত আর স্মৃতির মধ্যে বসে প্যানপ্যান করে কাঁদি। আপনি যতদিন ছিলেন না, প্রতি মুহূর্তেই বলেছি, ও ফাদার! টেক মাই হ্যান্ড। আপনি ছাড়া আমার জীবন অচল।

হরিশঙ্কর আমার কপালে হাত রাখলেন। তাঁর চোখদুটো এইবার ছলছল করছে। আমার শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি খেলছে। শক্তির এক তরঙ্গ। প্রবল এক ইচ্ছার স্রোত। হাত যেন নীরব ভাষায় বলছে, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥ জীবনের একেবারে নীচের তলায় ইন্দ্রিয় সুখভোগের লালসায় পড়ে আছ। ওঠো। উচ্চজ্ঞান, উন্নত জীবনলাভের চেষ্টা করো। আত্মজ্ঞানে জ্ঞানী হও। নিজের চেষ্টায় হয়তো পারবে না। টেক মাই হ্যান্ড। আমার হাত ধরো। পথ যতই দুর্গম হোক আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

আমার হাত রাখলুম কপালের সেই হাতে। মনে মনে অনুভব করলুম এই সেই হাত, যে-হাত কখনও কোনও অপবিত্র কাজ করেনি। কারও কাছে নতি স্বীকার করেনি। আত্মবিশ্বাসে ইস্পাত- কঠিন। প্রবল একটা শক্তির ধারায় আমি স্নাত হলুম। সমিধের অভাবে যে-যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হয়ে এসেছিল, সেই আগুন আবার লকলকিয়ে উঠল। হরিশঙ্কর যেন উপনিষদের উদ্যত-বজ্র পুরুষ! কী আশ্চর্য! একটা সদ্ভাবের প্লাবন বয়ে চলেছে ভেতরে। কে যেন ভেতরে বসে বেদগান করছেন। প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন পুরে জাগ্রতি। স্পর্শে প্রাণ অগ্নি জ্বলে উঠল। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ।

জামা শুকোতে দেবার গোটাকতক হ্যাঙার নিয়ে জয়নারায়ণ ঘরে ঢুকে বললেন, রেকনসিলিয়েশন হচ্ছে। বাঃ জাহ্নবী ও যমুনার মিলন! ঠিক এই মুহূর্তে পাখোয়াজের সঙ্গে ধ্রুপদ গাইতে ইচ্ছে করছে।

করলে কী হবে? তুমি তো বাজে কাজে ব্যস্ত হয়ে আছ।

জয়নারায়ণ শিশুর মতো মুখ করে বললেন, না না, আমি তো মেয়েদের দলে ঢুকে গজালি করছি না। একগাদা জামাকাপড় কাচলুম, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে একটু কথা বলছিলুম।

জামাকাপড় মেয়েরা কেচে দিতে পারছে না?

বলেছিল। অফার দিয়েছিল। আমি পারি না। নিজের জামাকাপড় অন্যে কেচে দেবে ভাবলেও কেমন লাগে।

দ্যাটস গুড। চরিত্রটা তা হলে ঠিক রাখতে পেরেছ এখনও। ক্লীব হয়ে যাওনি!

জয়নারায়ণ লাজুক হেসে বললেন, এতদিনে আপনার কাছ থেকে একটা গুড ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পেলুম। না, গান না-গেয়ে আর আর থাকা যাচ্ছে না। দিস ইজ হাই টাইম লাইক হাই টাইড।

তা হলে বসে পড়ো, আমি তোমার সঙ্গে তবলায় বসছি। হরিশঙ্কর উঠে পড়লেন। জয়নারায়ণ হ্যাঙার ক'টা বিছানার একপাশে রেখে মেঝেতে মাদুর বিছোলেন। হারমোনিয়ম এসে গেল। জয়নারায়ণ ধ্যানস্থ হলেন। হরিশঙ্কর তবলায় হাতুড়ির ঠুকঠাক শুরু করলেন। জয়নারায়ণ হারমোনিয়মে হাত রাখলেন। একঝলক সুর খেলে গেল ছররার মতো। প্রথমেই নেমে এল সংস্কৃত স্তোত্র। যেমন গলা তেমন সুর,

> ন তত্র সূর্য ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভাণ্ডমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

কঠোপনিষৎ-এর এই শ্লোকটি স্বামীজির অতি প্রিয় ছিল। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, জ্যোতিষ্মান যত কিছু সবই ব্রহ্মের কাছে নিষ্প্রভ। ব্রহ্মের আলোয় সবকিছু আলোকিত। ব্রহ্মের জ্যোতিতেই জগৎ আলোকিত। মাতুল জয়নারায়ণ নিমেষে তৈরি করে ফেললেন তপোবন। হরিশঙ্কর স্তব্ধ। জয়নারায়ণ আড়া ঠেকায় গান ধরলেন। স্বামীজির সেই বিখ্যাত রচনা,

> নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
> ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব-চরাচর।

বিছানায় উঠে বসলুম। মেয়েরা কাজ ফেলে ছুটে এসেছে। অক্ষয় কাকাবাবু রাঁধছিলেন মনে হয়, কোমরে গামছা জড়ানো, হাতে খুন্তি। পথ দিয়ে যেতে যেতে এক সমঝদার আহা আহা করে উঠলেন। আমার ভেতরে অন্যলোকের দরজা খুলে গেল। আরও দু'জন ঘরে এসে ঢুকলেন, যাঁদের এইসময় আসার কথাই নয়। আশ্চর্য ব্যাপার। একজন হরিদ্বারের সেই সন্ন্যাসী। অন্যজন মেনিদা। তবলা বাজাতে বাজাতে হরিশঙ্কর মাথা নত করে নমস্কার জানালেন। কাকিমা একটা আসন পেতে দিলেন সন্ন্যাসীকে। মেনিদা মেঝেতেই বসে পড়লেন।

মাতুল এক গান থেকে আর এক গানে চলে গেলেন। এইবার একতালা বাউল, আর কেন মন এ সংসারে, যাই চলো সেই নগরে/ যেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে॥ সঙ্গে সঙ্গে মেনিদার পকেট থেকে খঞ্জনি বেরিয়ে এল। সে কী গান! সকলেরই মাতোয়ারা অবস্থা। আনন্দের বন্যা বইছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে মাঝে মাঝে গরম বাতাসের ঝলক খেলে যাচ্ছে। এমনই তালের খেলা আমার পা দুটো নাচতে চাইছে। একসময় শেষ হল গান। সবাই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করছেন। আমি প্রণাম করতেই মৃদু হেসে বললেন, বেটা বাঁচ গিয়া।

অবাক হবারই কথা। জানলেন কেমন করে! দেখা গেল সবই তিনি জানেন, যা যা ঘটেছে। ছবির মতো বলে গেলেন সব। এমনকী সাপের ছোবল। শেষে বললেন, বেটা তোমার মৃত্যু হত। তাই আমি তোমাকে অমৃত ফল খাইয়ে গিয়েছিলুম। তা হলে শোনো অদ্ভুত এক ঘটনার কথা। স্বপ্নে নয়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে দিব্য

শরীরে আমার মাতামহ দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, নাতিটার একটা বিপদ আসছে, আপনি একটা কিছু করুন। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, বাকিটা প্রভুর কৃপা।

হরিশঙ্কর জানতে চাইলেন, অমৃত ফলটা কী? আপনার কাছে আর একটা আছে? তা হলে অ্যানালিসিস করে দেখতুম, অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস কী আছে? বিজ্ঞানের উপকার হত।

সন্ন্যাসী বললেন, হিমালয়ের ফল হিমালয়েই থাক। সাধুসন্ন্যাসীদের সহায়। ও জেনে কোনও লাভ নেই। দুর্গমের ফল দুর্গমেই থাক। আমাদের কাজ হয়ে গেছে, আবার কী? আর তো আমাদের প্রয়োজন নেই। সোমরস ছিল। ফর্মুলা ইজ লস্ট। সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠেছিল। সেই অমৃতের ফর্মুলা কী? জেনে লাভটা কী হবে? আমরা তো ব্যবসা করব না। তবে আপনি সায়েন্টিস্ট, আপনার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

অলৌকিককে আমি লৌকিকে আনতে চাই, যাতে জড়বাদীরা ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিতে না পারে। দরকার নেই। অবিশ্বাসীরা অবিশ্বাসীই থাকুক। দ্যাট ইজ গড্‌স ডিজায়ার।

জয়নারায়ণ বললেন, মহারাজ, আপনি আমার বাবাকে দেখলেন? কেমন আছেন তিনি? কোথায় আছেন?

মামা এমন আকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, যেন সাধুজি ঠিকানাটা বললেই তিনি এখনই ছুটে যাবেন দেখা করতে। কিন্তু সে এমন একটা জায়গা যেখানে দেহ নিয়ে যাওয়া যায় না। দেহ ফেলে যেতে হয়। সেই লোকের অধিবাসীরা মায়াদেহ ধারণ করে হয়তো আসতে পারেন।

সন্ন্যাসী বললেন, তিনি কোন লোকে আছেন বলা সম্ভব নয়। জীবনের পরপারে অনন্ত লোক। কে-ই বা জানে তার কথা, সবই কল্পনা, সবই অনুমান। মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এই বৃত্তাকার পথে আত্মার ভ্রমণকে চিন ও তিব্বতি ধর্মশাস্ত্রে বলে বার্দো জার্নি। ভারী সুন্দর ধারণা। মৃত্যুর পর দেহমুক্ত আত্মা পরলোকের পথ ধরে ভ্রমণে বেরোয়। একটা পাক মেরে ফিরে আসে মাতৃজঠরে। এই স্বাধীন ভ্রমণে তাঁরা আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমরা যেতে পারি না, কারণ আমরা দেহে আবদ্ধ, পৃথিবীর নিয়ম মেনে আমাদের চলতে হয়।

জয়নারায়ণ জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি আবার জন্মগ্রহণ করবেন?

সেটা তাঁর ইচ্ছে। যদি করেনও আমরা জানতে পারব না। তিব্বতি সাধকদেরই সেই ক্ষমতা আছে। আমাদের নেই। কী আর করা যাবে! বৌদ্ধরা বেশ মজা করেছেন। তাঁরা ফর্ম, মানে জীবাকারকে বলছেন ‘সে’, আর শূন্যাকারকে বলছেন, ‘কুং’, এইবার দুটি অবস্থাকে একটি সূত্রে গেঁথেছেন। সেই সূত্রের নাম হৃদয়সূত্র। সেই সূত্রে সব একাকার, That which is form is just that which is emptiness. আমরা আছি, আকার, আকৃতি, দেহ, জীব, বস্তু, আছি শূন্যতাকে ঘিরে। একটা বুদবুদ। ভেতরটা ফাকা, and that which is emptiness is just that which is form. বেটা, হোয়াট ইজ এ উইন্ডো, হোয়াট ইজ এ ডোর? একটা ফাঁকা জায়গা। এ প্যাচ অফ এম্পটিনেস, কিন্তু প্রয়োজনীয়। দরজা আর জানলা ছাড়া ঘর হয় না, অ্যান্ড উই মেক ইট। প্ল্যান করে তৈরি করা হয়। একটা ফর্ম কিন্তু শূন্য। নাথিং ইজ দেয়ার। আকার নিরাকার, নিরাকার আকার, দুটোই সত্য, দুটোই মিথ্যা অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং। বেটা, আমি এখন যাই। দেখা করে গেলুম। আবার কবে আসব জানি না।

হরিশঙ্কর বললেন, আজ আপনাকে কিছু গ্রহণ করতে হবে।

করেছি। সংগীত। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। ওটা বাহুল্য। ভাল থাকুন। বি হ্যাপি। সন্ন্যাসী চোখ বুজিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কেউ পেলেন কি না জানি না, আমার নাকে একটা সুগন্ধের ঝাপটা এল।

সন্ন্যাসী আঙুল দিয়ে মেঝেতে একটা ত্রিভুজ এঁকে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকার পর বললেন, নিজেকে জানতে চান? দি স্টাফ, হুইচ ইউ আর মেড অফ?

সবার আগে মাতুল উৎসাহী হলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই জানতে চাই।

হরিশঙ্কর বললেন, কীভাবে জানা যাবে?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, জাস্ট পুট ইয়োর ফার্স্ট ফিঙ্গার অন দি সেন্টার অফ দি ইম্যাজিনারি ট্রাংগল। মাতুল আঙুল দিতে গিয়েও থমকে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, টাচ ইট।

জয়নারায়ণ আঙুল ছোঁয়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখের চেহারা করুণ হয়ে উঠল। কতদিনের বেদনা ফুটে উঠল মুখে। জলে ভরে এল চোখ। অসীম বিষন্নতায় নিমজ্জিত হলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, ইউ আর মেড অফ সরো। দুঃখ দিয়ে তৈরি। দুঃখের পথেই রিয়েলাইজেশন।

একে একে সবাই এগিয়ে এলেন। আঙুল রাখলেন অক্ষয় কাকাবাবু। ছটফট করে উঠলেন। সন্ন্যাসীর দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, এনার্জি। মুকু হাত ছোঁয়াল। পাথরের অহল্যার মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। সন্ন্যাসী বললেন, তুমি রিজিডিটি। অনমনীয়তা দিয়ে তৈরি। সুরঞ্জনার পালা এল। আঙুল ছুঁইয়েই সে টানটান খাড়া। কে যেন তাকে ওপর দিকে টানছে। ধারালো মুখ আরও ধারালো। সন্ন্যাসী বললেন, ইউ আর অল অ্যাম্বিশন। তুমি বড়, আরও বড় হতে চাও। আমার পালা এল। ভয়ে ভয়ে আঙুল রাখলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে এল। জমির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। সন্ন্যাসী বললেন, ইউ আর মেড অফ ফিয়ার। তোমার উপাদান হল ভয়। এইবার হরিশঙ্কর। আমরা তাকিয়ে আছি। অসীম কৌতূহল। এমন একজন বজ্রপুরুষের সত্তাটা কী? কী দিয়ে তৈরি? হঠাৎ মেনিদা বললেন, আমি আগে সেরে নিই। হরিশঙ্কর বললেন, অলরাইট। সব শেষে আমি। মেনিদা আঙুল রাখলেন। পাগলের মতো হাসতে লাগলেন। সন্ন্যাসী বললেন, হি ইজ এম্পটি। এ ম্যান উইদাউট সোল। এইবার হরিশঙ্কর। তাঁর প্রথম আঙুল ধীরে ধীরে এগোচ্ছে ত্রিভুজের দিকে।

যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা

উৎকণ্ঠা তো বটেই। হরিশঙ্কর আঙুল রাখবেন ত্রিভুজে। কী প্রকাশ পাবে তাঁর স্বভাবে! নিষ্ঠুরতা, দয়া, মায়া, জ্ঞান? চরিত্রের কোন দিকটা প্রবল হবে? সন্ন্যাসী কী দেখবেন তাঁর ভেতরে! হরিশঙ্করের স্থির অকম্পিত আঙুল কাঙ্ক্ষিত স্থান স্পর্শ করল। তাঁর ঋজু শরীর আরও ঋজু হল। মুখে একটা জ্যোতি। যেন একটা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলছে শরীরে। মনের বা চোখের ভুল কি না জানি না, আঙুল ভূমি স্পর্শ করামাত্রই একটা স্পার্ক খেলে গেল। এমনও হয় নাকি! চোখের দেখা আর মনের বিশ্বাসকে এক করতে পারছি না। তবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা, হরিশঙ্কর স্থির দৃষ্টিতে কারও দিকে তাকালে তার আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা থাকে না। আমার মনে আছে, একবার একটা মরচে-ধরা টিনের কৌটোর ঢাকনা কিছুতেই খোলা যাচ্ছিল না, অথচ তার মধ্যে একটা কেমিক্যালস ছিল, যেটা খুবই জরুরি প্রয়োজনের। আমরা সবাই ব্যর্থ হলুম। হরিশঙ্করও প্রথমটায় পারলেন না। সকলেই রায় দিলেন, ঢাকনা এমন আঁটা এঁটেছে ও আর খোলা যাবে না। হরিশঙ্করের চোখে একটা স্পার্ক খেলে গেল। মুখের চেহারা পালটে গেল। কৌটোটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন স্থির হয়ে, তারপর মারলেন এক টান। ঢাকনা খুলে গেল। একবার একটা ড্রয়ারের তালা খুলছিল না। সবাই পরাজিত। হরিশঙ্কর চাবি ঢোকালেন, ঘোরানোমাত্রই খুলে গেল। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, কী করে হল? হরিশঙ্কর অদ্ভুত উত্তর দিয়েছিলেন, তোমরা খুলবে না ভেবে চাবি ঘোরাচ্ছিলে, আর আমি ঘুরিয়েছিলুম খুলবে ভেবে। এই সামান্য তফাত। বলেছিলেন, দেশলাই কাঠি জ্বালাবার আগেই যদি ভাবো নিবে যাবে, তা হলে নিববেই; আর সেটা যদি একেবারেই ভুলে যাও কাঠি কখনওই নিববে না। একে বলে অ্যাপ্রোচ। একে বলে উইল। দুটো কথা আছে, আই ক্যান আর আই ক্যান নট। আমি পারি আর আমি পারি না। একটা শক্তি আর একটা দুর্বলতা। হরিশঙ্কর একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন, কাউন্ট মেরালের উদাহরণ। ইতালির এক মাননীয় মানুষ। হাত অথবা চিরুনি ছাড়াই তিনি চুল আঁচড়াতে পারতেন যেমন খুশি। যেদিকে খুশি টেরি বাগাতে পারতেন। ইচ্ছাশক্তির উদাহরণ। আর একটা গল্প বলেছিলেন জন কাউপারের। নিউ ইয়র্কে ওয়েস্ট ফিফটি সেভেন্থ স্ট্রিটে কাউপারের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকতেন। তাঁর নাম ছিল ড্রেইসার। কাউপার রোজ বিকেলের দিকে তাঁর বাড়িতে আসতেন। কাউপার তখন হাডসান নদীর ধারে ছোট একটা গ্রামে থাকতেন। প্রায় তিরিশ মাইলের দূরত্ব। বেলাবেলি বন্ধুর বাড়িতে ডিনার শেষ করে ট্রেন ধরে তিনি ফিরে যেতেন গ্রামে। একদিন ডিনার শেষ হয়ে যাবার পর দুই বন্ধুতে খুব গল্প হচ্ছে। কাউপার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন, কথায় কথায় সময়ের খেয়াল ছিল না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। আর বসলে ফেরার ট্রেন পাবেন না। বন্ধু একটু হতাশ হলেন। গল্প বেশ জমেছিল।

কাউপারকে ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। কাউপার বিদায় নেওয়ার আগে দরজার সামনে দাড়িয়ে বললেন, মনখারাপ কোরো না, আমি আজই আবার আসছি তোমার কাছে। বন্ধু বললেন, চলে গেলে আবার আসবে কী করে, সেই তিরিশ মাইল দূর থেকে? কাউপার বললেন, তা জানি না, তবে আমি আসব। তোমার সামনে এসে দাঁড়াব আমি। ড্রেইসার বন্ধুর কথা কিছুই বুঝলেন না। কাউপার চলে যাওয়ার পর বই নিয়ে বসলেন। ঘণ্টাদুই কেটে গেছে। হঠাৎ কী খেয়াল হল দরজার দিকে তাকালেন। অবাক কাণ্ড। দরজা আর ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় কাউপার দাঁড়িয়ে আছেন। স্পষ্ট। কোনও ভুল নেই। ড্রেইসার তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেলেন। জন, তুমি তোমার কথা রেখেছ। এসো এসো। বন্ধুর হাত ধরার জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন। কাউপার কোনও কথা বলছেন না। ড্রেইসার যখন আরও কাছে গেলেন, দূরত্ব মাত্র তিন ফুট, কাউপার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ড্রেইসার প্রথমটায় ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বন্ধুকে টেলিফোন করলেন। কাউপারের গলা ভেসে এল। ড্রেইসার এই গলার সঙ্গে পরিচিত। কাউপার বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলুম যাব। তুমি তার প্রমাণ পেয়েছ। এর বেশি আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। গল্প শেষ করে হরিশঙ্কর বলেছিলেন, প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে মানুষের পক্ষে অ্যাস্ট্রাল প্রোজেকশনও সম্ভব। হরিশঙ্কর নিজেও তা পারেন, যেমন পারতেন যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাই। অস্বীকার করেন, কিন্তু আমার কাছে অজস্র প্রমাণ আছে। হালফিল তার প্রমাণ পেয়েছি। আমার রোগশয্যায় মাথার কাছে এসে দাড়িয়েছিলেন। স্বপ্ন না-ও হতে পারে।

হরিশঙ্করের উজ্জ্বল মূর্তির দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, ইউ আর অল পাওয়ার ভাইব্রেটিং ইন এ ডিভাইন প্লেন। শাবাশ বেটা। সাইলেন্টলি চালিয়ে যাও তোমার সাধনা। জল একটু বেশি খাবে। চিত হয়ে শোবে, অ্যান্ড ইউস এ ব্ল্যাঙ্কেট। হোয়াইট ছাড়া কিছু পরবে না। তোমার ইষ্ট হলেন লর্ড ভিষ্ণু।

সন্ন্যাসী হাত দিয়ে সেই অদৃশ্য ত্রিভুজ মুছে দিলেন। তারপর হাত জোড় করে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই আমাদের শেষ দেখা, আপনারা সবাই ভাল থাকুন। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করুন। সন্ন্যাসী সিঁড়ির দিকে এগোলেন। মেনিদা বললেন, আমি একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। আর তো দেখা হবে না।

জয়নারায়ণের গবেষণা শুরু হল, ব্যাপারটা কী? এমনও হয় নাকি? জাদু? হিপনোটিজম? হরিশঙ্কর বললেন, প্লেন অ্যান্ড সিম্পল সাইকোলজি। চালপড়া বলে একটা জিনিস আছে জানো? চালপড়া খাইয়ে চোর ধরা। যে-চোর তার মুখে চাল ভিজবে না। শুকনোই থেকে যাবে। ভয়ে থুতু বেরোবে না। মুখ শুকনো কাঠ। মনস্তাত্ত্বিক কারণে। এও সেইরকম। আমরা সবাই আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিলুম। নিজের ভেতরটাকে দেখার চেষ্টা করছিলুম, যেটা সবসময় আমাদের বাইরের তুচ্ছতায় চাপাই পড়ে থাকে, খড়ের গাদায় ছুঁচের মতো। ধরো মানুষ একটা মোটরগাড়ি, তার দু'জন চালক। একজন বসে আছেন সূক্ষ্মে, অন্যজন স্থূলে। স্থূলে যিনি আছেন তাঁর ভূমিকা হল মেন্টিনেনস্ ইঞ্জিনিয়ারের। তাঁর নিয়ন্ত্রণে আমাদের নিদ্রা, আমাদের স্মৃতি, পরিপাকযন্ত্র ও পরিবর্জন ব্যবস্থা। সূক্ষ্ম মনের উপস্থিতি আমরা ভুলেই যাই। স্থূলের কাজকর্মের দিকেই আমাদের নজর। সরষের ভেতর তেল আছে। বোঝার উপায় নেই। পিষতে হবে। ঘোলে মাখন আছে, মন্থন করতে হবে, মেহেদিতে রং আছে বাটতে হবে। একটা মোহর পড়ে আছে এক বালতি ঘোলা জলে। দেখার উপায় নেই। ফটকিরি ফেলে জল পরিষ্কার করে নাও, সব দেখতে পাবে। শান্ত হয়ে বোসো। স্থূলের ক্রিয়া থেকে চিন্তা তুলে

নাও। স্থির হও আর তখনই দেখতে পাবে সূক্ষ্মকে। সেই সূক্ষ্মেই আছে আমাদের স্বভাব। সন্ন্যাসী অলৌকিক কিছুই করলেন না, কায়দা করে আমাদের স্বরূপ দর্শন করালেন। একসঙ্গে এতজনকে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। ভাবে বলে গেলেন, অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্ মনসগোচরম্। আত্মানম্ অখিলাধারম্ অভীষ্টসিদ্ধয়ে আশ্রয়ে। চিত্তের অনন্তবৃত্তি। স্টপ ইট। আত্মাতে যুক্ত হও। সিট স্টিল অ্যান্ড মেডিটেট। আমরা যা করলুম তা এক ধরনের ধ্যান। করেছি এক মহাশক্তির উপস্থিতিতে। নিজেরা করলে অত সহজে হত না। ওইটাই হল সন্ন্যাসীর সম্মোহন। সাপকে কঁপিতে এককথায় ঢোকাতে পারেন বেদে। সন্ন্যাসী সেই বেদে। আমি বোধহয় একনাগাড়ে বহুক্ষণ বকবক করছি! আমার স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। ছিছি তোমরা কী মনে করছ! আই বেগ টু বি এক্সকিউজড ফর মাই অসভ্যতা। এজ হ্যাজ মেড মি এ ফুল। তা না হলে কেনই বা ভুলে যাব, নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে মানুষ নিজের শক্তিকে খুঁজে পেতে পারে!

হরিশঙ্কর উঠে পড়লেন। শ্যালক জয়নারায়ণ বললেন, অপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আরও কিছুক্ষণ চললে বেশ হত। আর কতকাল নিজেকে লুকিয়ে রাখবেন? আসুন আমরাও এইবার শুরু করি। এই পানসে সংসার থেকে বেরিয়ে যাই। শ্যামা সুধা তরঙ্গিণীতে ভেসে যাই।

হরিশঙ্কর বললেন, নাক তেরে কেটে তাক বোল মুখে বলা সহজ, হাতে ফোটানোই মুশকিল। এই তো তবলা, অক্ষয় একবার চেষ্টা করো না!

অক্ষয় কাকাবাবু বললেন, এমনি হবে? সাধতে হবে।

হরিশঙ্কর বললেন, তারও আগে একটা কথা আছে, কেন সাধবে? মোটিভেশন? বেশ তো আছি! রোগে-ভোগে। বউ ঝ্যাঁটা মেরেছে? ভাই মামলা ঠুকেছে? চাকরি চলে গেছে? শেয়ার মার্কেটে দেউলে হয়ে গেছি? সংসারের একদল ঝড়তি-পড়তি মানুষ, গালভাঙা, কোলকুঁজো, চোখে ছানি-কাটা-চশমা। বুকে ব্রঙ্কাইটিস, কাতরাতে কাতরাতে চলেছে, প্রভু প্রভু করতে করতে, খিচুড়ি আর মালসাভোগ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, হৃষ্টপুষ্ট মহিলা দেখলেই অক্ষম দেহ হায় হায় করে উঠছে। পেট-চুক্তি হরিনাম। ছ'ঘন্টা নাগাড়ে করতে পারলেই একপাতা খিচুড়ি। হরে কৃষ্ণ হরে রাম-এর বদলে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে, হচে কিষ্ণ হচে রাম। মূল গায়েনের কোনও মাথাব্যথা নেই সংশোধন করে দেবার। লক্ষ্য তো রাম নয়, কৃষ্ণও নয়। লক্ষ্য উদর ও উদরের নিম্নভাগ। এই মিছিল ঈশ্বরের দিকে যত এগোতে থাকে, ঈশ্বর ততই পেছোতে থাকেন। শবযাত্রীর দল আসছে গামছা কাঁধে। স্বর্গের দেউড়ি বন্ধ করো। পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে, সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে। তোমায় আমায় মিলন হবে বলে, যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে, পরান আমার বধূর বেশে চলে চিরস্বয়ম্বরা। রাজার ছেলে রামচন্দ্র, রাজার ছেলে বুদ্ধ, জনকরাজা, মহাপণ্ডিত কন্দর্পকান্তি শ্রীচৈতন্য, সেই পথের পথিকের এই হল চেহারা। রাজসমারোহে এসো। কার অভিসারে তুমি চলেছ! রাজসভায় ভোজ খেতে চলেছ তুমি। তুমিও যাও রাজার মতো। টু মিট এ কিং, বি এ কিং, নট এ বেগার। ভিখিরি রাজার দর্শন পায় না। ওহো, ধরো গান, জয় সুর লাগাও,

একমনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা॥

যেখানে তোর সীমা সেথায় আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে, ফিরিস নে আর হাজার টানে,
যেন রে তোর হৃদয় জানে হৃদয়ে তোর আছেন রাজা—
একতারাতে একটি যে তার আপন-মনে সেইটি বাজা॥

জমজমাট ব্যাপার, সেই কালী কীর্তনের মতো, হতেছে পাগলের মেলা খেপাতে খেপিতে মিলে/ আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী/ পড়ছে ঢলে॥ বড় ধুম লেগেছে হৃদকমলে। হুঁ করে বেজে উঠল চটকলের বাঁশি। দক্ষিণেশ্বরে বসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই বাঁশি শুনে গেছেন। শ্রীশ্রীমা এই বাঁশিকে বলতেন শ্যামের বাঁশি। ঠাকুরের আহারাদির পর এই বাঁশি শুনে তিনি সেবায় বসতেন। এই বাঁশি শুনতে শুনতে আমার মাতামহ উত্তরের বারান্দায় পায়চারি করতে করতে তেল মাখতেন। সবসময় তাঁর বিভোর অবস্থা। দেহ একখানে মন আর একখানে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমনঝুলা, কেদারনাথ। আজ এই আসরে তিনি থাকলে কী মাতনই না হত! যখন তানপুরা কাঁধে নিয়ে গান ধরতেন, যদি দান দিলে আমায় এ বিপুলধরণী।/ তবে কেন প্রাণ দিলে না, দিলে না॥/ আঁখি যদি দিলে মা গো এ বিশ্বমাঝারে।/ তবে আঁখিজল কেন দিলে না, দিলে না॥

ভেঙে গেল আসর। শেষ হল আহারাদি। বাগানের রোদ পলাতক বালকের মতো পাঁচিল টপকে সারগাছের মাথায় গিয়ে চড়ল। ডালে ডালে বিষণ্ন পাখি। উজ্জ্বল একটি দিনের মৃত্যুতে শোকার্ত। হঠাৎ হরিশঙ্কর ঘোষণা করলেন, কালই তিনি চলে যাবেন। জানলার কাছে বসে আছি আমি। বিভোর আমার স্বপ্নে। সব হারিয়ে আবার সব ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন। সওদাগরের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল, মা-লক্ষ্মীর কৃপায় আবার ভেসে উঠেছে। হঠাৎ এ কী সিদ্ধান্ত? ঘরে যেন বজ্রপাত হল। কোথায় যাবেন? কেনই বা যাবেন! প্রশ্ন করলুম, কোথায় যাবেন?

প্রশ্নটা একটু বোকার মতো হল। তোমার কী ধারণা? আমার কোনও যাওয়ার জায়গা নেই? তোমার কি ধারণা, এতকাল আমি ছেঁড়া কম্বল কাঁধে ধর্মশালায় ধর্মশালায় ঘুরছিলাম, লাইক ওয়ান অফ দি সো মেনি আইডলারস!

আমি তা মনে করিনি। ভেবেছিলুম সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। কারণ আপনি কিছুই নিয়ে যাননি। একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

ইয়েস মাই সান, হরিশঙ্কর কনভেনশনাল সন্ন্যাসে বিশ্বাসী নয়। হরিশঙ্কর গুরুবাদে বিশ্বাসী নয়। হরিশঙ্কর কনভেনশনাল ধর্ম বিশ্বাস করে না। মন্দির, মসজিদ, গির্জা সব তার কাছে সমান। সন্ন্যাসী হবার জন্যে কোথাও যাবার দরকার হয় না। অন্তরের কয়েকটা ময়লা জিনিস বাইরে ফেলে দিতে পারলেই একজন সন্ন্যাসী। যে-কোনও জায়গায়, যে-কোনও অবস্থায়। এম্পটি ইয়োর ডার্টি বাস্কেট অ্যান্ড ইউ আর এ সেজ। দেয়ার আর থ্রি ক্যাটস, কাম, ক্রোধ, লোভ, তিনটেকে বিদায় করো, তুমি সন্ন্যাসী। আর একবস্ত্র? যখন এসেছিলুম সঙ্গে ক'টা বস্ত্র এনেছিলুম? ওইটাই হরিশঙ্করের আত্মবিশ্বাস। যেচে, সেধে চ্যালেঞ্জ নেওয়া। অলওয়েজ এক্সপ্লোর নিউ হরাইজন। নতুন দিগন্ত। এ নিউ স্ক্র্যাচ, অ্যান্ড বিগিন। নতুন একটা আঁচড় থেকে তৈরি করো নতুন ভবিষ্যৎ।

ফ্রম নাথিং টু সামথিং। জগতের হাটে হরিশঙ্কর নিজেকে বাজাতে জানে। অ্যাডভেঞ্চার ইজ লাইফ। তুমি ভীরু, তুমি ঘরকুনো, তোমার পক্ষে জীবনের বিশালতা বোঝা সম্ভব নয়। ইউ আর এ পেটিকোট ম্যান।

ভয়ংকর আক্রমণে স্তব্ধ হয়ে যেতে হল। এই কারণেই আমার যত অভিমান, যত হতাশা। বয়সটা কাঁদার নয়। মুখ গোঁজ করে থাকার। আমি পেটিকোট ম্যান! বারনার্ড শ-র কথা থেকে শব্দটা নিলেন, শ বলেছিলেন, A woman is really only a man in petticoats, or, if you like that a man is a woman without petticoats. আমি সামান্য প্রতিবাদ জানাতে চাইলুম। আপনি এখনও আমার ওপর রেগে আছেন?

তুমি এটাকে রাগ ভাবছ? একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারতে, এ রাগ নয়, এ তোমার শক থেরাপি। মিনমিনে ঘিনঘিনে জীবন থেকে তোমাকে বের করে আনার চেষ্টা। এই বয়েসে আমি যা পারি, তুমি তা পারো না? মুখে পাউডার লেপে ফিনফিনে কথা বলে মেয়েদের প্রিয় হতে চাও। ওমর খৈয়াম, গালিব পড়ো। কেন মিলটন, হোমার, ভার্জিল পড়তে পারো না? গোলাপি কাগজে প্রেমপত্র লেখো। লাইফ ইজ নট দ্যাট রোজি পিন্টু। জীবন অবশ্যই একটা কবিতা, তবে বীররসের কবিতা। লাইফ ইজ এ হিরোয়িক পোয়েম, রাইমড্ আর আনরাইমড্। তোমাকে আমি তোমার মুখ দেখাতে চাই। মনে আছে সেই গল্প! সিংহশাবক ভেড়ার পালে বড় হতে হতে ভেড়াই হয়ে যাচ্ছিল। একদিন এক সিংহ এসে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল জলার ধারে। জলে পাশাপাশি দু'জনের প্রতিবিম্ব। দেখ, তোর আর আমার দু'জনের মুখই একরকম দেখতে। তুইও সিংহ আমিও সিংহ। এই নে চেখে দেখ এক টুকরো মাংস। তুমি আমার ছেলে হয়ে, আমার উপহাস হয়ে জীবন নষ্ট করছ। তোমার লজ্জা করে না। আমি এক ধরনের জীবন শেষ করে আর এক ধরনের জীবন শুরু করেছি। অবসরভোগী বৃদ্ধ হয়ে ছেলের রোজগারে অলস জীবন আমি কাটাতে চাই না।

ছেলের সেবাও আপনি নেবেন না?

সেবা খুব কঠিন জিনিস পিন্টু। বলা সহজ, করা শক্ত। বিরক্ত না হয়ে সেবা ক'জন করতে পারে? আর শক্তি থাকতে সেবা নোব কেন?

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি এখন কী করছেন? যদি আমাকে একেবারেই পর না ভাবেন তা হলে বলবেন, আর যদি ভাবেন আমি আপনার কেউ নই তা হলে বলবেন না। আমি আমার পথ আপনারই আশীর্বাদে ঠিক খুঁজে নিতে পারব। ছোট মুখে বড় কথা মার্জনা করবেন, একটা উদাহরণ মনে আসছে, পাখির মা পাখিকে যখন উড়তে শেখায় তখন কিন্তু ঠোকরায় না। পাহারা দেয় ডালে বসে, অন্য পাখির ঠোকরের হাত থেকে বাঁচায়।

হরিশঙ্কর অসন্তুষ্ট হলেন না, বরং খুশিই হলেন, বাঃ, ওয়েল সেড। সুন্দর উপমা। ভেরি পোয়েটিক। বাট মাই সান, ইফ ইট ইজ নট এ বার্ড? যদি পাখি না হয়ে একজন প্যারালিটিক মানুষ হয়? এ ক্রিপল? তাকে বকে, ধমকে, তিরস্কার করে, যন্ত্রণা দিয়ে হাঁটাতে হয়। দয়া করলে, অনুকম্পা দেখালে তার ক্ষতি হয়। জীবনের দীর্ঘপথ পড়ে আছে তোমার সামনে, যে-পথে তোমার সঙ্গী হবে না কেউ, সেই পথে হাঁটার শক্তি তোমাকে অর্জন করতে হবে। প্রেমের কাছে, সহানুভূতির কাছে, সাহায্যের কাছে, মানুষের করুণার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ো না। এই তো আসল কুরুক্ষেত্র পিন্টু। কেউ কারও নয়। না ঘর মেরা, না ঘর তেরা। নিজের এই অসুস্থতার সময় অবশ্যই বুঝে গেছ নির্ভর করার মতো একজনই আছেন, তিনি কে? তুমিও জানো

না, আমিও জানি না। কেউই জানে না। জাস্ট এ ওয়াইল্ড গেস। একটা অনুমান মাত্র। ডপ্‌পেলগ্যাঙ্গার বলে একটা শব্দ কখনও শুনেছ?

আজ্ঞে না।

শব্দটা জার্মান। ইংরেজি মানে হল তোমার সাইকিক ডবল। তোমার দ্বিতীয় সত্তা। চুয়াল্লিশ সালের ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তখন এক ভয়ংকর পরিস্থিতি। ফরাসি রণাঙ্গনে এক আমেরিকান ইনফ্যান্ট্রি সার্জেন্ট। তাঁর নাম গ্রিফিথ। গ্রীষ্মের শেষবেলায় তাঁর বাহিনী নিয়ে বেরিয়েছেন টহলে। জায়গাটার নাম রেনে। চারপাশ শান্ত। সরু একটা পথ। ধুলোয় ঢাকা। দলের আগে আগে চলেছেন গ্রিফিথ। হঠাৎ গ্রিফিথের সামনে মাত্র কয়েক গজ দূরে এক মূর্তির আবির্ভাব হল। গ্রিফিথ চমকে গেলেন। সামনে পথ আগলে যে দাঁড়িয়ে সেও গ্রিফিথ। একই আকৃতি, একই পোশাক, এমনকী দাড়ির ক্ষতে যে স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো, দ্বিতীয় গ্রিফিথের দাড়ির ঠিক সেই জায়গাতেও প্লাস্টার। দ্বিতীয় গ্রিফিথ হাত নেড়ে ইশারা করছে, ফিরে যাও। গ্রিফিথ ভয় পেয়ে গেলেন। শুনলেন সেই নির্দেশ। ফিরে চললেন তাঁর বাহিনী নিয়ে। তিনি ফিরছেন এমন সময় সৈন্য-বোঝাই একটা জিপ তাঁর পাশ দিয়ে তিনি যে-দিকে যাচ্ছিলেন সেই দিকেই গেল। পরক্ষণেই তাঁর কানে এল স্পান্ডাউ মেশিনগানের শব্দ। জিপগাড়িটার উলটে যাওয়ার শব্দ। ওই জায়গায় জার্মান সৈন্যরা একটা গোপন ঘাঁটি গেড়েছিল। গ্রিফিথের মূর্তি যদি গ্রিফিথকে সাবধান না করত তাঁর বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। বিজ্ঞানে এর কোনও ব্যাখ্যা পাবে না। একবার নয় গ্রিফিথের জীবনে এই ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটল কুড়ি বছর পরে। গ্রিফিথ তখন বিয়ে করেছেন। দুটি ছেলে। ঘটনাস্থল কানাডা। সপরিবারে বেড়াতে বেরিয়েছেন। দু'সার প্রাচীন গাছের মধ্যে দিয়ে পথ চলে গেছে। আবহাওয়া সুন্দর, তবে দমকা বাতাস বইছে। তাঁরা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে সবে দাড়িয়েছেন, হঠাৎ সামনে আবির্ভূত হলেন সেই দ্বিতীয় গ্রিফিথ। যুদ্ধের পোশাক, চিবুকে প্লাস্টার। ইশারায় বলছে, পালাও, গো ব্যাক। গ্রিফিথ এক মুহূর্ত দেরি না করে পেছন ফিরে সপরিবারে ছুটতে লাগলেন। দমকা বাতাস তখন ঝড়ের চেহারা নিয়েছে। গ্রিফিথ যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে হুড়মুড় করে বিশাল একটা গাছ ভেঙে পড়ল। সরে না এলে সপরিবারে মারা পড়তেন। এই ডপ্‌পেলগ্যাঙ্গারের অভিজ্ঞতা পৃথিবীতে আরও অনেক ভাগ্যবানের জীবনে ঘটেছে। বার্লিনের ঘটনা। থিওলজির অধ্যাপক বাড়ি ফিরছেন সন্ধেবেলা। উলটো ফুটপাথে আর একজন। দেখেই চমকে গেলেন। আর একজন তিনি নিজেই। অধ্যাপক দ্রুত পা চালালেন। তাঁর দ্বিতীয় মূর্তির চলার গতিও বাড়ল। অধ্যাপক পাশের রাস্তায় ঢুকলেন। এড়াতে পারলেন না। বাড়ির দরজার কাছে মূর্তি তাঁকে অতিক্রম করে গিয়ে নিজেই বেল টিপল। অধ্যাপক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন উলটো ফুটপাথে। দর্শক হয়ে। পরিচারিকা বাতি হাতে দরজা খুলল। দু'জনে দোতলায় উঠছেন। দোতলার ঘরে আলো দেখা গেল। পরমুহূর্তেই পুরো ছাতটা ভেঙে পড়ল সশব্দে। এর কী ব্যাখ্যা হবে পিন্টু? তুমিই তোমার ভগবান। কারও দর্শন হয়, কারও হয় না।

হরিশঙ্কর নিঃশব্দে উঠে গেলেন বারান্দায়। কেন আমি ওঁর জ্ঞানকে স্পর্শ করতে পারি না! কেন পারি না ওঁর মতো একটা মনের উত্তরাধিকারী হতে! নিজের মর্তসীমা চূর্ণ করে কেন মিশে যেতে পারি না বিশালের বিশালে! অনেকদিন পরে আদেশ এল, এসরাজটা নামাও। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলছেন।

এসরাজ নামালুম। ঘরে এসে বললেন, আমাদের সেই মলসন্দটা বিছাও। ঠিক আছে না ইঁদুরে কুটি কুটি করেছে?

আজ্ঞে না ঠিকই আছে।

বহুত আচ্ছা! তা হলে পেতে ফেলো। হারমোনিয়মটা সাবধানে বের করে আনন। এসরাজের সিল্কের তৈরি ঢাকা খুললেন। ঝকঝকে শরীরে মিহি ধুলো। নরম কাপড় দিয়ে সযত্নে মোছা হল। ছড়িতে রজন ঘষলেন। রজন ঘষার সরঞ্জাম তাঁর এক অসাধারণ কারিগরি। ছোট্ট একখণ্ড কাঠ। বাটালি দিয়ে কুঁদে নৌকোর মতো আকৃতিতে এনেছেন। মসৃণ। ওভ্যাল। ভেতরের খোলে রজন গলিয়ে ঢেলে দিয়েছেন। তৈরি হয়েছে রজনের খোপ। বস্তুটা অপূর্ব এক কারুকর্ম। নাম□— রজন- কাঠ। ছড়ির ছড় বারকয়েক ঘষলেই তারে স্বচ্ছন্দ গতি।

এসরাজ বাঁধা হল। আমাকে বললেন, ওই গানটা গাইবার চেষ্টা করো। তাঁহারে আরতি করে...। এসরাজে ছড় টানলেন। মিঠে মোলায়েম সুর ডানা মেলে উড়ে গেল।

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন, দেব মানব বন্দে চরণ□—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে॥

রমেশবাবু যেভাবে গান, সেইভাবে গাইবার চেষ্টা করছি। হচ্ছে না। তবু চেষ্টা আপ্রাণ।

অনাদিকাল অনন্তগগন সেই অসীম-মহিমা-মগন
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন আনন্দ-নন্দ-নন্দ-রে॥

The people that walked in darkness have seen a great light.

ভগবান কে, এই প্রশ্নের সমাধান কোনওকালেই হবে না। আমিও ভগবান হতে পারি। পিতা হরিশঙ্কর হয়তো একটু পরেই বলবেন, ওয়র্ক ইজ গড। আবার হয়তো পরমুহূর্তেই বলবেন, ম্যাথেমেটিক্স ইজ গড। আমার কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়, হরিশঙ্করকে যেভাবেই হোক আটকানো। বালিশের তলা থেকে পিসিমার চিঠিটা বার করে তাঁর হাতে দিলুম।

নিতে নিতে বললেন, কার চিঠি?

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পড়তে শুরু করলেন। মুখের চেহারা পালটাচ্ছে। পড়া শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কী সিদ্ধান্ত?

ভয়ংকর সমস্যা।

হরিশঙ্কর বাজ পড়ার মতো চমকে উঠলেন, সমস্যা বলছ কেন?

এত বড় একটা পরিবার ঘাড়ে এসে পড়বে।

নোংরা একটা বাথরুমে ঢুকলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন হয়, হরিশঙ্করের মুখের চেহারা সেইরকম হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এমন একটা কথা তুমি বলতে পারলে? ঘাড়ে এসে পড়বে। অসহায় একটা পরিবার অনাহারে নির্যাতনে দিন কাটাচ্ছে, তাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার নেই?

আপনি চলে গেলে আমি একা কী করে সামলাব?

আমি যদি মরে যেতুম, তুমি তোমার পিসিমাকে সাহায্য করতে না? না আমার বোন বলে দায়িত্বটা একা আমারই? কী তোমার মনোভাব? কী শিক্ষা পেলে তুমি? মঠ-মিশনে গিয়ে কী পেলে তুমি? কী হল তোমার? এখনও গেল না আঁধার!

শরীর খারাপের জন্যেই বোধহয় মেজাজ হঠাৎ বিগড়ে গেল। বলেই ফেললুম, আমার একার রোজগারে অত বড় একটা ফ্যামিলি সামলানো সম্ভব? কারও পক্ষেই কি সম্ভব?

হরিশঙ্কর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললেন, আলবাত সম্ভব। পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই, যদি মানুষের ইচ্ছে থাকে। কম রোজগারে এর চেয়ে কত বড় পরিবার প্রতিপালিত হচ্ছে। তুমি দেখতে চাও? একসময় আমাদের যৌথ পরিবার কত বড় ছিল, আমার বাবার সামান্য রোজগার। আমরা কি মরে গেছি? ভেসে গেছি? ধরো তোমার যদি আরও কয়েকটি ভাইবোন থাকত, আর আমি যদি মরে যেতুম, তা হলে তুমি কী করতে? বাবার বউ বাবার ছেলেমেয়ে বলে সব ফেলে রেখে পালাতে?

সেটা অন্য কেস।

অন্য কেস নয়। দুটো কেসই সমান। কেবল মনটা অন্য। নিজের ভাবতে পারলে দুটোই সমান। তোমার স্বার্থ জেগেছে। তুমি এখন নিজের সংসারের স্বপ্ন দেখছ। নিজের সুখের স্বপ্ন, নিজের ভোগের স্বপ্ন। এই বাড়িটা খুব পুরনো হয়ে গেছে, তোমার একটা নতুন বাড়ি চাই। সেখানে তোমার সুন্দরী স্ত্রী। একটি-দুটি ছেলেমেয়ে। সম্ভব হলে ছোট একটা গাড়ি। সুখী পরিবার ভোগ আর স্বার্থের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ত্যাগ কাকে বলে তোমার ধারণা নেই। ছেলেবেলা থেকে একা মানুষ হয়েছ, একাই থাকতে চাও।

আমার মাথা ঝাঁঝাঁ করছে। কানদুটো গরম আগুন। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার ক্ষুদ্র আমি রাগে তিড়বিড় করছে। চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে, তীব্র ভাষা ব্যবহার করতে ইচ্ছে করছে। ক্ষণকাল আগের আধ্যাত্মিক শিক্ষা অকেজো মনে হচ্ছে। নৌকো যেমন মাঝনদীতে ঝড়ের ঢেউয়ে টলমল করে, আমাতেও সেই ক্রোধের দুলুনি। কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে স্বাভাবিক রেখে বললুম, এ আমার স্বার্থপরতা নয়, ভয়। আমার ভয় করছে।

হরিশঙ্করের ঠোঁটে সেই বাঁকা হাসি, ভয় থেকেই স্বার্থপরতা আসে। সহোদর ভাই। হারাবার ভয়েই মানুষ স্বার্থপর হয়। নাথিং টু লুজ অ্যান্ড নাথিং টু ফিয়ার। তোমার ভয়টা কীসের? কমফর্ট হারাবে, হারাবে যা খুশি তাই করার স্বাধীনতা। জীবন বাঁধা পড়ে যাবে। জীবনের এতটা পথ ফাইট করতে করতে আসার পর আমি ভেবেছিলুম, এইবার একটু মুক্তি অর্জনের অধিকার সংসার আমাকে দেবে। তা আর হল না। আবার আমাকে কোমর বেঁধে জলে নামতে হবে। আবার শুরু করতে হবে গোড়া থেকে। এই বুড়ো বয়সে আবার আমি চাকরির সন্ধানে বেরোব, দশটা-পাঁচটা। আবার ঠেলব সংসারের চাকা।

সাহস করে বললুম, আমরা যদি না থাকতুম।

থেকে কী করে ভাবা যায় আমি নেই! আমি আমার জন্যেই আছি আর কারও জন্যে নেই, এ ভাবনা তো আমার পক্ষে অসম্ভব। অল রাইট, তুমি তোমার ভাবনা ভাবো, আমি আমার ভাবনা। যে-বোন আমার কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে, তাকে আমি ফেলতে পারব না। বরং ফেলে দেব আমার গবেষণা।

গবেষণা? অবাক হয়ে গেলুম। হরিশঙ্কর গবেষণা করতে গিয়েছিলেন। জানতে ইচ্ছে করছে, কী গবেষণা? কোথায় সেই গবেষণাগার? এখনই সেই প্রশ্ন করলে কোনও উত্তর দেবেন না। তার আগে নিজের দুর্বল চরিত্রের পুনরুদ্ধার প্রয়োজন। হরিশঙ্করের চোখে নিজের উজ্জ্বল মূর্তি তুলে ধরতে হবে। তিনি ধরেছেন ঠিক, নিজের সুখ বিসর্জন দিতে হবে এই ভয়েই আমি কাতর। আমার ফুরফুরে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। সেই গান মনে পড়ছে—এক হাতে মোর পূজার থালা আর এক হাতে মালা। এক হাতে আমার ত্যাগের বড়াই, আর এক হাতে নারীদেহের স্পর্শ। এমন একটা ভণ্ড শয়তান কী করে হরিশঙ্করের পুত্র হল! দেবতা সৃষ্টি করলেন অপদেবতা। মধ্যপ্রাচ্যের আমির হবার কিংবা মোগল বাদশা হবার সব গুণ আমার মধ্যে বর্তমান। হারেম, ঝরোখা, গোলাপবাগিচা, ঝুলা, কোয়েলিয়া, বাইনাচ, রাঙা পানীয়ের গেলাস। মনে একেবারে মথুরা। ধরেছেন ঠিক। হরিশঙ্কর ধরবেন না তো কে ধরবেন! অন্তর্দর্শী।

একটু নড়েচড়ে বসতে হল। এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে জীবন আমার কোন পথে চলবে। বিদ্রোহী হওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। একটা ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করতেই হবে। এ ছাড়া আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বেশ জোর গলায় বললুম, আমি আপনার সঙ্গেই আছি। বলুন আমাকে কী করতে হবে?

হরিশঙ্কর স্থির চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, আমিও তোমার সঙ্গে আছি। আমাদের দু'জনকেই আবার সংসারে ঢুকতে হবে। অন্যের সংসারে। আমি পুরুলিয়ার ঝালদায় গালা দিয়ে একটা রিসার্চ শুরু করেছিলুম। ফল সংরক্ষণে গালার ব্যবহার। গালার সঙ্গে রং মিশিয়ে ল্যাক পেন্ট, যা দিয়ে শিল্পীরা ছবিও আঁকতে পারবেন। আর চেয়েছিলুম চাঁচগালা তৈরি করতে গিয়ে যেসব কর্মীর দু'হাতের আঙুল ক্ষয়ে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে তাঁদের পুনর্বাসন। মিশনারিরাই আমাকে সাহায্য করছিলেন, আমার সেই কাজটা বন্ধ হয়ে যাবে। এখানেই আমাকে একটা কিছু করতে হবে। কোনও ব্যাবসা কি ছেলে পড়ানো। এ জীবনে বড় কিছু আর করা গেল না। স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল।

না, তা হবে না। আপনি যা শুরু করেছেন শেষ করুন। আমি একাই টানব।

কী করে? তোমাকে তো দেরাদুনে যেতে হবে।

বলে-কয়ে কলকাতাতেই থাকব। প্রোমোশনের দরকার নেই।

তা হয় না। আমি জীবন শেষ করতে চলেছি, তুমি চলেছ শুরু করতে।

আচ্ছা এমন হয় না, আমরা সবাই পুরুলিয়ায় সেটল করলুম। আপনার কাজে আমিও সাহায্য করলুম। আমাকে ওঁরা মাইনে দেবেন না?

পিন্টু, এ-ও এক ধরনের কর্মসন্ন্যাস। এটা ঠিক চাকরি নয়। সেবা।

তা হলে আসুন আমরা দু'জনে মিলে এখানেই একটা কেমিকেল ইন্ডাস্ট্রি করি। আপনার বহুদিনের স্বপ্ন। ছেলেবেলায় আমাকে বলতেন, কারও দাসত্ব যাতে করতে না হয় সেই চেষ্টা কোরো। আমি পারিনি। তোমার মধ্যে আমি আমার স্বপ্নের রূপায়ণ দেখতে চাই। আসুন না, আমরা একটা পরিকল্পনা তৈরি করি। কত কী-ই তো করা যায়। অনেকেই তো অনেক কিছু করছেন।

এইরকম একটা ইচ্ছে আমারও হচ্ছে। সাত্ত্বিক থেকে রাজসিক।

আপনি চেষ্টা করলে অসম্ভবও সম্ভব হবে। আপনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। আমার অনেক কল্পনা আপনাকে ঘিরে। আপনি একজন বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছেন। কত মানুষ কাজ করছেন আপনার প্রতিষ্ঠানে। সাদা অ্যাপ্রন পরে নিজের ল্যাবরেটরিতে নিজের কাজ করছেন আপনি। চোখে সোনার চশমা। এই বাড়িটা ভেঙে নতুন একটা বাড়ি হয়েছে। চারপাশে সুন্দর বাগান। গ্যারেজে সাদা রঙের ঝকঝকে একটা গাড়ি। মাঝে মাঝেই আপনি বিলেতে যাচ্ছেন। বিদেশিরা আসছেন আপনার প্রতিষ্ঠানে। সুন্দর একটা অফিস। টাইপরাইটারের খটখট শব্দ। কেমিকেলসের গন্ধ।

উত্তেজনায় আমি ঘরে পায়চারি শুরু করলুম। একটা কিছু করতে হবে। নিজেদের জন্যে, অন্যের জন্যে। এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ। মনে হচ্ছে আমিই হরিশঙ্কর। যত পাক মারছি ততই মনে হচ্ছে আমি বড়লোক হয়ে যাচ্ছি, লাখোপতি, কোটিপতি। হালকা লাগছে শরীর। সব বিষণ্ণতা কেটে যাচ্ছে। ঘরের আলোর পাওয়ার বাড়ছে। তখন আমি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখব। ড্রেসিংগাউন পরে বাথরুম থেকে বেরোব। স্লিপিং সুট পরে নেটের মশারিতে শোব।

হরিশঙ্কর বললেন, এইবার তুমি একটু স্থির হয়ে বসতে পারো। প্রায় মাইলখানেক পায়চারি হল। ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট ওয়াকিং। লোকে হজমের জন্যে বেড়ায়।

আমার ভেতরে একটা শক্তি আসছে। ডু আই মাস্ট।

ইংরেজি ভাষার একটা শক্তি আছে, কিন্তু আমাদের কিছু করতে হলে করতে হবে বাংলায়। তুমি বোসো। দেখো ডক্টর রয় এখন চিফ মিনিস্টার। আমাকে একটু পছন্দও করেন। কংক্রিট একটা স্কিম তাঁর সামনে ফেলতে পারলে টাকার অভাব হবে না।

আমার আর তর সইছে না, বললুম, কালই তা হলে চলুন।

দরজার কাছ থেকে জয়নারায়ণ বললেন, না না কাল কী করে যাবেন? এখনও দিন সাতেক আমাকে কলকাতায় থাকতেই হবে। রেকর্ডিং আছে, রিহার্সাল আছে। ট্রেনের টিকিট কেটে রিজার্ভেশন করতে হবে।

জয়নারায়ণ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আমার কথার শেষটা শুনেছেন। প্রথম দিকটা শুনতে পাননি। ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, কাঁচি ধুতি। হরিশঙ্কর বললেন, চললে কোথায়? বরযাত্রী?

জয়নারায়ণ বললেন, ড্রেস দেখে বলছেন? বেশি মিহি হয়ে গেছে, তাই না?

ভেতরের গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। একটু অবসিন হয়ে গেছে। তোমার মতো একজন কালচারড মানুষের এটা নজরে পড়ল না? আরে ছি ছি।

জয়নারায়ণ লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে গেলেন। নিজের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটা তা হলে পালটানো দরকার?

অফকোর্স! এই পোশাকে লোক চরিত্রহীন হয়ে যায়।

জয়নারায়ণ বললেন, আসল কালপ্রিট তা হলে এই পাঞ্জাবিটা?

হ্যাঁ, তোমার শাঁস দেখা যাচ্ছে।

এ তো তা হলে আর কোনওদিনই পরা যাবে না। তা হলে কী করব এটাকে?

ভাল করে কাচিয়ে মেয়েমহলে চালান করে দাও, চা ছাঁকার কাজে লেগে যাবে। এটা আসলে ফিল্টার ক্লথ। তোমাকে ভুল করে পাঞ্জাবির কাপড় বলে গছিয়ে দিয়েছে।

পাঞ্জাবিটা চা ছাঁকার কাজে ব্যবহার করা যাবে জেনে মাতুল জয়নারায়ণ ভয়ংকর খুশি হলেন, যাক একটা ভাল কাজে লাগবে। কোনও চায়ের পাতাই আর লিক করবে না। গুঁড়ো চা-ও ব্যবহার করা যাবে। গুঁড়ো চায়ে বেশ আয় দেয়। সংসারের সেভিংস হবে।

তা হবে। তবে ছাঁকনিটা একটু কস্টলি হয়ে গেল।

না, খুব একটা কস্টলি হবে না। সাড়ে তিন গজ কাপড় আছে, অনেকগুলো পিস বেরোবে। জয়নারায়ণ বেশ খুশি হয়ে ভিতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে হরিশঙ্করের সামনে দাঁড়ালেন। যেন পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে, এখন অভিভাবক কী বলেন। হরিশঙ্কর বললেন, হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। ট্র্যানসপেরেন্ট থেকে ওপেক। তা তুমি যে বড় বাধ্য ছেলের মতো আমার কথা শুনলে?

শুনব না? আপনার হাই টেস্ট। তা কালই যাবেন ঠিক করছেন?

না না, আমরা একটা ব্যাবসা করার পরিকল্পনা করছি। ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি।

জয়নারায়ণ লাফিয়ে উঠলেন, উঃ, সেই কারণেই বলে গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। আমিও সেই কথাই ভাবছি বেশ কয়েক মাস ধরে। আসুন তা হলে লেগে পড়ি। মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। হারমোনিয়ম তৈরি হবে। স্কেলচেঞ্জ, কাপলার। টিউনিংটা আমি ভালই পারব। কোম্পানির নাম হবে চ্যাটার্জি ফ্লুট। রিডে মাদার অফ পার্লস। বেলোয় রুপোর পাতের ডেকরেশন। এক একটা হারমোনিয়ম বেরোবে যেন ওয়ার্ক অফ আর্ট। সুর ঝরবে ঝরনাধারার মতো।

মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস পারবে না জয়। ওর জন্যে একটা ট্র্যাডিশন গড়ে তুলতে হয়। একটা হাউস। তোমাদের গানের ঘরানার মতো বাদ্যযন্ত্রেরও ঘরানা আছে। সেই ট্র্যাডিশন গড়ে উঠতে উঠতেই আমরা ভবসাগরের পারে চলে যাব।

তা হলে আর কী করা যাবে? জয়নারায়ণের উৎসাহ ভেঙে পড়ল।

হরিশঙ্কর বললেন, আমার মাথায় একটা এসেছে। সেটা আমার লাইন। পারফিউমস।

মানে সেন্ট! জয়নারায়ণ নড়েচড়ে বসলেন, তা হলে আমি হব পাবলিসিটি অফিসার। যেসব আসরে যাব গায়ে মেখে যাব। একেবারে মাত হয়ে যাবে। সবাই জিজ্ঞেস করবেন, কী মেখেছেন? কোথায় পাওয়া যায়? ওয়াইড পাবলিসিটি। নাম রাখা হবে সমীরণ। নাঃ বাংলা নাম চলবে না। ইংরিজি নাম রাখতে হবে। প্রাইভেট অ্যাফেয়ারস, সিক্রেট টাচ, অ্যাফেক্‌শন, কিস, এইসব।

হরিশঙ্কর মৃদু হাসছেন, বললেন, এ পারফিউম সে পারফিউম নয় স্যার। এ হবে স্পেশ্যাল ব্লেন্ড। বড় বড় সাবান কোম্পানি, পাউডার-স্নো কোম্পানি, এমনকী ওষুধ কোম্পানিও এই ব্লেন্ড কিনবে। তারাই ব্যবহার করবে। এর বেশির ভাগটাই এখনও বিদেশ থেকে আসে। বম্বেতে একটা মাত্র প্রতিষ্ঠান হয়েছে। এই ব্লেন্ডিং একটা মস্ত বড় আর্ট। জানো তো পারফিউমকে ফিক্‌স করতে হয়।

মানে? সুগন্ধী কি ফার্নিচার যে ফিক্‌স করতে হবে?

ভাল পারফিউম মানে শুধু ভাল গন্ধ নয়, লাগাবার পর অনেকক্ষণ যেন গন্ধটা থাকে। লাগালুম আর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল, তা যেন না হয়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় ফিকসেটিভের। বেড়ালের নাড়িভুঁড়ি থেকে তৈরি হয় সিভেট। সিভেট, স্যান্ডাল এইসব হল ফিকসেটিভ। যাক, এইসব আলোচনা অর্থহীন। আমরা ভাবছিলুম ডক্টর রায়ের কাছে একবার যাব আমাদের এই পরিকল্পনা নিয়ে। তোমার কী মত?

খুব ভাল হবে। ওয়ান্ডারফুল।

তুমি এখন চললে কোথায় সেজেগুজে?

সুরঞ্জনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। বাড়ি যাবে বলছে।

এই যে বললে আজ থাকবে, রাতে আমার কাছে বসবে অঙ্ক নিয়ে।

মেয়েদের মত তো মিনিটে মিনিটে বদলায়।

ওকে ডেকে আনো।

সুরঞ্জনা এল। কোনও সাজগোজই নেই। এলোমেলো হয়ে আছে। মাতুল জয়নারায়ণের মতোই লম্বা। চেহারার ধার কী! তরোয়ালের মতোই। সুরঞ্জনাকে দেখলে আমার লজ্জা আসে নিজের ওপর। যেমন স্মার্ট,

তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত। আমি এক ম্যাদামারা। বাসী লুচি। ভিজে দেশলাই। শরীরে একটু শক্তি এলেই নিজের সংস্কারে লেগে যাব। সাদা ফিনফিনে শাড়ি, হালকা হলুদ রঙের ব্লাউজ।

হরিশঙ্কর বললেন, তুমি চলে যাচ্ছ?

কই না তো! কোথায় যাব? বাড়িতে তো কেউ নেই। এই জমজমাট বাড়ি ছেড়ে কেউ যেতে পারে? আনন্দের হাটবাজার।

জয়নারায়ণ বললেন, কী বলেছিলুম আপনাকে? মিলিয়ে নিন।

হরিশঙ্কর সুরঞ্জনাকে বললেন, যাও। এই প্রশ্ন করার জন্যেই ডেকেছিলুম। তোমরা কী করছ?

আমরা কাকিমার গল্প শুনছি। কিছু বলবেন? কিছু করতে হবে?

জয়নারায়ণ বললেন, করতে হবে না? চা না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায়? এক রাউন্ড হয়ে যাক।

সুরঞ্জনা বললে, আর কিছু? চায়ের সঙ্গে কোনও টা?

নো টা। সিম্পল চা।

সুরঞ্জনা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল। এই মেয়েটির প্রতি হরিশঙ্করের একটা মমতা জন্মেছে বেশ বোঝাই যাচ্ছে। বোধহয় বিজ্ঞানের ছাত্রী বলে। কিংবা বন্ধুকন্যা বলে। মুকুর ওপর এই স্নেহটা কিন্তু আসেনি। মুকুর দুর্ভাগ্য।

আমরা তিনজনেই থম মেরে বসে আছি। হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে হুস করে একটা চামচিকি ঢুকে ঘরের মধ্যে পাক মারতে লাগল। বোমারু বিমানের মতো। জয়নারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে খসে পড়লেন মেঝেতে। পারলে খাটের তলায় ঢুকে যান। হরিশঙ্করের দৃষ্টি জয়নারায়ণের দিকে। গভীর আগ্রহে দেখছেন আরও কী করতে পারে। কত দূর যেতে পারে। চামচিকির যা স্বভাব। উন্মাদের মতো ঘরময় লাট খাচ্ছে। জয়নারায়ণের ঘাড় নিচু। মাথার ওপর দু'হাতের আড়াল।

হরিশঙ্কর বললেন, যতটা নিরাপদ ভাবছ নিজেকে ততটা নিরাপদ জায়গা ওটা নয়। মাঝে মাঝে ডাইভ মারছে। তুমি বুকে হেঁটে খাটের তলায় গেলে ভাল করতে। তার আগে অবশ্য ভেবে নাও, কোনটা তোমার ভাল লাগবে, চামচিকির লাথি না আরশোলার খোঁচা!

জয়নারায়ণ করুণ কণ্ঠে বললেন, আমার এই বিপদের মুহূর্তে আপনারা কোনও সাহায্যেই আসছেন না! চামচিকির ব্যালে দেখছেন!

হরিশঙ্কর বললেন, আর দেখাচ্ছে কোথায়? সবচেয়ে সমঝদার দর্শক যাকে ভেবেছিল তার এই দশা দেখে লজ্জায় ঘরের আকাশ ছেড়ে বাইরের আকাশে ফিরে গেছ। তুমি এইবার ভূমিতল ছেড়ে চেয়ারতলে ফিরে আসতে পারো। তোমার অমন সাদা ধবধবে ধুতি ময়লা হয়ে গেল।

জয়নারায়ণ ঘাড় তুলে সাবধানে চারপাশ দেখতে দেখতে বললেন, আত্মরক্ষার সময় জামাকাপড় তুচ্ছ হয়ে যায় চাটুজ্যেমশাই। চামচিকির লাথি খেলে কী হয় জানেন? অস্টিওম্যালাইটিস। হাড়ে চুন জমে সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পড়ে যায়।

কোথায় পড়বে? বাইরে?

না না, দেহের থলের মধ্যেই।

বাবা, এটা তো জানা ছিল না। কোন ডাক্তারি শাস্ত্রে লেখা আছে জয়?

সব কি আর শাস্ত্রে থাকে চাটুজ্যেমশাই? কিছু থাকে মানুষের বিশ্বাসে। চামচিকি হল ইল-ওমেন। অশুভকারী।

হরিশঙ্কর বললেন, চামচিকি হল আত্মা। সেকথা জানো কি? হয়তো কোনও ভাল সোল এসেছিল। তুমি তাকে উপেক্ষা করলে।

জয়নারায়ণ শিশুর মতো মুখের ভাব নিয়ে তাকিয়ে রইলেন হরিশঙ্করের দিকে।

জীব আজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি, লয়ে জ্ঞানতূণ, রসনাধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ,
ব্রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তাহে সন্ধান করে॥

সিল্ক টুইলের সাদা ধবধবে শার্ট। গলার একেবারে ওপরের বোতামটা পর্যন্ত টাইট করে লাগানো। একমুখ পান। বেঁটেখাটো হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। সামনে সিঁথি। বসে আছেন হরিশঙ্করের ছোটমামা। অকৃতদার। তন্ত্রসাধক। বেশিরভাগ সময় তারাপীঠেই থাকেন। শবসাধনা করেছেন। অলৌকিক শক্তির অধিকারী। বাইরে থেকে দেখলে কিছুই বোঝা যাবে না। যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরা ভয় আর ভক্তি দুটোই করেন। একটু খোঁচাখুঁচি যিনিই করেছেন তিনিই মরেছেন। প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটা গোপন দিক থাকে। সর্বসমক্ষে তাঁর গোপনীয়তা উন্মোচিত হলে লজ্জার একশেষ। এই সাধক তাঁর অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন, তখন আর তিনি পালাবার পথ পান না। এঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে সবাই কাচের মানুষ। আমার সামনেই কতবার এমন ঘটনা ঘটেছে।

একবার এক বড় ডাক্তার এসেছেন খোঁচাখুঁচি করতে। সন্দেহবাদী, অলৌকিকে বিশ্বাস নেই। বিলিতি ডিগ্রিধারী। বিশাল পসার। এসেছেন শক্তি পরীক্ষা করতে। খুব দগদগে কথা বলছেন, শবসাধনা? কী আছে মশাই শবে! জাস্ট এ ডেডবডি। বরং একটা কঙ্কালের প্রয়োজনীয়তা আছে। অ্যানাটমির ছাত্রের কাজে লাগে। অমন ডেডবডি আমরা বহুবার ডিসেক্ট করেছি। তা হলে তো আমরাও অলৌকিক শক্তির অধিকারী, কী বলেন মিস্টার ব্যানার্জি?

ছোটদাদু মিচকি হাসছেন।

ডাক্তার বলছেন, আমাদের ধর্ম থেকে এই বুজরুকিটা না গেলে শিক্ষিত লোক কোনওদিনই ভিড়বে না। বোকা আর অশিক্ষিত মানুষরাই এই ফাঁদে পা দেবে। গুরুদের এই ব্যাবসাদারি ক্রিমিনাল অফেন্স।

ছোটদাদুর মুখে পান ছিল। ছিবড়েটা ফেলে মুখ খালি করলেন। ভাঁজ-করা সাদা রুমালে পাতলা ঠোঁটদুটো সাবধানে মুছলেন। প্রস্তুত হচ্ছেন। আমরা যারা জানি, বসে আছি থম মেরে। পরিচিত যে-ভদ্রলোক ডাক্তারবাবুকে এনেছেন তিনি মহা বিব্রত।

ছোটদাদু বললেন, কেন এসেছেন?

ডাক্তার বললেন, খুব প্রচার আপনার, মুখ দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন!

ছোটদাদু বললেন, তিনটেই জানতে চান, না চারটে? ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই নিয়ে ইহকাল, তারপর একটা আছে পরকাল।

ডাক্তার বললেন, পরকাল তো একটা আজগুবি গল্প, যা বলবেন তাই মানতে হবে! ইহকালটাই হোক। তবে তাই হোক, বলে ছোটদাদু অদ্ভুত হাসলেন। এক টিপ নস্যি নিলেন। এইবার জামার পকেট থেকে একটা রুমাল বেরোল। খাড়া খড়্গের মতো নাক। নাক মুছলেন, তারপর বললেন, অফিসের ক্যাশ ভেঙে জেলে যেতে হচ্ছিল, আত্মহত্যা করলেন, তারপর মামার বাড়িতেই মানুষ। মামাদের প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা জানালেন মামাতো বোনটিকে নষ্ট করে। ভালই করেছেন। কিন্তু আপনার এমন স্বাস্থ্য, পারেন না কেন? ইমপোটেন্ট হয়ে পড়েছেন। স্ত্রী তো অন্যভাবে অন্য লোকের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছে। ডিসগ্রেসফুল। রোজগার তো কম নয়, জীবনের শান্তি কোথায় ডাক্তার? আমাকে পরীক্ষা না করে নিজেকে পরীক্ষা করান। ফিজিশিয়ান হিল দাইসেলফ। নিজের স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে দেখতে ভাল লাগে ডাক্তার? ডিসগ্রেসফুল। মাত্রাতিরিক্ত সেলফ অ্যাবিউজের ফল। বউ এখন ব্ল্যাকমেল করছে। সো স্যাড। আপনারই পয়সা অন্যের জন্যে দু'হাতে ওড়াচ্ছে। ছেলেটা যে আপনার নয় সে আপনি ভালই জানেন। বাবা বলে যখন ডাকে লজ্জা পান, তাই না ডাক্তার?

ডাক্তার স্তম্ভিত। মুখ কালো। মাথা হেঁট। শেষে কাঁদোকাঁদো অবস্থা।

ছোটদাদু বলেই চলেছেন, আপনার বাড়ির উত্তর দিকের হলদে বাড়ির ফরসামতো ছেলেটা এখন আপনার স্ত্রীর ইজারা নিয়েছে। অতীত আর বর্তমানের একটুখানি হল, এইবার ভবিষ্যৎ। পাঁচ বছরের মধ্যেই আপনার স্ত্রী পাগল হয়ে যাবে। আর যে আপনার ছেলে বলে পরিচিত, সে আপনাকে বাড়ি-ছাড়া করবে। ভবিষ্যতের দিকে আর একটু এগোই? আপনার পার্কিনসনস ডিজিজ হবে। সেটা কী নিশ্চয় জানেন। ভেবে দেখো, শেষের সেদিন কী ভয়ংকর! কেন এমন হবে! প্রারব্ধ। কেন এমন হবে? তামসিক অহংকার হল আপনার ঘোড়ার জকি। সে যেমন চালাচ্ছে, তেমনি চলছেন আপনি। টাকার গরম, পসারের গরম, মোসায়েবদের মালিশ আর আলগা চরিত্রের কিছু মহিলা দিলে সর্বনাশ করে। এরপর ময়লা বিছানায় শুয়ে থরথর করে কাঁপবেন। কাপড়েচোপড়ে মাখামাখি। পাশে থাকবে একজন, সে আপনার বিধবা বোন, যাকে আপনি এখন বাড়ি ঢুকতে দেন না। আর কিছু জানতে চান ডাক্তার? সামথিং কংক্রিট? অ্যান্ড হিয়ার ইট ইজ। আপনার কাছে এখন তিন হাজার সাতশো কুড়ি টাকা বারো আনা আছে। দুটো মরফিনের অ্যাম্পুল আছে, সন্ধেবেলা আপনার নিজেরই লাগবে। গাড়িতে এক বোতল বিলিতি হুইস্কি আছে। নোংরা ছবির বই আছে একটা। আরও গভীরে যাব? আপনার প্রাইভেট পার্টসে সম্প্রতি একটা ঘা হয়েছে। ওপাশে ক'দিন হল পাইলস খুব ভোগাচ্ছে। ফিসচুলার দিকে যাচ্ছে। আরও চাই ডাক্তার? এনিথিং মোর ইউ ওয়ান্ট!

ডাক্তার কেঁদে ফেললেন। একটা তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ডের মতো হয়ে গেলেন। অতিকষ্টে বললেন, আমাকে বাঁচান।

ছোটদাদু বললেন, বাঁচানো যায় না, তবে সহ্যশক্তিটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়, টলারেন্স। ফুটবাথের মতো। ভীষণ গরম জল। ধীরে ধীরে সহ্য করার শক্তি বেড়ে গেলে আর পা ডুবিয়ে বসে থাকতে অসুবিধে হয় না। সহজ ব্যাপার। এর জন্যে কী করতে হবে? শ্লেটের সব লেখা সাত্ত্বিক ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলতে হবে। ত্যাগ আর তিতিক্ষার পেনসিল দিয়ে ফোটাতে হবে নতুন বর্ণমালা।

সেই ডাক্তার এখন দাদুর প্রধান শিষ্যদের একজন। বেশিরভাগ সময় আশ্রমেই থাকেন। শান্ত সমাহিত এক নতুন মানুষ। এইরকম অজস্র ঘটনা আছে দাদুর জীবনে। একবার একদল গুন্ডা কালীপুজোর রাতে দাদুকে

মারতে এসেছিল। সামনে গিয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়ালেন। সব স্থাণু। কেউ আর নড়েও না চড়েও না। শেষে ছোটদাদু বললেন, আচ্ছা! তা হলে তোমরা এইবার যাও। একটা মৌন মিছিল ধীরে ধীরে চলে গেল। সব যেন নেশায় বুঁদ।

হরিশঙ্কর মুখে না বললেও এই ছোটদাদুকেই গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। হরিশঙ্কর অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস করেন বিজ্ঞান, কর্ম, সাধনা আর পবিত্র জীবন। বিয়ে করে কেউ সংসারে ঢুকলে আক্ষেপ করে বলেন, যাঃ হয়ে গেল। জীবনের ডানা ভেঙে গেল। ছোটমামা বিয়ে করেননি, সেটা একটা পয়েন্ট। বিয়ে তো করেননি, অনেকে বিয়ে না করেও নারীসঙ্গের জন্যে ছোঁকছোঁক করেন, ছোটমামা তা করেন না। কামজয়ী সাধক। পয়েন্ট দুই। তিন নম্বর, প্রবল সাধনভজন করেন। চার নম্বর, পবিত্র জীবনযাপন, কদাচারী তান্ত্রিক নন। পরমাশক্তির উপাসক। ছোটদাদুকে আমি শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি আমাকে ভয়ংকর ভালবাসেন। আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন আমার ভবিষ্যৎ মহৎ জীবনের ছবি। কেবল বলেন, তুমি কী হবে তুমি নিজেই জানো না। আমার সব হতাশা সব দুর্বলতা ঝরে যায়, একটা আকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রদ্ধার দ্বিতীয় কারণ, আমি তাঁর মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখেছি। সেটা কী, তার মধ্যে বিজ্ঞান আছে না তন্ত্র আছে না ম্যাজিক আছে আমার জেনে দরকার নেই। ছোটদাদুকে প্রশ্ন করেছি। তিনি হেসে বলেছেন, সাধনাই সব। সেইটাই দেখবে। বিভূতির দিকে নজর দেবে না। অমন হয়। সাধনভজন করলে সকলেরই হবে।

সেই ছোটদাদু বসে আছেন দক্ষিণের জানলার দিকে পেছন ফিরে, হাতলঅলা চেয়ারে। সামনে একটা গোল কাঠের টেবিল। মুখোমুখি বসে আছেন হরিশঙ্কর। আমি ঘুরঘুর করছি। হঠাৎ হরিশঙ্কর টেবিলে একটা আঙুল ঠুকে বললেন, হোয়াই? ক্যান ইউ টেল মি হোয়াই? কেন এমন হবে? আমরা মানবই বা কেন?

দুজনেই সমবয়সি। একই সঙ্গে লেখাপড়া করেছেন, তাই তুই-তোকারির সম্পর্ক।

ছোটদাদুও হরিশঙ্করের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি করলেন, হোয়াই। কেন মানব আমরা! আমাদের অধিকার কেন ছাড়ব? হোয়াই!

হরিশঙ্কর আর একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, দ্যাটস রাইট। একজন মহিলা যেই বিধবা হবে, অমনি পুত্র-কন্যা সমেত তাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হবে কেন? বাঙালির এ কী অসভ্যতা! প্রতিবাদ করা হয় না বলে, বেড়েই চলেছে, বেড়েই চলেছে। আমরা তা হলে কী করতে আছি! উই মাস্ট ফাইট। জীবনটা বড় শান্ত হয়ে আসছে। বহুকাল বড় ধরনের কোনও মারামারি হয়নি। এখনও দশ-বিশটা লোকের মহড়া নিতে পারি। ছোটদাদু খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, লাস্ট কবে মারামারি করেছিস?

তা বছর দশেক হল। কলকাতার ময়দানে গোটা পাঁচেক বাঁদরকে দিনকতকের জন্যে শুয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম।

তোর টেকনিকটা কী?

বেধড়ক ঘুসি আর যুযুৎসুর প্যাঁচ, রদ্দা।

আমি আবার কুস্তির লাইনটা প্রেফার করি। একবারে মাথার ওপর তুলে বারকতক ঘুরিয়ে ছুড়ে ফেলে দিই। মহাভারতের স্টাইলটাই আমার হাতে খোলে ভাল। দুটো পা ধরে ফেঁড়ে ফেললুম, কি মুণ্ডটা ঘুরিয়ে দিলুম। ঝামেলা অনেক কম। সময়ও অনেক কম লাগে।

তুই লাস্ট কবে করেছিস?

পরশু দিন। তারাপীঠের শ্মশানে। খুব মাস্তানি করছিল। সবক'টাকে ল্যাংটা করে রামপুরহাটে পাঠিয়ে দিলুম।

বেশ করেছিস। দু'-একটাকে নিরামিষ করে দিতে পেরেছিস?

হ্যাঁ, পালের গোদাটার মনে হল সবকটা দাঁতই ঝরে গেছে।

মানুষের মধ্যে পশুও আছে দেবতাও আছে। সব এক ট্রিটমেন্ট হলে তো হবে না। পশুদের শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজন পশুবলের। ধর্মের কথা, জ্ঞানের কথা, সদুপদেশ, কিছুই কিছু হবে না। মায়ের নাম করো, মায়ের নাম, তারা শালা বলে তেড়ে আসবে। যেমন রোগ তার তেমন দাওয়াই হওয়া উচিত। ভূত ছাড়াতে ওঝার ঝ্যাঁটা। গ্রীক মাইথোলজিতে আছে সেন্টর-এর কল্পনা, যার আধখানা পশু আর আধখানা মানুষ। মানব-দানব কমবাইন্ড। তিনি আবার শিক্ষক। রাজপুত্রদের গুরু। ভবিষ্যৎ রাজা কী শিখতেন? দানবদলনে দানব হবে, মানবপালনে দেবতা হবে। আমাদের নৃসিংহ-অবতার! সেই একই কল্পনা। আমাদের দশ মহাবিদ্যা। ত্বং কালী তারিণী দুর্গা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী/ ধূমাবতী ত্বং বগলা ভৈরবী ছিন্নমস্তকা॥ ত্বমন্নপূর্ণা বাগ্‌দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া/ সর্বশক্তি-স্বরূপা ত্বং সর্বদেবময়ী তনুঃ॥ আমাদের দশাবতার— মীন, কূর্ম, শূকর, নরহরি, বামন, ভৃগুপতি, ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে, রঘুপতি, হলধর, বুদ্ধ, কল্কি। কী কনসেপশন! জগৎ যেমন, শাসনও ঠিক তেমন। কী, তুই আমার সঙ্গে একমত তো?

অবশ্যই। কালই চলো বেরিয়ে পড়ি অসুর নিধনে।

একটা ব্যাপারে আমাদের সাবধান থাকতে হবে, সেটা হল সংযম। এমন কিছু করব না, যাতে থানা-পুলিশ হয়। অ্যাবসলিউট সংযম।

অ্যাবসলিউট। প্রথমে আমরা ভয় দেখাব। তাতে না হলে লোভ দেখাব। লোভ দেখিয়ে বের করে আনব, তারপর আমাদের এলাকায় এনে দাড়া হুল, সব ছেঁটে দেব।

তোর অলৌকিক কিছু করবি নাকি?

এই অলৌকিক শব্দটা সম্পর্কে আমার সামান্য আপত্তি আছে। তোর কাছে যা অলৌকিক আমার কাছে তা ভীষণ স্বাভাবিক। তুই অবিশ্বাসী, তোকে বোঝাতে হলে বিজ্ঞানের রাস্তায় যেতে হবে। যেমন ধর, একটা দেশলাই কাঠি। দেখলে বোঝা যায় আগুন আছে? যায় না। এইবার বারুদের গায়ে ঘষো, ফ্যাঁস! এটা কি অলৌকিক। কিছু শক্তি ধারণ করা যায় বৎস! একটু সাধনা করলেই হয়। তুই যে এসরাজ বাজাস, ওটা কি অলৌকিক? কেউ দশ সেকেন্ড দম বন্ধ করে থাকতে পারে না, আমি দশ মিনিট পারি। আমি অভ্যাস করেছি। আমি প্রাণায়াম করে আসন ছেড়ে ভেসে উঠতে পারি, আমি পারি। কেন পারি, কীভাবে পারি, তা আমি কী করে বলব! প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই পারি হয়তো। ত্রৈলঙ্গস্বামী সারাটা দিন কাশীর গঙ্গায় পদ্মফুলের মতো ভেসে বেড়াতেন। হাঁস জলে ভাসে, পাখি আকাশে ওড়ে, এর মধ্যে অলৌকিক তো কিছু নেই। সেই আর্ট আমার আয়ত্তে এসেছে গুরুর কৃপায়। আমি কী করতে পারি! এখনই দেখবে, বিনা চেষ্টায় আমার ভেতর থেকে কোন অনাহত শব্দ বেরোবে? ঠোঁট ফাঁক হবে না, নড়বে না, বুক পেটে কোনওরকম আন্দোলন হবে না। সেই শব্দে ঘরের সমস্ত জিনিস কাঁপবে। তোমাদের শরীর শিরশির করবে। শুনতে চাও?

হরিশঙ্কর কিছু বলার আগে আমিই লাফিয়ে উঠলুম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

হরিশঙ্কর বললেন, অকাল্টের দিকে এর খুব ঝোঁক।

ছোটদাদু চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে নেমে বসলেন পদ্মাসনে। দেহ স্থির। চোখ নিমীলিত। প্রথমে আকাশের অনেক উঁচু দিয়ে এক ঝাঁক প্লেন উড়ে গেলে যেরকম শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ শুরু হল। তারপরেই উঠল সেই ভয়ংকর শব্দ, একটানা। কোনও ছেদ নেই। টানেলের ভেতর দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। গোমুখে গঙ্গার অবতরণ হচ্ছে। একটা দড়িতে ছোট একটা লোহার পাত বেঁধে কেউ বনবন করে ঘোরাচ্ছে। একাক্ষর শব্দ, ওঁ। হচ্ছে তো হচ্ছেই। কী তার রেজোনেন্স। ঘরের সমস্ত জিনিস চিনচিন করে কাঁপছে। আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষে ঝংকার হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাউডার হয়ে যাব।

হরিশঙ্কর বললেন, স্টপ ইট। স্টপ ইট।

ধীরে ধীরে শব্দ স্তব্ধ হল। ছোটদাদু আবার চেয়ারে ফিরে এলেন।

হরিশঙ্কর বললেন, এ হল সাউন্ড স্প্যাজম। নাদ-সাধনায় এটা হয়।

ছোটদাদু বললেন, আমি এটা সাধনায় পেয়েছি, বাঘ পেয়েছে জন্মসূত্রে। যে-কোনও বাঘই এটা পারে। শব্দটা একটু অন্যরকম হবে। বাঘের ভাষায় হবে, কিন্তু সাউন্ড-কোয়ালিটি এক। এটা কি অলৌকিক?

না। এটা টেকনোলজি।

এখন দেখো, এই শব্দের পিচ যদি আমি আরও বাড়াই, এই ঘরের সবকিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বিশ্বাস করো?

করি। অনেক সময় প্লেনের শব্দে আলমারির কাচ ভেঙে যায়।

আমি এইরকম কিছু ভেলকি দেখাতে চাই ওখানে। অলৌকিক নয় তবে হাইলি-টেকনিক্যাল। তোর আপত্তি আছে?

না। সে তুই করতে পারিস। সাউন্ডকেই অনেক ভাবে ব্যবহার করা যায়, যেমন ভেনট্রিলোকুইজম।

সে বিদ্যাটাও আমার আয়ত্তে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলুম, ছোটদাদু একবার, কখনও শুনিনি।

বলামাত্রই শুনলুম, নীচের রাস্তা থেকে কে আমার নাম ধরে ডাকছে। বোকার মতো রাস্তার দিকের জানলায় ছুটছিলুম। ছোটদাদু হেসে ফেললেন। ওপাশে রান্নাঘরের দিক থেকে কে বললেন, ওদিকে নয় এদিকে এসো।

হরিশঙ্কর বললেন, বাঃ, বেশ ভালই আয়ত্ত করেছিস। দিস ইজ অ্যান আর্ট।

ছোটদাদু বললেন, তোর কন্ট্রোলে এইরকম কিছু আছে?

নাঃ, আমার কন্ট্রোলে আছে শক্তি। আমি মেঘের মতো হাসতে পারি। বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠতে পারি। হাতির মতো সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দিতে পারি। আবার একটু একটু করে সব গড়েও তুলতে পারি। আমি কখনও শ্মশানের চিতা, কখনও উনুনের আগুন। জীবন আর মৃত্যুর সীমানায় মহাকালের দোলকের মতো দোল খাচ্ছি।

ছোটদাদু বললেন, তোমার একটা জিনিস হয়, রঙের পরিবর্তন। কখনও ছাইয়ের মতো ধূসর, কখনও লোহার মতো কালো, কখনও রক্তের মতো লাল, কখনও মঠের মতো সাদা।

শুনেছি বটে, তবে কোনওদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখিনি। মনের ভাবের সঙ্গে রঙের পরিবর্তন হয়। আমার ভিতরে মনে হয় বহুরূপীর মশলা আছে। স্কিনের পিগমেন্টেশন পালটে যায়। বলে না! রেগে লাল। আমি হয়তো সত্যিসত্যিই লাল হয়ে যাই। মনের ভাব অনুসারে আমার দেহের উত্তাপ বাড়ে কমে। পঁচানব্বই থেকে একশো এক চলাফেরা করে। এর কোনওটাই বিভূতি নয়। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, ভাই! অষ্টসিদ্ধির একটা সিদ্ধি থাকলে আমায় আর পাবে না। তোমার একটু শক্তি হতে পারে, এই মাত্র! গুটিকা সিদ্ধি, ঝাড়ানো, ফোঁকানো, দাওয়াই। তবে লোকের একটু উপকার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, সিদ্ধাইয়ের জন্যে তোক পঞ্চ-মকার তন্ত্রমতে সাধন করে। কিন্তু কী হীনবুদ্ধি! সিদ্ধাই থাকলে মায়া যায় না, মায়া থেকে আবার অহংকার। কী হীনবুদ্ধি! ঘৃণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণবারি খেয়ে লাভ কী হল? না মোকদ্দমা জেতা! তুই তো এইসব করেছিস!

ছোটদাদু বললেন, যে-সাধনের যা নিয়ম তা তো আমায় করতেই হয়েছে গুরুর নির্দেশে। সিদ্ধাই এসেই পড়ে, যেমন বৃষ্টিতে দাঁড়ালে মানুষ ভেজে। আটটা সিদ্ধিও আমার এসেছে□— অনিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িতা, এই হল অষ্টসিদ্ধি; কিন্তু আমি প্রকাশ করি না। সবই আমার আছে, প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। যেমন ধর অনিমা, আমি নিজেকে ছোট করতে করতে একেবারে অদৃশ্য করে ফেলতে পারি গুরুর কৃপায়। ব্যাপ্তি, সেটাও এসেছে। বিশালও করে ফেলতে পারি নিজেকে। নিজেকে ভারী করে ফেলতে পারি পর্বতের মতো।

আমি আবার লাফিয়ে উঠলুম, ছোটদাদু অনিমাটা একবার দেখাবেন?

হরিশঙ্কর ধমকে উঠলেন, কী ভেবেছ তুমি? এটা কি যোগের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস? যাও, তোমার কাজে যাও।

ছোটদাদু বললেন, তোমার যখন আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল, সাধনভজনে চলে এসো না?

হরিশঙ্কর বললেন, ঈশ্বর কে চায়, সবাই চায় ম্যাজিক! ও প্রসঙ্গ বাদ দে, এখন প্রস্তুত হ বাঁকুড়ায় যাওয়ার জন্যে। সেখানেই দেখা যাবে তোর অনিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি। আজই গেলে কেমন হয়?

না আজ নয়। আজ আমাদের দিন ভাল নয়। কাল হল উৎকৃষ্ট দিন।

জন্ম-জরার ঝরাধানে ফোটে নয়ন-চারা
কেউ জানে না রসে বশে খেলা কেমন ধারা॥

বহুকাল পরে একটা অজ গাঁ দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। হাঁটছি তো হাঁটছিই। সামনে বিশাল দামোদর। এখন তেমন জল নেই। ধুধু বালি। সামান্য জল চিকচিক করছে কোথাও কোথাও। বালির নদী দেখলে বুকটা কেমন করে ওঠে। আতঙ্ক হয়। আবার নদীর নাম যদি হয় দামোদর, তা হলে তো কথাই নেই। দামোদর নদী নয় নদ। দুঃখ-নদ। নদীতে নামার আগে তিনজনেই থমকে দাঁড়ালুম।

পরম সাহসী হরিশঙ্কর বললেন, একটাই ভয়, চোরাবালি। চোরাবালিতে পড়লে আর রক্ষে নেই।

ছোটদাদু বললেন, স্থানীয় মানুষ যাঁরা পার হচ্ছেন তাঁদের অনুসরণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

হরিশঙ্কর বললেন, তা হলে চল কপাল ঠুকে নেমে পড়ি। এখানে তোর অলৌকিক বিদ্যা কাজে লাগবে না। লৌকিক বিদ্যাই ভরসা। সে বিদ্যার নাম অনুসরণ। ওই যে তিনজন যেখান দিয়ে যেভাবে নামছে, আমরাও সেইভাবে নেমে পড়ি।

ঢালু গড়ানে পাড় বেয়ে ছোট ছোট আগাছা মাড়িয়ে আমরা নেমে এলুম নীচে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ উঠে গেল অনেকটা উঁচুতে। সাদা বালি প্রখর রোদে ঝলসাচ্ছে। চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে, বামে শুধু বালি আর বালি। নিজেকে মনে হচ্ছে ছোট্ট একটা পুতুল। হাতের দিকে তাকালুম, মনে হল পোড়া কাঠ। এত কালো দেখাচ্ছে। সামনের তিনজন পরপর যেমন চলেছেন, আমরাও ঠিক সেই কায়দায় চলেছি। পাশাপাশি নয়। একের পিছনে আর এক। রোদে মাথার চাঁদি ফেটে যাচ্ছে। নেশার মতো লাগছে। বালির নেশা। সবার আগে হরিশঙ্কর, তারপর আমি, আমার পেছনে ছোটদাদু। ভয় একমাত্র আমারই করছে, কারণ আমি ভিতু। হরেক রকমের আশঙ্কায় কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেছে। হঠাৎ যদি বান আসে, সেই বিখ্যাত দামোদরের বান, তা হলে কী হবে? কীভাবে প্রাণে বাঁচব? ফসফসে থসথসে বালিতে তো দৌড়োতে পারব না। এই প্রথম অনুভব করলুম, পথ না থাকলে পথ চলা কত অস্বস্তিকর। পথহারা পথিক আমরা। কোনও ধরাবাঁধা নেই। কেউ পথ পেতে না রাখলে চলার সুখ কীভাবে হারিয়ে যায়! বাঁ পাশে পড়ে আছে বিশাল এক গোরুর কঙ্কাল। হাড়ের খাঁচায় বাতাস বইছে ঝুমঝুম শব্দে। মৃত্যু যেন ঘুঙুর পায় নাচছে।

আমরা যখন মাঝামাঝি এসে গেছি, সামনের তিনজনের মধ্যে একজন বললেন, আজ বোধহয় ড্যাম থেকে জল ছাড়বে।

হরিশঙ্কর বললেন, শুনছিস?

ছোটদাদু বললেন, আর শুনে কী হবে? আমরা এখন মাঝনদীতে। এপারও যত দূরে ওপারও তত দূরে। জল ছাড়লে ডুবে মরতে হবে।

কথা শুনে, মরার আগেই আমি মরে গেলুম। পায়ের জোর কমে এল। বালির নদী এঁকেবেঁকে ডাইনে-বামে নিজেকে খেলিয়ে দিয়েছে। মহাতঙ্কের মহাসংকীর্তন যেন নেচে নেচে চলেছে। বুগবুগ একটা শব্দ কানে এল। কে যেন আলগোছে জল খাচ্ছে। দেখি, সামনেই বালির মধ্যে একটা গর্ত, সেখানে জল ফুটছে। উঠছে, ঢুকছে, ঢুকছে, উঠছে।

হরিশঙ্কর থেমে পড়লেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। মুখে চোখে অসীম কৌতূহল। ছোটদাদু স্মরণ করিয়ে দিলেন, ওরা তিনজন কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ জল ছাড়তে পারে।

হরিশঙ্কর সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, সায়েন্সটা কী? ব্যাপারটা কী হচ্ছে! ও বুঝেছি, ক্যাপটিভ ওয়াটার। বালির তলায় জল আটকে আছে। রোদ আর বালির গরমে ফুটতে শুরু করেছে। এ দেশে কেন যে সোলার এনার্জিকে কাজে লাগায় না! জলের টেম্পারেচারটা হাত দিয়ে দেখব?

ছোটদাদু বললেন, কী দরকার তোর? ওখানে চোরাবালিও থাকতে পারে।

চোরাবালি নেই। তলায় একটা হার্ড সারফেস আছে। তা না হলে জল জমত না।

তুই এখন দয়া করে এগিয়ে চল।

তোরও ভয় করছে?

আমি ঠান্ডা বাতাসের গন্ধ পাচ্ছি, তার মানে জল আসছে। ওই দেখ সেই তিনজন মানুষ দূরে বিন্দুর মতো হয়ে গেছে। আমাদের পেছনে আর কেউ নেই।

হরিশঙ্কর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, দেখে বললেন, ভয় আর বিপদ নিয়ে খেলা করতে আমি ভীষণ ভালবাসি। ও দুটো আমার প্রিয় খেলনা। যারা ভয় পায় তাদের আরও ভয় দেখাতে ভীষণ মজা লাগে, আজ সেই সুযোগ এসেছে। আহা! প্রকৃতির কী ভয়ংকর রূপ। মাথার ওপর অসীম অনন্ত ফিকে নীল আকাশ। বালির বিশাল নদী খেলে খেলে চলে গেছে এপাশ থেকে ওপাশে। প্লাবনের আতঙ্কে ভরা পরিমণ্ডল। এমন পরিবেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ না করে চলে যাব!

ছোটদাদু বললেন, ক্যালকুলেটেড রিস্ক নেওয়া চলে, ডেয়ারডেভিল হওয়া ঠিক নয়। অকারণে নিজেকে বিপদে ফেলে বোকারা। এগিয়ে চল। বেলা বেড়ে যাচ্ছে।

তোরা না থাকলে আজ আমি এই নদীগর্ভেই দিন কাটাতুম। জল এলে আমার কী হত, ভেসে চলে যেতুম। মৃত্যুকে ভয় পেলে জীবনকে উপভোগ করা যায় না।

মৃত্যুকে ভয় না পেলেও জেনেশুনে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া বোকামি। আত্মরক্ষার পথ খোলা রেখে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়। জল এসে গেলে এই অবস্থায় আমাদের পালাবার কোনও রাস্তা নেই। ওরা যখন বলে গেল তখন আমাদের সাবধান হওয়াই উচিত। সাধ করে মরে লাভ কী! সে তো আত্মহত্যার সামিল।

হরিশঙ্কর বললেন, মৃত্যু থাকলে মৃত্যু হবে। তা বলে এমন একটা দৃশ্য ছেড়ে ভয়ে পালাব! ওরা কী জানে?

ওরা স্থানীয় লোক। আমাদের চেয়ে বেশিই জানবে।

ক্ষুণ্ণ হরিশঙ্কর হাঁটা শুরু করলেন। ছোটদাদু বললেন, তোর কাণ্ড দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের গল্প। একটা হাতি আসছে। হাতির পিঠে মাহুত। সামনে একটি লোক পড়েছে। হাতির পিঠ

থেকে মাহুত চিৎকার করছে, সাবধান! সাবধান! লোকটি শুনেছিল, সমস্ত জীবই নারায়ণ। হাতিও নারায়ণ। নারায়ণ তার ক্ষতি করবে কেন? লোকটি মাহুতের কথায় কান দিল না। হাতি এল। শুড় দিয়ে তুলে এক আছাড়। প্রায় মরোমরো। একজন এসে বললেন, বাবা, সবাই নারায়ণ এই জ্ঞানই যদি তোমার হয়েছে, তা হলে মাহুত নারায়ণের কথা কেন শুনলে না? তোকেও বলি, ওয়ার্নিং শুনতে হয়। এখন গোঁগোঁ করে বাকি পথটুকু হেঁটে চল। এখানে দ্রুত পলায়ন ছাড়া আর কোনও বিজ্ঞান আপাতত নেই।

হরিশঙ্করের এই পলায়নটা তেমন পছন্দ হল না। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল। হঠাৎ বললেন, চাঁদের আলোর রাতে এই ধুধু বালির বিস্তারে আসন পেতে বসতে হয়। সামনে জ্বলবে ধুনি। আর সেই গান, শ্মশান ভালবাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।

ছোটদাদু বললেন, ওই গান তো তোমার ভাল লাগার কথা নয়। নেগেটিভ গান। মৃত্যুর ইঙ্গিত আছে।

হরিশঙ্কর বললেন, মৃত্যুর মতো মহান কিছু আছে! এমন একটা চলে যাওয়া, যা একেবারে একশো ভাগ সত্য। একশো ভাগ নিশ্চিত। কোনওভাবেই আর ফেরা যাবে না। থাকা আর না-থাকার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বাড়তেই থাকবে, ক্রমশই অনন্তে গিয়ে ঠেকবে। জার্নি টু ইনফিনিটি। এই একটা কারণেই মৃত্যু আমার কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়। সব চলার শেষ আছে, এ চলার শেষ নেই। জীবনই এই পথে পৌঁছে দেয় বলে জীবনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তা হলে তুই আমার সঙ্গে চল, দ্বারকা নদীতে আমরা বসব আসন করে। অমাবস্যার রাতে। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকবে। মড়ার মাথায় বাতাস হাহা করবে। সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। অচেনা দিগন্তে ভ্রমণের মতো।

দুজনে কথা বলছেন। আমি কিন্তু ভয়ে ভয়ে ডাইনে-বামে তাকাচ্ছি। কোন বাঁক থেকে জল ছুটে আসবে তা তো জানি না। হঠাৎ দেখি ডান দিকে বহু দূরে সাদা একটা ঢেউয়ের মতো কী ফুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলুম, জল আসছে।

দুজনেই সচকিত হয়ে তাকালেন। হরিশঙ্কর হাহা করে হেসে উঠলেন, আরে ওটা একটা কাপড়। দু'জনে দু'পাশ থেকে একটা কাপড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। কাপড় শুকুতে শুকুতে চলেছে। এটা জলের নদী, দুধের নদী নয়। জল এত সাদা হয় না।

অবশেষে আমরা নদীর গর্ভ ছেড়ে পাড়ে উঠে এলুম। দোকানপাট, মানুষজনের হইচই। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। শরীর আর চলছে না। মনে হচ্ছে ধড়াস করে শুয়ে পড়ি। যেমন তৃষ্ণা, সেইরকম খিদে। ছোটদাদু মনে হয় আমার মনের তরঙ্গ ধরতে পারলেন। বললেন, এইখানে একটা ভাল দোকান দেখে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। একটু বিশ্রামেরও দরকার। বেশ পরিশ্রম হয়েছে।

হরিশঙ্কর বললেন, ভাত খাওয়া চলবে না। হোটেলের ভাত আমি অ্যালাউ করব না।

ভাত কে খেতে চাইছে! শুকনোশাকনা।

কোনও দোকানই মনে ধরে না। পরিচ্ছন্নতার অভাব। হঠাৎ হরিশঙ্কর বললেন, হোয়াট এ ফুল! বাড়ির বাইরে এসে বাড়ির সুখ খুঁজছি, মূর্খ আমরা। যে-কোনও দোকানে ঢুকে যা খুশি তাই খাব আমরা। কোনও

বাছবিচার করব না। একটা জিনিস ভেবে দেখেছিস, যেখানে যাচ্ছি আমরা, সেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হলে কোনও পাকা ব্যবস্থা নেই!

ছোটদাদু বললেন, খুব জানি। প্রকৃতির কাজ প্রকৃতিতেই সারতে হবে। মাঠ আর পুকুর। আর লজ্জা! নিজের চোখদুটো বন্ধ করে রাখো। আমাকে দেখো, আমি তো দেখছি না।

হরিশঙ্কর সদর্পে একটা আটচালায় ঢুকে পড়লেন। সবই আছে সেখানে। অদ্ভুত চেহারার মিষ্টি। গুড়ের রসে পাক করা কালচে রঙের বেসনের লাড্ডু। ঠান্ডা জিলিপি। টক দই। প্রচুর মুড়ি। চিঁড়ে। ভেলিগুড়। মনমরা তেলেভাজা। এক ঝাঁক মাছি ছাড়া কারওকেই তেমন আনন্দিত উৎফুল্ল মনে হল না।

দোকানের মালিক পরিচ্ছন্ন খদ্দের পেয়ে বেশ উৎসাহিত হলেন। প্রমাণ মাপের একটা গামছা পরে বসে ছিলেন। নিজেকে একটু গোছগাছ করে বললেন, সবরকমের ব্যবস্থাই আছে। চিঁড়ের ফলার করতে পারেন মণ্ডা দিয়ে। এক ছড়া কলা আনিয়ে দিচ্ছি।

তেড়াবাঁকা কালোকালো লাড্ডুগুলোর নাম মণ্ডা। এই অঞ্চলের লোকপ্রিয় মিষ্টান্ন, মণ্ডামেঠাই।

হরিশঙ্কর বললেন, আজ আমরা একাদশী করতে চাই।

আজ্ঞে বাবু আজ যে চতুর্দশী, পূর্ণিমা।

তাতে কী হয়েছে, একাদশী মানে আটাদশী। গরম লুচি কুমড়োর ছক্কা, হতে পারে?

হবে না কেন, অর্ডার দিলেই হবে। মোহনের অসাধ্য কিছু নেই। একটা হুংকার ছাড়লেন, বিমলা!

এমন একজন মহিলাকে এখানে দেখা যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একেবারে সাধিকার চেহারা। ভাব-থমকানো মুখে ভাসাভাসা দুটো চোখ। উদাস যেন কোন আকাশে লগ্ন। মধ্যবয়সি। পরিষ্কার লাল পাড় শাড়ি। কপালে গোল সিঁদুরের টিপ। দু'হাতে মোটা দুটো শাঁখা। আলগা খোঁপা। আমরা তিনজনেই অবাক। এমন পবিত্র আবির্ভাব আমরা আশা করিনি। দোকানের মালিক একগাল হেসে বললেন, আমার বোন। খুব ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছিল। তা সংসার আর করা হল না।

ছোটদাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সংসার করবেন কী করে! ইনি তো সংসারের নন। শক্তি, সাক্ষাৎ জগজ্জননী। এঁর স্থান তো আশ্রমে মন্দিরে হবে। সাধিকা।

বিমলা হাত জোড় করে বললেন, ওইসব বলবেন না বাবা। তবে আপনাকে আমি চিনি।

ছোটদাদু অবাক হয়ে বললেন, আমাকে?

হ্যাঁ বাবা, আপনাকে আমি তারাপীঠে দেখেছি। আজ আপনি এসেছেন আমাকে কৃপা করতে। আপনি যে কত বড় সাধক আমি নিজে দেখেছি। আপনি আমাকে একটা বজ্রনাভি রুদ্রাক্ষ দিয়েছিলেন। এই দেখুন আমার গলায়। এইটা ধারণ করার পর আমার অনেক বিপদ কেটে গেছে বাবা। এখন আর আমার কাছে আসার সাহস হয় না কারও।

বিমলা এগিয়ে এসে ছোটদাদুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। হরিশঙ্কর নিজের মনেই বললেন, যেখানেই যাই সেইখানেই সাধন, সাধনা, রুদ্রাক্ষ, তন্ত্র, তাগা, তাবিজ। সাধারণ মানুষের পৃথিবীটা হারিয়ে গেল নাকি!

বিমলা হরিশঙ্করকে প্রণাম করার জন্যে এগিয়ে এলেন। হরিশঙ্কর তিন লাফে পেছিয়ে গেলেন, আমাকে নয়, আমাকে নয়। আমি কেউ নই। আমি সাধনভজন করি না।

বিমলা হরিশঙ্করকে ধরে ফেললেন। প্রণাম করতে করতে বললেন, সে তো আমি বুঝি। উঠে দাঁড়িয়ে হরিশঙ্করের দিকে তাকিয়ে এমন সুন্দর হাসলেন হরিশঙ্করও থমকে গেলেন। এতসব কাণ্ড দেখে দোকানের মালিক মোহন আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। উঁচু জায়গা ছেড়ে নেমে এলেন। বোনকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মহাপুরুষের কথাই তুই আমাকে বলেছিলিস? যিনি দু'হাত ঘষে আগুন জ্বালাতে পারেন?

বিমলা ঘাড় নাড়ল। মোহন ছোটদাদুর দিকে তাকিয়ে আছেন অবাক হয়ে। ভাবের মানুষ। চোখে জল এসে গেছে। ছোটদাদুকে দেখছেন আর কাঁদছেন নিঃশব্দে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বহুকাল পরে সন্তান যেন তার হারিয়ে যাওয়া পিতাকে খুঁজে পেয়েছে। এতদিনের দুঃখ-বেদনা সব ধুয়ে সাফ হয়ে যাচ্ছে চোখের জলে। মোহন নিচু হয়ে ছোটদাদুকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। এখন এই মুহূর্তে তাঁকে কোনওভাবেই ভাবা যাচ্ছে না সামান্য একজন অশিক্ষিত মিঠাইঅলা। শান্ত, সংযত, ভাবগম্ভীর। থমথমে গলায় বললেন, আজ আমাদের পরম সৌভাগ্যের দিন। কিছু চাই না। যদি কিছু দেবার থাকে আমাদের দিয়ে যাবেন, অন্ধকারের লণ্ঠন, বৃদ্ধের লাঠি, বর্ষার ছাতা, শীতের কাঁথা।

মোহন শুদ্ধ সাহিত্যের ভাষায় কথা বলছেন। এঁর জীবনের অন্য একটা দিক আছে অবশ্যই। ছোটদাদুর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন না তাগা-তাবিজ মন্ত্র-তন্ত্রের জন্যে। শুধুই কৃপাপ্রার্থী। ভাগ্য-ভবিষ্যৎ কিছুই জানতে চান না।

বিমলা বললেন, দাদা, এঁদের আমি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। সেইখানেই সেবা হবে।

মোহন বললেন, তাই তো করবি! এঁরা কৃপা করে এসেছেন শুধু আমাদেরই জন্যে।

হরিশঙ্করের হয়তো আপত্তি ছিল। মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল আমার। কারও সংসারে সহসা ঢুকতে চান না। ব্যবসায়িক লেনদেনই পছন্দ করেন। একটা চুক্তির মধ্যে এসো। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, যাবতীয় সেন্টিমেন্ট বড়ই জটিল, অযথা সময় নষ্ট। ঘোর সংসারে অঘোর বিষয়ের কোনও দাম নেই। ফেলো কড়ি মাখো তেল। ইংরেজিতেই ভাল শোনায়, ফিনিশ ইট। পৃথিবী মানেই থকথকে দগদগে স্বার্থ। স্বার্থে আসার আগে যাবতীয় গৌরচন্দ্রিকা। আগে দেখেছি, বাড়িতে এসে কেউ খুব ভণিতা করছেন, কেমন আছ? তোমার সেই গোড়ালির ব্যথা? আমি ডেড শিয়োর, কোনও পাথরে পা পড়ে গিয়েছিল। গুপো হয়ে গেছে। ভয়ংকর ভোগায়।

হরিশঙ্কর শুনে যাচ্ছেন। ব্যাডমিন্টন খেলার মতো। বল আসছে, বল ফিরে যাচ্ছে। চলছে খেলা। হঠাৎ এক চাপ্স। বিপক্ষ বসে পড়বে।

হরিশঙ্কর হয়তো একটু মজা করবেন। বিব্রত করার জন্যে বলবেন, গোড়ালিতে তো আমার কস্মিনকালেও কিছু হয়নি।

ভদ্রলোক অমনি বলবেন, আমি গুলিয়ে ফেলেছি। নগেনের সঙ্গে তোমাকে গুলিয়ে ফেলেছি। তোমার যেন কোথায় ব্যথা হয়েছিল? গলায়?

হরিশঙ্কর আরও একটু খেলবেন, হাঁচি-কাশি-সর্দি-জ্বর-ব্যথা-মাথাধরা, আমার জীবনে হয়নি, হবেও না।

ভদ্রলোক হাল ছাড়বেন না। বলবেন, যদি কখনও তোমার গুপো হয়, তুমি যেরকম গোড়ালি ঠুকে ঠুকে গোরাদের মতো হাঁটো, হলেই হল। তখন কী করবে? একটা টোটকা শিখিয়ে দিই। মেয়েরা উনুনের আগুন

ফেলে দেবার পর, উনুনের ঝিকের পাশে জয় মা বলে গোড়ালিটা চেপে ধরবে। বারকয়েক। ব্যথাফ্যথা সব হাওয়া। আর যদি গলায় ব্যথা হয় তা হলে...।

হরিশঙ্কর এইবার মারবেন চাপ্‌স। তা হলে গলাটা স্রেফ উড়িয়ে দোব। অনেকটা সময় আমার নিয়েছেন, এইবার কাজের কথায় আসুন, কী চাই বলুন তো?

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বলবেন, বেশি না, গোটা কুড়ি টাকা হলেই হয়ে যাবে। কামিং মান্থের বাই দা টেন্‌থ আমি দিয়ে যাব। ভীষণ হার্ড আপ হয়ে পড়েছি হরিশঙ্কর। বৃদ্ধ মানুষ। আগের মতো আর খাটতে পারি না। ফার্মটা উঠে চলে গেল বিলেতে। ইন্ডিয়ান বিজনেস ক্লোজড। সবই শেষ হয়ে গেল। একসময় দোল-দুর্গোৎসব হত বাড়িতে। বাঙালির পতনের কাল।

হরিশঙ্করের ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে একজন বড় মাপের মানুষ বেরিয়ে আসবে। মুখের চেহারাটা হয়ে যাবে শ্রীচৈতন্যের মতো করুণাময়। একটা বেদনা, যেন মানুষটির জীবনে নিজে ঢুকে পড়েছেন। ভদ্রলোক চেয়েছিলেন কুড়ি, একশো টাকার একটা নোট হাতে গুঁজে দিয়ে বলবেন, এটা আর আপনাকে শোধ দিতে হবে না। আমার ছেলেকে দিয়ে মাঝে মাঝে আপনার খবর নেওয়াব। আমি বাঁচলে আপনারও বাঁচার অধিকার আছে।

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে চলে যাবেন। হরিশঙ্করের দিকে অবাক হয়ে তাকাবেন। যেন বিস্ময়কর কোনও বস্তু দেখছেন। হতাশ মুখে একঝলক আশা। বেঁচে থাকার মন্ত্র শুনেছেন কানে।

এক নয়, ছড়িয়ে আছে শত শত উদাহরণ। কত পরিবার নীরবে নিভৃতে স্মরণ করে হরিশঙ্করকে। হরিশঙ্করের দান সেইরকম, বাঁ হাতও জানতে পারে না, ডান হাত কী করছে। কেউ প্রশংসা করলে স্তাবকতা করলে হয় নিজে স্থানত্যাগ করেন, নয় তাকেই দূর করে দেন।

সেই হরিশঙ্কর নিতান্ত বাধ্য হয়েই চলেছেন বিমলার ভিটেতে। ছোটদাদুর কথা অমান্য করতে পারেন না। দোকান থেকে বেরোনো মাত্রই একটা কলরব। একটা শব্দ। সবাই ছুটছে নদীর দিকে। জল ছেড়েছে। জল ছেড়েছে।

কোনও কথা নয়, হরিশঙ্করও ছুটলেন। আমরাও পিছু নিলাম।

অপূর্ব দৃশ্য! হুহু শব্দে, দিগ্বিদিক ভাসিয়ে ছুটে আসছে জল। ভক্ত নরনারীর মতো প্রণাম করতে করতে আসছে শত শত ঢেউ। একের ঘাড়ে আর এক। প্রেম সুধারসে মাতোয়ারা কীর্তনিয়ার দল। বাজছে লক্ষ মৃদঙ্গ।

Is man one of God's blunders
Or is God one of man's blunders?

ঝোপঝাড় গাছপালা সব মিলিয়ে বাগানের মতো একটা জায়গা। তারই মাঝে কয়েকটা কুঁড়েঘর। দুপুরে পাখির ডাকে একটা ক্লান্তির ভাব। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে দামোদরের জল চিকচিক করছে। নদীটা পেছন দিক দিয়ে ঘুরে চলে গেছে তার সমুদ্রযাত্রায়। এই হল বিমলার ভিটে।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাচ্চা একটা ছেলে ছপটি হাতে ঘুরছে। বড় বড় চোখ। আদুড় গা, একমাথা ফুরফুরে চুল। নিজের মনেই বকবক করছে আর হাতের ছপটিটাকে ঘোরাচ্ছে মাঝে মাঝে। অচেনা আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

কোথায় আমি নাম জিজ্ঞেস করব! না, সে-ই আমার নাম জিজ্ঞেস করে বসল।

আমার নাম পিন্টু। তোমার নাম?

আমার নামও পিন্টু।

ছেলেটি বললে, তুমি কি আমার মামা?

হ্যাঁ, আমি তোমার মামা।

তুমি মাছ ধরতে পারো?

পারি না বললে ছেলেটির কাছে হেরে যেতে হয়। মামা মাছ ধরতে পারে না, সে আবার কেমন মামা! বেশ একটা বীরত্ব এসে গেল ভেতরে। বুক চিতিয়ে বললুম, নিশ্চয় পারি।

ছেলেটি আমার কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বললে, তুমি মাছি ধরতে পারো?

মহা দুষ্টু ছেলে। চোখেমুখে বুদ্ধি খেলা করছে। পরিষ্কার হাফপ্যান্ট। ফরসা রং। গ্রামের ছেলে বলে মনেই হয় না। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ভোমরা উড়ে এল। মাথার চারপাশে ভোঁ ভোঁ উড়ছে। আমাকে ভয়ে আড়ষ্ট দেখে ছেলেটি বললে, দুর বোকা, নিজের নামটা বলে দাও না, তা হলেই তো চলে যাবে।

আমি বললুম, পিন্টু। ভোমরাটা সত্যিই উড়ে চলে গেল আর একদিকে।

ছেলেটি বললে, দেখলে? ওরা নাম জিজ্ঞেস করতে আসে।

কেন, নাম জিজ্ঞেস করতে আসে কেন?

তাও জানো না? ছেলেটি হাসল আমার অজ্ঞতায়, ওরা হল কোটাল। রাজপুত্রের কাছ থেকে আসে। তোমাকে তোমার মা বলেনি?

না তো?

তোমার মা জানে না। আমার মা সব জানে।

তোমার মা কে?

আমার মা বিমলা। ছেলেটি হঠাৎ ধেই ধেই করে খানিক নেচে নিল, বিমলি মা কলমি খায়। বাঘের সঙ্গে কথা কয়। তুমি আমার বিমলি মাকে চেনো না? তুমি কোত্থেকে এলে গো? বৃন্দাবন থেকে?

না তো, কলকাতা থেকে।

ও তা হলে তুমি আর এক মামা? বৃন্দাবনে আমার আর এক মামা আছে। আসে না, কেবল চিঠি লেখে। বিমলি মা কেবল বলবে ঝুলনে আসবে ঝুলনে আসবে। আসেই না। মিথ্যে কথা।

তুমি ওই ছড়াটা কোথায় শিখলে?

আমার মোহনমামা শিখিয়েছে। মোহনমামা আমাকে কত শেখায়। তোমার মামা আছে?

হ্যাঁ আছে।

কিছু শেখায়?

হ্যাঁ গান শেখান।

ঠোঁট উলটে বললে, আমার মোহনমামাও আমাকে গান শেখায়। দেখি তুমি একটা গান ধরো তো? কেমন শিখেছ দেখি।

তুমি একটা গাও আগে।

তোমার লজ্জা করছে? আমি না হয় চোখ বুজোচ্ছি। নাও নাও, তাড়াতাড়ি ধরো।

সত্যিই আমার যেন একটু লজ্জালজ্জা করছে। এমন একজন শ্রোতা। যেন গানের পরীক্ষা দিচ্ছি। এক পিন্টু চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর এক পিন্টু গান ধরেছে, মন রে কৃষি কাজ জানো না। এমন মানবজীবন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা।

গান যতক্ষণ চলল ছেলেটা একভাবে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গান শেষ হতেই চোখ খুলে বললে, ভালই শিখিয়েছে। তা তুমি আর একটু চড়াতে পারলে না? তা হলে শোনো।

পিন্টু ওই গানটাই ধরল। ধরামাত্রই অবাক হয়ে গেলুম। যেমন সুরে গলা, তেমনি উচ্চারণ আর ভাব। এ ছেলে নির্ঘাত বড় গাইয়ে হবে। মন রে বলে যখন সুর টানছে, তিরের মতো বুকে এসে লাগছে। পাতার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়েছে মুখে। মুখটা লাল। হঠাৎ গান থামিয়ে বললে, ঠিক হচ্ছে তো? দে মা আমায় তবিলদারিটা জানো?

না গো।

ইস! তা হলে শিখে নাও, আমি গাইছি।

পিন্টু গাইতে লাগল, আমায় দে মা তবিলদারি। আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী। প্রথম লাইনটা গেয়েই বললে, নাও ধরে ফেলো। চুপ করে থাকলে শিখবে কী করে?

ডি-শার্পে ধরেছে। আমি পারব কেন? তবু হেরে যাওয়ার ভয়ে ধরতে হল। জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন এসে গেছে। ধরে ফেললুম, আমায় দে মা তবিলদারি। অন্তরায় গিয়ে আর রাখতে পারলুম না। গলা ফেল করল। প্রসাদী গানের যত কেরামতি তো চড়ায়। পিন্টু আর গ্রাহ্যই করল না আমাকে। তার ভাব এসে গেছে। সে

গেয়েই চলল প্রাণ খুলে। এত ভাল গাইল, রেকর্ড কোম্পানি শুনলে রেকর্ড করে নিত। গান শেষ করে আবার সে প্রতিযোগিতায় ফিরে এল, তুমি আর কী জানো? গাছে উঠতে পারো?

না গো, গাছে চড়তে ভয় করে।

পিন্টু কিছুক্ষণ ভেবে বললে, ও ভয় করে! তা হলে তো তুমি কোনওদিন পেয়ারা জামরুল খেতে পারবে না। তুমি ক'দিন থাকবে? ওটাও তোমাকে শেখাতে পারি। খুব সহজ। হাত আর পা দিয়ে গাছটাকে জড়িয়ে ধরবে। প্রথমে কিন্তু নম করে নেবে। গাছ তো দেবতা। মনে মনে বলবে, গাছ, তুমি আমাকে ফেলে দিয়ো না। তারপর তো একটু উঠলেই ডাল পেয়ে যাবে। ওগুলো হল গাছের হাত। ডাল ধরে ধরে তুমি কত ওপরে উঠে যাবে। একটুও ভয় পাবে না কিন্তু। এখনই শিখবে নাকি?

ভয়ে ভয়ে বললুম, এখন থাক। কাল সকালে শিখব।

সাঁতার জানো নাকি?

সে একটু একটু।

তা হলে তো ভালই। কাল পুকুরে দু'জনে সাঁতার কাটব।

সাঁই সাঁই করে গাছের ভাঙা ডালটাকে এদিকে-ওদিকে বারকতক দুলিয়ে দিয়ে বললে, কেন এইরকম করলুম বলো তো? একগাল হেসে বললে, করতে হয়। তা না হলে রাগ হয়।

কার রাগ হয়?

ছপটির রাগ হয়। মাঝে মাঝে এটা দিয়ে মারতে হয়।

কাকে?

যাকে হোক। তা না হলে এর মন খারাপ হয়।

তুমি কত কী জানো!

বড় হলে আরও কত কী জানব! তুমি লেখাপড়া করো না?

করি তো। তুমি?

আমিও করি। তুমি ফার্স্ট হও?

তুমি?

আমি ফার্স্ট ছাড়া হতেই পারি না। কী যে আমার হবে!

তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

ফোর। জানো তো আজ আমি একটু পরে পায়েস খাব।

কেন?

পায়েস কেন খায়?

তোমার জন্মদিন।

ঠিক বলেছ। আজ আমার জন্মদিন। তোমার জন্মদিন কবে?

আমার জন্মদিন পুজোর সময়, আশ্বিন মাসে।

তোমাকে কেউ পায়েস করে দেয়?

আমার যে মা নেই।

তা হলে তুমিও আজ আমার সঙ্গে পায়েস খাবে। এখন চলো আমরা বাড়িতে যাই। এখুনি বিমলি মা খুঁজতে আসবে এখানে।

বাগানটাকে আমরা দু'জনে মিলে একবার পাক মারলুম। গাছের জটলা। একপাশে একটা পরিত্যক্ত ভিটে। বিশাল বিশাল গাছ। আম, জাম, কাঁঠাল। কিছু ফুলগাছ, আগাছা। হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে টুসটুসে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন, শিশুটির সামনে দাঁড়িয়ে একটু নিচু হয়ে বললেন, এই যে গোপাল আমার! আজ একবারও আসা হল না কেন মানিক?

পিন্টু বললে, আজ আমাদের বাড়ি অনেক লোক এসেছে। দেখছ না, এই যে আমার মামা। আমার পিন্টুমামা।

গোপালের প্রসাদটা তা হলে আমি কী করব?

নিজেই খেয়ে নেবে কুপুর কুপুর। তুমি তো পেটুক।

বৃদ্ধা হাহা করে হেসে উঠলেন, কাল রাতে আমার খুব জ্বর হয়েছিল গো কত্তা।

যাও না, পুকুরে খুব করে চান করো গে না। তোমার তো খুব গরম!

একটু ওষুধ দিবি না?

তোমার ওষুধ আমার এই ছপটি। পিঠটা পাতো।

আমি এমন ডাক্তার চাই না।

তা হলে যাও বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো।

বৃদ্ধা কিছু দূর গেছেন, পিন্টু ছুটে গিয়ে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরল, দিদা, আমার চালভাজা রেখো কিন্তু, বিকেলে আসব। বৃদ্ধা আদর করতে করতে বললেন, লুডোটা আনবি। অনেকদিন আমাদের খেলা হয়নি। বেলাবেলি আসবি কিন্তু। বৃদ্ধা সুঁড়িপথ ধরে গুটগুট করে চলে গেলেন। কাঁধের পাশে একটা ঝোলা।

পিন্টু বললে, তুমি চালভাজা খেয়েছ কোনওদিন, কুসুমবিচি ভাজা দিয়ে?

শুধু চালভাজা খেয়েছি। পিন্টুকে এখন সমবয়সি বন্ধু মনে হচ্ছে।

তা হলে বিকেলবেলা আমার সঙ্গে যাবে। লুডো খেলতে জানো?

হ্যাঁ তা জানি।

তা হলে ঠিক আছে, আমরা তিনজনে খেলব। তুমি আর কী খেলা জানো? ডান্ডাগুলি?

সে তোমার মতো যখন ছোট ছিলুম।

আচ্ছা পিন্টুমামা, তুমি আমাকে একটা কথা বলতে পারো, বড় হতে ক'দিন লাগে?

বেশ শক্ত প্রশ্ন। উত্তরের বদলে প্রশ্ন করলুম, কেন বলো তো! বড় হয়ে কী হবে, ছোট থাকাই ভাল। পিন্টু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চোখ কুঁচকে একবার আকাশের দিকে তাকাল। একটা ব্রাহ্মণ চিল উড়ছে। সাদা চিল সহসা দেখা যায় না। আমি তাকিয়ে রইলুম হাঁ করে। পিন্টু বললে, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে হবে।

কেন বলো তো?

তুমি জানো কি, কানপুর বলে একটা দেশ আছে?

হ্যাঁ, জানি তো।

সেই কানপুরে আমার বাবা আছে। বাবার সঙ্গে আমার বিমলি মায়ের আড়ি। ধরো, আমি যদি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাই, তা হলে একদিন ট্রেনে চেপে কানপুরে চলে যাব। গিয়ে বাবাকে ধরে আনব। বলব, চলো, এক্ষুনি চলো। তুমিই বলো, সব্বাইয়ের বাবা আছে, আমার বাবা নেই। ভাল লাগে! আমার কেবল মামা। সবাই আমার মামা। তুমি আবার কোথা থেকে চলে এলে এক মামা! আমার মা কেবল সবসময় পুজো করে আর কাঁদে। কী করে তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায় বলো তো! গাছের গোড়ায় মোহনমামা গোবর দেয়, গাছ বড় হয়। আমি একটু গোবর খাব মামা?

দাঁড়াও, আমি একটু ভেবে দেখি। তবে কী জানো, মানুষ বছরে বছরে বড় হয়। অঙ্কের মতো। যেমন ধরো, এই তো আজ তোমার জন্মদিন, সামনের বছর এই দিনে তুমি আর এক বছর বড় হবে।

কত বছর হলে মানুষ বড় হয়?

তা ধরো কুড়ি বছর।

পিন্টু ভুরু কুঁচকে বললে, আচ্ছা, তখন কি আমার বাবা আর মা বেঁচে থাকবে?

কেন থাকবেন না?

এই তো তোমার মা নেই।

সে তো অন্য ব্যাপার গো। আমি যখন তোমার চেয়েও ছোট সেইসময় আমার মায়ের খুব অসুখ করল। সে আর আমি কী করব বলো! ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলেন না। শোনো, তুমি বড় হয়ে ডাক্তার হবে কেমন? খুব বড় ডাক্তার। তোমার এই ছপটির মতো। অসুখের গায়ে সপাসপ হাঁকাবে, অসুখ মরে যাবে, রুগি ভাল হয়ে যাবে। তোমাকে দেখামাত্রই সব অসুখ চিৎকার করবে, পালা পালা, পিন্টু ডাক্তার এসে গেছে।

পিন্টুর ভীষণ ভাল লাগল কথাটা। খুব হাসি, আমি তো ডাক্তারই হব। জানো তো, আমার মোহনমামার গলায় কী হয়েছে? ডাক্তারবাবু বললেন, মোহন, তুমি খুব সাবধান হও। খুব শক্ত রোগ। তিন বছরও বাঁচতে পারো, আবার দু'বছরও বাঁচতে পারো, তবে জেনে রাখো মোহন মরতে তোমাকে হবেই। ইস, এই সময়ে যদি আমি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ডাক্তারটা হয়ে যেতে পারতুম!

পিন্টু আবার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ একেবারে স্বচ্ছ নীল। সেই চিলটা আর নেই। পিন্টুর চোখে জল। হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল, আমার মোহনমামা মরে যাবে। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম, তুমি কাঁদছ কেন? কে বলেছে, মোহনমামা মারা যাবে? কে এক ডাক্তার বললেই হল? জানো তো, আমার যে দাদু এসেছেন, তাঁর খুব শক্তি। আমরা দু'জনে মিলে ধরব। মোহনমামার অসুখ ভাল করে দেবেন।

বুক থেকে মাথা তুলে চোখ মুছতে মুছতে পিন্টু বললে, কখন বলবে?

যখন সব কাজ হয়ে যাবে, তখন গিয়ে বলব, দাদু, আমার মোহনমামাকে ভাল করে দিন।

আমরা এসে দাওয়ার একধারে বসলুম। ছোটদাদু ঠাকুরঘরে পুজোর আসনে বসেছেন। তাঁর চওড়া ফরসা পিঠ দেখতে পাচ্ছি। বসে আছেন নিশ্চল ধ্যানে। হরিশঙ্কর এমন এক ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানেন। একটা

হারিকেন নিয়ে পড়েছেন। কল গোলমাল করেছে, পলতে উঠছে না। সেইটাকে চেষ্টা করছেন ঠিক করার। চারপাশে ছড়ানো যন্ত্রপাতি। কোনওভাবে খবর পেয়েছেন কল কাজ করছে না, আর তো তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না। কাজই ঈশ্বর, এই তাঁর বিশ্বাস।

তাঁর পাশে বসে কানে কানে বললুম, আজ বিমলাদির ছেলের জন্মদিন।

ইজ ইট? বেশ, ব্যবস্থা হবে। চলো তা হলে কায়দা করে একবার বাজারে যাই।

এখন তো সব বন্ধ।

ক্যাশ টাকা দেওয়া তো ভাল দেখাবে না, তুমি একবার চুপি চুপি বেরিয়ে দেখো না। গঞ্জে কাপড়ের দোকান, বাসনের দোকান, এসব খোলা থাকে। এটা তো বিজনেস সেন্টার। দুটো জেলার বর্ডার। যাও, বেরিয়ে যাও।

একা পারব? যদি হারিয়ে যাই?

হরিশঙ্কর ভীষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, স্ট্রেঞ্জ! তুমি মেয়েছেলে হলে না কেন? ইউ নিড এ শাড়ি অ্যান্ড পেটিকোট।

আমি তাঁর হাতে সামান্য চাপ দিয়ে বললুম, একটু আস্তে, সবাই শুনতে পাচ্ছেন।

ফিসফিস করে বললেন, এই লজ্জা যাতে পেতে না হয় সেইভাবে চরিত্র সংশোধন করো না! এটা ইউরোপ আমেরিকা নয়, একটা গঞ্জ, এখানে তুমি কোথাও হারাতে পারো?

বেশ উত্তেজিত অবস্থায় পথে বেরিয়ে এলুম। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের সমস্ত মহিমায় মণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে জনশূন্য পথ। মাঠের পর মাঠ। ছোট ছোট ডোবা। জলে ভাসছে নীল আকাশ। লেজের বহর নিয়ে ডালে বসে শিস দিচ্ছে ফিঙে পাখি। শীর্ণ চেহারার গাভী টুকুস টুকুস করে হেঁটে চলেছে অনিশ্চিত কোনও গন্তব্যে। একটা বাচ্চা মেয়ে এক্কাদোক্কা খেলতে খেলতে চলেছে। হাতে খোলামকুচি, ছেলেবেলায় যাকে আমরা বলতুম চাপ্পা। সেইটাকে দূরে ছুড়ে দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এক পায়ে। আবার তুলে নিয়ে ছুড়ে দিচ্ছে। রংচটা ফ্রক। পিঠের বোতাম নেই একটাও। ছোট্ট একটা বিনুনি লাফানোর ছন্দে দুলছে এদিক-ওদিক।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমাদের এদিকে দোকানবাজার কোন দিকে?

মেয়েটি ফিক করে একটু হাসল। আমি তার মাথায় হাত রেখে বললুম, বলো, কোন দিকে?

মেয়েটি ঘাড় হেঁট করে জড়োসড়ো হয়ে গেল।

দোকানবাজার নেই?

ফিসফিস করে বললে, আছে।

বলো কোন দিকে?

দিগন্তের দিকে হাত তুলল। এইটুকু একটা হাত। বললে, ওই দিকে।

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে বললে, জানি না।

এমন সময় পেছন দিক থেকে এক প্রবীণ মানুষ টুকটুক করে আমাদের অতিক্রম করে গেলেন। দেখে মনে হল পণ্ডিতমশাই। তাঁকেই ধরলুম, অনুগ্রহ করে বলবেন, এদিকে দোকানবাজার কোন দিকে গেলে পাব?

তিনি ঘোর সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কেন?

আজ্ঞে, আমি কিছু জিনিস কিনতে চাই।

সহজে ছাড়ার মানুষ নন, পালটা প্রশ্ন করলেন, উদ্দেশ্য?

ঘোর সমস্যা। কোনও কিছু কেনার উদ্দেশ্যটা কী? তিনি থামেননি। চলতে চলতেই যাবতীয় প্রশ্নোত্তর। সংকটে নিদানকালে মাগো আমি তোমার শরণ মাগি। পণ্ডিতমশাই বললেন, কী ধরনের বস্তু তুমি কিনতে চাও? তুমি কি নবাগত? নবাগত হওয়াই স্বাভাবিক, তা না হলে প্রশ্ন করবে কেন? তুমি কি চন্দ্রচূড় চৌধুরীর জামাতা?

আজ্ঞে না। তিনি কে?

পণ্ডিতমশাই নিজের মনেই বললেন, বিনীত ও সভ্য। অবশ্যই সদ্বংশোদ্ভূত। আমার চরিত্র বিশ্লেষণের পর তাঁর মনে হল একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া চলে। আমরা কিন্তু হেঁটেই চলেছি। পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করলেন, আমার বয়স তোমার অনুমানে কত?

নিজের অজান্তেই শুদ্ধ ভাষা বেরিয়ে এল, আজ্ঞে পঞ্চাশোর্ধ্ব।

তিনি বিজয়ী হাসি হেসে বললেন, অর্বাচীন! তিরিশ বর্ষ পূর্বেই আমি পঞ্চাশ অতিক্রম করেছি। এবং আমার মাতা আজও জীবিত। এই অঞ্চল একদা অতি সমৃদ্ধ ছিল। আজ অতিশয় শ্রীহীন। হেতু দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া। মশককুল নিশ্চিহ্ন করেছে সভ্যতা সংস্কৃতি। শ্রীমান চন্দ্রচূড় ছিলেন এতদ্ অঞ্চলের বদান্য ভূস্বামী। ওই দেখা যায় তাঁর প্রাসাদ। কালগর্ভে বিলীন। একটি প্রান্তে তাঁর বংশধরেরা অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন এবং মরা হাতি লাখ টাকা। তা বাবাজি তুমি তা হলে কে?

আজ্ঞে, সেইভাবে বলতে গেলে আমি কেউ নই। আমরা সোনামুখি অঞ্চলের এক গ্রামে যাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতমশাই চেপে ধরলেন, বহুবচন ব্যবহার করলে কেন? তুমি তো এক এবং একক।

আজ্ঞে, আমার পিতা এবং দাদু মোহনবাবুর অতিথি হয়েছেন।

কেমন দাদু? পিতামহ না মাতামহ?

আজ্ঞে পিতার ক্ষুদ্র মাতুল।

ক্ষুদ্র হবে না বাবাজি, বলো কনিষ্ঠ। মোহন অতি সদাশয় চরিত্র। বড় বংশের সন্তান। চন্দ্রচূড়ের সম্পর্কিত। বিমলার ওই বংশে বিবাহ হয়েছিল, সে বিবাহ সুখের হয়নি। বিমলা ঐশী শক্তির অধিকারী। তার ছেলেটি প্রতিভাধর। আমার বিশ্বাস মোহনের পিতামহ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন বর্ধমানরাজের সভাসদ, সংগীতগুণী। মোহনের বাস্তুভিটে দামোদর নিয়ে গেছেন। মোহনের পিতামহ এক যবনির আকর্ষণে পড়ে সংসারে দুর্যোগ নিয়ে এলেন। মোহনের পিতা ছিলেন সৎ, সাত্ত্বিক। সৎ মানুষের পক্ষে বিত্ত প্রভুত্ব অর্জন করা অসম্ভব। তোমার কী ধারণা? পৃথিবীটা কার?

বেশ একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। আধুনিক ধারণা বলব, না প্রাচীন? মানুষটি যখন প্রাচীন তখন প্রাচীন বিশ্বাসই পছন্দ করবেন, আজ্ঞে, সৃষ্টি তো ভগবানের।

বৃদ্ধ খাঁইখাঁই করে উঠলেন, অর্বাচীন! পৃথিবী শয়তানের। ভগবানের হলে তিনি এখানে বসবাস করতেন। মানুষ হল শয়তানের চেলা। শয়তানের সন্তান। এখানে যারা ঈশ্বরের ভজনা করে তারা সব বিদ্রোহী। বিধর্মী। কোথায় আছ? তুমি কে? কিছুই খবর রাখো না! ট্যাকোস ট্যাকোস করে এঁড়ে বাছুরের মতো পৃথিবীর পথে হেঁটে মরছ। এসো আমার সঙ্গে।

সামনেই আটচালা। বাইরে বড় বড় করে লেখা□—বলরাম চতুষ্পাঠী। সামনে একটু বাগানমতো। মাঝখান দিয়ে পথ চলে গেছে। বালিবালি মাটি। প্রচুর সাদা ফুল। সাদা জবা ডালের ডগায় নিশ্বাসের মতো প্রকৃতির ফিকে বাতাসে টুলুর টুলুর দুলে উঠছে। বৃদ্ধ আগে আগে চলেছেন টরটর করে।

চতুষ্পাঠীর দরজা খুললেন। মেঝেতে পাটি পাতা। আমাকে বললেন, বোসো। পাদুকা বাইরে।

একটু ইতস্তত করে বললুম, আমি যে জামাকাপড়ের দোকান□—

বৃদ্ধ খিঁচিয়ে উঠলেন, হস্তীমূর্খ! এই বেলায় তুমি কোন চুলোয় যাবে, কে বসে আছে তোমার জন্যে?

একপাশে বসে পড়লুম। এপাশে ওপাশে কয়েকটা লেখার চৌকি। দোয়াত কলম।

God, like a gardener, sows people as they are
leaving them to grow without interfering here on earth.

এমন ফাঁপরেও মানুষ পড়ে! বৃদ্ধ পণ্ডিতের অদ্ভুত এক আকর্ষণী শক্তি। বলতেও পারছি না, আমাকে যেতে হবে। আমার জন্যে সবাই অপেক্ষা করে বসে আছেন। দানাপানি পড়েনি পেটে। ঘরের কোথাও বোধহয় চাঁপাফুল আছে। ভুরভুর করে গন্ধ বেরোচ্ছে। বৃদ্ধ আমার সামনে বসলেন। একটা চৌকি টেনে নিয়ে হাতদুটো তার ওপর রাখলেন। আশি বছরের তুলনায় বেশ ভালই স্বাস্থ্য। চামড়ায় সামান্য কুঞ্চন।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করলেন, একটা গন্ধ পাচ্ছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চাঁপাফুলের।

ত্রিসীমানায় কোথাও চম্পক নেই। রহস্যটা আজও আমার কাছে পরিষ্কার নয়, তবে এইসময় একটা স্বর্ণগোধিকা আসে বাগানে। তার শরীর থেকে এই গন্ধ বেরোয় কি না জানি না। তোমার জানা আছে?

আজ্ঞে না। আমি তো কলকাতার ছেলে।

ও, তার মানে সর্ব বিষয়ে অজ্ঞ। তোমরা তো দাসত্ব করার জন্যে জন্মাও। তুমি দাস হয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা চাকরি করি।

ঘোড়া হয়েছ?

আজ্ঞে প্রশ্নটা সবিশেষ বোধগম্য হল না।

মানে লাগাম চড়িয়ে কোনও রমণী পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করেছে?

আজ্ঞে না, বিবাহ এখনও করিনি।

আর দেরি নেই এইবার হয়ে যাবে। শোনো, যে-কারণে তোমাকে বসালুম, আমি নৈয়ায়িক, তোমাকে আমি বুঝিয়ে দেব কেন পৃথিবী শয়তানের! হিরণ্যকশিপুর নাম শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর কিছু জানো?

অসুর ছিলেন।

সুর-অসুরের প্রশ্ন ছাড়ো। এই পৃথিবীরই এক সম্রাট ছিলেন। কার সন্তান? না মহাঋষি কশ্যপের সন্তান। বোঝো ঠ্যালা। ঋষিরও কাম আছে। তিনি আবার দুই স্ত্রী রেখেছিলেন দিতি আর অদিতি। আমরা এক বিবাহতেই ভয়ে মরি। ছেলেপুলে বেশি হলে লজ্জা পাই। এইবার কী হল? দিতি একদিন ভরসন্ধ্যাবেলা

কশ্যপের কাছে এসে হাজির। পূজা-পাঠ-প্রার্থনার জন্যে নয়। সন্ধ্যার প্রদীপ দিতে বা শাঁখ বাজাতেও নয়। তিনি স্বামীকে বললেন, এসো আমাতে উপগত হও। আমি একটি বলবান পুত্র চাই। মহর্ষিও তেমনি, সন্ধ্যাহ্নিক ভুলে সেই কালবেলাতেই মেতে গেলেন কামকলায়। বলতে পারলেন না, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোক, জপাহ্নিক সমাধা হোক, রাত্রি গভীর হোক, তারপর না হয় দেখা যাবে। শাস্ত্রের নির্দেশই আছে, প্রাতে দ্বিপ্রহরে সায়াহ্নে মিলিত হওয়া উচিত নয়। সন্ধ্যায় নিতান্ত সাধারণ মানুষও ক্ষণকালের জন্যে ঈশ্বর চিন্তা করে। যেমন ঋষি তাঁর তেমন পত্নী। কশ্যপ জানতেন কামজ সন্তান সুসন্তান হতে পারে না। তিনি যে সময়ের, সেই সময় হল ভারতের আধ্যাত্মিক উন্মেষের কাল। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ তৈরি হচ্ছে ঋষিদের তপোবনে। প্রজনন কামক্রিয়া নয়, এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠান। যোষারূপ অগ্নিতে বীর্যাহুতি। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন— যোষাবাব গৌতম! অগ্নিঃ। তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবা রেতো জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি। বুঝলে কিছু? সংস্কৃতর চর্চা তো উঠেই গেল দেশ থেকে। সায়েবরা সেবা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, দিশি সায়েবরা এসে সোজা গলায় ঠ্যাং তুলে দিলে। পাতলুন পরা বড় সায়েবের দল। দেশটা তেনাদের বাতকর্মে দুর্গন্ধময়। তুমি অমন ছটফট করছ কেন বাবাজি? প্রকৃতির ডাক?

আজ্ঞে না, আমার তো এখনও আহারাদি হয়নি।

সে তো আমারও হয়নি। আমার তো স্বপাক। তুমি ব্রাহ্মণ? আমার তো তাই মনে হয়।

আজ্ঞে যথার্থই।

তবে? ব্রাহ্মণের জীবনধারণের বিধি কী? আমি কীভাবে বললুম তুমি ব্রাহ্মণ? তোমার শরীরে কোথাও লেখা আছে? না, আছে তোমার সূক্ষ্ম শরীরে। আমি সেই সূক্ষ্মের বর্ণ দেখতে পাচ্ছি— ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাং চ লোহিতঃ। বৈশ্যানাং পীতকশ্চৈব শূদ্রাণাম অসিতস্তথা॥ পদ্মপুরাণে একথা বলা হয়েছে। মানুষের ভেতরের বর্ণ দেখা যায়, তোমরা ইংরিজিতে যাকে বলো টাইপ। ব্রাহ্মণের বর্ণ শুক্ল, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত, শূদ্রের কৃষ্ণ। শুক্ল মানে শ্বেত, মানে সাদা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হবে সাত্ত্বিক। খাওয়া হল না খাওয়া হল না বলে ছটফট করছ। একদিন আহার না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! এক তো নিজেকে পতিত করে ফেলেছ শ্ববৃত্তি নিয়ে। শ্ববৃত্তির অর্থ বুঝলে?

আজ্ঞে না। তবে ওই ধরনেরই একটা শব্দের অর্থ কুকুর।

কাছাকাছি গেছ। শব্দটার অর্থ দাসত্ব। ব্রাহ্মণের দাসত্ব করা উচিত নয়। মনুর নির্দেশ, নিজের জীবনযাত্রার প্রয়োজন এরূপভাবে সংকীর্ণ করবে যেন কোনওদিন না শ্ববৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়। সংস্কৃত শুনলে ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়ছ, তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি, তবু আমি বলব যাতে তোমার কান তৈরি হয়— ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু, মৃতেন প্রমৃতেন বা/ সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥ ব্রাহ্মণ ঋত ও অমৃত দ্বারা, মৃত ও প্রমৃত দ্বারা, সত্য ও অনৃতদ্বারা জীবিকা অর্জন করবেন, কদাচ শ্ববৃত্তি করবেন না। এইবার আমার পিদ্রুসবাবু পড়েছেন বিপদে। শ্লোকে বহু শব্দ, যার অর্থ তিনি জানেন না। তাকিয়ে আছেন বোকার মতো। ঋতের অর্থ কী? শিলোঞ্ছবৃত্তি। সেটা কী? কৃষকেরা ফসল কেটে নিয়ে যাবার পর ক্ষেত্রে যে শস্যকণা পড়ে থাকে তা সংগ্রহ করে জীবনধারণ। অমৃতের অর্থ অযাঞা, অর্থাৎ কারও কাছে কখনও কিছু না চাওয়া, মৃতের

অর্থ ভিক্ষাচর্য। প্রমৃতের অর্থ কৃষিকর্ম আর সত্যানৃতের অর্থ বাণিজ্য! তুমি এই সবকটি করতে পারো; কিন্তু শ্ববৃত্তি কখনও নয়।

সাহস করে বললুম, যদি অনুমতি করেন তা হলে আমি এইবার নিজকর্মে যাই।

আজ্ঞে না, তোমার এখনও ছুটি হয়নি। বলরাম এখনও তোমাকে ছুটি দেয়নি অবোধ। এই প্রসঙ্গের শেষ কথাটি তোমাকে বলা হয়নি। সেটি মহাভারতের বনপর্বে আছে। মানুষের জীবনের কাম্য কী? সুখ। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু/অনলে পুড়িয়া গেল/অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে/সকলি গরল ভেল।/সখি কি মোর করমে লেখি/শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু/ভানুর কিরণ দেখি। /উচল বলিয়া অচলে চড়িতে/পড়িনু অগাধ জলে/লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল/মাণিক হারানু হেলে॥ জ্ঞানদাসের পদ। সবই সুখের লাগি। সুখ কোথায়? সুখ মহাভারতের বনপর্বে। যুধিষ্ঠির বলছেন ধর্মকে, পঞ্চমেহহনি ষষ্ঠে, বা শাকং পচতি স্বেগৃহে/অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥ হে জলচর যক্ষ! যে-ব্যক্তি পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিনে নিজের গৃহে বসে শাকান্নও পাক করে অথচ সে ঋণী ও প্রবাসী নয়, সে-ই সুখী। অতএব তুমি কী খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ! শ্ববৃত্তির জন্যে তোমাকে তো প্রবাসী হতে হবে!

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম পণ্ডিতমশাইয়ের শীর্ণ কিন্তু উজ্জ্বল মুখের দিকে, আপনি কেমন করে জানলেন?

বৃদ্ধ রহস্যের হাসি হেসে বললেন, সৎ, সাত্ত্বিক, শাস্ত্রসম্মত জীবনযাপন করলে মানুষের মধ্যে একটা শক্তি জাগ্রত হয়! তার প্রমাণ তুমি এইমাত্র পেলে।

আজ্ঞে আমি এইবার আসি তা হলে। এইবার আমাকে খুঁজতে বেরোবে। বিশ্বাস করুন আমি প্রায় সবই বুঝতে পেরেছি।

তুমি কিছুই যে বোঝোনি তোমার আচরণই তার প্রমাণ। তুমি শুধু জীবিকার দাস নও তুমি সময়ের দাস, পরিবেশের দাস, ঘটনার দাস। তোমার অবস্থা খোঁটায় বাঁধা গোরুর মতো। তোমাকে অমূল্য কিছু সম্পদ দিতে চাইছি, তুমি নিতে পারছ না। তোমার ভেতরে আধ্যাত্মিক একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কোথায় গেল?

মনে হয় চাপা পড়ে গেছে।

তোমার কিন্তু সংস্কার ছিল। কু-চিন্তা আসে? কদাচারে অভ্যস্ত?

আজ্ঞে না।

তা হলে তো তুমি মহাপুরুষ হে! বৃদ্ধ হাহা করে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন। হাসি থেমে গেল। মুখ ভয়াবহ আকার ধারণ করল। চোখ রক্তবর্ণ। হিরণ্যকশিপুর মতো হুংকার ছাড়লেন, অনৃতভাষী। কুচিন্তা আর অবিরত বীর্যক্ষয় ছাড়া কারও এমন মলিন চেহারা হয় না। তোমার স্মৃতি-মেধা-ধৃতি-পুষ্টি, সবই সছিদ্র পাত্রের জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে। তুমি পাপাচারী।

আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন আমার অসুখ করেছিল।

করেছিল কী? করে আছে। সেই অসুখ সারাতে হবে যুক্তি তর্ক বুদ্ধি দিয়ে। সংকল্প দিয়ে, শ্রম দিয়ে।

বিশ্বাস করুন, আমি খুব চেষ্টা করছি।

কোথায় বসে? জ্বরের রোগী বসে আছ আচারের ঘরে!

আমাকে একজন বলেছেন ডন-বৈঠক মারতে। হাজার ডন, হাজার বৈঠক। তা হলে কুচিন্তা কুভাব কেটে যাবে।

ঠিক, ঠিক বলেছেন। এ তো স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের দাওয়াই। তা তোমার যা শরীর, পঞ্চাশে উঠতেই হার্টফেল করবে।

একটা কথা বলব? আমার পিতা আপনার চেয়েও ক্রোধী। আমি এখন যাই। ওদিকটা সামলে আবার আসব।

শোনো, যা দিয়ে শুরু সেটা শেষ না হলে যাবে কী করে! পৃথিবী শয়তানের এইটাই তো ছিল আমাদের প্রমেয়। বললেই তো হল না, প্রমাণ করতে হবে। ধরো আমি বললুম আকাশ নীল। তুমি দেখলে। দেখে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আকাশ নীল। বিজ্ঞানী এসে বললেন, তোমরা দু'জনেই ভুল করলে, আকাশ কালো, অজস্র ধূলিকণায় সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে নীল দেখায়। বিজ্ঞানের প্রমাণ গবেষণাগারে। মতের প্রমাণ ন্যায়শাস্ত্রে, যুক্তিতে। আমি যদি বলি, মানুষ দেবতা নয় দানব, আমাকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। সবার আগে নির্দেশ করতে হবে সংজ্ঞা। দানবের সংজ্ঞা কী? দেবতার সংজ্ঞা কী? আর দেব ও দানবের মাঝে মানবেরই বা সংজ্ঞা কী? দিতি যখন শয্যা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কশ্যপ তখন বললেন, তোমার চিত্ত অপবিত্র, তুমি কামাতুরা, তোমার দুই অধম পুত্র হবে, তারা হবে অসুর। তিনি যখন অসুর বলছেন, তখন অসুরের একটা সংজ্ঞা আছে। যেমন ধরো আম। আমের সংজ্ঞা নির্দেশে বিচার্য কী কী? প্রথম আকার, আকৃতি, বর্ণ। দ্বিতীয়, তার অভ্যন্তর, তৃতীয়, তার স্বাদ। চতুর্থ বৃক্ষ। এখন তুমি যদি বলো আমের স্বাদ মিষ্টি, তা হলে হল না। আম ভীষণ মিষ্টিও হতে পারে, ভীষণ টকও হতে পারে। তোমাকে বলতে হবে অম্লমধুর। এইবার এসো জননী বৃক্ষে। আম্রবৃক্ষসকল একইরকম দেখতে হলেও ফল মিষ্ট হতে পারে, অম্লও হতে পারে, অতঃপর উপমা স্থানান্তর। বৃক্ষ থেকে মানবে। মানব যোনি থেকে দেবতা আবির্ভূত হতে পারে অসুরেরও জন্ম হতে পারে। যেমন, কশ্যপের দুই স্ত্রী, দিতি ও অদিতি। অদিতির পুত্ররা হলেন দেবতা, দিতির পুত্ররা হলেন দানব। সুতরাং আমের সংজ্ঞা নির্ধারণে বৃক্ষের যে ভূমিকা, দেব-দানবের সংজ্ঞা নির্ধারণে যোনিরও সেই ভূমিকা। অতএব ওটি গৌণ। আমাদের বিচার থেকে উৎসকে সরিয়ে রেখে আর একটি বিচার আনব যা ওই বিচার থেকেই উৎপন্ন, সেটি হল বীজ ও মৃত্তিকা। বীজ ও মৃত্তিকাকে ভেঙে আনব উপাদান ও পরিবেশ। পরিবেশকে ভাঙো, খনিজ উপাদান, জলবায়ু। বীজকে ভাঙো, অর্থাৎ বীজের সংস্কার। এখানে একটা ব্যতিক্রম চিহ্নিত করি। এক, ল্যাংড়ার বীজে ল্যাংড়াই হবে। দুই, হিরণ্যকশিপুর বীজে অসুরই হবে। প্রশ্ন, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ হল কেন, কশ্যপের কেন হিরণ্যকশিপু হল? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বীজ কি তা হলে মৃত্তিকার গুণে গুণান্বিত! অনুসন্ধান, ল্যাংড়ার কি গুণভেদ হয়? হয়। উত্তরপ্রদেশের ল্যাংড়া অতিশয় সুস্বাদু, আঁটি পাতলা, আঁশ নেই। পশ্চিমবাংলায় সামান্য আঁশ আছে, আঁটি বড়, স্বাদে অম্লমধুর। সিদ্ধান্ত, কশ্যপের বীজ, মূল বীজ, দিতির যোনি ভাল নয়, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধুর যোনি ভাল ছিল। তাই কশ্যপের বীজ হিরণ্যকশিপু বাহিত হয়ে কয়াধুর গর্ভে দেবোপম প্রহ্লাদের জন্মের কারণ। অতএব মৃত্তিকাই নিয়ামক। অর্থাৎ পৃথিবী হল অধঃপতনের স্থান। পতিত জায়গা। প্রমাণ...।

আমি মৃত্তিকা ছেড়ে উঠেই পড়েছি। বিদ্যুৎগতিতে দরজার বাইরে থেকে জুতোজোড়া তুলে নিয়ে দে ছুট। কোন দিকে দৌড়োচ্ছি খেয়াল নেই। একটা কালভার্টের ওপর এসে জুতো গলাবার ফুরসত হল। ওরে সর্বনাশ, কী পাল্লায় পড়েছিলুম! এক সাঁওতাল রমণী পাশ দিয়ে চলেছে। খোঁপায় একটা কাঠি গোঁজা। এক থোকা সাদা ফুল। বয়স তেমন বেশি নয়। তবু সাহস করে জিজ্ঞেস করলুম, দোকানবাজার কোন দিকে বলতে পারেন ভাই! বেশ সাহসের দরকার হল। শুনেছি, সাঁওতাল যুবতীদের সঙ্গে কথা বললেই বন থেকে তির ছুটে আসে। মেয়েটি চিৎকার করল না, বরং হেসে জবাব দিল, সে-ও ওই দিকেই যাচ্ছে। তাকে অনুসরণ করলেই বাজার। আমি ভয়ে ভয়ে একটু পেছিয়ে গেলুম। ভয়ংকর শক্তিশালী চেহারা। পালিশ-করা শরীর। উঁচু, নিচু, বর্তুল, যাবতীয় জ্যামিতির ছড়াছড়ি। অসহনীয়। কিছুক্ষণ অনুসরণের পর মনে হল, মন মহাভারত হয়ে যাচ্ছে। পণ্ডিতমশাইয়ের আর কী? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। এখন তিনি দিবসের অষ্টমভাগে শাকান্ন খাবেন। যুবকের মন কী বুঝবেন! এই যে আমি পশ্চাৎগামী আর ওই যে বনবালা পুরোগামী, ষাট বছর আগের পণ্ডিতমশাই হলে কী করতেন? এখন তো তাঁর চর্পট-পঞ্জরিকা অবস্থা—অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম। এখন তো ভজ গোবিন্দং হবেই। হরিশঙ্কর বলেন, নিরামিষাশী কেন, না দাঁত আর পারমিট করছে না হাড় চিবোনো।

হঠাৎ পেছনে হইচই, ওই তো, ওই তো যাচ্ছে।

হরিশঙ্করের গলা, পাতাল প্রবেশ করেছিল।

থেমে পড়ে পেছন ফিরে তাকালুম। তিনজন হন্তদন্ত হয়ে আসছেন, পিতা হরিশঙ্কর, ছোটদাদু, মোহনবাবু। তিনজনে এসে পড়লেন। হরিশঙ্কর বললেন, কী কায়দায় অদৃশ্য হয়েছিলে! গ্রামাঞ্চলে ভুলভুলাইয়া বলে একটা ভূত আছে, তুমি কি সেইরকম কোনও ভূতের পাল্লায় পড়েছিলে? তুমি জানো সবাই তোমার অপেক্ষায় থাকবে না খেয়ে। কবে যে তুমি একটু মানুষ হবে। মাছ ধরছিলে, না পাখি দেখছিলে?

আজ্ঞে, ওসব কিছু নয়, আমাকে বলরাম পণ্ডিতমশাই ধরেছিলেন।

মোহনদা বললেন, সর্বনাশ, তুমি ছাড়া পেলে কী করে! মহাপণ্ডিত, তবে ইদানীং মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে।

আমাকে ওই চতুষ্পাঠীর ভেতরে নিয়ে গিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, পৃথিবীটা শয়তানের, ভগবানের নয়। তারপর একসময় আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।

হরিশঙ্কর ভয়ংকর উল্লসিত হয়ে বললেন, তাই নাকি? এমন এক পণ্ডিত আছেন এখানে? আমার মতের সমর্থক। তা হলে এক রাউন্ড বসে যাই। এমন সুযোগ আর পাব না। আমি প্রথমে অস্বীকার করব। শুরু হবে তর্ক। কতকাল পরে আবার তর্কযুদ্ধ। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন। ন্যায়শাস্ত্রের লন্ডভন্ড। চলো চলো, যাই। এমন সুযোগ আর পাব না।

ছোটদাদুও লাফিয়ে উঠলেন, চল চল, দুই চৈতন্যের লড়াই দেখি।

মোহনবাবু করুণ মুখে বললেন, একেবারে অবেলা হয়ে গেছে, যা হয় কিছু সেবা করে নিন আগে। পিত্তি পড়ে যাচ্ছে। বিমলা বসে আছে পথ চেয়ে। তা ছাড়া দুর্ভাবনা, ছেলেটা দামোদরেই চলে গেল কি না!

হরিশঙ্কর বললেন, তা হলে একবার দর্শন করে যাই। অন্তত জানিয়ে যাই, আমরা আসছি, একঘণ্টার মধ্যে।

আমি বললুম, পণ্ডিতমশাই মোহনবাবুর খুব প্রশংসা করছিলেন। তা তিনি নিজেও অভুক্ত। পণ্ডিতমশাইকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলে হয় না?

মোহনবাবু বললেন, তিনি স্বপাক ছাড়া খান না। আর এক যদি তাঁর মা রেঁধে দেন। চলুন তাঁকে আমরা বলে চলে যাই।

ছোটদাদু বললেন, আর কি আমরা সময় পাব! আমাদের তো যেতে হবে।

মোহনবাবু বললেন, আজ আর যাওয়া হবে না। কাল সকালে বেরোবেন। দূরের পথ। পৌঁছোতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

আমরা সদলে চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করলুম। জানতুম প্রথম থেকেই হরিশঙ্কর মুগ্ধ বিমুগ্ধ হতে হতে একেবারেই সমাহিত অবস্থায় চলে যাবেন। এত গাছ, ফুল, প্রজাপতি, কঞ্চির বেড়া, মৌচাক, ভ্রমর। আহা ওহো করছেন আর ছোটদাদু তাঁকে ঠেলছেন, চল, চল এগিয়ে চল এগিয়ে চল।

অবশেষে পণ্ডিতমশাইকে পাওয়া গেল পেছনের বারান্দায়। ইটের মাঝখানে কাঠ জ্বেলেছেন। যত না আগুন তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া। মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আস্ত একটা বেগুন জলচর প্রাণীর মতো হাবুডুবু খাচ্ছে। পণ্ডিতমশাই একপাশে বেশ আরামে বসে শাক বাছছেন। এতই তন্ময় আমাদের উপস্থিতি টের পেলেন না। নিজের ভাবেই মৃদু মৃদু হাসছেন। হঠাৎ বললেন, যাবে যাও। কে তোমাকে ধরে রেখেছে?

মোহনবাবু যেই ডেকেছেন, পণ্ডিতমশাই, অমনি চমকে উঠেছেন, কার সঙ্গে কথা বলছেন?

আরে একটু আগে একটি ছেলে এসেছিল, সে নাকি তোমার ওখানেই অতিথি হয়েছে, তাকে দেখতে ঠিক আমার সেই বড় ছেলেটার মতো, সেই যে গো জয়রাম, টাইফয়েডে মারা গেল, ছেলেটা ছুটে পালাল। অনেকদিন পরে তার সঙ্গে বেশ একটু শাস্ত্র আলোচনা হচ্ছিল, যেমন হত জয়রামের সঙ্গে, আহা বেচারার বোধহয় খুব খিদে পেয়েছিল, বুঝলে মোহন!

পণ্ডিতমশাই, সে আবার এসেছে। সঙ্গে তার পিতা আর মহাসাধক দাদু এসেছেন।

পণ্ডিতমশাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কোল থেকে কিছু শাকপাতা ঝরে পড়ল। তিনি আকুল হয়ে বলতে লাগলেন, কোথায় আমার জয়রাম কোথায়, কোথায় আমার রাম!

রাম রাম বলতে বলতে বৃদ্ধ অঝোরে কেঁদে ফেললেন। বৃদ্ধের চুল সাদা, বৃদ্ধের ভুরু সাদা, সাদা চোখের পাতা। দু'গাল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। ঠোঁটদুটো তিরতির করে কাঁপছে, আর মাঝে মাঝে শব্দ বেরোচ্ছে, রাম, জয়রাম।

তিনি কাঁপতে কাঁপতে একপাশে হেলে পড়ছিলেন, ছোটদাদু এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, যে জিসকো শরণ লিয়ে সো রাখে/উসিকো লাজ/উলট জলমে মছলি চলে/বহি যায় গজরাজ। পণ্ডিতমশাই কার কথা?

প্রশ্ন? আর যায় কোথায়, পণ্ডিতমশাই কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বললেন, মহামান্য, এ তো তুলসীদাস।

ছোটদাদু বললেন, তবে? অর্থ যথা পদধুলি হোয়, যৌবন নদী কর বেগ/মানুখ জলখে বিন্দু হোয়, জীবন ফেন করি লেখ॥ এর অর্থ কী পণ্ডিতমশাই?

ছোটদাদুর আলিঙ্গনমুক্ত পণ্ডিতমশাই বললেন, ধন পদরজের ন্যায় অতি তুচ্ছ, যৌবনদশা বেগবৎ চঞ্চল, নরগণের শরীর জলবিন্দু সদৃশ; অতএব ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য আপাতত সুখকর সংসারসুখে কেন মুগ্ধ, মোক্ষলাভের নিমিত্ত ধর্মোপার্জনই কর্তব্য।

তবে আপনি এমন বিচলিত হচ্ছেন কেন?

মহাশয়, মানুষের ধর্মই হল বিচলিত হওয়া। কারণ মনই মানুষের কর্তা। আমার আমি যতদিন এই দেহকে ঘিরে আছে, ততদিনই আমার দুঃখ, সুখ, জরা, ব্যাধি। তেষু বিনষ্টেষু সৎসু স্বয়ং বিনশ্যতি। ধর্ম হল দুর্বল মানুষের হাতিয়ার। ঈশ্বর হলেন জ্বরের রোগীর কপালের জলপটি। রোগারোগ্য হয় না, সাময়িক উপশম হয় মাত্র। আপনাদের তত্ত্বকথা অনুলেপন মাত্র। আমি ভক্ত নই। আমি বিচারশীল এক মানব। ইহলোকাৎ পরো নান্যঃস্বর্গোহস্তি নরকা ন চ। ইহলোকের পর স্বর্গও নেই, নরকও নেই মহামান্য। সবই এইখানে। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। আমার দুঃখ-বেদনা-অনুশোচনার কোনও প্রলেপ নেই। সহ্যই আমার শক্তি।

হরিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে করমর্দন করতে করতে বললেন, এই তো চাই, এই তো চাই। এতদিনে একজন বীর মানব খুঁজে পেয়েছি। এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা চলে।

পণ্ডিতমশাই বললেন, অনুমান সঠিক, আপনি আমার জয়রামের পিতা।

আজ্ঞে, জন্মদাতা।

উপযুক্ত উত্তর। আপনি অতিশয় জ্ঞানী। আর ইনি এক বিশ্বাসী সাধক। মাতৃ উপাসক। মানবের পাঁচটি পিতা, পঞ্চপিতা, জন্মদাতা ভয়ত্রাতা কন্যাদাতা বিদ্যাদাতা অথবা দীক্ষাদাতা ও অন্নদাতা।

মোহনবাবু আমার কানে কানে বললেন, হয়ে গেল। আজ সাড়ে সর্বনাশ। তিন জ্ঞানী একত্র হয়েছেন।

পণ্ডিতমশাই আবার শুরু করলেন, জগৎকারণের মূল হল অহংকার। অহংকার দু'রকম, জীবের অহংকার, মানবের সমবেত অহংকার। সমবেত অহংকার সভ্যতার চাকা। আর যে-শক্তিতে পশু লেজ নাড়ে, সেই শক্তিই ব্যক্তির অহংকার। তর্জনগর্জন আস্ফালনাদি ইত্যাকার লাঙ্গুল সঞ্চালনাদি কর্ম, উপনিষদোক্ত, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। অহংকারশূন্য মানব কর্তিতলাঙ্গুল বৃহন্নলাবৎ।

হরিশঙ্করের চোখমুখ উজ্জ্বল। সার-পাওয়া লতার মতো। তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, শাবাশ, শাবাশ।

এমন সময় ভাতের ফেন উথলাল। মোহনবাবু বললেন, পণ্ডিতমশাই অন্ন প্রস্তুত। আপনি আহারাদি সেরে নিন, আমরা আবার আসছি।

হরিশঙ্কর বললেন, শাক আপনি কীভাবে প্রস্তুত করবেন?

অতি সহজ। পাত্রে জল, জলে কিঞ্চিৎ হলুদ, কালো জিরা ও লবণ। তাইতে শাক ছেড়ে দোব। সুসিদ্ধ হলে নামিয়ে নোব। অতিশয় সুস্বাদু।

ছোটদাদু জিজ্ঞেস করলেন, এই আপনার দিবসের আহার? রাত্রিকালে?

আমি একাহারী!

শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে না?

মহাশয়, মেধাই আমার বৃত্তি। শরীর নয়। আমার কায়িক-শ্রম নেই বললেই চলে। আমার কোনও ক্ষয় নেই। কোনও দুশ্চিন্তা নেই। একেবারে গণিতের নিয়মে শরীর চলছে।

গণিত! গণিত হরিশঙ্করের ঈশ্বর। মেধা হরিশঙ্করের ইষ্ট। তিনি লাফিয়ে উঠলেন, এই তো চাই। গণিত আপনার জীবন। আপনি সিদ্ধ মহাপুরুষ!

He that looks not before, finds himself behind

শিশুকে যেভাবে ভুলিয়ে শান্ত করে তার আকর্ষণের ক্ষেত্র থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, মোহনবাবু ঠিক সেইভাবে হরিশঙ্কর ও ছোটদাদুকে নিয়ে এলেন। বিমলাদি দাওয়ায় বসে আছেন আপনার ভাবে বিভোর হয়ে। পিন্টু লাল মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, দু'হাতের ভরে চিবুক রেখে গভীর মনোযোগে কী একটা বই পড়ছে। পেছনের পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে মুড়ে ওপরে তোলা।

আমাদের ফিরতে দেখে বিমলাদি তাড়াতাড়ি উঠে এগিয়ে এসে বললেন, আপনাদের ভারী দেরি হয়ে গেল আজ। কত বেলা হয়ে গেছে।

ছোটদাদু বললেন, কিচ্ছু ভাবিসনি মা, আমরা সব চারটের পার্টি। সকাল সকাল খায় রোগীরা।

পিন্টু অদ্ভুত কায়দায় গড়িয়ে মেঝে থেকে ঝপ করে উঠে বললে, ছোটমামা, তুমিও ছোট ছেলের মতো হারিয়ে যাও! হারিয়ে গেলে কী করতে হয় জানো? মামার নাম বলবে, আর বাড়ির ঠিকানা। তোমার মামা আছে তো?

বিমলাদির দিকে তাকাতেই করুণ মুখে একঝলক হাসি এনে বললেন, ছেলের পাকাপাকা কথা শোনো।

ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। বাবার পরিচয়ে পরিচিত হবার উপায় নেই। মামার পরিচয়ই সব। শিশু জানে না তার জীবনের দুর্ভাগ্যটা কোথায়! যখন জানবে তখন সে একটা বেদনারই উত্তরাধিকারী হবে। পুরো ইতিহাস আমার জানা হবে না। তবে যদি ধর্মের কারণে বিচ্ছেদ হয়ে থাকে, তা হলে বিমলাদির কাছে আমার নিরুচ্চার প্রশ্ন, সংসার করতে গিয়েছিলেন কেন? এমন সুন্দর এক শিশুর জীবন কেন নষ্ট করলেন! পণ্ডিতমশাই ঠিক, পৃথিবী শয়তানের। এখানে ভগবানও সময় সময় শয়তানের রূপ ধরেন। না কি শয়তান ধরেন ভগবানের রূপ!

আমরা লাইন দিয়ে খেতে বসেছি। এমন সময় মোহনদার এক পরিচিত এসে জানিয়ে গেলেন, দামোদর ভয়াবহ চেহারা ধারণ করেছে। জল বাড়তে বাড়তে একেবারে টইটম্বুর। যে-কোনও সময় কূল ছাপিয়ে যাবে।

হরিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আগ্রহে বললেন, তার মানে বন্যা! বন্যা হলে আমি কিন্তু থেকে যাব! দুর্ভিক্ষ দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি, দাঙ্গা দেখেছি, ভূমিকম্প দেখেছি, মহামারী দেখেছি। দুটো জিনিস দেখা হয়নি, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আর বন্যা।

মোহনদা বললেন, সে ভারী সুন্দর! কোনওরকমে বেঁচে গেলে অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা। শুধু জল আর জল। সব সমান। এ পাড়া ও পাড়া নেই সব একাকার। গাছপালা সব ছোট ছোট, ঝোপের মতো। বাড়ির চালগুলো শুধু জেগে আছে। সেই চালে বসে আছি আমি। শুধু আমি একা নই, আমার সঙ্গে গোরু আছে, ছাগল আছে, হাঁস-মুরগি আছে, সাপ আছে। ঘরে ঘরে মানুষ নেই, শুধু জল কলকল করছে। এরই মধ্যে ঘর ভাঙবে। ঝুপ করে দেয়াল ধসে পড়ে চালাটা ভাসতে ভাসতে চলে যাবে। না খাদ্য, না জল। এরই মাঝে

আসবে নৌকো, হয় সেনাবাহিনীর না হয় মিশনের। অনেক দিন না-খাওয়ার পর খাওয়া, মরতে মরতে বেঁচে ওঠার কী আনন্দ। মরে না গেলে একটা অভিজ্ঞতা। বিহারে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বন্যা হলেও হতে পারে। আপনাদের ভাগ্যে থাকলে দেখা হবে। বন্যা আমাদের গা সওয়া। হলেই হল।

হরিশঙ্কর বললেন, একবার নদীর ধারটা ঘুরে এলে হয়!

ছোটদাদু বললেন, তুই কোনওরকমে আগে খাওয়াটা শেষ কর। নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা হবে তো! সে অভিজ্ঞতাটা খুব সুখের হবে না। আমার সাধারণ বুদ্ধি যা বলে। যতটা পারো পেটে নিয়ে নাও। এমনও হতে পারে সাতদিন কিছু জুটল না।

বিমলাদি পরিবেশন করতে করতে বললেন, এখন বন্যা হবে না। আরও পরে হলেও হতে পারে। মাসখানেক পরে। এ জল আমাদের বাগান পর্যন্ত এসে সরে যাবে। বড়জোর এই উঠোনটা ভরে যাবে। এ দাওয়া থেকে ও দাওয়া জল ভেঙে ভেঙে যেতে হবে।

পিন্টু বলল, দেখবে কত মাছ আসবে। সাপ আসবে সুন্দর সুন্দর।

ছোটদাদু বললেন, অপূর্ব আহার হল। বিমলা মা আমার চমৎকার রেঁধেছে। এতসব করলে কখন?

মোহনদা বললেন, বিমলা ভীষণ ভাল রাঁধে। ওর রান্নার জন্যেই আমার খদ্দের। মানুষকে খাইয়ে আনন্দ পায়।

পিতা হরিশঙ্করের কানে কানে বললুম, কিছু তো কেনা হল না! উপহার।

হরিশঙ্কর চুপিচুপি বললেন, ব্যবস্থা হয়েছে একটা।

আমি আরও ফিসফিস করে বললুম, কী ব্যবস্থা?

ছোটমামার পকেটে একটা সোনার মাদুলি ছিল তারা মায়ের চরণের ফুল ভরা। এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কী হতে পারে! ধর্মের সংসার, বেশ মানিয়ে গেছে।

ছোটদাদু ভীষণ পান ভালবাসেন। দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বসেছেন। পেছনে পরিষ্কার ওয়াড়ে-ঢাকা বেঁটে মোটা তাকিয়া, সামনে পানের ডিবেতে সাজা পান। পাশে গোল ছোট্ট ডিবেতে চুন। আর একটা কৌটোয় জরদা। ছোটদাদু চারপাশ আলো করে বসে আছেন। হরিশঙ্কর কবি হয়ে গেছেন। গাছ, আকাশ, নদী, পাখি। সামনেই বাঁশঝাড়। হরিশঙ্কর বাঁশঝাড় ভীষণ ভালবাসেন। কচি, মসৃণ, তেলা বাঁশ তাঁর কাছে কবিতার মতো সুন্দর।

হরিশঙ্কর বললেন, একটাই অভাব। একটা ছোট পাহাড় থাকলে বেশ হত।

ছোটদাদু বললেন, বাকি জীবনটা এখানে কাটালে কেমন হয়? আমাদের তো কোথাও কোনও বন্ধন নেই। বড় শান্তির জায়গা। একটা পঞ্চমুণ্ডীর আসন পেতে বসে পড়ো কাজের কাজে।

হরিশঙ্কর বললেন, বসতে হলে হিমালয়ের কোলেই বসা ভাল।

হিমালয় হল শিবের, বিষ্ণুর। তারার সাধনা গরম ছাড়া হয় না। কাঁকুরে মাটি, জলের অভাব, ফোসকা পড়ানো ভীষণ গরম, একটা বেলগাছ, পাশেই মহাশ্মশান, হোমের আগুন, তবেই না তাঁর আবির্ভাব! বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই হল পীঠস্থান। চল না, আমার সঙ্গে একদিন শ্মশানে বসবি।

হরিশঙ্কর বললেন, শ্মশান করেছি হৃদি, শ্মশান-বাসিনী শ্যামা, নাচবি সেথা নিরবধি। আমি আর শ্মশানে গিয়ে কী করব? আমার জীবনটাই তো শ্মশান। প্রহরে প্রহরে স্মৃতির শৃগালের হুক্কাহুয়া। হরি বাঁচ, আরও বাঁচ। প্রতিদিন মরে মরে বাঁচ। মৃত্যুর হায়না রবীন্দ্রনাথের মতোই আমার জীবন নিয়ে খেলা করেছে। তাঁর সেই অপূর্ব গান নিজেকে গেয়ে শোনাই, গরব মম হরেছ, প্রভু, দিয়েছ বহু লাজ/ কেমনে মুখ সমুখে তব তুলিব আমি আজ। মুখুজ্যেমশাই, এর দাদু প্রেমিকের একটা গান গাইতেন। গেঁথে আছে আমার মনে। সুরটাও ছিল অসাধারণ, পরজবাহার। মন দিয়ে শোন, তুই তো গান লিখিস। বিশাল বিশ্বফলকে আঁকিছ প্রতিপলকে/সীমা করি লোকালোকে, মহামোহ রাগ সারে॥ আশারূপ মহাহ্রদে পড়ে যায় ধরিতে চাঁদে/কেহ কাঁদে মনের খেদে, মত্ত কেহ অহংকারে/ কেহ আনন্দে মগন পেয়ে তনয়-রতন/কেহ অশ্রু বিসর্জন করে মৃত সুত হেরে॥ কল্পনা-পাদপ-তলে বসেছে কেউ কুতূহলে। কেহ ভাসে সকল ফেলে অকালে কাল-স্রোত-নীরে/এ আকৃতির এমনি রীতি অসত্যে সত্য প্রতীতি। দেখ, আমি নাস্তিক। দেবদেবীতে আমার বিশ্বাস নেই। জীবন হল যাপনের জিনিস। যেমন কম্বল। গায়ে দাও। ছাতা মাথায় দাও। জুতো পায়ে দাও। মানুষ হল বদ্ধ উন্মাদ। একটা মাছি তৈরি করার ক্ষমতা নেই, ডজন ডজন দেবতা তৈরি করে বসে আছে। আমি নিৎসের মতোই মাঝে মাঝে প্রশ্ন করি নিজেকে, মানুষ ভগবানের মারাত্মক ভুল, না ভগবান মানুষের মারাত্মক ভুল। বিশ্বাস মানুষের মনে ঢোকানো যায় না, বিশ্বাস মানুষের মনে তৈরি হয়। ফুলের মতো ফুটে ওঠে। ঘাসের মতো অনায়াসে গজায়।

হরিশঙ্কর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কেন অকারণে এত বকছি! প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পথে হাঁটবে। পথের শেষে খুঁজে পাবে বেঁচে থাকার উপলব্ধি। এত যুক্তিতর্কের কী প্রয়োজন! কুকুরের লেজ বাঁকা, বাঁকাই থাকবে। ঘোড়ার লেজ সোজা ঝুলে থাকবে চামরের মতো। শত চেষ্টাতেও তার পরিবর্তন হবে না। বাজে না বকে, যাই দেখে আসি প্রকৃতির খেলা। দামোদরের জল কত দূর এল! পথে উঠে পড়েছে কি না?

মোহনদা বললেন, পণ্ডিতমশাইয়ের টোলে যাবেন না? বললেন যে, খুব তর্ক হবে!

হরিশঙ্কর উদাস মুখে বললেন, কী হবে অহংকারের কাঠি-নৃত্য করে? যুগ বদলে গেছে। শ্রীচৈতন্যের প্রেমের যুগ, শঙ্করের মেধার যুগ, বুদ্ধের বিচারের যুগ, প্রসাদের ভক্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে। এখন চলেছে শিশ্নোদরের যুগ। খাও-দাও শুয়ে পড়ো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।

ছোটদাদু বললেন, বিকেলটা তো কাটাতে হবে! পণ্ডিতমশাইয়ের আশ্রমটা ভারী সুন্দর। তর্ক না হোক দুদণ্ড বসা তো যাবে।

হরিশঙ্কর কী ভাবলেন, চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, আজই আমাদের চলে যাওয়া উচিত ছিল। একটা কাজের জন্যে আমরা অনেকটা সময় খরচ করে ফেললুম।

ছোটদাদু বললেন, আমরা কি আর করলুম! যাঁর ইচ্ছায় জগৎ-সংসার চলছে, তিনিই করাচ্ছেন।

মোহনদা বললেন, আপনারা যে-দিকটায় যাবেন, সেদিকে বিশাল একটা জঙ্গল পড়বে। দুর্গাপুর হওয়ার পর, যত ডাকাত ছিল সব চলে এসেছে ওই তল্লাটে। কী দরকার, রাত্তিরবেলা ঝুঁকি নিয়ে! কাল সকালে যাবেন। একটা রাতের তো ব্যাপার। আপনারা মহাপুরুষ। একদিনের জন্যে আপনাদের একটু সঙ্গ করি। সকালে বলেছিলেন, লুচি-কুমড়োর ছক্কা খাবেন, রাতে সেইটাই হবে মহামায়ার ভোগ। একটু পুজো হবে, আরতি হবে। আমাদের দুঃখের জীবনে আর কী আছে! একটা আশা নিয়ে বেঁচে থাকি।

ছোটদাদু বললেন, মহামায়া?

মোহনদা বললেন, সে এক কাহিনি! সেবার বন্যা হয়ে গেল জোর। জল নেমে গেল। আমরা নেমে এলুম ডাঙা থেকে। ভিজে ভিজে তিন জ্বর। বাড়িঘর মাটি ভরতি। কোনওরকমে একটুখানি পরিষ্কার করে পড়ে আছি একপাশে। চোখ খুলতে পারছি না, পাশ ফিরতে পারছি না। রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। সে আমার স্বপ্ন, না আপনারা যাকে দর্শন বলেন, তা-ই বুঝতে পারলুম না। কুচকুচে কালো এক দেবীমূর্তি। আমার মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে বলছেন, হাত ধর। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। দেখি হাতের পাশে বালিমাটির ওপর ছোট্ট এক দেবীমূর্তি শুয়ে আছেন। পণ্ডিতমশাই দেখে বললেন, মহামায়া। সেই থেকে সংসারে বেশ যেন একটা আঁট এসেছে। মনটা আর আগের মতো টলে না। সহ্য করার শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। পুজো আমি শিখিনি। যা পারি তা-ই করি নিজের মতো করে।

ছোটদাদু বললেন, এসব কথা কারওকে কোনওদিন বলবে না। চেপে রাখবে নিজের ভেতর। চারপাশে কত অবিশ্বাসী আছে, তোমার সহজ সরল বিশ্বাস ভেঙে দেবে।

মোহনদা বললেন, আপনারা মহাপুরুষ, তাই আপনাদেরই বললুম।

কৃপা দয়া এইসব অযাচিত আসে। হয়তো পূর্বজন্মের কর্মফল। ছোটদাদু বললেন।

হরিশঙ্কর বললেন, ওই একটা জিনিস আমি মানি, কর্মফল।

এক খিলি পান মুখে ফেলে ছোটদাদু বললেন, কেন মানো? তুমি কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করো?

হরিশঙ্কর বললেন, কর্মফল হল চাষবাসের ব্যাপার, এগ্রিকালচার, সেই কারণেই মানি। বীজ যেমন বুনবে সেইরকম ফসল তুলবে। যেমন কর্ম তেমন ফল। এ জন্মে না পেলে পরের জন্মে সেইটাই হবে তোমার ভাগ্য, ডেস্টিনি। তুমি বুঝতেই পারবে না কোথা দিয়ে কী হয়ে যাবে!

ছোটদাদু বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। তাকিয়াটা টেনে নিলেন কোলে। মজলিশি মানুষ। দুঃখ, সুখ কোনও কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। জ্ঞাতি শত্রুর অভাব নেই। তারা যা-তা অপবাদ রটায়। ভণ্ড বলে। বিষয়সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অশান্তি করে। ছোটদাদু গ্রাহ্যই করেন না। কী সব ঘেউ ঘেউ করছে, কান না দিলেই হল। তুলসীদাসের মতো, হস্তী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার/সাধুনকে দুর্ভাব নহি যঁও নিন্দে সংসার॥ সবসময় একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব। মানিকজোড় বলে। হরিশঙ্কর আর ছোটদাদু সেই মানিকজোড়।

তাকিয়াটা কোলে টেনে নিয়ে ছোটদাদু বললেন, সেই গল্পটা শোনো। গভীর বন। মাঝরাত। এক তান্ত্রিক জবরদস্ত আয়োজন করে শবসাধনায় বসেছেন এক গাছতলায়। কারণবারি, ফুল, ছোলাভাজা। শব জাগলে তাকে ছোলাভাজা খাওয়াতে হবে। শবকে স্নান করিয়ে সাধক তার বুকে চেপে বসে খুব জপ করছেন। ওদিকে গাছের ডালে একজন উঠে বসে আছে। সে পথিক। রাত হয়ে গেছে দেখে বাঘের ভয়ে ডালে উঠে বসে আছে। শবসাধনায় সাধক অনেক বিভীষিকা দেখে। সাহস করে বসে থাকতে হয়। সাহস থাকলে সিদ্ধি, ভয় পেলেই মৃত্যু। শবই ঘাড় মটকে দেবে। সাধক সেই বিভীষিকা দেখতে শুরু করেছেন। ভয়ে এমন অবস্থা, ভাবছেন নেমে পড়ে দৌড় লাগাবেন কি না! এমন সময় কোথা থেকে বিশাল এক বাঘ এসে তন্ত্রসাধকের ঘাড় কামড়ে ধরে তুলে নিয়ে চলে গেল। পথিক বসে আছে গাছের ডালে। সে সব দেখছে। নীচে শুয়ে আছে শব। পূজার উপকরণ প্রস্তুত। সে তখন আস্তে আস্তে নেমে এল গাছ থেকে। খুব ইচ্ছে হল, দেখাই যাক না, বসে কী হয়।

আচমন করে বসে গেল শবের ওপর। একটু জপ করতে-না-করতেই মায়ের দর্শন। সামনেই মা ভগবতী। তিনি বললেন, আমি তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর নাও। মা'র পাদপদ্মে প্রণত হয়ে সে বললে, মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়েছি! যে-সাধক এত খেটে, এত আয়োজন করে, এতদিন ধরে তোমার সাধনা করছিল, তাকে তোমার দয়া হল না! আর আমি কিছু জানি না, শুনি না, সাধনহীন, ভজনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, আমার ওপর এত কৃপা হল মা? ভগবতী হাসতে হাসতে বললেন, বাছা! তোমার জন্মান্তরের কথা স্মরণ নেই, তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছিলে, সেই সাধনবলে তুমি বসতে-না-বসতেই আমার দর্শন পেলে। এখন বলো, কী বর তুমি চাও? এই হল কর্মফল। একটা বোকা, নিরেট, গাধামার্কা লোক সিংহাসনে বসে সবাইকে হুকুম করছে, আর বুদ্ধিমান বিচক্ষণ জ্ঞানী গুণী মানুষ হা অন্ন হা অন্ন করে পরের দাসত্ব করছে। বাংলায় একটা সুন্দর প্রবাদ আছে, কপালগুণে ঘি-ভাত, কপাল দোষে কী ভাত।

মোহনদা বললেন, আমার অবস্থাটাই দেখুন না। কোন ঘরের ছেলে আজ কোথায় নেমে কী কাজ করছি!

হরিশঙ্কর একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তাতে কী হয়েছে? সৎপথে সৎভাবে উপার্জন করার জন্যে যে-কোনও জীবিকাই গ্রহণ করা যায়। এতে অসম্মানের কিছু নেই।

মোহনদা বললেন, না, আমি বলছি ভাগ্যের কথা। মানে আমার ভাগ্যটা চিরকালই তেমন সুবিধের নয়। আমার জীবনে কিছুই তেমন হতে চায় না। কত লোকের কত কী হয়!

শোনো, ভাগ্যে বিশ্বাস করো শুধু শব্দটা পালটে নাও। ভাগ্যের জায়গায় বসাও কর্ম। যত খাটবে ততই তোমার বরাত ফিরবে। আমিও ভাগ্য বিশ্বাস করি। যত খাটি ততই আমার ভাগ্য ফিরে যায়। খাটলে খাটিয়া, আরও খাটলে খাট, আরও খাটলে সিংহাসন।

মোহনদা বললেন, আমিও তো কম খাটি না!

হরিশঙ্করের স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে ওঠা দেখে ছোটদাদু ভয় পেয়ে গেলেন, কী হল?

হরিশঙ্কর কোনও কথা না বলে সোজা চলে গেলেন দাওয়ার উত্তরপ্রান্তে। সেখানে দাঁড়িয়ে মোহনদাকে ডাকলেন। মোহনদা বেশ থেবড়ে বসেছিলেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে। ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেলেন। হরিশঙ্কর মোহনদার কাঁধে হাত রেখে বললেন, এটা কী?

ছোটদাদু বললেন, দেখে এসো তো, ওখানে মোহনের কোন ভাগ্য খেলা করছে? সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য! খোলার চাল। বাঁশের বাতা। বাঁশের খোঁটা বেয়ে পুরু হয়ে উইপোকা নেমেছে। যেন উইয়ের নদী। মূলধারা থেকে শাখা-প্রশাখা খেলে গেছে। কিছু শুঁড় আবার হিলহিলিয়ে মাথা তুলেছে, অশুভ অঙ্গুলি-সংকেতের মতো। দেখলেই গা শিউরে ওঠে।

হরিশঙ্কর বললেন, এটা কী মোহন?

মোহনদা চমকে উঠলেন, এ তো উই ধরেছে।

এটা উই নয় মোহন, এ তোমার আলস্য। আর এই আলস্যই তোমার ভাগ্য তৈরি করছে। আরও দেখবে?

হরিশঙ্কর মোহনকে নিয়ে তরতরিয়ে আরও কিছুটা উত্তরে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ওপরে তাকাও।

মোহন ওপরে তাকালেন, ভাল করে দেখে বললেন, ঘুণপোকা ধরেছে।

এরপর কী হবে? একদিন আচমকা ভেঙে পড়বে। ওই বাচ্চা ছেলেটাই এখানে বেশি খেলা করে। পড়লে তার মাথাতেই পড়বে। সেটা ভাগ্য? না তোমার আলস্য?

মোহন মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আজ্ঞে বাঁশ তো, ঘুণ আর উইপোকা ধরে ধরে আনে!

একটা টুল নিয়ে এসো।

টুল কী করবেন?

তোমাকে যা বলছি তাই করো।

হরিশঙ্কর আমাকে বললেন, বিমলাকে ডেকে আনো।

আমি জানি পিতা হরিশঙ্কর কী করতে চাইছেন! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। বিমলাদি বাড়ির পেছন দিকে বাসন মাজছিলেন। পিঠে ছড়িয়ে আছে এলো চুল। গুনগুন করে গান গাইছেন আর একটা লোহার কড়া শালপাতা ছাই দিয়ে ঘসঘস করে ঘষছেন। ঝকঝকে হয়ে গেছে, তবুও ঘষে যাচ্ছেন।

বিমলাদি।

চমকে ফিরে তাকালেন, বলো ভাই। জল খাবে বুঝি?

আজ্ঞে না, বাবা আপনাকে একবার ডাকছেন।

বিমলাদি বললেন, আমার হাতে একটু জল ঢেলে দেবে ভাই?

সামনেই বালতি আর মগ। ফরসা গোল গোল হাতদুটো সামনে এগিয়ে দিলেন। সাবধানে জল ঢালতে লাগলুম। আমার পেছনেই একটা চালতা গাছ। ছায়া ছড়িয়ে আছে। একটা দোয়েল বেলা শেষের গান গাইছে। একটু পরেই উজ্জ্বল একটা দিনের মৃত্যু হবে। সেই দুঃখ পাখির ঠোঁটে গান হয়ে ঝরছে।

বিমলাদি বেশবাস ঠিক করে হরিশঙ্করের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কাকাবাবু!

আমাকে একটা খুন্তি এনে দাও। কেরোসিন তেল আছে?

বিমলাদি একটু অবাক হয়ে বললেন, ঘি-ও আছে।

এইবার হরিশঙ্করের অবাক হবার পালা। তিনি বললেন, ঘি কী হবে মা?

রাতে লুচি খাবেন তো!

তুমি কি ভাবলে কেরোসিন তেল দিয়ে লুচি ভাজব বলে খুন্তি চাইছি?

আমি ঠিক ধরতে পারছি না কাকাবাবু।

তোমাকে ধরতে হবে না, যা চাইছি নিয়ে এসো। সময় নষ্ট কোরো না।

মোহনদা বীর হনুমানের মতো একটা টুল মাথায় করে এলেন কোথা থেকে। মালকোঁচা মারা ধুতি। টুলটা বেশ বড় আর ভারী। হরিশঙ্করের সামনে নামিয়ে রেখে হাঁপাতে লাগলেন। যে-টুল দু'হাতে তুলেও মোহনদা কাঁপছিলেন, সেই টুল হরিশঙ্কর এক হাতে অক্লেশে তুলে ঠিকমতো জায়গায় নিয়ে গেলেন। এই হলেন হরিশঙ্কর! কখন যে কোন শক্তি প্রকাশ পাবে! কখনও মেধা, কখনও দেহ! কখনও সূক্ষ্ম দেহ-বোধ। একেবারে পূর্ণমানব।

মোহনদা বললেন, এক হাতে তুললেন কী করে! আমি যে দু'হাতে ধরেও কেঁপেছি।

হরিশঙ্কর বললেন, তোমার ব্লাড সুগার হয়েছে মোহন। তাই ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছ। তোমার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অঙ্কটা কী দাঁড়াচ্ছে জানো, আলস্য থেকে সুগার, সুগার থেকে আলস্য, আলস্য থেকে উই আর ঘুণ, ভাগ্যের কাঠামো বিধ্বস্ত।

হরিশঙ্কর টক করে টুলে উঠে পড়লেন। বিমলাদি বললেন, সাবধান সাবধান, টুলে উঠছেন কেন? হরিশঙ্কর কোনওরকম উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। খুন্তি দিয়ে উইপোকা চাঁচতে শুরু করলেন। চাবড়া চাবড়া উইমাটি ঝরে ঝরে পড়ছে। মোটা মোটা সাদা সাদা উইপোকা।

বিমলাদি বললেন, আপনি নেমে আসুন কাকাবাবু, আমি করছি।

নীচের দিক থেকে হরিশঙ্করের মুখ অন্যরকম দেখাচ্ছে। স্পার্টানদের মতো। কাজ করতে করতেই বললেন, দীক্ষা দেওয়ার মতো তোমাদের লজ্জা দিয়ে যাই। ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ঠাকুরঘরে বসে ভগবানের পায়ে ফুল চড়ালে, ভগবান এসে তোমার এইসব কাজ কোনওদিন করে দেবেন না। ওই দিকটা একটু কম করে এই দিকটা একটু বেশি করে করো। বাড়িতে কোদাল আছে?

মোহনদা বললেন, আজ্ঞে আছে। একজোড়া আছে।

রেডি করে রাখো। এরপরই লাগবে।

হঠাৎ হরিশঙ্কর টুল থেকে টুক করে নেমে এলেন। নেমে এসে বললেন, মোহন, এইবার তুমি ওঠো। তোমার কাজ তোমাকেই করতে হবে। ঠিক আমি যেভাবে চাঁচছিলুম তুমিও সেইভাবে চাঁচো। আমি ততক্ষণ একটা নুটি তৈরি করি, কেরোসিন লাগাতে হবে। বিমলা, বেশ মোটা দেখে একটা কাঠি জোগাড় করে আনো।

মোহনদা বললেন, কাকাবাবু, আমাকে যে দোকানে যেতে হবে!

এক ঘণ্টা পরে যাবে। বিকেলের দিকে তেমন খদ্দের হয় না, তুমি না বললেও আমি জানি।

মোহনদা থমথমে মুখে টুলে উঠে পড়লেন। ছোটদাদু বসে বসে হাসছেন। আমি কাছে যেতেই বললেন, তোমার বাবা একটা চরিত্র! কেমন নজর দেখলে! বসে বসেই লক্ষ করেছে। মোহনের আজ দফারফা।

ছেলেবেলায় রবিবার হলেই আমার ভয় করত। খাটতে খাটতে শেষবেলায় মনে হত আমি একটা গাধা।

কেরোসিনের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ হরিশঙ্কর আমাকে ডাকলেন, কেমিস্ট্রির ছাত্র তো! বলতে পারো বিমলার রান্নাঘরের ভেতর দিকের চালের বাঁশে কী আছে?

প্রথমে মনে হল বলি, টিকটিকি, গিরগিটি, হেলে সাপ। তারপরেই মনে হল ওটা কেমিস্ট্রি নয়। ঝট করে মাথায় এসে গেল, বললুম, কোলটার।

কেউ কিছু পারলে ঐশ্বরিক আনন্দে হরিশঙ্করের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মোটা টাকার লটারি পেলেও তাঁর এত আনন্দ হবে না। আমার উত্তর শুনে তিনি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে উঠলেন, গুড, ভেরি গুড। যাও, তুমি আর বিমলা গিয়ে কিছুটা কালেক্ট করে আনো।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কীভাবে?

মাথা খাটাও মাথা। নেসেসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেনশন।

When a man is wrapped up in
himself he makes a pretty small package.

বিমলাদির রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ মাথা ঘামালুম। এমনই মাথা, শরীর ঘেমে গেল মাথা ঘামল না। বিমলাদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে। আমার অসহায় অবস্থা দেখে বললেন, এক কাজ করো ভাই, আমি একটা গামলায় কেরোসিন তেল আর খানিকটা ন্যাকড়া নিয়ে আসি। তেলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে বাঁশ মুছলেই যা চাইছ তা উঠে আসবে। ভেজাব আর মুছব। তেলটা কালো হয়ে যাবে। যখন একবারে ঝুল কালো হয়ে যাবে তখন নিয়ে গেলেই হবে। এটা আমার মেয়েলি বুদ্ধি। তোমার মাথায় কী এল!

এর চেয়ে ভাল বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না দিদি। আমার বাবাকে আপনার কেমন লাগছে? বিমলাদির চোখে জল এসে গেল। বললেন, আমার যদি এইরকম বাবা থাকতেন! তোমার কী ভাগ্য! বাবার গর্বে নিজের বুকটা দশ হাত হয়ে গেল। শুরু হল আমাদের দিশি বিজ্ঞান। দু'জনেই মোছা শুরু করলুম। কেরোসিন আর কয়লার ঘামের গন্ধে ঘর ভরে গেল। বাঁশ তার পুরনো বর্ণ ফিরে পাচ্ছে ক্রমশই। বিমলাদির ডান হাতের ওপর বাহুতে একটা তাগা। বুকে একটা সোনার হার দুলছে। চমৎকার ঢলঢলে শরীর। ওদিকে ভয়ংকর কাণ্ড চলেছে। হরিশঙ্করের নানা নির্দেশ চাবুকের মতো মোহনদার ঘাড়ে আছড়ে পড়ছে।

বিমলাদির ফরসা হাত কুচকুচে কালো হয়ে গেল। একবার বোধহয় ভুলে গালে হাত দিয়েছিলেন। কালো ছোপ। আমার হাতের অবস্থা তো আমি দেখতেই পাচ্ছি। কাজের সঙ্গে গল্পও চলেছে আমাদের। আমাদের ছেলেবেলার গল্প। ঘুড়ি ওড়ানোর গল্প, লাট্টু খেলার গল্প। বকুনি খাওয়ার গল্প। ওদিকে বেলা পড়ে আসছে। রান্নাঘরের বাইরে ওপাশে একটা বেড়াল ডাকছে ম্যাও ম্যাও করে। আমরা দু'জনেই চলে গেলুম আমাদের শৈশবে। মনেই হচ্ছে না, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের পরিচয়। মনে হচ্ছে দুই সমবয়সি বন্ধু বিকেলে নয়নতারা আর কেষ্টকলি ফুলে ঘেরা উঠোনে খেলা করতে এসেছি। সেই ছেলেবেলার দিনগুলিতে যেমন হত। শরৎ শেষ হয়ে হেমন্ত আসছে, শিশিরের কাল। মাটি থেকে ভিজেভিজে একটা গন্ধ উঠছে। শিশুমনকে অবাক করে দিয়ে ঘাসের পাড় ধরে ধরে একটা শামুক চলেছে তার বিশাল বাসস্থানটিকে পিঠে নিয়ে। শম্ভুকাকার আটচালায় মা দুর্গা। সব মূর্তি বায়না অনুযায়ী বিক্রি হয়ে গেছে, পড়ে আছে এই একটি মা। রায়েদের বাড়ির পুজো হল না। বিদেশে বড় ছেলে মেমের প্রেমে পড়ে আত্মহত্যা করেছে বোধনের দিন। অসময়ের মা দুর্গার দিকে আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকতুম। ওই মুখ, ওই চোখ। নন্তু কিছু ফুল তুলে এনে ভয়ে ভয়ে মায়ের পায়ের ওপর রাখত। আমাদের মনে হত সিংহ জ্যান্ত হয়ে গেল, অসুর যাত্রার দলের জীবনবাবুর মতো হাহা করে হাসছে। পরেশ যেই বলত, ওই দেখ মা দুর্গা ক্যাঁচা তুলছে, আমরা অমনি ভয়ে তিরবেগে মাঠময়দান ভেঙে ছুট লাগাতাম। শঙ্করী আমাদের সঙ্গে তেমন ছুটতে পারত না। নাকি সুরে বলত, আমাকে ফেলে যাসনি ভাই। ছুটতে ছুটতে আমরা গঙ্গার ধারের উঁচু ঢিবিতে সেই বহু প্রাচীন বটগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতুম, যে-

গাছের তলায় অনেক অনেক আগে শ্রীচৈতন্যের নৌকো ভিড়েছিল। তখন এমন শহর তো ছিল না। গ্রাম, একটা-দুটো চালাবাড়ি। সেদিন যে-গ্রামবাসী তাঁর সেবা করেছিলেন নিমাই তাঁকে যে-কাঁথাটি দিয়েছিলেন, সেই পবিত্র গাত্রবাস ঘিরে ছোট্ট একটি মঠ হয়েছে। সন্ধ্যার গঙ্গায় প্রদীপ ভাসানোর মতো শৈশবের একটি দিন ভাসিয়ে দিয়ে যে-যার গৃহে। সঙ্গীদের মধ্যে কেউ বড়লোক, কেউ মধ্যলোক, কেউ নিম্নলোক। এই ভূলোক, দ্যুলোক, খেলার মাঠে সব একাকার। বাড়ি গিয়ে যে-যার অবস্থা ফিরে পাবে। কেউ খাবে শুকনো রুটি, কেউ খাবে গরম লুচি, কেউ শোবে ভুঁয়ে, কেউ খাটে নরম বিছানায়। আমরা দু'জনেই চলে গেছি শৈশবের ঘোরে। হঠাৎ বহু দূর থেকে একটা গান ভেসে এল। বাতাসের ওঠা-পড়ায় কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্ট। সুর খুবই চেনা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলা। আমাদের দু'জনেরই কাজ বন্ধ হয়ে গেল।

বিমলাদি বললেন, মেলায় হচ্ছে। এইসময় এখানে একটা বড় মেলা বসে। মা মঙ্গলচণ্ডীর মেলা। যাবে নাকি দেখতে? খুব জমজমাট। ম্যাজিক, পুতুলনাচ সব আসে। আউসগ্রামের পুতুল। বাঘমুণ্ডির মুখোশ। গ্রামের মেলা তো দেখোনি কোনওদিন।

আপনিও যাবেন?

আপনিটা ছাড়ো। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমাদের পরিচয়। হ্যাঁ, আমিও যাব।

তা হলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিই। হাত চালাই।

আর হয়ে এসেছে।

হোটেলের কোনও বড় পরিবেশক যেন বিশেষ একটা কিছু পরিবেশন করছেন, আমরা সেইভাবে ঝুলকালো তেল-ভরতি গামলাটা পিতা হরিশঙ্করের দরবারে স্থাপন করলুম। তিনি খুশি হয়ে বললেন, আমি জানি বুদ্ধিটা কার মাথায় এসেছিল, বিমলার। একেই বলে গুড-ক্যাচ। কনসেনট্রেশনটা ভালই হয়েছে। এইবার এতে একটু পয়েজন, বিষ যোগ করতে হবে। বিমলা, তোমার বাড়িতে বিষাক্ত কী আছে?

আজ্ঞে কাকাবাবু বিষাক্ত তো কিছুই নেই।

হতেই পারে না, ভাল করে ভাবো।

বিমলা অন্যমনস্ক হলেন। হঠাৎ ঝলসে উঠে বললেন, ধুতরো ফল।

ভেরি গুড। নিয়ে এসো আটটা ফল।

বিমলা বললেন, চলো ভাই।

বাগানের দিকে যেতে যেতে ছোটদাদুর দিকে একবার তাকালাম। একমনে নিজের ছোট্ট পকেট বুকে লিখছেন। জানি কী লিখছেন, গান। হয়তো সন্ধের আগেই সুর হয়ে যাবে। রাগ-রাগিণীর প্রখর জ্ঞান। সুন্দর গলা। সাধক না হয়ে বড় ওস্তাদ হতে পারতেন। বিপ্লবী হয়েছিলেন। শাক্ত বিপ্লবী। হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা। দেশবিভাগের দাঙ্গারোধে তাঁর নিঃশব্দ ভূমিকা কেবল আমরাই জানি। ইচ্ছে করলে নামকরা রাঁধুনি হতে পারতেন। হতে পারতেন বিরাট ব্যবসায়ী। সিদ্ধি তাঁর হাতের মুঠোয়। ধুলো ধরে সোনা করার অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর আয়ত্তে।

বাগানের শেষ মাথায় কোদাল পড়ার আওয়াজ। মোহনদা মাটি কোপাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন, আজ খুব জব্দ হয়েছি।

ভদ্রলোক ঘেমে নেয়ে গেছেন। পিতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে লজ্জা করছে। একদিনে এতটা অত্যাচার ওই শরীর সহ্য করতে পারবে! আমিই তাঁর হয়ে ক্ষমা চাইলুম, আপনি কিছু মনে করবেন না মোহনদা। ওঁর চরিত্রের এইটাই এক ভয়ংকর দিক।

কোদাল ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মোহনদা বললেন, উনি যে আমার কত উপকার করলেন! আমার চরিত্রের একটা বড় দিক খুলে দিলেন। কত আপনার ভাবলে তবেই এমন করা যায়।

একদিনে এতটা সহ্য হবে মোহনদা?

কাকাবাবু বললেন, সবাই ধর্মদীক্ষা দেয় আমি তোমাকে কর্মদীক্ষা দিলুম। আজ সবই একটু একটু হবে। আমার ভীষণ ভাল লাগছে। চনচনে খিদে।

বাগানের একেবারে শেষপ্রান্তে পোড়ো একটা পাঁচিল। সেইখানে ধুস্তুর গাছের ছোটখাটো একটা জঙ্গল। মহাদেবের প্রিয় গাছ। ভাং আর ধুতরো একসঙ্গে বেটে খেলেই—শিবোহং। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাণ। জয় বাবা, বলে গোটা দশেক ফল আমরা ছিঁড়ে নিলুম। কবিরাজি আর অ্যালোপ্যাথি মতে উই মারা হবে। এই সাধক কীটকুলের প্রতি হরিশঙ্করের অসীম ক্রোধ। আমাদের প্রাচীন প্রাসাদে পিতামহের দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহ শত চেষ্টাতেও রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন সেইসব বই আকারে আকৃতিতে ছিল বিশাল। ওয়েবস্টার ডিকশেনারি প্রায় জলচৌকির মতো। দশ খণ্ড দর্শনের বই একের পর এক সাজালে টুলের উচ্চতা। কোনান ডয়েলের লস্ট ওয়ার্ল্ড, পাতায় পাতায় ছবি। ইউক্লিডের বিশাল জ্যামিতি। স্কটের বই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস, বায়রন, টেনিসন, মিলটন। উইপোকাদের মাথার ঠিক থাকে! অসীম জ্ঞানভাণ্ডার সীমাহীন তৃষ্ণায় মাটি করে ফেলেছে। শুধু খায়নি, খেয়ে হজম করে ত্যাগ করেছে। পিতার মন্তব্য, জ্ঞান যে একদলা ঝুরো ঝুরো মাটি ছাড়া কিছুই নয়, এ তারই রাসায়নিক প্রমাণ। এরপরই সেই বিখ্যাত সংগীত বিভিন্ন রাগ সহযোগে, উই আর ইঁদুরের দেখো ব্যবহার। কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে করে ছারখার। এই গান দিয়ে নাকি তবলায় বোল সাধা যায়। ত্রিতাল। তা ধিন ধিন তা।

নরম সবুজ ঘাসের ওপর বিমলাদির পা পড়ছে। একটু উঁচু করে পরা শাড়ি। মনে হচ্ছে বনপথ ধরে মা লক্ষ্মী চলেছেন হেমন্তের বিকেলে। আর কিছুক্ষণ। বিকেল, রাত, ভোর, নাটক শেষ। যতই কেন হোক না মধুর, যতই ভাল লাগুক, যতই মজে থাক মন, লতা যতই ভাবুক এতদিনে পেয়েছি লতিয়ে ওঠার মতো নির্ভর এক বৃক্ষ, বাউল-সময় একতারাটি বাজাতে বাজাতে এসে বলবে, হেথা নয়, হেথা নয়। তুমি চাইলেই তো হবে না, ভাগ্য তোমাকে দিয়েছে যা, তাই নিতে হবে মেনে। তুমি এখানে, তোমার ইতিহাস ওখানে। আমি জানি, এতদিনে আমার স্নেহশুষ্ক জীবন একটা দিঘির সন্ধান পেয়েছে। সেই কোন শৈশব থেকে মাতৃহারা এক শিশু শাসনের ছায়াহীন মরুভূমিতে উটের মতো চলেছে তো চলেছেই। পিঠে তার উচ্চাশার কুঁজ। মনে তার দুরপনেয় খিদে। একটু ভালবাসা, একটু স্নেহ, কোমল হাতের ছোঁয়া, দুটো মিষ্টি কথা। সেই কবে থেকে কাঁটাগাছই চিবোচ্ছি। কশ দুটো ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। মাঝে মাঝে একটু ছায়া খেলে যায় জীবনে। মায়ামৃগের মতো ছুটে পালায়। মরূদ্যান আজও মিলল না। সবই মরীচিকা। নিজের মনেই তৈরি করে রেখেছি মায়া মরূদ্যান। মনে মনেই সেখানে সরে যাই। রূপসাগরে তলিয়ে যাওয়ার সাধনা করি। ছোটদাদু শেখাবার চেষ্টা করেছেন ষটচক্রে মনভ্রমণের কৌশল। এগিয়ে যাও। বাইরে নয় ভেতরে। ছোটদাদু গাইবেন, জাগ জাগ জননি/

মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুলকুণ্ডলিনী/ স্বকার্য সাধনে চল মা শিরমধ্যে। পরম শিব যথা সহস্রদল পদ্মে/ করি ষড়চক্র ভেদ ঘুচাও মনের খেদ, চৈতন্যরূপিণী। কাটাকুটি করলে এই ষড়চক্র দেখা যাবে না। সার্জারির বিষয় নয়। এ হল মনের নানা অবস্থার কথা। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। মন বেশিরভাগ সময় এই অঞ্চলেই ঘোরাঘুরি করে। তাই মানুষ শিশ্নোদরপরায়ণ। হৃদয় হল অনাহতপদ্ম। মনকে ঠেলে এইখানে তুলতে পারলেই অন্য অভিজ্ঞতা। জীবাত্মাকে তখন শিখার মতো দর্শন হয়। চোখ বুজোলেই জ্যোতি। সাধকের সে কী আনন্দ, এ কী! এ কী! পঞ্চম ভূমি হল বিশুদ্ধচক্র। মন এই ভূমিতে গেলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছে করে। ষষ্ঠভূমি হল আজ্ঞাচক্র। সেখানে মন গেলে ঈশ্বরদর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো, ছুঁতে পারে না, মাঝে কাচ ব্যবধান আছে বলে। ছোটদাদু জনকরাজার কথা বলেন, ত্রৈলঙ্গস্বামীর কথা বলেন। জনকরাজা পঞ্চমভূমি থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতেন। তিনি কখনও পঞ্চমভূমি, কখনও ষষ্ঠভূমিতে থাকতেন। ষড়চক্র ভেদের পর সপ্তম ভূমি। সহস্রার। মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়। তখন সমাধি। দেহবুদ্ধি চলে যায়, বাহ্যশূন্য হয়, নানা জ্ঞান চলে যায়, বিচার বন্ধ হয়ে যায়। সমাধির পর শেষে একুশ দিনে মৃত্যু হয়।

বিমলাদি কোথা থেকে এক ধরনের মাটি নিয়ে এলেন। বললেন, বেশ করে সারাশরীরে মেখে পুকুরে মারো এক ডুব। তিনিও মাখতে লাগলেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এসেছে বড়-ছোট ব্যাং। থুপুর থাপুর লাফ চলেছে এদিকে-ওদিকে। ভয় করছে। প্রথম হল সাপ। তারপর মনে হল সাপ মানুষকে একবারই কামড়ায়। বজ্রাঘাত একবারই হয়। অর্থাৎ মানুষ মারা যায়। আমি তো বেঁচে আছি। আর একবার কামড়ালে কী হবে!

বিমলাদি আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, কী ভাই, ভয় করছে খুব! দেখো, পুকুরের জলটা যেন ঠিক একটা আয়না!

দিদি, আমার বাবাকে তো দেখছেন। তাঁর হাতে মানুষ। ভয় থাকলেও বলার উপায় নেই। করলেও বলা যাবে না। মানুষের তিনটি আদিম ভয় আছে, সর্পভয়, অগ্নিভয় ও জলভয়। তিনটেই আমার কাটিয়ে দিয়েছেন।

কীভাবে? সাপ দিয়ে কামড় খাইয়ে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে, জলে চুবিয়ে?

সাপ আমাকে এমনি নিজে নিজে এসে দয়া করে কামড়ে গেছে এই ক'দিন আগেই। জানি না বেঁচে গেছি কীভাবে? মনে হয় এক সন্ন্যাসীর কৃপায়। সে এক অলৌকিক কাহিনি। আগুন আমাকে ঘিরে থাকে। আমি একটা ল্যাবরেটরিতে কাজ করি। এমন সব জিনিস আগুনে ফোটাতে হয় যে-কোনও মুহূর্তে আগুন লেগে গেলেই হল। ভীষণ সাহসের দরকার। আর জল? গঙ্গার ধারে বাড়ি। সাত বছর বয়সেই বাবা কোমরে গামছা বেঁধে জলে ভাসিয়ে রেখে সাঁতার শিখিয়েছেন। বর্ষার গঙ্গায় নৌকো করে এপার ওপার করিয়েছেন। মাঝগঙ্গায় ভীষণ বাতাসে পালের দড়ি ছিঁড়ে গেল। নৌকোর চরকিপাক। যাত্রীরা গেল গেল করে আতঙ্কে চিৎকার করছে। নৌকো প্রায় ডোবে আর কী! পালের দড়ি বাঁধা কোণটা ঝোড়ো হাওয়ায় ফটাস ফটাস করে ছইয়ের ওপর আসছে আর ফিরে ফিরে যাচ্ছে। বাবা আর আমি ছইয়ের ওপর বসেছিলুম। দড়িটা বারেবারে এসে ঝাপটা মেরে যাচ্ছে। পড়ে যাবার ভয়ে আমি গলুইয়ের একটা বাঁশ প্রাণপণে ধরে আছি। মনে মনে ভাবছি, আজই শেষ। যতই সাঁতার জানা থাক, এই উত্তাল নদীতে পড়লেই সব শেষ। বাবা গুনগুন করে গান

গাইছেন। যেন ফুরফুরে বাতাসে পানসি চেপে বেড়াতে চলেছেন! নৌকোর যাত্রীরা যখন ভয়ে আধমরা, মড়াকান্না শুরু করে দিয়েছে, বাবা খপ করে ডান হাত বাড়িয়ে দড়িটা ধরে ফেললেন। তখন মাঝিরা চিৎকার করছে, বাবু ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, রাখতে পারবেন না। পাল ততক্ষণে ফুলে উঠেছে ভরা বাতাসে। নৌকো ডান দিকে কাত হয়ে তিরবেগে এগোচ্ছে পাড়ের দিকে। হরিশঙ্কর অক্লেশে ধরে আছেন পালের দড়ি। হেডমাঝি এগিয়ে এসে দড়িটা কোনওরকমে খোটার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বললে, মানুষের এমন শক্তি আমি দেখিনি। বাবু আপনি দেবতা। পরে বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, কী করে এমন করলেন? সোজা বললেন, মনের জোরে। আমার দুঃখটা কোথায় জানেন দিদি, আমি বাবার নখের যোগ্য নই। কিছুই আমি নিতে পারিনি।

দূরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হরিশঙ্কর আর মোহনদা আসছেন। বিমলাদি তাড়াতাড়ি শরীর ঢাকলেন। আমাদের লক্ষও করলেন না। সোজা নেমে গেলেন পুকুরে। হরিশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, মাছ ছেড়েছ?

মোহনদা বললেন, আছে কিছু।

কিছু কেন? ভাল করে চাষ করো না কেন? মোহন, তোমার সবই আছে, প্ল্যানিংয়ের অভাব। ইচ্ছে করলে তুমি রুপোর থালায় ভাত খেতে পারো।

আমার আপনার মতো একজন গুরু দরকার।

জানো তো কর্তাভজা সম্প্রদায়ে মন্ত্র দেবার সময় গুরু বলবেন, এখন থেকে মন তোর। নিজের মন নিজে সামলাও। মনকে এগিয়ে নিয়ে যাও। মনই সব। মনেই সব। ওই একই কথা তোমাকেও আমি বলছি— মন তোর।

ঝপাঝপ স্নান সেরে উঠে এলেন দু'জনে। যাওয়ার সময় হরিশঙ্কর আমাদের বলে গেলেন, একটু-আধটু তেলকালি থাকে থাক না। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। তোমার তো আবার হাঁচিকাশির ধাত।

একের পর এক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বেজে যাচ্ছে দূরের সেই মেলায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। যখন আমাদের পরিবার সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে, সেই সময়, যেন চোখের সামনে দেখতে পেতুম। অধ্যবসায়ী এক মালী উবু হয়ে বসে আছে। একখণ্ড জমি। লোমশ হাত দিয়ে খুঁটে খুঁটে একটি একটি করে ঘাস তুলে যাচ্ছে। হরিশঙ্করের অবাক প্রশ্ন, তুমি কে? উত্তর, আমি মৃত্যু। প্রশ্ন, তুমি কী করছ? আমি নির্মূল করে দিচ্ছি। শুধু দুটি মাত্র ঘাসের ডগা থাকবে। পিতা আর পুত্র। কেন? বিধির বিধান। হরিশঙ্কর পাথরের মতো মুখে বলতেন, তবে তাই হোক। সন্ধ্যার ছায়ান্ধকারে, প্রকৃতি যখন দিবসের তীক্ষ্ণ রেখা হারিয়ে ক্রমশই নরম তলতলে হয়ে আসত, হরিশঙ্কর তখন গাইতেন, সন্ধ্যা হল গো—ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো/অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো। ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো...। হঠাৎ একদিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন, তবে রে ষড়যন্ত্র! দয়া! তোমার দয়া কে চায়! কে তুমি! তুমি কার প্রভু! আই চ্যালেঞ্জ ইয়োর অথরিটি। মন্দিরে মন্দিরে অসহায় মানুষের সেবা নিচ্ছ, ইউ লাইফলেস গড। মানুষ কেঁদে ভাসাচ্ছে। মাথা ঠুকে ঠুকে ফুলিয়ে ফেলছে। বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার। উত্তরের বারান্দায় পিতা হরিশঙ্কর বিসর্জনের রঘুপতির মতো পায়চারি করতেন আর বলতেন, কোথাও সে নাই। ঊর্ধ্বে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে নাই, কোথাও সে ছিল না কখনও। সেইসময় হরিশঙ্করের একটা হাত ধরেছিলেন

রবীন্দ্রনাথ, আর একটা হাত শেকসপিয়ার। একদিন আমাদের ঠাকুরঘরে মাতামহের পূজিত তারামূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আবৃত্তি শুরু করলেন, দেখো, দেখো, কি করে দাঁড়িয়ে আছে, জড়/পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্বোধের মতো/মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে/সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!/পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়/আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি। হা হা হা!/ কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস/জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া/মা বলিয়া ডাকে যত জীব, হাসে তত/ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দয় বিদ্রূপ। মূর্তি তুলে গঙ্গার জলে ফেলতে গিয়েছিলেন, মাতামহ ছুটে এসে বোঝাতে লাগলেন, মূর্তিতে কিছু নেই, আছে মানুষের বিশ্বাসে। একটা মূর্তি বিসর্জন দিয়ে কী হবে! হাজার হাজার মানুষের মন থেকে যুগসঞ্চিত বিশ্বাস কি উৎপাটন করতে পারবে? হরিশঙ্কর ভাবলেন, হরিশঙ্কর শান্ত হলেন। অ্যালকোহলিকের মতো হয়ে উঠলেন ওয়ার্কোহলিক। কাজ, শুধু কাজ। কতরকমের কাজ আবিষ্কার করা যায় প্রতিভা সেই দিকে খেলে গেল।

দামোদরের তীরে এই সন্ধ্যা একে একে আমাকে সেই অতীত ফিরিয়ে দিতে লাগল। একটি মানুষের একক সংগ্রামের ইতিহাস। আমার অতীত কিছু নেই। অজগরের পৃষ্ঠে আরোহণ করে পিন্টু নামক ভেকের ভ্রমণবৃত্তান্ত। একেবারে অর্থহীন একটা জীবন। ঝকঝকে মানিব্যাগ। খোলো, একটাও নোট নেই। একটা বাসের টিকিট। চালক হরিশঙ্কর। জানলার ধারে বসে-থাকা আমি এক সুখী যাত্রী মাত্র।

ভাবালুতা চটকে গেল। হঠাৎ হরিশঙ্কর সেনানায়কের মতো হুংকার ছাড়লেন, উঠাও গাঁঠরি। ছোটদাদু চোখ বুজিয়ে বসে ছিলেন। চোখ না-খুলেই প্রশ্ন করলেন, কী বলতে চাইছিস? বাংলায় বল।

হরিশঙ্কর বললেন, ভীষণ ঘাস-ঘাস লাগছে। একটা আইডিয়া খেলে গেল। শুধুই কর্তব্য আকর্ষণ শূন্য। আমরা একটা জায়গায় যাব। এর মধ্যে বাড়তি কোনও আকর্ষণ আছে?

ছোটদাদু বললেন, কেন নেই? নতুন জায়গা, নতুন দৃশ্য, নতুন মানুষ।

এর বেশি কিছু আছে?

না।

আমি আরও কিছু আকর্ষণ ঢোকাতে চাই।

কীভাবে?

আমি এই যাওয়াটাকে করে তুলব আকর্ষণীয় এক অ্যাডভেঞ্চার। এখনই আমরা বেরিয়ে পড়ব। এই অন্ধকার রাত, বনের পথ, ডাকাতের ভয়। সারারাত আমরা হাঁটব। ভয়ে একজনের বুক টিপটিপ করবে।

কার, আমার?

তোর বুক? ওটা তো পাথরের বেদি। ভয় করবে আমার পুত্রের। ভাগ্য প্রসন্ন হলে ডাকাতের কবলেও পড়তে পারি। ডাকাত, ডাকাতি, চিরকাল শুনেই এসেছি। একটা অভিজ্ঞতা হোক না! ইংরেজিতে একটা কথা আছে হ্যান্ডলিং। ব্যবহারবিধি। স্টোভ, বন্দুক, ক্যামেরা, টেলিস্কোপ, ঘড়ি, এক-একটা জিনিস এক-এক কায়দায় নাড়াচাড়া করতে হয়। ডাকাতকে কীভাবে হ্যান্ডল করতে হয়, সেটা আমরা শিখতে পারব। তুই কোনওদিন ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিস?

না, উলটোটা হয়েছে। ডাকাত আমার পাল্লায় পড়েছে। তারাপীঠে আমার আস্তানায় এসে কান্নাকাটি। বাবা ভাল করে দাও। ডাকাত বলে তো পির নয়! আমরা ডাকাতকে ভয় পেতে পারি, ব্যাধি তো আর ডাকাত-

পুলিশ মানে না। দু'পক্ষকেই ধরে। একপাশে থানাদার বসে আছে, পেটে ক্যান্সার। আর একপাশে ভৈরব ডাকাত, ডান অঙ্গে প্যারালিসিস।

হরিশঙ্কর বললেন, নে উঠে পড়্। রাতের জঙ্গল একটা দেখার জিনিস। শজারুর নাচ দেখেছিস?

কী শজারু দেখাচ্ছিস! শেষরাতে চাঁদের আলোয় শেয়ালের নাচ দেখেছিস?

তুই হনুমানের ধ্যান দেখেছিস?

তুই রাতচরা রাজহংস দেখেছিস?

উতোর-চাপান আরও কতদূর এগোত কে জানে? সামনে এসে দাঁড়ালেন পণ্ডিতমশাই। একেবারে রাজবেশ। গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি। ভুরভুর আতরের গন্ধ। চোখে কাজল। মুখে পাউডার। সবিনয়ে বললেন, এই আমার অভিসারের সময়। নিজেকে প্রস্তুত করে রাখতে হয়। বলা তো যায় না, দেখা তো হয়ে যেতে পারে। প্রস্তুত ছিলাম না বলে ফিরে চলে গেলে দুঃখের সীমা থাকবে না।

হরিশঙ্কর বললেন, কার অভিসারে চলেছেন? শ্রীরাধিকা?

পণ্ডিতমশাই বসতে বসতে বললেন, গণিতজ্ঞ হয়ে ধরতে পারলেন না? আমি বৈদান্তিক, জ্ঞানমার্গী। মধুর রসের পথ আমার পথ নয়। মৃত্যুর অভিসার। ভোলানাথ আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

ছোটদাদু বললেন, কোন ভোলানাথ? উমার স্বামী?

না মহামান্য। গোয়ালা ভোলানাথ, যে আমাকে নিত্য আধসের করে দুধ সরবরাহ করত। সেই ভোলানাথ সদাসর্বদাই এই জেলার বিখ্যাত গামছা পরিধান করে থাকত। অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু কৃপণ। বারবার বলেছিলুম, ভোলা ব্যাটা, তোর টাকা খাবে কে? সন্ধেবেলায় একটা ধুতি পরার মতো দয়ালু হ না। দিবা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত গামছা সহ্য করা যায়। তারপর নৈব চ। ভোলা গামছা পরেই মারা গেল। কী অগৌরবের কথা! গামছা, ফতুয়া, পকেটে বিড়ির ডিবে। পুষ্পক রথে আরোহণ করে স্বর্গে যায় কে? ভোলা গোয়ালা। স্বর্গের সিংহদুয়ারে অপ্সরাগণ লজ্জায় অধোবদন।

বিষ্ণুপদ মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতে করতে চলে গেল। কী অগৌরবের কথা! মানুষ বলে কি আমাদের কোনও মানসম্মান থাকতে নেই মৃত্যুর কাছে! তাই আমার এই রাজবেশ। রজনীতেই আমার মৃত্যু হবে। তারকারাজির পথ বেয়ে চলে যাবে আমার স্বর্গীয় শকট।

ছোটদাদু বললেন, কেমন বৈদান্তিক! মৃত্যুর কথা ভাবছেন?

ভাবব না? মৃত্যুই যে আমাকে ঝকঝকে নতুন সুন্দর পোশাক দেবে। এই শততালি প্রাচীন পোশাক তো আর চলে না। জীর্ণ হয়েছে। আমি এখন তাম্বুলসেবা করব। আমার বিমলা মা কোথায়?

পণ্ডিতমশাই ডাকলেন, বিমলা মা। উত্তর এল, যাই বাবা।

পণ্ডিতমশাই বললেন, আসুন সুধিজন, আমরা বিচারে বসি। বিষয় আপনারাই নির্বাচন করুন।

হরিশঙ্করের মুখেচোখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ আভাস। এতক্ষণ বড় বোদা হয়ে ছিলেন। গণিত জ্যামিতি পরিমিতি থেকে দূরে। একদল সহজ-সরল মানুষের অতি সাধারণ জগতে। এখন সামনেই ন্যায় ও দর্শনের এক পণ্ডিত। বুদ্ধির ঘষাঘষির অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে এই জীবন উপত্যকায় মানুষ কী দর্শন

করে? কাকে দর্শন করে? হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ আমাকে ছুঁয়ে গেলেন। এই মুহূর্তে কেউ যদি আমাকে গাইতে বলতেন, আমি গেয়ে উঠতুম:

তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার কত রঙে রঙ-করা।
মোর সাথে ছিল দুখের ফলের ভার অশ্রুর রসে ভরা॥

If you ever need a helping hand
You will find one at the end of your arm.

অতিশয় ভরসার কথা। বনপথে গভীর রাতে আতঙ্ক বুকে নিয়ে সেই অচেনা গ্রামের দিকে আর যেতে হবে না। পণ্ডিতমশাই হঠাৎ কামজয়ের প্রসঙ্গ পেড়েছেন। একটু আগে বেশ একটু মজা হল, দুগ্ধধবল একটি গাভী কোথা থেকে হটরপটর করে উঠোনে এসে দাঁড়াল। ছোটদাদু দেখেই বললেন, এই যে এসেছ, তোমাকেই আমি স্মরণ করছিলুম মা।

গোরু অমনি আমুদে চোখে ছোটদাদুর দিকে তাকিয়ে গদগদ একটি ডাক ছাড়ল, হাম্বা।

ছোটদাদু বললেন, হ্যাঁ মা।

গোরু বললে, হাম্বা।

মা আর হাম্বা এই চলতে লাগল। সে এক অপূর্ব ঐকতান। সন্ধ্যার মগ্ন পরিবেশ চনমন করে উঠল। মহামায়ার পূজার ঘণ্টার টিংলিং শব্দ। বিমলাদির উনুনের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশমুখী। পাতার ফাঁকে ধকধকে সন্ধ্যাতারা। আমরা নিঃস্তব্ধ। মানুষে আর পশুতে অদ্ভুত বাক্যালাপ।

বিমলাদি ছুটে এলেন, ব্যাপারটা কী? তাঁদের গোরু তো কোনওদিন এমন উল্লাসে ডাকাডাকি করে না। আজ কী হল?

তাঁর বিস্ময় প্রশ্ন হবার আগেই ছোটদাদু বললেন, তোমরা বুঝবে না মা, আমাদের অন্তরের কথা কিছু হল। ওর সবটাই তো মা। দুগ্ধবতী জননী আমার। যাও দুধ দোয়ার ব্যবস্থা করো। তারপর ভরতি এক গেলাস চা।

ছোটদাদু গোরুকে বললেন, যাও মা, আজ একটু বেশি দুধ দিয়ো, বাড়িতে অনেক অতিথি। গোরু আহ্লাদের শেষ ডাকটি ডেকে গোয়ালের দিকে চলে গেল হেলতে দুলতে, ভার-ভরন্ত চালে।

এই ঘটনা দেখে পণ্ডিতমশাই মুগ্ধ হয়ে বললেন, আপনি অবশ্যই সাধনজগতে অগ্রসর হয়েছেন। শ্রবণ, দর্শন, আস্বাদন ইত্যাদি হয়েছে। আচ্ছা বলতে পারেন, কাম কি জয় করা যায়? কামই তো বড় শত্রু।

হরিশঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে না, যায় না। ঈশ্বর যদি কোথাও থাকেন, তিনিও তা চান না, কারণ তা হলে তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কামই মানুষের জাগ্রত অবস্থা।

পণ্ডিতমশাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হল না। নিদ্রাতেও কাম। কিছু করতে চাওয়াটাই কামনা। স্বপ্ন কামোত্থিত।

হরিশঙ্কর বললেন, মানুষের জাগ্রত অবস্থা ও নিদ্রিত অবস্থার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। চেতনা নিদ্রিত হয় না। ঢেউ থাকলেও সমুদ্র, না থাকলেও সমুদ্র। জল আর বরফে যে তফাত তা আমাদের দৃষ্টিতে। বুদ্ধিতে দুই সমান। জলই বরফ, বরফই জল। একমাত্র মৃত্যুতেই চিরনিদ্রা, চেতনার মৃত্যু। আমাকে জাগতে হবে এই

কামনা নিয়েই মানুষ নিদ্রিত হয় আর ঠিক সময়ে জেগে ওঠে। কেন জাগতে হবে? সে এক কামনাপুঞ্জ, জীবিকা অর্জন করতে হবে, আহার করতে হবে, শরীরের চর্চা করতে হবে, শরীর রক্ষা করতে হবে। নিজের নিরাপত্তার তাগিদেই জাগরণ। এইবার আপনি খণ্ডন করুন।

পণ্ডিতমশাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। অবশেষে বললেন, মহাশয়, আপনি তো প্রকারান্তরে আমাকেই সমর্থন করলেন। আমি শুধু মানুষের দুটি অবস্থাভেদের কথা বলেছিলুম, জাগ্রত সচল অবস্থা, নিদ্রিত অচল অবস্থা। আপনি সে দুটিকে এক করে দিলেন। বেশ দিন। কিন্তু মূল প্রশ্ন, কাম কি জয় করা যায়? তা রয়েই গেল।

না যায় না। অসাধ্য।

পণ্ডিতমশাই ছোটদাদুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি মহাসাধক। আপনার অভিমত?

ছোটদাদু বললেন, তার আগে সমাধান করুন নিদ্রা কাকে বলে, জাগরণ কাকে বলে?

পণ্ডিতমশাই বললেন, চেতনার আচ্ছন্ন অবস্থাই হল নিদ্রা। নিদ্রার দুটি ভেদ, ক্লান্তিতে নিদ্রা আবার মোহনিদ্রা। বিচার যেখানে অবসিত। এ সবই হল তামসিক নিদ্রা। এর পাশেই আছে যোগনিদ্রা। অর্থাৎ চেতনা জাগ্রত অবস্থা থেকে অধোগমন করলে তামসিক, ঊর্ধ্বগমন করলে যোগারূঢ়। অর্থাৎ সমুদ্রে যদি তলিয়ে যাই তা হলে এক, আর যদি মহাকাশে উড়ে যাই, তা হলে আর এক। অর্থাৎ দুটি অবস্থাই বাস্তবচ্যুত অবস্থা। একটি অন্ধকার, অন্যটি আলোকিত। একটিতে তামসিক অভিজ্ঞতা অন্যটিতে সাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ নিদ্রা হল দেহগত চেতনার নিমজ্জন অথবা অতিজাগরণ। অর্থাৎ...।

হরিশঙ্কর বললেন, অর্থাৎ নিদ্রা হল স্লিপ। একটা বিছানা, একটা বালিশ, এক গেলাস জল খেয়ে পা তুলে শুয়ে পড়ো। নিদ্রা দু'রকমের, এক নাক ডাকিয়ে ঘুম, আর এক নিঃশব্দে ঘুম। পেট গরমে স্বপ্ন, পেট ঠান্ডায় নিঃস্বপ্ন? মিটে গেল ঝামেলা।

ছোটদাদু বললেন, শয়ন, অর্থাৎ শ-এ অন। অর্থাৎ অন শ। শ মানে চিতা। অর্থাৎ চিতায় ওঠার নাম শয়ন। শয্যা হল অস্থায়ী মৃত্যুর চিতা। আর শ্মশানে মহানিদ্রার চিতা। আমাদের তন্ত্রে শয্যা হল শ্মশান। সেই কারণে শয্যায় সাধনের বিধান।

হরিশঙ্কর বললেন, আমাদের কর্মতন্ত্রে নিদ্রা হল তামসিকতা। নিদ্রা হল আলস্য। ব্যাড হ্যাবিট। অনেকে জেগেও ঘুমোতে পারে।

এইবার এসো বৎস, কামনা বাসনার নিদ্রার অর্থ হল যোগভূমিতে জাগরণ, সাধকের উঠে বসা। ছোটদাদু বললেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, এই কামনা বাসনার নিদ্রা কেমন করে সম্ভব?

হরিশঙ্কর বললেন, খুব সহজ, একটা ল্যাঙোট পরুন। দুটো থান ইট একহাত এক বিঘত দূরে স্থাপন করে পঞ্চাশবার ডন, দরজার একটি পাল্লা ধরে একশোবার বৈঠক। এতেও যদি মন উসখুস করে তা হলে পঞ্চাশবার মুগুর ভাঁজুন, মনের তামসিকতা দূর হয়ে যাবে। এতেও যদি না যায়, কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করুন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, অতিশয় দানবীয় পদ্ধতি। বুদ্ধিমান মানবীয় পদ্ধতির কথা জানতে চাই।

ছোটদাদু বললেন, সে পথ হল বিচারের পথ। বিচার করুন। প্রথম বিচার, কে চায়?

পণ্ডিতমশাই: আমি চাই।

ছোটদাদু: কোন আমি?

পণ্ডিতমশাই: অহং, অর্থাৎ যে-আমি দেহবোধ জাগায়।

ছোটদাদু: তা হলে ভোগ করতে চায় দেহ। দেহের ক্ষমতা কতটুকু! এইখানেই বিচারের শুরু। দেহের পক্ষে কতটুকু কতদিন ভোগ করা সম্ভব?

হরিশঙ্কর: অর্থহীন আলোচনা। এই আত্মা-প্রশ্ন মানুষের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছেন মহামানবেরা অনাদিকাল ধরে। সো হোয়াট, তাতে আমাদের বয়েই গেল। যতটুকু ভোগ সম্ভব, ততটুকুই করব, যতটুকু করা যাবে না, তার জন্য আক্ষেপ করব। লালচ বড় বালাই, জেনেও লালসায় ঘি ঢালব। তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই॥ মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই। এই হল সাধারণ মানুষ, কিন্তু অসাধারণ রবীন্দ্রনাথ কোথায় গেলেন? শোনো তা হলে, তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস, রাখিস ঘরে ভরে। যারে যায় না পাওয়া তারি হাওয়া লাগল কেন মোরে॥ এই হাওয়াটা কে লাগাবে ভাই? যে-হাওয়া গায়ে লাগলে রবীন্দ্রনাথের মতো বলা যায়, আমি আছি সুখে হাস্যমুখে, দুঃখ আমার নাই। আমি আপন-মনে মাঠে বনে উধাও হয়ে যাই॥ নিজের ভেতর থেকে কামনা বাসনার অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে নিজেকে বের করে এনে উধাও করে দাও। সিনেমার হিরো-হিরোইনের মতো টুলুলুলু করে গাছের ফাঁকে ফাঁকে নাচানাচি নয়, মনে মুক্তি। মহামান্য নৈয়ায়িক পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র এবংবিধ বিচারে অশ্বডিম্ব হবে। বসে বসে নিতম্ব ভারী না করে আসুন নৃত্য করি। ফক্সট্রট ট্যাঙ্গো, কোনটা আপনি জানেন?

পণ্ডিতমশাই: মহামান্য! আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

ছোটদাদু: অবশ্যই নয়। যত মত তত পথ। মূল কথা হল ভুলে থাকা। ভাবে থাকা। ঘোরে থাকা। ও ওর নিজের ভাবে, নিজের ঘোরে আছে। পথ খুঁজে পেয়েছে। ওর কোনও কামনা বাসনা নেই। মায়ামুক্ত অঘোর।

হরিশঙ্কর: মোটেই না। কামনা বাসনায় জরজর হয়ে আছি। সবচেয়ে বড় কামনা, ছেলেটা যেন আমার মানুষ হয়। ছোট কামনা, এখনও কেন চা আসছে না!

ছোটদাদু: ওটা কামনা নয় আকাঙ্ক্ষা। দুটোই তোমার আত্মিক চাওয়া। না পেলে তুমি পাগল হবে না, পেলে তোমার একটাই লাভ, আত্মিক তৃপ্তি। যাকে আমরা ভোগ বলি তাতে তৃপ্তি নেই, শুধুই অতৃপ্তি। আত্মিক সুখে তৃপ্তি, দেহসুখে অতৃপ্তি।

বিমলাদি একটা থালার ওপর চারটে গেলাস সাজিয়ে আসরে প্রবেশ করলেন। প্রায় নাচের ভঙ্গিতে। ছোটদাদু বললেন, এসেছে এসেছে। বহু প্রতীক্ষিত সেই চা এসেছে। হরিশঙ্কর তাড়াতাড়ি উঠে থালাটা ধরে নিলেন। ছোটদাদু বললেন, পিন্টু, কাজটা তোমারই করা উচিত ছিল।

বাবা এত তাড়াতাড়ি উঠলেন যে আমি হেরে গেলুম।

হরিশঙ্কর বললেন, একেই বলে রিফ্লেক্স। ওর একটু তানানানা স্বভাব। স্লাগিশ।

বিমলাদি বললেন, আপনি আমার ভাইটাকে কেবল বকেন!

হরিশঙ্কর বললেন, যুবক হবে চিতাবাঘের মতো। তিরের মতো, ইস্পাতের মতো। স্প্রিংয়ের মতো। সনি লিস্টনের মতো।

ছোটদাদু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, চমৎকার। তারপর হরিশঙ্করকে বললেন, সনি লিস্টনকে টানলি কেন?

হরিশঙ্কর গেলাসের গোলে পড়ে গেছেন। একটা গেলাসে সাদা দুধ। বিমলাদি বললেন, ওটা পণ্ডিতমশাইয়ের দুধসাবু।

হরিশঙ্কর হাসিতে ফেটে পড়লেন, দুধসাবু! রোগীর খাদ্য শিশুর পথ্য! চা খেলে কী হত পণ্ডিতমশাই?

আমি যে চায়ে অভ্যস্ত নই।

ঠিক আছে, আজ যখন হয়েছে খেয়ে দেখুন না, ভেষজ পদার্থ।

যকৃৎ খারাপ হয়ে যাবে।

হায় নৈয়ায়িক! এখনও ভয়! খান, সাবু খেয়ে আরও একশো বছর বাঁচুন!

পণ্ডিতমশাই কাতর কণ্ঠে বললেন, মহাশয়, জীবনের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আপনার পুত্রের মতো আমার একমাত্র পুত্রটি চলে গেল। স্ত্রী গত। জননী আজও জীবিত। দুটি সেবার কারণে এই অক্ষম জীবন ধারণ, জননীর সেবা ও শাস্ত্রসেবা। এই দুধসাবুটুকুই আমার রাতের আহার। আমার বিমলামায়ের ব্যবস্থা। আরও একটু আছে। যাওয়ার সময় সেইটুকু নিয়ে যাব। আমার মা খাবেন। এর মধ্যে আমার কোনও বাঁচার আকাঙক্ষা নেই। আমি যেতেই চাই।

হরিশঙ্কর কিছুমাত্র অপদস্থ না হয়ে বললেন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলেন পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিতমশাই বললেন, পরীক্ষা? আমাকে আপনি কী পরীক্ষা করছিলেন?

আপনি জীবনের সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন কি না! কতটা স্বাবলম্বী আপনি? আপনার ব্যক্তিত্বের তন্তুটি যথেষ্ট দৃঢ় কি না! দেখলুম না, আপনার মান ও অভিমান দুটিই প্রখর, যথেষ্ট রোমান্টিক। আপনার হরমোন বিভাজনে স্ত্রী হরমোনের প্রাচুর্যই বেশি। ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, শ্রুতির পরিবর্তে কাব্য, অলংকার, রসশাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে আপনার বিচরণ বাঞ্ছনীয় ছিল। মানুষের মধ্যে জাতিতে আপনি লতা, বৃক্ষ নন। আপনি অবলম্বন খোঁজেন। আপনি দুঃখবিলাসী। সহানুভূতিভোজী। সর্বোপরি আপনার ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়নি। আপনার উচিত এই সাধক, ওই যে চায়ের গেলাসে নিরাসক্ত চুমুক দিচ্ছেন, আর মৃদু মৃদু হাসছেন, ওঁর শরণ নেওয়া। জীবনের অবশিষ্ট পথ কোন যষ্ঠি অবলম্বন করে হাঁটবেন, কীভাবে সত্যদর্শন হবে, ওই মহাপুরুষই বলতে পারবেন। হয়তো আপনার কারণেই তাঁর এই আকস্মিক আগমন। আপনি কষ্টে আছেন পণ্ডিতমশাই। আপনি আপনার কোনও একটি অপরাধ ভুলতে চাইছেন।

ছোটদাদু হাসতে হাসতে বললেন, কাছাকাছি যেতে পেরেছিস হরিশঙ্কর। এক একটা মানুষ হল অনধিত এক একটা বই। শুধুমাত্র মলাটটা আমরা দেখতে পাই। নাম লেখা। ভেতরে অধ্যায়ের পর অধ্যায়, ঘটনার ঘনঘটা। তুমি মলাটের ভেতর কিছুটা ঢুকতে পেরেছ। এঁর জীবনের চারটি অপরাধ, স্ত্রীর প্রতি অবহেলা, কৃপণতার জন্যে পুত্রের মৃত্যু, যৌবনে মাতাকে অসম্মান, অবশেষে এক বিধবার সম্পত্তি গ্রাস। এ ছাড়া কোনও এক সময় গোপনে গণিকাগমন ও মদ্যপান।

পণ্ডিতমশাই কোনওরকমে গেলাসটি নামিয়ে রেখে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। মুখে ভয়ংকর এক যন্ত্রণার ছায়া। ভীষণ খারাপ লাগল। কেন ছোটদাদু এমন করেন! শক্তি আছে বলেই কি যেখানে সেখানে তার অপপ্রয়োগ করতে হবে? কী প্রয়োজন ছিল মানুষের ভেতর থেকে মানুষকে টেনে বের করার? বেশ তো হচ্ছিল দাবাখেলার মতো কথার খেলা। মগজের চালাচালি। পণ্ডিতমশাইকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। ভীত পশুর মতো কাঁপছেন।

ছোটদাদু বললেন, মন আর মুখ এক করবেন। মা বললে জননীই ভাববেন। শুধু শরীর নয়, মনেও ভোগ হয়। রমণের চিন্তাতেও রমণ হয়। স্বপাকে স্বর্গলাভ হয় না, স্ববশে হয়। জীবনদীপ নির্বাপিত হবার প্রাক্ মুহূর্ত পর্যন্ত নারীসম্ভোগ ইচ্ছা থাকে। জীব যোনিসম্ভূত। অবচেতনার গভীরে সেই চেতনা সুপ্ত। আপনি কী করবেন আমিই বা কী করব? বারেবারে প্রশ্ন করছিলেন কামজয়ী কি হওয়া যায়? অর্থাৎ ওই রিপুটি প্রৌঢ়কেও পীড়া দিচ্ছে। যায় না মহামান্য। মহাভারতকার কী বলছেন? ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ পঞ্চানাং মনস্যে হৃদয়স্যচ। মনে পড়ছে পণ্ডিতমশাই ভীমসেন বলছেন যুধিষ্ঠিরকে! রূপাদি বিষয়ে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির যে প্রীতি, যে ভাললাগা, তারই নাম কাম। ধর্ম, অর্থ, কাম জীবনে তিনটির উপাসনাই প্রয়োজন। সেইটাই বাস্তব পরামর্শ। শুধু ধর্ম শুধু অর্থ শুধু কাম এক ধরনের অসুস্থতা, অস্বাভাবিকতা। মানুষের একটি দিনকে তিন ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন বেদব্যাস। ধর্মং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে কামমাচরেৎ। দিনের প্রথম ভাগে কর্ম। কর্ম অর্থে ধর্মকর্ম। মধ্যম ভাগে অর্থ, অন্তিম ভাগে কাম। এই হল প্রতিদিনের অনুশাসন। কিন্তু কতদিন? বেদব্যাস বলছেন, আয়ুকেও ভাগ করো। সেখানে কী? কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্মমাচরেৎ। পণ্ডিতমশাই বিধান বদলে গেল। যুবাবস্থায় কাম, প্রৌঢ়াবস্থায় অর্থ, আর বৃদ্ধাবস্থায় ধর্ম। আপনার জীবন কি সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে? আপনি আফিং সেবা করেন কেন?

পণ্ডিতমশাই আবার চমকালেন। ভয়ে ভয়ে বললেন, আমার বংশের ধারা।

আপনি জ্ঞানী। আপনি তো জানেন আফিংয়ে বুদ্ধিনাশ হয়!

আমার ভ্রম, আমি যৌবনকে স্থায়ী করতে চেয়েছি। আমি কামাসক্ত পণ্ডিত।

ছোটদাদু বললেন, আপনার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আর কয়েকটা বছর মাত্র। কবে তা আমি জানি, কিন্তু বলা নিষেধ। আর কৃপণতায় কী কাজ? দু'হাতে মায়ের সেবায় ব্যয় করুন। প্রতিদিন একবার করে মৃত্যুচিন্তা করবেন। মনে মনে গাইবেন, দিন যে আগত দেখি। আর করবেন দেহভ্রমণ। সেটা কী? আসনে স্থির হয়ে বসবেন। মেরুদণ্ড সোজা। দেহ শিথিল। ভাববেন আপনি নগ্ন। চোখ মুদিত। প্রথমে চিন্তা করবেন, এই আমার পা, এই আমার শিথিল লিঙ্গ, উদর, বক্ষ, গলা, দুটো জরাগ্রস্ত হাত, মুখ, মস্তক বিরলকেশ, দ্যুতিহীন দুই চোখ, দুটো কান, মনে মনে নিজের দেহের পরিমাপ করবেন, চিন্তা করবেন পরিবেশ। ঘর, বাহির, গ্রাম, নগর, বিশ্ব, মহাকাশ, বিন্দুর মতো তিলের মতো হারিয়ে যাবেন। কীসের অহংকার, কার সঞ্চয়, কী ভোগ, কতটুকু ভোগ! চিন্তা করবেন বিশাল এক জ্যোতিঃপুঞ্জ। অসংখ্য আলোক বিন্দুর একটি হলেন আপনি, নিমেষে বিলীন হয়ে গেলেন। এরই নাম ধ্যান। একান্তভাবে এই চিন্তায় নিমগ্ন হবেন। মনে রাখবেন তুলসীদাসজির একটি কথা : মালা জপে শালা, কর জপে ভাই। মন্ মন্ জপে যো, ওস্‌কো বলিহারি যাই॥ ভণ্ড মালাজপকারীকে শ্যালক বললেও ক্ষতি নেই, সংযতচিত্তে করে অর্থাৎ আঙুলে যাঁরা জপ করেন, তাঁদের ভ্রাতা বলা যায়, আর মনে মনে

যাঁরা জপাদি সাধন করেন তাঁরাই বলিহারি। পুজোর চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। আচ্ছা, এই নিন একটা লবঙ্গ খান।

পণ্ডিতমশাই ফ্যালফ্যালে মুখে বললেন, এখনই?

ছোটদাদুর চেহারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। বিশাল মর্মর মূর্তির মতো আকৃতি। না, কোনও চোখের ভুল নয়। সবাই দেখছেন। গম্ভীর মুখে বললেন, বিলম্বে লাভ কী?

লবঙ্গটা হাতে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, চিবিয়ে খাব?

কচমচ করে।

পণ্ডিতমশাই লবঙ্গ চিবোচ্ছেন। আমি জানি এর মধ্যে অবশ্যই কোনও রহস্য আছে, বিজ্ঞানে যার ধরাছোঁয়া পাওয়া যাবে না। লৌকিক আর অলৌকিক মিলে জীবন আর জগৎ রহস্যময়। রহস্য আছে বলেই রহস্য শব্দের উৎপত্তি। লৌকিক আছে বলেই অলৌকিক।

পণ্ডিতমশাই ঢোঁক গিলে বললেন, হয়ে গেল। চলে গেল পেটে। এখন কী হবে?

ধীরে ধীরে কিছু একটা হবে।

সামান্য লবঙ্গে?

মটরের দানার মতো সামান্য একটা আফিংয়ের গুলিতে কী হয় পণ্ডিতমশাই! সেটা জ্ঞাত, তাই আপনার সন্দেহ হচ্ছে না, এটা আপনার কাছে অজ্ঞাত, তাই আপনার সন্দেহ। এই হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। পণ্ডিতমশাই, এটা কী?

ছোটদাদু চায়ের গেলাসটা তুলে ধরলেন।

পণ্ডিতমশাই বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন? গেলাস!

আমি যদি বলি গেলাসের আকার বিশিষ্ট একটুকরো শূন্যতা!

পণ্ডিতমশাই একটু ভেবে বললেন, তর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে। আধার ও আধেয়।

আধার ভাঙলে কী থাকে? আধেয় অর্থাৎ শূন্যতা। এখন আকার সত্য না নিরাকার সত্য? যা ভেঙে যায়, যা থাকে না, আর না-থাকার পর যা থাকে, তার মধ্যে কোনটা সত্য ও শাশ্বত!

যার মধ্যে বসে আছে এই সৃষ্টি বা এই সৃষ্টির মধ্যে যা আছে, অর্থাৎ যা আমাতেও আছে আপনাতেও আছে, যা এই ঘরের বাহিরেও আছে ভেতরেও আছে, তার অনুভূতি কেমন লাগে। দেখুন তো পণ্ডিতপ্রবর।

ছোটদাদু টকাস করে একটা টুসকি মারলেন।

To see a world in a grain of sand
And heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.

টুসকির শব্দটা ঠিক যেন বাজ পড়ার শব্দের মতো, কড়াক। সকলেই চমকে উঠলেন। অবিশ্বাস্য। দুটো আঙুলে এমন ভয়ংকর শব্দ বের করা যায়! যায় তো। এই তো ছোটদাদু করে দেখালেন। সেই শব্দে পণ্ডিতমশাই কেমন যেন হয়ে গেলেন। হরিশঙ্কর আমার কানে কানে বললেন, খেলা খুব জমে গেছে।

হরিশঙ্কর এইভাবে যখন কানে কানে কথা বলেন, তখন আর পিতা বলে মনে হয় না, মনে হয় সমবয়সি প্রিয় এক বন্ধু। মুখে অদ্ভুত সুন্দর পিপারমেন্টের মতো গন্ধ। আমার গুরু স্বামী নির্মলানন্দজি আমাকে বলেছিলেন, মানুষ যখন ইন্দ্রিয় জয় করতে পারে তখন তার ভেতরটা সাত্ত্বিকভাবে ভরে যায়। তখন তার শ্বাসে, তার দেহনির্যাসে সুগন্ধ বেরোয়। হরিশঙ্কর জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ। মৎস্যগন্ধা, পদ্মগন্ধা শোনাই ছিল। এখন হয়তো দেখছি। ছোটদাদুর শরীর থেকে সবসময় গোলাপের গন্ধ বেরোয়। অবাক অবাক সব কাণ্ড চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। ধন জন মান নয়, সেই সব দিব্যানুভূতি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগছে। ক্ষুদ্র সামর্থ্যে কিছুতেই ধরতে পারছি না। ছটফট করেই মরছি।

টুসকির শব্দে পণ্ডিতমশাই কেমন যেন ধোঁয়াটে হয়ে গেলেন। চোখের ভুলও হতে পারে। আমার মন দুর্বল। দুর্বল আমার স্নায়ু। কঠিন ব্যক্তিত্ব সবসময়েই আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। একসময় আমি সম্মোহনকারীর প্রিয় মিডিয়ম ছিলুম। আমাকে সহজে সম্মোহিত করা যেত বলে।

মৃদু আলো। চার পাশে গাছপালা, বাতাসের ঝপর ঝপর শব্দ। ধ্যানস্থ কিছু মানুষ। দূর থেকে ভেসে-আসা আরতির শব্দ। এইসব মিলিয়ে যে মায়া তৈরি হয়েছে, তারই প্রভাবে হয়তো এইরকম মনে হচ্ছে। ছোটদাদু হঠাৎ পণ্ডিতমশাইকে নিয়ে পড়লেন কেন? কৃপা করার হলে আরও তো অনেকে রয়েছেন। আমি নিজেই তো আছি। দিন না সেই শক্তি, পৃথিবীতে থেকেও যেন পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে পারি। অন্ধকারে থেকেও যেন আলোতে সাঁতার কাটতে পারি। কতবার বলেছি। পায়ে ধরেছি। সোডার বোতল খোলার মতো অলৌকিক হাসি ছড়িয়ে বলেছেন, জীবনটাকে নষ্ট করিসনি। মূর্খ অশিক্ষিত অক্ষম গ্রাম্য লোককে আমরা বোকা বানাই, শিষ্য করি, দীক্ষা দিই। ধর্ম একটা জোচ্চুরি ব্যাবসা। আগে দেখা যেত বেদের মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে যাচ্ছে, দাঁতের পুকা বের করি। ওঝা এসে ভূত ছাড়াচ্ছে। সর্পাঘাতের চিকিৎসা করছে। সব বাজে। বুজরুকি। ধাপ্পা। কলাটা, মুলোটা পাবার ধান্দা। এসব শিক্ষিত শহুরে মানুষের জন্যে নয়। আমরা কোয়াক। বোকাদের শ্রদ্ধেয়। আমরা ম্যাজিক দেখাই। অসহায় অশিক্ষিত মানুষ ভেলকি দেখে ভুলে যায়। আমরা মিঠাই-মণ্ডা খেয়ে

ভুঁড়ি বাগাই। আমরা চিট। আমাদের ফাঁদে পা দিয়ো না। তোমাদের জগৎ আলাদা। চাকরি করো, সংসার করো, ঘরদোর সাজাও, বিদেশ যাও, ছেলেমেয়ে মানুষ করো। ভগবান-ভগবান করে জীবন নষ্ট কোরো না। ভগবান হলেন অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষের অলীকে বিশ্বাস। ভগবান কোনওদিন তোমাদের বৈঠকখানায় চা খেতে আসবেন না।

সে প্রায় তিরস্কারের মতো। ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার মতো। তখনই বুঝেছি, সময় হয়নি। এ জীবনে না-ও হতে পারে। অসুখ। ভীষণ অসুস্থ আমি। এর নাম ভবরোগ। এ রোগ সারবে কীসে! দাওয়াই আছে। কীরকম? স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির ওপর। সেই জল একটা ব্যাং খেতে যাবে। সেই ব্যাং-কে একটা সাপে তাড়া করবে। ব্যাং-কে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ ওই মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর সেই ব্যাংটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজলের একটু খেতে হবে।

এ তো অসম্ভব। না অসম্ভব নয়। ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হবে। কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে হবে। সেই ব্যাকুলতা আমার নেই। মহাপুরুষ দেখেই বুঝেছেন, এর থাক আলাদা, জাত আলাদা। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে নোট ভাঙাবার কায়দায়, মর্কট বৈরাগ্য ভাঙিয়ে ঈশ্বরপুরিয়া পেতে চায়।

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। তারপর কোনওরকমে দাঁড়িয়ে, টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন। ছোটদাদু বললেন, হৃদকমলে বড় ধুম লেগেছে। মজা দেখিছে আমার মন পাগলে। ঘোর লাগিয়ে দিয়েছে ঘোর। এক জালা মদ খাইয়ে দিয়েছি। সুরা পান করি নে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে। হঠাৎ ছোটদাদু গান শুরু করলেন, এ মদ যে রসে ভরা। ষড় রিপু চোলাই করা। যে খায় সে আত্মহারা। মদে তারে খায় না॥

ছোটদাদু হঠাৎ উঠে পড়লেন।

হরিশঙ্কর বললেন, তুই একাসনে কতক্ষণ বসে আছিস জানিস? ছ'ঘণ্টা।

ছোটদাদু বললেন, এ কিছুই নয়। আমি পরপর তিন দিন একভাবে বসে থাকতে পারি। এর নাম স্থাণু যোগ। আমার গুরু শিখিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকো। একটা দিন কেটে গেল। সে বেশ মজা। চুপচাপ একভাবে দাঁড়িয়ে আছি, যেন একটা গাছ। অদ্ভুত সব অনুভূতি হতে থাকে। অনুভূতিও তো একটা শিক্ষা।

অবশ্যই। ফিলিংস। তা চললি কোথায়?

চান করব।

কোথায় চান করবি?

পুকুরে।

মোহনদা বললেন, তা হলে একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি। একটা নতুন গামছা।

তুমি গামছা দাও। আলোর প্রয়োজন নেই। তারার আলোর প্রদীপ জ্বেলে চলব আমি আমার পথে। পিন্টু, চলো আমার সঙ্গে।

এত ঘনিষ্ঠতা হয়নি আগে। এই প্রথম বাইরের পরিবেশে দেখছি একজন সাধককে। সাধনা সাধক শব্দদুটো শোনাই আছে। মনে হয় খুব পরিচিত। আসলে কিছুই জানি না। কীভাবে ধাপে ধাপে সাধারণ থেকে অসাধারণ একটা স্তরে। থিয়োরি জানি, প্র্যাকটিস জানা নেই।

ছোটদাদু আগে আগে চলেছেন। আমরা পেছন পেছন। আমি আর মোহনদা। ছোটদাদু বললেন, মোহন, তুমি যাও। তোমার আসার প্রয়োজন নেই।

মোহনদা ফিরে গেলেন। মোহনদা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড হল। ছোটদাদু অন্ধকার পথে পা ফেলছেন, পা দিয়ে একটা আলো ঠিকরোচ্ছে। যেন টর্চলাইট হাঁটছে, যার ফোকাসটা নীচের দিকে। আমার সবেতেই ভীষণ ভয়। এত পরিচিত একজন মানুষকে ভীষণ অপরিচিত লাগছে। এর নামই কি ডাকিনী বিদ্যা? অস্বাভাবিক একটা আলো। নীল তার রং। সেই আলোয় ঘাস আগাছা স্পষ্ট। ছোট ছোট ব্যাং থমকে আছে লাফ মারার আগে। জ্বলজ্বল করছে ছোট ছোট চোখ। নানারকম পোকা। ছোটদাদু চলেছেন অলৌকিক শরীর নিয়ে। কোন বিজ্ঞানে সম্ভব হচ্ছে! প্রশ্ন আসছে। সাহস হচ্ছে না করার। মানুষটি এখন আমার সম্পূর্ণ অচেনা। মহাকাশ থেকে নেমে আসা মহাজীবের মতো। আলোয় আলোকময় করে হে, রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ছে, তোমার আলো গাছের পাতায় নাচিয়ে তোলে প্রাণ। তোমার আলো পাখির বাসায় জাগিয়ে তোলে গান।

আমাকে সঙ্গে আনার কারণ, আমার অবিশ্বাস ভাঙাবেন। আমি যা পারি না, আমি যা জানি না, আমি যা দেখিনি তা নেই। এই আমার বিশ্বাস। বাকিটা অবিশ্বাস। আমার সামনেই ছোটদাদু। হঠাৎ বললেন, চার পাশে সাদা সাদা সুবাসিত ফুল নেই কেন? ফুল! ফুল!

ভেলকি হয়ে গেল। ফুটফাট, ফুটফাট। ফুলে ভরে গেল। গোয়ালের গন্ধ ভরে গেল কনক চাঁপার গন্ধে। আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্নে ভাবছি! এ কেমন ঘোর! ছোটদাদু জলে নেমে গেলেন। সে আর এক অলৌকিক দৃশ্য। যেন চাঁদ পড়েছে জলে। একটা আলোর শরীর জলের তলা পর্যন্ত ঝিলঝিল করে নেমে গেছে। এত আলো যে দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট মাছ খেলা করছে। কী সুন্দর! স্লেটের মতো কালো আকাশ। খণ্ড খণ্ড তারা। ফুলের গন্ধ। মনে হয় স্বর্গে আছি!

জলে ওই অপূর্ব দৃশ্য দেখে মনে হল কেন আমি ম্যাজিক ভাবছি? আমার সেই শ্লোকটি যে মনে পড়ছে এই মুহূর্তে। কেন মনে পড়ছে? আমি সম্পূর্ণ আবিষ্ট। আমি কে? আমি কোথায়? সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। প্রভাবের এক বৃত্তের মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। যা মনে আসার কথা নয়, তাই মনে আসছে। সেরেছে, ভক্তি আসছে। একটা লীলার মধ্যে ঢুকে গেছি আমি। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে দেখেছেন। কৃষ্ণ কেমন, বর্ণনা দিচ্ছেন বিশাখাকে: কুরঙ্গমদজিদ্‌বপুঃ পরিমলোর্মি কৃষ্টাঙ্গনঃ ইত্যাদি। কস্তুরীকে হার মানায় এমন দেহের সুগন্ধের ঢেউ দিয়ে যাঁর আনন পরিমার্জিত, নিজের অঙ্গস্থিত অষ্টনখে উৎপলের গন্ধযুক্ত, নতুন চাঁদের মতো চন্দনের ও অগুরুর সুগন্ধ যুক্ত হে মদনমোহন।

সেই দৈবী দেহ আর এই দেহ, তফাত কোথায়? এরই নাম যোগবিভূতি। যোগে সবই সম্ভব। ছোটদাদু আমাকে একদিন ছান্দোগ্য উপনিষদ বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে নিয়ে যে চেষ্টা করেননি তা নয়। শ্বেতকেতুর গল্প বলছিলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে আদেশ করলেন, ওই জলের পাত্রে এই লবণ খণ্ডটা ফেলে দাও। শ্বেতকেতু আদেশ পালন করলেন। উদ্দালক বললেন, যাও, এইবার তুমি রাতের বিশ্রাম নাও। কাল সকালে আবার দেখা হবে। সকালে শ্বেতকেতু এলেন।

উদ্দালক: সেই লবণ খণ্ডটি যা কাল রাতে তুমি জলে নিক্ষেপ করেছিলে, আমাকে এনে দাও।

পিতার আদেশে পুত্র জলাধারের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। লবণ খণ্ড কোথায়! জলে গুলে গেছে।

উদ্দালক: পুত্র, জলের উপরিভাগ আস্বাদন করো। স্বাদ কেমন?

শ্বেতকেতু: পিতা! জলের স্বাদ লবণাক্ত।

উদ্দালক: আচ্ছা, মধ্যভাগের স্বাদ নাও।

শ্বেতকেতু: লবণাক্ত।

উদ্দালক: বেশ, এইবার একেবারে তলার জল গ্রহণ করো!

শ্বেতকেতু: পিতা। এর স্বাদও লবণ মিশ্রিত।

উদ্দালক: পুত্র, পাত্রের সমস্ত জল ফেলে দিয়ে আমার কাছে এসো।

আদেশ পালন করে পিতার কাছে ফিরে এলেন পুত্র। ফিরে এসে বললেন, জল ফেলে দিলেও ওই লবণ সবসময় জলেই থাকবে।

উদ্দালক: পুত্র, এইটাই তোমার শিক্ষণীয়। লবণ দৃশ্যমান নয়। আস্বাদনে তুমি বুঝলে। আবার এও বুঝলে নিক্ষিপ্ত হলেও লবণ জলেই থাকবে। জগৎ-কারণে তিনি দৃশ্যমান নন, কিন্তু প্রতিটি কণায় কণায় তিনি উপস্থিত। প্রতিটি জলবিন্দুতে লবণকণার মতো। অনুভবে তাঁর উপস্থিতি।

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে। হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

ছোটদাদু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন। আমার, তোমার, তার, সকলের মধ্যেই সেই একের অস্তিত্ব। একটা পাথর তোলো, দেখো তিনি, একটা কাঠ চেরো, সেখানেও তাঁর উপস্থিতি। এই তাঁর-তাঁর বলতে বলতে ছোটদাদুর বড় বড় স্ফটিকের মতো চোখ জলে টলটল করে উঠল। কী ভয়ংকর সেই বিচ্ছেদ বেদনা! পৃথিবীর সমস্ত স্বাদ যেন বিস্বাদ।

ছোটদাদু তখন ছান্দোগ্যের আর একটি শ্লোকে চলে গেলেন। এই শরীর, এ হল আত্মার পুরী। ছোট্ট একটি ঘর আছে সেখানে। পদ্মের মতো তার আকৃতি। সেই ঘরে ছোট্ট একটু স্থান। সেখানে কী আছে? কে আছে? সেই স্থানটুকুতে আছে সমগ্র বিশ্ব। বিশ্ব কেন? মহাবিশ্ব। চরাচর সৃষ্টি। সবই ওইখানে। স্বর্গ, পৃথিবী, অগ্নি, বাতাস, সূর্য, চন্দ্র, বজ্র, বিদ্যুৎ, তারকারাজি, যা আছে, যা নেই, সবই অবস্থান করছে পদ্মস্থিত এই ছোট্ট স্থানটিতে। মানুষের শরীরেই যদি সব, এই সৃষ্টি, সর্বকাম, সর্ববাসনা, তা হলে দেহের বিনাশে কী হবে! ওই স্থানটুকু, আত্মার ওই পদ্মনিবাসের বিনাশ নেই। কামনা, বাসনা, লয়, প্রলয়, সৃষ্টি, ধ্বংস, রূপ, অরূপ, বিকার, নির্বিকার, এই সোলার সিস্টেম, আরও কোটি সৌরজগৎ, আদিগন্ত, চরাচর, সব অবিনশ্বর।

এই বোধ আসবে কেমন করে? যা তোমার মধ্যেই অবস্থিত তাকে কেন পাওয়া যায় না খুঁজে। তুমি চাও না। মায়া তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। মহামায়ার এমনি খেলা। এ কেমন জানো, রাম লক্ষ্মণ সীতা। তিনজন চলেছেন। আগে রাম মাঝে সীতা শেষে লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না। কেন? মাঝে সীতা আবরণ। মায়া। সীতা সরে না গেলে রামকে দেখা যাবে না। পরমাত্মা হলেন রাম, জীবাত্মা হলেন লক্ষ্মণ, সীতা হলেন মায়া। এই তিন নিয়ে লীলা।

দুটি শোভন-পক্ষ পক্ষী, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। একই গাছে বসে আছে দুটি পাখি। গাছ কী? তোমার দেহবৃক্ষ। পাখিদুটি বসে আছে কীভাবে? জড়াজড়ি করে। সযুজা সখায়া। যেন দুই প্রাণের বন্ধু। তাদের মধ্যে একজন সেই গাছের ফল, বিচিত্র আস্বাদযুক্ত ফল, স্বাদু পিপ্পলম অত্তি, ঠুকরে ঠুকরে খায়। সে কী? সেই পাখিটি কে? সেটি হল জীব। ফল কী? সুখদুঃখাত্মক কর্মফল। অন্য পাখিটি কী করে? সে কিছু খায় না, সে শুধু দেখে। দর্শন করে। তিনিই পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্রয়ে দেহবৃক্ষে অবস্থান করছে।

তুমি কী করে সেই ব্রহ্মকে ভেদ করবে? অমৃত আস্বাদনের জন্যে ব্রহ্মকে বিদ্ধ করতে হবে। জীবাত্মাকে পরমাত্মায় লীন হতে হবে। তোমার ধনুক কোথায়! কোথায় তোমার শর! প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা। ওঙ্কার সেই ধনু, জীবাত্মাই বাণ আর ব্রহ্মাই সেই বাণের লক্ষ্য। সারাটা দুপুর তাঁর ঘরে বসে আমাকে পাখি পড়ানোর মতো করে বোঝালেন। তিক্ত সংসার সম্পর্কে অসম্ভব একটা ঘৃণা জাগাবার চেষ্টা করলেন। অন্য ধরনের একটা আকাঙক্ষায় আমাকে জাগ্রত করতে চাইলেন। ওঙ্কার সাধনার প্রাথমিক আভাস দিলেন।

পশ্চিমের অ্যানাটমিস্টরা মাথার মাঝখানে যে জায়গায় পাইনাল বা পিনিয়াল গ্ল্যান্ড আছে বলছেন, যেখান থেকে আমাদের স্বপ্নের উৎপত্তি, সেইখানেই হিন্দুযোগীরা দেখেছেন সহস্রবার। সহস্রদল একটি পদ্ম। জ্যোতির্ময়। সেইটিকে ভেদ করতে হবে প্রণবমন্ত্রে। দুচোখের মাঝখানে ভ্রূ-মধ্যে যে-স্থান, মেয়েরা যেখানে টিপ পরে, অ্যানাটমিতে সেই বিন্দুটির নাম গ্লাবেলা। মনকে ওইখানে রাখো পদ্মাসনে বসে। সুস্থ সুন্দর জীবনের কথা ভাবো। শরীর শিথিল করো। এইবার ভাবো মাথার মাঝখানে একটি ছিদ্র। সেই ছিদ্রে স্থাপিত সহস্রদল এক পদ্ম। সহস্র কান্তমণি। সেই পদ্মে স্থির এক জ্যোতি। এইবার শ্বাসকে আকর্ষণ করে মূলাধার থেকে টেনে তোলো। ওই ছিদ্রটিকে ভরে দাও। চেষ্টা। অনন্ত চেষ্টা। প্রাণায়ামই সব। কুম্ভক অভ্যাস করবে। দমভর বাতাস নেবে, বুক ভরতি করে। ধরে রাখবে যতক্ষণ না কষ্ট হয়। ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে আবার নেবে। দিনের চারটে সময়ে কুড়িবার করে এই কুম্ভক করবে। সূর্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে, সায়াহ্নে, মধ্যরাত্রে। তোমার দেহ পবিত্র হবে, সমস্ত মালিন্য দূর হবে। শক্তিতে ভরে যাবে। দেহ সুবাসিত হবে। ত্বক উজ্জ্বল হবে। খিদে বাড়বে, হজম বাড়বে। তোমার কণ্ঠ মধুর হবে। আর কী হবে? নরম গলার স্বরও বহু দূর পর্যন্ত পৌঁছোবে। প্রচণ্ড সাহস বাড়বে। আসবে অসীম কর্মোদ্দীপনা। মানসিকতার অদ্ভুত এক পরিবর্তন আসবে। দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন-নিপীড়ন, সংসাররূপ এই দুঃখজলধি তুমি অক্লেশে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি পাবে। তোমার আকর্ষণীয়শক্তি, ম্যাগনেটিজম ভীষণ বেড়ে যাবে। সমস্ত মানুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। তুমি যা বলবে তাই শুনবে, পালন করবে। তুমি রোগমুক্ত, যন্ত্রণামুক্ত হবে; কারণ তখন তুমি মায়ামুক্ত, মোহমুক্ত।

ছোটদাদু এমন লোভ দেখিয়েছিলেন, লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আর কী! মহাজীবনের লোভে ভেতরটা খচরমচর করে উঠল, তারপরে একসময় নেতিয়ে পড়লুম। মনে পড়ে গেল এক মহাত্মার অদ্ভুত কথা; বোল সবহিঁ ঢোল বরাবর,/পোল সবহিঁ মে পুরা। /অবোল তত্ত্ব কো সমঝাওত নহিঁ/ জো সমঝাওত সো কুরা॥ ঢোলের মধ্যে যেমন ফাঁক বা শূন্য থাকে, সেইরকম বোল বা বাক্যের মধ্যেও ফাঁক থাকে। বাণীর অতীত তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায় না। যা প্রকাশ হয় তা মিথ্যা। সার নেই। শ্রীরামকৃষ্ণকে একজন বলেছিলেন, মহাশয় আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? শুনে সবাই হেসেছিলেন। সমাধি শেখানো যায় না। শিরোদেশ হল

সপ্তমভূমি—সেখানে মন গেলে সমাধি হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, কিন্তু তখন আর শরীর থাকে না। সবসময় বেহুশ, কিছু খেতে পারেন না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। ওই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু।

বাস্তববাদী হরিশঙ্কর এই প্রসঙ্গে সুন্দর একটি গল্প বলেছিলেন:

এক শহরে এক সিঁদেল চোর বাস করত। সিঁদ কেটে লোকের বাড়িতে চুরি করাই তার পেশা। লোকটির বয়স হল। যুবক ছেলে হঠাৎ একদিন এসে বললে, বাবা, তোমার তো যাওয়ার সময় হল, বিদ্যেটা আমায় শিখিয়ে দিয়ে যাও, আমাকে তো করে খেতে হবে। বাবা বলল, ঠিক আছে, আজই তা হলে চলো আমার সঙ্গে।

গভীর রাতে একটা বাড়ি বেছে নিলে। বড় চোর নিপুণ একটি সিঁধ কেটে ছেলেকে নিয়ে ঢুকে গেল। ঘরে এসে দেখলে বিশাল এক সিন্দুক। বড় চোর সিন্দুকের তালা খুলে দিয়ে ছেলেকে বললে, ঢোক। সব মালপত্র বেছে বেছে বাইরে ফেল।

বাবার আদেশ। ছেলে ভেতরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে বড় চোর সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল। নিঃশব্দে গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। তারপর করল কী! বাড়ির গেট ধরে নাড়া দিয়ে চিৎকার করে বলে গেল, তোমাদের বাড়িতে চোর পড়েছে গো।

বাড়িসুদ্ধ সবাই উঠে পড়ল। আলো নিয়ে খোঁজাখুঁজি। স্টোর রুমে গিয়ে দেখলে সবই ঠিক আছে। সিন্দুকও তালা বন্ধ। কোথায় চোর! ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে গেল। সব শেষে দাসী। তার হাতে বাতি। সিন্দুকে বন্ধ চোরের ছেলে ভাবছে, সর্বনাশ! বেরোতে না পারলে তো দম আটকে মরতে হবে। সে তখন বারকয়েক খুড়ুর খুড়ুর শব্দ করল। দাসী যেতে গিয়েও ফিরে এল। মরেছে, ইঁদুর ঢুকেছে। সে তখন তাড়াবার জন্যে যেই ডালা খুলেছে, চোরের ছেলে এক লাফে বেরিয়ে এসে, দাসীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আলো নিবিয়ে অন্ধকারে দে চম্পট। দাসীর চিৎকার, চোর চোর! বাড়ির সবাই রাস্তায় নেমে চোরের পেছনে ছুটছে। চোর দেখলে, সে আর পারছে না ছুটে। প্রায় ধরা পড়ে যায় আর কী! পথের পাশেই মস্ত এক ইঁদারা। চোর দু'হাতে বেশ বড় একটা পাথর তুলে তার মধ্যে ফেলে দিয়ে, আবার ছুটতে লাগল। যারা অনুসরণ করছিল, তারা বোকা বনে গেল। ভাবলে চোর ইঁদারায় ঝাঁপ মেরেছে।

ভোর হচ্ছে, ছেলে বাড়ি ঢুকল। দেখলে বাবা আয়েশ করে বসে চা খাচ্ছে। ছেলের রাগ অভিমান দুটোই হয়েছে। বাবাকে বললে, তুমি আমার সঙ্গে এইরকম একটা ব্যবহার করতে পারলে?

বাবা হেসে শান্ত গলায় বললে, বোস, আগে বল, তুই কীভাবে ফিরে এলি?

ছেলে সব বললে।

বাবা বললে, পুত্র, তুমি তো সবই শিখে গেছ। এ তো শেখানো যায় না, নিজেকে শিখতে হয়।

হরিশঙ্কর বলেছিলেন, ধর্ম, পথ, নিরাসক্তি, মায়ামুক্তি, সংসার থেকে বেরিয়ে আসার কায়দা শেখানো যায় না, নিজেকে শিখতে হয়।

ছোটদাদুর ভিজে ভারী হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল, চলো আমার হয়ে গেছে।

এইবার পট পরিবর্তন। আমি আর বিমলাদি মেলায়। বিমলাদির ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা জায়গায় গ্রামের সব মানুষ এসে জড়ো হয়েছে। আলোয় আলো। ক্যাঁ কোঁচ নাগরদোলা, পুতুল নাচ। মহাভারতের

পালা। দিব না দিব না সূচ্যগ্র মেদিনী। দুই মাতাল টলছে। একজন বলছে, আমি নিমাইচন্দ্র। আর একজন বলছে, চিনি রে শালা। আমি যে নিতাইচন্দ্র। বিমলাদি কাঁধ ধরে বললে, সরে এসো, জাত মাতাল।

রাত হয়েছে, তাও কী জমজমাট মেলা। প্রায় দামোদরের তীর পর্যন্ত চলে গেছে। মানুষ ঘুমোবে না। ঘুম তো আছেই। তিনটে দিন না হয় জাগল। এত আনন্দ একসঙ্গে এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। একপাশে একটু নিরালা জায়গায় রামায়ণ হচ্ছে। বাঁকুড়ার বিখ্যাত পাঠক হারমোনিয়ম বাজিয়ে রামায়ণ গান করছেন। বেশ ভিড় হয়েছে। এক ছাউনির তলায় এসেছে কৃষ্ণনগরের পুতুল। পুতুলের কী আকর্ষণ! বিমলাদি আর আমি দু'জনেই দাঁড়িয়ে পড়েছি। জীবন্ত সব চরিত্র। কৃষ্ণ। গোপাল হামা দিচ্ছে। কলসি কাঁখে মহিলা। জাল কাঁধে জেলে। সাপুড়ে সাপ খেলাচ্ছে। কী নেই! হ্যাজাকের জোরালো আলোয় কল্পনার জগৎ।

বিমলাদি বললেন, কিনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ভীষণ দাম।

আমি আপনাকে কিনে উপহার দিই। বলুন, আপনার কোনটা পছন্দ?

আমি নোব কেন?

ভাই দিচ্ছে বলে।

আপনি আপনি করলে বোন হয়!

এই কথা? বেশ তুমি বলছি। বলো দিদি তোমার কোনটা পছন্দ!

বাঁশি হাতে কৃষ্ণ। এখন কিনো না, আগে সবটা ঘুরে আসি। নাগরদোলায় চড়ব। ভীষণ মজা লাগে! মনে হয় ছোট হয়ে গেছি।

আমার যে ভীষণ ভয় করে দিদি।

দুর! তুমি আমার পাশে বসবে, আমি তোমায় দু'হাতে শক্ত করে ধরে থাকব। চিনেবাদাম খাবে? গরম চিনেবাদাম খেতে ভীষণ ভাল লাগে।

এত রাতে বাদাম খাবে দিদি? পেট ভরে যাবে।

তোমার মাথা! একমুঠো বাদাম থেকে বড়জোর পঞ্চাশটা পুঁচকে পুঁচকে দানা বেরোবে। এইতে যদি পেট ভরে যায়, পেট কেটে বাদ দাও। মেলায় এসে হিসেব করতে নেই। যা প্রাণ চায় তাই করতে হয়। বালির খোলায় চিনেবাদাম নাড়ার গন্ধটা কী সুন্দর লাগে! মনে হয় মেলার গন্ধ। বছরে তো এই একবারই মেলা বসে গো। তাও তুমি এইরকম করছ!

দিদি ছেলেমানুষ হতে হতে একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন। মুখচোখের চেহারা পালটে গেছে। আমরা নাগরদোলার দিকে এগোচ্ছি। পরপর এক সার চট-ঘেরা খুপরি। অনেকে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছে। চটের পরদা তুলে টুপ টুপ ঢুকে পড়ছে। দিদি আমার হাত চেপে ধরলেন;

সাবধান।

কেন দিদি?

অনেক সময় হাত ধরে টেনে নেয়।

কে টেনে নেয় দিদি?

ওই যে ওর মধ্যে যারা আছে, সেই মেয়েরা। পা চালাও পা চালাও।

ওদের এখানে কেন আসতে দিয়েছে দিদি?

মেলায় আসে অমন। ওদেরও তো খেয়ে পরে বাঁচতে হবে।

মাঝে মাঝে খিলখিল হাসি আসছে কানে। অল্প অল্প ঘুঙুরের শব্দ। আমরা প্রায় ছুটে জায়গাটা পেরিয়ে এসে এমন এলাকায় পড়লুম, যেখানে শুধুই কাচের জিনিসপত্র। আলোয় ঝলমল করছে। যেন কোনও মুঘল রাজার শিশমহলে এসে পড়েছি।

দিদি, দেখো কী সুন্দর! কিছু কিনবে?

কাচের জিনিস থাকে না। একদিন-না-একদিন ভেঙে যায়। কাচ পাথর খুব সাবধানে রাখতে হয়। একটু পরেই কত পাথরের কাজ দেখবে। শুশুনিয়ার পাথর কেটে তৈরি। লোভ লেগে যাবে। কিনতে ইচ্ছে করবে। আমাদের ঘরে কাঁসার জিনিসই ভাল।

আমরা নাগরদোলার কাছে চলে এলুম। দাঁড়ানোমাত্রই একটা পালা শেষ হল। দিদি বললেন, আমাদের ভাগ্যটা ভীষণ ভাল। একটুও অপেক্ষা করতে হল না।

নাগরদোলা কোম্পানির লোক আমাদের একটা দোলায় বসিয়ে দিলে। একটু না ধরলে তো বসা যায় না। আমরা যেটায় বসলুম সেটা এক ধাপ ওপরে উঠে গেল। পরেরটা ভরে গেল। আমরা আর একটু ওপরে উঠে গেলুম, শেষে একেবারে টংয়ে। শুরু হল ঘুরপাক, আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। প্রথম নাগরদোলায় চড়া। যখন হুস করে নীচের দিকে নামছে, মনে হচ্ছে আছড়ে মাটিতে ফেলে দেবে। আমার ভয় দেখে দিদি ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। কাঁধে কাঁধ ঠেকে আছে। যখন সবেগে নীচের দিকে নামছে, দিদি সুরেলা গলায় চিলের মতো শব্দ করছেন। বাঁইবাঁই করে ঘুরছে দোলা। মনে হচ্ছে ছিটকে আকাশের দিকে উঠে যাব। শরীরের কোনো ওজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। দিদির কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। দোলা ঘুরছে। নিবিড় স্নেহে জড়িয়ে রেখেছেন। দিদি। এইসময় মনে হল নাই বা থামল এই দোলা। কিন্তু থামল।

দিদি বললেন, নামবে? না আর একপাক ঘুরবে?

ঘুরব। আমার ঘুম এসে গেছে।

দেখেছ তো অভ্যাস হয়ে গেলে কেমন ভাল লাগে।

আমি হাসলুম। আবার শুরু হল ঘোরা। এইবার দিদিকে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলুম। ধূপ ধুনোর গন্ধ শরীরে। তুলোর মতো নরম। পাথরের মতো শীতল। অদ্ভুত একটা ভাব আসছে মনে। আনন্দের হিমপ্রবাহ নেমে আসছে অদৃশ্য উৎস থেকে। এইবার শেষ পাকে আমাদের দোলাটা থামাল সবার ওপরে। শূন্যে ঝুলে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ।

মাটিতে নেমে এলুম। শরীর টলছে। নেশা লেগে গেছে। পাঁইপাঁই করে ঘুরলে খিদে পায়। আমরা চিনেবাদামের কাছে গেলুম। বাদাম কিনে আমরা একটা কদমগাছের তলায় গিয়ে বসলুম। সেখানে আমাদের

জন্যে কেউ একটা গোরুর গাড়ির চাকা ফেলে রেখেছিল। আমরা পাশাপাশি সেই চাকার ওপর বসলুম। চিনেবাদামের খোলা ভাঙার পুটুসপুটুস শব্দ। দিদির সাদা শাড়ি অন্ধকারে আরও সাদা দেখাচ্ছে। আমাদের পেছন দিকে একটু দূরে লোহার জিনিসের স্টল। কড়া, চাটু, হাতা, খুন্তি। সামনের দিকে একসঙ্গে অনেক কিছু চলছে। ইন্দ্রজালের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক ভয়ংকর চিৎকার করছে।

দিদি বললেন, ভীষণ ভাল লাগছে। আরও ভাল লাগছে তুমি আছ বলে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে তুমি আমার কৃষ্ণ। সংসারের বাঁধাধরা আমার একদম ভাল লাগে না। কী ছাই হাতা-খুন্তি-বেড়ি! মাঝে মাঝে মনে হয় বাউল হয়ে যাব। কেমন দেশে দেশে ঘুরব গান গেয়ে। অত দূরে বসেছ কেন? কাছে সরে এসো, গায়ে গা লাগিয়ে বোসো। দাঁড়াও বাদামগুলো আমার কোলে ঢালি। নাও এইখান থেকে তুলে তুলে নাও। আজ আকাশের রং দেখেছ? একেবারে শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং।

আমার শরীরে দিদির শরীর ঠেকে আছে। আকাশের রং শ্রীকৃষ্ণের মতো বলার সঙ্গে সঙ্গে দিদির শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। ফিসফিস করে বললেন, শিগগির শিগগির, আমাকে নামিয়ে আনো।

ভয় পেয়ে গেলুম। কোথা থেকে নামাব! কোথা থেকে নামাব দিদি? তুমি তো আমার পাশেই রয়েছ।

দিদির কাঁপুনি আরও বেড়ে গেছে। ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপছেন ঠকঠক করে। কোনওরকমে বললেন, আমার মন ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। শিগগির আমার বুকে হাত রাখো।

অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। কোনও চিন্তার অবকাশ নেই। খুব ভয়ে ভয়ে বুকে হাত দিলুম। সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনার অতীত। মেলার নেশা-ধরানো রাত। শ্যামকৃষ্ণ আকাশ। স্ফটিকের টুকরো তারা। ঝাপুর ঝুপুর কদমের পাতায় বাতাসের হিমসিম শব্দ। ইন্দ্রজালের চিৎকার। নাগরদোলার ছুঁচোর ডাক। আমার হাত। দিদি আমাকে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলেন। এই প্রথম একটা অনুভূতি হল, দেহ দিয়ে দেহের বাইরে যাওয়া যায়। আমার অস্তিত্ব মন্দিরচূড়ার পতাকার মতো পতপত করে উড়তে লাগল। আমার এমন কিছু দর্শন হল, যা অতীন্দ্রিয়। অলৌকিক। দিদি আমার শরীরের সর্বত্র হাত বোলাচ্ছেন। সাধারণ কোনও মানুষ আড়াল থেকে দেখলে ভাববে অশ্লীল একটা কিছু হচ্ছে। একমাত্র আমিই জানি কী হচ্ছে! ইন্দ্রিয়ের জট খুলে বেরিয়ে আসছে নিরাসক্ত বিশুদ্ধ অনুভূতি। সমস্ত শরীরে যেন অমৃতক্ষরণ হচ্ছে। সারাশরীর মধুর মতো চটচটে। মাথার ঢাকনা যেন খুলে গেছে। সেখানে কে যেন একখণ্ড বরফ বসিয়ে দিয়েছে। কানে শুনতে পাচ্ছি ঠিনঠিন খঞ্জনির শব্দ। দেখতে পাচ্ছি সামনে জমিতে চূর্ণ চূর্ণ চাঁদের টুকরো। নাকে আসছে পদ্মের গন্ধ। কখনও মনে হচ্ছে আমি বিশাল, কখনও মনে হচ্ছে বিন্দুর মতো ক্ষুদ্র। প্রসারিত হচ্ছি, সংকুচিত হচ্ছি। কখনও মনে হচ্ছে আমি জমাট বরফ, কখনও তরল নদী।

কতক্ষণ এই অবস্থায় ছিলুম জানি না, যখন সংবিৎ ফিরে পেলুম, তখন মেলা প্রায় ভেঙে এসেছে। স্থির নাগরদোলা সামনের জমিতে। ইন্দ্রজালের চিৎকার নেই। রামায়ণ গান কানে আসছে না। দিদির এখন অন্য ব্যক্তিত্ব। আদেশের কণ্ঠস্বর, চলো, বেশ রাত হয়েছে। বুঝতে পারছ, বাতাস ঘুরে গেছে! হাওয়া দিয়ে সময় ঠিক করা যায়।

দিদি, তোমার কৃষ্ণ?

মাটির কৃষ্ণের আর দরকার নেই। আমি জ্যান্ত কৃষ্ণ পেয়ে গেছি। শোনো তোমাকে একটা কথা বলি, যা হল, যা পেলে, আরও যা পাবে, তোমার দাদু তোমার বাবাকে বলবে না। তোমার কেমন লাগল?

আমি বলতে পারব না। বলা যায় না।

হঠাৎ কী হয়ে গেল! জানো তো অনেকেই এসব বোঝে না। অপবাদ দেয়।

দিদি, তোমার শক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমার জীবনে এর দাম আছে। আমার এসবে কী প্রয়োজন!

প্রয়োজন? তোমার কি ধারণা এসব চাইলেই পাওয়া যায়! তোমার মনে হল, আর তুমি পেয়ে গেলে! তোমার মনে হল আমি চাই না, আর সব ফিরে গেল! মানুষের জীবনে না চাইতেই আসে। সকলের জীবনে আসে না। যার আসে তার আসে। এরই নাম কৃপা। করা থাকলে তবেই পাওয়া যায়। করে পাওয়ার নাম কৃপা। ধরো, তোমার চুল পড়ে যাচ্ছে, তুমি চাইলেই কি পড়া বন্ধ হবে? পড়ার হলে পড়বে, থাকার হলে থাকবে। সময় হলে শিশুর দাঁত উঠবে, বয়স হলে পড়ে যাবে, চোখে যখন ছানি আসবে আসবেই, তুমি না চাইলেও আসবে। শোনো, তোমার আগের জন্মে বেশ কিছু করা আছে। তুমি সে খবর রাখো না। তোমার দাদু আজ তোমাকে কিছু দেখিয়েছেন, বলো ঠিক কি না?

হ্যাঁ দিদি।

তোমার বাবার শক্তি তোমাকে ঘিরে আছে। তোমার ভেতরে ভোগ আর যোগ দুটোই সমান সমান মাত্রায় আছে। তোমাকে ভোগের পর্বটা আগে শেষ করে নিতে হবে। তোমার স্ত্রীর শক্তি তোমার চেয়ে বেশি হবে। তোমার স্ত্রীকে ধরেই তোমাকে এগোতে হবে। এইটাই তোমার পথ, কিন্তু আসতে হবে অনেক ঘাটের জল খেয়ে ঘুরপথে।

সেই অদ্ভুত মহিলা আমাকে একটি অসাধারণ গল্প বলেছিলেন। হরিশঙ্কর প্রায়ই বলেন, জ্ঞানের মনোপলি হয় না। তোমার কাছেই সব জ্ঞান। কৃপা করে তুমি ছাড়বে, তবেই আমার বরাতে সামান্য জুটবে, এই একটি ক্ষেত্রে সেই ব্যাবসা অচল। জ্ঞান সকলের। সকলেই জ্ঞানী হতে পারে। যদি ইচ্ছে থাকে, যদি চেষ্টা থাকে। মানুষের ভেতরে জ্ঞান উদিত হয় সূর্যের মতো। এই মহিলাও সেইরকম জ্ঞানী। শুধু জ্ঞানী নন, সাধিকাও।

দিদি বলছেন, একটা কুঁড়েঘর। একটা লণ্ঠন জ্বলছে। একজন লোক শুয়ে ছিল। হঠাৎ উঠে বসল। এক ছিলিম তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। হুঁকো কলকে বেরোল। এইবার চাই টিকে। খুঁজে খুঁজে কয়েকটি টিকেও বেরোল। এইবার যে একটু আগুন চাই। আগুন না হলে যে টিকে ধরবে না। তার যে চকমকি পাথরটা ছিল, সেটা হারিয়ে গেছে। পাথর আছে প্রতিবেশীর বাড়িতে, কিন্তু এই মাঝরাতে ডাকাডাকি করাটা কি উচিত হবে! সবাই ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তামাকের নেশা! একটু না হলে যে প্রাণ ছটফট করছে। লণ্ঠন হাতে লোকটি বেরিয়ে পড়ল রাতের অন্ধকারে। প্রতিবেশীর দরজায় গিয়ে ধাক্কাধাক্কি। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বাড়ির কর্তা। কী চাই? বড় তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। টিকে ধরাতে হবে। একটু আগুন চাই। আপনার চকমকি পাথরটা যদি একবার দেন কর্তা! কর্তা বললেন, আগুন ধরাবে? তা তোমার হাতে ওটা কী? আজ্ঞে লণ্ঠন। লণ্ঠনের ভেতর ওটা কী? আজ্ঞে, তাই তো। তোমার নিজের হাতে আগুন, আর তুমি মাঝরাতে প্রতিবেশীর ঘুম ভাঙিয়ে আগুনের খোঁজ করছ?

দিদির বক্তব্য, তোমার ভেতর আছে, তোমার হুঁশ নেই। সেই হুঁশটা তোমার করিয়ে দিতে হবে। সেইটা হবে তোমার গুরুর কাজ। ভেতরে থাকলে তবেই তাকে টেনে বের করা যায়। যেমন গান, শিল্প, সাধনা। ভেতরে থাকা চাই। তোমার আছে। প্রকাশ নেই। তীর্থে তীর্থে ঘোরো, সাধুসঙ্গ করো। তা না হলে, তোমার এদিকও যাবে ওদিকও যাবে। সংসার তুমি করবে। শুরুটা ভালই হবে, শেষটা গোলমেলে। নির্জনে একা। তখনই হবে মুখোমুখি।

সারাটা পথ এই ধরনের অদ্ভুত সব কথা বলতে বলতে দিদি এসে ঢুকলেন বাড়িতে। ঢুকেই হরিশঙ্করের গলা, এই নে কিস্তি। সামলা।

দাওয়ায় বসেছে দাবার আসর। হ্যারিকেনটা ঝুলছে বাঁশের বাতায়। গাওয়া ঘিয়ে একটা কিছু ভাজা হচ্ছে। গন্ধে আকাশ বাতাস ভরে গেছে। মোহনদা নেমে পড়েছেন রান্নায়।

ছোটদাদু টুক করে একটা ঘুঁটি সরিয়ে বললেন, এই নাও বন্ধনমুক্ত করে দিলুম, কিন্তু এইবার তোমার বিপদ।

হরিশঙ্কর চালটার খুব তারিফ করলেন। আমি একপাশে বসলুম। ছক থেকে মুখ না তুলেই ছোটদাদু বললেন, কেমন হল মেলা?

আমার উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে একটা ঘুঁটি চেলে বললেন, কিস্তি।

হরিশঙ্কর বলছেন, এ একেবারে জীবনমরণ লড়াই চলেছে। একবার এদিক যায় তো একবার ওদিক।

ছোটদাদু হাসছেন, রাজারাজড়ার ব্যাপার। রাজ্যপাট সামলানো কি মুখের কথা! আচ্ছা নে এইবারও সামলে দিলুম, কিন্তু তোর মন্ত্রী ইন ডেঞ্জার।

খেলার কোনও সমাধান শেষ পর্যন্ত হল না। খাওয়ার ডাক পড়ে গেল। হরিশঙ্কর আসনে বসতে বসতে বললেন, কাল শেষরাতেই কিন্তু আমরা বেরিয়ে যাব।

ছোটদাদু হঠাৎ বললেন, শেষরাত নয়। এই রাতেই বেরোব। অদৃশ্য নির্দেশ।

মোহনদা পরিবেশন করছিলেন। বললেন, কিছুতেই কি কারও কথা শুনবেন না?

ছোটদাদু বললেন, অবশ্যই শুনব একজনের কথা। তিনি বসে আছেন অন্তরে।

পথটা ভাল নয়। কেন অমন করছেন। একবার ইনি বলছেন। ইনি শান্ত হলেন তো আপনি। আর তো কয়েকঘণ্টা। তারপরেই তো ভোর!

এক মুহূর্তে বিশ্ব জুড়ে কত কাণ্ড হয়ে যায় মোহন! এই মুহূর্তে কত জন্মাল, কত মরল, কত খুন হল, কত সংসার ভাঙল! কত বরফ জল হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। কত মানুষ এগোল, কত মানুষ পেছোল। এই মুহূর্তে একটা ট্রেন গন্তব্যের দিকে কতটা এগিয়ে গেল। সে খবর রাখো মোহন?

সবই ঠিক, তবে এই কষ্ট। আমরা আরামে ঘুমোব, আপনারা হাঁটবেন!

পুরোটাই মনের ব্যাপার মোহন। কেউ ঘুমিয়ে আরাম পায়, কেউ পায় বনের পথে হেঁটে।

খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর হাত ধুচ্ছি, বিমলাদি বললেন, কোনওরকমে আটকাও না! রাতে তোমাকে নিয়ে যে একটু বসব ভেবেছিলুম। এমন একটা ক্রিয়া তোমাকে শেখাব ভেবেছিলুম যা তোমার সংসারপথের সহায় হবে।

কী দিদি!

বজ্রোলি মুদ্রা। এক মহাযোগী আমাকে শিখিয়েছিলেন। তুমি কোনওরকমে বোঝাও।

ছোটদাদু প্রস্তুত হচ্ছেন। হরিশঙ্কর প্রায় তৈরি। ছোটদাদুকে আস্তে আস্তে বললুম, ছোটদাদু, আর তো কয়েকঘণ্টা, একেবারে ভোরবেলা বেরোলে হয় না?

গম্ভীর গলায় বললেন, না হয় না!

এই রাত! এতটা পথ! জঙ্গল! ডাকাত!

তাতে তোমার কী? তুমি কি সঙ্গে মোহরের থলে নিয়ে চলেছ?

বেশ রাগের গলা! বিমলা ওপাশে ছিলেন। গিয়ে বললুম। বিমলাদি বললেন, তুমি বলো, আমি থাকছি। ফেরার পথে আপনাদের সঙ্গে চলে যাব।

আমি একটা ভেড়ার মতো সেই কথা বলার জন্যে ফিরে এলুম। একটা অদৃশ্য শক্তি যেন আমাকে পরিচালিত করছে। একটা ঘোরের মধ্যে আছি।

ছোটদাদুর সামনে দাঁড়ানোমাত্রই, তিনি খপ করে একটা হাত ধরলেন আমার। ভয়ংকর একটা ঝাঁকুনি মারলেন। তারপর টানতে টানতে একেবারে রাস্তায়। হরিশঙ্কর অনুসরণ করছেন। ছোটদাদু আমাকে নিয়ে হাঁটছেন হনহন করে।

নিমেষে চলে এলুম পণ্ডিতমশাইয়ের চতুষ্পাঠীর কাছে। মিটমিট একটা আলো জ্বলছে ভেতরে। এসে গেল সেই সাঁকো। পথ ঢালু হল। সামনেই সেই মেলার জায়গা। অন্ধকারে দৈত্যের মতো খাড়া হয়ে আছে নাগরদোলা। টিং টিং আলো এখানে ওখানে। সেই মেয়েরা এখন বেরিয়ে এসেছে। অসংলগ্ন কথা, চুটকি হাসি, মাতালের প্রলাপ।

আমরা যেন বাতাসে উড়ে চলেছি পক্ষীরাজের মতো। বিশাল একটা ধ্বংসাবশেষ এগিয়ে আসছে। হরিশঙ্কর পেছনে আসছেন সৈনিকের মতো মার্চ করে।

There is an Eye that never sleeps
Beneath the wing of night;
There is an Ear that never shuts
When sink the beams of light.

পণ্ডিতমশাইয়ের জন্যে আমার খুব দুঃখ হচ্ছিল। ছোটদাদুর ভয়ংকর আক্রমণ, তারপরে অসীম কৃপা, সবই হল, কিন্তু মানুষটি বড় নিঃসঙ্গে আছেন। শাস্ত্র আর পাণ্ডিত্যের ভারে নুয়ে পড়েছেন। বাঁচার ইচ্ছা প্রবল, অথচ সময়ের বালুকণা অবিরত ঝরেই চলেছে। যৌবনে না হয় একটু বেহিসেবি ছিলেন। হয়তো টাকাপয়সার ব্যাপারে একটু হিসেবি। মানুষের সবটাই কি ভাল হতে পারে! মানুষ তো তা হলে ভগবান হয়ে যাবে! দুটো পা, দুটো হাত, দুটো কান, দুটো চোখ, অর্থাৎ পাপ আর পুণ্য। বৃদ্ধ মানুষটি আমার মধ্যে তাঁর সন্তানকে দেখেছিলেন। আর হয়তো দেখা হবে না কোনওদিন। এইসব ঠুনকো সেন্টিমেন্টের অর্থ হয় না কোনও।

হরিশঙ্করের হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল। গাছের ডাল, কচি বাঁশ, বেত, কুড়িয়ে পাওয়া পাথর এইসব হরিশঙ্করের প্রাণের জিনিস। প্রকৃতিতে মিলিয়ে যেতে হরিশঙ্কর ভীষণ ভালবাসেন। এত বড় মাপের মানুষকে সংসারে ধরে রাখা যায় না। অসম্ভব। আকাশ মানুষের জানলায় উঁকি দেয় বলে আকাশকে ছোট ভাবা, জানলার আকাশ ঘরের আকাশ ভাবা মূর্খতা। হরিশঙ্কর গুনগুন করে গান গাইছেন। কেদারার আলাপ। পথ বন্ধুর। খন্দে ভরা। যখন ঝোপঝাপ গাছের দঙ্গলে ঢুকছি তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আর টেনিস বলের মতো আলো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। চিনতে পারিনি। হরিশঙ্কর বললেন, ভয় পেয়ো না। ভূত নয় জোনাকি। এর আলাদা রূপ।

এক জোনাকি দর্শনেই হরিশঙ্কর যেন সমাধিস্থ। সৃষ্টিবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতায় চলে গেলেন। স্রষ্টার বিশাল পরিকল্পনা যে কতটা বিশাল তারই আলোচনা চলল! যেখানে যা প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন, সবই আছে। কিছু আবার রেখেছেন লুকিয়ে, গুপ্তধনের মতো করে। মানুষের অনুসন্ধানী প্রতিভা যাতে বাড়ে। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যাতে আরও উন্নত হয়। যেমন অসুখ। অসুখ যেমন দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের ব্যবস্থাও করে রাখলেন। খুঁজে নাও। দেহটাকে করে দিলেন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কমবাইন্ড। স্টম্যাক একটা ল্যাবরেটরি। স্কেলিট্যান পারফেক্ট ফিজিক্স। হিঞ্জ, ফালক্রাম, গিয়ার, পিনিয়ান। ব্রেন কম্পিউটার। চোখ ক্যামেরা। হরিশঙ্কর এতটাই অভিভূত যে হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল।

অন্ধকারে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম সেই ধ্বংসাবশেষের সামনে। কোনও এক সময় ছিল বিশাল প্রাসাদ। বাঁকুড়ার ইতিহাস তো সামান্য নয়। একসময় নাম ছিল জঙ্গলমহল। শুধু গণিত? ইতিহাসেও হরিশঙ্কর

অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোথাকার ইতিহাস চাই? গ্রিস, রোম, ইজিপ্ট, অটোমান টার্ক, ভারত, এমনকী পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলা।

আমরা যেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন গেরিলা সোলজার। এইমাত্র প্যারাসুট নিয়ে আকাশ থেকে নেমে এসেছি মধ্যপ্রাচ্যের কোনও রণাঙ্গনের পশ্চাৎভূমিতে। সামনেই ফোর্ট নক্স। দুই জেনারেলে যুক্তি হচ্ছে। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে! ঝিঁঝিঁ পোকার ঐকতান যে কী ভয়ংকর হতে পারে, সে-ই টের পেলুম। দু'কানের পরদা যেন খুলে পড়ে যাবে!

হরিশঙ্কর আর ছোটদাদুর মুখের ওপর এক ভৌতিক আলো খেলা করছে। দু'জনকেই মনে হচ্ছে আমার অচেনা। হরিশঙ্কর হঠাৎ বললেন, ক্রিস্টাল অফ বীরভানপুর অ্যান্ড দেজুরি।

ছোটদাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পরীক্ষা করে বিশেজ্ঞরা রায় দিলেন...।

হরিশঙ্কর ধরে নিলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগেও এই জেলায় মানুষের বাস ছিল, আর সে মানুষ অরণ্যচারী কাঁচাখেকো মানুষ ছিল না, ছিল সুসভ্য। শিল্প নিদর্শন যা আবিষ্কৃত হয়েছে সেইটাই তার প্রমাণ। অন্ধকারের এই স্তূপটি কী? এনি আইডিয়া।

আদি রাজা ছিলেন মহারাজা সিংহ বর্মন। এটা তাঁর স্মৃতি নয়। শুশুনিয়া পাহাড়ের একপাশে পাথরের গায়ে বিরাট এক জ্বলন্ত চাকার তলায় নিজের কালকে, নিজের রাজত্বের কাহিনীকে কালজয়ী করে রেখে গেছেন। আমার মনে হয় এটা রাজা গোপাল সিংহের কালের।

কোন গোপাল সিংহ! সেই রাজপুত ব্রাহ্মণ, যাঁর রাজত্বসীমা ঘুরে দেখতে যোলো দিনেরও বেশি সময় লাগত। রাজস্ব থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ছিল তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা। শত্রু-দমনের কাজে যিনি জলকে ব্যবহার করেছিলেন শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে।

সেই সুজা খাঁ!

ঠিক, ঠিক বলেছিস। হান্ড্রেড আউট অফ হান্ড্রেড।

গোপাল সিংহের রাজত্ব ছিল দুর্ভেদ্য। সুজা খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেছিলেন। মনে পড়েছে?

পড়বে না! গোপাল সিংহ-র কী ট্যাকটিকস! এসো। এগিয়ে এসো। আরও এসো। একেবারে হাতের মুঠোয়। তারপরেই খুলে দেওয়া হল ড্যামের গেট। জলের তোড়ে সব হাবুডুবু।

কী রাজাই ছিলেন! হোয়াট এ কিং হি ওয়াজ। জমজমাট রাজত্ব। চুরি নেই, ডাকাতি নেই, চোর-জোচ্চর বাটপাড় নেই। দিগ্বিদিক থেকে বণিকরা আসছেন, ভ্রমণার্থীরা আসছেন। অ্যান্ড হোয়াট এ সিস্টেম! রাজসীমায় ঢোকামাত্রই নিরাপত্তার দায়িত্ব রাজপ্রহরীর। ঘাঁটির পর ঘাঁটি। প্রহরী এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে এনে আর এক প্রহরীর হাতে দায়িত্ব দিয়ে ফিরে যাবে। রিলে সিস্টেম। শুধু হাতে ফিরবে না, ফিরবে রিসিট নিয়ে। পারসন ডেলিভার্ড। মুখ্য প্রহরী আবার রাজার কাছে নিয়মিত খবর পাঠাতে থাকবেন, অতিথি কেমন আছেন, কোথায় আছেন। গোপাল সিংহের রাজত্বে ঢোকা মানে, তুমি স্টেট গেস্ট। তোমার আর কোনও খরচ নেই। সব ফ্রি। থাকা খাওয়া। এমনকী তোমার সওদা, তোমার সম্পদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিনা পারিশ্রমিকে একজন বাহক পাবে। যদি তুমি কিছু হারিয়ে ফেলো, ধরো টাকার থলে, তা হলেও চিন্তার কিছু নেই। যিনিই

সেই থলি কুড়িয়ে পান কেন, সবচেয়ে কাছের কোনও গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে তিনি নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সেই খবর দেবেন। চৌকিরক্ষক ঢেঁড়া পিটিয়ে সেই খবর সমস্ত জেলাবাসীকে জানিয়ে দেবেন।

ছোটদাদু বললেন, এই ধ্বংসাবশেষ হয়তো সেই গ্রেট কিং গোপাল সিংহের রাজত্বকালের।

একটা তোরণের মতো প্রবেশপথ। সময় যেন সলিড হয়ে গেছে। তারপর প্রবল জঙ্গল। টলের মতো জোনাকির আলো, ফুরফুরে বুদবুদের মতো ভাসছে। তারপর ছোট বড় অন্ধকারের টুকরো। ইতিহাসের অন্ধকার।

হরিশঙ্কর বললেন, আমি ভেতরে দু'-এক কদম এগিয়ে দেখি। শুধু ইতিহাস নয়। রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ছোটদাদু বললেন, ইদানীং লক্ষ করছি তোর মধ্যে একটা ইনস্যানিটি আসছে। মাঝে মাঝে মনে হয় পাগলামি আসছে। এই অন্ধকারে যেখানে একটা শেয়াল ঢুকতে ভয় পায়, তুই সেখানে কী কারণে ঢুকবি? সাপের ছোবল বিছের কামড় খাওয়ার জন্যে? না কি পড়ে হাত পা ভাঙার জন্যে!

শোন, আদি পৃথিবীটা কেমন ছিল?

তুই আদিম মানুষ নোস!

আমি কিন্তু একেবারে মাথায় এক বিন্দু আলো দেখতে পাচ্ছি।

আমরা তাকালুম। সত্যিই তাই, একটা আলোর ফুটকি জ্বলছে নিবছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে একটা নয় দুটো বিন্দু। গা-টা ছাঁত করে উঠল। অবশ্যই কোনও ভয়ংকর ডাকাত। হাওয়া থেকে টঙে চড়েছে। সিগারেটে টান মারছে।

ছোটদাদু হঠাৎ হেসে উঠলেন, ভায়া, ওটি একটি বৃহৎ আকারের প্যাঁচা, একটু বাতাস নিচ্ছেন। জানবে শিকারি পাখি শিকারি জন্তুর চোখ রাত্তিরবেলায় আগুনের মতো জ্বলে। হিংসার আগুন।

হরিশঙ্কর বললেন, ইউ আর রাইট। রাত যদি না হত আমি এই রেলিকস দেখে ছাড়তুম। এমন একটা জিনিস না দেখে চলে যেতে হচ্ছে, ভেরি স্যাড। ফেরার পথে আমাকে দেখতেই হবে।

তোর সঙ্গে আমি একমত। অতীতের চেয়ে দর্শনীয় আর কী আছে!

আমার হঠাৎ মনে হল, আমাদের কোনও অদৃশ্য শক্তি এখানে ধরে রেখেছে। যেভাবে দু'জনের কথাবার্তা আলোচনা চলেছে, তাতে মনে হচ্ছে এইখানেই রাত ভোর হয়ে যাবে। একপাশে বসে পড়লেই তো হয়!

হঠাৎ আলোচনা থেমে গেল। গোটাকতক প্যাঁচা চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডেকে উঠল। ভয়ংকর ডাক। ছোটদাদু বললেন, একটা প্রহর শেষ হল। চলো, আমরা পা চালাই।

হরিশঙ্কর বললেন, এই সময়টায় আমি পৃথিবীর আহ্নিকগতি যেন অনুভব করতে পারি। পৃথিবী তার নিজের অ্যাকসিসে ধীরে ধীরে রিভল্‌ভ করছে। রাত থেকে দিন, দিন থেকে রাত। রাতের মতো সময় আছে! এমন ঘন, এমন একান্ত একটা সময়! সবকিছুই রহস্যাবৃত। আচ্ছা চলো। এগিয়ে পড়ি।

হঠাৎ ঝুনঝুন শব্দ। যেন অনেক কঙ্কাল একসঙ্গে নৃত্য করছে। এ শব্দ আগে কখনও শুনিনি। হরিশঙ্কর চলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, রাজপুরীতে নাচের আসর বসল নাকি?

ছোটদাদু বললেন, শব্দটার সঙ্গে পরিচয় নেই, তাই না!

আগে শুনিনি।

একসঙ্গে অনেক শজারু নাচছে কোথাও। রাতেরবেলা ওদের খুব আনন্দ হয়।

হরিশঙ্কর বললেন, দৃশ্যটা দেখে গেলে হত।

ছেড়ে দে, বিনা নিমন্ত্রণে না যাওয়াটাই ভাল।

আমরা হাঁটছি। একটা ভারী বাতাস বইছে। কষাকষা গন্ধ। জঙ্গলে কত গাছ! কোন গাছের কী গন্ধ বলা কঠিন। আমাদের হাঁটার গতি একটু কমেছে। ইতিহাস আমাদের ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। হঠাৎ ভীষণ একটা পচা গন্ধ এল নাকে।

ছোটদাদু বললেন, মেরেটেরে এনে ফেলে রেখে গেছে। পচা মড়ার গন্ধ।

জায়গাটা আমরা পেরিয়ে এলুম। জঙ্গল কমে আসছে। সামনেই একটা গ্রাম। মাঝরাতে ঘুমিয়ে আছে। ছোট্ট একটা মন্দির। মাথায় একটা সাদা পতাকা উড়ছে। একটা পথ মাঠের ওপর দিয়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। চালা বাড়ি জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝুপুর ঝাপুর আমগাছ। খেজুরগাছ। মন্দিরটা আমাদের পাশেই পড়ল। সিমেন্ট বাঁধানো ছোট্ট লাল চাতাল। টগর কলকে আর জবা গাছ। মাঝরাতেই ফুল ফুটিয়ে বসে আছে।

ছোটদাদু বললেন, মিনিট পনেরো বসে গেলে কেমন হয়! জায়গাটা ভারী মিষ্টি। যে-ই করুক তার টেস্ট আছে।

হরিশঙ্কর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজছে?

কবজির দিকে তাকিয়ে ভেতরটা ছাঁত করে উঠল। ঘড়িটা নেই। কোথায় গেল ঘড়ি! ভাববার চেষ্টা করলুম। হাতেই তো ছিল। সুইশ ঘড়ি। ওই নামের ঘড়ি আর বাজারে পাওয়া যায় না। এভার হার্ড। সোনার ঘড়ি। জ্যাঠামশাই আমাকে দিয়েছিলেন। মিষ্টি রঙের ডায়াল। সোনার কাঁটা। অপ্রচলিত গড়ন। পিতা হরিশঙ্কর হাতঘড়ি ব্যবহার করেন না। বাবু-বাবু দেখায় বলে।

হরিশঙ্কর বললেন, কী হল? দেখতে পাচ্ছ না?

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। কোনওরকমে বললুম, ঘড়িটা দেখতে পাচ্ছি না।

সময় দেখতে পাচ্ছ না, না ঘড়িটাই দেখতে পাচ্ছ না!

আজ্ঞে, ঘড়িটাই দেখতে পাচ্ছি না।

তার মানে, মোহনের ওখানেই ফেলে চলে এলে!

মনে হচ্ছে পরেছিলুম।

এখন এই মুহূর্তে কী মনে হচ্ছে!

মনে হচ্ছে, ছোটদাদু আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছিলেন, সেইসময় যদি ব্যান্ড ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে থাকে!

ছোটদাদু বললেন, ঘড়ি কি তুমি আজকাল ডান হাতে পরছ? তোমার ডান হাতই তো আমি ধরেছিলুম। তন্ত্রে নির্দেশ আছে কারওকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে হলে, ডান হাত ধরে বাঁ পা আগে ফেলতে হয়। এর

ব্যতিক্রম তো হবার কথা নয়। ঘড়িটা তুমি ফেলেই এসেছ।

হরিশঙ্কর আর দ্বিতীয় কথা বললেন না। কোনও হাহাকার নেই, হায় হায় নেই। গেলে গেছে। পাওয়া গেলে পাওয়া যাবে। আপন মনে হাঁটতে শুরু করলেন। পথের মন্দির পেছনে পড়ে রইল। আমি আর ছোটদাদু পাশাপাশি হাঁটছি। ঘড়ি হারাবার বেদনায় অতিশয় কাতর, যেন ঘড়িটার জন্যেই বেঁচে ছিলুম এতকাল। কত স্মৃতি! দামও যথেষ্ট। ঘড়ি তো গেলই, সঙ্গে চলে গেল জ্যাঠামশাইয়ের স্মৃতি।

ছোটদাদু বললেন, খুব মন খারাপ?

ঘড়িটা তো খুবই দামি ছিল। সোনার বডি। কোম্পানিও উঠে গেছে। কত সাবধানে ব্যবহার করতুম! অ্যাকিউরেট টাইম দিত।

তুমি কতক্ষণ বেহুঁশ ছিলে?

বেহুঁশ মানে?

মানে নাগরদোলায় চড়লে। দু'পাক মারলে। চিনেবাদাম কিনলে। কদমতলায় কাঠের চাকার ওপর বসলে। তারপর হুঁশ হারালে। এই অবস্থায় কতক্ষণ কাটালে?

ছাত্রজীবনে প্রথম সিগারেট খেয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার পর যে অবস্থা হয়, আমার সেই অবস্থা। ছোটদাদু জিজ্ঞেস করছেন, তখন তোমার হাতঘড়ি ছিল?

খেয়াল নেই দাদু।

কী করে থাকবে? তুমি তো সম্মোহিত ছিলে। তোমার হাতে ঘড়ি ছিল না। তুমি কী খেয়েছ মনে আছে?

না।

তুমি একটা ভয়ংকর পাল্লায় পড়েছিলে। তোমার জন্যেই ছিটকে বেরিয়ে আসতে হল আমাকে। এই দেখো, তোমার ঘড়ি আমার পকেটে।

ছোটদাদু ঘড়িটা বের করে আমার হাতে দিলেন। হারিয়ে পাওয়ার কী আনন্দ! সবচেয়ে প্রিয়জনের মুখের মতো সেই ঘড়ি। তাড়াতাড়ি হাতে পরতে গেলুম। ছোটদাদু বললেন, সকাল-না হওয়া পর্যন্ত আমার পকেটেই থাক। পথের বিপদ কাটেনি এখনও।

ছোটদাদু ঘড়িটা আবার পকেটে পুরলেন।

সময়টা বাবাকে তা হলে বলে দিন।

ওর আর সময় জেনে কী হবে! ও কি অফিসে যাবে বলে বেরিয়েছে!

আবার আমাদের হাঁটার গতি বেড়ে গেল। যেন পেছন দিক থেকে অদৃশ্য কোনও শক্তি আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছে। চলার বেগ বাড়লেও আমার প্রশ্ন থামল না।

ছোটদাদু, মেলার ঘটনা জানলেন কেমন করে!

অতি সহজে। তোমাকে অনুসরণ করে।

কই আপনাকে তো দেখতে পাইনি কোথাও!

তুমি যদি আমাকে দেখতেই পাবে, তা হলে আমার গোয়েন্দাগিরির কী মানে রইল! ওটা বোঝার চেষ্টা কোরো না। শোনো, তুমি এমন এক সাধিকার পাল্লায় পড়েছিলে, যিনি ডাকিনী-হাকিনী চ বিদ্যাচতুষ্টয়ে সিদ্ধ। সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মতোই এঁদের বিশ্বাস,

এথুসে সুরসুরি জমুণা এথুসে গঙ্গা সাঅরু।
এথুসে পআগ বণারসি এথুসে চন্দ দিবাঅরু॥

দেহেই সব। সুরেশ্বরী যমুনা, এখানে গঙ্গাসাগর, এখানেই প্রয়াগ বারাণসী, চন্দ্র, সূর্য, ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ, তীর্থক্ষেত্র ও সুখভূমি। তোমাকে বিন্দুসাধনার স্বাদ দিয়েছেন ওই শক্তিময়ী, কিন্তু তোমার আধার অন্য। তাই তোমাকে ঝটকা মেরে নিয়ে এলুম। ওই পথে গেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে।

পাগল হয়ে যাব কেন?

তোমার কাম বেড়ে যাবে, তুমি ধারণ না করে বর্জন করবে, তোমার শরীর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হবে। তোমার ক্ষয়রোগ হবে। তোমার মেধা কমে যাবে। তুমি জড় হয়ে যাবে। নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর অসম্ভব সংযম না থাকলে ওই পথ ধর্মের পথ না হয়ে ব্যভিচারের পথ হবে। দেখলে না, তুমি আসতে চাইছিলে না। সামান্য যেটুকু স্বাদ পেয়েছ, তাইতেই অস্থির হয়ে গেছ।

হরিশঙ্কর হঠাৎ থেমে পড়ে হাসতে লাগলেন।

ছোটদাদু জিজ্ঞেস করলেন, হাসির কারণ?

উলটোটা যদি হয়!

মানে?

আমাদেরই ডাকাত ভেবে গ্রামের লোক যদি পেটায়।

হুঁ, কথাটা তুই মন্দ বলিসনি। সে সম্ভাবনা অবশ্যই আছে।

তার মানে, ডবল রিস্ক। ডাকাতেও মারতে পারে, গ্রামের লোকও পেটাতে পারে। কিন্তু এতটা পথ চলে এলুম, এখনও একেবারেই নিরামিষ। ভেবেছিলুম ফাঁকা মাঠে অন্তত একটা ভূতও দেখতে পাব। সাধারণত খেজুরগাছের তলায় দর্শন হয়। সাদা কাপড় পরা মেয়েছেলে।

তোকে আমি বলিনি, এক-একবার আমরা চারজন হয়েছি। চতুর্থজন কে আমি বলতে পারব না। ঘাড় ঘোরালেই অদৃশ্য। এইবার বুঝে নে।

আমার বুক ঢিপঢিপ। পৃথিবীর যতরকম ভয় আছে সবই আমার আছে। কী পাল্লায় পড়া গেল! একজন ডাকাত হ্যান্ডল করবেন, আর একজন ভূত নাচাবেন। এইবার আমরা গভীরতর জঙ্গলে ঢুকলুম। হরিশঙ্করের কী আনন্দ! এই হল মানুষটির চরিত্রের অনন্য এক দিক। যত বিপদ তত আনন্দ। বল্লভভাই বলেছিলেন, ডেঞ্জার ইজ দি ব্রেদ অফ মাই লাইফ। এই আর একজন তাঁর দোসর। আমাদের সামনে হাতে একটা গাছের শুকনো ডাল নিয়ে নেচে নেচে চলেছেন।

ছোটদাদু বললেন, আমি যখন টেররিস্টের দলে ছিলুম স্বদেশি আন্দোলনের সময়, তখন এই জঙ্গলে তিনটে রাত কাটিয়েছিলুম। তখন বুঝেছিলুম, বিদেশি পুলিশের চেয়েও মারাত্মক হল দিশি মশা। এই জঙ্গলের

ভেতরেও একটা ধ্বংসাবশেষ আছে। সেইটাই হয়েছিল আমাদের আশ্রয়। বাড়িটার চারপাশ ভেঙে গেলেও মাঝখানটা আস্ত ছিল। সাদা পাথরের মেঝে। অবাক কাণ্ড, ছোট্ট একটা ঘরে এক দেবীমূর্তি, সিংহবাহিনী। মনের আনন্দে তিন দিন পুজো করলুম।

বহু দূরে একটা আগুন দেখা গেল। হরিশঙ্কর বললেন, যাক মনোবাসনা পূর্ণ হল। ডাকাতে আগুন পোহাচ্ছে, এইবার আমাদের জীবনে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে। নিজেদের একটু প্রস্তুত করে নাও।

কোথায় পালাবে তুমি তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়
অগস্ত্যেরও কাছে কখনও সে নোয়ায়নি ঘাড়॥

হরিশঙ্কর হনহন করে এগোচ্ছেন। ডাকাতদের সভা তাঁকে টানছে। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছেন। আমাকে প্রায়ই বলেন, নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলবে, কষ্টের মধ্যে ফেলবে, ঝুঁকি নেবে, বেরিয়ে আসবে লড়াই করে। একটু ক্ষতবিক্ষত হবে, হয়তো মরতে মরতে বেঁচে যাবে; কিন্তু বাঁচাটা শিখবে। পাখির মা বাচ্চাকে ওড়া শেখায়, দেখেছ নিশ্চয়? ডানার জোর নেই, কাক তাড়া করছে, পাখি উড়তে শিখছে। একটা-দুটো মরেও যেতে পারে। তবু এইটাই নিয়ম। বিপদের চেয়ে বড় শিক্ষক কেউ নেই। আলতো জীবন ওয়ার্থলেস জীবন। লিভ লাইক এ হিরো। স্বামী বিবেকানন্দের ওই ছবিটা দেখেছ? বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন বীর সন্ন্যাসী। জীবনের সামনে এই হল জীবনের দাঁড়াবার ভঙ্গি। দৃপ্ত, বেপরোয়া। লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,/নাচে তারা উন্মাদ তাণ্ডবে; মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!/করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিশ্বাসে প্রশ্বাসে/ তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!/ কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।/ সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

সন্ন্যাসী হবার প্রয়োজন নেই, সাহসী হও। হরিশঙ্কর রবীন্দ্রনাথের গলায় গাইতে লাগলেন, ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে॥ দীনতা হতে অক্ষয় ধনে, সংশয় হতে সত্যসদনে জড়তা হতে নবীন জীবনে নূতন জনম দাও হে॥ হরিশঙ্কর যা বিশ্বাস করেন, তা প্রতিফলিত করেন নিজের জীবনে। আমি তা পারি না। এক ধাতুতে গড়া হরিশঙ্কর, ছোটদাদু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ধাতুতে।

ছোটদাদু আমাকে ছেড়ে জোর কদমে হরিশঙ্করকে ধরে ফেললেন। আমি একটু পেছনে। চিরটাকালই আমি একটু গদাইলশকর ধরনের। খুব জোরে হাঁটতে পারি না। ভূত আর ডাকাতের ভয়ে চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব জোরে হাঁটার। তবু হাত দুয়েকের ব্যবধান। ভেতরটা হাঁকপাক করছে। স্বপ্নেও আমার একই অবস্থা হয়। ভয়ের পরিবেশে সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি দৌড়োবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পা চলছে না। শেষে হামাগুড়ি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছি চতুষ্পদ প্রাণীর মতো। তাও পারছি না। শেষে কান্না। আর তখনই ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় পড়ে থাকে পাথরের মতো ভারী একটা শরীর।

দুজনের বাক্যালাপ কানে আসছে।

ছোটদাদু: ডাকাতদের কী বলে সম্ভাষণ করবি? গুড মর্নিং!

হরিশঙ্কর: অবশ্যই। সেইটাই তো ফর্ম্যালিটি।

ছোটদাদু: কিছু নজরানা দিবি নাকি?

হরিশঙ্কর: ইনসাল্ট করা হবে। ডাকাতরা গ্রহণ করে না, কেড়ে নেয়। যার যা ধর্ম। সামনে গিয়ে দাঁড়াব। হকচকিয়ে যাবে। না চাইতেই শিকার।

ছোটদাদু: তারপর কী হবে?

হরিশঙ্কর: তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। হয় ঝটাপটি, না হয় বন্ধুত্ব।

দেখা গেল চারজন সাঁওতাল শুকনো পাতায় আগুন জ্বেলে কী একটা পোড়াচ্ছে। হরিশঙ্কর ভয়ংকর হতাশ হলেন। আগুনে ঝলসাচ্ছে বুনো একটা খরগোশ। ব্রেকফাস্টের আয়োজন। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলেন না হরিশঙ্কর। মনে হল, পারলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু নিজেই সিদ্ধান্তে এলেন— খরগোশ ইজ ডেড বাই দিস টাইম। সাদা ধবধবে একটা খরগোশ, গোল গোল উজ্জ্বল দুটো লাল চোখ, সৃষ্টির সৌন্দর্যশালার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের একটি, লাল আগুনে ঝলসে কালো।

হরিশঙ্কর প্রায় ছুটে পালিয়ে গেলেন। সাঁওতাল চারজন আমাদের গ্রাহ্যই করল না। একপাশে একটা বাঁশি পড়ে আছে, অদূরেই শুয়ে আছে শ্রান্ত তিরধনুক। সংগীত, হিংসা, ক্ষুধা, অগ্নি, সম্পূর্ণ এক জীবনদর্শন। সেই দর্শনে আতঙ্কিত হরিশঙ্কর বুদ্ধের মতো পলাতক।

ভোর হয়ে আসছে। গাছের পাতায় সামান্য সামান্য রুপোলি আলোর ছোঁয়া, যেন রাতের কেশপাশে দিনের বার্ধক্যের স্পর্শ। টিট টিট করে একটা পাখি দামি ঘড়ির অ্যালার্মের মতো বেজেই থেমে গেল।

ছোটদাদু আবার হরিশঙ্করের পাশে চলে গেছেন। দু'জনের বাক্যালাপ কানে আসছে। পায়ের তলায় শুকনো পাতার মচমচ শব্দ।

ছোটদাদু: ছুটে পালিয়ে এলি!

হরিশঙ্কর: সহ্য করা শক্ত। ন্যাচারাল ডেথ স্ট্যান্ড করা যায়, হত্যা অসহ্য। খরগোশ, পাখি, প্রজাপতি, আমার প্রিয় প্রাণী।

ছোটদাদু: জীবই তো জীবের আহার।

হরিশঙ্কর: এ হল মানুষের কথা। মানুষের সব কথাই মানুষের নিজের স্বার্থে।

ছোটদাদু: আহা! দর্শন থেকেই তো দর্শন।

হরিশঙ্কর: ঠিকই। কিলার্স ফিলোজফি। একদল বুদ্ধিমান, লোভী, ক্ষুধার্ত মানুষ জ্ঞানের কথা ধর্মের কথা দর্শনের কথা বলছে। সবই আপেক্ষিক, রিলেটিভ, সেলফিশ। কোনওটাই আমি বিশ্বাস করি না। নিজের কোলে ঝোলটানা কথা। সময়ের লাইব্রেরিতে ভাবনার সেলফ, দর্শনের পাখির বাসা, উড়ে গিয়ে বসলেই হল। আশ্রয়ের অভাব নেই। খুনিরও যুক্তির অভাব নেই। বুদ্ধই আমার আশ্রয়। নিরীশ্বরবাদী। বুদ্ধ কী বলছেন শোন।

হরিশঙ্কর নিমেষে এক ভাবলোকে চলে গেলেন। বিশাল বিশাল গাছ। মাথায় ভোরের আলো ধরেছে। অন্ধকার চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে নামছে। ঝিঁঝির কলরোল। পাখির টুইট টুইট। ধ্রুপদের মতো একটা পরিবেশ। হরিশঙ্কর বলছেন, জন্ম এক যন্ত্রণা, ক্ষয় এক যন্ত্রণা, রোগ এক যন্ত্রণা, মৃত্যুও এক যন্ত্রণা, দুঃখ, শোক, কাতরতা, বিলাপ, হতাশা, শুধু যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা। যা পছন্দ করি না তার মধ্যে পড়ে থাকা যন্ত্রণা, যা পছন্দ করি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও এক যন্ত্রণা। যা পেতে চাই তা না পাওয়া এক যন্ত্রণা, এই দেহ, পঞ্চভূতের

এই পিণ্ড যা শুধু ভোগ করতে চায়, সব যন্ত্রণার উৎস এই দেহ। তার আবার জীবনদর্শন! দর্শনের কথা আমাকে বলিসনি। যন্ত্রণার কথা বল, বল দুঃখের কথা।

ছোটদাদু প্রসঙ্গ থেকে সরে গেলেন। বললেন, ভোর হল। বেশ তাজা লাগছে। ভোরের ফোটা ফুলের মতো। একটা অভাব বোধ করছি, এইসময় এক কাপ গরম চা পেলে বেশ হত।

চল, সামনেই গ্রাম, কিছু মেলে কিনা দেখি।

গরম জিলিপি আর মোটা চা।

আমরা তরতর করে এগিয়ে চললুম। সিনেমা শেষ হওয়ার মতো ঝপ করে জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। বিশাল একটা ডাঙা। কোথা থেকে শীর্ণ একটা নদী জেগে উঠেছে। অপূর্ব দৃশ্য। রুপোর মতো আলো। ছোটদাদু মিছরির মতো মিষ্টিগলায় গেয়ে উঠলেন, তব চরণ ধোয়াবে শারদ-শিশির, শেফালি অর্ঘ্য দেবে/ ধরণী শ্যামল আসন বিছাবে, তুমি আসিবে যবে/ রক্ত উষাতে সিন্দূরের টিপ পরাবে মা তোর ভালে/ চাঁদিমা আরতি দিয়ে যাবে মাগো সুনীল গগন-তলে॥ কত শতশত কমল কুমারী তোমারে পূজিতে চাহে। দিকে দিকে তব আগমন-গীতি দোয়েল শ্যামা গাহে॥

হরিশঙ্করের রাত-জাগা সাত্ত্বিক মুখে অদ্ভুত একটা ভাব খেলা করছে। বিশাল প্রান্তর, শীর্ণ নদী, ভিজে ঘাস আর ওই গান। স্বাভাবিক জগতের। ভেতর থেকে আর একটা অন্য জগৎ বেরিয়ে এল। গানটা যেন ঠিক এই পরিবেশে এই সময়ে গাইবার জন্যেই রচিত হয়েছিল। ভৈরবীর মন কেমন করানো সুরে। জীবনের সব ভোর যদি এইভাবেই হত!

একটা কাজ করা যাক, নদীর জলে মুখ ধুয়ে নেওয়া যাক। হরিশঙ্কর বললেন।

ছোটদাদু বললেন, প্রকৃতির বড় কাজ কি সারার প্রয়োজন আছে কারও?

হরিশঙ্কর বললেন, আমার ডাক আসেনি।

ছোটদাদু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার?

ফাঁকা মাঠে প্রকৃতির ডাক? অসম্ভব ব্যাপার। ভাবাই যায় না। আমরা নদীর কিনারে চলে এলুম। টলটলে জল। অসম্ভব ঠান্ডা। দূর আকাশে ধূসর হয়ে আছে শুশুনিয়া। চানটা করে নিতে পারলে মন্দ হত না। ছোটখাটো একটা আলোচনাও হল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল, অতটা সময় দেওয়া যাবে না। লটঘট ব্যাপার। এইবার আমাদের এগোতে হবে মিলিটারি কায়দায়, দ্রুত পায়ে। মনে রাখতে হবে, আমরা চলেছি একটা পরিবারকে উদ্ধার করতে। বেড়াবার বিলাসিতা করতে নয়।

ডাঙাটা পেরিয়ে আসতেই একটা গ্রাম পাওয়া গেল। একটু শ্রীহীন। গাছের তলায় উনুন। উনুনে সাতসকালেই গুড় জ্বাল দিচ্ছে একদল নারী-পুরুষ। তালের গুড় তৈরি হচ্ছে। জায়গাটা পেরিয়ে এসে আমরা একটা পিচের রাস্তায় উঠলুম। হেলেদুলে ক্যাঁচকোঁচ শব্দে একটা গোরুর গাড়ি চলেছে। মনে হয় একটু পরেই গঞ্জের মতো কোনও জায়গা পাওয়া যেতে পারে। পাকা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। একটা ফুটবল খেলার মাঠ। উচ্চ বিদ্যালয়। সাইকেল আরোহী। সরকারি দপ্তর।

দোকানও পাওয়া গেল। পাওয়া গেল গরম জিলিপি আর মোটা চা।

ছোটদাদু বললেন, জিলিপি কিন্তু জোলাপের কাজ করে। সেই বুঝে খেয়ো।

হরিশঙ্কর বললেন, জিলিপির লোভ আমার নেই। চা হলেই হবে।

ছোটদাদু বললেন, এনার্জির জন্যে প্রয়োজন। সারারাত আমরা হেঁটেছি। রেলের ইঞ্জিন হলে এতক্ষণে কতটা কয়লা খেত!

বাইরে খাওয়া হরিশঙ্কর একেবারে পছন্দ করেন না, কিন্তু উপায় নেই। সেই জিলিপি আর চা। বাবু-খদ্দের দেখে দোকানদারের খুব খাতির। গরমজলে তিন-তিনবার গেলাস দেয়া হয়ে গেল। বেশ মজবুত চা এসে গেল। পাকা রাস্তা গঞ্জের বুক ফেঁড়ে দৌড় মেরেছে বিহারের দিকে। তারই পাশে এই দোকান। বেশ পরিচ্ছন্ন। দোকানের মালিক একসময় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। হরিশঙ্করের সঙ্গে জমে গেল খুব। শ্রম, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, এই তিন হল মন্ত্র। পৃথিবীতে কেউ কারও নয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা যেমন অদৃশ্য আকর্ষণে ঘুরছে, মানুষ মানুষের চারপাশে ঘুরছে স্বার্থের টানে। যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা। স্বার্থ ফুরোলেই তুমি কে? কে তোমার! বিবেক আর কর্তব্য ভুলো না। প্রত্যাশায় জলাঞ্জলি। সুখের চাবিকাঠি।

দুজনে মেতে উঠেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলোচনায়। নেতাজি, আই এন এ, হিটলার, ব্লিৎসক্রিগ। দু'জনের আলোচনা শুনলে মনে হবে, দু'জনে এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলেন। দোকানের মালিক তিন-তিনবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন শুনে হরিশঙ্করের ভীষণ দুঃখ। সেইভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি তিনি কেন হতে পারলেন না! বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেছেন। সেই সুযোগ একবারই এসেছিল বেনারসে। ছাত্রজীবনে। কাশীর বাড়ির তিনতলার ছাদে বাঁদরের সঙ্গে যুদ্ধ। একটা নয়, একদল। সুগ্রীব ভার্সাস হরিশঙ্কর। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে হরিশঙ্কর আর বানরাধিপ জড়াজড়ি করে গড়াতে গড়াতে সোজা একতলায়। জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি রেফারির অভাবে। হরিশঙ্করকে তিন দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়েছিল। ফিরে এসেছিলেন নাকের ওপরে কপালের মাঝখানে নিখুঁত অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। সেই চিহ্নটি স্থায়ী হয়ে আছে। সকলেই বলেন, শুভ চিহ্ন। শিবের দান।

ভদ্রলোক প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশ দিলেন। আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেখানে একটি আশ্রমে আধুনিক থাকার ব্যবস্থা আছে। আমরা ইচ্ছে করলে থাকতে পারি। ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা পথে নামলুম।

পাকা রাস্তার সুখ বেশিক্ষণ সহ্য হল না। নেমে আসতে হল কাঁচা পথে। ধানখেত, গমখেত, আমবাগান। পুকুর। এ দেশ হল পুকুর-থানার দেশ। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আমরা এসে গেলুম সেই গ্রামে। অজ গাঁ নয়। বড়মানুষের বসবাস আছে। বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষই কলকাতায় চাকরি করেন। পাকা বাড়ির সংখ্যা কম নয়। বড় স্কুল, হাসপাতাল আছে।

রাধাবিনোদবাবুর বাড়ি বলতে সকলেই চিনতে পারলেন। সুপুরুষ আলাপী মানুষ ছিলেন তিনি। উপকারী, দাতা। তবে? এই তবেটাই মারাত্মক। ছোট ভাইটা একটা জানোয়ার। যাবতীয় বদগুণের অধিকারী। কালীসাধকের ভেকধারী অকৃত্রিম এক শয়তান। বিয়ে করেননি। একজন ভৈরবী আছেন। সেই ভৈরবীই ওঠ-বোস করায়। সে দৃশ্য জীবনে ভোলার নয়। মানুষের হাতে মানুষের নির্যাতন। একটা উঠোন। উঠোন পেরিয়ে দাওয়া। চারজন প্রাণী হতাশ হয়ে বসে আছে। ছোট ছোট দুটি মেয়ে একটি ছেলে আর আমার পিসিমা। পিসিমার মাথায় পুরু একটা ব্যান্ডেজ। চারজন বসে আছেন, যাঁদের কাছে সবদিনই একরকম। কোনও আশার বাণী বহন করে আনে না। শুধু যন্ত্রণাই। যন্ত্রণারই রকমফের।

পিসিমা আমাদের দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, ছোড়দা তোমরা? ছোটমামা তুমিও এসেছ। পিসিমাকে অবিকল শ্রীশ্রীসারদামায়ের মতো দেখতে।

ছোটদাদু বললেন, আশা, মাথাটা ফাটালি কী করে?

আমাদের আগমন যেন ভোরের সূর্যের আলো। সেই আলো খেলছে আমার পিসিমার মুখে। কোনও উত্তর নেই। নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন। ইতস্তত করছেন। বড়মেয়ে জবাব দিল, ওই জানোয়ারটা চেলা কাঠ মেরে মায়ের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। সাতটা সেলাই পড়েছে।

পিসিমা মেয়েকে ধমক দিলেন, ছিঃ, কাকাকে জানোয়ার বলতে নেই কাঁদু।

না, বলবে না! মেয়ে যেন মা দুর্গা! কথায় সাংঘাতিক তেজ।

হরিশঙ্কর দপ করে উঠলেন, কোথায় সেই সোয়াইন? আমি আজ কীচক বধ করব।

ছোটদাদু বললেন, অতটা উত্তেজিত হোসনি। মাথা ঠান্ডা রাখ। আগে দেখতে হচ্ছে ওর শক্তি কতটা? দলবল কতটা ভারী?

হরিশঙ্কর বললেন, দল! যে নারীর গায়ে হাত তোলে সে কাওয়ার্ড। তার দলে যদি একশোজনও থাকে, মেরে ছাতু করে দোব। সে শক্তি আমার আছে। আই ক্যান ফাইট।

ছোটদাদু বললেন, আমি জানি তুমি তা পারো। তবে আমাদের আইনের কথা ভাবতে হবে। ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়লে চলবে না।

মামলা? এই মাথা ফাটানোর মামলা হবে না? তাকে তো এখনই অ্যারেস্ট করানো যায়।

না, যায় না। এখন আর যায় না। কারণ সঙ্গে সঙ্গে থানায় ডায়েরি করা হয়নি। তা ছাড়া এটা তার এলাকা। সাক্ষীসাবুদের প্রশ্ন আছে। হঠকারিতায় ফল ভাল হবে না। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দে।

তুই কী করবি? লবঙ্গ খাওয়াবি? কুলকুণ্ডলিনী জাগাবি?

কী করব তা জানি না। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

শোন, ধর্ম হল শৌখিন জিনিস। ফুল বেলপাতায় শয়তান সন্তুষ্ট হয় না। শয়তানের প্রয়োজন বেধড়ক ধোলাই।

প্রয়োজন হলে তাই হবে। তার আগে ভাবা দরকার আমাদের প্ল্যানটা কী? আমরা এখানে এসেছি কী কারণে?

এসেছি আমার বোনকে উদ্ধার করতে।

এই তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, উদ্ধার করো।

তার আগে এই মারের আমি বদলা নোব। হরিশঙ্করের একটাই মন্ত্র, টিট ফর ট্যাট।

উত্তেজনায় তুই ভুলে গেছিস, আশাকে আমরা এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি। ওর। বিষয়সম্পত্তি পাওনাগণ্ডা আমরা বুঝে নিতে এসেছি।

পিসিমা বললেন, সে তো আর হবার উপায় নেই ছোটমামা। সবই তো সই করিয়ে নিয়েছে।

কে সই করেছে?

এদের বাবা।

হরিশঙ্কর বললেন, তা হলে তো হয়েই গেছে। ফিনিশড্।

ছোটদাদু বললেন, তোরা দাওয়ায় বসে আছিস? ঘরে তালা? ব্যাপারটা কী?

কাল রাতে মেরে বের করে দিয়েছে আমাদের। ঘরে ঢুকতে দেবে না।

হরিশঙ্কর বললেন, তোদের জিনিসপত্তর?

পিসিমা করুণ হেসে বললেন, কী-ই বা আছে ছোড়দা! যা আছে সব ওই ঘরে বন্ধ।

সারারাত এইখানে আছিস?

কী করব ছোড়দা? আর তো কোনও উপায় নেই।

গ্রামের আর সব মানুষ কি মরে গেছে?

তাদের হাত করে ফেলেছে। সবাই ভয় পায়। তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক করে তো, হাতে খাঁড়া নিয়ে ঘোরে।

হরিশঙ্কর একটা হুংকার ছাড়লেন, তন্ত্রের নিকুচি করেছে। ভাঙো তালা।

ছোটদাদু বললেন, সেখানেও একটা আইনগত সমস্যা আছে রে? প্রপার্টি তো তার।

হরিশঙ্কর আগুনের মতো উত্তপ্ত, বললেন, আইন তা হলে সবসময় অপরাধীর দিকেই থাকবে! আর আমরা কেবল ধর্মের লেজ নাড়ব! এই দেশ থেকে যেদিন ধর্ম যাবে সেইদিন থেকে আমরা সুখে থাকব। তা হলে চলো সেই রাসকেলটাকে আগে খুঁজে বের করি। পাড়া-প্রতিবেশীকে ডাকি। ছোটদাদু দাওয়ার একপাশে বসে পড়লেন। হরিশঙ্কর উঠোনে খানিক পায়চারি করে নিলেন সম্রাটের মতো। আমার শরীরে আর কোনও বল নেই। একটা ঠেলা মারলেই পড়ে যাব। সারারাত জেগে, তার ওপর ওই প্রচণ্ড হাঁটা। পায়ের খিল খুলে যাওয়ার মতো অবস্থা। ছোটদাদুর পাশে থপাস করে বসে পড়লুম। জেলিফিশের মতো। আমার ভাইবোনেরা কেউই আমার সঙ্গে কথা বলছে না। সেই কতকাল আগে যখন ছাত্র ছিলুম তখন একবারই দেখা হয়েছিল কলকাতায়। বয়েস তখন খুবই কম। একেবারেই শিশু। তিনজনে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এখন কেউই আর শিশু নয়। বড় বোন কিশোরী। তারপরে সবাই বছরের ব্যবধানে সাজানো। অর্থাৎ মাথায় মাথায়।

হরিশঙ্কর দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছোটদাদুকে বললেন, তা হলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে, আমরা এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁ করে বসে থাকব সেই ধর্মাবতার, সেই মদ্যাবতারের আবির্ভাবের অপেক্ষায়। তিনি এসে কৃপা বর্ষণ করবেন!

পিসিমা বললেন, সে তো এখন সেই বাগদিপাড়ায় তার সেই মেয়েমানুষের ঘরে আছে। বারোটার আগে আসছে না। আসবে তার চেলাচামুণ্ডা নিয়ে। এই উঠোনেই হয়তো ছাগবলি হবে। ওরাই রাঁধবে। গেলাসে গেলাসে মদ ঢালা হবে। তখন আর আমরা ত্রিসীমানায় থাকি না। লাল ঢ্যালা ঢ্যালা চোখ। বিশ্রী গালাগাল। হাত ধরে টানাটানি।

হরিশঙ্কর বললেন, এখানে তোদের আপনার লোক বলে কি কেউ নেই! জ্ঞাত-গুষ্টি সব মরে গেছে? না রাধা এমন ব্যবহার করে গেছে যে কেউই আর তোদের ছায়া মাড়ায় না?

কার অত সাহস আছে ছোড়দা! সকলেই ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করে। তুকতাক করে দিলে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যাবে।

হরিশঙ্কর হাঁটুতে চাপড় মেরে বললে, উঃ, দেশটা কী কুসংস্কারে পড়ে আছে! জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্ল্যানিং সব ব্যর্থ। এই অন্ধকারে কিছুই ঢুকতে পারছে না। তা হলে তোদের আর এখানে রেখে লাভ কী?

Keep your fears to yourself, share your courage with others.

অদ্ভুত একটা বিষণ্ণ পরিবেশে আমরা থম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। সামনে কোনও পথ নেই। বরাত আর মানুষ, দু'তরফ হাতিয়ার ধরেছে। মেরে পাট করে দেবে। আমার পিসিমা আর বিমর্ষ ভাইবোনদের পাশে নিজেকে অপরাধীর মতো সুখী ও শৌখিন লাগছে। যেমন ড্রেস, সেইরকম ভোগীর মতো চেহারা আমার। শ্যাম্পু করা চুল। ফুরফুর কপালে খেলছে। পরিষ্কার, দামি জামাকাপড়। শহুরের জল আর দুধেল সাবানে রঙের জেল্লা। মনে শহুরে অহংকার। নিজেকে মনে হচ্ছে ত্রাণমন্ত্রী। বিমানে করে বন্যা-দুর্গতদের দেখতে এসেছি। কথা বলতে গেলেই গলায় এসে আটকে যাচ্ছে, বক্তৃতার মতো শোনাবে। বন্ধুগণ! কষ্ট করো, ত্যাগ স্বীকার করো। জীবন হল সংগ্রাম। যেমন বলেন আর কী ক্ষমতার আসনের নেতারা!

হরিশঙ্কর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, পেয়ে গেছি। পথ পেয়ে গেছি।

ছোটদাদু বললেন, তোমার পরিষ্কার মাথা। পথ তো পাবেই। জানতে ইচ্ছে করছে।

আমরা ডেকরেটরকে দিয়ে এই উঠোনে একটা প্যান্ডাল করাব। রাইট নাও। এখনই।

তাতে লাভ?

সেই প্যান্ডেলে আমরা বসবাস করব। পুরো বাজারটাকে তুলে এনে, বেশ বড় মাপের রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া লাগিয়ে দোব। ঘোর উৎসব। পালা করে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করব।

কী হবে তাতে?

হিংসেয় জ্বলেপুড়ে যাবে সেই মহাসাধক।

তাতে আমাদের কী মঙ্গল হবে হরিশঙ্কর?

পৃথিবীর দুটো দিক। একটা স্পিরিচুয়াল, অন্যটা মেটিরিয়াল। ইট, কাঠ, বালি, পাথর, চুন, সুরকি, দেহবল, অর্থবল, রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য। আমাদের এই লড়াই সেই তামসিকতার বিরুদ্ধে। এখানে তামসিক ঐশ্বর্যের স্রোত বইয়ে চোখ ঠিকরে দোব। যেখানেই অর্থ সেখানেই লোভীদের ভিড়। মানুষ তো ঐশ্বর্যের পদানত। ক্ষমতার পদানত। এখানে হরিনাম সংকীর্তনে কোনও কাজ হবে না। টাকা, ক্ষমতা, রাজসিক অহংকার!

তারপর! শেষটা কী হবে?

শেষে আমরা এই তালুক, মৌজা সব কিনে নোব।

অত ঘুরপথে না গিয়ে সরাসরি এখনই সেই শয়তানটাকে ডেকে কিনে ফেলো না।

না, ওকে আমি স্যান্ডউইচ করে মারব। চারপাশ থেকে ঘিরব। মামলায় জড়াব। এখান থেকে উৎখাত করবার জন্যে দাঙ্গা করবে। আমি ইচ্ছে করে আহত হব। মার খাব, ডায়েরি করব, মামলা ঠুকব। লোকটার শেষ দেখে আমি ছাড়ব। আমি ওর সঙ্গে সাংঘাতিক একটা কনফ্রন্টেশনে যেতে চাই। তার মধ্যে পাওয়ার

থাকবে, বুদ্ধি থাকবে, কূটনীতি থাকবে, আইন থাকবে, প্যাঁচ থাকবে। লোকটাকে একেবারে জেরবার করে মারতে হবে।

মশা মারতে কামান দেগে কোনও লাভ আছে? ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ!

হরিশঙ্কর বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সাবেক আমলের এইরকম একটা যুক্তিই আমি আশা করেছিলুম। পাশকাটানো পরামর্শ। এইভাবেই আমরা লোচ্চা ক্রিমিন্যালদের বাড়ার সুযোগ করে দিই। জেনে রাখ মহামানবদের মারতে কয়েক সেকেন্ড লাগে, কারণ এক অর্থে তাঁরা নির্বোধ, তাঁরা মানুষকে বিশ্বাসের ব্ল্যাঙ্ক-চেক দিয়ে রেখেছেন।

হরিশঙ্কর গলাটাকে সামান্য বিকৃত করে বললেন, ভালবাসা, প্রেম, বিশ্বপ্রেম, অমৃতস্য পুত্রাঃ! লিভিং ইন এ ফুলস প্যারাডাইস। পণ্ডিতমশাই ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীটা শয়তানের। মশা-মাছির মতো মহামানব মরেন, মহাত্মা গান্ধি, লিঙ্কন, মার্টিন লুথার। শ্রীচৈতন্যকে সমুদ্রে *ঠেলে* ফেলে দিলে, না জীবন্ত পাঁচিল তুলে দিলে আনারকলির মতো, সে রহস্য আজও রহস্য। অত প্রেম! যিশুখ্রিস্টকে কোলে করে ক্রুশে তুলে দিলে তোমার এই মানুষ শয়তানের দল! বিদ্যাসাগরের গায়ে কাদা ছেটালে। নন্দকুমারের গলায় ফাঁসির দড়ি লটকে দিয়ে এল এক ব্রাহ্মণ। মশা মারা খুবই কঠিন কাজ রে! মশারাই থাকে, সহজে নির্মূল হয় না। তোর আর আমার রক্তেই তাদের প্রজনন, বংশবৃদ্ধি। ঝাঁকে ঝাঁকে এই মশাটিকে মারার জন্যে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করব। আমার এক ফোঁটা রক্ত ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু হিজ ওয়ান বাকেট। এই জেলার এই মাটিতে আমি একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে যাব। ফর এজেস টু কাম, মানুষ মনে রাখবে নারী হল শক্তি। শক্তির অপমানে নির্যাতনে ধ্বংস হতে হয়। একথা তোমার শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্রেই আছে, হয় না কিছুই। নির্বিচারে নারী-নির্যাতন হয়েই চলেছে। ভাগ্য নিয়ে দেহ নিয়ে খেলা। সেই শাস্ত্রবাক্যের একটা উদাহরণ আমি রেখে যাব। মুরগির মতো সেই জানোয়ারের পালক ছাড়াব। হরিশঙ্কর এখন বিষধর কেউটে। সেই কেউটের লেজে পা পড়েছে।

অশান্ত হরিশঙ্কর পায়চারি শুরু করলেন আবার। ব্যায়াম করা চকচকে শরীর ফুলে উঠেছে। বাঘের মতো বিক্রম। এ সেই ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময়ের চেহারা। রাত বারোটার সময় আমাদের পাড়া আক্রান্ত হল। হাতে একটা শোর্ড নিয়ে হরিশঙ্কর বেরিয়ে এলেন। সেইসময় তিনি ডুমার বই খুব পড়ছেন, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো, ব্ল্যাক টিউলিপ। সেই শোর্ড ফাইটের সুযোগ সেদিন এসেছিল। নেতৃত্ব দেওয়ার কী ক্ষমতা! সমস্ত পাড়া তাঁর পেছনে। ক্লাবের ছেলেরা। হাতে হারোয়া খেলার লাঠি। মরচে-ধরা তরোয়াল। ঘরে ঘরে নারীবাহিনী বঁটি কাটারি হাতে প্রস্তুত। তেমন প্রয়োজন হলে জহরব্রতের জন্যে টিন টিন কেরোসিন মজুত। হরিশঙ্করের নিজের তৈরি মলোটভ ককটেল। বাংলায় বোতল বোমা। স্বদেশি চেতনায় সবাই টগবগ করছে। ইংরেজ দ্বিজাতি-তত্ত্বর তরোয়াল চালিয়ে দেশ টুকরো করতে চাইছে। যারা এতকাল পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে বন্ধুর মতো, তারাই ধর্মের দোহাই পেড়ে ছুরি ধরেছে। কলকাতায় এক ধর্মের মানুষ। স্লোগান দিচ্ছে
— ঠোঁট মে বিড়ি, মু মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।

সেই হরিশঙ্কর আজ বেরিয়ে এসেছেন আবার বাঁকুড়ার মাটিতে। এবার তাঁর স্ট্র্যাটেজি ভিন্ন। ধর্মের নামে কত অধর্ম তিনি দেখেছেন। ধর্মের নামে ব্যভিচার তিনি দেখেছেন। দেখেছেন সাধুর ক্ষমতার লড়াই। দেখেছেন আশ্রমে ভোগের জীবন। দেখেছেন ধনীর খাতির, গরিবের প্রতি অবহেলা, দুঃসহ ঘৃণা। যে-কারণে তিনি গুরু

গ্রহণ করেননি। পাহাড়ে গেছেন, জঙ্গলে গেছেন, কখনও কোনও আশ্রমে যাননি। কখনও কখনও এই সাধক ছোটমামাকে গুরু হিসেবে মেনেছেন। দীক্ষা গ্রহণ করেননি। অভিমত, কানে ফুসমন্তরে ধার্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম মনে গ্রহণ করতে হয়। সেটা একটা টোটাল প্রসেস। কমপ্লিট রূপান্তর। বাঘকে হরিণ হতে হবে। খাদককে হতে হবে খাদ্য। দস্যুকে হতে হবে প্রেমিক। অর্ধমানব অর্ধদানব হলে হবে না।

সেই অশান্ত হরিশঙ্কর সামনে ঘুরপাক খাচ্ছেন। প্রশান্ত ছোটদাদু বসে আছেন ছোটখাটো একটা টিলার মতো। অচঞ্চল। হরিশঙ্কর আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, তা হলে তোমরা আমাকে কেউ সমর্থন করছ না? একলা চলো রে! তাই তো! ছোটদাদু মৃদু হেসে বললেন, ঠিক তা নয়। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি তোর শান্ত হওয়ার অপেক্ষায়। তোর চিন্তা, বোধ, বুদ্ধি সব আচ্ছন্ন হয়ে আছে এই মুহূর্তে। এই ধোঁয়াটা কেটে গেলেই তুই দেখতে পাবি, তোর পথটা কত জটিল। সময় অর্থ শ্রমের অপচয়। তখন তোর মাথা থেকেই অন্য পথ বেরোবে। যা স্বাভাবিক, যুক্তিপূর্ণ।

হরিশঙ্কর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, আমাদের স্বার্থপরতাই এই পরিবারটাকে অস্তিত্বের শেষ সীমায় নিয়ে গেছে। কখনও সেভাবে খবর নেওয়া হয়নি। বছরে দু-চারটে পোস্টকার্ড চালাচালি। আশা করি ঈশ্বরের কৃপায় সকলে কুশলে আছে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। উত্তরের অপেক্ষায় রইলুম। হয়ে গেল। কর্তব্য শেষ। পাহাড়ে যাই, সমুদ্রে যাই, লুচি মোহনভোগ খাই। দামোদর পেরিয়ে বোনকে দেখতে আসি না। বিয়ে হয়ে গেছে, আর তার খবর রাখার প্রয়োজন কী? মরল না বাঁচল!

পিসিমা ঝেড়েঝুড়ে উঠে দাঁড়ালেন, ছোড়দা শান্ত হও। ভাগ্য মানতেই হবে। চিরটা কালই তো আমার এইভাবেই কাটছে। তুমি কী করবে! যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল, তিনি তো খারাপ ছিলেন না। অসুখেই সব শেষ করে দিলে। ভগবান যাকে মারবেন, মানুষ তার কী করবে! আমি জল আনি, তোমরা হাত-পা ধোও। আমি চা জলখাবারের ব্যবস্থা করি।

হরিশঙ্কর বললেন, সেটা কীভাবে সম্ভব হবে! তোর তো কিছুই নেই। শ্মশানে বসে আছিস ধূমাবতী হয়ে।

তিন দিন আগে গলার চেন বাঁধা রেখে কিছু টাকার জোগাড় করেছিলুম তোমার কাছে যাব বলে। মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে যাই কী করে! তাই অপেক্ষা করছিলুম। এখন তোমরা এসে গেছ, আর ভয় কী! নতুন হাঁড়িতে ভাতেভাত চাপাই। দেখি ঘি পাওয়া যায় কি না! চা চিনি কিনে আনি।

হরিশঙ্কর বললেন, তোকে কিছু করতে হবে না। সব আমরা করছি। শুধু সেই রাসকেলটা এখনও আসছে না কেন? লোহা গরম থাকতে থাকতেই ঘা মারতে হয়।

ছোটদাদু বললেন, মুখ হাত পা তো ধুতেই হবে হরিশঙ্কর, আর একটা অবশ্য করণীয় কাজ তুমি ভুলে গেছ। দাঁত মাজা। গাবভ্যারেন্ডার বেড়া দেখতে পাচ্ছি। দাঁতনের অভাব হবে না।

হরিশঙ্কর বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। দাঁত মাজাটা বাকি আছে।

দাওয়ার এক পাশে একটা বালতি ছিল। পিসিমা সেই দিকে এগোলেন। ছোটদাদু বললেন, আশা, তোর মেয়েকে বল না। জল আনবে কোথা থেকে? টিউবওয়েল?

ও পারবে না ছোটমামা। পাতকোটা খুব বড় আর অনেক নীচে জল।

তা হলে আমরাই কেন যাই না!

পিসিমা বললেন, তুমি তো জানো আশা কীরকম খাটতে পারে! মাথার চোট আমাকে কাবু করতে পারবে না।

পিসিমা বালতি হাতে বাড়ির পেছন দিকে চলে গেলেন। হরিশঙ্করের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা ছুরি বেরোল। বিদেশি জিনিস। শেফিল্ডে তৈরি। চকোলেট রঙের বাঁট। পেতলের কাজ করা। খুবই লোভনীয়। জিনিসটা হরিশঙ্করের বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো। পকেটে পকেটে ঘোরে। ফলকাটা, গাছের ডাল কাটা, সবেতেই লাগে। এইসব কাজে হরিশঙ্করের নিপুণতা তুলনাহীন। সব কাজেই হরিশঙ্কর অসাধারণ দক্ষ। তিনি বলেন, কাজের চেয়ে কাজের ফিনিশই বড় কথা। যেমন শিক্ষার সঙ্গে সংস্কৃতি।

হরিশঙ্কর দাঁতনের জন্যে ডাল কাটতে গেলেন। ভেঙে নিলেই হয়। কিন্তু না, তা হবে না, নিখুঁত করে কাটতে হবে। ছুলতে হবে। একটা ডাল কেটেছেন। দাঁড়িয়ে আছি পাশে। ডাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস ঝরছে। হঠাৎ পিসিমা প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন। মুখে চোখে ভয়ংকর এক আতঙ্ক। যেন ভূত দেখেছেন।

আমাদের কাছে এসে প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন।

হরিশঙ্কর বললেন, কী হল আশা? ওরকম করছিস কেন?

পিসিমা ধরাধরা গলায় বললেন, পাতকোর মধ্যে।

পাতকোর মধ্যে কী?

কী একটা রয়েছে।

কী একটা রয়েছে মানে? জল ছাড়া আর কী থাকবে?

একটা মানুষ।

মানুষ। কী করছে মানুষ? চান করছে।

মরা মানুষ।

সেকী?

আমরা সবাই ছুটলুম কুয়োতলার দিকে। শ্যাওলা শ্যাওলা একটা জায়গা। কয়েকটা ইট এলোমেলো পাতা। একপাশে বিশাল একটা ছাইগাদা। বড় বড় মান গাছ। বিশাল একটা কঁঠাল গাছ। খা খা করে কাক ডাকছে। হঠাৎ একটা কাক ক্রাঙ্ক ক্রাঙ্ক করে ডাকতে লাগল। কাক সাধারণত এইভাবে ডাকে না। ছোটদাদু আমাকে বললেন, শুনছ? ভীষণ অমঙ্গলের ডাক। কাক সব জানিয়ে দেয়। অদ্ভুত এক পাখি। কাকের ডাক নিয়ে আমাদের শাস্ত্রে অভ্রান্ত গবেষণা আছে, কাকতত্ত্ব।

তিন পাশ থেকে আমরা পাতকো দেখতে লাগলুম ঝুঁকে। পাতকোর বেড় বিশাল। ইঁদারার মতো। তেমনই গভীর। বাঁকুড়া খুব শুকনো জায়গা। জলের খুব কষ্ট। অনেক নীচে জল। সেই জলে ভাসছে সাদা কাপড়। একটা চুলঅলা মাথা। তালের ফেঁপলের মতো। সব তালগোল পাকিয়ে আছে। বেশ বোঝা যায়, ওঠার জন্যে হাঁচোড়পাঁচোড় করে এলিয়ে পড়েছে একসময়। মাথার ওপর সূর্য। ফলার মতো কিরণ পড়েছে। ভেতরটা বেশ স্পষ্ট। দশাসই একজন মানুষের সলিল-সমাধি। জলের ভেতরে একটা লালের আভা।

মানকচুর ঝোপে একটা কিছু ভয়ংকর চকচক করছে। দেখা গেল, সেটা একটা টিনের খাঁড়া। একজোড়া খড়ম পড়ে আছে একপাশে। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সেই কাক তারস্বরে চিৎকার করছে, ক্রাঙ্ক

ক্রাঙ্ক। হরিশঙ্কর যার পালক ছাড়াতে চেয়েছিলেন, সে ওই কূপে মৃত।

প্রথমে কথা বললেন ছোটদাদু, এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! হয় নিজেই ঝাঁপ মেরে আত্মহত্যা করেছে, না হয় কেউ মেরে ফেলে দিয়ে গেছে। পুলিশ কেসের ব্যাপার।

হরিশঙ্কর বললেন, আমাদের এখন কী করা উচিত?

ছোটদাদু পিসিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা তো সারাটা রাতই ওই দাওয়ায় ছিলিস, এত বড় একটা জিনিস কুয়োয় পড়ল, তোরা কোনও শব্দ পেলি না।

পিসিমা ভয়ে ভয়ে বললেন, আমরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আর এটা তো বাড়ির পেছন দিক।

হরিশঙ্কর বললেন, আমাদের এখন থানায় যাওয়া উচিত।

ছোটদাদুর চেহারা, গলা সবই হঠাৎ পালটে গেল। একেবারে অন্য মানুষ। চাপা গলায় বললেন, কোনও চিৎকার চেঁচামেচি না করে সব ওদিকে চলো। মনে করো, তোমরা এটা দেখোনি। তোমরা কিছুই জানো না।

আমরা এইবার চোরের মতো অপরাধীর মতো দাওয়ায় এসে বসলুম। ঝলমলে দিন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গভীর রাত। গভীর এক ষড়যন্ত্রে বসেছি আমরা। আমরাই যেন খুনি। বেশ বোঝা যাচ্ছে, হরিশঙ্কর কোনওরকমে নিজের ভয়ংকর উত্তেজনা চেপে রেখেছেন। আমি জানি তিনি কী চাইছেন! এখনই ওই মৃতদেহ তোলার ব্যবস্থা করতে চাইছেন। মানুষটির প্রতি রাগ-দ্বেষ যা ছিল আর নেই। এখন আছে মৃতের প্রতি কর্তব্য, শেষ সংস্কার। মৃতের কোনও জাত নেই। পাপ-পুণ্য নেই।

হরিশঙ্কর বললেন, থানায় খবর দিলে ক্ষতিটা কী? যতই হোক আমাদের একজন আত্মীয়!

ছোটদাদু বললেন, একটু আগেই তো তুমি কীচকবধ করতে চেয়েছিলে।

মৃতের কোনও শত্রু থাকে না।

তুমি যা ভেবেছিলে, এখন কাজে তাই হয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্পর্ক— হত আর হত্যাকারী।

হরিশঙ্করের বিস্মিত প্রশ্ন, আমরা হত্যাকারী?

সন্দেহটা প্রথমে আমাদের দিকেই আসবে। পুলিশ আমাকে ধরে টানাটানি করবে। আমাদেরও জড়াবে। এই দাওয়া, ওই ইঁদারা। অত বড় একটা শরীর পড়ল, শব্দ হল, কেউ শুনতে পেল না। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হবে? আদালত মানবে!

তুমি খুন ভাবছ কেন? অ্যাক্সিডেন্টালি পড়ে যেতেও তো পারে!

ভুলে যেয়ো না আশা বসে আছে শত্রুপুরীতে। জমিজমা, বিষয়সম্পত্তি অতি ভয়ংকর জিনিস। মানুষের আদিম লোভের একটি। এই মৃত্যুর পর এদের জমিজমার কে মালিক হবে? কে হতে চলেছে! তোমাকে একটা কথা বলি, মানবতা, কর্তব্য এইসব ভুলে, এখনই যে যে-অবস্থায় আছ বেরিয়ে পড়ো, বাঁচতে যদি চাও। বিশাল বিশ্রী এক ঝামেলা আসছে। হরিশঙ্কর, জেল জিনিসটা খুব সুখের নয়। জায়গাটাও খুব খারাপ। স্বদেশি করার সময় আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। ভাগ্য ভাল এখনও কেউ আসেনি। আগে এখান থেকে বেরিয়ে চলো, তারপর বলব চক্রান্তটা কী? আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার অনুমান মিথ্যে হবার নয়।

হরিশঙ্কর ভয়ংকর অবাক হয়ে বললেন, সেকী পালিয়ে যাব? ভয়ে পালাব?

ছোটদাদু বললেন, কার ভয়ে তুমি পালাচ্ছ হরিশঙ্কর! কেউ কি তোমাকে ভয় দেখিয়েছে?

মানুষ নয়, ভয় দেখাচ্ছে আশঙ্কা।

তুমি ভয়ে পালাচ্ছ না, পালাচ্ছ বুদ্ধিমান বলে। নির্বোধ নয় বলেই আমরা ফাঁদে পা দিচ্ছি না।

আমরা অপরাধী নই, তবু একদল খুনির মতো বেরিয়ে এলুম সেই ভিটে ছেড়ে। কেবলই মনে হচ্ছে, কেউ দেখছে না তো! কেউ হঠাৎ জিজ্ঞেস করবে না তো, যাচ্ছ কোথায়? কেউ ফিরে তাকালে অস্বস্তি হচ্ছে।

ছোটদাদু বললেন, ভাগ্যের পরিহাস। সত্যিই আমাদের অপরাধীর মতোই পালাতে হবে। কারও চোখে যেন না পড়ে যাই। একটু ছাড়া ছাড়া হাঁটো সবাই। দল তৈরি কোরো না।

হরিশঙ্কর বললেন, আবার কি আমাদের হেঁটেই যেতে হবে? জঙ্গলের পথ ধরে!

না। ও পথের শেষ মাথায় অমঙ্গল বসে আছে। এবার আমরা রেলে ফিরব।

স্টেশনের দিকে এগোলুম আমরা। আমাদের নিয়ে কারওই তেমন মাথাব্যথা নেই। আমরা চলেছি আমাদের মতো। মনে কিন্তু অদ্ভুত একটা ভয় কাজ করছে। মৃত্যু মানুষকে কেন এত ভয় দেখায়?

An animal with some instincts of a God,
His life a story too common to be told.

হরিশঙ্কর বেশ নিজের মনেই হাঁটছিলেন, হঠাৎ থেমে পড়লেন। পাদমেকং ন গচ্ছামি। ছোটদাদু বললেন, আবার কী সমস্যা?

হরিশঙ্কর বললেন, কোনও পরিস্থিতি থেকে কখনও আমি পলায়ন করিনি, আর সবচেয়ে বড় কথা হল, ট্রুথ ইজ ট্রুথ। সত্য হল, আমরা খুনি নই, তা হলে আমরা কেন সিচুয়েশন ফেস করব না! দিস ইজ কাওয়ার্ডিস!

ছোটদাদুর মুখে খেলা করে গেল সেই উদ্ভাসিত হাসি। আমরা গ্রামের সীমানার বাইরে চলে এসেছি। মন্দির, মসজিদ, পাম্প হাউস সব পেছনে ফেলে এসেছি। ফেলে এসেছি সায়েবকুটি বলে বিশাল এক বাগানবাড়ি। স্বদেশি আমলের চরকা প্রতিষ্ঠান। এখন যেখানে মেয়েদের তাঁত শেখানো হয়। হাতের কাজ শেখানো হয়। স্বদেশি কাগজ আর সাবান তৈরি হয়। সব পেছনে ফেলে এখন আমরা শুধু প্রান্তরে। রোদে চারপাশ দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী দুর্গতি আমাদের! চামড়া পুড়ে কালো হয়ে আসছে।

ছোটদাদু বললেন, আমরা ওই ছায়ায় একটু বসি। তোদের একটু বোঝানো দরকার পরিস্থিতিটা কী দাঁড়িয়েছে। খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

বাঁ পাশে মাঠের মাঝখানে ঝাঁকড়া একটা গাছ। ভাঙা একটা ঘর। কোনও সময় কিছু একটা ছিল। আমরা সেই দিকে এগিয়ে চললুম। হরিশঙ্কর লক্ষ্মী ছেলের মতো কেন এগিয়ে যাচ্ছেন আমি জানি। ওই ভাঙা বাড়ি। একটা সমাধি মতে রয়েছে পাশে। অতীত ডাকছে ইশারায়, ডাকছে অখ্যাত ইতিহাস। কেউ ছিল একদিন। কে তিনি? হরিশঙ্করের জানা চাই। লতাপাতার ইতিহাসে পড়ে আছে কারও পরিত্যক্ত সংসার। আমরা সকলেই বসে পড়লুম হরিশঙ্কর ছাড়া। তিনি সেই ভগ্ন কুটিরের ইতিউতি উঁকি মারতে লাগলেন।

ছোটদাদু বললেন, তুই তাড়াতাড়ি তোর অনুসন্ধান শেষ করে এদিকে আয়।

হরিশঙ্কর খুঁজে খুঁজে ঠিক একটা প্রস্তরফলক আবিষ্কার করলেন। উদ্ভাসিত মুখে বললেন, পেয়ে গেছি। সবই অস্পষ্ট, নামটা কোনওরকমে পড়া যায়, স্বামী তপানন্দ। এখানেও সন্ন্যাসী। ধর্মের এলাকা থেকে বেরোবার উপায় নেই। যেদিকেই যাও ধর্ম।

ছোটদাদু বললেন, বেশ হয়েছে, এখন চলে এসো।

হরিশঙ্কর এসে বসেই বললেন, তপানন্দ কে?

ছোটদাদু বললেন, নিশ্চয় কোনও সন্ন্যাসী।

তাঁর চেলারা কোথায়? এইভাবে একটা সাধনপীঠ নষ্ট হয়ে গেল!

কত পীঠ এইভাবে নষ্ট হয়, ও নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নেই। তুমি আসল সমস্যায় এসো।

হরিশঙ্কর গুছিয়ে বসলেন। ছোটদাদু পিসিমাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা আশা, তুই আমাকে একটা সত্যি কথা বল, তুই তোর ঠাকুরপোকে ঠেলে ফেলে দিসনি তো?

হরিশঙ্কর লাফিয়ে উঠলেন, সে কী? আশা ঠেলে ফেলবে কেন? আশা খুনি? অসম্ভব! তুমি ভুল পথে যাচ্ছ। ঠিক হচ্ছে না।

পিসিমার মুখ ভয়ে সাদা। থেমে থেমে বললেন, এ তুমি কী বলছ ছোটমামা! অত বড় একটা মানুষকে ঠেলে ফেলা সম্ভব।

মাতালকে ফেলা সম্ভব। বিয়ের আগে পর্যন্ত তুই ডাকাবুকো ছিলিস। সত্যি কথা বল। তুই খুব রাগী। রেগে গেলে তোর জ্ঞান থাকে না। একবার তুই আমাদের জানলার গরাদ বাঁকিয়ে দিয়েছিলিস।

পিসিমা ছোটদাদুর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বিশ্বাস করো, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, আমি কিছু জানি না।

তুই কোনও শব্দ পাসনি!

সত্যি পাইনি।

ছোটদাদু ছেলে আর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা কোনও শব্দ পাসনি?

তিনজনেই বললে, না। কোনও শব্দ শোনেনি।

হরিশঙ্কর বললেন, তুই কোনও ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার হলে মিজারেবলি ফেল করতিস। এটা একটা জেরা হচ্ছে?

ছোটদাদু বললেন, এদের ঘুম তা হলে কুম্ভকর্ণের ঘুম।

বলেই ছোটদাদু লাফিয়ে উঠলেন। আমি ভাবলুম পিপড়ে কামড়েছে। না, তা নয়।

ছোটদাদু বললেন, ইঁদারায় তা হলে একজন নয়, দু'জন পড়েছে।

হরিশঙ্কর বললেন, ফ্যান্টাসটিক ইম্যাজিনেশন। একা রামে রক্ষা নেই, দোসর লক্ষ্মণ। আর একজন কে? এ ধারণাটা তোর এল কোথা থেকে?

আমি একটা লাল কাপড় দেখতে পেয়েছি। সেটা একটা শাড়ির অংশ।

তার মানে?

মানে ভৈরব আর ভৈরবী দু'জনে জড়াজড়ি করে পড়েছে।

অসম্ভব। দু'জনের জায়গা হতেই পারে না।

অবশ্যই পারে। একজনের ওপর আর একজন। ঘটনাটা আমি দেখতে পাচ্ছি। ওই ভৈরবী ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল। ভৈরব তার শাড়ির আঁচল টেনে ধরেছিল। একজনের ভারে আর একজনও তলিয়ে গেল।

হরিশঙ্কর হাসলেন, তোর কাব্যপ্রতিভা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু গোয়েন্দা গল্প লেখার ক্ষমতা একেবারেই নেই। দু'জন পড়ল, যে-কোনও একজন তার ঘাড়ে পা রেখে উঠে দাঁড়াত। সে বেঁচে থাকত। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করত। বেশ! হাতে পাঁজি মঙ্গলবার করে তো লাভ নেই, চলো তা হলে, ফিরে গিয়ে থানায় ইনফর্ম করি। দেখা যাক ক'জন ওঠে, একজন না দু'জন। কেস কোথায় গড়ায় চলো দেখি।

একটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে অত বড় একটা ঝুঁকি নেওয়া যায় না। যদি ভৈরবী ইঁদারায় থাকে, আশার ওপর পুলিশের সন্দেহ পড়বে না। আর ভৈরবী যদি বেঁচে থাকে, আশাকে নিয়ে টানাটানি হবেই।

কেন হবে?

খুব সহজ। পুরো সম্পত্তিটা ভৈরবী দানপত্র করে নিয়েছে।

যদি সম্পত্তিটা নিজের নামে করিয়েই নিয়ে থাকে তা হলে খুনের কী প্রয়োজন?

দখল নেবার জন্যে।

শোন, তুই আধ্যাত্মিক লাইনের লোক, জাগতিক ব্যাপারে মাথা ঘামাসনি। শোন, আশাকে নিয়ে তোরা কলকাতায় চলে যা, আমি ব্যাপারটার শেষ দেখে যাই।

তোকে আর শেষ দেখতে হবে না। অনেক কিছু আছে যার শেষটা না দেখাই ভাল।

আমার এই পালিয়ে যাওয়াটা ভাল লাগছে না। ভীরু কাপুরুষ মনে হচ্ছে নিজেকে।

কিছুকাল আগে তুই ছেলেকে ছেড়ে পালিয়েছিলিস।

ওটা পালানো নয়, ওটা ছিল শিক্ষা দেওয়া। স্বাবলম্বী করার শিক্ষা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা।

ঠিক আছে, এখন চল। আমাদের যাত্রা শুরু করা যাক।

শোন, তোর ভুল ধারণাটা ভেঙে দিই। ইঁদারায় একজনই আছে। দু'জন নয়। দেহটা ভাসছে। তলায় আর একটা দেহ থাকলে ওইভাবে ভাসতে পারত না। জলের ঊর্ধ্বচাপ অতটা কাজ করতে পারত না। দিস ইজ সায়েন্স। আনন্দের কারণ নেই। ভৈরবী বেঁচেই আছে।

পিসিমা বললেন, ছোড়দা, আমরা চলে গেলে কোনও অন্যায় হবে না। তুমি আর ওই গ্রামের নোংরামির সঙ্গে জড়িয়ে পোড়ো না। সবাই গেঁজেল আর মাতাল। আমাদেরই জমি চারপাশ থেকে দখল করে বসে আছে। ওখানে বেড়া চলে চলে বেড়ায়। আজ দেখলে ওখানে, সকালে উঠে দেখলে তিন হাত সরে এসেছে তোমার জমির ভেতরে। ক্ষমতা থাকে লড়াই করো। মাথা ফাটাফাটি, রক্তগঙ্গা। ওই ইঁদারাটা ওকে টানত। কেন জানো তো! সাত বছর আগে বুড়ো বাপকে পাঁজাকোলা করে ওর মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, বুড়ো মরছে না বলে। মদের ঘোরে। তারপর থেকেই মাঝরাতে ইঁদারার পাড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে কাঁদত, বাবা, তুমি কী করছ ওখানে! উঠে এসো। তোমার জন্যে কাঁঠালি কলা এনেছি। ও তো আগে এইরকম ছিল না। মিলিটারিতে কাজ করত। এতখানি চেহারা ছিল। তারপর অসৎসঙ্গে পড়ে, মদ, ভাং, জুয়ায় এইরকম হয়ে গেল। আত্মহত্যাই করেছে ছোড়দা। মনটা তো খুব নরম ছিল।

আমরা আবার রাস্তায় এসে উঠলুম। আমাদের মুখ স্টেশনের দিকে। হরিশঙ্করের মুখ ছেড়ে-আসা গ্রামের দিকে। ছোটদাদু ভাবলেন হরিশঙ্কর দিক ভুল করেছেন। বললেন, তুই যে উলটো দিকে চললি। স্টেশন তো এই দিকে!

হরিশঙ্কর চলা শুরু করে দিয়েছেন। চলতে চলতে বললেন, দিক ভুল করিনি। যেদিকে যাওয়ার সেই দিকেই চলেছি। ফলো মি।

ছোটদাদু ভীষণ অবাক হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী করতে চাইছে বলো তো?

কিছুই বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণ ধরে এতভাবে বোঝালুম, কিছুই ঢুকল না কানে।

দ্রুত এগিয়ে গেলেন ছোটদাদু, কী করতে চাইছিস?

হরিশঙ্কর বললেন, তুমি মামলায় হেরে গেছ। আমাকে অনুসরণ করো।

অনুসরণ করে?

সোজা থানায়। আমরা ছ'জন। ওরা ছিল দু'জন। এখন একজন। একা সেই ভৈরবী। আমরা হেরে যাব? তোমাকে দেখাতে চাই, সত্যের জয়। তুমি ধার্মিক, ঐশী শক্তির অধিকারী। তোমাকে দেখাতে চাই ধর্মের জয়। চোরের মতো পা টিপে টিপে পালাব। পালিয়েও শান্তি নেই, সর্বক্ষণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। এই বুঝি পুলিশ এল। ধরে নিয়ে গেল খুনের দায়ে। তোমার কোনও ভয় নেই। আমার সঙ্গে চলো। আমার আত্মবিশ্বাস জয়ী হবেই। আমি যদি এই সিচ্যুয়েশন ফেস না করি, আমার বিবেক আমাকে সারাজীবন ঘুমোতে দেবে না। বিবেক হল মেরুদণ্ড। তোমার এত কেন ভয়!

ছোটদাদু কিছুক্ষণ গুম মেরে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক বলেছিস। ভীরুতাই পাপ। ভীরুতাই অধর্ম। যা হবার তা হবে। চলো, লেট আস ফেস দি সিচ্যুয়েশন।

আবার মাইল দু'য়েক হাঁটতে হবে ভেবে আমার কান্না পেয়ে গেল। সারারাত জেগে। চান হয়নি। দানাপানি পড়েনি পেটে। রোদে সব ঝলসে যাচ্ছে। এই উদ্বেগ, এই উৎকণ্ঠা। জীবনের এইসব মুহূর্তে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। ঘটনা থেকে পালাতে না পারলে দেহ থেকেই পালানো ভাল। সে উপায়ও তো নেই। মৃত্যু ও হরিশঙ্কর সমান একগুঁয়ে। কারও কথা শোনে না। থানা, হাসপাতাল, সরকারি দপ্তর, কোর্টকাছারি, আমার ভেতরে অদ্ভুত এক অসুস্থ ভাব আনে। কী কুক্ষণেই আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। ছোটদাদু এমন একজন অলৌকিক পুরুষ। মা কালীর সঙ্গে যাঁর সরাসরি যোগাযোগ, তাঁর শক্তিও বেকায়দা। মানুষ যে-ঘটনা ঘটাবে, যে-চক্রান্তে ফেলবে, সেখান থেকে বের করার ক্ষমতা ভগবানের নেই। ভগবান অতিশয় শৌখিন এক বড়বাবু। সুখীর সঙ্গ করেন। যে-মানুষ বিপদে পড়েছে তাকে বিপদের বিচারেই ছেড়ে দেন। ভাল যার হয় তার নিজের শক্তিতেই হয়। আশ্রমের ছবি মন্দিরের ছবি চোখের সামনে ভাসছে। একদল আর্ত কাতর নরনারী। জীবনের মুড়ো ঝ্যাঁটায় ক্ষতবিক্ষত। মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, বড়লোকের চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, এক চেহারা। মানুষ চাইতে এসেছে। শেষের দুটোয় তবু কিছু মেলে। প্রথমটায় সবই ফক্কা। বসে বসে নিজের বুড়ো আঙুল চোষো।

হঠাৎ হরিশঙ্কর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, কেন এমন বিরস বদন হেরি সখী। বড় বিপদে পড়েছ তাই না? কোথায় তোমার সুখশয্যা! সুদৃশ্য স্নানঘর, সুগন্ধী সাবান! Soak your life in a gallon of danger, spice it with powder of time and slowly roast it in the fire of your courage and enjoy a good dinner. বুঝলে কিছু? এক গ্যালন বিপদে জীবনটাকে চোবাও, চূর্ণ সময়ের মশলা মেলাও, সাহসের আঁচে ধীরে ধীরে রোস্ট করো, বসে যাও জীবনের মহাভোজে। আজ তাই হবে। তোমাদের সন্দেশ মারা ফুরফুরে আধ্যাত্মিকতার কোনও স্থান নেই রক্তমাংসের পৃথিবীতে। এটা এক ধরনের রোমান্টিকতা। বড়বাবুদের বিলাসিতা। লাঙল, কোদাল, কুড়ুল, খোন্তা, ছোরাছুরি, কাড়াকাড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি, এই হল জীবন। কোথায় গেল তোমাদের হিউমার? মুখ দেখে মনে হচ্ছে বধ্যভূমির দিকে চলেছ! এসো গান ধরো, জগৎজননী জাগিয়াছে আজি, জয় মা তারিণী গাও রে,/বাজাও ডঙ্কা, নাহিকো শঙ্কা, ঘুচে গেছে ভবভয় রে॥

হরিশঙ্কর নিজেই গাইছেন। এই অবস্থায় গলায় সুর আসছে! কোন উৎস থেকে এই ভয়ংকর শক্তি আসে! আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। ছোটদাদু কি পরাজিত হলেন হরিশঙ্করের জীবনবেদের কাছে? তন্ত্র-মন্ত্র সব বোগাস? আমরা দেখতে দেখতে থানার চৌহদ্দির মধ্যে এসে ঢুকলুম। বিশাল একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঝিলমিল করে আলোর বিলিব্যবস্থা করছে। ঢনঢনে একটা জিপ গাড়ি জরদগব প্রশাসকের মতো একপাশে পড়ে আছে। একজন হাবিলদার বগলে লাঠি চেপে হাতের তালুতে খইনি ডলছে। আমাদের দেখে ফটাস ফটাস করে তিনবার চাপড় মারলে, সাদা চুনের গুঁড়ো উড়ে গেল খানিক।

কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় পিসিমারা থমকে দাঁড়ালেন। আমরা তিনজন এগিয়ে গেলুম। হরিশঙ্কর হঠাৎ আমাকে বললেন, মনে করো আমি নেই, তুমি কেসটা হ্যান্ডল করো তো!

ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। এ যে দেখি বিপদের ওপর বিপদ। ডবল বিপদ। তবু মনে হল হেরে যাব? মনে পড়ে গেল হরিশঙ্করের পুরনো শিক্ষা! লেখাপড়ায় লাগাতে বলেছিলেন— সবসময় ভাববে তুমি একজন অথরিটি। তুমি কারও চেয়ে কম যাও না। কেউ তোমার চেয়ে শক্তিশালী নয়। হারার আগে হেরে যাবে না। লড়াই করে হারো, হারবে। আমি ভয় করব না ভয় করব না/ দু'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥/ তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—

এগিয়ে গেলুম সেই কনস্টেবলের দিকে। বেশ বড় একটা গোঁফের মালিক, কিন্তু গলাটা ভীষণ সরু। যতটা কঠোর হবেন ভেবেছিলুম ততটা কঠোর নন। মোটা লাঠিটা শুধুমাত্র প্রভুত্বের প্রতীক। গরম বাতাস, কৃষ্ণচূড়ার ঝিলিমিলি ছায়া। অসম্ভব সরু গলায় প্রশ্ন এল, কী চাই?

অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কী কেস!

একটু থতমত খেয়ে গেলুম। কেসটা কী? কী বলব? হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমরা কলকাতা থেকে আসছি।

কনস্টেবল অবাক করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের তো আসার কথা ছিল। এত দেরি হল!

অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে হরিশঙ্করের দিকে তাকালুম। ছোটদাদু হাসছেন মৃদু মৃদু। কী উত্তর দোব? হয়তো অন্য কারও আসার কথা।

কনস্টেবল বললেন, যান যান, তাড়াতাড়ি যান। অফিসঘরে অপেক্ষা করছেন।

একটু আগে কেসটা যাই থাক, এখন আরও জটিল হয়ে গেল। কে আসবে, কারা আসবে! সম্মানিত ওপরঅলা কেউ? এসে পড়েছি আমরা। প্রথমে খাতির। তারপর যেই জানবেন, আমরা তাঁরা নই, তখনই ভয়ংকর অবহেলা। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য। বলতেও পারছি না। অহংকারের বাধা!

হঠাৎ ছোটদাদু এগিয়ে গেলেন। এক মাথা কাঁচাপাকা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। ধবধবে সাদা টুইলের শার্ট রোদে ঝলসাচ্ছে। অপরাজেয় ছোটদাদু। পেছনে আমরা। হরিশঙ্কর অবিচলিত। দেখে মনে হচ্ছে, কোনও ঘটনার মধ্যেই তিনি আর নেই। থেকেও না-থাকাটা হরিশঙ্করের সাধনা। এ আমি আগেও দেখেছি অজস্রবার।

রক পেরিয়ে অফিস। থানার অফিস যেমন হয়। কেঁদো টেবিল। গোদা চেয়ার। অসম্ভব সুন্দর ইউনিফর্ম পরা একজন মানুষ বসে আছেন। সামনে খোলা খাতা। একপাশে ব্যাটন, আর একপাশে টুপি। আমরা

ঢোকামাত্রই বললেন, আসুন, আসুন। আপনারা এই বাঁকুড়ার অজ-শহরে?

ছোটদাদু চেয়ার টেনে আর এক অফিসারের মতো বসতে বসতে বললেন, আপনি যাঁদের কথা ভাবছেন আমরা কিন্তু তাঁরা নই।

অফিসার বললেন, আপনারাই। আপনি তারাপীঠের মহাসাধক। আপনার লেখা বই আমার বাবা পড়েন। আমার ছোটভাই জেসপের ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতায় থাকে। তাকে আপনি গত বছর দীক্ষা দিয়েছেন।

ছোটদাদু বললেন, আমরা আসব জানলেন কী করে?

ওইখানে একটু পুলিশি বুদ্ধি আছে। আপনারা সকালে যে-দোকানে জিলিপি আর চা খেয়েছেন, সেই দোকানে রোজ আমাকেও একবার যেতে হয়। সেরা খাবার। সেখানে গিয়ে শুনলুম, আপনারা গ্রামে ঢুকেছেন। তা থানায় কেন আসবেন! হঠাৎ স্কুলের হেডমাস্টারমশাই তারিণীবাবু খবর আনলেন রাধাবাবুর ইঁদারায় মৃতদেহ। আরও বললেন, তিন ভদ্রলোকের সঙ্গে রাধাবাবুর পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে স্টেশনের দিকে গেলেন। আবার এও বললেন, রাধাবাবুর ভাই গতরাতে রাধাবাবুর বিধবা পত্নীকে বেধড়ক পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ঘর থেকে টেনে বাইরে ফেলে দিয়ে দোরতাড়ায় তালা মেরে হাওয়া হয়ে গেছে। এইবার আমার ডিডাকশন, ঝামেলার ভয়ে প্রথমে আপনারা পালাতে চাইবেন, তারপর আপনাদের বিবেক আর বুদ্ধি কাজ করবে। আপনারা ফিরে আসবেন। কোথায় আসবেন? থানায় আসবেন। এমন সময় আমাদের হেড কনস্টেবল এসে জানাল, আপনারা আসছেন। সে আপনাদের ওভারটেক করে জিপে করে আসছিল।

হরিশঙ্কর বললেন, ওয়ান্ডারফুল! পারফেক্ট ম্যাথমেটিক্স। আমি ভাবলুম অলৌকিক কোনও দূত এসে আপনাকে খবর দিয়েছে।

অফিসার বললেন, আপনি? আপনার পরিচয়?

ছোটদাদু বললেন, আমার ভাগনে।

অফিসার হুংকার ছাড়লেন, উদাস!

উদাস যে কারও নাম হতে পারে, ভাবা যায় না। কুচকুচে কালো একটি ছেলে ঘরে এল। চায়ের হুকুম হল। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গেছেন। ডেডবডি় তুলতে সময় লাগবে কিছুক্ষণ। তারপর যাবে পোস্টমর্টমে।

ছোটদাদু বললেন, আমার ভাগনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেমেয়ে নিয়ে।

অফিসার বললেন, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার কোয়ার্টারে।

হরিশঙ্কর বললেন, সেটা যে বড় অস্বস্তিকর হবে আপনার পরিবার-পরিজনের পক্ষে। আচ্ছা কোনওরকমে তালা ভেঙে ওদের গৃহপ্রবেশ করানো যায় না?

অফিসার চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলেন, আবার বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ ভাবলেন। ভেবে বললেন, তালাটা ভাঙলে কী এমন বেআইনি হবে! প্রপার্টিটা কার?

হরিশঙ্কর বললেন, রাধা ভাইকে লিখে দিয়েছিল এটুকু জানি। তারপর কার হাতে গেছে জানি না। তবে এর মধ্যে কে এক ভৈরবী আছে।

ও সব ভৈরবী-টৈরবি আমরা গ্রাহ্য করি না। আমরা আইন দেখব। তালা ভাঙার অধিকার পুলিশের আছে। অনুসন্ধান সার্চ আমাকে করতেই হবে। এটা যদি মার্ডার কেস হয়?

হরিশঙ্কর বললেন, মার্ডার হতে পারে?

সবই হতে পারে। পুলিশ লাইনে থেকে বুঝেছি, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। টাকার জন্যে মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। সব পারে।

প্রায় মগের মতো আকার এক একটা কাপের। স্ট্রেচারের মতোই বড় ট্রে-তে চেপে চলে এল চা। চায়ে চান করা যায়। এদিকে খালি পেটে চোঁ চাঁ শব্দ হচ্ছে।

অফিসার বললেন, তাড়াতাড়ি শেষ করে নিন। চায়ের সঙ্গে আর কিছুই দেওয়া গেল না।

আমরা কোঁত কোঁত করে চা শেষ করলুম। জিপ আমাদের নিয়ে চলল ঘটনাস্থলের দিকে। বেশ ভিড় জমে গেছে। দেহ সবে তোলা হয়েছে ইঁদারা থেকে। মাঝারি গড়নের একজন মানুষ। ঝাঁকড়া চুল। গলায় জড়ানো লাল একটা কাপড়ের টুকরো। ঠোঁট ফাঁক। গ্যাঁজলা বেরিয়েছে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে কী একটা ধরা। দেহটা উঠোনে চিত হয়ে পড়ে আছে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক তারিণীবাবুর সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, একটা মহৎ পরিবার এইভাবে শেষ হয়ে গেল। নেশাভাং মানুষকে কোন দুর্গতির দিকে নিয়ে যায়! কী ছেলে ছিল! শেষ পরিণতিটা কী হল!

তাঁর আক্ষেপ শোনার মতো কেউ নেই। ভয়ংকর কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। পুলিশের নানা ফ্যাচাং। কোথায় কী পড়ে আছে, তার অনুসন্ধান। খাঁড়া, খড়ম। বিড়ির টুকরো। পায়ের ছাপ। সেই ছাপে আমাদের পা আছে। দাওয়া থেকে ইঁদারার দূরত্ব। শুরু হল জেরা। কী ক্লান্তিকর ঘটনা। এরই নাম তল্লাশ। খাতায় লেখা হচ্ছে মৃতের বর্ণনা। মিডিয়াম বিল্ড। ফেয়ার কমপ্লেকশনড। লং কারলি হেয়ার। হাইট। বার্থমার্ক। পার্টেড লিপস, ফোমিং। বালজিং আইজ। ঘাস্টলি স্টেয়ার। ক্লেঞ্চড ফিস্ট। ব্রুইজ, কাটস, ল্যাসিরেশন। সোলেন টেস্টিকলস। ডিস্টেন্ডেড স্টম্যাক। ফেন্ট রেড স্পট অন দি ফোরহেড, নট ব্লাড। রাইগার মরটিস হ্যাজ স্টার্টেড। বর্ণনার শেষ নেই।

রামশঙ্কর, কুম্ভকার। তিনি কাল মৃতকে কখন দেখেছেন? কী অবস্থায় দেখেছেন? প্রসাদ রায়, পুরোহিত। কাল শেষ কথা কখন বলেছেন, কী বলেছেন? আমরা প্রথম এসে কী দেখেছি? ইঁদারায় প্রথম কে দেখে? কী অবস্থায় দেখেছে? আমরা কী দেখলুম? আমরা কেন এলুম? কী জন্যে এলুম? কাল রাতে কোথায় ছিলুম? প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

অবশেষে চাদর- চাপা দেহ চলে গেল পুলিশের হেফাজতে। অফিসার কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললেন, এইবার তালাটা ভাঙা যাক। তারিণীবাবু, আপনি সাক্ষী থাকুন।

একটা চাড় মারতেই তালা খুলে গেল। দরজাটা খোলার সময় কবজায় কিচ করে একটা শব্দ হল। ঢুকতে গিয়ে সবাই থমকে গেলেন। তারিণীবাবু, অফিসার, সহকারী সবাই। ঘরটা বেশ বড়ই। চাপা আলো থমথম করছে। সামনেই লাল মেঝেতে স্বাস্থ্যবান এক মহিলার মৃতদেহ চিত হয়ে পড়ে আছে। পরনে লাল টকটকে কাপড়। গলার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরে বুকের কাছটা দগদগে লাল। এলোচুল ছড়িয়ে আছে চারপাশে। কপালে

বিশাল লাল টিপ। ফরসা টকটকে রং। কশ বেয়ে পিলপিল করে নেমে আসছে কালো পিঁপড়ের দল। পা দুটো দুপাশে ছড়ানো। এক হাতের মুঠোয়। একটা তাবিজ।

অফিসার বললেন, ঘাস্টলি মার্ডার। গ্যাপিং উন্ড।

Every man is the architect of his own fortune,
Every man is the son of his own works.

কোনও কোনও সময় বেঁচে থাকলেও মানুষের মরে যাওয়ার মতো একটা অনুভূতি হয়। বোধ, বুদ্ধি, সব লোপাট হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় চলমান যন্ত্রের মতো। এক ঝলকের দেখা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না সেই দৃশ্য। কেবলই ভাবছি, এমন একটা দেহ এমন একটা সৌন্দর্য মানুষ ধ্বংস করে কীভাবে! কী ভেবে? পাথরে-কোঁদা শরীর, যেন খাজুরাহোর মন্দিরগাত্র থেকে একটা মূর্তি খুলে পড়ে গেছে। চরিত্র যাই হোক, প্রকৃত সাধিকা কি না সে বিচারেও যাচ্ছি না, সুন্দরী এক মানবী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কোথায় যেন বিমলাদির সঙ্গে একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। আমার চোখ পাপীর চোখ, ভোগীর চোখ। নিজেকে তিরস্কার করতে ইচ্ছে করছে।

হরিশঙ্কর পাশেই ছিলেন। ছোটদাদুকে বললেন, জীবনের আর একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। মনে হচ্ছে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। আইন বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াবে। জেল, প্রাণদণ্ড সবই হয়ে যেতে পারে। মন্দ হবে না। আমার ধারণা, ফাঁসি বেশ আরামদায়ক। গলার কাছে বেশ একটা টান পড়ে তো! শিরাটিরা বেশ ছেড়ে যায়।

ছোটদাদু সংশোধন করলেন, ছেড়ে যায় না, ছিঁড়ে যায়।

ছেঁড়ার আগে ছেড়ে যায়।

তোর কোনও দুঃখ হচ্ছে না?

কীসের দুঃখ? কার জন্যে দুঃখ? এ গ্রুপ অফ ক্রিমিন্যালস। তোদের এই ধর্মটাকে দেশ থেকে বিদায় কর।

ধর্মকে তো বিদায় করা যাবে না ভাই। ওটা মানুষের সঙ্গেই জন্মেছে। পাখি থাকলে ডিম থাকবে, ডিম থাকলে পাখি। তুই যা দেখছিস, এ হল ধর্মের ব্যভিচার। এর মধ্যে সেক্স আছে, গ্রিড আছে। ধর্ম এখানে ভেক। ধর্মের আড়ালে অনাচারের খেলা।

তোরা এইটাকে কন্ট্রোল করতে পারছিস না কেন?

কারণ ধর্মের জগতে কোনও পুলিশ নেই। তোমরা ধর্মাবতার বলে যাঁদের আদালতে বসিয়ে রেখেছ, তাঁদের এক্তিয়ারে এই অধর্মটা পড়ে না। ধর্মের আদালতের ধর্মাবতার হল মন। সত্যপথে মন করো আরোহণ প্রেমের আলো জ্বালি চলো অনুক্ষণ/ সঙ্গেতে সম্বল রেখো পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে॥ লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব লুণ্ঠন/ পরম যতনে রাখো রে প্রহরী শম দম দুই জনে॥

ছোটদাদু সম্পূর্ণ ভাবস্থ হয়ে বিখ্যাত গানের লাইন বলছেন। সামান্য সুরও আছে। এমন অদ্ভুত রচনা অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর, হরিশঙ্করও তন্ময় হয়ে গেছেন। স্বামীজির বড় প্রিয় গান। ঠাকুরকে প্রায়ই শোনাতেন। ছোটদাদু পরের অনবদ্য লাইনক'টি বলছেন, সাধু-সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্তি হলে তথায় করিও বিশ্রাম। পথভ্রান্ত হলে শুধাইও পথ, সে পান্থ-নিবাসী জনে॥ যদি দেখো পথে ভয়ের। আকার প্রাণপণে দিয়ো দোহাই রাজার/ সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে॥

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, হরিশঙ্করের দু'চোখ বেয়ে নিঃশব্দে জলের ধারা নেমেছে। এই মূর্তি আমার চেনা, ক্ষতবিক্ষত এক যোদ্ধার। জতুগৃহ দগ্ধ হয়ে যাওয়ার পর যদি জীবিত কেউ দগ্ধাবশেষ থেকে উঠে আসতে পারতেন, তাঁর চেহারা এইরকম হত। মনের চেহারা। হরিশঙ্কর তাঁর নিখুঁত উচ্চারণে। 'সাবিত্রী'র কয়েকটি লাইন বললেন,

Ardent from the sack of happy peaceful homes/ And gorged with slaughter, plunder, rape and fire/ They made of human selves their helpless prey/ A drove of captives led to lifelong woe.

অফিসার এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, কেস খুব ঘোরালো। দুটো ক্লু পাওয়া গেছে। ইঁদারার লাশের মুঠোয় কিছু চুল পাওয়া গেছে। ভৈরবীর মুঠোয় একটা তাবিজ। লাশের মুঠোয় মেয়েদের চুল থাকলে ব্যাপারটার একটা সহজ সমাধান হয়ে যেত। মুঠোয় পুরুষের চুল। তার মানে তৃতীয় আর একজন একসঙ্গে এই ডবল মার্ডারের জন্যে দায়ী। সে কে? গভীর জলের ব্যাপার।

হরিশঙ্কর খুব সহজ গলায় বললেন, আমাদের মধ্যে কারওকে অ্যারেস্ট করতে চান?

অফিসার অবাক হয়ে বললেন, আপনাদের অ্যারেস্ট করব কেন? আপনারা তো এই একটু আগে স্পটে এলেন। এসব কাল মাঝরাতের ঘটনা। আমাদের প্রথম সন্দেহভাজন লোক হল ভৈরবীর স্বামী।

হরিশঙ্কর বললেন, আমার বোন আশাকে সন্দেহ হয় না?

ছোটদাদু অবাক হয়ে হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকালেন। কত সহজে একজন মহিলাকে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। হরিশঙ্কর যেন আসামি পক্ষের উকিল!

অফিসার বললেন, না, হচ্ছে না। দুর্বল মহিলার দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

সারারাত ওই দাওয়ায় শুয়ে থেকে এত বড় একটা ঘটনা টের পেল না!

তার সহজ ব্যাখ্যা, মহিলা রাতে ত্রিসীমানায় ছিলেন না।

কোথায় ছিল তা হলে?

ছোটদাদু বললেন, তুই কি আশাকে অপরাধী প্রমাণ করতে চাস?

হরিশঙ্কর সকলকে অবাক করে বললেন, মিথ্যে কথা বলবে কেন?

অফিসার বললেন, আশ্চর্য মানুষ আপনি! সত্যের জন্যে এত বড় একটা বিপদ ডেকে আনতে চাইছেন! আপনি ঠিকই বলছেন, উনি সত্য গোপন করছেন।

তারিণীবাবু বললেন, সত্যটা আমি বলছি, আশা আমার কাছে ছিল। আমি অবিবাহিত পুরুষ। জায়গাটা শহর নয় গ্রাম, হাজার কথা হবে, সেই কারণেই মিথ্যা বলেছে। আমি একটু দেখাশোনা করি বলে ইতিমধ্যেই

অনেক কথা হয়েছে। সেসব আমি গ্রাহ্য করিনি। তবু একটু সাবধান হতেই হয়। আমি শিক্ষক।

হরিশঙ্কর বললেন, তার মানে কোথাও একটু পাপবোধ আছে!

ছোটদাদু সামান্য ধমকের সুরে বললেন, কী হচ্ছে হরিশঙ্কর?

হরিশঙ্কর অম্লান বদনে বললেন, সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। লুকোচুরিটাই পাপ। আশা আমাদের সত্য কথাটা বললেই পারত। আমরা তো গ্রামের লোক নই। আই হেট লায়ারস দ্যান মার্ডারারস, দ্যান প্রস্টিটিউটস।

যেন বাজ পড়ল! আমরা সবাই স্তম্ভিত। তারিণীবাবুর মুখটা ভীষণ করুণ দেখাল।

অফিসার বললেন, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আপনারা সোজা কলকাতায় চলে যান। দায়িত্ব আমার। এখন ট্রেন নেই। বাসে করে বর্ধমানে চলে যান। সেখান থেকে লোকাল ধরে কলকাতা। এইসব ভুলে যান। আমি আর সময় দিতে পারছি না। আমার এলাকায় খুন এই প্রথম। সদলে আবার আমরা রাস্তায়। যথারীতি হরিশঙ্কর আবার একটা সমস্যা তৈরি করে ফেললেন, এদের জিনিসপত্তরের কী হবে? সবই তো পড়ে রইল!

ছোটদাদু বললেন, ও সবই এখন পুলিশের হেফাজতে। সুখে থাকতে ভূতের কিল খেয়ে লাভ কী?

আশার ছেলেমেয়ের স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের কী হবে?

সব, সব হবে। পরে হবে। ঠিক সময়ে হবে।

আবার আমাদের চলা শুরু হল। এইবার আর স্টেশনের দিকে নয়, বাসস্ট্যান্ডের দিকে। আর যেন পারা যাচ্ছে না। শরীর ভেঙে আসছে। বিমলাদি বলেছিলেন, থেকে যাও তুমি। বিদ্রোহী সন্তান হয়ে যদি রয়ে যেতুম, তা হলে অন্য এক ধরনের অভিজ্ঞতা হত। হয়তো ভেড়া হয়ে যেতুম। ভয়ও ছিল। ইঁদারায় না পড়ে হয়তো গলায় দড়ি দিতে হত। এখন বুঝতে পারছি, মেলায় বিমলাদি আমাকে কী করেছিলেন। যা কোনওদিন কেউ করবে না। বাসস্ট্যান্ডে এসে হরিশঙ্কর বললেন, খাওয়াদাওয়ার প্রয়োজন আছে?

সকলেই সমস্বরে বললেন, না। কারও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

আমরা বাসে উঠে বসলুম। কারও মুখে কোন কথা নেই। আমরা বেঁচে ফিরছি, না মরার জন্যে দল বেঁধে চলেছি, মনের অবস্থা দেখে বোঝার উপায় নেই। বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত। হরিশঙ্কর পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুক বের করে মগ্ন হয়ে আছেন। আমি ঠিক তাঁর পেছনে বসে যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাইতে মনে হচ্ছে লেখা আছে উদ্ধৃতি। ছোটদাদু বসেছেন হরিশঙ্করের পাশে।

ছোটদাদু জিজ্ঞেস করছেন, কীসে ডুবে গেলি?

হরিশঙ্কর বললেন, নোটস। এতে কিছু কিছু পয়েন্টস লেখা আছে। মেডিক্যাল গাইডসের মতো, লিভিং গাইডস। প্র্যাকটিক্যাল নোটস ফর এফেক্টিভ লিভিং। কীভাবে তুমি বাঁচবে। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার গণিত। মানুষ গাছে সার দেয়, পেটে দানাপানি দেয়, অভিভাবকহীন নিঃসঙ্গ মনকে মানুষ কী দেয়! অনাথ বালকের মতো বসে আছে ফুটপাথে। টোলসহরত করে মিছিল যাচ্ছে আলোর রোশনাই দিয়ে, দেখছে। সেজেগুজে বড়মানুষের মেয়ে যাচ্ছে, দেখছে। ঝকঝকে মোটরগাড়ি যাচ্ছে, দেখছে। দুটো লোক ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছে, দেখছে। কেউ ভুট্টা খেতে খেতে চলেছে, দেখছে। রাত হল, দেখছে। পথ নির্জন থেকে নির্জনতর হয়ে গেল। নিবে গেল দীপাবলী। বন্ধ হয়ে গেল বাহারি সব দোকান। রাতের বাতাস বহে গেল রাজপথের ছেঁড়া

কাগজ উড়িয়ে। অনাথ বালক বসে আছে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। কেউ এসে হাত ধরে বলবে না, চলো, ওঠো, রাত হল। কেউ তাকে গরম জলে চান করাবে না, ভাল পোশাক পরিয়ে সেন্ট ছিটিয়ে দেবে না, গরম খাবার খাইয়ে নরম বিছানায় শুইয়ে দেবে না। মধ্যরাতের নির্জন পথে একা বালক। নিরাশ্রয় একটি পাখি। সেই মনের ধাত ধরতে পারে আমার এই ছোট্ট খাতা। আমি এটাকে আরও বড় করব। নাম হবে, মাই এনকাউন্টার উইথ লাইফ। জীবন পথিক।

বাস চলেছে প্রচণ্ড গতিতে। আমার পাশে জানলার ধারে আমার পিসতুতো ভাই। বাসে এখনও তেমন ভিড় হয়নি। চিৎকার চেঁচামেচি তেমন শুরু হয়নি। মানুষের কপচাকপচি। ভাইয়ের চোখ বুজে আসছে। মুখ দেখে মনের ভাব পড়া যাচ্ছে না। বাস কলকাতার দিকে যাচ্ছে, না যাচ্ছে অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের দিকে! আকাশে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ মারার মতো, একমাত্র বাতাসই ভরসা।

ছোটদাদু বলছেন, তোর একটা টুকরো শোনা না!

শুনবি? তা হলে শোন, সুইচ অফ সুইচ অন। কখনও তুমি থাকবে কখনও তুমি থাকবে না। মন বসাবে, মন তুলবে। উপমা পাখি। ডালে বসল, ফল ঠোকরাল, শিস দিল, পোকামাকড়ের দিকে নজর গেল, হঠাৎ উড়ে চলে গেল একসময়। মনের দেহ-যুক্তি, দেহ-বিযুক্তি। ঘটনার মধ্যে দেহ আছে, কিন্তু মন নেই। পাখি উড়তে পারে, মন কেমন করে উড়বে। ঘুড়ি ওড়ে, ঘুড়ির লেজ ওড়ে কেমন করে? ঘুড়ির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। মন উড়বে ভাব আর ভাবনার লেজ ধরে। মনকে তল্লাশ দিতে হবে, যাও মন পাহাড়চুড়োয়, যাও মন সমুদ্রের ঊর্মিমালায়, যাও মন আমাজনের রেনফরেস্টে। ক্ষুদ্র থেকে বিশালের দিকে ঠেলে দাও। এইটা রপ্ত করার জন্যে ছোটখাটো ব্যায়াম অভ্যাস করা যেতে পারে। যেমন বাস চলার এই শব্দে তুই কি আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিস?

ছোটদাদু বললেন, না।

আচ্ছা, এইবার চেষ্টা কর।

ছোটদাদু কিছুক্ষণ স্থির থেকে বললেন, এইবার পাচ্ছি।

কোন কায়দায় পেলে?

কিছুই না মনটাকে গুটিয়ে নিয়ে এলুম। সবকিছু থেকে সরিয়ে উৎকর্ণ হতেই শুনতে পেলুম।

ছোটদের ম্যাগাজিনে এক ধরনের ধাঁধা ছাপা হয় দেখেছিস? একটা ম্যাপের মতো, রোড ম্যাপ। একগাদা পথ। একটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে আর একটা চলে গেছে, দুটোকে জড়িয়ে তৃতীয় আর একটা। সব পথই কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে আর নেই। আটকে গেছে। এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত যাওয়ার একটা পথই খোলা আছে। সেটাকে খুঁজে নিতে হলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চাই, কনসেনট্রেশন চাই। পৃথিবীর জটিল আবর্ত থেকে পথ চিনে লক্ষ্যে পৌঁছোবারও সেই একই কায়দা। দৃষ্টি স্থির, মন স্থির। প্লেন থেকে নীচে তাকালে কী দেখবে? ছবির মতো পড়ে আছে জনপদ। নদী, খাল, ব্রিজ, পথ, বাড়ি, মনুমেন্ট, গির্জা, মন্দির। কোথাও কোনও জটিলতা নেই। কোনটা কোথায়, কোথায় শুরু, কোথায় শেষ, একেবারে পরিষ্কার ছবি। জীবন থেকে সরে গিয়ে জীবনের নকশা দেখে নিতে হয় মাঝে মাঝে। মনকে সরাও, মনকে ঢোকাও। ঘাড়-মুখ গুঁজড়ে সংসারে পড়ে থেকো না। সবেতেই আছি আবার কিছুতেই নেই। ইউ লিড এ লাইফ অ্যান্ড লার্ন দি আর্ট অফ লিভিং।

ছোটদাদু বেশ আগ্রহের সঙ্গে বললেন, বেশ বলেছিস তো! তোর নোটবুকে আর কী আছে?

বাস থামছে, বাস চুলছে। আমার পিসতুতো ভাইয়ের মাথাটা আমার ডান কাঁধে নেমে এসেছে। গভীর ঘুমে কাদা। অন্য কোনও সহযাত্রী হলে জাগিয়ে দিয়ে বলতুম, সোজা হয়ে বসুন। এখন একটা কেমন করুণার ভাব আসছে। কী অসহায়! দুটো বোন। তাদের লেখাপড়া, বিয়ে। এই ছেলেটিকেই হতে হবে পিলার, হতে হবে ছাতা। কত রাজপথ জনপথ পেরিয়ে মরুভূমি সাগরের সীমানায় এই ছেলেটিকে যেতে হবে। তেল চিটচিটে চুল। জামার কাঁধে ছোপ পড়ে যাবে। আমার শহুরে মনের সংকীর্ণতায় নিজেকেই নিজে ধমক দিলুম। কাঁধটাকে আরও এগিয়ে দিলুম মাথাটা যাতে পড়ে না যায়।

হরিশঙ্কর বলছেন, মানুষ যখন বাঁচতে শেখে তখন তার জীবন শেষ হয়ে আসে। আমাদের স্কুল কলেজের আধুনিক শিক্ষা বড় একপেশে। রোজগার করতে শেখায়, সুখে বাঁচার কায়দাটা শেখায় না।

সুখে বাঁচার কায়দাটা কী?

দুঃখটাকে মেনে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি। রিক্ততার মধ্যে পূর্ণতার অনুভূতি। প্রত্যাশা বর্জিত জীবন। আমাকে কেউ কিছু দেবে না, পারলে কেড়ে নেবে, পথ আর বাধা দুটোই থাকবে একসঙ্গে। কেউ আমার প্রশংসা করবে না, নিন্দাই করবে। আমাকে নিয়ে আলোচনা হবে না, হবে সমালোচনা। আমার কোনও বন্ধু থাকবে না, সকলেই শত্রু। সকলেই আমাকে ব্যবহার করবে। যারা কাছে আসবে, আসবে স্বার্থের কারণে। স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে আর চিনতে পারবে না। আমার ভাল হলে সবাই দুঃখ পাবে, খারাপ হলে ভয়ংকর আনন্দ হবে। তোমাকে শুধু দিতে হবে, পাবে না কিছুই। পৃথিবীতে ভালবাসা নেই, আছে ঘৃণা। জীবন একটা খেলা, চালে ভুল হলেই হার। তা হলে তোকে একটা কবিতা শোনাই:

The world won’t care if you quit
And the world won’t whine if you fail;
The busy world won’t notice it,
No matter how loudly you wail.
Nobody will worry that you
Have relinquished the fight and gone down
For it’s only the things that you do
That are worth while and get your renown.
The quitters are quickly forgot;
Of them the world spends little time;
And a few e’er care that you’ve not
The courage or patience to climb.
So give up and quit in despair
And take your place back on the shelf

But don’t think the world’s going to care;
You are injuring only yourself.

কী অসাধারণ স্মৃতি হরিশঙ্করের! এই কবিতাটা আমাকে একসময় মুখস্থ করিয়েছিলেন। কোথাও এতটুকু বিস্মরণ হল না। অপূর্ব উচ্চারণ। কখনও কোনও রেফারেন্স দিতে হলে বইয়ের পাতা ওলটাতে হয় না। আমাকে একদিন কথামৃত খুলে দেখিয়েছিলেন স্মৃতির রহস্যটা কী! শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে বলছেন, আর এক আছে ধৈয্যরেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু তারপর বীর্যধারণ। বারো বছর ধৈর্যরেতা হলে বিশেষ শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নতুন নাড়ি হয়, তার নাম মেধা নাড়ি। সে নাড়ি হলে সব স্মরণ থাকে□— সব জানতে পারে।

হরিশঙ্কর আন্ডারলাইন করে রেখেছেন ঠাকুরের উক্তি, বীর্যপাতে বলক্ষয় হয়। স্বপ্নদোষে যা বেরিয়ে যায়, তাতে দোষ নাই। ও ভাতের গুণে হয়। ওসব বেরিয়ে গিয়েও যা থাকে, তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। শেষে যা থাকে, তা খুব রিফাইন হয়ে থাকে। লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরি সব রেখেছিল, নাগরির নীচে একটি একটি ফুটো করে, তারপর এক বৎসর পর দেখলে; সব দানা বেঁধে রয়েছে। মিছরির মতো। রস যা বেরিয়ে যাবার, ফুটো দিয়ে তা বেরিয়ে গেছে।

হরিশঙ্করের স্মৃতির রহস্য এই মেধা নাড়ি। ছোটদাদুরও স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। দুই যোগী আমার সামনের আসনে পাশাপাশি। হরিশঙ্কর তাঁর সামনের আসনের জানলার ধারের ভদ্রলোককে বললেন, চলন্ত বাসে অনবরত ওইভাবে থুতু ফেললে পেছনে যারা বসে আছে তাদের গায়ে লাগে।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন, কোথায় ফেলব? নিজের কোলে?

হরিশঙ্কর বললেন, তখন থেকে অত থুতু ফেলছেন কেন? আপনার মনে হয় কৃমি হয়েছে। ভাল ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে, সিনা থার্টি।

ভদ্রলোক বললেন, আপনাকে আমার ডাক্তারি করতে বলিনি। চুপচাপ বসুন।

হরিশঙ্কর মৃদু হাসলেন। জামার বুকপকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে একটা কোণ ছিঁড়ে গোল করে পাকিয়ে নিজের নাকে ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। এইবার যা হবে আমি জানি। ভয়ে সিঁটিয়ে রইলুম। নির্ঘাত মারামারি। হরিশঙ্কর বরদাস্ত করেন না অসভ্যতা। বিশাল একটা হাঁচি একেবারে ভদ্রলোকের ঘাড় তাক করে। আপ্লুত করার মতো নিখুঁত একটি হাঁচি। বম্ব-ব্লাস্টের মতো।

ভদ্রলোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, এ কী অসভ্যতা?

হরিশঙ্করও বললেন, এ কী অসভ্যতা।

ভদ্রলোক বললেন, গায়ে লাগছে না?

হরিশঙ্কর বললেন, গায়ে লাগছে না?

ভদ্রলোক বললেন, আশ্চর্য।

হরিশঙ্কর বললেন, আশ্চর্য!

ভদ্রলোক বললেন, অদ্ভুত।

হরিশঙ্কর বললেন, অদ্ভুত। যেন আয়নায় বিম্ব আর প্রতিবিম্ব। বাস ছুটছে হুইহুই করে।

The time, which steals our years away
Shall steal our pleasures too;
The memory of the past will stay
And half our joys renew.

হরিশঙ্কর আর সেই বাসযাত্রীর দ্বন্দ্ব আরও কতদূর এগোত কে জানে? হয়তো হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যেত। ভদ্রলোক একবার মাত্র ছোটদাদুর চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে গেলেন। কী ছিল সেই চোখে? আমি তো বসে আছি পেছনে, প্রস্তুত হয়ে। তেমন কিছু হলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ছোটদাদু বললেন, ছি ছি! যাচ্ছেন জামাইবাড়ি! নাতিকে কী শিক্ষা দেবেন? পিচিক পিচিক থুতু ফেলা! ভদ্রলোক কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ছোটদাদু বললেন, শ্বশুরবাড়িতে মেয়ে এত অশান্তিতে রয়েছে, বনিবনা হচ্ছে না, মেয়ে কি আপনার স্বভাবই পেয়েছে? এইরকম উদ্ধত, অসভ্য! মেয়ের মা তো মাটির মানুষ ছিলেন! সেইজন্যই বুঝি তাঁকে ধামসে শেষ করে দিলেন! আপনি তো মশাই মহাবদ! কাছারির চাকরিটা খোয়ালেন কী করে? এদিকে তো পাইলসের যন্ত্রণায় ছটফট করেন।

উলঙ্গ মানুষ যেভাবে নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করে, ভদ্রলোক সেইভাবে জড়োসড়ো হয়ে গেলেন। মুখে অদ্ভুত একটা ভয়ের ভাব। পারলে কান ধরে জিভ বের করেন, এইরকম একটা অবস্থা। ছোটদাদুর এই কাণ্ডটা আমি খুব উপভোগ করি। ভীষণ একটা শ্রেষ্ঠত্বের ভাব আসে আমার মনে। এমন একজন মানুষ আমার দাদু, যিনি সমস্ত তামসিকতা এক ফুৎকারে স্তব্ধ করে দিতে পারেন। প্যাঁজা তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারেন মানুষের যত নীচ অহংকার। লোকটি কেঁচোর মতো গুটিয়ে গেলেন। আর বাসের কনডাক্টর, এতক্ষণ যিনি পুরো পর্যায়ের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে ছিলেন, তিনি এগিয়ে এসে বললেন, মহাপুরুষের চরণে প্রণাম।

ছোটদাদু একঝলক তাকিয়েই বললেন, শীঘ্র তোমার এই কর্ম ঘুচে যাবে। তোমার শ্বশুরমশাইয়ের এখন-তখন অবস্থা। সাত দিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে। তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তুমি, কারণ তাঁর ছেলেটি উন্মাদ। লোকজন সরিয়ে কনডাক্টর ছোটদাদুর পায়ের পাশে বসে পড়লেন। মুখে কথা সরছে না। কেবল বলছেন, বাবা, বাবা। ছোটদাদু তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, তোমার ত্রিতাপ জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। তুমি শুদ্ধ প্রাণ। জননীর সেবা যেভাবে করছ, সেইভাবে করে যাও। ইষ্টদর্শন হবে। পারলে তারাপীঠে এসে আমার খোঁজ কোরো। বোলো, অথরবাবার আশ্রমে যাব।

বাসের প্রায় সমস্ত যাত্রী পাগলের মতো হয়ে উঠেছে। যেন স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট এই বাসের যাত্রী। কৃপা চাই, একটু কৃপা। বাসচালক একধারে নিয়ে গিয়ে বাস থামিয়ে দিয়েছেন। চিৎকার করছেন, সকলের হবে, আমার কিছু হবে না!

হরিশঙ্কর বলছেন, নাও, এইবার বোঝো ঠ্যালা, কাঙালদের দেখিয়েছ শাকের খেত।

ছোটদাদু বাসচালককে বললেন, তুমিই তো আমাদের চালাচ্ছ! তোমার না হয়ে যায়! বর্ধমান চলো, সেখানে তোমার ব্যবস্থা হবে।

সহজে কেউ শান্ত হয়! মানুষ নয় তো, সবাই এক একটি তোলা উনুন। অশান্তির কালো কয়লা জীবনের আঁচে জ্বলছে। ছোটদাদু হঠাৎ দু'হাত তুলে বললে, আচ্ছা, তা হলে আজ এই হোক, যাঁরা আমার সহযাত্রী তাঁদের সকলেরই মঙ্গল হোক। যেখানে যার যা বাধা আছে সব সরে যাক। মোটা ভাত-কাপড় আর শান্তির অভাব যেন না হয় কারও। সবাই একটু মিষ্টি খাও। মিষ্টি মুখ করো। মিষ্টি মুখ। যার যা ইচ্ছে।

জীবনে আমার এমন অভিজ্ঞতা কখনও হয়নি। দেওঘরে বাবা বৈদ্যনাথ ধামের পাশে যে-পেঁড়ার দোকান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পেঁড়া খেয়েছিলেন, মিষ্টির কথায় আমি সেই দোকানের পেঁড়ার কথা ভেবেছিলুম। আমার মুখ সেই স্বাদে ভরে গেল। আমার মতোই অভিজ্ঞতা হল সকলের। বাসের সমস্ত যাত্রী বুঁদ হয়ে গেছেন। বাস আবার যাত্রা শুরু করল। সেই একই বাস, একই যাত্রী। পরিবেশ ভিন্ন। যেন চলমান একটা ধ্যানঘর। সবাই মৌনী!

মহাভারতের বনপর্বের উপাখ্যান মনে পড়ছে। দুর্যোধন, কর্ণ ও দুঃশাসনের দুষ্ট পরামর্শে তপস্বী দুর্বাসা তাঁর অযুত শিষ্য নিয়ে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। অতিক্রান্ত মধ্যাহ্নে। পঞ্চপাণ্ডবের আহারাদি সমাপ্ত। দ্রৌপদী সবার শেষে আহার করে সবে সামান্য বিশ্রামের আয়োজন করছেন। যুধিষ্ঠির দুর্বাসার সশিষ্য আগমন সংবাদ জানালেন। যুধিষ্ঠির যথাবিধি পুজো করে বলেছেন, ভগবন, আপনি আহ্নিক করে শীঘ্র আসুন, আপনার সেবা আমরা প্রস্তুত করছি। দ্রৌপদী মহাচিন্তায় পড়লেন। সশিষ্য দুর্বাসা স্নানে গেছেন। স্নান আর আহ্নিক এইটুকুমাত্র সময়। এর মধ্যে অন্নের আয়োজন কীভাবে হবে! অগতির গতি শ্রীকৃষ্ণ। দ্রৌপদী আকুল প্রার্থনা শুরু করলেন, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো, হে দুঃখনাশন, একটা কিছু উপায় করো ঠাকুর। দ্যূতসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলে, আজ এই সংকট থেকে ত্রাণ করো প্রভু।

কৃষ্ণ ঠিক শুনতে পেলেন প্রিয়জনের প্রার্থনা। রুক্মিণীকে ছেড়ে চলে এলেন দ্রৌপদীর কাছে। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে তিনি বললেন, কৃষ্ণা, আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, শীঘ্র আমাকে খাওয়াও, তারপর তোমার অন্য কাজ। শীঘ্রং ভোজয় মা কৃষ্ণে পশ্চাৎ সর্বং করিষ্যসি। দ্রৌপদী লজ্জিত হলেন। যতক্ষণ না আমি নিজে আহার করি ততক্ষণ পর্যন্তই সূর্যদত্ত অন্নপাত্রে অন্ন থাকে। আমার আহার যে হয়ে গেছে প্রভু। আর যে কিছু নেই। ভুক্তবত্যস্মাহং দেব তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে। ভগবান বললেন, কৃষ্ণা, এখন পরিহাসের সময় নয়, শীঘ্র যাও, ওই হাঁড়িটি এনে আমাকে দেখাও। দ্রৌপদী নিয়ে এলেন সেই অন্নপাত্র। কৃষ্ণ দেখলেন, তার কানায় একটু শাকান্ন লেগে আছে। স্থাল্যাঃ কণ্ঠেহথ সংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ। সেই শাকান্নটুকু মুখে দিয়ে কেশব বললেন, বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তুষ্টশ্চাস্ত্বিতি যজ্ঞভুক্। বিশ্বাত্মা যজ্ঞভোজী দেব তৃপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হোন।

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মুনিগণ তখন নদীতে স্নানের জন্য নেমে অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করছিলেন। সহসা তাঁরা উদগার তুলতে শুরু করলেন। যেন কতই খাওয়া হয়েছে। উদগারে আহারের গন্ধ। তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে এলেন। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন। মুনিরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহ্মর্ষি, আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন করে তৃপ্ত হয়েছি, এখন আবার কী করে ভোজন করব! দুর্বাসা বললেন, বটেই তো! ওদিকে রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরকে

বৃথাই অন্নপাক করতে বলে মহা অপরাধে অপরাধী হলুম। হরিচরণাশ্রিত পাণ্ডবদের আমিও ভয় করি। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আমাদের দগ্ধ না করেন। চলো, আমরা পালাই।

কেশবের আদেশে তাঁদের ডাকতে নদীতীরে এসে সহদেব দেখলেন, কেউ কোথাও নেই।

ছোটদাদু যা করলেন, অনেকটা এইরকম। এ যে অদ্ভুত এক যোগশক্তি! সেই শক্তির অনুভব আমার মধ্যেও হল। কেমন করে অবিশ্বাস করি! নিপুণ শিল্পীর মতো ছোটদাদু ছোটখাটো নানা বিভূতি দেখিয়ে চলেছেন। বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নেই আমার। হরিশঙ্করের ঠোঁটে একফালি হাসি লেগে আছে। তিনি মগ্ন হয়ে আছেন তাঁর সেই বিখ্যাত নোট খাতায়।

অলৌকিক সেই যাত্রার শেষ মিলল বর্ধমানে এসে। এতটা পথ ড্রাইভার ও কনডাক্টর কোনও যাত্রী তোলেননি, শুধু নামিয়ে গেছেন। ছোটদাদুর সম্মানে বাসটা স্পেশ্যাল বাস হয়ে গেছে। টার্মিনাসে বাস লাগল। কোনও আরোহী আগে নামলেন না। ছোটদাদু ও আমরা নামার পর সবাই নামলেন একে একে। বাসের চালক ছুটে এলেন। ফরসা সুন্দর চেহারার এক যুবক। একমাথা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। প্রণাম করে বললেন, আপনি বলেছিলেন বর্ধমানে বলবেন।

ছোটদাদু তাকে টেনে নিয়ে গেলেন একপাশে। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল দু'জনে অন্তরঙ্গ ভাবে।

রাজসমারোহে আমরা ট্রেনে চাপলুম। এইবার ছোটদাদু আমার পাশে। উলটোদিকে হরিশঙ্কর। হরিশঙ্করকে আমরা এমনভাবে ঘিরে রেখেছি যাতে আর কোনও গোলযোগ না হয়। ট্রেন অবশ্য খুবই ফাঁকা।

ছোটদাদু বললেন, ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল।

কেন? মনখারাপ কেন?

অত সুন্দর ছেলে, কিন্তু বাঁচবে না বেশিদিন।

কে? ওই ড্রাইভার?

হ্যাঁ। খুব সামান্য আয়ু হাতে নিয়ে এসেছে।

আপনি পারেন না বাড়াতে?

ওই একটা জায়গায় কেরামতি চলে না পিন্টু।

বিধ্বস্ত সৈনাবাহিনীর মতো আমরা একটা দল পাড়ায় ঢুকলুম। আমাদের বিশ্বস্ত দুই অভিভাবক, দুটো কুকুর মোহর আর পল্টু, মাঝরাস্তাতেই ধরে ফেলল আমাদের। তাদের সে কী নর্তন-কুর্দন! হরিশঙ্কর ছোটদাদু দু'জনেই এদের ভক্ত। সকাল বিকেল দুপুর ভোজনের অন্ত নেই। তন্ত্রের সঙ্গে কুকুরের গভীর যোগ। হরিশঙ্কর জীবজন্তুপ্রেমী। গাড়ি চাপায় মোহরের ঠ্যাং ভেঙেছিল, হরিশঙ্কর প্লাস্টার করেছিলেন। সকলের চিৎকার, কামড়ালেই জলাতঙ্ক। হরিশঙ্কর বলেছিলেন একটি কথা, মোহর মানুষ নয়। সবাই ঠোঁট উলটেছিল। বলেছিল, কামড়ালেই বুঝবেন মোহর মানুষ না কুকুর! হরিশঙ্করের হাতে ছোট একখণ্ড কাঠ, প্ল্যাস্টার অফ প্যারিসের টিন, ব্যান্ডেজ। তিনবার টুসকি মেরে মোহরের সামনে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল মোহরের কান্না। মোহর লেজ নাড়ছে। হরিশঙ্কর নিপুণ একটি প্লাস্টার করে উঠে দাঁড়ালেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

একটা স্টেশনারি দোকান তখনও খোলা ছিল। ছোটদাদু একগাদা বিস্কুট কিনলেন। বাড়ির সামনে এসে রকের ওপর বিস্কুটগুলো ছড়িয়ে দিলেন। মোহর আর পল্টুর ভোজন শুরু হল। পল্টু মোহরের ছেলে।

খাওয়ার আগে দু'জনেই আকাশের দিকে মুখ তুলে তাদের বিখ্যাত সেই উল্লাসের ডাকটি ছাড়ল।

কানে আসছে গান। মাতুল জয়নারায়ণ দোতলায় গান ধরেছেন,

পড়িয়ে ঘোর সংকটে ডাকি তোমায় অকপটে।
নিকটে বারেক আসি দাঁড়াও না।
পক্ষ হইয়ে বিপক্ষ, প্রতিপলে করে লক্ষ, দিতেছে দারুণ মন বেদনা।
দুটি খুঁটির উপরে, দিয়াছ রহিতে ঘরে, ঘুণ ধরে সে যে আর থাকে না।

সুরটা মনে হচ্ছে খট। আমার মাতামহের কণ্ঠে শুনেছি এই গান, রাম দত্তের লেখা। আমাদের বিখ্যাত সদরের কালোয়াতি দরজা খোলাই ছিল। ঠেলতেই হড়াস হয়ে গেল। তিন ভাঁজ দরজা পৃথিবীর কোথাও আছে কি? একমাত্র এই বাড়িতে।

সিঁড়ির মাথায় প্রথমেই দেখা হল মুকুর সঙ্গে। আনন্দের উল্লাস, আপনারা এসেছেন?

আরও কিছু বলত, পিসিমাদের দেখে থমকে গেল। জড়োসড়ো হয়ে উঠে আসছে চারটি প্রাণী। পিসিমার মাথায় মোটা ব্যান্ডেজ। এটা পিসির নিজের বাড়ি, তবু কী সংকোচ!

জয়নারায়ণ বেরিয়ে এলেন গান থামিয়ে। পরিবেশ বদলে গেল। জয়নারায়ণ হইহই করে বললেন, আশাদি, তুমি তা হলে এলে? মাথাটা ফাটালে কী করে?

পিসিমা অবাক হয়ে বললেন, জয়, তুমি? কেমন আছ তোমরা? কতদিন পরে দেখা! তুমি আগের চেয়ে আরও ফরসা হয়েছ। কী সুন্দর দেখতে হয়েছে তোমাকে!

সবাই বারান্দায়। কেউই সাহস করে ঘরে ঢুকছে না। মুকু পিসিমার ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বললে, নতুন জায়গা। আড়ষ্ট লাগছে তাই না? চলো ভেতরে চলো। ভয় কী?

হরিশঙ্কর ডাকলেন, মুকু!

অতন্দ্র প্রহরীর মতো উত্তর, মেসোমশাই।

তোমার অনেক কাজ। ছেলেমেয়ে তিনটেকে ফলাও করে চানের ব্যবস্থা করে দাও। সাবানের কৃপণতা কোরো না। চুলে উকুন থাকা অসম্ভব নয়। তার ব্যবস্থা কাল হবে। পরিষ্কার জামাকাপড় পরাও। জামাকাপড়, বলে হরিশঙ্কর হোঁচট খেলেন। ছোটদাদুকে বললেন, গ্রেট মিস্টেক। প্রলিফিক ব্লান্ডার।

ছোটদাদু বললেন, কী হল আবার?

আমাদের উচিত ছিল এক সেট করে জামাকাপড় কিনে আনা। এখন এরা কী পরবে!

মুকু বললে, আপনি ভাববেন না মেসোমশাই। আমি ইমপ্রোভাইস করছি।

হরিশঙ্কর বললেন, এই তো চাই! যাও মা। তুমি এদের ইনচার্জ।

রান্নাঘরে কাকিমা রাঁধছিলেন। বেরিয়ে এলেন। এসেই গুনতে শুরু করলেন এক দুই তিন চার। নিজের মনেই বললেন, পার হেড আটখানা, তার মানে আরও ছাপ্পান্ন খানা রুটি। আধখানা কুমড়ো, দু'সের আলু। মাছ হবে না। দুধ আছে, সুজি দিয়ে পায়েস হবে। মুকু!

কাকিমা মুকুকে ডাকলেন। দু'সের আটা বের করে ঠাসতে শুরু করি।

হরিশঙ্কর বললেন, চিন্তার কিছু নেই। আমি সাফা হয়ে এসে তোমাকে সাহায্য করছি।

পিসিমা বললেন, ছোটদা, আমি আছি।

মুকু বললে, আমি কী করতে আছি!

আমাদের বাড়ির পুরনো রীতি অনুসারে মাঝরাতে জেগে উঠল সংসার। জয়নারায়ণ রান্নার এক্সপার্ট। তিনি বসে গেলেন হামানদিস্তা নিয়ে। ভাজা মশলা গুঁড়ো করতে। কুমড়োর ছক্কায় ভাজা মশলা না পড়লে জমে না। তালে তালে হামানদিস্তা চলেছে। জয়নারায়ণ বলছেন, প্রথমটা ঢিমে তিনতাল, তারপর ঝাঁপতাল, তারপর দাদরা। দাদরায় মশলা মিহি।

মুকুর মাথা খাটানোর ফলে গোটাকতক ক্লাউন বেরিয়ে এল ভেতরের ঘর থেকে। পিসতুতো ভাই একটা আন্ডারওয়ার পরেছে। বিশাল তার সাইজ, ফলে মনে হচ্ছে থ্রি কোয়ার্টার পায়জামা। তার ওপর হরিশঙ্করের সুবৃহৎ হাতাঅলা গেঞ্জি। সেটা আর গেঞ্জি নেই, মনে হচ্ছে পাঞ্জাবি। মেয়েদুটো পরেছে মুকুর শাড়ি, পাটে পাটে জড়িয়ে। জ্যান্ত মমির মতো পায়ে পায়ে ঘুরছে। বাড়ি একেবারে জমজমাট। রান্নার ছ্যাঁকছোঁক শব্দ। চাকি বেলনে রুটি ঘুরছে গোল হয়ে।

একপাশে বসে বসে ঢুলছিলুম। মুকু এসে বললে, তুমি আগে খেয়ে শুয়ে পড়ো না! তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে।

শুয়ে পড়লে বাবা বকবেন। আর শোবই বা কোথায়? এতগুলো মানুষের বিছানার কী ব্যবস্থা হবে? ক'টা মশারি লাগবে জানো?

সে ভাবনা তোমার নয়, আমার। তোমাকে যা বলছি তাই করো। তোমাকে ভূতের মতো কাহিল দেখাচ্ছে।

মুকুর কী উপমা! ভূতের মতো কাহিল! মুকুকে একেবারে গার্ডেন-ফ্রেশ দেখাচ্ছে। শিশির-ভেজা গোলাপের মতো। টুসটুসে গাল, টসটসে ঠোঁট। আকাশি রঙের শাড়ি। মুকুর নিজস্ব একটা সুগন্ধ আছে, লিলিফুলের মতো। আজ যদি কেউ কোথাও না থাকত, তা হলে মুকুর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়তুম, সাবিত্রীর কোলে সত্যবানের মতো। অরণ্যের গল্প বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়তুম। স্বপ্ন দেখতুম, দামোদরের কূল ছাপিয়ে বান আসছে। প্রতিমুহূর্তে মানুষের প্রায় প্রতিটি ইচ্ছারই মৃত্যু হয়। মন হল ইচ্ছার মহাশ্মশান। মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে মুকুর গোল কবজিটা ধরি। বুকের কাছে মাথাটা একটু রাখি। উপায় নেই, একটা ছেলে একটা মেয়ে, সংসারের যত পাপের উৎস! লেবরেটরিতে আমরা যেরকম কালচার প্লেট তৈরি করি, এক জীবাণুর সঙ্গে আর এক জীবাণুকে মিলিয়ে, ছেলে আর মেয়ে সেইরকম পাপের কালচার প্লেট।

এই ঘোর বেশিক্ষণ স্থায়ী করা গেল না, ওঘর থেকে হরিশঙ্করের ডাক এল, প্লিজ হেলপ্ মি। ছোটদাদু তাঁর সেই অসাধারণ লাল সিল্কের লুঙ্গি পরে অনাবৃত ঊর্ধ্ব-দেহে বসে আছেন মহাযোগী। প্রশস্ত ফরসা বুকে স্ফটিকের মালা শীতল আগুনের মতো খণ্ড-শোভা ধরেছে। হরিশঙ্কর আমাদের সেই বিখ্যাত মর্গের পাল্লা খুলেছেন। একটা আলমারি। ছোট একটা ঘরই বলা চলে। জয়নারায়ণ ধরে আছেন টর্চ।

হরিশঙ্কর বললেন, আমাদের সেই উৎসবের মশারিটা বের করতে হবে।

তাঁবুর মতো বিশাল তার আকৃতি। ভেতরে দশ-বারোজন স্বচ্ছন্দে সিঁধিয়ে যেতে পারে। হরিশঙ্কর পরিকল্পনামতো তৈরি করিয়েছিলেন। মশার উৎপাতে জর্জরিত। সন্ধের পর চলতে গেলে ধাক্কা লাগে। মাথায় খেলল মশারি দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘর হবে। ঘরের অন্তর্বাস। তার ভেতর চেয়ার, টেবিল, যাবতীয় আয়োজন। পড়া তো যাবেই, তেমন হলে খানা খেতেও অসুবিধে হবে না। চাটনি আর গুড় তো খাওয়ার উপায় নেই। চাটনিতে মশার আত্মবলি, গুড় হল মশার কদমা। পরিকল্পনা মতো চলেছিল বেশ কিছুদিন। বাধ সাধলে আমাদের প্রিয় বেড়াল। মশারির গা বেয়ে চড়চড়িয়ে চালে গিয়ে ওঠে। চাল ঝুলে গেল। সেখানে সার্কাসকুমারীর মতো তার হরেক কসরত। লেখাপড়া তো মাথায় উঠলই। মশারিরও অস্ত্রোপচার। সে যে কী নিদারুণ দুষ্টুমি, অথচ কী সুইট!

সেই গ্রাম-বিশেষ মশারির সন্ধানে একদিক থেকে আমি, একদিক থেকে মুকু অ্যাডভেঞ্চারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

আমি ভয় করব না ভয়, করব না। দু'বেলা মরার আগে...।

জয়নারায়ণ বললেন, এর তো আলাদা একটা মৌজা, দাগনম্বর, খতিয়ান নম্বর থাকা উচিত, আলাদা পোস্টাপিস! আচ্ছা চাটুজ্যেমশাই, আর ইউ শিয়োর, যে এর মধ্যে অন্য আর কোনও প্রাণীর বসবাস নেই, যেমন ধরুন আরশোলা?

হরিশঙ্কর বললেন, আরশোলাকে আমি প্রাণী বলেই গণ্য করি না। ও আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। ভয় হল ইঁদুর।

জয়নারায়ণ একটু পিছিয়ে গেলেন। বলতে লাগলেন, সাবধান! সাবধান! লাফ না মারে।

হরিশঙ্কর বললেন, ওদের সাবধান করার আগে নিজের পালাবার পথটা দেখে রাখো। জয়, তুমি। যদি কোনও আর্মির জেনারেল হতে তা হলে কী দশা হত!

চাটুজ্যেমশাই, ছোটখাটো প্রাণীকেই আমি একটু সমীহ করি। বড়দের আমি ভয় পাই না। আপনি একটা বাঘ আনুন, আমি মালকোষ মেরে ঠান্ডা করে দেব।

এদিকে লেপ-কম্বল, বাড়তি বালিশের স্তূপে আমাদের দধিমন্থন চলেছে। সাদামতো গোল গোল গোটাকতক কী পুটপুট করে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে গেল। মাতুল লম্ফপ্রদান করে বললেন, গোখরো সাপের ডিম।

হরিশঙ্কর বললেন, আই অ্যাম সরি জয়। ওগুলো ন্যাপথলিনের বল।

শব্দ করে একটা পিতলের পিলসুজ মেঝেতে পড়ে কিছুদূর গড়াল। জয়নারায়ণ বললেন, শব্দটা শুনলেন চাটুজ্যেমশাই! পারফেক্ট পঞ্চমে স্টার্ট করে গান্ধার ছুঁয়ে নেমে গেল, বিশুদ্ধ ভূপালী।

হরিশঙ্কর বললেন, ওইজন্যেই তোমাকে ভালবাসি জয়। সংগীত তোমার ধ্যানজ্ঞান। সত্যিই তুমি গন্ধর্ব। বহুত হাঁটাকাহাঁটকির পর সেই মশারির গোলা বেরোল। হরিশঙ্কর বললেন, সাবধানে খোলো। দু'-চারটে আরশোলা বেরোতে পারে।

আরশোলা নয় কিছু উচ্চিংড়ে পুটপাট লাফিয়ে এদিক ওদিকে চলে গেল। সেই তালে মাতুল একটু নাচানাচি করলেন। হরিশঙ্কর বললেন, জয়, তোমার নাচের দক্ষতাও অস্বীকার করা যায় না। এটা ন্যাচারাল, না

শিখেছিলে?

জয়নারায়ণ বললেন, আজ্ঞে আরশোলাই আমার গুরু। সেই ছেলেবেলা থেকেই তালিম দিয়ে আসছে। এটা যা দেখলেন, ককরোচ ড্যানস।

অনেকটা কথাকলির মতো।

সেই রাতে বারান্দায় বিশাল পঙ্ক্তি ভোজ। পরপর বসে গেছি। জয়নারায়ণ বললেন, বেশ বিয়ে বাড়ি বিয়ে বাড়ি লাগছে।

আমার পাশে আমার পিসতুতো ভাই। চুপিচুপি বললে, এরা জল দেবে না?

চুপিচুপি বললুম, এদের নিয়ম খেতে বসে জল না খাওয়া। কড়া নিয়ম। খাওয়ার পাতে জল খেলে হজমশক্তি কমে যায়। গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড ডাইলুট হয়ে যায়। অম্বলের ব্যায়রাম হয়।

আমার যে গলায় আটকে যাচ্ছে।

কড়িকাঠের দিকে তাকাও, নেমে যাবে।

ছোটদাদু আমার আর একপাশে। তিনি বললেন, বলেছ ভাল। ওপর দিকে তাকালে সব বাধা সরে যায়।

মুকু একটা জায়গান্টিক বিছানা তৈরি করেছে। দেখার মতো। সেই বিশাল মশারি। পিসিমার পুরো পরিবার সেই মশারির ভেতর। পিসিমার ছোট মেয়ে হঠাৎ ফোঁস ফোঁস করে কান্না শুরু করল। পিসিমা বললেন, শুরু হল। কাঁদছিস কেন? বলবি তো কী হয়েছে!

কী বলবে? ওই বালিকার গুছিয়ে বলার ভাষা আছে কি? একটা সংসার চুরমার হয়ে যাওয়ার বেদনা। একটা গ্রাম, চেনা পরিবেশ, পরিচিত জীবন ছেড়ে আসার বেদনা। শিকড়সুদ্ধ তুলে এনে ভিন্ন এক মাটিতে বসিয়ে দেওয়া। মুকু মেয়েটিকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল। সে তখন স্বপ্ন দেখছে সবুজ মাঠ, একটি ছাগলছানা, ছাতা- বগলে পণ্ডিতমশাই, যত খেলার সাথী। দূর থেকে ভেসে আসছে কিশোরীকণ্ঠের ডাক□— উষি।

The flowers fall for all our yearning;
Grasses grow, regardless of our dislike.

মাতুল জয়নারায়ণ আর আমি একই বিছানায়। মুকু মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে গেছে। শৌখিন জয়নারায়ণের জন্যে বিছানাটাকে যতদূর সম্ভব পরিপাটি করেছে। বালিশে পরিচ্ছন্ন তোয়ালের ঢাকা। মাথার কাছে একটা টুলে চাপা দিয়ে গেছে এক গেলাস জল। ছোট একটা পেতলের পদ্মকাটা বাটিতে লবঙ্গ, বড় এলাচ। মাঝরাতে জয়নারায়ণের কাশি হয়; তখন প্রয়োজন হতে পারে। মুকুর নজর সব দিকে।

বিছানায় আমরা দু'জনে গড়াচ্ছি, বাইরে গড়াচ্ছে রাত। রাতের ভেলায় ভেসে চলেছে জীবজগৎ, নতুন দিনের কূলে। দু'জনেই চিত।

মাতুল জিজ্ঞেস করলেন, তুই কোন পাশে শুস?

সাধারণত বাঁ পাশে।

ধনুক হয়ে যাস?

না, স্ট্রেট।

তোর নাক ডাকে?

মনে হয় না।

আমার নাকে এফ শার্পে তারার সা বাজে, সিঁসিঁ করে। তখন আমাকে ঠেলে দিবি।

আমি তো এখনই ঘুমিয়ে পড়ব মামা।

হাই পিচ সাউন্ডে তোর যদি ঘুম ভেঙে যায় তা হলে আমাকে ঠেলে দিবি। জানিস তো, সারারাত আমি গান গাই। স্বপ্নে। বিশাল বিশাল সব আসর। মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন। এপাশে ওপাশে জাফরির কাজ। চারটে তানপুরা, সুরমণ্ডল, তবলায় আল্লারাখা, সারেঙ্গিতে লড্ডন খান, চারপাশে সমঝদার শ্রোতা। ধরেছি মারুবেহাগ।

মাতুল হঠাৎ একটা ইংরেজি কবিতা ধরলেন।

There they stand, the innumerable stars,
Shinning in order like a living hymn, written in light.

নীরব রইলেন কিছুক্ষণ। ফরসা কপালে আলতো পড়ে আছে বাঁ হাত। পূর্ণ চন্দ্রের আলো মাথার কাছের জানলা দিয়ে মুখে এসে পড়েছে। জয়নারায়ণকে অবিকল কবি কিটসের মতো দেখতে। দুধসাদা একটা ধুতি

দু'ভাজ করে লুঙ্গির মতো পরেছেন। ধবধবে সাদা গেঞ্জি। শরীরের ত্বক এত পাতলা যে ছোট ছোট শিরা আর ধমনীর রক্তস্রোত গোলাপি আভা ছাড়ে। খুব সাবধানে সংগ্রহে রাখার মতো একজন পরিপূর্ণ শিল্পী।

মাতুল আপন মনে গুনগুন করে খাম্বাজ আলাপ করতে লাগলেন। আমি জেগে থাকার অনেক চেষ্টা করেও একসময় ঘুমিয়ে পড়লুম। কতক্ষণ নিদ্রায় পাথরের একটা বাটির মতো তলিয়ে ছিলুম জানি না। হঠাৎ একটা ধাতব শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। যেন পেল্লায় এক ঘড়ি বাজল কোথাও। শব্দটা মনে হয় পাশের ঘরে হল। মাতুল ধারে শুয়েছিলেন, আমি দেয়ালের দিকে। অনেকক্ষণ হিসেব করলুম, অতল নিদ্রায় শান্ত শোলার মতো একটি মানুষকে না জাগিয়ে কীভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়া যায়! টপকাতে হবে। সাবধানে পায়ের ওপর দিয়ে শরীর স্পর্শ না করে মেঝেতে নেমে মশারিটা আবার খুঁজছি, জয়নারায়ণ বললেন, একটা কিছু হাতে নিয়ে বেরোও, চোর হতে পারে! জয়নারায়ণ নিদ্রা আর জাগ্রত অবস্থার পাতলা স্তরে অবস্থান করছিলেন, পা ডোবে না এমন জলে নৌকো বাওয়ার মতো। চোরের ভয় ধরিয়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্য থমকে যেতে হল। অতীতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। চোরের সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময়। চোর দাঁড়িয়ে আছে জানলার শার্সির বাইরে, আমি ঘরে। দু'জনেই দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, ওটা আমারই প্রতিবিম্ব। হঠাৎ খেয়াল হল তা কী করে হয়! আমার নাক তো অমন নয়। আমার ভুরু আছে, প্রতিবিম্বর ভুরু নেই। রং কালো। চোখদুটো মরামরা। ওটা তো আমি নই। তখনই আমি চোর চোর বলে চিৎকার করলুম চোর লজ্জায়, আমার ভয় পাওয়ায় লজ্জায় দোতলার কার্নিস থেকে এক লাফ মেরে একতলায় পড়ে পাঁচিল টপকে ছুটে পালাল। চোরের দোষ কেউ দিলে না, সকলে আমাকেই তিরস্কার করতে লাগল, তুই চিৎকার করলি কেন ইডিয়েট! চোর এলে নিজে চোর হতে হয়। পা টিপে টিপে পেছন দিক থেকে গিয়ে জাপটে ধরতে হয়। ধরেছি প্রভু! আর তোমাকে ছাড়ব না। যত বলি, কার্নিসের তো পেছন নেই। তার সবটাই তো সামনে। কেউ মানতে চায় না। তখন বললে, তা হলে নেমে গিয়ে লুফে নিলে না কেন! চোর যেন ক্রিকেট বল! ওভার বাউন্ডারির মারে আসছিল, ব্রাডম্যানের মতো ক্যাচ করব আমি। সিদ্ধান্ত হল, আমার মতো ভিতু এর চেয়ে আর কী করতে পারে!

দরজা খুলছি, জয়নারায়ণ বললেন, আগেই ঝট করে বেরোসনি। মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বাইরেটা দেখে নে। কত বড় চোর। ধরার শক্তি তোর আছে কি না! চোর ধরা প্রায় মাছ ধরার মতোই।

বাইরের দালান চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। রুপোর তবক মোড়া। দেয়ালে ঠাকুরদার অয়েল পেন্টিং চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রে রহস্যমণ্ডিত হয়ে জীবন্ত। ভিক্টোরিয়ান চেয়ারে আসীন গম্ভীর এক পুরুষ। হাতে আড়াআড়ি একটি ছড়ি। সেকালের সুখ্যাত প্রখ্যাত এক শিক্ষক। একালে তাঁর জীবিত ছাত্ররা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। তাঁর পৌত্র বলে অযাচিত স্নেহ করেন।

সেই মায়াময় দালানে অন্ধের মতো এক কিশোর টাল খাচ্ছে। পা লেগে গলা উঁচু মোরাবাদি ফুলদানি উলটে পড়েছে একপাশে। এই মাঝরাতে আমার পিসতুতো ভাই কী করতে চাইছে! দিগজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে বলেই মনে হয়! নীচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। সাবধানে দরজা খুলে এগিয়ে গেলুম।

কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় যাচ্ছ?

চমকে ফিরে তাকাল, ভয়ে ভয়ে বললে, আমি ছোট বাইরে করব।

ওদিকে নয়, বাথরুম এই দিকে।

ভাই বাথরুমে ঢুকেছে। দাঁড়িয়ে আছি। দালানের একেবারে শেষ ঘরে চাপা গলায় দু'জনে কথা বলছেন। অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের শব্দের মতো। যেন রাজকীয় দুটো ভোমরা ঘরে ঢুকে আছে। ভাইকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। রাতের অন্ধ পাখির মতো তার অনিশ্চিত ঘোরাফেরা মনে বড় দাগ ফেলে গেল। শীর্ণ এক কিশোর, সহায়-সম্বলহীন। আমাকে এই আঁধারে চালায় কে গো! এইরকম একটি সচল প্রশ্ন। বাইরে চাঁদের আলোর মুশায়েরা চলেছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম অপ্সরার মতো বাতাসে নাচছে। নিস্তব্ধ চরাচর। মনে হচ্ছে, বৃহৎ এক স্বপ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। ঘুমের জগতেই জেগে উঠেছি অশরীরী হয়ে। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলুম শব্দ লক্ষ করে। ঠাকুরদার অয়েল পেন্টিং যেন ফিসফিস করে ডাকলেন, পিন্টু! চললে কোথায়! নিদ নাহি আঁখিপাতে! আমি তো আপনাকে দেখিনি কোনওদিন, কিন্তু আপনি ওমনিপ্রেজেন্ট। যেখানেই যাই আপনার নাম।

দালানের শেষ ঘর। দরজার পাল্লা আধ-ভেজানো। দু'জনের কথা বলার শব্দ আরও স্পষ্ট। বাইরের দিকে তাকালুম, রুপোর আঁচল উড়িয়ে সুন্দরী রাত বিশ্বসভায় নাচছে। কোনও কবি কোথাও লিখছেন,

> কাল চৌধভিঁ কি রাত থি,
>   সফর রাহা, চর্যা তেরা
> কুছ নে কহা ইয়ে চাঁদ হ্যায়,
> কুছ নে কহা চেহেরা তেরা॥

হরিশঙ্কর যথার্থই বলতেন, রাত কত রহস্যময়। যারা ঘুমিয়ে কাটায় তাদের মতো বঞ্চিত আর কেউ নেই। সমস্ত অপ্রাণ বস্তুও রাতে প্রাণ পায়। সামান্য একটা চেয়ার, দেয়াল, ছড়ি, বেড়ানোর ছবি, সব জীবন্ত। দূর থেকে একটা চেয়ারকে দেখো। শূন্য ঘর, শূন্য টেবিল, শূন্য চেয়ার, দেয়ালে পূর্বপুরুষের একটি ছবি। সেই ছবি থেকে নিঃশব্দে তিনি নেমে এলেন। চেয়ারে বসলেন। চারপাশে তাকালেন। হয়তো হাসলেন, নয়তো রাগত। অদৃশ্য কাগজে লিখে গেলেন, অদৃশ্য চিঠি। তোমরা ঠিক পথে চলছ না। আমি যা চাইনি, তোমরা ঠিক সেইটাই করছ। আমার ধারা তোমরা ঘুরিয়ে দিতে চাইছ। আদর্শ-ভ্রষ্ট হচ্ছ! কিংবা তিনি কোনও নির্দেশ দিলেন। ভয় পেয়ো না। সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকো। তোমাকে অপমান করেছে করুক, প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোরো না, তাতে তুমি নিজেই অপরাধী হবে। একা হয়ে যাবে। গডস জাস্টিস, ডিভাইন প্রোটেকশন আর পাবে না। অথবা লিখবেন, প্রিয়জনের অসুস্থতায় তুমি বিচলিত। অসহায় বোধ করছ? প্রার্থনা করো। নিজেকে বোঝাও, জন্ম, মৃত্যু তোমার হাতে নেই। ধৈর্য, সহ্য এই তোমার হাতিয়ার। বি কাম, বি পেশেন্ট, সারেন্ডার।

তিনি তোমার জন্যে সব লিখে যাবেন, দূরে দাঁড়িয়ে তুমি শুধু অনুভব করো। মধ্যরাতের নিথর বায়ুমণ্ডলে ভেসে আসছে ভিন্ন জগতের বার্তা। তুমি ধরার চেষ্টা করো। গুড সোল এই সময়ে ঘুরে বেড়ান তোমাকে সাহায্য করার জন্যে। শুদ্ধ মনে তুমি তা গ্রহণ করো। তোমার সেন্স, তোমার পারসেপশনকে অসীম করো। দেহসীমাকে লঙ্ঘন করো। সূক্ষ্ম থেকে অতিসূক্ষ্ম হয়ে চেষ্টা করো আই অফ দি নিডল দিয়ে গলে যেতে। আদার ওয়ার্লডে যাওয়ার পথ ভারী সূক্ষ্ম। পথ আছে। সেটা স্থূল নয়। ভেরি মাইক্রসকোপিক। চেষ্টা করতে

হবে, আঁকুপাঁকু করতে হবে। এই জগতের নিয়মে সে জগৎ চলে না। সেখানে টাইম সাইকল ভিন্ন। সেখানে গ্রাভিটি নেই। সে জলে লোহা ভাসে, শোলা ডুবে যায়। হরিশঙ্কর এমারসনকে উদ্ধৃত করবেন, Great men are they who see that spiritual is stronger than any material force, that thoughts rule the world.

হঠাৎ পেছনে একটা খসখস শব্দ হল। ভয়ে চমকে উঠেছি। সাদা একটা মূর্তি। মাতুল জয়নারায়ণ। কাছে এসে চাপা স্বরে বললেন, কী রে, চোর পালিয়েছে?

চোর নয়, পিসতুতো ভাই।

তা তুই এখানে চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন চাঁদের আলোয়! জানিস না চাঁদের আলোয় অ্যানিমিয়া হয়। ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় বোঝাতে চাইলুম, চুপ করুন।

কানের কাছে মুখ এনে বললেন, কেন রে?

ঘরের ভেতর গুঞ্জন।

মাতুল শুনলেন। বললেন, চল না যাই। কেন বঞ্চিত হব চরণে!

দরজাটা ধীরে খোলা হল। ভেতরটা প্রথমেই দেখা গেল না। ডান দিক থেকে একটা দেয়াল দরজার দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। তৈরি করেছে বড় মাপের একটা খাঁজ। সেই অংশে হরিশঙ্করের নিজস্ব ল্যাবরেটরি। লম্বা একটা টেবিল। অ্যালুমিনিয়ামের পাত মোড়া। টেস্টটিউব, ফ্লাস্ক, জার, ব্যুরেট, ডিক্যান্টার, ডিস্টিলেশন ফ্লাস্ক, স্পিরিট বার্নার, কেমিক্যালস, রিএজেন্ট বটল, ছোট একটা হাপর। রাতের পর রাত এখানে কাজ চলে। ভেষজ কিছু একটা তৈরি করতে চাইছেন। একটা আমি জানি, দুরারোগ্য একজিমার ওষুধ।

বাঁ দিকে ঘুরতেই ঘরের ভেতরটা দেখা গেল। জানলার দিকে মুখ করে মেঝেতে আসন পেতে পাশাপাশি বসে আছেন ছোটদাদু আর হরিশঙ্কর। দুধের মতো চাঁদের আলোয় দু'জনে ভাসছেন। দু'জনের নাভির কাছ থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ উঠছে। ওঙ্কারের সঙ্গে আরও কিছু জড়িয়ে আছে। সেই শব্দে আমার বুকের কাছটা কাঁপছে, রোম খাড়া হয়ে উঠছে।

জয়নারায়ণ কানে কানে বললেন, অনাহত ধ্বনি।

আমরা সেই অপূর্ব দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি পাথরের মূর্তির মতো। এইসময় তো বিরক্ত করা উচিত হবে না। জয়নারায়ণ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই বসে পড়লেন। আমিও বসে পড়লুম। বসেই মনে হল, যে ভূমিতে বসেছি সেটাও প্রসারিত সংকুচিত হচ্ছে। যেন বিশালের বুকের ওপর বসে আছি।

জয়নারায়ণ এই প্রলোভন থেকে আর সরে থাকতে পারলেন না। নাভির কাছ থেকে ওম বলে একটা শব্দ তুললেন। মাতুলের সুরের সঙ্গে ওঁদের সুর মিলে ঘরে এমন একটা রেজোনেন্স্ তৈরি হল ওপাশের টেবিলে রাখা কাচের সব জিনিসপত্র ঝনঝন করে উঠল। মনে হল আমার মাথাটায় ভেতর থেকে চিড় ধরে যাবে। বেলের মতো ফটাস করে ফেটে যাবে। আমার আধার অতি ক্ষুদ্র। গুড়গুড়ে ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। মরে যাব না তো! জয়নারায়ণকে আর কে পায়? নাভি উন্মোচিত হয়েছে। স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র ভেদ করে সহস্রারে ফেটে পড়ছে শব্দ। অদ্ভুত তার কম্পন। শরীর ঝিঁঝিঁ পোকার মতো থিরথির করে কাঁপছে। জয়নারায়ণ সব ভুলে ভৈঁরোতে ধরলেন সেই বিখ্যাত গান:

মা মা রবে মন সুখে মন ত্রিতন্ত্রী বাজাও রে,
মায়ের রচিত সুমধুর বীণা বাজায়ে মা নাম গাও রে।
স্মরিয়ে ধূর্জটি মন্দ্র হতে উঠি, মধ্যগ্রামে যাও মন রে,
ক্রমে তারাপুরে উঠে তার স্বরে, তারা তারা ধ্বনি করো রে॥

ভৈরবের অলৌকিক চলন। ষড়জ থেকে পঞ্চমে উঠে, কোমল মধ্যম শুদ্ধ গান্ধার কোমল ঋষভ স্পর্শ করে আবার ষড়জে নেমে আসছে। ঐশ্বরিক সুর লহরী। দুই যোগীর সাধন ভঙ্গ হল। তাঁরা উঠে এলেন। বসে পড়লেন জয়নারায়ণের সামনে। জয়নারায়ণের কণ্ঠ ইস্পাতের ফলার মতো উদারা মুদারা তারায় অনায়াসে বিচরণ করছে। জয়নারায়ণ গাইছেন,

মিলায়ে অকার উকার মকার, মা নামের অগ্রে দিয়ে অলংকার
বাজাও সাধের বীণা বারবার, ভুবন কম্পিত করো রে।
মূলাধারে আছে নিদ্রিতা যোগিনী, নতমুখে সেই শিব সোহাগিনী,
তব বীণার ঝংকারে সুষুপ্তা দেবীরে, জাগায়ে প্রসন্না করো রে।
গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ঘেরি, সার্দ্ধ ত্রিকোটী তন্ত্রী সারি সারি,
বাজিছে নিয়ত মা মা করি, তব বীণার ভিতরে শুনো রে;
দীন রাম বলে মন কোরো নাকো হেলা, বাজাও সাধের বীণা এইবেলা
অজপা ফুরালে বীণা ফেলে যাবে আনন্দে আনন্দ নগরে।

ঝকঝকে মেঝে থেকে চাঁদের আলো ঠিকরে জয়নারায়ণের ঝিনুকের মতো মুখে পড়েছে। মনে হচ্ছে দেবতার মুখ। এক ফোঁটা, দুফোঁটা, জলের মুক্তোদানা গাল বেয়ে নামছে, যেন গাছের পাতা ভোরের শিশির ঝরাচ্ছে। গান শেষ করে জয়নারায়ণ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ছোটদাদু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি মহাসাধক। এইবার তোমার সব চলে যাবে জয়, অর্থ, বিত্ত, ভোগ, দেহসুখ, থাকবে শুধু তোমার মাতৃনাম। জেনে নাও, এই তোমার শেষ জন্ম। তুমি হলে সুরলোকের গান্ধার। রিক্ত হয়ে সুরের ভেলায় চড়ে চলে যাবে পূর্ণের কূলে।

জয়নারায়ণ বললেন, তাই হোক। তবে তাই হোক।

চন্দ্রালোকের ঘনত্ব কমছে। আগামী দিন জল ঢালতে শুরু করেছে দুধে। বিশ্বপ্রসবিনী এক আশ্চর্য কামধেনু। আমরা আমাদের উল্লাসে অন্যান্য ঘুমন্ত প্রাণীদের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। ধীরে দরজা খুলে মুকু এসে একপাশে বসল। শেষরাতের ঘুম-ভাঙা মেয়েদের দেখলে মনে হয় রাতের ট্রেনে বিদেশ যাচ্ছি সুখের সুটকেস নিয়ে। মুকুর আয়ত চোখে নিদ্রার তলানি। বাসি মুখ প্রসন্ন। শাড়ি নিভাঁজ নয়। গোল গোল ফরসা হাতে সোনার চুড়ির চেকনাই।

ছোটদাদু বেশ আয়েশ করে বসেছেন খুশি খুশি মুখে। আসনে বসলেই এঁদের বিশ্রাম হয়ে যায়। হরিশঙ্কর প্রসন্ন। মনে হল এইবার কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে, এমন পরিবেশ, এই সুযোগ আর হয়তো আসবে না

জীবনে। জানতে চাইলুম, কেমন করে একজন মানুষকে দেখেই তিনি তাঁর সম্পর্কে গড়গড় করে সবকিছু বলে যান? এর কি কোনও বিজ্ঞান আছে!

ছোটদাদুর মুখে হাসি খেলে গেল। বললেন, অবশ্যই আছে। প্র্যাকটিক্যাল সায়েন্স। করে পেতে হবে, অর্থাৎ কৃপা। শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কাম জীবন যাপন করলেই এই শক্তি অর্জন করা যায়। অহংকার খুলে বেরিয়ে আসতে পারলেই যে-কোনও মানুষের জীবনে প্রবেশ করা যায়। অন্যের উনুনের ধোঁয়া যেভাবে বাড়িতে ঢোকে সেইভাবে তোমার মনও অন্যের মনে ঢুকে যেতে পারে। তুমি তখন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পাবে ছবির মতো। তা হলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি গল্প শোনো। মহাত্মা রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলীর একজন। একদিন তিনি চলেছেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরকে দর্শন করবেন। শ্যামবাজারের পোলের কাছে ময়রার দোকান থেকে কয়েক পয়সার জিলিপি কিনেছেন। জিলিপি কিনে ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছেন। গাড়ি ছাড়বে। কোথা থেকে ছ-সাত বছর বয়েসের এক মুসলমান ছেলে এসে বলছে, বাবু একটা জিলিপি। রামচন্দ্র কিছুতেই তাকে জিলিপি দেবেন না। জিলিপি কিনেছেন ঠাকুরের জন্যে। তাকে কেন দেবেন! গাড়ি চলতে শুরু করল। নাছোড়বান্দা ছেলেটি পেছন পেছন ছুটছে। হঠাৎ রামবাবুর মনে হল, এ হয়তো ভগবানের ছলনা। ভগবান পরীক্ষা করছেন। তাঁর মনে পড়ে গেল সেই গল্পটি, এক সাধু রুটি তৈরি করে একটু ঘি আনতে গেছেন। এসে দেখেন, একটা কুকুর রুটি মুখে করে পালাচ্ছে। সাধু তার পেছন পেছন দৌড়োচ্ছেন আর বলছেন, রাম অপেক্ষা করো, রুটিগুলোয় ঘি মাখিয়ে দিই। মনে হওয়ামাত্রই রামবাবু একটা জিলিপি তুলে ছেলেটিকে ছুড়ে দিলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে এই ঘটনা তিনি আর কাউকে বললেন না। বিকেলবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করলেন, রাম, তুমি আমার জন্যে কী এনেছ? রামবাবু ভয়ে ভয়ে জিলিপির ঠোঙাটি তাঁর সামনে রেখে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাকুর বাঁ হাতে জিলিপিগুলো চটকে হাত ধুয়ে ফেললেন। খেলেনও না, কিছু বললেনও না। পরে একদিন রামবাবুর বন্ধুস্থানীয় একজনকে বলেছিলেন, ওদের সাবধান করে দিয়ো, দ্রব্যের অগ্রভাগ বেরিয়ে গেলে, সে জিনিস আর ঠাকুরের সেবায় ব্যবহার করা যায় না।

ঠাকুর কীভাবে জেনেছিলেন! মনকে যদি বিশ্বমন, চোখকে যদি বিশালের চোখ করা যায়, তা হলে সবই জানা যায়। একবার ঠাকুরের এক ভক্তের পালিতা কন্যার কলেরা হয়েছে। তিনি রামকৃষ্ণকে স্মরণ করছেন। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। অর্থাৎ শোনা যায়। বহু দূর থেকেও শোনা যায় ভক্তের কাতর ডাক। সে ডাক কান শোনে না, শোনে মন। তুমি যে-বিজ্ঞান জানতে চাইছ, সে বিজ্ঞান হল, মনের নিয়ন্ত্রণ। এদিকে কিছু করলে ওদিকে কিছু হয়। যেমন ঘটি মাজলে ঝকঝকে হয়, আয়নার কাচ পরিষ্কার করলে নিজের মুখ আরও পরিষ্কার দেখা যায়। যেমন গ্রামোফোনের স্টাইলাস পরিষ্কার করলে রেকর্ডের শব্দ আরও ঝনঝনে শোনায়। যেমন দূরবিনে চোখ রাখলে অনেক দূর দেখা যায়। এ-ও তাই। এর মধ্যে অলৌকিক যা, সেটা হল এক ধরনের জীবনযাপন। নাক বুজে থাকলে গন্ধ পাবে না, কানে খোল থাকলে শব্দ পাবে না। ব্যাপারটা হল খুলে দেওয়া, খুলে যাওয়া।

হরিশঙ্কর বললেন, ওপনিং আপ।

ছোটদাদু বললেন, এই বিজ্ঞান রবীন্দ্রনাথের সেই সুন্দর গানে একেবারে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে,

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে

দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি—পেয়েছি আঁধার রাতে॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে॥

বৃষ্টিতে পড়ে থাকলে ভিজবে, রোদে ফেলে রাখলে পুড়বে, ফুলের বাগানে রাখলে সুগন্ধ পাবে, মাছের বেপারী হলে আঁশগন্ধ নেবে নাকে, সংসারে সংসারীর কোলাহল, মন্দিরে মন্ত্র, আরতির ঘণ্টা, নিজেকে রাখা এইটাই হল বিজ্ঞান। মিনারে রাখলে আলো, বাতাস, দূরদর্শন, পাতালে অন্ধকার। কাকে রাখবে? দেহ নয়। এ বিজ্ঞানের সম্পর্ক দেহের সঙ্গে নয়, সে হল ভোগবিজ্ঞান, এ হল মনের ব্যাপার, মনোবিজ্ঞান।

প্রশ্ন করলুম, দামোদরের তীরের সেই গ্রামের পুকুরে আপনি যখন গভীর অন্ধকারে স্নান করতে যাচ্ছিলেন তখন আপনার পায়ের কাছে অলৌকিক আলো দেখেছি। সেটা কী?

আজ তুমি সবই জেনে নিতে চাইছ! তা নাও। আর তো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। আর আমার কণ্ঠও রুদ্ধ হয়ে যাবে। কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে।

হরিশঙ্কর বললেন, তার মানে?

ছোটদাদু হাসলেন। গানের বাকি অংশটা শোনালেন,

এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানেগানে॥
রাজার পথে লোক ছুটেছে, বেচা কেনার হাঁক উঠেছে
আমার ছুটি অবেলাতেই দিন-দুপুরের মধ্যখানে
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে কেন যে তা কেই-বা জানে॥

হরিশঙ্কর অধৈর্য হয়ে বললেন, রহস্যটা কী?

রহস্য! এই পথে এক কাঁকড়া বিছে আছে। তার নাম কর্কট। শেষ সংগীত সেই লেখে। সে হল ঈশ্বরের দূত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কী হয়েছিল হরি?

হরিশঙ্কর কেমন যেন আতঙ্কিত হলেন, তার মানে ক্যান্সার! তোর ক্যান্সার হবে?

হবে কী! হয়ে আছে।

সেকী! আমরা জানি না!

জানালে তো জানবি! কাল, কাল কেন আজই বলি, ভোর তো হয়েই এল। আজ বেলা বারোটার সময় আমার স্বর বন্ধ হয়ে যাবে। আর ঠিক এক মাস পরে আমার স্বরনালী ফেটে যাবে। ইট উইল ওপন আপ। আমি ধীরে নিঃশব্দে বিলীন হয়ে যাব মহাকালে।

জয়নারায়ণ বললেন, তা কী করে হয়? আমাদের ফেলে চলে যাবেন? আমরা চিকিৎসা করাব।

ছোটদাদু বললেন, কর্কটের কোনও চিকিৎসা নেই। সারেন্ডারই চিকিৎসা। শুনে রাখো, আজ এই ঘরে এই মুহূর্তে আমরা যারা বসেছি জলসায়, সকলেই ওই একই আশীর্বাদে দেহমুক্ত হব। তোমার হবে প্রসট্রেটে, হরির হবে ইনসাফেগাসে, পিন্টুর হবে লিভারে, মুকুর হবে ব্লাডে। নদীর এপার থেকে একটি একটি করে খুলে

যাবে তরী। আগে আর পরে। এই পথের এই পরিণতি, মন খারাপ কোরো না। মনে দুটো আকার যোগ করো, হয়ে যাবে মানা। মন, মান, মানো, মানা, এই হল ম-এর শব্দরূপ। এখন পিন্টুর প্রশ্নের উত্তর, শোনো পিন্টু, যোগ মানে নিজের শক্তিবলয়ের সঙ্গে সম্যক সংযোগ। যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই দেহভাণ্ডে। তুমি বসে আছ ভূমিতে। তোমার মাথার চাঁদি, তার পরেই আকাশ। এই তো তোমার বিস্তৃতি। আকাশ মানে অবকাশ মানে আভাস মানে অক্লেশ মানে অশেষ। গুহ্য থেকে মস্তক-শীর্ষ, সাতটি ভূমি। সপ্তভূমিতে সহস্রার। সেই সহস্রদলকমলে পরমশিব, পরমাত্মা। কুণ্ডলিনীদেবী সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের বাসনায় সদা ছটফট করছেন। পিন্টু, রমণ বাইরে নেই, আছে জীবের ভেতরে। যোনি দেহনিম্নে নেই আছে দেহশীর্ষে। কুণ্ডলিনী দেবী কখনও ভেক, কখনও মীন, কখনও বা মর্কট গতিতে মূলাধার থেকে সহস্রারে উঠছেন, নামছেন। পরমশিব কুণ্ডলিনীশক্তির আশ্রয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন। দেখছেন চিদাকাশে বিবিধ নাম রূপ-বিশিষ্ট বিশ্ব বুদবুদের মতো ফুটছে ফাটছে। কখনও তিনি সচ্চিদানন্দ সাগরে লীন হয়ে যাচ্ছেন। পিন্টু, সাধন ছাড়া এই উপলব্ধি কথার কথা। রাজপথ বাইরে নেই আছে ভেতরে। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল এই ভেতরে। ভেতর থেকে বাইরে যেতে হয়। দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পাহাড়তলিতে হাঁটছেন। গুরু আর শিষ্য। হঠাৎ এক সার হাঁস উড়ে গেল। গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, কী গেল? শিষ্য বললে, বুনো হাঁস। উড়ে যাচ্ছে কোথায়? শিষ্য বললে, প্রভু ওরা উড়ে চলে গেছে। গুরু সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের নাক খামচে ধরে মোচড়াতে লাগলেন। শিষ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। গুরু বললেন, এই যে তুমি বললে উড়ে চলে গেছে। আমি দেখছি, শুরু থেকেই তারা এখানেই রয়েছে।

পিন্টু এর মানে কী? মন দেহেই বদ্ধ। দেহ ছেড়ে উড়তে পারে না, জানে না, অভ্যাস নেই। পারলে বলতে পারত হংসবলাকা কোথায় উড়ে যায়! জানতে পারত জীব কোথা হতে এসে কোথা ভেসে যায়।

ছোটদাদু হঠাৎ ধ্যানস্থ। নীরব সরবতায় ঘর ভরে গেল। চাঁদ তুলে নিয়েছে লোটানো আঁচল। সূর্যসারথির স্বর্ণ ছায়ার মৃদু আভাস পূর্ব গবাক্ষে।

Thirty spokes will converge
In the hub of a wheel
But the use of the cart
Will depend on the part
Of the hub that is void.

রাত শেষ হয়ে এলে কেন আমার দুঃখ হয়! কেন হায় হায় করে ওঠে আমার ভেতরটা! হরিশঙ্কর, জয়নারায়ণ আমাকে এই উত্তরাধিকার দিয়েছেন। আমার মায়ের শরীরে যে-রক্ত ছিল, জয়নারায়ণের শরীরেও সেই রক্ত। তার সঙ্গে মিশেছে হরিশঙ্করের ধারা! হরিশঙ্করে মিলেছে ছোটদাদুর বংশের বীজ। এঁরা সবাই নিশাচর। যত রাত বাড়ে, তত এঁদের আনন্দ বাড়ে, কর্মোদ্দীপনা বাড়ে। সবাই জেগে ওঠেন ভিন্ন এক জগতে। সে জগতে রহস্য, সে জগতের অন্য মাত্রা, অন্য বায়ু চলাচল। আকাশের ছায়াপথ নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে নেমে আসে, ভেসে আসে পরলোকের কণ্ঠস্বর, বিশাল বিশাল ভাব অতিথি হয়ে আসে, মনের ঝিনুক খুলে গড়িয়ে পড়ে চিন্তার মুক্তো। আমি যে এঁদেরই শরিক।

ছোটদাদু হঠাৎ সচেতন হলেন। নিজেকে গোটাতে চাইলেন একটি শ্লোকে,

কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুযো যদ্ অসদ্ব্যয়ঃ।
মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়ো মন্দায়ুষশ্চ বৈ।
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত থেকে বললেন ছোটদাদু। এই বংশের সমস্ত মানুষের অসাধারণ স্মৃতি। ছোটদাদু শৌনকের উপলব্ধিই ব্যক্ত করলেন, কী লাভ অযথা গালগল্পে। আয়ুক্ষয় ছাড়া তো অন্য কোনও ফল হবে না। যারা অলস, যারা নির্বোধ, তাদের পরমায়ু এইভাবেই ক্ষয় হয়, রাতে ঘুম, দিনে বৃথা কর্ম।

ছোটদাদু কাচের টুকরোর মতো হাসলেন। হেসে বললেন, পিন্টু। জীবনে এমন কিছু আশা কোরো না যা তোমার আয়ত্তের বাইরে। সাধনজগতের একটা সত্য তোমাকে বলে যাই, এখানে জোর করে লড়াই করে কিছু পাওয়া যায় না। আপনি এসে ধরা দেয়। There is a treasure in the deep mountains; He who has no desire for it finds it. এ জগতে এক হাতে তালি বাজে, এক ডানাতে পাখি ওড়ে, এক পায়ে মানুষ চলে, একটা চোখে মানুষ দেখে। এ তোমার সোনার খনি দেখে এগোনো নয়, এগিয়ে সোনার খনি পাওয়া। এক কাঠুরে মাথায় এক বোঝা ডালপালা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে। এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যাও। পরের দিন সে সন্ন্যাসীর কথায় এগিয়ে গেল। দেখলে মোটা মোটা

কাঠের জঙ্গল। সেদিন যতদূর পারলে কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পয়সা পেলে। পরের দিন আবার সে মনে মনে ভাবতে লাগল, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন, ভাল, আজ আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন? সে এগিয়ে গিয়ে চন্দনকাঠের বন দেখতে পেলে। সে সেই চন্দনকাঠ মাথায় করে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশি টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে করলে, আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন। সে সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে তামার খনি দেখতে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগল—ক্রমে ক্রমে রুপো, সোনা, হিরের খনি পেয়ে মহা ধনী হয় পড়ল। এই হল ধর্মের পথ। ভ্রমণকাহিনি পড়লে হবে না। সংকল্প নিয়ে, নির্দেশ মেনে এগোতে হবে। একটু-আধটু রূপ জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই লাভ করে যে মনে করে আমার সব হয়ে গেছে, সে মরেছে।

ছোটদাদু শব্দ করে হাসলেন। আমরা বসে আছি স্তব্ধ হয়ে। গলাটা একটু ধরাধরা লাগছে।

হরিশঙ্কর বললেন, ধর্ম ছাড়া কি পৃথিবীতে আর কিছু নেই?

ছোটদাদু বললেন, অবশ্যই আছে। ভোগ আছে, দুর্ভোগ আছে। সাফল্য-অসাফল্য আছে। রোগ শোক জরা ব্যাধি আছে। ধর্ম হল বিচার। ধর্ম হল গণিত। ধর্ম হল হিসেব। ধর্ম হল ইনসেক্টিসাইড, পেস্টিসাইড। ধর্ম হল বুদ্ধি। লেজেগোবরে না হওয়ার কায়দা। বাঁচব, মরার সময় মরব। রোজ একবার করে মরব না। ধর্ম মানুষকে ঝকঝকে একটা জীবন দান করে। ধর্ম হল অলৌকিক এক টুথপেস্ট। মনের দাঁতকে ঝকঝকে করে। জীবনের দুর্গন্ধ দূর করে। ধর্ম নিয়ে ন্যাকামি চলে না, কাব্য চলে না। রোমান্টিকতা চলে না, ধর্ম হল কোদাল। মনের কৃষিকাজ ধর্মের কোদাল ছাড়া চলে না। হয় না।

হরিশঙ্কর বললেন, একটা জিনিস আমার মাথায় আসছে না, তোমার যদি মনেই হয় ক্যান্সার হয়েছে, তা হলে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ না করে, বিজ্ঞানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করছ না কেন! এটা কি একটা ন্যাকামি, একটা রোমান্টিকতা নয়?

ছোটদাদু হেসে বললেন, এটা আমার মনে হওয়া নয়, এটা ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস। ক্যান্সার সারে না। চিকিৎসা মানে শরীরের ওপর অকারণ অত্যাচার আর টাকার শ্রাদ্ধ। বুদ্ধিমানের কাজ হল, চুপ করে বসে দেখো কী হয়! প্রেমিক হয়ে যাও। মৃত্যু-প্রেমিক। ধীরে ধীরে তাকে আসতে দাও। আমি ন্যাকা নই, রোমান্টিক ফুল নই, আমি বুদ্ধিমান। এ বিট ইনটেলিজেন্ট। ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, এ হল দুরারোগ্য ব্যাধির কাছে সারেন্ডার। ছোট জীবন সুখের, দীর্ঘজীবন দুঃখের। আমার কোথাও কোনও বন্ধন নেই। তোমাদের একটা হেঁয়ালি শোনাই। একটু বোঝার চেষ্টা করো।

মনে করো একটা সাপ। এই মেঝেতেই শুয়ে আছে। সাপটা কপাত করে একটা ব্যাং গিলেছে। গেলার পর অলৌকিক কারণে সাপটা স্রেফ উবে গেল। সাপটার পেট যে জায়গায় ছিল মেঝেতে, দেখা গেল সেই জায়গায় ব্যাংটা বসে আছে হতভম্ব হয়ে, ব্যাংটা মরেনি। এইবার ওই ব্যাংটাকে বোঝার চেষ্টা করো। ব্যাং কী ভাবছে, তার মনের অবস্থাটা কী?

হরিশঙ্কর হা হা করে হেসে বললেন, আরে এ তো চরম বেদান্তের গল্প। সুন্দর একটা অ্যালিগরি, অথরবাবা। সাপ আছে ব্যাংটার মনে, ব্যাংটার সংস্কারে। যুগ যুগ ধরে সাপ ব্যাং খায়। যেমন যুগ যুগ ধরে সংসার নামক ময়াল সাপ মানব নামক জীবকে গিলে বসে আছে। সংসার বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের

গিলে বসে আছে, এই অনুভূতি আমাদের সংস্কারে চলে গেছে। নড়তেও পারি না, চড়তেও পারি না, পড়ে আছি জবুথবু হয়ে। কী ঠিক বলেছি কি না!

ছোটদাদু বললেন, এই তো চাই হরিশঙ্কর! এমন একটা পরিষ্কার মাথা না হলে ধর্মের অধিকারী হওয়া যায় না। পিন্টু, আজ তোমাকে একটা কথা বলে যাই, সন্ন্যাসী আর গৃহীতে তফাত বিশেষ নেই। সন্ন্যাসীর মন যদি গৃহীর মন হয় তা হলে বাইরের গেরুয়া হল সাজমাত্র। মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙালে কী হবে যোগী! গৃহীও মন রাঙিয়ে যোগী হতে পারে। তোমার মাতামহ, মাতুল, তোমার পিতা সকলেই মহাসাধক। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। যে-কোনও ভেকধারী সন্ন্যাসীর কান কেটে দিতে পারে। কৌশলটা কী জানো, আরোপ করো। সেটা কী? একটা প্রতীকে তোমার মন স্থাপন করো। যেমন বৃক্ষ। সবসময় মনে করবে তুমি একটা বিশাল গাছ। সেই গাছে অসংখ্য পাতা। একটা দিন মানে অসংখ্য মুহূর্ত। কয়েক কোটি মুহূর্ত নিয়ে একটা দিন। একটা দিন মানে ষড়ঋতু। তোমার সকাল হল বসন্ত। মুকুলিত মুহূর্তের পত্রসম্ভার নিয়ে বৃক্ষরূপী তুমি দিন শুরু করলে। দ্বিপ্রহর হল গ্রীষ্ম। মধ্যাহ্নের দিন ঢলে যাওয়ার বিষণ্ণতায় বর্ষার অনুভূতি। অপরাহ্নের শরতে তুমি দিবসের ফসল তুলবে গোলায়। সন্ধ্যার হেমন্তে নামবে নির্জনতা। দিনের চোখ বুজে এল। যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল, পাখি ফিরে চলো কুলায়, ব্যস্ত জনপদ শান্তির কর্মবিরতির আচ্ছাদনে। রাত আসছে, আসছে শীত, আসছে জৈব-নিদ্রা। একে একে ঝরে গেল একটি দিনের সব মুহূর্তের পাতা। প্রতিটি মুহূর্ত যেন কারণে ঝরে। অকারণে নয়। কর্মের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দাও তোমার ওই বিল্ববৃক্ষের এক-একটি ত্রিপত্র। ত্রিপত্র মানে, স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। বৃক্ষ অচল, বৃক্ষ অটল, সে শুধু উর্ধ্বে ওঠে, সসীম থেকে অসীমে যেতে চায়। আকাশে ডালপালা বিস্তার করে নৃত্য করে। পাখি হল রমতা সাধু। বৃক্ষকে সঙ্গ দেয়, ঈশ্বরের নাম শোনায়। আর বৃক্ষের ভূমি কী? সংস্কার। আর প্রাণরস কী? বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তুমি আসবে কীভাবে? ধ্যানের মাধ্যমে। পুজোর চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড়। নিক্তির ওপরের কাঁটা, নীচের কাঁটা। ওপরের কাঁটা হল ঈশ্বর-শক্তিতে বিশ্বাস আর নীচের কাঁটা হল মন। মাঝে মাঝে দেখে নাও, ওপরের কাঁটার সঙ্গে নীচের কাঁটা মিলেছে কি না! যদি এদিক ওদিক হয়ে গিয়ে থাকে, বুঝতে হবে স্মরণে চলেছ, অবিশ্বাসে হেলেছ। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হও। চোখ বোজাও। বিচারে বোসো। ঝুঠা সোহাগ জগৎ কী রী সজনী, হোয় হোয় মিট জাসি/ মাতা পিতা সুত কুটুম কবীলা, টুটু গয়া জ্ঞাঁ তাগা। প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সোহাগ, পিতা, মাতা, আত্মীয়-কুটুম্ব সব দু'দিনের। ইন দেহকা গরব ন করনা, মাটিমে মিল জাসি/ এ সংসার চহরকি বাজি সাঁঝ পড্যাঁ উঠ জাসি। জগতের এই বিচিত্র রং-ঢং, কড়াক্রান্তি, গাড়ি-বাড়ি, সাজসজ্জা, যা কিছু দেখছ, এ সবই জাদুকরের জাদুখেলা। জীবনসন্ধ্যায় দেখবে সব ভোঁ-ভাঁ। জো দিন গয়ে সো ফির নহি আবৈ, অন্ত সময় কোই কামন আবৈ, জব জম লেহি বোলায়। জয়নারায়ণ, তোমার সেই বিখ্যাত গান:

আমার দিন তো চলে যায় মা,
আর কবে দেখা দিবি, ধুলা ঝেড়ে কোলে নিবি,
বড় দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি আয় মা॥

জো দিন গয়ে সো ফির নহি আবৈ। আর শেষে যখন যম এসে ধরবে তখন কেউ আসবে না সাহায্য করতে। ইন দেহকা গরব ন করনা, মাটিমে মিল জাসি। এই হল বিচার। গানের চর্চা তো করো, তা এই গানটা

গাইতে পারো? ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম। জয়, ধরো না। শেষ গানটা গেয়ে যাই। ধরো, গলা মেলাও।

জয়নারায়ণ বললেন, তা হলে হারমোনিয়মটাও আসুক। সুরে সুর লেগে যাক

আমি উঠতে যাচ্ছিলুম, মুকু বললে, তুমি বোসো, আমি আনছি।

হারমোনিয়ম এসে গেল। শুরু হল গান। ছোটদাদু যেন ভাবসাগরে ভাসছেন। ক্ষীরের মতো চেহারা। পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত বসে থাকা। জয়নারায়ণ সুর ভাসালেন,

ভবে আসা খেলতে পাশা, বড় আশা করেছিলাম।
আশার আশা ভাঙা দশা, প্রথমে পঞ্জুড়ি পেলাম।
প'বারো আঠারো ষোলো, যুগে যুগে এলাম ভাল,
(শেষে) কচে বারো পেয়ে মাগো, পঞ্জা ছক্কায় বদ্ধ হলাম।
ছ-দুই-আট, ছ-চার-দশ কেউ নয় মা আমার বশ;
খেলাতে না পেলাম যশ, এবার বাজী ভোর হইল।

ছোটদাদু বললেন, জয়, রামপ্রসাদী তুমি এত ভাল গাও! চেহারা পালটে দিয়েছ। পঞ্জুড়ি মানে কী? পঞ্চভূত। পঞ্জা-ছক্কায় বন্দি হওয়া অর্থাৎ পঞ্চভূত ও ছয় রিপুর বশ হওয়া। ছ-তিন-নয়ে ফাঁকি দিব। ছয়কে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ ছয় রিপুর বশ না হওয়া। তিনকে ফাঁকি দেওয়া অর্থাৎ তিন গুণের অতীত হওয়া। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ□— এই তিন গুণেতেই মানুষকে বশ করেছে। তিন ভাই, সত্ত্ব থাকলে রজকে ডাকতে পারে, রজ থাকলে তমকে ডাকতে পারে। তিন গুণই চোর। তমোগুণে। বিনাশ করে, রজোগুণে বদ্ধ করে, সত্ত্বগুণে বন্ধন খোলে বটে; কিন্তু ঈশ্বরের কাছ পর্যন্ত যেতে পারে না। কিন্তু পথ দেখিয়ে দেয়।

ভোরের প্রথম পাখিটি কোথাও চিঁক করে উঠল, যেন দিনের কপাট অল্প একটু ফাঁক হল। ছোটদাদু মহানন্দে মশগুল। আমি ভাবছি, আর একটু পরেই এই আসর ভেঙে যাবে। এই মুহূর্তের সমন্বয় আর জীবনে ঘটবে না। সময় আর নদী একই ধারা। এক জল একই জায়গা দিয়ে দু'বার বহে যাবে না। অলওয়েজ নিউ, এভার চেঞ্জিং। ভাল লেগেছে বলে দৃশ্য ঘটনাকে আবার ইচ্ছামতো সাজানো যাবে না। মালা হতে ফুলগুলি ছিঁড়ে ঝরে যায়।

হরিশঙ্কর বসে আছেন স্তব্ধ আকাশের মতো। ঘটনাকে মেনে নেওয়ার অসীম ক্ষমতা তাঁর। তিনি বলেন, মানুষ হল আইসক্রিম। খোলের ভেতর সময় ভরা। টসটস করে ঝরে যাচ্ছে মুহূর্ত। জীবন হল মোমবাতি। জ্বলবে আর গলবে, নিঃশেষ একদিন। হরিশঙ্করের দর্শন হল, No one throws a stone at a barren tree. ফল ধরে আছে যে-গাছে, সেই গাছেই লোক ঢিল ছোড়ে। সফল জীবনই মানুষের আক্রমণের লক্ষ্য।

ছোটদাদু নড়েচড়ে বসে বললেন, এইবার তোমাদের অনুমতি ছাড়াই আমি একটা কাজ করব?

হরিশঙ্কর প্রশ্ন করলেন, কী কাজ! তুমি আবার অনুমতি নেবে কী, আমরাই তোমার অনুমতি নোব। বলো কী কাজ তুমি করতে চাও?

আমি একটা ব্রিজ তৈরি করব। ছোটদাদু হাসছেন।

সকলেই একটু অবাক। ব্রিজ তৈরি করবেন মানে? কোন নদীর ওপর?

হরিশঙ্কর বললেন, রহস্য কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হওয়া দরকার।

ছোটদাদু বললেন, পিন্টু, তোমার রাজবেশ পরে এসো। সিল্কের পাঞ্জাবি, গরদের ধুতি। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম লাগাবে।

কেন ছোটদাদু?

আমি যে প্রশ্ন পছন্দ করি না পিন্টু।

আমার যে ওর কোনওটাই নেই।

তা হলে সাদা ধুতি আদ্দির পাঞ্জাবি পরে এসো।

জয়নারায়ণ বললেন, তোর না থাকে আমার আছে। যা পরে আয়, তোর দীক্ষা হবে।

হালকা পালকের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। দীক্ষা মানে ত্রিজন্ম। উপনয়নে দ্বিজন্ম হয়ে গেছে। সেজেগুজে ঘরে ঢুকতেই ছোটদাদু বললেন, মুকু, তুমি একটা টকটকে লাল শাড়ি পরে এসো। লাল শাড়ি তোমার আছে, আমি দেখেছি।

জয়নারায়ণ বললেন, আমরাই বা কেন বাকি থাকি?

ছোটদাদু বললেন, ঠিকই তো। হরিকে নিয়ে যাও। বেশ ধোপদুরস্ত হয়ে এসো। মুকু, তুমি দু'খানা পুজোর আসন, গঙ্গাজলের ঘটি, কোষা-কোষী, তাম্রকুণ্ড, ধূপ, ধূপদানি, দেশলাই, প্রদীপ নিয়ে আসবে।

একটা কিছু হবে, এই আনন্দে সব হয়ে গেল। পরিপাটি আয়োজন। ছোটদাদু আমাকে আর মুকুকে পাশাপাশি আসনে বসালেন। আমার বাঁ পাশে মুকু। প্রদীপ জ্বলছে। ধূপের ধোঁয়া পাক খাচ্ছে উষার ফিকে গোলাপি আলোয়। আমাদের সামনে কোষা-কোষী, তাম্রকুণ্ড। ছোটদাদু বসেছেন সামনে পদ্মাসনে।

ছোটদাদু বললেন, জয়, তোমার আঙুলে দুটো আংটি। ও দুটো কি গ্রহশান্তির জন্যে?

আজ্ঞে না। শখের আংটি।

যে-কোনও একটার মায়া ছাড়তে পারবে?

কেন পারব না!

তা হলে মুকুর অনামিকায় একটা পরিয়ে দাও। পিন্টুর হাতে একটা রয়েছে দেখছি।

মাতুল মহা উৎসাহে মুকুর আঙুলে আংটি পরিয়ে দিলেন। বাইরে কলকল করে পাখি ডাকছে।

ছোটদাদু বললেন, ব্যাপারটা কী হতে চলেছে বলে তোমাদের অনুমান?

জয়নারায়ণ বললেন, দীক্ষা।

ছোটদাদু বললেন, না, দীক্ষা নয়, বিবাহ।

হরিশঙ্কর, জয়নারায়ণ দু'জনে একসঙ্গে বললেন, বিয়ে!

আমার বুকের ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। বিয়ে! এইভাবে কি বিয়ে হয়? বিয়ের তো কিছু নিয়ম আছে। তা ছাড়া মুকুর মতামত। হরিশঙ্করের ইচ্ছা অনিচ্ছা।

হরিশঙ্কর বললেন, পাত্রীর মত নিবি না? মুকুর বাবা?

ছোটদাদু বললেন, আমার মত, আমার ইচ্ছা। এর ওপর কারও কথা তো চলবে না।

হরিশঙ্কর বললেন, বিবাহের একটা অনুষ্ঠান আছে।

ছোটদাদু বললেন, সে দায়িত্ব আমার।

হরিশঙ্কর বললেন, বেশ, কিন্তু ছেলেটাকে এরই মধ্যে সংসারে ঢোকাবি! সংসার যে বড় কদর্য জায়গা। আমি চেয়েছিলুম ও হবে বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। এক মুক্তপুরুষ।

ছোটদাদু একটা আঙুল তুলে বললেন, সন্ন্যাসী হওয়া কি ডাক্তার হওয়া, না ইঞ্জিনিয়ার হওয়া! হব বললেই হওয়া যায়। সংস্কার চাই, দৈব কৃপা চাই। তুমি তো সব ছেড়ে চলে গিয়েছিলে। ফিরে এলে ঘোর সংসারী হয়ে। কবে মুক্তি পাবে? আশার ছেলের মানুষ হতে পনেরো-কুড়ি বছরের ধাক্কা। এই পনেরোটা বছর তোমার কোনও মুক্তি নেই। সংসার! আমরা কে সংসারের বাইরে আছি হরিশঙ্কর? সংসার ঢুকে বসে আছে আমাদের মনে। পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার। জেনে রাখো, যৌবনের সকালেই তুমি তোমার স্ত্রীকে হারিয়েছ। এই বয়সে তোমার পুত্রবধূর প্রয়োজন, যাকে তুমি মা বলে ডাকবে। সেই ডাকাটাই তোমার সাধনা। পিন্টু আর মুকু, দু'জনের দুই গ্রহ। দু'জনের রাশিচক্রের মিলনে এই সংসার হেসে উঠবে। এর কিছু আছে, কিছু নেই, এর যা নেই ওর তা আছে, ওর যা নেই এর তা আছে। কীরকম জানো, একটা ছবি ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে আছে, এখন শুধু সাবধানে জুড়ে দেওয়া। কোনও পক্ষের কোনও প্রতিবাদ আছে?

কারও মুখে কোনও কথা নেই। নীরবতায় পেরেক ঠুকছে ঘরের দেয়ালঘড়ি। যেন কোনও স্বর্ণকার সময়ের অলংকারে মিছরি কাটছে।

ছোটদাদু বললেন, নীরবতাই সম্মতির লক্ষণ। একটা প্রশ্ন কেবল মুকুকে, তোমার মন থেকে পুলিশ অফিসারের সেই ছেলেটি ঝরে গেছে কি? সুরঞ্জনার দাদা?

মুকু চমকে উঠল।

ছোটদাদু বললেন, বিপজ্জনক জীবনসঙ্গী হত। ওদের পরিবারে তোমার সুখ হত না। ওদের আদর্শের সংজ্ঞা আলাদা। তুমি এই পরিবারের জন্যেই তৈরি।

মুকু বললে, আমার রাগ আর অভিমান দুটোই হয়েছিল।

এখন?

এখন আর কিছু নেই।

আমি যা চাইছি তোমার মত আছে?

আছে।

তোমার বাবার মত?

কে বাবা? কার বাবা? আমার বাবা আমার সামনে বসে আছেন।

হরিশঙ্কর স্নিগ্ধ চোখে মুকুর দিকে তাকালেন। ভোরের নীল আকাশ অনেক সময় মানুষের দিকে এইভাবে তাকায়। ফাঁদে-পড়া ধেড়ে ইঁদুরের মতো আমার মনের অবস্থা।

ছোটদাদু বললেন, পিন্টু, এইবার তোমাকে প্রশ্ন, দেখলে তো অনেক, একই মশলার রকমভেদ, মুকুকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছ?

আমার মাথা অবনত। মুকু কি আমাকে মানুষ ভাবে! ওর চরিত্রের বলিষ্ঠতা আমার আছে কি? আমার সুরঞ্জনা, আমার জবা। আমার দুর্বলতার পরিধি তো কম নয়! আমি একটা ফড়িং। লাফ মেরে একবার এই ঝোপে, একবার ওই ঝোপে।

ছোটদাদু বললেন, উত্তর দাও।

আমি সব দিক থেকে ওর অযোগ্য।

আমি এই জ্ঞানোদয়টুকুই চেয়েছিলাম। যোগ্যের জন্যেই অযোগ্য। আচ্ছা শুরু করা যাক অনুষ্ঠান। একই মন্ত্রে দু'জনের দীক্ষা। মন্ত্রের জীবনবন্ধন।

অনুষ্ঠান শুরু হল। ছোটদাদু আচমন করে প্রত্যেকের হাতে একটু একটু গঙ্গাজল দিলেন। মন্ত্রটি ভারী সুন্দর,

হংস ঋষিঃ। অব্যক্তাং গায়ত্রী ছন্দ।
পরমহংস দেবতা। অহমিতি বীজম্।
স ইতি শক্তিঃ। সোহহমিতি কীলকম॥

হরিশঙ্করের হাতে আমার ডান হাত, জয়নারায়ণের হাতে মুকুর ডান হাত। দু'জনে আমাদের হাত মেলালেন। ছোটদাদু লাল সুতোর সাতটা পাক মেরে বন্ধন দিলেন। সেই মিলিত হাতের ওপর শুরু হল তাঁর জপ। সময় চলে যায়। ধ্যান গভীর থেকে গভীরতর। একটা তরঙ্গ বহে চলেছে শরীরে। একটা ঘোর। অদ্ভুত একটা ভালবাসার ভাব। একটা স্নিগ্ধতা। মুকুর আংটি চলে এল আমার আঙুলে, আমারটা মুকুর আঙুলে। ছোটদাদু কখন যে শাঁখা সিঁদুর জোগাড় করেছিলেন, তাও জানি না। আমাকে বললেন, শাঁখা পরাও, সিঁদুর দাও। ছোটদাদু বিশুদ্ধ উচ্চারণে বলছেন,

শক্তয়োহস্য জগৎ কৃৎস্ন শক্তিমাংস্তু মহেশ্বরঃ।
শক্তিস্ত শক্তিমদ্রুনাদ্ ব্যতিরেকং, ন গচ্ছতি।
তাদাত্ম্য মনয়োনিত্যং বহ্নি দাহি কয়োরিব॥

ছোটদাদু বললেন, এইবার তোমরা দু'জনে আমাদের সাতবার প্রদক্ষিণ করে আসনে বোসো।

গোটা একটা মেয়ে আমার হাত ধরে গোল হয়ে ঘুরছে। মাথায় লাল ঘোমটা, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁদুর। ধূপের ধোঁয়া, প্রদীপের শিখা। মন্ত্রের ওঙ্কার। ক্ষণিকের জন্যে মনে হল, এই ঘরের বাইরে তাঁবুর মতো বিশাল এক মশারির ভেতর একটি অসহায় পরিবারের অনিশ্চিত কাহিনি তৈরি হচ্ছে।

আসনে বসলুম দু'জনে। ছোটদাদু আমাদের কানে বীজমন্ত্র দিলেন। দিয়ে বললেন, কয়েকটি কথা স্মরণে রেখো। জীবনের পথে কাজে লাগবে। সুখে, দুঃখে, শান্তিতে, অশান্তিতে, সত্যকে হারিয়ে ফেলো না। উদার দৃষ্টিতে দেখবে। কখনও উৎকণ্ঠিত হবে না। বিপদে হারিয়ে ফেলো না নিজেকে। মনকে ধরে রাখবে

কেন্দ্রবিন্দুতে, প্রদীপের স্থির শিখার মতো। মনকে শান্ত রাখবে, এক সেকেন্ডের জন্যেও দৃঢ়তা হারাবে না। মন হবে টলটলে তরল, নমনীয়, উদার, উন্মুক্ত, স্বাধীন। শরীর যখন বিশ্রামে তখনও মন যেন একাগ্রতা না হারায়। প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও বিক্ষিপ্ততাতেও মাথা যেন ঠান্ডা ও স্থির থাকে। শরীর যেন মনের দ্বারা প্রভাবিত না হয়, মনও যেন শরীর নিরপেক্ষ থাকে। মনকে ধরে থাকবে, শরীরটাকে ভোলার চেষ্টা করবে। মনকে সবকিছু জানাবে, কিন্তু বাজে ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। বাইরের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না, নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগাবার চেষ্টা করবে। ক্ষুদ্রকে বৃহতের ধারণা করতে হবে, বৃহৎকে ক্ষুদ্রের। সততাই একমাত্র মন্ত্র। জ্ঞানের পরিধি বাড়াও। জগতের সবকিছু জানো, বিচার, অবিচার সৎ, অসৎ। সমস্ত শিল্প ও দক্ষতা আয়ত্ত করো। পৃথিবী তোমাকে যেন ঠকাতে না পারে, যেন বোকা না বানাতে পারে।

ছোটদাদু হেসে বললেন, এইবার তোমরা গুরুজনদের একসঙ্গে প্রণাম করো।

প্রণাম শেষ হতেই বললেন, পুবের জানলার দিকে মুখ করে দু'জনে পাশাপাশি বোসো, মুকু বসবে তোমার বামে। তোমার বাঁ হাতের ওপর থাকবে মুকুর ডান হাত। ওই অবস্থায় একশো আটবার বীজমন্ত্র জপ করবে ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, একসঙ্গে। মনে মনে চিন্তা করবে, মন থেকে মনে চলে গেছে মন্ত্রের উজ্জ্বল একটি সেতু। একশো আট হয়ে যাওয়ার পর, মুকু বসবে তোমার কোলে। ওইভাবে একশো আট। তারপর তোমরা মিলিত হবে। শরীরে শরীর। ঊর্ধ্বে অধে, অধে ঊর্ধ্বে। কিন্তু, সঙ্গমের হি কর্তব্যং কর্তব্যং ন তু মৈথুনম্। আশা করি বুঝতে পারলে। আমরা চলে যাচ্ছি। দরজা বন্ধ হচ্ছে বাইরে থেকে।

বন্ধ দুয়ার জীবের উপমা। বাইরেটা বন্ধ না হলে আত্মপ্রকাশ কী অসম্ভব! ওই দুয়ার যখন জগতের দিকে খুলে গেল আবার, তখন আর আমি নয়, আমরা দেখলুম, এক শান্ত সমাহিত সাধক, সাদা শার্ট, সাদা ধুতি পরে পথ ধরে হেঁটে চলেছেন, দূর থেকে দূরে। একবারও পেছন ফিরে তাকালেন না। যা ঘটে গেল, গেল। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। কৃষক যেভাবে জমিতে বীজ ছড়াতে ছড়াতে চলে যান দিগন্তের কোনও এক মহাবৃক্ষের আড়ালে। তারপর রাত আসে, মৃত্তিকার স্নেহে সময় খেলা করে যায়, দিবসের সূর্য শাসন করে, আরোপ করে তিতিক্ষা, আনন্দে উপ্ত হয় প্রাণ। চিতা জ্বলবে একের পর এক, সময়ের ব্যবধানে। সাক্ষী মহাকাল লিখবে জীবের কাহিনি, বাতাস উলটে যাবে পাণ্ডুলিপির পাতা।

আমাদের জাফরি-ঘেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে হরিশঙ্কর নায়কের মতো হেসে বললেন, তুমিও সংসারী, আমিও সংসারী। বউমা, এইবার চা চাপাও। জীবনের লিকার যত গাঢ় হবে, আদর্শের দুধ তত বেশি ঢালবে, স্থৈর্যের চিনি।

লালমতো একটা কী চলে গেল! মুকু। জয়নারায়ণ অকৃত্রিম ছেলেমানুষের মতো বললেন, ওই দেখ তোর বউ! বউমা ডাকে নড়ছে চড়ছে। নিউ চ্যাপ্টার অফ ইয়োর লাইফ।

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস • গল্প

অগ্নিসংকেত

অচেনা আকাশ

একে একে

কপাল

কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

কামিনী কাঞ্চন

ক্যানসার

ঝাড়ফুঁক

তুমি আর আমি

তৃতীয় ব্যক্তি

দুটি দরজা

দুটি চেয়ার

পায়রা

পার্বতী

পেয়ালা পিরিচ (গল্প)

ফিরে ফিরে আসি

বসবাস

ভয়

ভৈরবী ও শ্রীরামকৃষ্ণ

মুখোমুখি

মুখোশের চোখে জল

রসেবশে

রাখিস মা রসেবশে

শঙ্খচিল

শাখা প্রশাখা

শ্বেতপাথরের টেবিল (গল্প)

সাধের ময়না

সোফা কাম বেড় (গল্প)

হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ

ছোটদের বই

অজ্ঞাতবাস

ইতি তোমার মা

ইতি পলাশ

কলকাতার নিশাচর

ডোরাকাটা জামা

রুকুসুকু

শিউলি

লোটাকম্বল • সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



|| ই-বুকটি সমাপ্ত হল ||

